ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৯—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

মহাপ্রস্থান

শিল্পী : অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

পদসঞ্চার

বাঙলা দেশে ইউরোপীয় বণিক্‌দের সর্বপ্রথম পদসঞ্চারের যুগ—ইতিহাসের এক অভিশপ্ত সন্ধিক্ষণ। বহির্ভারতে কীর্তিমান বাঙালী তখন বাণিজ্য-যাত্রায় বীতরাগ—শাসক-বর্গ বিলাসী ও আত্মসুখ পরায়ণ—সম্প্রদায় ও ধর্মগত অনৈক্যে সমগ্র দেশ তখন দুর্বল ও পঙ্গু। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সেই চরম দুর্যোগের দিনে আগমন ঘটলো ইউরোপীয় বণিক্‌দের—যারা তরবারির মুখে প্রচার ক'রতো খৃস্টধর্ম—আর লুণ্ঠন ক'রতো সম্পদ। ইতিহাসের সেই জ্বলন্ত পটভূমিতে রচিত—'পদসঞ্চার'।

দাম—পাঁচ টাকা

উপনিবেশ

শুধু ঘটনার বিচিত্র প্রবাহ—সমুদ্রোপকূলবর্তী এক রহস্যময় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্নধর্মী নর-নারীর বিচিত্র কার্যধারা—তাহাদের জীবনযাত্রার অপরূপ ছবি!

১ম পর্ব—২-৫০ ২য় পর্ব—২-৫০ ৩য় পর্ব—২-৫০

গন্ধরাজ

সর্ববৃহৎ নয়—কিন্তু দশটি বড় গল্পের সুনির্বাচিত সংকলন।

দাম—তিন টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আরও কয়েকটি অভিনন্দন

DANDY SWAMI JAGANNATH ASHRAM
SHANKAR MATH
P. O. KANKO MATH
VIA KATRAS GARH
(DHANBAD)
Dated ১।৯।৬২

আশীর্ব্বাদ

'ত্যাগেনৈকেনমৃতত্বমানশুঃ'—ত্যাগরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম পদার্থ 'অমৃতত্ব' লাভ সম্ভব হয়—ইহাই ভারতীয় আর্য্য মনীষায় সমুদ্ভাসিত। বস্তুতঃ ত্যাগই প্রকৃত পক্ষে জীবনে পরম শান্তি আনিতে সমর্থ হয়। ভারত-জীবনের এই মূল-মন্ত্র আজ কাল-প্রভাবে অবহেলিত। আত্ম-বিস্মৃত ভারত আজ ইহ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যসভ্যতার আপাতমনোহর 'বৈজ্ঞানিক'-ভোগোপকরণ সংগ্রহে সমুৎসুক। এই ঔৎসুক্য মানুষকে নবাবিষ্কারে প্রেরণা প্রদান করিতেছে সত্য হইলেও—ইহা আরও সত্য যে—মানুষ আপন মহিমা হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। সত্য, সংযম, সরলতা প্রভৃতি মানবীয় সদ্‌গুণরাজি হইতে মানুষ আজ পরিচয়হীন হইয়া আসুরী-প্রবৃত্তির দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া আত্ম-স্বার্থ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মোহ-মহোদধির উদরে আবার স্থান রচনা করিতে যাইতেছে।

যাহাতে পুনরপি ভারতের প্রকৃত ভাগ্যবিধাতা এই বিড়ম্বনা হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করেন সেজন্য ভারতবর্ষ পত্রিকা দীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল সচেষ্ট, তাই তাহার সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাহাকে আশীর্বাদ করি, তাহার চেষ্টা সফল হউক। তাহা হইলেই এই জাতির সংরক্ষণ সম্ভব।

দণ্ডিস্বামী জগন্নাথাশ্রম।

প্রাক্তন মোহান্ত, তারকেশ্বর

গত সংখ্যাগুলিতে যাঁরা অভিনন্দনবাণী পাঠিয়েছিলেন :—

মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ,
" উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন,
" পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু
" মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়
" কৃষি, খাদ্য, সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন,
" শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
" কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীবি, গোপাল রেড্ডী
" পশ্চিমবংগ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ
" জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
" মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়
" শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়
" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীমন্মথ রায়
শ্রীকালিদাস রায়
মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত
শ্রীত্রিগুণা সেন

SENATE HOUSE

CALCUTTA

অভিনন্দন

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমি গণিতশাস্ত্রে এম্, এ পাশ করিয়া কলেজের পড়া শেষ করিয়াছি এমন সময় আপনাদের "ভারতবর্ষ" বাহির হইল। প্রথম সংখ্যায় মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্র লালের "যে দিন সুনীল জলধি হইতে………" পড়িয়া একরকম অভিভূতই হইয়া পড়িয়াছিলাম। অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব শব্দ-সম্পদে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে মন প্রাণ আনন্দে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি কিশোর বয়স থেকেই শুধু পদ্য নয়, পদ্যধর্ম্মী গদ্যেরও অনুরক্ত ছিলাম—অনেক গদ্য খণ্ড আজিও এই বার্দ্ধক্যে মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারি—এই রকম একখণ্ড ছবি বঙ্কিমের অপরূপ ভাষার ঝঙ্কারে আজও মনকে সরস করিয়া উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলে—"নদীর জল চল চল অবিরল চলিতেছে ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে"—ফলে, স্থানে অস্থানে উহা আবৃত্তি করিয়া অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করি। প্রথম যৌবনের আকাঙ্খিত বস্তুর প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রীতি আমাকে আজও অনুপ্রাণিত করে—তাই আপনাদের এই বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতীক পত্রিকাখানিকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাই। পরিচালক-মণ্ডলীর কার্য্যতৎপরতা ও কর্ম্মদক্ষতায় পত্রিকাখানি দিন দিন অধিকতর সাফল্য লাভ করিবে এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণের বস্তু হিসাবে "ভারতবর্ষ" আপনাদিগকে অসামান্য যশঃ গৌরবের অধিকারী করুক, ঐকান্তিকভাবে ইহাই কামনা করি।

ইতি

আপনাদের প্রীতিধন্য

ট্রেজারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪ বিপিন পাল রোড

কলিকাতা ২৬

৩।১০।৬২

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর কাল ইহা যেভাবে নানা দিক দিয়া বাঙ্গালীর মানসিক উন্নতি সাধন ও জ্ঞানের ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রশংসা'র যোগ্য। আজ ইহার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি ইহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। বহু বৎসর যাবৎ আমি লেখক হিসাবে ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত—সুতরাং ভারতবর্ষের কৃতিত্বে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশা করি, আরও বহুকাল 'ভারতবর্ষ' তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতে সমর্থ হইবে।

১৫।১এ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯
১৬।১০।৬২

'ভারতবর্ষের' আমি একজন অনুরাগী পাঠক এবং একজন পুরাতন লেখকও বটে। পঞ্চাশ বছর আগে এই 'ভারতবর্ষে' আমার লেখা ছোট গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আমার আঁকা ছবিও প্রথম ছাপা হয়েছিল এই 'ভারতবর্ষে' চল্লিশ বছর আগে। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এই 'ভারতবর্ষের' দৌলতে।

তার পর কত কাল গেছে কেটে। পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই 'ভারতবর্ষ' আজও তার সাহিত্যিক আভিজাত্য ও উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে চলেছে অক্লান্তভাবে। তার এই শুভ সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।
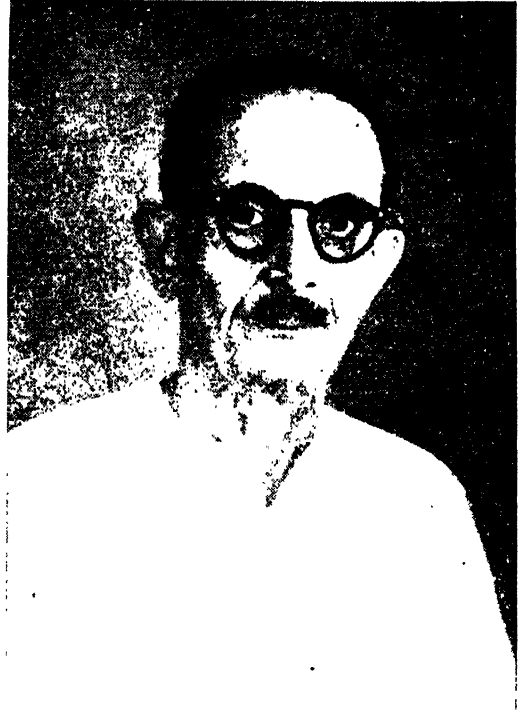
১৪৮ মহাত্মা গান্ধী রোড
বোম্বাই-১
১২ই আগষ্ট, ১৯৬২

"ভারতবর্ষ"-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে, আমি তখন কল্‌কাতায় কলেজে পড়ি। সেই অবধি আমি এর নিয়মিত পাঠক। এই কয়েক বছরে বাংলা দেশের অনেক বিদগ্ধ সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি "ভারতবর্ষ"-এর মাধ্যমে।

আমার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনালুপ্ত "বিচিত্রা"য়, কিন্তু আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প স্থান পেয়েছিল "ভারতবর্ষ"-এরই পৃষ্ঠায়। তারপর মাঝে মাঝেই আমার লেখা গল্প ও প্রবন্ধ এই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আমার সরকারী জীবনের শেষবছরের স্মৃতিকাহিনী "এক অধ্যায়"ও ধারাবাহিকভাবে "ভারতবর্ষ"-তে প্রকাশিত হয়েছিল, বছর তিনেক আগে। আমি যদিও খুব বেশী লিখিনা (ইংরেজিতে অর্থনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখায় অনেকখানি সময় আমাকে দিতে হয়), তবু যখনই লিখি "ভারতবর্ষ"-এর দাবী অগ্রাহ্য করতে পারি না।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে "ভারতবর্ষ" নানাভাবে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধি করে এসেছে, নতুন এবং পুরানো বহুলেখককে বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছে। সুবর্ণ-জয়ন্তী বছরে আমি এর দীর্ঘজীবন এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

(ডঃ) [illegible signature]

পৌষ—১৩৬৯

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চাশত্তম বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

নিত্যলীলা

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে স্বকীয়ার লক্ষণ করা হইয়াছে—

"করগ্রাহং বিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥"

অর্থাৎ—যাঁহারা পাণিগ্রহণবিধি অনুসারে পরিগৃহীত পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং পতিসেবাবিধি হইতে অবিচলিতা, এ স্থানে তাঁহারাই স্বকীয়া বলিয়া কথিতা। আর পরকীয়ার লক্ষণ করা হইয়াছে—

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণঃ।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তে ॥"

রাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং পাণিগ্রহধর্ম্মানুসারে এ স্থানে অস্বীকৃতা, পরকীয়া শব্দ-বাচ্য তাঁহারাই।

ব্রহ্ম সংহিতার শ্লোকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে অপ্রকট গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে ভাব তাহা স্বকীয়া ভাব। শ্লোকটি এই—

"আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভি য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আদিপুরুষ অর্থাৎ আবির্ভূত গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় প্রেয়সীবর্গের সহিত গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই প্রেয়সীবর্গ হইতেছেন —আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিত, শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তিরূপ অংশ বা কলারূপা, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপতা নিজ স্বরূপের তুল্য। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বলিয়া স্বরূপ হইতে স্বরূপ শক্তির অবিচ্ছেদ্যত্ব-বশতঃ ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতুল্যা। শ্রীপাদজীব গোস্বামী ইহার টীকায় বলিয়াছেন—

"নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব, নতু প্রকটলীলাবং
পরদারত্বব্যবহারেণ ইত্যহঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং
তৎপরদারত্বাসম্ভবাং অস্য স্বদারত্বময়রসস্য
কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকট-
লীলায়াং মায়য়ৈবতাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ।"

শ্রীপাদ জীবের এই টীকাটি অবলম্বন করিয়াই পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামিপ্রমুখ প্রভু-সন্তানগণের সিদ্ধান্তটি স্ফুটীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন—

"নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবং
পরদারাভাসেন পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং পরদারাবত্তা
সম্ভবাং। অস্য স্বদারতাময়রসস্য কৌতুকাব-
গুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষনার্থং প্রকটলীলায়াং
তাসু পরদারতা ব্যবহারেন নিবসতি। সোঽয়ং য এব
প্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপব্যবহারে যো
নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়ে
তন্ত্রে তদপ্রকটলীলা নিত্যলীলাশীলময়দশাব্যাখ্যানে—
'অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেবেতি।'
গোলোক এব ইত্যেবকারেণ সেয়ং লীলা তু তস্মান্নান্যত
বিদ্যত ইতি প্রকাশতে।"

গোলক ব্যতীত এই লীলার অন্যত্র বিদ্যমানতা নাই—ইহাও বুঝাইল এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত এবং শ্রীব্রজসুন্দরীরূপা গোপীগণ তাঁহার স্বকীয়া কান্তা—ইহাও বুঝাইল। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার অন্য একটি শ্লোকেরও শ্রীপাদ জীব এই অর্থই বুঝাইয়াছেন।

এই যে লীলা ইহাই নিত্যলীলা। আর যে গোলোকে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ লীলাসহচরী গোপীগণ সহ বাস করিয়া থাকেন তাহারই অপর নাম হইল—ব্রজধাম ও বৃন্দাবন। শ্রীপাদ জীব বলিয়াছেন শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকটলীলানুগত প্রকাশই হইল গোলোক। "শ্রীবৃন্দাবনস্য অপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি"। সুতরাং গোলোকই হইল অপ্রকট ব্রজধাম। এই অপ্রকট ব্রজধাম হইতেই প্রকট ব্রজধামের যে প্রকাশ হয়, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সরলভাবে বর্ণিত আছে—

"পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্যবিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহ একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগ জানি।
সেই চারিযুগে এক দিব্যযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ তাহারই অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে গোলোক হইতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজলীলায় আত্ম-প্রকাশ করেন।

সুতরাং ইহা স্বাভাবিকভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, গোলোকে কান্তাগণের যে ভাব, তাহাই স্থায়িভাব। প্রকট লীলায় ভাবান্তরবং প্রত্যায়িত হইলেও, মূলে কিন্তু সেই নিত্যস্বকীয়াত্বেই তাহার পর্য্যবসান হয়। অর্থাৎ—গোলোকে কান্তপ্রতি কান্তাগণের যদি স্বকীয়াভাবের নিত্যতা দ্যোতিত হয়, তবে প্রকটে পরকীয়াত্বের বৈচিত্রী যত উৎকর্ষই লাভ করুক, শেষে কিন্তু অপ্রকটে প্রবেশের প্রাক্কালে স্বকীয়াভাবেরই স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইবেই।

শ্রীমদভাগবতে প্রকটলীলারই গৌরব প্রদর্শিত। প্রকট লীলা যে পরকীয়া-ভাবময়ী ইহা সুস্পষ্ট হইলেও, বহু স্থলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের স্বরূপগত প্রকৃত সম্বন্ধ উঁকি মারিয়াছে—পরকীয়াভাবের উৎকর্ষ দেখাইবার প্রয়োজনে স্বকীয়াভাব মাথা তুলিতেই পারে নাই, ইহাই মাত্র এ লীলার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবত পরকীয়াভাবের জয়জয়কার করিতে করিতেও মাঝে মাঝে দু'একটি সাঙ্কেতিক শব্দবিন্যাস করিয়াছেন, যদ্দ্বারা গোপীদিগের স্বরূপ সম্বন্ধে হুঁসিয়ারীর ত্রুটি না হয়। এমনই একটি শব্দ হইল—'কৃষ্ণবধূ'। মূল শ্লোকটি হইল—

পাদান্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈ র্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্য স্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥
১০।৩৩।৭

বলা বাহুল্য, শ্রীরাসমণ্ডলে নৃত্যপরা গোপীগণসহ রাস-বিহারীর পরস্পর শোভাতিশয্য বর্ণনায় পরকীয়াভাবময়ীত্বই ব্যঞ্জিত হইতেছে—ইহাদিগকে এ সময় 'কৃষ্ণবধ্বঃ' বলিয়া পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য কি?

তাৎপর্য্য হইল এই যে, গোপীগণের 'গোপবধূ' বলিয়া যে প্রসিদ্ধি, তাহা এই 'কৃষ্ণবধূ' শব্দ দ্বারা খণ্ডিত করা হইল। গোপীগণ 'পরকীয়া'-ভাব-ভাবিতা হইয়া এই লীলার চমৎকারিত্ব বিধান করিলেও, মূলে যে তাঁহারা 'স্বকীয়া', এই তত্ত্বটি স্মরণ করাইয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে যে 'মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহা-মারকতো যথা—এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, দাম্পত্য না থাকিলে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না অদাম্পত্য হইল আগন্তুক সম্বন্ধ—স্বাভাবিক সম্বন্ধ নয়। এই শ্লোকে যে মেঘচক্রে বিদ্যুতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে. তাহাও সঙ্গত হয় না।

বৈষ্ণবতোষণী টীকায় এই তত্ত্বটি এইভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে—"তং কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ তা দৃষ্টান্তয়িতব্যবশাৎ কৃষ্ণস্য তত্তৎ প্রকাশচক্রে বিরেজুঃ। কুত্র কা ইব—মেঘচক্রে তড়িত ইব। নন্থ মধ্যে মনীনামিত্যাদিপ্রোক্ত-দৃষ্টান্তো ঘটতে অদাম্পত্যেন তত্তদাত্মক সম্বন্ধাৎ নত্বয়ং স্বাভাবিক সম্বন্ধাভাবাত্তদেতদাশঙ্ক্য আনন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্য-মেব ব্যনক্তি 'কৃষ্ণবধ্ব' ইতি তদ্বদত্রাপি স্বাভাবিকাদেব সম্বন্ধাৎ দাম্পত্যসেবেতি ভাবঃ। অর্থাৎ আনন্দবৈচিত্রী বশতঃ 'কৃষ্ণবধ্ব' শব্দে রহস্যই ব্যক্ত হইয়াছে,—সে রহস্য হইল—দাম্পত্যরূপ স্বকীয়াত্ব।

আরও একটি শ্লোকের কথা বলিতেছি। উদ্ধব-সংবাদে গোপীগণের স্বমুখোক্ত প্রশ্ন—

"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে?"

আর্য্যপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ) এক্ষণে কি (গুরুকুল হইতে আসিয়া) মধুপুরীতে আছেন?

লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, পরকীয়া ভাবময়ী হইয়াও তাঁহারা প্রাণবল্লভকে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণী টীকাকার এই আর্য্যপুত্র শব্দটির রূঢ়ি বৃত্তিতেই অর্থ স্বীকার করিয়াছেন—

"আর্য্যপুত্র ইতি রূঢ্যা বৃত্ত্যা আর্য্যস্য শ্রীগোপেন্দ্রস্য পুত্র ইতি তচ্ছন্দেন স এবাস্মাকম্ বাস্তবঃ পতিঃ অন্যস্ত লোক প্রতীতিমাত্রঃ।"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও যখন ইহার অর্থ করিয়াছেন —"আর্য্যস্য গোপেন্দ্রস্য পুত্রঃ অস্মৎ স্বামীতি বা"—তখন গোপীগণের বাস্তবস্বকীয়াত্বই যে তিনিও মানিয়া লইয়াছেন, তাহাই বুঝা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পত্নী কর্তৃক পতিকে আর্য্যপুত্র বলিয়াই উল্লেখের প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুশাসনই হইল—

"আর্য্যপুত্রেতি সম্বোধ্যঃ পতিঃ পত্নীজনেন বৈ।"

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতীয় লীলাটিতে যদিও গোপীদিগের পরকীয়াত্বভাবেরই শ্লাঘা ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি মূল সিদ্ধান্ত যে 'স্বকীয়া' এই তত্ত্বটি বুঝাইতেও ভাগবত ত্রুটি করেন নাই।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ললিত-মাধব নাটকে স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, দ্বারকাস্থিত নববৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যথারীতি বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। যে দশম অঙ্কটিতে এই বিবাহলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহায় নাম দিয়াছেন —"পূর্ণমনোরথ"। অর্থাৎ প্রকট লীলায় পরকীয়াভাবময়ী রূপে যে লীলাচমৎকারিতা প্রদর্শন করিলেন, তদুত্তরে আবার স্বকীয়াভাবে প্রত্যাবর্ত্তন দ্বারা মনোরথটি পূর্ণ হইল। পরকীয়াভাবসম্ভূত পারতন্ত্র্যের অবসানে বিবাহ-জাত স্বকীয়ভাবানুগত পরম বৈশিষ্ট্যময়, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে প্রকট লীলার পর্য্যবসানেই 'পূর্ণ মনোরথ' শব্দের সার্থকতা। প্রকট লীলায় ঔপপত্যাদির প্রকাশ থাকিলেও এই কারণেই দূষণীয় হয় নাই। এই কথাটি শ্রীপাদ রূপ উজ্জ্বল-

নীলমণি গ্রন্থের নায়কভেদ প্রকরণের একটি শ্লোকেও উল্লেখ করিয়াছেন—

"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥"

ঔপপত্যসম্বন্ধে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে; পরন্তু রস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রকটলীলায় গোপীগণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে ঔপপত্য বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের যে পরকীয়া-ভাব তাহাও দোষযুক্ত নহে, যেহেতু রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়া স্বরূপশক্তিরূপিণী ব্রজ-গোপীগণকেই পরকীয়াভাবভাবিতা করিয়া এই লীলাটির বৈচিত্র্য প্রদর্শনান্তে পুনরায় স্বকীয়াতেই ইহার পর্য্যবসান ঘটাইয়াছেন।

প্রকটলীলার এই পরকীয়া ভাবটি যে বাস্তব নয়—ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন শ্রীপাদ জীবগোস্বামী। বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর মধ্যে কথোপকথন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

বৃ। দুঃখের কথা কি বলিব, চিরদিন যাহাদিগকে কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি, তাহাদেরও বিশেষ আগ্রহে অপরের সহিত সম্বন্ধ স্পষ্ট হইতেছে।

পৌ। তুমি ইহা কি প্রকারে জানিলে?

বৃ। আমি নিজ চক্ষেই সে বিষয়ের চেষ্টা দেখিতেছি।

পৌ। অন্যের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হইবে না। আমিই মায়াদ্বারা অপরা গোপীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ সে কার্য্যের প্রতিবন্ধ সংঘটন করিব।

বৃ। তথাপি লোকসমাজে কলঙ্কশঙ্কা যে অনিবার্য্য!

পৌ। সে কলঙ্কও থাকিবে না। কারণ—মুনিগণ ইহা বর্ণনা করিবেন যে,—'ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বস্থিতা বলিয়াই মনে করিল এবং কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিল না।'

বৃ। যদি তাহাও হয়, তথাপি তাহাদিগের অন্যের সহিত যে বিবাহ তাহাও অত্যন্ত পীড়ারই কারণ হইবে। শাস্ত্রাচার্য্যগণ ইহার তো কোনই প্রায়শ্চিত্তের নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাই বলিতেছি, আপনি এখানে কেন নিবস উপেক্ষা করিতেছেন?

পৌ। (হাস্যপূর্ব্বক) মঙ্গলময়ি ভগিনি! ইহাদের বিবাহও হইবে না। তুমি হাস্যমুখে গমন কর।

অতঃপর বৃন্দা দেবী সানন্দে পৌর্ণমাসীর চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া তদীয় বাক্য স্বীকার করতঃ অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। পৌর্ণমাসী কোন বিষয় গোপন না করিয়া বৃন্দাকে উত্তোলনপূর্ব্বক সান্ত্বনা সহকারে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে বৃন্দাও সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপনকরতঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে দুই তিন দিন যাপন করিলেন। অপরের সহিত তাহার বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়াছে—এই কথা শ্রবণ করতঃ ম্লানমুখে পৌর্ণমাসীর নিকট অতিসত্বর আগমন করিলেন এবং মৃতব্যক্তির মত অবস্থান করিলেন।

পৌ। কি হইয়াছে, যে জন্য তুমি অতিশয় উদ্বিগ্নবৎ পরিদৃষ্ট হইতেছ?

বৃ। ভগবতি! কি বলিব? আমার মুখ দিয়া যে কিছুই নির্গত হইতেছে না।

পৌ। পঙ্কজনয়নে! তুমি মনোমধ্যে কিছুই চিন্তা করিও না।

বৃ। (কঠোর হাস্য সহকারে) চিন্তার কারণ বর্ত্তমান নয়?

পৌ। অদ্যাপি তাঁহাদের বিবাহ নির্ব্বাহ হয় নাই।

বৃ। পরমবিজ্ঞে? লোকেরা যে ইহা চাক্ষুষ করিয়া বলাবলি করিতেছে?

পৌ। সে বালিকারা কোথায়?

বৃ। ইহাই শুনিয়াছি যে, গোপগণ সেই বালিকা-গণকে নিতান্ত বালিকা দেখিয়াই পিতৃগৃহে রক্ষা করতঃ চলিয়া গিয়াছেন।

পৌ। (প্রণয় ও রোষ সহকারে) তুমি কেন আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না? জনশ্রুতিকেই বার বার অঙ্গীকার করিতেছ!

বৃ। (সানন্দে) ভগবতি! এই সত্যঘটনা যেন মিথ্যাই হয়; কিন্তু আমার মন যে তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেই পারিতেছে না।

পৌ। (সহাস্যে) লোকেও মিথ্যা বলে নাই, এবং তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধও ঘটে নাই।

'লোকেও মিথ্যা বলে নাই, এবং 'তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধও ঘটে নাই'—এই দুই আপাতবিরোধ বাক্যের সঙ্গতি সাধনার্থ অতঃপর পৌর্ণমাসীর মুখ দিয়া প্রকৃত তত্ত্বটিই প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে—"শ্রীপরমপুরুষয়ো রৌপপত্যং নাস্তীতি।"

ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দ-চিন্ময়" ইত্যাদি শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, "যাঁহারা উজ্জ্বলরস প্রতিভাবিত ও হ্লাদিনীস্বরূপিনী, এরূপ গোপীগণের সহিত নিজ পত্নীভাবে যিনি গোলকে বাস করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" কেবল প্রকটলীলার মধ্যভাগে গোপীগণ পরকীয়াভাসরূপে যে জনশ্রুতি অর্থাৎ লোকমধ্যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, সে লোক সেরূপ নহে—ইহা জানাইবার জন্যই ঐ পদ্যে 'কলাভিঃ' এই পদের পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং শ্রীপাদ জীবেরও সিদ্ধান্ত হইল এই যে—"গোপীগণেরও কেবল কদাচিৎ বহির্দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে নিরন্তর তাহারা কৃষ্ণকে পতি বলিয়াই অনুভব করেন!"

উত্তর চম্পুর শেষে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে ব্রজরামাগণের (গোপীগণের) সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনের অভিলষিত এবং ঐ অভিলসিত বিবাহ ঐ পূরণে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার ঐ পূরণটির নাম দিয়াছেন—'সর্ব্বমনোরথপূরণ।' ললিতমাধবে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ প্রথমাঙ্কে সূচিত এবং সর্ব্বজনাভিলষিত শ্রীরাধাদির বিবাহ শেষ দশম পূরণে বর্ণিত বলিয়া তাহার 'পূর্ণমনোরথ' এই নাম দিয়াছেন। বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীরূপ গোস্বামির এই 'পূর্ণমনোরথ'ই শ্রীজীব গোস্বামীর 'সর্ব্বমনোরথ পূরণে'র আদর্শ। সম্প্রদায়-বর্য্য ঐ দুই আচার্য্য ঐ বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রকট-লীলার পরকীয়াভাবেও নিত্যদাম্পত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বর্ণনা তাঁহাদের স্বকল্পিত নহে—এবং কদাপি প্রমাণ-বিরহিতও হইতে পারে না; কারণ ইহার আকরও পরিদৃষ্ট হয়—ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতকথা প্রকরণে।

শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিতেছেন—

"এইরূপে শ্রীরাধিকা দেবী ধরাতলে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া প্রকটলীলায় কখনও নিজ স্বরূপ জানিতে পারেন নাই। এজন্য গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আমাকে পতি-কামনা করিয়া প্রত্যহ সখীগণের সহিত সূর্য্যপূজা করিতেন। এ দিকে বৃষভানুরাজ আমার মায়াকল্পিত অন্য মূর্ত্তিকে রাধা-জ্ঞানে অভিমন্যুর (রায়াণের) হস্তে প্রদান করেন। ইহা তিনিও জানিতে পারেন নাই। সুতরাং অন্যলোকে যে জানিতে পারেন না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই প্রকটলীলাতে পরম বুদ্ধিমতী সেই রাধিকা 'আমি পরস্ত্রী' এই জ্ঞানে গুরুজন হইতে ভীতা হইয়া অতিনির্জ্জনে কুঞ্জমধ্যে আমার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, পরকীয়াভাবে যে সঙ্গ, তাহা নায়ক-নায়িকা পরস্পরের পক্ষে অতীব সুখকর। এইজন্য যোগমায়াকে সমাশ্রয় করিয়া আমিই স্বয়ং তাহা কল্পনা করিয়াছি। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন আগমাপায়রহিত অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত—তদ্রূপ আমি ও আমার বল্লভার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ স্থলে মূলশ্লোক কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

> পরভাবেন যঃ সঙ্গঃ স চাতীব সুখং মিথঃ।
> ময়ৈব কল্পিতং তচ্চ যোগমায়াবলম্বিনা॥
> দাহশক্তি র্যথা বহ্নে স্তথৈষা মম বল্লভা।
> অনয়া সহ বিচ্ছেদঃ ক্ষণমাত্রং ন বিদ্যতে॥
> তথ্য চেদ্ রস পোষায় প্রকটস্যানুসারতঃ।
> করোমি লীলামধুনাং যোগমায়াবিবর্দ্ধিতাম্॥

ইহার পর কংসাদি দুর্দ্দান্তজনের বধের নিমিত্ত মথুরা গমন করতঃ উক্ত কংসাদির বধসাধন পূর্ব্বক দ্বারকাতে গমন করি এবং তথায় দন্তবক্র নামক শেষ শত্রুর নিধন সাধন করিয়া পুনরায় গোকুলে আগমন করি ও ব্রজবাসিজনগণকে জানাইয়া থাকি যে—'শ্রীরাধার বিবাহ হয় নাই।' দেখ নারদ! চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ। (অর্থাৎ তাহাদেরও গোবর্দ্ধনাদি গোপপ্রভৃতির সহিত যে বিবাহ তাহা মায়িক)। অতএব তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই। অতঃপর 'লোকবৎ লীলাকারী' আমি লৌকিক রীত্যনুসারে

(সাধারণের প্রতীতির জন্য) সাধারণ জনগণ সমক্ষে (জনসংসদি) শ্রীরাধাদির পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

"ততঃ পাণিগ্রহণৈষা স্বীকৃতা জনসংসদি।

প্রকটস্যানুসারেণ লোকবল্লীলয়া ময়া ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও নারায়ণ নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধের বিস্তার ভয়ে এস্থলে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না। বলা বাহুল্য এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে যাহা সিদ্ধান্তিত হইয়া আছে, শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ জীব তাহাই নাটক ও চম্পূতে বিশদীকৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন যে,—

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্।

তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞাব্ সংজ্ঞয়া ॥

অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' আমি যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি। কাব্যকৃতি প্রজ্ঞারূপা রসনা দ্বারা সেই অমৃতেরই আস্বাদন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই বিরাটগ্রন্থে কাব্য চমৎকারিতার ভিতর দিয়া তিনি অপ্রকট লীলায় স্বকীয়াভাবময়ী লীলাই সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন।

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে তদানীং ব্রজমণ্ডলে ও গৌড়মণ্ডলে তুল্যভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। কবিরাজ মহাশয় শ্রীপাদ জীব গোস্বামি প্রসাদী লিখিয়াছেন—

"গোপালচম্পূ কারলি গ্রন্থ মহাশূর ॥

নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥"

গ্রন্থের গৌরব প্রদর্শনার্থই 'মহাশূর' বলা হইয়াছে তাহা নহে, এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত খণ্ডনে যে কাহারও সামর্থ্য নাই ইহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'ব্রজরসপূর' বলার তাৎপর্য্যও হইল যে, স্বকীয়া ভাবময়ী নিত্যলীলায় পর্য্যবসিত হইয়াই পরকীয়ালীলা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন,—এই তত্ত্বটিই ইহাতে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

প্রকটলীলায় ঔপপত্যের অবতারণায় পাছে কোমল শ্রদ্ধালুচিত্তে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই তত্ত্বটি নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করা হইল—

"যদবতারাদন্যদা ন তাদৃশতায়াঃ স্বীকারঃ কিন্তু দাম্পত্যস্যৈবে লভ্যতে"—অর্থাৎ একমাত্র প্রকটলীলাকাল ব্যতীত অন্যসময়ে পরকীয়াত্ব স্বীকৃত হয় না, কিন্তু দাম্পত্যই স্বীকৃত হয়।

"তস্মাদুপপাতীয়মানত্বেনৈবাসৌ উপপতিরিতি উপদিষ্ট" অর্থাৎ প্রকটলীলায় উপপতিরূপে প্রতীয়মান হন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে 'উপপতি' বলা হইয়াছে।

"তদেবং শ্রীমুদ্ধববাক্যে ব্রহ্মসংহিতা বাক্যে চ তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন মঙ্গীচ্ছতে তদসমাধ্ৎেশ্চ অবতারে তথা প্রতীতি র্মায়িকী এব।"—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত উদ্ধববাক্য এবং ব্রহ্মসংহিতা বাক্য হইতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের নিত্যসম্বন্ধ প্রযুক্ত তাঁহাদের পরকীয়াত্ব সঙ্গত হয় না। অসঙ্গত হইলেও, প্রকটলীলাকালে পরকীয়াত্বের যে প্রতীতি হয়, তাহা মায়িকী মাত্র। এস্থলে মায়িকীর অর্থ হইল—যোগমায়াপ্রভাব সঞ্জাতা।

যোগমায়া প্রভাবে মাত্র প্রকটলীলার রসপুষ্টির জন্যই যে এই পরকীযাত্বের ব্যঞ্জনা এবং এই লীলার অবসানে পুনরায় যে নিত্য দাম্পত্যই স্ফুটীকৃত—একথা স্পষ্ট করতঃ তিনি বলিয়াছেন—

"তদেব শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পতে স্বীকৃতে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি নশ্যত্যেবান্ততো······পূর্ব্বরীত্যা রসাভাসঃ স্যাং ইত্যত্যেহবতারসারস্যাপরভাগে ব্যক্তীভবত্যেব দাম্পত্যম্।"

অর্থাং গোপীগণের সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া প্রকটলীলার শেষসময়ে মায়িক পরকীয়াত্ব অন্তর্হিত হয় অর্থাং পুনরায় নিত্যসকীয়াত্বে অন্তর্লীন হয়। এই পরকীয়াত্ব যদি মায়িক না হইয়া নিত্য হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বরীতি অনুসারে রসাভাস হইত ; ইহা মায়িকী বলিয়াই প্রকটলীলাবসানকালে দাম্পত্য ব্যক্তীভূত হয়।

গোস্বামীগণের এই সিদ্ধান্তই শাস্ত্র-যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ বলিয়া ভক্তসমাজে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। গোস্বামীগণ যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন এই সিদ্ধান্তের উপর কোন আপত্তি তুলিতে কেহই সাহসী ছিলেন না, তাঁহাদের অপ্রকট হইবার পরও পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সিদ্ধান্তই অনুমোদন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কবিরাজ কৃষ্ণদাসরচিত সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রন্থ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" গোস্বামিগণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই পরিগৃহীত হওয়ায়, ভক্তসমাজে কোন বিরুদ্ধসিদ্ধান্তই দাড়াইতে পারে নাই। কবিরাজ অপূর্ব্বভঙ্গীতে এই তত্ত্বটি উপস্থাপিত করিয়াছেন—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধস্বত্বপরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হইতে॥

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু এই তত্ত্বটি স্বয়ং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাঃ ইহা যে অভ্রান্তও অবশ্যমান্য সিদ্ধান্ত তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই চিচ্ছক্তি যোগমায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির প্রভাব প্রদর্শনের জন্যই অপ্রকট হইতে এই রূপরতন প্রকটে আবির্ভাবিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং নিত্যলীলার স্বকীয়াভাবময় রূপটিই যখন প্রকটে প্রকাশিত হইল, তাহাও যে তত্বতঃ স্বকীয়ভাবময়ই রহিয়া গিয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে যে প্রকটলীলায় পরকীয়াভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা কি করিয়া সম্ভবপর—ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—ইহা যোগমায়া প্রভাবসঞ্জাতমাত্র, স্বাভাবিক নহে,—আগন্তক মাত্র। এই তত্ত্বটিরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—"ভক্তগণের গূঢ়ধন" এই বিশেষণপদ দ্বারা। অর্থাৎ নিত্যস্বকীয়াত্ব আবৃত করিয়া পরকীয়াত্বের অভিমান টিকে সত্যবৎপ্রত্যায়িত করতঃ যোগমায়া যে লীলাচমৎকারিতা প্রদর্শন করিলেন—ইহাও যেমন গূঢ়, আবার সেই প্রকটলীলাপর্য্যবসানকালে সেই সেই পরকীয়াভিমানিনীরা যে আবার কেমন করিয়া কিছুমাত্র না জানা অবস্থাতেই নিত্যদাম্পত্যে অধিষ্ঠিতা হইলেন—এই ব্যাপারটিও তেমনি গূঢ়। এইজন্যই বলা হইয়াছে—'ভক্তগণের গূঢ়ধন।'

এই নিগূঢ় তত্ত্বটি ঠিকমত ধরিতে না পারিয়া কোন কোন ব্যক্তির চিত্তে ভ্রমের উদয় হয়। গোস্বামিগণের অপ্রকটের দীর্ঘকাল পরে এইরূপ ভ্রমোদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভ্রম হইতেই পরে আপত্তি উপস্থাপিত হয় এবং পরিশেষে একটি বিরুদ্ধবাদেরও অবতারণা দেখিতে পাই।

অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথাগুলি কিন্তু উপেক্ষণীয় নহে। যদিও সম্প্রদায়ের পণ্ডিত আচার্য্যগণ চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্তটির কোনই গুরুত্ব দেন নাই, তথাপি বিরুদ্ধবাদীগণের ভ্রান্তি অপনোদনার্থ তাঁহার সিদ্ধান্তটি আলোচনা করা প্রয়োজন। চক্রবর্ত্তিপাদের মূল কথা হইল—প্রকট এবং অপ্রকট এই উভয় লীলাতেই ব্রজদেবীগণের পরকীয়াভাব নিত্য, ইহা আগন্তক বা মায়িক নহে,—ইহা বাস্তব।

এই মত কিন্তু শ্রুতি, স্মৃতি, ঋষিবাক্য এবং গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। অপ্রকট লীলার তো কথাই নাই—সেখানে নিত্যদাম্পত্য যে অবিচ্ছিন্ন—ইহা তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। একমাত্র প্রকটলীলার পরকীয়াত্বটিকেই বাস্তব বলিতে গেলেও উভয়লীলার স্বাতন্ত্র্যই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ যে ব্রহ্মাণ্ড ভেদে এই প্রকটলীলার প্রবাহটিকে নিত্য বলিয়া একটা সমাধান করিয়াছেন, ইহার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ, সাধক যে ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রকটলীলায় ভজনের সৌভাগ্য লাভ করেন, সেই প্রকটই অপ্রকটে অন্তর্ভাবিত হইবার সময় সাধককেও সঙ্গে লইয়া যান। ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্তরে পরকীয়াভাবপ্রবাহ নিত্যকাল প্রবাহিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এক ব্রহ্মাণ্ডের ভজন নিজ পর্য্যবসানকালে সাধককে ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে ঠেলিয়া দিবেন—ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। প্রকটলীলা অসাধারণী শক্তি প্রভাবেই তল্লীলাস্মরণপরায়ণ ভজনকে অভীষ্ট ধামে নিজেই পৌছাইয়া দিবার সামর্থ্য রাখেন। সুতরাং সাধকের দুশ্চিন্তারও কোন কারণই থাকিতে পারে না।

এ সকল আপত্তি অপেক্ষাও আর একটি আপত্তির বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সেটি এই যে, "প্রকটলীলায় পরকীয়াভাব যদি অবাস্তবই হয়, এবং যদি প্রকটলীলার শেষভাগে এই পরকীয়াভাবটি স্বকীয়াতেই মিলাইয়া যায়, তবে তো ইহার নিত্যতাই নাই। তাহা হইলে এই যে, রাগানুগমার্গের ভজন—ইহারই বা গতি কি হইবে?"

বলা বাহুল্য, এরূপ আশঙ্কার কোন অবসরই নাই।

তত্ত্বটি একটু ধীরভাবে বিচার করিতে হইবে। শ্রীরায় রামানন্দসহ ইষ্টগোষ্ঠীতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা বিশদভাবে শ্রবণ করার পরও—

প্রভু কহে—"এহো হয় আগে কহ আর"।
রায় কহে—"ইহা বই বুদ্ধির গতি নাই আর॥"

বুদ্ধির গতি নাই সত্য, কিন্তু লীলাপরিকর শ্রীরায়ের তাহা অজানা হইতে পারে না। তবে ছদ্মলীলায় তাহা প্রকাশ করা প্রভুর অনুমোদিত কিনা—এই আশঙ্কায় বলিলেন—

"যেবা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥"

এই অবস্থার ঘটনাটি অতঃপর কবিরাজ মহাশয় প্রকাশ করিলেন—

—এত বলি আপন-কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল॥

গীতটি সেই সুপ্রসিদ্ধ 'পহিলহিরাগ' ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের জানাই আছে, সুতরাং সমগ্রটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইল—দুইটি তত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা। (১) গীতটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রভু গায়কের মুখ আচ্ছাদন করেন নাই। (২) এই গীতের মধ্যে নিশ্চয়ই সাধ্যবস্তুর অবধি অর্থাৎ চূড়ান্তসাধ্যত্বের নির্দ্দেশ আছে। নতুবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বকথা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহাতে সাধ্যবস্তুর অবধিত্ব প্রকটনের অপেক্ষা ছিল; কিন্তু এই গীতটির পর আর কোন অপেক্ষা রহিল না।

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়।

প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে তত্ত্বটি ভক্তজনসমক্ষেই রাখিয়া দিলাম।

তবে মূল আপত্তির উত্তরে ইহাই জানা উচিত যে, প্রভু যখন নিজেই বলিলেন—"সাধ্যবস্তু সাধনা বিনা কেহ নাহি পায়"। এবং পরে এই সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যখন রাগানুগামার্গের ভজনই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট, তখন এই প্রকটলীলার ভজনই যে 'সাধ্যবস্তুর অবধি'টির প্রাপ্তি ঘটাইবেই; তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহের অবসর নাই। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, যিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধদেহে পাবে তাহা"

তিনিই প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"কবে বৃষভানুপুরে আহিরীগোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ?"

নিত্যলীলার আবেশ ব্যতীত এ প্রার্থনার সঙ্গতিই হইত না। কোথায় কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে দেহান্তকালে প্রকটলীলা হইবে, সেই লীলান্তর্গত বৃষভানুপুরে জন্মিবার দৈন্যাত্মিকা লালসার কথা ঠাকুর মহাশয় ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না।

ইহা অপেক্ষাও আর একটি অবান্তর সিদ্ধান্ত—নিতান্তই দুঃখজনক। স্বকীয়া ও পরকীয়া এতদুভয়ের নিত্যত্বস্থাপনের আগ্রহে সিদ্ধান্তকার লিখিয়া ফেলিয়াছেন—

"সিদ্ধিলাভান্তে সাধকের দেহভঙ্গের সময়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা চলিতে থাকে, দেহভঙ্গের পরে সেই ব্রহ্মাণ্ডেই আহিরী-গোপের ঘরে তাহার জন্ম হয় এবং যথাসময়ে লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হন্। সেই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা যখন অপ্রকট প্রকাশে প্রবেশ করে, তখন তিনিও এক প্রকাশে অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিবেন এবং আর এক প্রকাশে প্রকট লীলায় থাকিবেন।"

এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ—ইহা যে কোন ভক্তই বুঝিতে পারেন। সাধনের পরিপাকে সিদ্ধদেহটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক প্রকাশে প্রকটলীলায় আর এক প্রকাশে অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সেবার সৌভাগ্য লাভ করিবে—এরূপ কল্পনা বেদ বেদান্তের সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী"। ইহারই অনুবাদে ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা"। এই উক্তি শ্রুতিসম্মত। মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

"যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্
তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥"

অর্থাৎ জীব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া যে যে লোকের চিন্তা করে বা যে যে কামনা পোষণ করে, সেই সেই লোকই প্রাপ্ত হয় এবং সেই সেই কামনাও তাহার সিদ্ধ হয়।

এই শ্রুতির অনুবাদ স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্‌ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাম্‌॥

অনন্যভাবে যে যে ভাবে মনোনিবেশ করে, সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তাদি সিদ্ধি লাভান্তে একপ্রকাশে প্রকটলীলায় ও অন্যপ্রকাশে অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি ঘটে—এইরূপ সিদ্ধান্তের বাধক।

সিদ্ধদেহটি দ্বিবিধ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকাশে অপ্রকটলীলায় ও অন্যপ্রকাশে প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ সেবার সৌভাগ্য লাভ করে—এরূপ উক্তির সমর্থনে শাস্ত্রও নাই, যুক্তিও নাই। একমাত্র স্বয়ং ভগবানেরই যুগপৎ বিবিধ প্রকাশ হইতে পারে, কোন জীবাত্মার পক্ষেই যুগপৎ একাধিক প্রকাশে একাধিক লীলাস্বাদন সম্ভবপর হইতে পারে না।

"অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বেদান্তদর্শন জীবকে ব্রহ্মের অংশই বলা হইয়াছে। এই জীবশক্তি কিন্তু স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে, আবার মায়াশক্তিরও অন্তর্ভুক্ত নহে। পৃথক্ একটি শক্তি বলিয়া ইহাকে তটস্থাশক্তিও বলা হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভধৃত বচন হইল—

যৎ তটস্থং তু বিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্‌।
রঞ্জিতং গুণরাগেন স জীব ইতি কথ্যতে॥

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জীবশক্তি চিদ্‌রূপা শক্তি হইলেও ইহা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে। সুতরাং স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরও অংশ নহে। সুতরাং যুগপৎ দ্বিবিধ প্রকাশে দ্বিবিধ লীলাস্বাদন জীবের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীরায়ের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধদেহের অবস্থাটি শ্রবণ করিলেন—

সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

সিদ্ধদেহ—অন্তশ্চিন্তিত স্বীয়ভাবযোগ্য দেহ। তাহাঞি—শ্রীবৃন্দাবনে। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল—তাহাঞি অর্থাৎ একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনেই রাধাকৃষ্ণচরণ সেবার অধিকার পায়—একটা প্রকট লীলাভেদে দুইটি স্থান (দুই বৃন্দাবনের) উল্লেখ নাই। প্রকট বৃন্দাবনে যখন অপ্রকটে পর্য্যবসিত হইতেছেন তখন শ্রীবৃন্দাবনও গোলক বৃন্দাবনই বুঝিতে হইবে এবং এই তত্ত্বই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত তাহার প্রমাণই হইল—

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপূজ্যপাদ যে ছয় গোস্বামীর সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রকটাপ্রকট উভয় লীলারই পারদর্শী ছিলেন। প্রকটের চূড়ান্ত পর্য্যবসান রহস্য ও নিত্যলীলা হইতে গমানাগমন তাৎপর্য্য—সকলই তাঁহাদের মানস চক্ষে নিত্য উদ্ভাসিত হইত? সেইজন্য তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত ভক্তজনের হৃদয়ের ধন ও চিরমান্য হইয়া আছে। ভক্তসমাজে আজও তাই ইঁহাদেরই জয়ধ্বনি শুনিতে পাই? আসুন পাঠক, ভক্তবৃন্দের সহিত আমরাও তাঁহাদেরই জয়গান করি—

জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞী যবে ব্রজে কৈল বাস।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিল প্রকাশ॥
এই ছয় গোসাঞী যাঁর তাঁর মুঞি দাস।
তাঁ-সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
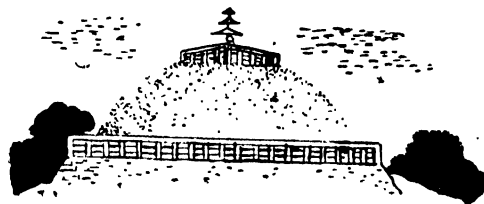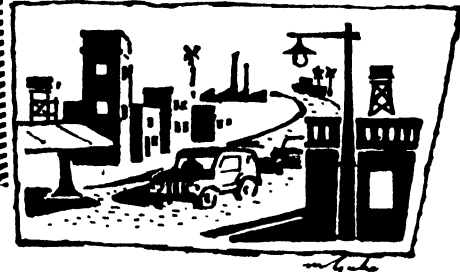
(পূর্বানুবৃত্তি)

গ্রীষ্মকাল পড়ছে।

গোয়ালের রুদ্ধ পরিবেশে খড় কাটতে কাটতে ঘেমে উঠেছে। গঙ্গাঠাকরুণের ডাকে বের হয়ে এল। ধান কিছু বিচতে হবে।

কথাটা প্রকাশ করতেই আজ যেন বেঁকে বসে নারাণ-ঠাকুর। এতদিনের অভিজ্ঞতা আর অভাবের যন্ত্রণায় সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে চাষের সময় ধান বাড়ি নিলে শোধ দিতে দেড়া ধান বের হয়ে যায়। সারা বছর ধরে কেবল অভাব আর অভাব। আবাদ চাষও করতে পারে না ধান অভাবে—মাঠে সার গোবর দেওয়া তো দূরের কথা।

তাই এবার মাথা নাড়ে অর্থাৎ এক ছটাক ধানও বিক্রী করতে রাজী নয়।

—এক বস্তা ধানও বিচবি না ?

গঙ্গাঠাকরুণের বড় সখ সনাতনকে জুতো একজোড়া কিনে দেয়, তাই ধান বিচবার কথাই বলেছিল। বাধা দিতে গঙ্গাঠাকরুণ যেন মারমুখী হয়ে ওঠে।

—কি বললি ?

জবাব দিতে পারে না তবু মাথা নাড়ে বোবা লোকটা।

—তুর বাবার ধান ?

—অব্যক্ত চীৎকার করছে শুধু প্যাঁ ঠাকুর।

গঙ্গাঠাকরুণ আগে থেকেই ছানুদাসকে বলে রেখেছিল তাই এসে পড়েছে সেও বস্তা হাতে। দাওয়ায় রাখা ধান তুলতে যাবে—লাফ দিয়ে পড়ে নারাণঠাকুর।

—চীৎকার করছে, আর পেট দেখায় ইসারা করে; জৈবিক ক্ষুধা শুধু বেঁচে থাকার ওই একটুমাত্র চেতনাই তার তীব্রতর—তাই যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে সে।

···গঙ্গাঠাকরুণের খুরধার জিবের আগে তাও স্তব্ধ হয়ে যায়; চোখের সামনে দিয়ে ছানুদাস ধান দুবস্তা তুলে নিয়ে চলে গেল। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলমাত্র নারাণ—ভাসাহীন নির্বাক দুচোখের কোল গড়িয়ে অশ্রু নামে। কি করে বোঝাবে সে ভাজবৌকে আগামী কোন অনিশ্চিত সর্বনাশের কথা—অজন্মার কঠিনতম দুঃখ দুর্ভোগের জ্বালা।

···গঙ্গাঠাকরুণ তখনও হাঁক পাড়ছে।—ধানটা খাওয়াচ্ছি তুকে। চাট্যি খেতে দিই দুবেলা, তাই কতো —আবার উল্‌টে চোখ রাঙ্গানো ?

···ভাষার জ্বালা ওকে স্পর্শ করে না—তাই বোধহয় তবুও সনাতনকে ভালবাসে; ভাজবৌকে নাবালক ভাইপোকে পর করতে পারেনি, অমানুষিক পরিশ্রমে সংসার সাজিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। বাড়ীর বাইরে একটু জায়গাতে তরকারী লাগায়—এনে বসিয়েছে কোথা থেকে একটা কাঁঠালের চারা।

সনাতনকে ইঙ্গিতে দেখায় কত বড় হবে গাছটা—কেমন পাতা মেলবে ছায়া হবে। ফুল ফুটবে ফাগুনবেলায়—কোন আগামী অপরাহ্ন তার সৌরভে মদির হয়ে উঠবে। আসবে ফলের ইসারা।

…গজগজ করে গঙ্গামণি।

—হ্যারে সোনা, ইস্কুল থেকে এসে মুড়িটুড়ি খাবিনা?

—যাই মা।

সনাতন বাবার হাত ছাড়িয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। চুপ করে কি ভাবছে সনাতন। ভাববার বেশী ক্ষমতা তার নেই—কেমন যেন মনটা আকারণ খুশিতে ভরে ওঠে। আবার আলুর জমি কোপাতে থাকে; আলু উঠেছে, এবার লাগাবে গ্রীষ্মের মরসুমের কুমড়ো—শশা।

নীরব মাটি আর নীরব ব্যর্থভাষ ওই লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়ে গেছে।

…ওদের সকলেরই সঙ্গে সেই বন্ধন অচ্ছেদ্য রয়ে আছে। তাই ওরা কোন নির্মম বেদনায় এসে জমায়েত হয়েছে জরিপ-খানাপুরীর মাঠে।

টেবিলের উপর ম্যাপটায় সরু পেন্সিল দাগ বোলাতে বোলাতে হাঁক পাড়ে।

…মৌজা রঘুনাথপুর রেঃ সা-নম্বর আটাশ, তৌজি নং বাহান্ন খতিয়ান নং সাত, দাগ নং এগারোশ বাইশ। উত্তর সীমার দখলদার শ্রীগতিলাল দিগর। বর্তমান দখলীকার—

মাঠের আলের এদিক ওদিকে ছোটখাট সেরেস্তা বসে গেছে; ওদিকে বটতলায় বসেছে মেয়েদের দুএকজন—মিষ্টি লোহারও এসেছে দাগ নম্বরে তার দখল বলবান করতে। ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে—ছোয়াঁছুঁয়ি বাঁচিয়ে গঙ্গাঠাকরুণও।

ধরণী মুখুয্যে লালখেরোর পুঁটুলি বগলে জাকিয়ে বসেছে। এই প্রথম মৌড়া—এখানে পাকা করতে পারলেই ব্যস—কানুনগোই বল, তিনধারা—সাতধারা বল সব ফৌত।

হুকোটা টানছে আর তড়পাচ্ছে—বল বল বাহু বল। এই বাহুবল আমার কাগজ। জজে না করুক দিকি! ওটা আমার দখলে আমিন সাহেব। খাস।

—আজ্ঞে সীকি কথা?

এগিয়ে আসে অতুলকামার—সিদিন বন্দোবস্ত করলেন?

—হাসে ধরণী—ওই তো বললাম অতুলখুড়ো, বল বল বাহুবল। কাগজেই সব সাক্ষ্য প্রমাণ—এই যে।

এগিয়ে আসে এমোকালী।

—তালে সিদিন কলাপাতায় লিখেছিলেন ইঃ এটা কি?

মিষ্টি লোহারও এগিয়ে আসে। ক্ষারে কাচা একটা শাড়ী পরে এসেছে—মুখে একমুখ পান, দোক্তার আমেজে গরগর করছে। একবার খানিকটা পিচ্ ফেলে চাতরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তাকেও ধরণীমুখুয্যেই জমি বন্দোবস্ত করেছে।

কয়েকটা জমিতে নাম বহালও হয়েছে তার।

এবার একটা গণ্ডগোল দেখে বলে ওঠে মিষ্টি।

—লিখে দিলুম কলার পাতে—

দেখে লেগা মাঠে মাঠে॥

ইকি তাই হল নাকি গো? বলি আমাকেও কলার পাতে লিখে দিয়েছ এটা?

—এ্যাই ইষ্টপিড—ধমকে ওঠে ধরণীমুখুয্যে। রেগে গেলে ওই ইংরাজীটাও বের হয়ে পড়ে মাঝে মিশেলে।

হাসছে মিষ্টি—চটছো কনে গো।

…আমিনবাবুও অবাক হয়েছে।

…বাইরের লোক দেখেছে এখানে এসে পাকেপাকে যেন জড়ানো এদের অনেকেরই অন্তর। গঙ্গামণি ঠাকরুণও ঘোমটার আড়াল থেকে ফিসফিসিয়ে বলে।

—আজ্ঞে ওই দাগে কেবল একটা নামই বসাবেন?

—কোন ফকীর ভটচায ফৌত, কিন্তু নারাণ ভটচায?

জবাব দেয়—গঙ্গামণি বোকা হাবা মানুষ সে, নইলে আমার এই পোড়া বরাত! একটা মাত্র পেটের কাঁটা নাবালক!

হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমিনবাবু উর দিকে। আইনগত কথা কি যেন চিন্তায় পড়ে।

…ওদিকে তখন বেধে গেছে গজ কচ্ছপে যুদ্ধ।

ধরণীমুখুয্যে এটা বাদই দিয়ে গেছে বন্দোবস্তের পাকা রোকড়ে—কিন্তু হাতচিটায় কবুল করেছে। দখলও নিয়েছে ভুবন কর্মকার—লাঙল দিয়ে বীজ ধান ছিটিয়েছে। চারাও উঠেছে—

…এদ্দিন বলোনি কেন হে ঠাকুর? এই তো কাগজে লিখেছ? .

—মিছে কথা!

…এমোকালী কিছু বলবার আগেই ধরণীমুখুয্যে এসে লাফ দিয়ে পড়ে কালীর কাছেই—দুর্বার বেগে চড় চাপড় কসতে থাকে।

…যেন মরণ কামড় দিয়ে শেষবারের মত ব্যর্থ চেষ্টা করছে ধরণী—কোন ক্রমে যদি টিকিয়ে রাখতে পারে।

…শীর্ণ প্যাকাটির মত লোকটা যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

…নীলকণ্ঠবাবুই ছাড়িয়ে দেন।

…থাম, থাম কালী!

—আজ্ঞে কিছুই করিনি বাবু!

ওরা এসে ধরণীকে টেনে সরিয়ে নেয়, সত্যিই কালীচরণ ওর অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে গেছে; নইলে ব্যাপার অনেক দূরই গড়াতো।

…আমিনও ঘোষণা করে—ফৌজদারী করবার থাকে তাই আগে করুন, পরে আমার কায স্থরু করবো তাহলে!

নিরস্ত ধরণীমুখুয্যে তখনও তড়পাচ্ছে—তাই হবে। মরাহাতী সওয়া লাখ।

—তাই দেখলে। কালী গর্জাচ্ছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবনীমুখুয্যে। এখানে তার বিষ দাঁত যেন ভেঙ্গে গেছে। হাওয়া বইছে উল্টো দিকে।

এ হাওয়ায় ঝরে পড়ে যোড়ধারের অজ্‌স্র শিমূলগাছের জীর্ণপাতা। চারিদিকে ধু ধু তপ্তরৌদ্র; কোথাও ছায়ার যেন কোন সঙ্কেত নেই।

তারকবাবু এসব ঝামেলায় আসেনি। শশী গোমস্তা এসেছে, কোন আপত্তি থাকে—যেন দাগে বাটানম্বর করিয়ে আপত্তি পেশ করে, তিন ধারা সাত ধারায় দেখবে। হাটের মাঝে ওই লোকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বচসা করতে পারবেনা। জীবনরত্ন সঙ্গে রয়েছে গোমস্তার।

কারণ অকারণে আমীনকে সিগারেট খাওয়াচ্ছে: ফ্লাস্কে করে চাও এনেছে। চাকরটা ছাতা ধরে ফিরছে ওর মাথায়।

…দেখিয়ে দিতে চায় জীবন—এখনও ওদের থেকে তারা স্বতন্ত্র।

ধরণীমুখুয্যে তখনও গোঁ গোঁ করছে।

সারা গ্রামের ভাগ্যের বিধান যেন উল্‌টে যাচ্ছে।

…বড় জাবেদাখাতা থেকে দখলকার পত্তনিদার তারকরত্ন প্রমুখদের নাম মুছে যাচ্ছে—বহাল হচ্ছে অন্য প্রজা, চাষী আরও কত নোতুন নাম।

অতুল কর্মকার দিগর; মিষ্টি লোহারণী আরও কত।

…আমিনবাবু বলে ওঠেন—মিষ্টি লোহারণী—স্বামী!

হাসছে মিষ্টি…হঠাৎ কি ভেবে ধরণীর দিকেই আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়—উদিকেই শুধোন কেনে?

হাসির ছায়া খেলে যায় সমবেত অনেকেরই মুখে।

…ধরণী মুখুয্যে আজ যেন ধরা পড়ে গেছে।

এতদিনের গলদ গাফিলতি নীচতার ইতিহাস সব প্রকাশ হয়ে পড়ছে। দেনার দায়ে স্থিতবন্ধকী রেখেছে ইস্তক জমি; পরিষ্কার সর্ত্ত দেনার টাকা দিতে না পারলে পনের বৎসর তক্ ভোগ দখল করিবার পর আবার জমি মালিকের কাছে ফিরিয়া আসিবে—তা আর আসেনি। নাবালকের সম্পত্তি নিয়েছে অন্যায়ভাবে।

সব ফাঁক আর ফাঁকিটাই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে।

…চুপ করে বসেছিল বার বার অপদস্থ হয়ে। মিষ্টির কথায় তেলেবেগুনে জলে ওঠে।

—এ্যাই মাগী!

…আমিনবাবু ওদিকে কান দিল না।

…চেনম্যান মেপে চলেছে—তুই সরিকানের জমিতে বাটাদাগ দিতে ব্যস্ত।

…বেলা বেড়ে চলে।

লোকগুলো ব্যগ্র ব্যাকুল নয়নে চেয়ে আছে—যদি অতীতের পুঞ্জীভূত গলদের কোন সুবিচার এতদিনপরও হয়।

পড়চায় নামপত্তন নেই—দখল করে বসে আছে, স্বপক্ষে কোন কাগজপত্রও নেই।

জীবন একবার ইংরাজীতে বলে ওঠে

—Possession is the right.

—অবনী মুখুয্যে সায় দেয়—all right, Surely, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়।

এদের মধ্যে অশোকও দাঁড়িয়ে আছে। চুপ করে সে দেখছে—এতদিন কি ভাবে এতবড় গলদটাকে ওরা স্বপক্ষে দাঁড় করিয়ে এনেছে। গড়ে তুলেছে এতদিনের প্রাসাদ।

পুঞ্জীভূত সেই পাপের প্রাসাদ চুর চুর হয়ে ধ্বসে পড়ছে, ছিটিয়ে পড়ছে তায় ইট কাঠ বালি। পচছে ওর মৃতদেহ—চারিদিকে যত ধারাল নখ আর ঠোঁট বের করে বসে আছে শিবাশকুন দল। ঠুকরে খাচ্ছে সেই গলিত দেহ।

জীবনের কথায় পিছন থেকে কে হরিধ্বনি করে ওঠে—বলো হরি—হরি বোল।

—এ্যাও!

অবনী মুখুয্যে গাঁয়ের মিটিংয়ের মত চীৎকার করছে—সাইলেন্স!

জীবন বলে ওঠে—ব্যাটাদের বাড় দেখছ? তুমিও কিছু বলবা না অশোকদা?

বলার দিন শেষ হয়ে এসেছে, আজ এই চাষী মজুর—কামারপাড়ার সকলেই যেন টের পেয়ে গেছে—যে মাটির জোরে বাবুরা একদিন চোটপাট চালিয়েছিল—খেতাব পেয়েছিল জমিদারবাবু—সেই মাটিটুকুই সরে যাচ্ছে পায়ের নীচে হতে।

আজ ওকেও যেন তারা অনুকম্পা করে কোথায়।

সেই শ্রদ্ধা ভয় মেশানো সমীহটুকুও যেন মুছে গেছে।

পানুদাস এদের থেকে স্বতন্ত্র। গ্রামের মধ্যে সে যেন একটি নোতুন নবজাগ্রত সত্ত্বা। ধ্বংসোন্মুখ এই জমিদারী প্রথা—আর একদিকে ওই মজুর ভূমিহারা শ্রেণীর দিন বদল-এ সবের বাইরে সে একটি নোতুন মানুষ। কারোও সঙ্গে তার বিরোধ নেই, দুজনকেই শোষণ করতে পারে সে।

…সেটা সে অনুভব করতে সুরু করেছে ক্রমশঃ।

অতীতের সেই দুঃখের দিনগুলো ক্ষীণভাবে মনে পড়ে। বহু দুঃখ আর অভাবের দিন।

বাপ মারা যাবার পর সামান্য দোকানটুকুও মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে যায়। ধার বাকি—বিলেত যা পড়েছিল, তার তাগাদা দিয়েও আদায় ওয়াশীল করতে আর পারেনি।

একবেলাও এ জুটেছে, কোনদিন বা উপোস দিয়েছে। দেখেছে তার মা, ছানু আর তার জন্য কিনা করেছে। লোকের বাড়ীর চাল ভেজেছে; ধান ভেনেছে—পানু সেই দুঃখের মধ্যে মাথা তোলবার চেষ্টা করেছে নানা ভাবে।

ধান ওঠে। মাঠে মাঠে ছড়ানো ধান। মুনিষরা ধান কাটতে নামে—পানু প্রথম ডালায় করে ঝালবড়া—আলুর চপ বিচতে বেরুতো—পয়সা নেই। মুনিষ মাহিন্দররা মুনিবকে লুকিয়ে দাম দিয়েছে ধানের আঁটি। তাই তাড়া বেঁধে মাথায় করে দু-এক কোশ পথ হেঁটে ঘরে ফিরেছে দিনান্তে—খেয়েছে আকণ্ঠ ওই কাঁইজোড়ের জল।

সামান্য পুঁজি নিয়ে চাট্টি খোলা মালসার দোকান দিয়েছে।

অবনী মুখুয্যে প্রথমদিন দেখেশুনে বলেছিল—খেলাপাতির দোকান। তার চেয়ে কোথাও কাম টাম দেখগে বাপু। কাম পেলেও করতো পানু, কিন্তু পায় নি। তাই জবাব দেয় মিষ্টি কথায়।

—গন্ধেশ্বরীর টাট গো খুড়োঠাকুর, বেনের ছেলে এইতো বেশ।

পানুদাসের মুখে যেন সুধাবর্ষণ করে, চড়া কথা কেউ কোন দিন শোনেনি।

ক্রমশঃ সদর থেকে মালপত্র এনেছে—তারপর আবার মহাজন ধরেছে। ওদিকে ধানকলের ধান যোগাবার ঠিকেও পেয়েছে, যুদ্ধের আর কনট্রোলের বাজারেই ফেঁপে উঠল পানু।

প্রেসিডেণ্ট হাকিম তারকরত্নবাবুর সাহায্য না পেলে পানু পানুই থেকে যেত—দাসমশাই আর হতো না। তার জন্য অবশ্য তাঁকে দিতে হয়েছে একটা হিস্যা, কিন্তু দিয়ে থুয়েও যা পেয়েছে পানু তাতেই ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে বাড়ীঘর কারবারের।

জমিও করেছে কিছু এই বানচালের সময়, তারপর অন্য ভাবেই অর্জিত জমি জায়গা যা করেছে তাও কম নয়।

পানুদাস কাযকারবারের ব্যাপারে নিজেই আসে। ছানুকে দিয়ে বিশ্বাস নেই—লেখাপড়াও শেখেনি। তা-ছাড়া গোঁয়ার লোক। যাকে তাকে যা তা বলে ফাঁক ফিকিরে কেউ ঠকিয়ে দিলেও জানতে পারবে না। তাই দাগ পড়বার ব্যাপারে নিজেই এসেছে।

স্নান সেরে তিলক ফোঁটা কেটে ছাতি বগলে এসে পড়েছে, বগলে একতাড়া কাগজ। আমিনবাবুর সামনে

হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন কত গরীব নিরীহ একটি প্রাণী।

গড়বড় দেখলেই কাকুতি মিনতি করে।

—মারা যাবো বাবু, গরীব লোক—ন্যায্য বিচার করে দাগনম্বর পালটান, এই যে কাগজ হুজুর।

খুড়ো ভাইপোর প্যাচওয়ালী সরিকান সম্পত্তি।

লোচন দাসের বয়স হয়েছে—তবু কঠিন শক্ত সমর্থ দীর্ঘ দেহ। এককালে হেঁটেই বাঁকুড়া-বর্দ্ধমান যাতায়াত করেছে। আজ জোর কমে এসেছে কিন্তু ভাইপোর শ্রীবৃদ্ধির হিংসাতেই লোচন বোধহয় এখনও মহীরুহের মত টিকে আছে। বিশ্বাস করে সেও ভাগ্য ফেরাবে।

চোখ বুজে ঝিমুচ্ছিল লোচন। হঠাৎ পান্নুর গলা শুনে কষ্ঠি নেড়ে এগিয়ে আসে আলের মাথা থেকে।

—আজ্ঞে আমারও একের তিন অংশ উথে আছে। ভরতদাস দিগরের তিন পুত্র—আমি কনিষ্ঠ।

আমীনবাবু থামিয়ে দেন ভরতের পুত্ররত্নকে।

অন্য সম্পত্তির কথা হচ্ছে দাসমশাই। সরিকান নয়।

—স! লোচন দাস নিরস্ত হল. তবু কান পেতে শোনে ভাইপোকে বিশ্বাস নেই। সুচ যেখানে চলে না—ভাইপো বাবাজীবন সেখানে ফাল চালাতে এলেম রাখে।

অবনীকে প্রকাশ্যেই বলে—বুঝলেন গো বাবু, ভাইপো আমার বেতক্ক হলেই পথে বসিয়ে দেবে।

পান্নুদাস কথা বলে না, কাকার দিকে একবার চাইল মাত্র।

লোচন তখনও বলে চলেছে—হ্যাঁগো, তোমার খুড়ীও ওই কথা বলে, সুধিয়ো।

পান্নুদাস কাজে মন দিয়েছে। ফর্দ মিলিয়ে পড়চার নম্বর দেখছে গম্ভীরভাবে। পচাত্তর বিঘে জমি—দুজনের নামে প্রায় শ'দেড়েক বিঘে জমি রেখেছে। তারই জন্য বোধহয় একটু গম্ভীর। কথাবার্ত্তা কম বলে।

...অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে!

...এই সমবেত জনতার মধ্যে পান্নুদাসই আজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, ও যেন টের পেয়েছে এখানের প্রথম এবং প্রধান পুরুষ সেই—অন্ততঃ ভবিষ্যতে তা হবার স্বপ্নও দেখেছে।

দরখাস্তটা একটু দেখে দিন তো ছোটবাবু।

অশোকের দিকে এগিয়ে দেয় পান্নু দরখাস্তটা, ফকীর ভটচাযের হ্যাণ্ডনোটের বিনিময়ে দুকাচি জমি দেবার কথা, এতদিন দখল নিয়ে এসেছে। আজ কায়েম করতে চায়।—মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এক বিঘা জমি?

অশোক অবাক হয়ে যায়। পান্নুদাস বলে ওঠে—আজ্ঞে সুদটা যোগ দেন?

—সুদ কোনমতেই আসলের বেশী হবে না পান্নু।

নারাণ ঠাকুর আখের ক্ষেতে মেড়া বাঁধছিল, সেও কায সেরে এসে জুটেছে। পরণে আট হাতি কাচা। ব্যাপারটা সেও জানে—তাই হাউমাউ করে ওঠে দুহাতের আঙ্গুলের মধ্যে যতটা গোনা যায় গুনে—তারপর থেই হারিয়ে চীৎকার করছে, অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকার।

...চোখের সামনে দেখে অমন জমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে—আমীনবাবু কায বন্ধ করে ওর দিকে কি যেন মমতাভরা চোখে চেয়ে থাকেন।

দরখাস্তখানা পড়ে ওর দিকে বলে ওঠে—

—একটা আর্জি তুমিও পেশ করো।

নারাণ ওর দিকে চেয়ে থাকে, মানুষের ভাষা বোঝে না। গঙ্গা ঠাকরুণও এসে দাঁড়িয়েছে।

অশোকই একটা কাগজে ওর হয়ে দরখাস্ত লিখে দেয় নারাজীনামা।

—তাহলে দাগ নম্বরে নাম বসাবেন না?

পান্নুদাস গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সমবেত জনতাও যেন নারাণের দিকে। অজাতশত্রু একটি মানুষ অতুল কামার বলে ওঠে—বামুনকে মেরো না দাসমশোয়। কে আছে তুমার?

—তাই বলে কে ছেড়ে দেবে?

আমীনবাবু জবাব দেন—আমি ওদের নামই বহাল রাখলাম দাসমশাই, আপনি তিন ধারায় কানুনগোর কাছে যা হয় বলবেন।

...পান্নু দাস চুপ করে কি ভাবছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন অশোকবাবুই গোলমাল করে দিয়েছে।

—কথাটা কি ঠিক হ'ল ছোটবাবু?

—আইন যা বলবে তাই হবে পান্নু?

পান্নু যেন ব্যঙ্গ ভরে জবাব দেয়—আইনতো আজ্ঞে বামুনের শালগ্রাম শিলা, একাৎ ওকাৎ করতে কতক্ষণ!

—তাই করো।

ওর কথায় অশোক একটু বিস্মিত হয়েছে। এরা সামান্য জমি পাবার আনন্দে আজ বিভোর হয়ে উঠেছে—কিন্তু পানুর মনের গভীরে তার চেয়ে অন্য কোন নেশার স্বাদ।

সে পয়সার জোরে সবকিছু বিকৃত করে দিতে চায়, ন্যায়বিচার কল্যাণময় চিন্তা মনুষ্যত্ব সবকিছুকে।

এতদিন তারকবাবুর দল যে স্বপ্ন দেখেনি আজ থেকেই ওই নবজাতক শ্রেণী সেই প্রতিষ্ঠা আর সর্বনাশের স্বপ্ন দেখছে।

...বেলা পড়ে আসে। গ্রীষ্মের আমেজ এসেছে বাতাসে। মহুয়া গাছগুলোর পাতা ঝরে গিয়ে বৃন্তে বৃন্তে এসেছে ফুলের স্তবক; কপিশ বন্ধুর প্রান্তরে নেমেছে দিনের শেষ আলো।

গরুগুলো ফিরছে ঘরে—সারাদিন ঘাসশূন্য তামাটে মাঠে বনের ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, আড়ের ধারে জমাজলের দুপাশে তবু একটু সবুজের নিশানা মেলে সেই খানেই এক দুগাছি ঘাস খুঁটে খেয়ে জলের ধারে গড়িয়ে তারা গ্রামে ফেরে দিনান্তে।

...ধুলো আর সূর্য্যাস্তের শেষ আলোয় রাঙ্গা হয়ে ওঠে আকাশ। ওদের চীৎকার শোনা যায়।

...কেমন শান্ত একটি পল্লীজীবনের স্বপ্নছবি।

আমীনবাবু বাইরের লোক। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হচ্ছে তাকে। এখানেও এসে আস্তানা গেড়েছে। থাকবার মত বাড়তিঘর গ্রামে কারো বিশেষ নেই।

তারকবাবুর খামারবাড়ীর ওদিকেই একটা ঘরে তারা আস্তানা পেতেছে। গ্রামের শেষ সীমা। কেমন যেন স্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকারে বাইরের ওই স্তব্ধ দিগন্তের পানে চেয়ে থাকে।

রাতের অন্ধকারেও তার ছুটি নেই। সারাদিন মাঠে ঘোরার পর ক্যাম্পে ফিরে চেনম্যান দুজনকে নিয়ে খসড়া খাতা থেকে পাকা খাতায় নোতুন নাম দাগনম্বর লিখতে হয়। ওদিকে চাকরটা রান্নার আয়োজন করছে।

অন্ধ আজ পাড়াগাঁ। সহর থেকে দূরে—ওদিকে দুর্গাপুরের বন ঢাকা ইষ্টিশান ছোট বাজার ও দূরের পথ, মধ্যে ধু ধু দামোদর, বর্ষায় সফেন বন্যায় দুর্গম করে তোলে, গ্রীষ্মে ওর দাবদাহে নামা যায় না। সকাল সকাল পারলো তো পার হয়ে গেল লোকজন—না হয় সেই বৈকালে সন্ধ্যার আগেই পার হতে হবে সেই দুস্তর নদী।

নাদলে ডাকাত ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতেই শেষ হয়ে যাবে, মানা বনে ছিড়ে খাবে তার মৃতদেহ নেকড়ের দল।

...পাণ্ডববর্জিত অঞ্চল।

তবু চাকরীর খাতিরে আসতে হয়েছে এখানে।

রাত নেমে আসে। বনের বাইরে প্রান্তরে বাতাসে উড়ে বেড়ায় ঝরাপাতার শব্দ—যেন দলবেঁধে কোন ঘোড় সওয়ার বাহিনী আসছে জয়যাত্রায়। দুএকটা শিয়াল ডাকে—ডাকে বনতিতির।

আবার সব চুপচাপ।

...হঠাৎ কাকে দেখে মুখ তুলে চাইল আমীনবাবু।

একটা মস্ত মাছ—নোতুন এঁচড়—একটা বড় সিদে অনেক কিছু নিয়ে এসেছে ছানুদাস।

—আপনি?

ছানু ওগুলো নামাতে নামাতে বলে—গাছের ফল পাড়লুম, মাছ ধরা হয়েছিল। গাঁয়ে আইচেন—কি আছে ইখানে খাবাব। কইরে পদা দিয়ে যা।

...চেনম্যান রমেশ ইতিমধ্যে এসে মাছটাকে নাড়াচাড়া করতে থাকে। পদ্মাপারের লোক ওটার উপর তাদের লোভ জন্মগত।

—বাঃ, বেশ খাসা মাছ আনছেন ত মসয়।

ছানুদাসের পিছনেই রাতের অন্ধকারে আর একজন দাঁড়িয়েছিল...দূরে, খাবারের ওদিকে। অন্ধকারে তার চোখদুটো যেন জলছে।

...দেখছিল সাগ্রহে ব্যাপারটা।

...ছানু চলে গেল;

রাত হয়ে আসে। পানু দাস আঁধার ফুড়ে এগিয়ে আসে ক্যাম্পের দিকে। নাঃ, লোকজন কেউ কোথাও নেই।

.. ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে দেখে নোটগুলো রয়েছে, মনে মনে হিসাব করতে থাকে, এ বাবদ কত দেওয়া যাবে আঁধারে।

দিতেই এসেছে সে!

সবাইকে দিয়ে থুয়েই সে নিজে খেতে চায়। ইতিপূর্বে

তারকবাবুকেও দিয়েছে—বঞ্চিত করে ব্যবসা করেনা পান্নু দাস।

পায়ে পায়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল ধূর্ত শিয়ালের মত।

চুপ করে বসে আছে অশোক।

পুরোনো বাড়ীটা মেরামত অভাবে চুণ বালি খসে পড়ছে। রাতের আঁধারে যেন নখদন্ত বিস্তার করে প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে আছে কোন মৃত অতীত। ধ্বসে পড়া পাচীলও মেরামত করা হয়নি।

সামনেই বৈঠকখানার বারান্দায় একটা পাল্কী পড়ে আছে। রং চটা বিবর্ণ সাজহীন অতীতের প্রতাপ আর হুঙ্কার স্তব্ধ হয়ে গেছে ওর।

দাওয়ায় একটা বেতের চেয়ারে বসে আছে। সামনের ছোট বাগানটুকু এখনও নিজের হাতে টিকিয়ে রেখেছে অশোক—তাই গোলাপ রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো সবুজ হয়ে উঠেছে—ফুটেছে বেলফুলের দল। রাতের আঁধারে তীব্র সৌরভময় এতটুকু শ্বেত অস্তিত্বমাত্র ওদের আবির্ভাব।

আজ যেন নোতুন একটা সত্য উপলব্ধি করেছে সে মনে মনে। আগামী দিনের একটি নোতুন সমাজব্যবস্থা এবং তারই মাঝে নবজাতক একটি নবগোত্রের কথা।

বাতাসের মধ্যে কোথাও কোন শূন্যস্থান থাকে না, বাতাস তাকে পূর্ণ করার জন্য চারিদিক থেকে ছুটে আসে ফলে ঘূর্ণিঝড় ওঠে। আজ সমাজের মধ্যে একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা নিঃশেষ হয়ে আসছে—সেই স্থান পূর্ণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে অনেকেই। তার মধ্যে যার অর্থ এবং প্রতিপত্তির জোর বেশী সেই-ই টিকে থাকবে, মাথা তুলবে এই সমাজের সকলকে ছাড়িয়ে; এর অন্ধকার অতলে চালিত করবে শোষণ করবার জন্য হাজারো শিকড় মূল। তারাই সবুজ সতেজ হয়ে উঠবে।

পান্নুদাসের কথায় আজ সেই সুরের আভাস প্রত্যক্ষ করেছে। বেদনাময় সেই অনুভূতি।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল।…হঠাৎ এখানে ওকে দেখবে কল্পনা করেনি। হাতে কয়েকখানা বই, প্রীতিও ওকে দেখে একটু অপ্রস্তুত বোধ করে।

—আপনি? এ সময়ে?

—কথাটা তোমাকেই জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম?

হাতের বইগুলো দেখিয়ে প্রীতি বলে—নিয়েছিলাম সেদিন, ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম, চুপচাপ বসে আছেন—শরীর-টরীর খারাপ নয় তো?

প্রীতির কথায় জবাব দিল না অশোক; কি যেন ভাবছে। ওর কণ্ঠে সামান্য উৎকণ্ঠার সুরও তার মনকে স্পর্শ করেছে। একটু হেসে জবাব দেয়।

—না। সারাদিন মাঠে রোদে রোদে ঘুরে।

—ও, সম্পত্তি আগলাচ্ছিলেন বুঝি! বাঁচা গেছে বাব্বাঃ—ও দুর্ভাবনা আমার নেই। অন্ততঃ একটা দায় থেকে বেঁচেছি।

—এবার আমরাও মুক্ত হবো।

—অর্থাৎ!

প্রীতি যেন একটু চমকে ওঠে, অজানতেই কেঁপে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর।

অশোক আজ সত্যই ক্লান্ত, প্রীতির কথাগুলো ইতি-পূর্বে তত গভীরভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করেনি। আজ মনে হয় সত্যিই এবার সামনের কথা ভাবা দরকার, আগামী ভবিষ্যতের।

—বসো!

প্রীতি বসলো।

সন্ধ্যা নেমেছে। নিস্তব্ধ চারিদিক। বাতাসে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ।

অশোক চুপ করে কি ভাবছে। প্রীতির মনেও কোন একটি নিবিড় এক মধু স্বপ্নের সংক্রমণ।

…আবছা তারার আলোয় অশোকের দিকে চেয়ে থাকে।

—কি ভাবছেন এতো?

—তোমার কথাই হয়তো সত্যি প্রীতি!

প্রীতির দুচোখ নীরব একটু স্বীকৃতি পাবার আনন্দে উছল হয়ে ওঠে। যৌবনমদির দেহে ওর কোন নীরব কামনার প্রকাশ। তারই আবেগ দুচোখের চাহনিতে।

…খোঁপায় গুজেছে ওর বাগানের বেলকুঁড়ি—কালো চুলে সাদা কুঁড়িগুলো যেন সজীব প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

—কেন?

—একটা কিছু করা দরকার।

হাসছে প্রীতি। অন্তরের পুঞ্জীভূত আবেগ চেপে সহজ হবার চেষ্টা করে। কোথায় যেন তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে অশোক।

—কি করবেন?

—ঠিক জানি না। তবে একটা কিছু করতে হবে।

প্রীতি বলে ওঠে।—জমিদারী আর জমাদারী যাই বলুন তাতো গেল, বসে বসে খেতে গেলে রাজার সম্পত্তিও ফুরিয়ে যায়। শুনছি দুর্গাপুরে কি সব প্রোজেক্ট হচ্ছে—এই বেলা দেখুন না।

জবাব দিল না অশোক। সেও খবর পেয়েছে দুর্গাপুরের নানা কথা, দামোদরের ব্যারেজএর কায সুরু হয়েছে। দলে দলে নানা স্থান থেকে লোকজন আসছে, সারা বাংলা দেশ কেন বাংলার বাইরে মানুষের যে করবার কিছুই নাই এইটাই বুঝেছে—নাহলে ভাগাড়ে গরু পড়লে শকুনি লাগার মত পালে পালে তারা এসে ছেয়ে ফেলতো না চারিদিক। তাদেরই দলে মিশে একটি সাধারণ মানুষ হতে কেমন যেন মন সায় দেয় না। মনে হয় তার কি এক নিবিড় পরাজয়। ওই ভিড়ে মিশে কষ্টে ক্লেশে খুঁটে খেয়ে দিনযাপন করা—আর বংশ বৃদ্ধি করে জানোয়ারের মত টিকে থাকার কোন সার্থকতাই নেই তার কাছে।

প্রীতি ওর দিকে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে—ওখানেই তো আপনাদের বাড়ী—আসল জমিদারী! বন টিলাও অনেক আছে।

মাথা নাড়ে অশোক—হ্যাঁ। তাও সব চলে যাবে।

—একটা দাবী নিশ্চয়ই সেখানে আছে। চাকরীও পেয়ে যাবেন।

—অনেক কিছুর উপরই দাবী থাকা সত্ত্বেও জানাই নি কোনদিন। চাকরীর উপর দাবীটুকুও নাইবা করলাম।

প্রীতি কি যেন নীরব বেদনাভরা চাহনিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। ওর মনের গভীরে কি যেন একটা বেদনা জমা আছে—তাই হয়তো ইচ্ছে করেই সেই জমজমাট বাড়ী—সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার-বংশের পরিবেশ থেকে সরে এসে এই সামান্য বিষয় নিয়েই তৃপ্ত রয়েছে।

হয় এড়িয়ে থাকতে চায়—কোন দুর্বলচেতা একটি মানুষ যেমন করে সংঘাত—উচ্চাশার তাড়নাকে ভয় করে। না হয় ওই প্রতিষ্ঠা আর প্রতাপকে সহ্য করতে পারে না—মনে মনে ঘৃণা করে তাই সরেই এসেছে।

ঠিক বুঝতে পারে না প্রীতি অশোককে—কোথায় একটা দুর্বোধ্য হেয়ালির মত মনে হয়।

সহরের অনেককেই দেখেছে। সহরের ধানকল, করাত কলের মালিক নিবারণবাবুর ছেলে প্রশান্তকেও দেখেছে—কেমন যেন অন্য ধরণের। বলিষ্ঠ কর্মময় একটি যুবক। চোখে মুখে কেমন সহজ নেশা-লাগানো জ্বালাময় দৃষ্টি।

সব কিছুতেই তার যেন অধিকার আছে, এইটাই আগে থেকেই জেনে নিয়ে পা ফেলে প্রশান্ত।

সেও আশা রাখে সূতাকল বসাবে, দরকার হয় বন অঞ্চলে কাঠ ধানের কারবারও চালাবে।

...একটা জিপ কিংবা মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে ফেরে সহরে। তার দাপট আর যন্ত্রদানবের ওই গর্জনে সে সবকিছু ছাপিয়ে ঘোষণা করে তার উদগ্র অস্তিত্ব।

...প্রীতির মনে রেখাপাত করেছে সেও গভীরভাবে। তার তুলনায় অশোক যেন বিজলীবাতির পাশে হ্যারিকেনের লালাভ শিষকাঁপা ম্লান আলো।

প্রীতি বলে ওঠে—সবকিছুর উপরে দাবী জানাতে হয়, নাহলে ন্যায্য প্রাপ্যটুকুও এখন কেউ দেবে না।

উঠে পড়ে প্রীতি। একটু উত্তেজিতই হয়েছে সে—কেমন যেন বার বার একটা পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকে ফিরে যাচ্ছে সে—ব্যর্থ হয়ে।

—প্রীতি!

হঠাৎ অশোকের ডাকে থমকে দাঁড়াল সে।

কেমন হু হু বইছে রাতের বাতাস। কোথায় ঝড় উঠছে বেণুবনসীমায়। সব সুরভি তার নিঃশেষ হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়েছে অশোক—ওর দুচোখে তারার আভা। প্রীতি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

...এগিয়ে আসছে অশোক!

—কিছু বলবে?

প্রীতির কণ্ঠস্বর কাঁপছে নিবিড় একটি উত্তেজনায়।

—পরে বলবো।

অশোক যেন সংযত করে নেয় তার মুহূর্তের দুর্বলতা। প্রীতিও।

দরজার কাছে হঠাৎ বোধহয় এই মূহূর্তেই থমকে দাঁড়িয়েছিল কদমবৌ। কি করতে এই পাড়ায় এসেছিল —কদিন অশোক ওদিকে যেতে পারেনি। মাঠেমাঠেই কাটে। নিজের হাতে কদমবৌ তৈরী করেছে খেজুর গুড়ের সন্দেশ; এনেছিল!

হঠাৎ প্রীতি আর অশোককে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চকিতের মধ্যে সরে গেল।

কেমন চমকে উঠেছে কদমবৌ।...বের হয়ে এসে হন-হনিয়ে বাঁধের পার ধরে চলতে থাকে—কে যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করেছে।

হু হু বাতাস বইছে।

খানিকটা পথ এসে দাঁড়াল কদমবৌ। অশোকের জন্য আনা মিষ্টিকটা চটকে কি ভেবে বাঁধের জলেই ফেলে দিল পাতা সমেত।

...কামার বৌ!

...চমকে উঠে ওর দিকে চাইল কদম। কেমন যেন মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছে নিবিড় এক উত্তেজনায়।

—ও-তুমি প্রীতিদিদি? ভাবলাম আর কেউ বা।

—হ্যাঁ। কোথা গিয়েছিলে?

কদম সহজ হবার চেষ্টা করে—কালীতলায় পেন্নাম করতে। তুমি!

প্রীতি হাসতে হাসতে জবাব দেয়—বইগুলো আনতে গিয়েছিলাম।

—ও!

...বইপত্র বোঝেনা কদম।...প্রীতি পাশকাটিয়ে চলে গেল।

চুপকরে দাঁড়িয়ে থাকে কদম। জীবনের অনেকটাই তার অজানা, এমনি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মূর্খ একটি নারী—ব্যর্থ জীবনে তার পূর্ণতার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আঁধারে জলছে তারার আলো, তারই প্রতিবিম্ব কাঁপছে দিঘীর নীল জলে।...আলো কাঁপা আঁধার।

...সারা অন্ধকার মনে অতলে শুধু ভালবাসার অন্ধ-আলো—ব্যর্থ বঞ্চিত বেদনায় শিউরে উঠছে বার বার।

কদম বৌ-এর দুচোখে জল নামে! কি জ্বালা—কি পাপ! তবু এ জল বাধা মানে না। নিজের অন্তরের এই নোতুন পরিচয়ে সে শিউরে উঠেছে।

রাত্রি বেড়ে চলে। নিশুতি অন্ধকার।

পাতায় পাতায় কেমন একটা কানাকানি। বাতাসে উঠছে ঘুমহীন ফুলের জাগর সৌরভ। অশোক কি ভাবছে।

এ যেন একটি সন্ধ্যার অন্ধকারে আজ নিজেকে নোতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে কি এক অতৃপ্তির মধ্যে।

চারিদিক থেকে একটা গুমোট পরিবেশ দমবন্ধ করে তুলেছে। এতদিন এসব ভাবেনি, ভবিষ্যতের কথা, কোন সার্থক স্বপ্নের ইঙ্গিত। প্রীতির দুচোখের চাহনিতে আজ তেমনি পথ-ভোলান কোন পথের ইসারা পেয়েছে, দেখেছে দূর প্রান্তর পারে কোন একটি সার্থক স্বপ্নজগতের সন্ধান। মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

ওর দুচোখের চাহনিতে কেমন কালো দিঘীর জলের অতল রহস্য, আবছা আলো পড়েছে কালো চুলে—চোখের কোলে টেনেছে সুরমার ক্ষীণ আভা—তারই মাঝে সুন্দর মুখখানা কেমন যেন একটা পদ্মের লাবণ্য আর সুষমা নিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। নিটোল মোমমাজা বাহুমূলে দুটো বালা—একটি স্বর্ণবেষ্টনীর পাকে সুন্দর সুডৌল রূপের আদলটিকে সীমায়িত করেছে শান্ত মাধুর্য্যে।

কোন অন্য জগতের লোক—রাতের তারাকিনী অন্ধকারে ওরা আসে—কাজ ভোলাতে, পথ ভোলাতে।

অশোক জীবনে যেন কোন নোতুন সদ্যজাগর বিচিত্র অভিজ্ঞতার আবির্ভাবে শিউরে উঠেছে।

সেই সঙ্গে দেখেছে তার আগামী ভবিষ্যতের স্বপ্ন। বসে থাকার কথা নয়—কাজ করার কথাই ভাবে এবং অর্থ অর্জনের কথাও।

এতদিনের চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা কোন দিকে চলে যাচ্ছে—আসছে নোতুন দিন। এদিন—এই পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তাকেও ভাসতে হবে, আশ্রয় খুঁজতে হবে নোতুন কোন সবুজ পলিচরের, যদি সেখানে ঠাঁই মেলে—মেলে নোতুন কোন প্রতিষ্ঠা।

...আঁধার গাছগাছালির বুকে পড়েছে তীব্র এক-ঝলক আলো—কেমন আঁধার ফুঁড়ে এগিয়ে আসছে সেটা। নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গাড়ীর গুর গুর শব্দে।

ঘুমন্ত পাখপাখালীর ঘুমভেঙ্গে যায়—ডানা ঝটপট করে জেগে ওঠে তারা। কলরব তোলে।

নিরব নিস্তব্ধ পল্লীর অন্তরের নিবিড় শান্তি ভঙ্গ করে কোন কঠিন বাস্তব যেন জয়ধ্বনি ঘোষণা করে প্রবেশ করছে।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় জিপ টা এগিয়ে আসছে। ডাঙ্গা ছেড়ে গ্রামের পথে নামল জিপটা—রাস্তার ধারে ডোম-পাড়ার ঝুপড়িতে ঘুমন্ত দুচারজনের ঘুমভেঙ্গে যায়—ওরা চোখকচলে অবাক বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নবাগত ওই মূর্তিমান বিজয়ীর দিকে।

গাড়ীটা টালবেটাল খেয়ে এগিয়ে চলেছে ছায়ান্ধকার-ঢাকা পথ দিয়ে—উছলে উঠছে সেই অন্ধকার ওই দু'চোখের তীব্র ঝলকানিতে।

অশোক ওকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়েছে।

…খাকি প্যাণ্ট আর সাদা সার্ট পরণে, ঠাই ঠাই তেল-কালির দাগ লাগা, পাইপ টানছে। ওর তামাকের পোড়া বিশ্রী গন্ধে ওর বাগানের ফুলের সৌরভ সব মুছে গেছে, উপে গেছে। বাতাসে উঠেছে পেট্রল আর তামাক পোড়ার চিমসে গন্ধ।

.. ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকে। বয়সও তেমন কিছু বেশী নয়। এরই মধ্যে যেন অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে সে। চোখে-মুখে একটা কাঠিন্যের ছাপ।

ওর কথাগুলো শুনে চলেছে অশোক। আগামী বাতাসে উঠেছে ঝড়ের সঙ্কেত, দূর দিগন্তে কালো মেঘসীমা যেন অতর্কিত ধূলোয় লাল হয়ে উঠেছে। ভেসে আসছে শোঁ শোঁ গর্জনধ্বনি। কোন আগামী মহাকালের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ সূচিত হতে চলেছে।

…তেমনি কোন এক মহাযুগ আগত প্রায়।

…তার আগে হতেই ওরা বের হয়ে পড়েছে, এ যুগের নন্দীভৃঙ্গীর দল। আঁধার রাতে বন ভেদ করে জিপ চালিয়ে এসেছে ওই নোতুন ঠিকাদার ভদ্রলোক—দামোদরের বাঁধের পাথর সাপ্লাইএর কনট্রাক্ট নিয়েছে। ..পাথর চাই—কালো জমাট মটামরফিক রক। স্যাণ্ডষ্টোন বা বেলে পাথর হলে চলবে না। কনট্রাক্ট.. বাঁধের কায—ফ্যাক্টরীর ভিত্তি স্থাপন করা হবে, চাই কালো মহিষে পাথর—বেমাল নিদেন মেটামরফিক রক।

তার সন্ধানও করেছে ওরা, মামলা মালিবাড়ার বিস্তীর্ণ পাহাড়ী জঙ্গলে তার দীর্ঘ স্তর খুঁজে বের করেছে। কিন্তু দুর্গম গহন বন—ওদিকে দামোদর নদ।

অশোকের কথায় হাসে ভদ্রলোক—তাতে কি! রাস্তা বানিয়ে নোব, ট্রাক যাবার রাস্তা। সে সব খরচ আমাদের। আপনি শুধু বিঘে হিসাবে রয়েলীটি নেবেন—অবশ্য যোগ্য রয়্যালটিই আমি দোব।

বিস্তীর্ণ বন—পার্বত্যভূমি। কোন আয়ই বিশেষ হয় না ওখান থেকে। উর্বর মাটিও নেই সেখানে যে বড় শাল গাছ হবে—সবই ঝুপড়ি বন। অশোক দু একবার গেছল সেখানে। টিলার নীচে অনেক নীচে দামোদর বয়ে চলেছে। যেদিকে চোখ যায়, ঝিরি ঝিরি শালবন আর কালো কালো পাথর।

…আজ সেই বন্ধ্যা প্রস্তর স্তূপই তার সামনে এনেছে অযাচিতভাবে বেশ কয়েক হাজার টাকার প্রাপ্তিযোগ। বলে চলেছে—অবশ্য আরও কেউ যে এ প্রস্তাব নিয়ে আসবে না তা নয়; তবে আমি যা দর দিচ্ছি, এ দর আর কেউ দিতে পারবে না।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। কেমন যেন নির্লজ্জ প্রলোভন—না দর কসে বেসাতি করা—ঠিক বুঝতে পারে না অশোক।

ওর দিকে চেয়ে থাকে। ভদ্রলোক ফোলিও ব্যাগ থেকে ফস্ করে বের করে—টাইপ করা কাগজ-পত্র, সেই সঙ্গে একটা ব্যাঙ্ক-এর চেক বই। দামী পার্কার ফিফটিওয়ান কলমের সোনার ঢাকনাটা আবছা আলোয় ঝকমক করে।

ওর চারিপাশে যেন তেমনি একটা চকমকে পালিশ—কিছু অগ্রিম নিয়ে আজ যদি ওটা সই করে দেন—

অশোক কি ভাবছে!…

আজ সন্ধ্যা—সন্ধ্যা কেন অতীতের কিছুদিন থেকেই দেখে আসছে সে একটা পরিবর্তন। অন্ধকার পাড়াগাঁয়ের মধ্যেও সেই ঝড় এসে বেজেছে—মরচে পড়া চাকাটা বহু-কালপরে যেন নাড়াচাড়া পেয়ে একটা অন্তিম আর্তনাদ তুলেছে আকাশে বাতাসে।

…নড়ছে! ধীরে ধীরে নড়ছে।

…সেই সঙ্গে মনে পড়ে প্রীতিকে। একটি মধুর অজানা স্বপ্নের মোহে তাকে যেন ঘিরে আছে। সব দুঃখ বিপদের মাঝে ও এনে দেবে এগিয়ে দেবার স্বপ্ন। ঘরের নিশানা

বাড়ে—যে ঘর নিঃশেষে লুটিয়ে পড়েছে—তাকে আবার নোতুন করে গড়বার আশ্বাস!

—দিন!

কাগজগুলোয় চোখ বোলাতে থাকে অশোক।

ভদ্রলোক তখনও বলে চলেছে—ওটা একটা ফর্মাল ব্যাপার মাত্র। টাকাটা আপনি কোয়াটারলি পাবেন—প্রথম অগ্রিম বাবদ এবং সেলামী বাবদ হাজার দশেক টাকা দিই?

জমিদারী চলে যাবার আগেই পাকাপাকিভাবে বন্দোবস্ত করে দেবে অশোক। মোটা টাকাটা কেনই বা হারাবে—তার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পায় না।

সই করে দিল।

…রাত নেমেছে। কত রাত্রি জানে না। ভদ্রলোক বের হয়ে গেছেন অনেক আগেই। বাঁকুড়া সহরে ফিরতে হবে তাকে।

অশোক বলেছিল এই রাত্রে!

হাসে ভদ্রলোক—তাতে কি! একটু গিয়েই বড় রাস্তায় উঠবো—তারপর তো সোজা বাঁকুড়া—কোশ্চেন অব ফিফ্‌টি মিনিটস্‌। থ্যাঙ্কউ'

ওরা সময়ের হিসাব করে মিনিটে।

…চলে গেছে ভদ্রলোক।

…রাত নেমেছে। আবার নিস্তব্ধ তন্দ্রাভরা রাত্রি। আঁধারে সব যেন হারিয়ে গেছে। মুছে গেছে গ্রাম সীমা। কি নীরব বেদনায় তারাগুলো জলছে। [ক্রমশঃ

প্রফুল্ল ও 'প্রফুল্ল' নামকরণ

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক নাট্যগুচ্ছের মধ্যে এত অধিক জনপ্রিয়তা আর কোন নাটক দাবী করতে পারে না।

একটি পরিবারের দুর্গতির কাহিনী এর প্রতিপাদ্য বিষয়। নাটকটি বিয়োগান্তক। যোগেশ—এই পরিবারের কর্তা। আকস্মিক বিপদে ও সহোদর রমেশের চক্রান্তে যোগেশের জীবনে যে ঘোরতর অশান্তি ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এবং তাকেই কেন্দ্র করে' ঐ পরিবারেরও যে পতন ঘটে—তারই নাট্য কাহিনী—'প্রফুল্ল'। যোগেশ এর নায়ক। রমেশকে বলতে পারি—প্রতি-নায়ক। বড়-বৌ জ্ঞানদা নায়িকার পদে আসীন হতে পারেন—যোগেশের কনিষ্ঠ সুরেশ, রমেশ-পত্নী প্রফুল্ল—এরা পার্শ্বচরিত্র। ব্যাঙ্ক-ফেল যোগেশ ও তার পরিবারের এক অশুভ ঘটনা।

এই নাটকের নামকরণ কিন্তু 'প্রফুল্ল' হওয়ায় তর্কের অবকাশ রাখে। গিরিশচন্দ্র যাদের নিয়ে এই নাটকের সূচনা এবং পরিণতি ঘটালেন, মুখ্য চরিত্র হিসাবে সেই যোগেশ, রমেশ অথবা জ্ঞানদা—কারুর নামেই নামকরণ করেন নি। এমন কি যে 'ব্যাঙ্কফেল' ঐ পরিবারে ঘটালো নিদারুণ অঘটন, তার ইঙ্গিতেও রাখলেন না। কিন্তু যে প্রফুল্ল নিছক একটা পার্শ্ব-চরিত্র, যার প্রভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘটলো না সেই পতনের সূত্রপাত এবং পরিণতি, এমন কি যার ব্যক্তিগত নামটি এই বিয়োগান্তক নাটকের বহন করে না কোন অর্থ বা ইঙ্গিত—তার নাম-করণেই এই নাটকের নাম হলো 'প্রফুল্ল'। এর কারণ নির্ণয় করা নিশ্চয় যুক্তিতর্কের বিষয়।

আপাতঃদৃষ্টিতে 'প্রফুল্ল' নামকরণ যুক্তিসঙ্গত নাট্য-কারের সুষ্ঠ সিদ্ধান্তের অপ-প্রয়োগ। নামটি কেবল নাম হিসাবেই দেওয়া। নাটকে উপস্থাপিত বিষয় ও ঘটনা এবং বক্তব্য—কোন কিছুই এই নামকরণের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয় বলে মনেও হয় না। অশুভ ঘটনা নিয়ে যে-নাটকের আরম্ভ, এবং 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলে'

আর্তরবে যার বেদনাদায়ক পরিণতি—সেই নাট্য কাহিনীর 'প্রফুল্ল' নামকরণের শাব্দিক অর্থও কেমন যেন শ্রুতিকটু। পঞ্চম অঙ্কের পূর্ব পর্য্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশই সে গ্রহণ করেনি। নাটকের ঘটনাস্রোতও যে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাও নয়। তাই দৃঢ়ভাবেই বলা চলে, ঐ নামকরণ যেমনই অযৌক্তিক, তেমনি নিরর্থক।

কিন্তু একটু বিশদভাবে চিন্তা করলে এ-ভ্রান্তি দূর হয়। মনে হয় না 'প্রফুল্ল' নামকরণ মূল্যহীন—উদ্দেশ্যহীন।

'প্রফুল্ল' নাটকের কাহিনী একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের কাহিনী। যে-যুগের কথা, সে-যুগ তখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবজনিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিস্থিতিতে উদ্বেলিত। একদিকে সনাতন-প্রথা, যৌথ সমাজ-ব্যবস্থায় ও গোষ্ঠীবদ্ধ পারিবারিক জীবন ধারায় ভাঙন ধরছে; অন্যদিকে প্রবল স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি-সচেতনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সমাজে সুস্থ সহ-অবস্থানের বিরোধিতা করছে। ঘটনার স্থান এবং পরিবেশও পল্লী নয়। নয়া-শহর কোলকাতা নগরী।

যোগেশ-পরিবার এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই বিপর্য্যস্ত। 'ব্যাঙ্ক-ফেল' বহিরাগত একটা অশুভ ঘটনা। কিন্তু এই 'Tragedy of incident' ঐ পরিবারের যে দুর্দ্দিনের আভাস নিয়ে আসে পরোক্ষভাবে,—আপনার স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থে রমেশ তাকেই প্রত্যক্ষভাবে করে' তোলে দুর্বিসহ ও অলঙ্ঘনীয়। গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনার সুখ ও স্বার্থ সিদ্ধিতে নব্য সভ্যতাপুষ্ট মনটি তার কেবল বিদ্রোহী হয়েই ক্ষান্ত হয় না; সেই সঙ্গে অধীত বিদ্যাবুদ্ধির অপপ্রয়োগে সহজ সরল মানুষের গড়া একান্নবর্ত্তী ঐ-পরিবারটিকেও ধ্বংসের পথে নামিয়ে দেয় চক্রান্ত করে'।

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ছিল যুগাশ্রয়ী। সমকালীন যুগের ত্রুটিপূর্ণ কয়েকটি দিকের ছায়াছবি এই নাটকে তুলে ধরেছেন তিনি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নারী-প্রগতিতে তার উদার মনোভাব খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ঐ প্রগতিধারার সঙ্গে সহযোগিতা করেনি তাঁর নারী চরিত্রেরা। তাঁর নারীচরিত্রগুলি সনাতন ভারতীয় আদর্শের পথ ধরেই চলতে চেয়েছে প্রায় সর্ব্বত্র। এটি গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যকাব্য রচনার একটা সংস্কার-জাত প্রভাবের ফল বলা চলে।

নাটকে প্রফুল্লর স্থান পার্শ্বচরিত্র হিসাবে পরিবেশিত হলেও, আনুপূর্ব্বিক ঘটনায় তার জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা-সঙ্কুল। পারিবারিক সনাতন প্রথা এবং একান্নবর্ত্তী সংসারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি অন্য পাচজন গৃহস্থ-বধুর মতই তার মনকে গড়ে তুলেছে। সে অন্যসকলেরই একজন। সকলের সুখদুঃখের সমান অংশীদার—এই চেতনাতেই পুষ্ট। স্বামীর উচ্চশিক্ষা, আর্থিক সঙ্গতি তার মনে কোনরূপ পৃথক প্রভাব সৃষ্টি করেনি। শাশুড়ী বড়মার নিত্যশিক্ষা তাকে ঘোষ পরিবারের যথার্থ কুলবধু করেই গড়ে তুলেছে। প্রফুল্লর কাছে সবাই আপনার। সকলেই প্রিয়জন। যাদব—পুত্রতুল্য, সুরেশ—ভ্রাতৃসম, যোগেশ—পিতার মত, জ্ঞানদা—সহোদরা, এই হিন্দু কুল-বধূটির প্রতি গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা নাটকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এ হেন প্রফুল্ল তার পরিবারের আকস্মিক দুরবস্থায় কত যে পিষ্ট, তা বলা বাহুল্য। প্রিয়জনদের একটির পর একটির চরম সবনাশে তার অন্তরাত্মা হাহাকারে ভরে ওঠে। কিন্তু শেষে যখন বুঝতে পারে এ-সবের মূলে রয়েছে তার নিজেরই স্বামী, তখন তার মর্ম্মান্তিক শোকের যেন আর ক্ষমা থাকে না। এই স্বামীকে সে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। হিন্দু কুলবধূর কাছে স্বামীই যে সব। রমেশ নিজেও একবার তাকে এ ব্যাপারে সচেতন করে দিয়ে বলে: "…আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছে জানিস, স্বামী গুরুলোক ……"(৪।২)। আর এই খানেই প্রফুল্লর সকল ট্রাজেডি। স্বামী চক্রান্তকারী জেনেও তার বিরুদ্ধে সহসা প্রতিবাদ করতে পারে না। প্রকাশ করে দিতেও পারে না। অথচ তার কাছে 'স্বামীর' চেয়ে অনেক বড়—তার পরিবার, তার প্রিয়জনেরা—শাশুড়ী, বড়-জা, ভাশুর, দেওর প্রভৃতি।

প্রফুল্ল বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, তার অন্তরে সে কোন্ প্রভাবকে সায় দেবে। মুখে ফোটে তার করুণ প্রলাপ: "আমি তবে আজ কাঁদি (৪।২)। এই বিষম অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা সার্থক ট্রাজেডির লক্ষণ, তা এই নাটকে আর কারুর আছে কিনা সন্দেহ! যোগেশের সান্ত্বনা 'মদে'। শাশুড়ী উন্মাদ হয়ে বেঁচেছেন। জ্ঞানদা মুক্তি পেয়েছে 'মরে'। কিন্তু প্রফুল্লর এ অন্তর্দাহ নির্ব্বাপিত

হবে কিসে? ভাশুরের মানবহ্নি, স্বামীর ধনবহ্নি---তার যে দাহকে করছে প্রজ্জ্বালিত,—তার উপসম কোথায়?

যোগেশ—জ্ঞানদা—উমাসুন্দরী—সুরেশ প্রভৃতি সকলে যে আঘাত ও দুর্ভোগ পেয়েছে, তা বেশীর ভাগই বহিরঙ্গে। ঘটনার একটানা স্রোতে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদের অন্তরে প্রফুল্লর মতন এমন মর্ম্মান্তিক সংশয় ও অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করেনি। প্রফুল্লকে সংগ্রাম করতে হয়েছে ভেতরে ও বাইরে—দু' দিকেই। আর কোন চরিত্রের মধ্যে এই দুঃসহ সংগ্রাম-বৃত্তি তেমনভাবে মনকে দোলা দেয় না। সবাই আপন আপন দুরবস্থায় পিষ্ট। আত্মরক্ষায় আগ্রহী। কিন্তু প্রফুল্লই একমাত্র নিজের চিন্তা অপেক্ষা সকলের রক্ষা, সবাইয়ের উদ্ধারের জন্য শশব্যস্ত। জ্ঞানদাকে বাঁচতে ও ভরসা দিতে, পাগল শাশুড়ীকে সেবা করতে, সুরেশকে রক্ষা করতে, যাদবকে স্বামীর নিষ্ঠুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে—তার প্রত্যক্ষ চেষ্টার সীমা নেই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ গৃহিণীরূপে তার এই আন্তরিকতা মহৎ হৃদয় ও বলিষ্ঠ চিত্তেরই নিদর্শন। একান্ত অসহায় পরিস্থিতিতে তার এ-সংগ্রাম, এ-দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও নির্ভীকতা তাকে যথার্থ নায়িকার পদেই উন্নত করে। যে স্বামী দেবতা, তার নিষ্ঠুরতায়, নীচতায় মন ঘৃণায় ভরে' উঠলেও, মৃত্যুসময় তারই কল্যাণ-কামনা শুনতে পাই প্রফুল্লর মুখে: "জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়···জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।" মহৎ হৃদয়ের এ নমুনা নাটকে আর দেখা যায় না। এ-চরিত্রের উৎকর্ষতায় নাটকের মর্যাদাও যে বেড়ে গেছে, তা অনস্বীকার্য্য।

ধ্বংসের পর সৃষ্টি। দুঃখের পর সুখ। আর এই বিশ্বাসেই শত দুঃখ শোকের পরও মানুষ আবার নূতন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। কবি গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক-মন এ বিশ্বাসে অটল। তাঁর সে-আস্থা এ নাটকে ফুটে উঠেছে এই প্রফুল্লকেই ঘিরে। যোগেশ পরিবারের শুকিয়ে যাওয়া বাগানের শেষ ফুল এই প্রফুল্লর মৃত্যু মর্ম্মান্তিক নিশ্চয়। তবু আশাবাদী, জীবনবিশ্বাসী গিরিশচন্দ্রের সান্ত্বনা—ঐ মধুময় 'প্রফুল-ফুল' শুকিয়ে গেলেও, যোগেশের বাগানের ভবিষ্যৎ দু'টি অঙ্কুর—যাদব ও সুরেশকে সে নিষ্কণ্টক করে বাঁচিয়ে রেখে গেছে।

কবি কালিদাস রায় এই নাটকটিকে বলেছেন—যে, এটি একটি নৈতিক সংস্থার চরম ট্রাজেডি। গিরিশচন্দ্র চার পাশের সমাজের মধ্যে সেকালে যে নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করেছিলেন, তার মধ্যে তিনটি—সুরাপান, বিলাতী আইনশিক্ষার অপপ্রয়োগ এবং বেকার ভ্রষ্ট যুবকের অধঃপতন—এদের অবলম্বন করেই এ-নাটক রূপায়িত করেছেন। যোগেশ—রমেশ—সুরেশ—সব এক-একটা 'composite character', আর প্রফুল্লকে তিনি এঁকেছেন এদের গোষ্ঠী-গত পতনের একজন সংহতি-ধারিণী শক্তির প্রতীক করে। বঙ্কিমের মত গিরিশচন্দ্রও ভারতীয় আদর্শ-নারীর এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন এই 'প্রফুল্লকে' ঘিরে'। সুতরাং নাট্যকার ও নাটক উভয়ের ভাবগত উদ্দেশ্যের লক্ষ্য-চরিতার্থে প্রফুল্ল-চরিত্রের পরিকল্পনা এবং তারই নামে নাটকের নামকরণ যে সার্থকতর হয়েছে,—তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

একখানি আধুনিক নাটক

অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

আধুনিক-কবিতা কথা-সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন প্রযুক্তি এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নিত্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা লক্ষ্য করি আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রেও আমরা সেই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রত্যয়সমর্থিত প্রয়োগের আশা অতি স্বাভাবিকভাবেই করিয়া থাকি। নাট্যকারগণও এ বিষয়ে আমাদের যে একেবারে নিরাশ করিতেছেন তাহা নয়, নাটকের প্রযুক্তি এবং বিষয়বস্তু লইয়া আধুনিক কালে আমরা নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করিতেছি।

বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা সহজেই আশা করি আধুনিক নাটকের বিষয়বস্তু আধুনিক হইবে। আধুনিক বলিতে আমরা এ ক্ষেত্রে বুঝি, সমসাময়িক জীবন হইতে গৃহীত ঘটনা। আবার আধুনিক হইতে হইলে ঘটনাটিতে সমসাময়িক জীবনের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় ঘটনা হইতে হইবে। আমাদের জীবনযাত্রা বহুদিনের বিবর্তনধারার ভিতর দিয়া এখন একটি বিশেষ ক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই ক্ষণে আসিয়া জীবনের বিচিত্র-জটিল অভিজ্ঞতা আমাদের ভিতরে বিচিত্র-জটিল জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তুলিতেছে; সাহিত্যে আধুনিক বিষয়-বস্তুকে তাই শুধু আধুনিক ঘটনা হইলেই চলিবে না, তাহাতে নানাভাবে এই আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করিয়া দিতে হইবে।

স্বাভাবিক ভাবেই তাই আধুনিক বাঙলা নাটক আধুনিক-সমস্যা বহুল হইয়া উঠিতেছে। অপেশাদার নাট্য সম্প্রদায়গুলিই নয়, এখন পেশাদারী-নাট্যসম্প্রদায়গুলিও বাছিয়া বাছিয়া এইজাতীয় নাটকগুলিই মঞ্চস্থ করিতেছেন। কিছুকাল পূর্বেও আধুনিক সমস্যাসঙ্কুল নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে চলে না বলিয়া নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু বাঙলা রঙ্গমঞ্চের সেই আক্ষেপের দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু আধুনিক নাটক রচনা করিতে হইলে নাটকে সমসাময়িক কোনও ঘটনাকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। আসল কথাটা হইল ঐ আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা। মনটা যদি সমাজসচেতন বা যুগ সচেতন হয় তবে বিষয়বস্তু যাহাই হোক, তাহার ভিতর দিয়া যুগজীবন জিজ্ঞাসা ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিবেই। যেখানে তাহা ঘটে না সেখানে বুঝিতে হইবে—নাট্যকার হয় প্রথা-বদ্ধতায় নিষ্ক্রিয়, নতুবা তাঁহার ব্যক্তিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে যুগ-জীবনসম্বন্ধে তিনি বিমুখ।

হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন একটি বিষয়বস্তু একটি যুগসচেতন শিল্পীমনের স্পর্শে কতখানি আধুনিক হইয়া উঠিতে পারে তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি চোখে পড়িল 'বহুরূপী' পত্রিকায় (ত্রয়োদশ সংখ্যা) প্রকাশিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুত মন্মথ রায় মহাশয়ের 'মহা-অভিসার' নাটকখানিতে। নাটকখানি রচিত সম্রাট অশোকের একটি জীবন অধ্যায় লইয়া—যাহার মধ্যে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে অশোকের স্ত্রী তিষ্যরক্ষিতার সপত্নীপুত্র পদ্মপলাশলোচন কুণালের প্রতি দুর্বার প্রেম লইয়া দ্বন্দ্ব এবং কুণালের জীবনে তাহার করুণ পরিণতি। ঘটনাটি খুব অজ্ঞাত নয়—শ্রীযুত মন্মথ রায় মহাশয়ও ইতঃপূর্বে অশোকের জীবনী অবলম্বনে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার ভিতরেও এই বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের ভিতরকার প্রেমের দ্বন্দ্ব ও তাহার পরিণতি স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ ঘটনা সেখানে পার্শ্ববর্তী ঘটনা, বর্তমান নাটকে ইহাই মুখ্য ঘটনা।

নূতন নাটকে নাট্যকার ঘটনাটির যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে দেখি মহারাণী তিষ্যরক্ষিতা নিজেকে কুণালের নিকটে আগাইয়া দিয়াছে 'ভোগবতী গঙ্গা' বলিয়া, সেই গঙ্গাতেই সে কুণালের অনিন্দ্যসুন্দর যৌবনকে নিমজ্জিত করাইতে চায়; কারণ জীবনে সে অশোকের পত্নী হইয়া অশোকের যৌবন ভোগ করিতে পারে নাই; অশোকের সেই পরিপূর্ণ যৌবনকে চোখের সামনে সে পাইয়াছে অশোকপুত্র কুণালের পরিপূর্ণ যৌবনের মধ্যে, উদগ্রকামনা-

ময়ী অতৃপ্তা নারী সেই যৌবনের ভোগের জন্যই লালায়িতা হইয়া উঠিয়াছে সকল সমাজসম্পর্কের বৈধতা-অবৈধতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া। সহজে মনে হইবে, নাটকের মধ্যে যে দ্বন্দ্বটি দেখা দিবে সে দ্বন্দ্বটি হইবে অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার সহিত সমাজ-সম্পর্কের বৈধতার দ্বন্দ্ব। কিন্তু সে দ্বন্দ্বকে অস্বীকার না করিয়া এবং মূল ঘটনাকে বিকৃত না করিয়া সুনিপুণ নাট্যকার একটি সূক্ষ্মকৌশলে এই দ্বন্দ্বকে একটি বৃহৎপরিধির মধ্যে স্থাপিত করিয়া দ্বন্দ্বটিকে মানুষের জীবনের একটি গভীর মৌলিক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করিয়াছেন। লালসাময়ী বিমাতার লুব্ধদৃষ্টিকে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কুণালের যে পদ্মলোচন দুইটি মহারাণী তিষ্যরক্ষিতাকে অমনভাবে কুণালের প্রতি লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং যে লোচন দুইটি ছিল তিষ্যরক্ষিতার প্রার্থিততম, নিজের সেই চোখ দুইটি একটি রুদ্ধদ্বার নিভৃত কক্ষে বসিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া একটি রত্নপেটিকায় করিয়া কুণাল স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহামাত্য মণিদীপার হাত দিয়া তিষ্যরক্ষিতাকে উপহার পাঠাইয়া দিল। এই ঘটনা নাটকখানিকে একরূপ পরিণতি দিতে পারিত—যদি একটু পরেই আমরা না পাইতাম মহাভিক্ষু উপগুপ্তের সঙ্গে চোখ-বাঁধা কুণালের বৌদ্ধভিক্ষুরূপে উপস্থিতি।

বিমাতা হইয়া তিষ্যরক্ষিতা যেভাবে কুণালের প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছে, কোন অশরীরী আত্মিক প্রেম নয়, যৌবনোদ্দীপ্তা নারীর ভোগচরিতার্থ-প্রেম, তাহাতে নাটকে সহজভাবেই তাহার প্রতি আমাদের একটা ঘৃণা জাগ্রত হইতে পারিত এবং আমরা নাটকখানি পড়িয়া বা ইহার অভিনয় দেখিয়া তিষ্যরক্ষিতাকে একটি সুস্থ সংসারধর্ম হইতে স্খলিতা রমণী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতাম। কিন্তু আশ্চর্য এই, এইজাতীয় একটি নারীও নাটকখানির মধ্যে আমাদের গভীর সহানুভূতির পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রটি এতখানি সহানুভূতির পাত্রী হইয়া উঠিবার কারণ, নাট্যকার তিষ্যরক্ষিতার ব্যক্তিজীবনের কামনার দ্বন্দ্বকেই মানবজীবনের একটি মৌলিক দ্বন্দ্বের রূপ দিয়াছেন। সে দ্বন্দ্ব আসলে রহিয়াছে মানুষের শ্রেয়োবোধের মধ্যে। মানুষের মধ্যে একরকমের শ্রেয়োবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে ত্যাগের আদর্শ লইয়া, বৈরাগ্যের আদর্শ লইয়া। মৃত্যুকে সেখানে উপেক্ষা করিতে হইবে গোটা জীবনরেই শুধু উপেক্ষা নয়, সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া। ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথ হইল ক্রমান্বয়ে জীবনকে কেবলই অস্বীকার করিবার পথ। এইখানে আর একদল মানুষের শ্রেয়োবোধে লাগে কঠোর আঘাত—জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার এবং উপেক্ষা করিয়া জীবনের এ কোন অদ্ভুত মূল্যবোধ! আলোচ্য নাটকে তিষ্যরক্ষিতা এই প্রশ্নেরই একটি রক্ত-মাংসে গড়া রূপ।

আমাদের শ্রেয়োবোধের ক্ষেত্রে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা এই প্রশ্ন এবং সংশয়টিকে আমাদের কাছে অতিশয় তীব্র করিয়া তুলিয়াছে, সেই তীব্রতা লইয়াই দেখা দিয়াছে মহারাণী তিষ্যরক্ষিতা আমাদের কাছে। অথচ নাট্যকার যে কৌশলে তিষ্যরক্ষিতার ভিতর দিয়া এই সংশয় ও জিজ্ঞাসাকে তীব্র করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে কালাতিক্রমের কোন দোষের দ্বারা তিষ্যরক্ষিতা দুষ্ট হইয়া ওঠে নাই।

বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়া একদিন ধর্মের ক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিল এই নিবৃত্তিমার্গের চরম আহ্বান—ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সর্বাতিশায়ী মহিমা। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক। কলিঙ্গ-বিজয়ের নৃশংসতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়া দেখা দিল ধর্ম বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা; বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনই দেখা দিল তাঁহার নিকটে জীবনের মহত্তম আদর্শরূপে। ত্যাগ বৈরাগ্যে সংযমের তীব্রতার দ্বারা তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন মৈত্রীকরুণার ধর্মে—সর্বভূত-হিতের সেবাধর্মে; শুধু নিজেকে নয়, সমগ্র রাজপরিবারকেও তিনি অনুপ্রাণিত করিতে চাহিলেন এই আদর্শে; প্রিয় পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন সিংহলে। অন্য রাণী কারুবকীর পুত্র তিবরকে মাতা সহ পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য, অশোকের ইচ্ছা তাঁহার অন্য যুবক পুত্র কুণাল এই বৌদ্ধধর্মের বার্তা বহন করিয়া যায় তক্ষশীলায়। মহাভিক্ষু উপগুপ্তের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কুণাল এই ধর্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করে ইহাই রাজা অশোকের কাম্য। নিজেকে পরিবারকে—সমগ্র সাম্রাজ্যকেই এইভাবে বৌদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার

প্রবল বাসনা দেখা দিল দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের ভিতরে। এই প্রবল স্রোতের প্রবলতর বিরুদ্ধ স্রোতের বাধা লইয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল পরিপূর্ণ-জীবন-রসে উচ্ছল রাণী তিষ্যরক্ষিতা। তিষ্যরক্ষিতা সহায়তা লাভ করিল দুই দিক হইতে, এক হইল অশোকের ভ্রাতা মহাবলাধিকৃত বীতশোকের নিকট হইতে. যাহার লুব্ধদৃষ্টি ছিল রাজসিংহাসনের প্রতি, সবাই বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে সে-ই সিংহাসন গ্রহণ করিবে। অপর প্রবল সহায়ক হইল অন্তঃ-মহামাত্য খল্লাতক। খল্লাতক অন্তঃমহামাত্যও বটে—আবার অশোকের অভিভাবক স্থানীয়ও বটে। খল্লাতক রাজনীতিতে কৌটিল্যের মন্ত্রশিষ্য, ধর্মনীতিতে বিশুদ্ধ চার্বাকপন্থী, ইহজীবনের পরে কোথাও কিছু আছে ইহাতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী—জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগেই জীবনের পরমার্থ—এই পন্থী।

এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আমরা সুরাসক্তা এবং সপত্নীপুত্র কুণালের প্রতি আসক্তাচিত্তারাণী তিষ্যরক্ষিতাকে যখন দেখিতে পাইলাম তখন সে এই প্রশ্নটি লইয়াই আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, "সম্রাট আমাকে বলেন, তিষ্যরক্ষিতা, তুমি আমোদ প্রমোদ ছেড়ে দাও। সুরাপান করো না। অলংকার পরো না। অথচ দেখুন আমি রাজরাণী। আমার রক্তে বিলাসের নেশা। এই রক্তটাই যদি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় আমি কেমন করে বাঁচবো? (ক্রন্দন)" এই প্রশ্নটা তিষ্যরক্ষিতার জীবনে রহিয়াই গেল। প্রশ্নটা মানুষের রক্তের প্রশ্ন—অপরের মনেও তিষ্যরক্ষিতা এই প্রশ্নই বার বার জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, মানুষের ভিতরে এই যে একটা রক্তের প্রশ্ন আছে—সে প্রশ্নটা কি আদিতে মধ্যে এবং অন্তে সর্বত্র এবং সর্বথাই ঘৃণ্য? আর এই রক্তকে অস্বীকার করিয়া সম্পূর্ণরূপে রক্তহীন জীবনটাই কি পরমকাম্য। কুণাল তাহার জীবন দিয়া এ প্রশ্নের জবাব দিতে চাহিয়াছিল এই, রক্তের প্রশ্নটার অপেক্ষা জীবনে বড় করিয়া তুলিতে হইবে বোধির প্রশ্ন—সেইখানেই মহাপ্রশান্তি, সেই মহা-প্রশান্তিতেই জীবনের মহামূল্য। কিন্তু অভাগিনী তিষ্য-রক্ষিতা জীবনের এই সত্যকে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিল না। দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া একবার সে বসিয়া গিয়াছিল কুণালকে লইয়া এই মহাপ্রশান্তির সাধনায়. কিন্তু পারে নাই। পিছন হইতে আবার প্রবল শক্তি বিস্তার করিতেছে খল্লাতক, সে বারবার উত্তেজিত করিতেছে তিষ্যরক্ষিতাকে, "খণ্ড বিখণ্ড কর দুঃখবাদের এই ধর্ম। ছিন্নভিন্ন করো শূন্যতার আকাশকুসুম। যৌবনের হোক জয়। জীবন পাক মহিমাময় স্বীকৃতি।" সে কানে আসিয়া বারবার মন্ত্র দিতেছে. 'পিব খাদ চ, পিব খাদ চ।' সেই মন্ত্রকেই তিষ্য-রক্ষিতা অনুভব করে তাহার জীবনসাধনার মহামন্ত্র বলিয়া। সেইজন্যই কুণালকে লইয়া সাধনায় বসিয়াও বুদ্ধজীবনের কথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষিতা বলিয়া উঠিতেছে, "বিশ্বাস কোরো না কুণাল, বিশ্বাসকর-প্রত্যক্ষ জীবন। বিশ্বাস কর জীবন্ত যৌবন।" মাতা-পুত্রের উপাসনার মধ্যে এই কথোপকথন শুনিয়া লিপিকর শ্রীপদ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনারা কী উপাসনাই করছেন?" তিষ্যরক্ষিতা তখন উত্তর করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ মূর্খ, এর নাম জীবনের উপাসনা, যৌবনের উপাসনা—লিখে রাখো।" স্ত্রী-অধ্যক্ষা মহামাত্য মণিদীপা যখন শ্রীপদের লিখিত এই কথোপকথন আনিয়া সম্রাট অশোককে পড়াইয়া শুনাইয়া অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করিয়াছিল, "এটা কি রকম উপাসনা সম্রাট?" সম্রাট অশোক তখন গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "এটা জীবন জিজ্ঞাসার উপাসনা। সত্যোপলব্ধির সাধনমার্গ।" এ জীবন জিজ্ঞাসা অশোকের যুগেও মানুষের মধ্যে যে ছিল না এ-কথা বলিতে পারি না; আজকে আমাদের মধ্যে যেরূপ স্পষ্ট ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে অশোকের যুগে তাহা এমনতর স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়াই প্রকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা মনে করিতে পারি না। মনে হয়, সূক্ষ্ম কৌশলে নাট্যকার আমাদের যুগের জীবন জিজ্ঞাসাকেই প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন অশোকের যুগের একটি তীব্র জীবন-দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করিয়া এবং ইহার ভিতর দিয়াই নাট্যকার অশোকের যুগের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছেন একখানি চমৎকার আধুনিক নাটক।

শিক্ষা-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

শিক্ষাই মানুষের উন্নতি ও কল্যাণের ভিত্তি। এ-শিক্ষা শুধু মাত্র অক্ষর বিদ্যা নয়। এর সারবস্তু ও গভীরতা যেমন বড় কথা, জনসাধারণে এর ব্যাপক বিস্তৃতিও তেমনি প্রয়োজনীয়। ভারতের কল্যাণকামী মহাজন-গণ মাত্রেই—রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—এদের কর্মধারা ভিন্ন পথগামী হলেও, শিক্ষার অভাবই দেশ-জাগৃতির প্রধান অন্তরায়—সে বিষয়ে এঁদের চিন্তা ও আদর্শের গভীর ঐক্য ও সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। অশিক্ষাজনিত ভারতের অশেষ দুর্গতি এঁদের বেদনা বিধুর করে তুলেছিল। এঁরা প্রত্যেকেই তাই বার বার জোর দিয়েছেন শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর, এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব চিন্তা ও শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে। বর্তমান ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনার বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনায় এঁদের অবদান অসামান্য। প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রনাথকে একটি স্কুল পালানো ছেলে বলা অন্যায় হবে না। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে একাধিক স্কুলে পড়াশুনা করতে পাঠান হয়েছিল, কিন্তু কোন স্কুলেই তিনি বেশীদিন টিকে থাকতে পারেন নি। কিছু দিন পর পরই এক স্কুল ছেড়ে যেতেন আর এক স্কুলে। তারপর, আবার আর এক জায়গায়। বাড়ির অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন যে, এ ছেলের লেখাপড়া হবার নয়। রবীন্দ্রনাথের কোন জ্যেষ্ঠা সহোদরা আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, রবি একজন মানুষের মত মানুষ হবে—তাঁদের সে আশা সফল হ'লো না। কিন্তু এই স্কুল বিমুখতার সবটা দোষ রবীন্দ্রনাথের একার নয়। স্কুলের যন্ত্রচালিতবৎ ডিসিপ্লিন, আনন্দ লেশহীন পরিবেশ আর ছাত্রনিরপেক্ষ ও পরীক্ষামুখ্য একঘেয়ে পঠন-পাঠন এই সংবেদনশীল তরুণ শিক্ষার্থীকে বিরূপ করে তুলেছিল প্রচলিত স্কুল-ব্যবস্থার প্রতি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই ছেলেটির মধ্যেই দেখা যায় এক অকৃত্রিম ও সহজাত শিক্ষানুরাগ। বাড়ির বারান্দার থাম ও গরাদে-গুলিকে শিশু রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় ছাত্র বানিয়ে নিজে মাষ্টার সেজে বসেছেন। এই বোধ হয় খেলাচ্ছলে গুরুদেবের আদি গুরুগিরি। রবীন্দ্রনাথের স্কুলবিমুখতা প্রকৃতপক্ষে প্রাণহীন গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অনুভূতি প্রবণ, প্রতিবেদনশীল উদার প্রাণসত্তার আধার রূপে স্কুল-গৃহটি ছিল নিতান্তই অপরি-সর। বল, জগত নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?

স্কুলপর্বের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনীতে। সে সময়কার একটা ঘটনা:

রবীন্দ্রনাথ একসময়ে নরম্যাল স্কুলে পড়তেন। নরম্যাল স্কুলের শিক্ষক হরনাথ পণ্ডিতের ব্যবহার খুব ভাল ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি মোটেই ভাল ব্যবহার করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই শিক্ষকের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। কখনো এর সঙ্গে কথা কহেন নাই। ক্লাশে পড়া জিজ্ঞাসা করলেও রবীন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিতেন না। তার জন্য অনেক সময় তাকে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হত। অনেক সময় উঠানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। সে আবার যেমন-তেমন দাঁড়ান নয়, মাথা হেঁট করে পিঠ নুইয়ে অনেকক্ষণ একভাবে থাকতে হত। কিন্তু এত শাস্তি দিয়েও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন ছেলেটার কিছু হবেনা; কিন্তু বৎসরের শেষে যখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী নম্বর পেয়ে ক্লাশে প্রথম কি দ্বিতীয় হলেন, তখন হরনাথ পণ্ডিত তাহা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, পরীক্ষক পক্ষপাত করে রবিকে বেশী নম্বর দিয়েছেন। যে ছেলে সারা বছর কিছু পড়ে নাই, সে কেমন করে এত নম্বর পেল! রবীন্দ্রনাথকে ফের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এবার অন্যান্য সব শিক্ষকদের সম্মুখে।

পূর্বের অপেক্ষাও এবার তিনি বেশী নম্বর পেয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের বিদ্যা রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী কিছু লাভ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব তাঁর ছিলনা। কিন্তু সংস্কৃত সম্পন্ন গৃহ-পরিবেশ এবং বৃহত্তর জীবন ও জগতের ক্ষেত্রে তিনি নিবিড় নিষ্ঠার সহিত পাঠ গ্রহণ করেছেন আজীবন। সেই ছেলেবেলার ইস্কুল-ইস্কুল খেলা হতে শুরু করে পরবর্তী জীবনের নানা অভিনব পরীক্ষা, প্রয়োগ ও প্রচেষ্টা তাঁর শিক্ষানুরাগের জলন্ত স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথের বর্ণাঢ্য ব্যক্তি-সত্তায় কবি, শিল্পী, দার্শনিক ও শিক্ষক পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর অর্থাৎ জীবনের শেষ অঙ্ক অবধি কবি তাঁর নিরলস চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছিলেন শিক্ষার সংস্কারে ও রূপায়ণে। এক শিক্ষা সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ। তাঁর রচিত শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সংখ্যা ১৩০টি। এগুলি অনেক বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'শিক্ষা' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। এ-ছাড়া রবীন্দ্রনাথ শিশু ও কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন ১৬ খানা। তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রচনার পরিমাণ ১৭৫০টি মুদ্রিত পৃষ্ঠা, এবং ৩৫০০০০ শব্দের সমষ্টি। পরিমাণের দিক দিয়েও এ অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষাচিন্তা নায়ক, শিক্ষাব্রতী এবং হাতে কলমে শিক্ষক। বহুল কর্মব্যস্ত জীবনের এদিকটাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। শিক্ষাবিদ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাতি কম নয়। ইউনেস্কোর (Unesco) বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শ রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" আদর্শের অনুরূপ।

১৮৯২ সনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ "শিক্ষার হেরফের" প্রকাশিত হয়। এই আদি রচনায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শনের মূল কয়েকটি কথা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।

১৯০৬ সনে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। স্যাড্‌লার কমিশন এবং দেশী বিদেশী শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ সবদাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শনকে যথোচিত মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছেন। জীবনের শেষ ভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দিয়ে তিনি এক নূতন প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'হিবার্ট' বক্তৃতা-মালা "রিলিজিয়ন অব্ ম্যান" (Religion of man) নামক গ্রন্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনাত্মক কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা তাঁর জীবন-দর্শনের উৎস হতেই উৎসারিত। বাল্যে ঋষি-কল্প পিতার সান্নিধ্যে তুষারশীর্ষ হিমাদ্রির কোলে যে শান্ত, স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের মনের ফলকে উপনিষদের উদার বাণী উৎকীর্ণ হয়েছিল সেই বাণীবিধৃত ভাবধারাই তাঁর জীবন-দর্শনের মর্মকথা। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগত।

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহরো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো

এই মৌলিক কথাটাই নানা ভাবে নানা ছন্দে ও বিচিত্র ব্যঞ্জনায় কবি প্রকাশ করেছেন।

সত্য সত্য সত্য জপি
সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি.
সীমার বাঁধন পেরিয়ে সব
নিখিল ভবে—
সত্য তোমার পূর্ণ প্রকাশ
দেখব কবে।

* * *

বর্তমান ভারতের দুই মহান সন্তান রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি যথাক্রমে ভারতে শাশ্বত সত্য-দর্শন উপনিষদ ও ভাগবত-গীতার ফলশ্রুতিস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর ঈশ্বর বিশ্বের বাইবেল বস্তু নন। অবাঙ্‌মনসাগোচর পরম পুরুষও নন। বৈষ্ণবের প্রাণের ঠাকুর ভক্তের ভগবান বা ব্যক্তিগত ঈশ্বর নন। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সত্তা হচ্ছেন সর্বময় অনন্তসত্তা···যিনি সৌন্দর্য ও আনন্দরূপে৹ বিশ্ব-প্রকৃতির সর্বত্রই বিরাজমান। এই আনন্দসত্তা ঈশ্বর তিনরূপে প্রকটিত।

শান্তং, শিবং, অদ্বৈতম।

কোলাহলময় চিরচঞ্চল জগতে তিনিই শান্ত, স্থির এবং ধ্রুব। শোকদুঃখতাপক্লিষ্ট সংসারে তিনিই শিব—কল্যাণ-

র শত বিরোধ, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বিচ্ছিন্ন, অখণ্ড, অদ্বৈত।

তর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানেই জীবনের সার্থকতা। সহিত মানবসত্তার মিলনসাধনই প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের মতে যে যত পরিমাণে বিশ্ব-ঙ্গে একাত্ম ও সংযুক্ত হতে পারবে সেই হবে ক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ডতা ও মধ্যেই মানুষকে পেতে হবে তার অন্তরতম এই উপলব্ধির প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার টেনে এনেছিলেন প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে। বিশ্ব-উদার ক্ষেত্রে শিশুকে তিনি মুক্তি দিতে চেয়ে-কেন না, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা বোধই ত মানুষের সত্যিকারের শিক্ষা। প্রকৃতির সঙ্গে ক কবি 'ভূমার আলিঙ্গন' বলে অভিহিত করেছেন। থের শহর বিমুখতা সর্বজন বিদিত।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা। দাও সেই তপোবন
পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান—
পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব;
চাই স্বাধীনতা চাই পক্ষের বিস্তার
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

লন, শহর ব্যাপারটা তৈরী হয়েছিল মানুষের বিশেষ নে—ওটা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। থের শিক্ষা প্রকল্পে তপোবন বিদ্যালয় বা আশ্রম-য়র স্থান সবার উপরে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার ক্ষিতে এই আশ্রম বিদ্যালয়ে সীমিত সম্ভাব্যতার তাঁর অবিদিত ছিলনা। তাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এই ক আদর্শের সঙ্গে সংশ্রবের সামাজিক দিকটাকেও ক্ত করেছেন। লোকবহুল শহরাঞ্চলীয় জনপদ হতে দূরে র শান্ত পরিবেশে যে আশ্রম-বিদ্যালয়—তা আপাত সমাজ-বিচ্ছিন্ন একটা অদ্ভুত ও অবাস্তর অবস্থার সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা করা অমূলক নয়। কিন্তু শহর বা সমাজ হতে দূরে অবস্থিত হলেও বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটা সামাজিক জীবন থাকবে, আর থাকবে প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে সেবার মাধ্যমে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। আধুনিক পরিভাষায় একেই বলা হয় Extension Service। আশ্রম পরিবেশ সমাজ হতে দূরে থাকলেও সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। বরং শহরের মানুষই জনতার মধ্যে বাস করেও আপনাকে মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন রাখে।

তপোবন শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "যেখানে সাধনা চলেছে, যেখানে জীবন যাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নাই, যেখানে ব্যক্তি-গত, জাতিগত বিরোধ বুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।"

"কিন্তু বর্তমান কালে এখনি দেশে এই রকম তপস্যার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষ ভাবে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমন হওয়া উচিত অন্ততঃ তার একটি মাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য ও নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের উর্দ্ধে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।"

শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সে সময়ে বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন অনেক ছিলেন যাঁরা শান্তিনিকেতন সখের নাচ-গান-ছবি আঁকার ইস্কুল ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারতেন না। আজও সে-ভাবটা একেবারে ঘুচে গেছে তা বলা যায় না। কিন্তু ক্রমশই দেখা যাচ্ছে যে, জনবাহুল্যের চাপে এবং পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে শহরের ইস্কুল-কলেজে মানুষের চরিত্রগঠন ও দূরস্থান সাধারণ পরীক্ষা-পাশের পড়াশুনাও ঠিকমত হচ্ছে না। কলকাতার বড় বড় ইমারতি বাড়িতে ইস্কুল কলেজের নামে যে শিক্ষার প্রহসন চলেছে তারই বিষময় প্রতিক্রিয়া শহরের সামাজিক জীবনে প্রায়শই নানা বিপদ ও অঘটন ডেকে আনছে। যেখানে শিক্ষাদান ব্যবসায় মাত্র যেখানে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় পর্যন্তও থাকা সম্ভব নয়, সেখানে শৃঙ্খলা ও সংযম আশা করা বৃথা। তাই আজ আবার উল্টোদিকে

হাওয়া বইতে শুরু করেছে। হালে ভারতের নানাস্থানে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রমিক আবাসিক বিদ্যালয় এমনকি শান্তিনিকেতনী ধাঁচে গাছতলায় ইস্কুল পর্যন্ত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও হবে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথে বর্তমানের শিক্ষা-সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ও নামের আকর্ষণে আজ শান্তি-নিকেতন বিশ্বপর্যটকগণের তীর্থস্বরূপ। শান্তিনিকেতনের বয়ঃক্রম ষাট বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়। কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিষয়মুখ মূল্যায়নের পক্ষে এই বয়স অকিঞ্চিৎকর নয়। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই প্রকৃত উৎকর্ষ নির্ধারিত হয় যে পরিমাণে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থিগণ দেশ ও সমাজ জীবনের উপর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। বিলাতের বিখ্যাত পাব্লিক স্কুলগুলি আর এদেশের গোল দীঘির গোয়াল থানা নামে নিন্দিত শিক্ষালয়গুলির অবদান ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে অবশ্যই শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর নিকট হইতে দেশবাসীর প্রচুর প্রত্যাশায় অবকাশ রয়েছে।

তপোবন বিদ্যালয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু কথা স্মরণীয়ঃ

"একশো-দুশো এক আশ্রমে লইয়া দিন যাপন করাকে কোনমতেই নির্জন বাস বলা চলে না। এই যে একশো-দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে, ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম, আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এমনটি হইবার যো নাই, এই একশো-দুশো মানুষের দিন-রাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে,—ইহাকেই বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে এ বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা।"

আশ্রম বিদ্যালয়ের স্বরূপ, এবং বিরূপ সমালোচনার উত্তর বিবৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিতেই।

শিক্ষা পদ্ধতির চাইতে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের উপর দায়িত্ব ও মর্যাদা আরোপ করেছেন অনেক বেশী। শিক্ষাদান ব্যাপারটিকে তিনি প্রাণ হতে প্রাণান্তরে প্রেরণা সঞ্চারণ বলেই মনে করতেন। শিক্ষক তিনিই যিনি শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জন তপস্যায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন। তাই শিক্ষককে হতে হবে প্রাণবান মানুষ, অনুপ্রাণিত মানুষ। এই ভাবটিকে অতি সুন্দররূপে ব্যপ্ত করেছেন তাঁর অনুপম ভাষায়ঃ

গুরুর অন্তরের ছেলে মানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা'হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপনার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। সাধারণতঃ আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। তাই পাকা শাখায় কচিশাখায় ফুল ফোটাবার, ফল ফলাবার মর্ম-গত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে যায়।"

মাতৃভাষায় শিক্ষা ছাড়া জাতীয় শিক্ষা হয় না। মাতৃভাষা হবে শিক্ষার বাহন। মাতৃভাষাকে কবি মাতৃ-দুগ্ধের সহিত উপমিত করেছেন। যে শিশু মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত সে সত্যই হতভাগ্য। ফ্যাসানের মোহে বা হঠাৎ বড় লোকির গরমে যারা ছেলেমেয়েদের ইংরাজী মিডিয়মে পড়াতে উৎসাহী তারা কবির কথাগুলির মর্ম অনুধাবনে সচেষ্ট হতে পারেন।

"আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য-সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয়। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা তথা মাতৃভাষা। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র, কেবল একত্র করিতে পারিতেছিনা বলিয়াই আমাদের এক দৈন্য; নহিলে আছে সকলই। এখন বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন একত্র করিয়া দাও।

পানীমে মীন তিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

এ-অবস্থার নিরসন আবশ্যক।"

১৯২৬ সনে কবি রুশ দেশ পরিভ্রমণে যান। 'রাশিয়ার

' নামক গ্রন্থখানি রুশদেশ ভ্রমণের ফলশ্রুতি। রাষ্ট্রের প্রচণ্ড ঝড় তুফান কাটিয়ে রুশদেশ তখন নবসৃষ্টি ও গঠনের সাধনায় ব্যাপৃত। নিজদেশবাসীর অশিক্ষা ও গভীর দুর্দশায় কবিচিত্ত বেদনাবৃত। শিক্ষার দ্বারা একটা মধ্যযুগীয় অনগ্রসর দেশ কিরূপ দ্রুত ও পদক্ষেপে সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার রেখে গেছেন "রাশিয়ার চিঠিতে"।

মাত্র আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের কর মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ টিত। যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক। অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল—তারা আজ সমাজের কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন র অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত ভাবান্তর ঘটতে পারে তা' কল্পনা করা কঠিন। এদের গালের মরা গাঙে প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। র একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। সামনে একটা নতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে রত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

তবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী দাঁড়িয়ে আছে তার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। ভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই ড় আছে এই শিক্ষার অভাবকে।"

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল আজ কেবলমাত্র বৎসর কয়েকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত হ। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্য-ও সমান চেষ্টা।"

শদেশ সম্বন্ধে কবির এই মন্তব্যগুলি ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও র্বুল ভাবে প্রযুজ্য। কবি খোলা চোখে ও মুক্ত মন বিপ্লবোত্তর রুশদেশে জাতিপুনর্গঠনের যে বিপুল লক্ষ্য করেছিলেন তার বিস্ময়কর সাফল্য আজ সর্বীকৃত। এই সাফল্যের মূলে যে প্রধান কারণ নিহিত তা হচ্ছে জাতির সঙ্কল্প এবং সামগ্রিক উদ্যম। এক-র্বজনীন শিক্ষা দ্বারাই যে একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায় এই বিপুল কর্ম-যজ্ঞে রুশদেশ সেই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছে পৃথিবীর যাবতীয় অনগ্রসর দেশগুলির সামনে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং অসম্পূর্ণতায়,—যার সমাধান আজ পর্যন্তও সম্ভব হয় নি,—উদ্বিগ্ন কবি তাই বলেছিলেন তাঁর "শিক্ষার বিকিরণ" প্রবন্ধে:

"ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্না ঘরে হাড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কত জনকে সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা।

এ-কালে আমরা যাকে এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। এই শিক্ষাবিধি রেল গাড়ির কামরার মত। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে—সেটা অন্ধকারে লুপ্ত।"

জাতির উন্নতিকল্পে জনশিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন, আর চেষ্টা করেছেন তৎপ্রতিষ্ঠিত লোকশিক্ষা সংসদের মাধ্যমে নিজ সাধ্যানুযায়ী সমস্যা সমাধানের।

বর্তমান যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হচ্ছেন আমেরিকা বাসী জন ডিউই (John Dewy, 1859—1952), আর প্রাচ্যদেশীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)। এই মনীষীদ্বয়ের স্বচ্ছ ও মৌলিক শিক্ষা-চিন্তা এ-যুগের মানুষের মূল্যবান মানস-সম্পদ। এঁদের ভাবধারায় মিল আছে, আবার অমিলেরও অভাব নাই। উভয়েই দার্শনিক, এবং উভয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনাই সুগভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এঁদের পরস্পরের মতবাদের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা হয়ত এ-যুগের উপযোগী শিক্ষার পথ ও পদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এঁদের উপর যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রভাব সক্রিয় ছিল তা পৃথক ধরণের।

ডিউই ছিলেন চার্লস ডারুইনের বিবর্তন বাদে বিশ্বাসী, কেবল বিশ্বাসীই নন গভীর ভাবে প্রভাবিত। ডিউইর মতবাদ ইউরোপ, আমেরিকা এবং অনেকাংশে এ-দেশের শিক্ষা নীতি ও পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। ডিউই বাস্তববাদী। যন্ত্রবিদ্যা, জড়বাদী বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক

সমাজ পরিস্থিতির পৃষ্ঠপটেই তাঁর শিক্ষা তত্ত্বের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ। ডিউইর শিক্ষা-তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার :

বিশ্বের সৃজন ও গঠন-কার্য শেষ হয়নি। মানুষ সেই গঠন কার্যে সাধ্য মত অংশ গ্রহণের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। 'ঈশ্বর সৃষ্ট' পৃথিবীতে মানুষ দর্শক মাত্র নহে। 'ওরে ভীরু তোর উপরে নেই ভুবনের ভার' রবীন্দ্রনাথের এ-কথা ডিউই মানেন না।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন ঐশ্বরিক শক্তির সৃষ্টি নয়। বিশ্বের মৌলিক গঠন-উপাদান কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া মাত্র (combination of chemical forces)।

মানুষের পক্ষে সত্য-জ্ঞানলাভ খুবই সম্ভবপর। কিন্তু সে-সত্য অনুমান সাপেক্ষ বা উপলব্ধি জাত সত্য নহে। এ সত্য পরীক্ষাও প্রমাণ সাপেক্ষ। পরীক্ষা ও প্রমাণ নিরপেক্ষ কোন সত্যের অস্তিত্বই ডিউই স্বীকার করেন না।

সত্যের কোন শাশ্বত তথা অপরিবর্তনীয় সত্তা নাই। সত্য আপেক্ষিক এবং অবস্থানুযায়ী পরিবর্তনশীল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ স্পষ্টই ডিউইকে প্রভাবান্বিত করেছে। অতিন্দ্রীয়তায় বিশ্বাসী মানুষ ডিউইর মতবাদে সায় দিবেন না সে কথা নিশ্চিত।

ডিউই গণতন্ত্রের সমর্থক। স্কুলকে তিনি কম্যুনিটি (Community) প্রতিষ্ঠান রূপেই গণ্য করেছেন এবং সেরূপেই গড়তে চেয়েছেন। তাঁর-প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরি (Laboratory) স্কুল—পরবর্তী নাম ডিউই স্কুল কম্যুনিটি প্রতিষ্ঠানের যথার্থ প্রতীক। শহর ও সমাজ হতে দূরে অবস্থিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ডিউইর মতে একান্ত অবাস্তব। সমাজের সমস্যার মাঝখানেই শিক্ষার আসন পাততে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গণতন্ত্র-প্রশাসন এবং সমাজ পরিকল্পনার শিক্ষানবীশী চলবে।

রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউইর শিক্ষা মতবাদে বহু অমিল থাকলেও মিলের পরিমাণ ও নেহাৎ কম নয়। উভয়েই শিক্ষার সার্বজনীন আবশ্যকতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষাই সমাজের ভিত্তি ও প্রগতির অনিবার্য পন্থা। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবকে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ডিউই অনুরূপ মর্যাদা দিয়েছেন গোষ্ঠি-অভিজ্ঞতাকে। উভয়েই মানবজীবনের অবিরাম অগ্রগতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল। এগিয়ে চলাই ত মানুষের ধর্ম,—রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই ঔপনিষদিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই এগিয়ে চলা কিন্তু লক্ষ্যহীন, নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়। অনন্তসত্তার সন্ধানে এ-চলা। সত্যোপলব্ধি এর লক্ষ্য। কিন্তু ডিউইর বস্তুতান্ত্রিক দর্শনে প্রয়োজন সিদ্ধির বাইরে কোন অতিন্দ্রীয় লক্ষ্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। ডিউইর কাম্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির পার্থিব উন্নতি। কিন্তু কেন, কিসের জন্য এই উন্নতি ? উন্নতিই কি উন্নতির চরম লক্ষ্য ? যা আপাত শেষ তারও যে পরিণাম সিদ্ধি থাকতে পারে—সে প্রশ্নের জবাব মিলবে না ডিউইর তত্ত্বদর্শনে। তার জন্য ফিরে যেতে হবে প্রাচ্যকবির অন্তর্দর্শনে, যার যুগোপযোগী প্রতিনিধি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

ছক

—সঙ্কর্ষণ রায়

শমিতার ঘুম ভেঙ্গেছে। ডানলোপিলোর নরম আরাম থেকে চোখ মেলে তাকায় সে দেয়ালঘড়ির দিকে। নতুন একটি দিনের সূচনা তার আগ্রহলেশহীন মনকে যেন স্পর্শ করতে পারে না। অন্য যে কোনও দিনের মত আর একটি দিন—গতানুগতিকতার ছকে বাঁধা। দিনের প্রথম আলো জানালার নীল পর্দায় পরিস্রুত হ'য়ে ঘরের আঁধারকে শুধু ফিকে ক'রে তোলে, যেন তারই মনের বিষণ্ণতার প্রতি-ফলন। জানালা থেকে পর্দার ঢাকা খুলে বাইরের অবারিত আলোকে স্বীকৃতি দেবার মত কোনও ঔৎসুক্য সে অনুভব করে না। তার কাছে যেন আঁধারই ভাল। দৈনন্দিন একঘেয়েমিকে প্রকাশ্য দিনের আলোয় প্রকট দেখতে সে চায় না।

কিন্তু তবু বিছানা ছেড়ে বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিনতার পুনরাবৃত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়। সকালে উঠে পরবে ব'লে ওয়ার্ডরোবে হলুদ রঙের শাড়িটা আলাদা ক'রে রেখেছে মানদা। তার সঙ্গে লাল বর্ডার দেওয়া ব্লাউজ। ড্রেসিং টেবিলে হাল্কা প্রভাতী প্রসাধনের আয়োজনও রয়েছে। পুরোণো ঝি মানদা। শমিতার দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি তার মুখস্থ। প্রাত্যহিক খুঁটিনাটিগুলি এক চুলও যাতে এদিক ওদিক না হয়, সেদিকে তার প্রখর দৃষ্টি।

বাথরুমে তোয়ালে, স্পঞ্জ, সাবান, অডিকোলোন ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই শমিতার স্নান করার অভ্যাস। তার এই অভ্যাসকে অনুসরণ ক'রে সে রাত্রে শুতে যাওয়ার আগেই সব ব্যবস্থা ক'রে রাখে মানদা। বাথরুমে ঢুকে কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। শমিতার এতে খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যতিক্রমহীন এই ত্রুটিহীনতা শমিতার মনের স্বীকৃতি যেন আর পায় না। খুশি হ'তে গিয়েও মনটা বিমুখ হয়। একটা সূক্ষ্ম ক্ষোভও যেন অনুভব করে সে। তার অভ্যাসের খাতের সীমা-বদ্ধতার মধ্যে তাকে আটকে রাখার জন্যই যেন নিখুঁত কর্তব্যপরায়ণতার ষড়যন্ত্র।

কিন্তু পরক্ষণে সে বুঝতে পারে যে অভ্যাসের ছকে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার জো নেই তার।

কেন এমন হ'ল সে ভেবে পায় না। জীবন মানেই কী নিজের জন্য নিজের মধ্যে কারাগার সৃষ্টি করা? অভ্যাস ও সংস্কার কী স্বচ্ছন্দ ও সহজ জীবনবোধের চেয়েও বড়?

অথচ তার মত স্বাধীন জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি কজন পায়। মা নেই—নির্বিরোধী ও নিরীহ বাপের একমাত্র সন্তান সে। বাবা নামকরা শিল্পপতি, ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট স্থানটা প্রায় অচলায়তনের মত। টাকার অভাব কাকে বলে সে জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হওয়ামাত্রই সে জেনেছে যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের স্বাধীনতা আছে তার। তার চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার নেই কোন বিরোধ। চাওয়ামাত্রই পাওয়াকে সে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে জেনে এসেছে।

কিন্তু তবু কোথা থেকে আসে গতানুগতিকতার বাঁধা পথে পদে পদে নিজের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করার বাধ্য-বাধকতা? সমাজ-সংসারের অনুশাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না ক'রেও পদে পদে কেন এই আত্ম-সঙ্কোচন?

ধারা-স্নানে নিজের সর্বাঙ্গ নিষিক্ত করতে করতে শমিতা ভাবে এই জলের ধারার মত অবাধ মুক্তিতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে না কেন? এতখানি মুক্তি সইবার ক্ষমতা কী নেই তার দেহের সীমার মধ্যে?

বোধ হয় নেই। নিজের ভেতরকার সঙ্কীর্ণ আপনের সঙ্গে আপোষ ক'রেই তার স্বস্তি।

কিন্তু মুক্তির কামনা থেকে মুক্তি কই ? শমিতা অনুভব করে, তার সত্তার অনু-পরমাণুর মধ্যে রয়েছে নিজের সীমাবদ্ধতার গণ্ডী অতিক্রম করার আকুতি। বাথরুমের আয়নায় প্রতিবিম্বিত তার শুভ্রসুন্দর রূপযৌবনকে তার ছকে বাঁধা সঙ্কীর্ণ জীবনবোধের সঙ্গে যেন মেলাতে পারে না। আকাশে বাতাসে যে অন্তহীন মুক্তি ছড়িয়ে আছে, সেই মুক্তির পরোয়ানা পেয়ে কোন অজ্ঞাত সুদূর সার্থকতার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেছে যেন এই নিরাবরণ সৌন্দর্য।

দেহের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রমের এই ব্যাকুলতাকে বসনের শাসনে বেঁধে রাখে শমিতা। সে জানে, এই গতির আবেগকে মুক্তি দিতে পারবে না সে—তার গতানুগতিক জীবনে সদর রাস্তায়।

নিস্ফল একটা কান্না শমিতার বুকের ভেতরে গুমরিয়ে ওঠে। নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার কামনা তার বাইশ বছরের যৌবনে ব্যথার মত বাজে। নিজেকে নিজের মধ্যে বেঁধে রাখার বেদনা দুঃসহ। কিন্তু কোথায় সেই দুঃসাহসী গ্রহণশীলতা, যেখানে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পারবে পূজার নৈবেদ্যের মত ?

সুরঞ্জনের কথা তার মনে পড়ল। তার জীবনের বাঁধা সড়ক দিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মত সে এসে পৌচেছে তার জীবনে শমিতার বাবা ভূপতির সম্মতি নিয়ে। সুরঞ্জনের অভ্রের খনিগুলোর সঙ্গে ভূপতির ব্যবসায়িক যোগ আছে। অভ্রের বাজার গরম থাকায় আদান প্রদানটা নিবিড় হ'য়েছে। সুরঞ্জন ও শমিতার মিলনের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যবসায়িক বৃত্তকে প্রসারিত করতে চান তিনি।

ভূপতির ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত না হ'লেও শমিতার সাংসারিক শুভ বুদ্ধি সুরঞ্জনকে তার জীবনে বরণ ক'রে নেবার প্রেরণা দিয়েছে। ভূপতির মত সেও বিশ্বাস করে যে সুরঞ্জনই তার যোগ্যতম জীবন-সঙ্গী। কিন্তু এই প্রত্যয় তার মনের গভীরে গিয়ে যেন ফিকে হ'য়ে যায়। ব্যবহারিক জীবনের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাকে সে চায়, হৃদয়ের গহনে প্রবেশের ছাড়পত্র তাকে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে সে। তার নিঃসঙ্গ আত্মার প্রতীক্ষার মধ্যে যার আগমনের পদধ্বনি স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে, শমিতা জানে যে সে সুরঞ্জন নয়। সে যে কে, তা' জানবার অবকাশ বুঝি কখনোই আসবে না তার জীবনে। তার হৃদয়ের আত্ম-নিবেদনের কুঁড়িটি পূর্ণ হ'য়ে ফুটবে না বুঝি কখনো।

উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে শমিতা প্রসাধনে রত হ'ল। ক্রীমের হাল্‌কা প্রলেপের ওপর পাউডারের সুগন্ধি চূর্ণ ছড়িয়ে দু'চোখে টেনে দিল কাজলের কাল রেখা। সকালে রুজ লিপষ্টিকের চড়া রঙ সে ব্যবহার করে না।

প্রসাধনের পর হলুদ রঙের শাড়ি পরল সে তার দেহের চম্পক গৌরবর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে। সকাল বেলায় নিজের আত্মস্বরূপকে সে অবারিত রাখতে চায় কৃত্রিম আবরণ ও আভরণে আচ্ছন্ন না ক'রে। কিন্তু তার এই চাওয়াটা প্রাত্যহিক অভ্যাসের প্রলেপে জীর্ণ হ'য়ে এসেছে—হাল্কা সাজসজ্জার ব্যতিক্রমও হ'য়ে পড়েছে বহু ব্যবহারে বৈচিত্র্যহীন।

সকাল আটটা বাজতেই শমিতা এল প্রাতরাশের টেবিলে। সেখানে আগে থেকেই এসে বসেছেন ভূপতি খবরের কাগজের ব্যবসা-বাণিজ্যের পাতায় নিজেকে আড়াল ক'রে। এম্নিকেই তিনি স্বল্পভাষী, প্রাতরাশের সময় স্টক্ এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার মার্কেটের বিচিত্র অঙ্কজালে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। শমিতার উপস্থিতি যেন টেরও পান না তিনি। শমিতার এগিয়ে দেওয়া ডিমের পেয়ালা ও পরিজের পাত্রটিতে আংশিকভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন মাত্র। শমিতা নিজে অবশ্য বিশেষ কিছু খায় না—একটি ডিম-সেদ্ধর সঙ্গে এক টুকরো মাখন দিয়ে সেঁকা রুটি—দু'কাপ চা সহযোগে।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে শেষ করলেন ভূপতি প্রাতরাশপর্ব। শমিতা তার দ্বিতীয় কাপ শেষ ক'রে ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছে উঠে দাঁড়াল। দুজনের মধ্যে যথারীতি কোনও কথাবার্তা হ'ল না। ভূপতি কলিং বেল টিপে তাঁর খাস বেয়ারাকে ডেকে বললেন ড্রাইভারকে গাড়ি আনতে বলতে। রোজ সকালে ঠিক সাড়ে আটটার সময় তিনি তাঁর অফিসে যান। তাঁর গাড়ি তাঁর বাড়ির গেট পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সকলে বুঝতে পারে যে সকাল ঠিক সাড়ে আটটা বাজল।

শমিতা বেরিয়ে এল বাড়ির সাম্নের ফুল বাগানে।

এখানেও প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাগা বুলোনো। বাগানে নানা রঙের ভিড়। দেশী ফুলের চেয়ে উগ্রবর্ণের বিদেশী ফুলের সমারোহ এখানে বেশি। ডালিয়া, হলিহক্‌স্‌, এ্যাস্টার, মেরিগোল্ডের বেডগুলি জ্যামিতিক ছকের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছে। দেশী টগর, বেল, যুঁই ও গন্ধরাজ একপাশে প'ড়ে আছে অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়। বিলিতি ফুলগুলির মত জাতে বাঁধা পড়েনি তারা। ওদের দিকে বাগানের মালিরাও বিশেষ নজর দেয় না। বিদেশী ফুলের বাহারের মধ্যেই তাদের ব্যস্ততার প্রতিযোগিতা। শমিতাকে দেখে মালিরা যথারীতি যত্নে তৈরি করা একটি ফুলের তোড়া উপহার দিল তাকে। গন্ধহীন কসমসের সঙ্গে মেলানো কয়েকটি গোলাপ মেহেদি পাতা দিয়ে ঘেরা। হাতে নিয়ে শমিতার মনে হ'ল, কাগজ বা প্লাস্টিকের ফুল হ'লেও ক্ষতি ছিল না। স্বাভাবিক ফোটা-ঝরা থেকে বিচ্ছিন্ন নিষ্প্রাণ কিছু রঙের মধ্যে মনের সৌন্দর্য পিপাসার বিকারের প্রতিফলন। তোড়াটি হাতে নিল সে শুধু অভ্যাসবশতঃ। ফিরিয়ে দিতে পারল না, মালিরা পাছে তার এই বিপরীত ব্যবহারে অবাক হ'য়ে যায়। যথাযথ নিয়মের শৃঙ্খলাবোধে ওরাও শৃঙ্খলিত। ঘড়ির কাঁটা ধ'রে ওরা কাজ করে। কাঁচি, জলের ঝারি, ঘাস কাটার কল ইত্যাদি নিয়ে তাদের যান্ত্রিক তৎপরতা জ্যামিতিক বৃত্ত, ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণে বেষ্টিত ফুলের গাছগুলিতে যে শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে, তার একচুল ব্যতিক্রমও তারা সইতে পারে না।

অভ্যস্ত নিস্পৃহতার সঙ্গে বাগানে ঘুরে বেড়াল শমিতা খানিকক্ষণ। তার মনে হ'ল, নিত্য ব্যবহারের জীর্ণতা যেন বাগানটাকেও আচ্ছন্ন করেছে। নানা রঙের বর্ণালি তার দু'চোখের বিস্ময়কে ডাক দিতে যেন ভুলে গেছে।

রোদ চড়া হয়ে গায়ে ফুটতে শমিতা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। বারান্দা পেরিয়ে এসে দেখল যে ভূপতির অফিসঘরের দরজা খোলা। দরজায় লাগানো ভারি পর্দা ভেদ ক'রে ভেতরে দৃষ্টি যায় না। ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। এ সময়ে অফিসঘর বন্ধ থাকার কথা। ভূপতি অফিসে যাওয়ার সময় নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিয়ে যান। চাবি তাঁর নিজের কাছেই থাকে। সকাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় ভূপতি বেরিয়ে যান। শমিতা মনেও করতে পারে না যে কখনো এর ব্যতিক্রম হ'য়েছে।

অন্য যে কোনও সকালের মত এ সকালটি বর্ণবৈচিত্র্যহীন হ'তে পারত, কিন্তু ভূপতির অফিসঘরের খোলা দরজা তার বিবর্ণতার গায়ে আঁচড় কাটল। শমিতার স্তিমিত মন চাঞ্চল্যে স্পন্দিত হয়। ভূপতির অফিস ঘরে সে কখনো ঢোকে নি, ঢোকবার আগ্রহও বোধ করে নি। কিন্তু আজ সে না ঢুকে পারল না। ভূপতি যে আত্মবিস্মৃত হ'য়েছেন, তার প্রমাণ সে স্বচক্ষে যাচাই করতে চায়।

কিন্তু অফিসঘরে ঢুকতেই তার গতি স্তম্ভিত হ'ল। পুরু ভারি কাশ্মীরী কার্পেটে তার পা দুটো এঁটে গেল—যেন কোনও চুম্বকশক্তির অতর্কিত আক্রমণে। অর্ধচক্রাকৃতি মেহগনির সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সাম্নে চেয়ারে বসে আছেন ভূপতি—কয়েকটি টাইপ করা কাগজের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে।

ভূপতি অফিসে যান নি। ঘটনাটা এমন কিছু নয়, কিন্তু শমিতার বাইশ বছরের জীবনে অভূতপূর্ব। তার মনে প'ড়ে গেল, তার মা যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও সকাল ঠিক সাড়ে আটটায় ভূপতিকে নিয়ে তাঁর শেভ্রোলে গাড়িটা বেরিয়ে গিয়েছিল মার শবদেহ নিয়ে বেরোবার মাত্র মিনিট দশেক আগে।

রুদ্ধশ্বাসে শমিতা ভূপতির দিকে চেয়ে থাকে দুর্নিবার বিস্ময়ে। ভূপতির ব্যবসা-বাণিজ্য সে বোঝে না, কিন্তু সে বুঝতে পারে যে হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে যে ভূপতির অনড় নিয়মানুবর্তিতাতেও চিড় ধরিয়েছে।

কোনও বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা তার স্বভাব নয়। কিন্তু আজ সে চুপ করে থাকতে পারল না। শমিতার উপস্থিতি কাগজপত্রে নিবিষ্ট ভূপতির চেতনাকে ছুঁতে পারে নি। কাজেই শমিতা একটু জোরেই ডাকল, বাবা।

ভূপতি চমকে উঠে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, শমিতা, কেন মা?

—তুমি আপিসে যাও নি যে—শরীর খারাপ হয় নি তো?

চোখ থেকে চশমা নামিয়ে ভূপতি বললেন, না, না

শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? অফিসে বেরোবো বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় জরুরি একটা চিঠি পেলাম সকালের ডাকে। অফিস যাওয়া বন্ধ করতে হ'ল।

শমিতা বললে, কিন্তু বাবা, তোমার অফিসের চিঠিপত্র কখনো তো বাড়ির ঠিকানায় আসতে দেখি নি।

—এই চিঠিটা বিশেষভাবে জরুরি ও গোপনীয় ব'লে সুরঞ্জনকে বলেছিলুম বাড়ির ঠিকানায় পাঠাতে। আর কারুর হাতে এটা পড়ে এ আমি চাই নি। ভাল কথা, সুরঞ্জন লিখেছে যে কাজকর্মে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় এখন তোকে চিঠি লিখতে পারছে না। পরে লিখবে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শমিতা বললে, বাবা, তোমাদের বিজনেস আমি বুঝি নে, বুঝতে চাইও নে। কিন্তু আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এমন কিছু ঘটেছে যা তোমাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। ব্যাপারটা কী আমাকে বলবে?

ভূপতি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন, না মা, তেমন কিছু নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ওঠা-নামা, পাঁচ রকম সমস্যা তো আছেই—তাদের নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও পারি নে। কিন্তু তাই ব'লে আমাদের ভাবনাচিন্তাটা অনর্থক তোর মধ্যে সংক্রামিত করতে চাই নে। এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে তোকে যাতে আদৌ কখনোই মাথা ঘামাতে না হয়, তার জন্য পাকা ব্যবস্থা তো শিগগিরই করছি। সত্যি মা, সুরঞ্জনের মত এমন ছেলে হয় না।

শমিতা নিরাসক্তভাবে বললে, বাবা, তুমি তো এখন রিটায়ার করলেই পার। উনিই না হয় সব কিছু দেখা-শোনা করবেন। তুমি তো বলেছিলে যে ওঁর অভ্রের খনি তোমার ব্যবসায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছে। দুদিকই সামলাতে এমন কিছু অসুবিধে হবে না ওঁর।

—ঠিক বলেছিস মা। এবারে কাজ থেকে আমার অবসর নেওয়া উচিত। সুরঞ্জন ওকথা আমাকে বলে। তবে ঠিক এখনি তা সম্ভব নয়। একটা বিজনেস্ কমিট-মেণ্ট রয়েছে, যা সামলাতে একা সুরঞ্জন পারবে না।

—কিন্তু বাবা তোমার প্রতিষ্ঠানে শুনেছি কাজকর্ম সব যন্ত্রের মত চলে ছক-বাঁধা রাস্তায়। এজন্য তোমার তো খুব সুনাম শুনেছি। সেদিন তোমাদের চেম্বার-অব-কমার্সের প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন যে মানুষকে মেশিন করে তুলতে তোমার মত দক্ষ কারিগর তামাম বিজ্‌নেস্ ওয়ার্ল্ড তল্লাস করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোমাদের এই বিজ্‌নেস্ ডিল্‌টাকে তোমার বাঁধা ছকের মধ্যে ফেলে দিতেই তো পার।

—না মা এটা সাধারণ বিজ্‌নেস্ ডিল্ নয়। এ রকম বড় এক্সপোর্টের ব্যাপার আগে কখনো আমাদের হাতে আসে নি।

—কিন্তু বাবা, আমি তো জানতাম তোমার হাতে মস্ত বড় বিজ্‌নেসের মেশিনারি—তার অসাধ্য কিছু নেই।

শমিতার মুখের ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে ভূপতি বললেন, বড় হ'লে আরও বড় ক'রে তুলতে হবে মা। তোর ও সুরঞ্জনের জন্য মস্ত বড় একটা ভবিষ্যৎ রেখে যেতে চাই।

শমিতা বললে, বাবা, তুমি তো চিরকাল বলে এসেছ, যা' অসাধ্য তার দিকে হাত বাড়াতে নেই।

ভূপতির কপালে সূক্ষ্ম কয়েকটি কুঞ্চনের রেখা ফুটে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, কিন্তু সুরঞ্জন তা বলে না। অসাধারণ ছেলেটার উচ্চাকাংখা—আমি হেন সাবধানী লোককেও ওর দলে টেনে নিয়েছে।

মনের মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভব করে শমিতা। গতানুগতিকতার পর্দা এক মুহূর্তের জন্য যেন সরে যায়। সে বললে, বাবা, তুমি কি পারবে সামলাতে?

ভূপতি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, পারব মা, পারব। সুরঞ্জন সব কিছু প্ল্যান ক'রে রেখেছে যে। ভয় নেই মা, ব্যাপারটাকে ছকে বেঁধে ফেলবার প্রায় সব ব্যবস্থাই ক'রে ফেলেছে সুরঞ্জন। আমি যে রকম ছকে অভ্যস্ত, তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক দুঃসাহসী হ'লেও অবাস্তব কিছু নয়। দেখিস মা, আমাদের এই বিজ্‌নেস্ ডিল্ সাক্‌সেস্‌ফুল হ'লে কত বড় একটা ছকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে পারব আমাদের ব্যবসাকে।

শমিতা আস্তে আস্তে বললে, আমার কিন্তু ভয় করছে বাবা।

মৃদু হেসে ভূপতি বললেন, বুঝতে পেরেছি মা। তোমার

বুড়ো বাপের কর্ম নয় তোকে অভয় দেওয়া। ঠিক আছে, কালই চল্ গিরিডি যাব। সেখানে উপযুক্ত লোকের কাছ থেকে অভয়মন্ত্র শুনবি।

ঈষৎ আরক্তমুখে শমিতা চুপ ক'রে থাকে।

ভূপতি বললেন, কী চুপ ক'রে রইলি কেন?

শমিতা বললে, এখন তো যাওয়ার কথা নয় বাবা। তুমি বলেছিলে মাসখানেক বাদে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে বেরোবে।

—হ্যাঁ সুরঞ্জনও তা' বলেছিল বটে। কিন্তু আমার যে এখনি একবার যাওয়া দরকার আমাদের এই বিজ্‌নেস্ ডিলের ব্যাপারে। সুরঞ্জনও তাই লিখেছে।

শমিতা নিস্পৃহভাবে বললে, তোমাদের কাজে তোমরা ব্যস্ত থাকবে—আমি গিয়ে কী করব! আমি বরং ম্যাণ্ডেভিল্ গার্ডেন্সে রুবি মাসির কাছে গিয়ে থাকি।

—না, না, তোকেও যেতে হ'বে। নইলে সুরঞ্জন দুঃখিত হ'বে। তা' ছাড়া তুই কাছে না থাকলে এত বড় একটা কাজ করবার মত মনের জোর পাব কোথা থেকে? কাজ আমাদের দিন কয়েকের মধ্যেই শেষ হ'য়ে যাবে মা।

—কিন্তু, বাবা, কালই কী ক'রে রওনা হ'বে? পরশু তোমাদের বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্সের মিটিং হওয়ার কথা ছিল না?

গম্ভীরমুখে ভূপতি বললেন, কথা ছিল, কিন্তু মুলতুবি রাখা হ'য়েছে। আমাদের এ কাজটা এই মিটিং-এর চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।

গিরিডির বার্গাণ্ডাতে অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়ায় সুরঞ্জনের বাড়ি। উশ্রী নদীটা বেশি দূরে নয়, কিন্তু বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে তার ক্ষীণ ধারা চোখে পড়ে না। সকাল বেলায় বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তাদের কলকাতার বাগানের সঙ্গে কোন পার্থক্য খুঁজে পেল না শমিতা। তেম্নি একই ছাঁচ—একই ছকে কাটা-ছাঁটা বিলিতি ফুলের গাছগুলির জ্যামিতিক শৃঙ্খলা। তেম্নি ফ্লক্সের নানা রঙের বর্ণালিকে ঘিরে ডালিয়ার রক্তিম বিকাশ—প্রাচীরের গায়ে সবুজ লতায় আইপোমিয়ার বেগুনি রঙের এলোমেলো আঁচড়। একই রুচি ও মেজাজের প্রতিফলন। পাঁচিলের বাইরে উশ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু নীচু কাঁকরে-ছাওয়া মাঠটি চোখে পড়ে না, কাজেই শমিতার মনে হয় সে যেন তাদের কলকাতার বাড়ির বাগানেই রয়েছে।

আশ্চর্য রকম ঐক্য, কিন্তু শমিতার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় না। যে বাঁধা ছাঁদের সঙ্গে সে পরিচিত, তার বাইরে কাউকে সে দেখে নি। সুরঞ্জনের মধ্যে সেই ছাঁচের ব্যতিক্রম সে প্রত্যাশা করে না।

নির্দিষ্ট যে পথ বেয়ে সুরঞ্জন তার জীবনে এসে পৌছতে উদ্যত, সে পথ যে তার দৈনন্দিন অস্তিত্বকে কোনও অজ্ঞাত সুদূরের পানে টেনে নিয়ে যাবে না, তা' সে জানে—কাজেই সুরঞ্জনের এই বাগানটিতে তাদের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাগানের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ ক'রে সে বিস্ময় বোধ করে না। তার পরিকল্পিত জীবনের মধ্যে এই বাগানটিও যেন অনায়াসে তার জায়গা ক'রে নিয়েছে।

বাগানে ঘুরতে ঘুরতে শমিতা বাড়ির পেছনদিকে এল। সাম্নের দিকের তুলনায় এ দিকটা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। এখানে সব্‌জির বাগানের সঙ্গে আছে কিছু দেশী ফুলগাছ। একটা বড় কনকচাঁপা গাছের নীচে ছোট একটা শ্বেত পাথরে বাঁধানো বেদী। সুরঞ্জনের আদরের কুকুর পপিকে এখানে গোর দেওয়া হ'য়েছে। বেদীর পাশে ল্যাম্প পোষ্ট, তাতে জোরালো আলো লাগানো। সারা রাত বেদীটি উদ্‌ভাসিত হ'য়ে থাকে। অদূরে লোহার জালে ঘেরা একটি ছোট ঘর। এখানে আগে ময়ূর রাখা হ'ত। এখন কী রাখা হয় শমিতা তা' জানে না। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার—ভেতরে কিছু আছে কি না বোঝার কোনও জো নেই।

বেলা বাড়ে। শ্রান্ত বোধ করে শমিতা। বাগানে সামান্য একটু হেঁটেই এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে কী ক'রে তা' সে ভেবে পায় না। হয়তো তার প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্ব বোধ আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে অবসাদবোধে।

বাড়ির মধ্যে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে ভেলভেটে-মোড়া কৌচে আধশোয়া হ'য়ে বসল শমিতা। ঘরটা দোতলার পেছন দিকে। জানালা দিয়ে দেখা যায় কনকচাঁপার কয়েকটি সোনারঙ ফুলের স্তবকের নীচে শাদা পাথরের বেদী। সদ্য দুটো ফুল পড়েছে সেখানে। সুরঞ্জনের আদরের কুকুর পপির কবর। পপিকে খুব ভালবাসত বুঝি সুরঞ্জন। তাকেও কী তেম্নি ভালবাসবে!

ভালবাসা! হাসি পেল শমিতার। যে বাঁধা ছাঁচে সে মানুষ, ভালবাসার মত হৃদয়বৃত্তির কী জায়গা আছে। স্বরঞ্জন ভালবাসার কথা মুখেও প্রকাশ করে নি কখনো। স্বরঞ্জনকে ভালবাসে কি না তা-ও ভেবে দেখে নি কখনো শমিতা। হৃদয়ক্ষেত্রে যাচাই করে নি তাকে তার জীবনে গ্রহণ করার প্রস্তুতিকে। তার জীবনের বাঁধা সড়ক দিয়ে সে অনিবার্যভাবে এসে পৌঁচেছে।

কৌচে ব'সে নিস্পৃহভাবে স্বরঞ্জনের কথা ভাবে শমিতা। কাজের মানুষ স্বরঞ্জন। অনেকটা ভূপতির মতোই। গিরিডি রেল স্টেশনে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য সে উপস্থিত ছিল, এবং যথারীতি ভূপতির সঙ্গে অর্ডার ও সাপ্লাইয়ের জটিল তর্কে বিভোর হয়ে প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল তার উপস্থিতি। একটি কথাও বলে নি সে তার সঙ্গে—এমন কি চায়ের টেবিলেও না। প্রাতরাশের পর ভূপতিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে সে জরুরি কাজে। এই বিরাট বাড়িতে শমিতার একাকী অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সে। কিন্তু তার জন্য মনের মধ্যে কোনও ক্ষোভ নেই শমিতার। তাদের ভাবী মিলিত জীবনে এম্নি নিঃসঙ্গতাকে যে স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে হ'বে তা' সে জানে।

বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে মনের ভেতরকার শূন্যতাবোধকে প্রসারিত ক'রে দেয় শমিতা পাঁচিলের বাইরে প্রায় নিস্তৃণ খোয়াইয়ের বিস্তারে। তপ্ত বাতাস ধূলির ওড়না উড়িয়ে দীর্ঘশ্বাসের মত বইতে থাকে, যেন ঐ অবারিত রুক্ষ প্রান্তরের বুকের ভেতরকার চাপা হাহাকার কে আকাশের পানে পৌছে দিতে চায়। রোদে পোড়া বিবর্ণ ধোঁয়াটে-আকাশে উড়ছে একটি মাত্র চিল তার একলা মনের একক অস্তিত্বের প্রতিবিম্বের মত।

বাগানে আমগাছগুলির ছায়া হ্রস্বতম হ'য়ে এসেছে। বেলা দুপুর। পাঁচিলের বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে ডালে লাল ফুলগুলি যেন রুদ্রের রক্তচক্ষুর মত জলছে। এবারের মত বসন্ত গত। কিন্তু এল কখন—যে যাবে! শমিতার হৃদয়ে তার আবির্ভাবের কোনও চিহ্ন নেই। তার কাছে এটা একটা ঋতু মাত্র, সময়ের চাকায় বাঁধা কয়েকটি দিন, আর কিছু নয়।

স্বরঞ্জনের খাস-খানসামা এসে সেলাম দিয়ে বললে, লাঞ্চ তৈরি মেমসাহেব।

শমিতা প্রশ্ন করলে, সাহেবরা কী এনে গেছেন?

খানসামা জবাব দিল, না, আসেন নি। তাঁরা খবর পাঠিয়েছেন যে বাইরেই তাঁরা লাঞ্চ খাবেন। জরুরি কাজে তাঁরা আটকা পড়েছেন।

জরুরি কাজ! এর ওপর আর কোন কথা নেই। গোটা পৃথিবীটাই কাজের মানুষের পদানত, সে তো সামান্য নারী। জরুরি কাজের কাছে বলিপ্রদত্ত হ'য়ে আছে তার নগণ্য অস্তিত্ব। অগণিত অবহেলিত মেয়েদের মধ্যে সে-ও একজন।

তার স্মৃতির কুজ্ঝটিকার মধ্যে সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে আর একটি নারীর মর্মবেদনা। ভূপতির জরুরি কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তুচ্ছ ছিল তার সত্তা। সে তার মা। মার চাপা কান্না তার শিশুমনে দাগ কেটেছিল। মনে পড়ে তাঁর বিনিদ্র রাত জাগা জানালার ধারে ব'সে।

ভূপতির ব্যবসায়ের অগ্রগতিতে সেই কান্না কোন দাগ কাটে নি। টাকা-আনা-পাইয়ের ব্যাল্যান্স শিটগুলি যে একটি নারীর চোখের জলে লেখা হয়েছে, তা' কেউ স্বীকার করবে না।

বড় ডাইনিং-টেবিলের ক্ষুদ্র একটি অংশে শমিতার খাওয়ার আয়োজন করা হ'য়েছে। বাকিটা টেবিল ক্লথের শুভ্র শূন্যতা। রুচিহীন আহার—অনেকটা খানসামার পরিবেশনের রীতিবন্ধনকে মেনে নেবার তাগিদে। খাওয়া যেন ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়, প্রাত্যহিক একটা অভ্যাস-মাত্র।

পুরোণো বর্মী সেগুন কাঠের টেবিল, খাবারের ঘরে বহুকাল ধ'রে অধিষ্ঠিত আছে বোধ হয়। গৃহপ্রবেশের দিনে আর সব কিছুর সঙ্গে সম্ভবতঃ এই টেবিলটাও এ ঘরে ঢোকানো হ'য়েছে। এ বাড়ির অচলায়তনের মধ্যে এরও যেন অচল প্রতিষ্ঠা।

খেতে খেতে শমিতার মনে হ'ল শমিতার মাও বুঝি এখানে খেতে বসতেন এম্নি একা। প্লেটের ওপর আহার্য-গুলি অবসন্নভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে শমিতার মনে হ'ল যেন তারই মত আর একটি নিঃসঙ্গতা এই ঘরের দেয়ালে মিশে আছে।

সুরঞ্জনের বাবাও কাজের মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখে সকলেরই মনে হ'ত যেন মানুষের জন্য কাজ নয়, কাজের জন্যই মানুষ। কাজের পরিধির বাইরে মন দেবার অবসর ছিল না তাঁর। তাঁর দৈনন্দিতার বাইরে যে অতল নিঃসঙ্গতা বিপুল শূন্যতাবোধকে বহন করছে, তার খবর তাঁর কাছে পৌঁছাতো কিনা সন্দেহ। সুরঞ্জনের জন্ম মুহূর্তে তার মায়ের ক্ষীণ অস্তিত্বের অবসান হ'ল। অবসান হ'ল যেন একটা বোবা নিষ্ফল অন্তর্দাহের।

সুরঞ্জনও কাজের মানুষ। সে তার বাপেরই ছেলে। তার মায়ের দুর্বল আত্মা তাকে যেন স্পর্শও করে নি।

ছুরি দিয়ে পুডিং-এর বাদামি চকোলেটের আবরণ বিশ্লিষ্ট করতে করতে শমিতা অনুভব করল সুরঞ্জনের মায়ের বিদেহী আত্মা যেন তার মধ্যে আবার বেঁচে উঠতে চায় সুরঞ্জনের মধ্যে তার মৃত পিতার সেই নির্মম ঔদাসীন্যে আবার ক্ষতবিক্ষত হ'বার জন্য।

কিন্তু নিষ্ফল বেদনা বিলাসে আত্মনিপীড়নের উপযোগী নমনীয়তা আছে কী শমিতার হৃদয়ে!

খাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে বিলিতি কয়েকটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসল শমিতা। ঘড়িতে মোটে দেড়টা বেজেছে। সময়ের গতির মন্থরতাকে বিস্মৃত হ'বার চেষ্টা করে সে রোমহর্ষক সত্য ঘটনায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে।

কিন্তু এম্নি ক'রে দশ মিনিটও কাটে না। ম্যাগাজিন-গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। অকস্মাৎ তীব্র-ভাবে তার ভাবী জীবনের অন্তহীন শূন্যতা তাকে আক্রমণ করল। যতদূর দৃষ্টি চলে শুকনো দগ্ধ মরুভূমির অন্তহীন বিস্তার। কী করবে সে এই জীবন নিয়ে, কী দিয়ে ভ'রে তুলবে সে ভেবে পায় না।

বিকেলে চায়ের টেবিলে সুরঞ্জন ও ভূপতি উপস্থিত ছিলেন। দুপুরে খাবার টেবিলে তাঁদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করলেন না কেউ। সুরঞ্জন মাপা হাসি হেসে বললে, আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে শমিতা বললে, না, অসুবিধা কী আর। আপনার খানসামা-বাবুর্চিরা খুব এফিশিয়েন্ট।

—এফিশিয়েন্ট হ'বে না! খাস সাহেব বাড়ির ট্রেনিং রয়েছে ওদের।

শমিতা কিছু বললে না। নিঃশব্দে ভূপতি ও সুরঞ্জনের দিকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল।

ভূপতি চুরুট ধরিয়ে বললেন, এ তো ওর নিজেরই বাড়ি। সুবিধে অসুবিধে যাই হোক, সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে ওর মানিয়ে না নিলে চলবে কেন।

ভূপতির কথাগুলি শমিতার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। নির্বিকারভাবে নিজের চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরঞ্জন বললে, দেখুন মিস হালদার, আমার নতুন মডেলের ফিয়াট গাড়িটা আপনার জন্যই কিনে রেখে-ছিলাম। ওটা আমি ব্যবহারই করি নে। আপনার ইচ্ছে করলে ওটা নিয়ে অনায়াসে বেরোতে পারেন। ড্রাইভার শোভনলালকে ঐ গাড়িটার জন্যই বহাল করেছি।

ভূপতি চুরুটে বড়োরকম একটা টান দিয়ে বললেন, দেখ সুরঞ্জন, মা আমার বেড়াতে টেড়াতে বিশেষ ভালবাসে না। ও ওর মায়ের মতোই হোম-মাইণ্ডেড্।

সুরঞ্জন বললে, আমার মাও তাই ছিলেন—আমার বাবার কাছে শুনেছি।

ভূপতি বললেন, ভাল কথা সুরঞ্জন, সেই যে মাসখানেক ছুটি নিয়ে নানা জায়গায় বেড়াবে প্ল্যান করেছিলে, তা' নিশ্চয়ই ভোল নি।

—না, না, ভুল কেন? ছুটি অর্জনের জন্যই তো উদয়াস্ত খেটে যাচ্ছি।

ভূপতি বললেন, আমি ভাবছিলাম কী—আমাদের কাজটা শেষ হওয়ামাত্র তোমাদের বিয়ে দেব।

সুরঞ্জন মুখ নীচু ক'রে বললে, কাজটা আগে সফল হোক, তারপর না হয়—

ভূপতি জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই সফল হ'বে। তোমার উদ্যম ও অধ্যবসায় কী বিফল হ'তে পারে কখনো!

সুরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তিস্‌রি থেকে নৌসের আলির আসার সময় হ'য়েছে—আমার একবার কারখানায় যাওয়া দরকার। মালটা নির্বিঘ্নে নিয়ে আসতে পারল কিনা দেখতে হ'বে। আপনিও কী আসবেন নাকি?

ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভূপতি বললেন, নিশ্চয়ই।

ভূপতি ও সুরঞ্জন চ'লে যাওয়ার পরও শমিতা চায়ের টেবিলে ব'সে রইল।

ভূপতি ও সুরঞ্জনের কথোপকথন তার মনে বিন্দুমাত্রও দাগ কাটতে পারে নি। সে বুঝতে পারে যে স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলি সে ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে। সুরঞ্জনের সাধ্য কী যে তার হৃদয়ের অসাড়তার বর্ম ভেদ করে!

কিন্তু ঔদাসীন্যবোধের মধ্যে কোথায় তার ঈপ্সিত সান্ত্বনা! সুরঞ্জন যে তার চেয়েও উদাসীন, এই অপ্রিয় সত্যটিকে উপেক্ষা করবে সে কী ক'রে! সুরঞ্জনের আছে কর্মজগৎ, কিন্তু তার কী আছে!

নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে শমিতা। বাড়ির বেয়ারাদের একজনকে ডেকে সে ব'লে দিল যে তার শরীর খারাপ—তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়।

সন্ধ্যার আলো-ছায়ার সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে রাত্রি এল। আলো-না-জ্বলা ঘরটিকে মিলিয়ে দিল বাইরের সঙ্গে আঁধারের স্রোতে। খাট, ড্রেসিং টেবিল ও অন্যান্য আসবাব-সুদ্ধ সমস্ত ঘরটা ক্রমশঃ মুছে যায়। বিছানার নরম আরাম থেকে সে যেন নির্বাসিত হয় অন্তহীন নিরালম্ব অন্ধকারের মধ্যে। তার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব যেন এই আঁধারের বিপুলতার মধ্যে লুপ্ত হচ্ছে। তার শ্রান্ত স্নায়ুগুলোতে তন্দ্রার ঘোর লাগে।

গভীর রাত্রে শমিতা বিছানায় উঠে বসল। যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগেছে। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে দেয়াল-ঘড়ির কাঁটাগুলি শুধু জেগে আছে রেডিয়মের ঔজ্জ্বল্যে। আর কিছু নেই। ঘরের বোবা আঁধার যেন বিরাট একটা বুকফাটা আর্তনাদ তার গলার কাছে এসে আটকে যায়। কোন মতে সে উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে। তারপর বেরিয়ে এল ঘরের সংলগ্ন বারান্দায়।

বাড়ির পেছন দিকের বাগানে একটি মাত্র আলো জ্বলছে পপির শ্বেত পাথরে বাঁধানো কবরটিকে উদ্ভাসিত করে আকাশ মাটি জোড়া নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে একটি মাত্র আলোক বিন্দু যেন প্রলয়ের অবশেষের মত জেগে আছে। শমিতা আঁধার ছেড়ে এই আলোর দিকেই তাকায় তার আঁধারলীন সত্তার গভীরে আলোর মধ্যে জেগে ওটার উগ্র সাধের এক মূহূর্তের প্রেরণায়।

আলোর বৃত্তটির দিকে তাকাতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কেঁপে ওঠে শমিতার বুকের ভেতরটা। ঐ আলো যেন তার সমস্ত চৈতন্যে এসে ঘা দিল। এই আলোর তরঙ্গ বেয়ে সে যেন তার একলা আপনের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসার প্রেরণা পেল।

তার আঁধার-ঘেরা মনকে রাঙিয়ে দিতে এসেছে কী প্রথম জাগরণের উষা?

মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে শমিতা। আলোর কেন্দ্রে ল্যাম্প পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি বলিষ্ঠ গড়নের যুবক। একটা মোটা বাঁধানো বই খুলে তন্ময় হ'য়ে পড়ছে সেই আলোয়। আগুনের মত উজ্জ্বল চেহারা, সৌম্য মুখের কান্তি। শমিতার মনে হ'ল এমনটি তার বাইশ বছরের জীবনে কখনো দেখে নি।

কে এ সে জানে না। সুরঞ্জনের অভ্রের খনি বা কারখানায় কাজ করে, এমন কেউ হবে হয়তো। আউট হাউসে থাকে সম্ভবতঃ। সেখান থেকে এই দূরে ল্যাম্প পোস্টের আলোর নীচে এসে দাঁড়িয়ে বই পড়ার সঙ্গত কোনও কারণ অনুমান করতে পারে না শমিতা। তার মনে হ'ল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। তার গতানুগতিক জীবন বৃত্তের চারপাশের বেড়া সরে গিয়ে এ কোন পরমাশ্চর্য—আত্ম প্রকাশ করেছে!

ওকে ঘিরে আলো। তার চার পাশে আঁধার। এই অন্ধকার ডিঙ্গিয়ে ঐ আলোয় যাবার শক্তি কী তার আছে!

কিছুক্ষণ বাদে যুবকটি বই বন্ধ ক'রে ল্যাম্প পোস্টের তলা থেকে স'রে এল অন্ধকারের মধ্যে। কোথায় কোন্ দিকে গেল সে, বুঝতে পারল না শমিতা।

শূন্য আলোর বৃত্ত শুধু যেন চারপাশের অন্ধকারকে মাপতে থাকে। শমিতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার ভেতরকার সুপ্ত আত্মার এক আশ্চর্য জাগরণের স্পন্দন অনুভব করে।

পরদিন খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠল শমিতা। এত ভোরে সে জীবনে কখনো ওঠে নি।

তারপর স্নান করল। রোজকার মত অডিকোলোন, বাথ সল্ট, গডরেজ সাবান সুগন্ধি স্নানের বিলাসের পরিবর্তে ঠাণ্ডা জলে স্নিগ্ধ শীতল অবগাহন। দেহটাকে শুচিস্মিত ক'রে তোলার এক অভূতপূর্ব প্রেরণা তার অঙ্গে অঙ্গে বাঁশির সুরের মত বাজে।

স্নানের পর ড্রেসিং টেবিলের সাম্নে এসে দাঁড়াল শমিতা। তার অনাবৃত যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ মালার মধ্যে নিজেকে যেন নূতন করে আবিষ্কার করল সে নিজের মধ্যে এক আশ্চর্য সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে। দেহের মধ্যে দেহের সীমা অতিক্রমের অপূর্ব প্রেরণা কোন সুদূর থেকে এসে পৌঁছেছে!

লাল পাড় দেওয়া শাদা শাড়িতে তনু দেহটি আবৃত্ত করল শমিতা। মুখের ঢলঢলে লাবণ্যকে কৃত্রিম প্রসাধন প্রলিপ্ত না করে দু' চোখে আঁকল শুধু কাজলের রেখা। কপালে আকল একটি কুঙ্কুম টিপ বাঁকা দুটি ভুরুর সঙ্গমে। তারপর বেরিয়ে এল সে বাগানে।

বাগানে তখনো মালিরা কাজ করতে আসে নি। ভোরের প্রথম রোদের তুলি ফুলের বাগানে বিচিত্র সব ছবি এঁকে চলেছে। শমিতার মনে হ'ল আকাশ থেকে নেমে আসা খুশির খবরের উচ্ছ্বাস ফলে ফলে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। পরিচিত এক ঘেয়ে বাগানটা যেন তার আবরণ খুলে ভেতরকার সত্য পরিচয়কে উদঘাটিত করে দিয়েছে।

পুলকিতচিত্তে শমিতা আবিষ্কার করে নতুন রঙ, নতুন আলো। সবই মনে হয় বিস্ময়কর। অকারণ খুশিতে বাগানময় ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়ায় সে।

ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পেছন দিকে এল সে। ল্যাম্প পোস্টের নীচে শ্বেত পাথরের বেদী। আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আলোর বৃত্তটির পরিবর্তে ভোরের স্নিগ্ধ রোদের প্লাবন। কিন্তু এত আলোর মধ্যেও বিশেষ একটি আলোর স্মৃতি তার মনের মধ্যে গাঁথা থাকে। এ যেন এক চিরন্তন আলো, যা দিয়ে সে জালিয়ে রাখতে পারবে তার প্রাণের প্রদীপটিকে।

কেউ কোথাও নেই। অদূরে জালে ঘেরা ঘরটির ভেতরে শূন্যগর্ভ অন্ধকার। অল্প অল্প বাতাস বইছে চাঁপা গাছের পাতাগুলিকে দুলিয়ে। কিসের প্রত্যাশায় শমিতার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। বাতাসে শুকনো পাতাগুলো উল্টে পাল্টে সূক্ষ্ম শব্দের তরঙ্গ তোলে।

বুড়ো দারোয়ান নয়বৎ সিং তার রাতের প্রহরার কাজ সেরে ঘরে ফিরছিল, চাঁপাগাছের তলায় শমিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। প্রসাধনহীনা শমিতাকে প্রথমে যেন সে চিনতে পারে না, তারপর তার সুপুষ্ট পাকা গোঁফের নীচে ফুটে ওঠে প্রসন্ন হাসি। ভাঙ্গা বাংলায় সে বললে, বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি মা?

এ বাড়ির সাহেবিয়ানা বুঝি বুড়ো দারোয়ানটির কাছে সুস্পষ্ট নয়, তাই 'মেমসাহেব' ব'লে না ডেকে শমিতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছে। কিন্তু শমিতার কানে ভারি মিষ্টি লাগল এ ডাক। ভোরের পাখির কাকলির সঙ্গে যেন এ ডাকের মিল আছে।

কিন্তু নয়বৎ সিং এর প্রশ্নে সে বিব্রত বোধ করে। ভোরের আলোর মতই স্বচ্ছ বুড়োর চোখের দৃষ্টি তবু তার দৃষ্টির সাম্নে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে সে।

মুখ নীচু করে পায়ের কাছে ঘাসের চাপড়ার মধ্যে উদ্ভিদতত্ত্বে মন দিয়ে শমিতা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বেড়াতে বেরিয়েছি। বেশ লাগছে। ভারি চমৎকার বাগান—বিশেষ ক'রে এদিকটা।

নয়বৎ খুশি হ'য়ে বললে, ঠিক বলেছ মা। বাগানের এদিকটাই ভাল। এদিকে সব দেশী ফুলের গাছ। সাম্নের দিকটাতে তো খালি বিলিতি ফুলের বাহার—দেখে মনে হয় যেন কাগজ কেটে ফুল গড়া হয়েছে।

শমিতা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, আচ্ছা নয়বৎ, এই ঘরটাতে দুটো ময়ূর থাকত না। তাদের দেখতে পাচ্ছি নে কেন?

—তারা তো মরে গেছে কদিন আগে। দুটো এক সঙ্গেই মরল কী একটা মড়কে। এখন এ ঘরটাতে ময়ূর নয় মানুষ থাকে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শমিতা ব'লে উঠল, মানুষ থাকে এখানে।

নয়বৎ হেসে ফেলে বললে, থাকে বই কি মা, বেশ আরামেই থাকে। তুমি ভাবছ এখানে থাকাটা খুব কষ্টের, কিন্তু যে থাকে সে তা' ভাবে না। দুঃখী মানুষ, যেমন হোক একটা আস্তানা পেলেই খুশি।

শমিতা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে, কে এখানে থাকে নয়বৎ?

—সে এক ভদ্রলোক, বড় গরীব। আমাদের মত দীন দুঃখী হ'লেও লোকটা কিন্তু খুব বিদ্বান। এই ল্যাম্প পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে রাত জেগে পড়াশুনা করে। ঐ ঘরে আলোর বন্দোবস্ত নেই কিনা।

দুঃসহ আবেগে উথাল পাথাল হয় শমিতার হৃদয়। একটা বিস্ময়কর বিপ্লব যেন তার মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে শমিতা বললে, তিনি বোধহয় ঐ ঘরেই আছেন এখন ?

নয়বৎ বললে, না মা। ভোর ঠিক ছটার সময় শোভনবাবু সাহেবের অভ্রের কারখানায় চ'লে যান। ছেটে বাছাই-করা অভ্রের পাতগুলির হিসেব রাখেন তিনি। ফেরেন রাত প্রায় আটটায়।

—রাত আটটায়! এতক্ষণ উনি ঐ কারখানাতেই কাজ করেন নাকি!

—হ্যাঁ মা। এখন ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে। বিলেতে অনেক অভ্র চালান যাবে শুনেছি এ মাসের শেষে।

শমিতা চুপ ক'রে রইল। আরও অনেক প্রশ্ন তার মনের মধ্যে কলরব ক'রে উঠলেও সে আত্মসংবরণ করে। মনের কৌতূহলকে বল্গা ছাড়া ক'রে নয়বতের মনে কোনও রকম অসঙ্গত কৌতূহল উদ্রেক করতে সে চায় না।

নয়বৎ চ'লে গেল। চাঁপা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা চাপা কান্নায় ভার নিয়ে। সে জানত তার সব কান্না ম'রে গেছে। কিন্তু কোন্ গোপন উৎস থেকে অশ্রুর ধারা বইতে শুরু করল? স্থায়ী হিমরেখার ওপর-কার বরফ যেন গলছে আবহাওয়ার কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণে।

রোদের তেজ বাড়ে। সুস্পষ্ট দিনের আলো। কিন্তু রাতের মোহিনী মায়া এই চড়া রোদকেও আচ্ছন্ন ক'রে।

উর্দিপরা বেয়ারা এসে সেলাম ক'রে বললে, ব্রেকফাস্ট তৈরি মেমসাহেব। সাহেবরা টেবিলে হাজির আছেন।

সুরঞ্জন ও ভূপতি শমিতার বিলম্বের জন্য অধৈর্য হ'য়ে উঠেছেন। খাবার টেবিলে শমিতার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন, এই ব্যতিক্রম বুঝি তাঁদের সয় না।

প্রসাধনহীনা শমিতা খাবার ঘরে ঢুকতেই দু'জনেই চমকে উঠলেন। সুরঞ্জনের অসন্তোষ প্রকাশ পেল তার কুঞ্চিত জ্রভঙ্গিতে।

ভূপতি শমিতার মুখের পানে সন্ধানী দৃষ্টি হেনে বললেন, তোমার কী শরীর খারাপ হ'য়েছে মা ?

নত মুখে রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে শমিতা বললে, না।

—তবে ?

—তবে কী ?

—ঠিকমত সাজ পোষাক না ক'রে খাবার টেবিলে এসেছ। এমন তো কখনো হয় নি তোমার।

শমিতা চুপ ক'রে থাকে নিজের চারপাশে গাম্ভীর্যের আবরণ টেনে।

ভূপতি বললেন, এ তো ভাল নয় মা।

শমিতা তবু চুপ।

—সুরঞ্জন, আমার মনে হয় আমাদের কাজকর্মের সঙ্গে শমিতার কিছু যোগ থাকা উচিত। সারাদিন যে ওর কিছুই করার নেই, এ ভাল নয় ওর পক্ষে।

সুরঞ্জন গম্ভীর মুখে বললে, কিন্তু আমাদের বিজ্‌নেসে কী উনি ইন্টারেস্ট পাবেন ?

ভূপতি জোরালোভাবে বললেন, নিশ্চয়ই পাবে। এ বিজ্‌নেস্ কী শুধু আমাদের নাকি? ওরও তো। শমিতা মা, তৈরি হ'য়ে নাও—আজ, সুরঞ্জনের অভ্রের কারখানায় তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে।

সুরঞ্জন বললে, আমাদের ঝামেলাগুলো সব চুকে যাক, তারপর না হয় উনি যাবেন। আজকালের মধ্যে পুরো মাল এসে পৌঁছবে—কাজের এই অতিরিক্ত চাপও কমে গিয়ে স্বাভাবিক গতিতে সব চলবে। এখনকার এই ফিভারিশ স্পীড কী উনি সইতে পারবেন ?

—কেন পারবে না? সুরঞ্জন, ব্যবসা মানেই তো ঝামেলা। ফিভারিশ স্পীড না হ'লে বিজ্‌নেসের প্রসার সম্ভব নয়। এ সব তো তোমারই কথা। আমি চাই শমি সব কিছুই দেখুক, বোঝবার চেষ্টা করুক। ও যদি আমাদের ব্যবসা বুঝতে পারে, আমাদেরও বুঝতে পারবে।

ক্ষীণ স্বরে শমিতা বললে, কী দরকার বাবা! তোমরা বোঝাতে চাইলেই কী আর বুঝতে পারব!

সুরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললে, ব্যবসা বুঝতে না পারুন, তার নেশাটা হয়তো বুঝবেন। ব্যবসাতে নেশাই হ'ল আসল মশলা।

কারখানায় একটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে শমিতাকে বসিয়ে সুরঞ্জন বললে, এ ঘরে ব'সে আমি কাজ চালাই।

কারখানায় যারা কাজ করে, সোজাসুজি তাদের সংস্পর্শে আসার দরকার হয় না আমার। তারা আমার মাস্টার-রোলের খাতায় কতগুলো অঙ্কমাত্র।

শমিতা বললে, আমাকে আপনার কারখানাটা দেখাবেন বলেছিলেন। এ ঘরে ব'সেই কী দেখা যাবে।

—এ ঘরে ব'সেই তো আমি দেখি। ঐ মোটা বাঁধানো লেজার, রেজিস্টার, ষ্টক্ বুক, ক্যাশ বুক, ফাইল, রকমারি ভাউচারের তাড়া—এই তো আমার অভ্রের খনি ও কারখানা। এখান থেকে কদাচিৎ বেরোই আমি। বেরোলে সব গুলিয়ে যায়। যে লোকগুলো কাজ করছে তারাও যে মানুষ এই সত্যের মুখোমুখী হতে হয়। হাজিরা বইয়ের সংখ্যাগুলির মধ্যে তারা আর বাঁধা থাকে না।

—এই ঘরে বসেই সব কাজ চালান! আশ্চর্য ক্ষমতা আপনার স্বীকার করতে হবে।

ঈষৎ হেসে সুরঞ্জন বললে, আশ্চর্য ক্ষমতা কি না জানি নে, কিন্তু কিছুটা দূরদৃষ্টি ও সাধারণ বুদ্ধি যে আছে তা স্বীকার করি।

—আচ্ছা আপনাদের এই অসাধারণ বিজ্‌নেস ডিলের ব্যাপারটা কী বলবেন? একটানা চল্লিশ বছর ধ'রে সাউণ্ড বিজ্‌নেসে অভিজ্ঞ হ'লেও বাবাকে দেখছি এতে যেন খানিকটা বেসামাল হ'য়েছেন।

গম্ভীরমুখে সুরঞ্জন বললে, বেসামাল নয়, তবে খানিকটা ভাবিত। কারণ এত বড় একটা এক্সপোর্টের দায়িত্ব কখনো তিনি নেন নি। আমেরিকার একটা ফার্ম থেকে অভ্রের একটা বিরাট অর্ডার জোগাড় করেছি আমরা। আমার অভ্রের খনি থেকে যত অভ্র এক বছরে বের করা হয়, অর্ডারের পরিমাণটা তার চেয়ে অনেক বেশি। এক সঙ্গে এত বড় অর্ডার অভ্রের পয়লা নম্বর ব্যবসায়ীদেরও হাতে আসে না কখনো। তা' ছাড়া এত অল্প মেয়াদের সাপ্লাইয়ের ঝুঁকি নিতে কেউ চায় না। আপনার বাবাও নিতে চান নি। আমার আগ্রহেই রাজি হয়েছেন অর্ডারটা নিতে। নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আমার উচ্চাকাংখাটা একটু বেশি। আমি চাই আমাদের বিজ্‌নেসের বেশ বড়ো রকম প্রসার।

ভূপতি ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছিলেন। সুরঞ্জন থামতেই তিনি বললেন, আমিও কী চাই নে? তবে আমার চাওয়াটার মূল গাঁথা রয়েছে তোমাদের দু'জনের ভবিষ্যতের মধ্যে।

শমিতা গলার স্বরটা তরল করবার চেষ্টা ক'রে বললে, আচ্ছা বাবা, মিস্টার লাহিড়ী যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন তুমি ঘাবড়ে যাও কেন বল তো?

ভূপতি একটু হেসে বললেন, বয়সের দোষ মা। সুরঞ্জনের তাজা গরম রক্ত তো আমার গায়ে নেই, কাজেই মাঝে মাঝে নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। তবে সুরঞ্জন যেমন নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা—

এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। ভূপতি তাঁর বাক্য স্রোতে ব্রেক কষলেন।

সুরঞ্জন গম্ভীর গলায় হাক দিল, ভেতরে এস।

দরজা খুলে গেল।

গত রাত্রির আলোর বৃত্তটি হঠাৎ শমিতার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে⋯দরজার ফ্রেমে আঁটা একটা ছবি যেন—পেছনে ধূসর পটভূমিকা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শোভন। দূর থেকে যাকে দেখেছে ল্যাম্পপোস্টের নীচে নিরবচ্ছিন্ন আঁধারের কেন্দ্রে তিমিরবিদারী একটি অভ্যুদয়ের মত, কাছে থেকে সে তার দু'চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

শমিতা নিষ্পলক চেয়ে থাকে। তার ভেতরকার সুপ্ত আত্মা যেন ঘুম ভেঙ্গে তার দু'চোখ বেয়ে বেরিয়ে আসে এক জ্যোতির্ময় আহ্বানের আকর্ষণে।

শোভন সুরঞ্জনকে বললে, এই মাত্র তিস্‌রি থেকে খবর এসেছে যে বাকি মাল জোগাড় করা হয়েছে। কিন্তু নৌসের আলির আস্তানা পর্যন্ত তা আনতে অসুবিধে হচ্ছে।

সুরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠে প্রশ্ন করলে, অসুবিধে! কিসের অসুবিধে!

—তা' জানায় নি নৌসের আলি। তবে সে জানিয়েছে যে অসুবিধে কাটিয়ে উঠতে তার কষ্ট হ'বে না।

ভুরু কুঁচকে ঝাঁজালো স্বরে সুরঞ্জন বললে, স্পষ্ট ক'রে অসুবিধের কথাটা জানালেই তো পারত।

ভূপতি বললেন, সুরঞ্জন তোমার এই নৌসের আলিটি একটি নেপোলীয়ান বিশেষ—অসম্ভব শব্দটি এর অভিধানে

লেখে না। কাজেই তোমার দুশ্চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ দেখছি না।

শোভনকে উদ্দেশ্য ক'রে সুরঞ্জন বলল, কবে নাগাদ বাকি মালটা এখানে এসে পৌঁছবে তার আভাস কী দিয়েছে নৌসের আলি?

শোভন বললে, হ্যাঁ। সে জানিয়েছে যে কাল সন্ধ্যার আগেই এসে যাবে—সে নিজেই নিয়ে আসবে।

সুরঞ্জন ভূপতিকে বললে, দেখেছেন তো, কত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় মাল জোগাড় করা হ'ল; এদিকে কারখানায় ড্রেসিং ও সর্টিং এর কাজ যে রকম এগোচ্ছে, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমরা পুরো মাল কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে। নির্দিষ্ট মেয়াদের অনেক আগেই পুরো মাল পৌঁছে যাবে ডেট্রয়েতে।

শোভন-সুরঞ্জন-ভূপতির কথোপকথনের এক বর্ণও শমিতার কানে যায় নি। সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে শুধু অনুভব করেছে শোভনের উপস্থিতি। আলোর ঝর্ণা-তলায় চলছে যেন তার আত্মার অবগাহন।

শমিতার নির্নিমেষে চেয়ে থাকা শোভনের দৃষ্টি এড়ায় না।

শোভনের চোখের কাল তারা দুটির গভীরে তার অলজ্জ দৃষ্টির প্রত্যুত্তর খুঁজতে গিয়ে যেন অতলে তলিয়ে যায় শমিতা। বুকের ভেতরটা তার কেঁপে ওঠে।

সুরঞ্জন শোভনকে বললে, তুমি এবারে যেতে পার। চেষ্টা কর যাতে মাইকা ড্রেসিং-এর কাজের গতি আরও বাড়ানো যায়।

শোভন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভূপতি বললেন, সুরঞ্জন, তোমার সব কিছুই ভাল, কিন্তু তোমার কারখানার কাজের জন্য এই লোকটিকে নির্বাচন করা মোটেই প্রশংসা করতে পারছি না। এর স্থান যেখানেই হোক, এখানে নয়।

মুচকি হেসে সুরঞ্জন বললে, সময় এলে একেও কাজে লাগানো যাবে।

ভূপতিকে উদ্দেশ্য ক'রে শমিতা বললে, বাবা, আমি বাড়ি যাব।

সুরঞ্জন বললে, হ্যাঁ, সেই ভাল। আমাদের এখন অনেক কাজ। নৌসের আলি অভয় দিলেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকা যায় না।

সেদিন সুরঞ্জন ও ভূপতি মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বাড়িতে ফিরলেন না। বিকেলে চায়ের টেবিলেও তাঁরা অনুপস্থিত রইলেন। রাত্রিবেলায় যখন নৈশ ভোজের আয়োজন হচ্ছে, সুরঞ্জনের অফিসের বেয়ারা এসে শমিতাকে খবর দিল যে সুরঞ্জন ও ভূপতি জরুরি কাজে গিরিডির বাইরে চলে গেছেন—পরদিন সকালের আগে ফেরার সম্ভাবনা নেই।

শমিতা প্রশ্ন করল, কোথায় গেছেন?

বেয়ারাটা জবাব দিল—তা' জানি নে। কাউকে কিছু বলেন নি।

কোন মতে খাওয়া শেষ ক'রে বাইরে এসে দাঁড়াল শমিতা।

বাগানে ইউকালিপ্‌টাস গাছের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছায়াগুলি প্রসারিত হ'য়ে একাকার হ'য়েছে।

ঝাউয়ের পাতাগুলিতে মৃদু বিষণ্ণ মর্মরধ্বনি তুলে বাতাস বইছে।

শমিতার সারা দিন কেটেছে স্বপ্নঘোরের মধ্যে। দৈনন্দিন ছকের বাইরে বাস্তব-অবাস্তবের সীমানায় নিজের হারানো পরিচয়কে যেন পুনরুদ্ধার করেছে ধুলোর আবরণ সরিয়ে। কিন্তু একে তার জীবনে স্বীকৃতি দেবার মত সাহস কোথায়? এতদিন ছিল, একলা আপনার ঢাকনার আড়ালে নিজেকে অবগুণ্ঠিত ক'রে—আজ নিজের সীমানার বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান এসেছে।

বিধান বাঁধা জীবনের রীতিবন্ধনকে মেনে নির্বিঘ্নে ছিল তার একক অস্তিত্ব। কিন্তু আজ সকল বেড়ার বাইরে বাঁধা পথের চিহ্ন মোছা বিপুল সুদূরের সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় শমিতার। ভয় পায় সে। আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। দারোয়ান নয়বং সিং তখনো তার ডিউটি শুরু করে নি। সমস্ত বাড়ি জোড়া বিপুল শূন্যতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। তার পংক্তিহারা আত্মা যেন অভ্যস্ত বাসা ছেড়ে অজ্ঞাত সুদূরের পানে যাত্রা করেছে।

গাঢ় অন্ধকার আকাশের মত নিঃসীম। শমিতা সইতে পারে না এই নিঃসীমতার গুরুভার। দৌড়ে চ'লে এল সে তার ঘরে। সে ভাবল বাইরের অসীম শূন্যতাকে আটকে রাখবে বুঝি ঘরের চার দেওয়াল। কিন্তু সে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দেওয়ালের আড়াল যেন স'রে গেল। তার প্রাচীর ঘেরা নির্দিষ্ট আবাসখানি যেন মিলিয়ে গেল সুদূর দিগন্তে। ভর করার মত নিভর যেন স'রে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে। খাটে পাতা গদি মোড়া শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েও মনে হ'ল সে শূন্যে ভাসছে। তার দেহের রক্তকণিকাগুলিতে সুনির্দিষ্ট কক্ষ থেকে বিচ্যুত নক্ষত্রের লক্ষ্যহীন সুদূরের পানে উধাও হওয়ার দুর্দম বাসনা যেন আবর্তিত হয়।

ঘরের সঙ্গে বাইরের কোন তফাৎ রইলনা তার কাছে। সে আবার বেরিয়ে আসে বাইরে। বাড়ির পেছন দিকের বাগানে ল্যাম্প পোস্টের নীচে আলোর বৃত্তটি লক্ষ্য করে হাঁটে। বাঁধানো মোটা একটা বই খুলে ব'সে আছে সেখানে শোভন। চারপাশে সীমাহীন আঁধারের মাঝখানে এই এক বিন্দু আলো শমিতাকে যেন ভরসা দিল, দিল অভয়।

শমিতার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায় শোভন। শমিতার এই আকস্মিক উপস্থিতি তার কাছে প্রত্যাশাতীত হ'লেও এই অভাবনীয়ের জন্য সে প্রস্তুত নয় তা প্রকাশ পেল না তার আচরণে। শমিতার আনত দু'চোখের ভীরুতা ডুবে গেল অতলান্ত সমুদ্রগভীর দৃষ্টির অতলে। কিন্তু তাতে ভয় পেল না সে। কালো দুটি চোখের নীরব চাহনিতে যেন অভয় মন্ত্র বেজে উঠল।

শমিতা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, আপনি বোধহয় আমাকে চেনেন না। ভূপতি হালদারের মেয়ে আমি। আমার নাম শমিতা। বাড়ির ভেতর একা একা আমার ভয় করছিল। তাই বেরিয়ে এলাম বাইরে।

শোভন মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, ঘরের মধ্যে ভয়, আর ঘরের বাইরেই অভয়!

কথাগুলি যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত শমিতার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তুলল। শোভনের মুখের পানে তাকাল সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে। এক পলকের চাহনির মধ্যে নিজেকে যেন উজাড় করে দিল।

অবলম্বন শূন্য ভয়ের মধ্যে দানা বাঁধল অভয়মন্ত্র।

মুখ নীচু করে শমিতা বললে, বাড়িটা এত বড়—একা থাকলে মনে হয় যেন ভুতুড়ে বাড়ি।

শোভন হাসতে হাসতে বললে, এত বড় বাড়ি করা সুরঞ্জনবাবুর পক্ষে নিশ্চয়ই অন্যায় হ'য়েছে।

শমিতা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, অন্যায় কেন?

—আপনাকে একা একা থাকতে হচ্ছে সেই জন্যেই অন্যায়। সুরঞ্জনবাবুকে তো প্রায়ই এমনি বাইরে বেরোতে হয়।

—প্রায়ই বেরোতে হবে কেন? বাবাকে তো দেখেছি অফিসে কাজের চাপ যত থাক, রাত বারোটার আগেই বাড়িতে ফিরে এসেছেন। সারারাত বাইরে থেকেছেন এমন তো হয় নি কখনো।

—সুরঞ্জনবাবুর মত উচ্চাকাংখী হয়তো নন তিনি।

—উচ্চাকাংখা থাকলেই কী রাত্রিবেলায় বাইরে ঘুরে বেড়াতে হবে?

—দিনের আলোয় সব কাজ করা যায় না বলেই রাতের আঁধারে গা ঢাকার প্রয়োজন হয়।

শমিতা অস্ফুট আতস্বরে ব'লে উঠল, তেমনি কোন কাজে ওঁরা হাত দিয়েছেন না কি?

শোভন গম্ভীর মুখে বললে, তাই তো মনে হয়? অতখানি অভ্র চালান দিতে হবে—সুরঞ্জনবাবুর খনি থেকে তিন বছরেও তা' পাওয়া যাবে না। কাজেই রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তা যোগাড় করতে হচ্ছে।

স্তম্ভিত শমিতা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শোভন বললে, অবশ্য কাজ প্রায় হাসিল হয়ে এসেছে। নৌসের আলির তৎপরতা খুবই প্রশংসনীয়।

কাছে এগিয়ে এসে শমিতা বললে, আপনার কাছেও?

শোভন হেসে ফেলে বললে, আমার কাছেও নিশ্চয়। নৌসের আলির মত তৎপর হ'তে পারলে এই বিজনেস্ ডিলে আমারও কিছু অংশ থাকত।

—তা' হ'লে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন কেন? ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেই তো পারতেন।

—মনের মধ্যে উচ্চাকাংখার তাগিদ নেই যে আদৌ। তা' ছাড়া রোজ রাতে পড়াশুনা করি।

—কী এমন পড়া যে একরাত্রি না পড়লেই নয়? আমার তো বই পড়তে মাথা ধরে।

—আমারও ধরে। এই সব জটিল অঙ্কের ফর্মুলা বুঝতে আমার মস্তিস্ক কম পীড়িত বোধ করে না। কিন্তু এ এক আশ্চর্য নেশা। এই সব ফর্মুলা আমাকে আমার ক্ষুদ্র সীমানার বাইরে অনায়াসে টেনে নিয়ে আসে। সম্প্রতি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছি—সময়ের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডকে মিলিয়ে মহাশূন্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছি। আমার ছোটখাট সুখদুঃখের মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্বের মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে।

শোভনের মুখের পানে নিবিড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে শমিতা বললে, আপনার ভয় করে না?

শোভন অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে, ভয় কিসের?

—জানা শোনার সীমা ছাড়িয়ে আসার ভয়।

—কই না তো।

শমিতা কম্পিত স্বরে বললে, কিন্তু আমার যে ভয় করে। এই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, যেন আমার ছকবাঁধা নিশ্চিন্ত জীবনের সীমানার বাইরে আকাশের মত ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছি। এখানে যেন নির্ভর করার মত শক্ত মাটি নেই পায়ের নীচে।

ব'লে সে ঘন হয়ে দাঁড়াল শোভনের বুকের কাছে। কী একটা প্রত্যাশা তার দু চোখের মণিতে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি মুহূর্তের স্তব্ধতার পর শোভন বললে, ভেতরে চলুন শমিতা দেবী। দারোয়ান নয়বৎ সিং যত উদার প্রকৃতির লোক হোক না কেন, এত রাত্রে আপনাকে এখানে দেখে ব্যাপারটা সহজভাবে নেবে না সে।

কম্পিতস্বরে শমিতা বললে, আপনি যদি নিয়ে যান, তা' হ'লে যাব। নইলে এখান থেকে এক পাও নড়ি, সে' সাধ্য নেই আমার।

শোভনের মুখের পেশীগুলো হঠাৎ শক্ত হ'য়ে ওঠে বুকের মধ্যে উদ্বেলিত দুঃসহ আবেগকে সংবরণ করার চেষ্টায়। অবশেষে অস্ফুট স্বরে সে বললে, বেশ, চলুন।

বাড়ির দোতলার ড্রইং রুমে এসে শোভন বললে, আমি বরং এখানে ব'সে থাকি। আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। ভয় নেই, আমি সজাগই থাকব।

শমিতা হঠাৎ তার দু'হাত দিয়ে শোভনের একটি হাত চেপে ধ'রে বললে, তুমিও চল।

শোভনের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কোনমতে সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

শমিতার দু'চোখে আগুনের দাহ। নিঃশ্বাস চেপে সে জবাব দিল, আমার ঘরে।

তারপর আর কোন কথা নয়। বাক্যের অতীত আবেগ ঘনীভূত হ'য়ে থাকে ঘরের মধ্যে। দুজনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ঘরের ভেতরকার নৈঃশব্দকে যেন মাপতে থাকে।

হঠাৎ চারপাশের স্বপ্নিল নীরবতাকে চিরে ফেলে মোটরগাড়ির যান্ত্রিক শব্দ। তারপর স্পষ্ট শোনা গেল সুরঞ্জনের গলার স্বর। সে উত্তেজিতকণ্ঠে দারোয়ান নয়বৎ সিংকে ডাকছে।

চাপা ত্রাস ফুটে ওঠে শমিতার কণ্ঠে, ঐ ওরা এসে গেছেন—এক্ষুণি হয়তো এখানে এসে পড়বেন। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়, চল পালাই।

আপনাকে চেনার লগ্ন এসেছে বুঝি নিজের আট-পৌরে পরিচয়ের ঢাকনা খুলে। শমিতার কুমারীমন উদ্‌ঘাটিত হল লজ্জার কুহেলিকা থেকে আকাশের মত বিপুল পৌরুষের আবাহনে। বসনের শাসন থেকে যৌবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস বেয়ে বেরিয়ে এল চরম আত্মনিবেদন দুঃসাহসী গ্রহণশীলতার তীরে। শমিতার ক্ষুদ্র সত্তা তার শরীরের বেড়ার বাইরে পেল নিজের নতুন পরিচয়ের অভয় স্বাদ। এতদিন সে একের মধ্যে ছিল একঘরে, শোভন তাকে বেঁধে ফেলল দুয়ের গ্রন্থিতে দুজনের মাঝখানকার সীমারেখাটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে। তার অপাবৃত রূপের ওপর স্পর্শের তুলি বুলিয়ে তাকে যেন নতুন ক'রে সৃষ্টি করল। অবশেষে চরম সার্থকতাবোধ—শরীর মনকে ছেয়ে, একটা স্থায়ী স্বর্গীয় সুখানুভূতি পেল যে—সে ধন্য, সে পূর্ণ।

শোভনের কানে কানে শমিতা বললে, আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে চিনতে না, আমি চিনতুম না তোমাকে—এটা কী করে সম্ভব হ'ল বল তো?

শোভন বললে, আমাদের দুজনের চেনার মাঝখানে সেতু বাঁধার আনন্দ পাব ব'লেই এই না চেনার ভান ছিল।

—ভান!

—ভান ছাড়া কী! মনে হয় না কী চিরকালের চেনা আমাদের?

পরদিন সকালে তার সামনে এসে দাঁড়াল ড্রেসিং গ্রাউন পরা সুরঞ্জন।

থমকে দাঁড়াল শোভন শক্ত ঋজু ভঙ্গীতে। তার সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা নজর বুলিয়ে সুরঞ্জন বললে, এতক্ষণ তোমাকে খুঁজছিলাম। বলা বাহুল্য ঠিক জায়গাতে খোঁজা হয় নি। শোন, তোমাকে এখনি তিস্‌রি যেতে হবে গাড়ি তৈরি আছে।

সুরঞ্জনের মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি হেনে শোভন বললে, না আমি যেতে পারব না।

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সুরঞ্জন বললে, যেতে পারবে না মানে! আমি যখন হুকুম দিচ্ছি, যেতে তুমি বাধ্য।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শোভন স্থির গম্ভীর গলায় বললে, আমি আপনার চাকরি থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। আপনার হুকুমমত কোথাও যাবার বাধ্য-বাধকতা এর পর আর থাকে না।

সুরঞ্জন পাথরের মত জমাট বাঁধা গলায় বললে, যেতে তোমাকে হবেই। যেতে না চাও, জোর ক'রে পাঠানো হ'বে। নৌসের আলি ও তার সাকরেদ জাহির খাঁ হাজির আছে এখানে। এ তল্লাটে যে ওদের নামকরা গুণ্ডা হিসাবে সুখ্যাতি আছে, তা' নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়।

এরপর আর কোন কথা বললে না শোভন। কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মত নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে সুরঞ্জনের চোখে চোখ রেখে। তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়।

সেদিন প্রাতরাশের টেবিলে শমিতার মুখের ওপর সন্ধানী দৃষ্টি হেনে সুরঞ্জন বললে, কাল রাতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি তো? আমাদের ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল—জরুরি কাজে আটকা পড়েছিলাম।

হঠাৎ টেবিল ক্লথের নক্সাগুলির মধ্যে সূচি-শিল্পের নৈপুণ্য পরখ করার ঝোঁক চাপল শমিতার। কোন জবাব দিল না সে।

মনের মধ্যে অগ্নিদাহকে সংহত ক'রে নিয়ে মুখে কষ্ট-কৃত হাসি ফুটিয়ে তুলে সুরঞ্জন বললে, রাত্রে একা একা আপনার ভয় করে নি?

মুখ নীচু ক'রে শমিতা জবাব দিলে, না ভয় কিসের। কোলকাতার বাড়িতেও প্রায়ই আমাকে একা কাটাতে হয়।

ভূপতি বললেন, আর না মা—আর তার দরকার হ'বে না। আমাদের জরুরি কাজ শেষ হয়েছে। সুরঞ্জন তার সাধনায় পুরোপুরি সিদ্ধি লাভ করেছে। এবারে নিভাবনায় আমাদের বিজ্‌নেসকে প্রায় তিনগুণ বাড়াতে পারব, কী বল সুরঞ্জন?

সুরঞ্জন শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, নিশ্চয়ই। অভ্রের এই কন্‌সাইন্‌মেণ্ট্‌টা চালান হ'য়ে যাওয়ার পর গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সার্টিফিকেট অব্ এ্যাপ্রুভাল পেতে আর অসুবিধা হ'বে না। তারপর অন্ততঃ পক্ষে চারটে ভাল অভ্রের খনি আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

ভূপতি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, আর দেরি নয় সুরঞ্জন, আমাদের ফার্ম দুটিকে মিলিয়ে দিয়ে জয়েণ্ট সিণ্ডিকেট করে ফেলা যাক। হাঁ ভাল কথা, সেই সঙ্গে তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থাও করতে হ'বে।

শমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমার শরীরটা ভাল লাগছেনা বাবা। আমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে চাই। সুরঞ্জন বাবু, দুপুরে খাবারের টেবিলে উপস্থিত থাকতে পারবনা বোধ হয়—আমাকে মাপ করতে হ'বে।

সুরঞ্জন বললে, খানসামাকে ব'লে দেব আপনার খাবার ট্রেতে ক'রে আপনার ঘরেই পৌছে দেবে। কিন্তু রাত্রিবেলার ডিনার টেবিলে আপনার উপস্থিত থাকা চাই—কয়েক জনকে নেমন্তন্ন করেছি—মাইকা মাইনিং বিজ্‌নেসের বড় বড় ম্যাগনেটদের।

ভূপতি গম্ভীর গলায় বললেন, নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকবে। সুরঞ্জনের এই সাফল্যের জন্য এই ভোজের ব্যবস্থা—শমিতা হাজির না থাকলে চলবে কেন?

শমিতা কিছু বলল না। নিজের ঘরে এসে দরজায় খিল দিল।

মন তার অশান্ত অস্থির। নিজের চারপাশের সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে যেন সে।

তার মনে হ'ল এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত্তও সে টি'কতে পারবে না। নিজের সীমানার বাইরে নিজেকে তুলে ধরার আবেগে নিজের সীমাবদ্ধতার দুঃসহ যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে। তার সমস্ত সত্তায় বেদনার মত বাজে নিজের চারপাশের বেড়া ভেঙ্গে নিজেকে মুক্ত করার সুতীব্র আকুতিটি।

হঠাৎ শোভনের ওপর তীব্র অভিমানে তার মন ভ'রে ওঠে। তার নিজেকে উজাড় ক'রে দেওয়াকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েও কেন সে তাকে কিছু না ব'লে চ'লে গেল? তাকে তার জীবনে পুরোপুরি গ্রহণ করার সাহস কী তার নেই! তবে কেন দুঃসাহসী হ'য়ে উঠেছিল তার গ্রহণশীলতা? দেওয়া-নেওয়ার সেই মিলন কী পুরোপুরি সত্য হ'য়ে ওঠেনি তার মধ্যে? তার বলিষ্ঠ আশ্লেষে যে অভয় মন্ত্র শমিতার সমস্ত দেহ মনে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাও কী মিথ্যা?

পেছন দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল শমিতা। ল্যাম্প-পোস্টের নীচে কয়েকটি বিবর্ণ চাঁপা ফুল প'ড়ে আছে। ঈষৎ তপ্ত বাতাস মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠছে—পাচিল ঘেঁষা আমগাছের নীচে শুকনো পাতার স্তূপে। অদূরে রোদে ঝলসানো মাঠে ধোঁয়া হ'য়ে বেরিয়ে আসছে মাটির ভেতরকার সব রস। বাইরের ঐ দাহের মধ্যে শমিতা যেন নিজের অন্তর্জ্বালাকে প্রত্যক্ষ ক'রে। কেউ কোথাও নেই। এমন নির্জন এমন বিষণ্ণ দুপুর যেন শমিতার জীবনে কখনো আসে নি।

সেদিন রাত্রে একটি জমকালো নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিল সুরঞ্জন। আহার্য্য ও পানীয়ের এত বৈচিত্র্য গিরিডি শহরে নাকি অভূতপূর্ব। যেন আরব্যোপন্যাসের একটি রজনী ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বইয়ের পাতা থেকে।

ভেনিস থেকে আনানো দুর্লভ ফুলদানি, রূপার ঝক্‌ঝকে ছুরি কাঁটা চামচ, দুর্ম্মূল্য কাঁচও পোর্সিলেনের সমারোহ যেন টেবিল ক্লথের শুভ্রতার পটভূমিকায় আঁকা চোখ-ঝলসানো একটি ছবি। অতিথিরা চমৎকৃত। সুরঞ্জন ও ভূপতি খুশিতে প্রদীপ্ত। একমাত্র নিষ্প্রভ শমিতা। এই টেবিলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সাজ-সজ্জা করলেও তার মনের বিষাদ তার প্রসাধন ভেদ ক'রে প্রকট হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করে না। সুরঞ্জনও না। অভ্রের কারবারে তার অসাধারণ সাফল্য নিয়ে উত্তেজিত আলোচনার আবর্তে সবাই তলিয়ে গেছে। নিমন্ত্রিত মহিলারাও তাতে অংশ নিয়েছেন। একমাত্র শমিতা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, সুদূর।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শমিতা দেখল যে রাত দশটা বেজেছে। হয়তো এতক্ষণে শোভন এসেছে ল্যাম্পপোস্টের নীচে। আজও কী আপেক্ষিক তত্ত্বের বইটি আছে তার সঙ্গে? তেম্নি নির্লিপ্তভাবে সময় ও ব্রহ্মাণ্ডের সমন্বয়কে অঙ্ক কষে বোঝবার চেষ্টা করছে! ল্যাম্পপোস্টের নীচে আলোর বৃত্তের মধ্যে তারই জন্য হয়তো একটি আশ্চর্য প্রতীক্ষা চলছে। সেই প্রতীক্ষা যেন বাইরের সমস্ত আঁধার ছেয়ে আছে।

তার চারপাশের এই মিথ্যা আলোর আবরণ স'রে গেলে যেন এই প্রতীক্ষা তার বুকের মধ্যে এসে মিশবে।

অনেক রাত্রে পার্টি থেকে মুক্তি পেল শমিতা। নিজের ঘরে সে আর ঢুকলো না, খিড়কির দরজা খুলে পেছন দিকের বাগানে বেরিয়ে এল।

ল্যাম্পপোস্টের নীচে আলোর বৃত্তটি শূন্য। কেউ নেই সেখানে। চারপাশে ঝিল্লীঝঙ্কৃত স্তব্ধতা।

শমিতা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশের আঁধার যেন ব্লটিং কাগজের মত তার মনের সব আবেগ ও অনুভূতিগুলিকে শুষে নিল। অবশিষ্ট রইল শুধু একটা বোবা শূন্যতা-বোধ। সাম্নের ঐ ফাঁকা আলোর বৃত্তটি যেন তারই ফাঁকা মনের প্রতিফলন।

টহল দিতে দিতে দারোয়ান নয়বৎ সিং শমিতাকে দেখে তার সাম্নে এসে দাঁড়াল। শমিতা তাকে দেখেও যেন দেখল না।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে নয়বৎ বললে, মা, তোমার একটা চিঠি আছে।

শমিতার প্রস্তরীভূত সত্তা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত জেগে উঠল।

কার চিঠি!—আর্তস্বরে সে বলে উঠল।

একটা ভাঁজকরা ময়লা হলদে রঙের কাগজ তার হাতে দিয়ে নয়বৎ সিং বললে, শোভনবাবুর। তাঁকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে। ফাঁড়িতে জেলের মধ্যে আটকে রেখেছে। খবর পেয়ে আমি গিয়েছিলাম। দারোগা-বাবুকে পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছি। তিনি এই চিঠিটা লিখে বললেন, আপনাকে দিতে। চিঠি লেখার জন্য কাগজ কলম জোগাড় করতেও আমাকে কিছু খর্চা করতে হয়েছে।

নয়বতেব কথা শুনে শমিতা কাঠ হ'য়ে গেল। যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশ্বাস নিতে তার পাঁজরগুলো যেন টন্ টন্ ক'রে ওঠে।

রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, পুলিশে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে কেন? কী করেছেন তিনি!

নয়বৎ গম্ভীর মুখে জবাব দিল, আমাদের সাহেবকে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এস, পি, সাহেব তাঁর বন্ধু, উপরন্তু কয়েক কয়েক হাজার টাকা তাঁর ট্যাঁকে গুঁজে দিয়েছিলেন—কাজেই তাঁর বদলে শোভনবাবুকে ধরা হ'ল। একজন কাউকে না ধরলে পুলিসের মানরক্ষা হ'ত না। অতখানি অভ্র চুরি, সেই সঙ্গে একজন মানুষ খুন—একেবারে চোখ বুঁজে থাকলে ওপরওয়ালারা এস. পি. সাহেবের ওপর নারাজ হ'তেন।

চিঠিটা নিয়ে বাড়ির ভেতরে চ'লে যেতে উদ্যত হ'ল শমিতা। তাকে অনুসরণ ক'রে নয়বৎ বললে, মা শোভন-বাবুকে বাঁচাও তুমি। নির্দোষ তিনি। নয়বতের আকুতি শমিতার বুকের মধ্যে যেন তীরের মত এসে বিঁধল। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না সে।

নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে শোভনের চিঠিটা পড়ল শমিতা। একবার, দুবার, অনেকবার।

শোভন লিখেছে, সুরঞ্জনবাবুর উচ্চাকাংখার বলি হয়েছি আমি। এখন বুঝতে পেরেছি যে এটা পূর্ব-পরিকল্পিত। যে অভ্র চালান দেবার দায়িত্ব সুরঞ্জনবাবু ও আপনার বাবা নিয়েছিলেন, তার অধিকাংশ চুরি ক'রে সংগ্রহ করা হ'য়েছে। এ কাজের ভার পড়েছিল গিরিডির নামকরা গুণ্ডা নৌসের আলি ও তার সাকরেদ জাহির খাঁর ওপর। এ ধরণের কাজে তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিস্‌রি থেকে কিছু দূরে খড়্‌গদিহাতে এই সব চোরাই মাল রাখার জন্য একটি গুদাম করা হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য জানত, সব মাল আসছে সুরঞ্জনবাবুর অভ্রের খনি থেকে। এই কাজে অনেক লোক লাগানো হয়েছিল। তারা তিস্‌রি চাকাই ও বামদার আশেপাশে মাইকা বেল্টের অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে রাতের আঁধারে গা ঢেকে কাজ করত। এম্নি তৎপর ছিল তারা যে, তাদের কেউ ধরতে পারত না। নির্বিঘ্নেই কাজ চলছিল, কিন্তু একটা লোকের অসাবধানতার জন্য শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হ'ল না। লোকটা মাহেস্‌রির দিক থেকে অভ্র কেটে নিয়ে আসছিল, সেখানকার অভ্রের খনির একজন পাহারাদার তাকে আট্‌কেছিল। পাহারাদারটি তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লোকটার সড়কির ঘায়ে সে ঘায়েল হ'ল। এরপর ব্যাপারটা চাপা রইল না। অতখানি অভ্র চুরি তার ওপর একটা লোক খুন। সুরঞ্জনবাবু পুলিশের বড়কর্তা থেকে শুরু ক'রে সবচেয়ে নীচের ধাপের কনস্টেবল পর্যন্ত সবাইকে মোটা টাকা ঘুষ দিলেন। (তাদের রাজি করালেন তাঁর বদলে আমাকে গ্রেপ্তার করতে) তারপর পুলিশ চোরাই অভ্র সংগ্রহ ও খুনের আসামী হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি করল না। আজ খুব ভোরে সুরঞ্জনবাবু ধ'রে বেঁধে আমাকে খড়্‌গদি-হাতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পুলিশ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আমি গিয়ে পৌঁছাতেই তারা আমাকে গ্রেপ্তার করল। গিরিডির থানার লক্ আপের অন্ধকূপে আমাকে আটকে রেখেছে ওরা। আমার বইগুলোও আমার সঙ্গে আনতে দেয় নি। আমার নিত্য সঙ্গী অপেক্ষিক তত্ত্বের বইখানা ওরা ছিঁড়ে ফেলেছে। আর সব বই ও আমার লেখার খাতাগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদ করার চেষ্টায় আকাশের মত প্রসারিত জীবন বোধের অধিকারী হয়েছিলাম। ওরা তা খর্ব করে দিতে বদ্ধপরিকর। আলো বাতাসের স্পর্শবর্জিত ঘরের মধ্যে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে আমার জীবনদর্শন।

:—তোমাকে সব কিছু লিখলাম। কারণ আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে তুমি আমাকে মুক্ত করবার

চেষ্টা করবে মিথ্যার আবরণ সরিয়ে সত্যের ওপর আলোক সম্পাত ক'রে। তুমি আমার কাছে এসেছিলে তোমার সীমানার বাঁধন থেকে মুক্তির কামনা নিয়ে। আজ তোমার কাছে আমার আবেদন, মুক্ত করো আমাকে আমার চারপাশের অন্যায়ের পাঁচিল ভেঙ্গে। তোমার মুক্তির মিলন হোক আমার মুক্তির মধ্যে। সকল বন্ধন ভেঙ্গে এক স্রোতে ভাসব আমরা দুজনে।

চিঠিটার প্রত্যেকটি শব্দ গাঁথা হয়ে যায় শমিতার বুকের মধ্যে। শোভন একান্তভাবে ডেকেছে তাকে তার অভ্যস্ত জীবনবৃত্তের বাইরে। তার চারপাশের বেড়া নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে তার কাছে যেতে আহ্বান জানিয়েছে।

শমিতা বুঝল যে, দুঃসাহসী গ্রহণশীলতা তার লজ্জার খাঁচা পেরিয়ে ব্যক্ত ও মুক্ত হবার কামনাকে বরণ করেছিল, তা' আজ এসেছে বলিষ্ঠ দাবীর রূপ নিয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে দ্বিধাহীনচিত্তে স্বর মেলাতে পারছে না কেন সে?

হঠাৎ শমিতার মনে হল, শোভনের জন্য নিজের সীমানা পেরিয়ে আসার শক্তি বুঝি তার নেই।

তার ছক্ বাঁধা জীবনের খাঁচাটির দুর্লঙ্ঘ্যতা স্পষ্ট হ'ল তার কাছে। সুরঞ্জনের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে শোভনকে মুক্ত করার দুঃসাহসে নিজের অভ্যস্ত দৈনন্দিতায় বিপ্লব হেনে নিজেকে কক্ষচ্যুত করতে চায় না সে। একমাত্র শোভনের জন্য সব ছাড়ার প্রস্তুতি তার মধ্যে নেই।

তবে কিসের প্রেরণায় নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল শোভনের মনে এই সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে, তার সঙ্কটলগ্নে শমিতা তার কাছে ছুটে আসবে সব বাধা ডিঙ্গিয়ে, সীমানা ভেঙ্গে?

অনেক বিশ্লেষণ ক'রেও প্রশ্নটির কোন সদুত্তর স্পষ্ট হ'য়ে উঠল না তার মনের মধ্যে। তার নারী-সত্তার যা পরম ধন, পূজার নৈবেদ্যর মত তা উৎসর্গ করে যাকে বরণ করেছে, তার জন্য নিজের অভ্যাস ও সংস্কারের ছক পেরিয়ে আসার সাহস যে তার নেই, এইটুকুই শুধু বুঝল।

হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত আবেগ ও অনুভূতিগুলি ক্রমশঃ উবে গিয়ে অবশিষ্ট থাকে সুপরিচিত রীতি বন্ধন। সব স্বপ্ন মুছে গিয়ে রইল সুপরিচিত বাঁধা ছাঁচ ও তাতে দাগা বুলোবার বাধ্যবাধকতা!

পরদিন সকালে ভূপতি শমিতার ঘরে ঢুকে বললেন, শমি মা, সুরঞ্জন আর অপেক্ষা করতে চায় না। বলছে এই মাসের মধ্যেই তোদের বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলতে।

শমিতা জানালার পাশে দেয়ালে মাথা হেলিয়ে বসেছিল। বাইরে কী দেখছিল সেই জানে।

তার এই ব'সে থাকার মধ্যে যে একটা নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপ আছে, তা ভূপতির চোখে পড়ল না। বাঁধা ছাঁচে দেখতে তিনি অভ্যস্ত, কাজেই তাঁর অত্যন্ত কাছে নৈরাশ্যের বিরাট গহ্বরটি তিনি দেখতে পেলেন না।

ভূপতি ব'লে চলেন, সুরঞ্জন বলছে বিয়ের পর কাশ্মীর বেড়াতে যাবে—তোকে নিয়ে। তুই কী বলিস মা?

শমিতা ভূপতির মুখের পানে তাকাল নিষ্প্রভ চোখে। মুখে একটা কষ্টকৃত হাসি ফুটিয়ে তুলে বিরস নিস্পৃহ স্বরে সে বললে, আমি তার কী বলব বাবা! আমার কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছে তো নেই। তোমরা যা বলবে, তাই হবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মদিনে

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

৪ঠা শ্রাবণ, ১২৭০

কবির জন্মদিন। কৃষ্ণনগরে বিখ্যাত দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পিতা—কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, মাতা—প্রসন্নময়ী দেবী। শৈশব হইতে মেধাবী বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ছিল। প্রিয়দর্শন ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল—ছিলেন স্পষ্ট-বক্তা। তাঁহার সুকণ্ঠের গান শুনিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। শৈশবকাল তাঁহার কৃষ্ণনগরেই কাটে।

এসব বহুদিনের কথা। অতীতের কথা। তখন দেশ ছিল পরাধীন, আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। তাই আমরা সেকালের সেই কবি, সেই গায়ক দ্বিজেন্দ্রলালকে স্মরণ করিতেছি। স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনিও একদিন দেখিয়াছিলেন—তাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, রচনা করিয়াছিলেন—দেশাত্মক কবিতা, গান-নাটক; আর দৃঢ়ভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন চিঠিপত্রে—একখানি চিঠির কিছুটা অংশ এখানে উল্লেখ করিতেছি—

"আমি সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছি। আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি—যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদেয় হেয় ও নগণ্য ভেবে উপেক্ষা করুক না—আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব।"

কবির সেই স্বপ্ন, সেই দৃঢ় আশ্বাস আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, দেশ স্বাধীন হইয়াছে। আজ আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মুক্তকণ্ঠে গাহিতেছি—

—"দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার!
আমার দেশ!"

তখনকার দিনে, পরাধীনতার যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এই সব সঙ্গীত; কবিতা রচনা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল? তিনি ছিলেন সরকারী চাকুরীজীবী—কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করিয়াও তিনি গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—

—"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব
মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি
তীর্থক্ষেত্র।"

কেবল স্বদেশাত্মক রচনাই তিনি করেন নি। প্রয়োজনবোধে সমাজের যেখানে হীনতা, দীনতা, কাপুরুষতা সেখানেই তিনি হাসির গান বা ব্যঙ্গাত্মক গানের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে চাবুক মারিয়াছেন—তা সে যেই হউক না কেন? দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের বিশেষত্বই ছিল দৃঢ়তা, স্পষ্টবাদিতা। আর এর জন্য তাঁহাকে কম দুর্ভোগ ভুগিতে হয় নাই। তাঁহার হাসির গান বা ব্যঙ্গাত্মক গান তখনকার সমাজজীবনকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল। যেখানেই ত্রুটি, যেখানেই ন্যাকামি দেখিতেন, সেখানেই গাহিয়া উঠিতেন—

…"যদি জান্‌তে চাও আমরা কে,
আমরা Reformed Hindoos.
আমাদের চেনে নাক যে,
Surely he is an awful goose."…

আবার গাহিতেন—

—"আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।…ইত্যাদি।

আবার গাহিতেন—

—"রাস্তায় সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড়, বন কি বাঘ ভাল্লুক,
When it doesn't care a nang;
কাজটি অন্যায় কিম্বা ঠিক্,
ঠাট্টা হোক্ কি নিন্দা হোক্
When it doesn't care a kick;
মরি কিম্বা বাঁচি, when it is very much
the same;—
তারেই বলে প্রেম।"—

এই ধরণের বহু ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখিয়া, তিনি নিজে গাহিয়া লোকের চোখে, কানে আঙুল দিয়া দেখাইয়া ও শোনাইয়া ছিলেন। সে জন্য অনেকেই তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। তাই বলিয়া তাঁহার আদর কম ছিল না। এই সবের জন্যই তিনি আজও অমর। তাঁহার হাসির গান সম্বন্ধে তিনি নিজেই এক জায়গায় জানাইয়াছেন—

—"কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হয়।"···দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিলেন, ইংরাজী বাংলা মিশ্রণে রচিত গানগুলি সকলে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না—তাই খাঁটী বাংলা গাহিয়া উঠিলেন—

—"নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা ক'রেই হোক্, রাখিবেই
সে জীবন।"—

আবার রচনা করিলেন—

—"হ'ল কি! এ হল কি!—এত ভারি আশ্চর্য্যি!
বিলেত ফের্তা টান্‌ছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে
ভশ্চার্য্যি।"···

···ইত্যাদি এই ধরণের হাসির গান, ব্যঙ্গাত্মক গানের কষাঘাতে দেশের মানুষকে শোধরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সব হাসির গান, ব্যঙ্গাত্মক গান, দেশাত্মক গান ছাড়াও নাট্যকার হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচিত। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিলেন যে দেশের মানুষকে সজাগ করিতে হইলে নাটকের মাধ্যমেই সহজে তাহা করা সম্ভব। তাই তিনি একের পর এক সৃষ্টি করিলেন দুর্গাদাস, মেবারপতন, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি।

পরাধীনতার গ্লানি কাটাইয়া আমরা আজ স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা সেই অমর কবি, নাট্যকার, স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক দ্বিজেন্দ্রলালকে স্মরণ করি। কবির জন্মশতবার্ষিক আগত—প্রায় জন্মশত বার্ষিক পূর্ত্তি হিসাবে জন্মশতবর্ষ উৎসব সুরু হইয়াছে কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরে কবির জন্মদিনে জন্মভিটায় একটী স্মৃতি ফলকের উন্মোচন করিয়া কৃষ্ণনগর তথা নদীয়াবাসী জন্মশতবর্ষ উৎসবের প্রথম পদক্ষেপ সুরু করেন। এই অনুষ্ঠানে কবি-দুহিতা শ্রীমতী মায়া দেবী (ব্যানার্জী) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া স্বর্গত পিতৃদেবের স্মৃতির ফলক উন্মোচন করিয়া বলেন—

—"আমার বাবার ছিল প্রাণে অগাধ ভালবাসা। তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রতি ছিল অন্তরের ভালবাসা—শত কাজের মধ্যেও ছেলেদের দেখতেন, দেখতেন মাতৃহারা শিশুদের মায়ের মত করে অন্তর দিয়ে। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন আমাদের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হয়েছিল তাঁর মতভেদ, কিন্তু মনের অমিল কোনদিন হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের মেয়ে বলে রবীন্দ্রনাথ আমাকেও কম স্নেহ করতেন না।"·· ···

কৃষ্ণনগরের আকাশ বাতাস ঐদিন প্রত্যূষে কবির রচনা—"ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"···সঙ্গীতে ভরিয়া উঠে। দলে দলে লোক কবির গান গাহিয়া কবির জন্মভিটায় সমবেত হয় কবিকে নূতন করে জানিবার জন্যে, চিনিবার জন্যে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের মানুষের কর্ত্তব্য—আর কর্ত্তব্য জাতীয় সরকারের। সমবেত ও মিলিত চেষ্টায় স্মৃতিরক্ষার নিশ্চয়ই সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইবে এ আশা, এ ভরসা আমরা রাখিতে পারি। কবির গাওয়া গানের সার্থকরূপ যেন আমরা দিতে পারি—

·· "মানুষ আমরা নহিত মেষ!"···

কবির জন্মদিনে এই প্রার্থনা জানাইয়া দেশবাসীর কাছে নিবেদন, আসুন সকলে চেষ্টা করি—কবির জন্মশতবর্ষকে সার্থকভাবে রূপ দিতে।

১৯৬২-৬৩ সালের রেলওয়ে বাজেট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

সর্দার শরণ সিং হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বিগত ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভারতীয় লোকসভায় ১৯৬২-৬৩ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে, ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই থেকে মাশুল এবং যাত্রীভাড়া কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। অর্থাৎ রেলওয়ের নিজস্ব মাল, ডাক ও সামরিক দ্রব্য এবং রপ্তানীর জন্য খনিজ ম্যাঙগানীজ ছাড়া সমস্ত প্রকার মালের মাশুল চল্লিশ কিলোমিটার পর্য্যন্ত মেট্রিক টন প্রতি পঞ্চাশ নয়া পয়সা হারে এবং আশী কিলোমিটারের পর এক টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে। বলা হয়েছে, মাশুলের হার মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের জন্য অনুরূপ হারে বৃদ্ধি করা হবে। মাত্র খাদ্যদ্রব্যের জন্য এক শত ষাট কিলোমিটারের পর অতিরিক্ত মাশুল এক টাকা হারে আদায় করা হবে। এছাড়া এখন পাচ শতাংশ হারে যে অতিরিক্ত চার্য আদায় করা হয়ে থাকে সেটাও এর দিতে হবে। যাত্রীভাড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীভাড়া পনের শতাংশ হারে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া শতকরা দশভাগের সামান্য কিছু কম হারে বৃদ্ধি পাবে। রেলওয়ে সিজন টিকিটের ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে মাত্র পাচ শতাংশ হারে। রেলওয়ে মন্ত্রী বলেছেন, যাতে অফিস এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা সুবিধা পেতে পারেন সেজন্যই স্বল্প হারে ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। হিসাব করে নাকি দেখা গেছে, প্রস্তাবিত ভাড়া বৃদ্ধি অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই থেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি বছরে গড়ে মাত্র চার নয়া পয়সা করে বেশী ভাড়া দিতে হবে। এর ফলে এক বছরে এক শত কোটি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কাছ থেকে তের কোটি টাকা নাকি পাওয়া যাবে। বলা হয়েছে, শতকরা পঁচাশীজন তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী অনধিক পঞ্চাশ মাইল (আশী কিলোমিটার) ভ্রমণ করেন। এঁদের ক্ষেত্রে খুব বেশী হলে পনের নয়া পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি পাবে। শহরতলীর তৃতীয় শ্রেণীর সিজন টিকিটধারিগণ প্রত্যেক দিনে একদিকে গড়ে প্রায় সতের কিলোমিধার ভ্রমণ করেন। তাঁদের নাকি প্রতিদিন অতিরিক্ত প্রায় এক নয়া পয়সা দিতে হবে। এছাড়া খাদ্যশস্য একশত মাইলের বেশী যতদূর বাহিতই হোক না কেন, প্রতি মণে অনধিক চার নয়া পয়সা বেশী মাশুল লাগবে। যাই হোক রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং যে ভাবে রেলওয়ে বাজেট পেশ করেছেন তাহাতে দেখা যাচ্ছে—

	১৯৬০-৬১ সালের প্রকৃত হিসাব	১৯৬১-৬২ সালের সংশোধিত হিসাব	মার্চ (১৯৬২) উপস্থাপিত ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট	১৯৬২-৬৩ সালের নূতন বাজট
যাত্রী ভাড়া ও মাশুল বাবদ মোট আয়	৪৫৬-৮০	৫০১-২৪	৫২৪-১০	৭৪৫-৩৬
পরিচালনা ব্যয়	৩১৩-২৪	৩৩০-৫৫	৩৪৫-৭৪	৩৫৬-৯৪
বিবিধ ব্যয়	১০ ৬৯	১৬-৫৯	১৬-৩৫	১৬-৩৫
ক্ষয়ক্ষতির সংরক্ষিত তহবিলে জমা	৪৫-০০	৬৫-০০	৬৭-০০	৬৭-০০
মোট	৩৬৮-৯৩	৪০৯-০৬	৪২৯-০৯	৪৪০-২৯
নীট রেলওয়ে রাজস্ব সাধারণ রাজস্বে দেয়:—	৮৭-৮৭	৯২-১৮	৯৫-০১	১০৫-০৭
(ক) ১৯৬০-৬১ সালে ৪ শতাংশ হারে এবং ১৯৬১-৬২ সালে ৪.২৫ শতাংশ হারে রেলওয়ে মূলধনী চার্জ বাবদ প্রদেয় অংশ	৫২-৮৬	৬৩-২০	৬৯-৩৫	৬৯-৩৫
(খ) যাত্রী ভাড়ার কর বাবদ প্রদেয় অংশ	—	১২-৫০	১২-৫০	১২-৫০
নীট উদ্বৃত্ত	৩২-০১	১৬-৪৮	১৩-১৬	২৩-২২

বিগত ৪ঠা মে তারিখে লোকসভায় ১৯৬২-৬৩ সালের রেলওয়ে বাজেট গৃহীত হয়েছে। আরো জানা গেছে, তিন ঘণ্টা বিতর্কের পর অবশিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দের দাবী এবং ১৯৬২-৬৩ সালে রেলওয়ে পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চিত তহবিল থেকে এক হাজার একশত চৌত্রিশ কোটি আশী লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা দানের অধিকার সম্বলিত একটা অর্থপ্রয়োগ বিলও গৃহীত হয়েছে।

কেন যাত্রীর ভাড়া এবং মালের মাশুল বাড়ান হয়েছে সে সম্পর্কে রেলওয়ে মন্ত্রী বলেছেন, ক্রমে ক্রমে রেলওয়ের খরচ বেড়ে গেছে। অথচ বিগত দশ বছরের মধ্যে যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি পাইনি। মাশুলের হারও নাকি খুব সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকসভায় যখন রেলওয়ে বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল তখন দেখা গেছে, কিছুসংখ্যক কংগ্রেসী সদস্য নীতিগতভাবে ভাড়া এবং মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধী নন। তবে তাঁদের বক্তব্য হল—প্রস্তাবটি সময়োচিত হয়নি। অন্যদিকে বিরোধী দলের সদস্যরা প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, এধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিলনা। নির্দলীয় সদস্য মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টনী বলেছেন, মাশুল বৃদ্ধির ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি আরো বেড়ে যাবে। শ্রীমাথুরেরও অভিমত হচ্ছে, মাশুল বৃদ্ধির ফলে রপ্তানীর উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিবে। শ্রীআনন্দন নাম্বিয়ার হলেন কমুনিষ্ট সদস্য। তিনি বলেছেন—রেলওয়ে উন্নতিসাধনের জন্য যে অর্থ দরকার সাধারণ রাজস্ব থেকে সেটা ঋণ নিয়ে পূরণ করা যেত। লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনার সময় শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিককে এই মর্ম্মে মন্তব্য করতে দেখা গেছে যে, রেলওয়ের আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই রেলের মাশুল এবং ভাড়া বৃদ্ধি করা অযৌতিক। তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ভাল করা হচ্ছেনা। কোন কোন সদস্যের ধারণা, রেলওয়ের প্রশাসনে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব রয়েছে বলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীসি এল নরসিংহ হলেন স্বতন্ত্র পার্টির সদস্য। তিনি অন্ধ্র থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। মাশুল এবং ভাড়া বৃদ্ধির বিরোধিতা করে শ্রীনরসিংহ বলেছেন, এতে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। শ্রীসুবোধ হাসদা হলেন পশ্চিম বাংলা থেকে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য। রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কে বিতর্ককালে তিনি মন্তব্য করেছেন, যদি রেলের সীজন টিকিটের ভাড়া বেড়ে যায় তাহলে ছাত্র এবং নিম্নবেতনের কর্ম্মচারীরা অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তাছাড়া তিনি এই মর্ম্মে দাবী জানিয়েছেন যে, রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করতে হবে, কারণ এ সম্পর্কে অবদমন ও বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছে। মহারাষ্ট্র থেকে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রীতুলসীদাস যাদব লোকসভায় ন্যারো গেজ লাইনগুলো ব্রডগেজে পরিণত করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। তিনি আরো বলেছেন; সম্ভব হলে উপরের শ্রেণীর ভাড়া আরো বাড়িয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমান বাঞ্ছনীয়। বিহার থেকে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রীএ পি শর্মা মনে করেন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী-ভাড়া বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি এর বিরোধিতা করেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী মহিষী হলেন কংগ্রেসী সদস্যা। তিনি মহীশূর থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তাঁর অভিমত হল সুখ-সুবিধার কথা দূরে থাকুক ভাড়া বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের উপরই সব চাইতে বেশী আঘাত এসে পড়বে। কাজেই রেলওয়ের পক্ষে অর্থসংগ্রহ করার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। মনোনীত সদস্য অধ্যাপক এ আর ওয়াদিয়া কিছুতেই ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবটি মেনে নিতে পারেননি। তিনি ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবটিকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার তুল্য বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, যদি টিকেটবিহীন যাত্রীর রেলভ্রমণ বন্ধ করা যেত, তাহলে এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচান সম্ভবপর হত। সততা এবং যোগ্যতার সাথে কাজ করলে রেলওয়ে প্রশাসনের পক্ষে টিকেটবিহীন যাত্রীর রেলভ্রমণ বন্ধ করা কষ্টকর হবেনা। কেরল থেকে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রীকে মাধব মেননও রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবটি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রেলওয়ের তরফ থেকে যদি এইভাবে ভাড়া বাড়ান হয় তাহলে রেলওয়ে কিছুতেই সাধারণ মানুষের সেবা করতে পারবেনা। তাঁর নিজের ভাষায় বলছি, রেলভাড়া বৃদ্ধির একটা "অত্যন্ত বিরক্তিজনক ব্যাপার এবং সাধারণ মানুষের কাছে পীড়া-

দায়ক।" এ ছাড়া তিনি প্রস্তাব করেছেন, দক্ষিণ ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন প্রচলিত করা দরকার, কারণ সেখানে প্রয়োজনের অনুপাতে কয়লা সরবরাহ অল্প। অবশ্য যে সব এলাকায় কয়লার প্রচুর সরবরাহ রয়েছে সে সব এলাকায় ইঞ্জিনে কয়লা ব্যবহৃত হলে ক্ষতি নেই।

শ্রীকে শান্তনম হলেন রেলওয়ে দপ্তরের প্রাক্তন উপমন্ত্রী। বিগত ২৫শে এপ্রিল তারিখে রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কে রাজ্যসভায় ভাষণ দিবার সময় তিনি বলেছেন, রেলওয়ে মাশুল এবং যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে সে প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। এই বৃদ্ধি মোটেই অতিরিক্ত হয়নি। অর্থাৎ তিনি মাশুল এবং ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস, যদি শীঘ্র মিটার গেজকে ব্রড গেজে পরিণত করা না হয় এবং যদি এমন একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গৃহীত না হয় যার ফলে ডিজেল দ্বারা ইঞ্জিন পরিচালনা এবং ডবল লাইনে রেল চালনা সম্ভব হতে পারে তাহলে একদিকে যে রকম রেলওয়ের অযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে সে রকম অন্যদিকে রেলওয়ের মুনাফা অর্জ্জন কমে যাবে। যা'তে রেলওয়ে দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য তিনি পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন সহ চার হাজার কোটি টাকার একটা পনের বছরের মেয়াদের দীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য রেলওয়ে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশান্তনমের আরেকটা মন্তব্যও আমরা উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, রেলওয়ে বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রয়োজনের অনুপাতে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বেশী। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরের কর্ম্মচারীর সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি করার পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে তিনি মনে করেন না। অর্থাৎ শ্রী শান্তনমের মতানুসারে রেলওয়ে বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে অনায়াসে কর্ম্মচারী ছাঁটাই করা যেতে পারে।

মহীশূর থেকে নির্ব্বাচিত সদস্য শ্রী কে হনুমন্তিয়া লোকসভায় এই মর্ম্মে অভিযোগ করেছেন যে, যদিও আর্থিক দিক থেকে মিটারগেজ লাইন লাভজনক নয় তথাপি এখনও পর্য্যন্ত দেশে এই লাইন চালু রয়েছে। তার আরেকটা অভিযোগ হল এই যে, যেহেতু পরিকল্পনাকারিগণ রেলওয়ে, সম্প্রসারণ কর্মসূচী সম্পর্কে কয়েকটা মূল কথার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নি সেহেতু দেশের কোন এলাকা—বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। মহীশূর থেকে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযোয়াসিম আলভা জোর দিয়ে বলেছেন, কারোয়ারে রেল লাইন থাকা দরকার, কারণ কারোয়ার ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল। রেললাইন না থাকলে এই এলাকার বন, খনিজ, এবং অন্যান্য সম্পদ আহরণ করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়বে। এ ছাড়া কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি শ্রীআবদুল গণি লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কীয় বিতর্কের সময় এই মর্ম্মে দাবী জানিয়েছেন যে, অন্ততঃ জম্মু পর্য্যন্ত রেল সংযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। তাঁর দাবীর সমর্থনে শ্রীগণি বলেছেন, কাশ্মীরে খনিজ সম্পদের পরিমাণ কম নয়। এই সম্পদকে যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়—তাহলে জম্মু পর্যন্ত রেল সংযোগ সম্প্রসারণ করা একান্ত দরকার। পাঞ্জাব থেকে নির্ব্বাচিত স্বতন্ত্র সদস্য শ্রী লাহরী সিং লোকসভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন যে, দিল্লী এবং নিকটবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ সহরগুলোর মধ্যে অধিকসংখ্যক ডিজেল-চালিত ট্রেণ প্রবর্তন করা উচিত।

কেন রেলওয়ে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে সেটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রেলওয়ে-মন্ত্রী শ্রীশরণ সিং মন্তব্য করেছেন, যাত্রী-ট্রেণ পরিচালনার ক্ষেত্রে আয় অপেক্ষা ব্যয় সর্ব্বদা বেশী হয়ে থাকে। তাঁর মতানুসারে এই ভাড়া বৃদ্ধি করেও নাকি ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবেনা। ১৯৬০-৬১ সালে যাত্রী ভাড়া বাবদ যে আয় হয়েছে সেটা অপেক্ষা নয় কোটি টাকা বেশী খরচ হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে সতের কোটি টাকা। লোকসভায় সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে রেলওয়ে মন্ত্রী সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রেলওয়ের সম্পদ সীমাবদ্ধ। তবে এর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। হারানো মালের জন্য রেলওয়ের কাছে যে দাবী জানান হয়ে থাকে সে প্রসঙ্গে সর্দার শরণ সিং বলেছেন, পৃথিবীর সর্বত্র এই সমস্যা রয়েছে এবং ভারতীয় রেলওয়ের ক্ষেত্রে এই সমস্যা নূতন নয়। এছাড়া যাত্রীভাড়া অথবা মালের ভাড়া হ্রাসের জন্য যেপ্রস্তাব করা হয়েছে সে প্রস্তাব

তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় বলে তিনি সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছেন, কারণ সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবং যাত্রীদের জন্য সুযোগ সুবিধা ও দ্রুত মাল পরিবহন ব্যবস্থায় রেলওয়ের সামগ্রিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করেই রেলওয়ে দপ্তর যাত্রীভাড়া এবং মালের ভাড়া বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কলকাতা তথা পশ্চিম-বাংলার যাত্রীসাধারণ যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এর পিছনে অবশ্য কারণও আছে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, এই এলাকায় যাত্রীসাধারণকে বিশেষ কিছুই সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হয়নি। বরঞ্চ বিভিন্ন দিক থেকে অসুবিধাগুলো গুরুতর হয়ে উঠেছে। ভীড়ের চাপ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অথচ রেলওয়ে দপ্তর কোন অতিরিক্ত গাড়ী প্রবর্তন করতে রাজী নন।

দিল্লী থেকে নির্ব্বাচিত সদস্য শ্রী নওল প্রভাকর দাবী জানিয়েছেন, দিল্লী অঞ্চলের জন্য একটা বৃত্তাকার রেলওয়ে নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রেলমন্ত্রী এই দাবী মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে নাকি সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া কোন কোন সদস্য বিশেষ করে শ্রীপট্টভাই রমণ আন্তঃরাজ্যে রেলওয়ে লাইন স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হল, এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের অনুন্নত অঞ্চলগুলোর সুবিধা হবে।

পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী লোক-সভায় সদস্যদের জানিয়েছেন, খড়্গপুর এবং হলদিয়া বন্দরের মধ্যে নয়া রেলওয়ে লাইন স্থাপনের যে পরিকল্পনা আছে সেটা পরিবর্ত্তন করার জন্য নাকি একটা চেষ্টা চলছে। বর্ত্তমানে পাঁশকুড়া পর্য্যন্ত এই লাইন নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে। যদি পাঁশকুড়া পর্য্যন্ত লাইন নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে কালিয়া নদীর উপর সেতু তৈরী করা দরকার হবেনা। ফলে কিছুটা ব্যয়সঙ্কোচ হবে। আসলে শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী বলতে চেয়েছেন, যদি সংসদের কোন সদস্যের চাপে বিশেষ কোন নির্ব্বাচন কেন্দ্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য এধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে দুঃখের ব্যাপার হবে। দেশের পক্ষে কোনটি অধিকতর মঙ্গলজনক সেটা বিবেচনা করার জন্য তিনি সদস্যদের অনুরোধ জানিয়েছেন। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তীর মন্তব্যের উত্তরদান প্রসঙ্গে রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীশাহ নওয়াজ বলেছেন, খড়্গপুর এবং হলদিয়া বন্দরের মধ্যে নূতন রেললাইন নির্ম্মাণের পরি-কল্পনার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়নি।

জলপাইগুড়ি থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, চা-করদের জনৈক মুখপাত্র দুঃখ করে বলেছেন, উৎপাদনের খরচ বেশী বলে বাইরের বাজারগুলো ভারতীয় চা-শিল্পের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক দরে চা বিক্রী করা ভারতীয় চা-করদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। কাজেই রেলের ভাড়া এবং মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবে এঁরা আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এঁরা আশঙ্কা করছেন, ভাড়া এবং মাশুল বৃদ্ধির ফলে সবশ্রেণীর ব্যবসা, বিশেষ করে চা-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বাজারে সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে যাবে। এছাড়া ট্রেণের নিয়মানুবর্তিতা ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। দুর্ঘটনার সংখ্যাও যেন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সোজা কথা হল, যাত্রীবর্গীগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ভাল ব্যবস্থা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি বর্ষাকালে ছাতি মাথায় দিয়ে বসে থাকতে হয়। এছাড়া বাতি, পাখা এবং জলের অভাব বিদ্যমান। কাজেই এই পরিস্থিতিতে যাত্রী-সাধারণের পক্ষে ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নেওয়া সত্যি কষ্টকর।

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীশূলপানি

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর ক'লকাতার মুক্তারামবাবু স্ট্রীটস্থ 'মার্বেল প্যালেসে'। 'মার্বেল প্যালেস' ক'লকাতার একটি দ্রষ্টব্য স্থান। বিস্তৃত মনোরম বাগান, কৃত্রিম ঝর্ণা, ছোট পাহাড়, নানারকম পাখীর মেলা, বিরাট প্রাসাদের অভ্যন্তরের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বহুমূল্যবান চিত্র ও ভাস্কর্য্য সবাইকে নিয়ে যায় এক স্বপ্নরাজ্যে! রূপকথায় বর্ণিত স্বপ্নময় পরিবেশের রাজপুরীর সন্ধান পায় যেন ছোটরা!! সাহিত্য সম্মেলন বাংলাদেশে মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম চিন্তাসেবী হলেন শিশু সাহিত্য সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (পূর্বনাম প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন) পরিকল্পনাকারী হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মনীষীগণ। এই দু'টি সম্মেলনের উপর প্রভাব ছিলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের। বিশ্বকবির আশীর্ব্বাদপূত এই দু'টি সম্মেলন এগিয়ে চলেছে সফলতার পথে। নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের যাত্রা সুরু এই ক'লকাতার বুকেই। ১৯৫৭ সালে মহাজাতি সদনে এই সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। এই সম্মেলনেরও উদ্যোক্তা হলো বাঙ্গালী সাহিত্যরথীরাই।

এই সর্বভারতীয় শিশু সাহিত্য সম্মেলনেরও পথপ্রদর্শক হলেন দু'জন বাঙ্গালী সাহিত্যকর্ম্মী প্রভাসরঞ্জন দে ও উৎপল হোম রায়। তাঁদেরই নেতৃত্বে বাঙ্গলার তরুণ সাহিত্যকর্মীরা এক অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন। সারা ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশের স্থান হলো প্রথম সারিতে। এবার শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাঙ্গলা দেশেরই সাহিত্য কর্মীরাই পথ দেখাতে এগিয়ে এসেছেন। এই সম্মেলনের কাজ সুরু হয় গত জানুয়ারী মাস থেকে। অধিবেশনের দিন বার বার ধার্য হয়েছে আর বার বার পরিত্যক্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এরা হয়েছেন জয়ী। সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্য থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় শিশু সাহিত্যকরা উপস্থিত থেকেছেন। পশ্চিম বাংলা থেকে শতাধিক শিশু সাহিত্যিক ও প্রকাশকরা এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় 'মার্বেল প্যালেসে'। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তার একটু আগে ঠিক দুপুর দু'টোয় আন্তর্জাতিক শিশু পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। তিন দিনের এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে উদ্বোধক ও সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন উড়িষ্যার গোপালচন্দ্র মিশ্র, আসামের নবকান্ত বড়ুয়া, মহারাষ্ট্রের অমরেন্দ্র গ্যাডগিল, তামিলনাদের সুব্রাহ্মনিয়াম এবং পশ্চিমবাংলার যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অখিল নিয়োগী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ইন্দিরা দেবী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্র মল্লিক, আশাপূর্ণা দেবী ও সরোজিৎ বাগচী প্রভৃতি। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা বর্তমান শিশুসাহিত্যের গতি, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনা করেছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার গুলিকে শিশু সাহিত্য রচনায় অধিকতর উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রতি রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে সর্বভারতীয় একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং শিশু সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশনার নানাপ্রকার অসুবিধার কথাও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ক'লকাতার মেয়র রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার এক মূল্যবান ভাষণ দান করেন।

তিনি শিশু সাহিত্য সম্মেলনের সংগঠকদের সর্বরকমের সাহাযাদানের প্রতিশ্রুতি দেন। শিশু রঙ্গমহল ও শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। সর্বভারতীয় শিশু সাহিত্যিকরা এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সবপেয়েছির আসর এবং নন্দনের শিশুশিল্পীরা আনন্দানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সকলকে আনন্দ দান করেছে। রঘুনাথ গোস্বামী ও সম্প্রদায়ের পুতুল নাচ বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় জাতীয় সঙ্গীতগুলি প্রতিটি অধিবেশনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সম্মেলনের প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয় কৈলাস বসু ষ্ট্রীটস্থ এক ধরমশালায়। ধরমশালার সুন্দর পরিবেশ ও সু-ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের কাছে ক'লকাতা বাসের কয়েকটি দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রতিনিধি শিবিরের এই ব্যবস্থাপনার মূলে ছিলেন সুনীতি গুপ্তা, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক সুরেন নিয়োগী ও প্রতিনিধি শিবির-সম্পাদক অনিল ভৌমিক। সর্বোপরি অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় যাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য—তাঁরা হলেন—সাংস্কৃতিক ধূর্জটি দত্ত, প্রদর্শনী-সম্পাদক সুনীল রাহা, প্রতিনিধি-বিনোদন-সম্পাদক হরলাল বর্দ্ধন, স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক সোমেন পাল, প্রচার সম্পাদক মনোজ দত্ত, কার্যালয় সম্পাদক শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ ও স্মরণী সম্পাদক বিনয় দত্ত। নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সুষ্ঠু সমাধানের পশ্চাতে রয়েছে পশ্চিম বাংলার শিশু সাহিত্য রসপিপাসু মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সক্রিয় সহযোগিতা—নতুবা প্রমাণ হতো না —বিফলতাই সফলতার সোপান।

ক'লকাতায় শিশু সাহিত্যের অধিবেশনের যে শুভ সূচনা হলো—তা যাতে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেতে পারে সেই জন্যে স্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতিও গড়া হয়েছে এই অধিবেশনেরই সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি এবং পশ্চিম বাংলার প্রতি-নিধিরা রয়েছেন এই সমিতিতে—আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন এই সম্মেলনেরই সাধারণ সম্পাদক উৎপল হোম রায়। এরা বর্তমানে গঠনতন্ত্র রচনায় ব্যস্ত আছেন। ভারত সরকার, পশ্চিম বাংলা সরকার ও সাহিত্য আকাদেমী এই শিশু সাহিত্য সম্মেলনকে সাহায্য দানে যে ভাবে এগিয়ে এসেছেন তা চিরকাল মনে থাকবে শিশু সাহিত্য-সেবীদের। পশ্চিম বাংলা সরকার এই সম্মেলনকে এককালীন দান হিসেবে দিয়েছেন পাঁচ হাজার টাকা।

আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীতে প্রায় দু'হাজার শিশু-সাহিত্য পুস্তক প্রদর্শিত হয়েছে। এর পাচশত বই এসেছে ভারতের বাইরের—পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, ডেনমার্ক, আরবরাষ্ট্র, আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। আর বাকী দেড় হাজার বই এসেছিলো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চৌদ্দটি ভাষাভাষী সহিত্যিকদের কাছ থেকে। সাংবাদিক ও দর্শকদের মতে শিশু সাহিত্যের ওপর এত বিরাট প্রদর্শনীও-ভারতের বুকে এই প্রথম। সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণী বইটিও ভারতীয় শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা যেতে পারে। সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদেয় প্রেরিত বাণীগুলি এই সর্বভারতীয় সম্মেলনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে।
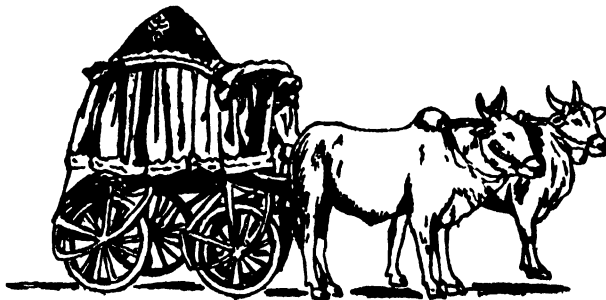
সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন ও বর্তমান সঙ্কট

নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ উৎপাদনকারী নয়, কিন্তু প্রতিটি মানুষই ভোক্তা (c mer)। সমাজের প্রত্যেকেই কোন না কোন পণ্যের ক্রেতা। অনেক জিনিষ আছে যা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তালিকাভুক্ত, যেমন, খাদ্যদ্রব্য, কয়লা, চিনি ইত্যাদি অন্যান্য ভোগ্য পণ্য, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি। বর্তমানে ন্যায্য মূল্যে উপযুক্ত মানের ভোগ্য পণ্য বাজারে বিরল। কারণ পাইকারী বণ্টন ব্যবস্থা ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ভোক্তার স্বার্থে পরিচালিত নয়। ব্যবসায়ীগণ স্বার্থান্বেষী। অসহায় ক্রেতা বা ভোক্তা জানে যে তাকে শোষণ করা হচ্ছে, তবু চুপ করে থাকা ভিন্ন তার উপায় নেই—কারণ ক্রেতারা সংঘবদ্ধ নয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে তাই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা দিনদিন প্রকট হয়ে উঠছে। নেফার ঘটনাবলীর সুযোগে দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীগণ মুনাফা করতে আরম্ভ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অসাধু ব্যবসায়ীগণ আবার সেইরূপ সুযোগের অপেক্ষায় অছেন। জাতির এই দুর্দিনে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কোরে আর্থিক দুরবস্থায় হাত থেকে সমগ্র জাতিকে বাঁচাতে হলে দেশে দেশে গড়ে তুলতে হবে সুসম বণ্টন ব্যবস্থা—আর সেজন্য প্রয়োজন ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় ভোক্তার সংস্থায় সংগঠন। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলনকে চালু করার বিরাট সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। এ আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের দেশে ১৯০৫ সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম এই আন্দোলন সুরু হয় ১৪ জন স্কুল শিক্ষকের চেষ্টায়। ১৯০৫ সনের সেই সমিতি টিপলিকার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর আজও সগৌরবে তার ৬২টি শাখা নিয়ে বিজয় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ভোগ্যপণ্য সরবরাহই আন্দোলনকে সমবায় কাঠামোর একেবারে গোড়ার কথা বলে ধরা হয়েছে, অথচ আমরা সেই ভাণ্ডার আন্দোলনকে বাদ দিয়েই এদেশে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে এসেছি।

কয়েকজন মিলে অতি সামান্য মূলধনেই সমবায় ভাণ্ডার চালু করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী স্থানীয় এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্টারের নিকট পাওয়া যাবে। সমিতি রেজিস্টার্ড হলে সরকারী অর্থ সাহায্যও মিলবে। সর্ব প্রথমে দুজন কর্মচারী ও একটি ঘর প্রয়োজন। এই সমিতি থেকে আপনি কি কি সাহায্য পেতে পারেন? প্রথমতঃ, সমিতির সভ্যদের দৈনন্দিন ভোগ্যপণ্য বা সেবার যা চাহিদা তা সমিতি জোগান দেবে। দ্বিতীয়তঃ বাজার দর থেকে বেশীমূল্যে কখনই আপনাকে কোন দ্রব্য ক্রয় করতে হবে না। ন্যায্য মূল্যে উৎকৃষ্ট ও উন্নত ধরণের পণ্য আপনি ক্রয় করতে পারবেন। তৃতীয়তঃ নগদ নামে সর্বদা ক্রয় করতে হচ্ছে বলে আপনি মিতব্যয়ী হতে পারবেন। চতুর্থতঃ ভেজাল বা ওজনে কমতির কোন ভয় থাকবে না। এ সব সুবিধাগুলি ছাড়াও আপনি আরো দুইক্ষেত্রে লাভবান হতে পারছেন। আপনার মূলধনের উপর নির্দিষ্টহারে সুদ পাচ্ছেন এবং সমিতির প্রতি আপনার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পুরস্কারও (R bate) আপনি পাচ্ছেন যা সমরায় সমিতি ছাড়া আর কোথায় আপনি পাবেন না। সভ্যদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বেশী দ্রব্য সমিতি থেকে কিনবেন তিনি সব চেয়ে বেশী লভ্যাংশ পাবেন। একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে কথাটা বুঝানো যাক। ধরা যাক কোনও সমিতিও শ্যামবাবু ১০০ মূল্যের ১০টি শেয়ার কিনেছেন কিন্তু সমিতির কোন পণ্যদ্রব্য কেনেননি। রহিম আর একজন সভ্য যিনি ৫০ টাকা মূল্যের ৫টি শেয়ার কিনেছেন এবং সমিতি থেকে ৫০০ টাকার ভোগ্য পণ্য কিনেছেন নগেন সমিতির আর একজন সভ্য যিনি সমিতি থেকে

১০৲ টাকা মূল্যের একটি শেয়ার কিনেছেন কিন্তু তিনি সমিতি থেকে জিনিষ কিনেছেন ১০০০৲ টাকার। এক্ষেত্রে নগেন সমিতির সব থেকে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং শ্যামবাবু সমিতিকে একেবারেই পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। এক্ষেত্রে সমিতির নীট লাভের কিছুই শ্যামবাবু পাবেন না, যদিও তিনি সব থেকে বেশী শেয়ার কিনেছেন, রহিমবাবু যদিও শ্যামবাবু থেকে কম শেয়ার কিনেছেন তবুও তিনি নীট মুনাফার একটি অংশ পাবেন এবং নগেনবাবু পাবেন রহিমবাবুর প্রাপ্য মুনাফার দ্বিগুণ। এইভাবে সমিতির প্রতি সভ্যদের পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে (Patronage basis) সমিতির মুনাফা বন্টন করা হবে। অবশ্য সকলই স্বীয় মূলধনের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ সমিতির পরিচালনার সমবায়ের নীতিগুলি সর্বদা মনে চলতে হবে। নীতিগুলি হচ্ছে (১) সমিতির উপবিধি (Bye law) মেনে চলতে রাজী হলে যে কোন ব্যক্তিই সমিতির সভ্য হতে পারবেন, (২) গণতান্ত্রিক উপায়ে সমিতির কাজ পরিচালনা করা হবে, (৩) অংশগত মূলধনের উপর সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করা থাকবে, (৪) সমিতির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণ অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টিত হবে, (৫) রাজনীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা ; (৬) সর্বদা নগদ বিক্রয়, (৭) সমবায় শিক্ষার প্রচার।

সমবায়ের ভিত্তিতে সমিতি গড়ে তুলতে হলে উপরোক্ত নীতিগুলি মেনে চলতেই হবে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমিতি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সেদিক দিয়েও কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হবে। সমিতির কাজের জন্য দোকান ভাড়া কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি সবই আয় অনুপাতে করতে হবে। সমিতির কাজের জন্য দোকান এমন স্থানে হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সভ্যদের অসুবিধা না হয়। তেমনি কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে দেখতে হবে বিক্রয়-যোগ্যতা ও হিসাবনিকাশে পারদর্শিতা। দোকানের হিসাব এমন সরল ও সহজ পদ্ধতিতে রাখতে হবে যাতে সাধারণ সদস্যেরাও এক নজরে সমিতির আর্থিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

সমবায় ভাণ্ডারের একটি প্রধান সমস্যা হলো স্টকের ঠিক ঠিক হিসাব রক্ষা করা। এখানে চাই কড়া পাহারা, কারণ ঐ পথেই সাধারণতঃ পুকুর চুরি হয়ে থাকে।

সমবায় ভাণ্ডার সংগঠনের আর একটি সমস্যা হলো মালের যোগান রাখা। সরাসরি উৎপাদকের ঘর থেকে মাল কিনতে হবে। মধ্যবর্ত্তীদের কাছ থেকে মাল কেনার দামও বেশী পড়ে এবং ভেজালেরও সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্যে পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ পাইকারী ভাণ্ডারগুলিই প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার গুলিকে ন্যায্যমূল্যে মালের যোগান দিতে পারবে। সমবায়ে কোন ফাঁক নেই, ফাঁকিও নেই। তাই এই আন্দোলনে যোগদান করে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন সম্ভাবনা নেই।

এখন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমবায় ভাণ্ডারের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

অনুন্নত ভারতের আর্থিক কাঠামোকে বলিষ্ঠ কোরে তোলার জন্য ভারত সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ; প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর এখন চলছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ। পরিকল্পিত পথে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে, জাতীয় আয় ও বেশ কিছুটা বেড়েছে, অথচ জনসাধারণের দুঃখকষ্টের লাঘব হয়নি, বরং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে আকাশচুম্বী হয়ে। কেন এই মূল্যবৃদ্ধি, তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির যেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন, বন্টন সম্পর্কে তেমন কোন ব্যবস্থা আজও করা হয়নি। দুঃখের কথা ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে সুসম-বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ইঙ্গিতই ছিল না। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলেই দুটি জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে : (১) আমাদের দেশের উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ সংঘবদ্ধ, কিন্তু ক্রেতারা সংঘবদ্ধ নয় ; (২) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণব্যবস্থার অভাব। ফলে উৎপাদনকারী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীগণ সুযোগ পেলেই ক্রেতার স্বার্থ পদদলিত কোরে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করে চলেছেন।

আজ চীনাদের নগ্ন ও বর্বর আক্রমণের ফলে ভারতের অর্থনীতি এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। জাতির এই চরম সংকটে আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থা ও পরি-

কল্পনাকে বাঁচাতে হ'লে আজ একদিকে যেমন চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধসজ্জার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। অবশ্য মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা স্বাধীনোত্তর ভারতের একটি নতুন সমস্যা নয়, কিন্তু দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আরো গুরুতর আকার ধারণ করেছে। আশার কথা যে-দেশের সরকার ও জনসাধারণ আজ এ সম্পর্কে সচেতন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন যে, জরুরী অবস্থায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের জন্য ভারতের ১১৩টি নগরীতে এবং ১৩৭টি মফঃস্বল শহরে হাজার হাজার সমবায় বিপণি ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। আর এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্যে খরচ হবে দশ কোটি টাকা। "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বিশিষ্ট বিষয়" হিসাবে এই পরিকল্পনাটি গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলতি বৎসরের মধ্যেই অন্ততঃ ৫০টি পাইকারী কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার ও উহার ১০০০টি শাখা খোলা হবে। ১৯৬৩-৬৪ সালে খোলা হবে আরও ১৫০টি পাইকারী ভাণ্ডার ও উহার ৩০০০টি শাখা। বর্তমান জরুরী অবস্থায় কিভাবে দ্রুত দেশব্যাপী ক্রেতা-সমবায় ভাণ্ডার গঠিত হবে তার বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানা যায় নি। তবে যে কোন স্থানে অন্যূন ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সমবায়ের আদর্শের ভিত্তিতে ক্রেতা সমবায় সংস্থা গঠন করতে পারেন। ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ ও ও বিক্রয় হবে এই সমবায় ভাণ্ডারের প্রধান উদ্দেশ্য। সমবায় সংগঠনের আইনগত খুঁটিনাটি ও ন্যায্যমূল্যে ভোগ্য-পণ্যের যোগানের ব্যাপারে সরকারী সমবায় দপ্তর ও বেসরকারী রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণকে সমবায়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। আজ ভারতবর্ষের প্রতি রাজ্যেই রাজ্য সমবায় ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে বেসরকারী সমবায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। দেশের এই জরুরী অবস্থাতে সমবায় ভাণ্ডারের ব্যাপক প্রসারকল্পে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সমবায় বিশেষজ্ঞদের সামনে তাই আজ আরো গুরুদায়িত্ব এসেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে শুধু সরকারী উদ্যম ও প্রচেষ্টায় ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন সার্থক হতে পারে না। জনসাধারণকে এ বিষয়ে অধিকতর আগ্রহশীল হতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গিয়েছে যে ভারতে ক্রেতাসমবায় শৈশব-মৃত্যুর হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে অসংখ্য সমবায় ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিলো, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথেসাথেই তাদের অপমৃত্যু ঘটলো। কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে শুধু সরকারী উদ্যম ও প্রচেষ্টায় তাদের জন্ম হয়েছিল, তাই ভিত্ বলে কিছু ছিল না তাদের। দেশের জনসাধারণ যদি সমবায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে সমবায় ভাণ্ডার সংস্থার গঠনে অগ্রণী না হয়, তাহলে কখনই সমবায় আন্দোলন সার্থক হতে পারে না। তাই আগেই বলেছি যে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে জনসাধারণকে সমবায়—সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে দেশের সমাজ-কর্মীদের। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই যে ক্রেতাসমবায় একদিকে যেমন মূল্যমানকে প্রভাবিত করবে, অন্যদিকে তেমনি মূল্যের সমতা রক্ষা কোরে জাতীয় উন্নয়নে সাহায্য করবে। বিশেষতঃ বর্তমান জরুরী অবস্থায় দেশব্যাপী ক্রেতা সমবায় গঠনের জন্যে জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগ ও সহ-যোগিতা একান্ত কাম্য।

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে—কিন্তু কেন জানি না আজ পর্যান্ত তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়নি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তৃতীয় পরিকল্পনা মধ্যে ২২০০ প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার ও ৫০ টি পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার গঠন করা হবে। সমবায় ভাণ্ডারের গুরুত্ব স্বীকৃতিতে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "Programme for tho third plan provide tentatively for anisting fifty wholesale stores and 2200 primary consumer stores···there is both urgent need and considerable scope for the development of a successful consumer cooperative momement, specially in urban areas···Conditions for the development of consumers coopera-

tive in the Third Plan are generally favourable and if special efforts are made, rapid program can be achieved" এ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে সরকার তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন গড়ে তুলতে চান। কিন্তু যে কারণেই হোক দেশে বর্তমান জরুরী অবস্থার আগেও সরকার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় এই আন্দোলনটির দিকে নজর দেননি। যাই হোক, আজ যখন সরকার "সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার বিশিষ্ট বিষয়" হিসাবে এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছেন তখন যাতে আমরা এই আন্দোলনকে সফল করতে পারি সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে। পরিশেষে, ১৯২৮ সালের রাজকীয় কৃষি কমিশনের সেই অভিমত পুনরাবৃত্তি কোরে বলবো—'If Cooperation fails, everything fails in India'.

নও জোয়ানের প্রতি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নও জোয়ান নও জোয়ান
বিশ্বের দ্বারে নিঃস্ব ভারত
চাহিছে ভিক্ষা চাহিছে দান—
আজিকে তোরাই এদেশের আশা
তোরাই রাখিবি দেশের মান।

অন্ন নাই বস্ত্র নাই
শৌর্য নাই বীর্য নাই
একাকী নিভৃতে সাধনা করিতে
ধৈর্য নাই ভক্তি নাই
হাতে হাত দিয়া একতা করিতে
মিলায়ে মিলিতে শক্তি নাই
ঐ দ্যাখ্ দেখি নীরবে জননী
রয়েছে তোদের পানেতে চাই।
আজি ধিক্কৃত সোনার বাংলা
বিকৃত তাহার কীর্তি কথা
যে যার ইচ্ছা বলে আর করে
স্বেচ্ছাচারের প্রতিকূলতা
হিন্দি ও চিনি বলি ভাই ভাই
লাল চীনে মোরা কাল চিনি নাই
পীত বর্বর গর্ব করিছে
ছাগের অঙ্কে বাঘের ঘ্রাণ
মাটির ভিতরে মুখ গুঁজিয়া কি
উট পাখী পাবে পরিত্রাণ?

নও জোয়ান নও জোয়ান
আজি কি শোণিত শীতল হয়েছে
শীতল অগ্নি বিবস্বান?
বঙ্গবাসী কি বনবাসী হয়ে
সমাধির সুধা করিছে পান?
(না না) বাংলা যুঝিছে আজিও ধ্বনিছে
শঙ্খ তাহার সাংবাদিক
শত শত প্রাণ দিল সন্তান
দেশের সমরে সে নির্ভীক।
কাহারো গায়ে সে তোলেনিক হাত
শেখেনি বন্য বর্বরতা
তাই বলে কি সে দেশেরে বাঁচাতে
করিবেনা কর্তব্য যথা?
মিথ্যা জীবনে কি তার চাই
(যদি) বাঁচার মত না বাঁচতে পাই
আততায়ী দল—আসিলে প্রবল
তাহারে হানিতে ভাবিতে নাই।
নও জোয়ান নও জোয়ান
মূর্চ্ছাহতের জাগাও প্রাণ
নির্যাতনের যাতনা হইতে
প্রাণ দিশমার বাঁচাও প্রাণ।
পাকে পড়া হাতী ব্যাঙে মারে লাথি
বিক্রম বিনা নাহিক ত্রাণ
দলিত পীড়িত আর্ত জননী
ডাকিছে কোথায় নও জোয়ান।

(পূর্বানুবৃত্তি)

ষোলো

বিষ্ণুঠাকুরের ঘরে সুন্দর কালো পাথরের বেদীর উপরে ঠিক্ মাঝখানে রাধাকৃষ্ণের শ্বেত পাথরের যুগলমূর্তি। তাদের ডান পাশে চন্দ্রভাল সর্পমাল শিবমূর্তি, বাঁ পাশে সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা ভবানীমূর্তি। ধ্রুব ওদের বসিয়েই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সাবিত্রী মুগ্ধনেত্রে ত্রিমূর্তির দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপরে জলভরা চোখে বলে—যেন নিজের মনেই: "আহা! চোখ জুড়িয়ে যায়।"

প্রহ্লাদ (গাঢ়কণ্ঠে): সত্যি! পাথরের মূর্তি যে এমন জীবন্ত হয় আমি জানতাম না।

সাবিত্রী (হঠাৎ): একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

প্রহ্লাদ: কী?

সাবিত্রী: রাগ করবে না, কথা দাও।

প্রহ্লাদ (হেসে): আমি কি দুর্বাসা? তবে তুমি কী প্রশ্ন করতে চাইছ আমি জানি।

সাবিত্রী: ঈশ্! অন্তর্যামী!

প্রহ্লাদ: না, তবে শার্লক হোম্‌স পড়েছ তো? আমি তাঁর পদ্ধতি থেকে শিখেছি অনেক কিছু।

সাবিত্রী: অর্থাৎ?

প্রহ্লাদ: তুমি ভাবছিলে—আমাদের বেশির ভাগ মন্দিরেই ঠাকুরের মূর্তি অসুন্দর হয় কেন? নয়?

সাবিত্রী: ওমা, সত্যিই তো! (একটু পরে) কিন্তু তাহ'লে তুমি তো বড় সাংঘাতিক মানুষ!

প্রহ্লাদ: সাংঘাতিক?

সাবিত্রী: নয়? আশপাশের লোক কী ভাবছে—মানুষ টের পায় না ব'লেই না আজো এ-সংসার চলছে, চন্দ্রসূর্য উঠছে। আমাদের ভয়-ভাবনার, কামনাবাসনার আবরু না থাকলে কি মানুষে মানুষে মিতালি দুদণ্ডও টিঁকত?

প্রহ্লাদ (হেসে): কিন্তু তুমিও তো কম সাংঘাতিক সিনিক নও দেখছি।

সাবিত্রী: সিনিক কিসে? মেয়েরা মাটি ছাড়া নয়—রঙিণ চশমা প'রে সংসারকে দেখে না ব'লেই না তারা গিন্নি।

প্রহ্লাদ: আর কর্তা? গিন্নির প্রসাদার্থী নেড়ে কুকুর?

সাবিত্রী (জিভ কেটে): ছি ছি! অমন কথা কি ঠাট্টা করেও বলতে আছে? (এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত ক'রে) চারদিকে লোক—যদি কেউ শুনে ফেলে? (ব'লেই প্রণাম)

সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দ। ওরা উভয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। বিষ্ণু ঠাকুরের হাতে মালা ফিরছে, ঠোঁট নড়ছে।

তাঁকে ওরা গড় হ'য়ে প্রণাম করতেই তিনি ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন পর পর। তার পর আসনে ব'সে বলেন: "বোসো বাবা, বোসো মা।" ওরা সাম্‌নে বসতেই: "কেমন ঠাকুর আমার, বলো?"

প্রহ্লাদ ও সাবিত্রী: চমৎকার—
আমরা বলাবলি করছিলাম—

বিষ্ণুঠাকুর পর পর তিনটি বিগ্রহকে প্রণাম ক'রে বলেন: "অনেকেই আজকাল হাসাহাসি করে মা—বিগ্রহকে ভগবান্ বললে। বলে: ভগবান্ অনন্ত নিরাকার। আমি মনে মনে হাসি: যেন অরূপ বিশ্বরূপ না হ'লে বিশ্ব গ'ড়ে উঠতে পারত!

প্রহ্লাদ (একটু পরে): কোথায় পেলেন মূর্তিগুলি?

বিষ্ণুঠাকুর (নিজের বুকে হাত রেখে): এইখানে। আমি নিজে হাতে গড়েছি।

সাবিত্রী (বিস্ফারিত নেত্রে): আপনি?

বিষ্ণুঠাকুর: হ্যাঁ মা। ছেলেবেলায়ই মাটির মূর্তি গড়ার খেলায় মন মজেছিল। যৌবনে পাথর নিয়ে পড়ি। নাম রটে—ভাস্কর। এখন বুড়ো বয়সে পড়েছি মানুষকে নিয়ে—তাকে ঢেলে সাজাতে—সাধ্যম'ত। হ্যাঁ বাবা, ঠাট্টা নয়। এ-জীবন সার্থক হয় শুধু গড়ার পথে—যে যেমন পারে। আর এ-গড়ার প্রেরণাও দেন তিনিই যিনি আবহমানকাল অক্লান্ত প্রেমে সৃষ্টি ক'রে আসছেন লয়ের পাশাপাশি। ঠিক যেমন বুদ্বুদের পরে বুদ্বুদের চিকিয়ে ওঠা আর মিলিয়ে যাওয়া। এইমাত্র গাইছিলাম না বিদ্যাপতির—(ব'লেই গুণ গুণ ক'রে):

কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা,
তোহে জনমি' পুন তোহে সমাগত—সাগর লহরী সমানা।

প্রহ্লাদ (মুখ তুলে): একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

বিষ্ণু ঠাকুর: একটা কেন দশটা করলেও রাগ করব না! মানুষ গড়তে হ'লে প্রথমেই চাই এই ধৈর্য—কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই নয়, একই প্রশ্নের একই উত্তর দেওয়া—অগুন্তিবার। আমার ছিল না ধৈর্য একটুও—ঠাকুর অনেক পিটিয়ে সুধীর করেছেন। তাই যা প্রাণ চায় বলো, বাবা।

প্রহ্লাদ: আপনি কি জানতেন—আমি আজ আসব?

বিষ্ণু ঠাকুর (হেসে): বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে শোনো বলি। কাল সকালে তুমি এক জমিদারের বাড়ি কী গান গেয়েছিলে বলব? বৈজু-বাওরার একটি ধ্রুপদ সোহিনী রাগে সুর ফাঁক তালে—প্রথম আজ শিব শক্তি নাদ পরমেশ্বর···

প্রহ্লাদ (স্তম্ভিত হ'য়ে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে): আচ্ছা তা'হ'লে—ওর কথাও আপনি জানতেন?

বিষ্ণু ঠাকুর (হেসে): কত লোককেই যে এই ধরণের সব চিরপরিচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়—আমি দৈবজ্ঞ কি না, জ্যোতিষী কি না, ত্রিকালদর্শী কি না। আর বলতে হয় একই কথা লজ্জার মাথা খেয়ে যে আমি জানি শুধু—যেটুকু ঠাকুর আমাকে জানিয়ে দেন তাঁরই কাজের জন্যে। পাণ্ডবগীতার একটি শ্লোক আমার বড় প্রিয় বাবা:

যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হে ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্র ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে॥

হয় কি জানো, বাবা? আমাদের তিনি প্রথমে গ'ড়ে তোলেন অহংবুদ্ধির আওতায়—কিন্তু সে কেবল এইজন্যে যে বাহ্যজগতের সঙ্গে ভেদবুদ্ধির মধ্যে দিয়েই আমরা গ'ড়ে উঠি প্রথমদিকে। খুব ছোট বেলায় শিশু থাকে প্রায় জড় বস্তুই তো? পরে ক্রমশঃ তার নিজের পছন্দ অপছন্দ গ'ড়ে ওঠে—এর চেয়ে ওটা বেশি ভালোবাসে—এর চেয়ে ওর সঙ্গ বেশি কামনা করে। অর্থাৎ তার আমি—ভাব গ'ড়ে ওঠে প্রথম দিকে নিজের বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে। পরে দেখে যে,—যে-আমি এক সময়ে তার অগ্রগতির সহায় হয়েছিল সে-ই পদে পদে বাদ সাধছে তার পূর্ণায়িত আত্ম-বিকাশের পথে। তখন সে ঠেকে শেখে একটি চিরন্তন সত্য যেন নতুন ক'রে: যে, এই আমিকে সর্বান্তর্যামীর মধ্যে মজিয়ে দিতে না পারলে আর এগুলো সম্ভব নয়। পরমহংসদেব একেই বলতেন "আমি আমি" ছেড়ে "তুহুঁ তুহুঁ"-তে মুক্তি (হেসে) বাবা, একসময়ে আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল আমার এই কেয়াবাৎ আমির 'পরে। যদু মধু বিধু সিধুকে উঠতে বসতে অবজ্ঞা করতাম—তারা অজ্ঞান ব'লে। কিন্তু ঠাকুর আমাকে দিনের পর দিন পিটিয়ে পিটিয়ে সায়েস্তা করেছেন। সে যে কী পিটুনী, কী বলব? আত্মাভিমানে আঘাত পড়লে লাগত না কি আর? লাগত খুবই। কিন্তু সেই নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়েই এল নবারুণ চেতনা—চিনলাম গুরুকৃপাকে। ফলে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম যে, যে-আমির কীর্তিকলাপের এত জাঁক ক'রে এসেছি সে আসলে মায়া আমি, অজ্ঞ আমি, বেচারী আমি—যে কিছুই না জেনেও ভাবে নিজেকে সাবাস দেয় সব-

জান্তা ব'লে। যখন এইটি দেখতে পেলাম—তখন আমার প্রথম চৈতন্য হ'ল—কারণ তখনই প্রথম সত্যি বুঝতে পারলাম যে, যে-আমি ঠাকুরকে "ত্বং হি মাতা চ পিতা ত্বমেব" ব'লে বরণ করতে না শিখেছে সে নিজের ছোট্ট আমির গুটির মধ্যেই কেঁদে মরে পাখা মেলতে না পেয়ে। পরে যখন তাঁকে ঠাকুর ব'লে স্তব করতে করতে ভালোবাসতে শেখে তখনই সে এই ছোট্ট আমি-র আঁধার গুটি কেটে কেটে বেরিয়ে পড়ে তাঁর উদার আলোয়—যেখানে আনন্দাকাশে আমি সর্বব্যাপী তুমি-র সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে—অথচ তবু আমির একটুখানি ফিন্‌কি আছে, কিন্তু সে হ'ল দাস-আমি—যন্ত্র আমি—হুকুমদার আমি যাকে যন্ত্রী চালান যেভাবে চান। আমাকে তিনি যেদিন থেকে এই ভাবে চালাতে সুরু করলেন—সেদিন থেকেই কিছু কিছু জানিয়ে দেওয়া সুরু করলেন—কে কেমন আধার, কাকে কোন পথে রওনা ক'রে দিতে হবে, কার কাছে কতটা বলতে হবে—এই সব। বুঝলে? তাই আমি সবাইকেই বলি অকপটে যে, এই আধার—চেনার শক্তি আমার ছিল না এক তিলও। কিন্তু গুরু হ'তে হ'লে না চিনলেই নয়—তাই ঠাকুর আজ আমার কান ধ'রে দেখিয়ে দেন—কার কী স্বরূপ। এ-শক্তিকে সচরাচর লোকে বলে যোগবিভূতি, কিন্তু আমি নাম দিতে চাই দেববিভূতি—আর কেন জানো? কারণ আমরা যেমন ভোগের কর্তাও নই, তেম্‌নি যোগের বিধাতাও নই। আমরা পারি শুধু কর্মভোগের যজ্ঞে হর্তা হ'তে। না, এ ঠাট্টা নয়—অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। মানুষ যতদিন নিজেকে কর্তা ভাবে, ততদিন যা ধরে তাই পণ্ড হয়। অর্থাৎ, এককথায়—যখন তিনি পারান তখনই পারি, যখন তিনি চালান তখনই চলি। বুঝলে?

সাবিত্রী (মুগ্ধ হয়ে): এমন সুধামাখা কথা কখনো শুনি নি। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে—আমার সম্বন্ধে আপনাকে ঠাকুর কী দেখিয়ে দিয়েছেন। (করজোড়ে) না গুরুদেব, বলতেই হবে—আমি যে কত অপরাধে অপরাধী জানেন না। তাই তো ভয় করে যে আপনি আমাকে—

বিষ্ণু ঠাকুর (হেসে): না মা—ভয়ের কোনো কারণ নেই। অপরাধ তোমার যতই থাকুক না কেন, তুমি সুলক্ষণা—ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর কখন জানো? যে-মুহূর্তে তুমি আমাকে প্রণাম করলে? একটু আড় আছে—তবে কেটে যাবে।

সাবিত্রী (গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম ক'রে): আপনি আশীর্বাদ করুন বাবা। আমি……আমি যে বড়…… দুর্বল।

বিষ্ণু ঠাকুর: এই মাত্র বলছিলাম না মা, যে তাঁর বলেই বলীর বল। মহাভারতে পড়ো নি—হনুমানের লেজ ভীমও তুলতে পারে নি? আর কেন পারে নি জানো? কারণ হনুমানের লেজের পিছনে বল জুগিয়েছিলেন রামচন্দ্র—আর ভীমের বলের পিছনে ছিল তার মূঢ় আত্মাভিমান যে সে মহাবলী। মা, ঋষি বলেছেন: "তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি—যেখানেই আলো ফুটল সেখানেই জেনো রসদ যোগাচ্ছে তাঁর আলোর আলো।" না মা, এ মনভোলানো কথা নয়, আমি প্রিয়বাক্য বলি কেবল তখনই যখন সত্য ব'লে জানি। তাই তোমাকে বলছি—তুমি পারবে। তিনি যে তোমাকে পাঠিয়েছেন ওর বিদ্যা স্ত্রী ক'রে। যে অবিদ্যা স্ত্রী নয় সে ভয় পাবে কী দুঃখে মা?

সাবিত্রী (গাঢ়কণ্ঠে): আমাকে ফেলবেন না ঠাকুর… আমার বড় ভয়……

(ভেঙে পড়ে তাঁর পায়ে)

বিষ্ণু ঠাকুর (মাথায় হাত রেখে): ভয় করলেই ভয় পেয়ে বসে মা। শোনো। কাঁদে না। অবলা থাকলে চলবে না সবলাই হ'তে হবে তোমাকে—ওকে বল জোগাতে হবে। তুমি এসেছ ওর স্ত্রী শয্যাসঙ্গিনী ও চিত্তরঞ্জিনী হয়ে, ফুটে উঠতে হবে ওর সহযাত্রিণী, সহধর্মিণী হ'য়ে। কিন্তু আজ আর নয়। পরে এসব কথা হবে। অনেক কথা আছে। এখন জিরিয়ে নাও। স্নানাহারের পরে ওবেলায় কথা হবে।

প্রহ্লাদ: একটা কথা শুধু, গুরুদেব। শুনেছি আপনি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। কিন্তু তাহ'লে হরপার্বতীর মূর্তি কেন রেখেছেন আপনার পূজার ঘরে।

বিষ্ণু ঠাকুর: এ-জাতের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন এ-যুগের যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব। বলেছিলেন না তিনি—"একঘেয়ে কেন হব? আমি গোল আলু ঝোলে ঝালে অম্বলে সব তাতেই আছি।" আমি এর

পথের প্রদীপ
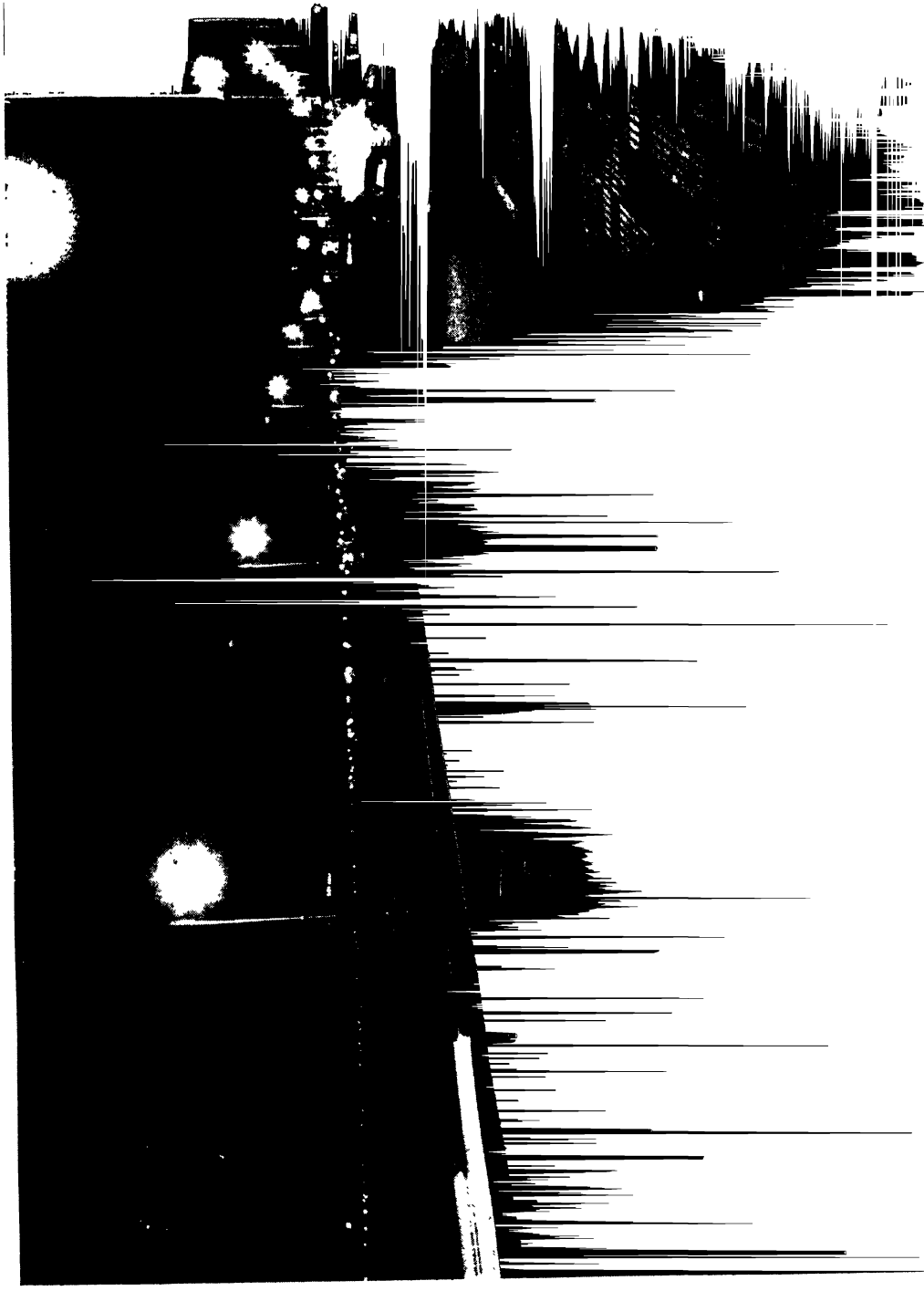
ফটো :
পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ে পথ ফটো : রণেন্দ্রশেখর ঘোষ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

টীকা করি এই ব'লে যে, আমি নিরাকারবাদীর সঙ্গে দোয়ার দেই ওঁ পরব্রহ্ম ব'লে। সাকারবাদীর সঙ্গে গাই —ডি এল রায়ের ভাষায় গেয়েঃ

আহা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হো, কার্তিক গণপতি
দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মী সরস্বতী

প্রহ্লাদ (একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে): জানি। কিন্তু তুকারাম বলতেন নিষ্ঠার কথা—

বিষ্ণু ঠাকুরঃ ও কি জানো? সাধনার নানা অবস্থায় নানা ব্যবস্থা। পরমহংসদেব এ-প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে গেছেন তাঁর অনুপম উপমায়। বলতেন না তিনি—ছাদে উঠবার সময় সিঁড়ির কথা ভাবা ছেড়ে শুধু ছাদকেই ধ্যান ক'রে সিঁড়ি পেরুতে হয়—কিন্তু ছাদে পৌছবার পর দেখা যায় সিঁড়িও যে ইটচুন সুরকি দিয়ে তৈরি, ছাদও তাই। তখন কেবল ইচ্ছামতন ওঠা নামা মহানন্দে। মূর্তি আমরা গড়ি কেন? না, এক একটা ভাবে থিতু হ'তে। কিন্তু মজা এই যে, যে-কোনো ভাবে সিদ্ধি হ'লেই—মানে, যে-কোন মতে পথ বেয়ে লক্ষ্যে পৌছলেই দেখি—সব ভাবই ঠাকুরের এক একটি বিভাব—aspect ; তাই না ঠাকুর ব'লে গেছেন —যত মত তত পথ। বলতেন যখন লক্ষ্যে পৌছতে হবে তখন একটি পথ ধ'রে চললেই কাজ হাসিল হয় সহজে, একবার এপথে একবার ওপথে করলে খেই হারিয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিয়ে যখন সাধক হয় "সিদ্ধের সিদ্ধ ওরফে বিজ্ঞানী" তখন সে সব পথেই ঘুরে ফিরে বেড়ায় অবাধে নেচে গেয়ে (হাততালি দিয়ে গুণ গুণ ক'রে):

ভাই, এ-সংসার যে মজার কুটি
আমি খাই দাই আর মজা লুটি,
ওরে, জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের বা ছিল ত্রুটি
সেযে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।

সাবিত্রীঃ জনক রাজার কথা থাক গুরুদেব, আপনার নিজের কথা আরো বলুন।

বিষ্ণুঠাকুরঃ আমার কথা আর কী বলব মা? আমার সাধনায় আমি আলো পেয়েছি মোটের উপর তিনটি ভাবের ভাবুক হ'য়ে—শিবের, শক্তির আর কৃষ্ণের, তাই আমার নিজের সাধনার পথে আমি এই তিনটি মূর্তিকেই নাম দিয়ে থাকি আমার জীবনের Trinity—অর্থাৎ কি না, এই ত্রিমূর্তির যে-কোনোটিকেই নিষ্ঠার সঙ্গে বরণ করো না কেন, পৌছবে একটিই উপলব্ধিতেই—তার নাম লীলাবাদ। আমি নিজে খুঁজতে খুঁজতে পথ পেয়েছি তিনটি দিশা বা বর পেয়েঃ শিবের কাছে মুক্তির, কালীর কাছে শক্তির, আর কৃষ্ণের কাছে ভক্তির। কিন্তু ঐ যে বললাম, সাধনার অবস্থায় এ-তিনটি বরকেই আলাদা আলাদা ক'রে দেখি একান্তী হ'তে। পরে, অর্থাৎ মিলনান্তে, দেখি প্রতি বরই পরিসমাপ্ত হয় লীলাবাদে যার উপনাম—সর্বাস্তিবাদ। একথা বলছি আমি কিন্তু সাধারণ ভাবে, এমন কথা মনে করলে ভুল হবে যে শিবের কাছে যে-আলো পাই তা কৃষ্ণের কাছে অপ্রাপ্য, বা শক্তি যে-বর দেন তা শিবের অদেয়। তবে সাধনার পথে মনকে একাগ্র করতে হ'লে একটা-না-একটা প্রতীককে symbol কে—বরণ করতে হয়। কিন্তু প্রতীক কথাটাকেও আবার ভুল বোঝা সম্ভব, কারণ প্রতীককে একবার ভালোবাসলে সে আর প্রতীক থাকেনা—হ'য়ে দাঁড়ায় রসঘনবিগ্রহ ওরফে অখিলরসামৃতমূর্তি—অর্থাৎ সর্বাস্তিবাদেরই সিঁড়ি। কিন্তু আজ আর এ-আলোচনা ফাঁপিয়ে তুলে কাজ নেই। এক সঙ্গে বেশি বলা ভালো নয়, কারণ তাতে গণ্ডগোল অনেক সময় ক'মে না গিয়ে বেড়েই ওঠে। এখন তোমরা স্নানাহার ক'রে বিশ্রাম করো। কেমন?

সতেরো

বিকেলবেলা ধ্রুব ওদের জন্যে চা ফল ডালবাটা নিয়ে এল দুটি থালায়। বললঃ "এবার মা-র কাছে নিয়ে যাব, চলুন।"

একটি ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। বেদীতে শুধু বিষ্ণুঠাকুরের একটি মূর্তি। শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীমন্তিনী মাটিতে একটি কুশাসনে বসে। বয়স পঞ্চাশ হবে। পরণে লাল-পেড়ে শাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ, গলায় তুলসীর মালা। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করাতে ধ্রুব বলেছিলঃ "আমি তাঁকে ডাকি মা ব'লে। আর সবাই—গুরুমা ব'লে। কেবল বাবা ডাকেন মোক্ষদা ব'লে—মা'র রাসনাম।"

প্রহ্লাদ ও সাবিত্রী গিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম করে। গুরুমা মালা হাতে ক'রেই আশীর্বাদ করেনঃ "এসো এসো বাবা। এসো মা। বোসো দুজনে—এই সামনের মাদুরে।" ব'লেই প্রহ্লাদের দিকে চেয়েঃ "তোমার

গানের কথা বাবা, কত যে শুনেছি—গৌরীর কাছে পরশুও লিখেছে। আজ সন্ধ্যায় গাইবে তো?

প্রহ্লাদ (সকুণ্ঠে) : আমি কী গাইব মা—গুরুদেবের সাম্‌নে? যোগ্যতা যার নেই—

গুরুমা (হেসে) : অমন কথা বলে? ঠাকুরের নাম করার যোগ্যতা কার নেই শুনি?

প্রহ্লাদ (অপ্রতিভ) : আমি গাই ওস্তাদি গান—ধ্রুপদ খেয়াল। তুকারামের অভঙ্গও গাই বটে, কিন্তু সে তো মারাঠী ভাষায়।

গুরুমা : কেন? ধ্রুপদই গাইবে। কত ধ্রুপদেই তো ভগবানের নাম আছে। উনি এখনো গান মাঝে মাঝে।

প্রহ্লাদ : ভগবানের নাম থাকলে কী হবে মা? আমরা—মানে ওস্তাদেরা—সাধারণতঃ ধ্রুপদ গাই তো স্তব করতে না (হেসে)—স্বরের তালের বাঁটের দুন চৌদুনের কুস্তিকসরৎ জাহির করতে। জানেনই তো।

ধ্রুব (খিল খিল ক'রে হেসে) : মা হাড়ে হাড়েই জানেন, প্রহ্লাদ-দা। শুনবেন সেদিন কী হ'য়েছিল—গেল মহাষ্টমীর দিন? উঃ, সে এক কাণ্ড। বাবা ধ্রুপদও ভালোবাসেন তো—বিশেষ ক'রে বৈজুবাওয়া, গোপাল নায়ক, তানসেনের দেবদেবীর নামে বাঁধা গান! তিনি নিজে পাখোয়াজে এক মস্ত ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গৎ করছিলেন। হঠাৎ হ'ল কী জানেন—?

গুরুমা (হেসে) : ওরে, মুখ সাম্‌লে, মুখ সামলে! তোর প্রহ্লাদ-দাও এক মস্ত ওস্তাদ, মনে রাখিস।

ধ্রুব (অকুতোভয়ে) : হ'লই বা। আমি তাঁকে ঠেশ দিয়ে কিছু বলেছি না কি? তা ছাড়া প্রহ্লাদ-দা তো কেবল ওস্তাদই নন। বাবা সেদিন বলেছিলেন না—উনি ছেলেবেলা থেকেই ভক্ত।

প্রহ্লাদ (উৎফুল্ল) : বলো কি? সত্যি?

ধ্রুব (সরল বিস্ময়ে) : নৈলে কি আমি বানিয়ে বলছি? (ফিক্ ক'রে হেসে) ও! বুঝেছি। আপনি অবাক হয়েছেন ভেবে—বাবা কেমন ক'রে জানলেন। বাবাকে তো জানেন না। তিনি যোগবলে সব কিছু জানতে পারেন।

গুরুমা (হেসে) : তাই বুঝি তুই বাপকা বেটা হ'য়ে সবজান্তা ব'নেছিস?

ধ্রুব (রুখে উঠে) : বাবা সব জানেন না বলতে চাও? তুমিই তো কতবার আমাকে বলেছ—তুমি যখন গঙ্গায় ডুবে মরবে ঠিক করেছিলে তখন হঠাৎ স্বপ্নে দেখলে—বাবার আলো-করা মূর্তি। আর কখন দেখলে বলো তো?—যখন তুমি চোদ্দ বৎসরের বিধবা—বাবার নাম পর্যন্ত শোনো নি।

গুরুমা ও সাবিত্রী : তুই থামবি? / সত্যি মা?

ধ্রুব : সত্যি নয় তো কি? সবাই জানে।

প্রহ্লাদ : একটু বলুন না মা সে-ইতিহাস।

গুরুমা : কী আর বলব বাবা? বলা কি যায় দয়াময়ের কৃপার কথা—যার প্রসাদে শাপ হ'য়ে দাঁড়ায় বর?

সাবিত্রী : না মা, বলুন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি।

গুরুমা : সে যে মস্ত ইতিহাস মা। আজ সময় নেই। সংক্ষেপে : আমি দশবছর বয়সে বিধবা হই। অলক্ষণা ব'লে শাশুড়ী তাড়িয়ে দেন। ফিরে আসি বাপের বাড়ি। সংসার ছিলাম আমি চক্ষুশূল। দিনরাত গঞ্জনা সইতে হ'ত। শেষে একদিন তিনি আমার চুল ধ'রে এমন মারলেন যে আমি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হ'ল তখন রাত দুটো। একশো তিন জ্বর। ঠিক করলাম ভোরে উঠেই গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করব—আর সয় না। কাঁদতে কাঁদতে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়তেই দেখলাম দয়াময়কে। সেইদিনই হ'ল আমার দীক্ষা।

প্রহ্লাদ : দয়াময়?

ধ্রুব : বাবাকে মা দয়াময় ব'লে ডাকেন যে! কিন্তু সে-ওস্তাদের কথা আর আমার বলা হ'ল না—মা-র কথা যখন সুরু হয়েছে তখন আর আশা নেই। আমি যাই—অনেক কাজ বাকি—(উঠল)

প্রহ্লাদ (হেসে ওর হাত ধ'রে টেনে বসিয়ে) : সে কি একটা কথা হ'ল ভাই! ওস্তাদের কীর্তি তোমার মুখে না শুনলে আজ রাতে কি আমার ঘুম হবে ভেবেছ?

গুরুমা : হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই শেষ ক'রে নে। আমারই ভুল হয়েছিল তোকে থামিয়ে দিয়ে।

ধ্রুব (খুশি হ'য়ে) : মা, তোমার এই গুণটি থেকে

আমি শিখেছি অনেক—এই ভুল ক'রে ভুল স্বীকার করা।

সবাই হেসে উঠে। হাসি থামলে সাবিত্রী হাসিমুখে বলে: "এবার গুরুমার ভুলের জন্যে তাঁকে মাফ ক'রে, ভাই, বলো এখন তোমার কথা।"

ধ্রুব: না, মাফ কেন? মা তো ইচ্ছে ক'রে আমাকে থামিয়ে দেন নি। নিজের কথা বলতে কে না উজিয়ে ওঠে বলুন?

গুরুমা (মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চেপে): হয়েছে হয়েছে। বল্ এবার যা বলতে চাচ্ছিলি।

ধ্রুব (সোৎসাহে): সে এক কাণ্ড! বলবার মতন বৈ কি। হ'ল কি জানেন? ওস্তাদজি গাইছিলেন ইমন-কল্যাণে একটি তানসেনের ধ্রুপদ ধামার—"দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবি করো কৃপা শিউ শংকরী" মা···বাবা সঙ্গৎ করছিলেন পাখোয়াজে, এক মুসলমান ওস্তাদ—কী খাঁ সাহেব মনে পড়ছে না—ধরেছিলেন হার্মোনিয়ম। কী চমৎকার যে বাজান! আচ্ছা। গান খুব জ'মে উঠেছে, ওস্তাদজি হু-হুংকারে দূন-চৌদূন, আড়ি-কুআড়ির মুগুর ভাজা সুরু করেছেন—সবাই কী হয় কী হয় ক'রে চাইছেন একবার ওস্তাদজির দিকে একবার পাখোয়াজীর দিকে—এমন সময়ে ওস্তাদজি কী খাঁ সাহেবের দিকে চোখ বড় বড় ক'রে তাকাতেই তিনি মাথা হেলিয়ে গোঁফ তুলিয়ে বললেন: 'কামাল কিয়া—শুভানাল্লা!' অমনি তিনি যেন ক্ষেপে গিয়ে দূন থেকে চৌদূনের কসরৎ দেখাতে দেখাতে হঠাৎ গান ছেড়ে—ধা ঘেড়ে নাক ধি ঘেড়ে নাক গদ্দী ঘেড়ে নাক—বোল্ আওড়ে শেষে শোম্-এ ধা—আ—আ ব'লেই লাফিয়ে উঠলেন তম্বুরা নিয়ে—অমনি আমাদের মাথার উপর ইলেকট্রিক ফ্যান না? তাতে বেধে তম্বুরা ছিটকে গিয়ে পড়ল দমাশ ক'রে কী খাঁ সাহেবের কপালে। সে ঢ'লে পড়ল—রগ ফেটে একেবারে রক্তগঙ্গা!

সাবিত্রী (চম্‌কে): বলো কি? সত্যি?

ধ্রুব: নয় তো কি মিথ্যে? একঘর লোক সাক্ষী আছে। হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড! জল রে, ওষুধ রে, ডাক্তার রে! সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে কী খাঁ সাহেবকে নিয়ে তো তোলা হ'ল আমাদের আশ্রমেরই ডিস্পেন্সারিতে। কিন্তু বাবা বলেন না "কপালং কপালং মূলম্"—কী খাঁ সাহেবের কপাল একথার প্রমাণ দিল। পুলিশ এসে হানা দিল।

প্রহ্লাদ: সে কি? পুলিশ।

ধ্রুব: একেবারে অক্ষরে অক্ষরে—বাবার শত্রু যে কত তার হিসেব আছে, প্রহ্লাদ-দা? কত লোকেরই যে চোখ টাটায় বাবার নাম ডাকে! হিংসুক কি দুনিয়ায় একটা? একজন দুর্নাম করলে দশজন দেয় দোয়ার। এবারও তাই হ'ল—দেখতে দেখতে একদল লোক রটিয়ে দিল আমরা হিন্দু সাধু, তাই মুসলমানকে ডাণ্ডা মেরেছি। ভাগ্যে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন বাবার—হিংসুকদের ভাষায়—ফ্লিশ্ ডিপেণ্ডেন্ট, তাই হেসে উড়িয়ে দিলেন। কেবল মা-র সেদিন যা কান্না—

গুরুমা: হয়েছে হয়েছে ফাজিল ছেলে! তোর বক্তৃতা ফুরিয়েছে তো? এখন যা। তরশু গোবিন্দদাসের যে নতুন কীর্তনটা শিখেছিস "নন্দনন্দন চন্দচন্দন" সেটা রেওয়াজ কর গে একমনে। আজ সন্ধ্যায় গাইতে হবে, মনে নেই?

ধ্রুব (অবজ্ঞাভরে): ফুঃ! সে-গান আমার ক—বে রপ্ত হ'য়ে গেছে! আমি আর একটু বসি এখানে। প্রহ্লাদ-দার সঙ্গে আরো অনেক কথা আছে যে—তবে সে হবে পরে—তোমার কথা হ'য়ে গেলে। না না—ইসারা করতে হবে না, আমি আর কথাটি বলব না। এই মুখে চাবি দিলাম—দেখ—এই কপাৎ।

সাবিত্রী (হাসতে হাসতে মুখে আঁচল দিয়ে): কী সরল ছেলে আপনার গুরুমা!

ধ্রুব (রুখে উঠে): বৈ কি! আমি সরল হ'তে যাব কী দুঃখে?

প্রহ্লাদ: সে কি?

ধ্রুব: নয় ত কি? আমি জানি না বুঝি? সরল মানে তো বোকা।

গুরুমা: না না বাছারে! তুই সরল হ'তে যাবি কেন—তোর রাম নাম সে কী যেন? শেয়ানা—না? ঐ দেখ, ভুলে গেছি।

ধ্রুব: মোটেই না। শেয়ানা হয় শেয়ালে। ছেলেরা হয় বুদ্ধিমান্। স্কুলে ফার্স্ট হই না সব সাবজেক্টে? সরল!—বললেই হ'ল?

সাবিত্রী : না ভাই, আমার ঘাট হয়েছে। তোমার শত্রু সরল হোক। তুমি হবে প্রবল।

ধ্রুব : ঠিক। আমিও তাই চাই—কিন্তু ওহো! বাবা আমাকে বলেছিলেন প্রহ্লাদ-দা কফি ভালোবাসেন। আমি কফি আনছি এক্ষুনি—পাশেই একটা তামিল উদিপি কাফেতে চমৎকার মান্দ্রাজী কফি করে। আপনারা মনের সাধে গল্প করুন, প্রহ্লাদ-দা। মা খুব খোলামেলা মানুষ—আর বাবার বিষয় যদি জানতে চান তাহ'লে তো আর কথাই নেই—মা একেবারে যাকে বলে অথরিটি।

সাবিত্রী : তুমিও কম যাও না ভাই!

ধ্রুব (গম্ভীর) : না। আমি বাবার সম্বন্ধে জানি বটে অনেক কিছু, কিন্তু অথরিটি হব কোথেকে শুনি? আমি বাবাকে জানি বড় জোর ন দশ বৎসর। মা বাবাকে জানেন বিশবৎসর। তাছাড়া বাবা মাকে যা যা বলবেন আমাকে বলবেনই বা কেন বলুন? আমি যোগযাগের কীই বা বুঝি?

প্রহ্লাদ : সে কি? তুমি ফার্স্ট হও সব সাবজেক্টে—

ধ্রুব (একগাল হেসে) : কিন্তু যোগ তো আর সাবজেক্ট নয়।

প্রহ্লাদ (টুক করে) : কিন্তু একটা অবজেক্ট তো।

ধ্রুব : (হেসে গড়িয়ে পড়ে) : আপনি তো ভারি রসিক প্রহ্লাদ-দা! আমাদের জমবে ভালো।

সাবিত্রী : জুড়ি তো জম্‌কালোই হওয়ার কথা—নামের দিক দিয়েও যখন জমেছে—ধ্রুব আর প্রহ্লাদ—এ বলে আমাকে দেখ্, ও বলে আমাকে।

ধ্রুব : কিন্তু এবার আপনার কাঁচা কথা হ'য়ে গেল দিদি। কোথায় ধ্রুব, আর কোথায় প্রহ্লাদ! বাবার মুখে কতবারই শুনেছি যে, ভগবানের কাছে যে, কিছু চেয়ে তাঁকে ডাকে তার নাম সকাম ভক্ত। প্রহ্লাদ ছিলেন নিষ্কাম ভক্ত। বাবার চোখে কতবার জল দেখেছি বিষ্ণুপুরাণের পাঠ দিতে—সেই যেখানে সমুদ্রে ডোবে ডোবে এমন সময় নারায়ণ এসে তাকে বললেন বর চাইতে, আর প্রহ্লাদ বলল : 'নাথ! যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং'—তারপরে কী মা?

গুরুমা (হঠাৎ চোখে জল) : এসব ভালো ভালো শ্লোক ভুলে যাবি—মনে রাখবি কেবল কে কোথায় কবে আকাশে ঘুরল বন্ বন্ ক'রে, ঠেঙিয়ে উঠল এভারেস্টে হাঁপাতে হাঁপাতে, রেডিও টেলিভিশন আর কী কী অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করল! দয়াময়ের গীতা-ভাগবত পাঠ এত শুনিস, তবু ভুলে যাস কেন তিনি কি বলেন? মানুষ হ'য়ে জন্মেছি আমরা কী জন্যে? আকাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে—না সবার মধ্যে ঠাকুরকে দেখে ভালোবেসে—হানাহানি, রেষারেষি, দাপাদাপি, ওড়াউড়ি ছেড়ে এই পৃথিবীকে স্বর্গ করতে। এখন থেকে রোজ অন্ততঃ পনের মিনিট এই সব স্তব মুখস্ত করবি স্তবকবচমালা থেকে। আগে তো করতিস—এখন সব ছেড়ে কেবল রেডিওতে শোনা বিশ্বের যত সব বাজে খবর কিম্বা বাজে গান। প্রহ্লাদ কী বলেছিল সাথী দৈত্যবালকদের—ভুলে গেলি? ভগবানকে চাইতে হয় ছোট বেলা থেকেই—যে ভাবে যে, বুড়ো হ'লে তবে ধর্ম-কর্ম করবে তার হয় শুধু দুর্গতি। রোখ চাই—আমি ভক্ত হব, যোগী হব, ধার্মিক হব—এই সব। দয়াময়ের কি রকম রোখ ছিল ভাব্ তো! কিশোর বয়সেই গুরু খোঁজা—আর মন্ত্র পেয়েই ভোর চারটে থেকে উঠে ছটা পর্যন্ত জপ ক'রে তবে জলগ্রহণ। বাপকা বেটা হবি কী ক'রে—যদি এই বয়েস থেকেই মতিচ্ছন্ন হয় এ-ও-তা রেডিও, সিনেমা, উড়ুক্কু হুজুগে। বল্ আমার সঙ্গে (হাতজোড় ক'রে - ধ্রুবও দেখাদেখি হাতজোড় ক'রে দোয়ার দেয়) :

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তে সদা ত্বয়ি॥

ধ্রুব : মনে পড়েছে মা। এর বাংলাটাও—তোমার মনে আছে? বাবা যে অনুবাদ করেছিলেন?

গুরুমা : না, বাংলাটা মনে করতে পারছি না।

ধ্রুব : তুমি কী মা? বাবা এমন চমৎকার অনুবাদ করলেন—মনে রাখতে পারো না? শুধু দয়াময় দয়াময় বললে কী হবে? দয়াময়ের দয়াময়ী হ'তে হ'লে রোখ চাই।

গুরুমা (হেসে) : একহাত নিয়েছিস বটে বাবা! বাপকা বেটা না হলেও সিপাহিকা ঘোড়া বটে—মান্‌ছি। কিন্তু আমি এ-অনুবাদটা তো শুনি নি।

ধ্রুব : শুনতে চাইতে হয়। কেবল গঙ্গাস্নান আর পারণ, আর যতরাজ্যের বাজে অতিথি নিয়ে মাতামাতি

করলে কি আর ভালো কথা শোনার ফুর্সৎ থাকে? গা করতে হয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। তাছাড়া এই তো সেদিনও তিনি পাঠ দিলেন—ও তুমি সেদিন সারনাথে গিয়েছিলে বটে। যাহোক বলো আমার সঙ্গে—মুখস্থ করো হাতজোড় ক'রে—ধরো দোয়ার (করজোড়ে সুর ক'রে):

যত না মলিন পশু পাখী হয়ে ভ্রমি যুগে যুগে
এ-বসুধায়,
অচল অটল রহে যেন নাথ, ভক্তি আমার
তোমার পায়।

(থেমে হাততালি দিয়ে) কেমন? শোধবোধ। তুমি মুখস্থ করলে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক, আমি—বাবার শ্লোক। কার জিৎ—এবার?

গুরুমা (প্রসন্ন হেসে): তোর সঙ্গে লড়াইয়ে আমার কবে জিৎ হয়েছে বাবা? কিন্তু কই, তোর প্রহ্লাদ-দার জন্যে কফি নিয়ে আসবি ব'লে অম্‌নি ভুলে গেলি?

ধ্রুব (জিভ কেটে): ওমা, তাই তো! (ঘরের দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ছুটে যাই—মা, সাইকেলে যাই?

গুরুমা (দৃঢ়স্বরে): না, ভর সন্ধ্যাবেলা সাইকেল না। একটা টঙ্গায় ক'রে যা।

প্রহ্লাদ: না না—টঙ্গায় কাজ নেই, আমার কফি খাওয়ার এমন কোনো অভ্যাস নেই। এম্‌নি পেলে খাই, এই আর কি।

ধ্রুব: সে কি হয়? স্বয়ং বাবা বলেছেন। আর আমি ধ্রুব হ'লেও বাবা তো উত্তানপাদ নন যে তাঁর কথা ঠেলব?

(উচ্চ হেসে হাততালি দিয়েই দৌড়)

প্রহ্লাদ (চেঁচিয়ে): ধ্রুব! দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

ধ্রুব (দোরের কাছ থেকে ফিরে): আপনি যাবেন? সে কি?

গুরুমা: না না—তুই একাই যা—কেবল টঙ্গায় যাবি।

প্রহ্লাদ (উঠে): না গুরুমা! আমাকেও যেতে দিন। ভর সন্ধ্যেবেলা আমার জন্যে একলা ছেলেমানুষ কোথায় যাবে কফি আনতে? (সাবিত্রীকে) তোমরা কথাবার্তা কও, আমি এলাম ব'লে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

সাবিত্রী: কী চমৎকার ছেলে আপনার গুরুমা! যেমন কথা, তেম্‌নি হাসি। যেমন সরল, তেম্‌নি বুদ্ধি।

গুরুমা (মুখ উজ্জ্বল হ'য়েই নিভে যায়): সবই তো ভালো মা, কেবল ওর শরীরটা মোটেই ভালো নয়। অল্পেতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়—আর ঠাণ্ডা লাগতে না লাগতে বুকে ব'সে যায় কাশি। আর সে যে কী কাশি—কী বলব মা? আমি আর একটিকে হারিয়েছি মা, তাই ভয় হয়। সে যদিও ছিল দয়াময়ের ভাইপো, কিন্তু অনাথ ছেলেটিকে আমিই মানুষ করেছিলাম। তখন ধ্রুব আসে নি তো—তাকেই আঁকড়ে ধরেছিলাম নিজের সন্তান ব'লে। সে যখন চ'লে গেল তখন বুকের ভিতরটা খালি হয়ে গিয়েছিল মা। জানি অবশ্য সবই তাঁর। আমার কিছুই নয়। কিন্তু মায়ের মমতা ম'রেও মরে না যে মা—আর কী অদ্ভুত কাণ্ড তাঁর ভাবো—একটি ছোট অসহায় শিশু—সেই কি না হয়ে দাঁড়ায় মায়ের প্রাণপুরুষ!—(ব'লেই সুর বদ্‌লে মুখে হাসি টেনে) ভাবছ—এ কেমন গুরুমা, নয়? তা কী করব মা? মা যে হয়েছে শুধু সেই জানে নাড়ীর টানের মর্ম। উনি আমাকে উঠতে বসতে ধম্‌কান কত যে! কিন্তু কী করব বলো? ধ্রুবের একটু অসুখ হ'লেও বুক কাঁপে আজো—পারি না কিছুতেই মন থেকে ঠাকুরকে বলতে: ঠাকুর, তোমার দেওয়া ধনের ভার তুমিই নাও। মুখে বলা অবিশ্যি শক্ত নয়, গান গাইতেও মন হয়ত রসিয়ে ওঠে: "তোমার ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী!" কিন্তু তিনি যে অন্তর্যামী, ভাবগ্রাহী মা—মন মুখ এক না হ'লে তো কানে তুলবেন না আমাদের প্রার্থনা—দেবেন না তো তাঁর রাঙা পায়ে ঠাঁই। অথচ সত্যিই কি মতে প্রাণে চাইতে পারি শুধু তাঁর আশ্রয়? বলতে পারি কি মীরাবাইয়ের সুরে গলা সেধে: "তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই?" (চকিতে আঁচলে চোখের জল মুছে) মা, অনেক রুক্ষ সন্ন্যাসীর মুখেই শুনি—বনে জঙ্গলে তপস্যার নামই আসল তপস্যা, গৃহী হ'য়ে সাধনা করা সহজ। তাঁরা কী জানবেন বলো—গৃহীর মন গৃহস্থালিতে কী ভাবে চলে ফেরে—ম'জে যায়—বিশেষ ক'রে মেয়েদের। পুরুষদের

মন তো খানিকটা আকাশেরই আশমানী, অতিথি—তাই ওরা পারে সহজেই মাটির টান কাটাতে। বেগ পায় কেবল মেয়েরাই—কারণ তাদের মনের প্রতিটি তন্তুতে মাটির মমতা গাঁথা। আর সব মমতার বাড়া হ'ল এই সন্তানের মমতা—সব চেয়ে কঠিন তার মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে আসা। আমার নিজের আরো বাজে মা এইজন্যে যে স্বামী আমার জীবন্মুক্ত—অথচ আমি আজো তেমন ক'রে মুক্তি চাইতে পারছি কই? তাই ঠাকুরকে শুধু বলি চোখের জলে মা: "ঠাকুর! হাজার অপরাধ করলেও তোমার চরণছাড়া কোরো না—আর মমতার মোহে ভুল কিছু চাইলেও কান দিও না সে-প্রার্থনায়। আমি জানি না তো কী চাইতে হয়—তুমিই জানিয়ে দিও (একটু থেমে অশ্রুগাঢ় কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে) মা, শোনো বলি। কারণ দয়াময় আজ দুপুর বেলা তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছেন। বলব?

সাবিত্রী (করজোড়ে): আপনার দয়া। কেবল একটা প্রশ্ন: তিনি আমার সম্বন্ধে জানলেন কী ক'রে?

গুরুমা: দয়াময় কিছু শুনেছিলেন গৌরীর কাছে, কিছু পেয়েছেন ধ্যানে। বললেন—কেন তুমি মাসখানেক আগে এখানে আসতে চেয়েছিলে, কেবল আমার প্রহ্লাদ-বাবা রাজী হন নি ব'লেই আসতে পারো নি। কিন্তু ওর এতে দোষ নেই মা! শুধু এইজন্যেই নয় যে, পুরুষরা সচরাচর বুঝতে পারে না মেয়েদের ঠিক কোন্‌খানে বাজে, এজন্যেও বটে যে স্ত্রীরা ধর্মজীবনে সন্তানের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে সার্থক হ'য়ে ফুটে ওঠে স্বামীরা কিছুতেই তার পুরো-পুরি হদিশ পায় না। দয়াময় নিজেও একথা স্বীকার করেন।

সাবিত্রী (সানন্দে): আপনার কথায় যে কতখানি ভরসা পেলাম মা—প্রণাম, প্রণাম! কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা, আজকাল অনেক মেয়ের মুখেই শুনতে পাই যে তারা স্বামী চাইলেও সন্তান চায় না।

গুরুমা (হেসে): চাইবে কেন মা—যদি ধর্ম তাদের প্রাণের পরম লক্ষ্য না হয়। অনেক নবকুলকামিনী তো এমন কথাও বলেন যে, স্বামীও অবান্তর—চাই নাগর,—কারণ বিবাহ ক'রে একঘেয়ে হব কী দুঃখে—মুখ বদলাতে না চেয়ে? অর্থাৎ আজ এক নাগর, দুদিন পরে আর একটি, তার পরে আর একটি—এই তো ভালো—মজাও আছে সাজাও নেই। (গম্ভীর হ'য়ে) এর সবটাই ঠাট্টা নয় মা! হয়েছে কি জানো? দয়াময় প্রায়ই বলেন যে, মানুষের দৃষ্টি যখন বহির্মুখী হয় তখন তার লক্ষ্য তাকেও টানে বাইরে—ঘুরিয়ে মারে দশদিকে। আর বাইরের লক্ষ্য ঝড়ঝাপটায় ছুটোছুটি করতে করতে বদ্‌লে যাবেই যাবে—ঐ এখানে আজ ধরল লাল রং, কাল ওখানে—নীল রং, পরশু সেখানে—সবুজ খানিকটা আলেয়ার মতন। কিন্তু ধর্ম হ'ল অন্তরের আলোপদ্ম—বাইরে তার প্রভা ও গন্ধ পৌঁছায় বটে, কিন্তু ফোটে সে শুধু অন্তরে। এই স্বর্ণকমলের মধুস্বাদ যে একবার পেয়েছে মা, তার কাছে স্বামী স্ত্রী সন্তান ভাই বোন বাপ মা সব কিছুরই স্বাদ বদ্‌লে যায়—যে কথা বলেছিল গোপীরা কৃষ্ণকে। আর বদ্‌লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখে যে, শুধু সেই সম্বন্ধই ধর্মপথে সহায় হয় যে পিছু ডাকে না—এগিয়েই দেয়, বাঁধে না—ছেড়ে দেয়। তাই ভোগের পথে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর যে-সম্বন্ধ এত আদরের—কিনা আসক্তির—ধর্মের পথে সে-সম্বন্ধ নেম্‌নি অচল, সর্বনেশে।

সাবিত্রী (সকুণ্ঠে): আপনার নিজের কী মনে হয় একটু যদি বলেন মা দয়া ক'রে—

গুরুমা (হেসে): কেন বলব না মা, এযে বলবার মতনই কথা—আর বলা চাই বড় গলা ক'রে। কারণ ধর্মের আলোয় যখন মনের কালো কেটে যায় তখন যে আনন্দের ঢেউয়ে ভক্তি প্রেমের পাল তুলে আমরা চলি তার কথা—ভাগবতের ভাষায় যারা বলে আর যারা শোনে তারা তো ধন্য হয়ই—আর যেখানে সেখানে বলা হয় সে-সব স্থান ধন্য হ'য়ে হ'য়ে দাঁড়ায় পুণ্যতীর্থ। (একটু থেমে) আমার নিজের কাছে যে-সত্য ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে দয়াময়ের কৃপায় তার প্রসাদে আমি কী দেখতে পেয়েছি বলব? যে, মেয়েদের গৃহস্থালির মূল-স্বামী, আর ফল-সন্তান। বাকি সব লতা পাতা গন্ধ রং ফুল—জীবনের গানের এক একটি মিড়, গমক, আশ, মূর্ছনা। কিন্তু স্বামী আর সন্তান হ'ল গানের মূল সুর—আস্থায়ী অন্তরা। তাই আমার মন কোনোদিনই মানতে পারে নি মা, যে, পুরুষদের দুয়ো দিতে চেয়ে হাটে বাজারে হাঁক-ডাক ক'রে গৃহলক্ষ্মীর সেবাধর্ম থেকে মুক্তি চাওয়া মেয়েদের স্বধর্ম

হ'তে পারে। তবে এ ধরণের সেকেলে শুনলে নবকুল-কামিনীরা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবেন, তোমারও হয়ত ভালো লাগছে না—কে জানে?

সাবিত্রী: না না, বলুন মা, আরো বলুন—আরো আরো। (আঁচলে আনন্দাশ্রু মুছে) আপনার কথায় আমার যেন বুকের সব তারগুলিই সুরেলা হয়ে বেজে উঠেছে—এক সঙ্গে। শুধু মা, আমার একটি মিনতি—আপনি নিজে আমার ভার নিন—আপনার দুটি পায়ে পড়ি।

সাবিত্রী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, গুরুমা তার মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ গুরুমন্ত্র জপ করেন। তারপর স্নিগ্ধ হেসে বললেন: তুমি মা ভাগ্যবতী—এ আমি দেখতে পেয়েছি। কেবল—

সাবিত্রী (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে): আপনি ভুল দেখেন নি মা! আমি যে ভাগ্যবতী—একথা আমার চেয়ে বেশি কে জানে বলুন। আমার স্বামীর মতন স্বামী ক-টা মেয়ে পায়? কিন্তু তবু সব জেনেও আমার মনে হ'ত এতদিন যে আমি হয়ত স্বভাবে অকৃতজ্ঞ, তাই শিবতুল্য স্বামী পেয়েও নিজেকে সুভাগিনী মনে করতে পারি না—নিঃসন্তান হবার দুর্ভাগ্যকেই এত বড় ক'রে দেখি। কিন্তু কী করব মা? ভুলতে হাজার চেষ্টা করলেও পারি না যে! কোনো মা তার সন্তানকে আদর করছে দেখলেই আমার দেহের প্রতি অঙ্গ যেন "ছেলে ছেলে ক'রে ওঠে। অথচ ওঁকে বলতেও ভয় পাই, কারণ উনি এ-ধরণের খেদ শুনলে মুখ ভার করেন, বলেন ভগবানের দিকে মন দাও—কী পুজো করো ছাই, ত্রিসন্ধ্যা? তাঁর পায়ে ভক্তি না চেয়ে ছেলে চাও বুঝি? (আঁচল দিয়ে চোখ মুছে) কিন্তু ওঁকে দোষ দেব কেমন ক'রে মা—কথাটা যখন সত্যি? আমি ভক্তি নিষ্ঠা পবিত্রতা যে চাই না এমন কথা বলব না, কিন্তু সব আগে সত্যিই যে চাই ছেলে। তাই তো আমার মন সময়ে সময়ে এত কালো হ'য়ে যায় যে, দুঃখে খেদে সত্যিই মনে হয় বিষ খেয়ে মরি—এমন পাপী যে—

গুরুমা (মাথায় হাত রেখে): অমন কথা বলে না মা—ছি! মা হ'তে চাওয়া পাপ নয়, কিন্তু সবার জন্যে যে ঠাকুর এক পথ্যের ব্যবস্থা করেন না এটি ভুললেও তো চলবে না। তাই যদি কোলে সন্তান নাই আসে, তা হ'লে সব সন্তানের মা হবার সাধনা ক'রেই ভুলতে হবে নিঃসন্তান হবার দুঃখ। কোন্ আঘাটা দিয়ে ঠাকুর যে কাকে কোন সার্থকতার ঘাটে টেনে তোলেন—কেউ কি জানে মা? কিন্তু দুঃখ কোরো না তুমি, অনেক সময়ে যে অভাবের মধ্যে দিয়েই স্বভাব বদলায়—এও তো ফাঁকা বুলি বা কথার কথা না মা!

সাবিত্রী: এটুকু আমিও বুঝি মা, কেবল ভয় আসে—সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও ছেয়ে ধরে—যখন দেখি আমি কিছুতেই পারছি না মন স্থির করতে—আরো এই জন্যে যে উনি প্রায়ই বলেন: "মেয়েরা কেন পারবে না ভগবানকে চেয়ে সন্তানের কামনা বিসর্জন দিতে?" মীরাবাই কি পারেন নি?

গুরুমা (মুচকে হেসে): ঐ একটি দেবীর কথাই আমরা বলি, ঘড়ি ঘড়ি ঘুরে ফিরে—যেন মীরাবাই জন্মান ঘরে ঘরে ঝাঁকে ঝাঁকে, যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদেরা গিশ গিশ করছে, রাক্ষসকুলে বিভীষণেরা; বানরকুলে হনুমানেরা। দয়াময়ের শ্রীমুখে শুনেছি, ঠাকুর নিয়মের কর্তা হ'লেও হর্তাও হ'তে পারেন—হনও অনেক সময় তাঁর লীলালাপে নতুন সুর ভাঁজতে, যেমন ওস্তাদেরা বিবাদী সুর এনেও সময়ে সময়ে মিশ্র রাগে নতুন নতুন রসের সঞ্চার করেন। মীরাবাই এই ভাবেই চেয়েছিলেন তাঁর নন্দলালের মধ্যেই—তাত মাত সুত বন্ধু ভাই সবারই দেখা পেতে। তাই বলেন দয়াময় প্রায়ই—মেয়েরা সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে মেয়ে হ'য়েই সার্থক হবে—এ-সূত্রকে বিধির বিধান ব'লে মেনে নিয়েও বলা যায় বৈ কি যে, কখনো কখনো—কোনো বিশেষ প্রয়োজন—মেয়েরা মেয়েলি কামনাকে ডিঙিয়েও সার্থক হবে, এ-ব্যবস্থাও তিনিই দিয়েছেন। কিন্তু দয়াময়ের একথা মেনে নিয়েও আমি বলব যে, মীরাবাই তাঁর নন্দলালার প্রেমে ফুলটি হ'য়ে ফুটে ছিলেন ব'লেই জোর ক'রে বলা চলে না যে, তাঁর কোলে একটি ভক্ত প্রহ্লাদ এলে তিনি আর ফুটতেন না—যেতেন আফোটা ঝ'রে। শুধু ভক্তির বেলায়ই বা বলি কেন, সন্তান যে মুক্তির দীক্ষাও দিতে পারে এমন কথাও তো শাস্ত্রে আছে।

সাবিত্রী (উৎসুক): আছে মা? সত্যি?

গুরুমা: নেই? দেবহুতি? তিনি চেয়েছিলেন স্বামিসহবাস। কিন্তু কর্দম মুনির ঔরসে তাঁর গর্ভে জন্মা-

লেন অবতার-কল্প মহামুনি কপিল। দয়াময়ের কাছে একদিন শুনো ভাগবতের কপিলগীতা-পাঠ—কপিল কী নব অপরূপ কথা বলেছিলেন তাঁর মা দেবহুতিকে। একটি শ্লোক আমার মনে গেঁথে আছে—আমি এ-থেকে নিজের সাধনায় আলো পেয়েছি ব'লে মুখস্থ ক'রে রেখেছি, মাঝে মাঝেই সুর ক'রে বলি বারবার নিজের মনে। কপিলদেব মাকে শিষ্য পেয়ে বলেছিলেন ঃ

যেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥

দয়াময় এর অনুবাদ করেছেন (হেসে) ধ্রুবকে বলতে হবে যে আমিও কিছু খবর রাখি তাঁর অনুবাদের ঃ

একই মন কভু মুক্তি সোপান, বন্ধনে কভু জীবেরে বাঁধে।
বিষয়াসক্তি আনে বন্ধন, ভগবৎ প্রেমে মুক্তি সাধে।

দয়াময় চমৎকার ক'রে বুঝিয়ে দেন—কপিলদেব কী ভাবে মুক্তি ও ভক্তি, পূজা ও জ্ঞানের সমন্বয় করেছিলেন যাতে ক'রে তাঁর মা র চোখ খোলে। কপিলদেব একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন—তাঁর মাকে যে-শ্লোকটি বার বার আমি আবৃত্তি করি পূজার ঘরে (হাত জোড় ক'রে) ঃ

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

দয়াময় এর ভাবটিকে ভিত্তি করে একটি গান বেঁধেছেন (গুণ গুণ ক'রে)

বিরাজি নিখিল জীবের প্রাণে যে-আমি,
নিয়ন্তারূপে প্রেমী অন্তরযামী,
সে আমার করি' অনাদর—বরি'
প্রতিমায় শুধু যে-মূঢ় পূজে আমারে,
ভস্মে সে হবি ঢালে হায় বারে বারে!

(একটু থেমে গাঢ়কণ্ঠে)

এ যদি শুধু কথার কথা না হয় মা—মানে, যদি প্রতি জীবের মাঝেই তাঁকে পাওয়ার নাম হয় পূর্ণ সাধনা, সবার বড়ো আরাধনা—তাহ'লে তাঁকে সন্তানের মধ্যে দিয়েই বা কেন তাঁকে পেতে চাইবে না মায়ের প্রাণ? তিনি সর্বত্রই আছেন, নেই শুধু সন্তানে—এই কথাই কি লীলাবাদের পরম বাণী হ'তে পারে কখনো? সাধনার পথে বাপ-মা ভাই-বোন সবই মঞ্জুর হোক—কেবল স্ত্রী আর সন্তানকে করতে হবে বয়কট্—এ-বিধান যে আমার প্রাণ মানে না মা, কী করব বলো?

সাবিত্রী (তাঁর পায়ে প'ড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) ঃ মা, আপনি ওঁকে বোঝাবেন এইটুকু—শুধু এইটুকু, আর কিছু চাই না আমি। আমার দেবতুল্য স্বামী মা, বলবার কিছুই নেই। কেবল একটি দুঃখ আমি বুকে চেপে রেখেছি ঃ উনি মা-র ব্যথা বোঝেন না।

গুরুমা ঃ হয় কি জানো মা? মেয়েরা সন্তানের মধ্যে দিয়ে যে-ভাবে সার্থক হ'য়ে ফুটে ওঠে ছেলেরা ঠিক সে-ভাবে সার্থক হ'য়ে ওঠে না। দয়াময় আমাকে প্রায়ই বলেন—পুরুষের অপত্যস্নেহ গ'ড়ে উঠতে সময় নেয়, মার স্নেহ গ'ড়ে ওঠে শিশু গর্ভে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তা-ছাড়া বলছিলাম না—পুরুষরা খানিকটা মাটিছাড়া—অনাসক্ত? এখানে অবিশ্যি আমি যথার্থ পুরুষদেরই কথা বলছি, কাপুরুষেরা তো বদ্ধ জীব, গুটিপোকার চেয়েও দুর্ভাগা, তাদের কথা ধর্তব্যই নয়। কী বলছিলাম যেন? হ্যাঁ, পুরুষেরা সহজেই পারে—গীতার ভাষায়—অনিকেত হ'তে। আর বিধাতা তাদের মনকে খানিকটা উদাসী ক'রেই গড়েছেন ব'লেই শাস্ত্রে গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়েছে। ভর্তার চোখ আকাশে উড়তে চায় ব'লেই গৃহলক্ষ্মীর রূপের সুষমার এত নামডাক—কারণ শুধু সেই পারে বেপরোয়াকে বাঁধতে, দায়িত্বহীনাকে দায়িত্বের দীক্ষা দিতে। তবে এ-সবই আমি দয়াময়ের কাছে শিখেছি মা, তাই তুমি তাঁর কাছেই এসব কথার ব্যাখ্যা শুনো পরে; আমি শুধু এসব তোমাকে বলছি যাতে তুমি ভরসা পেয়ে অকারণ ভয়কে কাটিয়ে উঠতে পারো। তুমি তো প্রহ্লাদবাবার অবিদ্যা স্ত্রী নও, বিদ্যাস্ত্রী হ'য়েই তার সহায় হ'তে এসেছ। কাজেই নির্ভরসা হ'তে যাবে কী দুঃখে?

সাবিত্রী (ফের ওঁর পায়ে মাথা রেখে খানিকক্ষণ কেঁদে তারপর উঠে) ঃ মা, আপনার কথা আমার কাছে এসেছে—ঠিক যেমন তুফানে দিশাহারার কাছে ধ্রুবতারা দেখা দেয় ভরসা হ'য়ে। তাই আর আমি নির্ভরসা হব না কোনোদিনও। কেবল আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আজ ঃ গুরুদেব—মানে শ্রীবিষ্ণুঠাকুর—কি সত্যিই ওঁর গুরু হ'য়েই ওঁকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছেন? তাই কি উনি বার বার ওঁকে স্বপ্নে দেখতেন গত কয় বৎসর ধ'রে?

গুরুমা : এসব প্রশ্ন দয়াময়কেই কোরো মা। আমাকে উনি সব বলেন নি। শুধু বলেছিলেন—প্রহ্লাদবাবার সঙ্গে ওঁর যোগ হয়েছে ধ্যানে, আর সে এখানে আসবেই আসবে। কিন্তু তোমার আসার কথা শুনি নি।

সাবিত্রী : মা, আমার এ মিথ্যে কৌতূহল নয়। আমি শুনেছি গুরুই শিষ্যকে বরণ করেন—সময় হ'লে এবং কে কার গুরু গুরু জানেন, যদিও শিষ্য জানে না সব সময়ে। কিন্তু আমি এসবের কিছুই জানি না মা। আমি শুধু জানি—আপনার চরণে আমি আশ্রয় চাই—আপনি আমাকে মন্ত্র দিলে আমি ধন্য হ'য়ে যাব।

গুরুমা (ওর মাথায় হাত রেখে সস্নেহে) : আমি কে মা ? আমি দয়াময়ের শিষ্যা, সেবিকা, দাসী—যদিও তিনি আমাকে মান দিয়ে ডাকেন—সহধর্মিণী। তিনি যা বলেন আমার কাছে বেদবাক্য—শুধু এইটুকুই আমি জানি, মানি। তাই আমি মন্ত্র দিতে পারি—কেবল তিনি অনুমতি দিলে তবে—নৈলে নয়। তোমাদের দুজনের সম্বন্ধে তিনি ঠিক কী ব্যবস্থা করেছেন জানি না। তবে আজ পর্যন্ত আমরা কখনো স্বামীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীকে মন্ত্র দেই নি। তাছাড়া আমি একা কাউকে দীক্ষা দিই না—দয়াময় ভার নিলে তবেই আমি সে-ভারের ভাগীদার হ'তে পারি। কেবল একটি কথা তোমাকে বলি খুলে : আমরা কাউকে কাউকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিলেও দয়াময় গৃহস্থাশ্রমে থেকে সাধনা করারই পক্ষপাতী। তাই দয়াময় নিজেকে কখনো সন্ন্যাসী বলেন না, বলেন গৃহী যোগী, বুঝলে ? এ-আদর্শ আমাদের শাস্ত্রের একটি সনাতন আদর্শ—বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভারত-ভাগবত-পুরাণ-তন্ত্র সব তাতেই যেমন গৃহী যোগীর কথাও আছে, তেম্‌নি গৃহিণী যোগিনীর কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু সব আগে জানা দরকার প্রহ্লাদবাবা ঠিক কী চান। তুমি জানো কি ?

সাবিত্রী : উনি তো অনেকদিন থেকেই উদাসী মা, গুরু খুঁজছেন—সে কবে থেকে! আজ দুপুরে বলছিলেন তাঁর সব খোঁজা সাঙ্গ হয়েছে—আশার অতীত সদ্‌গুরু মিলে গেছে।

গুরুমা (একটু ভেবে) : তাহ'লে—না দয়াময়কে জিজ্ঞাসা না ক'রে তো সঠিক কিছু করতে পারব না মা। তা তোমরা আছ তো দু-চারদিন ?

সাবিত্রী : এযাত্রা হয়ত দশ পনের দিনের বেশি থাকা হবে না। আমার শ্বশুর গেছেন কলম্বোয় এক বন্ধুর অসুখে। তিনি ফিরে আসার আগেই আমাদের ফিরতে হবে। দিদি আমাদের দুদিন আগে তার করবে। মানে, আমরা চাই না তিনি আমাদের মুখে ছাড়া আর কারুর মুখে খবর পান যে, আমরা কাশী এসেছি। তাছাড়া উনি বলছিলেন যে, উনি বাইরে পাঁচজনকে শুধু আমাদের কাশী-বাসের কথাই বলবেন—দীক্ষার কথা গোপন রেখে।' দিদিও এই পরামর্শই দিয়েছে—জানি না আপনাকে লিখেছে কি না।

গুরুমা : লিখেছে। কিন্তু···গোপন কি থাকবে মা ? দয়াময় বলেন—শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। দীক্ষার সাধনার, ধর্মের পথে বাধা কি একটা ? কিন্তু মরুক গে—সে তো পরের কথা—ব্যবস্থাও দেবেন দয়াময় সময়ম'ত।

সাবিত্রী : কবে মা ? কাল ?

গুরুমা (মাথা নেড়ে) : উঁ হুঁ:। পরশুর আগে কোনো কথাই হবে না। কাল যে এক ধনুর্ধর পণ্ডিত আসছেন। উঠবে তর্কের তুফান। সে ফেনা থিতিয়ে গেলে—

সাবিত্রী : সে কি ম ? তর্কের তুফান !

গুরুমা : শোনো নি তুমি ? কাশীতে যে প্রায়ই জাঁকালো তর্কের সভা হয় বহুদিন থেকে। নানা দেশ থেকে পণ্ডিত শাস্ত্রী সাধক যোগী তপস্বীরা আসেন প্রতি-পক্ষের মত খণ্ডন ক'রে বিদ্যা জাহির করতে আর নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে—যেমন শঙ্করাচার্য করেছিলেন মণ্ডন-মিশ্রের মত বা চৈতন্যদেব করেছিলেন বাসুদেব সার্বভৌমের মত—এই সেদিনও দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ, আরো কে কে পেল্লায় পণ্ডিত তর্কের দাপটে কাশী কাঁপিয়ে তুলে-ছিলেন—জানো না বুঝি ?

সাবিত্রী (মৃদু হেসে) : একদিন উনি যেন বল্‌ছিলেন কথায় কথায়। আমি মন দিয়ে শুনি নি। তর্কাতর্কির কথা আর কী শুনব মা ?

গুরুমা (হেসে) : তোমার আর ভাবনা কী বাছা ? থাকো শান্ত ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে। সে-দেশে তো শামিয়ানা ক'রে তর্কের সভা বসে না। বসে ?

সাবিত্রী : না মা। (প্রণাম ক'রে) ব'সেও কাজ

নেই। কিন্তু এ-পণ্ডিতটি কে মা—যিনি কাল আসছেন তর্কে কাশী ফাটিয়ে দিতে?

গুরুমা: শুনেছি এঁর নাম গম্ভীরানন্দ তর্কচঞ্চু—দুর্দান্ত বৈদান্তিক। তাঁকে নাকি কেউ কখনো হাসতে দেখে নি। দাড়ির মেঘে মুখ সর্বদাই অন্ধকার। বহু শিষ্য তাঁর। এ-জগৎকে নাকি দশবৎসর আগেই নস্যাৎ ক'রে দিয়েছেন "অবধূত গীতা" ম্রাওড়ে—বলছিলেন দয়াময়। গত বারো বৎসর নাকি নারীর মুখ দর্শন করেন নি—না রক্তমাংসে, না ছবিতে।—স্বপ্নে আমাদের দেখা পেলে কী করেন জানি না অবশ্য। তবে শুনেছি নাকি মেঘের দিকেও তাকান না—পাছে তার মধ্যে মেয়েদের কালো চুল দুলে ওঠে এই ভয়ে।

সাবিত্রী (খিল খিল ক'রে হেসে): আপনিও মা দুষ্টুমিতে কম যান না। তবে কার দীক্ষায় বোলচালে এমন পাকা হয়েছে এখন বুঝতে পারছি।

গুরুমা (অসহায় হেসে): কী করি বলো মা? এসব পণ্ডিতের রকমসকম দেখে হাসি শুধু এই ভয়ে—পাছে না হাসলে কাঁদতে হয়। ভাবো তো, ইনি নাকি মেয়েদের ছায়া মাড়ালেও গঙ্গাস্নান করেন, গঙ্গা না থাকলে বিল-ডোবা-নালাস্নানই সই। কেবল ভাবি মা—আঁতুড়ঘরে তাঁর মার বুকের দুধে পুষ্ট হওয়ার জন্যে তাঁর অনুতাপে তনু দগ্ধ হয় কি না। তুমি শুনবে তর্ক? কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তর্ক হবে শুনছি।

সাবিত্রী: রক্ষে করুন মা, পণ্ডিতি তর্ক—ও আমি কী বুঝব?

গুরুমা: আহা, বোঝার কি মাত্র একটি বৈ ছন্দ নেই? দয়াময় বলেন সেই বিখ্যাত বুড়ীর গল্প—তোমাদের মারাঠী দেশে এ-গল্পের চল আছে কি না জানি না। ভাগবত পণ্ডিত ব্যাখ্যা করছিলেন—ছলী বামনঠাকুর কী ভাবে বলিকে অপদস্থ করলেন। শুনতে শুনতে বুড়ী কেঁদেই সারা। পণ্ডিত তো মহা খুসি—এমন ভক্তিমতী বুড়ী! পাঠের শেষে তাকে ডাক দিলেন। বুড়ী আসতে সস্নেহে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বুড়ী গদ্‌গদকণ্ঠে বলল: "আহা, বাবা! আমার একটি বুড়ো ছাগল ছিল—ঠিক তোমার মতন বুড়ো, আর অবিকল ঠিক অম্‌নি দাড়ি। সে গত সংক্রান্তিতে পটল তুলেছে। তোমার ছাগলদাড়ি আর মাথা নাড়া দেখে আমার কেবলই তার মুণ্ডু মনে পড়ছিল, আর প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠছিল। ঠিক অম্‌নি দুলত তার দাড়ি—আর অম্‌নি ফ্যালফেলে ছিল তার দৃষ্টি বাবা! মনে হচ্ছিল—যেন তোমরা দুটি ভাই।

সাবিত্রী হেসে গড়িয়ে পড়ে। গুরুমাও যোগ দেন সে-হাসিতে। হাসি থামলে সাবিত্রী বলে: "কিন্তু আমি কেঁদে ভাসিয়ে দেব কোন্ ছুতোয়? ইনি তো আর কোনো শাস্ত্র থেকে পাঠ দেবেন না মা।"

গুরুমা: কিন্তু গর্জাবেন তো হাঁক ছেড়ে। কী দুর্দম গর্জানি জানো না তো মা। এম্‌নি আর এক অবধূত এসেছিলেন গেল বছর। তিনি আবার গান বাঁধেন। তাতে এক জায়গায় আছে: শিবঠাকুর! মিথ্যে পঞ্চশরকে ভস্ম করলে—কবি ভয় দেখিয়েছেন সে-ভস্ম বিশ্বময় ছড়ানো হয়েছে—কাজেই মদন মরলেও তাঁর ছোঁয়াচ কাটানোর আর উপায় রইল না। তাই শেষে লিখেছেন:

ভস্ম করো ক্রুদ্ধ হয়ে ভস্মকে
নইলে যোগীও মরবে যে অবশ্য হে!

সাবিত্রী (খিল খিল ক'রে হেসে): আমি নিশ্চয় তর্ক শুনব মা। কেবল আপনি পাশে থাকবেন তো আমাকে ভস্ম হ'য়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে? [ক্রমশঃ

মহাকাব্য ও নবীনচন্দ্র

অলোক রায়

মনীষা এবং কবিপ্রতিভা, যদিও এই দুয়ের মধ্যে কোনো প্রকৃত বিরোধ নেই, তবু প্রায়শই এরা সমান্তরাল-গতি। মনীষীরূপে নবীনচন্দ্রের কীর্তি যত প্রশংসনীয়, মহাকবিরূপে তাঁর পরিচয় তত উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও দুঃখের, কিন্তু সব সময়েই আমরা যা চাই, তা পাই না। নবীনচন্দ্রের প্রবল অহমিকা এবং অন্যের সম্বন্ধে অবজ্ঞা যদিও তাঁর আত্মজীবনীর প্রতি ছত্রে উচ্ছ্বসিত, তথাপি মহাকাব্য-রচয়িতা হিসাবে তাঁর দাবী আজকে আমরা স্বীকার করি না। মহাকাব্য লেখার মন কিংবা শৈল্পিক-বোধ, কোনোটাই তাঁর ছিল না। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, এই ত্রয়ী কাব্যের বিরাট পরিকল্পনা তাঁর মনীষার পরিচায়ক—অনেক পড়েছিলেন তিনি, তার থেকেও বেশি ভেবেছিলেন, সর্বোপরি উপলব্ধি করেছিলেন এক পরম জীবন সত্য। নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাই দ্বিধার অবকাশ নেই—তিনি তাঁর ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং কবি হিসেবে তাঁর পক্ষে যতটা দেওয়া সম্ভব, সবটাই দিয়েছেন। অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত কৃত্রিম মহাকাব্যগুলির মধ্যে নবীনচন্দ্রের পরিকল্পিত ত্রয়ীকাব্যই সবশেষে লেখা। মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যের আংশিক সাফল্য, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের প্রায় ব্যর্থতা এবং অখ্যাতনামা অন্যান্য কবিদের অনুল্লেখ্য প্রয়াস নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কাজেই মধুসূদন, এমন কি হেমচন্দ্রের থেকেও নবীনচন্দ্র অনেক বেশি পরবর্তীকালীন হওয়ায়, তাঁর কাব্য পূর্বসূরীদের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি করবে না, এমন একটি অসম্ভাব্য আশা আমাদের মনে জাগে, তাঁর কাব্য পড়বার আগে।

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্য তিনটি নবীনচন্দ্র লিখেছিলেন, একটি বিশেষ তত্ত্ব কথাকে প্রকাশ করার জন্য, কিংবা বলতে পারি, তিনি চেয়েছিলেন পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের কর্ম এবং ভাবমূর্তির এক নূতন যুগোচিত ব্যাখ্যা দিতে। বলা বাহুল্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং প্রশংসনীয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য বিরোধ ও প্রাসঙ্গিক আরও নানা ঘটনা-চরিত্র বর্ণিতব্য হওয়ায় কাব্যটি হয়েছে অতিরিক্ত দীর্ঘ (মোট পঞ্চাশ সর্গে সমাপ্ত)—দশ বছর ধরে এই কাব্যটি তিনি লিখেছেন। দৈর্ঘ্যের ফলে অনেক কথা বলবার সুযোগ যেমন তিনি পেয়েছেন, তেমনি তিনটি দীর্ঘ কাব্যে কবি-প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটা অসম্ভব হয়েছে,—প্রায়শই কৃত্রিম প্রয়াসে কাব্য রচনার কাজ এগিয়েছে। অথচ তিনটি কাব্যের কোন একটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলেও মহাকাব্য বলবার উপায় নেই—চরিত্র এবং ঘটনার বিকাশ এবং পরিণতির জন্য তিনটি কাব্যই একত্রে সন্নিবিষ্ট এবং সেই ভাবেই বিচার্য। স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কোনোটিই মহাকাব্য হয়ে ওঠেনি। সেটা সম্ভবও নয়। তাই সমগ্রভাবেই ত্রয়ীকাব্যের স্বরূপ আলোচনা করবো আমরা। কিন্তু আমাদের এই প্রয়াসও সার্থক হওয়ার উপায় নেই, কারণ স্বতন্ত্রভাবে এই কাব্যত্রয়ী যেমন সম্পূর্ণ নয়, তেমনই সমষ্টিগতভাবেও তাদের মধ্যে আত্মার যোগ নেই। অথচ মহাকাব্যের মধ্যে এই সামগ্রিক ঐক্য অবশ্য প্রয়োজন। নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে মহাভারতের নানা বিচিত্র কাহিনীর একত্রীকরণ করেছেন, এবং তাছাড়াও বহু কল্পিত উপকাহিনী তার সঙ্গে যোজনা করেছেন। মহাকাব্যের বিশালতা বলতে নবীনচন্দ্রের ধারণা ছিল চরিত্র সংখ্যায় বহুলত্ব এবং কাহিনী অংশের দৈর্ঘ্য। ফলে শ্রীকৃষ্ণ থেকে দুর্বাশা, অর্জুন থেকে বাসুকি, সুভদ্রা থেকে সুলোচনা, সত্যভামা থেকে শৈলজা, এবং সর্বোপরি জরৎকারু—এতগুলি চরিত্রের একত্র সমাবেশ হয়েছে। বিচিত্র তাদের জীবন-ইতিহাস, বিচ্ছিন্ন তার কর্মপদ্ধতি, এবং উদ্দেশ্যহীন তাদের আগমন-নির্গমন। তাই কাহিনীগত বিস্মৃতি যদিও এখানে আছে, এবং অন্ততঃ প্রভাসের আখ্যানবস্তু প্রায় মহাকাব্যোচিত, তবু সমগ্র-

ভাবে ত্রয়ী কাব্য, কিংবা এককভাবে 'প্রভাস' কাব্য মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হয়নি।

'প্রভাসে'র কাহিনীভাগ চিত্তাকর্ষক। দুটি শক্তিমান বিরোধী দলের সংঘর্ষে একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গেল। একে তো প্রায় ইলিয়াডের সঙ্গেও তুলনা করা চলে। কিন্তু ইলিয়াডের আখ্যানবস্তু আশ্চর্য সংহত, যদিও সেই আদিমযুগের মহাকাব্যের অনেক বেশি শিথিলও হতে পারতো, যেমনই ধরা যাক অডিসি। কিন্তু আধুনিক কালের সাহিত্যিক মহাকাব্যের সবচেয়ে বড়োগুণই হচ্ছে তার সংহতিগুণ। বাওরা সাহেব যার সম্বন্ধে বলেছেন: 'It's aim is to pack each line with as much significance as possible, to make each word do its utmost work and to secure that careful attention which reader, unlike the listener can give.' (From Virgil to Milton)। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি মহাকাব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে—'মেঘনাদবধকাব্য' যদিও মধুসূদনের আবেগোচ্ছল প্রাণবন্যা স্বতস্ফূর্তি লাভ করেছে, তবুও কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত এবং তার চরিত্রনির্বাচন থেকে সুরু করে কথোপকথন এবং বর্ণনায় অনন্যসাধারণ এক সংযমবোধ লক্ষিত হয়। একেই বলতে পারি ধ্রুপদী মনের পরিচয়। নবীনচন্দ্রের এই ধ্রুপদী মন ছিল না—তিনি হলেন রোমান্টিক কবি। (এখানে 'রোমান্টিক ' শব্দটী শিথিল অর্থে প্রয়োগ করেছি)। তাই যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তিনি গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু 'রঙ্গমতী'র মতো আখ্যায়িকা কাব্যে যে অসংযম অসহ্য নয়, 'প্রভাসে'র মতো মহাকাব্যের ছাঁচে ঢালা কাব্যে তা অবশ্য বর্জনীয়। নবীনচন্দ্রের মন বিক্ষিপ্ত কাহিনীকে অবলম্বন করে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে—মহাকাব্যের কাহিনীর মধ্যে যে গভীরতা থাকে তা থাকতে পারেনি। ফলে যদুবংশ ধ্বংসের কারণ, তার প্রস্তুতি এবং সবশেষে বিনষ্টি বিচিত্র ঘটনার সমবায়ে 'awe and grandeur' বাগাতে পারেনি। কৃষ্ণের মৃত্যুতে কবি অনেক চোখের জল ফেলেছেন, কিন্তু আমাদের মন তা পড়তে পড়তে জীবনের অত্যাপান্তিক চিরন্তন সত্য এবং মানবের অসহায়তার কথা স্মরণ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় না। অথচ মহাকাব্যের প্রাণসত্তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আবার ক্রমে স্পষ্ট করেই বলেছেন—'Unity is not an external affair. There is only one thing which can master the perplexed staff of epic material into unity ; and that is an ability to see in particuliar human experience some significant symbolism of man's general destiny' (The Epic)। কাজেই যাঁরা বলেন, আধুনিক যুগে সার্থক মহাকাব্য লেখা না হয়ে ওঠার কারণ বিক্ষিপ্ত মনন এবং দ্রুত সঞ্চারমান ঘটনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁরা সম্ভবতঃ মহাকাব্যের প্রকৃত প্রাণপরিচয় আবিষ্কার করতে পারেন নি, কারণ এই বিংশ শতাব্দীতেই টমাস হার্ডি তাঁর যুগচিহ্নিত ডায়নাস্ট নামে মহাকাব্য লিখতে সক্ষম হয়েছেন। আসল কথা, আবার এম্নি উল্লিখিত এই বিশেষে 'ability' নবীনচন্দ্রের ছিল না। ('রৈবতক' সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মন্তব্য করেছেন—'This huge epic, in twenty books, is marred by an apathetic in congruity that is repulsive and fatal.')।

অথচ মহাকাব্য লেখার সবগুলি মালমসলা নবীনচন্দ্র সংগ্রহ করেছিলেন—ইতিহাস বা পুরাণাশ্রিত কাহিনী, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন নায়ক, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল পরিব্যাপ্ত পটভূমিকা, বীর-শৃঙ্গার এবং করুণরসের প্রবাহ। কিন্তু তবু মহাকাব্য হোলো না, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস একত্র ভাগে কিংবা পৃথক পৃথক হয়ে। আসলে এটি হয়েছে পুরাণকেন্দ্রিক রোমান্টিক আখ্যান কাব্য এবং সেই ভাবেই কাব্যটিকে বিচার করে দেখতে হবে।

মহাকাব্য তো বটেই, এমন কি পুরাণাশ্রয়ী যে কোনো কাব্য নাটকের রচয়িতার একটা অন্যতম দায়িত্ব থাকে সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম না ঘটানো। যদি পুরাণের পুনর্মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো আধুনিক কবি সিদ্ধরসের বিকৃতি ঘটান তাহলে তা প্রায়শই জনচিত্তের সমর্থনে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে আধুনিক কবি তাঁর যুগচিত্তের প্রতিফলন ঘটিয়ে পৌরাণিক উপাখ্যানের যে আদর্শ বিচ্যুতি ঘটালেন তাতে সমালোচক কখনোই ক্ষুব্ধ হন না, যদি কাব্য হিসাবে তা সার্থক বিবেচিত হয়। কিন্তু পুরাণ

অনুস্মৃতির যে দায়িত্বের কথা আগে বলেছি তা কেবল সংস্কৃত আলংকারিকদের কাছেই নয়, কবির নিজের কাছেও বটে। মহাভারতের একটা সুপরিচিত চরিত্র যার একটা সুগঠিত ক্রমান্বয় সমন্বিত রূপ প্রচলিত আছে, তাকে যদি পরিবর্তন করতেই হয়, তবে তার সুসংবদ্ধ একটি নূতনরূপও দিতে হবে। নবীনচন্দ্র মহাভারতের চরিত্রগুলির যথেচ্ছ-ভাবে পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু সেজন্য বীরেশ্বর পাঁড়ে যতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন সে রকমটা হওয়া আমাদের দরকার নেই, কারণ 'সিদ্ধরস' নিয়ে আমরা অতিরিক্ত চিন্তা করতে প্রস্তুত নই আজ। তবে কাব্য বিচারে চরিত্র বিচারও অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ—আর এর মধ্যেই যখন নবীনচন্দ্রের প্রকৃত মৌলিকতা নিহিত, তখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি এখানে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখবো।

মহাকাব্যের চরিত্র হবে অসাধারণত্বপূর্ণ। কিন্তু এই অসাধারণত্ব অস্বাভাবিক কিংবা অসম্ভাবিত নয়। এক-দিকে অতি প্রকৃত ও পরিচিত, অন্যদিকে অতিপ্রাকৃত ও অপরিচিত—উভয়বিধ সীমার মধ্যবর্তী এবং নিজ বৈশিষ্ট্যে বিস্ময়কর চরিত্রাবলী মহাকাব্যের সম্যক উপযোগী। মহা-কাব্যের কাহিনীর মতই তার চরিত্রের মধ্যেও একটা বিশালতা থাকবে। প্রেমে দুর্বার, ক্রোধে উন্মাদ, প্রতি-হিংসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এই সব চরিত্রের মধ্যে একটা প্রচণ্ড একমুখিতা থাকে। বলাই বাহুল্য, এরা হোলো টাইপ চরিত্র, কেউ বীর, কেউ প্রেমিক, কেউ খল। এদের মধ্যে সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে—বহির্জীবনের যে পরি-পূর্ণতা, মনোজীবনে সেই অপূর্ণতা তাদের চরিত্রকে বিশেষত্ব দিয়েছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের চরিত্রেরা কিন্তু এই রকম 'flat character' নয়। তাদের মধ্যে আধুনিক জীবনের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত এবং সন্দেহ সংশয় অজস্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আঁকাবাঁকা এই মনের গতি—মহত্ব এবং নীচতা, ক্ষমা এবং প্রতিহিংসা, প্রেম এবং কাম পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির সংঘাতে এদের দোলাচল চিত্তবৃত্তি নিত্য রহস্যময়। এদের মধ্যে একমুখীতা নেই—বিরাটত্ব নেই। বিশালতা নেই, অর্থাৎ সব মিলিয়ে এরা মহাকাব্যের চরিত্র নয়।

কিন্তু একথাটিতো প্রশংসার্থেও প্রযোজ্য হতে পারতো। হ্যামলেট কিংবা ফাউস্টের মতো আধুনিক চরিত্র সৃষ্টি কবির পক্ষে বিশেষ গৌরবময় কীর্তি। নবীনচন্দ্র তাঁর বিরাটাকায় আখ্যান-কাব্যে অজস্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোনোটিই সম্যকরূপে সার্থকতা লাভ করেনি। এর কারণ আমাদের মনে হয়, নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যের চরিত্রগুলি নির্বাচনকালে নিঃসংশয় ছিলেন না। পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্র নিশ্চয় সবচেয়ে বেশি আধুনিকতার সম্ভাবনাপূর্ণ। দীর্ঘ একটা জীবন—অজস্র ঘটনা এবং চরিত্রের সঙ্গে জড়িত, সর্বোপরি তাঁর মুখে যে কোনো কথাই বসানো চলে, যে কোনো ভাবেই তাঁর কথাকে ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছেন ভারতীয় মনে মহা-ভারতের নায়ক—একই সঙ্গে ধর্ম ও কর্মের পথপ্রদর্শক। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের মান-রাগটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন —চরিত্রটিকে বাস্তবতর করে তোলার জন্য। উপরন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ এবং ভাগবতের তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণের মধ্যে পরিকল্পনাগত একটা মৌল পার্থক্য বর্তমান। ভারতীয়ের মনে কৃষ্ণ যখন ভগবান স্বয়ং—তখন তাঁর জীবনে অধ্যাত্মদর্শন এবং উদ্বেল ভক্তিস্বাদ উভয়ই প্রকট। নবীনচন্দ্র কৃষ্ণের সমগ্র মূর্তিটিকে তুলে ধরতে পারেন নি। তিনি কৃষ্ণকে 'সর্বত্রগ, অনির্দেশ্য, কূটস্থ অচল' বলে মনে করা সত্ত্বেও কৃষ্ণের উপর একই সঙ্গে প্রেমিক ও রাজনীতিকের দ্বৈতভূমিকা আরোপ করেছেন। ফলতঃ কবির কল্পনায় বিমূর্ত অধ্যাত্মচেতনা এবং বাস্তব ইন্দ্রিয়-নির্ভর মানবরূপের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়নি। কৃষ্ণ জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠেন নি।

আসলে নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্রই আদর্শ-বাদ দ্বারা পরিশুদ্ধ। ফলে তারা একটু বেশি বক্তৃতা দেয়, উপদেশ দেওয়ার সুযোগ পেলে কখনোই ছাড়ে না, হৃদয়-ভারে সদাই বিব্রত, এবং আত্মবিশ্লেষণে নিপুণ। ফলে মহাকাব্যোচিত চরিত্র যেমন তারা হতে পারেনি, তেমনি আধুনিক কাব্য নাটকের চরিত্র হিসেবেও তার একান্ত ব্যর্থ প্রয়াস। তাদের ভিতর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের নিতান্ত অভাব। তবে নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট সব কটি চরিত্রই অল্পবিস্তর রোমান্সধর্মী (কিন্তু ইংরেজী রোমান্টিক যুগের শেলী-কীট্স বা কোলরিজের রোমান্টিক আখ্যানকাব্যের সঙ্গে এর কোনোরূপ সাদৃশ্য নেই)। একমাত্র বায়রণের রোমান্স কাব্যগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে—শ্রীকৃষ্ণ থেকে সুরু করে

জরৎকারু এবং দুর্বাসা পর্যন্ত সকলেই কিছু পরিমাণে সেই আদর্শে গঠিত।

তারপর আসে মহাকাব্য হিসাবে এই কাব্যের রস বিচার। আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্র মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে প্রধানত আট বা নয়টি স্থায়ীভাবে বিভক্ত করে আট বা নয়টি রসের পরিকল্পনা করেছে। বিশ্বনাথ বলেছেন—বীর,শৃঙ্গার কিংবা শান্তরস মহাকাব্যের অঙ্গীরস হয়ে থাকে। আমরা জানি আনন্দবর্ধনের মতে রামায়ণ মহাকাব্যের অঙ্গীরস হোলো করুণ। কাজেই বোঝা যাচ্ছে আলঙ্কারিক রসবিচারের এমন কোনো সর্বজনীন ভিত্তি নেই যার দ্বারা স্থিরনিশ্চয় হয়ে যে কোনো কাব্যের রস এবং সেই সঙ্গে তার সম্পূর্ণতা ঘোষণা করা যায়। মহাকাব্যের রস বিচার বলতে তাই আমরা বুঝবো মহাকাব্যপাঠে আমাদের মনে যে ভাব বা সংবিদ জাগে, তাই। আসলে অল্পবিস্তর সব সার্থক কাব্যপাঠেই আমাদের মনে একটা বিস্ময়ের ভাব জাগে—এই বিস্ময় বোধ যখন বিরাট কিছুর দ্বারা উদ্বোধিত হয়, তখন তা একটা বিশিষ্ট রসের সঞ্চার করে, ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত যার নাম দিয়েছেন 'বিশাল রস'। ইংরেজ সমালোচকেরা একেই epic grandeur বলে থাকেন। নবীনচন্দ্রের কাব্য পড়ে জীবনের কোনো পূর্ণতর রূপ বা ভাব আমাদের মনে জাগে না। জীবন সম্বন্ধে কোনো বলিষ্ঠ আশাবাদ তো এখানে নেই, কাব্যের শেষে শুধু পাই প্রচুর হরিনাম এবং নির্বেদ শান্তি। কাব্যের অধিকাংশ চরিত্রই নিজেদের জীবনের ক্ষুদ্রতর আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রতিহিংসা নিয়েই তৃপ্ত—তার মধ্যে বিশালতার কোনো আভাসমাত্র নেই। কাব্যের কতক কতক অংশ খুবই সুন্দর—বর্ণনা চিত্তগ্রাহী, কিন্তু কাব্যের ফলশ্রুতি অর্থাৎ total effect মহাকাব্য—ঈপ্সিত ভীতি এবং সম্ভ্রম (awe and respect) জাগায় না। মহাকাব্যের উতুঙ্গ-শিখর-স্পর্শী গম্ভীরতা, কিংবা অতলান্ত সমুদ্রের গভীরতা কিংবা দিগন্তবিস্তারী প্রান্তরের উন্মুক্ততা—কিছুই নবীনচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। ছোট ছোট কতকগুলি মানুষ, যাদের পা ঠেকে আছে এই মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু মানসিক গঠনে নেই স্বাভাবিকতা, কাজে এবং ভাবনায় নেই ক্রমান্বয়, বক্তৃতাগন্ধী তাদের কথাবার্তা, এবং রোমান্সনিষ্ঠ তাদের পরিবেশ—এই নিয়ে মহাকাব্য রচনাতো হয়ই না, সার্থক কাব্যরচনাও অসম্ভব।

এককালে অবশ্য নবীনচন্দ্রের কাব্য বাঙালী পাঠককে সুগভীর আকর্ষণ করেছিল, অনেক ভাবিয়েছিল এবং ভাববার সুযোগ দিয়েছিল। তত্ত্বের দিক দিয়ে এই কাব্য অসাধারণ—চমৎকার দর্শন এবং পুরাণ ব্যাখ্যা হিসাবেও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্যদিকে নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিরূপতম সমালোচক বীরেশ্বর পাঁড়ে থেকে আধুনিক কাব্যপাঠক পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেন যে 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' একান্ত সুখপাঠ্য—ভাষা অত্যন্ত সুমিষ্ট (হেমচন্দ্র পড়ার পরই 'নবীনচন্দ্র পড়লেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়), ছন্দ সুসম এবং স্বচ্ছন্দ প্রবাহিনী।

কিন্তু তবু আমাদের বলতেই হচ্ছে যে, নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রকাশভঙ্গী তথা ভাষা-ছন্দ, কোনোটিই মহাকাব্য বিচারে প্রশংসনীয় নয়। সাহিত্যে অসংযম সর্বদাই পরিত্যাজ্য, বিশেষ করে ধ্রুপদী সাহিত্যে তো কথাই নেই। নবীনচন্দ্র লিখতে বসেছেন মহাকাব্য; মিলটন এবং মধুসূদন, হোমার এবং হেমচন্দ্র সবই তাঁর পড়া আছে—তবু মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে তাঁর মত অসংযত কবি কস্মিন কালেও দেখা যায় নি। নবীনচন্দ্রের এই কাব্যের সঙ্গে তুলনা যদি করতে হয়, তবে একমাত্র উইলিয়ম মরিসের The Story of Sigurd the Volsung'-এরই তুলনা চলে। মরিসের এই কাব্যটি যে কোনো অর্থেই মহাকাব্য নয়, এই বিচার প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলেছেন তা নবীনচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে অতি যথার্থভাবেই প্রযোজ্য : 'The first book is magnificient, everything that epic narrative should be ; but after this the poem grows long—winded and that is the last thing epic poetry should be. It is written with a running pen ; so long as the verse keeps going on, Morris seems satisfied, though it is very often going on about unimportant things and in uninteresting manner.' (The Epic.)

ভাবের ক্ষেত্রে যে অসংযম নবীনচন্দ্রের কাব্যের সর্বত্র পরিস্ফুট, ভাষা এবং ছন্দের ব্যবহারেও তার প্রকাশ

অনিবার্য হয়েছে। অত্যন্ত অসতর্কভাবে শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি, ফলে একই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দোষের হয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুকরণ করতে গিয়ে তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন, কারণ যতির বন্ধন ছিন্ন করার অর্থই ভাবের বন্ধন শিথিল করা নয়, তা তিনি জানতেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের দৃঢ় নিবদ্ধ গঠন তিনি মোটেই আয়ত্ত করতে পারেন নি—সে পরিমিতি-বোধ আদৌ তাঁর স্বভাবেই ছিল না। মিত্রাক্ষরেও নবীনচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। নূতনত্বের মধ্যে দীর্ঘায়িত পয়ার অর্থাৎ ১৪ অক্ষরের জায়গায় ১৬ অক্ষর ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বলাবাহুল্য এতে clcse l syllable এর সুবিধা পাওয়া যায় না। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ত্রিপদীর বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়, সম্ভবতঃ ত্রিপদী দিয়ে তিনি পয়ারের ত্রুটি দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পয়ারের তুলনায় ত্রিপদী অনেক বেশী লঘু, এবং মহাকাব্যের পক্ষে অনুপযোগী। তাছাড়া একই কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহারের ফলে ছন্দের কোনো সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি হয়নি—বলাবাহুল্য মহাকাব্যের grand style এর জন্য একই ছন্দ ব্যবহার প্রয়োজনীয়। নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রকাশভঙ্গী লঘু, প্রায়শঃ গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ, তবে সামগ্রিকভাবে তা রোমান্টিক আখ্যানকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত।

সুভাষচন্দ্র

শান্তশীল দাস

চক্ষের আড়ালে গেছ, মন তাই শত মূর্তি নিয়ে
তোমার আরতি করে হৃদয়ের নানা অর্ঘ্য দিয়ে।
দুর্গম পথের যাত্রী, অশান্ত, নির্ভীক, অবিরাম
চলেছ যাত্রার পথে কণ্ঠে নিত্য ঝরে মাতৃনাম।
শৃঙ্খল মোচন চাই, মোছাতেই হবে অশ্রুজল,
দীর্ঘ নিপীড়নে আঁখি জননীর বেদনা-তরল—
আর কোন পণ নয়, মাতৃমুক্তি একমাত্র পণ,
শত্রুর বিনাশ চাই ব্যথিতের দুঃখ বিমোচন।

দুষ্টের দমন তরে বারে বারে আসে ভগবান ;
দেখেছি তোমার মাঝে দিব্যদ্যুতি, তাঁর অধিষ্ঠান।
বহ্নিমান ও হৃদয় সদা দীপ্ত, তীক্ষ্ণ খড়্গ সম
অবিশ্রান্ত ছুটেছিলে তন্দ্রাহীন ভেদ করি তমঃ
হতাশার নিরাশার, জলন্ত উল্কার গতি সাথে
বেদনা বন্ধুর পথে, ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্যোগের রাতে।
সর্ব বাধা বিঘ্ন নিত্য মেনেছিল শত পরাজয় ;
জননীর আশীর্বাদ দীপ্ত ভালে অটুট অক্ষয়।

বিস্ময়ের ইতিহাস রচনা করেছ প্রতিদিন,
সোনার অক্ষরে লেখা আছে সব, কখন মলিন
হবে না সে ; যুগে যুগে মুক্তিকামী মানবের দলে
দেবে আশা, দেবে ভাষা, তারা তব আদর্শের তলে
একাসনে বসে দীক্ষা নেবে নম্র শ্রদ্ধানত হয়ে,
দুর্জয়ের পথে পথে তোমার আশিস্ শিরে লয়ে
হাসি মুখে যাবে চলে, অদম্য উৎসাহে অবিচল,
তুচ্ছ করি সর্ব বিঘ্ন সাধনায় অজেয় অটল।

তোমারে স্মরণ করি, যেথা থাক এপারে ওপারে,
(মৃত্যুর আয়ুধ কোথা মৃত্যুঞ্জয়ে মুছে দিতে পারে)
মরণ বিজয়ী বীর, দিব্যমূর্তি দেশ প্রাণ তার,
ত্যাগদীপ্ত ও জীবন, যৌবনের জলন্ত আধার।
দীক্ষা দাও ত্যাগব্রতে, মন্ত্র দাও স্বদেশ প্রেমের,
সব গ্লানি মুক্ত হয়ে উদার প্রসন্ন জীবনের
অধিকারী হয়ে যেন যোগ্যতার দিই পরিচয়,
তোমার জীবনালোকে এ জীবন হোক দীপ্তিময়।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত

"আনন্দ-রাধম্" নামক সংস্কৃত-নাটকের কয়েকটী দৃশ্য

অভিনয় স্থান—দ্বারকা, সৌরাষ্ট্র

অভিনেতৃমণ্ডলী—কলিকাতা প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্যবৃন্দ ॥

তারিখ—৫ই অক্টোবর, ১৯৬২

প্রথম দৃশ্য—দানকেলি ॥

শ্রীরাধার ভূমিকায় শ্রীমতী মধুশ্রী রায়কে গাগরি-হস্তে ধ্যানমৌনভাবে দেখা যাইতেছে।

"আনন্দ-রাধম্" নাটকের হিন্দোলযাত্রা দৃশ্য (ঝুলন)

বাঁ দিক থেকে—(১) শ্রীমতী মধুশ্রী রায়—শ্রীরাধা (২) শ্রীসুখেন্দুবিমল আঢ্য—শ্রীকৃষ্ণ।

দানকেলি দৃশ্যের শেষাংশে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মিলন।

বাঁদিক থেকে—(১) শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায়—সুবল; (২) শ্রীসুখেন্দুকুমার আঢ্য—শ্রীকৃষ্ণ; (৩) শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্য—বিশাখা; (৪) শ্রীমতী মধুশ্রী রায়—শ্রীরাধা; এবং (৫) শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী—ললিতা ॥

"আনন্দ-রাধম্" নাটকের শেষ দৃশ্য—(মাথুর)

বাঁ দিক থেকে—(১) শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্য্য—বিশাখা। (২) শ্রীমতী মধুশ্রী রায়—শ্রীরাধা এবং (৩) শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী ॥

তোর আপন আলোয় জ্বালতে হবে দেশের প্রাণের আলো

উপানন্দ

তোমরা হয়তো অনেকে জানো না, যে ম্যাকমোহন লাইনের অধিকার রক্ষার জন্যে শান্তিকামী ভারতবর্ষকে আজ বাধ্য হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হোতে হয়েছে। সেই ম্যাক মোহন লাইনের ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাদের জেনে রাখা দরকার, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদের প্রশ্ন করাও হোতে পারে। এই ম্যাকমোহন লাইনের স্রষ্টা হচ্ছেন বৃটিশশাসিত ভারতে পাঞ্জাবের এককালীন কমিশনার চার্লস ম্যাক-মোহনের পুত্র। এঁর পুরোনাম জেনারেল সার আর্থার হেনরী ম্যাকমোহন। প্রথম বয়সে ইনি সৈনিক ছিলেন। তারপর ক্রমে তদানীন্তন ভারত সরকারের রাজনীতিক দপ্তরে যোগ দেন। পরে বৈদেশিক দপ্তরে সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। পিতা চার্লস ম্যাকমোহনের কাছ থেকে ভূবিদ্যা ও জরিপে ইনি বাল্যকালেই দক্ষতা লাভ করেন। নিজে পরে এই বিষয়ে চর্চা করে বিশেষজ্ঞরূপে প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনিই আফগানিস্থান ও বেলুচিস্তানের সীমানা নির্দ্ধারণ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে চীন তিব্বতে হামলা করে লাসা অধিকার করলে, ভারত ও তিব্বতের সীমানা সুচিহ্নিত করার প্রয়োজন দেখা দিল। এই উপলক্ষে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে সার আর্থার যে সীমা রেখা নির্দ্দেশ করেন, তা-ই ম্যাকমেহন লাইন নামে বিশ্ববিদিত। ত্রিশ বৎসর পরে চীনের মানচিত্রে তিব্বতকে চীনের একটি প্রদেশরূপে দেখানো হয়, তারপর আরো দশ এগারো বছর পরে তিব্বত চলে যায় সরাসরি চীনের এক্তিয়ারে। আজ চীন এতই স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠেছে যে, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে চীন ম্যাকমোহন লাইনকে সীমানা বলে মানতে চায় না।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৮ই নবেম্বর সিমলায় সার আর্থার হেনরী ম্যাকমেহন জন্মগ্রহণ করেন। আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী দিনে অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! চীন ভারত আক্রমণ করেছে। এই সাম্যবাদী চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়। এদের যেমন খাদ্য-সঙ্কট, তেমনই অর্থনৈতিক সঙ্কট। যে সব দেশ থেকে খাদ্য এনেছে, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সকলের পাওনা টাকা চীনকে মিটিয়ে দিতে হবে। তা না হোলে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ চীনকে ছাড়বে না। টাকার পরিমাণ বড় কম হবে না, ২৫০ কোটি টাকা।

সোভিয়েট রাশিয়াও একজন পাওনাদার। কোরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া চীনকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করেছিল। এখনও তার দরুণ অনেক টাকা পাওনা। সেই সরবরাহের পুরো দাম রাশিয়া পেতে চায়। কমিউনিজম রক্ষার জন্য ঐ যুদ্ধ, নিজের স্বার্থে নয়, এ বক্তব্য শুনে সোভিয়েট রাশিয়া মোটেই আশ্বস্ত হয় নি, বরং ক্ষুব্ধ হয়েছে—সে টাকা দাবী করেছে। চীনের বড় বড় পরিকল্পনা আজ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। দেশের লোককে না খেতে দিয়ে বিদেশ থেকে যে

সব লক্ষ লক্ষ টন খাবার এসেছে, তা সৈন্যদের জন্যে সঞ্চিত করেছে লাল চীন। পর পর তিন বছর গেছে আকাল, দেশের মানুষ পেটের জালায় ছটফট করছে। এর ওপর প্রতিবছর এককোটি কুড়ি লক্ষ করে লোক বেড়েই চলেছে চীনে। পশ্চিমী দেশগুলির কাছে তার পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ। চুক্তিমত ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তার খাদ্য পাওয়া অসম্ভব হবে।

অনিশ্চিত ঘূর্ণী হাওয়ার মত লাল চীনের জটিল পরিস্থিতি। কমিউনিষ্ট শাসন পাকা-পোক্ত করে লাল চীন দ্রুত শিল্পায়নের দিকে জোর দিয়েছিল, বিশ বছরের কাজ একদিনে সমাধা করব এই ছিল তার বুলি। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রামবাসীদের সহরে টেনে আনার দিকে লাল চীন বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ক্ষেত খামার ছেড়ে গ্রাম থেকে দলে দলে চীনেরা এলো সহরে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনে নগরবাসীর সংখ্যা ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ থেকে ৯ কোটি ৫৭ লক্ষে এসে দাঁড়ালো। ঐ সময়ের মধ্যে কল কারখানার শ্রমিক সংখ্যা ৮০ লক্ষ থেকে বেড়ে হোলো ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ। ফলে গ্রামাঞ্চলে দক্ষ কৃষকের অভাবে ফসল উৎপাদনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। মহাচীনে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামলো। পর পর তিন বছর অজন্মা হওয়ার দরুণ সাধারণ মানুষ হোলো কঙ্কালসার। পাগলা তোগলকের মত চৌ-এন লাই। আবার নতুন শ্লোগান হোলো 'সিয়াফাং' অর্থাৎ আবার গ্রামে ফেরো। কোন আপত্তি চলবেনা। ইতিমধ্যে চীনের সহরগুলি থেকে ব্যাপকভাবে শ্রমিক অপসারণ সুরু হয়েছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ শেষ হওয়ার আগেই চীনের শহরবাসী প্রায় দুই কোটি শ্রমিককে সপরিবারে গ্রামে ফিরে যেতে হবে।

এরই চাপে পড়ে কয়েকলক্ষ লোক আশ্রয়ের প্রত্যাশায় হংকং এ প্রবেশ করেছে। এরা উদ্বাস্তু। এদের অবস্থা শোচনীয়, প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে। লাল চীনে আজ মানবতার বহিঃপ্রকাশ নেই, চলেছে বুভুক্ষু জনসাধারণের ওপর নৃশংস অত্যাচার আর রাষ্ট্রদৈত্যের আস্ফালন। আজ লেখাপড়ার পাততাড়ি গুটিয়ে দিয়ে ছেলে মেয়েদের টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে কোন কাজে। মাও চৌং বর্ব্বর নীতির জন্যে ক্ষোভ থাকলেও বিক্ষোভ প্রকাশ নেই। প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধ যেখানে আধিপত্য বিস্তার করেছে, সেখানে জনশক্তির কণ্ঠরুদ্ধ। এ ভারতবর্ষ নয় যে এক পেয়ালা চা নিয়ে রেঁস্তোরায় বসে বসে রাজা উজির মেরে গর্ভ-বথাটের পরিচয় দিয়ে রাষ্ট্রঘাতী মন্তব্য প্রকাশ করবে, আর নীরবে তা হজম হয়ে যাবে। চীনে এরকম করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্বাসরোধ করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এইটি হচ্ছে লাল চীনের স্বরূপ।

দলের হুকুম মানতে হবে। সেখানে আদালতের বিচারও প্রহসনে পর্য্যবসিত। লাল চীনে কমিউনিষ্ট রাজত্বে গত বারো বছরে এক বিবাহ আইন ছাড়া উল্লেখ-যোগ্য কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইন গৃহীত হয় নি। সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দ্দেশ অনুসারে হাকিমদের হুকুম চালাতে হয়। তাই জনৈক চৈনিক বিচারপতি ১৯৫৮খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারীর কিয়াং মিং ডেলিতে দুঃখ করে যা লিখেছিলেন তার মধ্যে একস্থানে উল্লিখিত আছে যে—চীনে বিশ্বাসযোগ্য কোন আইনই নেই। কর্তৃপক্ষ যখন বলেন হত্যা করতে, বিচারকও তখন দেন হত্যার আদেশ। যখন ছেড়ে দিতে বলা হয়, বিচারকও তখন ছেড়ে দেন—এই হচ্ছে লাল চীনের সাম্প্রতিক স্বরূপ। এদের রাজনীতি হচ্ছে কসাইনীতি। প্রধান জল্লাদ লিও-সা-চি। ইনি মাউসেতুনের পদলেহী, ভাবী লালচীনের কর্ণধার। লালচীনের ভূমিলালসার উদগ্রতার ইন্ধন জোগাচ্ছেন লিও-সা-চি। মাউসেতুন বা চৌ এন লাইয়ের চেয়েও ইনি আরও নিষ্ঠুর, আরও বর্ব্বর—বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে একটি বিশিষ্ট ধূমকেতু।

ভারত শান্তিপ্রিয় হোলেও দুর্ব্বল নয়, নিরপেক্ষ হলেও নির্ব্বান্ধব নয়—এই সত্য আজ লাল চীন উদ্ঘাটিত করে নিজের হিসাবের ভুল বুঝতে পারছে। চীনের যুদ্ধবাজ নেতাদের সাম্রাজ্য অচিরে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, তার লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনস্রোতকে জলস্রোতের মত ভারতবর্ষের দিকে ঠেলে দিয়ে চীন নিজের কবর নিজেই খুঁড়তে বসেছে। আজ যখন দেখি প্রেসিডেন্সিকলেজের শান্তনু ভট্টাচার্য্য, গোয়েঙ্কা কলেজের বৈদ্যনাথ রায় ও হরগোবিন্দ দাসের মত আদর্শ দেশপ্রেমিক ছাত্র চৌরঙ্গীতে জুতা পালিশ করে ১৯৬ টাকা ৬৩ নয়া পয়সা সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে ঐ দিনেই বিকেলে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে জমা দিয়েছে, তখন শুধু আনন্দিত হইনি, গর্ব্ব অনুভব করেছি। কবি বলেছেন 'তোর আপন আলোয় জ্বালতে হবে দেশের প্রাণের আলো—' কবির বাণী সার্থক হয়ে উঠেছে। বুঝেছি আমাদের পর তোমরা যারা এসেছ, প্রত্যেকেই সব্যসাচীর মত। তোমরা জন্মভূমির এক একটি স্তম্ভ, স্বদেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে কিছুমাত্র কার্পণ্যবোধ করবেনা এবিশ্বাস হয়েছে।

তোমাদের আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ চারিত্রিক বল, সত্যের সাধনা ও ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতি ভারতের সর্ব্বপ্রকার বিপন্নতাকে দূর করে স্বাধীনতার মহামহিমাকে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি তোমরা। দেশকে রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের মধ্যে আছে। ষোলবছরের ছিলেন অভিমন্যু—তিনি এতবড় বীর ছিলেন যে সপ্ত মহারথীকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছিলেন, তাঁকে হত্যা করতে বহু শক্তিক্ষয় করতে হয়েছিল।

তোমরা অভিমন্যু, বিজয় সিংহ, বাদল, জালিম প্রভৃতি কিশোর তরুণ বীরগণের উত্তরসাধক। তোমরা থাক্‌তে ভারতবর্ষ কোনক্রমেই পরপদানত হবে না। আজকের দিনে তোমাদের কার্য্য-কলাপ দেখে এই কথাই বারম্বার প্রমাণিত হচ্ছে। জাতীয় পতাকা রাষ্ট্রের প্রতীক। এই পতাকার সম্মান সর্ব্বোচ্চ। দেশরক্ষার জন্যে এই পতাকা আমাদের প্রধান অবলম্বন, এরই তলে দাঁড়িয়ে বলো সমবেত কণ্ঠে—'বন্দেমাতরম।' জয় হবে, জয় সুনিশ্চিত।

এই 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রই আমাদের সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রাণের জাগরণ এনেছিল। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ডে চল্লিশ কোটি নরনারীর শিরা-উপশিরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা এনেছিল, ব্রিটিশ সিংহের ভারত ত্যাগের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই মন্ত্রই জাগ্রত, এর ঐতিহ্য ভোলা যায় না। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে জাতীয় পতাকা নিয়ে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করো। ধ্বংস করো দেশের পঞ্চম-বাহিনী যারা চীন ও পাকিস্থানের দালাল। দেববীর্য্যে বলীয়ান ভারত, তাই জয়ের অধিকারী।

দেশপ্রেমিকের প্রাণদানে লোকশিক্ষা হয়, জনগণের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। দেশের কল্যাণের জন্যে, জাতির কল্যাণের জন্যে যে প্রাণ দান করে, তার মত মহৎ ব্যক্তি নেই। শুধু যারা মরে, তাদের কোন সম্মানপ্রাপ্তির অধিকার নেই। মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক গতি। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দেশের জন্যে, দশের জন্যে প্রাণ দেয় সে ইতিহাসে অমর। বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন কাপুরুষেরাই পাপ করে বীর কখনই পাপ করে না।

আজ কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—

'যতদিন দেহে আছে প্রাণ, ততদিন
সাথে আছে ভগবান,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, তোর হবেনাকো
পরাজয়।'
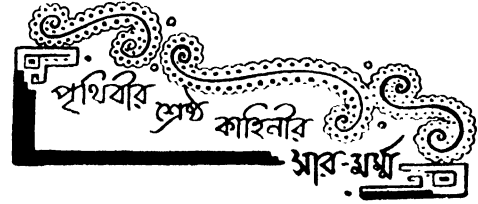
অজ্ঞাতনামা ইতালীয় সাহিত্যিক
রচিত

রাজা ফিলিপ আর তাঁর বন্দী গ্রীক-ক্রীতদাস

সৌমা গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এ ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজা ফিলিপের হঠাৎ কি খেয়াল হলো—কারাগার থেকে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতকে প্রাসাদের খাশ-কামরায় ডাকিয়ে এনে তাকে বললেন,—পণ্ডিত-মশাই, প্রজাদের মুখে নিত্য শুনছি আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির সুখ্যাতি···নিজেও বারকয়েক তার কিছু-কিছু পরিচয় পেয়েছি ইতিমধ্যে···তাই আজ ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে—আমার ব্যক্তিগত-জীবনের বিশেষ একটি প্রশ্নের জবাব জানবার জন্য। এ প্রশ্নের সঠিক-জবাব যদি দিতে পারেন, তাহলে···

রাজার কথা শেষ হবার আগেই বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত শান্ত-কণ্ঠে শুধোলেন,—বেশ তো···বলুন মহারাজ, কি প্রশ্নের জবাব আপনি জানতে চাইছেন?

রাজা প্রশ্ন করলেন,—বলতে পারেন, পণ্ডিত মশাই··· আমি কার পুত্র?···অর্থাৎ, আমার পিতার কি পেশা ছিল?···

রাজার এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে রাজ্যের পাত্রমিত্র-অমাত্যেরা তো সবাই অবাক!···এ আবার কি আজব-প্রশ্ন? দেশ-বিদেশের লোকে সবাই ভালোভাবেই জানে—রাজা ফিলিপ কার পুত্র এবং তার পরলোকগত পিতা অর্থাৎ, এ রাজ্যের শ্রদ্ধাভাজন বুড়ো-রাজাবাহাদুর কত বড় বিক্রম-শালী আর সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন! কি বিপুল শক্তিবলে মহামহিম বুড়ো-রাজাবাহাদুর দিনের পর দিন নিজের হাতে এই বিশাল রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন···তার সুযোগ্য-পুত্র হিসাবেই, রাজা ফিলিপ আজ এদেশের রাজ-সিংহাসনের অধিকারী! রাজ্যের ছোট-

ছোট শিশুদের কাছে পর্যান্ত যে কথা আজ অজানা নেই, সেই প্রশ্নের জবাব জানতে চাইছেন রাজা ফিলিপ স্বয়ং…এই বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের কাছে? এ কি রাজার কৌতুক-পরিহাস…না, আর কিছু?…সবাই রীতিমত বিস্ময়ান্বিত হলো! এমন কি, বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত পর্য্যন্ত সবিস্ময়ে বললেন,—ভারী আজব প্রশ্ন করে বসলেন কিন্তু, মহারাজ! আপনি নিজেই তো ভালোভাবে জানেন—আমাদের পরম-শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গত রাজাবাহাদুরের একমাত্র পুত্র আপনি! কাজেই, আমাকে আবার এ প্রশ্নের জবাব দিতে বলার অর্থ?…

বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের কথা শুনে রাজা ফিলিপ সদর্পে গর্জ্জে উঠলেন,—বাজে ওজর দেখিয়ে আমার আসল-প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না, পণ্ডিত-মশাই…যে কথা জানতে চেয়েছি, তার যথাযথ জবাব দিন! না হলে, আদেশ অমান্য করার অপরাধে, এখনি জল্লাদকে ডাকিয়ে এনে আপনার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেবো।

রাজার রূঢ়-আচরণে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না…বরং কিছুক্ষণ রাজা ফিলিপের পানে তাকিয়ে থেকে দৃপ্ত-কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, —বেশ…তাহলে শুনুন, মহারাজ—আপনার প্রশ্নের সঠিক-জবাব!…ভাগ্যচক্রে এ রাজ্যের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলেও, আপনি আসলে কিন্তু অতি-সামান্য এক রুটিওয়ালার পুত্র! আমাদের পরম-শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজাবাহাদুর, অর্থাৎ আপনার পূজ্যপাদ পিতৃদেব বিক্রম বলে এ-রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাজা হবার আগে, তার আদি-পেশা ছিল নিজের হাতে রুটি বানিয়ে সে-রুটি বাজারে বিক্রী করে কায়ক্লেশে কোনো মতে দিন কাটানো…এই হলো আপনার পিতার আসল পরিচয়।

গ্রীক-পণ্ডিতের এই নিদারুণ মন্তব্য শুনে রাজার অমাত্য পার্শ্বচরের দল তো স্তম্ভিত!…বলে কি পণ্ডিত!…সাহস তো কম নয়!…এতবড় রাজ্যের একচ্ছত্র-অধিকারী…তিনি কিনা একজন সামান্য রুটিওয়ালার সন্তান! দেশশুদ্ধ প্রজারা সবাই, এমন কি, শিশুরা পর্য্যন্ত জানে যে রাজা ফিলিপের দেহে বইছে বুড়ো-রাজাবাহাদুরের বোনেদী রাজ-রক্ত… তাঁকে মুখের উপরে এমন মারাত্মক-জবাব দেওয়া…এ যে রীতিমত অপমান! লোকজন সবাই শিউরে উঠলো…গ্রীক পণ্ডিতের এই বেয়াদবীর ফলে, রাজা ফিলিপ রোষভরে বন্দীর গর্দ্দানা নেবার আদেশ না দিয়ে বসেন শেষ পর্যান্ত! প্রবীণ-পণ্ডিতের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে অমাত্য পার্শ্বচরের দল সশঙ্কিতভাবে রাজার পানে তাকালো।

বৃদ্ধ-পণ্ডিতের জবাব শুনে রাজা ফিলিপের মুখ রাগে উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠলো…কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে তিনি কি যেন চিন্তা করলেন…তারপর কাকেও কোনো কথা না বলেই সভাগৃহ ছেড়ে সটান চলে গেলেন অন্তঃপুরে—রাজ-মাতার কক্ষে।

অন্তঃপুরে হাজির হয়েই রাজা ফিলিপ বিধবা রাজ-মাতার কাছে জানতে চাইলেন—স্বর্গতঃ রাজাবাহাদুরের আদি-পেশার আসল পরিচয়…অর্থাৎ, বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত এইমাত্র সভায় সকলের সামনে যে নিদারুণ কথা বলেছেন, সে কথা সত্যি কিনা! পাছে পুত্রের মনে এতটুকু আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় বৃদ্ধা-রাজমাতা প্রথমে নানা কথার সুকৌশলে তার স্বর্গত-স্বামীর আদি-পেশার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলেও, শেষ পর্য্যন্ত রাজা ফিলিপের একান্ত-অনুরোধে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের কথা সম্পূর্ণ নির্ভুল! এ রাজ্য জয় করার বহু-কাল আগে, প্রথম-জীবনে রাজা ফিলিপের পূজ্যপাদ-পিতৃ-দেব বাস্তবিকই ছিলেন দীন-দরিদ্র অতি-সামান্য এক রুটি-ওয়ালা…নিজের হাতে রুটি বানিয়ে, আর সে-রুটি বাজারে বিক্রী করে কোনোমতে তিনি দিন-গুজরাণ করতেন! পরে অবশ্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিল তার…নিজের ক্ষমতা-বলে তিনি ক্রমশঃ নগণ্য-রুটিওয়ালা থেকে সৈনিক, সৈনিক থেকে সেনাপতি এবং শেষ পর্য্যন্ত সেনাপতি থেকে এই বিশাল রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হয়ে উঠেছিলেন। তবে সে সবই বহু পুরোনো কাহিনী এবং তার প্রথম-জীবনের দুঃখ-কষ্টের এই ইতিহাস জানেন আর অল্প লোকই…মাত্র দু'চারজন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ-অন্তরঙ্গ বন্ধু আর আত্মীয়…তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন আর ইহলোকে নেই…যে দু'একজন আছেন [illegible] সেই অতীত-স্মৃতি মনে রেখেছেন, [illegible] ও আর পুরানো দিনের সেই অপ্রীতিকর ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গের পুনরালোচনা করতে রাজী নন।

রাজ-মাতার কাছে পৈত্রিক পেশার আসল-পরিচয় জেনে গম্ভীর-মুখে রাজা ফিলিপ ফিরে এলেন তার সভা-গৃহে… অমাত্য পার্শ্বচরদের সবাইকে বিদায় দিয়ে তিনি কৌতূহল-ভরে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতকে বললেন,—আপনার অসামান্য জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেচনাশক্তির সুস্পষ্ট-প্রমাণ পেয়েছি প্রচুর! তাই আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—কেমন করে, কোন অদ্ভুত বিদ্যাগুণে আপনি অনায়াসে এমন জটিল-প্রশ্নের যথাযথ-জবাব দিতে পারলেন—সেই রহস্যটুকু জানতে চাই?

রাজার এতখানি আগ্রহ দেখে মৃদু হেসে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত জবাব দিলেন,—বেশ, তাহলে শুনুন, মহারাজ…সব কথাই খুলে বলছি আপনাকে!…আপনার সেই বহুমূল্য ঘোড়ার সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলুম, তার রহস্য-বিচার করে-ছিলুম—সেই ঘোড়াটির কানের গড়ন দেখে! নিজের মায়ের দুধ খেয়ে যে ঘোড়া বড় হয়ে ওঠে, তার কানের-রোঁয়া কখনো খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে না…কারণ, ঘোড়ার

কানের রোঁয়া সর্ব্বদাই থাকে তার কানের-চামড়ার সঙ্গে আগাগোড়া সমানভাবে লুটিয়ে মিশে···আর গাধার কানের রোঁয়া বরাবরই দেখা যায় কানের চামড়ার উপরে কাঠির মতো খাড়া আর সিধা-উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···এই হলো, এ ছুটি জীবের কানের রোঁয়ার গঠন-বৈশিষ্ট্য ! সুতরাং এই বিশেষ-লক্ষণ পরীক্ষা করে দেখেই আমি বলেছিলুম যে ঘোড়াটি শৈশবে গাধার দুধ খেয়ে লালিত হয়েছে।

বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে রাজা ফিলিপ কৌতূহলভরে প্রশ্ন করলেন,—আর সেই অমূল্য রত্ন-মণির ভিতরে ছোট্ট পোকাটি সেঁধুনোর রহস্য ?

গ্রীক-পণ্ডিত স্মিত-হাস্যে জবাব দিলেন,—সে রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলুম—রত্নটি হাতে নিয়ে পরখ করবার সময় ! অর্থাৎ, পাথর আর মণি-রত্ন সবই জড়-পদার্থ···তাদের মধ্যে কোনো রকম প্রাণ-শক্তির স্পন্দন বা চাঞ্চল্য থাকে না··· তাই এ সব জড়-পদার্থের নিজস্ব কোনো তাপ নেই··· সচরাচর দিনে রোদ্দের তাপে এগুলি হয় উত্তপ্ত, আর রাত্রে হিমের পরশে হয়ে ওঠে শীতল ! এই হলো প্রকৃতির নিয়ম ! প্রকৃতির এই চিরাচরিত-নিয়মানুসারে, সেদিন পরখ করার উদ্দেশ্যে রত্নটি হাতে তুলে নিতেই দেখলুম, সেটি বেশ উত্তপ্ত··· তাই বুঝলুম, সেই শীতল জড়পদার্থের মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই প্রাণ-শক্তি লুকিয়ে রয়েছে ! তবে অতটুকু ঐ রত্ন-মণির ভিতরে তো কোনো বিরাট প্রাণী লুকিয়ে থাকতে পারে না···কাজেই অনুমান করলুম যে ওর মধ্যে নিশ্চয় কোনো ছোট্ট পোকা সেঁধিয়ে রয়েছে ! সে অনুমান যে মিথ্যা নয়, রত্নটি ভেঙ্গে টুকরো করে ফেলতেই হাতে-হাতেই তার প্রমাণ মিলে গেল !

গ্রীক-পণ্ডিতের কথা শুনে সাগ্রহ কৌতূহলে রাজা ফিলিপ প্রশ্ন করলেন,—কিন্তু আমার পিতৃদেবের আদি-পেশা ছিল যে রুটি-বানানো···এ সন্ধান আপনি জানতে পারলেন, কি বিচার করে ?

মৃদু হেসে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত বললেন,—এ তো খুব সহজ বিচার, মহারাজ ! প্রথমে ঘোড়ার সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তার যথাযথ-জবাব দিতে পেরেছিলুম বলে প্রসন্ন হয়ে আপনি আমার আহারের জন্য প্রতিদিন আধখানা রুটি বরাদ্দ করেছিলেন ! দ্বিতীয়বারে রত্ন-মণির ভিতরে পোকা-সেঁধুনোর সঠিক-সন্ধান দিয়েছিলুম বলে, খুশী হয়ে আপনি আমার জন্য পুরো একখানা রুটি বরাদ্দ করেছিলেন ! আপনি রাজার ছেলে, রাজ-বংশধর এবং নিজেও রাজা হয়ে এ রাজ্যের সিংহাসনে বসেছেন। কাজেই আমার কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে আপনি আমাকে কত কি সোনাদানা, জমিজমা, বাড়ীঘর, এমন কি, রাজ্যের খানিকটা অংশ পর্য্যন্ত পুরস্কার দিতে পারতেন। কিন্তু তেমন দামী-জিনিস কিছু পুরস্কার না দিয়ে, সামান্য এক-আধ টুকরো রুটি বরাদ্দ করেই আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ দেখালেন ! দুনিয়াতে ভালো আর দামী শত-সহস্র রকমের পুরস্কারের সামগ্রী থাকতেও, খুশী হয়ে শুধু ঐ এক-আধ টুকরো রুটি বরাদ্দ করার দিকেই আপনার একান্ত ঝোঁক দেখে আমার সুস্পষ্ট-ধারণা জন্মেছিল যে আপনি নিশ্চয়ই বোনেদী রাজ-বংশের সন্তান নন—সম্ভবতঃ অতি-সামান্য ঘরের ছেলে—তাই আপনার নজর এত খাটো ! কোনো খাঁটি-রাজার বংশধর হলে, দু'দুবারই পুরস্কার দেবার সময় আপনার উঁচু মন আর বোনেদী নজরের পরিচয় পেতুম—আপনার দেওয়া উপহার-সামগ্রী পছন্দের নমুনা দেখে···কিন্তু বোনেদী-উপহারের বদলে, প্রত্যেক বারেই আপনি প্রাণখুলে রুটির টুকরো দান করেছেন, এবং তাও নিতান্ত সামান্য···প্রথমে, দৈনিক—আধখানা, আর পরে, দৈনিক—পুরো একখানা মাত্র ! সুতরাং আপনি যে বোনেদী রাজবংশের সন্তান নয়, নগণ্য দীন-হীন কোনো রুটিওয়ালার ছেলে, এ কথা অনুমান করা আর শক্ত কি, মহারাজ ?

বিচক্ষণ প্রবীণ গ্রীক-পণ্ডিতের যুক্তি কথা শুনে রাজা ফিলিপ শুধু যে রীতিমত মুগ্ধ হলেন তাই নয়, এ যাবৎ তার মতো এত বড় জ্ঞানী-গুণীর প্রতি যে অন্যায়-অবিচার করে এসেছেন, তার জন্য মনে মনেও খুবই লজ্জা পেলেন !

অনুতপ্ত হয়ে রাজা ফিলিপ নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে, পরম শ্রদ্ধাভরে নিজের হাতে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের শৃঙ্খল-উন্মোচন করে, সাদরে তাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন রাজ-সিংহাসনের পাশে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর গদীতে এবং পুরস্কার হিসাবে রাজ-কোষাগার থেকে দামী-দামী উপহার উপঢৌকন আনিয়ে তুলে দিলেন প্রবীণ-বন্দীর হাতে ! এতদিনে রাজ-দরবারে জ্ঞানী-গুণী বিচক্ষণ গ্রীক-পণ্ডিতের যোগ্য সমাদর হলো দেখে দেশের সবাই মহারাজ ফিলিপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।
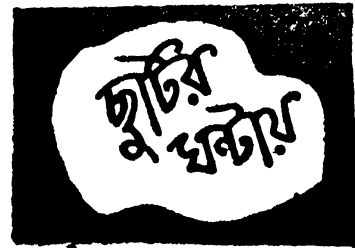
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের যে বিচিত্র খেলাটির কথা বলছি, সেটিও ভারী মজার। এ খেলার কলা-কৌশল খুবই সোজা এবং সামান্য যে ছ'চারটি ঘরোয়া সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে

বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি অন্য পাঁচজনের সামনে দেখানো যায়, সেগুলি জোগাড় করাও এমন কিছু দুঃসাধ্য বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়। সামান্য চেষ্টা করলেই তোমরা অনায়াসেই এ খেলার কায়দা-কানুন শিখে নিতে পারবে। তবে যাঁরা এ খেলার আসল-রহস্যটুকু জানেন না, তাঁরা কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও, বুদ্ধি খাটিয়ে এ কারসাজির কোনো হদিশই সহজে খুঁজে পাবেন না। কাজেই সে রহস্যের মর্মটুকু আগাগোড়া শিখে ও আয়ত্ত করে নিয়ে, তোমরা যদি সুষ্ঠুভাবে এ খেলাটি তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে দেখাতে পারো, তাহলে তাঁরা যে শুধু রীতিমত অবাক হবেন তাই নয়, তোমাদের বুদ্ধির আর হাত-সাফাইয়ের কায়দারও তারিফ করবেন সবাই একবাক্যে!

এ খেলার কলা-কৌশলের কথা বলবার আগে, খেলাটি দেখাতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার লাগবে, তার একটা ফর্দ দিই। অর্থাৎ, এখেলা দেখানোর জন্য চাই— জল-ভর্ত্তি বড় একটি গামলা, এক টুকরো বরফের চাঙড় (a block of ice), খানিকটা গুঁড়ো নুন আর আন্দাজ লম্বা সুতো। তবে সুতোটি এমনই নাতিদীর্ঘ (Short lenght) হওয়া প্রয়োজন যে, সেটি দিয়ে কোনমতেই যেন ঐ বরফের চাঙড়াটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বাঁধা সম্ভব না হয়। এদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার, নইলে এ খেলার মজা তেমন জমবে না। সামান্য এই কয়েকটি সামগ্রী তোমরা অনায়াসে তোমাদের বাড়ী থেকেই জোগাড় করে নিতে পারবে শুধু বরফের চাঙড়টুকু বাজার থেকে কিনে নিলেই চলবে। অবশ্য তোমাদের মধ্যে যারা শহরে থাকো কিম্বা যাদের বাড়ীতে 'রেফ্রিজারেটর' (Refrigerator বা 'বরফ-রাখার বাক্স' (Ice Box) আছে, তাদের পক্ষে এই বরফের চাঙড় জোগাড় করার কোনো অসুবিধা হবে না...তবে যাদের বাড়ীতে এসব সামগ্রী নেই এবং যারা মফঃস্বলে বা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করো, তাদের পক্ষে কিন্তু এত সহজে বরফ জোগাড় করা মুস্কিল, কিন্তু এ মুস্কিলের আসান হতে পারে—অবস্থা বুঝে বুদ্ধি খাটিয়ে সাম উদ্যোগ আর যথোচিত-ব্যবস্থা যদি করো। কারণ, কথায় বলে—উদ্যোগী-পুরুষের কপালেই শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীলাভ ঘটে। তাই অবস্থা বুঝে উদ্যোগ আর অন্য ব্যবস্থার ভার তোমাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আপাততঃ বিজ্ঞানের এই মজার খেলার কলা-কৌশলের পরিচয় দিই।

এ খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর দর্শকদের সামনে, সমতল মেঝে কিম্বা টেবিলের উপর জল-ভর্ত্তি গামলাটিকে সাজিয়ে রেখে, তার মধ্যে বরফের ঐ চাঙড়টিকে ভাসিয়ে দাও। এবারে পাশের টেবিলে সাজিয়ে-রাখা খেলার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে থেকে নাতিদীর্ঘ ঐ সুতোটি দেখিয়ে দর্শকদের আহ্বান জানাও তাঁদের মধ্যে কে এমন বাহাদুর আছেন যিনি বুদ্ধি খাটিয়ে এবং কায়দা করে মাত্র একটি হাতে ছোট্ট ঐ সুতোর-ফালিটি ধরে গামলার-জলে-ভাসন্ত বরফের চাঙড়খানিকে কোনো রকম বাঁধনে না বেঁধে, সম্পূর্ণ অটুট-অবস্থায় জলেরপাত্র থেকে সরাসরি তুলে আনতে পারেন! তোমাদের আহ্বানে বাহাদুরী-দেখানোর নেশায় মেতে দর্শকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এগিয়ে আসবেন—তাঁদের বুদ্ধির আর হাতের কেরামতির পরিচয় দিতে...কিন্তু বিজ্ঞানের এই আজব-খেলাটির বিচিত্র কলা-কৌশলের আসল-তথ্যটুকু জানেন না বলেই, তাঁরা প্রত্যেকে শেষ পর্যন্ত রীতিমত নাজেহাল হবেন। এমনিভাবে দর্শকদের সবাই যখন কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে অবশেষে হার মানতে বাধ্য হবেন, তখন দিব্যি হাসি-মুখে শান্তভাবে তাঁদের প্রত্যেককে তাক্ লাগিয়ে দাও—এই অসাধ্য-সাধনের নিতান্ত সহজ-সরল বৈজ্ঞানিক-রহস্যময় কায়দা-কৌশল দেখিয়ে।

অর্থাৎ, প্রথমেই ঐ নাতিদীর্ঘ-সুতোটির একপ্রান্ত হাতে ধরে ঝুলিয়ে, সুতোর অপর-প্রান্তটিকে গামলার-জলে-ভাসন্ত বরফের চাঙড়ের চূড়োর উপর খানিকক্ষণ ছুঁইয়ে রাখো... নীচের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ভঙ্গীতে।

বরফের চাঙড়ের উপর কিছুক্ষণ এমনিভাবে সুতোর ঐ প্রান্তটিকে ঝুলিয়ে রাখার ফলে, সুতোটি যখন বেশ ভিজে সপ্ সপে হয়ে উঠবে, তখন সেটিকে বরফের চাঙড়ের উপরে ফেলে রেখে সেখানে খানিকটা গুঁড়ো-নুন ছড়িয়ে দাও এভাবে নুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশের বরফ গলে গিয়ে, সুতোর আশেপাশে সামান্য একটু জল জমবে...আর সেই জলে ভিজে, সুতোটি আগাগোড়া বেশ সুসিক্ত (Wet) হয়ে উঠবে। তোমরা সবাই দেখেছো এবং জানো—উত্তাপ (Heat) পেলেই জমাট শক্ত বরফ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ গলে জল হয়ে যায়... কাজেই বিজ্ঞানের সেই নিয়মানুসারে, এক্ষেত্রেও তাই

ঘটবে···এবং এই উত্তাপটুকু আমদানী হবে, আশপাশের জমাট-বরফ আর ঐ বরফ-গলা জল থেকে। তার ফলে, বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে, বরফের চাঙড়ের চুড়োয়-রাখা ঐ সুতোর-প্রান্তের আশপাশের গলিত-জলটুকু জমে আবার সঙ্গে সঙ্গে জমাট-শক্ত বরফে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে এবং গলিত-জলের ভিতরকার সুতোর-প্রান্তটিও জমাট-বরফের মধ্যে পাকাপোক্তভাবে আটকে থাকবে। তখন ঐ সুতোর অপর প্রান্তটিকে একহাতে ধরে অনায়াসেই বরফের চাঙড়খানিকে জলের গামলা থেকে সরাসরি উঠিয়ে আনা সম্ভব হবে। এই হলো—এবারের বিচিত্র-মজার খেলাটির আসল-রহস্য।

পরের মাসে, এমনি-ধরণের অভিনব মজার বিজ্ঞানের আরো একটি খেলার কথা বলার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। হিজি-বিজি-ছবির হেঁয়ালী ঃ
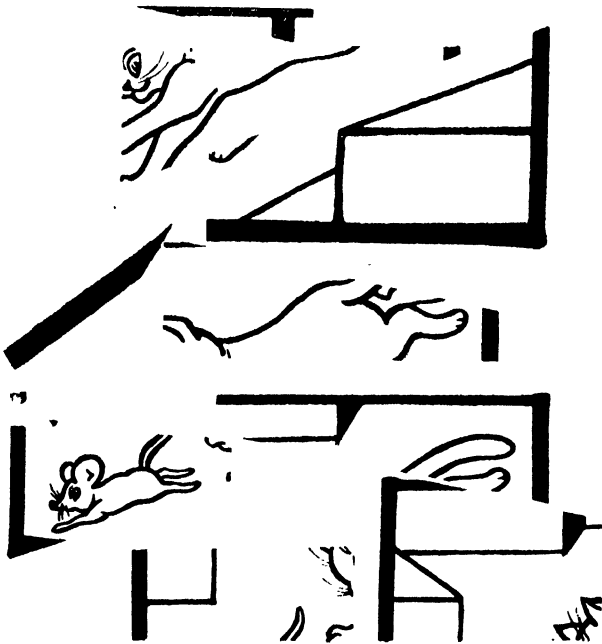
পৌষালী-সংখ্যার 'কিশোর-জগৎ' বিভাগে ছাপানোর জন্য আমাদের চিত্রকর-মশাইকে বিশেষভাবে একখানি ছবি এঁকে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিলুম। ছবিটির বিষয়বস্তু—একটি ইঁদুর-ছানা প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে এবং তার পিছনে পরম আগ্রহে লাফ দিয়ে তাড়া করেছে ইয়া-মস্ত এক হুলো-বেড়াল। কিন্তু চিত্রকর-মশাই ভারী খামখেয়ালী-মানুষ···শিল্পী কিনা, বোধহয় তাই নিজের খেয়ালে মাঝে মাঝে তিনি এমন সব বেয়াড়া-আজব কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে বসেন যে তার মর্ম্ম বোঝা দুঃসাধ্য। আমাদের অনুরোধমতো খামখেয়ালী এই চিত্রকর-মশাই সেদিন যে আজব-চিত্রখানি এঁকে পাঠিয়েছেন সম্পাদকের দপ্তরে, রঙ-তুলির এলোমেলো আঁচড়-টানা উপরের ঐ হিজিবিজি-ছবিটি দেখলেই তোমরা তার সুস্পষ্ট হদিশ পাবে। এ ছবিখানা বারবার পরখ করে দেখেও আমরা কেউই 'হুলো-বেড়াল আর ইঁদুর-ছানার' আসল-চেহারা খুঁজে পেলুম না। শেষে নিরুপায় হয়ে চিত্রকর-মশাইকে ডেকে পাঠালুম—এ সমস্যার সঠিক-সমাধানের উদ্দেশ্যে। চিত্রকর-মশাই এসে বললেন যে আমাদের অনুরোধ মতোই তিনি 'হুলো-বেড়াল আর ইঁদুর-ছানার ছবি এঁকেছেন, তবে তাঁর নিজের খেয়াল-অনুসারে উপরের ঐ কিম্ভূত-ছাঁদে হিজিবিজি-হেঁয়ালীর ধরণে, এবং পুরো-ছবিটিকে মোট আটটি ছোট-বড় বিভিন্ন-আকারের টুকরোতে ভাগ করে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো বললেন যে এলোমেলোভাবে-ছড়ানো বিভিন্ন-ছাঁদের এই আটটি টুকরোর মধ্যেই লুকোনো রয়েছে আমাদের অনুরোধে-আঁকা সেই 'হুলো-বেড়াল আর ইঁদুর-ছানার' পুরো ছবিখানি। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে সামান্য চেষ্টা করে উপরের ঐ ছোট-বড় বিভিন্ন-ছাঁদের আটটি ছবির টুকরোকে কায়দা-মতো-ধরণে সঠিকভাবে সাজাতে পারলে সহজেই সন্ধান মিলবে 'হুলো-বেড়াল আর ইঁদুর-ছানার' আসল ছবিখানির। এই বলেই চিত্রকর-মশাই তৎক্ষণাৎ আমাদের সবাইকার চোখের সামনে উপরের ঐ হিজিবিজি-ছাঁদে আঁকা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি-ছবির ছোট-বড় আটটি টুকরোকে সুনিপুণভাবে যথাযথ কায়দায় সাজিয়ে রাখলেন···সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি-সুস্পষ্ট ফুটে উঠলো 'হুলো-বেড়াল আর ইঁদুর-ছানার' ছবিটি আগাগোড়া!

কৌতূহলভরে আমরা প্রশ্ন করলুম,—এমন হেঁয়ালির ধরণে ছবিটি আঁকলেন কেন?

চিত্রকর-মশাই হেসে জবাব দিলেন,—'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের সকলেরই তো স্কুলের বার্ষিক-পরীক্ষার পালা চুকেছে···মন এখন তাদের অবাধ স্ফূর্ত্তিতে ভরা···ছুটির অঢেল-অবসর এখন

তাদের হাতে···তাই নতুন ধরণের একটা মজার হেঁয়ালি-ছবি এঁকেদেখ-দার্শনী হিসাবে সাদরে উপহার দিলুম সবাইকে! ছুটির দিনে বাড়ীতে বসে প্রত্যেকে, উপরের ছবিতে দেখানো বিভিন্ন-ছাঁদের ঐ আটটি টুকরোকে নিখুঁত-ভাবে অন্য একটি শাদা-কাগজের উপর হুবহু 'ছকে' (Trace) নিয়ে, সেগুলিকে পরিপাটি-ধরণে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে, বুদ্ধি খাটিয়ে কায়দা করে সাজাতে পারলেই সন্ধান মিলবে সুকৌশলে-লুকিয়ে-রাখা 'ভলো-বেড়াল আর ইঁদুর-ছানার' হিজিবিজি-হেঁয়ালির আসল-ছবিখানির!

এখন তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করে ত্যাখো তো, তোমাদের মধ্যে কেউ এই এলোমেলো আটটি টুকরোকে সঠিকভাবে সাজিয়ে আজব হেঁয়ালি-ছবির আসল-চেহারা খুঁজে বার করতে পারো কিনা! যদি পারো···তাহলে সেই টুকরোগুলিকে একখানা শাদা কাগজের উপরে যথাযথভাবে সাজিয়ে ও প্রত্যেকটিকে গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে সরাসরি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিও। তোমাদের মধ্যে যাদের পাঠানো ছবির এই হেঁয়ালির উত্তর সঠিক হবে, আগামী মাঘ মাসের সংখ্যায় তাদের প্রত্যেকের নাম-ধাম ছাপার অক্ষরে ছাপিয়ে দেবো—সবাই জানবে আর তারিফ করবে তাদের এমন বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরে এমন একটি ফলের নাম করো, যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে, সে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। শেষ অক্ষর বাদ দিলে, একটি সুস্বাদু ফল হয়। বলো তো, তিন অক্ষরের ঐ ফলটি কি?

রচনা : শ্রীমান বাচ্চু (কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর :
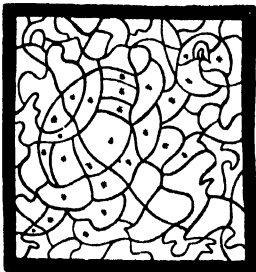
১। উপরের ছবির 'তারকা'-চিহ্নিত অংশগুলি রঙীণ-পেন্সিলের রঙ দিয়ে ভরাট করে দিলেই এলোমেলো-রেখার মাঝে সুস্পষ্ট সন্ধান মিলবে—উভচর-কচ্ছপের অপরূপ-চেহারার।

২। কাজল

৩। আলোক

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কলু মিত্র (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), পুপু ও ভুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (আলীপুর), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), বাচ্চু, বাবলু ও চিতু (কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর), আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কাশীপুর), মলয় মুখোপাধ্যায় ও অচিন্ত্য ঘোষ (পাতিরাম পাঠাগার পাতিরাম), বিনোদ, তারা, ইলা, চন্দ্রা, সুভাষ, রেখা, সোনা, শ্যামলী, কল্যাণী, দীপালি, মণিকা, কণিকা, সুপ্রিয়া ও বাবলী দত্ত (আসানসোল), গোকুল, বিদ্যুৎ, গোরা, মন্তু, শশধর, বুদো, শ্যামলা, মিনে, মুক্তা, বিন্দু, টুকন, মিলু ও সীমা (জয়নগর) ঝন্টু, মুক্তা ও গৌতম (সিন্দরী, ধানবাদ)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), পিণ্টু হালদার (বর্দ্ধমান), শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা), সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী), মদনমোহন ও নারায়ণচন্দ্র মিশ্র (রাগপুর, মেদিনীপুর), সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর), ধর্ম্মদাস ও জগদানন্দ রায় এবং বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর, বাঁকড়া), অমিতাভ ঘোষ (পাতিরাম পশ্চিম দিনাজপুর), রঞ্জিত মণ্ডল (মনোরমা পল্লী পাঠাগার, পাতিরাম), রতনময়, মৃন্ময়, চিন্ময়, জ্যোতির্ম্ময় লাহিড়ী (পাতিরাম)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুড়ো ও নিপু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), দেবীপ্রসাদ মিত্র, সুকান্তকুমার ও বনানী সিংহ (গয়া), নীতা, শ্যামলী, ভারতী ও মঞ্জুলিকা (দিল্লী) টুটুন, কল্পনা, অশোক ও নীতা (কলিকাতা), শঙ্করপ্রসাদ পুইতুণ্ডী (এথোরা, বর্দ্ধমান);

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব-কূলে আধুনিক সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ফিনিশিয়রা নৌ-চালনা আর জলযান-নির্ম্মাণ কৌশলে রীতিমত পারদর্শী হয়ে ওঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁরাই প্রথম সুদক্ষ নাবিক আর সুউন্নত অর্ণবপোত-বিশারদ... জলপথে দুরন্ত সাগর পার হয়ে প্রাচীন-দুনিয়ার নানা দেশে বাণিজ্য করে তাঁরা বিশেষ কীর্ত্তিমান ও বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদে গরীয়ান, শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের রাজ্যের লেবানন-অঞ্চলে পাহাড়ের কোলে প্রচুর 'সিডার' গাছ জন্মায়... সেই কাঠ দিয়ে ফিনিশিয়-অধিবাসীরা সেকালে সুনিপুণ-কারু-কৌশলে তৈরী করতেন অপরূপ-বিশাল আকারের এমনি সব বিচিত্র জলযান — বাণিজ্য-পোত, রণতরী আর প্রমোদ-তরনী। এ সব জলযানে ছিল পাল ও দাঁড়ির ব্যবস্থা

প্রাচীন আমলে মধ্য-প্রাচ্যের পারস্য-উপসাগরে, এক দেশ থেকে অন্যান্য দেশে লোকজন আর বাণিজ্য-সম্ভার পরিবহনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো বিশালাকার ও বিচিত্র-ছাঁদের কাঠের তৈরী এই সব বড়-বড় রঙীন পাল-তোলা অর্ণবপোত। একালেও ওদেশে এমনি-ধরণের জলযানে চড়ে সাগরের বুকে পাড়ি দিয়ে দূর-দূরান্ত রাজ্যে যাতায়াতের রেওয়াজ আছে। ওদেশী অধিবাসীরা এ সব বিচিত্র দূর-পাড়ির জলযানের নামকরণ করেছেন —'ঢাউ' (DHOW)। অতীতকালে এ সব জলযানে শুধু যে বিবিধ বাণিজ্য-পশরা বহন করা হতো তাই নয়, বিদেশের বাজারে আর স্বদেশের হাটে দাস-বেসাতীও চলতো খুবই
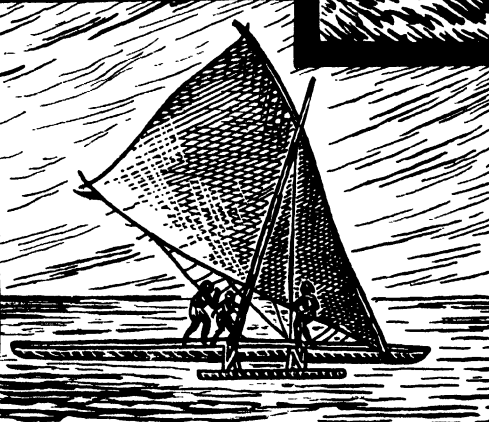
প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তে ফিজি-দ্বীপপুঞ্জের আদিম-অধিবাসীরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই নৌ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠে, গাছের গুঁড়ি থেকে কোঁদাই-করা এমনি ধরণের পাল-খাটানো ডোঙা বা শাল্‌তিতে চড়ে সাগরের উদ্দাম-তরঙ্গ তুচ্ছ করে অবলীলাক্রমে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে, এমন কি, দূর-দূরান্ত দেশেও পাড়ি দিতেন। এ সব ডোঙাতে কোনো 'হাল' থাকতো না, কাজেই ঢেউ আর বাতাসের দাপটে যাতে নৌকাডুবি না ঘটে, সেইজন্য ডোঙার দুই পাশে বেঁধে রাখা হতো বাড়তি দুটি কাঠের ভেলা। এ ধরণের ডোঙা এখনও ব্যবহার হয় ওদেশে।

স্মৃতি-চারণ—অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বৎসরের সুবর্ণজয়ন্তী হইতেছে, ইহাতে আমার ন্যায় প্রাচীন বৃদ্ধদের প্রাণে যে আনন্দ হইতেছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না, সেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সেদিনটির কথা মনে পড়ে, সেদিনও আষাঢ়ের আকাশটি ছিল—আষাঢ়ের প্রথম দিবসটি মেঘমেদুর, আমাদের মনে জাগাইয়া দিতেছিল কালিদাসের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের কথা।

একটু আগের কথা বলি। সে প্রায় ১৩১২-১৩ সালের কথা, কলিকাতা বেচু চাটার্জির [সম্ভবতঃ ৬ নম্বর হইবে] ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকি, সেটি ছিল একটি মেস, সেখানে কয়েকজন ঢাকা, ময়মনসিং, চব্বিশপরগণার ভদ্রলোক থাকিতেন, কেহ আফিসে চাকরী করিতেন, কেহ ওকালতি করিতেন, কেহ বা বঙ্গসাহিত্য নিয়া আলোচনা করিতেন। আমি তখন দুইখানি বহি প্রকাশের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, একখানা আমার লিখিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', অপরখানা ময়মনসিংহ কালীপুরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী স্বর্গত ধরণীকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রমণ-কাহিনী—ভারত ভ্রমণ নামে বিরাট সচিত্র গ্রন্থ। এই উদ্দেশে আমাকে সাহিত্য-সেবকগণের সহিত মিলিতে হইত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কুন্তলীন প্রেস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্সের কলেজ ষ্ট্রীটের দোকান, চৈতন্য লাইব্রেরী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের দোকান, মজুমদার লাইব্রেরী প্রভৃতি সেকালের কলিকাতার ছোট বড় লাইব্রেরী, এবং আরও বহু লাইব্রেরী, গঙ্গার ধারের সেকালের ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী—এমন কোন পাঠাগার ছিল না, যেখানে আমার যাতায়াত ছিল না। বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ও সেকালের প্রধান লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, প্রায় প্রত্যেকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। ঐ সময়ে মাতৃভাষার পরম ভক্ত, বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলীকে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আজন্ম সাধনা ও প্রার্থনাকে সাফল্য দান করিয়া মাতৃভাষার উন্নতির যে প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন—তাহার ফলে সেকালে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিজ্ঞানাধ্যাপক হইয়াও বেদশাস্ত্রের অন্তর্গত একখানি সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিবেদী মহাশয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যে অমূল্যরত্ন বাঙ্গলা ভাষায় দান করিয়া গিয়াছেন তাহার কথা কি আমরা ভুলিতে পারি। সে সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির ছিল আমার বড় প্রিয়, সেখানে গেলে সেকালের বাঙ্গালার মনীষীগণের দর্শন পাইতাম, দেখিতে পাইতাম পরিষদের অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয়কে, রামকমল সিংহকে—নলিনী রঞ্জন পণ্ডিতকে আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু রূপে পাইয়াছিলাম।

আমি পরিষদকে প্রথম দেখিতে পাই রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ১০৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদে, সেখানে পরিষদের শৈশব কাল অতিবাহিত হয়, তৎপরেই তা কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ১৩৭।১নং গৃহে নীত হয়। ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া ঘর—অতি সত্বরই উহা বর্দ্ধিষ্ণু পরিষদের অযোগ্য হইয়া উঠিল। ১৩০৭ সালে কাশিম-বাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষদের জন্য সাত কাঠা ভূমি দান করেন, এবং ইমারতের জন্য অনেক সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। অবশেষে আজ আমরা যে সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য অট্টালিকায় সমবেত হইতেছি তাহার দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য সমস্ত ব্যয় লালগোলার মহারাজা স্বর্গত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় দান করিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের চিরস্মরণীয় আনুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নিজের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সভার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। লিউটার্ড

নামে এক ফরাসী ভদ্রলোকের যত্নে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরের প্রাসাদে 'Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিষদের গঠন কার্য্যে সাহিত্যানুরাগী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, মিঃ এথ লিউটার্ড, শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, সি. আই. ই. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও রজনীকান্ত গুপ্ত বিশেষ যত্ন করেন, এবং নিম্নলিখিত মহোদয়গণের পরিশ্রমে সভা ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। উমেশ বটব্যাল মহাশয়ই সভাকে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" নাম দেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সি. আই. ই., চন্দ্রনাথ বসু এম. এ. বি এল, কবি নবীচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম. এ., রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল, মনোমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ., নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ব্যোমকেশ মুস্তফী, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, চারুচন্দ্র ঘোষ, বাণীনাথ নন্দী প্রভৃতি। রজনীকান্ত গুপ্ত মহারাজার নিকট হইতে ভূমি ও অন্যান্য মহোদয়গণের নিকট বাটী নির্ম্মাণার্থ অর্থ সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করেন। তিনি অকালে পরলোকগমন করেন। স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. প্রথম দুই বৎসর সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তারপর চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত পুনরায় এক বৎসর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন, পরে সারদাচরণ মিত্র মহোদয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ পরিষদের গৃহপ্রবেশ হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুভ শুক্লানবমী তিথিতে নব নির্ম্মিত সুশোভন মন্দিরে প্রবেশ করে। ঐ তারিখে ইহাতে ইহার প্রথম অধিবেশন। অমর কবি মাইকেল মধুসূদন কবি বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

"তব পদচিহ্ন ধ্যান করি' দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব দম দুরন্ত শমনে,—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি, সূরি ভবভূতি,
শ্রীকণ্ঠ, ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুর ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর। কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার।"

সেই শুভ গৃহপ্রবেশের পর হইতে কত মহাকবি, কত বৈজ্ঞানিক, কত ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক এই কীর্ত্তির মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদের কথা বলিবার অবসর আমার নাই,—সেদিন সেই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে 'ভারতবর্ষের' প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তিনি অতি গম্ভীরভাবে আরও কয়েকজন বন্ধুসহ, সানন্দে সমবেতকণ্ঠে বহু জনগণপূর্ণ পরিষদ মন্দিরে গাহিয়াছিলেন বঙ্গভাষা জননীকে লক্ষ্য করিয়া—

জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহিনা অর্থ চাহিনা মান
তুমি যদি দেহ তোমার ও দুটি
অমল কমল চরণে স্থান!

আমি যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাদের প্রত্যেককে দেখিবার এবং সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। পরিষদ হইতে সেই সব মনীষীদের পরিচয়, ইতিকথা আমার স্নেহভাজন বন্ধু স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সযত্নে গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা রাখিয়া গিয়াছেন। পরিষদের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত এবং বর্ত্তমান স্বাধীন গণতন্ত্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজ শাসন-সংস্থাপনের সমকালেই আবার বঙ্গীয় সাহিত্য দীপ্তিমান হইল। বিপ্লবের পর আসিল শান্তি। দুরন্ত সিপাহী বিদ্রোহে ভারতভূমিকে শুধু নয়, আমাদের বাঙ্গলা দেশকেও আলোড়িত করিয়াছিল। ধীরে ধীরে শান্তি আসিল, পরিষদ মন্দিরে নব অরুণ দীপ্তি প্রকাশিত হইল! বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্রকে, সাহিত্যকে বিশাল ও বিস্তৃত করিতে, বাঙ্গলাদেশকে মানবসমাজে পূজ্য বরেণ্য মহনীয় করিয়া তোলার জন্য বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্য বাড়িয়া উঠুক, বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য মানবজাতির সারস্বত ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাড়াইবে, বাঙ্গালার সমাজ হইতে ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কথা,

স্বার্থের কথা, নীচাশয়তা, ঈর্ষা দ্বেষ বিদূরিত হউক এই কামনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সমবেত কণ্ঠে উদাত্তস্বরে গাহিয়াছিলেন—

'পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমারি
কাছে মা এসেছি ছুটি ;
বাসনা-তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাবো তোমার
চরণ দুটি,
চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার এই জানি,
কিছু জানিনা ত আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি
আমার প্রাণ।"

সেই কতদিন আগের শ্রুতগান মনের মাঝে আজিও গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে। সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

মনে পড়ে ঢাকা কলেজে আমাদের সেকালে একটি ছাত্র সম্মেলনে আমোদ-প্রমোদ এবং হাস্য-কৌতুকের অভিনয় হইতেছিল, আবৃত্তি ও সঙ্গীতের অভাবও ছিল না, সেখানে একজন সুগায়ক গাহিয়াছিলেন,

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ -
স্বদেশের তরে, যা' করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, "আহা-হা হা কর কী,
কর কী নন্দলাল ?"
নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে, কে করিবে উদ্ধার এই দেশ ?"
তখন সকলে বলিল, "বাহবা, বাহবা বাহবা, বেশ,"

* * *

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি।
চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন উল্‌টায় গাড়িখানি।
নৌকা-ফিসন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়।
হাঁটিতে সর্প কুকুর আর গাড়ি চাপা পড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রইল নন্দলাল।
সকলে বলিল, 'ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল।"

পাচটি স্তবকের এই গানটির প্রথম ও শেষ স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সেখানে যত দর্শক ছিলেন এবং আমরা ছাত্রমণ্ডলী ছিলাম সকলের হাসির কলরোলে সভাস্থল মুখরিত হইয়াছিল। গানগুলি গাহিয়া ছিলেন যোগেন্দ্রকুমার রায় নামে এক ভদ্রলোক। তখন আমরা জানিতাম কে হাসির গানগুলি রচয়িতা—সাধারণতঃ ইনি সেকালে ডি. এল. রায় নামেই সমধিক প্রচলিত ছিলেন। ইঁহার নাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান স্বর্গীয় কার্তিকেয়-চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়া ষ্টেট স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত যান এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে সেটেলমেণ্টের কার্য শিক্ষা করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। সেকালের ভারতী, নব্যভারত, নবপ্রভা, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'হাসির গান'ই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলার সর্ব্বত্র পরিচিত করে। তাঁহার লিখিত 'আর্যাগাথা, কল্কি অবতার, আষাঢ়ে, হাসির গান, ত্র্যহস্পর্শ, বিরহ, পাষাণী, তারাবাঈ, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহাকে নাট্য-জগতে প্রসিদ্ধিদান করিয়াছে। 'পূর্ণিমা মিলন' নামে সাহিত্যসেবীদিগের মাসিক সম্মিলনেরও ইনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহপ্রবেশ দিনে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত—'জননী বঙ্গভাষা' গানটি শুনিয়া আমার এতদূর আনন্দ হইয়াছিল যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভের জন্য কৌতূহলী হইয়াছিলাম। সেদিন সেই গৃহ প্রবেশ দিনে সঙ্গীত বক্তৃতা ইত্যাদিতে রাত্রি হইয়া গেল, যার যার নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া গেলাম।

সে সময়ে মাণিকতলা এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয় ছিল, তার অধ্যক্ষ ছিলেন অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। সেখানে আমরা মিলিত হইতাম। অমূল্য-বাবুর সুমধুর ব্যবহার, বিদ্যানুরাগ এবং বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত বলিয়া তিনি সাহিত্যপরিষদ, বিদ্যাসাগর (মেট্রো-পলিটন) কলেজের পালি ভাষার অধ্যাপকও ছিলেন। ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য তাঁহার কাছে আমি প্রায়ই যাইতাম। অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন, তিনি মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে বহু সাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির আলাপ পরিচয় হইত।

তাহাদের মধ্যে চারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল আলিপুরের উকীল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন, সত্যানন্দ রায় প্রভৃতির নামোল্লেখ করিলাম। অনেক সময় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কেও দেখিয়াছি। তিনি অপরাহ্ণে ফুটপাথের উপর চেয়ার বেঞ্চ লইয়া বসিতেন এবং বহু সাহিত্যিকগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। এইরূপ মহাপুরুষ জীবনে বড় একটা দেখিতে পাই না, সাধু সদালাপী, গ্রন্থকারগণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, সাহায্যকারী ব্যক্তি তাঁহার মত নাই, প্রত্যেক গ্রন্থকারের প্রাপ্য টাকাকড়ি কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিতেন, তারপর গরীব ও দুঃস্থ গ্রন্থকারগণকে তিনি সময়ে অসময়ে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন, তাঁহারই পুণ্যফলে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স আজ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। গুরুদাসবাবু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে দুই একবার মাত্র প্রণাম করিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং তাঁহার সেই শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদটুকু আজও আমি ভুলি নাই।

গুরুদাসবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিদাসবাবু ও সুধাংশুবাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল। তখন তাঁহারা যুগলকিশোর দাসের লেনে থাকিতেন, হরিদাসবাবু ও সুধাংশুবাবু দোকানে বসিতেন, প্রত্যেকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহাদের দুই ভাইয়ের মধুর সম্ভাষণে, ব্যবহারে সকলে পুলকিত হইতেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তখন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গতা পত্নীর নামে সে বাড়ীর নাম দিয়াছিলেন 'সুরধাম'। হরিদাসবাবু নাট্যামোদী ব্যক্তি ছিলেন, ইভনিং ক্লাব নামে তাঁদের একটি ক্লাব ছিল। সেখানে সন্ধ্যার পর মিলিত হইতেন অনেক নাট্যামোদী এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি, দ্বিজেন্দ্রলালের ওরফে ডি-এল রায়ের সহিত হরিদাসবাবুর লাইব্রেরীর পুস্তকপ্রকাশাদির জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম—দ্বিজেন্দ্রবাবুকে পথে-ঘাটে মাঝে মাঝে দেখিতে পাই, আমার বড় ইচ্ছা তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। আপনি যদি তাঁকে বলে দেন তবে যেতে পারি।

হরিদাসবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা পারবো, তুমি রবিবার দিন সকালে এসো, আমি আজই বলে রাখবো, তুমি এসো, কোন ভয় নাই, লজ্জার কারণ নেই, দেখবে কেমন ঋষি, মাটির মানুষ।

আমি সেখানে যেতেই পা ছুঁয়ে নমস্কার করতে না দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনিত যোগেন্দ্রবাবু! হরিদাস আপনার কথা বলে গেছে! সেও একটু পরেই আসবে।

সুরধামের সম্মুখেই প্রাঙ্গণ, ফুলেফুলে শোভাময়, দুটি নারিকেল গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রৌদ্র কিরণে। পাতাগুলি ঝলমল করিতেছে। বারান্দায়, চেয়ারে ও টুলে অনেকে বসিয়াছিলেন—তাঁদের মধ্যে দেখিলাম; আমাদের চিরপরিচিত জলধরদাদা, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, প্রসাদ দাস গোস্বামী দাদামহাশয়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ব্যোমকেশ মুস্তফি, প্রভৃতি গল্প করিতেছেন।—এমন সময়ে আসিলেন হরিদাসবাবু।

আমাকে দেখে বললেন—তুমি কতক্ষণ?

এই মিনিট দশেক! রায় মহাশয় হেসে বলিলেন—দেখ যোগীনবাবুকে বিনা পরিচয়েই আমি চিনে ফেলেছি। হা! হা! হা!

সম্মুখের পাণ্ডুলিপি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম। কি লিখছেন? বললেন সরল ভাবে—'সিংহল বিজয়' নামে একটা নাটক। তাইত অমূল্যবাবুকে ও বিজয়বাবুকে শোনাব বলে ডেকেছি। বস হে হরিদাস—পালিয়োনা, খানিকটা শুনে যাও। আমার দিকে চেয়ে বলিলেন, আপনাকে পূর্ণিমা সম্মিলনেও দেখেছি, শুনেছি আপনি নাটকও ভালবাসেন, বসুন খানিকক্ষণ। তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন,—জানেন আমার ছেলে মণ্টু কি বলে?

কি বলে জানেন :—বাবা তুমি যুদ্ধের একটা নাটক লেখ—খুব লড়াই হবে—তরোয়াল চলবে। ভয়ানক একটা যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে লেখ।

আমরা সকলে হাসিলাম। তখন মণ্টু ও মায়া দুইজন বালকবালিকা মাত্র।

সকলে নীরবে শুনিলাম। পড়িবার তাঁর আশ্চর্য শক্তি ছিল। তারপর প্রশ্ন হইল। কি রকম হয়েছে? বিজয়বাবু ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন হয়েছে।

বিজয়বাবু পণ্ডিত লোক, ইতিহাসানুরাগী—তিনি ধীর

কণ্ঠে বলিলেন—আপনাকে আমার যা বলবার পরে বলবো, সব বইটা শুনে নিই।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—আমার মনে হয় আপনার ইতিহাসের দিক্‌টা বেশ হয়েছে।

কি হে হরিদাস! কিছু বললে না?

হরিদাসবাবু হাসিয়া বলিলেন,—নাটক কি অভিনয় না দেখে বোঝা যায়! তারপর বলিলেন ঘড়ির দিকে চেয়ে—দেখুন কটা বেজেছে।

তখন বেলা প্রায় বারোটা হয়েছে।

সকলের চমক ভাঙ্গলো। হরিদাসবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমি রায় মহাশয়কে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য সকলেও প্রস্থান করিলেন। দেখিলাম দাদামহাশয় প্রসাদদাস গোস্বামী অচলভাবে বসিয়া আছেন।

এই ভাবে দিন যায়, সর্ব্বত্র সভাসমিতিতে যাওয়া আসা করি,—একদিন অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ওখানে আমরা অনেকে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছি, শুনিলাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের ওখান হইতে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে ব্যোমকেশ দাদা, নলিনী পণ্ডিত ও জলধরদাদার মুখেও সংবাদের আভাস পাইলাম। আলোচনা হইতেছিল কে সম্পাদক হইবে? পরে শোনা গেল, সম্পাদক হইবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনিও সম্মত হইয়াছেন। পত্রিকার নাম দ্বিজেনবাবুই স্থির করিয়াছেন—নাম হইবে 'ভারতবর্ষ'। স্বত্বাধিকারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স সম্মত হইয়াছেন। মূল্য ইত্যাদিও স্থির হইয়াছে। বিষয় নির্ব্বাচন ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ের দায়িত্ব দ্বিজ বাবুই নিজে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। হরিদাস বাবু সকালে ও সন্ধ্যায় সর্ব্বদা সব বিষয় স্থির করিতেছেন। আষাঢ় মাসের প্রথম তারিখে প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ, জীবন চরিত, বিবিধ প্রসঙ্গ, সমালোচনা ইত্যাদি পরিবেশনের বৈচিত্র্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। তাঁহাকে অমূল্য বিদ্যাভূষণ, জলধর সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি অনেকেই বিবিধরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে সম্পাদক—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম-এ এইরূপ বিজ্ঞপ্তিও দেখিলাম।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন—

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, সে কি মা ভক্তি সেকি মা হর্ষ।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর
রাত্রি,
বন্দিল সবে "জয় মা জননি! জগত্তারিণি। জগদ্ধাত্রী।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ।
গাইল "জয় মা জগৎমোহিনী। জগজ্জননী ভারতবর্ষ।

এইরূপ পাঁচটি স্তবকে বিভক্ত। আমরা এখানে ইহার প্রথম স্তবকটি এবং শেষ স্তবকটি উদ্ধৃত করিলাম :—

"জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার
অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন চরণে তোমার বিতর মুক্তি,
জননি, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত
না হর্ষ,
—জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি!
ভারতবর্ষ,
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল 'জয়মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন মহোৎসাহে প্রফুল্লমনে এই অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া 'ভারতবর্ষের' প্রথম সংখ্যা—জয়মা জগৎমোহিনী! জগজ্জননি! ভারতবর্ষের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মায়ের চরণ করিয়া স্পর্শ, এবং বহুবিধ প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি নির্ব্বাচনে তন্ময় হইয়া ধ্যানী তাপসের মত মননিবেশ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে সহসা প্রাণত্যাগ করেন, মৃত্যুকালে তাহার মুখ হইতে 'মণ্টু' মাত্র একটি শব্দ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন। তার পর সব শেষ—। এখন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো। এক জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে দ্বিজেন্দ্রলাল মহাপ্রয়াণ করিলেন, অমর কবি ও নাট্যকার অমরধামে চলিয়া গেলেন! রহিয়া গেল তাঁহার অমর কীর্ত্তি 'ভারতবর্ষ'।

দ্বিজেন্দ্রলালের পর পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যা-

ভূষণ, রায় বাহাদুর জলধর সেন, উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকেই সম্পাদক, অন্যান্য অনেকেই ভারতবর্ষের পরিচালক মণ্ডলীতে গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায়, বা বাঙ্গলার বাহিরে এমন মনীষী লেখক নাই যাহাদের প্রবন্ধ ও কবিতায় ভারতবর্ষের কলেবর না অলঙ্কৃত হইয়াছে। জলধর দাদার মৃত্যুর পরে—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকের পদে ব্রতী হইয়া সুপরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

'ভারতবর্ষের' প্রথম বর্ষ হইতে যাঁহারা ইহার সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর ইহজগতে নাই। আমাদের ন্যায় 'ভারতবর্ষের' সেবার যাহারা প্রথম হইতে ধন্য হইয়াছেন তাহাদের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি—তাহারা শতজীবী হউন।

আজ অতীতের কত কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কথা, মনে পড়ে ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা, মনে পড়ে আরো কত বন্ধুর কথা—যেমন মধুস্মৃতি-রচয়িতা কবিভূষণ নগেন্দ্রনাথ সোমের কথা, মনে পড়ে ভারতবর্ষের পূর্ব্বের বাড়ীটির ত্রিতলের ঘরে চুরুট মুখে জলধরদাদার সাদর সম্ভাষণ, শরৎচন্দ্রের কৌতুকভরা গল্প, এই ভাবে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে 'ভারতবর্ষের' পুণ্যপীঠে কত মনীষা ও বিদুষীর দর্শন লাভ করিয়াছি। হরিদাসবাবুর ও সুধাংশুবাবুর প্রিয় সম্বোধন, কত না গল্প, মনে পড়ে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের মৃদু পদক্ষেপে হরিদাসবাবুর সঙ্গে গল্প গুজব। এইভাবে যে কত আনন্দে দিন কাটিত, সবই যেন স্বপ্নসম মনে হইতেছে। মনে পড়ে আমাদের নরেনদেব ভায়ার অনিন্দিত গ্রন্থসহ ধীর পদে আগমন, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলধরদাদার কক্ষে চুরুট মুখে গমন—'আজ স্মরণে আসে সবার পরশের কথা।'

মানুষ যায় কীর্ত্তি থাকে। বংশ পরম্পরা স্মৃতি রাখে বসুন্ধরা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাপীঠে যে সকল কৃতী লেখকগণ একদিন বাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহাদের অনেকেই অমর হইয়া আছেন। আজ 'ভারতবর্ষ' হাতে লইয়া মনে পড়িবে পুণ্যশ্লোক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা, মনে জাগিবে বন্ধুবর হরিদাস বাবু, সদালাপী মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তাহারা চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে স্নেহভাজন সরোজ এবং সুধাংশুশেখরের পুত্র পরিজন। সকলে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পিতা পিতামহের নাম ও সাহিত্যের উজ্জ্বল প্রদীপখানি জ্বালিয়া রাখিয়া স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রে 'ভারতবর্ষ' সমুজ্জ্বল করুন।

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা,
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে।
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে। ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাইল জয়মা জগন্মোহিনী। জগজ্জননি ভারতবর্ষ।
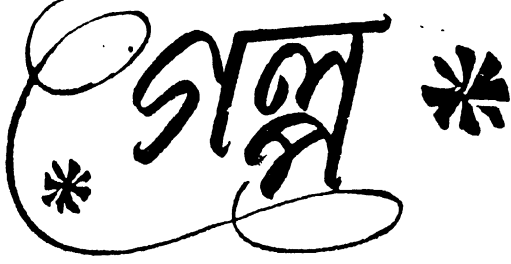
কালো ভ্রমর

কল্যাণী রায় চৌধুরী

মাঝরাতের নিঝুমতা ভেঙে দিয়ে শাঁখ বাজালো, কারা। যেন উলু দিল—বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলেন চন্দ্রমাধব চক্রবর্ত্তী। ওর এই ষাট বছর জীবনে এ একান্তই এক-ঘেঁয়ে, একান্তই পুনরাবৃত্তি। জীবনের দেনা চুকিয়ে দিয়ে শুধু একটু গৃহকোণ সম্বল করে আছেন তিনি। একটুখানি আয়েস, পাড়ার মোড়লী, আর নাতী-নাত্‌নীর অপ্রয়োজনীয় মধুর কোলাহল—পুত্রবধূর সস্নেহ সশ্রদ্ধ শাসন, আর—আর এক দুঃসহ নিঃসঙ্গতা!

শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনির পর ঘুম আর আসেনি চন্দ্রমাধব চক্রবর্ত্তীর। ঘুম ত এমনিতেই অনেকদিন আগে নোটিস্ দিয়েছে, এখন আবার চার ঘণ্টা ডিউটির জন্য আন্দোলনও স্বরু করেছে। এ সময় এই শীতের রাতে কেউ যদি গড়গড়াটা ধরিয়ে দিত। রামাটা তো ঘুমুচ্ছে—ডাকবেন নাকি? না থাক। বাড়ীতে আজ দুদিন যাবৎ যা উৎপাত শুরু হয়েছে—আর এবাড়ীর নিঃশব্দ ভার-বাহী হলো ঐ চল্লিশ বছরের রামা। থাক ঘুমুচ্ছে ঘুমুক।

শীতের দীর্ঘ রাতের শেষ হয়। কুয়াশা আর সোনালী আলোর সন্ধিক্ষণে একটু তন্দ্রার ছোঁয়া লেগেছিল চোখে—'চা খাবেন না? উঠুন, বেলা যে দুপুর হয়ে গেল।' কে যেন বীণার তারে তারে মূর্চ্ছনা তুলে বল্ল। সে মূর্চ্ছনা হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্মৃতির নীড় জাগিয়ে তুললো।

ধূমায়িত এক পেয়ালা চা। উষ্ণ। ছন্দিত মূর্চ্ছনা তখন চা-এর পেয়ালা রেখে একটুখানি দাঁড়ালো। নিস্তব্ধতা। ছন্দিত মূর্চ্ছনা আর এক পদ্দা গলা তুলে শাসনের ভঙ্গিতে বল্লো—'ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আর পারবো না—নিন খেয়ে ফেলুন।'

আটত্রিশ বছর আগে ঠিক এমনি একজন বলত, ঠিক এমনি মিষ্টি শাসনের ভঙ্গিতে; সেই স্বর, সেই কণ্ঠ, সেই ছন্দিত ভঙ্গিমা! পক্ক ভুরুর নীচে আনন্দে স্মৃতিতে উজ্জ্বল চোখ দুটী মেলে চেয়ে দেখেন বৃদ্ধ চন্দ্রমাধব—জোড়া ভুরুর ডান পাশে কপালের ঠিক নিচে তেমনি তিল, হাসলে গালে তেমনি টোল খায়। ঐ তিলতত্ত্ব আর গালে টোল খাওয়া নিয়ে কতদিন, কত ঠাট্টা করেছেন, দেহের ঐ সব লক্ষণ-বিশিষ্ট মেয়েরা নাকি বিশেষ কোন রিপুর বশ হয়, এমন কত কি হারিয়ে যাওয়া কথা!

'অমন করে চেয়ে দেখছেন কি? আমার বুঝি কাজ নেই—কাজের বাড়ীতে বুঝি দাঁড়ানোর ফুরসৎ থাকে?'—লতিকা বেরিয়ে গেল।

ধূমায়িত চা ঠাণ্ডা হলো, ৩৮ বছরের হারিয়ে যাওয়া পদচিহ্ন ধরে ধরে কে যেন এলো। পনর বছরের প্রস্ফুটিত পুষ্প, দেহের পরতে পরতে নববসন্তের স্বাক্ষর! উজ্জ্বল টানা টানা চোখ, জোড়া ভুরুর ডান পাশে কপালের নীচে তিল, হাসলে গালে টোল খায়, শ্যামলা রঙ, বউ-বরণ করতে এসে শাশুড়ী কেঁদেই ফেলেছিলেন। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছেলে—তার কিনা কালো বউ! সকলে ডাকতো 'কালো বউ'। চন্দ্রমাধব বলতেন 'কালো ভ্রমর' সেই কালো ভ্রমর তার জীবনকে আলো করে ছিল মাত্র তিনটি বছর। তার-পর নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দিল সে একদিন। সে প্রতিশ্রুতি আজ চন্দ্রমাধবের একমাত্র বংশধর ইন্দ্রনীল।

আঠারো বছরের পুষ্পিতা সীতা কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগলো—ব্যর্থ হলো কবিরাজের নাড়িটেপা আর ভেষজ, কালো ভ্রমর শুকিয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে ইন্দ্রনীলের গালে শেষ চুমু খেয়ে, ইন্দ্রনীলের কপালে শেষ অশ্রুটুকু ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

—সেই হাসলে গালে টোল খাওয়া মুখখানা, সেই জোড়া ভুরুর পাশে তিল। সেই ভ্রমর-কালো চোখের 'কালো ভ্রমর' তিলে তিলে ভস্ম হয়ে গেল।

জীবনজোড়া হাহাকার। নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রজনী। তবু একদিন এর শেষও হয়েছিল। বৈষয়িক পিতার আদেশ, মায়ের চোখের জল আর চক্রবর্ত্তী বংশের ঐতিহ্য—এক স্ত্রী মারা গেলে আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করা। এমন আজগুবী কথা চক্রবর্ত্তী বংশের কুষ্ঠিতে লিখে না।

কমলার কমল আনন চন্দ্রমাধবের মনের সব কালো ধুয়ে মুছে জোছনার আলো এনে দিল। জীবনের শত দেওয়ালীর মাঝে কালো ভ্রমর হারিয়ে গেল অবশেষে।

—'এত বেলা হলো এখনও মাছ এলো না। আমি ওসব ঝামেলায় নেই, আমায় শেষে দোষ দেওয়া না হয়'। কে একজন ছোট মাতব্বরের আত্মম্ভরি আস্ফালন।

—আচ্ছা, পুরুত ঠাকুর এখনও আসছেন না কেন? এখন কাজে না বসলে একটাতে মুখে ভাত হবে কি করে?

—তোমাদের যা খুশী কর—এমন অনাছিষ্টি কাণ্ডও দেখিনি।

—ওরে শাঁখ বাজা, টোপর এলো যে।

—শাকের ঘণ্টতে কে তোকে মাছের মুড়ো দেওয়াতে বল্লে? তোরা সব হয়েছিস যত সব ইয়ে।

এমনি সব অগোছালো কথার কোলাহল, শঙ্খধ্বনি, উলু সানাইয়ের প্রভাতী রাগিণী।

চোখের সেই তন্দ্রাটুকু যেন তবু কাটতে চায়না। রামা এসে কয়েকবার মুখ ধোয়ার জন্য বলে বলে হয়রাণ হলো, সুবাসিত অম্বুরি তামাক পুড়ে পুড়ে হাওয়াতে গন্ধ ছড়ালো শুধু। চা-এর পেয়ালাটাও এখন পর্য্যন্ত পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। ঠাণ্ডা। বাবুর এমন গম্ভীর ভাব দেখে রামা মনে মনে প্রমাদ গণলো। চানের বেলা হলে ভয়ে ভয়ে এক-বাটি তেল এনে মাখাতে বসলো।

বেলা একটাতে ইন্দ্রনীলের প্রথম ছেলের শুভ অন্নপ্রাশন হলো। চন্দ্রমাধব এলেন, নিয়ম মাফিক আশীর্ব্বাদ করলেন; পুরণো গয়নার বাক্স খুঁজে খুঁজে সেই নীলা-দেওয়া আংটীটা বের করলেন, সীতা ওটা ইন্দ্রনীলের জন্যে গড়িয়েছিল। ছোট্ট ইন্দ্রনীলের ছোট্ট আংটী গয়নার সিন্দুকের এক ছোট্ট কোণে স্মৃতির এক বিস্মৃত টুকরো হয়ে কোথায় যেন দীর্ঘ আটত্রিশ বছর লুকিয়েছিল! আজ সব বিস্মৃতির জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো, স্থান পেলো একেবারে ছোট্ট খোকনের হাতে।

খেতে বসে ঠিক মত খাওয়া হলো না চন্দ্রমাধবের। পুত্রবধূ অঞ্জনা এলো, অনেক যত্নের কথা বল্লো, অনেক পীড়াপীড়ি করলো আর কিছু খাবার জন্যে—কিন্তু চন্দ্রমাধব আজ এসব কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। সকালে স্মৃতির পথ বেয়ে যে এসেছিল সে যেন তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

চন্দ্রমাধবের নাতি, ইন্দ্রনীলের পুত্র খোকনের মুখে-ভাতের উৎসব দিনান্তের শেষের সূর্য্যের মত নিস্তেজ হয়ে আসছে! খাওয়া-দাওয়া হাঁক-ডাক অপ্রয়োজনীয় কথার প্রয়োজনীয় কোলাহল, শাঁখের আওয়াজ, মেয়েদের উলু প্রদোষের অন্ধকারের মত পাতলা হয়ে আসতে লাগলো। সানাইতে পূরবী বাজলো। এই পূরবী একদিন বেজেছিল কত বছর আগে।

চন্দ্রমাধব উঠলেন। রামা এখনও ঘরের আলো জেলে দিয়ে যায়নি। ঠাহর করে করে চটি জোড়া পরলেন—আজ আর রামার উপর রাগ করলেন না। বাগানে এলেন—রজনীগন্ধার ঝাড় থেকে তুললেন অনেক গুচ্ছ, গোলাপের গাছে হাত দিতেই কাঁটা ফুটলো—ভ্রূক্ষেপও করলেন না। চুপি চুপি পুত্র ও পুত্রবধূর স্থানীয়াদের দৃষ্টি এড়িয়ে এলেন নিজের ঘরে।

দেয়ালের এককোণ থেকে হেলেপড়া সীতার ছবি-খানা সযত্নে ঝেড়ে মুছে টিপয়ের উপর রাখলেন—রজনী-গন্ধার গুচ্ছ থেকে অপটু হাতে একটী একটি করে ফুল তুলে নিয়ে মালা গাঁথলেন। সীতার ছবিখানা বেষ্টন করে পরিয়ে দিলেন সেই মালা পরম সোহাগে। গোলাপের গুচ্ছ রাখলেন স্তবকে স্তবকে। সুবাসিত কস্তুরিধূপ সীতার অতি-প্রিয় সুবাস জালিয়ে দিলেন। চুপি চুপি কম্পিত হস্তে ঝেড়ে আনলেন অনেক দিনের নীল ঝালর দেওয়া টেবিল ল্যাম্প, জালিয়ে দিলেন সন্তর্পণে। আজ সীতা আসুক, একান্তভাবে চুপি চুপি, এই নীল আলোর নীচে, ঐ রজনী-গন্ধার মালা পরে—স্তবকে স্তবকে গোলাপের গুচ্ছে গুচ্ছে পা ফেলে ফেলে। সীতা আসুক—দেহে আর মনে আঠারোটী বসন্তের স্বাক্ষর নিয়ে।

উৎসব বাড়ীর সানাইতে পূরবী শেষ হয়ে ইমন বাজছে। সীতা আসুক জোড়াভুরুর ডানপাশে কপালের নীচে তিল, আর হাসলে গালে টোলখাওয়া শ্যামলা মুখশ্রী নিয়ে, চক্রবর্ত্তী

বাড়ীর 'কালো বৌ' সীতা চন্দ্রমাধবের 'কালোভ্রমর' সীতা।

ঠক্ ঠক্ কড়া নাড়ার আওয়াজ। সীতা এলো না, ঘরে এলো সকালের সেই ছন্দিত মূর্চ্ছনা; হাতে তেমনি এক পেয়ালা চা।· সীতার বোন ললিতা। 'বারে—আজ চা খাবেন না'—ধমায়িত চা রাখার পুনরাবৃত্তি। শাসনের ভঙ্গিতে আর একবার আটত্রিশ বছর আগেকার প্রতিধ্বনি! সীতার বোন ললিতা। জোড়া ভুরুর পাশে তেমনি তিল, হাসলে তেমনি টোল খায়। দেহে আঠারটী বছরের ছন্দিত সুষমা। বৃদ্ধ চন্দ্রমাধব তাকিয়ে দেখেন—একজোড়া পক্ক ভুরুর নীচে ষাট বছরের চোখজোড়া আনন্দে আর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওঠে। স্মৃতির পথ বেয়ে বেয়ে যে ভোরের আলোর সাথে সাথে চুপি চুপি এসেছিল—সে যেন দিনান্তের ক্লান্ত সন্ধ্যায়, জীবনের ক্লান্ত প্রহরে এলো, কেন এলো! দিশেহারা চন্দ্রমাধব ছবির ফ্রেমে বাঁধা সীতার দিকে চেয়ে চেয়ে তারি নিশানা জানার চেষ্টা করেন।

ছন্দিত মূর্চ্ছনা ললিতা ষাট বছরের চন্দ্রমাধবের এই ভাবান্তরের অর্থও খুঁজে পায় না।

একবার রজনীগন্ধার মালায় আর গোলাপের স্তবকে সাজানো সীতার ছবিখানা দেখে মুখ টিপে হেসে নীল আলোর নীচে দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে বেরিয়ে যায়।

বোতলের দৈত্য

চৈনিক রণ-দৈত্য ঃ—বাঁচতে চাও তো, এখনো ভেবে ছাখো ভালো করে !

ভারতীয় জওয়ান ঃ—মোরা ভয় করবো না,
ভয় করবো না···

শিল্পী ঃ—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

এই বার এস—এই ভ্যানেটী ব্যাগটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক'—আফিসের ঘরের দরজাটা ভিতর হতে বন্ধ করে দিয়ে আমি সহকারীদের উদ্দেশ্য করে বললাম—'এই ভ্যানিটী ব্যাগটী তো বহু দিন পূর্ব্বে কেনা বলে মনে হয়। আমার মনে হয় যে এই একটি মাত্র ভ্যানেটী ব্যাগই ইনি এযাবৎ ব্যবহার করে এসেছেন। আমার মন বলছে যে—ওঁর রাহাজানীকৃত ভ্যানিটী ব্যাগটি যে ঐ আহত যুবকের হাত হতে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই গড়াপেটা দস্যুটিই তাঁর ঐ একমাত্র ভ্যানিটী ব্যাগটি অপকর্ম্মের পর আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে? এখন আমাদের ঐ ভদ্রমহিলা প্রমীলাদেবীর বাটীখানাতল্লাস করতে হবে—কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য উদ্ধার করবার জন্যে নয়, শুধু ওখানে এঁর কোনও দ্বিতীয় ভ্যানিটি ব্যাগ নেই এবং কোনওদিন ছিলও না—সেইটেই এখন আমাদের প্রমাণ করা দরকার। কাশীপুরের রাজবাটীর ঝি চাকররা যে প্রমীলা দেবীর বাটীর ঘরকন্নার কায করে দিয়ে যেতো তাতো বোঝাই যাচ্ছে। এদের মনিব-মনিবানীর ব্যক্তিগত ঘরোয়া ব্যাপারে এদের আগ্রহাদি না থাকারই কথা। এদের অতর্কিতে জিজ্ঞাসা-করতে পারলে এই ভ্যানিটি ব্যাগ সম্পর্কীয় যাবতীয় সংবাদ তারা বিশ্বাসযোগ্যভাবেই পরিবেশন করতে পারবে। এ' ছাড়া প্রমীলা দেবীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আফিসের লোকজনদের দ্বারাও ওঁর এই ভ্যানিটী ব্যাগটী ওঁর বহুদিনের ব'লে সনাক্তকৃত করা যেতে পারবে। প্রমীলা দেবী তাঁর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বহু প্রমাণই বিনষ্ট করতে চেষ্টা করলেও অদৃষ্টবলে তাঁর বিরুদ্ধে এই বিরাট প্রমাণ সম্পর্কে একটু ভেবে দেখবারও অবকাশ পান নি। উনি কথামালার একচক্ষু হরিণের মত নিশ্চিন্ত হয়ে এতদিন পর্য্যন্ত তাঁর অতিপ্রিয় অথচ সর্ব্বনেশে এই ভ্যানিটী ব্যাগটী আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। একে এক নিদারুণ অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কিই বা বলা যাবে।

আমি এইরূপ বিবিধ চিন্তায় কিছুক্ষণ মসগুল হয়ে থেকে এই অতি-প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি আমার নিজস্ব সেফে তুলে চাবি দিয়ে আফিসের দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্র সেখানে এই মামলা সম্পর্কীয় আর এক মূর্ত্তমান মানুষকে প্রবেশ করতে দেখলাম—তাঁকে এখানে আনয়নকারী থানার প্রতিহারীর কাছে শুনলাম প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ একটা জরুরী সংবাদ আমাদের দেবার জন্য বাইরের আফিসে ইনি অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে আসন গ্রহণ করে একটী আশাতীত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। এঁর এই বিবৃতির উল্লেখ-যোগ্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আজ্ঞে! আমার নাম হচ্ছে এস্ ডট। একজন স্যুট-পরা বাঙ্গালী আমি পূর্ব্বের শ্রীমতী প্রমীলা দেবীর আফিসে তাঁর পারসন্যাল এ্যাসিস্টেণ্ট ছিলাম। এখন আমি ওকালতী পাশ করে পুলিশ কোর্টে ওকালতী করি। তা'ছাড়া আমি কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার অমুক বাগচীর জনৈক সহকারীও বটে? আমাদের সিনিয়ার ব্যারিষ্টার অমুক বাগচী কাশীপুরের ষ্টেটের বড় তরফদের হয়ে মামলা পরিচালনা করছেন। আজ এই মাত্র আমাকে প্রমীলা দেবী ও কাশীপুরের জমীদার-গিন্নী টেলিফোনে জরুরী কাযে তলব করে

পাঠালেন। আমি এসে শুনলাম যে তাদের একটী বিশ্বস্ত বালক-ভৃত্যকে এই অল্পক্ষণ আগে কে বা কারা গুম করে দিয়েছে। এঁরা ভুল করে ও না জেনে বাড়ীর এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁদের সঙ্গে হাইকোর্টে মামলারত তাঁদের ষ্টেটের ছোট তরফের এক জ্ঞাতিশত্রুকে তাদের বাড়ীতে ডেকে এনেছিলেন। তিনি বোধ হয় দৈবক্রমে এই বাড়ীর মেয়েদের কাউকে কাউকে দেখে চিনে ফেলে থাকবেন। ওঁদের ঐ বাড়ীর বালক-ভৃত্য বেচারাম এই ডাক্তারকে তাঁর গাড়ীতে তুলে তার গাড়ী পর্য্যন্ত তাঁর চিকিৎসার যন্ত্রপাতির ব্যাগ বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই এই অবোধ স্বল্পবয়স্ক বালক বেচারামকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। আমার পূর্ব্ব মনিবানীর বিশ্বাস যে ঐ চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায়ই এই ছেলেটীকে ভুলিয়ে বা ভাড়িয়ে তাকে তার গাড়ীতে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। এখন আমাদের আন্তরিক অনুরোধ যে এই বালক বেচারামকে খুঁজেপেতে বার করে আজই যদি আপনারা তাকে এনাদের বাড়ীতে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এবার থেকে এই বালক-ভৃত্যের মাসিক বেতন ডবল করে বাড়িয়ে দিতেও এঁরা রাজী আছেন।"

আমি নিজেই সাবধানে এই ভদ্রলোক এস্-ডটের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে অবাক হয়ে তাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এই সময় আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, এই এস্-ডট নামক স্যুটপরা এক ভদ্রলোকই আমাদের প্রমীলা দেবীর বাড়ীর কেয়ার-টেকার ভদ্রলোকের নিকট এসে ঐ বাড়ীর দ্বিতলের ফ্ল্যাটটী কাশীপুরের জমীদারদের তরফ হতে ভাড়া করে গিয়েছিলেন। এই এস্-ডট নামক ঐ জুনিয়ার উকিলটীও যে তাঁর সিনিয়র আইনজীবীদের সহিত যোগ দিয়ে এই কাশীপুর ষ্টেটের উভয় তরফের মামলায় যে বেশ কিছু টাকা লুট করছিলেন তা সহজেই বুঝা যায়। এই সঙ্গে আমি এ'ও বুঝতে পারলাম যে, মধ্যে মধ্যে খুব প্রয়োজন হলে শ্রীমতী প্রমীলা দেবী তাঁর এই পূর্ব্বতন অফিস-কর্ম্মচারীটীকে তলব করে থাকেন। এমনও হতে পারে যে প্রমীলা দেবী তাঁর প্রিয় নবীন'কে [সরকার ?] এঁর মারফৎই পত্র পাঠিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য এই বিষয়টী তাঁকে এখুনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করা আমি সমীচীন মনে করলাম না। কিন্তু একটা বিষয় আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না—এই যে এই তার দেওয়া সংবাদটির মধ্যে প্রমীলা দেবীর ভ্যানিটী ব্যাগ চুরি হওয়ার বিষয়টি বেমালুম চেপে গেলেন কেন? এতক্ষণও যে এঁদের অতি সাবধানে রাখা বহু-আকাঙ্খিত এই পত্রটী (মৃত্যু বান] সহ ভ্যানিটী ব্যাগটীর অপহরণ যে এঁরা জানতে পারেননি, তা কখনই হতে পারে না। বোধ হয় তাঁরা পুলিশ দিয়ে এই ভ্যানিটী ব্যাগটী উদ্ধার করার মধ্যে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে খুব ভালোরূপেই সচেতন ছিলেন। তাই এঁরা প্রকৃত বিষয় অবগত হবার জন্যে প্রথমে বেচারামেরই খোঁজ করতে চান। এইরূপ এক অবস্থায় পড়ে মানুষের মস্তিষ্কের আশু বিকৃতিও ঘটে। এই জন্যে অন্যায়ভাবে ধুরন্ধর ডাক্তার সুরজিৎ রায়কেও সন্দেহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বেচারামের মুখে আমরা শুনেছিলাম যে সুরজিৎ ডাক্তার হঠাৎ এসে পড়ায় প্রমীলা দেবী তাড়াতাড়িতে দিশেহারা হয়ে রোগীর ঘরের ঐ বেঁটে আলমারীর উপর থেকে তাঁর ভ্যানিটী ব্যাগটি না নিয়েই পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এই ভ্যানিটী ব্যাগটী বহু দিনের ব্যবহৃত বহু পুরানো সামগ্রী ছিল। এমন কি ব্যাগটী এক লহমায় দেখে প্রমীলা দেবীর পুরানো বন্ধুদের মধ্যে এক পুরাতন অন্যতম বান্ধব সুরজিত রায়ের পক্ষে এই ব্যাগটী চিনে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। এইরূপ কোনও এক অহেতুক চিন্তাও প্রমীলা দেবীর ও তাঁর বান্ধবী জমীদার-গৃহিণীর তখনকার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে উদয় হয়েছিল ব'লেই হয়তো তাঁরা এইরূপ এক অভিযোগ সরল বিশ্বাসে ডাঃ সুরজিতের নামে এঁকে দিয়ে দায়ের করিয়ে দিলেন। কিন্তু এদিকে আসল বিষয় আমাদের জানা থাকায় এই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করাও সম্ভব ছিল না। আমি এইজন্য এই সংবাদ-দাতাটীকে এই সম্পর্কে বহু আশার বাণী শুনিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে তাকে কয়েকটী প্রশ্ন করতে সুরু করে দিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্র :—আচ্ছা। আপনি বলুন তো এখন এই বালক-ভৃত্যের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাটী হতে কোনও দ্রব্যাদি

ও অন্তর্ধান হয়েছে কি না? এমনও তো হতে পারে যে ঐ বালক-ভৃত্য লোভে পড়ে কোনও দামী সামগ্রী নিয়ে নিজেই পলায়ন করেছে। আপনি বরং একবার বাড়ী গিয়ে ভালো করে দেখুন সেখানে কোনও জিনিস টিনিস হারালো কি না?

উঃ—আমার পূর্ব্ব-মনিবানীরা ঐ সরল-মনা বালক ভৃত্যটী যে কোনও দ্রব্য চুরি করে পালাতে পারে তা তাঁরা বিশ্বাসই করেন না। আমি যে এই একই প্রশ্ন তাদের কাছে উত্থাপন করি নি—তা'ও নয়। কিন্তু তাঁদের মতে ঐ সুরজিত ডাক্তারই ছোকরাটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়েছে। এখন এমন অবস্থা তাদের হয়েছে যে কিল খেয়ে কিল চুরি করা ভিন্ন তাদের আর কোনও উপায় নেই। এত কারণ ওখানকার গিন্নীরাই কাশী-পুরের বড় তরফের কাউকে না জানিয়েই তাদের এক নিঃ-সম্পর্কিত রোগীর চিকীৎসার জন্য ঐ চক্ষু-বিশারদকে এক-মাত্র এক্সপার্ট বিধায় ওঁদের বাড়ীতে গোপনে ডাকিয়ে আনিয়েছিলেন। এ'ছাড়া মুস্কিল হচ্ছে এই যে—ঐ বালক-ভৃত্যটীর দেশভুঁইএর বা কলকাতার কোনও ঠিকানাই এঁরা লিখে রাখতে পারেন নি।

প্রঃ—আমার মনে হয় আপনার পূর্ব্ব-মনিবানীর জানা-শুনা এক ভদ্রলোক নবীন সরকার বোধ হয় এই ছেলেটীর বাসার ঠিকানা জানলেও জানতে পারেন। আপনি এক-বার এই নবীনবাবুর বাসায় গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন, না। আপনি নবীনবাবুর বাসাটাসা যদি না চেনেন, তা হ'লে—

উঃ—ও হো হো। ওর সেই আত্মীয় নবীন সর-কারের কথা বলছেন তো! হাঁ হাঁ। ওর শান্তিভাঙ্গা লেনের বাসাতে একবার আমি গিয়েছিলাম তো বটে। আমার পূর্ব্বতন মনিবানীর একটা পত্র নিয়ে তাঁর কাছে একবার আমাকে যেতে হয়েছিল। আচ্ছা! তা' হলে ওঁর ওখানে আমি একবার খোঁজ করে আসবো। আচ্ছা। আমি তাহলে এখন আসি, স্যার।

আমি আমাদের এই সদ্য নূতন সাক্ষী এস-ডট্-এর প্রত্যাগমনের পথের দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে ভাবলাম যে —বুঝি বা কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি আমাদের এই বিষয়ে অক্ষমতা বুঝে দয়াপরবশ হয়ে আমাদের এই তদন্তের সফলতার পথে জোর করে ঠেলে এগিয়ে দিতে চায়। আমাদের নিজেদের আফিসের মাত্র একটী স্থানে বসে এতো সাক্ষীসাবুত আমরা ইতিপূর্ব্বে কোনও দিনই সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। এই দিনের মত তদন্তে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা এইবার খুশীমনে বিশ্রামের জন্য যে যার কোয়াটারে উঠে গেলাম। আমার এই বার স্থির বিশ্বাস হলো যে, এদের পাপের ষোলো আনা বোধ হয় পূর্ণ হয়ে এসেছে। তা' না হলে স্বয়ং দৈব এই বিষয়ে ওদের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়ক হয়ে পড়লে কেন?

যথারীতি এই দিনও সকালে অফিসে এসে বসে সহ-কারী অফিসারদের সঙ্গে এই অদ্ভুত মামলা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করাছিলাম। এতদিনে যেন আমাদের তদন্ত রূপ শকটটী তার এলো-মেলো অজানা ও অচেনা পথ পরিহার করে বাঁধা-ধরা রেল লাইন ধরে চলতে সুরু করে দিয়েছে। এখন আশা হয় কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের এই মহাশকট অনায়াসে তার গন্তব্য স্থানে নিয়ে পৌছিয়েছে। এদিকে এই মামলার তদন্তে সকলে মিলে ব্যস্ত থাকায় অন্যান্য বহু ছোট খাটো মামলার তদন্তেও বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। এই সব বিষয়েও আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আমরা এখন এই অদ্ভুত মামলার তদন্ত অতি-শীঘ্র শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। এই তদন্তের পরবর্ত্তী পদক্ষেপ আমাদের কোনদিক হবে সেই সম্বন্ধে অভিমত নেবার জন্য আমি আমার সহকারীদের মুখের দিকে চাইলাম।

'এখনও কি স্যার ঐ সাঙ্ঘাতিক প্রমীলা দেবীর বাড়ী তল্লাস করে তাকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করার সময় কি আমাদের হয় নি। আমার অন্যতম সহকারী কনকবাবু জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চেয়ে বললেন,' আমার ধীর স্থির বিশ্বাস যে সরাসরি গ্রেপ্তার না হলে ওর কাছে হতে কোনও সত্য কথা জানা যাবে না। স্থানকাল মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটা বিশেষ প্রবাদ আছে। ওঁকে থানায় নিয়ে আসা মাত্র এখানকার পরিবেশে পড়ে তিনি তাঁর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। এই অবস্থায় ওঁর নিজের বাড়ীতে বসে যা আমাদের বলেন নি, তা উনি এই থানার চারিটী দেওয়ালের ভিতরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে ফেলবেন।

হু ! স্থানকাল ও পরিবেশের শক্তিতে আমিও বিশ্বাসী। কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছো যে ওঁরা মেয়ে-ছেলে। হত্যার মামলাতে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদের আমরা যথা-শীঘ্র জামীন দিতে বাধ্য। এখন এই সব বিত্তশালিনী মহিলা-দের থানায় আনা মাত্র চারিদিকে বড় বড় উকীল ব্যারি-ষ্টারে ভর্ত্তি হয়ে যাবে। এর পর এদের কেউ কেউ ইতি-মধ্যে বড় হাকিমের বাড়ীতেই ছুটে গিয়ে সেখান থেকে এদের জন্য জামীনের হুকুম তখনি মঞ্জুর করিয়ে আনবেন। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই বহু প্রয়োজনীয় সাক্ষী সাবুং সংগ্রহ করেছি। কিন্তু তাঁদের জামীন আটকানোর মত সাক্ষী প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। এখন তবুও যখন তখন ওঁদের বাড়ী গিয়ে ওঁদের জিজ্ঞাসা-বাদ করে বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু ওঁরা একবার আদালত হতে জামীনে মুক্ত হয়ে আসতে পারলে পর—আর আমরা আইনমত ওঁদের ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারবো না যে। তোমরা বুঝো না যে 'তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যম্ যাবৎ ভয়ম্ অনাগতম্'। এ' ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত সুরু অপেক্ষা তদন্ত করে গ্রেপ্তার করারই আমি পক্ষপাতী। এখন আমি ভাবছি কি ভাই—তা তোমরা জানো ? আমি ভাবছি এই যে এতদিন যিনি পরিপাটী বেশভূষা করে এসেছেন, সেই একই তিনি এখন আর তাঁর সাজগোজে এতো অমনোযোগী কেন ? এ'কি ঐ হতভাগা যুবকটীর চক্ষুরত্ন হারানো-জনিত শোকের জন্যে, না, এর পিছনেও অন্য কোনও এক অতি গুহ্য এক অজানা কারণ আছে। আমাদের বিচকের এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ আহত যুবকের মনোরঞ্জনের জন্যই এতোদিন তিনি সাজগোজ করে এসেছেন। এখন তাঁর এই সাজগোজের আর কোনও প্রয়োজন না থাকাতেই তাঁর এই অহেতুক সাজগোজে তিনি বিরত থাকতে চান। আমার এই অনুমান যদি সত্যি হয়, তা'হলে এই হতভাগ্য যুবককে আহত করার পেছনে উদ্দেশ্য বা মোটিভ এইটাতেই প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য আরও একটু এই বিষয়ে তদন্ত না করে জোর করে এই অভিমত প্রকাশ করা উচিৎ হবে না। এখন এসো আজকের মধ্যেই আরও কয়েকটী স্থানে আমরা তদন্তকার্য্য সেরে আসি। এখন আজই আমাদের সেই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায়ের আস্তানা ও চেম্বারে একবার হানা দেওয়া দরকার। তা হলে এসো সেখানেই যাওয়া যাক। কেমন ?

এরপর আমি আর দেরী না করে সহকারী কনক-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ট্রাকে করে ডাঃ সুরজিৎ রায়ের ধর্ম্মতলার চেম্বারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। ডাঃ সুরজিৎ রায়ের বসতবাটীর সঙ্গে তাঁর এই চেম্বার ও কৃত্রিম চক্ষু উৎপাদনের একটী ছোট কারখানা সংযুক্ত ছিল। আমরা সেখানে পৌছুনো মাত্র দেখলাম যে স্থানীয় থানার একজন তদন্তকারী অফিসার তাঁর ঐ বাটী থেকে বার হয়ে আসছেন। তাঁর মুখে শুনলাম যে কাল রাত্রে তাঁর ডিসপেন্সারী এবং বসতবাটী ও কারখানা—এই তিনটী স্থানে একই রাত্রে সিঁদ কেটে ও তালা ভেঙে বড় চুরি হয়ে গিয়েছে। এই তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের এই সময়কার বিবরণের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'এ একপ্রকার আশ্চর্য্যজনক ও অভূতপূর্ব্ব সিঁদেল চুরি, মশাই। কোনও এক বাষ্পীয় প্রক্রিয়ার জন্যে বোধ হয় বাসীন্দাদের ঘুম গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রতিটি ঘরের প্রায় প্রতিটী বাক্সের শুধু কাগজপত্রই তছনছ করেছে। কিন্তু তবুও বাড়ীর কেউ একটু কোন শব্দও শুনতে পায়নি ! সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কটী মাত্র দ্রব্যও এখান হতে চুরি হয় নি। এমন কি কাগজপত্রের ফাইল ছাড়া এরা কোনও দামী জিনিস স্পর্শ করে নি। তবে কয়েকটা পরিষ্কার অঙ্গুলীর টীপ বাক্সের ও টেবিলের ডালাতে পাওয়া গিয়েছে। এখন জানেন তো এঁর ওপর-ওয়ালা মহলে কতো খাতির। তাই কালকে তদন্ত করার পর আজকেও এসে ওঁকে একটু খুশী করে গেলাম। তা' না হলে অভিযোগ করে বসবেন যে পুলিশ খুব বিশেষ চেষ্টা করছেন না। আপনার কি এখানে চোখ-টোকের চিকিৎসার ব্যাপারে এখানে আসা হয়েছে। তা উপরে যান আপনি। ডাঃ সুরজিৎ রায় চেম্বারেই আছেন।'

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে কালকেই তো সেই পত্রখানি চুরি হওয়ার পর ওখানকার সেই মহিলাটী এই ডাক্তারকেই সন্দেহ করেছিলেন। [বেচারামের বিবৃতি দ্রষ্টব্য] এখন কাল রাত্রেই এঁর বাড়ীতেই একটা বড়ো চুরি হয়ে গেলেও কোনও দ্রব্যাদি অপহৃত হলো না।

ওদিকে আবার শাস্তিভাঙ্গা লেনে আমাদের এই মামলার সংবাদদাতা অন্য ব্যক্তির বাড়ীতেও এইরূপ একটী বড়ো সিঁদেল চুরি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেখানেও কোনও দ্রব্যাদির বদলে শুধু কাগজপত্রই তছনছ করা হয়েছিল। [বাড়ীওয়ালীর বিবৃতি দ্রষ্টব্য] তবে সেখানেও কয়েকটী অঙ্গুলীর ছাপ একটা পোটমেণ্টের ওপর পাওয়া গিয়েছে ব'লে শুনেছি। এখন এই উভয় স্থানে প্রাপ্ত অঙ্গুলীর ছাপ তুলনা করার পর যদি প্রমাণিত হয় যে একই দল এই দুইটী পৃথক স্থানের অপকর্ম্মের জন্য দায়ী তা'হলে এই সব সিঁদেল চোরদের সন্ধান কাশীপুর রাজষ্টেটের বেনিয়াপুকুর এলাকার সেই চোর গুণ্ডা অধ্যুষিত বস্তীতেই খোঁজ করা উচিৎ হবে ব'লে আমার মনে হলো।

'হুঁম্। এই সব চুরির ব্যাপারে আমারও একটা খবর আছে হে'। আমি প্রকৃত বিষয় গোপন করে এই তদন্তকারী অফিসারকে বললাম, 'তুমি এখুনিই একবার বটতলা থানাতে চলে যাও। সেখানকার অফিসাররা শাস্তিভাঙ্গা লেনের একটা চুরির তদন্তের সময় কয়েকটা টিপচিহ্ন পেয়েছেন। তোমাদের এইখানে পাওয়া টিপ-চিহ্নের সঙ্গে ওখানে পাওয়া অঙ্গুলী টিপের তুলনা করলেও দেখবে ওগুলো একই মানুষের বা মানুষদের আঙ্গুলের টিপ। এখন যদি এই সব অঙ্গুলীর একই সেট-অব্-কাল-প্রিটের হয় তাহলে তাদের কোথায় পাওয়া যাবে তা আমি তোমাদের পরে বলে দেবো। তোমাদের বড়বাবুকে এক-বার টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলো তো! এ'ছাড়া এই দুইটী চুরির মোডাস্ অপারেণ্ডাই বা কার্য্য-পদ্ধতিও একপ্রকার দেখা যাচ্ছে। এই উভয় চুরিতেই কাগজপত্র যা কিছু বাক্সো-টাক্সো হতে বার করে বাড়ীর নিকটের একটী উন্মুক্ত স্থানে ছড়ানো রয়েছে। অথচ সেখান থেকে একটুকরো কাগজ বা পত্র বা দলীল চুরী যায় নি। এই বিশেষ দিকটাও আমাদের ভেবে দেখা উচিৎ হবে।

আমি যে কতো বড়ো একজন তদন্ত-বিশারদ অফিসার তা আমাদের এই তদন্তকারী জুনিয়ার অফিসারটির অজানা ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ আমার এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে পরবর্ত্তী করণীয় কার্য্যের জন্য নিজেদের থানায় আমার উপদেশ মত ত্বরিত গতিতে ফিরে গেল। এর পর আমি উপরে গিয়ে চক্ষু-বিশারদ বিজ্ঞানী ডাক্তার সুরজিৎ রায়ের চেম্বারে এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের অনেক পীড়া-পীড়ির পর ডাঃ সুরজিৎ রায় আমাদের বিবিধরূপ জেরার উত্তরে নিম্নলিখিতরূপ একটী বিবৃতি দিয়েছিল। এইখানে কেবলমাত্র তাঁর প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে।

"আমার নাম ডাঃ সুরজিৎ রায়, পিতার নাম রায় বাহাদুর ৺অমুক রায় মহাশয়। কাশীপুরের নবাবী আমলের পুরানো জমীদারবংশে আমার জন্ম। পূর্ব্বে আমাদের এই জমীদারী ম্যানেজমেণ্টের ব্যবস্থা একত্রে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই ষ্টেটের বড় তরফের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে মনোমালিন্যের পর আদালতে উভয়পক্ষেরই পরস্পরের বিরুদ্ধে কয়েকটী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া জমীজমার সীমার বিরোধ ও দখলী সত্ত্ব নিয়েও সেখানে কয়েকটী ফৌজদারী মামলা আমাদের বিচারাধীন। আমি কলিকাতা থেকে ডাক্তারী পাশ করে প্রথমে লণ্ডন ও পরে ভিয়ানা থেকে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করি। এখানে এবার করপোরেশনের ইলেক্শন কণ্টেস্ট করেছিলাম। কিন্তু পরে আমাদেব পার্টি'র অনুরোধে আমি আমার নাম প্রার্থীপদ হতে প্রত্যাহার করে নিই। এইখানেই আমার বাস, ওয়ার্কসপ্ ও চেম্বার একত্রে আছে। হাঁ, হাঁ। আমি প্রমীলা দেবীকে চিনি বৈ কি! তিনি আমাদের বড় তরফের বৌরাণীর বাল্য বান্ধবী। আজ্ঞে হ্যাঁ! সে কথাও ঠিক। তিনি বহুবার আমাদের কাশীপুরের রাজবাটিতে গিয়েছিলেন। এ সব বিষয় আপনারা মশাই জানলেন কি করে? প্রমীলা দেবীর সঙ্গে আমার বিলাত যাবার আগে একটু ভাবসাব হয়েছিল তো বটে। আর একটু হলে হয়তো আমরা বিবাহসূত্রে বন্দীকৃত হয়ে যেতাম। কিন্তু সময় মত ঈশ্বর আমাকে এ মহা অঘটন হতে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আজ্ঞে হাঁ হাঁ, তা তো ঠিকই। এতো কথা আপনারা জানলেন কি করে? ভদ্রমহিলা ওর মেক্আপের চটকে আমাকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন আর কি? কিন্তু বিলাত থেকে ফিরে এসে দেখলাম যে উনি প্রায় আমারই সমবয়সী হবেন। এখন আমাদের বৌরাণীর বড্ড ইচ্ছে আমি তাঁর এই বান্ধবীটিকেই বিয়ে করি। ওঁদের মধ্যে এতো নিবীড় অন্তরঙ্গতা যে সহোদরা

বোনেরাও তা কখনও কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু তা বলে ওকে বিয়ে করে আমি নিজের সারা জীবনটাই তো নষ্ট করতে পারি নি। আমাদের এই দুই তরফের মধ্যে ইদানীং মামলা মকর্দ্দমা চললেও আমার এই বৌদিদিটীর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত সদ্‌ভাবই ছিল। বাড়ীর পুরুষদের মধ্যে কি নিয়ে কলহ হচ্ছে বা না হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের এই সাবেকী পরিবারের মেয়েরা কোনও দিনই মাথা ঘামায় নি। আমাদের দেখামাত্র তাঁরা আদর করে বাড়ীর মধ্যে এনে কতো যত্ন আত্তি করেছেন। কিন্তু এই প্রমীলা দেবীর জন্য আমাদের এই ঘরোয়া শান্তিও অব্যাহত থাকে নি। বৌদিদি আমার তাঁর বান্ধবীর প্রত্যাখ্যানজনিত অপমান নিজের অপমান ব'লে ধরে নিয়ে তিনিও তাঁর স্বামীর মতন শত্রু হয়ে উঠলেন। এর পরও শুনেছি যে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে পরবর্ত্তীকালে মাথামাথি করেও আরও দুই একজন ঈপ্সিত স্বামী ফেঁসে যাবার আগে সরে পড়েছেন। ওঁর আবার কম বয়সের স্বামী না হলে একেবারেই মনে ধরে না। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে দেরী হওয়ায় ওর ঈপ্সিত স্বামীদের বয়সের কোনও তারতম্য ঘটে না বটে! কিন্তু ও দিকে ওর বয়স বেশী থাকায় সেটা সেই সময়ের মধ্যে আরও বেড়ে যায় যে! তবে সেটা লোকের চোখে ধরাও পড়ে তাড়াতাড়ি। এই জন্য প্রথম প্রথম ওঁকে ভালো লাগলেও দুই এক বছর পরে ওঁকে আর কাউরই ভালো লাগে নি। এইটেই হচ্ছে ওঁর জীবনের সাধারণের না জানা একটী গুহ্য তত্ত্ব। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক প্রমীলা দেবীর ধারণা হয়েছে যে আমি শত্রুতা করে ভাঙচি দিয়ে তাঁর ঈপ্সিত দয়িতাদের ওঁর প্রকৃত বয়সের কথা ব'লে তাদের আমিই ভাগিয়ে দিয়ে থাকি। এটা অবশ্য ওঁর একটা মনের একান্তরূপে মনোম্যানিয়া ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। এদিকে আমাদের আর এক শয়তান জুটেছে বড় তরফের এক গোঁফওয়ালা প্রবীণ ম্যানেজার সারকেল মশাই। আমি যতোবার আমাদের ঐ বড় তরফের বড়দার সঙ্গে মামলা মকর্দ্দমা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করি, ততবারই তিনি দু'পয়সা মারবার লোভে আমাদের পারিবারিক বিরোধটা জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেন। এই লোকটী যে কতবড়ো এক গুণ্ডার সর্দ্দার, তা' আপনাদের ধারণাই নেই। কাশীপুরের ষ্টেটের বেনিয়াপুকুরের বস্তীটীর কোন চোর বদমায়েস ধরা পড়লে উনি তখুনি তদ্বির করে তাদের জামীনে খালাস করে এনেছেন। আমাদের পূর্ব্বেকার যৌথ ষ্টেটের এক পুরাণো কর্ম্মচারী এইচ-বোস এবার ইভিনিং ক্লাশ করে ওকালতী পাশ করে ওকালতী করছেন। এই ভালো লোকটাকেও উনি ঐ গুণ্ডা চোরদের জন্য তাঁকে দিয়ে মামলা লড়িয়ে থাকেন। সে অবশ্য আমাকে এসে বলে যে—ক্লায়েণ্টের অভাবে পেটের দায়ে সে ওদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। এই এইচ-বোসকে প্রমীলা দেবীও কিছুদিন তাঁর আফিসে চাকুরী দিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর অপর পার্টনাররা অপছন্দ করায় ওঁকে কায ছেড়ে দিতে হয়। তবে নূতন উকীল হিসাবে এই এইচ বোসের ওকালতী পেশা ভালোই চলছে। আরে আরে! আপনারা তো বহু খবরই রাখেন দেখছি। আজ্ঞে হাঁ। কাশীর এক বর্দ্ধিষ্ণু সাবেকী পরিবারের একটী সুদর্শনা কন্যাকে আমার পত্নীরূপে মনোনীত করেছি।

হাঁ হাঁ হাঁ! ঠিক তাই! আমার মনের কথা আপনি টেনে বার করেন কি করে? এই বিষয় নিয়ে আমি কাউর সঙ্গে কোনও আলোচনা করি নি তো! আমি এখানেও য়ুরোপে-শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে মিশে বুঝেছি যে রাত্রে বাসে টাকার চেঞ্জ নেওয়ার মতই আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করা সমান রিস্কি। রাত্রে মোটর বাসে টাকা ভাঙালে যে সব সময়েই কয়েকটা মেকী রেজগী বেরুবে তা অবশ্য নয়। তবে এই বিষয়ে যথেষ্ট রিস্ক নিতে তো হয়। কিন্তু আমি নিজের পত্নী সংগ্রহে এতটুকু রিস্কও নিতে চাই নি। এইজন্য অর্দ্ধপর্দ্দানশীন ঘরে লেখা-পড়া জানা সুদর্শনা মেয়েই আমি পছন্দ করেছি। আজ্ঞে হাঁ। এও ঠিক। আমার ভাবী শ্বশুরের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের পুত্রের মাধ্যমে এই বিবাহের কথাবার্তা এখনও চলছে। এই ভদ্রলোক আমার এই ছোট্ট কৃত্রিম চক্ষুর ল্যাবরেটরীর ম্যানেজারী করে। কাশীপুর ষ্টেটের বেনিয়া-পুকুরের বস্তীর প্রায় সবটুকুই বড় তরফের মালিকানা বর্ত্তালেও ঐ বস্তীর সামান্য কিছু অংশ আমারও অধিকারে আছে। এই বস্তীর আমার মালিকানার অংশটীর ইনিই দেখাশুনার ভার নিয়েছে। ঐ বাড়ীর সামনের রাস্তার ওপারে ইনি একটা বাড়ীতে বাস করেন শুনেছি,

তবে তাঁর এই বাড়ীটি আমাদের ষ্টেটের সম্পত্তি নয়। আজ্ঞে না! ওর ঠিকানাটা জানলেও ওঁর সংসার সম্বন্ধে আমি ওয়াকীবহাল নই। বড় তরফের ঐ গোঁফ-ওয়ালা ম্যানেজারের বর্ত্তমান কীর্ত্তিকলাপ আমি এঁর মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। এই শহরের একজন প্রভাবশালী নাগরিক হয়েও আমাকে এই সব সংবাদ অনুযায়ী সাবধানে চলাফেরা করে থাকি। আজ্ঞে হাঁ। পূর্ব্বে এই দু ম্যানেজারের মধ্যে স্বভাবতই সদ্ভাব ছিল। এখন আমাদের মধ্যে মামলা বাঁধায় এঁদের মধ্যেও পূর্ব্বের মত আর মেলামেশা নেই। কাল আবার এই স্থানে একটা অদ্ভুত চুরি হয়ে যাওয়ায় মন আমার ভালো নয়। অন্য আর একদিন এলে বড় তরফের আরও বহু তথ্য জানাতে পারবো।"

[ক্রমশঃ

—সাধে কি 'লাল' জিনিষকে বিশ্বাস করি না। কিছু বোঝবার আগেই বলটা হঠাৎ বাঁক খেয়ে উইকেটটি বেঁকিয়ে দিয়ে গেল।

শিল্পী—অর্দ্ধেন্দু দত্ত।

অতীতের স্মৃতি

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

১০

খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতকের প্রাচীন-নথীপত্র খুঁজতে খুজতে সেকালের কলিকাতা-শহরবাসী প্রগতিশীল সৌখিন-সম্প্রদায়ের বেলুন-ওড়ানোর উৎসাহ, আর অনুন্নত পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ-অধিবাসীদের ব্যাঘ্র-ভীতি যে কতখানি প্রবল ছিল, সমসাময়িক ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ-পত্রের পাতায়…সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিচিত্র-কাহিনীর সন্ধান মিলেছে—একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের অবগতির জন্য তার কিছু নমুনা নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

*　　*　　*

বেলুন-ওড়ানো

(ক্যালকাটা গেজেট, ৩১শে আগষ্ট, ১৮২৬)

We understand that a rather novel spectacle for Calcutta, was exhibited yesterday at Entally. An ingenious person tesiding in that quarter of the town, had manufactured two Balloons, with cars attached, and a flag waving gracefully from each end of the car, The largest Balloon was about 18 feet in height, and the smallest, about 12 feet. The diamater of the first might have been about nine, and of the other about six feet. The cars which were framed of pas'eboard, were flit. The larger was three feet, the smaller a foot and a half long. The body of the Balloons appeared to have been made of tissue paper, tastefully painted with wreaths, and a variety of ingenious devices.

The Balloons were rendered buoyant by the rarefaction of the air by fire, and the smaller was let off about 20 minutes to 6 o'clock. It rose most majestically, took a north-easternly direction and remained in sight abont 20 minutes. The second Balloon was let off about 6 O'clock and took a similar direction with the other. It is supposed they may have fallen in the neighbourhood of Dum Dum.

*　　*　　*

বাঘ-শীকার

(সমাচার দর্পণ, ২রা মার্চ্চ, ১৮২২)

ব্যাঘ্র।—কলিকাতার পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চৌরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্রভীতিও অতিশয়। এক গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা—তাহার স্বামী প্রাতঃকালে কর্ম্মান্তরে গেল—ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের

চতুর্দিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রীলোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ এ সময়ে আপন স্বামী আইসে—তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই ২ রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উছাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল, কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাদের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল—এই সময়ে ঐ স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বারং বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্বং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে২ গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জালাইতে লাগিল। কিছু কাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, নিঃশব্দ হইলে দুই ঘণ্টা পরে গ্রামস্থ লোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া চতুর্দিগ অবলোকন করিয়া পাচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে২ ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চাল হইতে নামাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

* * *

বেলুন-ওড়ানো আর শীকারের সখ ছাড়াও, প্রাচীন সংবাদ-পত্রাদি থেকে সেকালের ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়-সম্প্রদাবের লোকজনের মধ্যে শাণিত-তলোয়ার কিম্বা গুলি-ভরা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে 'ড্যুয়েল' (Duel) বা 'দ্বৈরথ সমরের' নির্ম্মম-প্রতিদ্বন্দ্বীতা আর বাহাদুরী-দেখানোর যে সব বিচিত্র রোমাঞ্চকর-বিবরণের সন্ধান পাওয়া যায়, তারও কিছু নমুনা উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—একালের পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল-নিবারণের উদ্দেশ্যে। এ সব বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট-হদিশ মেলে যে সেকালের চিন্তাশীল-জনগণের মনে বিগত উনবিংশ-শতকের ইউ-রোপীয়-সম্প্রদায়ের এই 'ড্যুয়েল' বা 'দ্বৈরথ-সমরের' নৃশংস-মর্ম্মান্তিক প্রথা কতখানি প্রবল উদ্বেগ-অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিকর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সমসাময়িক-জনগণের তীব্র-বিক্ষোভ আর সংবাদপত্রের নির্ভীক-কঠোর সমালোচনার ফলে, সেকালের ইউরোপীয়-সমাজে ক্রমশঃ শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়েছিল এবং নিজেদের হিতাহিত সম্বন্ধে সজাগ-সচেতন হয়ে উঠে অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা আত্মঘাতী এই নির্ম্মম 'ড্যুয়েল' বা 'দ্বৈরথ-সমর' প্রথার চির-উচ্ছেদ সাধন করেন।

* * * *

দ্বৈরথ-সমর

(উইলিয়াম হিকি রচিত 'স্মৃতি-কাহিনী' [Memoirs] ১৭৮২)

...On the 8th (জুলাই, ১৭৮২), being told a gentleman wished to speak to me in private, I went into an ante-chamber, where I found Captain Samuel Cox, who after the usual congratulations upon my being once more an inhabitant of Calcutta, expressed great concern that his first visit should be of so unpleasant a nature, but that attachment of a very long standing made it incumbent on him to accept the disagreeable office, After promising this much, he said he called on the behalf of Mr. Nathaniel Bateman, who so strongly felt the language I had held towards him when personally present, as well as the contemptuous and disrespectful manner in which I had often spoken of him to various French officers, naval and military, whilst we were both at Trincomalay, rendered it imperiously necessary for him to demand of me *satisfaction*, his (Captain Cox's) business therefore was to request I would name time, p'ace and weapons for the meeting (দ্বৈরথ-সমর), unless, as he sincerely hoped might be the case, I made so violent a proceeding unnecessary by appologizing for what had passed. I instantly observed that anything in the way of

pology from me was wholly out of the uestion, as I really and truly thought the liberal and unhandsome behaviour of Mr. Bateman deserved all I said of him. It was herefore arranged that we should meet the ollowing morning at sunrise, at the back of Belvidere House at Alypore, with pistols, each attended by a friend ; that he (Captain Cox) should accompany Mr. Bateman.

Upon the departure of my unpleasant visitor I informed Pott of all that had occured, entreating he would go with me, which he instantly consented to, saying, "By God, Bill, you shall shoot the dirty little rascal through the head. I have a delicate pair Wogdens that will do his business effectually.

... ...

...Before daybreak of the 9th (জুলাই ১৭৮২] I gently left Mrs. Hickey in a profound sleep, and dressing myself in the next chamber, Pott, whom I found up and dressed, and I stepped into his post-chaise, driving to the appointed ground at Belvedere, distant about three miles. Mr. Bateman and Captain Cox arrived almost at the same instant that we did. The group being measured [twelve paces] by the seconds, it was, after a short discussion, determined that we should toss up for the first fire. Mr. Bateman won, discharged his pistol and missed. I then fired mine, but equally without effect, whereupon Mr. Bateman said it was then the time for him to declare upon his honour as a gentleman he never had used any disrespectful expression either to me or Mrs. Hickey, neither by writing nor parolly, and that I had been entirely misinformed relative thereto, his language of complaint having been confined to the injnstice of illeberality with which he and the other two English gentlemen, Messieurs Kemp and Brown, were treated by the French at Trincomalay, and that he had never even introduced my name or made any comparison as to our relative treatment. Upon this declaration, so seriously made and at so momentous a time, the seconds interfered, a reconciliation instantly took place, when I felt not the least reluctance to apologize for the improper language I had used, and which I was now convinced I had used under a mistaken impression upon my mind. The seconds were much pleased with our respective conduct, Mr. Bateman and I shook hands, and we parted perfectly reconciled,

* * * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৬ই জুলাই, ১৮২৯)

A most distressing event took place at Barrackpore on Saturday last, a young Offieer having been shot dead in a duel.

Such a catastrophe naturally gives rise to painful reflections upon a practice derived from our Gothic ancestors. To dilate upon it here would be as trite as we fear it would be vain—for so long as human nature is what it is, and society is constituted as at present, duels will occur. Of late, indeed, they have done so hereabouts oftener than it is pleasing to contemplate. We trust, however, that the event in question, deplorable as it is, will not wholly be without its use—and that out of this evil some good may arise. Such an event is more likely to make a serious impression than a thousand homilies, for there is something so dreadful in the idea of a fellow-creature, in the prime of life, being sent suddenly and violently to his 'great account', that it can scarcely fail to excite salutary reflections in the most thoughtless. In the death of the brave man, who falls in the performance of his duty, there is glory for the individual, and consolation for his friends : how dismal, in contrast, is the fate of him that is killed in a duel !

* * *

সেকালের শীকার-যাত্রা
(প্রাচীন প্রতিলিপি হইতে)

উনবিংশ-শতকের 'ড্যুয়েল' বা 'দ্বৈরথ-সমরের' বিচিত্র-বিবরণের মতোই, সেকালের পুরোনো সংবাদ-পত্রের পাতায় আরো সন্ধান পাওয়া যায়—প্রাচীন কলিকাতার ঘোড়-দৌড়ের মাঠে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তুমুল হাতাহাতি-মারামারির এক আজব-মজার কাহিনীর। ঘটনাটি ঘটেছিল—১৮২৭ সালে···এবং তখনকার আমলের পরম-কৌতুহলো-দ্দীপক-সমাচার হিসাবে তার সংক্ষিপ্ত-বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ছাপার অক্ষরে খবরের কাগজের পাতায়! প্রাচীন এই বিবরণটি থেকে, একালের কৌতূহলী-পাঠকপাঠিকরা সেকালের ঘোড়দৌড়ের মাঠে সৌখিন-বিলাসীদেব আজব-ক্রিয়াকলাপের কিছু আভাস পাবেন। ইতিপূর্ব্বেই বলেছি—এদেশে ঘোড়দৌড়ের বাজীখেলার রেওয়াজ সুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই। তখনকার আমলে ঘোড়দৌড়ের মরশুম ছিল শীতকালে এবং গোড়ার যুগে সেকালের বিলাসী-অভিজাত ইউরোপীয় সাহেব-বিবিরাই ছিলেন শুধু এই সৌখিন-নেশার অমুরাগী-পৃষ্ঠপোষক। পরে ক্রমশঃ তাঁদের দেখাদেখি বিলাতী-আদবকায়দা অমুকরণে, এদেশী সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোকজনেরাও এসে ভীড় জমাতে সুরু করলেন শহরের ঘোড়দৌড়ের মাঠে। ক্রমবর্দ্ধমান এই জনপ্রিয়তার ফলেই, পরে শীতকাল ছাড়াও, বছরের অন্যান্য সময়েও এদেশের মাঠে নিত্য-নিয়মিতভাবে ঘোড়দৌড়ের বাজীখেলার আসর জমে উঠতে লাগলো। সেই থেকেই সৌখিন এই বিলাতী নেশায় মেতে এদেশের কত বিত্তশালী-বিলাসীই না ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাসে রাতারাতি পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছেন এবং কত ফকিরই যে বরাত-গুণে ঘোড়ার দৌলতে নিমেষেই অগাধ রাজ-ঐশ্বর্য্য লাভ করেছেন, তার আর হিসাব মেলে না আজ! তবে তখনকার আমলে কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠের অবস্থা একালের মতো এমন উন্নত ছিল না···এবং ইদানীং যুগের বিবিধ সুব্যবস্থাদি না-থাকার ফলে, সেকালে নানা রকম মারাত্মক দুর্ঘটনাও যে ঘটতো, মাঝে-মাঝে—প্রাচীন নথীপত্রে তারও অনেক নজীর পাওয়া যায়। ঘোড়দৌড়ের মাঠই ছিল তখনকার দিনের সৌখিন ইউরোপীয় সাহেব-বিবিদের দৈনন্দিন সাক্ষাৎ ও মিলনের প্রধান কেন্দ্র। প্রত্যহ বিকালে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে এসে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে গল্প-গুজব জমাতেন রীতিমত ভীড় করেই। এই ছিল সেকালের রেওয়াজ।

*　*　*　*

ঘোড়দৌড়ের মাঠে

(উইলিয়াম হিকি রচিত 'স্মৃতি-কাহিনী' [Memoirs], ১৭৮২)

"···Every evening Pott (হিকি-দম্পতির কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত-অভিজাত বিশেষ অমুরাগী বন্ধু··· কিছুকাল এঁরই ভবনে হিকি ও তাঁর স্ত্রী বসবাস করেছিলেন—মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে) drove Mrs. Hickey and me in his phaeton to the racecourse, where it was the fashion for the carriages to draw up round the stand, the gentlemen and ladies passing half an hour in lively conversation,"

*　*　*

(ক্যালকাটা গেজেট, ২৩শে জুলাই, ১৮২৭)

We understand that the Course was made the scene yesterday (রবিবার) evening, of a personal conflict of singular violence between two individuals, with whose situation in life such an exhibition, especially time and place considered, was little compatible.

*　*　*　*

(ক্যালকাটা গেজেট, ২০শে ডিসেম্বর, ১৮২৭)

We are sorry to understand, that a serious accident occurred on the Race Course, this morning, owing to the imprudent folly of a native lad in attempting to ride across it during a race. The two foremost horses, ridden by gentlemen, came against the lad with great violence, and all fell : the former were thrown, but not much hurt ; but the unfortunate cause of the accident was so severely injured, that he expired shortly after being moved from the ground.

*　*　*　*

ঘোড়দৌড়ের বাজীর মতোই সেকালের দেশী ও বিলাতী সমাজের জনসাধারণের অনেকেরই ছিল নানা ধরণের জুয়াখেলার প্রবল নেশা। তখনকার দিনে জুয়া-খেলাটা কেউই বিশেষ গর্হিত—বা নিন্দনীয় কাজ বলে বিবেচনা করতেন না···বরং জুয়া না-খেলাটাই ছিল সে-যুগে রীতিমত অপৌরুষের লক্ষণ! কাজেই সেকালের বিলাসী-সৌখিন অভিজাত-সমাজে আর দরিদ্র-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে তাস, পাশা, দাবা, প্রভৃতি নানা রকমের জুয়া-খেলার খুবই প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন-কাজ-কর্ম্মের পর, এমনি বিভিন্ন-ধরণের জুয়াখেলার নেশায় মেতে সন্ধ্যার আসর জমিয়ে তুলে সানন্দে অবসর-যাপন করাই ছিল সেকালের দেশী-বিলাতী সমাজের বিলাসী-লোকজনের নিত্য নৈমিত্তিক সৌখিন-রীতি। তাছাড়া ছুটিছাটার দিনে, পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যেও সেকালের দেশী-বিলাতী সমাজের সৌখিম-বিলাসীরা মনের আনন্দে মেতে থাকতেন নানা রকমের জুয়াখেলায়। জুয়াখেলার এই উৎকট-নেশার ঝোঁকে তখনকার আমলের বহু অভিজাত, মধ্যবিত্ত, আর দরিদ্র সন্তান বাজীতে হেরে, শুধু টাকা-পয়সা, রত্ন-আভরণ, জমি-জমা, বসতবাটী, আসবাবপত্রই নয়, নিজেদের একান্ত-প্রিয় দাস-দাসী, পুত্র-কন্যা··· এমন কি ধর্ম্মপত্নীকেও শেষ পর্য্যন্ত অপরের জিম্মায় সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছেন—সেকালের পুরানো সংবাদ-পত্রের পাতায় তারও অনেক বিচিত্র নজীর মেলে। সে সব নজীরের কিছু কিছু বিবরণ ইতিপুর্ব্বেই দিয়েছি, তাই এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর বিস্তারিত-আলোচনা না করে আপাততঃ অতীত-যুগের আরো দু'একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংক্ষিপ্ত-সমাচার জানালেই, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ভারতের দেশী-বিলাতী সমাজের লোকজনের মধ্যে জুয়া-খেলার নেশা যে কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাবেন। তখনকার বিলাতী-সমাজে, তাসের জুয়াখেলারই প্রচলন ছিল সমধিক···বিত্তশালী বিলাসী-সৌখিন ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় আর কোম্পানীর অভিজাত-রাজকর্ম্মচারীদের বিশেষ ঝোঁক দেখা যেতো মোটা-টাকার বাজীতে 'হুইষ্ট' (Whist) খেলার দিকে···এ খেলার হার-জিতের অঙ্ক মেটাতে তাঁরা অকাতরে হাজার-হাজার টাকা উড়িয়ে দিতেন রাতা-রাতি···এই ছিল সেকালের রীতি। সাহেবদের দেখা-দেখি, সে যুগে এদেশের বিলাসী-সৌখিন লোকজনেরাও মোটা মোটা টাকার বাজী ধরে দাবা, পাশা আর তাসের 'প্রমারা' খেলা প্রভৃতি নানা ধরণের জুয়ার নেশায় রীতিমত মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। অবাধ-উচ্ছৃঙ্খলতা অলস সৌখিন-বিলাস, অসার-আনন্দোপভোগ, উদ্দাম স্ফূর্ত্তি-পানাহার, উন্মত্ত অনাচার-রেষারেষি আর উৎকট জুয়ার নেশা—এই সবই ছিল সেকালের বনেদীয়ানার চরম লক্ষ্য এবং এরই অলীক-মোহেই সুদীর্ঘকাল নিবিড়-তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল কোম্পানীর আমলের দেশী-বিলাতী জনসাধারণের শুভ-চেতনা! আলোচনা-প্রসঙ্গে নীচে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতকের যে পত্রাংশটি উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো, সেটি থেকে সুস্পষ্ট-পরিচয় পাওয়া যায়—সেকালের উৎকট জুয়া-খেলার নেশার।

*　*　*　*

জুয়াখেলা

(গড্‌ফ্রে সাহেবকে লিখিত স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের পত্র, ১৭৭৬)

…You must know, my friend, that on one blessed day of the present year of our Lor (১৭৭৬) I had won about F20000 at th Whist. It is reduced to about F12000 and now never play but for trifles, and that onl once a week.

* * * *

নৌকা পথে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মাঝি,—গিয়েছি এ পথে অর্দ্ধ শতাব্দী আগে—
চলুক তরী—পথটি বড় ভাল যে লাগে।
কত ফুলের গন্ধ আসে, কত পাখীর স্বর,—
আধেক ভোলা চেনা গানের সুরটি মনোহর,
—রাঙালো পথ কে যেন আজ নবানুরাগে।

২

ব্যথার পথই এম্‌নি করে হয়রে ছায়াপথ,
ঘরের ব্যথাই ভাগ করে লয় সমগ্র জগৎ।
ব্যথাই ভরে সুধার কলস লবণ সাগরে।
ব্যথাই গড়ে স্মৃতির দেউল মণি মর্ম্মরে।
সুরধুনী আসেন চিতাভস্মের দাগে।

৩

তরী চরণ পরশে কার হ'ল যে সোনা—
দেখছি আমি মাঝি তুমি খপর রাখো না।
মৃতই দেছে যাত্রা তোযাব অমৃত করি,—
আঁখি জলের মুক্তা দিল তরণী ভরি,
এবার মাঝি সুদূর গঙ্গা-সাগর যে ডাকে।

৪

আসছে হাওয়া কালিদহের কমল কাননের—
এবার দূরের পাল্লা মাঝি,—বিঘ্ন আছে ঢের।
চারি দিকে মেঘের ঘটা—সাগর উথলে—
খেলছে তবু সোনার আলো সুনীল জলে,
কমল বনের কাছেই এবার তরী ভিড়াবে।

৫

এবার হবে—হয়ত—কমল-কামিনী দর্শন—
যাঁহার লাগি সদাই এ মন হয়রে উচাটন।
দেখা দেবেন গণেশ কোলে চন্দ্রভালী মা—
সফল জীবন—পূর্ণ হবে সকল কামনা।
ডাকছে আমায় মায়ের পায়ের পদ্ম পরাগে।

অদৃশ্য বিচারক

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

সেসন্ কোর্ট—

বিচারক—শ্রীঘোষ,

আসামী—ডাঃ হরলাল বোস।

অপরাধ—সাঁওতালী রমণী লতার উপর বলাৎকার ও ধর্ষণ।

ডকে আসামী ডাঃ বোস—সাক্ষীর কাটরায় লতা—তার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি আসামীর দিকে—।

আসামী অপরাধ অস্বীকার করে ডকে দণ্ডায়মান।

লতার জবানবন্দী—

পূর্ণযৌবনা অটুট স্বাস্থ্যবতী—কালো চেহারা হলেও মুখে-চোখে অপরূপ লাবণ্য-প্রভাময়ী লতা দৃপ্তকণ্ঠে আসামী ডাক্তারের দিকে অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানাল, রবিবার রাত্রে বাজার থেকে ফিরে তার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল—যখন গাঁয়ের কোন দাওয়াই কার্য্যকরী হল না সে গরুর গাড়ীতে করে নিয়ে এল তার স্বামীকে ঝাড়গ্রাম সরকারী হাসপাতালে—রাত্রি তখন তিনটে হবে। বেহুঁস স্বামীকে হাসপাতালে তুলল, কিন্তু ডাক্তার তার কোয়ার্টারে সুপ্ত। পুরুষ নার্স জানাল ডাক্তারবাবু মিলবে না এখন। তাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করল ডাক্তারবাবুর আস্তানায় —অনিচ্ছাসত্ত্বে লতার কান্নাকাটিতে দয়াপরবশ হয়ে নার্স নিয়ে এল ডাক্তার বোসের কোয়ার্টারে। শীতের রাত্রি। ডাক্তার বিরক্ত হয়ে তিক্ত মেজাজে দরজা খুলল—লতা সাশ্রুনয়নে পড়ল ডাক্তারবাবুর চরণতলে, প্রার্থনা জানাল তার স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে—সে এসেছে পাঁচ মাইল দূর হতে। ডাক্তার হাসপাতালে এসে লতার স্বামীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনল পাম্প করে অত্যধিক মহুয়া ও দেশীমদের অংশ বের করে। নার্সকে রোগীকে দেখতে নির্দ্দেশ দিয়ে লতাকে বলল তার সংগে কোয়ার্টারে যেতে—আর একটি ভাল ওষুধ আনতে। লতা হৃষ্ট মনে ডাক্তারের সংগে গেল। সেখানে ডাক্তার দানবের মূর্তি গ্রহণ করে লতার উপর করল পাশবিক অত্যাচার—তার সকল প্রকার আপত্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় ডাক্তারের দিকে অঙ্গুলী হেলন করে দৃপ্ত স্বরে লতা বলল—দেখুন ধর্মাবতার, ওর দুই হাতের কবজিতে এখনও রয়েছে আমার দাঁতের কামড়ের ক্ষত চিহ্ন—সর্বাংগে নখের দাগ। প্রত্যুষে এত্তেলা দিল থানায়—খবর পেয়ে তাদের গাঁয়ের মোড়ল ও প্রতিবেশীরা এসে চড়াও করল ডাক্তারের কোয়ার্টার, ডাক্তার হল ফেরার।

উকীলবাবু আরো কিছু জবানবন্দী করাতে চাইলে হাকিম বললেন—"ছাট্স অল—নো মোর"—য়্যাবসার্ড—বোগাস্ স্টরী—শুনতে চাই না আর। উকীল আপত্তি করলো হাকিমের এই মন্তব্যে জুরারদের সমক্ষে—প্রকাশ্য আদালতে প্রকাশের জন্য! কিন্তু হাকিমের হুকুম বহাল রইল। তিনি জানালেন এই বাজে মোকদ্দমায় আদালতের অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না, আসামীর পক্ষের উকীল হাকিমের মনোভাব বুঝতে পেরে মৌনব্রত অবলম্বন করলেন—কিন্তু মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন একদিনেই মামলা খতম হওয়াতে। আশ্চর্য্য হলেন নূতন হাকিমের খামখেয়ালীতে।

হাকিম জুরীদের সংগে একমত হয়ে খালাস দিলেন বেকসুর আসামীকে। ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করলেন লতাকে মিথ্যা মোকদ্দমা ও অপবাদের জন্য নিরীহ ডাক্তার বোসের নামে। লতা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জন করে বলল—ঝুটা হাকিম! ঝুটা বিচার!!

মিথ্যা মোকদ্দমা আনার অভিযোগে লতার শাস্তি হল তিন সপ্তাহের কারাবাস। উকিল পরামর্শ দিল আপীল করার জন্য—কিন্তু লতা জানাল, সে নিঃস্ব—দরিদ্র, তার এক-মাত্র সহায় ভগবান। সে যুক্ত হস্তে করুণ নয়নে উর্ধে হাত

তুলেবলল'—আমি শ্রীভগবানের আদালতে জানাচ্ছি আমার আবেদন নিবেদন -তিনি তো জানেন আমি সাচ্চা —আমি একটি কথাও মিথ্যা বলি নি। আমি জেলে গিয়ে দিনরাত দোষীর শাস্তি প্রার্থনা করব করুণাময় সর্বজ্ঞ বিচারকের চরণে। অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বামীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল —"তুই ভাবিস্ নে, মুই ফিরমু ক'দিন পরে—চোখে জল কেনে, পুছে ফেল। বাড়ী যা—খা গিয়ে।"

স্বামী অনুতপ্তকণ্ঠে বলল, আমি পাপী, আমি নেশাখোর —আমার পাপের শাস্তি পেলি তুই; এই আমার দুঃখ। আমি আজ থেকে ভগবানের নামে শপথ করছি, আর জীবনে খাবো না মদ, মহুয়া ভাং।

লতা স্বামীকে আলিঙ্গন মুক্ত করে হাসিমুখে বলল, "হে ঠাকুর, দয়া কর—তুই ভাল হ—মানুস হ—মুই তো এই চাই।"

তিন সপ্তাহ পর।

সদর জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে লতা যাচ্ছে স্বগৃহে, সংগে স্বামী—সে গিয়েছিল সদরে লতাকে আনতে।

খড়্গপুর রেল ষ্টেশন জংশন। লতা ও তার স্বামী প্রতিক্ষা করছিল ঝাড়গ্রাম যাবার ট্রেণের। তাদের অদূরে দেখতে পেল একখানি "ট্রেচার" ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক। তাদের কৌতুহল হল দেখতে সেই "ষ্ট্রেচার"—কি ব্যাপার! এগিয়ে গেল ভীড় ঠেলে।

লতা সেই "ষ্ট্রেচারে" শায়িত লোকটিকে উঁকি মেরে দেখল, এগিয়ে গেল লোকটার দিকে—আরো এগিয়ে গেল —বেশ ভাল করে দেখে নিল তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে। পাশে বসেছিল একটি যুবতী, একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা—সকলের চোখে জল—বিষাদাচ্ছন্ন। লতার মুখে চোখে প্রচ্ছন্ন হাসির রেখা —সে নিষ্ঠুর অথচ প্রসন্ন হাসি হেসে একটু বিদ্রূপ কণ্ঠে বলে উঠল—দুশমন্ ডাক্তার, বেশ, বেশ হয়েছে —পাপী শাস্তি পেয়েছে—

উপস্থিত দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলল: এই মাগী কি পাগলিনী—না আর কিছু? সকলে সহানুভূতিসূচক শব্দে কণ্ঠ মিলাল।—ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল লতার অমানুষিক ব্যবহারে।

লতা উদ্ধত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে জানাল—তুরা শুনে নে, এ কেমন দুষমন। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জানলো এই রোগী তার ছেলে, যুবতী পুত্রবধূ ও বৃদ্ধা তার স্ত্রী।

লতা তখন সাশ্রুনয়নে প্রশ্ন করল—আচ্ছা বাবাঠাকুর, আজ যদি তোমার ঐ যুবতী পুত্রবধুকে আমার এই আদমী রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বলাৎকার করে—তার ধর্মনাশ করে—তবে তুমি তাকে কি শাস্তি দেবে বল—

বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—আমি সেই পাপিষ্ঠকে খুন করবো।

লতা লজ্জাবনত মুখে জানাল তাঁর পুত্রের পৈশাচিক কাহিনী—রাত্রির অন্ধকারে এক অসহায় রমণীর প্রতি। মিথ্যা বিচারে দোষীর হল মুক্তি—নির্দোষীর কারাদণ্ড। কিন্তু বিচারকের বিচারক আছেন, তিনি বিধান করেছেন শাস্তির প্রকৃত দোষীর"—পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছে ডাক্তার—তার পুত্র আজ পঙ্গু, পক্ষাঘাত রোগে।

সেইক্ষণে ডাক্তার একবার চোখ মেলে তাকাল—সামনে লতাকে দেখে দু'খানি হাত তুলবার চেষ্টা করল—পারল না—তার দুই গণ্ডে গড়িয়ে পড়ল কয় বিন্দু অশ্রু।

দুই দিকের ট্রেণ আসলো—যে যার গন্তব্য ট্রেণে উঠল চিন্তাভারাক্রান্ত মনে।
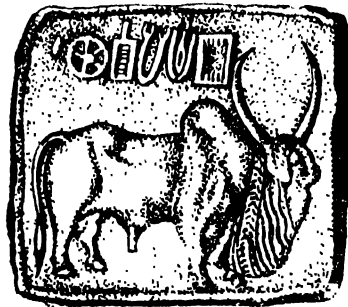
কলম্বো সম্মেলন—

গত ১০ই ডিসেম্বর কলম্বো সহরে ৬টি নিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হইয়াছিলেন—এ সকল দেশ ছিল—(১) সিংহল (২) ব্রহ্ম (৩) কাম্বোডিয়া (৪) ঘানা (৫) ইন্দোনেশিয়া ও (৬) সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—চীন ভারত সীমান্ত বিরোধে কে অপরাধী বা কে নির্দ্দোষ—তাহার বিচার করা হইবে না। ভারত ও চীন—পৃথিবীর দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্র যাহাতে সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ পথ বাছিয়া লয় এবং নিজেদের মধ্যে সরাসরি আলোচনা চালাইতে সম্মত হয়, সে জন্য কিছু সাহায্য করিতে এ সম্মিলন পথ খুঁজিয়া দেখিবে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। পরে ১১ই নভেম্বর ৬ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিলিয়া ৩টি রাষ্ট্রের—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ—প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছে। ১২ই ডিসেম্বর স্থির হইয়াছে—দূতরূপে শ্রীমতী বন্দর নায়ককে দিল্লী ও পিকিংয়ে প্রেরণ করা হইবে। তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা গোপন রাখা হইবে। শ্রীমতী বন্দরনায়কের এই দৌত্য সাফল্য লাভ করুক—পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

ভারত ও পাকিস্তান—

গত ২রা ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট শ্রীআয়ুবকে জানাইয়া দিয়াছেন যে ভারতের নূতন সমর সরঞ্জাম চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না। গত ১২ই নভেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে শ্রীনেহরু আয়ুব খাঁকে জানাইয়া দিয়াছেন—পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিতে ভারত মোটেই ইচ্ছুক নহে এবং ভারত কখনও যুদ্ধ আরম্ভ করিবে না। ২৭শে অক্টোবর শ্রীনেহরু আয়ুবকে চীন ভারত যুদ্ধ সম্বন্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ পত্র দেন—পাক প্রেসিডেণ্ট ৬ই নভেম্বর তাহার উত্তর দিলে ১২ই নভেম্বর শ্রীনেহরু আবার উপরোক্ত পত্র দেন। শ্রীনেহরু সকল দেশের সহিত মৈত্রী রক্ষায় সর্বদা চেষ্টা করিতেছেন।

বাধ্যতামূলক এন-সি-সি ট্রেনিং—

গত ৯ই ডিসেম্বর শিলিগুড়ী হইতে দুই মাইল দূরে চাঁদমণি নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা হয়—যেন রাজ্যের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে এন-সি-সি এবং এ-সি-সি ট্রেনিং চালু করার ব্যবস্থা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতি গ্রামে গ্রামরক্ষী দল গঠনের জন্য কংগ্রেস কর্মীদের উপর ভার দেওয়া হয়। ঐ গ্রামরক্ষীরা জিনিষপত্রের মূল্যমান রক্ষা, জাতীয়তা-বিরোধী ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ, সমাজ ও জনসাধারণের সমস্ত সম্পত্তির উপর দৃষ্টি রাখা—প্রভৃতি কাজ করিবেন। ধান ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য যাহাতে জরুরী অবস্থায় সরকারের আয়ত্তে আসে, গ্রামরক্ষীরা সে বিষয়েও প্রচার করিবেন।

চীনের স্বরূপ প্রকাশ—

গত ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতার খবরে প্রকাশ, ক্রূর, নিষ্ঠুর, শক্তিমদমত্ত শত্রু চীন আবার নখ-দাঁত বাহির করিয়া ভারতকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সাধারণ শিষ্টাচারের সকল মুখোস খুলিয়া দিয়া সে পিকিং হইতে আর্তনাদ আরম্ভ করিয়াছে—জবাব দাও—চীনাদের শান্তি প্রস্তাব ভারত মানিবে কিনা—এখনই তাহার জবাব চাই। ভারতবর্ষ চীনা শান্তি প্রস্তাবের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিয়াছিল, জবাবে চীন বলিয়াছে—ভারতের কালহরণের কৌশল চীন ধরিয়া ফেলিয়াছে। চীন সময় দিবে না—চীনা সৈন্য

পশ্চাদপসরণ করিলে ভারতীয় সৈন্য যে আগাইয়া যাইবে —ইহাই তাহাদের ধারণা। চীন হইতে ৯ই ডিসেম্বর ভারতকে যে পত্র দেওয়া হইয়াছে—তাহা চরমপত্র বা যুদ্ধের হুমকী বলা যায়। চীন নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করিয়াছিল—১লা ডিসেম্বর তাহার ভারতীয় এলাকা হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া লওয়ার কথা ছিল—১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সে তাহা করে নাই। কাজেই মনে হয়, সে যুদ্ধ চালাইতে চায়।

শ্রীনেহরুর ঘোষণা—

১০ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দিল্লীর রেডিও হইতে জাতির উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"চীনের তথা-কথিত শান্তি প্রস্তাবে ভারত সম্মত না হইলে চীনারা পুনরায় ভারত আক্রমণ করিবে। পিকিংয়ের এই ভীতি-প্রদর্শনে ভারত নতি-স্বীকার করিবে না। চীন আবার আক্রমণ করিলে ভারত সাফল্যের সহিত তাহাদের হটাইয়া দিবে। ভারতের সশস্ত্রবাহিনী নিঃসন্দেহে ভারতভূমি হইতে চীনা হানাদারদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবে।" ঐ দিন লোকসভাতেও শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—ভারত চীনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিল। চীনারা আক্রমণকারীর ভূমিকা ত্যাগ করিয়া হটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত চীনের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হইবে না। চীন যে পত্র দিয়াছে, তাহার পর চীনের সহিত ভারতের আপোস আলোচনার আর কোন পথ রহিল না।" কাজেই চীনের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়াই মনে হয়। তথাপি আশা, শ্রীমতী বন্দর নায়কের দৌত্য যদি সফল হয়।

গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—

গ্রামাঞ্চলের সমগ্র জনশক্তি ও সম্পদ দেশ রক্ষার কাজে নিযুক্ত করার জন্য ভারত সরকার ৭ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এক পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে সারা দেশে গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাতীয় উদ্যমে যোগদান করার সুবিধা দেওয়াই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। উৎপাদন বৃদ্ধি, জনশিক্ষা বিস্তার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা—এই তিন কর্তব্য সম্পাদন করিবেন—গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মহিলা শাখা গঠন করিয়া গ্রামবাসী মহিলাদিগকে কাজ করার সুযোগদানও এই পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য। সত্বর এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করা হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

অভূতপূর্ব মহিলা সমাবেশ—

চীনা বিতাড়নে সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য গত ৮ই ডিসেম্বর শনিবার বিকালে কলিকাতা গড়ের-মাঠে লক্ষাধিক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সভানেত্রীত্ব করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহধর্মিণী অশীতিবর্ষবয়স্কা শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সকলকে সংকল্প বাক্য পাঠ করাইয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকলকে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে বলিয়া সংকল্প বাক্য বলা হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তথায় যাইয়া ঐ দৃশ্য দেখিয়া বলেন—আমি জীবনে কখনও এরূপ দৃশ্য দেখি নাই ইহা অবিস্মরণীয়। সভানেত্রী প্রয়োজন মত সকলকে অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য দান করিতে বলেন। কলিকাতা সহরে এত অধিক-সংখ্যক মহিলার একত্র সমাবেশ পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

চীনের নুতন প্রস্তুতি—

৯ই ডিসেম্বর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, চীনারা বমডিলার প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণে টাঙ্গা উপত্যকায় বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে—গত ১৯শে নভেম্বর চীনারা বমডি-লা দখল করিয়াছিল। চীনারা টাঙ্গা উপত্যকার বমডি-লার ৩০ মাইল উত্তরে দিরাং জং-এও শক্তিশালী ব্যূহ তৈয়ারী করিয়াছে। ঐ প্রস্তুতি দেখিয়া মনে হয়, চীনারা তাহাদের অধিকৃত ভারতভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে না। পিকিং রেডিও ১লা ডিসেম্বর হইতে যে ঘোষণা করিতেছে—তাহারা নেফায় ভারতীয় অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়াছে—একথা সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া জানা যাইতেছে। পূর্বে তাওয়াং মঠনগরে চীনাদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি ছিল—এখন তাহারা অনেক আগাইয়া আসিয়াছে। ইহার পর চীন-ভারত আপোষ আলোচনায় কি কোন ফল হইবে?

এশিয়ার বৃহত্তম ব্লাষ্ট ফার্ণেস -

গত ১০ই ডিসেম্বর ভিলাই কারখানায় চতুর্থ ব্লাষ্ট ফার্ণেসের ভিত্তিস্থাপন উৎসব হইয়াছে। উহার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ২৭১৯ ঘন মিটার—উহা ভারতের তথায় এশিয়ার বৃহত্তম ব্লাষ্ট ফার্ণেস (লোহা গলাইবার চুল্লী) হইবে। সকলেই জানেন সোভিয়েট রাসিয়ার অর্থ সাহায্যে ভিলাই লৌহ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। রাসিয়া সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়া এই লৌহ উৎপাদন কার্যে ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেছে।

মার্কিণ সামরিক সাহায্য—

একদল আমেরিকান সমর-বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি ভারতে আসিয়া নেফা ও লাডাকের যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ এবং ভারতের সামরিক শক্তি কেন্দ্রগুলি দেখিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তিন পর্যায়ে ভারতকে সামরিক সাহায্য দানের সুপারিশ করিয়াছেন। ভারতীয় ফৌজের আশু প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও তাঁহারা ভারতকে ব্যাপকভাবে পুর্ণগঠন ও আধুনিকীকরণের জন্য ব্যবস্থা করিবেন—সে জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া সাহায্য দেওয়া হইবে। দেড় কোটি ডলার মূল্যের মার্কিণ সাহায্য ভারতে পাঠানো হইয়াছে—ভারতের সামরিক সংগঠন ও সমরাস্ত্রের উৎকর্ষ বাড়াইবার জন্য সত্বর মোট একশত কোটি ডলার খরচ করা প্রয়োজন ইহা বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। কি ভাবে সে সাহায্য দেওয়া হইবে, তাহা গোপন রাখা হইবে। ভারতীয় সৈন্যদের জন্য যে শীতবস্ত্রের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী—সে বিষয়ে তাঁহারা সকলে একমত। সহজে বহন যোগ্য হালকা অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি না পাইলে পার্বত্য-অঞ্চলে যুদ্ধের অসুবিধার কথাও তাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন। মার্কিণ সামরিক সাহায্য অবশ্যই ভারতকে যুদ্ধে জয়যুক্ত করিবে।

কলিকাতায় ছাত্র বিক্ষোভ—

কলিকাতার একদল চীন-দরদী ছাত্র চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে চীনের পক্ষে প্রচার করিতেছিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রায় সকল ছাত্র তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আরম্ভ করিয়াছে। অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগদান করায় এবং বহু চীন-দরদী ছাত্র কলেজ হইতে বিতাড়িত ও ধৃত হওয়ায় কলিকাতায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। মীরজাফরের বংশ কোন দিনই লোপ পাইবে না।

তরুণ ডি-লিট্—

দার্জিলিং রাষ্ট্রীয় বিদ্যায়তনের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ভ্রমবাদ' বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ডি-লিট্ উপাধি পাইয়াছেন। অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত ৺মহামহোপাধ্যায় ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থ ডি, লিট্ মহাশয়ের পাদমূলে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন-

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

ভাবে বহু বৎসর ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবার সৌভাগ্য ডাঃ মুখোপাধ্যায় পাইয়াছেন! কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ সুশীলকুমার মৈত্র পি, এইচ, ডি মহাশয়ের নিকটে বহুদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন! ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের পূর্বতন অধ্যক্ষ, বর্তমান নবনালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ স্বনামধন্য দার্শনিক ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। শ্রীমান জটিলকুমারের শৈশবে শিক্ষা আরম্ভ হয় জন্মভূমি বীরভূম জিলার রাতমা গ্রামে। তারপর কলিকাতার ভারতী বিদ্যালয়ে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে। শৈশব হইতেই তিনি সর্বস্তরের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত সাফল্য

অর্জন করিয়াছেন। এম, এ, পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক ভূষিত হইয়াছেন। সুযোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ডাঃ মুখার্জীকে তাহার এই তরুণ বয়সে গবেষণার সাফল্যের জন্য আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

চীনকে গ্যারাণ্টি দানের কথা—

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর রাজ্যসভাকে জানাইয়াছেন—চীনের একতরফা যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার অভিপ্রায় যেমন ভারত সরকারের ছিল না, তেমনই ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ভারত সরকার চীনকে কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেন নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার পরিণতি এবং চীন কি করে না করে, তাহার উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। ১২ই ডিসেম্বর চীনারা নেফার শিয়াং ডিভিসনের সাচ্‌কা নামক স্থানে ১৭ জন রুগ্ন ও আহত ভারতীয় সৈন্যকে মুক্তি দান করিয়াছে। ভারতীয় রেডক্রস তাহাদিগকে বিমানযোগে তখনই জোড়হাটে লইয়া গিয়াছে। চীনারা জানাইয়াছে—পরদিন ওয়ালংয়ে ৭৮ জন যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিবে। পরে দারাং জংয়ে ৮০জন আহতকে মুক্তি দেওয়া হইবে—ঐ সঙ্গে একটি ভারতীয় সৈনিকের মৃতদেহও চীনারা ফেরত দিবে। কিন্তু ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় এলাকা হইতে চীনা সৈন্য সরাইয়া লওয়ার কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

লরী-উৎপাদন বৃদ্ধি—

ভারতবর্ষে যাহাতে অধিক পরিমাণে মোটর লরী উৎপাদন করা যায়, সে জন্য মার্কিণ সরকার ভারতকে ১৪ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছেন বলিয়া ৭ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সংবাদ আসিয়াছে। ঐ টাকার মধ্যে সাড়ে ৭ কোটি টাকা হিন্দুস্থান মোটর কারখানা ও বাকী সাড়ে ৬ কোটি টাটা-মার্কিণ এঞ্জিনিয়ারিং ও লোকো কোম্পানী পাইবে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মাল পাঠাইবার জন্য লরীর অভাব দেখিয়া ও সত্বর লরী নির্মাণ ব্যবস্থা করার জন্য এই টাকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ ঋণের কোন সুদ লাগিবে না—প্রথম ১০ বৎসর ঋণ শোধ ব্যবস্থা করিতে হইবে না—পরে ৪০ বৎসরে টাকা শোধ করিতে হইবে। এই ভাবে সাহায্য দান করিয়া মার্কিণ-দেশ ভারতকে সমৃদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

চন্দননগরে কর্পোরেশন বাতিল—

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ৫ই ডিসেম্বর চন্দননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বাতিল করিয়া দিয়াছে। ঐ দিন বিকালেই সরকার পক্ষে একজন কর্মকর্তা কর্পোরেশন চালাইবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গে বহু মিউনিসিপালিটীর কাজ বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ—যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে সকল স্থানেই এই ভাবে মিউনিসিপালিটি বাতিল করিয়া দিয়া সরকারের নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ করা উচিত—তাহার ফলে নানা কারণে দেশবাসীরা উপকৃত হইবে। বিশেষ করিয়া যে সকল স্থানে কমিউনিষ্ট প্রভাবিত সদস্যরা সর্বদা মিউনিসিপালিটীর কাজে বাধা দান করেন, সে সকল স্থানের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করা দরকার।

পূর্ব-পাকিস্তানে নূতন চেষ্টা—

দিল্লীর ৫ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকটি জেলায় নূতন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে—তাহারা পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র দেশে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের একদল লোকও পূর্ব-পাকিস্তানের এই আন্দোলনকে সমর্থন করিতেছেন। ঐ আন্দোলন জোরদার হওয়ার ফলে পাকিস্তান সরকার চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ঐ আন্দোলন বন্ধ করার জন্য উপায় অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন। করাচীর ডন পত্রিকায় প্রকাশ—পাশ্চাত্যের কূটনীতিকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন সমর্থন ও তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। এই আন্দোলন কিসের পূর্বাভাষ!

পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস—

চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধে ভারত নিজ দেশকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে ও প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণ করিতেছে—সে ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ কমাইতে বাধ্য হইতে হইবে। সেজন্য গত ১১ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় কমাইয়াছেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল—ঐ দিন তাহার ২২ কোটি টাকার মত কমাইয়া তাহা ৬২ কোটি ৩৮ লক্ষ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার কাজ বন্ধ করা হইলে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি বন্ধ হইবে; বিশেষ করিয়া যে সকল গঠনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—সেগুলি অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় অকেজো হইয়া থাকিবে—ইহা চিন্তা করিয়া সকল দেশবাসী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন! দেশের মধ্যে ঋণ করিয়াও তৃতীয় যোজনার কাজগুলি অব্যাহত রাখা সরকারের কর্তব্য।
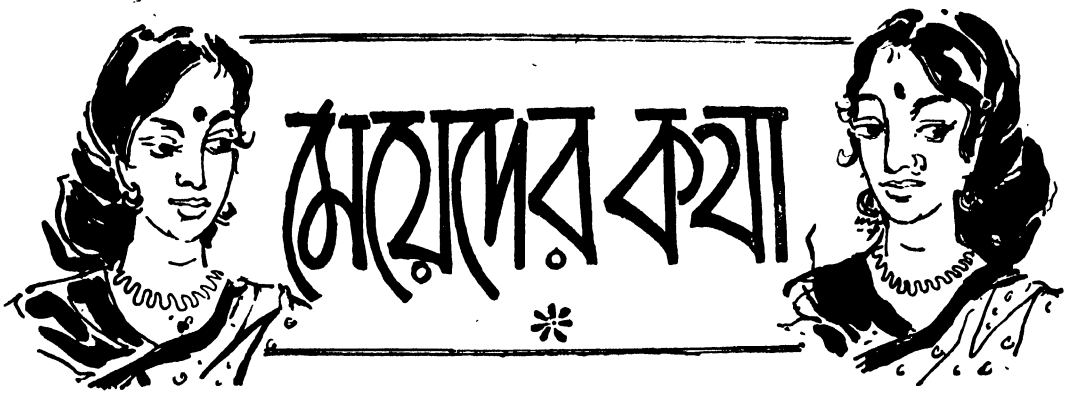
আমাদের সামাজিক সমস্যার একটি দিক

রেবা চট্টোপাধ্যায় এম. এ., ডি. জে.,

নাবালিকা হরণ ও লাঞ্ছনার কাহিনী আজকাল দৈনিক কাগজগুলির নিয়মিত খবরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাগুলি, নিঃসন্দেহে, আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতীক।

পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষা-বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য বছরের তুলনায় গত বছরে অনুষ্ঠিত এই ধরণের অপরাধের সংখ্যা কম। কিন্তু, ক্রমবর্ধমান বাস্তব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই রিপোর্টে আমরা আশ্বস্ত হ'তে পারি না।

দেশের আরক্ষা ও বিচার বিভাগ যদিও এই সমস্যার প্রতিকার সাধনে সচেষ্ট আছেন, তবুও সমস্যাটি যেহেতু ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু, কেবলমাত্র বাইরের প্রচেষ্টায় এর সুরাহা হওয়া কঠিন। এর জন্য, ঘরে ঘরে, নাবালিকাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও সচেতন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নাবালিকা অপহরণ ও লাঞ্ছনাজনিত অপরাধের ঘটনাগুলি প্রধানতঃ শিল্পাঞ্চল ও তার আশ-পাশের এলাকাগুলিতেই ঘটে। শিল্পাঞ্চলের বিকৃত জীবনযাত্রাই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। বস্তীর গ্লানিময় জীবনধারা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা এবং অন্যান্য সুপরিচিত উপসর্গগুলোর প্রভাবে শিল্পাঞ্চলে শুধু এই অপরাধই নয়, সব রকম অপরাধ-প্রবণতাই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, এই সব অঞ্চলে ভদ্র গৃহস্থের ধনপ্রাণ তো বটেই, মানও বিপন্ন হবার সম্ভাবনা নিয়তই প্রকট হয়ে উটছে।

* * কাগজের খবরে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাবালিকাকে তার অভিভাবক বা অভিভাবিকার হেফাজত থেকে হরণকারী আসামী বাদীপক্ষের পূর্ব পরিচিত। অভিভাবকদের নাকের ডগায় হয়তো আসামী মেয়েটির সঙ্গে দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, কিন্তু, তাঁরা লক্ষ্য করেন নি, অথবা বিষয়টির প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেন নি। একই বাড়ির ভাড়াটে, নিকট-প্রতিবেশী প্রভৃতিও অনেক সময় মামলার আসামী হয়ে দাঁড়ায় পরিজনদের এই উপেক্ষার ফলে।

একথা ঠিক যে, কিশোর বয়সী মেয়েদের ভালমন্দ বিচারবোধ তত সূক্ষ্ম নয়। প্রায়ই বোঝা যায়, আসামীর নানারকম মন-ভোলানো কথার ফাঁদে পড়ে', রঙীণ জীবনের স্বপ্ন দেখে', নতুন অনুভূতি আস্বাদনের মোহে, কিংবা সিনেমার নায়িকা হবার দুর্বার প্রলোভনে তারা ঘরের বাইরে পা দিয়েছে।

স্কুলের পথেও অনেক সময় আসামীরা পরিচিত হয় এই নাবালিকাদের সঙ্গে। তারপর, ঘটনা গড়িয়ে চলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, অপরাধী বালিকাকে ফুস্‌লিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেছে বলে অভি-

ভাবক থানায় অভিযোগ করেছেন। কিন্তু, এই পলাতকারা সকল সময়েই সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসামীর সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়েছে, তা' নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বালিকারা, রোম্যান্সের মোহে, ভবিষ্যত-সুখের আকাশ কুসুম দেখে, বাড়ির কোন পরিজনকৃত কোন লাঞ্ছনা ত্রুটির প্রতিশোধ নেবার জন্যে বা কারুর প্রতি ঘৃণায় অথবা পারিবারিক অশান্তির ফলে হতাশায় কিংবা অন্য যে কোন গুরুতর কারণে স্বেচ্ছায় আসামীর অনুগামী হয়।

এছাড়া বালিকার পক্ষ থেকে সাবধানতা অবলম্বন বা অস্বীকৃতির জন্য দুষ্কৃতিকারী যদি নাবালিকাকে হরণ বা ফসলিয়ে আনার ব্যাপারে ব্যর্থকাম হয় সেক্ষেত্রে আসামীর পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং বাদীপক্ষ বশীভূত না হ'লে রাস্তায় চলাকালে এসিড বাল্‌ব নিক্ষেপের ঘটনাও আজকাল বিরল নয় মোটেই।

প্রসঙ্গত দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। শ্যামলীর দিদি সেদিন বেড়াতে এসেছিল শ্বশুর বাড়ি থেকে। বোন স্কুলে গেছে। দুপুরে ওর সেলাইয়ের ঝাঁপি খুলেছিল কাজলী উলের নমুনা দেখবার জন্যে। কিন্তু, 'নমুনার' সঙ্গে 'সাপ'ও বেরিয়ে পড়ল। রঙীণ কাগজের চিঠি। বিষয়-বস্তুও খুবই রঙীণ। লেখক পাড়ারই শেষের দিকের এক বাড়ির ছেলে। শ্যামলীর কিছু ভয় নেই। শুধু সামান্য কাপড় চোপড় আর যে গহনা পরে আছে সঙ্গে নিলেই হবে। স্কুল থেকে ফেরার পথে কিংবা দুপুরবেলায়, কোন সময় শ্যামলীর যাবার সুবিধে', জানাতে অনুরোধ করেছে নায়ক। এ ছাড়া আছে আরও অনেক কথার জালবোনা। বোঝা গেল, চিঠিপত্র এর আগেও বিনিময় হয়েছে। অভিভাবকরা এই 'বাঞ্ছিত মিলনে' বাধা দেবেন বুঝেই ছেলেটি ওকে নিয়ে এখান থেকে বহুদূরে চলে যেতে চায়, যেখানে ওদের কেউ চিনবে না, জানবে না—ইত্যাদি।

এঁর পরে অবশ্য অভিভাবকদের তরফ্ থেকে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল—আর, এতেই একটি দুর্ঘটনার হাত থেকে ওদের পরিবার রক্ষা পেয়েছিল।

আশাকে আজও বারবার মনে পড়ে, আর, তখনই ভাবি এই অঘটনের প্রতিকার কি? সমাজ জীবনে এই ব্যাধি আজ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু কি নিরুপায়

দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল আশা। সুন্দরী, একমাত্র মেয়ে বাবা-মায়ের। ওদের বাড়ির ভাড়াটে ছিল আসামীর মামা। সেই সূত্রে আসামীর সঙ্গে সামান্য আলাপ। পরে আসামীর মামা ওদের বাড়ি থেকে অন্যত্র উঠে যান। কিন্তু আসামী প্রায়ই স্কুলের পথে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে আশার সঙ্গে দেখা করতে থাকে। প্রথমে ও ভয় পেয়ে বাড়িতে কিছু বলে নি। শেষে ওর বাবা জানতে পারেন। মেয়ের সঙ্গে গিয়ে একদিন আসামীকে পাকড়াও করেন। অপমান ও লাঞ্ছনাও করেছিলেন কিছু। তারপর, বেশ কিছুদিন কাটল। নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত সুরু করল আশা। এর পরেই ঘটল সেই মর্মান্তিক ঘটনা। ভীড়ের মধ্যে আশাকে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মেরেছে একজন। অপরাধী আর কেউ নয়, ওদেরই পূর্বতন ভাড়াটের ভাগ্নে। একবার মাত্র তাকে দেখতে পেয়েছিল আশা। তারপরেই, ও রাস্তায় পড়ে যায়।...তার পর দিন ভোরের দিকে ও মারা গেল। শেষ হল একটি নিরপরাধ ছোট্ট জীবন।

উদাহরণ বাড়াবো না। অনুরূপ ঘটনার বিবরণ কাগজে প্রায়ই পড়েন সবাই। তবে প্রশ্ন এই যে অভি-ভাবক বা অভিভাবিকাদের পক্ষ থেকে করণীয় কি কিছুই নেই? নাবালিকা কিশোরীরা যে ভাবে দ্রুত হারে সমাজ বিরোধীদের শিকার হয়ে পড়ছে—তা'তে শুধু সরকারী নিরাপত্তা বিধানের ভরসায় না থেকে অভিভাবকদের নিজেদেরও কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আবলম্বন করা প্রয়োজন।

এ কথা ঠিক যে, আজকের যুগে পর্দানসীন হয়ে বাঁচাটা আমাদের লক্ষ্য হতে পারে না। যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই জীবনকে গড়তে হবে। কিন্তু, প্রগতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়।

ঘরের পরিবেশ যদি সন্তানের মানসিক গঠনকে সুন্দর করে তুলতে না পারে, তাদের মনে নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি না করে, শৃঙ্খলাকে যদি তারা আদর্শ বলে গ্রহণ না করে—তবে, সমাজ জীবনে নৈতিক মানের অবনতি ঘটবেই। রুক্ষ, স্নেহহীন পারিবারিক পরিবেশ, অশান্তিভরা, অপ্রীতি-কর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের মনকে বহিরোন্মুখ করে তোলে। সুতরাং শিশুকাল থেকেই

জন্মায়, বর্তমান সংসার সম্পর্কে তাদের মনে যা'তে হতাশা বা বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা অভিভাবকের কর্তব্য।

অনেকসময় বাবা-মার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, কিশোরী মেয়ের প্রতি উদাসীনতা (ছোট শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য) প্রভৃতিও কোন কোন অপহরণ তথা পলায়ন কাহিনীর পরোক্ষ কারণ হয়ে ওঠে।

এছাড়া সিনেমার প্রভাব। প্রায়ই দেখা যায়—কিশোর বয়সীদের দেখবার অনুপযুক্ত ছবিতেই তাদের ভীড় বেশী। দুপুরে বাড়ির পুরুষরা বেরিয়ে গেলে পিসিমা, ঠাকুমা, মা কিংবা দিদি-বৌদিদের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা ও দলে দলে আজকাল সিনেমায় ভীড় জমাচ্ছে। এ সব ছবি তাদের মনে উত্তেজনা সঞ্চার তো করেই, অনেকসময় ছবির বিশেষ কোনর ঘটনা বা দৃশ্য তাদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এর কুফল সমাজে সুস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হলেও প্রতিকারের চেষ্টা আজও তেমন চোখে পড়ল না।

আবার, নাবালিকা হরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় অনেক সময় কৈশোরে পা দেওয়া মেয়েদের সময়ে অসময়ে বাজার দোকান বা এখানে-সেখানে যেতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে। দুপুরে বা সন্ধ্যায় এই যাতায়াতের ফলে তারা সহজেই দুর্নীতির ধ্বজাধারীদের শিকার হয়ে পড়ে। তারপর, নির্জন গলিতে ঘটে লাঞ্ছনা বা অপহরণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।

দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা যে সমাজের হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে—মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ সেখানে ধুলোয় লুটোয়, —সেখানে প্রগতির পথ খুব উন্মুক্ত হতে পারে না সুতরাং স্থান-কাল ভুলে আধুনিকতার মোহে অল্পবয়সী মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা না দেওয়াই সঙ্গত।

অবশ্য, একথা শুনে যেন কেউ আমাকে প্রগতি-বিরোধী বা গোঁড়া মনোভাবাপন্ন ভেবে নাক কুঁচকে উঠবেন না। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কিশোরী মেয়েদের প্রতি যে সতর্কতা মূলক মনোভাবের আজ কাল অভাব দেখা যায়—সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

অনেকেই সঙ্কোচ বা নেহাতই উদাসীনতাবশতঃ এই বয়সের মেয়েদের ভাবী জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন না। যৌবনোদ্গমে কালেও ১২।১৩ বছরের মেয়েনারী জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এই অজ্ঞতাও অনেকক্ষেত্রে তাদের সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়।

নাবালিকা হরণ ও লাঞ্ছনার ঘটনা সমাজ জীবনে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমাজের এই বৃহত্তর সমস্যার সমাধান সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই হওয়া সম্ভব। সুতরাং, সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য দমনে পুলিশের কৃতকার্যতা কতটুকু —তার সমালোচনায় মুখর না হয়ে অভিভাবক বা অভিভাবিকাদের সকলেরই এই সমস্যার প্রতিকার বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গত সংখ্যায় অব্যবহার্য্য পুরোনো মোজা দিয়ে ঘর-সাজানোর আর ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার ও উপহার দেবার উপযোগী কাপড়ের কারু-শিল্পের নানা রকম বিচিত্র-ছাঁদের পুতুল বানানোর যে অভিনব-পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছি, এবারে ঠিক তেমনি-ধরণেরই অন্য আরেকটি পদ্ধতির হদিশ জানাচ্ছি। পূর্বোল্লিখিত-পদ্ধতির মতো এবারের এই নূতন পদ্ধতিটিও নিতান্তই সহজসাধ্য এবং এ কাজে ব্যয়বাহুল্যেরও বিশেষ কোনো আশঙ্কা নেই। কি উপায়ে এই নূতন পদ্ধতিতে কাপড়ের কারু-শিল্পের বিচিত্র সুন্দর পুতুল বানানো যায়, আপাতত তারই মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি এবং পুরোনো মোজা থেকে তৈরী এ সব পুতুলের চেহারা দেখতে কেমন হবে, নীচের ছবিতে তারও সুস্পষ্ট একটি নমুনা প্রকাশ করা হলো।

উপরের ছবিতে কাপড়ের কারু-শিল্পের যে বিচিত্র-ছাঁদের পুতুলের নমুনা দেখানো হয়েছে– সেটি ভারতীয় দেশরক্ষা-বাহিনীর (Indian Army) 'জওয়ানের' প্রতিলিপি-অনুসরণে রচিত। আজকের দিনে এ-ধরণের পুতুল ছোট-বড় সবাইকার কাছেই রীতিমত সমাদর লাভ করবে—বিশেষ দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে, এমনি-ছাঁদের বিচিত্র পুতুল বানিয়ে অনায়াসেই 'জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের' (National Defence Fund) অঙ্ক বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে কিছু-কিছু দেশ-সেবার প্রচেষ্টাও করা যেতে পারে।

পুরোনো মোজা দিয়ে এমনি-ধরণের অভিনব পুতুল তৈরি করতে হলে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলি
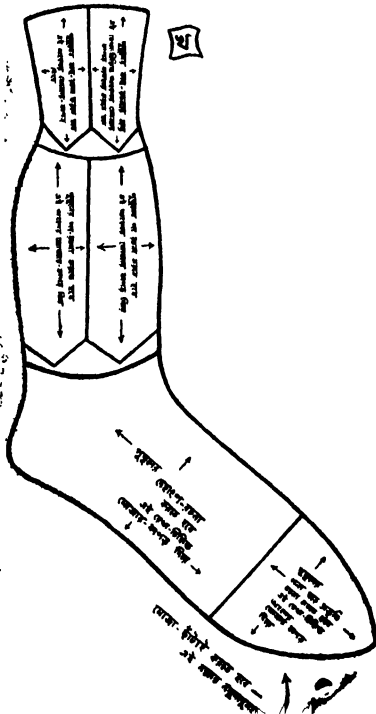
মোটামুটি ভাবে গত মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ইতি-পূর্ব্বে যেমন আলোচনা করেছি, ঠিক তারই অনুরূপ। কাজেই সে বিষয়ে আর নূতন করে ফর্দ্দ-তালিকা পেশ করার দরকার নেই। তবে উপকরণগুলি একই ধরণের হলেও, গতবারের এবং এবারের পুরোনো মোজা থেকে পুতুল তৈরীর পদ্ধতির মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। তাই আপাততঃ সেই পৃথক-পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ জানিয়ে রাখি এবারের নূতন পদ্ধতি-অনুসারে পুরোনো মোজা দিয়ে উপরোক্ত ঐ নমুনা মতো 'ভারতীয় জওয়ানের' পুতুল বানাতে হলে, নীচের পাশের 'খ' চিহ্নিত চিত্রে যেমন দেখানো রয়েছে ঠিক তেমনি-ছাঁদে মোজাটিকে আগাগোড়া বিভিন্ন অংশে ভাগ করে, তার প্রত্যেকটি অংশকে খড়ি কিম্বা পেন্সিলের রেখা টেনে নিখুঁতভাবে এঁকে নিতে হবে। তারপর কি ধরণে রেখা-চিহ্নিত এই মোজাটিকে আগাগোড়া ছোট-বড় বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পরিপাটি-ভাবে ছাঁটাই করতে হবে।—নীচের ১নং ছবিটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট-পরিচয় পাবেন।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে মোজার টুকরোগুলি বিভিন্ন-আকারে ছাঁটাই হয়ে যাবার পর, পুতুলের দেহাংশের টুকরোটিকে তুলো, কাঠের গুঁড়ো কিম্বা ছেঁড়া কাপড়ের ফালি ঠেশে ভরাট করে ফেলুন। অতঃপর, নীচের ২নং ছবির নমুনানুসারে তুলো, কাঠের গুঁড়ো কিম্বা ছেঁড়া কাপড় ভরাট-করা দেহাংশটির উপরের প্রান্তে অর্থাৎ গলার দিকে বেশ মজবুতভাবে বারকয়েক কষে সুতোর পাক জড়িয়ে এঁটে পুতুলের মুণ্ডটিকে রচনা করে ফেলুন। এ কাজ সারা হলে, পুতুলের পায়ের দিকের প্রান্তেও এমনিভাবে তুলো, কাঠের গুঁড়ো অথবা ছেঁড়া-কাপড়ের টুকরো ঠেশে ভরাট করে দিন—পরপৃষ্ঠায় ২নং ছবির ধরণে।

অতঃপর পুতুলের দেহাংশের নীচেকার (Body-Section) খোলা-প্রান্তটিকে আগাগোড়া ভালোভাবে

মুড়ে নিয়ে ছুঁচ-সুতো দিয়ে পাকাপোক্ত-ধরণে টেঁকে

বন্ধ করে দিতে হবে। সে কাজ কি ভাবে করতে হবে, তার সুস্পষ্ট আভাস পাবেন—নীচের ৩নং, ছবিটি দেখলেই।

এবারে পুতুলের দু'খানি হাত ও পায়ের অংশের কাপড়ের টুকরোগুলিকে উল্টে নিয়ে সেগুলির 'অন্দর-দিকের' প্রান্তভাগে পাকাপোক্তভাবে ফোঁড় তুলে থলে বা ঠোঙার মতো ছাঁদে সেলাই করে নিন। অতঃপর সদ্য-তৈরী থলে বা ঠোঙার মতো চেহারার এই হাত আর পায়ের জোড়াগুলিকে পুনরায় সোজা করে নিয়ে, নীচেকার ৪নং ছবির নমুনানুসারে ছুঁচ-সুতো দিয়ে

সেলাই করে পাকাপাকি-ধরণে জুড়ে দিন পুতুলের দেহাংশের সঙ্গে। তাহলেই পুতুলের দেহের ছাঁদ বা কাঠামো তৈরী হয়ে যাবে। বাকী রইলো, ছুঁচ আর মানানসই-ধরণের রঙীন সুতো অথবা রঙ-তুলির সাহায্যে পরিপাটিভাবে পুতুলের নাক, মুখ, চোখ, কান প্রভৃতি রচনার কাজ। সে কাজের জন্য অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারে—নীচের ৫নং ছবিতে দেখানো মুখ, চোখ, কান, নাক, ঠোঁটের নক্সা-চিত্রণের নমুনাটি।
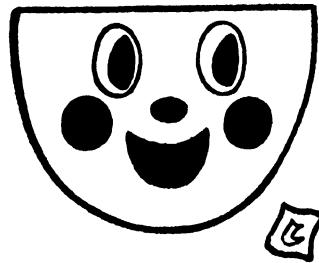
পুতুলের 'মুণ্ডের' (Head) উপর এ নক্সাটির প্রতিলিপি সহজেই 'ছকে' (Tracing) নেওয়া যাবে—এক টুকরো 'কার্ব্বন-পেপার' (Carbon-Paper) আর একটি পেন্সিলের সহায়তায়। কাপড়ের উপর উপরোক্ত নক্সার প্রতিলিপি এঁকে নেবার পর, গত মাসের প্রবন্ধে যেমন হদিশ জানিয়েছি, ঠিক তেমনি নিয়মেই এমব্রয়ডারীর সুতো আর রঙীন বোতাম দিয়ে রচনা করতে হবে—পুতুলের নাক, মুখ, চোখ, কান আর ঠোঁট।

এই কাজের পর, পুতুলটিকে 'ভারতীয় জওয়ানের' যুদ্ধের-পোষাকে সুসজ্জিত করার পালা। তবে সে কথা আর বিশদভাবে বলবার দরকার হবে না···কারণ, মেয়েরা প্রত্যেকেই ছোট বেলায় খেলাঘরে পুতুলের সাজ-পোষাক তো বানিয়েছেন নানান্ ছাঁদের! কাজেই ঠিক তেমনি ভাবেই খাকি-কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানিয়ে ফেলুন উপরের ছবিতেদেখানো 'ভারতীয় জওয়ানের' বিচিত্র ঐ সব ফৌজী-পোষাক—পাৎলুন, কোর্ত্তা, টুপী আর পায়ের পট্টি! জওয়ানের ফৌজী-পোষাকের 'কোমরবন্ধ' (Belt) প্রভৃতি রচনার জন্য ব্যবহার করবেন গাঢ় খাকী বা বাদামী-রঙের সুতী অথবা পাৎলা-প্লাষ্টিকের কাপড়ের সরু ফালি···মিলিটারী-বুটের জন্য চাই—কালো বা গাঢ়-বাদামী সুতী বা পাৎলা-প্লাষ্টিকের কাপড় এবং কাঁধে-ঝোলানো বন্দুকটী বানাবেন ছুরি দিয়ে যথাযথ-ছাঁদে নরম-কাঠের টুকরো কেটে এবং সেটিকে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে গাঢ়-বাদামী রঙে রাঙিয়ে নিয়ে।

এই হলো, নূতন-কায়দায় পুরোনো মোজা থেকে কাপড়ের কারু-শিল্পের অভিনব পুতুল—'ভারতীয় জওয়ানের' প্রতিমূর্ত্তি-রচনার মোটামুটি নিয়ম।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো একটি কাপড়ের কারু-শিল্পের অভিনব সামগ্রী রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

পশমের পুলোভার

হিরণ্ময়ী দেবী

২

পুলোভারের বগল আর হাতার ছাঁদ রচনার জন্য—গত সংখ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে, যেমন প্রথায়, পঞ্চম এবং দ্বিতীয় লাইন বোনবার কথা বলেছি, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে, একবার পঞ্চম লাইনের নিয়মে কাজ করে, আরেকবার দ্বিতীয় লাইনের নিয়মে কাজ করে হাতেরছাঁট ফেলবেন।

গোড়াতে দশটি করে ঘর বন্ধ করতে হবে -পুলো-ভারের বগলের দুইদিকেই। তারপর প্যাটার্ণটি যথাযথ রেখে, যতক্ষণ বোনার কাঁটায় ৯৪ ঘর থাকে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত জামার বগলের দুইদিকেই ১টি করে ঘর বন্ধ করে বুনে যেতে হবে। এমনিভাবে কাজ সেরে, এবারে কোনো ছাঁট না ফেলে সপ্তদশ লাইনটিকে প্যাটার্ণ অনুসারে বুনে যাবেন।

অতঃপর ৩৪ ঘর প্যাটার্ণ-অনুযায়ী বুনে থামবেন। এবারে যতক্ষণ না কাঁটায় ২৭ ঘর থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্যাটার্ণ-অনুযায়ী পুলোভারের গলার দিকে ২টি করে ঘর একত্রে জোড়া বুনে কমিয়ে, এই ৩৪ ঘর রচনা করবেন। তারপর এই ২৭ ঘরকে প্যাটার্ণ-অনুসারে বুনে অষ্টাদশ লাইন রচনা করতে হবে। এবারে পুলোভারের কাঁধের (Shoulder) ছাঁট ফেলবেন নিম্নোক্ত-নিয়মেঃ—

১ম লাইন—১৮টি ঘর বুনে যাবেন প্যাটার্ণ-অনুসারে, ৯টি ঘর না বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নিতে হবে।

২য় লাইন—এই ১৮টি ঘরকে পুনরায় বুনে যেতে হবে।

৩য় লাইন—এবারে ৯টি ঘর বুনে, বাকী ১৮টি ঘর না বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নেবেন।

৪র্থ লাইন—প্যাটার্ণ-অনুসারে ৯টি ঘর বুনুন, তারপর ২৭টি অর্থাৎ সব ঘরগুলিই বন্ধ করে দিন।

এবারে এদিকের ৫২টি ঘরের ১৮টি ঘর অপর কোনো বাড়তি বোনার-কাঁটায় (Extra Knitting-needle) রেখে দিয়ে, বাকী ৩৪ ঘর—যতক্ষণ না কাঁটায় ২৭ ঘর থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্যাটার্ণ-অনুসারে গলার দিকে ২টি ঘর একত্রে জোড়া বুনে ঘর কমিয়ে রচনা করে যাবেন। তারপর কোনো ছাঁট না ফেলে প্যাটার্ণ-অনুসারে অষ্টাদশ বা লাইন বুনতে হবে। এবারে নিম্নোক্ত-নিয়মে কাঁধের ছাঁট ফেলবেনঃ—

১ম লাইন—সব ঘর বুনে, শেষের ৯ ঘর না বুনে, কাঁটা ঘুরিয়ে নেবেন।

২য় লাইন—এবারে এই ১৮ ঘর বুনে ফেলবেন।

৩য় লাইন—পুনরায় ৯ ঘর বুনে, ১৮ ঘর বাকী রেখে কাঁটা ঘুরিয়ে নেবেন।

৪র্থ লাইন—প্যাটার্ণ মতো ৯ ঘর বুনে, কাঁধের সব ঘর বন্ধ করুন।

এবারে পুলোভারের 'পিঠ' [back] বা পিছনের দিক রচনা করতে হবে। যতক্ষন না কাঁটায় ৯৪ ঘর থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্যাটার্ণ-অনুসারে, ১১ নম্বর বোনার কাঁটার [No. 11 knitting-needle] সাহায্যে ১১০ ঘর তুলে পোষাকের পিছনের বা পিঠের দিকটি আগাগোড়া সামনের অর্থাৎ বুকের দিকের ছাঁদে বুনে যাবেন। তারপর কোনো ছাঁট না ফেলে, প্যাটার্ণ-অনুসারে বুনে যেতে

হবে—পোষাকের বুকের বা সামনের দিকের অনুরূপ-ধরণে। এবারে পোষাকের পিছনের দিকে কাঁধের ছাঁট ফেলবেন নিম্নোক্ত-নিয়মে :—

১ম লাইন—প্যাটার্ণ-অনুসারে সব ঘর বুনে, শেষের ৯ ঘর বাকী রেখে কাঁটা ঘুরিয়ে নেবেন।

২য় লাইন—এবারে এই ৯ ঘর বাকী রেখে, মাঝখানের সব ঘর প্যাটার্ণ-অনুসারে বুনে যাবেন, পুনরায় এদিকের ৯টি ঘর বাকী রেখে।

৩য় লাইন—সব ঘর বুনে যাবেন, শেষের ১৮ ঘর বাকী রেখে কাঁটা ঘুরিয়ে নেবেন।

৪র্থ লাইন—সব ঘর বুনে যাবেন, শেষের ১৮টি ঘর বাকী রেখে।

এবারে সব ঘর বুনে যাবেন। তারপর পুলোভারের পিঠ বা পিছনের দিকের কাঁটায়, কাঁধের ২৭ ঘর বন্ধ করে, পুনরায় মাঝখানের ঘরগুলি বুনে, শেষের ২৭ ঘর বন্ধ করে দেবেন। এবারে পোষাকের বাঁ-দিকের কাঁধ জুড়ে পুলোভারের গলার অংশে 'কিনারা' বা 'বর্ডার' (Border) রচনার কাজ স্থুরু করতে হবে।

পুলোভারের গলার 'বর্ডার' রচনার জন্য—১১ নম্বর বোনার-কাঁটার (No. 11 Knitting needle) সাহায্যে বুনে গলার পিছন-দিকের ৪০ ঘর উঠিয়ে, বাঁ-দিকের কাঁধ থেকে ২৬ ঘর পুনরায় সামনের দিকের লাইনে রাখা ১৮ ঘর তুলে, আবার ডান-দিকের কাঁধ থেকে আরো ২৬ ঘর তুলে নিতে হবে। তাহলে কাঁটাতে এখন ১১০ ঘর রইলো। এবারে ৬ লাইন—১ সোজা, ১ উল্টো··· বুনে বন্ধ করে দিন। তাহলেই পুলোভারের গলার 'বর্ডার' রচনার কাজ শেষ হবে।

এবারে পুলোভারের হাতের 'বর্ডার' রচনার পালা। এ কাজের জন্য—১১ নম্বর বোনার-কাঁটার সাহায্যে পোষাকের হাতের ফাঁদ থেকে ১১৪টি ঘর তুলে—১ সোজা, ১ উল্টো ···এমনি-ছাঁদে 'রিব' (Rib) প্যাটার্ণে, ৬ লাইন বুনে, সব ঘর বন্ধ করে দিন। তাহলেই পোষাকের একদিকের হাতের 'বর্ডার' রচিত হয়ে যাবে। ঠিক এমনি-পদ্ধতিতে পুলোভারের অপরদিকের হাতের বর্ডারটিকে রচনা করে ফেললেই, পশম দিয়ে বোনবার কাজ শেষ হবে।

অতঃপর পোষাকের বিভিন্ন-অংশ সুষ্ঠুভাবে জোড়া দিয়ে একত্রে সেলাই করার পালা। এ কাজের জন্য—পশম-দিয়ে-বোনা পুলোভারের দেহাংশের (Body) ডান-দিকের ও বাঁ-দিকের কাঁধ (Shoulder) জুড়ে দুই দিকের প্রান্তভাগ কার্পেটের ছুঁচের সাহায্যে পশমী-সুতো (Wool) দিয়ে পরিপাটিভাবে সেলাই করে নিলেই, উপরের প্যাটার্ণমতো সুন্দর পোষাকটি আগাগোড়া তৈরী হয়ে যাবে। এই হলো, এমনি সৌখিন-ছাঁদের 'পশমী-পুলোভার' রচনার মোটামুটি পদ্ধতি।

—

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রাজস্থান-অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় দুটি অভিনব-সুস্বাদু নিরামিষ-খাবার রান্নার কথা। এ দুটির মধ্যে—প্রথমটি হলো, 'ঝাল-নোন্‌তা জাতীয়' এবং দ্বিতীয়টি হলো, হালুয়া-মোহনভোগের মতো 'মিষ্টান্ন-জাতীয়, পরম-মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাবার। গৃহে কোনো উৎসব বা সামাজিক-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, নিজের হাতে নতুন-ধরণের এ দুটি উপাদেয় রাজস্থানী-খাবার রান্না ও পরিবেষন করে অনায়াসেই এবং অল্প-খরচে যে কোনো সুগৃহিণীই অতিথি-সমাগত আর আত্মীয়-বন্ধুদের প্রচুর তৃপ্তি দিতে পারবেন।

রাজস্থানী-রায়তা ঃ

প্রথমেই 'ঝাল-নোন্‌তা' জাতীয় যে খাবারটির কথা বলছি, সেটির নাম—'রাজস্থানী-রায়তা'। এ খাবারটি তৈরী করতে হলে, যে সব উপকরণ প্রয়োজন—গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবারের জন্য উপকরণ চাই—আধসের আন্দাজের একটি

কচি লাউ, একটা পাতিলেবু, অল্প একটু আদার রস, খানিকটা গোলমরিচের গুঁড়ো, আন্দাজমতো পরিমাণে নুন, খানিকটা সরিষার গুঁড়ো আর আধসের টক দই। সরিষা গুঁড়ো করবার আগে, সেগুলিকে রোদে দিয়ে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে ঝরঝরে করে রাখবেন এবং কোনোমতেই টক-দইয়ের বদলে-মিষ্টি-দই ব্যবহার করবেন না—এ খাবারটি তৈরীর সময়। এ বিষয়ে ত্রুটি ঘটলে, খাবারটি তেমন সুস্বাদু-মুখরোচক হয়ে উঠবে না—সে কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রাজস্থানী-প্রথায় 'রায়তা' রান্নার কাজে হাত দেবেন। এ কাজের জন্য গোড়াতেই লাউটিকে পরিষ্কার-জলে ধুয়ে ধুলো-কাদা সাফ্ করে নিন। তারপর ভালো একটি বঁটি, ছুরী কিম্বা অথবা কুরুনীর সাহায্যে লাউটিকে আগাগোড়া খোশা-ছাড়িয়ে নিয়ে খুব মিহি-সরু ছাঁদে কুটে নেবেন। এবারে উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেকচি চাপিয়ে, সেই পাত্রে আন্দাজ-মতো পরিমাণে জল দিয়ে, ফুটন্ত-জলের মধ্যে সদ্য-কোটা লাউয়ের কুচি সুসিদ্ধ করে নেবার পর, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে, পাত্রের ফুটন্ত-জলটুকু ফেলে দিয়ে লাউয়ের কুচি-সমেত পাত্রটিকে সযত্নে একপাশে সরিয়ে রাখুন। এবারে বড় একটা কাঁচের পাত্র কিম্বা পাথরের বাটিতে টক-দই, আন্দাজমতো পরিমাণে গোল-মরিচের গুঁড়ো, সরিষার গুঁড়ো, নুন, আদার রস আর পাতিলেবুর রস ঢেলে, তার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে রন্ধন-পাত্রে সরিয়ে-রাখা ঐ সুসিদ্ধ-লাউয়ের কুচিগুলিকে ভালোভাবে মিশিয়ে ফেলুন। এ সব উপকরণ একত্রে-মেশানোর পর, রন্ধন-পাত্রের মুখটিকে কিছুক্ষণ ঢাকা চাপা দিয়ে বন্ধ করে রাখবেন। তাহলেই 'রাজস্থানী-রায়তা' রান্নার কাজ শেষ হবে।

অতঃপর প্রিয়জনের পাতে এ খাবারটি পরিবেষনের পালা। যথাযথভাবে রান্না করতে পারলে, চাটনীর মতো এ খাবারটিও যে তাঁদের কাছে পরম-উপভোগ্য হয়ে উঠবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

রাজস্থানী পেস্তা-বাদামের হালুয়া ঃ

এবারে বলি—রাজস্থানী-প্রথায় 'মিষ্টান্ন-জাতীয়' খাবারটির রন্ধন-প্রণালীর কথা। এটি হলো—অভিনব ধরণের 'পেস্তা-বাদামের হালুয়া'। এ খাবারটি খেতেও যেমন অপরূপ-সুস্বাদু, তেমনি এর আরেকটি বিশেষ গুণ হলো যে এটি সহজে নষ্ট হয় না—দু'দিন ঘরে রেখেও খাওয়া চলে। তবে পেস্তা-বাদামের তৈরী বলে, অনেকের ধারণা—এ খাবারটি কিঞ্চিৎ গুরুপাক। তাই তাঁদের মতে—এ ধরণের হালুয়া শীতকালেই খাওয়া ভালো··· কারণ, গ্রীষ্মের দিনে এটি হয়তো সকলের পক্ষে সহজ-পাচ্য হবে না। এটি অবশ্য পরীক্ষা-সাপেক্ষ ব্যাপার··· কাজেই এ বিষয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার উপরেই নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত।

যাই হোক, এ সব তর্ক-বিতর্কের আলোচনা ছেড়ে আপাততঃ রাজস্থানী-প্রথায় 'পেস্তা-বাদামের হালুয়া' রান্নার জন্য যে উপকরণগুলি দরকার, তার প্রথমেই পরিচয় দিই। এ খাবারটি রান্নার জন্য প্রয়োজন—আধপোয়া সরেস বাদাম, আধপোয়া সরেস পেস্তা, আধপোয়া ভালো কিসমিস, আধপোয়া ভালো ঘি আর একপোয়া চিনি।

উপরের ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি জোগাড়, হবার পর রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, বাদাম, পেস্তা আর কিসমিস পরিস্কার-জলে ধুয়ে সাফ্ করে নিন এবং ধোয়া কিসমিসগুলিকে পরিচ্ছন্ন একটি শুকনো পাত্রে সযত্নে তুলে রেখে পেস্তা আর খোলা-ছাড়ানো বাদাম খানিকক্ষণ আলাদা-আলাদা বাটি বা গামলার জলে ভিজিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ এভাবে ভিজিয়ে রাখার ফলে, পেস্তা আর বাদাম নরম হলে, সেগুলিকে আগাগোড়া জল-ঝরিয়ে নিয়ে পরিষ্কার একটি শিলে বাটনার মিহি করে বেটে নিন।

এবারে উনানের আঁচে পরিষ্কার একটি ডেকচি বা কড়া চাপিয়ে, সে পাত্রে ঐ মিহি করে-বাটা বাদাম আর চিনি মিশিয়ে বড় চামচ, হাতা অথবা খুন্তির সাহায্যে নেড়ে-চেড়ে কিছুক্ষণ ভালোভাবে পাক করুন। এমনিভাবে পাক করার ফলে, চিনি আর বাদাম বাটা মিলেমিশে 'লেইয়ের' Paste মতো থক্থকে-ধরণের হয়ে গেলেই, রন্ধন-পাত্রে পেস্তা-বাটা, কিসমিস আর ঘি মিশিয়ে পূর্ব্বোক্ত-প্রথায় হাতা বা খুন্তি দিয়ে এই 'মিশ্রণটিকে' নেড়েচেড়ে আরো কিছুক্ষণ পাক করুন। খানিকক্ষণ এভাবে পাক করলেই, যখন দেখবেন যে ঘিটুকু গলে গিয়ে রন্ধন পাত্রের গায়ে লেগেছে, তখন বুঝবেন—এই 'হালুয়া' রান্নার কাজ শেষ হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উনানের আঁচ থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে নেবেন। এই হলো, রাজস্থানী-কায়দায় 'পেস্তা-বাদামের হালুয়া' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

পরের মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব উপাদেয় খাবার রান্নার বিষয়ে আলোচনা করার বাসনা রইলো।
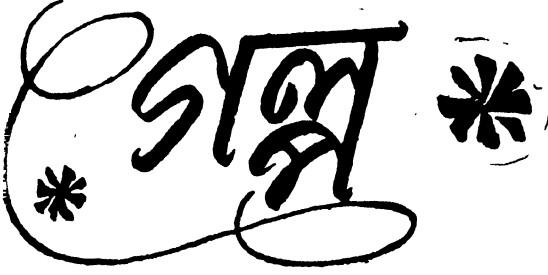
গল্প হলেও সত্যি

তারিণীপ্রসাদ রায়

ভূত যে আছে একথা অনেকে বিশ্বাস করেন, অনেকে করেন না। প্রেতলোক সম্পর্কে গবেষণা চলে, প্রেত-পুরীর অস্তিত্ব অনেকে স্বীকার করেন—কিন্তু ভূত দেখা বা ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপে আস্থাহীন আধুনিক শিক্ষিত-মহল।

বিশ্বাস করুন আর না করুন, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, গল্প হ'লেও সত্যি—এ ধরণের গল্প প্রকাশ হয় সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। আগ্রহ সহকারে পড়েন অনেকে, বিশ্বাস করেন কি না করেন, পাঠক-পাঠিকাগণই জানেন।

আমি যে ঘটনা বিবৃত করছি—শুনতে নিছক গল্প হলেও সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা এ কাহিনী। স্বচক্ষে যা' দেখেছি তা' থেকে একবর্ণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে লিখছি না। অনেক চিন্তা করেছি এ ব্যাপার সম্পর্কে, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারিনি।

ঘটনাটা ঘটেছিল গত আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে, আমার মেজভাই যতীনের জ্যেষ্ঠপুত্র দীপকের স্ত্রীকে নিয়ে। দীপকের বয়স বর্ত্তমানে বছর পঁচিশ হ'বে। যতীন বেঁচে নেই, সে যখন মারা যায়—তখন দীপকের বয়স ছয় কি সাত বছর।

দীপকের বিয়ে হয়েছে গত বৈশাখ মাসে। বৌমা বারাকপুর অঞ্চলের মেয়ে। বর্ত্তমানে মেয়েদের সঠিক বয়স অনুমান করা কঠিন, তবে মনে হয় বাইশ তেইশ হ'বে। নম্রপ্রকৃতি, লজ্জাশীলা, বুদ্ধিমতী মেয়ে, কথা খুব কম বলেন, এত আস্তে যে কাণ পেতে শুনতে হয়।

বৈশাখ মাসে বিয়ে হওয়ার পর বৌমা প্রথম এসেছেন এখানে আষাঢ় মাসে। আসার পর কয়েকদিন মাত্র গত হয়েছে, সেদিন রাত তখন প্রায় বারটা, কিছু আগে শয্যা-গ্রহণ করেছি, ঘুম এসে গিয়েছে, আমার স্ত্রী শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে—ওগো, ওঠো।

বার দুই-তিন ডাকতে ঘুম ভেঙে গেল। মশারীর ভিতর থেকে চোখ মেলে চেয়ে দেখি এদিকে সেদিকে অনেকগুলি আলো জ্বলছে। স্ত্রীর কথার ভাবে বুঝি—যেন আকস্মিক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

আমার স্ত্রী বলে—শিগ্‌গির উঠে এসো।

ঘুম তখনও জড়িয়ে আছে চোখে, বলি—কেন?

শঙ্কিতকণ্ঠে উত্তর আসে—বুদোর (দীপকের ডাক নাম) বৌএর কি হয়েছে দেখবে এস।

শয্যাত্যাগ করে স্ত্রীর পিছন পিছন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি। নির্দ্দিষ্ট ঘরে ঢুকে বৌমার অবস্থা দেখে যতটা ভীত না হই তা' থেকে বেশী ভয় পাই—বাড়ীর আর সকলের কাঁদাকাটা, চেঁচামেচি আর অস্থিরতা দেখে। খাটের উপর শুয়ে আছেন বৌমা, তাঁকে ঘিরে মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে কি করবে ঠিক বুঝতে না পেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সকলকে সরতে বলে ভাল করে দেখি বৌমাকে। জ্ঞানশূন্য অবস্থা, দাঁত লেগে গিয়েছে, হাত-পা কাঠের মত শক্ত, আড়ষ্ট। মেঝেয় মাদুর পেতে খাট থেকে নামিয়ে শোয়ানর ব্যবস্থা করা হয়। টিউবওয়েল থেকে সদ্য তোলা ঠাণ্ডা জল এনে মাথায় ঢালা হয় কয়েক বালতি, তিন চার খানা পাখার বাতাস করা হয়।

আধ ঘণ্টা মত সময় ধরে ব্যজন সিঞ্চন চলার পর উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠেন বৌমা। কি বিকট সে হাসি! চোখ মেলে তাকান, আসুরিক দৃষ্টি চোখের পাতায়, জবা ফুলের ন্যায় লাল চোখের মণিদ্বয়। সামান্যক্ষণের জন্য এ হাসি, এ চাহনি! মিনিট খানেক হ'বে হয়ত! আবার মূর্চ্ছা,

মূর্চ্ছা অপনোদন করে জ্ঞান সঞ্চারের পুনঃ প্রয়াসে পূর্ব-প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু জ্ঞানের সঞ্চার আর হয় না।

রাত তখন আন্দাজ একটা হ'বে। হাতের কাছে ডাক্তার নেই, একটু তফাতে, ডাকলে ডাকা যায়—কিন্তু অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন ওঝা দেখানোর। কাজেই ডাকতে হয় বুদ্ধিশ্বরকে। দু' মিনিটের পথ, আমাদের বাড়ী থেকে একটু দূরে বাস করে বুদ্ধিশ্বর, মোট বয়, মজুর খাটে, অক্ষরজ্ঞান শূন্য। অবসর সময়ে মন্তর শেখে, সাপ ধরে, সাপ খেলায়—ভূত-পেত্নী তাড়ায়, ওঝাগিরি করে।

বুদ্ধিশ্বরকে ডাকতে বলার সঙ্গে সঙ্গে বৌমার মূর্চ্ছা হয় ভঙ্গ। আমার পানে কটমট করে চেয়ে সে কি শাসানি! ভয় দেখিয়ে বলেন—বুদ্ধিশ্বর তো ছেলেমানুষ, কিছুই শেখেনি, তার বাবা এসেও আমাকে তাড়াতে পারবে না। রোজা ডাকলে আমাদের সকলের ঘাড় মটকে ভেঙে দেওয়া হ'বে, সে ভয়ও দেখান বৌমা।

সত্যি কথা বলতে কি, অবাক হয়ে গেলাম তাঁর কথা শুনে। নূতন বৌ, ধীর স্থির লক্ষ্মী মেয়ে, তার একি উগ্র-মূর্ত্তি, নির্লজ্জ আচরণ!

বুদ্ধিশ্বরকে ডাকতে পাঠালে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়েন বৌমা, মাঝে মাঝে ফুঁ দেন, হাসেন। মনে হয় যেন কলা-কুশলী অভিনেত্রীর নিপুণভাবে রপ্ত-করা এ হাসি।

আমাদের প্রাচীর-ঘেরা বাড়ী। আমরা সবাই ঘরের ভিতর বৌমাকে আগলে নিয়ে বসে আছি। তিনি মাদুরের উপর শুয়ে আছেন, মাঝে মাঝে ওঠার চেষ্টা করছেন। চার পাঁচজন দেবর ননদ আটকাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ঠিক এমনি সময় বুদ্ধিশ্বর সদর দরজা ঠেলে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে খিল খিল করে হাসেন বৌমা।

বুদ্ধিশ্বর ঘরের সামনে দরজার পাশে এসে বসে, চায় এক ঘটি জল। বৌমা তাড়া দেন তাকে, বলেন—তুই ত ছেলেমানুষ, তোর ওস্তাদ এসেও আমাকে তাড়াতে পারবে না।

এ কথা শুনে আমাদের সকলের ভয় হয়। বুদ্ধিশ্বর বাড়ীর ভিতর ঢুকেছে, আমরা তার প্রতীক্ষায় রইছি, কেউ টের পাইনি। বৌমা বিছানায় শুয়ে জানলেন কি করে!

নাছোড়বান্দা বুদ্ধিশ্বর জলের ভিতর কয়েকটা খড় ডুবিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে। বৌমাও অনর্গল মন্ত্র পড়েন, কখনও জোরে, কখনও আস্তে। বুদ্ধিশ্বর খড়কের ডগায় তুলে পড়া জল ছিটিয়ে দেয় বৌমার গায়ে, বৌমা জোরে একটা ফুঁ দিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠেন।

বুদ্ধিশ্বর জানতে চায়, কি নাম, কোথায় বাড়ী, কেন ধরেছ, কোথায় ছিলে—ইত্যাদি নানা কথা। হাসেন বৌমা, বিদ্রূপের হাসি, বলেন—কথা বুঝি গ্রাহ্য হ'ল না, চলে যা' বলছি, যদি বেশী জ্বালাতন করিস, এমন বাণ মারবো যে তোর সর্বনাশ হবে।

বুদ্ধিশ্বর ভয় পায়, বলে—ওঝা ভূতে ধরেছে, আমার সাধ্যে কুলাবে না ছাড়ানো। অন্য ওঝা দেখুন।

বুদ্ধিশ্বরের কথা শুনে বৌমার যেন ভয় হয়, বলেন, অন্য ওঝা ডাকবেন না, আমি বেশ আছি—। ভাল ওঝা ডেকে কি করবেন, আমি একে ছেড়ে যাব না, যদি যাই সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

সকলে তাজ্জব বনে যায় বৌমার কথা শুনে। এত কথা এ মেয়ের মুখে আসে কোথা হ'তে, একি বিশ্বাস-যোগ্য! বুদ্ধিশ্বর ভূত ছাড়াতে অক্ষম শুনে বাড়ীর সবাই অবাক হন। গ্রামের মধ্যে সব থেকে বড় ওঝা নলিন ঘোষকে ডাকার কথা হয়। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তিনটের কম হবে না। লোক ছোটে নলিন ঘোষকে ডাকতে। প্রায় মাইল খানেক রাস্তা, বানপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে তার বাড়ী। দুজনকে পাঠান হয়, একা যেতে কেহ সাহস করে না।

নলিন ঘোষকে ডাকায় ভীষণ আপত্তি বৌমার। আগে চোখ রাঙান, ভয় দেখান, পরে কান্না জুড়ে দেন। সেকি কান্না! মানুষ সুস্থ অবস্থায় এমনভাবে কাঁদতে পারে না।

কাঁদছেন বৌমা, এমন সময় নলিন ঘোষ আমাদের বাড়ীর সীমানায় পা দেয়, উত্তেজনাবশে প্রথম ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করেন বৌমা, কয়েকজনে ধরে রাখতে পারে না।

আগত ওঝার কাছে বৌমার জবানীতে ভূত বলে নিজের কাহিনী। যে সব কথা বলেছিল, সংক্ষেপে তাহা এই—হুগলী জেলার হরিপাল গ্রামে বৌমার বোনের বাড়ী। বিয়ের আগে তিনি সেখানে বেড়াতে গিয়ে-ছিলেন। একদিন পাড়া বেড়িয়ে এক শ্মশানের ধার দিয়ে সন্ধ্যার সময় ফিরবার বেলায় থুথু ফেলেন তিনি।

থুথ্ ছিটকে লাগে ভূতের গায়ে। সেই থেকে নাকি সে বৌমার পিছনে ঘুরে বেড়ায় তাঁকে গছবার জন্য।

বিয়ের আগের দিন বৌমা দুপুরবেলা এলোচুলে বাড়ীর ছাদে বসে একা-একা চুল শুখাচ্ছিলেন, সেইদিনই ভূত নাকি তাকে গছতে পারতো—পারেনি গায়ে হলুদের সংস্পর্শ থাকার জন্য। বিয়ের সময় বৌমার সঙ্গে নাকি আমাদের বাড়ীতেও এসেছে ভূত, সুযোগ করতে পারেনি গছবার।

পুনরায় আসার পর সন্ধ্যাবেলা খিড়কী পুকুরে গা ধুতে গিয়ে এলোচুল যখন গামছা দিয়ে মুচছিলেন তখন নাকি পুকুরের মাঝ বরাবর জলের ভিতর কালো মত একটা কি দেখে তিনি ভয় পান, সেই সুযোগে ভূত তাঁকে গছে ফেলে। সেইদিন রাত্রেই প্রকাশ পায় প্রতিক্রিয়া।

নিজের বিগত জীবনী সম্পর্কে ভূত বলে, অষ্টম শ্রেণীতে যখন সে পড়ে তখন পড়া ছেড়ে দেয়, বেকার অবস্থায় এক ওঝার কাছে ভূত-প্রেত ঝাড়ানো মন্ত্র শিখতে থাকে, ওস্তাদের নিকট পাকাপাকিভাবে শিক্ষালাভের পূর্বেই সে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে। অপঘাতে মৃত্যু-জনিত প্রেতযোনীপ্রাপ্ত হয়।

ভূত আরও বলে তাদের সমাজ আছে, বৈঠক বসে, বিচার হয়, আলাপ-আলোচনা চলে, রেষারেষি, ঝগড়া-দ্বন্দ্ব, মারপিঠ হয়। আরও অনেক অনেক কথা বলে, যা বৌমার পক্ষে বানিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব। সবিস্তারে লিখতে হ'লে বড় গল্প হয়ে পড়ে, তাই সংক্ষেপে লিখলাম।

অনেক বাকবিতণ্ডা, কথাকাটাকাটি, আলাপ-আলোচনার পর আপোসে ভূত ভদ্রলোকের ন্যায় বৌমাকে ছেড়ে যেতে স্বীকৃত হয়। কিভাবে যাবে, সহজ সরল আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়।

ছেড়ে যাবার বেলা সে কি অলৌকিক দৃশ্য, ভয়ঙ্কর কাণ্ড! যে ঘর থেকে বৌমা বার হলেন—আর যেখানে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন—অর্থাৎ খিড়কী পুকুরের পাড় পর্য্যন্ত কয়েকটি দরজা, দেওয়াল প্রাচীর প্রভৃতির বাধা ব্যবধান আছে। দূরত্ব পঞ্চাশ গজের কম নয়।

বাড়ীর দু'জন তরুণ যুবক বৌমার পিছনে ছুটবে বলে তৈরী হয়েছিল, বৌমা ওঝার আদেশের প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আদেশ পাওয়া মাত্র সে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার, কি অভাবনীয় কাণ্ড! প্রত্যেকটি দরজা পার হ'তে দুড়ুম দুড়ুম শব্দ, দরজা যেন ভেঙে খানচুর হয়ে গেল। উঠান-ময় দুপদাপ শব্দ। যেন ঝড় বয়ে গেল বাড়ীর উপর দিয়ে। বাতাসে মিশে যেন উড়ে গেলেন বৌমা, চোখের পলক না ফেলতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ওঝার নির্দেশমত পড়লেন এবং তিন ডাকের পর উত্তর দিয়ে উঠলেন।

ভূত ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল সাবেক অবস্থা। ধীর স্থির নম্র লজ্জাশীলা। এ রকম হ'লো কেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন তিনি—কিছুই হয়নি, ঘটনার কিছুই তিনি জানেন না। শরীর ক্লান্ত নয়, এত ধ্বস্তা-ধ্বস্তির ফলে গায়ে ব্যথা হয়নি অদৌ।

এখানেই শেষ নয়। সন্ধ্যার ট্রেণে বারাকপুর থেকে বৌমার মা, কাকীমা, অন্যান্য আপনজন এলেন—সঙ্গে এক ওঝা নিয়ে।

ওঝা বলে, ভূত ছেড়ে যায়নি, এখনও গছে আছে। জল-পড়া নিয়ে বৌমার সামনে আসে ওঝা, পড়াজলের দিকে তাকিয়ে সে কি কাণ্ড বৌমার!

সন্ধ্যা থেকে পুনরায় সুরু হয় ছাড়ানো। এবার ব্যাপার আরও চমকপ্রদ, ভয়াবহ। ভূতে ওঝায় যেন যুদ্ধ বাধে। আগেই বলেছি—শিক্ষানবীশ অবস্থায় আত্মহত্যা করে বলে ভূত হয়েছে ছেলেটি। শিক্ষা তার সম্পূর্ণ হয়নি, কাজেই শেষ পর্যন্ত ওঝার কাছে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

রাত বারটার সময় জুতা মুখে তুলে নেওয়ায় সে কি কায়দা! বাড়ীশুদ্ধ লোকের ভীতি উৎপাদন করে বাতাসের আগে উড়ে চলেন বৌমা, নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছাড় খেয়ে পড়েন। পূর্ব অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি। ভূত ছেড়ে যাওয়ার পরক্ষণেই স্বাভাবিক অবস্থা আসে ফিরে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অলৌকিক ব্যাপার অস্বীকার করিনা। যাঁরা পড়বেন এ আখ্যায়িকা—তাঁরা বলবেন আজগবী গল্প, আমি বলবো গল্প হলেও আমার লেখা প্রতিটি কথা সত্যি।

ভাববার কথা, ভূতগ্রস্ত না হ'লে নূতন-বৌ বুদ্ধিমতী, লজ্জাশীলা—এরূপ নিলজ্জ আচরণ কখনই করতে পারেন না, হাসি, কথার ভঙ্গিমা এরূপ অস্বাভাবিক হতে পারে না। তিনি যে সব কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি এবং লেখাপড়া অর্থাৎ শিক্ষার মাত্রায় কুলায় না।

চৈনিক আক্রমণে ভারতের অবশ্যম্ভাবী জয়ের সম্বন্ধে আলোচনা

উপাধ্যায়

২০শে অক্টোবর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ ভোর পাঁচটা একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক লগ্ন। আগত ও অনাগত কালের কাছে অবিস্মরণীয়। মহাভারতের ঐক্যবদ্ধ নব-জাতীয়তাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের গৌরবময় শৌর্য্যমণ্ডিত নব অধ্যায়ের সূচনা। বিশ্বশান্তির পূজারী বিশ্বপ্রেমের উদ্‌গাতা অহিংসপন্থী ভারত। তার বিশ্বাসঘাতক চৈনিক বন্ধুর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নগ্ন বর্বর আক্রমণে ভারতের শৈলশৃঙ্গ রক্তস্নাত। পঞ্চশীল চুক্তি, বান্দুং সম্মেলন, হিন্দী চীনি ভাই ভাই আওয়াজ সব ব্যর্থ। চীনের সমাধিক্ষেত্র, আর তার গৌরবের সমাধিক্ষেত্র রচনার দিন আসন্ন!

এ সব ঘটবে দুবছর আগেই একাধিকবার আলোচনা করে জানিয়ে দিয়েছি, গ্রহ বৈগুণ্যের ফলে কোথায় ভারত এসে দাঁড়াবে, সঙ্কট দুর্য্যোগময় পরিস্থিতি কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, পঞ্চম বাহিনীর কার্য্য-কলাপ কিরূপ হবে, তাও ব্যক্ত করেছি—আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকার নিয়মিত পাঠকপাঠিকাদের কাছে অবিদিত নয়। বর্ষফলাফল অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কালসর্প যোগ প্রসঙ্গে গণনার মাধ্যমে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছি স্বদেশের ভীষণ বিপন্নতা, সহস্র দুর্ভোগ, পঞ্চম বাহিনীর সক্রিয়তা ও কমিউনিষ্টদের গৃহভেদী অন্তর্ঘাতী নীতির কথা, একে একে সেগুলি প্রত্যক্ষ হোতে আরম্ভ করেছে।

ভারতের ভাগ্যাকাশে কালসর্প-যোগ ধূমকেতুর মত উদিত হয়েছে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে থেকে, এর অস্তগমন হবে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই সময়টী শুধু ভারতের পক্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বহু অমঙ্গলসূচক দুর্দৈব ঘটনার সংগঠক। একথাও বহু পূর্বে বলেছি। সমগ্র বিশ্ব রণাচ্ছন্ন হবে, রাসেলের আবেদন নিবেদন কোন কুগ্রহকে প্রশমিত করতে পারবে না। তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের জন্ম-দিনের সূচনা নিয়ে আসন্নপ্রসবা ধরিত্রী কাতর। যতই বিরুদ্ধ আলোচনা হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবী। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থাবলম্বনে রাষ্ট্রজ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে তা প্রতিপন্ন হয়। জ্যোতিষ গণনার দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে—দেশে এখনও জয়চাঁদ মীরজাফরের দল গোপনে গোপনে পঞ্চমবাহিনীর কর্ম্মভার নিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষতি কর্‌তে উদ্যত, তাদের আত্মগোপনতা আরও সাংঘাতিক—এর সক্রিয়তা আসাম ও বাংলার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা মুখে বলে এক—আর কাজে দেখায় অন্য, তারা জাতির কলঙ্ক।

কমিউনিষ্ট-শাসিত চীন সাধারণতন্ত্রের জন্মকুণ্ডলী থেকে জানা যায় যে তার মঙ্গলের দশা সুরু হয়েছে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে, এর অবস্থিতি কাল ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। অশ্লেষা নক্ষত্রে মঙ্গল অবস্থিত, আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর জন্মনক্ষত্র অশ্লেষা। যে সময়ে চৈনিক সাধারণতন্ত্রের চন্দ্রের দশা, সে সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাশির সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছিল চন্দ্র যার

ফলে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্যে তার পক্ষে তিব্বতের আধিপত্য পাওয়া এবং তিব্বতে ভারতের সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধাস্বচ্ছন্দতা ব্যাহত করেও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। চন্দ্রের দশায় চীনের সহিত ভারতের মৈত্রী সম্বন্ধ ঘনীভূত হয়। চৈনিক সাধারণ-তন্ত্রের মঙ্গলের দশা পড়ার পরই চীনের ভারত আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে চীনের রাহুর দশা পড়বে। সে সময়ে তার অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠবে। চীনের পূর্ব্বপরিকল্পিত আক্রমণের সুদীর্ঘ প্রসারিত উদ্দেশ্য এই যে, শুধু ভারতভূমি গ্রাসই নয়, সমগ্র এশিয়ার উপর একাধিপত্য বিস্তার এবং রাশিয়া ও আমেরিকাকে এর মধ্যে টেনে এনে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালগ্ন খুব জোরালো, এজন্যে ভারতভূমি গ্রাস করা তার পক্ষে অসম্ভব, আকাশ-কুসুম মাত্র। পৃথিবীর বিশ্বশান্তিভঙ্গের সময় এসে গেছে। কিউবার প্রাসঙ্গিক ঘটনাপ্রবাহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের দুঃখদুর্য্যোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে যুদ্ধের চাপা উত্তেজনাকে প্রদমিত করা যাবে না, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ চলবে। তবে পৃথিবীর ধ্বংস হবেনা, আর মনুষ্য জাতিরও বিলোপসাধন হবেনা। ১৯৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশাল ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটবে সমগ্র বিশ্বের উপর। আমাদের ইতিহাসে তা ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের মত হয়ে উঠবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল। তার স্বাধীনতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবেনা। তার জোয়ানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরদের মত সমাদৃত হবে। চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। রাশিয়া চীনের পক্ষে থেকে যাবে। ভারত-চীন সংঘর্ষ ও ভারতে চৈনিক অনুপ্রবেশ থেকেই রাশিয়া ও মার্কিণ শক্তি শিবিরের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হবে। ভারতের বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমাদের অন্যতম মিত্র রাশিয়ার কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে না। ভারতের দুর্দ্দিনে মার্কিনশক্তি অকৃত্রিম বন্ধুর মত ভারতের সঙ্গে কাজ করে যাবে. রাশিয়ার সহযোগ আশা বৃথা। ভারতেয় সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক মৈত্র্য থাক্‌লেও পরে তা বিচ্ছিন্ন হবে।

চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রগাঢ় মৈত্রী হোতে পাকিস্তানের কবর ক্ষেত্র রচিত হবে। ভবিষ্যতে জাতি হিসাবে তার অস্তিত্ব লোপ হবে। চীনের সহিত ভারতের সংঘর্ষ সহজে মিটবে না. অন্ততঃ চার পাঁচ বছর ধরে চল্‌বে। আগামী ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি, তারপর সুরু হবে সাংঘাতিকভাবে চৈনিক আক্রমণ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীর জওয়ানদের জীবন-মরণ পণ করে শত্রু সৈন্যবাহিনীকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা। অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে প্রচুর রণ-সম্ভার ও সৈন্য বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হোতে হবে। এসময়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে সমূহ বিপদ।

মেষলগ্ন

(দ্বাদশভাবে বুধের অবস্থান হেতু ফলাফল
ভৃগুসংহিতানুসারে)

মেষলগ্নে বুধ থাকলে সম্মানপ্রাপ্তি, দৈহিক শক্তি ও উত্তেজনার প্রাচুর্য্য, বুদ্ধির স্ফুরণ, ভ্রাতাভগ্নীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি, মাতামহের প্রভাব, নানা বাধাবিপত্তি অপসারণের ক্ষমতা লাভ,সৎসাহসের সহিত কর্ম্মসিদ্ধি, চাতুর্য্য, দাম্পত্য-শক্তি অর্জ্জন, পারিবারিক ক্ষেত্রে আধিপত্য, পরিশ্রমের মাধ্যমে পেশার উন্নতি। দ্বিতীয়ে বৃষে বুধের অবস্থিতি হোলে পরিশ্রমের দ্বারা ধনবৃদ্ধি, উৎসাহ ও বুদ্ধিলাভ, ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহলাভ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব। বিশেষভাবে অর্থোপার্জ্জনে আত্মমগ্নতা সম্মানলাভ। তৃতীয় স্থান মিথুনে বুধ থাক্‌লে বহু উত্তম কার্য্যে দক্ষতা প্রকাশ, উৎসাহবৃদ্ধি, ভ্রাতাভগ্নীর দাক্ষিণ্যলাভ, বাধাবিঘ্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে ভাগ্যোন্নতি—পরিশ্রমের সঙ্গে কর্ম্ম করার দরুন। মাতামহ পরিবারের সহৃদয়তায় উন্নতির সূচনা, প্রভাব প্রতিপত্তি, শত্রুর আনুগত্য লাভ। কর্কটে চতুর্থস্থানে বুধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যদাতা, পরিশ্রমের দ্বারা পারি-বারিক অবস্থার উন্নতি, ভ্রাতা ভগ্নীর সাহচর্য্যলাভ, মাতামহ পরিবারের আনুকূল্য, মাতার কিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যা প্রবণতা, মাতার সঙ্গে সদ্ভাবের অভাব, ভূসম্পত্তির গোলযোগ, সুখ লাভের প্রত্যাশায় মনশ্চাঞ্চল্য, শত্রুভয়ে ভীতনা হয়ে

কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রগমন, বৃত্তি বা পেশা থেকে লাভ, সমাজ ও রাষ্ট্র চালকদের কাছ থেকে সম্মান প্রাপ্তি, পিতৃস্থানের শক্তি লাভ, বুদ্ধিবলে উন্নতি। পঞ্চমে সিংহে বুধ থাকলে বুদ্ধির বৃদ্ধি, চতুরতার সহিত আলাপ আলোচনা, সন্তানস্থান সুখকর, কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যার্জ্জন, বুদ্ধি বলে শত্রু-দমনে পারদর্শিতা, বুদ্ধিজীবী হ'য়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনে অক্ষমতা, মনোবলের দ্বারা বহুমুখী কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ। কন্যার ষষ্ঠস্থানে বুধ জাতককে বুদ্ধিমান, কর্ম্মকুশল, ভ্রাতার শত্রুতায় বা বিরুদ্ধতায় বিব্রত, ব্যয় সম্পর্কে অসতর্ক, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মুরুব্বি পেয়ে হৃষ্ট। জাতক অত্যন্ত পরিশ্রমী, সাহসী ও শৌর্য সম্পন্ন হয়। সপ্তমে তুলায় বুধ থাকলে যথেষ্ট পরিশ্রমের দ্বারা অবস্থার উন্নতি করতে হয়, ভ্রাতা ভগ্নীর দ্বারা লাঞ্ছনা ভোগ, রাষ্ট্র ও সমাজে খ্যাতিপ্রতিপত্তি, যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি, একনিষ্ঠ দাম্পত্য জীবনের অভাব, পারিবারিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি। বৃশ্চিকে অষ্টমে বুধ থাকলে শক্তি সামর্থ্য ও উৎসাহের অভাব, ভ্রাতা ভগ্নীদের সুখ স্বচ্ছন্দতা হানি, অর্থোপার্জ্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম, উদরঘটিত পীড়া, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে দুশ্চিন্তা। ধনুতে নবম গ্রহে বুধ থাকলে পরিশ্রম ও উৎসাহের মাধ্যমে সাফল্য, যশ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ, ভাগ্যোন্নতির পথে কিছু কিছু বাধাপ্রাপ্তি, ভ্রাতা ভগ্নীর ক্ষমতা লাভ, ভাগ্যোন্নতির পথে যথোপযুক্ত ভালমন্দ বিচারে অগ্রাহ্যতা, চাপা চাতুর্য্য ও সাহস। দশমস্থানে মকরে বুধ থাকলে ভ্রাতাভগ্নীসুখ ও ক্ষমতা, পিতৃগৃহে আধিপত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তি, পিতার সহিত মনোমালিন্য এবং বিচ্ছেদ, মাতৃ শত্রুতা। একাদশে কুম্ভে বুধ ভ্রাতাভগ্নীদাতা, উৎসাহের সহিত অর্থোপার্জন, আয় বৃদ্ধি, শত্রুজয়, আয়বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমহেতু বিদ্যোপার্জ্জন, সুবক্তা, ও চতুর। দ্বাদশে মীনে বুধ থাকলে ভ্রাতা ভগ্নীর পক্ষে অশুভ ঘটনা, মাতুলালয়ে প্রীতির অভাব, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ব্যয়াধিক্য, কোন রকমে ও অতিকষ্টে ব্যয় সঙ্কোচ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে উত্তম। অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে মধ্যম। ভরণীজাতগণের পক্ষে অধম। দ্বিতীয়ার্দ্ধটীতে ভালো ফল। নানাভাবে শারীরিক কষ্ট। জ্বর, উদরের বিশৃঙ্খলতা, গুহ্যদেশে পীড়া। সন্তানের দিকে দৃষ্টি নেওয়া দরকার। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। প্রতারণায় ক্ষতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে টাকাকড়ির ব্যাপারে অনেকের সঙ্গে কলহবিবাদ। বাড়ীওয়ালা, ভূস্বামী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি বিশেষ অনুকূল নয়। প্রথমার্দ্ধে চাকরির ক্ষেত্রে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি, উপরওয়ালার সহিত মনোমালিন্য ও মতভেদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সময় উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য, সুখকর-ভ্রমণ, নবদম্পতির সুখাতিশয্য, সামাজিক ব্যাপার অপ্রীতিকর, পারিবারিক ঐক্য ও শান্তি। চারুকলা, শিল্প, সঙ্গীত, মঞ্চ ও ছায়া-ছবিতে নিযুক্ত নারীর পক্ষে অশুভ। গৃহাভ্যন্তরে সংস্কারে উন্নতি। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা ও মৃগশিরা নক্ষত্রাশ্রিত জাতগণের পক্ষে উত্তম। রোহিণীজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি। উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি। গুহ্য ও উদর প্রদেশে পীড়া। রক্তের চাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানদের স্বাস্থ্যহানি। পারিবারিক সামান্য কলহাদি। আর্থিক সন্তোষজনক। ব্যয়বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। চাকুরির ক্ষেত্র মোটের উপর মন্দ নয়, তবে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়, যদিও অবৈধ প্রণয়েও সামাজিক ব্যাপারে আশাতীত সাফল্য। কারণ ঘটনা-বহুল। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম। আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু জাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। মানসিক উদ্বিগ্নতা। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ। লাভ বৃদ্ধি। ধনী

ব্যক্তির সাহচর্য্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরীর ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ অনুকূল। অবৈধ প্রণয়েও রোমান্টিক ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য। চারুশিল্পকলা, সঙ্গীত মঞ্চ ও ছায়াছবিতে নিযুক্ত নারীর সবচেয়ে ভালো সময়। জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

পুষ্যাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। অশ্লেষার পক্ষে অধম। শরীর চলনসই। বায়ুপিত্ত প্রকোপ। গৃহে দুর্ঘটনার আশঙ্কা, ভ্রমণকালেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য কলহাদি। আর্থিক ক্ষেত্র মন্দ নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরির স্থলে নানাপ্রকার অশান্তি, বাধাবিঘ্ন ও উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি উত্তম। অবৈধপ্রণয়ে সাফল্য। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিস্থিতি। মঞ্চ ও ছায়াভিনেত্রীর বিশেষ শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম। মঘাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। রক্তদুষ্টি, পিত্তপ্রকোপ, যকৃৎদোষ প্রভৃতি হেতু স্বাস্থ্যের অবনতি। তীক্ষ্ণ অস্ত্র অথবা বিষাক্ত পদার্থ এমন কি অগ্নি ভয়। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। স্পেকুলেশনে কিছু প্রাপ্তি যোগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। চাকুরীর ক্ষেত্র শুভ, উন্নতি যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ, অনুকূল পরিস্থিতি। স্ত্রী লোকের পক্ষে মাসটী ঔদাস্যপূর্ণ। কোন কাজেই সুবিধা নেই। ফলে পারিবারিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হওয়া ভালো। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যা রাশি

চিত্রা ও উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বোত্তম। হস্তাজাতকের ফল নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যোন্নতি। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য সংযোগ। আর্থিক ক্ষেত্র বিশেষ শুভ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ, পদোন্নতিযোগ। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সাফল্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে খুব ভালো সময়। সর্ব্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়ে সুযোগ ও প্রীতিজনক পরিস্থিতি। রোমান্স অনুকূল। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পসার প্রতিপত্তি। নৃত্যগীত অভিনয় কুশলী নারীর সুবর্ণসুযোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর উত্তম সময়।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতকের উত্তম সময়। স্বাতী ও বিশাখা জাতকের কষ্টভোগ। দৈহিক স্বাস্থ্য হানি না হোলেও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি। উদ্বেগ, অশান্তি, আশাভঙ্গ এবং সুখ স্বচ্ছন্দতার অভাব। স্বজন বন্ধু বিরোধ। পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হবে না। আর্থিক অবস্থা শুভ। স্পেকুলেশনে কিছু লাভ। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর মধ্যম সময়। চাকুরির ক্ষেত্রে আশাপ্রদ আবহাওয়া। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। অবিবাহিতাদের বিবাহের যোগাযোগ, বিবাহিতাদের গর্ভবতী বা সন্তান প্রসবের যোগ। সামাজিক প্রতিষ্ঠা। অবৈধ প্রণয়ে নানাভাবে লাভ। গৃহিণীদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি। মঞ্চ ও ছায়াছবির অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তা ও আয়বৃদ্ধি। ছাত্রীর পক্ষে বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা নক্ষত্র জাত ব্যক্তির উত্তম সময়, বিশাখার মধ্যম, জ্যেষ্ঠা জাতকের নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্য হানি, যে কোন অসুখ হোতে পারে। উদর, বক্ষ, ফুস্‌ফুস ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে রোগাধিকার। অর্থক্ষতি, আয়ের পথ অপ্রশস্ত। ব্যায়াধিক্য। জামিন হোলে বিপত্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সুবিধা জনক নয়। চাকুরির ক্ষেত্র ভালো বলা যায় না। অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ ও আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি এক

ভাবেই যাবে। কোনরূপ অসমসাহসিকতা প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। পর পুরুষের সঙ্গে মেলা মেশায় সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক কাজে থাকাই ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম, মূলার পক্ষে মধ্যম, পূর্ব্বাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা নেই। ভ্রমণ জনিত ক্লান্তি ও অবসাদ। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। ধারালো অস্ত্রে শরীরের কোন অংশ কেটে যেতে পারে। পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা ও ঐক্য। দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত কাজে গাফিলতি। কিছু লাভ। স্পেকুনেশান বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়। চাকুরির স্থান শুভ। উন্নতির যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে একভাবেই যাবে। এ মাসটি স্ত্রীলোকের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নয়। অবৈধ প্রণয়, কোর্টসিপ, নূতন বন্ধুত্ব, পর পুরুষের সাহচর্য্য বা সঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে কোন লাভ ক্ষতি ঘটবে না। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একঘেয়ে ভাব থাকবে। চারু কলা শিল্প সঙ্গীত নৃত্য মঞ্চ ও ছায়াছবি প্রভৃতিতে যে সব নারী জীবিকা অর্জ্জন করেন তাঁদের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষেও অনুরূপ, শ্রবণা জাতগণের পক্ষে অধম। অস্ত্রাঘাত, রক্তপাত বা রক্তশূন্যতা প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক ক্ষেত্র ভালোই যাবে। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। চাকুরীজীবীর পক্ষে শুভ উন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর অবস্থার উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিশেষতঃ যারা কর্ম্মী ও বৃত্তিজীবী তাদের সন্তোষজনক পরিস্থিতি। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ, গৃহিনীদের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি। অবৈধপ্রণয়িনীর আশাতীত সাফল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যহানির যোগ। পারিবারিক কলহ, স্বজন বন্ধু বিরোধ, সহজে অর্থাগম, সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়। লাভক্ষতির মাস। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে সময়টী ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি বিশেষ ভালো বলা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। সর্ব্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। পুরুষের ভালোবাসা ও সঙ্গ সুখ লাভ। অবৈধপ্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি। শিল্পী ও অভিনেত্রীবৃন্দের উত্তম সময়। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাতকের বিশেষ উত্তম সময়, পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের মধ্যম এবং রেবতীর পক্ষে নিকৃষ্টফল। স্বাস্থ্যের অবনতি যোগ নেই। সন্তানাদির পীড়া। আর্থিক উন্নতি যোগ। অনাদায়ী অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিষয় সম্পত্তি ও অনাদায়ী অর্থ প্রভৃতির জন্য মামলা মোকদ্দমা করলে জয় অনিবার্য্য। স্পেকুলেশনে সাফল্য লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়। বেকার ব্যক্তির এবং ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি ভালো সময়। স্বার্থসিদ্ধির যোগ। গৃহকর্ত্রীদেরই উল্লেখ যোগ্য সময়। সামাজিক ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমানদের পক্ষে আশানুরূপ নয়। অবৈধ প্রণয়ে আশাভঙ্গ। প্রণয়ের ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

অংশীর সাহায্যে অর্থাগম। স্ত্রীপুত্রের বিষয়ে অশান্তি। বাড়ীর মধ্যে বিবাদবিসংবাদ বা বাড়ী নিয়ে বিবাদবিসংবাদ। মামলা মোকদ্দমায় পরাজয়। বিশৃঙ্খল আবেষ্টন। ভাগ্যবৃদ্ধি, কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। আইনজীবীর প্রতিষ্ঠা। মনোকষ্ট ও উদ্বেগ। শত্রুর ষড়যন্ত্রে বিপন্নতা। আয়বৃদ্ধি হলেও ব্যয়াধিক্য। প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য উদ্বেগ।

স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃষ লগ্ন

ধনভাব শুভ। ভাগ্যভাব উত্তম। বন্ধুভাব শুভ। ব্যবহারে রুক্ষতা ও তেজস্বিতা। বায়ু রোগ। প্রবল যৌন আকর্ষণ। শিল্প, কলা, কাব্য ও সাহিত্যের দিকে আকর্ষণ। পিতৃপক্ষ থেকে দুঃখ। মনোকষ্ট। চাকুরির স্থল ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ! বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন লগ্ন

ভাগ্যোন্নতি। কর্ম্মোন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা। সন্তানের লেখা পড়ায় উন্নতি। সাহসিক কাজ, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি থেকে অর্থাগম। নিজের জন্য ব্যয়। যৌনপ্রেম ব্যাপারে কিছু দুঃখ। অবৈধ প্রেম ও তার জন্য অশান্তি। ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ। অংশীর সহযোগিতায় উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কট লগ্ন

স্বাস্থ্যহানি। কোন রকম আঘাতাদি লাগতে পারে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন। শিরঃপীড়া বা চক্ষু পীড়ার প্রবণতা। পিতৃ পক্ষ থেকে শত্রুতা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

সিংহ লগ্ন

পিত্তাধিক্য হেতু পীড়া। গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি যোগ। সম্পত্তি ক্রয়, মিত্র লাভ, সন্তানের লেখা পড়ায় উন্নতি। পিতার বিশেষ পীড়া। বিবাদে জয়। দাম্পত্য প্রণয়। সৌভাগ্য বৃদ্ধিও উন্নতি লাভ। নানা রকমে অপব্যয়। দুর্ঘটনার ভয়, কর্ম্মস্থানে অশান্তি। সঞ্চয়ে বাধা, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যালগ্ন—

গুপ্তশত্রুবৃদ্ধির আশঙ্কা। দাম্পত্য প্রণয়, ভাগ্যোন্নতির যোগ। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি। অপরের সাহচর্য্যে অর্থাগম। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন—

ব্যবসায়ে দক্ষতা ও লাভ। অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। যৌন প্রেমে একনিষ্ঠতার অভাব। কর্ম্মস্থান নিতান্ত মন্দ নয়। গুপ্তশত্রু। মাতৃপীড়া। ভাইবোনের সঙ্গে মনোমালিন্য বা বিচ্ছেদ। ভ্রমণ। সংযমের অভাবের জন্য দুঃখভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিক লগ্ন

সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা। সাংসারিক ব্যাপারে সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। বন্ধুভাব শুভ। দাম্পত্য প্রণয় যোগ। পত্নীর শারীরিক অবস্থা শুভ। নিজের কৃতিত্বে সাফল্য। অর্থলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনুলগ্ন—

স্বাস্থ্যোন্নতি। সন্তানের জন্য চিন্তা, আর্থিক ব্যাপারে স্ত্রীর বা অংশীর সঙ্গে বিরোধ। অল্পবয়স্ক বন্ধুর দ্বারা সাহায্য। ভ্রমণে শারীরিক কষ্ট। ব্যয়কুণ্ঠা। আত্মীয় স্বজনের দিক থেকে কোন রকম লাভ। নানা রকম ঝঞ্ঝাট। ভূসম্পত্তির ব্যাপারে বিবাদ বিসংবাদ। অপরের সাহচর্য্যে আর্থিক লাভ, মিত্রলাভ। ভাগ্যোন্নতির আশা। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

মকরলগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতার জন্য ধনক্ষয়। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ। পদোন্নতি যোগ, মিত্রের সাহায্যে উপকারের আশা। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। মানসিক অশান্তি। স্ত্রীর জীবন সংশয়। দাম্পত্য প্রণয়ভঙ্গ, নানা দুর্ব্বিপাকের দরুণ ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা,মানসিক স্বচ্ছন্দতা ও ধনাগম যোগ। সহোদয় ভাব শুভ। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি। ভাগ্যোন্নতি ও কর্ম্মোন্নতি। সন্তানভাব শুভ। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। বিদেশ ভ্রমণ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মীনলগ্ন—

আকস্মিক আঘাত, রক্তপাত, পাকযন্ত্রের পীড়া, প্রদাহ জনিত পীড়া। স্বাস্থ্যের অবনতি। স্ত্রীর সহিত মতানৈক্য। সন্তানাদির বিবাহের আলোচনা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যয় বৃদ্ধি। শিল্প সাহিত্য চর্চ্চায় বাধা প্রাপ্তি। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

পদাবলী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

নবদ্বীপে প্রেমধারা নেমে এল
ভাবে ভোলা শ্রীহরির চোখে
কোটি-কণ্ঠে গুঞ্জরিত কত গান
শুনেছে তা লক্ষ লক্ষ লোকে।
যুগে যুগে যুগান্তরে গানে গানে
যত ছিল উত্তাল আকুতি
তারা দিল গৌরাঙ্গের প্রেমযজ্ঞে—
মধু মন্ত্রে প্রাণের আহুতি।
যমুনার কালো জলে আজো দেখা
যায় কার জলভরা আঁখি
বাংলার অভাজন হল কত মহাজন
সেই জল চাখি।

বিরহিনী শ্রীরাধার নীল চোখে
ঝরেছিল অফুরন্ত বারি
লবণাক্ত নীল সিন্ধু নীলাচলে
সাক্ষ্য দেয় তারি।
হিয়া-নিঙড়ানো গান শত শত
ঝর্ণা হয়ে এল নীলাম্বুতে
শ্রীগৌরাঙ্গ পদপ্রান্তে প্রত্যেকের
প্রেমসিক্ত প্রাণাঞ্জলি থুতে
সমুদ্রের লোনা জল নয় ওরা,
নয় ওরা শুধু পদাবলী
প্রেমিকের অশ্রু দিয়ে রচা ওরা
শ্রীহরির চির প্রেমস্থলী।

প্যাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

।। জাগো বাঙ্গালী ।।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস—তার প্রথম সভাপতি বাঙ্গালী; স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মন্ত্র "বন্দে মাতরম"—তার স্রষ্টা বাঙ্গালী; স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও সৃষ্টি করেছেন বাঙ্গালী; স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম 'বলি'—বাঙ্গালী;—আর ভারতীয় চিত্র-শিল্পের জন্মও হয় এই বাঙ্গলা দেশেই। অতএব যে বাঙ্গলা সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে অগ্রণী—সেই বাঙ্গলা কি আজ ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার কাজে সকলের পশ্চাতে অবস্থান করবে? কখনই নয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আহ্বানে বাঙ্গলা দেশের আবালবৃদ্ধ জনসাধারণের যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া—তাদের রক্তদান, অর্থদান ও স্বর্ণদানের মাধ্যমে—সমস্ত জাতির মধ্যে এক অভিনব প্রেরণার সৃষ্টি করেছে, তা ভারতেরই শুধু নয়, বিশ্বের সমুদয় প্রজাসমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির কাছে এক আদর্শ দৃষ্টান্তের উপযোগী। এই পরিস্থিতিতে চিত্র জগতেরও মহান কর্তব্য রয়েছে,—এবং বাঙ্গলার চিত্রজগৎ অবশ্যই তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হবে—এইই আমরা আশা করি। আমরা মনে করি কম্যানিষ্ট চীনের অন্যায়ভাবে অকস্মাৎ ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত-সমস্যার ওপর যথাযথভাবে আলোক-সম্পাত এবং দেশবাসীর মনে প্রকৃত দেশাত্মবোধের জাগরণের লক্ষ্য নিয়ে অনতিবিলম্বে বাঙ্গলা-চিত্রজগতের যথোপযুক্ত প্রামাণিক চিত্র ও জওয়ান বীরত্ব সমুজ্জল সত্য ঘটনা সম্বলিত কাহিনী-চিত্র নির্মাণের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রতিরক্ষা তহবিলে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও শিল্পপতিদের এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য দান—

দিলীপকুমার ৫০,০০০ টাকা, শঙ্কর জয়কিষণ ৫০,০০০ টাকা, রাজকাপূর ৫০,০০০ টাকা, বৈজয়ন্তীমালা ২৫,০০০ টাকা, জেমিনি গণেশন ২৫,০০০ টাকা, শাস্তি কাপূর ২৫,০০০ টাকা, সাবিত্রী (দক্ষিণ ভারত) ২৫,০০০ টাকা, গুরু দত্ত ২০,০০০ টাকা, দেব আনন্দ ২০,০০০ টাকা, আশা পারেখ ১০,০০০ টাকা, বি সরোজা দেবী ১০,০০০ টাকা, শিব দাসানি ১০,০০০ টাকা এবং নন্দা ১০,০০০ টাকা। দক্ষিণ ভারতের শিল্পী এম. জি. রামচন্দ্রন মোট ১,০০,০০০ টাকা দান করেছেন।

শিল্পপতিদিগের মধ্যে শ্রীএস. এস. ভাসান, ও তাঁর সংস্থা এবং শ্রী এ. ভি. মায়াপ্পান যথাক্রমে এক লক্ষ ও পঞ্চান্ন হাজার টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছেন।

গত ৩রা নভেম্বর 'সেতু' নাটকের ৭০০তম অভিনয় উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপা রঙ্গশালার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার নগদ ৭০০৲ টাকা ও সাতভরি সোনা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেন। এ-ছাড়াও ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় আয়োজিত 'সেতু'র এক বিশেষ প্রদর্শনীতে বিক্রয় লব্ধ সমুদয় অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হয়েছে বলে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন।

শ্রীমতী কানন দেবী, সুনন্দা বন্দোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, প্রভৃতি মহিলাশিল্পীগণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাতে প্রতিরক্ষার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার দান করেছেন।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা অলঙ্কার ও অর্থ প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন্য দান করেছেন; কিন্তু স্থানাভাবে তাঁদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

চিত্রজগতের শুভ প্রয়াস :—

সীমান্তে যুদ্ধরত জওয়ানদের সেবায় রক্তদান ও প্রতি-রক্ষা তহবিলে অর্থ ও স্বর্ণদানের আদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান ডকুমেণ্টারী প্রোডিউসার্স

অ্যাসোসিয়েসন—এর কর্ণধারগণ মাত্র সাতদিনের মধ্যে অল্প-দৈর্ঘ্যের পাচটি চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই চিত্রগুলি নির্মাণের জন্য কোনো শিল্পী, কলা-কুশলী বা ষ্টুডিওর মালিকগণ কোনোরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন না। ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এই চিত্রগুলি ভারতের সর্বত্র অব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বি-আর-ফিল্মস ঃ—

বোম্বই-এর বি-আর-ভিল্মস-এর কর্তৃপক্ষ চীনাদের ভারত আক্রমণ ও তথায় ভারতীয় জওয়ানদের মরণপণ সংগ্রামের ভিত্তিতে একটি চিত্র নির্মাণ করছেন। সাহির লুধিয়ানভি রচিত একটি সংগীতের দৃশ্যরূপ হিসাবে এই চিত্রটি নির্মিত হবে। চিত্রটির দৈর্ঘ্য হবে দু'হাজার ফুট এবং নাম হবে "পহেলা সিপাহী"।

ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন ঃ—

বোম্বাই-এর চলচ্চিত্র শিল্পের সমুদয় শিল্পী-কলা-কুশলী ও কর্মীগণ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী হওয়ায় ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন ৫২টি অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এই চিত্রগুলি ফিল্মডিভিসন-এর মাধ্যমে সমগ্র ভারতে প্রদর্শিত হবে। সব চিত্রগুলিই দেশাত্মবোধক গান সহযোগে নির্মিত হবে। গত ২রা নভেম্বর মেহবুব্ ষ্টুডিয়োয় উক্ত সংস্থার পরিকল্পিত প্রথম ছবিটির কাজ আরম্ভ হয়েছে। দিলীপকুমার এই চিত্র অভিনয় করছেন—তাঁকে দেশাত্মবোধক গান গাইতে দেখা যাবে। খয়াম স্বরসৃষ্টি করবেন এবং মহম্মদ রফি এই চিত্রে কণ্ঠদান করবেন।

'সাতপাকে বাঁধা' চিত্রের বহির্দৃশ্যে

বিমল দে

সর্বাধ্যক্ষ, আর, ডি, বি, এণ্ড কোঃ

'সাত পাকে বাঁধা' ছবির বর্হিদৃশ্য গ্রহণের ইতিহাস লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে চিতোরের শেঠজী উদয়পুরের মহারাণার সেক্রেটারীদ্বয় চন্দন সিংজী, ও নারায়ণ সিং জী, টুরিষ্ট গাইড অফিসের যশমন্ত সিংজী, উদয়পুর সিটি রেল ষ্টেশনের মিঃ পাণ্ডে, দিল্লীর রায়জাদা মনমোহন লালের কথা। এঁদের নাম প্রথমেই উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। কলকাতা থেকে ১৫০০ মাইল দূরে এই দুর্গম স্থানের বহির্দৃশ্য গ্রহণ এঁদের সাহায্য ছাড়া সম্ভবপর হ'ত-না। শুধু সাহায্য নয়, এদের ব্যবহারে মনে হয়েছে 'স্যুটিং সুষ্ঠভাবে শেষ করার দায়িত্ব যেন আমাদের চেয়ে ওদেরই বেশী। ওদের মাঝে দেখেছি রাজপুতদের সরল বলিষ্ঠ আতিথেয়তা, বলিষ্ঠ চরিত্র। সর্বোপরি আনন্দে মন ভরে গেছে, যখন ওদের মুখে শুনেছি বাঙালীর সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধের গুণগান। উদয়পুরের মহারাণার প্রধান সেক্রেটারি চন্দন সিংজী বলেছেন,—"বাঙালীরা ভাবপ্রবণ, তারা ভাল ছবি তৈরি করে। আপনাদের ইতিহাসের উপর শ্রদ্ধা আছে, আপনারা ইতিহাসকে বিকৃত করবেন না। একজন বাঙালীর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল যার কাছ থেকে রাজস্থানের এই উদয়পুরের ইতিহাস আমি শুনেছি। উদয়পুরের ইতিহাস আমি যা না জানি, তিনি তা জানেন! এই 'পিচোলা' লেকে ছবি তুলতে বম্বে থেকে অনেকে এসেছেন। তারা নায়কনায়িকাকে সঙ্গে বসিয়ে প্রেমের গান গাইয়েছেন। এখানে ছবি তুলতে এসে এসব করা উচিত নয়। 'পিচোলা' লেকের ইতিহাস প্রেমের গানের ইতিহাস নয়, অনেক অশ্রু এতে মিশে আছে। আর ঐ জনমন্দির, কজন জানে সম্রাট সাজাহান প্রিন্স খুরম হিসাবে যখন এখানে উদয় পুরের রাণার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তখন এই প্রাসাদের স্থাপত্য শিল্প থেকেই তিনি বিশ্ববিশ্রুত তাজমহলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আমার বিশ্বাস

"সাত পাকে বাঁধা" চিত্রের রাজস্থানে গৃহীত বহির্দৃশ্যে বিভিন্ন পরিবেশে পরিচালক অজয় কর ও সুচিত্রা সেন।

আছে আপনারা ইতিহাসকে রক্ষা করবেন।' আরও অনেক কথা তিনি বলেছিলেন। বাঙালী হিসেবে সেদিন আমার মন গর্বে ভরে উঠেছিল।

রাজস্থানের 'আউটডোর' সুটিংএ বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বদলে গেছে। পাহাড়, লেক, উষর আধা-মরু, গড়প্রাসাদ আর ময়ূরময়ূরীর লীলা-ক্ষেত্র এই রাজস্থান। ভারত ইতিহাসের পীঠস্থান চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর, অম্বর, যোধপুর জয়শীলমীরের রাজস্থান। আর চিতোর? হামির, চণ্ড, কুম্ভ, শঙ্খ, ভীম সিংহ প্রভৃতির মাতৃভূমি এই চিতোর। রাণী পদ্মিনী, পান্না আর রাণা প্রতাপের লীলাভূমি এই চিতোর।

চিতোরেই আমাদের প্রধান সুটিং। ইতিহাসের এই পবিত্রধ্বংসস্তূপে, শৌর্যবীর্যের এই পীঠস্থানে এসে আমরা সবাই—পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলী সাহায্যকারী সবাই যেন এক হয়ে গেলাম। আমরা যেন কলকাতার লোক নই, কি এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ ছিল এই ধ্বংসস্তূপের মাঝে জানিনা। প্রতিটি লোকের মাঝেই একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি।

অজয়কর: গম্ভীর, অন্যমনা, খুঁতখুতে অজয় করের কি হল? তিনি এখানে হয়ে উঠেছেন চঞ্চল, হাসিখুসী, প্রগলভ; আশ্চর্য হয়েছি, যখন দেখেছি তাকে গান গাইতে, খুশীর আমেজে তিনি 'ট্রলি-ট্রাক' বলাতে লেগে গেলেন। তিনি যেন 'প্রডাকসন বয়' থেকে পরিচালক সবকিছু। সুচিত্রা সেন, 'সুটিং' শেষ হবার সাথে সাথে ষ্টুডিও দরজায় গাড়ী প্রস্তুত না থাকলে যিনি ফণিনীর মত রেগে উঠেন, যার জন্য বিশেষ ধরণের 'মেক-আপ' একান্ত পরিচারিকা, এবং 'স্পেশাল ড্রেসার-এর ব্যবস্থা করতে হয়, যার ট্যাক্সী চড়লে 'এলার্জি' হয়—সেই সুচিত্রা সেন 'প্লেন' এর রিজার্ভেসন না পাওয়ায় 'সুটিং' প্রোগ্রাম ঠিক রাখবার জন্য দিল্লী থেকে উদয়পুর ৪৬৯ মাইল দুর্গম বনজঙ্গল দস্যু-পরিবেষ্টিত পথ মটর গাড়ীতে যাবার প্রস্তাব করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রওনা হলেন, একটানা ১৮০ মাইল ভ্রমণের পর পরিচালক অজয় কর প্রস্তাব করলেন রাত্রিটা জয়পুরে বিশ্রাম নেবার জন্য, কিন্তু ·মতী সেন এগিয়ে যেতে চান। তিনি বললেন "অজয়বাবু, যতটা পারি এগিয়ে চলি।" আবার যাত্রা সুরু হল, আজমীরে

"সাত পাকে বাঁধা" চিত্রের বহির্দৃশ্যে রাজস্থানের পিচোলা লেকে লঞ্চে উপবিষ্ট সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জী প্রভৃতি এবং পার্শে হাওয়া মহলেও উক্ত শিল্পীদ্বয়কে দেখা যাচ্ছে।

পৌছিলেন রাত ১০ টায়। অজয়বাবু আর যেতে রাজী নন, রাত্রির জন্য একটা আশ্রয় দরকার। কিন্তু কোথাও স্থান নেই, বহু অনুরোধ করে স্থানীয় সার্কিট হাউসে আশ্রয় পাওয়া গেল। অতি প্রত্যূষে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার প্রতিশ্রুতিতে।

উষারম্ভে যাত্রা সুরু হল এবং বেলা ২॥ টায় উদয়পুর আনন্দ-ভবনে যখন তাদের মোটর পৌছিল, শ্রীমতীসেনের দিকে চাইতে আমার লজ্জা হচ্ছিল। লজ্জা এই ভেবে যে, একজন ভদ্র মহিলাকে এতটা কষ্ট সহ্য করতে হল—আমাদের জন্য। পরে যখন এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে তিনি বলেছেন, "কি হয়েছে অমি তো একা নই। 'সুটিং' তো করতে হবে।" চিতোরের পবিত্র ধ্বংসাবশেষের মাঝে সদাহাস্যময়ী, আনন্দোচ্ছলা, অমায়িক এক বাংলার মেয়ে সুচিত্রা সেনকে নূতন রূপে আবিষ্কার করলাম।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : জীবন রসে পূর্ণ সৌমিত্র বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রোমান্টিক। বুদ্ধির সাথে 'রোমান্টিসিজমের' কোথায় যেন সংঘাত আছে। 'রোমান্টিসিজম' বুদ্ধিকে যেন ভোঁতা করে দেয়। তাই শ'এর মূর্তপ্রতীক সৌমিত্র কথায়, কাজে ও চিন্তায় বিরোধ বাধিয়ে ফেলে। বয়স তার কম, তাই ভাবাবেগ বন্যা লাগিয়ে সংযত করতে কষ্ট হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, যৌন-সমস্যা, বস্তুবাদ ভাববাদ, দ্বন্দ্ব মূলক-বস্তুবাদ অনেক কিছু নিয়েই তার সাথে আলোচনা করেছি, তর্ক করেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে—সৌমিত্রের আগ্রহের বিরাম নেই শুনবার এবং বুঝবার। সৌমিত্রের প্রতিভার পরিচয় পূর্বেও পেয়ে ছিলাম—কিন্তু আর একটা নূতন পরিচয় এখানে এসে আবিষ্কার করলাম, তা হচ্ছে সৌমিত্রের দেশ-প্রেম।

চিতোরের যে অংশে আমরা ছিলাম—তা সভ্যজগং থেকে বিচ্ছিন্ন স্থান বলা যেতে পারে। দু'তিন দিন বর্হিজগতের কোন খবর পাইনি, হঠাং একদিন কোন একটি সংবাদপত্র কোনও এক ভ্রমণকারী নিয়ে এলেন চীন-আক্রমণের সংবাদ নিয়ে। সংবাদ পড়ে সৌমিত্র বিচলিত হয়ে পড়ল—ঐ আক্রমণের বিষয় ছাড়া আর কোনও কথা নেই, রাত্রে তার ঘুম নেই। সুযোগ পেলে তখনই সে যুদ্ধে চলে যায়। সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকের চিন্তা যেন তার মাথায় বাসা বেঁধে গেল। একেই বলে দেশ-প্রেম।

বিশু চক্রবর্তী : একজন মানুষ তার কাজের সাথে কি-ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে তা বিশুবাবুকে এই 'আউটডোর'এ না দেখলে বুঝতাম না। চারিদিকের গল্প হৈ-চৈ গান-আবৃত্তির মাঝে বিশুবাবুর মুখে একটিও কথা

নেই। তিনি তাঁর ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে মনে হচ্ছে সমস্ত বিশ্বটাই দেখে নিতে চাইছেন। ছোট একটি ঘটনা বলি—মীরাবাঈ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের একটা সিড়ির উপর থেকে চিতোরের ধ্বংসাবশেষ এবং বিজয়-স্তম্ভকে 'কম্পোজ' করে শ্রীমতীসুচিত্রা সেন ও শ্রীসৌমিত্র চ্যাটার্জীর একটা 'শট' নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। শ্রীমতী সেন ও শ্রী চ্যাটার্জী কে 'স্পটে'এ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—হঠাৎ তারা দুজনে 'ডুয়েট' গাইতে সুরু করলেন, "আমরা দুজনে স্বর্গ খেলনা গড়িবনা ধরণীতে"। সবাই তাদের গান উপভোগ করছে, হাসি ঠাট্টা চলছে—কিন্তু বিশুবাবুর মুখে কোনও প্রতি-ক্রিয়া নেই। তার কাছে যে একটা গান চলছে তা যেন জানেন না। বারেবারে শ্রীমতী সেনের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে যারা 'রিফ্লেকটর' করছিল—তাদের 'রিফ্লেকটর' যথা স্থানে ধরবার ইংগিত দিচ্ছিলেন। শ্রীমতী সেন রেগে যেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ধ্যাততেরী—টিল্ট ডাউন আর কিল্ট আপ—বেরসিক কোথাকার।" এতেও বিশুবাবুর খেয়াল নেই ; তিনি তার কাজ করেই চলেছেন। বাধ্য হয়ে শ্রীমতী সেনই গান বন্ধ করলেন।

হীরেন নাগ—আত্মভোলা পরিচালক অজয়করের উপ-যুক্ত সহকারী। কিছুই তিনি ভোলেন না। সদাজাগ্রত, মিষ্টভাষী,জ্ঞানী হীরেন নাগ,আতিশয্য তার একবারে নেই। হীরেন নাগ, যাকে শ্রদ্ধা করা যায়—নিজের বলে মনে হয়।

'ইউনিটের' অন্যান্য সবাই প্রত্যেকের কথাই যথেষ্ট লেখা যায়, কিন্তু স্থান কম। শৈলেনবাবু, মেক-আপ, নির্মল বাবু, ক্ষিতীশ বাবু, সুদীপ, প্রভাত সবাই মিলে আমরা যেন একটা সংসার, সবার নিরলস কর্তব্য দেখে আনন্দ হল, অনেক বড় কথা মনে এসে গেল। এদের মাঝে যেন আমাদের জাতিকে দেখতে পেলাম। মনে হল—আমা দের ভবিষ্যত উজ্বল না হয়ে যায় না।

রাজস্থানের 'আউটডোর' আমরা চার হাজার মাইল পরিক্রমা করেছি। যানবাহন ব্যবহার করেছি উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী, মটর গাড়ী, জীপ, ট্রাক, বাস, টাঙ্গা প্রভৃতি। সুটিং প্রোগ্রামের সাথে তাল রেখে এসবের ব্যবস্থা করা এক দুরূহ ব্যাপার। যারা এ বিষয়ে না জানেন তাদের বোঝা সম্পূর্ণ কঠিন। একখানা ছবি তৈরি করতে কত কষ্ট করতে হয় তা যদি দর্শক সাধারণ জানতেন—তাহলে ছবি সম্পর্কে মতামত দেবার পূর্বে একটু বেশী ভেবে নিতেন। আমাদের আউটডোরের সুটিংএর স্থানগুলি ছিল, উদয়পুরের পিচেলের লেক, জগমন্দির প্রাসাদ, রাণী পদ্মিনী যেখানে জহরব্রত গ্রহণ করেছিলেন, মীরাবাই প্রাসাদ, যেখানে ধাত্রী পান্না বনবীরের হাতে নিজের পুত্রকে তুলে দিয়ে উদয়সিংহের প্রাণরক্ষা করেছিলেন, রাণা কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ম্যায়-ভূকাহু' কালীমাতার মন্দির প্রভৃতি। জয়-পুরের সিটি-প্যালেশ,হাওয়া মহলের সামনের রাস্তা, অম্বরের অম্বর প্রাসাদ। এখানে বলা প্রয়োজন—চিতোরের প্রাসাদ মানে—প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাথরের স্তুপ। প্রাসাদ বলতে আমাদের মনে যে চিত্র দেখা দেয়' এ তা নয়। রাজস্থানের তথা ভারতের বীরত্বের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারা পাথরের স্তুপ ও ভারতীয় স্থাপত্যের কংকাল।

বাঙলার চিত্র-শিল্পের দুর্দশা ও প্রতিকারের উপায়

বাঙ্‌লা দেশে বাঙ্‌লা চলচ্চিত্র শিল্পের যে দুর্দিনের সূচনা কয়েক বছর পুর্ব থেকে আরম্ভ হয়েছে আজ বোধহয় তা চরম পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। কারণ এ-যাবং বাঙ্‌লা চিত্রনির্মাণের কাজ কেবল মাত্র বাঙ্‌লা দেশেই সম্পাদিত হতো বটে, কিন্তু সম্প্রতি ইহার কাজ বোম্বাই সহরেও সুরু হয়েছে। ইহাতে প্রখ্যাত বাঙালী কলা-কুশলী, পরিচালক ও প্রযোজকগণের অনেকে হয়ত বাঙ্‌লা দেশ ছেড়ে বোম্বাই সহরে পাড়ি ~~দেবেন~~ অধিক অর্থলাভের প্রলোভনে এবং উন্নত পরিবেশে চিত্র নির্মাণের কাজ করবার জন্য ; কিন্তু বাঙালী সাধারণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ এবং সাধারণ কলা-কুশলীর দল যে চরম দুর্দশার মধ্যে পড়বেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

সুতরাং এ-রূপ ক্ষেত্রে বাঙ্‌লা দেশে বাঙ্‌লা চিত্র

নির্মাণের সঙ্গে সর্বভারতীয় এমন কি আন্তর্জাতীয় বাজারেও স্থান লাভ করবার জন্য ও চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে উপযুক্তভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাঙালী শিল্পী ও কলা কুশলীগণকে জীবন-ধারণ ও শিল্পের উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করবার জন্য এখানকার চিত্র-প্রযোজক ও চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীগণ যদি বাঙ্গলা দেশে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় হিন্দী চিত্র নির্মাণ করেন, তাহলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। আর এইভাবে সত্যই যে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব সে-বিষয়ে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাজ্য সরকারও প্রায় একমত হয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে একমত হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্‌লা চিত্র-প্রযোজকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি হিন্দী চিত্র নির্মাণের জন্য বোম্বাই গমন করাই শ্রেয় মনে করেছেন। এইরূপ অন্ধ ধারণা বাঙ্‌লা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। হিন্দীচিত্রে বোম্বাইয়ের চিত্র-তারকা না হলে ব্যবসায়িক দিক থেকে যদি ক্ষতিকর বোলে মনে হয়, তাহলে প্রয়োজনানুযায়ী বোম্বাইয়ের শিল্পীগণ যেমন মাদ্রাজে গমন করেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁরা বাঙ্‌লা দেশেও অবশ্যই আসবেন। বাঙ্‌লা চিত্রের বাজার সীমায়িত হওয়ায় ঐ চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যয় যতটা সঙ্কোচ করা প্রয়োজন, হিন্দী চিত্রের সর্বভারতীয় বাজার থাকায় তা নির্মাণ করবার জন্য ঠিক ততটা ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন হবেনা। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের শিল্পীদের যদি বাঙ্‌লার তুলনায় কিছু বেশী অর্থও দিতে হয় তথাপি তাঁদের বাঙ্‌লা দেশে অর্থাৎ কোলকাতায় নিয়ে এসে বোম্বাই-এর পরিবর্তে এখানেই হিন্দী চিত্রনির্মাণ করা উচিৎ। তবুও ত বাঙ্‌লার কলা-কুশলীগণ রোজগারের পথ পাবেন। শুধু কি তাই? ভবিষ্যতে এমনও তো হতে পারে যে---এই হিন্দী চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রেও বাঙ্‌লাদেশ একদিন বোম্বাই-এর সঙ্গে সমকক্ষ হয়ে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দিতাও করতে পারে। সুতরাং শুভ সম্ভাবনা যখন আছে, তখন বাঙ্‌লার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীগণই বা তার সফলতার জন্য চেষ্টা করবেন না কেন?

এতদ্ব্যতীত দেশবিভাগের ফলে বাংলা চিত্রের বাজারের আয়তন যেভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে, তার তুলনায় বাজারের ঐ আয়তনবৃদ্ধির বিষয়ে আজ পর্যন্ত সুপরিকল্পিত কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। বিদেশে বাঙ্‌লা চিত্রের একটি ভাল বাজার সৃষ্টি করা যায়। যেমন বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রেঙ্গুন, বাঙ্‌লা চিত্রের একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হতো এবং সেখানে নিয়মিতভাবে বাঙ্‌লা-চিত্র প্রকাশিত হতো। কিন্তু গত দশ বছরে সেখানে মাত্র দু'একটি বাঙ্‌লা চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। হিন্দী চিত্রই সেখানকার বাজার দখল করে আছে। অথচ সেখানে বহুসংখ্যক বাঙ্‌লী বাস করেন এবং তাঁরা বাঙ্‌লা চিত্র দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব। সুতরাং বাঙ্‌লা চিত্র-ব্যবসায়ীগণ যদি চেষ্টা করেন, তাহলে এখনও রেঙ্গুনে বাঙ্‌লা চিত্রের পূর্ব বাজার তাঁরা পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

আবার খবরে প্রকাশ, বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় টেলিভিশনের আধিপত্য বিস্তার লাভ করায় ঐ দুই মহাদেশে চিত্রশিল্পে অবনতি ঘটছে। তাই ঐ দুই দেশের চিত্র-ব্যবসায়ীগণ নিজনিজ দেশে উৎকৃষ্ট বিদেশী চিত্র দেখাবার জন্য ব্যগ্র। অতএব এই সুযোগে বাঙ্‌লা চিত্র-ব্যবসায়ীগণ ঐ দুই মহাদেশে উৎকৃষ্ট বাঙ্‌লা চিত্রের একটি স্থায়ী বাজার সৃষ্টি করবার চেষ্টা অনায়াসেই করতে পারেন। তার জন্য প্রয়োজন হলে সর্বভারতীয় চিত্র-ব্যবসার ভিত্তিতে সুগঠিত একটি 'এক্সপোর্ট' সংস্থার মাধ্যমে বিদেশের এই উৎকৃষ্ট চিত্র-ব্যবসার বাজারটিতে বাঙ্‌লা চিত্রের ব্যবসাক্ষেত্র সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার একটি সুপরিকল্পিত চেষ্টা করা উচিৎ।

—শ্রীসর্ব্বজিৎ

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ পর্য্যায়ে এসে গেছে। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ইণ্টার-জোন-ফাইনাল খেলায় মেক্সিকো ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠেছে। এই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলাই হ'ল প্রতিযোগিতার শেষ অধ্যায়। আগামী ২৬শে ডিসেম্বর অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের তিন দিন ব্যাপী খেলা (২৬—২৮শে ডিসেম্বর) সুরু হবে। মেক্সিকো এই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে গত তিন বছরের ডেভিস কাপ-বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস খেলার ইতিহাসে মেক্সিকো এবং ভারতবর্ষের পক্ষে ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলা এই প্রথম। এই নিয়ে ভারতবর্ষ উপর্যুপরি দু'বছর (১৯৬১ ও ১৯৬২) ইণ্টার-জোন সেমিফাইনালে উঠলো। গত বছর ভারতবর্ষ ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ২—৩ খেলায় আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে ভারতবর্ষের যেটুকু সামান্য স্থান ছিল তা গত বছর পর্য্যন্ত মেক্সিকোর ছিল না। বলতে কি, মেক্সিকোর কোন নামগন্ধ ছিল না। কিন্তু এই বছরে মেক্সিকো অসামান্য ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়ে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দেশ আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয়া, সুইডেনকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হয়।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার প্রথমদিনে মেক্সিকোর এ্যাণ্টোনিয়ো প্যালাফক্স ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করলে মেক্সিকো ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান রমানাথন কৃষ্ণান মেক্সিকোর রাফেল ওসুনার কাছে পরাজিত হ'লে মেক্সিকো ২—০ খেলায় এগিয়ে যায়। এরপর ডাবলসের খেলায় মেক্সিকোর ওসুনা এবং প্যালাফক্স ভারতবর্ষের ডাবলস জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করলে মেক্সিকো ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার অধিকার লাভ করে—মোট পাঁচটি খেলার মেক্সিকোর জয় তিনটি দাঁড়ায়। সুতরাং বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলার ফলাফল সম্পর্কে কোন গুরুত্বই ছিল না ; কেবল নিয়ম রক্ষার জন্যে দুই দলকে খেলতে হয়। এই শেষের দুটি খেলায় মেক্সিকো এবং ভারতবর্ষের নামকরা খেলোয়াড়রা যোগদান করেননি। মেক্সিকোর পক্ষে কণ্ট্রাস (অধিনায়ক) ভারতবর্ষের আখতার আলীকে এবং লামাস শেষ সিঙ্গলস খেলায় প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করলে মেক্সিকোর জয়ের অঙ্ক দাঁড়ায় ৫—০।

১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জোনের ফাইনাল, মূল প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল এবং ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নীচে দেওয়া হল ঃ

জোন-ফাইনাল

ইউরোপীয়ান ঃ	সুইডেন	৪	ঃ	ইতালি	১
আমেরিকান ঃ	মেক্সিকো	৪	ঃ	যুগোশ্লাভিয়া	১
ইষ্টার্ণ ঃ	ভারতবর্ষ	৫	ঃ	ফিলিপাইন	০

ইণ্টার-জোন

সেমি-ফাইনাল ঃ	মেক্সিকো	৩	ঃ	সুইডেন	২
ফাইনাল ঃ	মেক্সিকো	৫	ঃ	ভারতবর্ষ	০

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৬২ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে, জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ফলে ফাইনাল খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭২ বছরের ইতিহাসে এই রকম ঘটনা এই প্রথম।

প্রথম দিনের খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উভয় দলই একটি ক'রে গোল দেওয়াতে অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোন দলই আর গোল দিতে পারেনি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্ব্বে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল (হায়দরাবাদ পুলিশ নামে) পরপর পাঁচবার (১৯৫০-৫৪) রোভার্স কাপ জয় করেছিল—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এত অধিকবার কোন দল উপর্যুপরি রোভার্স কাপ জয় করতে পারেনি। তাছাড়া তারা ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালেও রোভার্স কাপ পায়। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইতিপূর্ব্বে তিনবার (১৯৪৯, ১৯৫৯, ১৯৬০) রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলে একবার (১৯৪৯) রোভার্স কাপ পেয়েছে। এ বছরের সাফল্য নিয়ে অন্ধ্র পুলিশ দলের রোভার্স কাপ জয় হল ৮ বার—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড।

কমনওয়েলথ গেমস ঃ

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমসে অস্ট্রেলিয়া মোট ১০৫টি পদক লাভ ক'রে পদক লাভের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। স্বর্ণপদকের সংখ্যা ছিল ১০৪টি। স্বর্ণপদক প্রাপ্তির তালিকায় প্রথম স্থান পায় অস্ট্রেলিয়া (৩৮), দ্বিতীয় স্থান ইংল্যাণ্ড (২৯), তৃতীয় স্থান নিউজিল্যাণ্ড (১০) এবং চতুর্থ স্থান পাকিস্তান (৮)। সপ্তম কমনওয়েলথ গেমসে সন্তরণ বিভাগের সাফল্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাঁতারের ৯টি অনুষ্ঠানে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয় এবং ৩টি অনুষ্ঠানে পূর্ব্বের বিশ্ব রেকর্ডের সমান হয়। এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠান সেই তুলনায় নিষ্প্রভ, কোন বিশ্ব রেকর্ডই স্থাপিত হয়নি। সাঁতারের পুরুষ বিভাগে মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া) এবং মহিলা বিভাগে মিস ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এই দু'জনই রিলে রেস নিয়ে চারটি ক'রে স্বর্ণপদক লাভ করেন। সাঁতারের তিনটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের মহিলা অনিতা লন্সব্রাউ।

এ্যাথলেটিক্সে 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন পুরুষ বিভাগে সেরাফিনো আন্তাও (কেনিয়া) ১১০গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে জয়লাভ ক'রে। মহিলা বিভাগে এই সম্মান লাভ করেছেন ইংল্যাণ্ডের মিস ডোরথি হিম্যান (১১০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়)।

পদক প্রাপ্তির তালিকা
(প্রথম তিনটি দেশ)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
অস্ট্রেলিয়া	৩৮	৩৬	৩১	১০৫
ইংল্যাণ্ড	২৯	২২	২৭	৭৮
নিউজিল্যাণ্ড	১০	১২	১০	৩২

বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ঃ

১৯৬২ সালের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক্স ক্রীড়ানুষ্ঠানে ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ছাত্র বিভাগে শিশুতোষ মুখার্জি (বিদ্যাসাগর কলেজের সান্ধ্য বিভাগ) এবং ছাত্রী বিভাগে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের জয়া ভট্টাচার্য্য। শিশুতোষ মুখার্জী চারটি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পান—(১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়,লংজাম্প এবং হপ-স্টেপ জাম্প)। তাছাড়া তিনি তৃতীয় স্থান পান পোল-ভল্টে। অপর দিকে জয়া ভট্টাচার্য্য এই চারটি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পান—৫০, ১০০, এবং ২০০ মিটার দৌড় এবং ৮০ মিটার হার্ডলসে। লং জাম্পে তিনি দ্বিতীয় স্থান পান।

সপ্তম কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৩৫টি দেশের এক হাজারের বেশী প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ যোগদান করেনি।

ছাত্রদের এই চারটি অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়ঃ ৮০০ মিটার দৌড়—পি সি হাউ (সেণ্ট জেভিয়ার্স), সময় ২ মিঃ ১.৪ সেঃ; ১,৫০০ মিটার দৌড়—পি সি হাউ, সময় ৪ মিঃ ২১.৮ সেঃ; লংজাম্প—শিশুতোষ মুখার্জী, দূরত্ব ২২ ফিঃ ৪½ ইঞ্চি এবং হাই জাম্প—বি তালুকদার (মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ), উচ্চতা—৫ ফিঃ ১০ ইঞ্চি।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান (ছাত্র): শিশুতোষ মুখার্জি (বিদ্যাসাগর কলেজ, সান্ধ্য বিভাগ)—২১ পয়েণ্ট।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান (ছাত্রী): জয়া ভট্টাচার্য্য (ভিক্টোরিয়া কলেজ)—২৩ পয়েণ্ট।

দলগত চ্যাম্পিয়ান (ছাত্র) ঃ বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ)—৫৩ পয়েণ্ট।

দলগত চ্যাম্পিয়ান (ছাত্রী) ঃ ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন —২৩ পয়েণ্ট।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

দুর্বাসার অভিশাপ

শিল্পী : শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

বেরোতে হবে ? চুল শুকিয়েছে তো ?
ভিজে চুল বাঁধা আর চুলের সর্বনাশ ডেকে আনা একই ব্যাপার। ভুলেও কখনও ভিজে চুল বাঁধবেন না কারণ ভিজে চুল বাঁধলে চুলের সৌন্দর্য আর সাবলীলতা দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়। যদি মনে করেন যে আপনার চুল শুকোবার আগেই আপনাকে বেরোতে হবে তবে ভাল করে জবাকুসুম তেল দিয়ে চুলের গোড়াগুলিতে মালিশ করুন, তারপর পরিষ্কার করে আঁচড়ে চুল বেঁধে ফেলুন! জবাকুসুম তেল চুলের একটি মস্ত বড় খাদ্য আর এ তেল মেখে জল না ঢাললে কোন ক্ষতি হয়না। এর চমৎকার সুগন্ধ আপনার মন নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ আনন্দে ভরিয়ে দেবে। জবাকুসুমের অপূর্ব ভেষজ-গুণাবলী মাথা ও স্নায়ু স্নিগ্ধ করে।
জবাকুসুম
সি, কে, সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-১২
JK.508

মাঘ—১৩৬৯

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মার্কণ্ডেয় পুরাণে গল্প সম্ভার

অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য

পুরাণ সাহিত্যের মূল তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় পুরাণ শব্দের অক্ষরার্থ পুরাকালের ঘটনা। কিন্তু বেদব্যাসের নাম-পূত 'পুরাণ' প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্ত হলেও ঘটনাপঞ্জির বিবরণমাত্র নয়। পুরাণ-সাহিত্য ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক চিরায়ত আলেখ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাময় এক বিশাল কল্পবৃক্ষঃ সর্বকালের ও সর্বজনের কল্যাণকর মহান্ গ্রন্থ সন্দর্ভ ঃ—

পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
উত্তমং সর্বলোকানাং সর্বজ্ঞালোকপাদকম্॥

পুরাণের পঞ্চলক্ষণ

পুরাণের বিষয়বস্তু পাঁচ রকমের। বিশ্বের সৃষ্টিকথা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ প্রলয় ঘটনা, ঋষি রাজা দেবতা ও দৈত্যদের উৎপত্তি কর্ম ও বংশানুক্রম, কালনির্ণায়ক মন্বন্তরের গণনা এবং বিখ্যাত মনীষীদের জীবনচরিত বা কীর্তিকলাপ এই পাঁচটি বিষয় পুরাণের সংজ্ঞার্থের মধ্যে পড়ে ঃ—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

পুরাণে বিষয় বৈচিত্র্য

ক্রমে এই 'পঞ্চলক্ষণ' পুরাণে বহিরঙ্গ বস্তুর প্রাচুর্য

ঘটেছে। পুরাণকার নানা প্রসঙ্গে বহু আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পশুদ্ধি পুরাণসংহিতায় যোগ করে দিয়েছেন :—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্প শুদ্ধিভিঃ।
পুরাণ সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ॥

পুরাণগ্রন্থ রচিত হয়েছিল আপামর জনগণের শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারকল্পে। সুতরাং ইতিবৃত্তের মূল ধারার ফাঁকে ফাঁকে পুরাণে পাওয়া যায়—দৈবী শক্তির মাহাত্ম্য কথা, তীর্থক্ষেত্রের পুণ্য কাহিনী, নীতিবহুল ধর্মোপদেশ আর লোকরঞ্জন আখ্যান উপাখ্যান। বক্তা বা লেখকের নিজে দেখা ঘটনার বিবরণের নাম 'আখ্যান', আর শোনা বিবরণ 'উপাখ্যান' :—

স্বয়ং দৃষ্টার্থ কথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ।
শ্রুতস্যার্থস্য কথন মুপাখ্যানং প্রবক্ষতে॥

পুরাণে ইতিবৃত্তবর্ণনের বৈশিষ্ট্য

পুরাণকার সুকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়েই পুরাণগ্রন্থের বিভিন্ন উপক্রমে বিচিত্র প্রকৃতির আখ্যান-উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। পুরাণবর্ণিত ইতিহাস এক বিশিষ্ট শৈলী অবলম্বনে রূপ গ্রহণ করেছিল এবং নানা বস্তুর সমাবেশে অসামান্যতা লাভ করেছিল। বেদব্যাস ইতিহাসের একটা স্বকীয় লক্ষণ গড়ে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মহাভারত সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এ গ্রন্থ ইতিহাস বটে, কিন্তু এ ইতিহাসের সংজ্ঞার্থে বৈশিষ্ট্য আছে। এতে পুরাতন ইতিবৃত্তের সঙ্গে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের উপদেশও স্থান পেয়েছে :—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

ইতিহাসের এ লক্ষণটি মহাভারতের পক্ষেও যেমন, পুরাণের পক্ষেও তেমন খাটে।

ইতিহাস-রচনার এই বিশিষ্ট আদর্শ সামনে রেখে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন বৃত্তান্ত অবলম্বনে অগণিত পুরাণ-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ আঠারখানা মহাপুরাণ এবং আঠারখানা উপপুরাণ ছাড়া অবান্তর পুরাণের সংখ্যাও বড় কম নয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'মার্কণ্ডেয় পুরাণের গল্প-সম্ভার'। অষ্টাদশ মহাপুরাণের গণনায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের স্থান সপ্তম। জৈমিনি নামে এক মুনি চিরজীবী মার্কণ্ডেয়কে পুরাবৃত্ত সম্পর্কে চারটি প্রশ্ন করেন। কর্মব্যস্ত মার্কণ্ডেয় প্রশ্নকর্তা জৈমিনিকে শাপভ্রষ্ট পক্ষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসু জৈমিনির প্রশ্ন আর তত্ত্ববিৎ পক্ষীদের উত্তর—মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল কাঠামো। পুরাণপ্রতিপাদ্য পাঁচটি বিষয় সৃষ্টি প্রলয় বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিতের মধ্যে কোনটির বর্ণনাই মার্কণ্ডেয় পুরাণে একেবারে বাদ পড়েনি। কিন্তু উপাখ্যানের আধিক্যই এ পুরাণের বৈশিষ্ট্য। স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ প্রভৃতি চতুর্দশ মন্বন্তর কালের নানা ঘটনার কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

সুরথ, সমাধি ও মহামায়া

সাবর্ণিক মন্বন্তরে ভগবতী মহাশক্তি অসুর বধ করেছিলেন। সে বিবরণ মেধস মুনি বলেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যে। সুরথ ও সমাধি দুজনেই ছিলেন প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি—একজন পরাক্রান্ত নরপতি, অন্যজন বিত্তশালী বৈশ্য; একজন রাজ্যভোগে নিমগ্ন, অন্যজন ধনমদে মত্ত। সহসা উভয়েরই দুর্দিন উপস্থিত হলো। প্রবলতর শত্রু এসে সুরথের রাজ্য কেড়ে নিলে, ঐশ্বর্যলোভী স্ত্রী-পুত্রেরা সমাধিকে ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেন। সুরথ ও সমাধি দুজনেই অরণ্যে আশ্রয় নিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা আর স্বজনতাড়িত বৈশ্য মেধস মুনির আশ্রম-প্রান্তে মিলিত হলেন। সাংসারিক বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসত্ত্বেও এঁদের নির্বেদ লাভ হয়নি। সুরথ রাজ্যভোগের লালসা ছাড়তে পারেন নি; সমাধিও অবিশ্বাসী স্ত্রী-পুত্রের মমতা ত্যাগ করতে পারেন নি। উভয়েই মেধস মুনির শরণাপন্ন হয়ে এর কারণ জানতে চাইলেন। মুনি মহামায়ার বিচিত্র লীলা বর্ণনা করলেন। এই দেবী একরূপে জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন, অপররূপে তার মোহ দূর করেন। দেবীমাহাত্ম্যের মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনীর মধ্যে মহামায়ার দৈবী শক্তি ও আসুরী শক্তির সন্ধান পেয়ে সুরথ ও সমাধি দেবীর কৃপায় শান্ত হলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই দেবী-চরিত বা সপ্তশতী চণ্ডী পুরাণ-সাহিত্যের এক অনবদ্য প্রকরণ।

হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্র

পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী শৈব্যার চরিত-

কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণের আর একটি মহিমময় উপাখ্যান। সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্র আত্মবিক্রয়, পত্নীবিক্রয় ও পুত্রবিক্রয়ের অর্থ নিয়ে বিশ্বামিত্রের নিষ্ঠুর নির্বন্ধ রক্ষা করেছিলেন। এ উপাখ্যান মহাভারতেও আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনায় বিশ্বামিত্রের ক্রূরতা, হরিশ্চন্দ্রের উদারতা এবং শৈব্যার সহিষ্ণুতা যেন সজীব হয়ে হৃদয়ের মর্মস্থল স্পর্শ করে। উপাখ্যানটির কাব্যসৌন্দর্যও অসাধারণ।

মদালসা ও পুত্রগণ

মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি কাহিনীর নায়িকা ঋতধ্বজ-পত্নী বিদুষী মদালসা। ইনি স্বীয় পুত্র বিক্রান্ত সুবাহু ও শত্রুমর্দনকে স্বয়ং সংসারত্যাগের উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু চতুর্থ পুত্র অলর্ককে প্রবৃত্তি-ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। মদালসার ভাষণে পদে পদে সুনীতি শেখানোর প্রয়াস সুস্পষ্ট।

ধনবান আত্মীয় থাকতেও যদি কেহ দৈন্য ক্লেশে কষ্ট পায়, তবে সে অভাবের পীড়নে যা কিছু পাপ করে, তার সমস্ত ফলই ধনী ব্যক্তিকে ভোগ করতে হয়:—

শ্রীমন্তং জ্ঞাতিমাসাদ্য যো জ্ঞাতিরবসীদতি।
সীদতা যৎ কৃতং তেন তৎ পাপং স সমশ্নুতে॥

এটি মদালসার উক্তি।

রাজা রাজ্যবর্ধন ও প্রজাবৃন্দ

মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান রাজ্যবর্ধন কথা। প্রজারঞ্জক রাজা রাজ্যবর্ধনের পরিণত বয়সে যখন কৃষ্ণ কেশগুচ্ছে বার্ধক্যের প্রথম চিহ্ন দেখা দিল, তখন তার পতিব্রতা মহিষী এবং অনুরক্ত প্রজাগণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এ বিষয়ে রাজার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য সত্ত্বেও প্রজারা বিপুল প্রয়াসে তাঁর দীর্ঘজীবন বর পেলেন। কিন্তু প্রজাপরিজনের জন্য অনুরূপ বর না পাওয়া পর্যন্ত রাজ্যবর্ধন নিজের চিরজীবীত্ব বাঞ্ছনীয় বলে গ্রহণ করলেন না। এ কাহিনী সেকালের রাজা ও প্রজার পরস্পর অনুরক্তির সাক্ষ্য দেয়।

ভামিনী অবীক্ষিত ও মরুত্ত

মার্কণ্ডেয়পুরাণে যে সব মহীয়সী নারীর চরিত্র চিত্রিত আছে, রাজমাতা ভামিনী তার একজন। সত্যশীলা ভামিনী, দৃঢ়চিত্ত অবীক্ষিত ও কর্তব্যরত মরুত্তের সত্যাশ্রয়িতা, তেজস্বিতা, ও প্রজাপ্রিয়তার অপূর্ব উদাহরণ যুগে যুগে আদর্শ হয়ে থাকবে।

পিতা অবীক্ষিত স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করায় মরুত্ত রাজ্যশাসন করছিলেন। প্রজাদের মুখে নাগজাতির অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ পেয়ে মরুত্ত নাগদমনে প্রবৃত্ত হলেন। বিষম ধ্বংসযুদ্ধে নাগবংশের বিলোপ আসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু পূর্বে মরুত্ত জননী ভামিনী এই নাগদের অভয় দিয়েছিলেন। করুণাময়ী নারী মরুত্তের কঠোরতায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্বামীর সঙ্গে স্বয়ং রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। এক দিকে পুত্র দুষ্টশাসনে বদ্ধ-পরিকর, অপর দিকে জনকজননী আশ্রিত রক্ষণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কাকুতিমিনতি বা স্নেহভক্তি কিছুই এঁদের স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। অবীক্ষিত পুত্রকে বললেন—"আমি ক্ষত্রিয়; যারা প্রাণ ভয়ে আমার শরণাগত হয়েছে, তাদের তুমি বিনাশ করছ; তোমায় বধ না করে উপায় কি?"

ক্ষত্রিয়েঽহমিমে ভীতাঃ শরণং মামুপাগতাঃ।
অপকর্তা ত্বমেবৈষাং কথং বধ্যো ন মে ভবান্॥

মরুত্ত উত্তর দিলেন—"মিত্র, আত্মীয়, পিতা কিংবা গুরু যিনিই হোন না কেন, প্রজাপালনে ব্যাঘাত ঘটালে, তিনি রাজার অবশ্য বধার্হ। আপনার দেহে আঘাত করতে হবে, এতে অপরাধ নেবেন না পিতা। আমি কর্তব্য পালন করছি, আপনার ওপর আমার ক্রোধ নেই":—

মিত্রং বা বান্ধবোবাপি পিতা বা যদি বা গুরু।
প্রজাপালন বিঘ্নায় যো হন্তব্যঃ স ভূভৃতা॥
সোঽহং তে প্রহরিষ্যামি ন ক্রোদ্ধব্যং ত্বয়া পিতঃ।
স্বধর্মঃ পরিপাল্যো মে ন মে ক্রোধস্তবোপরি॥

মাতা, পিতা ও পুত্রের কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে মুনি-ঋষিরা এই বিসদৃশ বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে নাগজাতি রক্ষা পেয়েছিল।

খনিত্র ও মানবপ্রেম

প্রাংশুর পুত্র খনিত্র ছিলেন একজন লোকহিতৈষী প্রজাবৎসল রাজা। তিনি স্বার্থপর স্বজনদের হিংসাদ্বেষের গর্হিত অপরাধ নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বিতৃষ্ণায় রাজৈ-শ্বর্য ত্যাগ করেছিলেন। খনিত্র বলতেন—এ সংসারে আমাকে যে দ্বেষ করে তারও কল্যাণ হোক:—

যশ্চ মাং দ্বেষ্টি লোকেঽস্মিন্ সোঽপি ভদ্রানি পশ্যতু।
এই সর্বজনপ্রিয় রাজা সর্বদা বিশ্বহিতার্থে প্রার্থনা করতেন ঃ—

নন্দন্তু সর্বভূতানি স্নিহ্যন্তু বিজনেষ্বপি।
মা ব্যাধিরস্তু ভূতানামাধয়ো ন ভবন্তুচ॥
মৈত্রীমশেষভূতানি পুষ্যন্তু সকলে জনে।
সমৃদ্ধিঃ সর্ববর্ণানাং সিদ্ধিরস্তু চ কর্মনাম্॥

"সমস্ত প্রাণীরা সুখী হোক, অনাত্মীয়দেরও আপন করে নিক। কোন লোকই যেন দেহের ব্যাধিতে কিংবা অন্তরের আধিতে দুঃখ না পায়। প্রাণীরা যেন পরস্পর প্রীতিভাব পোষণ করে। সকল বর্ণের সমৃদ্ধি ঘটুক; সকল কর্মে সিদ্ধিলাভ হোক।" এই খনিত্র ছিলেন একজন অকৃত্রিম মানবপ্রেমিক রাজা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এরূপ আখ্যান উপাখ্যানের সংখ্যা অনেক। তার নৈতিক, ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাও পরম উপাদেয়।

কলিকাতা আকাশ বাণীর সৌজন্যে প্রকাশিত

বিদায়—বরোদা

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ব গগনে উঠিছে সূর্য্য
(লয়ে) মুক্তি দিনের বাণী।
যত অপচয়, যত পরাজয়,
যত পরাভব গ্লানি,
যত অপমান, যত ঝঞ্ঝাট,
যত কাহিনা ও কথা
শেষ হয়ে যাবে আজি সন্ধ্যায়
বন্দী দিনের ব্যথা।
দুঃখ দিনের সকল কাহিনী
ইতিহাস হয়ে রবে।
হয়ত কখনও স্মৃতি-কারাগারে
বন্দিরা উঁকি দেবে॥
বরদে জননী! তব আহ্বান
পশেছে কর্ণে-মোর।
শুনেছি মাভৈঃ তোমার মন্ত্র
দুঃখ নিশির ভোর॥
দুঃখের মাঝে লভিনু তোমায়
হেরিনু তোমার রূপ।
বাগিচা প্রাসাদে বৈভবে ভরা
সুন্দরী অপরূপ॥

উষসী প্রান্তে প্রভাত লগ্নে
হৃদয় ভরিল ধীরে।
ভাবিলাম আমি তব ইতিকথা
নয়ন ভরিল নীরে॥
তুমি গো জননী ধরেছ বক্ষে
বীর সন্তান কত,
যাদের শাণিত দৃপ্ত কৃপাণ
শত্রুরে করে নত॥
তুমি মা দিয়েছ অভয়ের বাণী
অরবিন্দের কানে।
তুমি মা কেঁদেছ হয়েছ কঠিনা
স্বদেশের অপমানে॥
তব সন্তান সাহজী ধীমান
রচিয়াছে নব কীর্ত্তি।
তোমার মহিমা করেছে প্রচার
তোমার বিদুষী মূর্ত্তি॥
ক্ষমহে জননী ক্ষম অপরাধ
লহগো প্রণতি মোর
হে দেবী বরদে দাও গো আশীষ
লহ নয়নের লোর॥
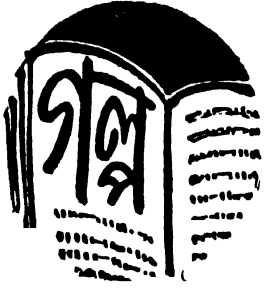
ভ্রান্তি

ডাঃ নবগোপাল দাস

পুরীতে চলে এসেছে পুষ্পনিভা, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে। কিন্তু কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না তার। কেবলই মনে হচ্ছে, এতটা বাড়াবাড়ি করাটা বোধহয় উচিত হয়নি'।

অথচ দোষটা কি শুধু তারই? নিরুপম যদি একটু শান্তভাবে তার কথাগুলো শুন্‌ত, তাহ'লে সে নিশ্চয়ই এভাবে পুরী চলে আস্‌ত না! হাজার হোক্ সে কচি খুকীটি নয়, তার একটা স্বাধীন সত্বা রয়েছে, নিরুপম কেন সেটা স্বীকার করে নেবে না?

একহিসেবে দেখতে গেলে ঝগড়ার কারণটা খুবই তুচ্ছ। একমাত্র ছেলে প্রবীর থাকে দার্জ্জিলিং-এ—বোর্ডিং স্কুলে। একা একা বাড়ীতে বসে থেকে পুষ্পনিভার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। নিজেকে ব্যাপৃত রাখ্‌বার জন্য সে খুঁজছিল ছোটখাট একটা কাজ। নিরুপমের সম্মতি নিয়েই সে আমেরিকান কন্‌সলেট্-এ আধাদিনের জন্য একটা চাকুরীও জোগাড় করে নিয়েছিল। নিরুপম প্রথমে খুসীই হয়েছিল, কারণ যে মাইনে পুষ্পনিভা ঘরে আন্‌ত তা' খুব একটা মোটা অঙ্কের না হলেও তাতে নানা দিক দিয়ে সংসারের সাশ্রয়ই হতে আরম্ভ করেছিল। এর আগে নিজের ছুটকোছাট্‌কা খরচের জন্য তাকে স্বামীর কাছে হাত পাত্‌তে হ'ত, আমেরিকান কন্‌সলেট্-এর এই চাকুরীটা পাবার পর অবধি এদিক দিয়ে নিরুপমকে বিব্রত হতে হয়নি'। তাছাড়া ব্যাঙ্কে একটা পাশ-বই খুলে পুষ্পনিভা কিছু কিছু সঞ্চয়ও স্বরু করে দিয়েছিল, যা' এতদিন নিরুপমের একার মাইনে থেকে করা কোনমতেই সম্ভব হয়নি'।

প্রথম গোলমাল বাঁধ্‌ল যখন ঘরের কাজকর্ম্ম করবার জন্য একটা ঠিকা ঝি-এর বদলে পুষ্পনিভা বাঁধা মাইনেতে একজন চাকর রাখ্‌ল। নিরুপম বলেছিল, এ কিরকম মিতব্যয়িতা হ'ল, নিভা? অতিরিক্ত যা আয় হচ্ছে তার অর্দ্ধেকটাই যে বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার এই চাকরের পেছনে!

নিরুপমের বিরক্তি পুষ্পনিভা গায়ে মাখেনি'। বরং অঙ্ক কসে সে নিরুপমকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে চাকরের জন্য অতিরিক্ত যা খরচ হচ্ছে তা' অতি সামান্য। তাছাড়া সারাদিনের জন্য একটা চাকর রাখার ফলে নিজের কাজকর্ম্ম, লেখাপড়া কর্‌বার জন্য যে অবসর সে পাচ্ছে, তার মূল্য তার কাছে কয়েকটা টাকার চেয়ে অনেক বেশী।

পুষ্পনিভার ব্যাখ্যানে নিরুপম অবশ্য সন্তুষ্ট হয়নি', মনের মধ্যে একটা চাপা বিরক্তি থেকেই গেছে।

বিরক্তিটা অগ্ন্যুদ্‌গায় হয়ে দেখা দিল এক সন্ধ্যায়।

অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে নিরুপম বাড়ীতে ফিরেছে, ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর কাছ থেকে বিনা অপরাধে মৃদু তিরস্কার খেয়ে তার মেজাজটাও তেমন ভাল ছিল না, ফিরে এসে দেখে, বাড়ীতে পুষ্পনিভা নেই, ঘরদোর অন্ধকার। চাকরটাও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পুষ্পনিভা সাধারণতঃ বাড়ীতে ফিরে আসে নিরুপম ফেরার বেশ আগেই। যদি কোনদিন কোন কারণে দেরী হবার সম্ভাবনা থাকে, নিরুপমকে পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়ে দেয় এবং শ্রান্ত নিরুপমের পরিচর্য্যার যাতে ত্রুটি না হয় সেজন্য চাকরকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে বলে যায়, বাবু ফিরে এলে কি কি করতে হবে।

সেদিন পুষ্পনিভা হঠাৎ আট্‌কে গিয়েছিল কন্‌সলেট্-এর কাজে। আমেরিকা থেকে দু'তিন জন সেনেটর এসেছেন, সস্ত্রীক, তাঁদের জন্য একটা প্রোগ্রাম তৈরী করতে

হবে, মিঃ ব্র্যাডলি এসে বললেন, পুষ্পনিভার সাহায্য দরকার, একটু দেরী হলে কোন অসুবিধে হবে না ত ?

পুষ্পনিভা বলল, না, না, অসুবিধে আর কি। বিদেশ থেকে ওঁরা এসেছেন, ওঁদের দিকে আমাদের দেখ্‌তে হবে বই কি !

মিঃ ব্র্যাডলি বল্‌লেন, আমাদের গাড়ী আপনাকে বাড়ীতে পৌছে দেবে, মিসেস্ মিত্র।

প্রোগ্রাম তৈরী করতে প্রায় দু'ঘন্টা লেগে গেল। পুষ্পনিভা যখন বাড়ীতে পৌছুল তখন রাত হয়ে গেছে, প্রায় আটটা বাজে।

নিরুপম অন্ধকার ঘরে গুম্ হয়ে বসে ছিল। লক্ষ্য কর্‌ল, প্রকাণ্ড একটা ক্যাডিলাক্ গাড়ী থেকে পুষ্পনিভা নাম্‌ল। গাড়ী চালাচ্ছেন যে ভদ্রলোক তাঁকে পুষ্পনিভা ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি জ্ঞাপন করল।

অন্ধকার ঘরে নিরুপমকে উপবিষ্ট দেখে পুষ্পনিভা প্রথমে চম্‌কে উঠেছিল। তার পর প্রশ্ন কর্‌ল, ও কি, বাতি জ্বালাও নি' যে ? সতীশটা কোথায় গেল ?

ব'লে সুইচ টিপে বাতিটা জ্বালাল পুষ্পনিভা।

নিরুপম কোন জবাব দিল না।

পুষ্পনিভা রান্নাঘরের দিকে একবার ঘুরে এল। ছোকরা চাকর সতীশ কোথাও নেই।

—সতীশকে বাজারে পাঠিয়েছ নাকি ?···পুষ্পনিভা প্রশ্ন কর্‌ল।

এবার তিক্তস্বরে নিরুপম বল্‌ল, আমি এক ঘণ্টা ধরে ঠাঁয় বসে রয়েছি। তোমার সতীশের টিকিটিও দেখ্‌তে পাচ্ছিনা !

—কি দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়েছে আজকালকার চাকরগুলো ! কোথাও হয়ত আড্ডা দিচ্ছে।···চা খেয়েছ ?··· পুষ্পনিভা প্রশ্ন কর্‌ল।

—সে সৌভাগ্য হয়নি', হবার সম্ভাবনাও দেখ্‌ছিনা ! ···নিরুপম বল্‌ল।

—নিজের চা'টাও নিজে তৈরী করে নিতে পারোনা ? এর জন্য চাকরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাক্‌তে হয় ?···একটু যেন বিরক্তির সঙ্গেই বল্‌ল পুষ্পনিভা।

এবার অগ্ন্যুদ্‌গার কর্‌ল নিরুপম।

—যার স্ত্রী ক্যাডিলাক গাড়ীতে বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে রাত আটটা অবধি ঘুরে বেড়ায়—তাকে নিজ হাতে রান্না করে খেতে হবে বই কি ! এই ত আজকালকার রীতি !

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল পুষ্পনিভা।

—কি বল্‌লে ? ক্যাডিলাক্ গাড়ীতে অন্যলোকের সঙ্গে সারারাত ঘুরে বেড়ানো আমার অভ্যেস ? লজ্জা করে না ইতরের মত কথা বল্‌তে ?

নিরুপমও সমান ওজনে জবাব দিল, ইতরের মত ব্যবহার করতে পারো তুমি, আর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই বুঝি গায়ে ফোস্কা পড়ে ?···আমি তোমাকে স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি নিভা, এ চাকুরী তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ঘরে থেকে এরকম বেলেল্লাপনা কর্‌বে, এ আমি বরদাস্ত কর্‌ব না।

স্থাণু হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পুষ্পনিভা। এ কি বল্‌ছে নিরুপম ?

নিরুপমের মাথায় তখন খুন্ চেপে গিয়েছে। সে বলে চল্‌ল, তোমার কন্‌সলেট্-এর আমেরিকানদের আমি খুব চিনি, যুদ্ধের সময় ওদের জাতভাইরা আমাদের সমাজ-সংসারকে ছারখার করে দিতে চেয়েছিল, পারেনি'। এখন এসেছে ভোল বদ্‌লে, ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির ছায়ায়, কিন্তু ওদের স্বভাব যাবে কোত্থেকে ? আবার বল্‌ছি, যত দিন আমার আশ্রয়ে রয়েছ, এরকম স্বৈরতা বর্জ্জন করে চল্‌তে হবে। আর যদি মনে করো সেটা সম্ভব হবে না, তা'হলে তুমি যেখানে খুসী চলে যেতে পারো, যে কোন টম্ ডিক্ হ্যারি বা তোমার য়ুনিভার্সিটিযুগের কোন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে।

এরপর আর কোন বাক্য বিনিময় করেনি পুষ্পনিভা। একটু পরে সতীশ এসে রান্না চাপিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নিরুপম সে রাতে বাড়ীতে খায়নি'। হোটেলে খেয়ে দেয়ে সে যখন বাড়ীতে ফিরেছিল তখন পুষ্পনিভা তার মনস্থির ক'রে ফেলেছে। পরদিন অফিসে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে নিরুপমকে শুধু বলেছিল যে সে কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাবে, আলমারির চাবিটা সে তুলে ধরেছিল নিরুপমের সাম্‌নে। নিরুপমও কোন কথা না বলে চাবিটা হাতে নিয়েছিল।

কন্‌সলেট্-এর মাধ্যমে টিকিট জোগাড় করতে পুষ্পনিভার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি'। দু'হপ্তার ছুটি এবং একমাসের

আগাম মাহিনা নিয়ে সে সোজা চলে এসেছে পুরীতে, কারণ জায়গাটা তার পূর্ব্বপরিচিত। উঠেছে রেলওয়ে হোটেলে, যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব নেই, কিন্তু যতটা ভাল লাগ্‌বে ভেবেছিল তা' লাগছেনা।

ছুটির মৌসুম কয়েক হপ্তা আগেই শেষ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে, হোটেলে অতিথিদের ভীড় অপেক্ষাকৃত কম। বেশীর ভাগ সময়ই পুষ্পনিভা কাটাচ্ছিল তার কামরায়, পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে নানা প্রশ্নে তাকে হয়ত উদ্‌ব্যস্ত করে তুল্‌বে, এই ছিল তার ভয়।

পুরীতে পুষ্পনিভার তিনদিন কেটে গেছে। নিরুপমকে সে কোন চিঠি লেখেনি। শান্তভাবে ভাববার সময় সে চায়, উদ্বেল উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে কাজ সে কর্‌বেনা। পরে যেন তাকে অনুতাপ কর্‌তে না হয়।

সেদিন ব্রেকফাষ্ট্‌-এর পর পুষ্পনিভা বেরিয়েছিল সমুদ্রের ধারে বেড়াতে, একহাতে বর্ষাতি, আরেক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ও একখানা বই। হোটেল থেকে বেশ খানিকদূরে এগিয়ে গিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বর্ষাতিটা পেতে সে বস্‌ল এবং বইএর পাতায় মনোনিবেশ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ল।

মিনিট পনেরোও কাটেনি', হঠাৎ সে অনুভব কর্‌ল একটু দূর থেকে বাইনোকুলার দিয়ে এক ভদ্রলোক যেন তাকে দেখছেন। অত্যন্ত বিরক্তি বোধ কর্‌ল সে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বস্‌ল।

ততক্ষণে ভদ্রলোকটি তার দিকে এগিয়ে এসেছেন।

—মাপ কর্‌বেন, আপনাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কাল থেকেই আপনাকে লক্ষ্য কর্‌ছি। কিন্তু আলাপ কর্‌তে সাহস পাচ্ছিলাম না।···আপনি কি মিসেস পুষ্পনিভা মিত্র।

তির্য্যক্ ভঙ্গীতে পুষ্পনিভা তাকাল আগন্তুকের দিকে। সুবেশ, পরিচ্ছন্ন, অল্পবয়সী ভদ্রলোক, অনেকটা যেন কবিভাবাপন্ন। কিন্তু পুষ্পনিভা একে এর আগে কখনও দেখেছে বলে ত মনে কর্‌তে পার্‌ছেনা! তবে তার নাম জান্‌ল কি করে?···ওঃ হো, নিশ্চয়ই হোটেলের অফিস থেকে জেনে নিয়েছে। সমুদ্রতীরে, ছুটির জায়গায় এরকম পূর্ব্বপরিচয়ের সূত্র ধরে আলাপ জমানোর প্রয়াসের কাহিনী সে অনেকের কাছেই শুনেছে। তার সঙ্গে কোন পুরুষসঙ্গী নেই দেখেই বোধ হয় ভদ্রলোকের সাহস বেড়েছে।

সংক্ষেপে সে বল্‌ল, আপনাকে আমি কখনও দেখেছি বলে ত মনে হচ্ছেনা!

ভদ্রলোক যেন পুষ্পনিভার মুখ থেকে উচ্চারিত কোন একটা কথার প্রতীক্ষায় ছিলেন। জবাবটা লুফে নিয়ে বল্‌লে, এবার আর কোন সন্দেহ নেই, আপনিই পুষ্পনিভা মিত্র। আমাকে ভুলে গিয়েছেন? আমি প্রিয়কান্ত রায়।

প্রিয়কান্ত রায়? নামটা শুনেও পুষ্পনিভার কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না, সে চুপ করে রইল।

আগ্রহান্বিত স্বরে প্রিয়কান্ত বল্‌ল, এখনও মনে পড়ছে না? একটু ভেবে দেখুন না!

অত্যন্ত বিরক্তি বোধ কর্‌ল পুষ্পনিভা। কোথায় কবে হয়ত দেখা হয়েছিল। তার সামান্য ছুতো ধরে সমুদ্রের ধারে ভাব জমাবার এই প্রয়াস—বিশেষ করে একজন বিবাহিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে—অত্যন্ত অশোভন।

বল্‌ল, দেখুন, কোথাও হয়ত আপনি আমাকে দেখেছেন, হয়ত মুখচেনাও ছিল, কিন্তু তার জের টেনে এখানে নতুন ক'রে বন্ধুত্ব করাটা আমার ধাতে আসেনা। আমাকে মাপ করবেন।

ব'লে পুষ্পনিভা বইএর পাতার দিকে দৃষ্টি সংযোগ কর্‌ল।

প্রিয়কান্তের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য লাল হয়ে উঠল। সে বল্‌ল, আপনাকে বিরক্ত কর্‌বার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না, বিশ্বাস করুন্। আচ্ছা, নমস্কার।

ব'লে সে উল্‌টো দিকে হাঁট্‌তে সুরু কর্‌ল।

পুষ্পনিভা অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। বই-এর দিকে আবার মন দিতে চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু দেখ্‌ল সম্ভব নয়। তারপর হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাক্-এর মত তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল কয়েক বছর আগেকার দু'একটা খণ্ড দৃশ্য—অত্যন্ত অস্পষ্ট, যা' তার মনে এতটুকু রেখাপাত করেনি' এবং যার জন্য প্রিয়কান্তকে সে যথার্থই চিনতে পারেনি'।

ঘণ্টাখানেক পরে হোটেলে ফিরতেই রিসেপ্শনের কেরাণীবাবু পুষ্পনিভাকে দিল একখানা চিঠি। চিঠি? এখানে সে এসেছে এ খবর আবার কে জান্ল এরই মধ্যে? ভ্রূ কুঁচকে খামটা হাতে নিল সে।

দেখ্ল, ডাকে আসেনি চিঠিটা, স্থানীয় কেউই হয়ত হোটেলে রেখে গিয়েছে।

চিঠিটা সংক্ষিপ্ত, অথচ সুস্পষ্ট :

"পুষ্পনিভা দেবী, আপনি আমাকে চিন্তে না পারার ভাণ করায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত, একটু অপমানিতও বোধ করেছি। কিন্তু এভাবে পরাভব স্বীকার কর্তে আমি প্রস্তুত নই। আজ বিকেলের দিকে গোটা পাঁচেকের সময় আস্ব, আমার পরিচয়পত্র দাখিল কর্তে। আশা করি আপনাকে পাব। প্রিয়কান্ত রায়।"

পুষ্পনিভার প্রথমে মনে হ'ল ম্যানেজারের শরণাপন্ন হবে, বল্বে এই অসভ্য লোকটাকে যেন কিছুতেই হোটেলের ত্রিসীমানায় আস্তে দেওয়া না হয়। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার খেয়াল হ'ল, এরকম কোন ষ্টেপ্ নেওয়াটা অত্যন্ত ছেলেমানুষির পরিচায়ক হবে। হাজার হোক্, প্রিয়কান্ত রায় যে চিঠি লিখেছে তার মধ্যে অধ্যবসায়ের চিহ্ন থাক্তে পারে, কিন্তু অভদ্রতার ছাপ নেই।

কিন্তু সে কি অন্য কোথাও চলে যাবে, যাতে প্রিয়-কান্তের সম্মুখীন হতে না হয়।...না, এরকম কাপুরুষের মত ব্যবহার সে কর্বে না। দেখাই যাক্ না, কি পরিচয়-পত্র দাখিল কর্তে চায় প্রিয়কান্ত।

মধ্যাহ্নের আহার-পর্ব্ব সমাধা ক'রে একটু গড়িয়ে নিল, পুষ্পনিভা। চারটের সময় বেয়ারা চা' দিয়ে গেল তার কামরায়। ধীরে সুস্থে চা' খাওয়া শেষ করে বৈকালিক সজ্জায় সাজল সে, তারপর এসে বস্ল হোটেলের লাউঞ্জ-এ, প্রিয়কান্তের প্রতীক্ষায়।

ঘড়ির কাঁটাটা সবে মাত্র পাঁচটা বেজে দু'মিনিটে এসেছে, পুষ্পনিভা লক্ষ্য কর্ল প্রিয়কান্ত রিসেপ্শন ডেস্ক-এ এসে কি যেন প্রশ্ন করল, রিসেপ্শনিষ্ট চোখের ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিল পুষ্পনিভা যে কোণটিতে বসে রয়েছিল সেই কোণটিকে।

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে প্রিয়কান্ত সাম্নে এসে দাঁড়াল। বল্ল, এই যে, আপনি এখানেই রয়েছেন। আমার চিঠি পেয়েছেন আশা করি।

ঘাড় নেড়ে পুষ্পনিভা জানাল যে সে পেয়েছে।

—তাহ'লে বস্তে পারি ত? আপনার কোন আপত্তি নেই আশা করি?...ব'লে কোন জবাবের অপেক্ষা না রেখেই সে পুষ্পনিভার সম্মুখীন একটা আরামচেয়ারে বসে পড়্ল।

—খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, সাড়ে চারটা বেজে গেছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসেছি, হাঁপিয়ে উঠেছি।...বলে চল্ল প্রিয়কান্ত।

এবার পুষ্পনিভা মুখ খুল্ল। বল্ল, কি পরিচয়পত্র দেখাবেন বলেছিলেন, দেখি!

—আপনাকে ধাপ্পা দিতে আসিনি, মিসেস্ মিত্র। আপনার সন্দেহ আমি দূর কর্বই।...আচ্ছা, বলুন ত, ফিফ্থ ইয়ারে যখন পড়্তেন তখন অনিমেষ ব্যানার্জ্জি আর রেবা ভৌমিকের সঙ্গে খুব ভাব ছিল ত আপনার? সিক্স্থ্ ইয়ারে রেবা ভৌমিক যখন বিলেত চলে গেল, তখন বেশ কিছুদিন আপনি অনিমেষ ব্যানার্জ্জির দিকে ঝুঁকেছিলেন, মনে পড়ে? তারপর আপনার বিয়ে হয়ে গেল নিরুপম মিত্রের সঙ্গে, অনিমেষ ব্যানার্জ্জিও তখন মনের দুঃখে সাগরপারে পাড়ি দিল।...এবার বিশ্বাস হচ্ছে ত, আমি আপনার অপরিচিত নই?

বিস্ফারিত চোখে পুষ্পনিভা প্রিয়কান্তের কথা শুন্ছিল। এ পর্য্যন্ত যতটুকু বলেছে তার প্রত্যেকটি খাঁটি সত্য, কিন্তু প্রিয়কান্ত এসব জানল কি করে? অনিমেষ বা রেবার কাছ থেকে শুনেছে কি? কি এর মতলব? ব্ল্যাক্মেল নয় ত?

প্রিয়কান্ত তখনও বকে চলেছে, বিয়ের পরও মাস ছয়েক আপনি স্বামীর ঘর করেন্নি। বাহ্যিক কারণ, এম. এ. পরীক্ষাটা দিতে হবে। আসল কারণ, অনিমেষের প্রতি আপনি যে ব্যবহার করেছিলেন তার জন্য গভীর অনুশোচনা। মনের এই অবস্থায় আপনি পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই পুরীতে এসেছিলেন, ছিলেন সেই সীফেস্ লজ্-এ, সেবারও এবারকার মত একা।...আরও শুন্তে চান্?

বিহ্বলের মত পুষ্পনিভা শুনছিল প্রিয়কান্তের বর্ণিত

ইতিহাস। স্খলিতকণ্ঠে সে বল্‌ল, কিন্তু আপনি, আপনি কি করে এসব জান্‌লেন?

—কি ক'রে জান্‌লাম? সীকেস্ লজ্-এ আপনার পাশের কামরায় আপনারই বয়সী অত্যন্ত লাজুক একটি ছেলের চেহারা আপনার মনে পড়ে? যে আপন মনে বাঁশী বাজাত, একা একা ঘুরত এবং একদিন যার বাঁশীর সুর আপনাকে এত উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল যে—আপনি তার কাছে গিয়ে সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সে যেন বাঁশী আর না বাজায়।

সম্মোহিতভাবে পুষ্পনিভা প্রশ্ন করল, তার পর?

—তারপর? তারপর আরও শুনতে চান্? ছেলেটি আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করেনি। বাঁশী বাজানো সে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। তার বদলে সে আপনার কাছ থেকে চেয়েছিল সামান্য একটু সহানুভূতি, একটু সাহচর্য্য। আপনি দিতেও হয়ত প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আপনার হৃদয়কে আপনি নিরস্ত ক'রে রেখেছিলেন আপনার বুদ্ধির কশাঘাতে।

-মিথ্যে কথা।...পুষ্পনিভা বলে উঠ্‌ল, কিন্তু তার অস্বীকৃতি শোনাল অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষীণ।

—যদি মিথ্যে কথা হয়ে থাকে তাহ'লে আমাকে দেখে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? কেন স্বীকার কর্‌ছেন না যে আমার মত গভীরভাবে আপনাকে কেউ ভালবাসেনি', না অনিমেষ ব্যানার্জি, না নিরুপম মিত্র?

বল্‌তে বল্‌তে প্রিয়কান্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

যেন বহুদূরাগত সঙ্গীত শুনছে এম্‌নি ভঙ্গীতে পুষ্পনিভা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। প্রিয়কান্ত যা' বল্‌ছে তাই কি সত্যি? তার অবচেতন মনের দ্বিধা এবং সঙ্কোচের জন্যই কি প্রিয়কান্তকে সে চিন্‌তে চায়নি'? কিন্তু জ্ঞানতঃ সে ত কোন লুকোচুরি করেনি' প্রিয়কান্তের সঙ্গে, না দশবছর আগে, না এখন। প্রিয়কান্তকে চিন্‌তে না পারার একটা বড় কারণ যে রয়েছে। দশবছরে প্রিয়কান্ত এমন বদ্‌লে গেছে যে, পুষ্পনিভা কেন, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট কেউ নিশ্চয়ই আজ হঠাৎ দেখে তাকে চিনতে পার্‌তনা।

পুষ্পনিভা বল্‌ল, আপনি সত্যি ভয়ানক বদ্‌লে গেছেন, প্রিয়কান্তবাবু। আপনাকে চিন্‌তে না পারার ভাণ আমি করিনি।

প্রিয়কান্ত খপ করে পুষ্পনিভার একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বল্‌ল, তাহ'লে আপনি বিশ্বাস কর্‌ছেন আমি আপনাকে ভালবেসেছিলাম, এখনও বাসি?

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পুষ্পনিভা বল্‌ল, ছেলেমানুষি কর্‌বেন না প্রিয়কান্তবাবু।

—ছেলেমানুষি?...আহতস্বরে বল্‌ল প্রিয়কান্ত।

—ছেলেমানুষি ছাড়া আর কি! দশবছর আগে আপনি যে ধূসর অবাস্তব জগতে ছিলেন এখনও সেখানেই রয়ে গেছেন। আমি আপনাকে ভাল্‌বাসতে প্রস্তুত ছিলাম, এটা নিতান্তই আপনার মন-গড়া ছবি।

—তার মানে তুমি এখনও নিজের কাছে ধরা দিতে রাজী নও?.....এই প্রথম প্রিয়কান্ত পুষ্পনিভাকে "তুমি" বলে সম্বোধন করল।

—ধরা-দেওয়া-না দেওয়ার প্রশ্নই উঠ্‌ছেনা, প্রিয়কান্ত-বাবু। ধরা দেবার পর্য্যায়ে কোনদিনই পৌঁছুইনি'... দৃঢ়স্বরে পুষ্পনিভা জবাব দিল।

তারপর বল্‌ল, আচ্ছা, আসুন তাহ'লে।

প্রিয়কান্ত চলে যাবার পর পুষ্পনিভা চুপকরে বসে ভাবতে লাগল সেই অতীত দিনগুলোর কথা। সীকেস্ হোটেলে সেবার সে থেকেছিল মাসখানেকেরও বেশী। কিন্তু প্রিয়কান্তের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল মাত্র শেষ সপ্তাহে। তা'ও ঐ প্রিয়কান্ত একটু আগে যা' বল্‌ল,— তাকে বাঁশী বাজাতে বারণ করার উপলক্ষ্য করে। সেই ঘটনার পর বড়জোর দু'তিনবার প্রিয়কান্তের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা হয়েছিল, অত্যন্ত মামুলি ভদ্রতাসূচক বাক্য-বিনিময়। না, সে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে—প্রিয়কান্তের প্রতি সে মোটেই আকৃষ্ট হয়নি', হবার সম্ভাবনাও ছিলনা, কারণ অনিমেষের স্মৃতিতে তার চেতন-অবচেতন মন দুইই ছিল ভরপূর।

তবে, হ্যাঁ, বিপন্ন বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে এখন সে বুঝতে পারছে, প্রিয়কান্ত হয়ত সত্যি তাকে ভালবেসেছিল। এখন তার মনে পড়ছে কতকগুলো অর্দ্ধবিলুপ্ত ছবির স্মৃতি—প্রিয়কান্ত প্রত্যহ কিভাবে দরজার সাম্‌নে বসে থাকত—কখন সে বেরুবে তার প্রতীক্ষায়। পুষ্পনিভার সঙ্গে একত্রে বায়ুসেবনে যাবার সাহস তার ছিলনা, শুভেচ্ছা

আলাপক দু'একটি কথার বিনিময় করেই সে খুসী থাক্‌ত। আর মনে পড়ে সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটা—যেদিন সে হোটেলের বিল্ চুকিয়ে দিয়ে এসেছে নিজের ঘরে, সুটকেশ ইত্যাদি তৈরী রয়েছে কিনা তত্ত্বাবধান কর্‌তে। লাজুক প্রিয়কান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল। আপনি বুঝি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন? পুষ্পনিভা জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ. আমার মেয়াদ এবার ফুরুলো। প্রিয়কান্ত প্রশ্ন করেছিল, সাম্‌নের বছর আস্‌বেন না? পুষ্পনিভা লঘুস্বরে বলেছিল, আস্‌ব নিশ্চয়ই, সীফেস্ হোটেলের মায়া কি সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়?……তাই এই শেষের কথাটি শুনে প্রিয়কান্তের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কি? খুব চেষ্টা করেও পুষ্পনিভা সঠিক বল্‌তে পারেনা।

একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌছুল পুষ্পনিভা। যদি প্রিয়কান্ত আবার তার কাছে আসে, তাহলে সে তাকে স্পষ্টভাষায় বলে দিবে, তার সাহচর্য্য সে চায়না। না, ভাবপ্রবণ প্রিয়কান্তকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত হবেনা।

পরের দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে পুষ্পনিভা দেখে, প্রিয়কান্ত তারই অপেক্ষায় পায়চারি কর্‌ছে। পুষ্পনিভাকে দেখেই সে এগিয়ে এল।

বল্‌ল, তোমার আজ দেরী হ'ল যে!

আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক ত এই প্রিয়কান্ত! বিরক্তির সঙ্গে পুষ্পনিভা জবাব দিল, আপনার সঙ্গে কোন অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করেছিলাম বলে ত মনে হচ্ছে না!

—না, অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করোনি,' সত্যি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জান্‌তে আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করব।

—কি পাগলের মত যা'তা' বল্‌ছেন আপনি, প্রিয়কান্তবাবু? এইভাবে আমাকে অনুসরণ না করলেই আমি আমি খুসী হব।

—কিন্তু আমার কয়েকটা কথা তোমাকে শুনতেই হবে, পুষ্পনিভা। দশ বছর অপেক্ষা করবার পর এই সুযোগ আমি পেয়েছি, তোমার মূল্যবান্ সময়ের খানিকটা অংশ আজ আমাকে দিতেই হবে।

প্রিয়কান্তের মিনতি-ব্যাকুল চোখের দিকে তাকাল পুষ্পনিভা। তারপর বল্‌ল, বেশ, বলুন কি বল্‌তে চান্।

—একটু বস্‌লে ভাল হ'তনা?…প্রিয়কান্ত বল্‌ল।

ক্লান্তস্বরে পুষ্পনিভা বল্‌ল, আসুন।

সমুদ্র সৈকতে বালির উপরই বস্‌ল তারা।

এক নিঃশ্বাসে প্রিয়কান্ত বলে গেল তার কাহিনী। মনে হয়, যেন নিটোল গল্প বল্‌ছে।…সেবার কল্‌কাতায় ফিরে গিয়েই প্রিয়কান্ত পুষ্পনিভা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু যখন জান্‌তে পার্‌ল যে সে নিরুপম মিত্রের পরিণীতা—তখন সে শক্ খেল। মিসেস্ মিত্রের পশ্চাদ্ধাবন করাটা যে শোভন হবেনা এই বুদ্ধিটুকু তার তখনও লোপ পায়নি'। তবু তার মনে একটু ক্ষীণ আশা রয়ে গেল, ছোট্ট দুটি বিষয় উপলক্ষ্য করে। প্রথম, পুষ্পনিভার সেই উক্তি, সীফেস্ হোটেলের মায়া কি সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়, আস্‌ব বই কি? দ্বিতীয়, বিবাহিত জীবনে সে নিশ্চয়ই সুখী হতে পারেনি', নইলে বিয়ের অব্যবহিত পরে কোন নব-পরিণীতা বধূ কি চলে আসে পুরীর মত জায়গায়, একা পুরো একটা মাস কাটাতে?…তাই প্রিয়কান্ত প্রতি বছর ঐ সময়টায় পুরীতে এসেছে, সীফেস্ হোটেলে উঠেছে, এই আশায় যে পুষ্পনিভা হয়ত কোন না কোন দিন আস্‌বেই। সুদীর্ঘ দশ বছর পরে তার ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের পুরস্কার সে লাভ করেছে, অবশেষে পুষ্পনিভার দেখা সে পেয়েছে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এবারও পুষ্পনিভা পুরীতে এসেছে একা, তার অবচেতন মনের আকর্ষণে! নয় কি?

চুপ ক'রে সব শুনল পুষ্পনিভা। প্রিয়কান্তের প্রগল্‌ভতায় রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ কর্‌লনা সে, বরং স্নেহমিশ্রিত একটা অনুকম্পাই যেন তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠ্‌ল।

সে বল্‌ল, শোন, প্রিয়কান্ত, নাম ধরেই ডাক্‌ছি, এসব কল্পনাবিলাস ছেড়ে দাও। তোমার এ ভালবাসার কোন পরিণতি হবেনা, হতে পারেনা, এটা বুঝতে চেষ্টা ক'রো।

—কিন্তু কেন হবেনা, পুষ্পনিভা?

—প্রধান কারণ, আমার মন তোমার প্রতি কোনদিনই আকৃষ্ট হয়নি'।

—হবার কোনই সম্ভাবনা কি নেই?…খিন্নস্বরে প্রশ্ন কর্‌ল প্রিয়কান্ত।

—না; নেই।…দৃঢ়স্বরে জবাব দিল পুষ্পনিভা।… আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আমি পুরীতে এসেছি

এটা যদিও ঠিক, তার মানে এই নয় যে আমি আর কারোর ভালবাসায় নিজেকে সমর্পণ করে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি। আর ঐ যে অনিমেষের কথা বলেছিলে, ওই পাগ্‌লামিও কাটিয়ে উঠেছি বহুদিন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, তুমি বয়সে আমার সমসাময়িক হ'লেও তোমার অনুভূতি এখনও কৈশোরের স্তরে রয়েছে। আর আমি প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসে পড়েছি!

—কি যে—যা' তা' বল্‌ছ তুমি!···প্রতিবাদ কর্‌ল প্রিয়কান্ত।

তার গায়ে একটা হাত রেখে পুষ্পনিভা বল্‌ল, আমাকে দিদির আসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহ'লে তোমার স্নেহের উপচার আমি গ্রহণ কর্‌তে রাজী আছি।

পুষ্পনিভার এই আমন্ত্রণ প্রিয়কান্তের মনঃপুত হ'ল কিনা বোঝা গেলনা। সে শুধু বল্‌ল, ভেবে দেখ্‌ব।

একটু বাদে প্রিয়কান্ত চলে গেল, পুষ্পনিভাও ফির্‌ল হোটেলে।

নিতান্ত অনুকম্পার বশীভূত হয়েই পুষ্পনিভা তার শেষের প্রস্তাবটা করেছিল, যাতে প্রিয়কান্ত নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারে। তাছাড়া সে আশা করেছিল যে, এবার বোধ হয় প্রিয়কান্ত তাকে আর অনুসরণ কর্‌বেনা। কিন্তু দু'দিন বাদেই সে বুঝতে পার্‌ল, প্রিয়কান্তের এই ব্যাধি সারবার নয়।

মাঝখানে মাত্র একটা দিন প্রিয়কান্ত তার সঙ্গে কোন সংযোগ স্থাপন করেনি'। আটচল্লিশ ঘণ্টাও কাট্‌লনা পুষ্পনিভার কামরায় টেলিফোন বেজে উঠ্‌ল।

—আমি প্রিয়কান্ত কথা বল্‌ছি।

—ব'লো।

—তুমি কোণারকে গিয়েছ?

—না, কেন?···বিস্মিতস্বরে পুষ্পনিভা বল্‌ল।

—আমার এক বন্ধুর গাড়ী জোগাড় করেছি। কাল যাবে?···আগ্রহান্বিত স্বরে প্রিয়কান্ত প্রশ্ন কর্‌ল।

—না, আমার সময় হবেনা।···পুষ্পনিভা জবাব দিল।

—এসোনা, পুষ্পনিভা। একা একা যেতে ইচ্ছে করছেনা, তাই না তোমাকে অনুরোধ কর্‌ছি।

একটু নরম হ'ল পুষ্পনিভা। বল্‌ল, যেতে রাজী আছি, এক সর্ত্তে।

—কি সর্ত্ত?

—ঐ সব ভালবাসাবাসির কথা তুমি মুখে আন্‌বেনা—এই প্রতিশ্রুতি যদি দাও তা'হলে আস্‌তে পারি।

—চেষ্টা কর্‌ব।···করুণস্বরে বল্‌ল প্রিয়কান্ত।

—চেষ্টা নয়, প্রতিশ্রুতি চাই।

—আচ্ছা, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কাল ব্রেকফাষ্ট-এর পরই বেরিয়ে পড়্‌ব, আমি গাড়ী নিয়ে ন'টার মধ্যেই তোমার ওখানে হাজির হ'ব।

প্রিয়কান্ত টেলিফোন ছেড়ে দিল।

পুষ্পনিভা শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসই করেনি' প্রিয়কান্ত তার প্রতিশ্রুতি রাখ্‌বে। ওটা প্রিয়কান্তের মুখের কথা মাত্র, কোন না কোন অজুহাতে সে আবার আর চিরন্তন টপিক্‌-এ এসে হাজির হবে। কিন্তু সে সত্যি অবাক্ হয়ে গেল—যখন সে দেখল যে প্রয়োজন হলে প্রিয়কান্ত নিজেকে সংযত ক'রে রাখতেও জানে।

ফের্‌তা পথে রেলওয়ে হোটেলে তাকে নামিয়ে দেবার সময় প্রিয়কান্ত প্রশ্ন কর্‌ল, প্রতিশ্রুতি রেখেছি কিনা ব'লো!

পুষ্পনিভা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হ'ল, প্রিয়কান্ত তার কথার খেলাপ করেনি'।

প্রতিশ্রুতি যে সাময়িক—তা' পুষ্পনিভা টের পেল পরের দিনই ব্রেকফাষ্টের পর প্রিয়কান্ত সোজা তার হোটেলের কামরায় এসে হাজির।

প্রিয়কান্তের আগের দিনের ব্যবহারে পুষ্পনিভার মন খুশীই ছিল। সে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই প্রিয়কান্তকে অভ্যর্থনা কর্‌ল।

—আজ তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া কর্‌তে এসেছি।···প্রিয়কান্ত বল্‌ল।

বোঝাপড়া? সে আবার কি? বিস্ময়াপ্লুত চোখে পুষ্পনিভা তাকাল তার দিকে।

—তুমি সেদিন বলেছিলে—আমি একটা ধূসর অবাস্তব জগতে রয়েছি। আমি বল্‌ছি, ধূসর অবাস্তব জগতে রয়েছ তুমি। ভালবাসার উপঢৌকনকে তুমি প্রত্যাখ্যান করে এসেছ, মনের কাছে স্বীকৃতি কর্‌বার সাহস নেই বলে।

কাঁচের স্বর্গে বসে থেকোনা, পুষ্পনিভা, মাটির পৃথিবীতে নেমে এসো।

বল্‌তে বল্‌তে প্রিয়কান্ত আবার আগের মত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল।

প্রিয়কান্তের এই উচ্ছ্বাসে পুষ্পনিভার বিরক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সভয়ে সে অনুভব কর্‌ল, প্রিয়কান্তকে ঘর থেকে বার করে দেবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। প্রিয়কান্তের এই স্তুতি, এই নিষ্ঠা আর যেন তেমন হাস্যকর, তেমন অর্থশূন্য মনে হচ্ছেনা।

তবু সে বল্‌ল, আবার পাগলামি সুরু কর্‌লে প্রিয়কান্ত? আমাদের মধ্যে না একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে—যে তুমি আমাকে তোমার দিদির সম্মান দেবে?

—এমন কোন প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি'।...সজোরে বল্‌ল প্রিয়কান্ত।...ওসব নিরর্থক ওজর তুলোনা।

—কি চাও তুমি?...প্রশ্ন কর্‌ল পুষ্পনিভা।

—কি চাই তা'কি আরও স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে? আমি চাই তোমার ভালবাসা, যে ভালবাসার জন্য এই সুদীর্ঘ দশবছর অপেক্ষা ক'রে রয়েছি।

—অসম্ভব।...বল্‌ল পুষ্পনিভা।

—অসম্ভব নয়, পুষ্পনিভা। ভেবে দেখো।

প্রিয়কান্ত উঠে পড়্‌ল।

—তুমি আমার কাছে আর এসোনা।...কাতরভাবে বল্‌ল পুষ্পনিভা।

—বৃথা অনুরোধ। আমাকে আস্‌তেই হবে, যতদিন না তুমি নিজেকে চিন্‌তে পারো।

অত্যন্ত অসহায় বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল পুষ্পনিভা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, সত্যি বুঝি সে ভুল কর্‌ছে। প্রিয়কান্তের এই উপহার গ্রহণ কর্‌লে কি ক্ষতি হতে পারে তার? নিরুপমকে ত সে কোনদিন ভালবাসেনি', তাছাড়া নিরুপমের ব্যবহার, তার সন্দিগ্ধতা অসহ্য হয়ে উঠেছে দিন দিন।...আর অনিমেষ? অনিমেষের স্মৃতি প্রায় অবলুপ্ত হয়ে এসেছে তার কাছে। অনিমেষ তাকে বর্জ্জন করে সানন্দে গ্রহণ করেছে রেবা ভৌমিককে। তবে কেন সে নিজেকে প্রতিহত ক'রে রাখ্‌বে অন্ধ কতকগুলো সংস্কারের জন্য? প্রিয়কান্তের প্রেমকে—যা' দশবছরে এতটুকু ক্ষীণ হয়নি', বরং আরও উজ্জ্বল, আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে—স্বীকার করে নিতে এখনও তার কেন এত দ্বিধা?

পুরীর উদ্দাম সংস্কারবিহীন আবহাওয়ার স্পর্শ অবশেষে যেন পুষ্পনিভার গায়ে এসে লাগ্‌ল। সে স্থির কর্‌ল, আবার যদি প্রিয়কান্ত আসে (যদি কেন, আস্‌বেই) তা' হ'লে সে বল্‌বে যে বোঝাপড়া কর্‌তে তার আপত্তি নেই।

যথারীতি বৈকালিক ভ্রমণে পুষ্পনিভা বাইরে যাচ্ছিল, রিসেপশন ডেস্‌ক্‌-এর কেরাণীবাবু তাকে ডেকে বল্‌লেন, আপনার একখানা টেলিগ্রাম এসেছে, মিসেস্‌ মিত্র।

টেলিগ্রাম? টেলিগ্রাম কে পাঠাল? তার ঠিকানাই বা জান্‌ল কি করে? কন্‌সলেট্‌ থেকে পাঠায়নি' ত?

খামটা তাড়াতাড়ি খুল্‌ল সে। পড়েই তার মুখ শাদা হয়ে গেল। নিরুপম জানিয়েছে যে দার্জ্জিলিং থেকে খবর এসেছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে প্রবীর ভয়ানকভাবে জখম হয়েছে, অবস্থা মোটেই ভাল নয়, সে চাকরের হাতে বাড়ীর চার্জ্জ দিয়ে দার্জ্জিলিং-এ রওনা হচ্ছে, অসম্ভব না হলে পুষ্পনিভাও যেন চলে আসে।

কেরাণীটি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। প্রশ্ন কর্‌ল, কোন খারাপ খবর নয় ত মিসেস্‌ মিত্র?

কোন কিছুই যেন বোধগম্য হচ্ছিল না পুষ্পনিভার। খামটা হাতে নিয়ে সে বসে পড়্‌ল।

ঠিক সেই সময় প্রিয়কান্ত এসে উপস্থিত। পুষ্পনিভাকে ঐ ভাবে বসে থাক্‌তে দেখে সে উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করল, ওকি, পুষ্পনিভা? কি হয়েছে? টেলিগ্রাম? কার টেলিগ্রাম? মিঃ মিত্রের খবর ভালত?

কোন কথা না বলে টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিল পুষ্পনিভা।

টেলিগ্রামটা পড়ে প্রিয়কান্ত যেন একটু নিরাশ বোধ কর্‌ল। তারপর প্রশ্ন কর্‌ল, প্রবীর আবার কে?

—প্রবীর আমার ছেলে, দার্জ্জিলিং-এ বোর্ডিং স্কুলে পড়ে।...ভগ্ন কণ্ঠে পুষ্পনিভা জবাব দিল।...আমার যে ছেলে থাক্‌তে পারে সেটা বুঝি তোমার মাথায় এতক্ষণ ঢোকেনি?

বোকার মত হাস্‌ছে কেন প্রিয়কান্ত? আর সেই হাসিতে পুষ্পনিভাও যোগ দিচ্ছে নাকি?...অথবা, এটাও কি আমাদের চোখের ভুল?

সপ্তপদী

বাদল বরণ

(১)

পুরানো দিল্লী স্টেশনের সামনে দক্ষিণ দিকে "গান্ধী মেমোরিয়াল পার্ক।" মাঝখানে মহাত্মাজীর মূর্তি। উৎকীর্ণ রয়েছে নেহেরুজীর কটী কথা—

"Where he sat was a temple,
Where he walked, was hallowed ground."

সোজা রাস্তাটা পার্কের পূব পাশ দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে "ফুল্লারার" কাছে। ফুল্লারা—ফোয়ারা বা fountain পুরানো দিল্লীর নাড়ীর স্পন্দন সেখানে যায় শোনা। তার বনেদী স্পর্শও যায় পাওয়া—টানা যায় শতাব্দীর পুরনো ট্রাডিশনের ধারার সূত্রকে। ফুল্লারার দক্ষিণে চলে গেছে পূবে পশ্চিমে বিস্তৃত চাঁদনী চকের রাস্তা। পূবদিকে তাকালে কিলোমিটার ব্যবধানে চোখে পড়ে লালকিল্লা। সম্রাট শাজাহানের বিরাট কীর্তি—আর নেতাজীর স্বপ্ন সেখানে পৌছাবার। আজ সেখানে তিনরংগা পতাকা উড়ছে।

(২)

সেই ফুল্লারার মোড়ে "বেংগলী-সুইটসের" যে-দোকান চ্যাপ্টা রসোমালাই খাবার জন্য ভীড় করে দিল্লীওয়ালারা —আর পাশে ছোট একটা কাউন্টার। তামাম দিল্লীবাসী ও দিলীবাসিনীর দল সেখানে বাঁধা।

সোজা গিয়ে দাঁড়াতে হবে দোকানের সামনে। বসবো কোথা? ফুটপাতে?

কাউন্টারে উবু হয়ে বসে আছে কিষেণচাঁদ। সত্তর ছাপিয়ে চলেছে! হাতে গুঁজে দেবে সবুজ গোল পাতা। তিনটে কৌম্বলীভাজে রূপ নেবে একটা পাত্রের। অচিরে এসে পড়বে ফুঁচকা। কি চাই? সাদা না দহিবালে? শুধু দেখিয়ে দিতে হবে। মেহমান দিল্লীর খানদানীর সাথে পরিচিত কিনা। বুকনীতে মিঠাবুলী ঝরছে কিনা, কেউ তা লক্ষ্য করবে না। কোনো রকমে বলে দিতে হবে দু আনা কি তিন আনা। যা অভিরুচি—সাদা না দহি, আনায় তিনটে।

মিঠা হেঁসে এগিয়ে দিল পাতাখান। সেদিন আমারই দেরী। সাড়ে আটটা। ঝাঁপী বন্ধ করার সময়।

(৩)

তেশরা জুনের হিট-ওয়েভ বয়ে গেছে সবে দু-তিন দিন। তবু কোথায় সে শুষ্ক রুদ্রতা। কিষেণজীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঝরে পড়ছে সাদা দাড়ি বয়ে। বারে বারে হাত গামছা দিয়ে মুছে সেটাকে বন্ধ করার অহেতুক অপচেষ্টা তার।

শেষ খদ্দের বলে, হয়তো বা অনেকদিন মুখ-পরিচয়ের ফলে সেদিন তার কাজের অখণ্ড "মেকানাইজেশন" ভংগ হোল। কথা বললো কিষেণচাঁদ। কথা নয়, তার আফশোষ। খানদানী উর্দু-হিন্দুস্থানীতে যা বললো, তার তর্জমা হয় না, হয় টেপ-রেকর্ডিং। ক্ষণিকের মধ্যে তার টেপ-রেকর্ডিং এ পুরানো দিল্লীকে দেখেছিলাম।

(৪)

মাত্র বিশবছর আগেও, এ-দিল্লী ছিল অন্যরকম। ঘাম ঝরার কষ্ট হয়নি কখনো। অন্ততঃ ঘামতে ঘামতে ঘামাচি যায়নি শোনা। আমেজী বসন্তের পর হঠাৎ তীক্ষ্মভাবে মে-মাসের মাঝে উঠতো গরমী-হাওয়া। চড় চড় করে উঠতো তাপমানের পারা। "লু" বয়ে যেতো দক্ষিণের কোনা দিয়ে পশ্চিম থেকে পূব দিকে। আর সেই শুকনো হাওয়ায় দিল্লী থেকে মুছে যেতো শেষ নির্য্যাসটুকুও। গলা তালু শুকিয়ে কাঠ, ঠোট যেতো ফেটে। তবু ঘাম বেরোতো না। ঘামের কষ্ট নেই। দুপুরে তোফা করে আমপোড়ার সরবৎ, পুদিনা পাতার রস মিশিয়ে, জীরের গুড়ো দিয়ে, হিং এর গন্ধে জারিয়ে খালি টানতে হবে গ্লাস দুই। ব্যস্ আর পায় কে? সর্দি গর্মী আর ত্রিসীমানায় পারবে না আসতে।

কালকাজী থেকে কাশ্মীরী গেট তক পায়দলে চলি না কেন!

এমনি চলে যেতো জুলাই অবধি। তারপর দু এক পশলা মনসুন। কিঞ্চিৎ গুমোট, অল্প ঘাম। ব্যস্ সে-ও সেই অক্টোবরেই খতম। শুরু হোত সারে ইন্দ্রপ্রস্থের কুসুমসজ্জা। চলতো সারা শীতকাল ধরে। সেই মার্চ অবধি।

আর সে শীতকাল। উত্তরে কনকনে হাওয়া। সকালে জল জমিয়ে দেওয়ার মতো। তারপর একটু বৃষ্টি হোলোতে হাড় কাঁপানো শীত।

আর গরমকালে গরম অসহ্য হয়ে উঠতো; মরুর প্রান্তর থেকে উড়ে আসতো পশ্চিমের আকাশ হলুদ করে আঁধির ঝলক। ৫০।৬০ কিলোমিটার বেগে সে ধুলোর ঝড় দিল্লীর ওপর দিয়ে যেতো বয়ে। পালাতে না পারলে, তোমার চোখ-মুখ-চুল সব রাঙিয়ে হলুদ করে দেবে। কষ্ট হবে নিঃশ্বাস নিতে। এতো ভার সে হাওয়ার। ধুলোর ভার। দু-হাত দূরে যাবে না-দেখা এমনি গভীর ধুলোর আস্তরণ। বৃষ্টি নেই, শুধু ধুলোর ঝড়। আর সেই আঁধি চলবে দু-চার-পাচ ঘণ্টা। তারপর দিল্লীর সে-এক আমেজী আবহাওয়া। না-গরম, না-ঠাণ্ডা। এই কালকের পরিত্রাহি গরম পলকের মধ্যে যাবে মিলিয়ে। দু-চার দিন ধরে লোকে ভোগ করবে আঁধির স্নিগ্ধতা। আর যারা লাল-কেল্লার "দেওয়ানী আমের" মর্মর সজ্জা দেখবার জন্য কোনো এক জ্যোৎস্না-রাতের প্রতীক্ষা করে আছেন, তারা ব্যর্থ হবে। সে-আঁধি অন্ততঃ দু-চারদিন ঝিমিয়ে দেবে সব আলো। চাঁদের-আলো মনে হবে, যেন নেমে আসছে ঘষা-কাঁচের মধ্য দিয়ে। আর সূর্য্যের আলো,—সে এক হলদে পাতলা সামিয়ানা ভেদ করে। মিইয়ে যায় দেওয়ানী-আমের চুমকি।

(৫)

তবু সেই আঁধি আর হিটওয়েভের চলাফেরার মাঝ দিয়ে শতাব্দীকাল ধরে চলেছে দিল্লীর জনতা।

আঁধি নিয়ে আসে এ্যাল্লারজি, আর হিটওয়েভ নিয়ে আসে হিট্-ষ্ট্রোক, মৃত্যু।

কিন্তু সে দিল্লী আজ পালটে গেছে। হিটওয়েভ ও আঁধি দুই-ই আছে, তবে খাদে-নামা।

* * *

এখন পয়লা আষাঢ়ে নেমে পড়ে মেঘদূতেরা। মনসুনের মেঘ। এ-মনসুন শিলং পাহাড়ে ধাক্কা-খাওয়া বাসি-মনসুন নয়। এর জন্ম আরব সাগরের নিঃশ্বাস থেকে। পশ্চিমঘাটের গিরিশৃংগে পরশ বুলিয়ে চলে এসেছে রাজধানীর দিকে।

...পথে দেখেছে বোম্বের বন্দর। নাগবিদর্ভের Black Soil, আর হয়তো "কটনসীডের" গজানো নূতন-কিছু চারা।

দক্ষিণাপথের অলিন্দে প্রতীক্ষাবিধুর বধূদের চোখের জল বহন করে এনেছে, দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে খস্খসের পর্দার ভিতরে বিরহ-কাতর ক্লান্ত স্বামীদের উদ্দেশ্যে।

পয়লা-আষাঢ়ে একবার যদি ম্যাপের ওপর তাকানো যায়, মনসুন ট্রাকের লাইনের দিকে, দেখা যাবে সেই '৩'-কার "আইসো-বার" (Isobar) দার্জিলিং-কোলকাতা ছুঁয়ে, কটক থেকে কাণ্ডালা অবধি সিধে চলে গেছে। কাণ্ডালার এ-পাশে থর-মরুভূমিকে পাশ কাটিয়ে সে-কনটুর (Contour) আরাবল্লীর পূব দিকে একটু বাঁক নিয়েছে দিল্লীর দিকে ঝুঁকে।

তাই পূরবৈয়া মেঘের বৃষ্টির আগে মনসুনের মেঘ পৌছে যায় দিল্লীর ওপর। ঘটে যায় "হিউমিডিটির একস্কারসান" (Humidity Excursion) ।—যখন উত্তরাপথের গংগা-যমুনার শুকনো পেলব তৃষ্ণার্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে শিলং পাহাড়ের দিকে, উপাসনা করতে থাকে দূরাগত পূবের মনসুনের।

* * *

আগে আরব-সাগরের ক্লান্ত মেঘ দিল্লীর ওপর এতো সহজে নামতো না। তাকে প্রলুব্ধ করেছে দিল্লীর নতুন গজানো "গ্রীনারি"। নয়াদিল্লী বানাবার সময়, প্রত্যেক ফাঁকা সেন্টি-মিটারে রোপিত হয়েছিল হয় গাছ, নয় ঘাস। পুরানো দিল্লীর উষর প্রান্তর যা আগে থর মরুভূমির আওতায় প্রায় এসে গিয়েছিলো, তাকে রোধ করেছে অগণ্য Prosopis Juliflora-এর শ্রেণী। অনেকটা বাবলার মতো—সেই পরিবারেই।

(৬)

আরাবল্লী। মাউণ্ট আবুতে যার চরমস্ফীতি। রাজপুতানার সবুজ অঞ্চলকে রক্ষা করছে থরের হাত থেকে।

সেই আরাবল্লী উত্তরে এগিয়ে এসে দিল্লী পর্য্যন্ত করেছে ধাওয়া। দিল্লীতে সে শেষ হয়েও ক্ষিন্ন হয় নি। তাই তার "রীজ" (Ridge) শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিল্লীর পশ্চিম পাশ বেষ্টন করে আছে। রীজ আর যমুনার মাঝে এই দিল্লী সাত-সাম্রাজ্যের রাজধানী।

দক্ষিণে আরাবল্লী, আর উত্তরে হিমালয়। সেই প্রশস্ত পথ দিয়েই উত্তর-পশ্চিমের ইতিহাস ভারতবর্ষকে বারবার লান্ছনা জানিয়েছে। এই পথেই তাই তিনটে পাণিপথ। অক্ষৌহিনীর কুরুক্ষেত্র, আর তরাইনের সংগ্রাম।

* * *

নয়াদিল্লীর কালীবাড়ী থেকে রীজের পথে পায়ে পায়ে উত্তরে চললে, শংকর রোডে বুদ্ধ-জয়ন্তী পার্কের বিরাট হবু-সংস্থান দেখে সামনেই চোখে পড়বে Pusa Agricultural Institute এবং National Physical Labortory. (N. P. L)-এর সৌধমালা। আরও উত্তরে চললে সে-পথ একেবারে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আনবে নিয়ে—মরিস-নগরে। স্যার মরিস গয়ারের স্বপ্নের প্রাংগণে। হয়তো বা একসারি গবাক্ষ পড়বে চোখে। মরিস গয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে Gwyer Hall-এর গবাক্ষ। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট আর রিসার্চ-স্কলাররা বাঁধে কটা-বছরের আস্তানা।

সূর্য্য ফোটার বহু আগে, সে গবাক্ষ পথে যাবে শোনা ময়ুরের কেকাধ্বনি। আরাবল্লীর রীজে-রীজে এদের আস্তানা। রাত্রে কেকাধ্বনিকে কবিরাও ভুল করে হুক্কা বলে। সারারাত ধরে ময়ুর বনাম শিয়ালে কবিয়াল চলে—কেকা বনাম হুক্কার গানে। আর আঁধির সংগে কোনোদিন যদি বৃষ্টি নামলো তো, সেদিন সত্যিকারের পাখা মেলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ময়ুরের দল। আর উন্মত্ত হয়ে ওঠে গবাক্ষপথে চেয়ে-থাকা পোষ্ট-গ্রাজুয়েটদের স্মৃতির ময়ুর। "যখন বৃষ্টি নামলো।"

* * * *

মরিস নগর ছাড়িয়ে সে-রীজ আর পারেনি বেশী এগোতে। নেমে এসেছে "খাইবার পাশে" মালরোডের পথে। এগিয়ে গিয়েছে তিমারপুরের বসতির ভেতর। ক্রমে হারিয়ে গিয়ে থেমে গেছে যমুনার ক্লান্ত-ধারার কিনারে। কক্‌সিক্‌সের শেষ হাড়ের মতো, রীজের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে শা-আলমের পরিত্যক্ত কবর, তুঘলকী-আমলের মোটা "আরকিটেকচারের" (Architecture) অসমাপ্ত মসজিদ।

পশ্চিমগামী যে-কোনও রাস্তা—শংকর রোড বা রোটক রোড অথবা পাচকুই রোড বা পুসা রোড ধরে কোনোদিন উদাস প্রদোষে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়বে—যেখানে রীজ কেটে থরে থরে নতুন কলোনী উঠেছে গড়ে। প্যাটেল নগর, রাজেন্দর নগর, পুসা-ইনষ্টিটিউট বা N. P. L.। সবাই রীজের রক্তে নিয়েছে জন্ম। এখনো চলেছে সেই কোয়ারী-খোঁড়ার (Querry) রেশ। পাথর বার করার জন্য—যে-পাথরে তৈরী হবে প্রাসাদের ভিত, মসৃণ হবে রাস্তার পলেস্তারা।

ঘড়ির দিকে না-চেয়ে সূর্য্য ডোবার ক্লান্ত প্রতীক্ষা। কখন বাতি জ্বলে উঠবে ঘরে ঘরে। চোখে পড়বে দিগন্ত জুড়ে উচু-নীচু নানা স্তরে থাকো-থাকো জোনাকী যেন জ্বলে উঠেছে। মেট্রোপলিসের প্রস্তর সজ্জার এ-দৃশ্য কল্পনাকে টেনে নিয়ে চলবে মুসৌরীর পাহাড়ে।

(৭)

ইংরেজ বুদ্ধিমান। এ স্বীকৃতি আজও থাকবে। তারা নতুন ক্যাপিটাল গড়ে তুললো দিল্লীতে, যেদিন কোল-কাতা তার ম্যামথ্-পরিসর নিয়ে দেখা দিল প্রবালেমেটিক হয়ে। নতুন ক্যাপিটাল, নয়াদিল্লী। শুধু বাছা-বাছা শাসক শ্রেণী। আবদ্ধ থাকতো নয়াদিল্লীর শৃংখলে। সেক্রেটারিয়েট আর কোয়ার্টারের পোড়নে কাটাতো দিনগুলি। শুধু গরমে একবার পাহাড়ে ধাওয়া। তাও কেবল সৌভাগ্যবানদের জন্য। বড়লাটের পেছনে পেছনে চলতো সৌভাগ্যবানের মিছিল!

চলতো নৈনিতাল, মুসৌরী, সিমলা। তখনো কুলু-ভ্যালির চার্মে লোক মেতে ওঠেনি। মোনালির কথা শোনেনি কেউ। বেশী ঝামেলা তারা ক্যাপিটালে আনতে দেয়নি। পুরানো দিল্লীকে ছেড়ে দিয়েছিলো তার ভাগ্যের ওপর। লু, আঁধি, চৌচক আর গন্ধীনালা রাজত্ব করতো সেখানে। সেদিন লালকিল্লার পদ-প্রান্তরও তাই ছিল ঊষর।

আজকের সরকার দিল্লীকে বড়ো করবে মনস্থ করেছে। সারা ভারতবর্ষের রক্তে দিল্লীকে পরাবে ললাটটিকা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় ১০।১২ কি. ম. রেখে বেষ্টন করিয়েছে এক রিং রোড Ring Road দিয়ে। আর সেই প্রিসরের মাঝে পুরানো দিল্লী আর নতুন দিল্লী যুগপৎ উঠছে গড়ে। নতুনই বেশী। পুরানো দিল্লীর কেবল সংস্করণ।

উত্তরে "ওল্ড্ সেক্রেটারিয়েটের" পাশে যমুনার ধারে ধারে তার পশ্চিম পারে চলেছে সেই রিং রোড। আরও দক্ষিণে—ডাইনে একের পর এক চোখে পড়বে মহিম-চিহ্নগুলো। রেডফোর্ট, রাজঘাট দেখে আরও দক্ষিণে, চোখে পড়বে ফিরোজ শা কোটলা, Permanent Exhibition Ground (যেখানে W. A. F—World Agricultural F ir 1959-60 হলো)—আরও দক্ষিণে চোখে পড়বে "পুরানো কিল্লা"—হুমায়ুন—শেরশাহের সময়ে যার পত্তন। যার মাটির তলায় ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থ। চিড়িয়াখানা, হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধ—যাকে বলা হয় তাজমহলের পূর্বসূরী।

দেখে আরও দক্ষিণে নেমে লাজপতনগরের ভেতর দিয়ে চলতে হবে পশ্চিম মুখে—যেমন রিং-রোড টেনে নিয়ে চলে। ডাইনে পড়বে বিজয় নগর, আর বাঁয়ে দূরে নিঃসংগ কুতব মিনারের চূড়ো। সেখান থেকে পথ টানবে "চাণক্য পুরীর" দিকে—চিক্ করে চোখে পড়বে Diplomatic Enclave এর জৌলুস-দেওয়া বাড়ীগুলো। চোখে পড়বে অপূর্ব American Embassy, পালাম আর ক্যানটনমেন্টকে বাঁয়ে রেখে সে রিংরোড এবার ঘুরলো উত্তরের দিকে, চললো রীজ ভেদ করে। ডাইনে পড়লো পুসা ইনষ্টিটিউট—N. P. L আর খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে "রাজৌরী গার্ডেন"। পাশে লেখা Thar East Ext। থরমরু একদিন পায়ে পায়ে গুটি গুটি এগিয়ে এসেছিল। তাকে বাধা দিয়েছে সেই "প্রগোপিস জলিফ্লোরার" অগণ্য শ্রেণী। জলে ভিজিয়ে বালিতে তৈরী হয়েছে Humus। গজানো হয়েছে নতুন করে বনজ সম্পদ। সত্যিকার সাফল্য এনেছে "বনমহোৎসব"। ডাইনে কীর্তিনগর, রমেশনগরকে রেখে সে পথ আরও উত্তরে উঠে পূর্বে গেল বেঁকে। আর পরিণত হোল মাল রোডে। "খাইবার পাশে"র কাছে পুরা হোল রিং রোডের সার্কল। জানি না এ খাইবার পাশ বহন করছে কোন্ স্মৃতি। তবে উত্তর থেকে দিল্লী পৌছতে হলে, এই একমাত্র রাস্তা—যা ক্রমশঃ কাশ্মীরী গেটের মধ্য দিয়ে নিয়ে চলবে একেবারে দিল্লীর অভ্যন্তরে। দুররানীর দৌরাত্ম্য এই পথেই প্রবেশ করেছিল দিল্লীতে। লটকানো হয়েছিল কাশ্মীরী গেটে বাহাদুর শাহের শির।

* * *

এই রিং-রোডের মাঝে ভারতবর্ষের মেট্রোপলিশ উঠছে গড়ে। শুধু অগণ্য লোক নয়, শুরু হয়েছে নতুন নতুন ইন্ডাসট্রিয়াল এস্টেট। ওখলা, নজফ গড়, সব্জি মণ্ডী—সারা ভারতবর্ষের যা শ্রেষ্ঠ টেনে আনা সম্ভব, মেট্রোপলিশ তাই করেছে। National Museum, Art Gallery, Permanent National Exhibition Ground, National Stadium সব দিল্লীতে। ভারতবর্ষের প্রথম Atomic Thermal Plant সে-ও হয়তো বসবে দিল্লীর কাছে। এতো ভালো টেনে আনার সংগে অনিবার্য্য ভাবে টেনে আন্ছে কালোকে। তাই দিল্লীর পথে হাম্লা আজ সাধারণ ঘটনা। প্রসেসন, জিন্দাবাদ স্থলভ। ইংরেজদের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে নয়াদিল্লীর রাজপথে দেখেনি কেউ মিছিলের বাহার। কেবল অভ্যস্ত ছিল ভাইসরিগ্যাল ড্রাইভ দেখতে। আর আজ সেই মিছিল, বিক্ষুব্ধ জনতার স্রোত প্রকাশ নিচ্ছে পথে পথে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ !

(৮)

পাকিস্থান—উদ্বাস্তুদের আগমন—দিল্লীর হঠাৎ স্ফীতি এরা এর সব অনিবার্য্য কারণ। হয়তো সু চনায় এ কারণ এতো অনিবার্য্য ছিলনা। এ বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ অন্যত্র করা যেতে পারতো। অন্যত্র নবদিল্লী গড়া যেতো হঠাৎ আগত জনতার জন্য। কলকাতা গড়ে উঠলো, দুই শতাব্দীর ব্যবধানে সে পেলো পূর্ণ পরিণতি, তারপর অনিবার্য্যভাবে ধরলো তার decay। স্তিমিত ক্ষয়। অসংখ্য জন্জাল ক্লেদ, গ্লানি, সমস্যা তাকে পাকড়ে ধরলো। তবু অনেক দিন লেগেছে তার এ পরিণতিতে পৌছতে। দিল্লীকে এ পরিণতিতে পৌছাতে বেশীদিন হবেনা অপেক্ষা করতে। দিল্লীর স্পেক্টাকুলার বৃদ্ধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এর

অনিবার্য্য ধ্বংস। রাজধানীতে ফাটল ধরলে রাজতক্তও থাকে না অটুট!

তাই বুদ্ধিমানের মতো নিউইয়র্ক ছেড়ে আমেরিকানরা ওয়াশিংটনকে দিয়েছে ক্যাপিটালের মর্য্যাদা। "পেন্টাগনকে" আবদ্ধ করেনি নিউইয়র্কের স্কাই-স্ক্রেপারের খাঁচায়। করাচী ছেড়ে রাওলপিণ্ডির পথে চলেছে জেনারল আয়ুব খান। রাজনীতির চালে ভুল করেনি মহম্মদ-বিন-তুঘলক, পাঁচশ বছর আগেও তার দেবগিরি যাত্রায়। ভুল করলো শুধু আজকের সরকার!

দেখতে পাচ্ছি বিরাট মেট্রোপলিস গড়ে উঠেছে। একনিশ্বাসে লণ্ডন, নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন, মস্কো, নয়াদিল্লী উচ্চারিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রধানতম নগরীর আখ্যা লাভ করেছে মহানগরী দিল্লী। শুধু রিং রোডের বেষ্টনীর মধ্যেই বাস করছে আধকোটি লোক। প্রাসাদের ছয়লাকে পর্যাটকরা নতুন করে এর নাম দিয়েছে 'প্রাসাদ নগরী'। কলকাতা ভুলতে চলেছে তার গরিমা—আখ্যা—City of Palaces বলে। শোভায় সৌন্দর্য্যে মর্য্যাদায়, ঝলমল করছে মহিমান্বিত দিল্লী। হাঁটু গেড়ে সেক্রেটারিয়েটের দরবারে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে অংগ, বংগ, কলিংগের সামন্ত-প্রজারা। সে প্রসাদ-বণ্টনে বণ্টকের মনোপলি প্রায় কেড়ে নিয়েছে পঞ্চনদবাসীর দল, আর সাথী হয়েছে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের দৃঢ়মুষ্টি। আজ দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটের স্ট্রাটেজিতে স্থান নেই বংগ সন্তানের। সে ভাগ ভাগাভাগি করে নিয়েছে মূলতঃ পঞ্চনদ—আর কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরীর সন্তানেরা।

*

বৃটিশ শাসক মর্য্যাদা দিতে চেয়েছিলো কোয়ালিটির। তাই পরাধীন রেখেও মাত্র মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে তারা দিল্লী থেকে শাসন চালিয়েছিল অটুট পঞ্চাশ বছর ধরে। ধূম উঠলেও, তখন জলতে দেয়নি আগুন। আগুন জ্বলেছিল, তবে সে একেবারে শেষে, জাতীয়তা বোধের আগুন, আর সেই আগুনে দিল্লীর সপ্তম সাম্রাজ্য একেবারে গেল পুড়ে। সে আগুন ছিল অনিবার্য্য। যে অনিবার্য্য আগুন বারে বারে এসেছে, হেনেছে আঘাত। ইতিহাস করে দিয়েছে রাজা-রাজ্যকে জলবিম্বের মতো। মিশিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ। পুড়িয়ে দিয়েছে পৃথ্বিরাজের দিল্লী, ক্ষয়িত করেছে "কুতুব", "সিরি", "তুঘলগাবাদ", "জাহান পাশা", "ফিরোজাবাদ"। সে আগুনের উদগ্র ক্ষুধার সামনে "অস্তিম-গরিম দিন পনা" তবু দাঁড়িয়ে আছে "শাহাজাহানাবাদ" নয়াদিল্লী।

(৯)

এই উগ্র-উত্তপ্ত মদিরাতপ্ত অশ্বের মতো বেগবান রাজধানীর মাঝে অন্তঃসলিলা ফল্গু যায় পাওয়া। শুধু অন্বেষণের অপেক্ষা।

ফোয়ারার জল যেখানে উপ্‌ছে পড়ছে। তার পার্শ্বে সেই চাঁদনী। যার ধারে গান্ধী পার্ক। সেখানে নিমন্ত্রণ একদিন মাঝরাতে। পুরানো ট্রাডিশনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়তো হয়েছে। তবু ট্রাডিশন চলেছে সমানে। মুশায়ারার ট্রাডিশন। দিল্লীর কবি-সম্মেলনী। নতুন গজিয়েছে সিল্কী গোঁফ। পাক ধরেছে দাড়িতে। সবাইকে দেখা যাবে মুশায়ারার মঞ্চে। মাইকের সামনে সবাই বসে। ডাক পড়ছে একে একে। কেউ বা সলজ্জভাবে, কেউ বা প্রত্যয়ের সংগে পড়ে চলেছে তার "শহর" কাব্য-সাগরে তার পুষ্পাঞ্জলি। শেষ করছে, আর রসবিমুগ্ধ জনতা ঝুঁকে পড়ে মাথা নেড়ে আওয়াজ জাগাচ্ছে—"ওয়াঃ ওয়াঃ"। চলছে সারারাত ধরে। শেষরাতে হয়তো ভীড় পাতলা হয়ে এসেছে। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে, সত্যিকারের সমজদার। সাক্ষাৎ হতে পারে আফজল খাঁর। চেনা যাবে তার মেহেদী মাখানো দাড়ি—আর আদ্দির কোর্তায় সবুজ সুতোর কাজ দেখে। উৎসাহ থাকলে প্রত্যুষে "মুশায়ারার" শেষে তার পেছনে ধাওয়া করে ফতেপুরে তার আস্তানা দেখা যেতে পারে। কোনোদিন ও পথে গেলে নিশ্চয়ই দোতলার নীচে গবাক্ষে চোখে পড়বে সে দাড়ির ছায়া। কানে আসবে উর্দু শেহরের রেশ।

আলোমে সাজো সাজ মে
ওয়াশল সে বারকে ফিরাক্,
ওয়াশল মে মরগিয়া আঁরজু
হিজরো মে লজতে তলব ॥

থেমে থেমে দাড়িতে হাত বুলিয়ে কখনো বা স্বপ্নের ভারে চোখ মুদে ফেলে, কখনো বা উৎসাহে আঁখি জ্বেলে, বৃদ্ধ পড়ে যাবে তার শেহর। শুধু তো কবিতা নয়, এ-যে তার অনেক অনুভবের ফিলসফি!

বেদনার আনন্দের পৃথিবীর মাঝে,
বিরহের লগ্ন ভালো, মিলনের চেয়ে।
কামনার ক্লান্তি নামে, মিলন-মেলায়;
উদগ্র আহুতি পায়, বিরহ-অনলে ॥

"ওয়াশ্‌ল্ মে মর গিয়া আরজু" In the union dies the desire. তাই তো মিলনের মুহূর্তে কথা সরে না। শুধু চোখে চোখে তাকানো। "না-বলা তার কথাখানি জাগায়। হাহাকার" মনকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে চলে—না-বলা-কথা বক্তব্যের ভারে সে বিব্রত হতে চায় না। কিন্তু "হিজরো মে লজতে তলব", But in the separation flourishes it. তা না হলে কোন্ যক্ষ রামগিরি পর্বত থেকে আহ্বান জানাতো মেঘকে! কেমন করে সৃষ্টি হতো মেঘদূতের।

যমুনায় হাঁটু জল। সব জল দিল্লীর শুষ্ক প্রাংগণ শুষে নিয়ে শেষ করে দিয়েছে—দুটো ঘাস আর একটু ফুল ফোটাবার জন্যে।

যমুনা দিল্লীতে তাই অন্তঃসলিলা। আর অন্তঃসলিলা, দিল্লীর ঘনায়মান নতুন সৃষ্টির কটাহে মুশায়ারার রেশ!
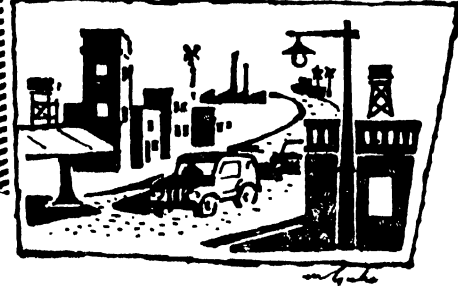
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শীতের মরসুম পরেই আসছে গ্রীষ্মের দাবদাহ। বসন্তের ঠাঁই এখানে সীমিত। বনে বনে আসে তার রূপবদলের পালা। শালবন পরে নোতুন সবুজ বাস—মহুয়াগাছের ঝরাপাতায় ফুলের মাদকস্বপ্ন শেষ হতে-না হতেই আসে সবুজ পত্রসম্ভার—পলাশ ফুলের রক্তরাগ গ্রীষ্মের শুকনো উত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই ঝরে পড়ে।

বাতাসে ফাটতে থাকে শিমূল ফলের অন্তর দেশ—হু হু হাওয়ায় নীল আকাশে ভেসে চলে সাদা তুলোর পুঞ্জ—মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন চলেছে তারা বনের উপর দিয়ে, জোনাকি যেমন পাল্লা দেয় তারার সঙ্গে!

…বসন্ত এখানে ক্ষণস্থায়ী—অন্ততঃ বনের বাইরে ওই বিস্তীর্ণ তাম্রাভ প্রান্তরের বুকে তার কোন অস্তিত্বই নেই। ধু ধু রোদ কাঁপে প্রান্তরের বালু আর নুড়ি পাথরের বুকে, ঢালু কাঁকুরে ডাঙ্গা নেমে গেছে দূরে ক্ষেতের সবুজের পানে—তারই কাছাকাছি কতকগুলো ছোট তালগাছ ঘনসবুজ আবেষ্টনী রচনা করেছে।

প্রান্তরের উপর থেকে চোখ মেললে দেখা যায়—দূরে পাতাজোড়ার পরই ধু ধু দামোদরের বালুরাশি—ওপারে সবুজ শালবন সীমা—কাছিমের পিঠের মত উঠে গেছে। গহন অরণ্যসীমা বিড়ালের গায়ে লোমের মত জিরিজিরি দেখায়।

নীল আকাশ আর সবুজ বন রচনা করেছে উপুড় করা আকাশ সীমার কোলে পৃথিবীর সীমান্ত। নীরব নিশ্চিন্ত স্তব্ধ কোন পৃথিবী। চড়াই এর এদিক ওদিকে শালবন ছায়ায় গড়ে-ওঠা দুএকটা শান্ত গ্রামসীমা—

বাতাসে কাঁপছে শস্যরিক্ত প্রান্তরের শেষে প্রহরীর মত দাঁড়ান দু একটা তাল গাছের পাতা।

…তারই মাঝখান দিয়ে চলে গেছে খোয়াঢালা সড়কটা দুর্গাপুর ঘাটের দিকে, দামোদরের ওপারেই দুর্গাপুর ইষ্টিশান। কোন বিচিত্র জগৎ।

এরা থাকে এপারে, এদের জীবন আর ওপারের জীবনের মাঝে দুস্তর ওই নদীর ব্যবধান। একা নদীই ষোল ক্রোশ।

সেই ষোলকুশী ব্যবধান। দুটো যুগ—অতীত এপাশে, ওপাশে দুর্গাপুর জাগছে; যুগের এই ব্যবধান ওই দুর্মদ দামোদরকে বেঁধে দুই যুগকে এক করবার প্রয়াস চলেছে।

…আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছে প্রচণ্ড শব্দে; বনের পর বন, স্তরে স্তরে উঠে গেছে বনঢাকা কঠিন পাহাড়সীমা। তারই অন্তরে চলেছে বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপছে কঠিন মৃত্তিকা আর পাহাড়সীমা, কালো পাথরের জমাট স্তর এতদিন মাটির তলে নিশ্চিন্ত নীরবে পড়েছিল, আজ মানুষ তাকে ডিনামাইট-এর আঘাতে চুর চুর করে

ফাটিয়ে তুলে নিয়ে চলেছে। অতীতের মৃত সমাহিত কোন মহাকালের শবদেহ তুলছে তারা—এ যুগের প্রয়োজনে।

এবড়ো খেবড়ো পথ দিয়ে বন থেকে বের হয়ে মস্ত মস্ত ট্রাকগুলো যাতায়াত করছে নদীর দিকে। রাতের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে বুলডোজার আর ক্যাটারপিলার ট্রাকটারের গর্জনে। দিনের বেলায় শব্দটা তত আসেনা—রাতের নিঃশব্দ অন্ধকারে যন্ত্রদানবের গর্জনধ্বনি বাতাস ভরিয়ে তোলে। বিস্তীর্ণ নদীর ধু ধু বালি সরিয়ে তারা ব্যারেজের পিলার ড্রিলিং করছে—কঠিন পাথরগুলো কনক্রিট মিক্সচারের নিষ্পেষনে-গ্রাইণ্ডিং মিলের মধ্যে চুরমার হয়ে চলেছে।

· চড়াই এর উপর থেকে দেখা যায় বনের মাঝে নদীর বিস্তীর্ণ অন্ধকারে আলোগুলো জ্বলছে—পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে প্রকট হয়ে উঠেছে ওদের দীপ্তিমান শিখা।

ছানুদাসই গল্প ফেঁদেছে।

দোকানের কাযকর্ম ইদানীং কম। ধান চাল এ মুলুকে যা ছিল সবই প্রায় ফাঁক হয়ে এসেছে। টেনে টুনে বের করে এনেছে তারা, কতক লোক বিক্রী করেছে দেনার দায়ে, কতক বিক্রী করেছে বৎসরের কাপড় চোপড় কিনতে, তার উপর আছে চাষের হালবলদের খোরাকী খইল, ভূষি, বছরকি মুনিষ মাহিন্দারও রাখতে হয়েছে মাঘমাসের শেষেই—তাদের বছরের মাইনে—শিরোপাও দিতে হয়।

...টাকা আর আসবে কোত্থেকে—বেচ ধান।

ধান বেচেই সে সব মেটাতে হয়েছে।

তাই গ্রীষ্মের আগে থেকেই আবার সেই নেই নেই রব। দুচারজনের ঘরে মাত্র কিছু টিকে আছে। তাও আঙ্গুলের ডগে গোনা যায়। বাকী আর সবাই—যাদের আছে তাদের ঘরে কবে থেকে বাকীর জন্যে ধন্না দেবে তাই ভাবছে।

সুতরাং তারা পানুদাসকে চটাতে পারেনা, কারণ অকারণেও ধন্না দেয়। পানুদাস অবশ্য বাজে গাল-গপ্পে থাকেনা, সে কাযের মানুষ, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া জানে সাধারণ লোকের সঙ্গে বসে বাজে কথা কইলে—গালগপ্প করলে তারা পেয়ে বসবে।

চাই কি মাথায় হাত দিতে এগোবে।

তাই কথাবার্তা কম বলে। তাছাড়া ওসব সময়ও তার নাই। ব্যবসা আর মা গন্ধেশ্বরীর পূজো করা একই কথা। পূজোয় তন্ময়তা না থাকলে যেমন পূজো সিদ্ধ হয় না, ব্যবসাতে তাই। তন্ময় হয়ে থাকতে হবে।

সেও বুঝেছে নিজের চোখেও দেখে এসেছে—বাঁধ তৈরীর কায সুরু হয়েছে। এদিকেও এইবার আসবে বিজলী বাতি, বড় সড়ক। কলকাতা-বর্দ্ধমান-আসানসোল-লোহা-কারখানা-মুলুক কোলিয়ারী—সব একাকার হয়ে যাবে।

...এই যেন চরম সুযোগ আসছে। পানুদাস কি হিজিবিজি হিসাব করছে মনে মনে।

—ছানুদাস বাইরের বারান্দায় বসা লোকগুলোর সঙ্গে গল্প করে চলেছে।

—ইরে বাস্‌সে জবর কল আর তেমনি তার মুরোদ। পাহাড় তুলে লিয়ে যাবেক মনে লাগে।

সতীশ ভটচাযও একদিকে বসে হুঁকো টানছিল, সব ঘটে কাঠালী কলা সে, এ আড্ডাতেও আসে। তাছাড়া কামারপাড়ার যজমান ছেড়ে দেবার পর থেকে তার যাতায়াত বেড়েছে ইদানীং।

জবাব দেয় সতীশ—যা বলেছিস। দেখলম বাপধন। দামোদর চন্দকে বাঁধনেওয়ালা ইবার এসেছে।

—শুধু কি বাঁধই হচ্ছে নাকি? ক্যানেলও হবেক গো, শোনলাম পিয়ারবাড়া-আমুড়ে-গয়লাবান্দী সব বিবাক লুটিশ হইছে, জমির উপর দিয়ে ক্যানেল কাটবেক। জল আসবেক—হু হু জল। লাও কেনে কত্তো চাষ করাইবার। আর শুকো রুখো নাই—কেতেরাও নাই। থোড় গলায় লিয়ে মাঠশুদ্ধু ধান জল বাগড়ে পেসব করতে নারলেক নাই, ঠোর মরে যাবেক আর সিটি হবেক নাই!

ওরা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনে চলেছে কথাগুলো, যেন তাদের কাছে অবিশ্বাস্য। নিরাপদে চাষ হবে—বৃষ্টি হোক বা না হোক—আর অমন লকলকে ধান শুকিয়ে পুড়ে তামাটে খড়কাঠি হয়ে যাবে না—এ যেন তাদের কাছে স্বপ্নেরও অতীত।

—সত্যি গো মামু!

সতীশ ভটচাযও অবাক হয়েছে। ছানুদাস বিজ্ঞের

মত মাথা নেড়ে বলেছে—ওই! তবেকি মিছে কথা বলছি তুদের। শুধো কেনে কাকাকে?

সতীশ ভটচায ইতিমধ্যেই বিজ্ঞতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। সমর্থন করে কথাটা—সত্যি রে! দেখিসনি বদ্ধোমান্ ক্যানেলের জমি!

ও গ্রামের অনেকেই ওদিকে খাটতে যায়, শুখো-হাজার বছরে এ মাঠে কাস্তে নামে না। গরু বাছুর সড়বড় করে চরে বেড়ায়। ধানের স্বপ্ন নেই—হু হু বুকজ্বলা রিক্ত শূন্য মাঠ।

বাউরীপাড়া, লোহারপাড়ায় অন্ততঃ পৌষমাসের দিনে ভাত থাকে। সেবার তাও থাকে না। বনের পাহাড়ী খাম-আলু-কন্দ, ভুঁড়ুর, কেঁদ ফলও নিঃশেষ হয়ে যায়।

তারপরই তারা বের হয়ে যায়, সোমত্ত মেয়ে মরদ সকলেই ওই দিকে। তালাই, হাড়ি, ঝুড়ি, কাস্তে মাথায় দল বেঁধে পায়ে হেঁটে—দামোদরের বালুচর দিগন্তপ্রসারী মানাবন পার হয়ে এগিয়ে চলে ওপারের দিকে।

···দিগন্ত ছুয়ে চলে গেছে রেল লাইন—বার্ণ কোম্পানীর চিনকুঠীর লম্বা চিমনীতে ধোয়া বের হয়—ভোঁ বাজে। বেগে লাইন দিয়ে ছুটে চলেছে মালগাড়ী—ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে; তারপরই ওদিকের ধান ক্ষেত সুরু হয়েছে মানকর ছাড়িয়ে। এ মাঠে ধান মরে না, একতালা ক্ষেত; চৌরস বগিথালার মত। তাদের মত পাহাড়ী সিড়ি-বন্দী ক্ষেত নয় যে—জল গড়িয়ে আল ভেঙ্গে ছুটবে নীচের কাইযোড়ের দিকে।

একটু বৃষ্টি হলেই জল বাধায়; তারপর ক্যানেল তো আছেই, গেট বন্ধ করলেই জল উপছে উঠে মাঠ ভাসিয়ে দেবে।

···সোনা ধান—যতদূর চোখ যায় সেই ধান আর ধান। বাতাসে সুর তোলে তার মঞ্জরী বিচিত্র একটি শিহর।

ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

···নিতে বাউরী যাচ্ছিল পথ দিয়ে, থমকে দাঁড়াল। সে যেন নোতুন কথা শুনেছে। বৈকালের আবছা আলো পড়েছে বাঁশ বনে—তিরোল গাছের পাতায়। কেমন শন-শন সুর তোলে।

···বাতাসে তামাক পোড়ার মিষ্টি আমেজ; নিতের কদিন ধরে মেজাজটা ভালোই আছে। নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ীতেই এ বছর কাযে গতেছে। কাযে ফাঁকি সে দেয় না—তবু কেউ তাকে ঠকাক, অবিশ্বাস করুক—এটা যেন সহ্য করতে পারে না সে। নীলকণ্ঠবাবু অন্ততঃ সে ধরণের মানুষ নন।

গরুর খোল নিতে দোকানে আসছিল। হঠাৎ ও পাশের রকে কথাগুলো শুনে দাঁড়িয়েছে সে।

···কেমন শান্ত মধুর ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

···সবুজ ধান সোনা রং হয়ে উঠেছে, ধানের ফাঁকে ফাঁকে আলের উপর বসেছে চড়ুই ছাতারে পাখীর মেলা। বাতাসে ধান পাকার মিষ্টি সৌরভ—প্রতি বছর যেন সেই দিন আসবে।

নিশ্চিন্ততার দিন—ফসল পাকার আনন্দের দিন। ছেলেমেয়েগুলোর শীর্ণ মলিন চোখেও হাসি ফুটে ওঠে। তারাও বুঝতে পারে—না খেয়ে অন্ততঃ কিছুদিন তাদের থাকতে হবে না। রাতে অন্ধকারে খালি পেটে কান্নার জ্বালা তারাও জানে জন্মে থেকেই!

নিতে দেখেছে কেমন যেন চারিদিকে একটা বদলের—দিন বদলের ঢেউ আসছে। তারকবাবুদের দাপরাফ কমে আসছে এটাও বুঝতে পেরেছে। জমিজারাত সব চলে যাচ্ছে। আমীনবাবুর দলকেও দেখেছে সে। ছানুদাসকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারে না।

·· মিছে কথা বলে উ।

মিষ্টি দোকান থেকে তামাক পোস্ত আরও কি সব নিয়ে বের হচ্ছিল তাকে দেখে নিতে জিজ্ঞাসা করে।

—কি গো দিদি! ইবার তালে আর শুকো খরা নাই মাটিতে—ছানুর কথাগুলো মিষ্টিও শুনছিল।

সেও দেখেছে ক্যানেলের ধারে কেমন বারোমাস সোনা ফসল ফলায় সেখানের মানুষ। গ্রামের রূপ বদলে যায়। একটি নিশ্চিন্ততার ছায়া তার মনের নিবিড় জ্বালাকে শান্ত করে তুলেছে। উপস্থিত সকলের মুখেই যেন সেই কল্পনাটুকু একটি মধুর আবেশ এনেছে। নিতে বাউরীর কথায় মিষ্টি জবাব দেয়।

—বদ্ধোমানে তো দেখেছি তাই. কে জানে কি হবেক ই মাটিতে।

নিতে জবাব দেয়—মাটির আর কি ফারাক দিদি—মানুষ বেইমানী করে, মাটি তো তা জানে না। মায়ের জাত যি গো—কথায় বলে না মা টি—

নিতে বাউরী মাঝে মাঝে কেমন যেন বিচিত্র কথা বলে। মিষ্টির মনে ধরেছে কথাটা, মা আর মাটি এক। মা হলেই যেমন মেয়ের সার্থকতা—ফসল ফললেই মাটিরও সার্থকতা। রূপ বাড়ে—সেই সঙ্গে বাহারও খোলে।

মেয়েও যেন ধন্যি হয় মা হলে।

আনমনা মিষ্টি পথ চলছে। গাঁয়ের পথে দিনের শেষ আলো লুটিয়ে পড়েছে, আকাশে একফালি লাল আলো ঠিকরে পড়েছে তির্য্যক রেখায়—পাখীগুলো ফিরছে গাছের মাথায়।

বাতাসে ভেসে আসে ঘরমুখো গরু-বাছুরের হাম্বা রব, একটা শান্ত মধুর ছবি।

তারকবাবুর খামারের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। নির্জন পথ, মুক্ত ডাঙ্গায় সন্ধ্যা নেমেছে।

হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়াল। জীবনবাবু এগিয়ে আসছে।…শোন।

মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে—কি বলছেন ?

…একটু অবাক হয় মিষ্টিও। ওই চাহনি চেনে—চেনে ওদের স্বরূপ। ভেবেছিল দিন বদলাচ্ছে—সবই চলে যেতে বসেছে। সেই সঙ্গে চলে যাবে স্বভাবের সেই চিরন্তন নোংরামিটুকুও। কিন্তু কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না।

—চলে যাচ্ছিস যে ? জীবন এগিয়ে আসে।

—হ্যাঁ। একটা কথা বলবো জীবনবাবু ?

—বল ! এগিয়ে আসে কি এক আশা নিয়ে জীবন।

—চাকরী-বাকরী কর এইবার।

চমকে ওঠে জীবন ওর মুখের এই কথায়! যেন অতর্কিতে একটা চাবুক মেরে কে থামিয়ে দিয়েছে ওকে। একটু সামলে নিয়ে জীবন বলে ওঠে।—কেনে ?

—ওই বললাম আর কি! সাজা খাজনা—আদায় উশুল সব তো গেল, কলসীর জল বসে খেলে আর কদ্দিন ? কিগো ? বাবুরা যে ইবার কাবু হয়েছেন শোনলাম।

…হাসছে মেয়েটা। কেমন বিশ্রী জ্বালা ধরানো হাসি। থমকে দাঁড়িয়েছে জীবন। মিষ্টি চলে গেল… সহজ ভাবেই।

আজ সে ওদের ভয় করে না। মনে মনে জেনেছে বিষদাঁত ভাঙ্গা নির্বিষ গোখরো—ফণা মেলতেই পারে, ওই পর্য্যন্ত। ছোবলে আর সেই সর্বনাশা বিষ নেই।

জলটোপ লোকটা কেমন নির্বিকার।…মুখ বুজে কাযই করে যায়। ও আর কিছুর খবর রাখে না। মেশেওনা গ্রামের লোকের সঙ্গে। মাঝে মাঝে নিতে বাউরী আসে, না হয় আরও দু-একজন।

নেশাটেশাও করেনা—ওই বিড়ি তামাক পর্য্যন্ত। নিতে বাউরী ওকে কারিগর বলেই ডাকে। ওই নামেই সেও পরিচিত হয়ে উঠেছে।

নিতে বাউরীর সমস্যা—মনের সব জটপাকানো প্রশ্ন-গুলোও মাঝে মাঝে ওকে তুলে ধরে। সন্ধ্যাবেলায় আজও তাই এসেছে নিতে।

…দোকানে শুনে এসেছে ছানুদাসের কথাগুলো। কেমন একটা শান্ত মধুর নিশ্চিন্ততার ছবি ফুটে ওঠে।

কারিগরের বানানো সেই পুতুলের একটা সংসারের ছবি রয়েছে ওর সামনে।

—বাহারের বানিয়েছে কিন্তুক কারিগর! ঘর—উঠোন—উঠোনে একটা ধানের মরাই, গোয়ালে গরু-বাছুর। মায় চালের ওপর লাউএর লতাটুনও বাদ দাও নি।

…কারিগর হাসছে। অবসর সময়ে নানা কল্পনা তার—অমনি পুতুল আর ছবি হয়ে ফুটে ওঠে মনের অতলে। তারই দু-একটা ধরে রেখেছে হাতের কাযে।

…মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিতে বাউরী ওই ছবিটার দিকে। সাজানো সংসার। কেমন শান্তির ছোঁয়া মাখানো।

ছানুদাসের কথা মনে পড়ে। এমনি কোন আগামী দিনের কথাই ভাবছে নিতে বাউরী।

—ছবি কখনও সত্যি হয় কারিগর ?

সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর হয়ে উঠেছে। মিটিমিটি জ্বলছে পিদীমটা উঠোনের এক কোণে। আকাশের তারায় তারায় নিঃশব্দ চাহনির বেদনাময় অনুভূতি। নিতে বাউরীর দিকে চাইল কারিগর। দু চোখে তার কি এক স্বপ্ন। এমনি একটি জীবনের কল্পনা।

—কেন হবে না নিতাই ? কোনকালে নিশ্চয়ই সত্যি ছিল—আবার যে সত্যি হবেনা কে জানে।

নিতাই মাথা নাড়ে। কথাটা যেন মনে মনে সেও বিশ্বাস করতে সুরু করেছে। অনেকদিন পর মিথ্যাবাদী ছাম্নদাস যেন ভুল করে একটা কঠিন সত্যি কথা বলে ফেলেছে।

উঠে পড়ে নিতে বাউরী। রাতের অন্ধকারে বের হয়ে এল পথে। বাঁশবনের ধারে শুকিয়ে আসা জলায় ফুটেছে সবুজ কচু বনে ঘন হলুদ ফুলগুলো, বাতাসে মাথা নাড়ে কালকাসিন্দের গাছের হলুদ ফুলের গুচ্ছ। আকাশে ওঠা-নামা করছে জোনাকির দল—কেমন ম্লান আভাগুলো ঝাঁকি-ঝুঁকি কেটে চলেছে—একটা মিষ্টি আবেশের মত বাতাস ভরে তুলেছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

তারই মাঝে বহুদিন পর উঠছে বাঁশীর সুর।

অনেকদিন পর আবার ফিরে এসেছে সুরটা। প্রথম রাত্রের অন্ধকারেই কেমন একটি মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

…মিষ্টির কানে আসে সুরটা—দূব থেকে বাতাসে ভেসে আসছে। কারিগর চুপ করে বসে আছে। সামনে নামানো সেই পুতুলের সংসার, তাদের পাশাপাশি সংসার করেছে মিষ্টিও। দু-চোখে তার তেমনি কোন সুন্দর স্বপ্ন। বাছুরটা ডাকছে মাঝে মাঝে। বাতাসে দোল খায় বকফুলের গাছে অফুরন্ত সাদা ফুল—মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে ঝর ঝরিয়ে উঠোনে।

—কারিগর!

কারিগর এই মিষ্টিকে চেনে না। নোতুন একটি নারী। বর্দ্ধমানের এক রাত্রের সেই নোংরা পল্লীর দৃশ্যটাও ভুলতে চায় সে। হতভাগ্য একটি মানুষকে পথ থেকে তুলে এনে আশ্রয় দিয়েছিল সেদিন মিষ্টি—পাড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠা রূপোপজীবিনী।

…কে জানে চরম ভুলই করেছিল সেই রাত্রে মিষ্টি।

—লোকটাকে দেখেছে সে ইতিপূর্বে বহুবার। কেমন হাসের জাত। এ পাড়াতেই থাকে—ওই টুকিটাকি কায করে আর হাসে। সবাইকে যেন ভালবাসে সে।

…তাই মিষ্টি সেদিন ঘর বাঁধতে চেয়েছিল!

—ইখানে? হাসে লোকটা।

…মিষ্টি ওকে জড়িয়ে ধরেছিল কি এক ব্যাকুল কামনায়।

—না! ইখান থেকে অনেক দূর গাঁয়ে। যাবা কারিগর?

…আজও সেই মিষ্টি বদলায় নি।

তেমনি উষ্ণ আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে। আজ সার্থক হতে চায় মিষ্টি। ওই ঘরের স্বপ্ন—নিজেকে বিকশিত করার স্বপ্ন—তার সারা মনে একটী দুর্বার উন্মাদনা এনেছে।

—মিষ্টি!

…উঁ!

কেমন তারার আলো জ্বালা রাতে—মিষ্টি আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিঃশেষে। তৃপ্তির আবেশে দুচোখ বুজে আসে।

…কারিগরকে দুহাতের কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে সে।

জীবনকে যেন—কোন সুন্দর স্বপ্নকে এমনি নিবিড় করে সার্থক বাস্তবে পরিণত করতে চায় আজ ব্যর্থ নারী।

…রাত নেমে আসে।

তখনও বাঁশীর সুর থামেনি।

তারার আলো—রাতের জমাট অন্ধকারে কার উষ্ণ আলিঙ্গনের স্পর্শ, আর ওই দূরাগত বাঁশীর সুরে সুরে আজ সব শূন্যতা পুর্ণ হয়ে ওঠে, মিষ্টির মনে কেমন একটি বিচিত্র অনুভূতি।

…সব হারিয়েও আবার এই কঠিন মৃত্তিকায় বাঁচবার সার্থক চেষ্টা করে চলেছে সে।

…সব কিছু আজ সুন্দর লাগে—সত্যিই কেমন বিচিত্র আর বর্ণময়।

এমনি আঁধারে হারিয়ে গেছে বাউরীপাড়ার কালো কালো মানুষগুলো। মেয়েমদ্দ সব্বাই। ঘুমে যেন নেতিয়ে পড়েছে তারা।

এখন থেকেই ভাবনা লেগেছে ওদের মনে—তারাই শুধু জেগে আছে নির্বাক নিষ্পন্দ আতঙ্কগ্রস্থ কটি মানুষ।

শীতের দিন শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ভাবনা বাড়ে। ক'জন মাত্র গাঁয়ের লোকের ঘরে মজুর মাহিন্দার গতেছে। বাকী সকলেই উটকো রয়ে গেছে। অর্থাৎ আজ এর বাড়ীতে ডাকলে খাটো—না হয় ওর বাড়ীতে। যদি কেউ না ডাকলো—তবে সেদিন ঘরে ধান চাল চাট্টি রইল তো খাও, না হলে উপোস—নিকাঠঠা উপোস।

রাঙ্গি বাউরী তাই বেশ ভাঁজ করে বলে—

—খাটো তবেই খাও

না খাটো তো

জুলুর জুলুর চাও॥

গ্রীষ্মের দাবদাহের জ্বালা শুধু কঠিন অনুর্বর মৃত্তিকার বুকেই জ্বালা তোলে না। এদের মনে হাহাকার আনে। রিক্ত শূন্য মাঠ। কঠিন মাটি।

হালফাল লাগে না—মানুষ তিষ্টোতে পারে না ওই কাঠফাটা রোদে। মুনিষ মাহিন্দাররা বাগানের ছায়ায় বসে খড়ের দড়ি পাকায়, না হয় ছানি কাটে। অন্য কাযও নেই।

বাকী বেকার যারা—টেষ্ট রিলিফ হলো ত ওই রোদেই ঝুড়ি কোদাল গাঁইতি নিয়ে মাটিকে যায়। ছায়াবিহীন ধূ ধূ প্রান্তরে কোথাও রাস্তা মেরামত হয় না—হয় পুকুরের কাজ। দিনান্ত পরিশ্রম করে পুরো মাপে পয়সা পায় মাত্র দশ বারো আনা, তার থেকে আবার মোহরার কায —সর্দারকে এক আনা দস্তুরী দিতে হয়।

…যা বাঁচে, তাতে যেন ভাতই জোটে মাত্র।

বেজা চুপ করে বসে থাকে—ঘুম আসে না।

ওদিকে বৌটা ঠায় বসে আছে। কদিনেই কেমন বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে। হঠাৎ যেন একটা অতর্কিত আঘাতে মুষড়ে পড়েছে ডাবি বৌ। এতদিন যে উদ্দাম দুর্বার গতিতে চলছিল সে, মনে করেছিল যৌবনের দুর্বার স্রোতে সে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাবুদের কাঁচা পয়সা সে ও এনেছে বেশ কিছু।

আরও আনতো।…হঠাৎ চমকে উঠেছিল।

সারা শরীরে অতর্কিতে কোন অসাবধান মুহূর্তে জড়িয়ে গেছে তার সেই পাপের ফল—পথের কাঁটা।

চমকে উঠেছিল সে।

…এ তো সে চায়নি। যেমন করেই হোক দূর করবে সে পথের কাঁটা। পেটের নবাগত ওই শত্রুর জাতকে।

বাউরীপাড়ার জীবনে এ এমন কিছু নোতুন ঘটনা নয়। মাইতরী বুড়ীর ও এসব বিদ্যা—জরি বুটি জানা। কত বড় ঘরের কত কেলেঙ্কারী সে দূর করেছে। এ আর এমন কি শক্ত নোতুন কায।

দাঁত-পড়া মাড়ি বের করে হাসে বুড়ী, বিশ্রী কুৎসিত সেই হাসি।

—কেনেলো থাক না, তবু মেয়ে হলে দেখতে ছিরি হবেক। ওজগারের দোসর হবেক তুর!

…ঘৃণায় ডাবির সর্বাঙ্গ রিরি করে।

—না! হুরুকর উটোকে। আজই।

বুড়ি জরি বুটীর খোঁজ করতে থাকে।

বেজাও যেন এই অপমান সইতে পারেনি। কোন-কথাই বলে না সে। ডাবির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এত গোপন খবরটাও বাতাসে বাতাসে ভেসে ওঠে।

…বেজা সেইদিনই গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল কি এক নিদারুণ অপমানে। কিন্তু পারেনি।

মরবার শেষ মুহূর্তেও কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে বাঁচবার প্রাণপণ আশায়। ডাবিকে কেন্দ্র করেই তার পৃথিবী নয়।

সুন্দর ওই নীল-আকাশ সবুজ-মাঠ। কাঁইযোড়ের ছায়াঘন তীরভূমি আখের ক্ষেতে আলো ছায়ার রঙ্গীণ স্পর্শ—একটু মাটির আশ্বাস—সব কিছু মিশে তার জগৎ!

বাঁচতে চায় সে। একজনকে বাদ দিয়েও বাঁচবে সে। …তাই আসমানে ঝুলন্ত দেহটা ঝটপট করতে থাকে। দুচোখে তার ব্যাকুল আবেদন।

…বেঁচেছিল সে।

আজও তাই রাত্রির বিনিদ্র প্রহরে জেগে আছে ওই তারার আলোমাখা আকাশের দিকে চেয়ে।

—ঘুমুলি!

চমকে ওঠে ওর দিকে চায় বেজা।…ডাবিবৌ উঠে এসে তার পাশে বসেছে। কেমন অসহায় দুর্বল একটি মেয়ে। সব তেজ যেন তার হারিয়ে গেছে।

লুঠ করে নিয়েছে কোন দস্যুদল তার সেই উচ্ছল যৌবন সম্পদ, প্রাণপ্রাচুর্য্য।

আজ পড়ে আছে তার মলিন কদর্য জীর্ণ দেহটা।

সাময়িক আনন্দ আর নেশার বহুমূল্য দিয়েছে ডাবি।

বেজা ওর দিকে চাইল। আজ মায়া হয়। কেমন মনে হয়—ওর কোন দোষ নেই। বেজা যদি খেটে সংসার চালাতে পারতো—দু-মুঠো ভাতএর সংস্থান করতে পারতো,

হয়তো ডাবিকে বেরুতে হতো না। ঘৃণ্য জীবনও সইতে হতো না।

…কথা কয়না বেজা—ডাবি কাঁদছে। কেমন ক্লান্ত পরাজিত একটি নারী কাঁদছে রাতের অন্ধকারে।

বাঁশীটা তখনও থামোন। রাতের আকাশে গুমরে গুমরে উঠছে সেই স্বর রেশ। কেমন যেন কান্না আসে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ডাবি।

বাউরী পাড়ার বটগাছের ঘন পত্রাবরণে কোন হরিয়াল দম্পতী পরস্পর পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখটুকু উপভোগ করছে।

…শান্তি নেই মানুষের মনে। বাতাসে ভেসে চলেছে—কোন উধাও আকাশের দিকে পাখনা মেলে ওই অতন্দ্র স্বরটা।

[ক্রমশঃ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের জন্ম

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

১৮৮৩ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর তিন দিন ধরে কলকাতায় প্রথম জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসে। আবার ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয়বার কলকাতা মহানগরীতেই উহার দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন (জমিদার শ্রেণীর বা সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিমূলক সংগঠন), ভারতসভা (শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক সংগঠন) এবং কেন্দ্রীয় মুসলমান সমিতি (Central Mahammedan Association) এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল সেই সম্মেলনের আহ্বায়ক। এবারেও তিন দিন ধরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সম্মেলনে প্রতিনিধি এসেছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের প্রস্তুতি ও পরিচালনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত ছিলেন এবং এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রথম অধিবেশনের মত দ্বিতীয় বারেও এই অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সাধন দাবী করে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রশাসনিক কবল থেকে বিচার বিভাগের মুক্তির প্রশ্নও এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতায় যখন জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল, তখন অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে বোম্বাইতে একই কার্য্যসূচির উপর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। একই কার্য্যসূচির উপর উভয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলছিল স্বতন্ত্রভাবে। তার কারণ এই সংগঠনদ্বয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিলনা। জাতীয় সম্মেলন ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ প্রচারিত হওয়ার পরই উভয়ের অস্তিত্ব উভয়ের কাছে প্রতীয়মান হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সেই অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। কারণ জাতীয় সম্মেলনের (National Conference) কাজ তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সম্মেলন স্থগিত রাখা তখন অসম্ভব ছিল। অবশ্য পরবর্ত্তী বছর থেকেই একই আদর্শ ও কার্য্যসূচির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের অযৌক্তিতা বিচারে এ দুটি সংগঠন একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় সম্মেলনের সকল কর্মী ও নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে একই আদর্শ ও মতবাদপুষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি রাজনৈতিক দল জীইয়ে রাখবার অপচেষ্টাকারী বর্ত্তমান রাজনীতিবিদদের উক্ত ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে বলেই মনে হয়। ১৯১৭ সালের পর যখন 'মডারেট' দল কংগ্রেস থেকে

বেরিয়ে আসে, 'মডারেট' দলভুক্ত সুরেন্দ্রনাথও তারপর আর কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে যোগদান করেননি। কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যান্ত প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনেই সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করে শাসন-সংস্কার ও ব্যবস্থাপকসভাসমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রস্তাব আনয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। অনিবার্য্য-কারণবশতঃ মাঝে একবার বুঝি তিনি করাচী অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি।

২। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তনের দ্বিতীয় বর্ষেই অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। জনচিত্তেও খুব উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয়—সর্বপ্রথম কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনকে সার্থক করে তোলবার জন্য। সকল দল-মত নিয়েই অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মুখপাত্র ভারতসভার সকলেই কংগ্রেসপন্থী ছিলেন। জমিদার ও সামন্ত-শ্রেণীর মুখপাত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান'ও তার যথাশক্তি নিয়ে এগিয়ে এল কংগ্রেস অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের নেতৃস্থানীয় সভ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং অশীতিপর বৃদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতিত্বে বরণ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। এমনি করে জাতীয় কংগ্রেসের বেদীমূলে সকল শ্রেণীর সকল লোক এসে মিলিত হল সর্বভারতীয় এক জাতীয় ভিত্তিতে। ভারতসভার প্রাণস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানে'র কর্ণধারবৃন্দেরও অন্যান্য সকলেরই খুব প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ। তাই কলকাতা কংগ্রেসে স্বায়ত্ত-শাসন মূলক ও ব্যবস্থাপকসভা বিস্তৃতি বিষয়ক প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যতদিন পর্য্যন্ত না শাসনের সংস্কার সাধন করা হয়েছিল এবং ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতিনিধিত্ব মূলক করে তার বিস্তৃতির সুযোগ ও সুবিধা দান করা হয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথই প্রতিবার কংগ্রেসে উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতেন।

৩। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব মহাসমারোহে কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার সভাপতি স্যার 'হেনরি হ্যারিসন' (Sir Henry Harrison) কলকাতা ময়দানের সেই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সুরেন্দ্র-নাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই আমন্ত্রণে আগ্রহের সহিত সাড়া দিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতিনিধিমূলক করে আরও বিস্তৃততর করবার অভিমত সেখানে ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারবেন। মফঃস্বলের পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল উৎসবে যোগদান করে অভিনন্দনপত্র পাঠ করবার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। প্রত্যেক পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই যাতে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সাধন করে তাকে অধিকতর প্রতিনিধিত্ব মূলক করবার দাবী জানানো হয়,সেইমত তিনি পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সংগঠিত করলেন। ফলে দেখা গেল প্রত্যেক পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে একই সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন শাসন-সংস্কার ও ব্যবস্থাপকসভার সম্প্রসারণের অনুকূলে মত প্রকাশ করে তার সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছিলেন। এর পাঁচ বছর পরে ১৮৯২ সালে সেই প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। এই সংস্কার বিধানের জন্য সুরেন্দ্রনাথ যে অনেকখানি দায়ী ছিলেন সে কথা অনস্বীকার্য্য।

৪। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনেও সুরেন্দ্রনাথ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান আরও এক বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান কালেই রঙ্গ নাইড়ু, সুব্রামানিয়া আইয়ার, আনন্দ চারলু প্রভৃতি মাদ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় ও ঘনিষ্টতা জন্মে। বিশেষভাবে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার সঙ্গে। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব এত গভীর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল যে মহারাজা সুরেন্দ্রনাথকে ভারত-সভা-ভবন নির্ম্মাণের জন্য ১৫,০০০ হাজার টাকা দান

করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ একবারমাত্র তাঁকে জানিয়েছিলেন যে পরিকল্পিত ভারতসভা-ভবন নির্মাণের খরচ বাবদ অনুমিত ২০,০০০ টাকার মধ্যে মাত্র ৫,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ মহারাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাকী ১৫,০০০ হাজার টাকা বিনা প্রশ্নে ঐ উদ্দেশ্যে দান করেন।

৫। মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য সেবার বাংলার প্রতিনিধিদলের মধ্যে রাসবিহারী ঘোষ, কিশোরীলাল গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। মাদ্রাজে বাংলার প্রতিনিধি দলকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিল। লর্ড লিটনের শাসনকালে প্রবর্ত্তিত কালাকানুন—অস্ত্র আইনের রহিতের জন্য ঐ মাদ্রাজ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব আনা হয়। এই প্রস্তাবের উপরে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন প্রসিদ্ধ আইনজীবি ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। অস্ত্র আইনের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের কথা না বলে তিনি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন যে স্থানীয় পৌর-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুসারে জনগণকে অস্ত্রবহন করবার অনুমতি দেওয়া হোক। সুরেন্দ্রনাথ তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সুরেন্দ্রনাথের যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো ভাষণের ফলে একটু সামান্য সংশোধনসহ মূল প্রস্তাবই অধিবেশনে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, অস্ত্র বহন করবার অধিকার সকলেরই আছে। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার লিখিতভাবে কারণ দেখিয়ে কোন লোককে বা দলকে অস্ত্র-শস্ত্র বহন করতে নিষেধ করতে পারেন।

৬। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন বসে। এলাহাবাদের অধিবেশনকে পণ্ড করে দেবার জন্য শাসক-মহল বহু অন্তরায় সৃষ্টি করবার অপচেষ্টাই করেছিল। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা পণ্ডিত অযোধ্যানাথের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সাফল্যের সহিত এলাহাবাদে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং এলাহাবাদ কংগ্রেসেই সর্ব্বপ্রথম একজন অভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার নজির সৃষ্টি হয়। কলকাতার 'এণ্ড্রিউ ইউল এণ্ড কোং' এর (Andrew Yule & Co.) উদার মনোভাবাপন্ন ব্যবসায়ী মিঃ জর্জ্জ ইউল্ এলাহাবাদ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই ১৮৮৮ সালেই বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় কংগ্রেসের পরিপূরক হিসাবে এক প্রাদেশিক সন্মেলন আহ্বান করা হয়, যার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই সন্মেলনের উদ্দেশ্য হল—বাংলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক সমস্যাসমূহের উপর আলোচনা করে তার সমাধানের উপায় নির্ণয় করা। প্রত্যেক প্রদেশেরই তার নিজস্ব সমস্যাবলী রয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সর্ব্ব-ভারতীয় সমস্যাবলী ছাড়া প্রদেশগুলির নিজস্ব সমস্যাবলী আলোচনা করার পথে কিছু অসুবিধা ছিল। এই কারণেই সন্মেলনের ব্যবস্থা করা হয় এবং বাংলা দেশেই এর প্রথম সূচনা। ক্রমে অন্যান্য প্রদেশও বাংলার অনুকরণে নিজ-নিজ প্রদেশে প্রাদেশিক সন্মেলন আহ্বান করে। এমনি করে সেদিন বাংলাদেশই প্রত্যেক প্রগতিশীল আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করতো। প্রাদেশিক সন্মেলনের ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সমস্যাবলীর আলাপ-আলোচনার আয়োজনের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে সুরেন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত উদার মনোভাব। মানবতার কষ্টিপাথরে তিনি সমাজের রীতি-নীতির বিচার করতেন। নারী জাতির মুক্তির তিনি ছিলেন একজন প্রধান সমর্থক। বিধবা-বিবাহেরও তিনি একজন মস্তবড় সমর্থক ছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একাধিক সভায় বলেছেন যে মানবতাহীন গোঁড়ামী ও সংরক্ষণশীলতা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই অকল্যাণ-কর। একবার তিনি তাঁর "বেঙ্গলী" পত্রিকায় এক ব্রাহ্মণ বিধবার বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি প্রায় দেড়শত আবেদন পত্র পেয়েছিলেন। আবেদন-কারীদের ভিতরে গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তানের সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য ছিল না। তিনি সেই আবেদনপত্রগুলি তাঁর সনাতনপন্থী বন্ধুদের দেখিয়ে শুধু এই কয়েকটি কথা বলেছিলেন—দেখ, মানবতাবোধ সকলের উর্দ্ধে—যার জন্যে এত বেশী সাড়া পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীচৈতন্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের কাছে আদর্শ মানুষ, কারণ চৈতন্যদেবের কাছে উচ্চ, নীচ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, নারী, পুরুষের কোন ভেদাভেদ জ্ঞান ছিলনা। কি আধ্যাত্মিক, কি বৈষয়িক সকল বিষয়েই

সকলে সমান অধিকারী। সুরেন্দ্রনাথও কায়মনবাক্যে চৈতন্যদেবের এই মতকে তাঁর চলার পথের ধ্রুবতারা করে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৭। ১৮৮৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের সাফল্যমণ্ডিত কর্ম্ম-জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় রচিত হয়েছিল। ঐ বছর বোম্বাই সহরে কংগ্রেস অধিবেশন বসে। সম্প্রসারণশীল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মপরিধিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। সুষ্ঠুভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অর্থের। মুস্‌কিল আসানে এগিয়ে এলেন সুরেন্দ্রনাথ-অর্থ নিয়ে নয়, অর্থের আবেদন নিয়ে। বোম্বাই কংগ্রেসে, কংগ্রেসের কাজের সহায়তার জন্য অর্থসংগ্রহের আবেদন করে বক্তৃতা করবার ভার অর্পিত হল বাক্‌নিপুণ সুরেন্দ্রনাথের উপর। সুরেন্দ্রনাথের আবেগময়ী বক্তৃতায় সমস্ত সভা এক নতুন প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সভাস্থলেই ৬৪,০০০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি আসে এবং সভামণ্ডপেই ২০,০০০ হাজার টাকা আদায় হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে এতই প্রভাবিত করেছিলেন যে—উপস্থিত মহিলাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের অঙ্গের অলঙ্কার খুলে দান করেছিলেন। সেদিন কংগ্রেসের সভামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন মিঃ ব্রাডল (Mr. Bradlaugh), তিনি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। পরের বছরেই ১৮৯০ সালে বিলাতে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় মিঃ ব্রাডল ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ ও শাসন-সংস্কারসংক্রান্ত বিল আনয়ন করেছিলেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবী বিলাতের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার জন্য বিলাতে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার প্রস্তাবও নেওয়া হল বোম্বাই কংগ্রেসে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবী বলতে তখন বোঝাত—প্রতিনিধিমূলক সরকার পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন। এর বাস্তব রূপায়নের জন্য বোম্বাই কংগ্রেসে একটা মোটামুটি খসড়া পরিকল্পনাও (Scheme) রচিত হয়েছিল, এবং সেইমতই পার্লামেণ্টে বিল আনবার জন্য মিঃ ব্রাডলকে অনুরোধ করা হয়েছিল। যাই হোক, বোম্বাই কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দলের সভ্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন মিঃ হিউম, স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহ্‌টা, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সরিফুদ্দিন, মিঃ আর্ডলি নর্টন, আর. এন. মাধোলকার। ইহারাই কংগ্রেস কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত প্রথম প্রতিনিধি-দল। ১৮৯০ সালের মার্চ্চমাসে এই প্রতিনিধি দল বিলাতযাত্রা করেন এবং এপ্রিল মাসে তাঁরা তথায় পৌছান। বোম্বাই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিনিধিকেই তাঁর স্ব-স্ব ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল। হিসাব করে দেখা গেল—প্রত্যেকের যাতায়াত বাবদ চার হাজার টাকা করে খরচ পড়বে। সুরেন্দ্রনাথের তখন আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিলনা। তখন তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল তের হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, তাও আবার স্ত্রীর নামে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী হৃষ্টচিত্তে স্বামীকে দেশের মঙ্গলচিন্তায় ঐ টাকা প্রদান করলেন। সুরেন্দ্রনাথও তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ঐ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করেই বিনা দ্বিধায় বিলাত গমন করলেন। তাঁর এই আর্থিক ত্যাগস্বীকার ব্যর্থ হয়নি। বিলাতে এই প্রতিনিধি দলের সর্ব্বপ্রথম সভা হয় ক্লার্কেন ওয়েল রোডে। সভাপতিত্ব করেন স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ (Sir William Wedderburn), সভার আয়োজন করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'ব্রিটিশ কমিটি'। বিলাতের এই ধরণের জনসভায় প্রথম বক্তৃতা করেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর বাগ্মিতায় সহজেই জনচিত্ত জয় করে ফেলেন সুরেন্দ্রনাথ। অবশ্য মিঃ জর্জ্জ-ইউল (Mr George Yule) পূর্ব্বাহ্নেই সুরেন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতীয় শ্রোতৃমণ্ডলী ও ইংরাজ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; কেহই ঘটনার শুষ্ক বিবরণীর লম্বা-চওড়া বক্তৃতার ধারা শুনতে ভালবাসেনা। ইংরেজী সাহিত্যে ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথও সেই দিকে না গিয়ে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুভূতিকে আবেদন করে এক আবেগময়ী বক্তৃতা করেন। বক্তা হিসাবে তিনি প্রথম দিনেই যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন, এবং জনচিত্তে তাঁর বক্তৃতায় বেশ একটা সাড়া জাগে। ঐ বারেই তাঁর বাগ্মিতার সাফল্যের আর একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে বণিক সভায় (Chamber of Commerce) তাঁর বক্তৃতা শেষে এক

ইংরেজ ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অকপটে বল্লেন—একজন ভারতীয়ের মুখে এত সুন্দর ইংরেজী বক্তৃতা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ বক্তার সমতুল্য এই ভারতীয় বাগ্মী। এই বক্তৃতার আগে ভারত এবং ভারতীয় ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বে আমি আর এত আকৃষ্ট ও আগ্রহান্বিত হইনি। সুরেন্দ্রনাথের যাদুকরী বাগ্মিতা বিলাতের লোকের মনে গভীর রেখাপাত করতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে একখানি চিঠির উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারা গেলনা। চিঠিখানি লিখেছিলেন দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্ এর জনসভাসমূহের সংগঠক মিঃ আগাষ্টিন হানি (Mr. Augustine Honey) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির কাছে। সেই চিঠিখানির কিয়দংশের উদ্ধৃতিঃ—"At all the meeting the demand was that Mr. Banerjee should visit them again, and I would point out to you the great advantage the movement would gain by his presence......etc," অর্থাৎ (প্রত্যেক সভারই দাবী, সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করবার জন্য পুনরায় আগমন করে এবং আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে তাঁর (অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের) উপস্থিতি আপনাদের আন্দোলনের যথেষ্ট সহায়ক হবে ইত্যাদি)। কি গভীর রেখাপাত করেছিল সুরেন্দ্রনাথ বিলাতের জনচিত্তে তাঁর সম্মোহিনী বক্তৃতায়, এই একটি ঘটনা থেকেই তা প্রকাশ পায়। এই প্রতিনিধিদলের বিলাত সফর খুবই সাফল্য অর্জ্জন করেছিল। সর্ব্বশেষে এই প্রতিনিধি দল মিঃ গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায়, উত্তরকালে পার্লামেণ্টে লর্ডক্রসের প্রস্তাবিত আইনের দ্বিতীয় পাঠের সময় মিঃ গ্লাডষ্টোন বলেছিলেন যে ভারতবাসীকে নির্ব্বাচনাধিকার দেওয়ার যে প্রশ্ন উঠেছে—তা যেন ভূয়া না হয়ে খাঁটি হয়। তারই ফলে ১৮৯২ সালে পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং জিলাবোর্ডগুলিকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভাগুলিতে সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ সভ্য পাঠাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার বেসরকারী সভ্যদের তাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য পাঠাবার অধিকারও স্বীকৃত হয়েছিল। সেই সঙ্গে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যবর্গের প্রশ্ন করবার এবং বাৎসরিক বাজেট আলোচনা করবার অধিকারও স্বীকৃত হয়েছিল। জনগণের প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পথে এই ব্যবস্থাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। জাতীয় কংগ্রেস এবং তার প্রেরিত প্রতিনিধি দলের প্রচেষ্টাতেই যে সেদিন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সে কথা আজ অনস্বীকার্য্য। ১৯০৯ সালে এই অধিকারকে আরও বিস্তৃততর করা হয়েছিল।

৮। ১৮৯০ সালেই জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ ভারতে ফিরে এলেন। তাঁর বাগ্মিতার কথা চারিদিকে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী ও বন্ধুগণ তাই দেশমাতৃকার এই কৃতীসন্তানকে স্বাগত জানাবার জন্য বিভিন্ন সভানুষ্ঠান ও সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ৬ই জুলাই ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য 'ফ্রেম্‌জী কাওয়াস্‌জী ইনষ্টিটিউটে' এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এলাহাবাদ ও কলকাতায়ও সুরেন্দ্রনাথকে মহতী জনসভায় বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল। প্রত্যেক সম্বর্দ্ধনা সভাতেই সুরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বিলাতে প্রতিনিধিদল পাঠাবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বক্তৃতা করেছিলেন। অবশ্য নানা কারণে সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শমত অনুরূপ প্রতিনিধিদল কংগ্রেসের পক্ষে পাঠান সম্ভব হয়নি।

৯। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করে বিলাত থেকে ফিরে এসেই সুরেন্দ্রনাথ আর এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজকে নিয়ে। রিপণ কলেজের আইন শাখার একটি ছাত্রকে তার অনুপস্থিতিকালে উপস্থিত দেখান হয়েছিল। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অনর্থের সূত্রপাত হয়। ব্যাপারটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের গোচরীভূত করা হয় এবং সিণ্ডিকেটের সভায় রিপণ কলেজের আইন বিভাগকে এক বৎসরের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কচ্যুত করার সুপারিশ করা হয়। সিণ্ডিকেটের এই সুপারিশ ভারত সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। সিণ্ডিকেটের সুপারিশের কার্য্যকারী রূপ-দানের অর্থ রিপণ কলেজের অনিবার্য্য ধ্বংস, কারণ কলেজের অন্যান্য বিভাগ আইন বিভাগের অতিরিক্ত অর্থ থেকেই

পরিচালিত হত। যে কলেজকে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গড়েছিলেন,সেই কলেজকে অনিবার্য্য ধ্বংস থেকে রক্ষা করাই তখন সুরেন্দ্রনাথের হয়ে উঠল,—দিনের চিন্তা ও রাতের স্বপ্ন। বিলাত থেকে সফল প্রতিনিধিত্ব করে ফিরে আসার পর তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীর দল, ভোজসভা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে তাঁকে নানা ভাবে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা করছিলেন তখন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের তখন আর কিছুতেই তেমন আর আগ্রহ ছিল না। রিপণ কলেজের চিন্তাই তখন তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, সব কিছু। উপায়ান্তর না দেখে সুরেন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হলেন। অনুরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থা আর ঘটতে দেওয়া হবেনা এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ভারত সরকার, বিষয়টিকে পুর্ণবিবেচনা করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ফেরৎ পাঠান এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতির দরুণ বিষয়টি রিপণ কলেজের অনুকূলেই বিবেচিত হল। এমনি করে সম্ভাবিত অপ্রীতিকর পরিণতির অবসান ঘটল। এই ব্যাপারে স্যার তারকনাথ পালিত সুরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তারকনাথের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল তাঁদের বিলাত-অবস্থান কালে। তিনিই স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রকে রিপণ কলেজের দুর্দ্দিনে কলেজের স্বার্থরক্ষার জন্য সহায়তা করতে প্ররোচিত করেছিলেন। রমেশচন্দ্রের সাহায্য এবং সহযোগিতা খুবই মূল্যবান হয়েছিল। রিপণ কলেজের ব্যাপার নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্র মিত্রের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন। মনোমোহন ঘোষ, কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি স্যার হেন্‌রি হ্যারিসন, স্যার হেন্‌রি কটন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গও সুরেন্দ্রনাথকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

১০। ১৮৯০ সালে ডিসেম্বর মাসে আবার কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেস অধিবেশনকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে ও তার প্রস্তুতির জন্য সুরেন্দ্রনাথ দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। ইতিপূর্ব্বে রিপণ কলেজের বিভ্রাট নিয়ে তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল এবং তার উপর কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতির জন্য কঠোর পরিশ্রমের ধাক্কা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁরই বন্ধু ডঃ দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের চিকিৎসাধীনে ধীরে ধীরে তিনি ডিসেম্বরের কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং কংগ্রেসে যোগদান করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এই অসুস্থতার সময় যখন চিকিৎসকের নির্দেশানুসারে তাঁকে প্রায় মাসাধিক শয্যাশ্রয় করে থাকতে হয়েছিল, তখন তিনি বার বার তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এই অবস্থায় গৃহে বন্দী হয়ে থাকার দরুণ, তাঁর মানসিক অস্বস্তির কথা প্রকাশ করেছেন—তাঁর সহকর্ম্মী ও বন্ধুবর্গ যখন কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করছেন তখন তাঁকে নিরুপায় হয়ে শয্যাশ্রয় গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল বলে। কর্ম্ম-পাগল সুরেন্দ্রনাথ কাজের ভিতরেই পেতেন আনন্দ।

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীকপিঞ্জল

পটু তুমি ছিলে গুণী,—হাসাতে ও হাসিতে—
চল্‌তো সপ্ত সুরের খেলা, তোমার বাঁশের বাঁশীতে।
প্রতিভাবান শিল্পী তুমি—মৌলিকতা সব কাজে—
কভু বাজাও 'গাব্‌গুবাগুব্‌ ধুনাও হে ছড় এস্‌রাজে।
হল খাসা বঙ্গভাষা—মিহি কোমল কণ্ঠ যার,—
পাল্লাতে হায় তোমার পড়ে—'এটম বম্ব' ও 'হাউটজার'
বাঙালী, মারহাট্টা তুমি রাজপুত ও শিখ শক্ত হে,
মহাকবি কেবল নহ—তুমি পরম ভক্ত যে।

মাকে ডাকা যায় না বৃথা—পূর্ণ তোমার আকাঙ্ক্ষা—
অপূর্ব্ব ওই তোমার স্তবে তুষ্ট হলেন মা গঙ্গা।
তাই তো পতিত উদ্ধারিণী নিত্য করেন
তোমার খোঁজ—
সোহাগ করে শিরে যে দেন আশীর্ব্বাদী হেমাম্ভোজ।
দেখে হাসি রঙ্গ করে গঙ্গাকে কন বাল্মিকী—
দাঁড়িয়ে আমি,—দেখলিনা মা—'দ্বিজুকে'
তুই করলি কি?
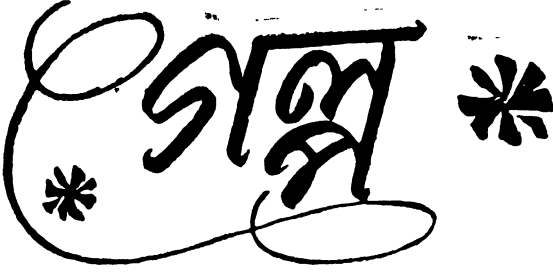
আমার মনে পড়ে

শ্রীপান্নালাল ধর এম.এ., আই.পি.এস.

যৌবনের কয়েকটি তীব্র দ্বিপ্রহর আগুনের হল্‌কা ছড়াইতে ছড়াইতে কাটিয়া গেল। ঘুরপাক খাইতে খাইতে ইম্ফল রণাঙ্গনে আসিয়া পড়িয়াছি। বাংলার দামাল ছেলেটি তখন ইম্ফলের দরজায় করাঘাত হানিয়া কহিতেছে—হামে দেহলীকা রাস্তা ছোড় দেও, ছোড় দেও, ছোড় দেও। ভারতের রুদ্ধদ্বার তাঁহার জন্য সেদিন খোলে নাই সত্য, কিন্তু প্রতি ভারতবাসীর হৃদয় দ্বার তাঁহার জন্য খুলিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় সৈনিকেরা সেদিন দুই-প্রকার আনুগত্যের মাঝখানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল।

বাল্মীকির রামায়ণে রাজভ্রাতা বিভীষণ স্বজন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দেশশত্রুর সহিত যোগ দিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাহার নিকট স্বদেশের চাইতে ইষ্টই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। অথচ কৃত্তিবাস রামায়ণে বিভীষণ-পুত্র তরণীসেন ইষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইষ্টেরই হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। ভারতীয় সৈনিকদের নিকট অবশ্য এ দুইয়ের কোন আদর্শই সেদিন ছিল না। যদি বা ছিল, যুদ্ধের দৈনন্দিন ডামাডোলের মাঝে তাহা ডুবিয়া গিয়াছিল। তবে অবচেতন মন হইতে যে সাড়া মাঝে মাঝে চাড়া দিত তাহার তীব্র কম্পনে কখনও কখনও সব কিছুই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিত। করে নাই যে কেন তাহাতে মাঝে মাঝে বিস্মিত হই। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশ আমাদের মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছিল, না বৃটিশ আর্ম্মির Diciplineএর অচলায়তনের তলায় পড়িয়া আমাদের স্বাধীন প্রবৃত্তিগুলি নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল, ইহা বলিতে পারি না।

তবে বাইরে না হউক—একথা স্পষ্টই বুঝিতেছিলাম যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বেশ একটা পরিবর্তন ঘটিতেছে। ঐ সম্মুখে যে আমাদেরই ভাইরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে—এ কথা যখন জানিলাম—তখন সমস্ত শরীর ও মনে একটা তীব্র শিহরণ অনুভব করিয়াছিলাম। সাইগল আসিতেছেন, ধিলন আসিতেছেন, আসিতেছেন ভাইরা। আর আসিতেছেন তিনি যাঁর বুকে জ্বলিতেছে দেশপ্রেমের মশাল, মুখে ধ্বনিতেছে "দিল্লী চল"। এ যৌবনতরঙ্গ রুধিবে কে? এ তরঙ্গে দিল্লী-কেল্লার লৌহ-কপাট যে খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে ইহা আমরা জানিতাম।

ইম্ফল রণাঙ্গনে। একটি টিলায় সহকর্ম্মীসহ এক Section লইয়া ঘাঁটি আগুলিয়া বসিয়া আছি। দূরের টিলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। উহারই উপরে শত্রুপক্ষের একটি O. P. (Observation Post)। ইহার ইশারায় শত্রুপক্ষের একটি দল ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। Coy. Hq. হইতে প্রেরিত আমি ও Lt. Prem Singh এই Sectionটি লইয়া আসিয়াছি, ইহাদের খোঁজ-খবর লইতে। সেই ভোরে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। এখান হইতে আর নড়িবার উপায় নাই। কারণ দুষমণের O. P.'র দৃষ্টি-পরিধির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। সারাদিন তাই নিশ্চল পাথরের মতো টিলার মাটিতে গা মিশাইয়া পড়িয়া আছি।

ইহারই মধ্যে মৃদুস্বরে প্রেমসিংএর সহিত কথা কহিয়া চলিয়াছি। একসময় প্রেমসিং হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তু আসল বঙ্গালী হো?"

একটু হাসিয়া বলিলাম,—"নেহিন্, আসল্ বাঙ্গালী হামারে সামনে।"

প্রেমসিং হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "ঠিক্ বাত্; ইস্‌মে কোই শক্ নেহিন্।"

Attestation Paradeএর কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় কহিল, "কসম্ খায়া থা, নেহিন্ তো⋯"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "নেহিন্ তো ক্যা?" এবার

ইংরিজীতে উত্তর দিল, "Don't ask me, don't ask me please.

চুপ্ করিয়া গেলাম। বুঝিলাম আমার মনে যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব তাহার মনে, সেই দ্বন্দ্ব সব ভারতীয় সৈনিকদেরই মনে। কিন্তু সবাই উহা এড়াইতে চাহে। কথাবার্ত্তায়, হাসিঠাট্টায়, কাজকর্ম্মে ধরা দিতে চাহে না।

কতক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করিল, "If Japs come now, what will you do ?"

উত্তর দিলাম—Shoot.

—Why ?

—The Japs have no business to come to our country.

প্রেম মাথার ঝুঁটি নাড়িয়া কহিল, "বিল্‌কুল্ সহি বাত্।"

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"But if they come ?"

ইহার উত্তর দিতে পারিলাম না।

প্রেমসিংএর বাস পঞ্চনদীর তীরে। জলন্ধর কি হোশিয়ারপুর আজ মনে পড়ে না। বেণী তাহার শিরে পাকাইয়া ছিল। আমরা উহাদের নাম দিয়াছিলাম Bushy top tree। কেহ কেহ বলিত চলমান বৃক্ষ। উহারা শুনিয়া হাসিত। প্রেমসিংএর সঙ্গে এক সময় Trainingএ ছিলাম। এই বেণী লইয়া একদিন আমি রীতিমত জব্দ হইয়াছিলাম।

সেদিন রবিবার। Cadet জীবনে সারা সপ্তাহ রবিবারের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবিবার সকালে সাইকেল লইয়া বাহির হইতাম। ব্যাঙ্গালোরে বাঙ্গালীর বাড়ী বাড়ী হানা দিয়া দিদি, বৌদিদি পাতাইয়া ভাত মাছ খাইয়া আসিতাম। জঙ্গী ভাই এবং দেবর পাইয়া বাঙ্গালী মহিলারাও কম তৃপ্ত হইতেন না। কাজেই বাঙ্গালী Cadetদের লইয়া মাতামাতি না করিলেও কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। আমরাও ইহার সদ্ব্যবহার করিতে দ্বিধা করিতাম না। এমনি এক রবিবার। সমস্ত দিন দিদি, বৌদিদিদের হাতের রান্না খাইয়া ভারী শরীরটি কোন মতে Barrackএ লইয়া ফিরিতেছি। প্রায় ৫০ গজ দূর হইতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, জনমানবহীন অপরাহ্ণে আমার কক্ষের সম্মুখ বারান্দায় এক রমণী চুল খুলিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। পশ্চিমের পড়ন্ত সূর্য্যের সোনালী রশ্মি চুলে পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। মুখ দেখা যাইতেছে না। তবে লাল শালোয়ার ও রং বেরঙ্গের কামিজ পরিহিতা মহিলাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া মনে হইল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম কেহ নাই। এ অপূর্ব্ব সুযোগ ছাড়িবে কে ? Cycleএ চাপিয়া ঝড়ের বেগে আসিয়া পৌছিলাম। যত তাড়াতাড়ি "কব্জা" করা যায়। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহাতে বলিতে ইচ্ছা হইল—'ধরণী দ্বিধা হও।'

সেই আলুলায়িতা কুন্তলার কুন্তলরাশি হইতে দুই হস্তে সেদিন যে শ্রীমুখখানি উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহা আর কাহারও নহে—পঞ্চনদতীরবাসী Cadet Officer প্রেমসিংএর।

সকাল হইতে এই সব পুরাণ কথা মনে হইতেছিল। মৃদুস্বরে প্রেমসিংএর সহিত কত কথাই না বলিয়া চলিয়াছি। সৈনিক জীবনের প্রথম যে দুটি বৎসর আম্বালায় কাটিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারি নাই। পাঞ্জাবীদের ভিতর একমাত্র বাঙ্গালী আমি। বেশ কিছুদিন অপাংক্তেয় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বাঙ্গালী যে যুদ্ধ করিতে জানে পাঞ্জাবী অফিসাররা ইহা কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। Military Accounts Officeএ কলমবাজী করিয়া বাঙ্গালী লড়াই করে, ইহারা জানে। বড় বড় কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ারের মাহিনা ও Allowance হইতে মোটা মোটা অংশ যখন কলম দিয়া কাটিয়া দেয় তখন নানা যুদ্ধবিজয়ী হইয়াও উহারা বুক চাপড়াইতে থাকেন। বড় বড় জাঁদরেল ইংরেজ অফিসারেরও মুখ হইতে Pipe খসিয়া পড়ে। ইহা পাঞ্জাবীরা জানে। লেকিন জঙ্গ্‌কে ময়দানমে ? নেহিন্, নেহিন্। ইহ্ কভি নেহিন্ দেখা। প্রথম প্রথম সেই জন্য ইহারা আমাকে নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিত। Assault course, Sharp shooting, Route march, Mountaineering, Tactical exercise, Battle innocculation কিছুতেই যখন হটিলাম না তখন ইহারা আমাকে জাতে তুলিল। তাছাড়া Regimental মাঠে হকি, ফুটবল, ভলিবলে যেমন কম যাইতাম না, তেমনি অফিসারস্ মেসে তাস বিলিয়ার্ডের মানও

তেমন কিছু খারাপ ছিল না। তাই জাতে উঠিতে পারিয়াছিলাম।

বাঙ্গালী মচ্ছী-ভাত খায়, সেই জন্য তাহারা নাকি কমজোর অর্থাৎ দুর্বল। অথচ হাজারে হাজারে গম্ খেকো পাঞ্জাবী সৈন্য যে কেন মচ্ছী-ভাত খেকো জাপানীদের হাতে আত্মসমর্পণ করিল ইহার কারণ ইহারা খুঁজিয়া পাইত না। সুযোগ বুঝিয়া তাই বলিতাম, যদি জাপানীদের সহিত লড়িতে চাও তবে ভাত আর মাছ খাইতে শেখ, নহিলে বাপ-দাদাদের মত আবার Surrender করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। সুপারিশে তাহারা গোমড়ামুখো হইলেও Officers' মেসে হপ্তায় দু-একদিন মচ্ছী-ভাত খাইতে মিলিত।

তা'ছাড়া বাঙ্গালীর মুখের কাছে উহারা দাঁড়াইবে কেমন করিয়া? বাঙ্গালীর ছাত্র জীবনের অন্য একটি নাম আড্ডাজীবন। ২৪ ঘণ্টার ভিতরে ১৬ ঘণ্টা আড্ডা দিয়া দিয়া শ্রীমুখের জিহ্বা ক্ষুরধার করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সৈনিক জীবনে ঐ ক্ষুরধার জিহ্বা দিয়া অনেক তোপ দাগিয়াছি।

বাঙ্গালী জাতটা নাকি চিরকাল নিমকহারাম, পাঞ্জাবীদের এই ধারনা বদ্ধমূল। ইংরেজদের তাবেদারী করিতে বাঙ্গালীরা যেমন পটু এবং সিদ্ধহস্ত অন্য কোন জাত নাকি ইহাদের নিকটে ঘেঁষিতেও পারে না। কলম পিষিয়া ও ইংরেজের তাঁবেদারী করিয়া বাঙ্গালীরা পাঞ্জাবীদের নিকট এক নিকৃষ্ট ঘৃণ্য জাতরূপে পরিগণিত হইয়াছে। 'Bengalees are a nation of clerks' পাঞ্জাবীদের নিকট বাঙ্গালীদের ইহাই একমাত্র পরিচয়। তোপ দাগিতাম, 'Punjabees are a nation of Bus-driver and Tsxi-driver। অন্ততঃ বাংলাদেশে পাঞ্জাবীদের আর কোন পরিচয় নাই। ভারতের ইতিহাসের পাতা আবার তাহাদের উল্টাইতে বলিতাম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধে শিখরা ইংরেজের তাবেদারী কেন করিল জিজ্ঞাসা করিতাম। ইংরেজ, ফরাসী এবং পর্তুগীজরা নিজেদের ভিতরে যে লড়াইগুলি করিয়াছিল তাহাতে অধিকাংশ বেতনভূক সৈন্য সামন্ত কোন্ জাতের ছিল; ইংরেজের তাঁবেদারী ভারতে কোন্ জাত করেনি, জিজ্ঞাসা করিতাম। ইংরেজের পূর্বেও মোগলের পদলেহন কোন্ জাত করে নাই। এমন যে বীর রাজপুত জাত তাহারাও নিজেদের কন্যা এবং ভগিনী মোগল বাদশাহের হারেমে নাচাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতে কোন্ জাত নিঃস্বার্থ ভাবে করিয়াছে? এ প্রশ্নে পাঞ্জাবী অফিসাররা রা করিত না। কেবল দাড়িতে হাত বুলাইত। এই আধুনিক যুগেও যখন জালিওয়ানাবাগে ও' ডায়ার পাঞ্জাবীদের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিল তখন কে আগাইয়া আসিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন? বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের সেই চিরস্মরণীয় চিঠির দুএকটি লাইন যখন উদ্ধৃত করিতাম তখন জাঁদরেল পাঞ্জাবী বীরপুরুষদের মুখ কাচুমাচু হইয়া যাইত। এইভাবে দুটি বৎসর Regimental H. Qএ প্রবেশণ থাকিয়া পরে জাতে উঠিলাম। উহারা বুঝিয়াছিল যে এ মচ্ছী-ভাত খেকো বাঙ্গালীকে বেশী ঘাঁটাইয়া লাভ নাই!

টিলার গায়ে গা লাগাইয়া পড়িয়া আছি, কত কথাই না মনে হইতেছে। কত কথাই না প্রেমসিংএর সহিত সকাল হইতে বলিয়া চলিয়াছি।

এক সময় প্রেমসিং জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলত' বাংলাদেশে স্ত্রীলোক পুরুষের চাইতে সংখ্যায় বেশী কেন?

হাসিয়া বলিলাম, "যেহেতু বাংলাদেশে স্ত্রীলোকের কদর বেশী।"

প্রেমসিং বলিয়া উঠিল, "কি রকম, তোমাদের দেশে তো বিনাপণে মেয়েদের বিয়েই হয় না।

উত্তর দিলাম, "পণপ্রথা কমবেশী সব জাতের মধ্যেই আছে।

প্রেম জিজ্ঞাসা করিল, "তবে?"

একটু ভাবিয়া কহিলাম, "দেখ, স্ত্রীলোকের একটি নিজস্ব জগৎ আছে যেখানে তাহারা স্বাতন্ত্র্য চায় যা তোমরা দিতে চাও না।"

"কি রকম?" প্রেম জিজ্ঞাসা করিল। কহিলাম, "যেমন ধর চুল। বাংলা কাব্যে নায়িকার কেশ বর্ণনা একটি Must। বাঙ্গালী মেয়েরা চুলের জন্য কি অধ্যবসায় না করে। কিন্তু তোমরা নিজেদের কেশ নিয়ে এত ব্যস্ত থাক যে স্ত্রীলোকের কেশ সৌন্দর্য্য তোমাদের চোখেও পড়ে না।"

প্রেমসিং হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আর কি?"

আমি বলিলাম, "বলছি, বাঙ্গালী পুরুষরা ধুতি পরে, কিন্তু বাঙ্গালী যুবতী বৃদ্ধা সবাই পরে সাড়ী—যার নাম ও দাম প্রতি মাসে বদলায়। তোমরা স্ত্রী-পুরুষ কিন্তু সবাই পর পায়জামা, সালোয়ার—যার পার্থক্য বোঝা মুশকিল,—যাকে বলে stream-lined.

প্রেমসিং প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "তুমি একচোখো কেন? পাঞ্জাবী মেয়েদের দোপাট্টা তোমার নজরে পড়েনি?"

হাসিয়া কহিলাম, "পড়েছে, তবে কি জান? আধুনিকারা দোপাট্টা যেন মাফ্‌লারের মতো ব্যবহার করেন।"

প্রেমসিং এবারে হাসিতে লাগিল। আমি বলিয়া চলিলাম, "আরও কারণ আছে। বড় ভাই মারা গেলে তার স্ত্রীকে তোমরা চটপট বিয়ে করে ফেল, পাছে সম্পত্তি হয়ে যায় ভাগ-বাটোয়ারা। অন্য যুগে এ প্রথাটা aristo-crate রাক্ষস ও বানরদের মধ্যেই ছিল। বাংলা দেশে ভাবীর সম্মান মায়ের সমান।"

প্রেম কহিল, "এ প্রথা জাঠদের মধ্যেই বেশী, আর আজকাল এসব কেউ মানে না।"

বলিলাম, "ভুল কথা। তবে শোন আমার কথা—'এই সেদিন পেশোয়ার ক্যান্টে বাংলো পেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এলাম। Lt. কর্ণেল রতনসিং, বন্ধু মানুষ। হাসি-খুশি, যাকে বলে 'চল্‌তা পুরা আদ্‌মী। শনিবার সন্ধ্যায় ক্লাবে হুইস্কি, জিন্ টানেন, ডান্স নাইটে রাত্রি দুটো তিনটে পর্যন্ত নাচেন। রবিবার স্যুইমিং পুলের লনে বসে বিয়ার খান, তারপর লাঞ্চ করেন। অফিসার'স মেসে ডিনারের পর বিলিয়ার্ড খেলেন। এত মডার্ণ লোক ক্যান্টনমেন্টে বিরল। আমরা বলতাম Rattan একটি রতন।

এহেন রতনমণি একদিন ঠিক করলেন যে ফ্যামিলি আনবেন। বাড়ী সাজাবার ভার নিলেন আমার স্ত্রী। রতনসিংএর স্ফূর্তি আর ধরেনা। অবশেষে সেই দিনটি এলো। দেখা গেল একটি স্টাফ্ কার ভাড়া নিয়ে স্টেশন থেকে ফ্যামিলি নিয়ে রতনসিং বাংলোয় ঢুকলেন।

দিন যায়, মিসেস রতনসিং কিন্তু 'কল্' করেন না। ব্যাপার কি? রতনমণি কিন্তু পূর্বের মতোই ক্লাব, অফি-সার্‌স মেস, ডান্স হলে বিরাজ করেন। 'কেমন চলছে?' জিজ্ঞাসা করলে বলে 'Fine, thanks!' কিন্তু শুকনো thanksএ আমাদের মন ভরে না।

ফ্লাইট Lt. সৈয়দ আহ্‌মেদ তাহার প্রতিবেশী। আমার স্ত্রী একদিন মিসেস আহ্‌মেদের কাছে ব্যাপারটি পাড়লেন। মিসেস আহ্‌মেদ মুচ্‌কি হেসে বললেন 'মাত্র দু তিন মাস বিয়ে হয়েছে, তাই হয়ত লজ্জা হচ্ছে।

শুনে আমরা সবাই অবাক। হবারই কথা। বিয়ের কথা আমরা ত' কেউ জানি না। বিয়ের ব্যাপার এত Topsecret। এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে। প্রেমের গন্ধ পাউ।

পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোকের কৌতুহল বেশী। একদিন দুপুরে পুরুষরা যখন সবাই বাইরে তখন আমার স্ত্রী রতন-সিংএর বাড়ী হানা দিলেন। সন্ধ্যায় স্ত্রী ফিরে এলেন। দেখি তার চোখ মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। মুখের দিকে চাইতেই বললেন, 'I went to surprise them but I was surprised instead।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রকম?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি দুপুরে Bde Hq রওনা হলে আমি গেলাম রতনসিংএর বাড়ী। বেয়ারা একগাল হেসে "আইয়ে" বলে অভ্যর্থনা করে Drawing roomএ নিয়ে গেল। 'তস্‌রীফ্ রাখিয়ে' বলে কেটে পড়ল। আমি ঠায় বসে। ঘণ্টাখানেক বাদে একটি প্রৌঢ়া ঢুকলেন। পরণে আধময়লা কামিজ শালোয়ার।

"কুছ্ খাইয়ে" বলে বাদাম ও সরবত খেতে দিলেন। খেলাম, ২।১টি কথাও হল। এমন সময় একটি ছোট মেয়ে ঘরে ঢুকল। প্রৌঢ়া বললেন, "ইহ্ রতন্‌কি বহিন।"

আমি মেয়েটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম," তুম্‌হারি ভাবী কাঁহা?"

মেয়েটি আঙ্গুল দিয়ে প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে দিল। আমি তার দিকে তাকাতে প্রৌঢ়া মাথা হেঁট করে বললেন, "ম্যায় ঈ হুঁ।

পালিয়ে এলাম।

মিসেস্ সৈয়দ শুনে আবার মুচ্‌কি হেসে বললেন মাত্র মাস দুই বিয়ে হয়েছে, "লজ্জা হবারই কথা।"

ইম্ফল রণাঙ্গনে একটি টিলার গায়ে গা মিশাইয়া লে প্রেমসিংএর সহিত কথা বলিয়া চলিয়াছি।

প্রেমসিং কহিল, "ক্লেদ আছে সব সমাজেই। এই

কিছুদিন আগেও বাংলা দেশে ৬০।৭০ বছরের বুড়োরা এক একজন ১০০।১৫০ যুবতী আইবুড়ী মেয়ে বিয়ে করত' না? বিয়ের পর পণ নিয়ে সেই যে হাওয়া হয়ে যেত, আর ত' টিকিটিও দেখা যেত না।"

বলিলাম, "ঠিক কথা। তবে এ প্রথাটি ব্রাহ্মণদের মধ্যেই ছিল।

প্রেম বলিল, "ও প্রথাটাও জমীদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।"

বুঝিলাম হাসি ঠাট্টার মধ্যে অজান্তে গুরুতর সমাজ সমস্যায় জড়াইয়া পড়িতেছি। কথার মোড় ঘুরাইতে চেষ্টা করিতেই প্রেমসিং বামহস্তে আমার মুখ চাপিয়া দৃঢ় মৃদুস্বরে কহিল, "শ্—শ্—শ্। দুশ্মন্।"

চকিতে সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম। খণ্ড খণ্ড অন্ধকারপুঞ্জ ভেদ করিয়া সন্ধানী চক্ষু দুইটি দুশ্মন খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এই ভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। প্রেমসিংকে কিছু বলিব মনে করিয়া তাহার দিকে ফিরিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহার জায়গা শূন্য।

তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আবার যখন দেখিলাম রাত্রির অন্ধকার তখন প্রায় ফিকা হইয়া আসিয়াছে।

উহার নিস্পন্দ গুলীবিদ্ধ বক্ষ রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে।

হস্তস্থিত রাইফেলের বেয়নেট বিদ্ধ হইয়া আছে একটি জাপানী যোদ্ধার নাভিমণ্ডলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে। একটি ছোট পাহাড়ী নালার ধারে পড়িয়া আছে। ফটো তুলিলাম।

নিঃশব্দে বনের ফুল দিয়া মৃতদেহ সাজাইলাম।

Water bottl-এর জল ছিটাইয়া মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করিলাম।

মনে মনে কহিলাম, "ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।"

দুইজনারই বুকপকেট হইতে বাহির হইল বৃদ্ধার ছবি। বুঝিলাম ইহাদেরই দুই বৃদ্ধা মাতা। এতদিন পুত্রদের পকেটে পকেটে পৃথক সত্তায় ছিলেন, আজ রাত্রিশেষে আমার পকেটে একত্রিত হইলেন। আমার বুক না মহাশ্মশান!

যুগে যুগে কুন্তী এবং গান্ধারীর দল এমনি করিয়া পুত্রাহুতি দেন এবং যুদ্ধ শেষে মশাল হাতে পুত্রদের খোঁজে যুদ্ধ শ্মশানে বিচরণ করেন।

প্রেমহীন Section লইয়া কোম্পানী হেডকোয়াটারে ফিরিয়া আসিলাম। বৃষ্টি তখনও নামে নাই। কেবল নানা জায়গা হইতে মেঘকুল জড় হইয়া কোলাহল শুরু করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে তাকাইয়া দেখি সূর্য্য আবার উঠিয়াছে। সেইদিন হইতে আমি একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছি। টিলার উপর যে মুখ প্রেমসিং বাম হস্তে চাপিয়া ধরিয়াছিল সে মুখ আমার চিরতরে চুপ হইয়া গিয়াছে।

আমার ক্ষুরধার জিহ্বা প্রেমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

সৈনিকের বড় গুণ সংকল্প। প্রেম তাহা রাখিয়াছে। আমার মত সে দুই নৌকায় পা দেয় নাই।

জয় প্রেম, জয় তুমহারী।

জয়, জয়, জয়।

কয়েক মাস বাদে নয়া দিল্লীতে আসিয়াছি। লাল-কেল্লার উন্মুক্ত ময়দানে Decorations Parade। প্রেমের বৃদ্ধ পিতাকে দেখিলাম। আমাকে শুধু জড়াইয়া ধরিলেন। কথা কহিলেন না বা কহিতে পারিলেন না। আমিও পারিলাম না। Viceroy-এর নিকট হইতে মৃতপুত্রের পাওনা মেডেলটি লইয়া একমুহূর্ত্ত বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। পরমুহূর্ত্তে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন। একটি-বারও ফিরিয়া তাকাইলেন না।

* * * *

যুদ্ধ আমরা জিতিলাম। মন কিন্তু হারিয়া গেল বিজিতদের নিকট। হিরোশিমায় বোমা না পড়িলে জাপান হারিত কিনা জানি না। তবে সে বোমা জার্মানীতে কেন পড়িল না বুঝিলাম না। কিংবা বুঝিয়াও মুখ বুজিয়া রহিলাম। বাংলার দামাল ছেলেটি প্লেন দুর্ঘটনায় জীবন দিলেন। না নিঃশব্দে আত্মগোপন করিলেন, হিটলার মৃত না জীবিত পলায়ন করিলেন—ইহা লইয়া বেশ কিছু জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ভারতের ঐতিহাসিক পটে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। ধৃত জাতীয় সৈন্যদের দিল্লীর লালকেল্লায়

সামরিক বিচার শুরু হইল। ইহাতে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত জনসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভারতলাল জহরলাল পরিত্যক্ত ব্যারিষ্টারি গাউন পুনরায় সযত্নে পরিধান করিলেন। ভারতীয় সৈন্য বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। লড়াইয়ের সময় যে দ্বন্দ্ব আত্মগোপন করিয়াছিল, লড়াইয়ের পর তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। বিচারের প্রহসন তাহারা জানিতে চাহিল না। সৎশ্রী আকাল, রাম রাম, নমস্তে, সালাম্—সে জোয়ারে ভাসিয়া গেল। শুধু রহিল জয়হিন্দ, আকাশে-বাতাসে মন্দিরে মসজিদে। ভারতের নৌসেনা যেদিন বোম্বে বন্দরে তোপ দাগিয়া বসিল সেইদিন ইংরেজ রাজত্বের কফিনে শেষ পেরেক বিদ্ধ হইল। লর্ড ওয়েভেল গেলেন, মাউন্ট-ব্যাটেন আসিলেন, তাঁহাদের সহিত আর কত কেউ গেলেন, কত কেউ আসিলেন। অবশেষে ভারতের বিকলাঙ্গ দুইটি পৃথক হইয়া পাকিস্তান হইল।

যুদ্ধোত্তর ২।৩ বৎসর ঘটনাবহুল। অঘটন যখন ঘটিল তখন অনেক ভারতীয় ছিলেন পাকিস্তানে, এবং অনেক পাকিস্তানী ছিলেন হিন্দুস্থানে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বহু দৃশ্যের সাক্ষী হইয়া রহিলাম।

পাঠানদের দেশে। ছোট ছোট পাহাড়ের কোল-আলো-করা ছোট্ট একটি ছাউনী কোহাট। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। দেশ বিভক্ত হইয়া গেল। আমার বাংলোর আশপাশ দিয়া পাকিস্তানী সৈন্যের March ও মহড়া সকাল হইতেই শুরু হইল।

সেই দিনটির কথা মনে পড়ে। ঘরে বসিয়া দিল্লীর রেডিও শুনিতেছি। দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছি, পাছে 'বন্দেমাতরম' বাহিরে শোনা যায়। কত গান যে সেদিন শুনিলাম। ক্রমে ভারতীয় সৈন্যদলের March শুরু হইল। ব্যাণ্ড বাজিল। রেডিওতে বুটের মস্‌মস্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। 'কদম্ কদম্ বড়হায়ে যা।' কখন যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানিনা। স্ত্রী আসিয়া যখন জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলেন তখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। দুই চোখ তখন জলে ভরিয়া গিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইল। অথচ সৈনিক হইয়াও দেশের প্রথম স্বাধীনতা Marchএ কদম ফেলিতে পারিলাম না। এ পা দুইটির মূল্য রহিল কি? এ হাত দুইটিরই বা দাম রহিল কি?

স্ত্রী কহিলেন, "দুঃখ কোর না। ভেবে দেখ তোমার মত কত ভারতীয় সৈন্য আজ পাকিস্তানে তোমারই মতো কাঁদছে। তোমাদেরই উপর নির্ভর করে বসে আছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে ফিরবে বলে। ধৈর্য্য ধর। কাজ কর।"

সত্যই ত। স্বাধীন ভারতের সৈনিক আমি। আমার যে অনেক কাজ। আমার ত' এ ভাবালুতা শোভা পায় না। গা ঝাড়া দিয়া উঠিলাম। রেডিওতে তখনও স্বদেশী সংগীত চলিতেছে।

দরজায় কে কড়া নাড়িল না? আগাইয়া গিয়া দেখিলাম পোস্টম্যান পরশুরাম দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য্য, এই দিনেও চিঠি বিলি! পরশুরাম আমার সঙ্গে একই পল্টনে ছিল। Release এর পর আমি উহাকে পোস্টম্যানের কাজে ভর্তি করিয়া দিই। পরশুরাম চুপি চুপি কহিল, "আজ সাম্‌কো কাফ্‌লা রওয়ানা হোয়েঙ্গে। হাম্‌লোগ্ আম্বালা যায়েঙ্গে, অগর্ কুছ কর্ সেকে ত হজুর ফর্‌মাইয়ে।"

মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "প্যাটেল্‌জীসে কহিয়েগা কি হাম্‌লোগ জরুর পৌউছ যাওয়েঙ্গে।" হাতে হাত মিলাইয়া পরশুরাম বিদায় লইল।

পুনরায় ঘরে ঢুকিয়াছি। এমন সময় বাহির হইতে একটি করুণ আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। ছুটিয়া বাহির হইতেই দেখি এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। বৃদ্ধ পরশুরাম টলিতে টলিতে চলিতেছে। এক হস্তে বক্ষ চাপিয়া আছে, অন্য হস্তে দেওয়ালে ভর করিয়া অতিকষ্টে এক পা এক পা অগ্রসর হইতেছে। বক্ষ বাহিয়া অঝোরে রক্ত ঝরিতেছে। দেওয়ালে যেখানে যেখানে তাহার হস্ত পড়িতেছে সেখানটাই লাল হইয়া যাইতেছে। ছুটিয়া গিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। রাস্তার উপরেই মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া পড়িলাম। কে যেন এক ঘটি জল লইয়া আসিল। চোখে মুখে জল দিতেই বৃদ্ধ পরশুরাম অস্ফুটস্বরে কহিল, "কাপ্তান সাহ্‌ব! বহুৎ মেহেরবানি। জয়হিন্দ সাহ্‌ব, জয়হিন্দ।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভারত অভিমুখে কাফ্‌লা রওনা হইয়া গেল।

জয়দেব ও কেন্দুবিল্ব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে মহাপ্রভু রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির সঙ্গে একত্র হয়ে বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন। নিম্নলিখিত ছত্রেই তার প্রমাণ,—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীত করায় প্রভুর আনন্দ ॥···
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ॥

এই গীতগোবিন্দর কবি হচ্ছেন জয়দেব। কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তসহ চৈতন্যদেব গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে এই গীতি-কাব্যের রসাস্বাদন করতেন। রাধাকৃষ্ণলীলার এই সুমধুর কোমলকান্তপদাবলী রচিত হয়েছিল বীরভূম জেলার অন্তর্গত পবিত্র নিকেতন কেন্দুবিল্বের এক নির্জন আশ্রমে। অজয় নদের তীরে অবস্থিত এই স্থানটি প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। গীতগোবিন্দ প্রথমে গীত হয় নীলাচলে, তারপরে হয় লক্ষ্মণসেনের সভায় নবদ্বীপে। কিছুদিনের মধ্যেই গীতগোবিন্দের মাহাত্ম্য পরিব্যাপ্ত হয় সারা ভারতে। সুদূর রাজপুতানায় যে এই গীতের বিশেষ সম্মান করা হয়েছিল, তারও প্রমাণ আছে। দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজের সভায় চাঁদ কবি 'পৃথ্বীরাজরাসৌ' নামক গ্রন্থে জয়দেবের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—

জয়দেব অঠঠং কবি কব্বিরায়ং।
জিনে কেবলং কিত্তি গোবিন্দগায়ং ॥

(বীরভূম বিবরণ, পৃষ্ঠা ১৯৫

মেবারের রাণা গীতগোবিন্দের একটি টীকা রচনা করেন, তার নাম রসিকপ্রিয়া। গীতগোবিন্দ যে কত জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব কারণে।

জয়দেব যে গৌড়েশ্বর লক্ষণসেনের সভাসদ্ ছিলেন, তা নিশ্চিত। লক্ষ্মণসেনের সভাগৃহের দ্বারে নিম্নোক্ত শ্লোক দেখেছিলেন ষট্ গোস্বামীর অন্যতম রূপ ও সনাতন নবদ্বীপে এসে,—

গোবর্ধনঃ শরণো জয়দেব উমাপতি।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ ॥

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহম্মদঘোরির যুদ্ধ হয় ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। জয়দেবের কাব্য তার পূর্বেই খ্যাতি লাভ করে; নতুবা চাঁদ কবি 'পৃথ্বীরাজরসৌ'তে জয়দেবের উল্লেখ করতেন না। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই জয়দেব বাংলাদেশ ত্যাগ করে যান। সুতরাং জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সম-সাময়িক ধরে বলা যায় যে কবি জয়দেব দ্বাদশ শতকের প্রথমের দিকে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়দেবের আবির্ভাব স্থান কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) বোলপুর (শান্তিনিকেতন) থেকে ২৬ মাইল দূরে। অজয় নদের উত্তর তীরে এই তীর্থস্থানটি বাংলার গৌরবেতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। এই স্থানটির কিছু পশ্চিমে শ্রীবিল্ব-মঙ্গলের নিবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান; পূর্ব-দিকে অবস্থিত 'লাউসেন তলাও' একজন কিশোর বাঙ্গালী-বীরের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান; দক্ষিণে নদীর অপর পারে সুপ্রসিদ্ধ ইছাই ঘোষের দেউল বা বিজয়স্তম্ভ এবং শ্যামারূপার গড় বা সেনপাহাড়ী। ইছাই ঘোষ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলেই মনে হয়। এঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে থাকবে।

ভক্তমালগ্রন্থে জয়দেবের জীবনী বর্ণিত আছে। বনমালী দাস 'জয়দেব চরিত্র' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পুঁথিখানি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে লিখিত। এই গ্রন্থের প্রকাশনা হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে। গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্ এবং বীরভূম অঞ্চলেই আবিষ্কৃত।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, 'তিনশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ ভক্তচূড়ামণি কবিকে যে ভাবে দেখিতেন, তাহার পূর্ণ চিত্র আছে। সে চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর—জীবন চরিত্র না হইলেও উপদেশপূর্ণ; ধর্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর।' (বীরভূম-বিবরণ, পৃষ্ঠা ২০২) এই গ্রন্থে জয়দেবের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে কবির পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। পদ্মাবতী ছিলেন কবির সহধর্মিণী। পদ্মাবতী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে 'জয়দেব চরিত' গ্রন্থে। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত হল,—

দক্ষিণ দেশে হরিভক্তি-পরায়ণ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত অনপত্য থাকায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না; জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে তিনি বলেন যে পুত্র-সন্তান হলে তিনি ঠাকুরের সেবক রূপে তাঁকে দান করবেন, আর কন্যা হলে সে তাঁর সেবিকা হয়ে ঠাকুরের কাজেই নিরত থাকবে। অনতিবিলম্বেই ব্রাহ্মণের এক পরমা-সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করল। ১২ বৎসর পরে তিনি কন্যাকে নিয়ে জগন্নাথের হাতে সমর্পণ করতে এলেন; ঠাকুর প্রত্যাদেশ করলেন,—

কেন্দুবিল্ব নামে এক গ্রাম।
অজয় নদীর ধারে মোর এক ধাম॥
পুরাতন তীর্থ সেই এবে লুপ্ত হইল।
তাহার মহিমা কিছু লোকে না জানিল॥
এই হেতু সেই ধাম উদ্ধার লাগিয়া।
মোর অংশে দ্বিজরূপে জন্ম নিল গিয়া॥
জয়দেব তার নাম নবীন যৌবন।
হরিনামে মত্ত সদা অশ্রুত-লোচন॥…
রাধাকৃষ্ণ নাম লেখা সকল অঙ্গেতে।
এই চিহ্ন কহি তবে দেখিবে তাহাতে॥
তাহারে দেখিয়া মনে ঘৃণা না করিবে।
যে মত আমাকে জান তেমতি গণিবে॥
পদ্মাবতী কন্যা লয়ে তারে দান কর।
তবে সে সন্তোষ হয় মোর কলেবর॥

—বীরভূম বিবরণ, পৃষ্ঠা ২০৩

জগন্নাথের আদেশে তিনি কন্যা নিয়ে উপস্থিত হলেন কেন্দ-বিল্বে। জয়দেব-সম্বন্ধে তথ্য গ্রামের লোক বিশেষ জানত না; গ্রামের সাধারণ এক অধিবাসী হিসেবেই তারা জয়-দেবকে জানে; তাঁর পাগলামির কথাও গ্রামে রাষ্ট্র ছিল। হরিনাম করতে করতে তিনি নৃত্যে বিভোর হয়ে পড়তেন; তাঁর বাস ছিল নদীতীরে এক শিব মন্দিরে। ব্রাহ্মণ গ্রাম-বাসীদের নিয়ে চললেন সেই মন্দিরে। সেখানে গিয়ে সবাই দেখে যে জয়দেব 'কদমখণ্ডীর' ঘাটে ধ্যানে নিমগ্ন। বহুক্ষণ পরে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলে সকলের আগমন-কারণ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ যথারীতি নিবেদন করে জগন্নাথের আদেশ জানালেন। জয়দেব সমস্ত শুনে বললেন, যদি ঠাকুর আমায় আজ্ঞা করেন—'তবে কন্যা বিভা করি কহিল তোমায়।' এই কথায় সবাই গ্রামে ফিরে এলো। রাত্রে জগন্নাথ স্বপ্নে জয়দেবকে জানালেন,—

তুমি আমি একদেহ ভিন্ন কভু নয়।
কন্যা বিভা কর মনে না করিহ ভয়॥
পদ্মাবতী লক্ষ্মী-অংশে জন্ম ইহার।
তোমার লাগিয়া কন্যা হইল অবতার॥

—বীরভূম বিবরণ, পৃষ্ঠা ২০৪

জয়দেব স্বপ্নাবস্থায় প্রভুকে নিবেদন করলেন, শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা-করা এবং গৃহে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা আমার বহুদিনের সাধ; যদি আমার উক্ত অভিলাষ পূর্ণ হয় তবে প্রভুর আদেশ আমি পালন করব। জগন্নাথদেব 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন। প্রভাতে পুনরায় ব্রাহ্মণ জয়দেব সমীপে আগমন করলে জয়দেব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে ঠাকুরের যুগল বিগ্রহ এই অজয়ের গর্ভেই বিদ্যমান। আগে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে কন্যাকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন জয়দেব। জয়ধ্বনি করে সবাই নদীতীরে চললেন এবং অজয়গর্ভ থেকে রাধামাধবের বিগ্রহ উদ্ধার করে জয়দেব গ্রামের মধ্যে ঠাকুরের অভিষেক ও পূজান্তে মহাসমারোহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। বনমালী দাস বলেছেন,—

পৌষমাস-সংক্রান্তি ব্রহ্মমুক্তির সময়।
পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়॥ পৃষ্ঠা ২০৫

এর পরেই পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের পরিণয় হয়। জয়দেব ও তৎপত্নী সম্বন্ধে চক্রদত্ত রচিত সংস্কৃত ভক্তমালে বিবৃত আছে,—

উভৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চনতৎপরৌ ॥

জানা যায়, কেন্দুবিল্বে রাধামাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বর্ধমানধাজের বিশেষ প্রযত্ন ছিল। তখন বাংলা দেশ স্বাধীন এবং লক্ষ্মণ সেনের অধীনে। 'সেখ শুভোদয়া' থেকেও জানতে পারা যায় যে জয়দেব ও পদ্মাবতীর শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতে গৌড়াধীপ লক্ষ্মণ সেন বিশেষ মুগ্ধ হন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পদ্মাবতীর পরিণয়ের পর জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনায় মনোনিবেশ করেন। কবির দৈনন্দিন কাজ কেমন ছিল তা জানা যায় বনমালী দাসের উক্তিতে,—

রাত্রিশেষে উঠি মঙ্গল-আরতি করিয়া।
প্রাতঃকালে স্বকুসুম আনেন তুলিয়া ॥
পদ্মাবতী নানা রঙ্গে গাঁথে ফুলহার।
গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্ণলীলা সার ॥···
প্রহরেক পর্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে।
তারপর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গাস্নানে ॥ পৃষ্ঠা ২০৭

কেন্দুবিল্ব থেকে গঙ্গা অনেক দূরে। কবি প্রত্যহ সেখানে কি করে যেতেন, বোঝা যায় না। যা হোক, এক দিন স্নানের সময় গঙ্গাদেবী কবিকে দেখা দিয়ে বললেন, তোমাকে এত কষ্ট করে এখানে স্নান করতে আসতে হবে না; আমি প্রতিদিন অজয়ে গিয়ে উপস্থিত হব; আর বছরের তিন দিন অজয়ের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে থাকব এবং পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন 'শঙ্খবলয়িত' বাহু দেখাব কদম্বখণ্ডীর ঘাটে।

এদিকে গীতগোবিন্দের রচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণরা জয়দেবকে ধরলেন, তাঁদের ভোজন করাতে হবে। কবি সানন্দে রাজি হয়ে তাঁর প্রিয়স্থান কদম্বী-খণ্ডের ঘাটে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়ে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করলেন; কিন্তু ঘাটটি শ্মশানের নিকটবর্তী বলে ব্রাহ্মণরা সেখানে ভোজনে অস্বীকৃতি হলে জয়দেব দুঃখিতচিত্তে প্রস্তুত খাদ্য-দ্রব্যাদি উক্ত ঘাটে প্রোথিত করলেন। কবি মনে বড়ই ব্যথা পেলেন; তাই চির-আকাঙ্খিত পৌষ-সংক্রান্তির সময় কাউকে আহ্বান না করে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। বৈষ্ণবগণ সংক্রান্তির দিনে জাহ্নবীর দর্শন ও নির্দিষ্ট দিনে অজয়ের তীরে কেন্দুবিল্বে। পৌষ-সংক্রান্তির ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে—

হেনকালে দুই বাহু শঙ্খ উত্তোলন।
কদম্বীখণ্ডের ঘাটে দিলা দরশন ॥ পৃষ্ঠা ২১০

অজয় তখন উজান বইতে লাগল; সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনিতে কেন্দুবিল্বের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। সেখানে মহোৎসব চলল তিন দিন ধরে। পরিশেষে কবি করজোড়ে সবাইকে বললেন,—

শুন শুন সর্বলোক শুন এই বাণী।
কদম্বখণ্ডীর ঘাট মহাতীর্থ জানি ॥
কোন যুগের ঈশ্বরের এই ধাম ছিল।
লুপ্তধাম পুনরপি মহাতীর্থ হইল ॥
কদম্বখণ্ডীতে রাধা-মাধব পাইল।
পুনরপি সেই ঘাটে গঙ্গা দেখা দিল ॥ পৃষ্ঠা ২১২

যে-সব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা শেষে জয়দেব ও কদম্বখণ্ডীর মাহাত্ম্য দেখে পুনরায় ভোজন প্রার্থনা জানান কবির কাছে। জয়দেব পরম আনন্দে বললেন, এক বৎসর পূর্বে যে-অন্নব্যঞ্জন ঘাটে প্রোথিত করে রেখেছি, যদি কৃপা করে তা গ্রহণ করেন তবে আমি ধন্য হব। ব্রাহ্মণরা অবাক হয়ে তাতে রাজি হলে জয়দেব মাটির ভিতর থেকে অন্ন-ব্যঞ্জন বের করলেন অবিকৃতঅবস্থায়। জয়ধ্বনি করে ব্রাহ্মণরা তা গ্রহণ করলেন। সেই থেকে প্রতিবৎসর উৎসবের অন্তে অন্নব্যঞ্জনাদি মাটিতে প্রোথিত করে রাখার প্রথা বরাবর চলে আসছে এবং পর বৎসরে তা উত্তোলন করা হয়। প্রতিবৎসর পৌষের মকর সংক্রান্তিতে কেন্দুবিল্বে চারদিন ধরে বিরাট মেলা হয়; এই সময় বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানথেকে কীর্তন ও বাউল সম্প্রদায় এসে কেন্দুবিল্বে মিলিত হন। অষ্টপ্রহর ব্যাপী নামকীর্তনে স্থানটি মুখর হয়ে ওঠে।

কেন্দুবিল্বে রাধামাধবের প্রতিষ্ঠা ও গীতগোবিন্দ রচনার পরে বহুদিন পর্যন্ত জয়দেব সহধর্মিণীসহ সাধন ভজন করে-ছিলেন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। পরিশেষে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শনের জন্য উতলা হয়ে জয়দেব পদ্মাকে মনের কথা জানান; কিন্তু রাধামাধবের কথা ভেবে দম্পতী ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগল; তখন স্বপ্নে ঠাকুর উভয়কে

লগ্রামশীলায় পরিণত হয়ে কবির 'খুঞ্জির' মধ্যেই যেতে পারবেন। উভয়ে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখে হৃষ্টমনে ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগ্রত হলেন এবং স্নানান্তে মন্দিরে গিয়ে দেখেন সত্যই বিগ্রহের পরিবর্তে শালগ্রামশিলা বিরাজমান। আনন্দাশ্রুতে তাঁদের দেহ হল সিক্ত ; কদম্বখণ্ডীর পবিত্র ধূলিকণা মাথায় নিয়ে উভয়ে রওনা হলেন শালগ্রাম শিলা নিয়ে বৃন্দাবনের পথে। বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনার ধারে মন্দির নির্মাণ করে জয়দেব সেখানে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করলেন; মন্দিরের নিকটেই এক কুঞ্জে দম্পতী বাসা বেঁধে দেবসেবা করতে লাগলেন।

একদিন পদ্মাবতী 'বৈজয়ন্তী'-মালা রচনা করে শাল-গ্রামকে সমর্পণ করলেন ; কিন্তু সেদিন পদ্মার মন ভরল না। তিনি স্বামীকে বললেন, শ্রীরাধামাধবের গলায় যেমন মানাত, তা তো হল না। বড় দুঃখ হল উভয়ের। ভক্ত-বৎসল ঠাকুর ভক্তের মনোভাব বুঝতে পেরে রাত্রে স্বপ্নে তাঁদের বললেন, যে-মূর্তি তাঁরা এখন কামনা করছেন, এখন থেকে সেই মূর্তিতেই আমি বিরাজ করব। পরদিন প্রভাতে স্নানান্তে দম্পতী দেখলেন—কেন্দুবিল্বের সেই শ্রীরাধামাধব মন্দির আলো করে বিরাজমান। উভয়ে প্রেমব্যাকুল হয়ে আনন্দাশ্রুতে মন্দির দিলেন ভাসিয়ে,—

সৌন্দর্য দেখিয়া প্রভুর আনন্দিত মন।
প্রেমজলে দোঁহা অঙ্গ করিলা সেচন॥
প্রণিপাত করে দোঁহে আনন্দ হিয়ায়।
প্রেমের বন্যায় উঠে যাহা নাহি পায়॥ পৃষ্ঠা ২১৭

বনমালীদাসের জয়দেবচরিত্রে জানা যায় যে, জয়দেব ও পদ্মাবতী বার বৎসর বৃন্দাবনে ছিলেন, তারপর হয় তাঁদের তিরোভাব, কিন্তু তাঁদের তিরোধানের বিবরণ অজ্ঞাত, কারণ জয়দেবচরিত্রের পুঁথিখানি এই খানেই খণ্ডিত—শেষের পাতা পাওয়া যায়নি। এখানে লক্ষণীয়, উক্ত গ্রন্থে নীলাচলের কোনো প্রসঙ্গই নাই, অথচ চন্দ্রদত্তকৃত সংস্কৃত ভক্তমালের বিবরণ অন্যপ্রকার। এই গ্রন্থ পাঠে মনে হয়, পদ্মাবতী-পরিণয়, গীতগোবিন্দ-রচনা ইত্যাদি শ্রীক্ষেত্রেই হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জয়দেব রাধা-মাধব-বিগ্রহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তার কোনোই উল্লেখ নাই ; মনে হয় সংস্কৃত ভক্তমাল্‌কার ভ্রমবশতঃ কেন্দুবিল্বকে শ্রীক্ষেত্রের নিকটবর্তী ভেবেছিলেন। পক্ষান্তরে সুদূর রাজপুতানায় রচিত ভক্তমালের অনুবাদে জানা যায়,

অসাধারণ গুণ সাধুর অপার মহিমে।
যার স্নান-অনুরোধে গঙ্গা আইল গ্রামে॥
কেন্দুবিল্ব হইতে গঙ্গা হয় আঠার ক্রোশ।
প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে বার মাস॥ ভক্তমালগ্রন্থ,
পৃষ্ঠা ১৪৭

এখানে সুস্পষ্টই বলা হয়েছে যে কেন্দুবিল্ব বাংলাদেশে এবং গঙ্গা থেকে আঠার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বীরভূমান্ত-র্গত কেন্দুবিল্ব থেকে গঙ্গা প্রায় ১৮ ক্রোশ দূর দিয়াই প্রবাহিত—ভৌগলিক তথ্য থেকেই তা জানা যায়। বনমালীদাসের জয়দেবচরিত্রেও বলা হয়েছে যে কেন্দুবিল্ব বীরভূমেই অবস্থিত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভক্তকবি জয়দেবের সিদ্ধস্থান বীরভুমের কেন্দুবিল্বই।

গীতগোবিন্দ যে কত লোকপ্রিয় ছিল, তা জানা যায় নিম্নোক্ত ছত্রে—

অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা যে গীত।
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত॥
পৃষ্ঠা ২১৮ ; ভক্তমাল গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৪৩

বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত গীতগোবিন্দের শেষে কয়টি অতিরিক্ত শ্লোক দেখা যায় ; সেগুলি নিশ্চয়ই পরে সংযোজিত; কারণ বঙ্গীয় সংস্করণে ঐ শ্লোকগুলি নেই। টীকাকার গোস্বামীর 'বালবোধিনী'তেও উক্ত শ্লোক-গুলির উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাণা কুম্ভকৃত 'রসিক-প্রিয়া'য় ঐগুলির ব্যাখ্যা থাকায় মনে হয়—কুম্ভ বঙ্গীয় গ্রন্থ অনুসরণক্রমে টীকা রচনা করেন নি। জয়দেবের শেষ জীবন সম্বন্ধে ভক্তমালে কিছু অলৌকিক ঘটনা বিবৃত আছে ; তাতে জানা যায়, দস্যুহস্তে নির্যাতীত হস্তপদহীন জয়দেব পুরীরাজ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হন এবং পুনরায় দৈবানুকূল্যে পূর্ব অবস্থা ফিরে পান। তখন থেকেই জয়দেব পদ্মাবতীসহ পুরীরাজের প্রাসাদেই দিনাতিপাত করেন ; কিন্তু এ-সম্বন্ধে বনমালীদাসের জয়দেবচরিত্রে কোনই উল্লেখ নাই ; উপরন্তু পরমভক্ত জয়দেব জীবনের অধিকাংশ সময়ই শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কাটিয়েছেন একান্ত নির্জন আশ্রমে ; তাঁর পক্ষে শেষ জীবনে বিলাসসম্ভারপূর্ণ রাজপ্রাসাদে আশ্রয়গ্রহণ করা কখনই সত্য বলে মনে হয় না। বনমালী দাসও ছিলেন

একজন বিশেষ ভক্ত কবি। নীলাচল বৈষ্ণবভক্তগণের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান; সেই মহাতীর্থের সঙ্গে জয়দেবের যদি বিন্দুমাত্রও সংশ্রব থাকত, তবে বনমালী দাস জয়দেব চরিত্র গ্রন্থে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ করতেন। সুতরাং মনে হয়, জয়দেব আদৌ নীলাচলে যাননি; বীরভূমের কেন্দুবিল্ব থেকে বরাবর বৃন্দাবনেই তিনি উপস্থিত হন, এবং অবশিষ্ট দিন তাঁর এইখানেই কাটে।

জয়দেব সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, তিনি শক্তিমন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কেন্দুবিল্বের অনতিদূরে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অজয়ের তীরে প্রতিষ্ঠিত কুশেশ্বর শিবলিঙ্গের সমীপবর্তী একটি প্রস্তর খণ্ডে একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত আছে; একে 'ভুবনেশ্বরী' যন্ত্র বলে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। জয়দেব সম্বন্ধে এই মন্তব্যের সার্থকতা পাওয়া যায় জয়দেব চরিত্র-প্রণেতা বনমালী দাসের উক্তিতেও,—

> ভিক্ষা মেগে খায় সদা হরিনাম জপে।
> হাসে কাঁদে নাচে গায় শিবের মণ্ডপে॥
>
> —কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, পৃষ্ঠা ৩৩

এই কুশেশ্বর শিব এবং মন্দিরে অষ্টদলপদ্ম চিহ্নিত একটি পাষাণখণ্ডও বিরাজমান ও অবিকৃত দেখা যায় আজিও কেন্দুবিল্বে। বীরভূম তান্ত্রিকতার পীঠস্থান; সুতরাং জয়দেব সম্বন্ধে এই উক্তি একেবারে অযৌক্তেয় নয়।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মতো একাধিক জয়দেবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। 'শৃঙ্গার-মাধবীয়-চম্পূ' রচয়িতার নাম জয়দেব, উপনাস কৃষ্ণদাস; 'পীযূষবর্ষ' উপাধিক একজন জয়দেব ছিলেন; তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চন্দ্রালোক-অলংকার' ও 'প্রসন্নরাঘব নাটক'।

এখন কেন্দুবিল্বে যে বিগ্রহ আছেন, তিনি জয়দেব পদ্মাবতী-পূজিত রাধামাধব নন। বৃন্দাবন যাত্রাকালে ভক্তদম্পতী রাধামাধবকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। অজয়ের ওপারে বিখ্যাত শ্যামারূপার গড় থেকে রাধাবিনোদের বিগ্রহ এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই মন্দির নির্মিত হয় বর্ধমান রাজষ্টেট থেকে আনুমানিক ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে। এ-সম্বন্ধে একখানি শিলালিপির অস্তিত্বের কথাও শোনা যায়।

মহাভারত

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

যতোই দুঃসহ হোক ভাবিতে এ মনে
তবু দেখি,—তোমার মননে,
শত জিহ্বা কৌরবের নিষ্ঠুর চাবুক
আপন স্বজন গোষ্ঠী পাণ্ডবে হানুক্!

আমি সহি যুধিষ্ঠির ঔদার্যের নীতি
তোমার সাম্রাজ্য নয়,—তোমার সম্প্রীতি
আমার আকাঙ্ক্ষা এক মানবতা মন
সৌহৃদ্য বন্ধন!

যতোই যন্ত্রণা হোক ভাবিতে এ মনে
তবু দেখি অতি সঙ্গোপনে
তোমার মননে,
তোমার সভ্যতা সেই দুর্যোধন ক্ষুধা
ভ্রাতৃরাজ্য গ্রাস করে, মুখে ন্যায় সুধা!

আমারে গ্রাসিতে আজ পদধ্বনি তোমার অশ্বের
কৌরব বর্বর শক্তি জেগে ওঠে ফের!

আমার চেতনা নিয়ে আমাতেই আছি
মরি কিংবা বাঁচি,
আমার মহান মন্ত্র পাঞ্চজন্য ডাক
কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধে কৃষ্ণ আজ
মোর পাশে থাক্!

যতোই বেদনা থাক ভাবিতে এ মনে
তোমার প্রাচীন গর্ব রত্ন-সিংহাসনে
অতি সঙ্গোপনে
দেখি আজ বসায়েছো কুরুরাজ
স্বৈরী দুর্যোধনে
মৃত্যু যার কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব নিধনে॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

গুরুমা (সাবিত্রীর চিবুক ধ'রে): থাকব বৈ কি মা। তুমি তো শুধু আমাদের অতিথি নও—তার উপরে মা হবার বর চাইতে এসেছ, কাজেই আমার ব্যথার ব্যথীই বলব—কারণ আমিও মা হ'তে চেয়েছিলাম মা। এমন দরদীকে আগলে না বাঁচালে শেষের সে-ভয়ংকর দিনে ঠাকুরের কাছে কী জবাবদিহি করব—যখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তর্কচঞ্চুর দক্ষযজ্ঞে ফের কলির সতীকে ভস্ম হ'তে দিলাম কোন্ প্রাণে ?

আঠারো

ধ্রুব টঙ্গা ডাকতে যাবে এমন সময় প্রহ্লাদ বলল: "কতদূর—কাফেটা ?"

ধ্রুব: কাছেই। আধমাইলও হবে না।

প্রহ্লাদ: তাহ'লে চলো হেঁটেই যাই—তোমার গল্প শুনতে শুনতে।

ধ্রুব (খুসি): মা তো আমাকে ঘড়ি ঘড়ি বলেন মৌনীবাবা হ'তে। আপনি খুব লক্ষ্মী, প্রহ্লাদদা। আপনার কাছে মন খুলে কথা কওয়া যায়—আপনি থামতে বলেন না।

প্রহ্লাদ (হেসে): বলি না আমার নিজের স্বার্থের জন্য। আমি জানতে চাই গুরুদেবের শিষ্যশিষ্যাদের সম্বন্ধে। কী ভাবে উনি দীক্ষা দেন—জানো তুমি ?

ধ্রুব: আমি জানি না ? বাঃ। প্রথম দিকে সব কিছুর তদারক করতে হয় তো আমাকেই।

প্রহ্লাদ (হেসে): মানে ? শিষ্যশিষ্যাদের ?

ধ্রুব: তা না। তবে আরো কত কী আছে। শামিয়ানা খাটানো, অতিথি সেবা, এও তা ফর্মাস খাটা, কী নয় বলুন ?

প্রহ্লাদ: কজন শিষ্য এখন থাকেন আশ্রমে—মানে বরাবরের জন্যে ?

ধ্রুব: কজন ? বলছি। (হাতে গুণে) বাবা মা আমি বাদে, বিপিন এক, শাস্তি দুই, ঝি ভবতারিণীদি—তিন।

প্রহ্লাদ: ঝি ? সেও শিষ্যা ?

ধ্রুব (আশ্চর্য): নয় তো কি ? বাবার কাছে রাজা-রাণী ঝি-চাকর সব সমান—মানে দীক্ষা নেওয়ার পরে। তাই তো ঝি-কে আমি দিদি বলি।

প্রহ্লাদ: মানে, যারা এখানে দীক্ষা নিতে আসেন সবাই—গুরুদেব ও গুরুমার কাছে সমান ?

ধ্রুব: নয় তো কি ? তবে বলি শুনুন এক গল্প। মাস তিনেক আগে—কোথাকায় এক রাজা আর রাণী এসেছিলেন দীক্ষা নিতে। বাবা দীক্ষা দিতে রাজি হন নি, বললেন: ওরা পারবে না, ওদের যে অহঙ্কার! রাণী গিয়ে মাকে ধরল—তাঁর পায়ে মাথা কুটে বলল—দীক্ষা দিতেই হবে। শুধু দীক্ষা না—ঐ সঙ্গে একটি ছেলে। মার মন সহজেই গলে তো ? কাজেই বাবাকে ধরলেন। বাবা শুনে বললেন: "ওরা দীক্ষা চায় না—চায় রাজপুত্তুর—বংশরক্ষা।" মা বললেন: "চাইলই বা। ওদের মনে সুখ নেই—বেচারী! কে বলতে পারে তোমার ছোঁওয়ায় শান্তি পাবে না ? ক্যা জানে কৌন ভেখসে নারায়ণ মিল জায়—বলে না ?" বাবা মা-র কথা খুব শোনেন। বলেন: মার নাকি আছে এমন একটা অন্তর্দৃষ্টি—ইনটুইশন বুঝি

কথাটা? (প্রহ্লাদ সায় দেয় ঘাড় নেড়ে) মার তাই আছে। কে কেমন আধার মা না কি বাবার চেয়েও পরিষ্কার দেখতে পান। (বিজ্ঞভাবে) না—বাবার চেয়েও বলব না—তবে সমান সমান—হম ভি মিলিটারি তুম ভি মিলিটারি গোছের—বুঝলেন না?

প্রহ্লাদ (হেসে): বুঝেছি বৈ কি। যোগীর জ্ঞান আর যোগিনীর ধ্যান।

ধ্রুব: বাঃ। বেশ বলেছেন। কারণ মা কী যে ধ্যান করতে পারেন! জানেন, একবার আমরা গিয়েছিলাম বৃন্দাবনে। উঃ, যমুনার জলে সে কী কচ্ছপ, আর তীরে সে কী মশা! সেই কচ্ছপের ভিড়ে নির্ভয়ে ডুব দিয়ে এসে সেই অগুন্তি মশার মধ্যে মা রোজ ধ্যানে বসতেন। এক-দিন কী হ'ল—ধ্যানে ব'সে—ওমা!—আর ওঠার নামটি নেই! ঝাড়া পৌনে চার ঘণ্টা ঠায় ব'সে! শুধু তাই? এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি প্রহ্লাদদা, স্বচক্ষে দেখলাম কী জানেন? মার মাথায় ছটি চড়ুই পাখী ব'সে হাসাহাসি কচ্ছে—বোধ হয় মাকে নিয়েই হবে, অথচ মা একেবারে নট্ নড়ন চড়ন! বাবা মাকে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলেন: মার ধ্যান দেখলে তাঁর মনে পড়ে গীতার দুটি উপাধি: আপূর্যমান আর অচলপ্রতিষ্ঠ।

প্রহ্লাদ: বটে? তাহলে গুরুমা সমাধি-সিদ্ধ বলো?

ধ্রুব: সিদ্ধ কি আধসিদ্ধ জানি না, জানি শুধু এইটুকু যে, মা-র অন্ত পাওয়া ভার। বাবা প্রায়ই বলেন একথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। একদিকে যেমন নরম—কারুর দুঃখের কথা শুনতে না শুনতে চোখে জল—অন্য দিকে তেম্নি নিজের কত শক্ত অসুখকেও হেসে উড়িয়ে দেবেন—যেন কিছুই না! শুনবেন একবার কী হয়েছিল? মার পিঠে এক প্রকাণ্ড কাবংকল্ হয়। সে কী লাল ফোড়া—আর তার সে কী টনটনানি! এক বুড়ো নাপিত এসে—ওমা! বসিয়ে দিল তার নরুণ! দেখতে গিয়েও আমি তাকাতে পারলাম না—চোখ বুঁজলাম, কিন্তু মা নির্বিকার! আবার ঐ বিপিন না? জানেন? ও ছিল এক দারুণ মাতাল। আমাদের কত যে অনিষ্ট করেছে কী বলব? তার গল্প পরে বলব একদিন বড় ক'রে, আজ সময় নেই। সে বাবার নামে নালিশ করে পুলিশ ডেকেছিল। কিন্তু পরে যখন তার একটা পা কাটা পড়ে—মদ খেয়ে পড়েছিল মোটর চাপা—তখন মা-ই তাকে ঠাঁই দেন। জানেন? সে আজ বাবার সেক্রেটারি।

প্রহ্লাদ: বটে? বলো না তার গল্প ভাই!

ধ্রুব: না, জমা রইল—সে মস্ত কাহিনী। আজ যে একটু বাদেই গুরুপূর্ণিমার ভজন আরতি। আমার ফিরে গিয়ে লোকজনের বসাটসার—আরো অনেক কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যা বলছিলাম—মাকে বাইরে থেকে দেখতে মনে হয় ঠিক যেমন আর পাঁচজনের একজন—মা-ও বটে, গিন্নিও বটে, দয়াময়ীও বটে, কান্নাময়ীও বটে,—কান্নাময়ী নামটা কিন্তু আমার দেওয়া—

প্রহ্লাদ (হেসে): বটে? তুমি তাহ'লে নামও দাও?

ধ্রুব: নাম দিতে দিতেই মন্ত্র দেব একদিন, দেখবেন—বলা রইল। কিন্তু কী বলছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, মাকে বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই—বাবা প্রায়ই বলেন মার ধ্যান যেন—কী যেন উপমাটা—অবিচ্ছিন্ন—

প্রহ্লাদ: তৈলধারাবৎ।

ধ্রুব (সোল্লাসে): হ্যাঁ হ্যাঁ। ধন্যবাদ। আপনি তো খুব পণ্ডিত!

প্রহ্লাদ: পণ্ডিত না। তবে সংস্কৃত আমাকে পড়তে হ'য়েছিল যে পাঁচ বৎসর বয়স থেকে। আমাদের অঞ্চলে অনেকেই সংস্কৃত পড়ে ছেলেবেলা থেকে—পুণা তো সংস্কৃতের একটা কেন্দ্র।

ধ্রুব: তবে মা বাবার সঙ্গে বনবে আপনার খুব। ওঁরা দুজনেই সংস্কৃতে প্রায় শাস্ত্রী। মা-র তো সংস্কৃতে মুখে খই ফোটে - উপাধিও পেয়েছেন—কাব্যতীর্থ।—এই যে, আমরা এসে গেছি।

ওঁরা দুজনে তামিল কাফেতে ঢুকল।

প্রহ্লাদ ও ধ্রুব কফির পেয়ালা নিয়ে বসেছে এমন সময়ে টেলিফোন। পরিবেষক ধ্রুবকে বলল: "আপনাকে গুরুমা ডাকছেন।"

ধ্রুব (ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধ'রেই): মা? কী ব্যাপার?...ও। হ্যাঁ, প্রহ্লাদদার জন্যে আর এক পেয়ালা কফি?...না না, মনে আছে মা আমি ভাজিয়া টাজিয়া কিছু খাব না, ভয় নেই।...কী? বন্দনাদিকে আর সুরেশদাকে

ফিরতি পথে ব'লে যেতে হবে ?···আচ্ছা। রাত্রে ভজনের পরে ভোজন ?—সুরেশদা তো বিষম খুশি হবেন—কেবল যা বন্দনাদি ভয় পাবেন—পতি পরম গুরুর খাওয়া দেখে। ···আচ্ছা আচ্ছা—বলব গো বলব। আমি কি তোমার মতন ভুলো না কি ?···কী ?···বন্দনাদিকে দোয়ার দিতে হবে ?···বেশ। আমরা টঙ্গা ক'রেই যাচ্ছি—সুরেশদা আর বন্দনাদিকে পারি তো সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসব। শাপে বর হবে আমার। সুরেশদা নতুন মোটর কিনেছেন—আমরা সেই মোটরেই ফিরব—দিব্যি হবে। তাতে তো আর তোমার আপত্তি নেই, মা ?

* * *

টেলিফোন রেখে ফিরে এসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ধ্রুব বলল : "আমাদের এই বন্দনাদিটিকে জানেন ? গরীব বিধবার মেয়ে। অতি কষ্টে থাকত—কায়ক্লেশে। মা তাকে নানা কাজ দিতেন—কাজ অবিশ্যি অছিলা—সেই সূত্রে কিছু সাহায্য করা আর কি। তারপরে বন্দনাদির বিধবা মা মারা যাবার পর মা বন্দনাদিকে পোষ্য-কন্যা নেন। সেও আর এক মস্ত গল্প। মার দয়ার গল্প কি একটা প্রহ্লাদদা ? বন্দনাদি ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী। মা-ই তাকে লেখাপড়া শেখান নিজে। বিশেষ ক'রে সংস্কৃত। জানেন—মা মেয়েদের প্রায়ই ভাগবতের পাঠ দেন! কিন্তু যা বলছিলাম। এই বন্দনাদির বিয়ের ব্যবস্থা করলেন কে ? মা।

প্রহ্লাদ (হেসে) : গুরুমা তাহ'লে ঘটকালিও করেন ?

ধ্রুব (অম্লানবদনে) : করবেন না কেন ? বাবা মা তো গৃহী যোগী, জানেন না বুঝি ?

প্রহ্লাদ : জানি। কিন্তু তোমাদের আশ্রমে বিয়েও হয় এতটা জানতাম না।

ধ্রুব : বাবার সঙ্গে যখন মার বিয়ে হ'ল তখন বন্দনাদির সঙ্গে সুরেশদার বিয়ে হ'তেই বা দোষ কী শুনি ?

প্রহ্লাদ : না না, দোষের প্রশ্নই ওঠে না। তুমি ভাই, বন্দনাদির গল্পটা বলো না আরো। তার স্বামী সুরেশদাই বা কে—কী করেন ?

ধ্রুব : বাবার শিষ্য। বেশ ভালো লোক। নামকরা ডাক্তার। কেবল কৃপণ এই যা। (হেসে) কৃপণ ব'লে কৃপণ! সে এক কাণ্ড! মা তাঁকে বললেন বন্দনাদিকে বিয়ে করতে। সুরেশদা শুনেই কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। মা খোঁজ নিয়ে জানলেন—লক্ষ্ণৌয়ের এক উকিলের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চলছে। উকিলটির মা ও বাবা মার শিষ্যা। তাই মা টেলিফোন করতেই সব বললেন তিনি গলগল্ করে—বিয়ে আটকে আছে সুরেশদা দশ হাজার টাকা যৌতুক চাচ্ছেন—তাঁরা পাঁচ হাজারের বেশি উঠতে নারাজ—এই সব। মা আর কথাটি না—নিজের নামে একটুকরো জমি ছিল—বিক্রি ক'রে বন্দনাদির জন্যে দশ হাজার টাকা যৌতুক নিয়ে সুরেশদার ওখানে গিয়ে হাজির। অমনি সুরেশদার যে কী গুরুভক্তি! একেবারে গদগদ! বললেন : "আপনি যখন বলছেন মা, তখন আর কথা কি ?" শুনে বাবার সে কী অট্টহাসি! "গুরুভক্তির বালাই নিয়ে মরি" ব'লেই এক ছড়া বাঁধলেন—

(গুণ গুণ করে)

'গুরুজি বলেন : গুরুকৃপা করে রগ্ন অবোধে জ্ঞানী ও বলী

গুরুমা বলেন : আরো অঘটন ঘটায় পলকে টাকার থলি—

কুমার শিষ্য পড়ে সাতপাকে গুরুভক্তিতে উঠি উছলি !'

হাসতে হাসতে ধ্রুব প্রায় বিষম খায় আর কি। প্রহ্লাদও হাসিতে যোগ দেয়। তার পরেই ধ্রুব গম্ভীর মুখে তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে : উঃ। আর সময় নেই—চলুন চলুন—বন্দনাদিকে ব'লে যেতে হবে ভুলে গেছেন ? কিন্তু এও বলব যে বিয়ের পরে সুরেশদা বন্দনাদির কথায় ওঠে বসে। আর বলে নিজেকে ভাগ্যবান্ শিষ্য। গুরুভক্তিও তার বেড়ে গেছে দশগুণ—হা হা হা! দশহাজারী গুরুভক্তি তো! বন্দনাদির একটি কবিতার বই পর্যন্ত ছাপিয়ে চলেছেন এক রুগী প্রকাশক পেয়ে। গুরুকৃপায় কী না হয় বলুন ?—কবিতার বইয়েরও প্রকাশক জুটে যায়। হা হা হা!

উনিশ

টঙ্গা একটি সুন্দর বাংলোয় ঢুকে থামল এসে এক গাড়িবারান্দার নিচে। প্রথমেই বন্দনার সঙ্গে দেখা—সে একটি উলের গেঞ্জি বুনছিল। সুন্দরী নয়, কিন্তু

শ্রীমস্তিনী মেয়ে। একটু গম্ভীর, কিন্তু যখন হাসে মুখ চোখ আলো হ'য়ে ওঠে। প্রহ্লাদের প্রথমেই শ্রীমস্তিনীকে ভালো লেগে গেল। ধ্রুব প্রহ্লাদের পরিচয় দিতেই বন্দনা বলল: "আপনার গুণপনার কথা গুরুমার মুখে শুনেছি, তবে আপনি এসেছেন এ খবর পাই নি।" ব'লে ধ্রুবের দিকে তাকিয়ে: কেন খবর দিস নি শুনি?"

ধ্রুব: দশ বারো দিন আপনি আশ্রমে আসেন নি কেন? এলেই খবর পেতেন।

বন্দনা: কলকাতা থেকে ওঁর দুটি জাঁকালো বন্ধু এসেছিলেন সস্ত্রীক। তাঁদের দেখাশুনো করতে ব্যস্ত ছিলাম। মাত্র আজ বিকেলের ট্রেণে তাঁরা প্রয়াগ গেলেন। আমার আরো মুস্কিল হয়েছে এই যে, দুসপ্তাহ হ'ল রাঁধুনী পালিয়েছে, তাই আমি সত্যি নিশ্বাস ফেলবার সময় পাই নি।

ধ্রুব: বেশ হয়েছে। আজে বাজে লোককে খাতির করলে এম্‌নি সাজাই হয়। যাহোক শুনুন, কাজের কথা বলি: মা ডেকেছেন আজ ভজন হবে সন্ধ্যায়। প্রহ্লাদদা গাইবেন বাবার পরে। মা বললেন বাবার সঙ্গে গানে আপনাকে দোয়ার দিতে হবে। আর রাতে আপনি আর সুরেশদা আমাদের মন্দিরে প্রসাদ পেয়ে আসবেন।

বন্দনা: এ তো সুখবর। আমার ফের আজ রাঁধতে মন চাইছিল না। আরো এই জন্যে যে আজ গুরুপূর্ণিমা।

ধ্রুব: আপনি কী বলছেন বন্দনাদি? আমি না এলে আজ রাতেও যেতেন না—রান্নাবাড়া নিয়েই থাকতেন?

বন্দনা: না না, যেতাম বৈ কি—তবে একটু দেরি হ'ত ওকে খাইয়ে দাইয়ে যেতাম নটা নাগাদ।

ধ্রুব: মানে যখন গান প্রায় শেষ! মা বোধ হয় আন্দাজ করেছিলেন আপনার দুর্মতি তাই, আমাকে বললেন আপনাকে পাকড়ে আনতে। চলুন এক্ষণি।

বন্দনা (একটু ভেবে): কিন্তু উনি যে এখন ঘুমুচ্ছেন ক্লান্ত হয়ে।

ধ্রুব: একটা চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি আমি—শোফার আমাদের পৌঁছুয়েই সুরেশদাকে দেবে তাঁর ঘুম ভাঙলে। মা বলেছেন, তার উপর আপনিও নেই দেখে তিনিও সুড়-সুড় ক'রে আসবেন, ভাববেন না। কান টানলে মাথা আসে দিদি।

বন্দনা (হেসে): তুই যা ফাজিল হয়েছিস ধ্রুব! মুখ আর কিছু বাধে না! আমি তোর দিদি না?

ধ্রুব: কিন্তু সুরেশদা তো আর আমার দাদা নন? আর স্ত্রীর ভাইয়ের যে সাতখুন মাপ কে না জানে?

বন্দনা: তাহলে তুই এগিয়ে শোফারকে ডাক—মোটর বার করতে। আমি ততক্ষণে তৈরি হ'য়ে নিই।

কুড়ি

বন্দনার মোটরে ওরা তিনজন ফিরতেই গুরুমার সঙ্গে ধ্রুবের দেখা। তিনি গালে হাত দিয়ে বললেন:

"এত দেরি! তুই কী ছেলে রে! আর আধঘণ্টার মধ্যেই সভা বসবে যে। দেখ না চেয়ে—কত অতিথি ইতিমধ্যেই গুঁতোগুঁতি করছে।"

শামিয়ানার নিচে বহুলোক। ধ্রুব তাকিয়ে অম্লান-বদনে বলে: "ওতো মঞ্চের নিচে—ওখানে তো গুঁতোগুতি একটু হবেই। মঞ্চে আমি শতরঞ্চ বিছিয়ে সব ঠিক করে রেখেছি—তোমাদের গিয়ে শুধু বসা বাকি। আশ্রমের আমরা কজন—প্রহ্লাদদা, সাবিত্রীদি, বন্দনাদি। সুরেশদা নয় কিন্তু। শুধু যারা গাইবে বা দোয়ার দেবে তারাই বসবে মঞ্চে। কেবল ঐ যা:। মৃদঙ্গী? তাকে বলা হয় নি। ছুটে যাই ডেকে আনি। একা আমি আর কত সামলাব বলো তো?"

ওরা সবাই হেসে ওঠে—ধ্রুব "আমি পাচ মিনিটের মধ্যেই আসছি ভেবো না মা" ব'লেই দে দৌড়।

* * *

গুরুমা প্রহ্লাদের জন্যে থার্মস ফ্লাস্কে কফি রাখলেন তার পাশেই।

কীর্তন সুরু হ'ল সন্ধ্যা সাতটায়।

বিষ্ণু ঠাকুর দুঘণ্টা কীর্তন গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিয়ে প্রহ্লাদকে বললেন: "বাবা! এবার তোমার একটি ভজন?"

প্রহ্লাদ (সকুণ্ঠে): আমি তো হিন্দি ভজন ভালো

জানি না গুরুদেব। তাছাড়া ভক্তি যার নেই সে ভজন গাইবে কোন্ মুখে বলুন ?

বিষ্ণু ঠাকুর: বাবা! ভক্তি আসে শুধু ঠাকুরের কৃপায়, আর তাঁর কৃপা কখন কোন্ পথে বেয়ে আসে—কেউ কি আগে থাকতে বলতে পারে? তুমি তো তুকারামের ভক্ত, তাঁর একটি অভঙ্গই গাও না। সেও তো ভজন।

প্রহ্লাদ (সাবিত্রীকে): তাহ'লে তুমিও গাও আমার সঙ্গে—তুকারামের ঐ অভঙ্গটি—"সুন্দর তেঁ ধ্যান উভেঁ বিঠেবরী।"

সাবিত্রী: না, এখানে মারাঠী অভঙ্গ কেউ বুঝবে না। তার চেয়ে তুমি একটি বাংলা বাউল গাও না কেন—"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে?"

ধ্রুব (সোৎসাহে): ওটা আপনারা জানেন, প্রহ্লাদদা? গান গান গান! আমিও দোয়ার দেব।

সাবিত্রী: তুমি জানো সুর?

ধ্রুব: জানি না? বাঃ! বাবার সঙ্গে কতবার দোয়ার দিয়েছি। তবে বাবা গাইতে গাইতে চোখের জল ফেলেন—আমি সেইটির দোয়ার কিছুতেই দিতে পারি না।

বিষ্ণু ঠাকুর: তুই থামবি, না গান থামিয়ে দেব? (প্রহ্লাদকে) ধরো। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে—গানটি আমার কী যে ভালো লাগে কী বলব?

ধ্রুব: কিন্তু বাবা, এমন দেশ কি সত্যিই আছে যেখানে নেই কো মৃত্যু নেই কো জরা—শুধু বাতাস গীতি গন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে—একটানা ধ'রে চলেছে? অসম্ভব!

প্রহ্লাদ: কবি এ-রাজ্যের কল্পনা করেছেন স্বপ্নে, এ-জগতের মিথ্যা কুৎসিত মলিনতার খানিকটা ক্ষতিপূরণ পাই ব'লে।

বিষ্ণু ঠাকুর (হেসে): না বাবা! এমন জগৎ সত্যিই আছে। নানা গন্ধর্বলোক ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক—আর এসব রাজ্য শুধু যে সত্যিই আছে তাই নয়—সে-রাজ্যে যোগী-ঋষিদের নিত্য যাওয়া আসা আছে? কবিরা কল্পনায় সে-রাজ্যের আনন্দের কতটুকুই বা দেখেছেন বলো? যা হোক এ-আলোচনা পরে হবে—এখন গানের পালা।

প্রহ্লাদ ধরল:

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে: আয় চ'লে আয়
ওরে আয় চ'লে আয় আমার পাশে।
বলে: আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা?
হেথা, নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা,
হেথা, বাতাস গীতিগন্ধভরা
চির স্নিগ্ধ মধুমাসে।
হেথা, চিরশ্যামল বসুন্ধরা চিরজ্যোৎস্না
নীলাকাশে॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে?
ভূতের ব্যাগার খেটে মরিস মিছে?
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে,
পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চলে
আয় আমার পাশে॥
কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ?
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ!
ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে আমারে ভালোবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে
আছিস পরবাসে?

গাইতে গাইতে প্রহ্লাদের কেমন আবেশ এসে যায়। দেখে—সামনে উদার নীল সমুদ্র, অদূরে দিগন্তের কাছে একটি মূর্তি, মূর্তিটি আবছা আলোয় গড়া, কেবল তার হাতে বাঁশিটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শুধু দেখাই নয়—শোনে বাঁশির মৃদুল সুর ঐ গানেরি সঙ্গতে—নূপুরের তানে তানে।

গানের শেষে বিষ্ণু ঠাকুর প্রহ্লাদের মাথায় হাত রেখে জলভরা চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন: তবে যে বললে ভক্তি নেই তোমার?"

প্রহ্লাদ (প্রণাম ক'রে): শুধু আপনার কৃপায়। নৈলে কি এমন দর্শন হ'ত?

ধ্রুব (উৎসুক কণ্ঠে): কী দর্শন প্রহ্লাদদা? বলুন—লক্ষ্মীটি!

বিষ্ণু ঠাকুর: দর্শনের বাড়া রে—শ্রবণ। ও শুনেছে

আর এ কেমন আনন্দ শুনবে! এর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে শান্তি আর অভয়। একটা উপমা মনে আসছে। তুফানে নোঙরহারা ভাঙাহাল, ছেঁড়াপাল নৌকা হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় বন্দরে পৌঁছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঝড় থেমে যায়, মেঘ কেটে যায়, আর তীরে দেখা যায় শ্রীক্ষেত্রে বসেছে সবাই সার সার জগন্নাথের প্রসাদ পেতে—না ভাই সত্যি এ একটুও বাড়িয়ে বলছি না, সত্যিই আমাদের আনন্দের সঙ্গে এমনিতর শ্রীক্ষেত্রের প্রসাদধন্য তীর্থযাত্রীর হঠাৎ-জেগে-ওঠা আনন্দের উপমা দেওয়া চলে। গুরুদেব কালই গাইছিলেন যদুনাথ দাসের একটি বিখ্যাত কীর্তন—আমরা দিলাম দোয়ার :

কি বা সে রসের অঙ্গ সুধা ঢল ঢল!
চূড়ার উপরে চাঁদ করে ঝলমল!
চাঁদের গাছে চাঁদের পাতা, তাহে চাঁদের ফুল!
কালাচাঁদে আলো কৈল কালিন্দীর কূল!

দিদি, তুমি বলেছিলে একদিন যে, গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেবে ভেবেই এত যত্ন ক'রে গত তিনবৎসর বাংলা শিখেছিলে। সাবিত্রীর সঙ্গে রোজ বাংলাতেই কথা কইতে গুরুদেবের মাতৃভাষা শিখে গুরুসঙ্গ গুরুপরিচয় বেশি ক'রে পেতে—বলেছিলে তুমি। সে সময়ে আমি তোমাকে ভাবতাম উচ্ছ্বাসী—কেন না গুরুদেবের গুণগান শুনে ও জীবনী পড়েই তুমি তাঁর দিকে এতটা ঝুঁকলে কী করে—ভাবতে আমার সত্যিই অবাক লাগত। কিন্তু আজ গুরুদেবের গান ও কথা শুনে বুঝেছি যে তাঁকে চিনবার জন্যে বাংলার মতন চমৎকার ভাষার তো কথাই নেই টিম্বকটুর কাফ্রী ভাষা শেখাও সার্থক। এবার উচ্ছ্বাসে আমিও তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। কী বলো দিদি?

কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়। বাঙালী জাতের মধ্যে একটি আশ্চর্য বিশেষত্ব আছে—তোমার চোখে পড়েছে কি না জানি না। মানে আমি বলতে চাইছি : বাঙালী সাধকেরা ইষ্টকে শুধু রসো বৈসঃ বা রসানাং রসতমঃ ব'লেই ক্ষান্ত হন না—নিজের নিজের জীবনেও বিশেষ ক'রে চান ইষ্টের রসস্বরূপটিকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করতে। তাই বুঝি বাংলাপদাবলীর রসবৈচিত্র্য এমন বিপুলকায় হয়ে উঠেছে—প্রেমে, পূর্বরাগে, বিরহে মিলনে হাসিতে অশ্রুতে! কৃষ্ণ ঠাকুরকে বাঙালী শুধু অপরূপ মানুষ উপাধি দিয়েই তৃপ্ত হয় নি, তাঁর উপর সাধ মিটিয়ে চাপিয়েছে যত রকম রং ঢং চাল চলন মানুষ তার হাবভাব চিন্তায় রপ্ত করেছে। তাই তো তাঁকে নিয়ে ভক্ত ভক্তিমতীরা শুধু ঠাট্টা তামাসা করেই ক্ষান্ত হন না—যা মুখে আসে বলতেও ভয় পাননা একটুও। গুরুদেব সেদিন গাইছিলেন—চণ্ডীদাসের একটি গান—মানিনী রাধা কৃষ্ণকে সাভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলছেন :

কালিয়া! কুটিল স্বভাব তোমার কপট পীরিতি যত!
ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে অবলা ভুলালে কত!
পীরীতি করিলে কেন দগধিলে বিরহবেদনা দিয়ে?
কালিয়া! কঠিন দয়ালেশহীন তোর নিদারুণ হিয়ে!

ঠাকুরের এত দুর্নাম রটিয়েও কিন্তু শ্রীমতীর আশ মিটল না, বললেন কৃষ্ণকে তুড়ে : 'তা গোয়ালার ছেলে আর কত হবে!' আর কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ সে-কটুক্তিকে করলেন শিরোধার্য—

রসিকের রীতি সহজ সরল রাখাল কী তার জানে?
চণ্ডীদাস কহে : রাধার গঞ্জনা কানু সুধাসম মানে!

আমাদের না না অভঙ্গেও মান অভিমান আছে। কিন্তু কৃষ্ণকে কপট খল লম্পট এসব উপাধি দিয়ে পদে পদে প্রেমকে মানবিক স্তরে নামিয়ে এনেও তাঁর দেবত্ব বজায় রাখার অসাধ্য সাধন—এ কেবল বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব। এ-সম্পর্কে গুরুদেব বললেন সেদিন একটি কী যে চমৎকার কথা :

"বৈষ্ণব লীলাবাদের একটি গূঢ় বাণী এই যে ভগবানকে যদি প্রাণ ঢেলে ভালোবাসো মানুষ মনে ক'রে—তাহলে সে-মানবিক প্রেমও তিনি গ্রহণ করেন প্রথমে মানুষের গ্রহণছন্দেই, কিন্তু তার পরেই তাঁর দিব্য পরশে সে প্রেমকে তুলে নেন দেবত্বের পর্যায়ে। অর্থাৎ প্রতি আবেগ উচ্ছ্বাস মান অভিমানই কৃষ্ণার্পিত হলে তার মানবিকতা ভগবতী রসধারায় নির্মল হ'য়ে সার্থক হয়ে উঠবেই উঠবে। কটু-কথা, মুখভার গঞ্জনা সবই তিনি বরণ করেন যদি তাঁকে একবার ভালোবাসা যায়—কারণ তিনি যে জানেন তাঁর পরশমণির ছোঁয়ায় সব সোনা হয়ে যাবেই যাবে। এ কথার কথা নয়। ভাগবতে অর্জুন কৃষ্ণের দেহরক্ষার পরে বলছেন :

হৃদয়ে জাগে কত মঞ্জু পরিহাস, স্নেহের সম্ভাষ—

'পার্থ প্রিয়!

হে অর্জুন, সখা পাণ্ডুনন্দন'—ঝরায়ে প্রতি ডাকে
কত অমিয় !
আমার ছিল সাথী শয়নে আলাপনে ভ্রমণে সম্ভোগে
সাঁঝবিহানে !
স্ফুটিত সে কী হাসি বলিলে—কেমন যে মিথ্যাবাদী
তুমি বিশ্ব জানে !
জনক তনয়ের স্খলন যথা সয়—সখার ত্রুটি সখা সয় হাসিয়া,
তেমনি সে-মহান্ লক্ষ অপরাধ সহিত হীন মোরে
ভালোবাসিয়া।

গুরুদেব এ-সম্পর্কে আরো যে কত সুন্দর সুন্দর কথা বললেন সেদিন—সাবিত্রী কিছু লিখে রেখেছে তার ডায়ারিতে ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখাবে, বলল।

যাই হোক আমি এ-সূত্রে বলতে চাইছি একটি কথা: যে বাঙালী আপ্তবাক্যের এই ভরসায় কান দিয়েছে যে ভক্তেরা যখন ভগবানকে সত্যি ভালোবাসে তখন ভগবান্ তাদের সঙ্গে শুধু যে মানুষের মতনই ব্যবহার করেন তাই নয়—তাদের লক্ষ উপদ্রবও গায়ে মাখেন না—তাদের মানসিক পূজাভঙ্গিতে মানবিক ভঙ্গিতেই সাড়া দেন। গুরুদেব বলছিলেন তিনি সাধনায় এক সময়ে অকূল পাথারে হঠাৎ যেন কূল পেয়ে গিয়েছিলেন গীতার একটি শ্লোকের অনুধ্যান করতে করতে:

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।"

অর্থাৎ যে-ভক্ত তাঁকে যেভাবেই ডাকুক না কেন, সত্যি ভালোবেসে ডাকলে ভক্তের ভাবনার রঙে রাঙিয়ে উঠেই তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর—প্রতি ভাবের ভাবুক যে-ভাবেই তাঁর শরণারতি করে সেই ভাবেই তাঁর শরণাগতি পাবে—একথা তিনি আমাদের হৃদয়ের তার বাজিয়ে গেয়ে ওঠেন ব'লেই এ-সব ভাবে সাধনায় আমরা সিদ্ধি লাভ করি।

কিন্তু গুরুদেবের এই ধরণের নানা কথা ও দীপ্ত **বাক্তিরূপ** মুগ্ধকর হ'লেও আমার সবচেয়ে ভালো লাগে **তাঁর** হাসি আর গান। তিনি যখন হাসেন তখন সত্যি মনে হয় দিদি, যেন বিশ্ব হেসে উঠল। আর তিনি যখন তন্ময় হ'য়ে আঁখরের পর আঁখর রচনা ক'রে গেয়ে চলেন তখন গায়ে আমার কাঁটা দেয়। আঁখরের এ-পদ্ধতি একেবারে বাঙালীর নিজস্ব। অর্থাৎ বাংলা ভক্তিসঙ্গীতে কীর্তনী প্রতিপদে শুধু গায়ক নয়—গীতিকারও বটে। কালই কী সুন্দর যে একটি আঁখর দিলেন—বৌ টুকে নিয়েছে তার খাতায়। বললেন গুরুদেব: বাঁশি কেমন? না, যার আয় আয় ডাক শুনে—

"শাখা সব অচল ছিল সচল হ'ল বাঁশির মূর্ছনায় !
যমুনা সচল ছিল অচল হ'ল গভীর বন্দনায় !"

এমনি অফুরন্ত আঁখর জোগায় তাঁর মুখে মুখে ! আমরা দেই সুরের তান, তিনি কাটেন উপমার ফুলঝুরি—নিত্য নব আঁখরের দেয়ালিতে। সত্যি দিদি, আমার সময়ে সময়ে যেন বিশ্বাস হয় না যে এ-রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির জগতে এমন অনাবিল আনন্দের মেলা ঝিকমিক ঝিকমিক ক'রে উঠতে পারে দুটি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে !

কিন্তু উচ্ছ্বাস রেখে একটু খবর দিই—আরো তুমি জানতে চেয়েছ ব'লে। তাই অবহিত হও এখন। কারণ আমি খুঁটিয়েই লিখব—বিশেষ ক'রে আমাদের দীক্ষার কথা।

গুরুদেব আমাদের একঘরেই থাকতে দিয়েছেন। বললেন প্রথম দিনেই একটি কথা খুব জোর দিয়েই: যে, তিনি রিক্ত সন্ন্যাসীও নন, পরিব্রাজক অবধূতও নন—তিনি বৈষ্ণব এবং মনেপ্রাণে গৃহী প্লাস যোগী প্লাস লীলাবাদী প্লাস গুরুবাদী। যথার্থ সন্ন্যাসীকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করেন, ভাগবতের পরম বাণী মেনে যে এ-বিশ্ব বিশ্বরাজের চরণবেদী—একথা মনে রেখে মাথা নুয়ে "জগৎ-প্রণাম"-এর নামই হ'ল লীলাবাদীর প্রণাম। তাই এ জগতে সাধু সন্ন্যাসী, অবধূত, দণ্ডী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী, ভিক্ষু সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতে হবে। আরো: "হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ"—মহতের অপমান করলে তার সব শুভ কাজই পণ্ড হয়। এইজন্যেই মহাভারতে এক মুনি আর এক মুনিকে বলেছিলেন: "অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপ প্রমোচনী।" কিন্তু এ ভনিতার পরেই গুরুদেব পাঠ দিলেন ফের স্বধর্মের ! বললেন: সবাইকে শ্রদ্ধা করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেক সাধককেই চিনে নিতে হবে তার স্বধর্ম এবং কায়মনোবাক্যে হ'তে হবে স্বধর্মপরায়ণ, মনে রাখতে হবে গীতার মহাবাণী: "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।"

আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম: "কার কী স্বধর্ম জানবার উপায় কি?" তাতে তিনি বললেন: "নানা উপায় আছে, তবে শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল সদ্‌গুরুর নির্দেশ মেনে চলা, আর সদ্‌গুরু বলব তাঁকেই যাঁর নেত্রে ঠাকুর জ্ঞানাঞ্জন পরিয়ে দিয়েছেন ব'লেই সে-অঞ্জনলব্ধ দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেয়েছেন—দীক্ষার্থীর স্বধর্ম কী।" গুরুবাদ সম্বন্ধে আরো কত চমৎকার চমৎকার কথাই যে গুরুদেব বললেন, তার কিছু কিছু আমিও ডায়ারিতে লিখে রেখেছি, ফিরে তোমাকে দেখাব। এখন আমাদের দীক্ষার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

গুরুদেব বললেন: "আমি যে-মহাপুরুষকে গুরুবরণ করেছিলাম তিনি গৃহী হ'লেও ছিলেন মনেপ্রাণে লীলাবাদী বৈষ্ণব। তাই তিনি আদৌ কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না, যদিও বলতেন কারুর কারুর পক্ষে আবার কৃচ্ছ্র-সাধনই বিধি—যেমন অতিভোজন ক'রে যে অসুস্থ হয়েছে তাকে উপবাসের মধ্যে দিয়েই নীরোগ হ'তে হয়। "কিন্তু" গুরুদেব বললেন—"কৃচ্ছ্রসাধন আর তপস্যা সমার্থক নয়। তপস্যা সবাইকেই করতে হবে—তপস্যা বিনা কোনো কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে না। লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে অকারণ বলেন নি: 'তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ'—তপস্যার চেয়ে বড় কিছু নেই, মহৎলাভের আর কোনো পন্থাও নেই। কিন্তু যে-তপস্যার ভর মূলতঃ কৃচ্ছ্রের 'পরেই—অর্থাৎ যে-তপস্যা সব আগে চায় দেহকে দুঃখ দিতে—সে-তপস্যা কারুর কারুর জীবনে ফলপ্রসূ হ'লেও সকলের জন্যে নয়-লীলাবাদীদের জন্যে তো নয়ই।" গুরুদেব আরো বললেন: "বৈরাগ্য শব্দটিকে অনেকেই কৃচ্ছ্রের সঙ্গে সমার্থক মনে ক'রে ভুল করেন ব'লেই আমি গীতার অনাসক্তি শব্দটিই ব্যবহার করার পক্ষপাতী। অর্থাৎ ধরণীবিরাগ চাই না, চাই—সব আসক্তি থেকে মুক্ত ক'রে মনপ্রাণকে স্ববশে আনতে। ভোগের জন্যেই এ-বিশ্ব সৃষ্টি—একশোবার, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অসংযমে ভোগ তৃপ্তি আনে না, আনে দুর্ভোগ, যেমন অতিভোজনে পরিণাম তৃপ্তি বা পুষ্টি নয়—স্বাস্থ্যহানি। কাজেই ঘুরে ফিরে আসতে হয় ঐ লীলাবাদেই। অর্থাৎ এ বিশ্ব ভোগের জন্যেই সৃষ্ট—মানার সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে হবে ভোগের চাবিটি—যার নাম সংযম, কেন না যোগের পথেই কেবল মিলতে পারে যথার্থ ভোগের দিশা। ঈশোপনিষদে এই কথাটিকেই বলা হয়েছে একটু ঘুরিয়ে: যে, ত্যাগের মধ্যেই যথার্থ ভোগের দেখা মেলে—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। তাই প্রথম চাই—সংযমের মধ্যে দিয়ে ভোগ, তারপর প্রতি ভোগের মধ্যে ভগবানকে ডাক দিয়ে সে-ভোগ তাঁকে নিবেদন ক'রে তাকে প্রসাদে রূপান্তরিত ক'রে গ্রহণ করো। এরই নাম লীলাবাদ ওরফে সর্বাস্তিবাদ—যাকে বলা যেতে পারে আর্য হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি, শ্রেষ্ঠ বাণী—খানিকটা রাগালাপে বাদী স্বরের মতন। অর্থাৎ প্রতি রাগ নানা স্বরের আরোহণ অবরোহণে ফুটে উঠলেও প্রতি রাগের বাদী স্বরে বার বার ফিরে না এলে যেমন সে-রাগটি পূর্ণ রূপ ধরতে পারে না, ঠিক তেম্‌নি লীলাবাদকে হিন্দুধর্মের মূল বাণী ব'লে বরণ না করলে হিন্দুধর্মের পূর্ণ মহিমার অনুরণন কখনোই হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজে উঠতে পারে না। এই জন্যেই আমি বেশির ভাগ দীক্ষার্থীকেই বৈরাগ্যের ও কৃচ্ছ্র-সাধনের দীক্ষা দিতে চাই না, গৃহী হ'য়ে লীলাবাদী যোগেরি দীক্ষা দিয়ে থাকি।"

আর কী আশ্চর্য—ঠিক একথা বলার পরদিনই এক বিরক্ত অবধূতের সঙ্গে তাঁর কুলীন বিতণ্ডা হয়—ঠিক আমাদের দীক্ষার আগের দিনেই! সে এক কাণ্ড। শোনোই না। এ-বাগ্‌বিতণ্ডা পণ্ডিতী হ'লেও নীরস হবে না—যেহেতু এর মধ্যে নাটকীয় উদ্বেগ তথা সংঘর্ষ— suspense ও conflict—পুরোমাত্রায়ই আছে।

সাবিত্রীকে গুরুমা বলেছিলেন প্রথমদিনেই যে, কাশীতে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাগ্বিতণ্ডার চল আছে। নানা দেশ থেকে শাস্ত্রী যোগী পণ্ডিত প্রবরেরা কাশীতে আসে বাগ্‌যুদ্ধের দ্বৈরথে জয়লাভ ক'রে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে।

সত্যিই দ্বৈরথ—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে, যাকে বলে fight to death; দুরন্ত পণ্ডিতের ত্বর সয় না, নস্য নিতে না নিতে প্রতিপক্ষের মতবাদকে নস্যাৎ ক'রে দিতে মুখিয়ে ওঠেন। আগে তর্কযুদ্ধে পণ ছিল—যে হারবে তাকে বিজেতার শিষ্য হ'তে হবে। আজকাল তা হয় না, তবে যুক্তি প্রতিযুক্তি শাস্ত্রের হুঙ্কার তথা টীকার টঙ্কার সবই ধ্বনিত হয় চিরাচরিত প্রথায়।

তোমার কাছে তো অজানা নেই দিদি, যে, গুরুদেব নিজেকে গৃহী যোগী বলেন ব'লে অনেক সন্ন্যাসীই তাঁর প্রতি বিরূপ। তুমি নিশ্চয়ই জানো কাশীর নানা পণ্ডিত তিনি যা বলেন তার কদর্থ ক'রে তাঁর দুর্নাম রটান। দীক্ষার আগের দিন এম্‌নি এক দুর্ধর্ষ বৈদান্তিক অভ্যুদিত হলেন একমাথা চুল ও একমুখ দাড়ি নিয়ে। না, চুল না ব'লে তাকে জটার জঙ্গল বলাই ভালো। মুখচন্দ্র জটাজলদ-জালে অদৃশ্যপ্রায়—দেখা যায় শুধু দুটি তীক্ষ্ণ চোখ ও একটি ছাইমাথা নাকের ডগা—ব্যস্।

ব'লে রাখি এ-বিবৃতি আমি টুকে রেখে পরে গুছিয়ে লিখে গুরুদেবকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলাম। সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলি তিনি প্রায় সবই লিখে দিয়েছিলেন—এখানে ওখানে কিছু কিছু জুড়েও দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যকে ফলিয়ে তুলতে। এবার শোনো এর নাম হোক তর্কতাণ্ডবনাটিকা—একাঙ্কিকা।

[ক্রমশঃ

হারিয়ে যাওয়া সেই কল্‌কাতা

সুধীর ব্রহ্ম

কলকাতার প্রাচীন তথ্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কলকাতা নামের উৎপত্তি নিয়েও আবার বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। ইংরাজ আগমনের বহুপূর্ব্বে জনৈক পরিব্রাজক কলকাতাকে 'গলগাথা অর্থাৎ মাথার খুলি বা নরককুণ্ডের স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের মতে কবিরামের গ্রন্থে লিখিত 'কিলকিলা' থেকে কলকাতা কথাটি এসেছে। আকবরের প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজল কর্ত্তৃক ১৫৯৬ খৃঃ রচিত আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কলকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 'পদ্মনাভ ঘোষাল' বলেন ঃ—

"Calcutta is a place known from remote antiquity. The ancient Hindus called it by the name of Kalikshetra. It extended from Bahula to Dakhineshar. Bahula is modern Behala and the site of Dakhineshar still exists. According to Purans a portion of the mangled corpse of Sati or Kali fell somewhere within that boundary; whence the place was called, Kalikshetra. Calcutta is a Corruption of Kalikshetra. In the time of Balal Sen it was assigned to the descendants of Sena" (Indian Antiquary—July 1873)

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে দক্ষিণে বেহালা পর্যন্ত প্রাচীন "কালীক্ষেত্র" হ'তে কলকাতা নামটি এসেছে। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বহু পুস্তকে কালীক্ষেত্রের নাম পাওয়া যায়। তখনকার গঙ্গার পূর্বতীরে প্রধান বাঁকে ছিল এক ত্রিভুজাকৃতি দ্বীপ। তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (গোবিন্দ) ও মহেশ্বরের মন্দির। ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন কালী-মন্দিরের সেই বিগ্রহ এখন নাকি কালীঘাটে স্থানান্তরিত। সেই সময়ে গঙ্গাতীরে চিত্রপুর (বর্ত্তমান চিৎপুর) ছত্রলুট বা ছাতানুট (পরবর্ত্তী কালের সুতানটী) কলিকাতা

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার একটি রাস্তা

গোবিন্দপুর এবং দক্ষিণে আর দুটি গ্রাম—ভবানীপুর ও কালিঘাট গড়ে ওঠে। কয়েকটি খাল গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত থাকায় 'খালকাট' থেকে 'কালকাটা' নামটি আসারও এক প্রবাদ আছে। উত্তরস্থ (বর্ত্তমান চিৎপুরের খাল) ও মধ্যস্থ (বর্ত্তমান ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উত্তরে) খাল প্রধান ছিল—এখন যেখানে সার হরিরাম গোয়েঙ্কা ষ্ট্রীট। প্রথম

ও দ্বিতীয় খালের মধ্যে ছাতানুট ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খালের মধ্যে তখনকার কলকাতা ; তৃতীয় খালটির দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রাম ; আরও দক্ষিণে ভবানীপুর ও কালীঘাট অবস্থিত ছিল।

সুতানুট, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের সমষ্টিকে কলিকাতা বলা হয়। গোবিন্দ দত্ত নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কালীঘাটের সন্নিকটস্থ ভূমি খনন করে বহু অর্থ পান। তিনি কালীমাতার পূজা করে এক মহাগ্রাম স্থাপন করেন। জনশ্রুতি এই যে তাঁর নাম থেকে বা প্রাচীন অধিবাসী শেঠদের প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম থেকে 'গোবিন্দপুর' নামটি এসেছে। ইংরেজ আগমনের বহুপূর্বে দেশীয় ব্যবসায়ীগণ যে স্থানে সূতা ও নটীর কাজ করত সেইস্থানের নাম হয়েছিল সুতানটী। প্রচলিত আর এক কিংবদন্তী যে বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামরায় ঠাকুরের প্রসাদ এক ছত্রতলে বিতরণ করা হত ; সেই থেকে ছত্রলুট নামটি এসেছে। ছত্রলুট এর অপভ্রংশ সুতালুটী বা সুতনুটী হতে পারে। বর্ত্তমানের চিৎপুর ও হাটখোলা স্থানটি সুতানুটি নামে খ্যাত। সুতানুটীর আর্ম্মানী বণিকগণ তাদের মাল-পত্র কালিকটে পাঠাত এবং ইংরেজ এই কলিকট থেকে কলকাতা নামের পত্তন করেন।

সেই ১৬২০ খৃ বৃটিশ বণিক সুরাট থেকে আগ্রা হয়ে পাটনায় এল বাণিজ্য করতে। মোগল সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা তখন বাঙ্গলার সুবাদার হয়ে 'রাজমহলে' অধিষ্ঠিত। মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বৃটিশ বণিক বাঙ্গলাদেশে বাণিজ্য অধিকার লাভ করল ১৬৫১ খৃঃ। হুগলী নদীর তীরে তখন বসল কারখানা। ১৬৪৬ খৃঃ এ জব চারণক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর নির্দ্দেশানুযায়ী বিলাত থেকে হুগলীতে এলেন। ১৬৯৮ খৃঃ তিনি সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের মালিকানা সত্ব মাত্র ১,৩০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করে নিলেন। তখনকার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর প্রজারা ছিল অধিকাংশ জেলে ও কাঠুরে ; কয়েক ঘর পূজারী ব্রাহ্মণও তাঁর প্রজা ছিল।

"The deed of purchase from the Mazumdars Dt Nov. 9 1698 is preserved at the British Museum (Addlt Mss No 24039) The payment of Rs 1300 to Majumdars was as Dr. C. R. Wilson has put it for the sake of peace and quiet and has quoted that Zamindars were the family of "Savana Mujumdars" (Fifth report from the Select Committee of House of Commons, 1812)

ভাগীরথী তীরে তখন সমতল ধান্যক্ষেত্র আর জলাভূমি এবং স্থানে স্থানে বন-জঙ্গল পরিবেষ্টিত ভূমির উপর ছিল তৃণ-পত্রাচ্ছাদিত কয়েকটি মৃন্ময় গৃহ মাত্র। গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজনে এই স্যাঁতসেঁতে জলাভূমিতে ধীরে ধীরে পড়তে লাগল কোটি কোটি টন মাটি। বর্ত্তমান কলকাতার আদি-ভূমি গোবিন্দপুর ও তখনকার চৌরঙ্গীর জঙ্গল কেটে গড়ের মাঠের পত্তন হল। ইউরোপীয়রা ঐ অঞ্চলে ও ভারতীয়রা বড়বাজার বা গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করতে লাগল। ১৬৯০ খৃঃ জব চার্ণক ঘোষণা করলেন—ইংরাজ টাউনের বাইরে যার যেখানে খুশী জমি নিয়ে ঘর বাড়ী করতে পারে। চতুর্দ্দিকে গলি খুঁজি ও এলোমেলো ভাবে ঘর বাড়ী গড়ে উঠতে থাকল। জমির কোন অভাব না থাকায় প্রত্যেকেই নিজ বাড়ীর চারপাশে বাগান করার সুযোগ পেল।

এখনকার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। 'বৈঠকখানা' নামটি কলকাতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, কারণ এই বৈঠকখানা অর্থাৎ প্রাচীনকালের ব্যবসায়ীদের প্রিয় বটবৃক্ষ-তলে বসে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক কলকাতাকে গড়ে তুলতে সঙ্কল্প করেছিলেন। বৈঠকখানা ষ্ট্রীট (বর্ত্তমান বৌবাজার) আজ আমাদের ইতিহাসের কয়েক পাতা স্মরণ করায়। ঐতিহাসিক স্টুয়ারটের মতে ঃ—

"Success produced new adventures and besides a number of English private merchants licensed by the Co. Calcutta was in a short time, peopled by Portuguese, Armenian, Mogul and Hindoo merchants who carried on their commerce under the protection of the British flag : thus the shipping belonging to the port in the Course of ten years after the Embassy (that is the Embassy of 1717) amounted to ten thousand tons, and many individuals amassed fortunes without injury

to the Co,'s trade or incurring the displeasure of the Mogul Govt."

এখন যেখানে শিয়ালদহ ষ্টেশন, পূর্ব্বে সেখানে একটি ছোট দ্বীপ চারদিকে জলার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ষ্টেশনের কাছে একটি বেঞ্চও আছে; গায়ে এখনো দেখা যায়—লেখা রয়েছে "২০ ফুট উচ্চতা"। মনে হয় এই লেখা সেদিনের সুগভীর জলাভূমির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে। জলাগুলি সঙ্কুচিত হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে সরে গেছে। কলকাতার বিভিন্ন স্থান খনন করলে চার পাচ ফুট মাটির নীচে মৃত সুন্দরী গাছকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। লোকের বসবাসের জন্য চিৎপুরের খাল ছাড়া অনেক খাল বুজিয়ে তৈরী হল রাস্তা ও বাড়ী। ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল বুজিয়ে বর্ত্তমানের ক্রীক রো—সোজা চলে গেছে মারাঠা খালের অপর দিকে অর্থাৎ মৌলালীর পথে। খৃঃ ১৭৩৭এর প্রবল ঝড়ে কয়েকটি নৌকা ও জাহাজ গঙ্গা থেকে এসে এই 'ডিঙ্গাভাঙ্গা' খালে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই খালটি ধাপা পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। বিদ্যাধরী নদী কলকাতা নগরের ময়লা জল ও বৃষ্টির জল নিঃসরণের কাজ করত। সেই নদী আজ আর অতিরিক্ত জলরাশিকে বহন করতে অপারগ। তাই প্রবল বৃষ্টিপাতে প্রায়ই কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষ করে ঠনঠনে কালীবাড়ী প্রভৃতি জায়গায় জল জমে, ট্রাম চলাচলের বিঘ্ন ঘটায়। বামনঘাটা থেকে কুলটি পর্য্যন্ত একটা খাল অবশ্য বর্ত্তমানের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। বাঙ্গালীদের জীবনযাত্রার পরিচয় পাই ১৭১০ সালে হ্যামিলটন কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত এক উক্তি থেকে :—

Most gentlemen and ladies in Bengal live both splendidly and pleasantly, the forenoons being dedicated to business and after dinner to rest, and in the evening to recreate themselves in chaises or palanhius in the fields, or to gardens, or by water in their bungeroes, which are convenient boats that go swiftly by four oars; and on the river sometimes there is the diversion of fishing or fowling or both; and before night, they make friendly visits to one another, when pride and contention do not spoil society, which too often they do among the ladies, as discord and caution do amongst the men."

ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর ইত্যাদি নানা রোগে যখন অগণিত দেশী ও য়ুরোপীয় কলকাতায় প্রাণ হারাচ্ছিল তখন খালগুলি বোজাবার কাজ সুরু হল। সেই অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ১৭০০ সনে বারশত ইংরাজ অধিবাসীর মধ্যে ৪৬০ জন প্রাণ হারাল অকালে। ফলে প্রবর্ত্তিত হল বিদেশী মতে নানা চিকিৎসা ধারা। সে চিকিৎসাসম্মত উপায়গুলি প্রথমে কলকাতাবাসীরা সংস্কারবশে মেনে নিতে পারে নি। তবুও এই সব-মহামারীর সম্মুখে দেশী ও বিদেশী চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকল। যাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কোন জ্ঞান ছিল না এই ধরণের হাকিম কবিরাজ নানাভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে লাগল।

"The medical gentlemen then made their visits in palanquins and received one gold mohur from each patient for every common attedance; extras were enormus. Medicines were also rated very high—An ounce of Bark Rs 3/- a Blister Rs 2 Lc. As the strength must be supported in dysentery, wine and solid animal food were the most appropriate diet." (On the progress of European medcine in the East—By Dr, Goodeve.)

ইংরেজরা এদেশে এসে শাসনের নামে একদিকে যেমন অত্যাচার করেছে বহু, তেমনি একথাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে তাদের এই নব্য জীবনবোধের কাছে দীক্ষা নিয়েই আমাদের দেশ প্রথম সর্বাত্মক অগ্রগতির পথে পা বাড়াতে শিখেছিল। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই ভারতীয়গণ সেদিন নতুন করে দেশপ্রেমে দীক্ষা নিয়েছিল। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ভারতীয়গণ সেদিন সেই মহামারীর মুখে ভীত সন্ত্রস্ত জনসাধারণকে নানাভাবে সাহায্য করে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা অজ্ঞ পল্লীবাসীদের সহজ স্বাস্থ্যরক্ষার পথগুলি বলে দিয়ে—উপদেশ ও সেবায়—তাদের জীবন দান করে ছিল। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি, পুরাতন ভূমির চিহ্ন পরিবর্ত্তনের স্রোতে আজ অবলুপ্ত হ'তে চলেছে।

প্রাচীন কলকাতার পথঘাটগুলির নামকরণ হয়েছিল বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় বাসিন্দাদের পেশানুযায়ী। চিত্তেশ্বরী দেবীর নামানুযায়ী যেমন 'চিৎপুর' স্থানটি আমাদের কাছে আজও পরিচিত, যেমনি মধ্যকলকাতার অলিগলি, যেমন 'সুরিপাড়া', 'জেলেপাড়া' ইত্যাদি যথাক্রমে সুরাবিক্রেতা, মৎস্যবিক্রেতার নাম থেকে এসেছে। ছুতোররা যেখানে থাকত সে জায়গা আজও ছুতোরপাড়া নামে পরিচিত। কলকাতার আশে পাশে শুধু নয়, কলকাতার কেন্দ্র স্থলেও ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হত। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পেছনে অক্রূর দত্ত লেন থেকে বাঁকারায় ষ্ট্রীট নামে একটি রাস্তা এখনও রয়েছে। এই বাঁকারায় কোন ব্যক্তি বিশেষ নন; তিনি ধর্ম্মঠাকুর; আর বাঁকারায় হচ্ছে ধর্ম্মঠাকুরের খুবই জনপ্রিয় নাম। ধর্ম্মতলা নামটি ধর্ম্মঠাকুরের আঞ্চলিক প্রতিপত্তি ও উৎসব থেকেই হয়েছে। শ্রীবিনয় ঘোষের মতে জেলিয়াপাড়ার প্রাচীন মৎস্য ব্যবসায়ীরা ধর্ম্মতলা অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রচনা করেছে। উৎসবের সে জাঁকজমক উপস্থিত ক্ষীণতর হয়ে এলেও পুরুষানুক্রমিক বাঁকারায়ের পূজা এখন স্থানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৮২১ সালের ক্যালকাটা গেজেট থেকে জানা যায় বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার তখন ধর্ম্মতলা স্কোয়ার নামে পরিচিত ছিল।

ইংরেজরা তাদের কুঠি সুরক্ষিত রাখার জন্য কলকাতায় ১৬৯৬ সালে প্রথম দুর্গ স্থাপন করেছিলেন—বর্ত্তমানে যেখানে জেনারেল পোষ্ট অফিস বা কালেক্টরী অফিস রয়েছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে এই দুর্গ অধিকার করলেন। ১৭৫৭ সালে সুরু হল পলাশী যুদ্ধ। নবাবকে পরাজিত করে লর্ড ক্লাইভ ১৭৭৩ সালে গোবিন্দপুরে নূতন দুর্গ স্থাপন করলেন আর পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হল।

পুরান ফোর্ট উইলিয়াম্-এর অভ্যন্তর

কলিকাতা ছিল একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। আধুনিক কলকাতা সম্বন্ধে হলওয়েল সাহেব লিখেছিলেন:—

"The bounds of Calcutta in 1757 were to the South the Creek which ran from the site of the Bank of Bengal and Chandpal Ghat across Chowringhee Road to the Salt-water Lake; to the East, the Lal Bazar and Chitpore Road; the Bara Bazar to the North and the river to the West; all beyond was called the continent, probably with Creek Row, the river and Maharatta Ditch, Calcutta was formed an island."

Salt অর্থাৎ লবণ হতে মলঙ্গা কথাটি এসেছে। বর্ত্তমানের "হিন্দ্ সিনেমার" সামনে থেকে সেই মলঙ্গা লেনের বিস্তৃতি ছিল উপস্থিত অক্রূর দত্ত লেন পর্য্যন্ত। কোম্পানী আমলে কমিসারিয়েট বিভাগে কাজ করে অক্রুর চন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রচুর ধনবান হয়েছিলেন। বীরভূমের যুদ্ধ ব্যাপারে তিনি ইংরেজ সেনার সঙ্গে ছিলেন। সেই সুবিখ্যাত দত্ত বংশ নানা ক্রিয়াকলাপের জন্য কলকাতার সমাজে বিশেষ পরিচিত। খ্যাতনামা মহিলাকবি গিরীন্দ্র মোহিনী এই দত্ত পরিবারের বধূ ছিলেন। এই বংশেরই ৺যোগেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাসভবনে চলত অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার নানা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আলোচনা; সেই সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনাই প্রকাশিত হত 'Reis Rayyet' পত্রিকাটিতে। শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

ছিলেন সেই কাগজের সম্পাদক। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'সমাচার হিন্দুস্থান' 'মুখার্জি ম্যাগাজিন' প্রভৃতি নানা বাংলা ও ইংরাজী পত্রিকা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছিল। অক্রূর দত্তের আত্মীয় ৺বলরাম ব্রহ্ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর নিকট হতে ২৪শে ডিসেম্বর ১৭৬৭ সনে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে নিজ বাসভবন নির্মাণ করেন। উর্দ্দুতে সহি করা সেই পাট্টা নং ৬৬৪ এখনও ব্রহ্মবংশের উত্তরাধিকারীদের নিকট রয়েছে। অক্রূর দত্ত লেনের প্রাচীন মৎস্য ব্যবসায়ীদের খোলার ঘরগুলি আজও তাদের উত্তরাধিকারীদের অধিকারে। পাশেই রয়েছে পুরাণো দিনের সেই 'জেলে পাড়া'। বলরাম-বাবুর পৌত্র শ্রীবৈদ্যনাথ ব্রহ্ম ১৮৪৭ খৃঃ অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজ থেকে সসম্মানে ডাক্তারী পাশ করেন। বসন্ত রোগ থেকে জনসাধারণ কি ভাবে বাঁচতে পারে সেজন্য তিনি টিকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করলেন। অজ্ঞ পল্লীবাসীদের অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক কুসংস্কার ছিল যে বসন্ত রোগের একমাত্র ঔষধ বাঁকারায় মন্দিরে সিন্দুর নিমজ্জিতা মা শীতলার চরণামৃত। টিকা লওয়াইতে প্ররোচিত করার জন্য তিনি যে পরিশ্রম, কষ্ট, ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, সরকার অবশ্য তার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন 'রায়-বাহাদুর' উপাধি প্রদান করে। কিন্তু তখনকার বাঙ্গালী চরিত্রের এমনই ব্যক্তিত্ব যে ৺বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম সে উপাধি সানন্দে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অক্রূর দত্ত লেনের পুরাণো বাসিন্দাদের মধ্যে শহীদ সন্তোষ মিত্র, উপেন সেন, ভুলু পাল বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম, কালীপ্রসন্ন রায়ের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তাদের বাসভবনগুলি এখনও এই গলিতে অবস্থিত এবং তাঁদের বংশধরগণ—এখনো এখানে বাস করেন। বর্তমান লেখকও উক্ত বৈদ্যনাথ ব্রহ্মেরই বংশধর।

অক্রূর দত্ত লেনের নিকটেই শাঁখারীরা বাস করত।

MEDICAL COLLEGE BENGAL
Instituted
Year of the Christian Era
CORRESPONDING TO THE BENGAL ERA
Buddinath Bromo
MATERIA MEDICA MIDWIFERY BOTANY
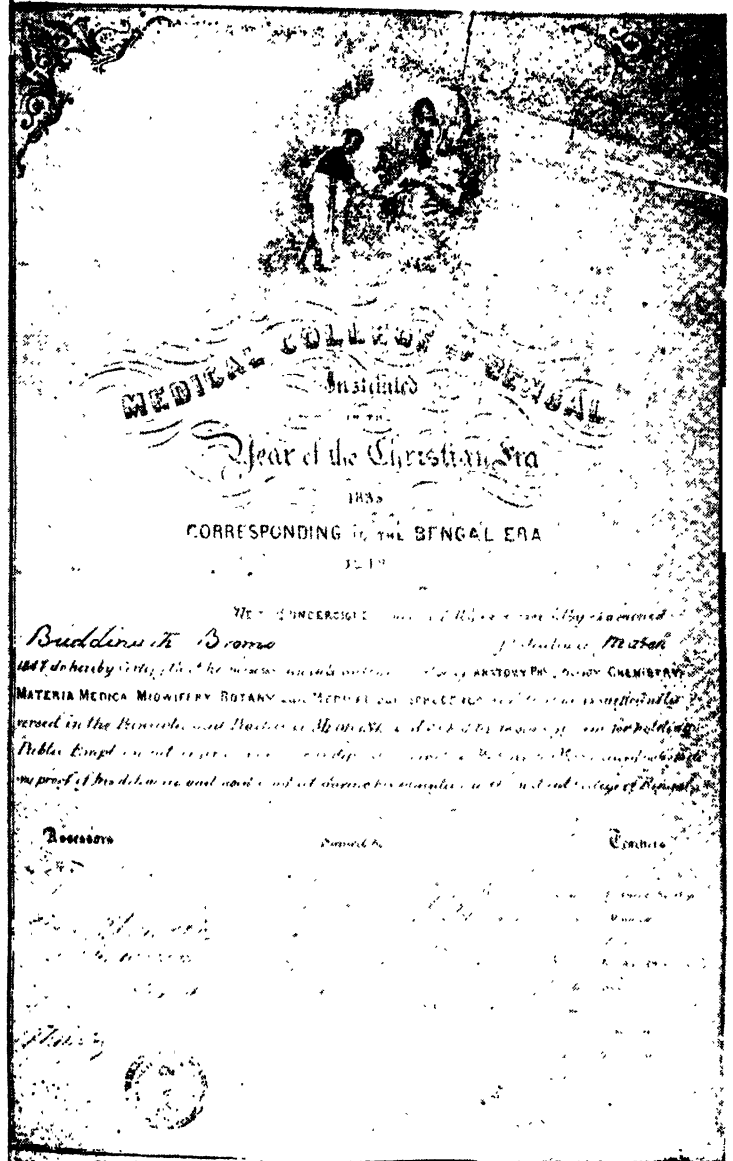
সেই শাঁখারীটোলাতেই ৺বৈদ্যনাথ ব্রহ্মের সমসাময়িক ৺মহেন্দ্রলাল সরকার বাস করতেন। তিনি মেডিকেল কলেজ থেকে M.D. পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। এই সরকার পরিবারের সঙ্গে ব্রহ্ম বংশ ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ

ছিল। কলেরা ও প্লেগ সম্বন্ধে তাঁর লেখা দু'খানি পুস্তক রয়েছে। ১৮৬৮—১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি Calcutta Journal of Medicine নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রধান কীর্ত্তি Indian Association for the Cultivation of Science নামক বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজ থেকে পাঠ শেষ করে তিনি মেডিকেল কলেজের এলো-প্যাথিক শিক্ষা লাভ করলেও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করে তিনি খ্যাতি সম্পন্ন হলেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, যাদুঘরের ট্রাষ্টী ছাড়াও তিনি তৎকালীন নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন মহেন্দ্র সরকার লেন নামে শাঁখারিটোলার একটি গলি তাঁর নাম বহন করে চলেছে।

শাঁখারিটোলা থেকে একটু এগিয়ে গেলেই সুরি লেন। এখানেই স্বনামধন্য দেশগৌরব স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর বাসভবন। কিন্তু তাঁর পিতা সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাস ভবন শ্রীনাথ দাস লেনের বিপরীতদিকে নির্ম্মল চন্দ্র ষ্ট্রীটের উপর। সূর্য্যকুমার ছিলেন এক খ্যাতনামা ডাক্তার। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা জি-এম-বি-সি উপাধি নিয়ে তিনি ব্রহ্ম দেশে যান ও পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সৈনিক বিভাগে চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। সিপাহীবিদ্রোহের সংবাদ তিনি পূর্ব্বাহ্নে ইংরাজদের না জানালে ইংরাজরা ভাবী বিপদ থেকে উদ্ধার পেত না। লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য হ্যাভলকের সৈন্যদলে এবং বিহারে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসাবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। College of Surgeons and Physicians এর সভাপতি ছাড়াও তিনি ফ্যাকালটি অফ মেডিসিন ও মেডিকেল সোসাইটী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্য ছিলেন। সূর্য্যকুমারের বাসভবনের বিপরীত দিকে নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাসভবন।

কলকাতার বিখ্যাত এটর্নী অফিস জি-সি-চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব মালিক গণেশচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন নির্ম্মল চন্দ্রের পিতামহ। নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। বেশী দিনের কথা নয় তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

মধ্যকলিকাতার আয়তন ৮৪০ একর; বৌবাজার থেকে দক্ষিণে পার্ক ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র ষ্ট্রীট ও বৌবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে 'বৌবাজার' নামে এখনও একটি দৈনিক বাজার বসে। কলকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের অন্যতম ৺বিশ্বনাথ মতিলাল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোংর লবণের গোলায় মাসিক ৮৲ বেতনে চাকুরী গ্রহণ করে নিজগুণে পরে দেওয়ান হয়েছিলেন। তার এক পুত্রবধূ বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যুর পর শশুরের সম্পত্তির কিছু অংশ বাজার করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন এবং সেই পুত্রবধূর নামানুসারেই বর্ত্তমান বৌবাজার।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পিতামহ ৺হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে প্রসিদ্ধ সন্দেশবিক্রেতা ভীমনাগের দোকানের বিপরীত দিকে একটি গলি আছে। সেই গলির মধ্যে ৺বিশ্বনাথ মতিলালের বাসগৃহে সাবেকী প্রথামত এখনও দোল দুর্গোৎসব চলে আসছে।

নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ষ্ট্রীটের এক প্রান্ত পড়েছে বৌবাজারের সংযোগস্থলে অপর প্রান্ত ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে। ধর্ম্মতলার মোড়েই বর্ত্তমানের 'রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার'; পূর্ব্বে নাম ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার। এই স্কোয়ারের একদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসগৃহ। অপর দিকে ১২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাস গৃহ। রাজা বাহাদুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাঁরই গৃহে শ্রীঅরবিন্দ বাস করেছিলেন; চলেছিল বিপ্লবীদলের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। পাশেই ছিল ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার কার্য্যালয়টি। বাঙ্গলার রাজ-নৈতিক মুক্তি আন্দোলনের কত অবিস্মরণীয় ঘটনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে এই স্কোয়ারের চতুস্কোণ ভূমিতে। এই তৃণাচ্ছাদিত মুক্তক্ষেত্র বহু বিখ্যাত ভারত-বাসীর পদার্পণে ধন্য হয়েছে। এইখানে বসেছিল বহুবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রকে কংগ্রেসের গদী থেকে অপসারণের জন্য সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা এই অঞ্চলবাসীদের কত বিক্ষুব্ধই না করেছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এই স্কোয়ারেই নানা চক্রান্তের পরে অপমানিত হওয়ার

ভয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন ; মনে পড়ে সেই স্বরাজ-মেলা ও স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত নানা প্রদর্শনীর কথা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের কয়েক পাতা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৮২৫ সালে কলকাতায় প্রথম লটারী খেলা হয়। টিকিট বিক্রয় লব্ধ টাকা থেকে নগরের শোভা বৃদ্ধি ও ড্রেন, জলসরবরাহ প্রভৃতি নানা জনহিতকর কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। স্কোয়ারের ভূমিতে ৮০ লক্ষ গ্যালন জলধারণ উপযোগী এক ট্যাঙ্ক বসল। পরিশ্রুত জলসরবরাহ করতে পথের ধারে ৪৭০টি লোহার সিংহের মুখমার্কা দাঁড়ানো পাইপ বসান হল। ১০ লক্ষ গ্যালন জল ধারণের উপযোগী টালার ট্যাঙ্কের সঙ্গে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্কের তুলনা করলে প্রমাণিত হয় যে কেবলমাত্র ইংরাজ-অধ্যুষিত অঞ্চলে অধিক পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ট্যাঙ্ক বসেছিল। Notes on Medical Topography of Calcutta পুস্তকে J. R, Martin ১৮৩৭ খৃঃ লিখেছিলেন :—

"The division between Durrumtollah and Bowbazar has a denser population ; it comprises the most thickly inhabited European part of Calcutta, as well as that occupied by a great number of country-born Christians who reside in the town with their families."

যখন স্কোয়ারে ছিল জলের ট্যাঙ্ক তখন পাম্পিং ষ্টেশনের মুসলমান মিস্ত্রীরা স্কোয়ারের ধারে একটি ঘরে বাস করত। এখন যেখানে মসজিদ সেখানে তারা নমাজ পড়তো প্রতিদিন। পাম্পিং ষ্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় মুসলমানরা রাতারাতি সেই ঘরটিকে একটি মসজিদে রূপান্তরিত করে। হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় এই মসজিদটি রক্ষা করতে গান্ধীজী এসেছিলেন বেলেঘাটায় এবং এই হলটিতে কয়েক ব্যক্তি তখন অনশনও সুরু করেছিল। Tubewell থেকে জল তোলার জন্য সম্প্রতি এক Pumping Station স্কোয়ারের ধারে স্থাপিত হয়েছে ; এই অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব এতে অবশ্য খানিকটা মেটে। মুসলমান বা ক্রীশ্চান অধ্যুষিত সেই মধ্যকলকাতায় এখন বহু হিন্দু পরিবারের বাস। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশ চলে গেছে ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের দিকে। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত বহু মসজিদ ও গির্জ্জা পুরাণো কলকাতার অবস্থাকে স্মরণ করায়। ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল ভারতের রাজধানী কলকাতা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলেও সরকারী হিসাবে কলকাতা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর। কীর্ত্তিমান বাঙ্গালীদের কর্ম্মে, শিক্ষায় এই কলকাতাই ত একদিন ভারতের সহরগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন কলকাতার ভিত্তির উপরেই একদা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে আধুনিক নব্য কলকাতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবি এটকিনসন লিখিত প্রাচীন কলকাতার বর্ণনা :—

Calcutta ! What was thy condition then ?
An anxious, forced existence, and thy site
Embowering jungle and noxious fen,
Fatal to many a bold aspiring wight :
On every side tall trees shut out the sight ;
And like the Upas, noisome vapours shed ;
Day blazed with heat intense and musky night
Brought damps excessive and a feverish bed ;
The travellers at eve were in the morning dead."

মর্য্যাদা

প্রভঞ্জনকুমার রায়চৌধুরী

ঐ বিল্ডিং দেখেই নিরূপার বাপ-মা ভুলেছিল আর সব। আশপাশের সবাই বলতো—হ্যাঁগা, শুধু দালান দেখেই ভুললে নিরূপার মা? শুনছি কোন খোঁজখবরই করলে না পাত্রের? নিরূপার মা শুধু একটু মুচকি হাসে। জবাব দেয় নিরূপাদের মুখরা ঝি,—তোমাদের এত মাথা-ব্যথা কেন গা? দিদিমণির যা ভাগ্যি, দেখবে যার ঘরে যাবে একেবারে রাজধানী হয়ে যাবে। সে জানতো, অমন সুন্দর যার মুখশ্রী, অমন মিষ্টি যার স্বভাব, তাকে কি আর বিধাতা যেখানে সেখানে দিতে পারেন?

রাজপথ জুড়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ঐ প্রকাণ্ড বিল্ডিং বিরাট দৈত্যের মতো। ঐ দানবের ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে সনতের আপিস। বেশী খোঁজখবর করেন নি সেদিন নিরূপার বাবা মোহিনীবাবু।

একদিন তিনতলায় আপিসে গিয়ে মোহিনীবাবু সামনে টেলিফোন অপারেটারকে দেখে পাত্রের বিষয় গোপনে খোঁজখবর করতেই অপারেটার দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো—নিশ্চিন্তি মনে মশাই, নিশ্চিন্তি মনে। এতবড় বিল্ডিং-এর আপিস—তারা কি যা-তা মাইনে দিতে পারে? কলকাতায় ক'টা এত বড় দালান দেখতে পান বলুন তো! পাশের প্রশস্তি অপেক্ষা বিল্ডিং-এর প্রশস্তি শুনেই মোহিনী-বাবুকে নানা রঙীণ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ফিরে আসতে হলো সেদিন। তিনিও মনে মনে ভাবলেন,—পাশ-করা সনৎ, অত বড় বিল্ডিং-এ কাজ করে, টাকা আনায় মাইনেটা ঠিক না জানলেই বা এমন কি এসে যায়?

আসছে ২৩শে বৈশাখ বিবাহের দিন ধার্য্য হলো। ঘটা করে মোহিনীবাবু সেদিন আদরের একমাত্র কন্যা নিরূপাকে পাত্রস্থ করলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় সনৎ-এর ঘরে নতুন বৌ হয়ে গেল নিরূপা। শুক্লা তিথিতে পদার্পণ করেছিল বলে সনৎ আদর করে নিরূপার নাম রাখলো শুক্লা। এই নাম রাখা নিয়েই কত না হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে কাটলো বৈশাখী বাসর ঘর। ক্রমে লজ্জা ভাঙলে এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলো নিরূপা ক'দিন বাদেই। সনতের নাম রাখলো সে মিস্টার সিপ্। জাহাজের মতো ঢংয়ের বিরাট বিল্ডিং-এ আপিস করে—তাই।

এমনি করে আনন্দ হাসি তামাসায় কাটতে লাগলো দাম্পত্য জীবনের মধুর মুহূর্ত্তগুলি। স্বল্প আয়ের ছোট্ট সংসার। বিরাট বিশ্বগ্রাসী চাহিদার সম্মুখীন হতে হয়নি বলে যাহোক্ করে কাটিয়ে দিলো তারা দুবছর। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও খরচার ধাক্কা প্রথম সনৎকে নাস্তানাবুদ করে দিলো সেদিন—যেদিন আরেক বৈশাখী পূর্ণিমায় নিরূপাকে হাসপাতালে রেখে এলো। একদিন তো অজ্ঞান অচৈতন্য হয়েই ছিলো নিরূপা। ডাক্তাররাও নানা জটিল উপসর্গ দেখে আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। স্বামীর মানসিক অবস্থা বুঝে চোখ মেলে এরি মধ্যে একদিন নিরূপা বলেছিলো'—কোন চিন্তা করোনা, আয়ু থাকলে ভাল হয়ে উঠবো। ভগবানকে ডাকো। সান্ত্বনার কথা শুনে নিরূপার শিয়রে সনৎ-এর দুফোঁটা চোখের জল টপ্‌টপ্ করে পড়লো। প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেও স্বামীকে বললো—ছিঃ কাঁদতে নেই।

যমে-মানুষে টানাটানি করে সাতদিনের দিন সিজারিয়ানের সাহায্যে প্রসব করানো হলো। একটি ফুটফুটে মেয়ে। ঐ সুন্দর চেহারার মধ্যে অভিশাপের চিহ্ন আঁকা—একটি চোখ কানা। কেউ বললে, বড় হয়ে সেরে যাবে। কেউ বা বললে, এখনই আই-স্পেশ্যালিষ্টকে দেখিয়ে অনবরত চিকিৎসা করানো দরকার; ভাল হলেও হতে পারে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু

বলে দেননি। শুধু ডাঃ বোসের হাউস সার্জেন বলেছিলেন,—দেখুন সনৎবাবু, এই হাসপাতাল বলে ইনি এবার প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু সাবধান! আর যদি কোন ইস্যু হয় অদূর ভবিষ্যতে—তাহলে আর একে বাঁচানো যাবে না।

বৃহস্পতিবার শুভদিন। সনৎ আপিস না গিয়ে নিরুপা ও নবজাত শিশুকন্যাটিকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরলো। পাড়াপড়সী যে দেখতে আসে সে-ই একবার বলে ওঠে—বাঃ কি সুন্দর মেয়ে, খাসা দেখতে! বলেই আচমকা থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপা ও সনতের মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়ে।

ডিস্‌চার্জ সার্টিফিকেটের উল্টোদিকে পাচ সাতটি ওষুধের নাম লিখে দিয়েছেন হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। সনৎ নামগুলি পড়ছে আর কপালে হাত দিয়ে ভাবছে—এবার নিরুপার চিকিৎসা করাবো, না মেয়েটাকে একজন আই-স্পেশ্যালিষ্ট দেখাব। কোন কুলকিনারা খুঁজে পায় না সনৎ! দু'টোতেই সনতের মত—একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর পক্ষে বিরাট অর্থের চাপ পড়বে। এদিকে হাসপাতালে নিরুপার চিকিৎসায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সনৎ আপিসের সবগুলো ফণ্ড নিঃশেষ করে রেখেছে। না আছে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, না আছে ক্রেডিট সোসাইটির কোন পাওনা। এবার কি করা যায়? আকাশপাতাল ভেবে অসাড় হয়ে পড়ে সনতের দেহমন। বাবাকে একবার মুখ ফুটে বলি কি বল? জিজ্ঞেস করে নিরুপা। স্বামীর দৈন্য প্রকাশ পায় বলে এতদিন কষ্ট হলেও জানানো সমীচীন বলে মনে করেনি সে।

সনৎ একবার ভাবে স্ত্রীর চিকিৎসারই আশু প্রয়োজন। মেয়েটার চিকিৎসা ছ'মাস বাদে হলেও কোন ক্ষতি নেই। পরক্ষণেই পিতৃস্নেহ অজ্ঞাতে পথরোধ করে বসে। ভাবে, সে কি করে সম্ভব?—অসহায় শিশু, তাতে একটা চোখ নেই। কথা ফোটেনি বলে তার প্রতি উদাসীন থাকা ·· না না সে হয় না। দিনের পর দিন এমনি অহেতুক ভাবনা ভাবতে ভাবতে সময় চলে যেতে লাগলো। কোনদিকেই ত্রাণ পাবার কোন স্পষ্ট পথরেখা দেখতে পেলো না সনৎ। সংসারের নিত্যকার খুঁটিনাটি জোগান দিয়ে চিকিৎসার দিকে পা বাড়াতে পারে না। শুধু চিন্তায় একবার অসাড় হয়ে পড়ে, গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে প্রচণ্ড খরচার তালিকা সনতের দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়।

ছ'মাসের মধ্যে সনতের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সেই হাসি-ঠাট্টা রসিকতার পরস্পর আক্রমণ—এরি মধ্যে তারা বেমালুম ভুলে গেছে। স্বপ্নের মতো মাঝে মাঝে স্মৃতিগুলি মনের কোণে উঁকি মারে, আবার মিলিয়ে যায়। পরক্ষণেই মনে হয় সব মিথ্যা, সব ফাঁকি, সব ছলনা। থেকে থেকে সনতের কেবলি মনে হয়,—নিরুপাকে বিয়ে করা আমার উচিত হয়নি। অবস্থাপন্ন ঘরের একমাত্র আদরের কন্যা মোহিনীবাবুর। ছিঃ, নানা, শেষ পর্য্যন্ত আমার উপযাচক হয়ে বলাই ভাল ছিল যে বিল্ডিং দেখে ভুলবেন না। আবার ভাবে, তারা বড় চাকরে ভাবলে আমি কি করবো? আমি তো তাদের ঠকাইনি। আমাকে তো বিয়ের আগে মাইনে জিজ্ঞেস করেনি কন্যাপক্ষের কেউ। হঠাৎ মুখ দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো—আমার কি দোষ? শুনতে পেলো নিরুপা। খাবারের থালাটা রেখে বললে,—বলেছিইতো তোমার কোন দোষ নেই। যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে। বরাতে যা আছে হবে। শোন, বাবাকে চিঠি দিয়েছি মিন্তুর অসুখ বলে; টাকা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।

—না গো না, টাকা পেলেই আমার সব দোষ স্খালন হয়না। থেকে থেকে কেবলি মনে হয়—নিজের আনন্দ সুখ শান্তি খুঁজতে গিয়ে একটা মেয়ের জীবন কেমন মাটি করে দিয়েছি—বললে সনৎ।

নিরুপা বুঝলো এখন কিছু না বলাই ভাল। তৎক্ষণাৎ মেয়ের কান্না শুনে চলে যেতে যেতে শুধু সনতের হতাশার দীর্ঘশ্বাস কানে এলো।

দিন দিন সনৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে যেতে লাগলো। তাকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়—সে বড় অসহায়, পথশ্রমে বড় ক্লান্ত। আপিস যায় আসে। মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে পড়ে। নিরুপা বল ভরসা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয় না।

নিরুপার চিঠি পাওয়া মাত্র আপাততঃ দু'শ টাকা পাঠিয়ে দিলেন মোহিনীবাবু। কুপনে লিখলেন—

"নিরু মা, কতটা বিপন্ন হলে তোমার মতো মেয়ে টাকা

চেয়ে চিঠি দিতে পারে আমি বেশ বুঝি—এ টাকা সংসারের অন্য কোন দিকে খরচা না করে আমার দিদিমণির চিকিৎসায় ব্যয় করো। সেদিনের কথা ভেবে আজ বড় কষ্ট হয় মা। বিল্ডিং দেখে ভুলেছিলাম, কোনদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করিনি।

আপিস থেকে এসে সনৎ টেবিলের উপর থেকে কুপনটা নিয়ে পড়তে লাগলো। শেষ লাইন পড়তে পড়তে কান্না চেপে রাখতে পারলো না; নিরূপা লক্ষ্য করতেই সংবরণ করবার বৃথা চেষ্টা করলো।

—কি হচ্ছে? সন্ধ্যেবেলা চোখের জল ফেললে মেয়েটার অকল্যাণ হবে যে! নিরূপা বুঝেছিলো মেয়ের অমঙ্গলের ভয় না দেখালে আর যে কথাই বলা যাক্ কান্না আরো প্রবলবেগে ফেটে পড়বে।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর কথাপ্রসঙ্গে নিরূপা বললো, আমার তো এ ক'মাসে শরীরের অবস্থা বিনা চিকিৎসায়ই অনেক ভাল; এবার মেয়েটার দিকে নজর দাওতো!

—দেখি!

একটু পরে বলল, মিছামিছি আমাকে প্রবোধ দাও কেন? দেখেছ, তোমার বাবাও লিখেছেন, বিল্ডিংটাই তাঁর চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়েছে। আমার সব খুলে বলাই ভাল ছিল, এ আমারই দোষ। আর যদি কারো কোন দোষ থাকেতো ঐ বিল্ডিং এর!

চোখের বড়-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, এ কটি মাস কি করেছিলেন? প্রথমদিকে আনলে নিশ্চয়ই ভাল হতো! বাঁ চোখের রেটিনা একেবারে ড্যামেজড্। নিরূপা কাতরকণ্ঠে বললে, আপনি ভাল করে চেষ্টা করে দেখুন, টাকার জন্যে ভাববেন না। বলেই চোখ ঘুরিয়ে দেখে সনৎ মেয়েটার বাঁ চোখের দিকে তাকিয়ে আছে পাণ্ডুর দৃষ্টিতে।

বছরখানেক যাহোক্ করে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হলো। মোহিনীবাবু এর যা কিছু ব্যয়ভার বহন করছেন। সেদিন মেয়ের চিঠি পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত ও উৎফুল্ল হলেন মোহিনীবাবু। ভাবলেন, ভগবান বুঝিবা মুখ তুলে চাইলেন এতদিনে। ক্রমে তাঁর ছোট্ট দিদিমণি দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। জানালেন,—আসছে পূজোতে তোমাদের কাছে যাচ্ছি নিরু মা, আশাকরি আমার টুকটুকে দিদিমণি তখন দুচোখ দিয়েই আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারবে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।

চিঠিটা প্রথমে সনতের হাতে এসে পড়লো। এবার শেষ লাইন পড়ে হেসে ফেললো সনৎ। মোহিনীবাবুর চিঠির শেষ লাইনটি সনতের কানে বিদ্রূপের মতো বাজলো।

যতই পূজো ঘনিয়ে আসছে, নিরূপার শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগলো। আপিস-ফেরতা কোনদিন একটা লেবু কোনদিন একটা বেদানা হাতে করে বাড়ী ফেরে সনৎ। এ সময় নাকি ফল খাওয়া ভাল।

পূজোর সাতদিন বাকি মাত্র। পঞ্চমীর দিন এসে পৌছুবার কথা মোহিনীবাবুর। জীবনে প্রথম মেয়ের বাড়ী আসছেন। বারণ করে আর চিঠি দিলোনা নিরূপা শরীর খারাপ বলে। যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন মোহিনীবাবু। দিদিমণি অনেকটা ভাল। আনন্দ হলো। কিন্তু আঁৎকে উঠলেন মেয়ের শরীরের অবস্থা দেখে। বাবা আসবার আগেই নিরূপা অনেকদিন আগেকার ওযুধের খালি ফাইল দু'তিনটে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছিলো। চিকিৎসা হচ্ছেনা বলে বাবা দুঃখ পাবেন—তাই এ ছলনার আশ্রয়।

গভীর রাত্রিতে মোহিনীবাবু বললেন সনৎকে—নিরুকে এক্ষুণি নিয়ে যাও হাসপাতালে। ভোরের অপেক্ষায় আর থেকো না। আমি বরং বাড়ীতে দিদিমণিকে দেখছি। আবার সেই হাসপাতালে ভর্ত্তি হলো নিরূপা।

ষষ্ঠীর দিন বিকেলে হাসপাতালে গেলেন মোহিনীবাবু। মেয়ে নিয়ে রইলো সনৎ। চিন্তা মন সব কিছু পড়ে রইলো হাসপাতালে। টেবিলের ওপর ওযুধের ফাইল গুলির দিকে চোখ পড়তেই অজানা আতঙ্কে সনতের বুকটা কেঁপে উঠলো। বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হলো না খালি ফাইলগুলির অর্থ কি, এ গুলোর ভিতর দিয়ে স্বামীর দৈন্য ঢেকে তার নিরূপা কি বলতে চায়।

ছুটিও পাওনা নেই। না গেলে সরাসরি মাইনে কাটা যাবে। ঐ অশান্ত মন নিয়ে পরদিনও তাকে আপিস যেতে হলো। ঐ আপিস বিল্ডিংটা যতবার সনতের চোখে পড়ে ততবারই ভয়ে কেঁপে ওঠে তাঁর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত। তবুও ঢুকতে হয় তারই গহ্বরে।

আপিস থেকে হাসপাতাল হয়ে বাড়ী যাবার কথা

আজ সনতের। শ্বশুর মশায় পথ চেয়ে বসে আছেন বহুক্ষণধরে। হাসপাতালে গিয়েই সনৎ জেনেছে সকাল থেকেই নিরুপার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বেলা এগারোটায় মেজর অপারেশনের সাহায্যে মৃত পুত্রসন্তান প্রসব করানো হয়। প্রসূতি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। দুঘণ্টা ঠায় বসে রইলো সনৎ একইভাবে নিরুপার শিয়রে। অক্সিজেনের নল ও যন্ত্রপাতি চারদিক থেকে তাকে ও নিরুপাকে যেন ঘিরে রেখেছে। একবার নিরুপার বিবর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে তাকাচ্ছে, আবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে নলগুলোর দিকে। নিরু আর তার দিকে তাকায় না। মিটারের কাঁটা নড়ে চড়ে সনৎকে আভাসে যেন জানিয়ে দিচ্ছে তার নিরুপার শেষ সময় ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। বসে থাকতে পারলো না আর নিরুপার শিয়রে। হনহন করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে হাসপাতালের সীমানার ভিতরের এক মাঠে ঘাসের ওপর অসাড় হয়ে বসে পড়লো সনৎ। কোন হুঁস নেই অনেকক্ষণ। কে এসে কখন তাকে বাড়ী নিয়ে গেছে জানে না।

রাত তিনটেয় বাড়ী থেকে ধীর পদক্ষেপে সে বেরিয়ে পড়লো---দুর্বল পা দুটোকে চালিয়ে দিলো হাসপাতালের দিকে যেখানে তার নিরুপা শুয়ে আছে।

মহাষ্টমীর সকাল। পূজোর বাজনা চারদিক থেকে ভেসে আসছে সনতের বধির কানে। নিরুপা কাউকে ভোগাল না, অর্থব্যয় করলো না। নিজেই যেন মৃত্যুর কাছে একপা একপা করে এগিয়ে গেল। এক ফোঁটা জলও পড়লোনা সনতের চোখ থেকে। সব জল শুকিয়ে গেছে। নিষ্প্রাণ পাথরের মতো বসে আছে সনৎ। অদূরে হাউস-সার্জেনের অস্পষ্ট কণ্ঠে চমকে উঠলো সে,—আগেই তো সাবধান করে দিয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে কোন ইস্যু হলে আর একে বাঁচানো যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে নানা অসংলগ্ন কথাকাহিনী স্মৃতি সনতের শোকতপ্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিলো।

এত বড় শোকাঘাতের পর সাতদিন কারো সাথে কোন কথা বলেনি সনৎ। বিরাট ছুটি পেয়েছে জীবনে। প্রচুর সময় হাতে। অফুরন্ত অবকাশ। সাতদিন বাদে সোমবার দশটার বহু পূর্বেই আপিসে গিয়ে সে হাজির হলো। অসময়ে উপস্থিত দেখে প্রথমে অনেকে অবাক হয়ে গেলো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। আধময়লা একটা সার্ট গায়ে। বেলা তিনটের সময় কতগুলো চিঠি ডেস্‌পাসে দিতে গিয়ে কাউণ্টারের বাইরে এক ভদ্রলোকের দিকে তার দৃষ্টি পড়লো। তাকিয়ে দেখে, সে কি যেন জিজ্ঞেস করছে টেলিফোন অপারেটারকে। একটু পাশে গিয়ে শুনতে পেলো অপারেটার বলছে—মাইনে জিজ্ঞেস করতে হয়? এতবড় বিল্ডিং-এ সাত বছর কাজ করছে—সে কি যা-তা মাইনে পেতে পারে? কথা শেষ করতে না করতে সনৎ ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিল টেলিফোন অপারেটারের গালে। চীৎকার করে বলে উঠলো—অসভ্য পাজি বদমায়েস। আমার জীবন নষ্ট করেছ, আবার বিল্ডিং দেখিয়ে এক ভদ্রলোকের সর্বনাশ ডেকে আনছ?

হৈচৈতে চেম্বার থেকে অফিসাররা বেরিয়ে এলো। আশেপাশের কর্ম্মচারী এসে তাকে তার সিটে সরিয়ে নিয়ে গেলো। তখনও ঐ বিশ্রী অবিন্যস্ত চেহারায় সনতের চোখ দুটি হিংস্রতায় জ্বল্ জ্বল্ করছে।

বিভক্ত বাংলা ও দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইতেছে। যাহার যেমন সাধ্য কবি, নাট্যকার, স্বদেশপ্রেমিক, ভগবৎ-ভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে কোন দিক দিয়া আলোচনা করিলেই দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী-গানের অন্যতম উদ্‌গাতা একথা আজ আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের এবং জাতীয় জীবনের অমূল্য-রত্ন, বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়। "দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্য-রস-সমুজ্জ্বল মধুর গানের রচয়িতা নন, তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত, তিনি বাঙ্গালীর পথ-প্রদর্শক, তিনি "স্বদেশী" মন্ত্রের মহাকবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙ্গালীর অবদান—হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ-মহাদেবের জটাজুট হইতে দেশ-ভক্তি ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটি কোটি ভারত-সন্তানের জীবন্মুক্তির সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে?"

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তি অন্ধ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি যেমন স্বদেশী গান গাহিয়া আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছেন, তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের ধারা যে ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে আশঙ্কাও অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজে জ্ঞান-বুদ্ধি মতে প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেদিনের প্রলয়ঙ্কর জাতীয় বিপ্লবের স্রোতধারায় তাঁহার সতর্কবাণী ভাসিয়াগিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে আজ তাঁহার পত্রাবলী পাঠ করিয়া মনে হয়, ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষির ন্যায়ই তিনি দেশের দুর্দ্দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন-প্রবর্ত্তিত বঙ্গবিভাগ রদ করিবার জন্য যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা "বয়কট" আন্দোলনে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, তখন একা দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন—তাঁহার মতে "খণ্ডিত বঙ্গের একটা প্রবল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে; বঙ্গবিভাগ রদ করিলে বাঙ্গালীর পক্ষে চরমতম ক্ষতি হইবে।"

কলিকাতা "টাউন হলে" প্রথম স্বদেশী সভায় যখন বাংলার নেতৃবৃন্দ "স্বদেশীর" কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করেন তখন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখের একখানি পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন "আজ নবজীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনে একি অপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদ! যাহা স্বপ্নের অগোচরে কল্পনারও অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য, সার্থক হইল, প্রাণ আমার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল। এত সুখও যে আমাদের অদৃষ্টে ছিল তা কে জানিত ভাই! কিন্তু এত আনন্দের ভিতরেও একটা কথা যখন আমার মনে হয় তখন আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে ভীত ও চঞ্চল হই। মাকে আমার ভালবাসিব, সেবা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সজ্জায় নিয়ত অনাবৃত করিব, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-প্রেম কুসুমে সতত পূজা করিয়া চিত্তপ্রসাদে ডুবিয়া থাকিব, আমার এই যে সাধ, এই যে আশা, এত অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুসন্তানের স্বভাবতঃই এ ইচ্ছা হইয়া থাকে, যার না হয় সে হতভাগ্য কুলাঙ্গার—নরাধম মাত্র। কিন্তু এই যে সব সাধ ও আকাঙ্খা, এর জন্য আমি সুযোগ বা অবকাশের সন্ধানই করি কেন, আর এসব ভাবোদ্রেকের জন্য আমরা এমন বাহিরের দশটা কারণ ও অবস্থার উপরেই বা নির্ভর করতে যাই কেন? স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি মাকে 'মা' বলিয়াই পূজা না করি, যদি পরের দ্বারে অনাবৃত ও আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্য্যাদা দিতে না চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য ক্লেশ দূর করিতে না পারি তবেই ত ভয় হয়—বুঝিবা আমাদের এ পূজা আন্তরিক নহে; তবেই ত ভয়—হয়ত বা আমাদের

এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়,—এ সব পদ্মদলের বারি—বিন্দুসম চপল ও ক্ষণস্থায়ী।"

"এখানে এখন প্রত্যেকদিন দু'টি বেলাই আমার সঙ্গে বন্ধুদের ভীষণ তর্কযুদ্ধ হয় যে, যে ভাবে এই স্বদেশী আরম্ভ হইল তা' বাস্তবিক আমাদের দেশে স্থায়ী ও মঙ্গলজনক হবে কি না। সকলেই আমার বিপক্ষে, আমি একা; কিন্তু 'একা হব সমকক্ষ শত সেনানীর'। আমি বলি, বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্ব্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেও সম্ভব নয়। এ দেশ যদি আজ পরপ্রসঙ্গ ও বিজাতীয় বিদ্বেষ ভুলিয়া, প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোন শক্তিই নাই যে তাহার বলদৃপ্ত-গতি রোধ করিতে পারে।..."

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখের আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে Partitionএ (বঙ্গ বিভাগে) তা ভাঙ্গিতে পারিবে না। বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করার পুর্ব্বে, তাহাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না।" আরও কয়েকদিন পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"Partition (বঙ্গ বিভাগ) রদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে শুনছি। কিন্তু বেহারের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ হবে না কি? বেহারীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের তেমন মনের মিল-সদ্ভাব নাই সত্য; কিন্তু ক্রমে একদিন তাহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য যে পাওয়া যেত—সে আশা গেল! Partition এর (বঙ্গভঙ্গের) সময়ে আমি বলেছিলাম যে, এর একটা খুব Bright side (উজ্জ্বল দিক) আছে। তোমরা ত তখন আমার উপরে খড়্গা-হস্তই ছিলে। সে ভালোর দিকটা এই,—একদিকে বাঙ্গালী আসামীদের শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বেহারীদের শিক্ষিত করুক, নইলে একা বাঙ্গালীর বল আর কতটুকু?"

দ্বিজেন্দ্রলালের আশঙ্কা সত্য হইয়াছে; বেহারের সঙ্গে বিচ্ছেদ বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার সঙ্গেসঙ্গেই ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহও ভারতবর্ষের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; গিয়াছে নেতৃত্বের অভাবে। একখানি পত্রে (১৯০৬, ১৩ই জানুয়ারী) লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, বরিশালই একাগ্র সাধনায় স্বদেশী ভাবকে স্বভাবে পরিণত করিয়াছে। আজ তোমার পত্রে সে কথার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া আমার যে কত আনন্দ হইল তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। বরিশালবাসী আজ সমগ্র ভারতের আদর্শ, শিক্ষক, নমস্য। ওখানে কার্য্যতঃ তোমরা যে আদর্শ দেখাইতেছ তাহা কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া এই দূর হইতে আমি নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। * * * ঐ যত সব বাক্যসর্বস্ব, কপটাচারী নেতাদের কানে ধরিয়া বরিশালে নিয়া দেখাইয়া দাও—কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়, স্বার্থত্যাগ করিতে হয়; দেশের যথার্থ যে প্রাণশক্তি, অর্থাৎ—এই আমাদের অশিক্ষিত, অগণিত চাষা ও গ্রামবাসীদের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া, কি করিয়া তাহাদিগকেও দেশভক্তির এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও দৃঢ়ব্রত করিয়া তুলিতে হয়—কাজের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই। শুধু কেবল বক্তৃতা, বক্তৃতা, আর বক্তৃতা! এই সৌখীন নেতা ও বক্তাদের (এক সঙ্গে দুটো শব্দ বলিলাম কারণ বক্তা না হইলে এখন আর নেতা হওয়া যায় না) উপরে আমার এখন তো ঘৃণাই জন্মিয়া-গিয়াছে। এখন কি উপায়ে এই সব আত্মসর্ব্বস্ব, 'নাম-কাওয়াস্তে' নেতাদের হাত থেকে দেশবাসীকে, বিশেষতঃ আমার ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল, আশাকল্পতরু, সোনার চাঁদ ঐ যুবকদিগকে রক্ষা করা যায় তাই আমি অনেক সময় ভাবি। তা নইলে ত আমি আর অন্য কোন পন্থা দেখি না। এঁদের পাল্লায় পড়িয়া পরিণামে আমাদের দেশের যে নানা রকম দুর্গতির একশেষ হইবে আমি তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। * * * নেতারা কেবল পরের দোষই দেখিতে মজবুদ্, পূর্ব্ববঙ্গের ভাইদের এতকাল তাঁরা অবজ্ঞাই করিতেন,—এখন তবুও যদিবা প্রকাশ্যে ততটা না করুন, মনে মনে ও কার্য্যতঃ যে তাঁহাদের আমল দিতে রাজী নন, এটা বেশ বোঝা যায়! (বাঙ্গালরা ত কোন দিনই 'কুচ্ কাম কা নেহি!') অথচ তাঁহাদের নিজেদের যে "সর্ব্বাঙ্গে ঘা ওষুধ দিই কোথা"—অবস্থা, তা তাঁরা একটিবার ভুলেও ভাব্‌বার অবকাশ পান না। মাথায় থাকুক আমার "বাঙ্গাল ভাই সব,—তাঁরাই তো মানুষ! জয় বরিশালবাসীর জয়,—জয় আমার "বাঙ্গাল" ভাইদের জয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেহত্যাগ করিবার প্রায় অর্দ্ধ শতবৎসর পরে তাঁহার লিখিত পত্রাবলী পাঠ করিয়া দূরদর্শী কবির ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা লক্ষ্য করিয়া মন বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে, সত্যই বিভক্তবঙ্গের একটা Bright side (উজ্জ্বল দিক) ছিল। বাঙ্গালীরা জাতি হিসাবে একতাবদ্ধ থাকিলে খণ্ডিত বাংলার দুই অংশেই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করিতে পারিতেন। সঙ্গে সঙ্গে মন দুঃখের ভারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে; কোথায় অখণ্ডবঙ্গের সাধনা—আর কোথায় বা সেদিনের দেশ-প্রেম! নেতৃত্বের বিভ্রমে যুক্ত বঙ্গদেশ পুনরায় খণ্ডিত হইয়াছে—জন্মগ্রহণ করিয়াছে নূতন রাষ্ট্র পাকিস্থান। মনে হয় স্বদেশী আন্দোলন এর গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া মনীষি-দ্বিজেন্দ্রলাল উহার যে মারাত্মক "গলদ" ও ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা অবহেলিত না হইলে আজ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সৃষ্টি হইত না। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মিলিত হিন্দুসংখ্যাধিক্যে পাকিস্থানের কল্পনাও দানা বাঁধিতে পারিত না; বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার সময় বেহার উড়িষ্যাও পৃথক হইয়া যাইত না। সমগ্র দেশের অধিকাংশ লোক যে বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন, একা দ্বিজেন্দ্রলালকে সে সম্বন্ধে ভিন্ন-মত পোষণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কি অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি! আরো বিস্মিত হইতে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের "বাঙ্গাল ভাই"দের জয়লাভে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা আজও রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা লাভ করে নাই; কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানের "বাঙ্গাল ভাই"দের আত্মদানে বাংলা আজ সমগ্র পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে হয়, "মাথায় থাকুক আমার বাঙ্গাল ভাই সব—তাঁরাই তো মানুষ"!

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী হতভাগ্য ভুক্তভোগী আমরা আজ বিভ্রান্ত নেতৃত্বের শোচনীয় ফল ভোগ করিতেছি। বাঙ্গালীর এই ক্ষতি-পূরণ কবে হইবে কে জানে। শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাতেই বলিতে ইচ্ছা করে—"গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।"*

---

* ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়-চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্রাবলম্বনে।

মহাকবি শ্রীমধুসূদন

(সনেট)

শ্রীপ্রসিত রায়চৌধুরী

প্রাচী আর প্রতীচীর দ্বিবেণী সঙ্গমে—
করি স্নান, শুচিস্নাত যেই মহাজন;
ভক্তিপ্লুত বঙ্গদেশ দেখি শুভক্ষণ
সেই দ্বিজ কবিবরে আজিকে প্রণাম।

অমিত্র-অক্ষর ছন্দ, এদেশে প্রথমে,
আপন জীবন ছন্দে করিলে সৃজন,
পয়ারের বেড়ী বাঁধা সমিল চরণ
হে ঋত্বিক, মুক্তি পেল তোমার উদ্যমে।

বহু ভাষাবিদ্ কবি, দিব্য প্রজ্ঞাবলে,
বিদেশের কাব্যখনি করি অন্বেষণ,
দীনা জননীরে তুমি গরবে সাজালে,
বিরচিয়া মহাকাব্য আর প্রহসন,

সনেট, নাটক আদি স্বল্প আয়ুকালে
বাঙালীর মহাকবি শ্রীমধুসূদন॥

শীতের সকাল

ফটো। বিবেক সাহা

রৌদ্রে বিহার

ফটো : রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা
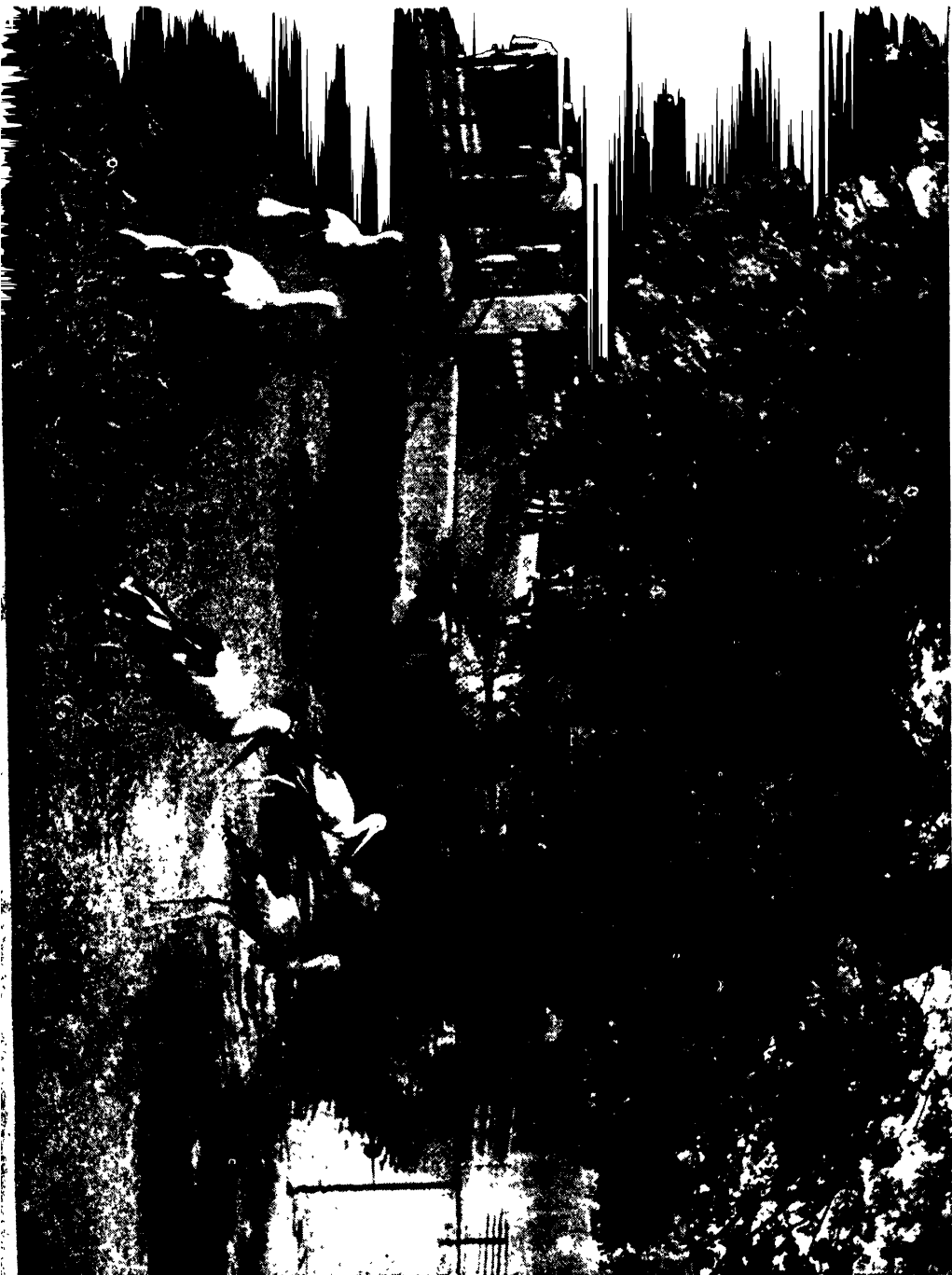
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই তো কাল ঢাকঢোল বাজিয়ে, গানের পর গান গেয়ে, কবিতার পর কবিতা পাঠ করে, প্রশস্তির ঝড় বইয়ে, অভিনয়ের পর অভিনয়ে হৈ হুল্লোড়ে মাইকী অমায়িক বক্তৃতায় এক মহাকবির জন্মশতবার্ষিকী আমরা পালন করলাম। আবার আজই চলেছি সেই একই উদ্দেশ্যে আর এক মহামানবকে প্রাণের প্রণাম জানাতে, অর্ঘ্য দিতে, ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতে। দেশে বিদেশে পথে প্রান্তরে মঠে মন্দিরে সাংস্কৃতিক সভায় ধর্ম আলোচনায় আমরা বলবো—জয়তু দেবতা; জয়তু ত্যাগী, জয় হোক তোমার হে বীর সন্ন্যাসী, হে সৌম্য সুগত পথপরিচায়ক মহানামব্রত শংকর-স্বরূপ। কিন্তু কতটুকু পাঠ আমরা নেবো সেই অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে, সেই জগজ্জয়ী চেতনার কাছ থেকে—অন্তত একটি কথা কি বলতে পারবো যে চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। কবির কাছ থেকে আমরা নিইনি তাঁর ভাবসাধনা, তাঁর ধ্যান, তার অনুভূতি, তাঁর সৌন্দর্যচেতনা, তাঁর মানবিক মূল্যবোধ, তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। স্বামিজীর কাছ থেকেও হয়ত নেবনা তাঁর দৃপ্তভঙ্গী, তাঁর বীর্য, তাঁর জীবশিব-চেতনা, তাঁর করুণাঘন প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা, তাঁর তপোজ্জল মন্ত্র, তাঁর শক্তিসাধনার ইঙ্গিত। শুধু অপরিশুদ্ধ ভক্তিশ্রদ্ধায় গদ্‌গদ্ হয়ে অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে মহামানবদের দেবতার দেউলে বসিয়ে ধূপধুনোগন্ধ পাদ্য অর্ঘ্যে, আরতিতে পূজা সমাপন করলেই কর্তব্যের সমাপ্তি হয় না। জানি মরা মরা করে দস্যু রত্নাকরের পরম লাভ হয়েছিল। জীবনের বহতা নদীতে মহাসাগরের রমতা-অভিরামত্ব আপনি আসেনা—যদি না তিলে তিলে তিলোত্তম হয়ে ওঠা যায়। সাধনার বিকাশ পলে পলে—তাই ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে জুড়ে ক্ষণিককে করতে হয় নিত্য। পূর্ণতা এলেই বল্মীকের স্তূপ আপনি সরে গিয়ে মহাকবিদের মহামানবদের আবির্ভাব হয়, কণ্ঠে সুর বেজে ওঠে অনুষ্টুপ ছন্দে, চেতনা হয় শুভ্র।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস অদ্ভুত। গঙ্গার ঘাটে শুধু বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয়নি, পশ্চিমী প্রবল বাত্যারও ঝন্‌ঝন্ শুনেছি। সোনার-তরীতে ভরা নতুন পশরা সে এনেছে—জ্ঞান বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বোধের চেতনা, নূতন দিগদর্শন। পুরোণোদিনের স্মৃতিশ্রুতিতেও বিদায় দিইনি আমরা। মিল-বেন্থাম-চসারের সঙ্গে যোগ দিলে মনুযাজ্ঞবল্ক্যহারীতলারিতজারিত। হিউম-কান্ট-কোমতের সঙ্গে কেন-কঠ-ঋক্-যজু-সাম। সেক্সপীয়রের পাশে বসলো শকুন্তলা। একদল লোক জেগে উঠলো সেই আলোড়নের মাঝে, তারা বললে—আমরা পড়বো, আমরা বুঝবো, আমরা শুনবো, আমরা জানবো—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে। এদের চোখে স্বপ্ন নেমেছিল বিশ্বামিত্রের, মহীদাসের, চার্বাকের, শংকরের, চৈতন্যের ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিদের। কেউ বললে—এঁরা হচ্ছেন আলালের ঘরের দুলাল, এ হচ্ছে নববাবুদের বিলাস--শুধু উপর বা মাঝতলার কয়েকজন লোক—যারা মদ মাতালে মাতাল না হয়ে মন মাতালে মাতাল হয়ে সুরার বদলে সুধা নিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এখানে জীবনের গণচেতনা ভাষা ও ভাষ্য পায়নি। ইতিহাসের বহিরঙ্গের মালমসলা খাতাখতিয়ান কি সাক্ষ্য দেবে জানিনা, কিন্তু অন্তর্জগতের মণিঅঙ্গনে সেদিন যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল সে তো সত্যি। সেইটিই তো উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-লতিকার দান—বিংশশতাব্দীর ভাবলক্ষীর পাদপীঠে। বাংলা দেশ চিরকাল কুললুপ্তির দেশ, অপাংক্তেয়দের দেশ, তার রক্তে আছে চঞ্চলতার বীজ—সে পান্থ, সে পথিক—সে সহজিয়া, মরমী চণ্ডালী ডোম্বী নিয়ে তার ঘর, মানুষ নিয়ে তার কারবার, তার কবিগান

হে ভবেশ হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ

তার পরিব্রাজক শেখান

হে ভারত, ভুলিও না তোমার আরাধ্য
গৌরীপতি শংকর

আবার শুনি বজ্রকণ্ঠে জীবন্ত দেবতার কথা—

ওরে মূর্খদল!
জীবন্ত দেবতা ঠেলি
অবহেলা করি
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়
চলেছিস্ ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা দ্বন্দ্ব—কলহের পানে—
কর তার উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা।

তাইতো আমাদের পূর্বসূরীরা বলতেন—এ হচ্ছে পাখীর দেশ, তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুর্নসংস্কারমর্হতি

আমরা পাখীর জাত
আমরা হেঁটে চলার ভাব জানিনা উড়ে চলার
ধাত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উড়েই চলেছিল বাংলা দেশ—ভারত-প্রথপথিক বাংলা দেশ মহাভারতের পথে পথে বেরিয়েছে—বিশ্বপথপথিক হয়েছে। সে তীর্থবারি সংগ্রহ করেছে, পূজার ফুল এনেছে—নিয়ে এসেছে সমিধ ও উপচার—তার কথা ও কাহিনী—তার কর্ম ও সেবা, তার আচার ও বিচার, তার ভাষা ও ভাষ্য, তার মেধা ও মণীষা তার সংস্কৃতি ও সাধনা। এরই প্রতীক রামমোহন-রামকৃষ্ণ, এরই প্রকাশ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, এরই সিদ্ধি বিবেকানন্দ-অরবিন্দ—এরই বাহক ও ধারক বিদ্যাসাগর মধুসূদন এবং আরো বহু মণীষী ও সাধকের দল।

মানুষের আত্মিক ইতিহাসে কখন যে কি ঘটে, বাইরের প্রকাশে তাকে অনেক সময়েই ধরা যায় না। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে, রূপরং-স্পর্শের সীমায়, ঘটনার পারম্পর্য দিয়ে, যুক্তিতর্ক করে, বিচার বিশ্লেষণ করতে বসে অনেক সময়েই দেখা যায় যে কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক থেকে গেছে।

একই দেশে, একই যুগে প্রায় একই সময়ে ভাগ্যবান আমরা, অনেক পুণ্যের জোরে পেয়েছিলাম বহু যুগন্ধর মহাপুরুষদের। এই রসমালঞ্চের প্রধান মালাকরদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথকে ও স্বামীজীকে। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের কথা আমি পূর্বেই বলেছি। কবিগুরু ও বিবেকানন্দের কথাও অন্যত্র আলোচনা করেছি। তবু মনে হয় এ সব বিষয়ে পুনরালোচনা নিরর্থক নয়। আর আমাদের মত সাধারণ মানুয়ের মনে এই প্রশ্ন স্বভাবতই উদিত হয় যে সমকালীন এই দুই মানুষের পরস্পরের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছিল কিনা। তা ছাড়া স্বামিজী রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্বের পূর্বেই মহাপ্রয়াণ করলেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নাম স্নিগ্ধতপস্তাপূত যে বিরাট মহীরুহ গড়ে ওঠে তার অত্যাশ্চর্য প্রগতি ত রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই। কবিমনে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর আত্মিক জগতে সূক্ষ্মমনে সিস্মোগ্রাফের মত কোন দোলা দিয়েছিল কিনা এও বিচার্য্য বিষয়। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ জন্মালেন, সে যুগ সত্যই সব দিক দিয়ে বাংলার মননের ইতিহাসে এক ঋতু পরিবর্তনের যুগ। ১৮৬১ বা ৬৩ সাল সিপাহী-বিদ্রোহের মাত্র কয়েক বছর পরের ঘটনা। পশ্চিমের দুর্বার স্রোত বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের পশরা নিয়েই ধাক্কা দিচ্ছেনা, আনছে নূতন মূল্য বোধ, নূতন রীতি নীতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাবালক হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ পর্ব সামাজিক শান্তজীবনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়েছে। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে তীব্র। সতীদাহ-প্রথা বা গঙ্গাসাগরে সন্তান সমর্পণ এ সব প্রশ্ন এখন গৌণ। ইয়ং বেঙ্গল ডিরোজিয়ো ও রিচার্ডসনের শিষ্য। রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথের আনুকুল্যে ও কেশবসেনের বাগ্মিতায় যার প্রতিপত্তি, সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন-শতদলে টলমল করছে। ওদিকে আন্তরজীবনের আর এক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে দেখতে পাই। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর কোলে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন রাণী রাসমণি—দেবী ভবতারিণী নামছেন আকাশ বেয়ে—মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা, বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশী। কেউ কেউ শুনতে আরম্ভ করেছে যে, গদাধর চট্টো বলে এক

আধ-পাগলা সাধুসন্ন্যাসী গোছের মানুষ সেখানে আস্তানা গেড়েছে। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের কিছু লোক সেখানে মনের আবেগে যেতে সুরু করেছেন। নিবিড় আঁধারের মাঝে অরূপরাশি চমকাচ্ছে। বাংলা দেশ নূতন গল্প শুনছে, নূতন কথা বলছে, নূতন রহস্যে জেগে উঠছে। বহুকালের বহু স্মৃতির বহু বৃহস্পতির মননে ভরা সে যুগ। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্যবিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌছায়নি।

"আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও নয়···এই পরিবারের বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই···আমাদের বাড়ীতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতি বাল্য-কালেই প্রায় প্রতিদিন বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণতঃ বাংলা দেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এ ছাড়াও ছিল ইউরোপীয় তথা ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি সুনিবিড় অনুরাগ। এর কিছু পরে দেখি নবনাটক অভিনীত হচ্চে, দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ লিখছেন, বিহারীলাল সারদামঙ্গল পড়ছেন, ভৃত্যরাজতন্ত্র পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ গাইছেন' "ময় ছোড়ো ব্রজ কি পিয়ারী ; পড়া হচ্চে মেঘদূত উত্তররামচরিত, ফরাসী কাব্য ও ইতিহাস, শেলী বায়রন কীটস, আলোচনা হচ্চে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরীশ্বরবাদ, হারবাট স্পেন্সর, জনষ্টুয়ার্ট মিল, ক্যান্টহেগেল মোক্ষমুলর ডয়সন জেকবী—সারা বাড়ী গমগম করছে হাস্যেলাস্যে আলাপে আলোচনায়, মুখরিত হচ্চে উচ্ছ্বসিত আনন্দে।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও যুগধর্মের প্রভাব প্রায় একই রকমের। ঠাকুরবাড়ীর সামন্ততান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা ছিল না হয়তো, কিন্তু একটা তেজী দামাল ছেলে (আচার্য্য ব্রজেন্দ্রশীল যাকে বলেছেন (Bohemian temperament) ছুটে চলেছে জানবার জন্য, বোঝবার জন্য—সে চলেছে হেষ্টি সাহেবের কাছে; সে ছুটেছে দেবেন্দ্রনাথের কাছে, সে গেছে দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণপাণি দেবতার কাছে। এই যে দুরন্ত মনের দুর্বার আবেগ এই তো সেই যুগের যুগমনের অভিব্যক্তি—বিবেকানন্দ তার একটি চরম ও পরমপ্রকাশ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন যে তিনি তাঁর মার মুখে শুনেছেন যে ঠাকুরবাড়ীর প্রসিদ্ধি তখন এতো ব্যাপক ছিল যে মুখে মুখে ছড়া ঘুরতো।

ধরাতে যথা মরতে বীর সোম আর রবি
সেই দেব নিকেতনে বাস করেন কবি

আমরা এ কথাও পড়েছি যে, যখন বিবেকানন্দ প্রায় উন্মত্ত হয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাছে দৌড়ে গিয়েছিলেন এবং বলে-ছিলেন যে তিনি ঈশ্বর দেখেছেন কিনা এবং দেখাতে পারেন কিনা তখন তিনি বলেছিলেন যে—বিবেকানন্দের আঁখির মধ্যে যোগীর চক্ষু নিহিত। বিবেকানন্দ যখন চিকোগোর ধর্মসভায় জয়লাভ করে দেশে ফিরলেন, তখন আশীর্বাদ উৎসাহ ও অভিবাদন জানিয়ে দেবেন্দ্রনাথ একটি চিঠিও দিয়েছিলেন তাঁদের ৩নং গোপীমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের পৈতৃক বাটীতে। কথামৃতে পড়ি—রবীন্দ্র-নাথের গান গাইছেন বিবেকানন্দ, শুনছেন পরমপুরুষ পরমভাগবত পরমহংসদেব। সমাধিস্থ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শোনেন বিবেকানন্দের কণ্ঠে কাশীতে

এ কি সুন্দর শোভা, কী মুখ হেরিএ,
মরিলো মরি আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে
সখি আমারি দুয়ারে কেন আনিল নিশিভোরে
যোগী ভিখারী

কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে যে ঐ যুগের বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যে রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নেই কেন। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, সঙ্গত ও সমীচীন, রবীন্দ্র-চেতনায় প্রাক্ বিংশশতাব্দীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর প্রভাব কি কিছুই পড়েনি—উত্তম, মধ্যম—অধম। এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন, হয়তো রুচিকর নয়, হয়তো এর সমাধান অন্যত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন ভক্তেরা প্রশ্ন করেছিলেন —সংসারের মধ্যে থেকে ভগবানকে পাওয়া যায় কিনা— সংসারীর বিষয় বাসনার মধ্যে তাঁকে ধরা যায় কিনা। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— দেবেন্দ্রনাথ—দেবেন্দ্র—। প্রথম যেদিন ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা—তখন তিনি দেবেন্দ্রনাথের জামা খুলিয়ে বুকের রক্তবর্ণ চিহ্ন দেখে বলেছিলেন—এই তো যোগীর লক্ষণ—শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর কাছে জ্ঞানের কথা, ঈশ্বরের কথা। দেবেন্দ্রনাথও বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করেছিলেন পরমহংসদেবের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন একেবারে বালক নয়—তাঁর মনে পরমহংসদেবের কি ছায়া পড়েছিল জানি না। তিনি তাঁর শেষ জীবনে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর ধর্ম সম্মেলনের ভাষণে এক অপূর্ব কবিতায় প্রণাম জানিয়েছিলেন তাঁকে

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ দিল এ জগতে
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেইখানে আমার প্রণতি দিলাম আনি

বললেন—

I venerate Paramhamsadeva, because he in an age of religious nihilism, proved the truth of our spiritual heritage by realising it, because the largeness of his spirit could comprehend seemingly antagonistic modes of Sadhana and because the simplicity of his soul shames for all time, the pomp and pedantry of pontiffs and pundits ......I have nothing new to tell you. I am a mere poet, a lover of men and creaton. But since love gives a certain insight I may claim to have sometimes caught the hushed voice of humanity and felt its suppressed longing for the Infinite (Modem Review April 1937).

তারপর তিনি কবীরের একটি কবিতা তুলে বললেন—

মাটির কাদায় রত্ন গেছে হারিয়ে
সবাই খুঁজচে—কেউ পূবে কেউ পশ্চিমে
জলে স্থলে পাথরে পাহাড়ে খোঁজার শেষ নেই
কিন্তু দাস কবীর জানে তার সত্য মূল্য
তার মনের মণিকোঠায় সে রেখেছে তাঁকে তুলে,
ঘষেমেজে।

সামগ্রিক কবিচেতনায় রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা স্বল্প হলেও তার মূল্য অপরিসীম। গভীরতম মর্মে একটি ঐক্যের সূত্র আছে যার পরিণতি রবীন্দ্রচেতনায় মহা-মানবত্বের কল্পনার জীবই শিব এইরূপ আরোপে যার পূর্ণ প্রকাশ আমরা পেয়েছি—হিবার্ট লেকচারের মানব-ধর্মে (Divinity of humanity, Humanity of Divinity). হয়তো এই ঐক্যের সূত্রের মূল খুঁজতে গেলে উপনিষদের গভীরে ডুব দিতে হবে। তবু এই ঐক্য লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হতেই মহর্ষি-প্রবর্তিত নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনায় অভ্যস্ত। পরিণত বয়সে পণ্ডিচারীতে গিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে আবার নমস্কার জানান, তখন তিনি বলেছিলেন—ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে জাগ্রত করে—মানুষের পথের সব বিষয়েই নাম্নে স্বথমস্তি—সমস্তই হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ···মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থ বলেন নি। প্রথম যুগে তাঁর কবি মনে মঠাশ্রয়ী (monastic) দীক্ষা শিক্ষা রীতিনীতির প্রতি কিছুটা বিরুদ্ধভাব ছিল বলেই মনে হয়। আমেরিকাতে এক বক্তৃতায় তিনি বলছেন যে আমার আশ্রমের কল্পনার মধ্যে monastic Seclusion এর স্থান নেই। আবার ভক্তি গদগদ ধর্ম তাঁর বিশেষ অনুমোদন লাভ করেনি—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায় যেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল প্রেম ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ (নৈবেদ্য)

সেইজন্য ভাবানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিমা পূজা তাঁর আদর্শে খর্ব হয়ে গেছে—

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা খেলা

তাঁদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল না, কারণ তাঁর ধারণা ছিল—আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানব আত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাহাকে বারবার নমস্কার করি (রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড)
তাই

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
নয়কো বনে নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো

কবি শুধু জ্ঞানমার্গের পথিক নন, তিনি লীলাবাদী, তিনি রসিক, তিনি সগুণ ব্রহ্মের উপাসক—রূপ থেকে রূপান্তরে তাঁর গতি—জল নড়ে, পাতা পড়ে—বিস্ময়ে তার জাগে প্রাণ—গান সাড়া দেয়—আকাশে দ্যুলোকে ভূলোকে তিনি দেখছেন প্রাণকে আনন্দকে।

১৮৯০ সেপ্টেম্বরে তিনি লণ্ডনে চলেছেন দ্বিতীয়বার। সঙ্গে আছেন লোকেন পালিত। ডেকে শুয়ে বসে আলাপ আলোচনা চলে। কবি লিখছেন—বাহ্য আকৃতির দিকে আমাদের দুটিকে দিবসে পেচকের মত যতটা আধ্যাত্মিক দেখায়, আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততটা সাত্ত্বিক সৌরভ থাকেনা। সকলের জানা উচিত, যদিচ আমরা ভারত সন্তান—কিন্তু তবু আমাদের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি। এখনও আমাদের সন্ন্যাসাশ্রমের সময় আছে …মনের মধ্যে কিছু উত্তাপ আছে। সেই জন্য আমরা দুই যুবক গত কল্য রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত কেবল ষটচক্রভেদ, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা না করে সৌন্দর্য, প্রেম এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করেছি। তাই বহুদিন পরে দিলীপকে তিনি লিখেছিলেন (তীর্থঙ্কর)—কোন মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনও ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখেনি—তা সে ভালোবাসা যে রকমই হোক্ না কেন… বাইরের সন্ন্যাসকে তিনি গ্রহণ করেননি, যতদিন না অন্তরের সন্ন্যাস-কবি-বাউল তাকে গেরুয়ার রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে

তাই কি ? সকলি মায়া ? আসে থাকে ?
আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ আর সব আছে
আর নাই ?
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন
কাহার স্বপন্

তবু বিবেকানন্দের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ যথেষ্ট—সেটা হচ্চে অন্তরের। শুধু বিবেকানন্দের দৃপ্ত পদক্ষেপ, অনির্বাণ তেজ, কম্বুকণ্ঠ, দার্ঢ্য, বলিষ্ঠতা কবিমনকে উদ্বেল করেনি, তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেই বিবেকানন্দকে মেরুদণ্ড খাড়া, মন যার নমনীয়, স্নেহ যার অনাবিল, চিত্ত যার অমিতবিত্ত, জ্ঞানের দণ্ড হাতে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত যে পরিব্রাজক পূর্ব পশ্চিমের মিলনের কথা সজোরে বলে গেছেন, যিনি বেদান্তের সূত্রের সার্থক ভাষ্য করলেন, শুধু মুখের কথায় নয়, জীবনের নিত্য পরিক্রমায়—কাজে লেগে যা, জমি তৈয়ারী কর, ফেলে দে ধ্যান, মুক্তি যুক্তি, যাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ ফুটে বেরুবে ভুনাওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটে মজুর মুদ্দফরাসের ঝুড়ি থেকে, ভাড়ীর ঘর থেকে।

সেই বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ—এক এক সময়ে দেখি একই ধরণের চিন্তাধারা, মননের বিন্যাস, কর্মে উদ্দীপনা। শাশ্বত মানবে বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী এই দুইজনই উপনিষদের গভীর অতল থেকে শুক্তিমুক্তা তুলে নিজেদের পশরা সাজিয়েছেন। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সিদ্ধরূপ, বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণের সিদ্ধরূপ। প্রথমতঃ দেখা যাক্, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের কোথায় কোথায় উল্লেখ করেছেন। শ্রদ্ধেয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখছেন যে তাঁদের ছিল Excelsior Union বলে একটি ক্লাব। ১৯০২ সালে জুলাই মাসে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরে একটি

শোকসভায় সিস্টার নিবেদিতা ভাষণ দেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতি। ভবানীপুর সুবার্বান স্কুলে সে সভা বসে। সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলীতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারাংশ বেরোয়। ১৩১৫ সালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রবন্ধে কবি লিখলেন মহাভারতবর্ষ গঠনের কথা এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষিদের মধ্যে বিবেকানন্দের স্থান নির্দেশ করলেন (রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ৬১২ পৃঃ) 'প্রবাসী' ১৩১৫ ভাদ্রের একটি প্রবন্ধেও বিবেকানন্দের উল্লেখ আছে। দিলীপের স্মৃতিচারণেও পড়ি যে, জালিয়ানওয়ালা-বাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লণ্ডনে প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করতে বললে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তোমাদের কি লজ্জা করেনা একটুও, জালিয়ান-ওয়ালাবাগে পশুর মত মার খেয়েছি সেই কথা এখানে হাটেবাজারে প্রচার করতে চাও—এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথা বলি —যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাইত তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি ওদের এসে ডাক দিয়েছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বলে—কাঁদুনি গাননি, আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকে তিনি কি ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্য কীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেননি—আমরা আর্ত, বড় দীনহীন —বলতেন—ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও, তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড় করে দেখো না, আমেরিকানদের সামনে এসে তিনি মাথা উঁচু করে বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন দুটি ভিক্ষা দাওগো—তাহলে না পেতেন ভিক্ষা, না পেতেন সমাদর।

আবার ১৩৩৫ সালের প্রবাসীতে কবি বিবেকানন্দের সম্বন্ধে একটি অনুক্রমণিকা লিখে দেন শ্রদ্ধেয় অমিয় চক্রবর্তী ও ডাঃ সরসীলাল সরকারের পত্রালাপের মুখবন্ধ হিসাবে। তিনি বলেন—আধুনিক কালের ভারতবর্ষের বিবেকানন্দই একটি মহৎবাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত না। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন—তোমাদের সকলের মধ্যে আছে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্রত্যাগে ফলেছে। তার বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে, তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ·········মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলা দেশের যুবকদের যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, ভুলকে নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে অনেক সময় বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়—সেখানে ঠিক ব্যক্তিগত প্রভাব নেই বটে কিন্তু মূল চিন্তার একটা ঐক্য পাওয়া যায়—একথা পূর্বেই বলেছি। রবীন্দ্র সাহিত্য মহাভারত বিশেষ—সেখানে ডুব দিলে ডুবুরী অনেক কিছু রত্নই সংগ্রহ করতে পারেন। নৈবেদ্য, খেয়া, গোরা, ঘরে বাইরে, মানবের ধর্মে রবীন্দ্রনাথ তার কবিমানসকে আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-চেতনায় বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতার দান অসীম। সাউথ সুবার্বাণ স্কুলের ঐ সভায় ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে—পতিত বঞ্চিত নিপীড়িতের জন্য বিবেকানন্দের যে আদর্শ তা অভ্রান্ত— সে আদর্শ আমাদের গ্রহণ করা উচিত (দেশ, ২৯শে ভাদ্র ১৩৬৯) রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার সাধনাকে বলেছেন সতীর তপস্যা—মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন তার জন্য তপস্যা

কোন মহাশ্বেতা কোন তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল
স্তব্ধ অচঞ্চল

রবীন্দ্রনাথের কথাতেই আমরা জানি যে নিবেদিতার কল্পনাকে নিয়েই ভেঙে চুরে গোরার উদ্ভব। কথিত আছে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন একটি পত্রে—"You asked me what Conection had the writing of Gora with sister Nivedta. She was our guest at Silaidaha and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of gora. She was quite angry at the idea of gora being rejected।" বিবেকানন্দের মত গোরা বলছে

আমার নব-দেবতা চাই—ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মূর্তি দেখতে, ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ; ধর্মে পূর্ণ। দেখি মূর্তিপূজা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মত বদলাচ্ছে—আকার জিনিষটিকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব আমার মনে এমন কুসংস্কার নেই। আকারকে গাল দিলেই কি সে ছোট হয়ে যায়—তাই রবীন্দ্রনাথের গোরা বললে—অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না, অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন—নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই—
তাই অপূর্ব ভাষায় কবি বললেন

—আপনি আমাকে সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দুমুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যার মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ নয়, যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন—যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই মনে করেন যে গোরায় নিবেদিতার মাধ্যমে রবীন্দ্র চেতনার উপর বিবেকানন্দের প্রভাব পড়েছে। রোঁমা রোলাও তাঁর পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের উপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেছেন। মণীষি রেঁালা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও কয়েকজন মণীষির কথা স্মরণ করেছেন —যেমন গান্ধীজী যাঁকে তিনি অভিহিত করেছেন the King of the masses বলে। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন the King of the thinkers আর রবীন্দ্রনাথকে the King of the poets বলে। গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দ নিজেরাই রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা বলে গেছেন। রেঁালা লিখেছেন—As for Tagore whose Goethe like genius stands at the junction of all the rivers of India, it is permissible to presume that in him are linked and harmonised too currents—of the Brahmasamaj, of the Maharshi and of the new Vedantism of Ram-Krishna-Vivekananda. rich in both, free in both, he has serenely wedded the East and the West in his own spirit. তিনি রেঁালাকে বলেছিলেন—So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life—we must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists এবং সেই জন্যই বিবেকানন্দ তথাকথিত স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা হাঁড়ীকুড়ির ধর্মের আচার বিচারের বিরুদ্ধে বললেও তিনি অনেককিছু নিয়মনীতিকে সহ্য করে গেছেন অকাতরে। বিবেকানন্দ বললেন—হে ভগবান, আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুবৎ হাড়ী ডোম, তোমার বাড়ীর চারিদিকে—তাহাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করিতেছ—খালি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। রবীন্দ্রনাথের—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ···অপমানে হতে হবে তাদের সমান' এই কবিতার সঙ্গে তুলনীয়।

দুজনেরই মধ্যে একটা ঐতিহাসিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজী বর্তমান ভারতে শূদ্রবিপ্লবের ইঙ্গিত দিতেছেন—বৈশ্যাধিকারের পর শূদ্রাধিকার। রবীন্দ্রনাথের রথের রশি, কালের যাত্রা, অচলায়তন প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—হে ভারত ভুলিওনা······ তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। তোমার সমাজ মহামায়ার ছায়া মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে পাচ্ছি—জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে, যে ভারতবর্ষ প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক তাহারই জয় হইবে। আমরা যাহারা ইংরাজী বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে মিলি মিলি যাওব—সাগর লহরী সমানা।

এককালে রবীন্দ্রনাথকে তপোবনের আদর্শ, ভারত চিন্তার অশোক অভয় মন্ত্র, প্রকৃত ব্রাহ্মণ গড়ে তোলার অভীপ্সা মাতিয়ে তুলেছিল। অবশ্য ধর্মমত ও চেতনায় প্রথমযুগে ব্যক্তিগত অনুভূতি, কবিদৃষ্টি, পিতার প্রভাব ও আদিব্রাহ্ম সমাজের সাধনপদ্ধতি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল—পরে কবির উদার মন বিশ্বজনীন্ ক্ষেত্রে মুক্তি নিয়েছিল এ কথাত স্বীকার্য। হিবার্ট লেকচারে তিনি স্পষ্ট করে বললেন—The solitory enjoyment of the Infinite in meditation no longer satisfied me

and the texts which I used for my silent worship, lost their insperation without my knowing it.

মানুষের ধর্মে তিনি সেই কথাই বললেন—দেবতাকে আবিষ্কার করলেন মানুষের মধ্যে—এ যেন বাউলের কথা

জীবে জীবে চাহিয়া দেখি সবই যে তার অবতার

ও তুই নূতন লীলা কি দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার

গীতাঞ্জলিতে প্রায় "রসে বশে" কবি-মূর্তি ফুটে উঠেছে।

মোরে করো সভা কবি
ধ্যান মৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী হে অবগুণ্ঠিতা
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী—

রবীন্দ্রনাথের শিব কল্পনাতেও বিবেকানন্দের প্রায় সমধর্মী তিনি। মহারুদ্র, মহাপাগল, মহা ভোলানাথ নটরাজ বারে বারে রবীন্দ্রচিত্তকে মথিত করেছে—

নৃত্য করো হে উন্মাদ নৃত্য কর

রবীন্দ্রনাথের শিব চেতনার শেষ স্ফুতি পাই আমরা "কবির দীক্ষায়" ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও দ্বারে দ্বারে—রব উঠল তার কণ্ঠে সে মুষ্টি ভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা—নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস, তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান। দুর্বল আত্মার তামসিক দানে দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জলে, আরো বহু দিক দিয়ে স্বামীজীর চেতনার সঙ্গে রবীন্দ্র চেতনার অভিব্যক্তির তুলনা করা যায়—যেমন দুজনে প্রাচ্য প্রতীচির দৃষ্টিভঙ্গী ও মিলনের দিক, তাদের চিন্তায় স্ত্রী-সমাজকে তারা কি ভাবে দেখেছেন যেমন স্বামীজী বললেন—The ideal woman. She is the wife in the west, the mother in the orient. Mother is the reprentative of God.

—খেতরীর রাজদরবারে নর্তকীর নৃত্য ও গান
প্রভু মোর অবগুণে চিত না ধরো
সমদরশী হই নাম তেহারো…

ও বিবেকানন্দের উপরে তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের—ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী চরণ পদ্মে নমস্কার—কবিতাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের মননেও ছিল বীর্য ও তেজ—কৃত্রিম শাসনে সত্যকে তিনি পেতে চাননি। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে দুজনের প্রতিই তার দেবরোষানল জলে উঠেছে আর—

যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য জ্বলি ওঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে (নৈবেদ্য)

কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয়না, শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু বললেও হয়না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বললেও হয়না—এও ছিল রবীন্দ্রনাথের এককালের উক্তি। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনায় অধ্যাত্ম-চিন্তায় সৌন্দর্য ও রস বোধ প্রধান। বিবেকানন্দের ভাবনায় বিজ্ঞানভিত্তিক অদ্বৈতবাদই প্রাধান্য লাভ করেছে, রামকৃষ্ণ ভাব সাধনাকে ভিত্তি করে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে ভাবে গদগদ বিশ্বাসী, শেষের জীবনে প্রায় agnostic প্রায় বিজ্ঞানভিত্তিক মানবতাবাদে পৌঁচেছেন। আবার রবীন্দ্র-নাথের কাছে শক্তির দুই রূপ—একটি অন্নপূর্ণা রূপ, একটি ভয়ংকরী কালী করালীর ছায়া—সৌম্যাতি সৌম্যা রুদ্রাতি-রুদ্রা—একটি পরিপূর্ণতার রূপ—একটি নিরাভরণতার। কোজাগরীর পূর্ণিমাতে তিনি মহালক্ষ্মী, দীপান্বিতার অমা-বস্যায় তিনি নগ্নিকা বসনহীনা মহাকালী। তাই সব মিলিয়েই তিনি মহেশ্বরী—একদিকে পাওয়া, একদিকে ছাড়া—চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে হচ্ছে 'হওয়া'। ভারত সাধনার মর্ম কথা সেইখানে তখনই অর্ধনারীশ্বর দেবতা মন্ত্র দেন—শিব শিব—শ্যামা নাচেন তাথৈতাথৈ—

ভালোই হয়েছে ঝঞ্চার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মিলন যজ্ঞে অগ্নি জ্বালায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব ॥
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
মেঘের সিংহ বাহনে
বজ্র শিখার দাহনে
সর্বসম্পদ খোয়ায়ে
তোমার চরণ ছোয়ায়ে

❀ অতীতের স্মৃতি ❀

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

১১

সেকালে দেশী-বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌখীন লোকজনেরা সকলেই যে উৎকট জুয়ার নেশা আর উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে দিন কাটাতেন, সে ধারণা ঠিক নয়। তবে কোম্পানীর আমলে, এদেশের আর বিদেশের লোকজন সবাই চাইতেন—ভালো-মন্দ যে কোনো উপায়েই হোক রাতারাতি অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে পরম সুখে-আরামে অবাধ-স্ফূর্ত্তিতে নবাবী-চালে রীতিমত ভোগ-বিলাস-আড়ম্বরে জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করতে। তাই তাঁরা সর্ব্বদাই সজাগ-দৃষ্টি রাখতেন—কোন সুযোগে আর কি কৌশলে অনায়াসে প্রচুর অর্থ-সম্পদ লাভ করতে পারবেন। কথায় বলে,—উদ্যোগী-পুরুষের ভাগ্যেই লক্ষ্মীলাভ ঘটে! এ কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গিয়েছিল সেকালের বহু ভাগ্যবানের বরাতে—এদেশে ইংরেজ-কোম্পানীর প্রবর্ত্তিত বিচিত্র-অভিনব 'লটারী' (Lottery) খেলার দৌলতে—বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে, ইংরেজের হাতে-গড়া কলিকাতা শহরেই সর্ব্বপ্রথম এই 'লটারী' খেলার প্রচলন হয়। ভারতে 'লটারী' খেলার সূত্রপাত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতকের প্রায় শেষাশেষি আমলে, কোম্পানীর ইংরেজ-কর্ম্মচারীদের আগ্রহে সুবন্দোবস্তে এদেশে এই 'লটারী' খেলার অভিনব-প্রথা প্রবর্ত্তন করার আসল উদ্দেশ্য ছিল—কোম্পানীর অনুন্নত বাণিজ্য-বন্দর ও উপনিবেশ-রাজধানী কলিকাতা শহরের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন, আর এদেশের বাজারে বিলাতের বিবিধ রকম পণ্য-পসরা বিক্রীর সুব্যবস্থা করা। ইতিহাসের পাতায় নজীর পাওয়া যায়—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-দশকে, অর্থাৎ ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট, রবিবার, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় বিলাতী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠির বিচক্ষণ-অধ্যক্ষ জব চার্ণক সাহেব গঙ্গা-তীরের সুতানুটি, ডিহি কলিকাতা আর গোবিন্দপুর—তিনটি নামে নগণ্য গ্রাম ইজারা নিয়ে ইংরেজের উপনিবেশ-রাজধানী কলিকাতা শহরের ভিত্তি-স্থাপন করেছিলেন। আদি-যুগে এ সব অঞ্চল ছিল নিতান্তই অনুন্নত-অস্বাস্থ্যকর নিরালা-জায়গা…জলা, জঙ্গল, খাল-বিল, পুকুর-খানা-ডোবা আর বুনো-জানোয়ার, বিষাক্ত-সাপখোপ, ঠ্যাঙাড়ে ও খুনী-ডাকাতের আস্তানা! মনুষ্যবাসের অনুপযোগী স্যাঁতসেতে এই জংলী-গ্রামাঞ্চলে তখন বাস করতো সামান্য কয়েকঘর জেলে, চাষী আর জোলা-তাঁতী…পরবর্ত্তীকালে ইংরেজ-বণিকদের দৌলতে সেকালের নগণ্য এই জংলী-গ্রামাঞ্চল ক্রমশঃ কি করে সুসমৃদ্ধ-মহানগরী আর পৃথিবীর অন্যতম-প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র হয়ে উঠলো, সে কাহিনী আজ আর কারো অজানা নেই! তবে গোড়ার দিকে অনুন্নত এই পল্লী-অঞ্চলে লোক-বসতি ছিল নিতান্তই অল্প…পরে ক্রমশঃ বিলাতী কোম্পানীর সুব্যবস্থায় বিশিষ্ট বন্দর ও উপনিবেশ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই কলিকাতার লোক-সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে যাবার ফলে, সেকালের নিরালা এই জংলী এলাকা উত্তরোত্তর সুউন্নত-শহরের রূপধারণ করে। ইংরেজের হাতে-গড়া কলিকাতা শহরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয়

অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে, কোম্পানীর তৎকালীন-কর্মকর্তাদের সুব্যবস্থায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সৃষ্টি হলো—অভিনব একটি 'লটারী-কমিটি' (Lottery Committee)। নব-প্রবর্তিত এই উৎসাহী 'কমিটির' সদস্যদের প্রচেষ্টায়, 'লটারী-খেলা' থেকে সংগৃহীত অর্থানুকূল্যেই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে শহর কলিকাতার নানা অঞ্চলে বহু বড় বড় ইমারত-অট্টালিকা, ভালো-ভালো পথ-ঘাট, সুদৃশ্য বাগ-বাগিচা-ময়দান গড়ে তোলা আর পানীয়-জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং নৌকা-চলা-চলের খাল, যানবাহন-যাতায়াতের পুল, রাস্তার ধারে বাতি ও গাছপালার সারি সাজানো, নালা-নর্দ্দমা রচনা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত হয়েছিল। সেকালের এই 'লটারী-খেলার' টাকা দিয়েই ১৮০৫-৩৬ সালের মধ্যে কমিটির সোৎসাহী-সদস্যেরা গড়ে তুলেছিলেন—কলিকাতার সুবিশাল 'টাউন হল' (Town Hall), 'এক্সচেঞ্জ-ভবন' (Exchange Buildings) ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার প্রভৃতির বিরাট জলাশয় (Tank), বেলিয়াঘাটার খাল, এবং শহরের ষ্ট্রাণ্ড রোড, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট প্রভৃতি সুদীর্ঘ পাকা-সড়ক। এমনিভাবে নিত্য-নিয়মিতঃ নতুন-নতুন লটারীর আয়োজন করে লক্ষ-লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে সেকালে শুধু যে শহরের উন্নতিকল্পে নানা রকম জনহিতকর কাজ করা হতো তাই নয়, কলিকাতার দেশী-বিলাতী সমাজের অভিজাত-বাসিন্দাদের অনেকেই ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় রাতারাতি কুবেরের সম্পদের অধিকারীও হয়ে উঠতেন—এই সব 'লটারী খেলার' মোটা-অঙ্কের পুরস্কারের দৌলতে। তাই তখনকার আমলে এদেশী ও বিদেশী বিত্তশালী-বিলাসী-সৌখিন ভাগ্যান্বেষীদের অনেকেরই প্রবল আগ্রহ-উৎসাহ ছিল এই সব 'লটারীর' টিকিট কেনবার দিকে…এমন কি পরম আস্তিক ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকেরাও সে-যুগে আপত্তি তোলা তো দূরের কথা, এ খেলায় যোগ দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। জনসাধারণের এমন বিচিত্র-অনুরাগের ফলে, সেকালের প্রত্যেকটি 'লটারী-খেলাতেই' প্রচুর টাকার টিকিট বিক্রয় হতো…পুরস্কারের অঙ্কও ছিল রীতিমত ভারী এবং কম-বেশী নানা ধরণের! প্রাচীন সংবাদ-পত্রে সেকালের এই অভিনব 'লটারী-খেলার' যে সব বিবরণ পাওয়া যায়, নীচে তাঁরই কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নমুনা সঙ্কলন করে দেওয়া হলো।

* * * *
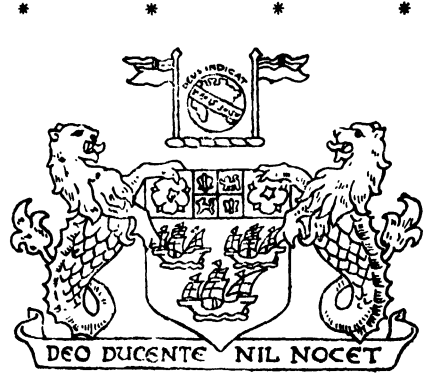
বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতীক-চিহ্ন
(প্রাচীন প্রতিলিপি হইতে)

লটারী-খেলা

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৩ই মে, ১৭৮৪)

The demand for tickets in the Calcutta Lottery is astonishingly great. A society of Gentlemen have subscribed for 500 tickets. The wheels are making by Nicholls and Howat, upon the same constrnction as those used for the State lotteries in England.

* * *

কোম্পানীর আমলে, উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই সেকালের 'লটারী-কমিটির, উদ্যোগে কলিকাতা শহরের দ্রুত উন্নতি ঘটে। ১৮০৩ সালে আদি 'লটারী-কমিটির' সংস্কার-সাধন করে নতুন নামকরণ হয়—'টাউন ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি'। পরে ১৮১৪ সালে সে 'কমিটিরও' কার্য্য-ক্ষমতা সম্প্রসারণ করে, নতুন নাম দেওয়া হলো—'লটারী কমিশনার্স'। ১৮১৭ সালের নব-রূপান্তরিত 'লটারী-কমিটির, উপর কলিকাতা শহরের পথ-ঘাট, নালা-নর্দ্দমা (Drains) তৈরী, রাস্তার আলোর সুব্যবস্থা, বেলঘরিয়া খাল কাটার বন্দোবস্ত এবং উন্নত-পরিকল্পনায় 'টাউন হল' প্রভৃতি বিবিধ বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণের দায়ীত্বভার দেওয়া

হয়। নগরোন্নতিকল্পে এই সব জনহিতকর-কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল সেকালের অভিনব 'লটারী-খেলার, টিকিট বিক্রী করে।

*   *   *

লটারীর দৌলতে

(সমাচার দর্পণ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২২)

কলিকাতা ২৬ লটারী ॥—৮০৯ নম্বর টিকিটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুচুড়ার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুক্ত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে এ টাকা তাহারা তুল্যাংশক্রমে লইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য২ যে২ টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।···

*   *   *

(সমাচার দর্পণ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২২)

ইস্তাহার।—মোকাম কলিকাতা ২৭ বারের লটারি যে হইবেক তাহাতে যে লাভ হইবেক তদ্দ্বারা কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয় এমত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। লাটরিতে ৬০০০ ছয় হাজার টিকীট হইবেক ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকীট মাল তদ্ভিন্ন ৪৫৪৩ চারি হাজার পাঁচ শত তেতাল্লিশ টিকীট ফরসা। এই টিকীট কলিকাতার টৌনহালে ১৫ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর বেলার সময়ে নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার ন্যূন ডাকিলে পাইবেক না ইহার অধিক যিনি ডাকিবেন তিনি পাইবেন।···

*   *   *

(সমাচার দর্পণ, ১০ই মে, ১৮২৩)

কলিকাতার শোভা ॥—এই মহানগরের সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে অনেক প্রশস্ত রাজপথ ও নরদামা করা গিয়াছে এবং শহরনিবাসি প্রাচীন লোকেরা বোধ করিতে পারেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতার সুগঠন ও শোভাকত হইয়াছে। সংপ্রতি ভাগীরথী তীরে যে নূতন প্রশস্ত রাজপথ ও পোস্তা হইয়াছে সে পথ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাত প্রশস্ত ও ঐ রাস্তার পার্শ্বে পাকা নরদমা হইতেছে তাহা দিয়া গঙ্গার জল কল-দ্বারা উঠিয়া সমস্ত শহরে যাইবে। এবং ঐ পোস্তার সর্ব্বত্র ঘাসের চাপড়াদ্বারা অতিসুশোভিত হইতেছে তাহাতে ঐ সকল পোস্তা জলপ্রবাহেতে ভগ্ন হইবে না। এই কর্ম্ম এইক্ষণে অতিশীঘ্ররূপে হইবে এমত বোধ হয়। অল্প কালেতে এই সকল সংপূর্ণ হইলে পর ভারতবর্ষের মধ্যে এ এক অপূর্ব্ব স্থান হইবেক।

*   *   *   *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১লা মার্চ্চ, ১৮২৫)

···The Spaker [২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা শহরে হিন্দু কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনানুষ্ঠানে তৎকালীন 'ফ্রী-মেশন লজের' বঙ্গদেশীয়-শাখার প্রাদেশিক-সর্ব্বাধ্যক্ষ (Provincial Grand Master of the Fraternity of Free Masons in Bengal) ও কোম্পানীর বিশিষ্ট-কর্ম্মচারী জন প্যাস্কাল লার্কিন্স (John Pascal Larkins) সাহেব—যাঁর স্মৃতি-কল্পে ইংরেজ আমলে কলিকাতার একটি পথের নামকরণ হয়েছে—লার্কিন্স লেন (Larkins Lane) then reverted to the exertions of the Lottery Committee, and to the paternal feeling of the Goverment who had devoted such large sums to the improvement of the City, independent of their arising from the Lottery, some of the members of that Committee were present, and he beg to return his individual thanks to them for their able conduct in a very unthankful office, and one of them in particular who was present (সেকালের সুপ্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রাজপুরুষ হ্যারিংটন সাহেব) he remarked was peculiarly entitled to the thanks of the Community.

*   *   *

সেকালে 'লটারী-খেলার' টিকিটের দাম ছিল রীতিমত চড়া···কাজেই বিত্তশালী-ব্যক্তিরা ছাড়া দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত জনসাধারণের পক্ষে এত দামী টিকিট কেনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। তবে সেকালের এই

'লটারী খেলায়'পুরস্কারের অঙ্ক ছিল মোটা এবং সংখ্যাতেও অনেকগুলি। তাই দুর্মূল্য হলেও, তখনকার আমলের ভাগ্যান্বেষী-পৃষ্টপোষকেরা অনেকেই লোভে পড়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে এই সব 'লটারী-খেলার' টিকিট কিনতে পশ্চাদপদ হতেন না। অর্থাৎ, বরাত-গুণে যদি মোটা-অঙ্কের কোনো পুরস্কার কপালে জুটে যায় তো—সকল অভাব-কষ্টের অবসান ঘটবে—এই ছিল তাঁদের মনের একমাত্র আশা।

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১১ই মার্চ, ১৮২৪)

Thirty-first Lottery
for the improvement
of the
City of Calcutta

Established by Government and conducted by the Superintendent under the immediate directions of the Lottery Committee

Capital Prize 1,00,000 Sa, Rs.

Scheme
of the
31st Calcutta Lottery

1 Prize of	...	...	1,00,000,
1 Ditto of	...	...	60,000
1 Ditto of	...	...	40,000
1 Ditto of	...	...	30,000
1 Ditto of	...	...	20,000
6 Ditto of 10,000 each	..	...	60,000
10 Ditto of 5,000 each	...	...	50,000
15 Ditto of 2,000 each	...	...	30,000
35 Ditto of 1,000 each	...	...	35,000
50 Ditto of 500 each	...	...	25,000
1200 Ditto of 125 each	...	...	1,50, 000
1321 Prizes			
4679 Blanks,			

6000 Tickets at 100 Rs, each, 6, 00,000

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১লা এপ্রিল, ১৮২৪)

Fort William
LOTTERY OFFICE
The 29th March, 1824

Notice is hereby, given, that the Tickets in the Thirty-First Lottery, were this day put up for sale by Public Auction, in the Town Hall, and purchased by Mr. John Vallente for Sicca Rupees Six Lacks and Sixty Thousand,

F. NEPEAN
Secretary to the Lottery Committee

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১লা জানুয়ারী, ১৮২৫)

কলিকাতা লাটরি খেলা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হইয়া লাটরি খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ সালের প্রথম লাটরি গভর্ণমেণ্ট-দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাপার লাটরি কমিটীর আজ্ঞানুসারে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট করিলেন তাহার ধারা গত বারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গালবেঙ্কে বিক্রয় হইবেক প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ এক শত টাকা।

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮)

Public Sale
of
Lottery Tickets

SUCH TICKETS in the FIRST CALCUTTA LOTTERY of 1823, as may remain unsold and undrawn after the Eleventh Day's Drawing, will be put up for Public Sale, by the Superintendent, at the Town Hall, immediately before the commencement of the Twelfth or Last Day's Drawing, which has been appointed to take place on Thursday, the 21st Instant.

The Sale will commence precisely at 10 o'clock a. m. and the Tickets will be put up in Lots of One Ticket each, at an upset price to be them declared and regulated by the value of a Ticket according to the Richness of the Weels at the time of Sale,

The Tickets will be sold *bona fide* to the highest bidder beyond the upset price; the amount of the purchase money to be immediately paid down in Bank Notes or Cash, or in default of payment, the sale of such Lot will be null and void, and the Ticket again put up for sale.

By Order of the Lottery Committee
G. A, BUSHBY
Supt. of Lotteries.
Calcutta, 15th February, 1828.

*   *   *

(ক্যালকাটা গেজেট, ২৭শে অক্টোবর, ১৮২৮)

ALL PRIZES !!!

Lottery on 700 Tickets, in the First Calcutta Lottery of 1829, to be divided into 390 Chances, at 200 Rupees each.

SCHEME

1 Prize of	...	100 whole Tickets.
1 Ditto	... ...	50 ditto.
2 Ditto of 20 each	... ...	40 ditto.
3 Ditto of 10 each	... ...	30 ditto.
3 Ditto of 8 each	... ...	24 ditto.
5 Ditto of 5 each	... ...	25 ditto.
6 Ditto of 4 each	... ...	24 ditto.
20 Ditto of 2 each	... ...	40 ditto.
9 Ditto of 3 each	... ...	27 ditto.
340 Ditto of 1 each	... ...	340 ditto.
390 Prizes		700 Whole Tickets

Application for Chance in the above will be received at the Bank of Hindoostan, by the undersigned—and the Drawing will take place on the 10th of January next,

Calcutta, 20th October, 1828

CONNOYLOLL BURRAL.

*   *   *
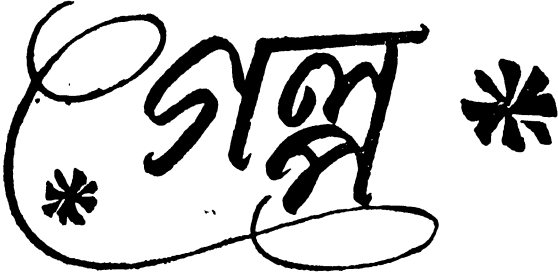
আমার বিচার লহ তুমি আপন করে

আভা পাকড়াশী

এলাহাবাদের হাইকোর্ট। জাষ্টিস মহেন্দ্রজিৎ সিংজীর এজলাশের কেশ। কত দূরদূরান্তর থেকেও বড় বড় লোকেরা এসেছেন এই মামলার রহস্য শুনতে। দুপক্ষের অ্যাডভোকেটও স্বনামধন্য। সুতরাং কোর্টঘর লোকে লোকারণ্য, কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ। সকলেই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছেন সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে! কারণ আজই প্রথম মিসেস লরেন্স এর সাক্ষী দেবার দিন। কে ওই মিসেস লরেন্স? কেউ বলছে বার্মিজ মেয়ে, আবার কেউ বলছে বাঙ্গালী। কিন্তু এত লোক থাকতে এমন সুন্দর মেয়ে এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটাকে বিয়ে করতে গেল কেন? হলেই বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—লোকটা কিন্তু সত্যই সুপুরুষ। এমন লোক যে মানুষ খুন করেছে এ সত্যই অবিশ্বাস্য। দেখা যাক আজ ওর স্ত্রী কি বলে? ঐ যে আসামী পক্ষের উকিল শর্মাজী, প্রথমে জেরা করছেন। এবার জজ সাহেবের হাতুড়ির শব্দ ওঠে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

—আপনার নাম মিনতি দেবী?

—হ্যাঁ।

আপনি এই আর্মি-অফিসর মিঃ লরেন্স এর বিবাহিতা স্ত্রী?

হ্যাঁ।

কবে কোথায় আপনাদের বিবাহ হয়?

আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে এই কলকাতাতেই রেজেষ্ট্রি করে আমাদের বিয়ে হয়।

আচ্ছা আপনার স্বামী কি ঐ বিধবা মহিলার বাড়ী যাতায়াত করতেন?

হ্যাঁ করতেন।

কি জন্য যেতেন?

ভদ্রমহিলায় নানা রকম জিনিষ পত্র কেনার বাতিক ছিল। তাই আমার স্বামী তাঁর যেগুলি অদরকারি—সেই সব আর্মি goods তাঁকে দেখাতে যেতেন। যদি তিনি কিনে নেন তাই।

আচ্ছা আপনার স্বামী যে বলেছেন তিনি শনিবার সন্ধ্যে সাতটার সময় বাড়ী ফিরে এসেছেন একথা নিশ্চয়ই সত্য?

এবার ধীর গম্ভীর স্বরে মিনতি বলে, 'দেখুন উনি আমার স্বামী হতে পারেন, কিন্তু উনি যে অন্যায়টা করেছেন তা আমি লুকোতে চাইনা। কারণ দোষীর শাস্তি হওয়া উচিত। না, সন্ধ্যে সাতটায় তিনি ফেরেন নি। সেদিন তিনি রাত দশটায় বাড়ী এসেছিলেন।

ওদিকে আসামী মিঃ লরেন্স মুখ চোখ লাল করে চিৎকার করে বলে ওঠে—এ তুমি কি বলছ মিনি? সেদিন আমি সাতটার সময় বাড়ী ফিরে সারা সন্ধ্যে তোমার সঙ্গে তাস খেলে কাটাইনি? please মিনি be kind of me? কেন তুমি এরকম পাগলামো করছ?

মিনতির গলা যেন কান্নায় বুজে আসে। তবু বলে, হ্যাঁ রাত দশটায় বাড়ী ফিরেছিলে তুমি। আমি তোমার জামার হাতা থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে দিয়েছিলাম। তুমি বার বার হাত ধুয়েছিলে। কেন? কেন তুমি খুন করলে ভদ্রমহিলাকে? তিনি তোমাকে কত বিশ্বাস করতেন, কত স্নেহ করতেন, তবু কিনা তুমি, ছিঃ ছিঃ।

শর্মাজী তো হতভম্ব। কি আশ্চর্য্য! এখন কি করে বাঁচাবেন তিনি লরেন্সকে? তবে না লরেন্স বলেছিলো আমার স্ত্রী আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সে আমার বিরুদ্ধে কখনই বলবেনা। আর এখন ওর স্ত্রী যে কিছু না জিজ্ঞেস

করতেই গড় গড় করে সব সত্য কথাগুলো এজলাশের বলে দিল, এখন উপায় ?

ওপক্ষের উকিল ভাটিয়া সাহেব। বিধবার কন্যার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। খুব উল্লসিত। জেরা না করতেই যে আসামীর স্ত্রী এমনি করে সব বলে দিয়ে তাঁর সুবিধে করে দেবে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

সেদিনকার মত আদালত ভাঙ্গলে। রাত এগারটা নাগাদ শর্মাজী একটা ফোন পেলেন। ফোন করছেন একটি মহিলা। কথা বলছেন বার্মিজ মেশানো ইংরেজীতে।

হ্যালো আপনি কে ?

—আপনি আমাকে চিনবেন না। তবু দয়া করে যদি আপনি একবার এক্ষুণি এলাহাবাদ ষ্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমার সঙ্গে দেখা করেন তাহলে আপনারই উপকার হবে।

মানে ?

মানে আপনি আপনার ক্লায়েণ্ট মিঃ লরেন্সকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পারবেন।

—সেকি ?

হ্যাঁ এমন প্রমাণ আমার হাতে আছে—যা পেলে ওতো বাঁচবেই, আপনার নামেও জয় জয় পড়ে যাবে।

কিন্তু আপনি কে ?

ঐটেই বলবনা। পরিচয় জানতে চাইবেন না। তবে এইটুকু বলব যে—আমি মিনতি মানে মশায়ের যম।

আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি !

অনেক ধন্যবাদ। শীঘ্র আসুন।

শর্মাজীর বোন কান্তা ছিল পাশেই দাঁড়িয়ে। কলেজ গার্ল। থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। এই সব মামলা মোকর্দ্দমার ব্যাপারে খুব 'ইণ্টারেষ্টেড্'। শ্যাম্পু করা চুলে বোফা-ষ্টাইল, আর চোস্ত শালোয়ার কামিজ পরা। ভাইয়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, ভাইসাব কে এই মেয়েটা ?

শর্মাজী বলেন, তাকি আমিই জানি বেবি ? যাই দেখে আসি রহস্যময়ীকে।

এলাহবাদ ষ্টেশনের চারনম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই একটি বার্মিজ মেয়ে এসে শর্মাজীর সামনে দাঁড়ায়। বলে, আপনি নিশ্চয় মিঃ শর্মা, অ্যাডভোকেট ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা এদিকে আসুন। এ বুক-ষ্টলটার কাছে, ওখানটা একটু নিরিবিলি আছে।

আপনি যে ফোনে বললেন, আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে—যা পেলে লরেন্সকে বাঁচান যায় ?

এবার মেয়েটি কেমন যেন ফিক্‌ফিক করে হেসে ওঠে। আর শর্মাজীর খুব কাছে সরে এসে চুপি চুপি বলতে থাকে, আছে সেই প্রমাণ আছে। তখন আর এ মিনতিকে ধর্ম্মপরায়না, নেহাতই নিরীহ মেয়ে বলে হবে না—তখন ওর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। বোঝা যাবে ও কতবড় ডাইনী। আবার ফিকফিক্ করে হাসে। শর্মাজীর কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হয় মেয়েটিকে। ওর মুখের কড়া চুরোটের সঙ্গে চন্দনের গুঁড়োর গন্ধ মিশেছে। আবার কথা বলার সময় সব ছাপিয়ে বার্মিজদের প্রিয় খাবার নাপ্পির উৎকট গন্ধ ছাড়ছে। পাতলা এঙ্গি আর লুঙ্গির আড়ালে মেয়েটির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহের উৎকট ইসারা। মনে যেন কেমন সন্দেহ জাগায় শর্মাজীর। উনি আবার একই প্রশ্ন করেন।

Who are you ? কে আপনি ?

এবার মেয়েটি উত্তেজিত স্বরে বলতে থাকে—জানেন ঐ মিনি কি কম শয়তানী ? ঐ লরেন্স আমাকে ভালবাসত। রোজ রাত্রে আমার ঘরে আসত, তা ওর সহ্য হোল না। তাকে কেড়ে নিল। বিয়ে করল। কিন্তু ও ওকে মোটেই ভালবাসে না। নাহলে কোন ধর্ম্মপত্নী কি তার স্বামীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেয় ? আমরা না হয় বাজারের মেয়েমানুষ, আমাদের কথাই ছেড়ে দিন। এখন আবার ঐ মঙমঙএর পেছনে পড়েছে। ঐ ছেলেটাকে আমি রেখেছি। ইদানিং আমাকে সে ভালও বাসে, এখন আবার তাকে হাত করার চেষ্টা ? জানি ওরা বর্মায় পাশাপাশি বাড়ীতে থাকত। ছোট্ট থেকে আলাপ পরিচয় ছিল। তা এখন লরেন্সকে যখন বিয়ে করেছিস তাকে নিয়েই থাক না, তা নয়। নিত্য নতুন দোসর চাই। এখন ঐ মঙমঙকে চিঠি লিখেছে, "আর কদিন, লরেন্সএর তো ফাঁসি হবেই। আমি যা বয়ান দিয়েছি ওকে আর বাঁচতে হচ্ছে না। তারপর লরেন্সএর টাকা নিয়ে আমি বর্মা যাচ্ছি, তোমার কাছে।

ততদিন তুমি থাক ত ঐ ডাইনিটার কাছে। তারপর আমরা সুখে ঘর বাঁধব।" এবার বুঝুক সবাই কে ডাইনী, আমি, না ঐ শয়তানী মিনি। ঘেন্নায় একদলা থুতু ফেলে প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দেয় একেবারে শর্মাজীর চোখের কাছে।

দেখুন, এই দেখুন চিঠি—ওর লেখা, ঐ মিনির নিজের হাতের লেখা। ওর প্যাডের চিঠির কাগজ। এবার ওটা যে ওরই হাতের লেখা সেটা প্রমাণ করার ভার আপনার।

শর্মাজী বলেন, সবই তো বুঝলাম কিন্তু ওতে তোমার কিসের স্বার্থ? তুমি তো লরেন্সকে ভালবাস না?

নাঃ বাসি না। তবু আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে আমার অনেক উপকার করেছে। এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে মেয়েটি। কেন যেন তার এই কান্নাটা শর্মাজীর অস্বাভাবিক মনে হয় না।

একটু সুস্থ হয়ে এবার মেয়েটি বলে, আমি বড় Needy, এই খবর Paperএ পড়ে বার্মা থেকে আসতে আমার অনেক খরচ হয়ে গেছে। যদি তুমি আমাকে কিছু help কর। সত্যি বলছি আমি তোমাকে ব্ল্যাক-মেলিং করিনি। কালই তুমি এর প্রমাণ পাবে কোর্টে। তুমি শুধু মিনিকে জিজ্ঞেস কোরো সে কি রকম প্যাড ব্যবহার করে? শর্মাজী পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের কোরে হাতে দিতেই, মেয়েটি তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে যাবার দরজার দিকে হাঁটতে থাকে।

পরদিন আবার এজলাশ বসেছে। কোর্ট ঘর লোকে লোকারণ্য। মিসেস লরেন্স মানে মিনতি করুণ মুখে একখানি কালো শাড়ী পরে একপাশে বসে রয়েছে। সকলেরই দৃষ্টি এক একবার ঘুরে ফিরে তার ব্যথাভরা বিষাদ-ম্লান মুখখানি লেহন করছে। মিনতি শুধু ভাবছে—এ সে কি করতে চলেছে? ঐ অপরাধ-প্রবণ লরেন্সকে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাইয়ে দিলে আবার কি সে অপরাধ করবে না? কিন্তু ওযে একদিন ওর কতবড় উপকার করেছিল সে কথা ভুলতে পারে না মিনতি। একবার তাকিয়ে দেখে আসামীর কাঠগড়ায়। কদিনেই শুকিয়ে উঠেছে লরেন্সের অমন সুন্দর মুখখানা। চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে। ভয় পেয়েছে খুব। ভারী মায়া হয় ওর। আহা ওর যে সে ছাড়া আর কেউ নেই। নাঃ বাঁচাবে ওকে, যেমন করে হোক বাঁচাবে।

মনে পড়ে ওর সেই দুঃখের দিনগুলো। যখন বার্মাতে জাপানি শত্রু ঢুকে পড়ল। সেই যে রাত্রে তারা ওর বাবাকে খুন করে মাকে ওপরের ছাত থেকে ফেলে দিল। উঃ বীভৎস কাণ্ড। সেই যখন ও ফিরছিল কলেজ থেকে, তখন কতকগুলো সোলজার নেকড়ের মত ঘিরে ধরেছিল তাকে। ঐ লরেন্সই তখন রক্ষা করেছিল ওকে। বাড়ী এসে দেখল—বাড়ী ঘর সৈন্যে ভরে গেছে. জিনিষপত্র ভাঙ্গা তচনচ, বাবা, মা, উঃ ভাবতে পারছে না আর সেই বীভৎস দৃশ্য। তখন ঐ লরেন্স তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে। ক্ষুধার অন্ন দিয়েছে। এখন তো সে তার কিছুটা প্রতিদান দেবে? ও তো জানতোই লরেন্স জুয়াড়ি, জালিয়াৎ। ঐ ভদ্রমহিলার চেক জাল করেই তো অত টাকার সোনা কিনেছিল। আর তিনি ধরে ফেলতেই তো খুন করল তাঁকে। বেশীর ভাগ সময় বাধ্য হয়েই তাকে ওর কুকাজের সহায়তা করতে হয়। অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্য্যন্ত শোধরাতে পারল না লোকটাকে। এদিকে শিশুর মত সরল। তাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না। সব কথা খুলে তাকে বলে। এইটুকু বিশ্বাস আর পরস্পরের আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিংই এখন তাদের মিলিত জীবনের একমাত্র পাথেয়।

শর্মাজী এবার ডাক দিলেন তাকে। গম্ভীর ভাবে ধীর পায় উঠে দাঁড়ালো সে। অতি কষ্টে যেন এগিয়ে গেল witness boxএর দিকে! তার শরীরের অবস্থা দেখে একটা চেয়ার তাকে দেওয়া হল বসতে।

ওদিকে লোকেদের মধ্যে গভীর গুঞ্জন ধ্বনি উঠেছে। একদল মিনতির সৎসাহসের প্রশংসা করছে, আর একদল ওকে বলছে পাষাণী। তার মধ্যে আছে শর্মাজীর বোন। সে আজ কলেজ কামাই করে এসেছে কোর্টের বিচার দেখতে। বিশেষ করে তার আকর্ষণের বস্তু হল ঐ আসামী। কি সুন্দর চেহারা। যেন গ্রীক-দেবতা অ্যাপলোর মত দেখতে। ও কখনই খুন করেনি। করতেই পারেনা। কাল তো ও দেখা করেছিল লোকটির সঙ্গে। সেলএ গিয়ে কি সুন্দর ভদ্র আচার ব্যবহার। লোকটি

ওকে বলেছিল, এবার কোন মতে ছাড়া পেলে আর এদেশে থাকব না। নিজের দেশে চলে যাব। সেখানে গিয়ে সৎভাবে জীবন কাটাব। আর তার আগে ঐ মিনিকে আমার জীবন থেকে সরাব। ঐ আমাকে যত কুকাজের প্রেরণা দেয়।

এবার বিচার শুরু হল।

শর্মাজী—আপনি বলেছেন আপনার স্বামী সেদিন রাত দশটায় ফিরেছিলেন। আর ওদিকে সেই ভদ্রমহিলাও খুন হন রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। এর মানে আপনি বলতে চান আপনার স্বামীই খুনী। বেদনায় গলা বুজে আসে মিনির, তবু বলে, 'হ্যাঁ'।

এবার শর্মাজী তাঁর তুণে রাখা শ্রেষ্ঠ শরটি নিক্ষেপ করেন। বলেন, আচ্ছা আপনি আপনার এই সঙ্কটের অবস্থা কাউকে জানান নি, কোন চিঠি লেখেননি এর মধ্যে?

মুখ নীচু করে ধরা গলায় মিনি বলে, হ্যাঁ লিখেছি।

কাকে লিখেছেন?

বর্মায় আমার,—আমার ভাইকে।

আচ্ছা কি রকম প্যাডে আপনি চিঠি লেখেন? এই, এই রকম সাদা বড় প্যাডে?

না। আমার প্যাডের কাগজ ওরকম নয়।

তবে কি রকম?

গাঢ় নীল রংএর ছোট ছোট কাগজ।

আচ্ছা আপনি আপনার ভাইকে শেষ যে চিঠি লিখেছেন, তার কয়েকটা লাইন কি মনে করতে পারবেন? যদি পারেন তো একটা কাগজে একটু লিখে দিন তো। আর নীচে নিজের নাম সই করুন।

কম্পিত হস্তে লেখে মিনি।

তার অবস্থা দেখে কেউবা সহানুভূতি প্রকাশ করছে, আর কেউবা বলছে ঢং।

এইবার সেই লেখাটি হাতে নিয়ে শর্মাজী জজ সাহেবের সামনে তুলে ধরেন, আর নিজের কাগজ পত্রের নীচে লুকিয়ে রাখা সেই নীল প্যাডের কাগজে লেখা চিঠিগুলি বার করে মিনির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা আপনার প্যাডের কাগজ কি এই রকম? আর এই চিঠি কি আপনার লেখা?

মিনির মুখ যেন কাগজের মত সাদা হয়ে যায়; ঐ চিঠিগুলি দেখে। সে নিরুত্তর থাকে।

এবার প্রায় ধমকের সুরে শর্মাজী বলেন, এই চিঠিগুলি যে আপনার লেখা, অস্বীকার করতে পারেন আপনি? আর এই বুঝি ভাইকে লেখা চিঠির ভাষা? সবগুলি নয়, আমি মাত্র শেষ চিঠিখানিই পড়ছি—

> Oh my dear, Oh my love
> আর তোমাকে প্রতীক্ষা করে কষ্ট পেতে হবে না। আর একদিন মাত্র আমার বহেস্ নিতে বাকি আছে। যা বহেস দিয়েছি তাতে নির্ঘাৎ লরেন্সের ফাঁসি হবে। তখন এই বিপুল সম্পদ, টাকা-কড়ি সব কিছু নিয়ে আমি তোমার কাছেই যাব প্রিয়তম। অল্প দিন আর ধৈর্য্য ধর।
>
> ইতি তোমারই মিনি।
> (মাশোয়ে)

দেখুন ধর্ম্মাবতার এই ভদ্রমহিলাকে যে কি আখ্যা দেওয়া যায়, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা। হুজুর আপনিই এর বিচার করুন। যে নারী তার নির্দোষ স্বামীকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে দিয়ে তারই টাকা নিয়ে অন্য প্রেমিকের মনোরঞ্জন করতে চায় তাকে যে কি ধরণের মেয়েছেলে বলে তা আমার ভাষায় আসছে না।

সমস্ত এজলাশের লোকেরা চিৎকার করছে shame shame, ও একটা witch ডাইনী। বেওয়াফা আওরৎ ওকেই hang করা উচিত। সাজা দেনি চাইয়ে। জজসাহেব আবার হাতুড়ি পিটে ঠাণ্ডা করেন সকলকে।

ওদিকে মিনি তখন দু হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে নিঃঝুম হয়ে বসে আছে।

বেকসুর খালাস পেলো লরেন্স।

মিঃ শর্মার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, কি আমি বলেছিলাম না—যে আমার স্ত্রী খুব ভাল। ওর জন্যই তো বেঁচে গেলাম আজ ফাঁসির দড়ি থেকে, বলে মিনিকে কাছে টেনে নেয়। মিনিও ওর বুকে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে থাকে। ওর সব বেদনা, সব অপমান যেন ধুয়ে যাচ্ছে। এদিকে শর্মাজী তো হতভম্ব, কি ব্যাপার কিছুই

বুঝতে পারছেন না! তাঁর অবস্থা দেখে মিমি কান্না সামলিয়ে হাসতে হাসতে তাঁর কাছে এসে বার্মিজ টোনে ইংরেজীতে বলে—I am very needy, please help me. এবার ঠিক সেই রাত্রের মত ফিক্‌ফিক করে হাসে। আর সেই একশো টাকার নোটটা বাড়িয়ে ধরে মিঃ শর্মার দিকে! এবার আর তাঁর কিছুই বুঝতে বাকি থাকেনা।

এমন সময় কান্তা আসে ছুটতে ছুটতে। এসেই হাত বাড়িয়ে দেয় লরেন্সের দিকে। বলে—এসো তোমার পরিচয় দিই। ভাইকে মানে মিঃ শর্মাকে বলে, ভাইয়া আমি একেই আমার সোহর করতে চাই। আর এও তাতে রাজি।

মিঃ শর্মার আশ্চর্য হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল। তিনি কিছু বলার আগেই লরেন্স বলে মিনতিকে।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মিনি, আমি তোমাকে একবার মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আজ তুমি তার প্রতিদান দিয়েছ। এবার আমি ভদ্রজীবন যাপন করতে চাই, ভাল হতে চাই। ঐ পরিবেশে আর ফিরে যাব না। এই মিঃ শর্মার বোনকে বিয়ে করে জীবনটা অন্য ভাবে কাটাতে চাই।

মিনির দিক থেকে কোন সাড়া আসেনা শুধু তার চোখ ছুটো একবার জ্বলে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের পোষাকের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের কোরে লরেন্সের পেটের মধ্যে আমূল বসিয়ে দেয়। হাহাকার করে ওঠে কান্তা। কিন্তু মিনি শুধু ছুটি কথা উচ্চারণ করে, অকৃতজ্ঞ, Brute, এই ছুরি এনেছিলাম আমিও থালাশ না পেলে আত্মহত্যা করব বলে। আর ও কিনা শেষে, ছিঃ ছিঃ!

এবার শর্মা মিমিকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, তুমি দেবী। তোমার মহিমা এ জানোয়ারটা কি বুঝবে? মা চণ্ডীকার মত তুমি নিজেই দুষ্টের বিনাশ সাধন করেছ। এবার আমিই সকলের সামনে তোমার এই দেবী রূপ তুলে ধরব। প্রমাণ করব তুমি নির্দোষ, মুক্তিপাবার যোগ্য। আর তারপর যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে তোমার মত নারী রত্ন নিয়ে গিয়ে আমার ঘরের শোভা বাড়াব।

কান্তা এসব কিছুই না বুঝে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে। কোর্টের মধ্যে খুন, বিরাট এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে শহরে। মিনি যায় কয়েদে। এবার তার বিচার হবে। সে আবার অন্য এক কাহিনী।

বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

নেহেরুর নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ও চৈনিক আক্রমণ

শ্রীসমর দত্ত

জোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ নীতি অনুসারে বর্তমান সঙ্কটে (ভারতভূমির উপর চৈনিক আক্রমণে) ভারত সরকার লাভবান হয়েছে। লাভবান হয়েছে এই জন্য যে, গত ২০শে অক্টোবর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উত্তর সীমান্তে চীন-সৈন্যদের ব্যাপক আক্রমণের অনতিবিলম্বেই যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন ভারতকে সামরিক সাহায্য দানে এগিয়ে এসেছে এবং কোন রকম সর্ত্ত আরোপ না করেই প্রথম দফায় প্রয়োজনীয় আধুনিক সমরাস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছে, শুধু তাই নয় যুদ্ধ-চলাকালীন আরও যত সমরাস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তাও এই দুটি রাষ্ট্র ভারতবর্ষকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ছাড়াও ফ্রান্স, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, মালয়, টিউনিসিয়া, ইথিওপিয়া, সাইপ্রাসপ্রমুখ ৬০টি দেশ ভারতকে সমর্থনে এগিয়ে এসেছে।

সম্প্রতি ইউরোপে বিভিন্ন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের রাজধানীতে পর পর যে সমস্ত কমিউনিষ্ট-কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হয়ে গেল তাতে একের পর এক পিকিংয়ের একগুঁয়েমি নীতির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ধ্বনিত হল। বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের পার্টিগুলির সম্মেলনে চীনা-কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুই প্রকারের সমালোচনার কথা শোনা গেল। প্রথমতঃ চীনের গোঁড়া-ষ্টালিনবাদের জন্য বর্ত্তমান সোভিয়েট নেতৃত্বের বিরোধিতার নিন্দা এবং দ্বিতীয়তঃ চীন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের নিন্দা। একমাত্র আলবেনিয়া, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনাম—এই তিনটি কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কোন দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে চীনকে সমর্থন জানায়নি।

এদিকে-এশিয়া আফ্রিকার গোষ্ঠী মহলেও চীনের প্রতি আর আগেকার মত প্রেম নেই। ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ঘানা, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের মনোভাব চীন অপেক্ষা ভারতবর্ষের দিকেই বেশী ঝুঁকেছে। মোটের উপর সমগ্র পশ্চিমীজগং, কমিউনিষ্ট দুনিয়ার অধিকাংশ, লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম অংশ এবং এশিয়া-আফ্রিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠী চীনের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে-ভারতবর্ষের দিকে সহানুভূতি এবং প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছে। কমিউনিষ্ট দুনিয়ার প্রাণকেন্দ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন এ বিরোধে কোন অংশ নেয়নি। ক্রুশ্চেভ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে বন্ধু ভারত ও ভ্রাতা চীনের বিরোধ তাঁর কাম্য নয়।

তাই দেখা যাচ্ছে জোট-বহির্ভূত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে ভারত সরকার লাভবান হয়েছে। কিন্তু তবুও কথা থেকে যায় এবং সেই কথাটাই এই প্রবন্ধের আসল কথা।

গত ২০শে অক্টোবর চীন কর্ত্তৃক ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হবার পর রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ একটি মন্তব্য ক'রে বলেন—একটা আঘাতের প্রয়োজন ছিল।' দার্শনিক ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের এই মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। যে জাতীয় সংহতির জন্য আমরা মাথা খুঁড়ছিলাম চৈনিক আক্রমণজনিত আঘাতের ফলে ৪০ কোটির অধিক ভারতবাসীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব সংহত চেতনা পরিলক্ষিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষাবিদ্বেষ ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতবাসী আজ এক সূত্রে অসংখ্য প্রাণ বেঁধে ফেলেছে। একজন জোয়ানকে লড়াতে গেলে যে ৪০জন বে-সামরিক ব্যক্তির আত্মত্যাগ এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন—একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে অর্থদান, স্বর্ণদান ও রক্ত-দানের মাধ্যমে এবং দেশের ধনসম্পদ উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে বিশেষভাবে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সার্থক

করে তোলবার উদ্দেশ্যে ভারতবাসী আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

একদিকে অতি দুর্গম, অতিশয় তীব্র শীতে এবং নানা-রূপ অসুবিধার মধ্যে ভারতীয় জোয়ানেরা শত্রুকে রুখে দাঁড়িয়েছে। অতিদুর্গম পার্ব্বত্য পথে যেখানে এক দিকে খাড়া পাহাড়, অপর দিকে তিন মাইল গভীর খাদ, রাস্তায় যেখানে মাথার কাঁটার মত খাঁজ, জীপ যেখানে চলে ঘণ্টায় চার মাইল, যেখানে একটু জোরে হাঁটলে মনে হয় হৃৎপিণ্ড বুঝি বেরিয়ে এলো—সেই পাহাড়ে-শীত ও দুর্গম পথে ভারতীয় সৈনিক চীনা-দস্যুর বিপক্ষে যুদ্ধ করেছে। হিমালয়ের সাদা বরফ ভারতীয় জোয়ানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। স্বদেশের স্বাধীনতা এবং সম্মান রক্ষার জন্য তারা আরও রক্ত দিতে প্রস্তুত। অপর দিকে নব উৎসাহে জাগ্রত বে-সামরিক জনসাধারণ 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সকল স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে জোয়ানদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ধরণের সামরিক এবং বে-সামরিক যৌথ প্রচেষ্টায় ভারত যে শুধু যুদ্ধে জয়ী হবে তা নয়, যুদ্ধোত্তর ভারতে দেখা দেবে এক অপূর্ব্ব জাতীয় ঐক্য।

তাই দার্শনিক ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ যে কথা বলেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ 'out of the evil cometh good,' কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারত সরকারের ভুল-পদক্ষেপজনিত যে evil-এর সৃষ্টি হয়েছে তা সমর্থন-যোগ্য। আঘাতের ফলে দেশ বর্ত্তমানে যে ভাবে লাভবান হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অধিকতর লাভবান হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা আঘাতের পরোক্ষ ফল।

বহুদিনের পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ বহুকষ্টে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে এবং স্বাধীন ভারতে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই ভারতের ঘরোয়া নীতি। ঘরোয়া নীতিতেই মানুষ ঘরের বাইরে-টাকেও চালাবার চেষ্টা করে। ভারত সরকারের ঘরোয়া নীতি যদি জনকল্যাণনীতি হয় (নতুবা জনকল্যাণ রাষ্ট্র স্থাপিত না হয়ে টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোতো) তাহলে তার ঘরের বাইরেটা চালানোর নীতি অর্থাৎ পররাষ্ট্র-নীতি নিশ্চয় কল্যাণকর। কল্যাণকর এই জন্য যে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, হিংসোন্মত্ত পৃথিবীতে নিত্য নূতন দ্বন্দ্বের অবসান এনে সুমহান শান্তি স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে 'পঞ্চশীল' রচিত হয়। পঞ্চশীল চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী নয়া-চীন এবং এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের পর বন্ধুতার আড়ালে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে লালচীন বিশ্বাসঘাতকের মত ভারত আক্রমণ করে। অভ্রভেদী হিমালয়ের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার যে পাষাণ-প্রাচীর উত্তরদিকে—তারই আশ্রয়ে ভারতবর্ষ নিঃশঙ্ক ছিল এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মনোভাবের মধ্যে নূতন উন্নত সমাজ-জীবন গড়ে তোলার কঠিনব্রতে হাত দিয়েছিল, কিন্তু অকস্মাৎ চীন নিজেদের কল্পিত এবং নিজেদের সমাজবাদের আমলে তৈয়ারী মানচিত্র ও দলিলের দাবীতে ভারত-সীমানায় হামলা সুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রভূত অস্ত্র, সৈন্য, প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সহ অঘোষিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আন্ত-র্জাতিক আইন এবং পারস্পারিক চুক্তির এমন নির্লজ্জ পদাঘাত একমাত্র ইউরোপে হিটলারী আমলে দেখা গেছে। যে ভারতবর্ষ অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বছর ধরে চীনের বহু সুখ-দুঃখের সময়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চীনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে সেই ভারতবর্ষকে পিকিংয়ের লাল-শাসকেরা ছুরিকাঘাত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। তাই প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষ এবং নব-জাগ্রত এশিয়ার ইতিহাসে এই অসৎ দৃষ্টান্তের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাহলে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে যে পঞ্চশীলের প্রতি পণ্ডিত নেহরুর শ্রদ্ধা, উৎসাহ এবং আগ্রহ অন্যায় এবং তাঁর জোট-বহির্ভূত নিরপেক্ষ নীতির অনুসরণ একটি ভুল পন্থা? এই প্রসঙ্গে সর্ব্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের গত ২রা ডিসেম্বর ১৯৬২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত কোন একটি ইংরেজী দৈনিকে 'The Challenge of China' শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষ বিবেচ্য :—

"The mistakes that led to the present tragedy were not due to incompetence, but to political myopia induced by ideological prejudices. It was the latter that made the persons concerned, shut their eyes to plain facts and to create a world of unreality, for which there could have been no justification whatever. I do not mean to hold non-align-

ment up as the culprit ; nor do I think there is any cause to alter that basic policy ; nor has any of our friends in the world even indirectly raised that question. The real culprit was the mental and emotional alignment that went about in the garb of non-alignment."

জয়প্রকাশ নারায়ণের উপরোক্ত কথাগুলির মর্ম্মার্থ এই যে সাম্প্রতিক সঙ্কটের জন্য ভারত সরকারের জোট-বহির্ভূত থাকার নীতি দোষী নয় ; জোটবহির্ভূত থাকার নীতি গ্রহণ করেও কোন একটি বিশেষ জোটের দিকে ঝোঁক দেওয়া এবং সেই দিকে ভাবাবেগে নুইয়ে পড়াই অন্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই বিশেষ জোটটি কমিউনিষ্ট ব্লক। পঞ্চশীলের প্রতি পণ্ডিত নেহেরুর আস্থা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু যে হেতু চীন পঞ্চশীল চুক্তির স্বাক্ষরকারী এবং রাশিয়া পঞ্চশীলের সমর্থক, সেই হেতু এদের পর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করে পণ্ডিত নেহরু রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কমিউনিষ্ট ব্লকের দিকে মানসিক ঝোঁক ও ভাবাবেগের জন্য হাঙ্গেরীর গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপারে ভারত সরকার তার কর্ত্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরীতে গণ-বিপ্লব সংঘটিত হল। ষ্টালিনবাদের কামড় থেকে নিজেদের বাঁচাবার এবং জনগণের ইচ্ছানুসারে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য হাঙ্গেরীর অধিবাসীরা বৈপ্লবিক আন্দোলনের আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য যাঁর হুকুমে হাঙ্গেরীর বুকের উপর সশস্ত্র রুশ সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল তিনি হলেন সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ, যে ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট রাশিয়ার বিংশ পার্টি-কংগ্রেসে ষ্টালিন সংক্রান্ত রিপোর্টে মহান (?) ষ্টালিনের স্বৈরতান্ত্রিকতার, ক্ষমতা-লোলুপতার, ব্যক্তিজীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার, নভেম্বর-বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতাদের এবং লাল-ফৌজের সুদক্ষ সেনাপতিদের হত্যা করার, 'টিটোপন্থীদের চক্রান্ত' নামে এক জঘন্য মিথ্যার আগাগোড়া জাল অভিযোগ তৈয়ারী করার, বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসকে বিকৃত করার এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষ্টালিনকে যে ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তার উপর মিথ্যার পলেস্তারা লেপন করার অভিযোগে ষ্টালিনকে অভিযুক্ত করে দুনিয়ার গণতন্ত্রী এবং সোস্যালিষ্ট শক্তিগুলির কাছে প্রতিটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্টার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেদিন ক্রুশ্চেভ এবং অন্যান্য রুশ-নেতাদের মুখে গণতন্ত্রের ভাল ভাল কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুত্থানকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য ক্রেমলিনের আদেশে হাঙ্গেরীর বুকে রুশ-সৈন্যের আবিভাব হয়। রুশ সৈন্যের গুলিতে প্রায় ৩৫ হাজার নিরস্ত্র শ্রমিক, ছাত্র এবং নীচের তলার লোকেদের রক্তে বুদাপেষ্টের পথঘাট প্লাবিত হয়। গণতন্ত্রের আলখাল্লার ভেতর থেকে নির্গত টোটালিটেরিয়ানিজমের থাবার আঘাতে সেদিন হাঙ্গেরীর গণবিপ্লব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

রুশ সৈন্য কর্তৃক হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুত্থান দমিত হওয়াতে ভারত সরকার যে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, ১৯শে অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লোকসভায় প্রদত্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। সেই বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

'The Major fact stands out that the majority of the people of Hungary wanted a change, political, economic or whatever else, and demonstrated and actually rose in insurrection to achieve it but ultimately they were suppressed.'

* * *

'I am not very much concerned about the legal implications of the Warsaw Pact. It may be that some lawyers may say that, strictly in terms of the Warsaw Pact, the soviet army had a right to be there. But that is very small matter. The fact is, as subsequent events have shown, the Soviet armies were there against the wishes of the Hungarian people. That is clear.

* * *

'......the Government in Hungary was not a free Goverment but was an imposed Government and that the people of Hungary

were not satisfied. Ten years have passed since the last War, and if in ten years in Hungary, the people could not be converted to that particular theory. It shows a certain failure which is far greater, it seems to me, than the failure of the military coup. It indicates that all of us, whether we are Communists or non-Communists or anti-Communists, have to think afresh.'

কিন্তু এত অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুত্থান দমিত হওয়ার, হাঙ্গেরীবাসীদের জাতীয় মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং হাঙ্গেরীর জনসাধারণের মানবিক অধিকার দলিত হওয়ার বিরুদ্ধে নিন্দামূলক প্রস্তাবসহ যে Resolutionটি ৩৬টি রাষ্ট্র উপস্থাপন করে, সেই Resolutionটির স্বপক্ষে ভোটদানে আরও ৯টি রাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষ বিরত থাকে। যদিও ভারতবর্ষ Resolutionটির বিপক্ষে ভোট দেয়নি, তথাপি ভারত সরকারের এই রকম নিরপেক্ষ ভূমিকার সহজ-সরল অর্থ সোভিয়েট ইউনিয়নকে অসন্তুষ্ট না করা। অথচ পণ্ডিত নেহরু তাঁর পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যায় অনেকবার ঘোষণা করেছেন যে—

......"When peace is menaced, justice is threatened, we can not be neutral."

এবার তিব্বতের ব্যাপারটা একটু দেখে নেওয়া যাক্। ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবর চীন সৈন্যেরা তিব্বতে প্রবেশ করে। তারা যখন তিব্বতের রাজধানী লাসার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিব্বতে জাতীয় পরিষদ (Tibetan National Assembly) চৈনিক আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে একটি জরুরী আবেদন পেশ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তিব্বতের আবেদনটি এড়িয়ে যায় এবং এই আশা প্রকাশ করে যে তিব্বত এবং চীনের মধ্যস্থ-বিরোধ বিবাদমান দুই পক্ষের সহযোগিতায় যেন মিটে যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে কোন রকম সাহায্য না পাওয়ার ফলে ১৯৫১ সালের মে মাসে তিব্বত চীনের নির্দ্দেশে একটি সাত-দফা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। ঐ সাত-দফা চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে তিব্বত তার পররাষ্ট্র এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা বিষয়ক সকল ক্ষমতা চীন সরকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। স্বরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ক্ষমতা অবশ্য তৎকালীন তিব্বত সরকারের হাতেই থেকে যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ তিব্বত সরকারের সকল ক্ষমতা চীন সরকার ছিনিয়ে নেয়। তিব্বতের ধর্ম্মীয় আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সমস্ত ব্যাপারেই চীন সরকার মাথা গলায় এবং তিব্বত সরকারকে হাতের পুতুল করে রেখে দেয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিলে তেজপুরে দালাই লামা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দেওয়া হল :—

'In fact, after the occupation of Tibet by the Chinese army, the Tibetan Goverment did not enjoy any measure of autonomy even in the internal affairs and the Chinese Goverment exercised full powers in Tibetan affairs.

এমনিভাবে অনবরত তিব্বতের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে চীন সরকারের হস্তক্ষেপে, তিব্বতের স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে চীন সরকার কর্ত্তৃক লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য এবং তিব্বতের শাসনপরিচালনায় তিব্বতবাসীদের মতামত, তাদের ধ্যানধারণা আশা-আকাঙ্ক্ষা চীন সরকার কর্ত্তৃক পদদলিত হওয়ার ফলে ১৯৫৭ সালের ১০ই মার্চ তিব্বতের জনসাধারণ বিদ্রোহ ক'রে। বিদেশী শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের জন্য এই বিদ্রোহ তিব্বতের জাতীয় গণবিপ্লবে পরিণত হয়। পিকিং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে তিব্বত বরাবরই চীনের অংশ ছিল এবং সেই জন্যই পিকিং সরকারের তিব্বত অধিকারের দাবী এবং দাবী আদায়ের কর্ম্মপন্থা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

তিব্বতের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতীরা খুব পরাক্রমশালী জাতি ছিল। তিব্বতের তৎকালীন রাজা সং-সান-গাম্পো (Song Tsan Gampo) ভারত এবং চীন আক্রমণ করেন। নবম শতাব্দীতে এই রাজবংশের বিলোপ হয়। তিব্বত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতে লামাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়

এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুবলাই খাঁ লামাতন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন। চৈনিক-মঙ্গোল-উয়ান বংশের (Chinese-Mongol-Yuan Dynasty) রাজত্বকালে তিব্বত নামে-মাত্র চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ এর স্বাধীনতা তখনও সংরক্ষিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলীয় গুস্‌রি (Mongol Gusri) তিব্বত জয় করেন। গুসরি চীনের মাঞ্চু সম্রাটদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেইজন্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে তিব্বত চীন সাম্রাজ্যের অংশ ব'লে স্বীকৃত হয়। তথাপি তিব্বতের জনসাধারণ চীনের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার কাছে কখনও নতি স্বীকার করেনি, সেইজন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে আটবার তিব্বতে বিদ্রোহ হয়। প্রত্যেকবারই চৈনিক রাজশক্তি বিদ্রোহ দমন করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তিব্বত কখনই চীনের অধীনস্থ ছিল না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একটি চৈনিক সামরিক অভিযান তিব্বতের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। কিন্তু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতদখলকারী চৈনিক সামরিক শক্তি বিতাড়িত হয়। তাই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে তিব্বত স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার ভোগ করে আসছিল। সুতরাং এই রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক হ'বে ব'লে মনে হয় না, যে কোন দেশ অপর একটি দেশকে সামরিক শক্তির সাহায্যে কয়েক শতাব্দী অধীন ক'রে রাখে এবং সামরিক শক্তিবলে বলীয়ান পররাজ্যলুণ্ঠনকারী দেশটি লুণ্ঠিত দেশটিকে স্বীয় রাজ্যের অংশ ব'লে দাবী করবার অধিকার লাভে সক্ষম হয়, তাহলে ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বহু দেশেরই স্বাধীন অস্তিত্বের দাবী যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন।

চীন কর্ত্তৃক তিব্বত আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সমর্থনে আর এক ধরণের যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। নয়া চীনের বর্ত্তমান শাসক-গোষ্ঠীর এদেশীয় সমর্থনকারীগণ এই কথা রটনা করেছেন যে সামরিক শক্তির সাহায্যে তিব্বত অধিকার করে চীনেরা ঐ দেশে পুরাণো রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অর্থাৎ তিব্বতের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আবর্জ্জনা দূর করে সেখানে আধুনিক প্রগতি-শীল শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করেছে। এই ধরণের অপপ্রচার সাম্প্রতিক কমিউনিষ্ট চীন গভর্ণমেণ্টের সম্প্রসারণবাদের কলঙ্ককে চাপা দেবার চতুর কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাসজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে অপেক্ষাকৃত উন্নত কোন দেশ যখন কোন এক অনুন্নত দেশ অধিকার কোরে শাসন ব্যবস্থা কায়েম ক'রে, তখন বিজয়ী দেশের সরকার বিজিত দেশের সামাজিক উন্নয়নের রুদ্ধ শক্তির উৎস উন্মুক্ত ক'রে দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে বিজিত দেশের আংশিক সামাজিক উন্নতি ঘটে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিজয়ী দেশের যতখানি সুবিধা হয়, বিজিত দেশের তার শতাংশের এক অংশও হয় কি না সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত এই প্রক্রিয়াতে বিজিত দেশে যে উন্নতি ও প্রগতি দেখা যায় তা' অপর দেশ কর্ত্তৃক রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যমূলক ফল নয়, তা' পররাজ্য জয়ের ঐতিহাসিক উপজাত ফল। ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় ক'রে ভারতের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। তাহলে কি ভারতবর্ষের চিরদিনই ইংরেজের অধীনে থাকা উচিত ছিল? পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে উন্নত জাপান একদা সামন্ততান্ত্রিক চীনের ভূমি দখল করে যেখানে সমাজ উন্নয়নের অনুকূল বহু ব্যবস্থা করেছিল। তাহলে কি চীনের ঘাড়ে জাপানের জগদ্দল পাথরের মত চিরদিনই চেপে এসে থাকা উচিত ছিল? সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়ার জন্য এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজনৈতিক আধিপত্য যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তাহলে ফ্যাসিষ্ট ইতালীর কাছ থেকে আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার কোন অধিকার ছিল না। আলজেরিয়ার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের মরণপণ যুদ্ধ তাহলে নিশ্চয় যুক্তিহীন। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দমন ও পীড়ন থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির যে অক্লান্ত চেষ্টা, তা'ও তাহলে অর্থহীন! লামাতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রগতির বন্যা বইয়ে দেওয়ার নামে সম্প্রসারণ-বাদী চীন সরকারের তিব্বতে সর্ব্বাত্মক শাসন-ব্যবস্থা (Totalitarian Rule) প্রচলন করবার কৌশল ইতিহাসজ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষেরই সমর্থন লাভ করবে না।

১৯৫৯ সালের ১৩ই অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে তিব্বতবাসীদের মানবিক অধিকার এবং তাদের ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের

প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আয়ারল্যাণ্ড ও মালাপা একটি Resolution উপস্থাপন করে। সোভিয়েট রাশিয়া এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে এই ধরণের প্রশ্নের উপর আলোচনা করার অর্থ ঠাণ্ডা-যুদ্ধের উস্কানি দেওয়া। এ সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে চীন আক্রমণ উদ্ভূত তিব্বতের অবস্থা আলোচনা করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট Resolutionটির স্বপক্ষে ৪৩টি এবং বিপক্ষে ১২টি রাষ্ট্র ভোট দেয়। ২৫টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। এই ২৫টি রাষ্ট্রের অন্যতম ভারতবর্ষ।

ভোটদানে বিরত না থেকে উপায়ই বা কি ছিল? কারণ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিব্বত সম্পর্কে ভারত সরকার ও চীন সরকারের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তিপত্রে ভারত সরকার তিব্বতের উপর চীনের অধিকার এবং তিব্বত যে চীনের এলাকা বা রাজ্য একথা মেনে নিয়েছিল। বৃটিশ আমলে তিব্বতে বৃটিশ ভারতীয় সরকারের যে সকল বিশেষ অধিকার ছিল সেগুলিও বর্ত্তমান ভারত সরকার চুক্তিনামা স্বাক্ষরের দ্বারা পরিত্যাগ করে।

তাহলে কি বল্‌তে হ'বে যে ভারত সরকার ইতিহাস এবং রাজনৈতিক জ্ঞান বিবর্জ্জিত? ভারত সরকার বিশেষ করে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এ কথা অযৌক্তিক এবং অশোভন হ'বে ব'লে মনে করিনা যে, তিনি চীন তথা সোভিয়েট ব্লকের মন রাখবার জন্য অন্যায় ভাবে তিব্বতের অধিকার জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

রাশিয়া এবং বিশেষ ক'রে চীনের মন রেখে পণ্ডিত নেহরু এই দুটি রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই বন্ধুত্বের ঋণের ভারে আজ তিনি এবং ৪০ কোটি ভারতবাসী বিপর্য্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে চীন ভারত আক্রমণ করলেও রাশিয়াতো ভারতের বিপক্ষে যায় নি, বরং রাশিয়া নিরপেক্ষ আছে। সুতরাং শ্রীনেহরু যদি এমন কিছু করতেন যাতে সোভিয়েট ব্লকের মধ্যমণি রাশিয়া ক্রুদ্ধ হ'ত তাহলে তো আমাদের বিপদের উপর বিপদ আসতো। এ কথা আজ সর্ব্ববাদীসম্মত যে চীন সম্প্রসারণবাদী এবং আক্রমনকারী। যে সোভিয়েট-রাশিয়া সোশ্যালিজমের পথ পরিক্রমা শেষ করে কম্যুনিজমের পথে যাত্রা সুরু করেছে ব'লে চীৎকার করছে, তার কি উচিৎ ছিল না আক্রমণকারী চীনের বিরুদ্ধে শান্তিকামী ভারতকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা? কিন্তু আজ অবধি—(এই প্রবন্ধ রচিত হবার সময় পর্য্যন্ত) একটা কার্তুজও রাশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসে পৌছায়নি। সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা তো দূরের কথা, বিপদের সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া-ইত্যাদি দেশের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ভারত সরকারের এই রকম কাজের তিনি বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। তাঁর মতে বিদেশী অস্ত্র সাহায্য নিলে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারাবে।

তাই যদি হয় তাহলে কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকার কাছ থেকে প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরোপকরণ সাহায্য নিয়ে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চেকোশ্লোভেকিয়া রাইনল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া গ্রাস করার পর প্যারীর পতন ঘটিয়ে, পোল্যাণ্ড ধ্বংস কোরে Rundtstedt, Von Boek, Von Powler এর মত বিচক্ষণ সমর-নায়কদের নেতৃত্বে রাশিয়া আক্রমণ ক'রে লেনিনগ্রাদ, রোস্তভ এবং মস্কোর দরজা ধরে অভাবনীয় তীব্রতার সঙ্গে নাৎসীবাহিনী যখন নাড়া দিতে লাগলো, তখন আমেরিকা থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সমরোপকরণ রাশিয়াতে এসে না পড়লে জার্ম্মাণ সৈন্যদের হাত থেকে রাশিয়া রক্ষা পেত না। এ কথা সর্ব্বতোভাবে সত্য যে রুশজার্ম্মাণ যুদ্ধে রুশসৈন্য যে পৌরুষ এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস তা যুগ যুগ ধরে সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রেরিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং বহুবিধ সামরিক সাহায্য রুশ সৈন্যগণের বীরত্বের পরিপূরক। মহাযুদ্ধকালীন নিদারুণ সঙ্কটের দিনে আমেরিকার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে রাশিয়া আমেরিকার গোলাম হ'য়ে যায়নি।

সুয়েজ খালের যুদ্ধে ক্রুশ্চেভই প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য ক'রেছিলেন। তাহলে কি মিশর সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে তার স্বাধীনতা বন্ধক রেখেছে? স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রসজ্জার অধিকার প্রত্যেক দেশেরই আছে। আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সোভিয়েট রাশিয়ার তরফ থেকে যদি দেশপ্রেমের যুদ্ধ হয়, তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স ইত্যাদি বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণকারী চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 'সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁস' হ'বে কেন? ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই একমাত্র পবিত্র কর্ম্ম, কিন্তু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র যদি সম্প্রসারণবাদী হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে মিত্র রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে সংগ্রাম করবার ন্যায্য অধিকার সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত'—সোভিয়েট সর্ব্বাধিনায়ক মিঃ ক্রুশ্চেভের এমন কথা মোটেই বোধগম্য নয়।

নীতিগত বিবাদের জন্য রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে সম্প্রতি কালে খুব জোর মন-কষাকষি চলেছে। দু'পক্ষের আভ্যন্তরীণ কলহ এখন পাড়া প্রতিবাসীদেরও কানে উঠেছে। দু'পক্ষের ঐতিহাসিক খেউড়ের ফলে অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে উঠেছেন। সমাজতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা রচনায় মার্কস্-লেনিন প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে ব'লে পারস্পরিক দোষারোপ করা হচ্ছে। কিন্তু রুশ এবং চীন দুজনেই আজ মার্ক্স্-লেনিন প্রদর্শিত পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা না করে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলি।

প্রকৃত কমিউনিষ্টদের কাছে সোশ্যালিজম ও ডেমোক্রেসি এক এবং অবিভাজ্য। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম না ক'রে কমিউনিষ্টরা পারে না। গত একশ' বছর ধরে কমিউনিষ্টরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। কাল মার্ক্স্ ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো প্রকাশ ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। বিগত একশ' বছরের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবময় সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পেছনে। মার্ক্স্-বাদীরা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে পুঁজিবাদীরাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূল গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি লিখিতভাবে স্বীকৃতি পেলেও সাধারণ মানুষেরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায় না। কারণ সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য এই সকল রাজনৈতিক অধিকার ব্যবহার করার পথে সাংঘাতিক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই মার্ক্স্-বাদীরা সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করবার জন্য খুব জোর দিয়ে থাকেন এবং উৎপাদন যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান এনে তাঁরা এগুলিকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে চান। এমনি ক'রে তাঁরা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে যুক্ত করে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সার্থক করে তোলার কাজে অগ্রসর হন। এই কারণে প্রতিটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার একমাত্র সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সার্থক হতে পারে। কিন্তু রাশিয়া এবং তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র চীনে আজ গণতন্ত্রের কোন চিহ্ন নেই। ক্রুশ্চেভ মনে করেন যে ভারতের উপর চীনা আক্রমণের ফলে সোভিয়েট নীতি সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর মতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং অন্তর্ঘাতী প্রভাবের মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষ দেশগুলিতে শেষ পর্য্যন্ত কম্যুনিজম জয়যুক্ত হবে। তিনি মনে করেন যে, সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির এই প্রধান লক্ষ্য কম্যুনিষ্ট চীনের কার্য্যকলাপের ফলে ব্যাহত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চীন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে ঘরোয়া ঝগড়া চলেছে সেই ঝগড়ার কারণ নীতিগত মতভেদ নয়; প্রভেদ শুধু উভয় দেশের গৃহীত নীতির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে। কিন্তু এর ফলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সোভিয়েটের কাছ থেকে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র লাভবান হয় নি।

তাই যে কথাটা বলবার জন্য এত তত্ত্ব ও তথ্যের আশ্রয় নিতে হ'ল, সেই কথাটা এই যে—নেহরুর জোট-বহির্ভূত নিরপেক্ষ নীতির মূলগত কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন না থাকলেও যে রঙীণ চশমার ভেতর দিয়ে শুধু একদিকেরই একটি গোলাপী চিত্র সর্ব্বদা তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়, সেই রঙীণ চশমা খুলে ফেলে দেবার সময় এসেছে। পণ্ডিত নেহরু স্বাধীন ভারতের অবিসংবাদী নেতা। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ এবং পূর্ব্বে কামরূপ থেকে পশ্চিমে দ্বারকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ৪০ কোটির উর্দ্ধ নরনারী, ভারতের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আজ তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তাঁর নির্ভুল নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যুদ্ধে জয়ী হবে, প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীরই এই কামনা।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডঃ সুরজিত রায় তাঁর দীর্ঘ বিবৃতি শেষ করেছেন মাত্র। এমন সময় হঠাৎ সেখানে তাঁর ম্যানেজার অমুকবাবু এসে উপস্থিত হলেন। আমাদের দেখা মাত্র তিনি একটু চমকে উঠলেন। তাঁর ঠোঁট দুটো একবার মাত্র নড়ে স্থির হয়ে গেল। এদিকে কাটা দরজার তলার ফাঁকে প্রায় ছয় সাত মানুষের পা দেখতে পাচ্ছি। বোধ হয় এঁদের ইনি সঙ্গে করে এনে থাকবেন। ম্যানেজারবাবুর ইসারা পেয়ে ডাক্তার সুরজিত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।' এর পর তিনি এদের নিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেলেন। এই সুযোগে এই ঘরটার চতুর্দ্দিক একবার দেখে নিলাম। এটি বসবার ঘর বা গুদম তা বলা শক্ত। দেওয়াল ঘিরে লম্বা আলমারীর সারি। মাঝখানে টেবিল ও ক'খানা চেয়ার। এবার দাঁড়িয়ে উঠে আলমারীগুলোর কাছে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। এ্যা! এ'সব এখানে আবার কি? অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম যে—সব কয়টি আলমারীতে 'ভিরোল বিষের প্যাকেটের গাদা। সহকারীদের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে আমি স্বস্থানে ফিরে এলাম।

এ সময় আমাদের বারে বারে সন্দেহ হচ্ছিল যে হয়তো ঐ আহত যুবকের চক্ষু দু'টি বিনষ্ট করবার জন্য এঁর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই ভিরোল বিষও বোধ হয় [এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দ্রষ্টব্য] এর এই গুদাম হতে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। এদিকে এই চক্ষু-বিশারদ সুরজিত রায় প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কক্ষান্তরে গেলেও তখনও ফিরলেন না। এদিকে পাশের ঘরে বহু লোকের অস্পষ্ট গুঞ্জন আমরা শুনতে পাচ্ছি। শেষে পথের কাঁটা মনে করে এখানে আমাদের গুম্ করে দেবেন না তো! আমি ভাবছিলাম যে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে গিয়ে পথের ধারের কোনও দোকান থেকে থানায় সাহায্যের জন্য টেলিফোন করে দেবো কিনা। এমন সময় মুখচোখ রাঙা করে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বেশ একটা উত্তেজনা নিয়েই ভদ্রলোক আমাদের এই ঘরটার ভিতর ফিরে এলেন। আমরা অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম যে—কোনও এক দুঃসংবাদ কিংবা সুসংবাদ পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁর মুখের পেশীর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কুঞ্চন পরিলক্ষ্য করে বুঝলাম যে কোনও একটা ভবিষ্যৎ আশঙ্কাও তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোক এইবার বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়েই আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। এই সুযোগে তাঁর উপরোক্ত বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্র—আচ্ছা! এতক্ষণ কি আপনার ল্যাবরেটারীর ম্যানেজার অমুকবাবু কয়েকজন বাইরের লোককে এখানে আনলেন? ওঁরা কি আপনার নির্দ্দেশ মত কোনও একটা কায সত্বর সমাধা করতে এইমাত্র বাইরে চলে গেলেন?

উঃ—আপনারা দেখেছি এখানে এসে পর্য্যন্ত ভেল্কীর পর ভেল্কী দেখিয়েই চলেছেন। আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য হলেও এর মধ্যে রীতিবিরুদ্ধ বা বে-আইনি কিছুই নেই। আমার কোনও এক নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে এঁরা এখানে এসেছিলেন। আশা করি এই সব পারিবারিক বিষয় আপনাদের জানবার কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রঃ—আচ্ছা! আপনি তো বারে বারে বললেন যে, প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবী বৌরাণীর সঙ্গে আপনার বিরোধ এখন চরমে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের বাড়ী গিয়ে সেদিন জনৈক হৃতচক্ষু যুবকের কৃত্রিম চক্ষুর জন্য মাপজোপ নিয়ে এলেন। তাহলে কি বুঝবো যে সম্প্রতি আপনারা গোপনে আবার নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেছেন?

উঃ—এ্যা! এ কি আপনি বলতেছেন মশাই? সেই-দিন কি তা'হলে আমি ওদের বাড়ীতেই গিয়েছিলাম না কি। কিন্তু ঐ বাড়ীর অবস্থান তো কাশীপুরের নূতন-কেনা রাজবাটী থেকে বেশ কিছুটা দূরেই মনে হয়। তা'হলে কি ওনারা আমাকে ধোঁকা দিয়ে ওখানে চিকিৎসা করানোর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ রোগীর সঙ্গে প্রমীলা দেবীর কোনও সম্পর্ক আছে তা জানলে নিশ্চয়ই আমি সেখানে যেতাম না। এমন কি মেডিকেল বোর্ড থেকে আমার বিরুদ্ধে প্রফেসন-কণ্ডাকট্-আইনে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেও আমি ওনাদের ওখানে যেতে রাজী হতাম না?

প্রঃ—আচ্ছা! আর একটা অদ্ভুত কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। আপনি কি কখনও কাশীপুরের থাকার সময় প্রমীলা দেবীকে লেঠের সাহায্যে পাল্কী করে কাশীপুরের ষ্টেশনের পথ থেকে অপহরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন? আপনি আপনার প্রেম তাঁর ওপর থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরও এইরূপ এক গর্হিত কায করেছিলেন কেন?

উঃ—ওঃ বাবা! এতো কথাও তা'হলে আপনাদের কাণে গিয়েছে? আসলে এইরূপ একটা অভিনয়ের অবতারণ আমি করেছিলাম বটে! প্রমীলা দেবী চোখ-ঝলসানো হরিণ-চাউনি আমার চোখের উপর রেখে একদিন বলেছিলেন—'আমার ইচ্ছে করে যে, আমার প্রেমাস্পদ আমাকে জোর করে অপহরণ করে তার ডেরায় তুলুক'। তাঁর মতে এইরূপ এক রোমান্সের তুলনা হয় না। এই কারণে ওঁর কলিকাতা থেকে কাশীপুরে আসার পথে এইরূপ একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ভুল বুঝে তিনি ভয় পেয়েছুটা-ছুটি করায় তাঁর যা না কি রূপের 'মেকআপ', তা আমার চোখের সামনেই খুলে যায়। এই সময় আমি বুঝতে পারি যে, সাজগোজের জন্যেই তাঁকে কমবয়স্ক সুন্দরী নারী ব'লে মনে হয়। এঁর এই আসল রূপ ও বয়সের পরিচয় পেয়ে সেদিন তাঁর মত আমিও আঁতকে উঠে-ছিলাম। এইদিন এই স্থানেই আমাদের প্রেমের মধ্যে চিরযবনিকা ফেলে দিয়ে আমি এদের সকলকেই শত্রু করে তুলি। এই ঘটনা না ঘটলে সিভিল এ্যাক্ট অনুযায়ী ওঁকে বিবাহ করে আমিই চিরতরে ফেঁসে যেতাম আর কি? এরপর আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, খাঁটি হিন্দুমতে নেগোসিয়েটেড্ ম্যারেজই আমি করবো।

প্রঃ—একি কথা আপনি বলছেন মশাই। হিন্দু-ম্যারেজ তো একটা উইদ্-আউট্ হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দেওয়ারই মত। সময় ও সুবিধে মত এই বিয়ে অস্বীকার করলেই তো হলো। তবে এও ঠিক যে সিভিল-এ্যাক্টের দুই বা তিনজন সাক্ষীর বদলে পুরুত নাপিতসহ ছেলেয় বুড়োয় প্রায় তিনশো 'সই না করা' সাক্ষী আমাদের রয়ে যায়। এঁদের সব কয়জন লোক হারিয়ে বা মরে যাবার পূর্ব্বে আমাদের নিজেদের পুত্রে পৌত্রে আরও বহু সাক্ষী-সাক্ষিণী পৃথিবীতে এসে গিয়ে থাকে। কিন্তু সে যাইহোক তাড়াতাড়ি বিবাহ সারবার জন্য তা'হলে প্রমীলা দেবীই আপনাকে সিভিল এ্যক্ট অনুযায়ী বিবাহ সম্পাদন করতে প্ররোচিত করছিলেন। তাহলে তাঁর প্রকৃত রূপ বেরিয়ে যাওয়ার পর হিন্দু ধর্ম্ম মতে আবার অন্য কাউকে কোনও না কোনও অজুহাতে আপনি পাছে বিয়ে করেন—এই আশঙ্কাতেই কি প্রমীলা দেবী আপনারা উভয়ে এক সম্প্র-দায় ও গোষ্ঠীর লোক হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুযায়ী বিবাহ করবার পক্ষপাতী ছিলেন?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ। ঠিক তাই। কিন্তু এতো কথা আপনারা জানলেন কি করে? আমি শুনেছি, সম্প্রতি তিনি কোনও এক বালককে তাঁর এই মেক্আপ্ রূপের জেল্লসে মোহিত করে বিবাহ করবার তালে আছেন। তবে এ আবার অন্য দিকে একটু লাভ হয়েছে। এই লাভ কি তা আমি আপনাদের এখুনি বলছি না। একটা লাল পত্রের মাধ্যমে পরে তা আপনাদের আমি জানাবো। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, এতো গোপন বিষয় আপনারা এতো শীঘ্র জানলেন কি করে?

প্রঃ—আজ্ঞে! এ সব গুহ্য তত্ত্ব পরে আমরা আপনাকে জানবো। এখন আপনি বলুন, আপনাদের বড় তরফের ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজার মশাই কোনও ফেরার খুনে আসামী কি'না? আমি এইরূপ একটা আশঙ্কা বারে বারে অনুভব করেছি।

উঃ—ওঃ হো! তা'হলে উনিই আমার সম্বন্ধে এই সব মিথ্যা গাল-গল্প আপনাদের শুনিয়েছেন। ওঁর মত এতো-বড়ো আমার শত্রু আমাদের বড় তরফের বড় কর্ত্তাও নহেন। আমাদের জয়েন্ট ষ্টেটে উনি এক-নাগাড়ে আজ ত্রিশ বছরের উপর ম্যানেজারগিরী করেছেন। ওঁর যৌবনে উনি কোনও মার্ডার-টার্ডার কাউকে করে থাকতে পারেন। ওঁর বাড়ী ঘর-দোরের কথা জিজ্ঞাসা করলে উনি বলতেন যে ওসব বহুদিন আগে পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে?

প্রঃ—এইবার আপনাকে শেষ প্রশ্নস্বরূপ একটী সাংঘাতিক প্রশ্ন করবো, মশাই। এই আলমারীর তালা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এইটে সিঁদেল চোররা স্পর্শ করেনি। এখন বলুন তো এই সর্ব্বনেশে ভিরোল বিষের প্যাকেটগুলো আপনি কি জন্যে এনেছেন? আপনার ষ্টক্ বুকের সঙ্গে মিলিয়ে আমাকে ব'লে দিতে হবে যে এই প্যাকেটগুলো হ'তে কোনও একটা প্যাকেট বা একটা শিশি ইতিমধ্যে খোয়া গিয়েছে কি'না? এই সব প্যাকেট আপনি কবে [তারিখ] ও কি জন্যে ও কোথা থেকে এনেছিলেন? এই প্যাকেটের কোনও শিশি খোয়া গিয়ে থাকলে আন্দাজ মত করে খোয়া গিয়েছে? আপনি ছাড়া আর কেউ এই আলমারী খোলে কি'না? এই আলমারীর তালার চাবি সাধারণতঃ কার হেপাজতে থাকে? এই সব প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর আপনাকে মনে করে করে আমাকে জানাতে হবে মশাই।

উঃ—এই সব ভিরোলের প্যাকেট আমি আমার ল্যাবরাটারিতে কৃত্রিম চক্ষু উৎপাদনের জন্য আনিয়েছিলাম। সাধারণতঃ মাপ নিয়ে আমি কৃত্রিম চক্ষু ভিয়েনা শহর থেকে আনিয়ে নিয়ে থাকি। মাস দুই আগে ল্যাবরেটারীতে গবেষণামূলক পরীক্ষার জন্য অমুক বিদেশী কোম্পানী থেকে এ'গুলো আনিয়ে নিয়েছি। আমি ছাড়া আমাদের পূর্ব্বোক্ত ম্যানেজারও আমার এই আলমারী খুলে থাকেন। এখনও পর্য্যন্ত এই সব পদার্থ আমি একবারও কাযে লাগাই নি। কোনও ভিরলের শিশি খোয়া গিয়েছে কি'না তা আমি ষ্টক্ চেক্ না করলে বলতে পারছি না। একটু অপেক্ষা করলে আমার কর্ম্মচারীদের সাহায্যে ষ্টক্ বুক্ চেক করে প্রকৃত তথ্য আপনাকে জানিয়ে দিতে পারবো। এই সব পদার্থ এখান হতে খোয়া যাবার কোনও সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। এই সাংঘাতিক বিষের কণামাত্র কাউর চোখে পড়লে তার চোখ চিরান্ধ হয়ে যেতে পারে। এসব চুরী বা খোয়া গেলে তো সে এক ভয়ঙ্কর বিপদের কথা।

আমাদের আগ্রহাতিশয্যে এই দিন ঘণ্টা দুই চেষ্টা করে ষ্টক বুকের সঙ্গে এই ভিরোলের ষ্টক মিলিয়ে দেখা গেল যে এই ভিরোলের একটা পুরা প্যাকেটই এখান হতে খোয়া গিয়েছে। বলাবাহুল্য যে এই খোয়া যাওয়ার খুঁটী-নাটী সম্বন্ধে এই চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার সুরজিত আমাকে কোনও কৈফিয়ৎই দিতে পারলেন না। বরং এ জন্য তাঁকে বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ ও চিন্তিত বলেই মনে হলো। এরপর বহু চেষ্টা করেও তাঁর কাছ হতে আমরা আর অন্য কোনও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি! এর পর নিষ্প্রয়োজনে আর এখানে অপেক্ষা না করে আমরা নীচে নেমে আমাদের অপেক্ষমান পুলিশ ট্রাকটার নিকট এসে দাঁড়ালাম।

'ওহে সুবোধ! তুমি একটা কায করো ভাই', আমি গাড়ীতে উঠে সহকারী সুবোধ রায়কে বললাম, 'এখান হতে তুমি সোজা সিংহ বাগানের সিংহী লেনের সেই বিখ্যাত সিংহী বাড়ীতে যাও। আমি এখন এখান হতে সোজা চলে যাবো প্রমীলা দেবীর বাড়ী। এতদিনে ঐ আহত যুবক সুশীলবাবু নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমি আর দেরী না করে আজই এই মামলা সম্পর্কে তাঁর একটা বিবৃতি নিতে চাই। তুমিও সিংহী-বাগানে সিংহী লেনে গিয়ে ঐ আহত যুবকের মাতুলকে সকল সমাচার জানিয়ে তাঁকে নিয়ে সোজা প্রমীলা দেবীর বাড়ীতে চলে আসবে। আমার মনে হয় ঐ আহত যুবকটীকে ঐ প্রমীলা দেবীর প্রভাব হতে মুক্ত করে তার মামাদের হেপাজতে তাকে তুলে দেওয়া প্রথমে আমাদের উচিৎ! এই ভাবে ঐ ডাইনী

স্ত্রীলোকের প্রভাবমুক্ত হয়ে অন্যত্র নীত হলে তবে আমরা প্রমীলা দেবীর বিরুদ্ধে ওর কাছ হতে একটা প্রয়োজনীয় বিবৃতি আদায় করতে পারবো। ঐ আহত রোগীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে আর দেরী করলে আমাদের মামলা আদালতে গেলে জুরী ও জজ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এদিকে ওঁর মামারাও বোধ করি ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তুমি আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়ো।

সহকারীকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে ঐ যুবকের মাতুলালয়ে পাঠিয়ে আমি সোজা প্রমীলা দেবীর বাড়ীতে চলে এলাম। আমার হাঁক ডাকে রোগীর ঘরের ভিতরের খিল খুলে বেরিয়ে এসে প্রমীলা দেবী পার্লারে আমাকে উপবিষ্ট দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। আমি এই দিন অবাক হয়ে দেখলাম যে তাঁর পূর্ব্বের পরিপাটি বেশভূষা নেই। চোখের নীচে স্বাভাবিক কালো দাগ এখন সুস্পষ্ট দেখা যায়। বিলাতী রঙিণ পাউডারের অভাবে তার মুখের এতাবৎকাল দৃষ্ট চকচকে ভাব আর নেই। অধিকন্তু তাঁর ঝলসে-পড়া ফ্যাকাশে মুখ দেখলে তাঁকে একজন বর্ষীয়সী মহিলা মনে হয়। এতো সত্বেও তিনি তাঁর অতি সুমিষ্ট সংলাপের ক্ষমতা এতটুকুও হারান নাই। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীত হল যে প্রয়োজন বোধে এই বিশেষ ক্ষমতাটুকুর তিনি আরও চর্চ্চা করে সেটা বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছেন।

আমাকে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত দেখে তিনি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিসের একটি নিদারুণ আশঙ্কায় তিনি থেকে থেকে কেঁপে উঠছিলেন। কিন্তু 'আমি এখানে এই আহত যুবকের বিবৃতি নিতে এসেছি শুনে তাঁর এই ভয়ের ভাব নিমিষের মধ্যে কেটে গিয়ে তাঁর ঠোঁটের ও চোখের কোনে একটা স্বস্তির হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো। তিনি এইব্যর তার পূর্ব্ব-অভ্যাস মত আমাদের দিকে চেয়ে চোখের কোনে অকারণে একটা ব্যর্থ ঝিলিক টেনে আমাকে অতি সমাদরে রোগীর ঘরে এনে বসালেন। এর পর তিনি পাশের ঘর থেকে অন্য ঘরে গিয়ে পূর্বের মত বেশভূষা করে এসে আমাকে খাতির করতে সুরু করে দিলেন। তার মধ্যে পূর্ব্বের মত দেমাক একটুও দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ঐ ভ্যানিটী-ব্যাগটী আমাদের হাতে পড়ার আশঙ্কায় তাঁর মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন এসেছিল।

আমি এইবার এই হৃতচক্ষু যুবকটীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। মুখ দিয়ে ভাষা ফুটাতে পারলেও চোখ দিয়ে ভাব প্রকাশ করতে আজ সে অক্ষম। তার যন্ত্রণা-কাতর মুখে জীবিত ব্যক্তিসুলভ চরিত্র আর ফুটে না। মুখে পীত জাতীয় মানুষের ন্যায় কোনও এক্স-প্রেশন বা ভাবের অভিব্যক্তি নেই। বেশ বুঝা গেল যে, দৈহিক যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ অবসান হলেও তার দৃষ্টিহীনতা-হেতু মানসিক যন্ত্রণা প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। সে পদ শব্দের মাধ্যমে আমার উপস্থিতি বুঝে দেহটা কাঠের মত শক্ত করে ওপরে ওঠাতে ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর পুনরায় বিছানার উপর শুয়ে পড়ে বালিশের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিল। চোখে দৃষ্টি না থাকলেও তার কোণ থেকে জল তখনও গড়িয়ে পড়ছে।

প্রমীলা দেবী ও আমি উভয়ে মিলে এই হতভাগ্য আহত যুবকটীকে বহুক্ষণ ধরে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিলে সে আমাকে এই দুর্ঘটনার বিবৃতি দিয়েছিল। এই বিবৃতিটী প্রমীলা দেবীর উপস্থিতিতে গৃহীত হওয়ায় আমি এইটীর উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিতে পারিনি। এই হতভাগ্য যুবকটীর এতৎসম্পর্কীয় বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'কিছুকাল যাবৎ আমি এই প্রমীলা দেবী ওরফে ডলির প্রতি আকৃষ্ট হই। প্রথম প্রথম আমি এই নিঃসম্পর্কীয়া প্রমীলাকে বড়ভগ্নীর মত মর্য্যাদা দিতাম। এরপর ধীরে ধীরে আমি তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠি। আমার এই নির্ভরশীলতা পরিশেষে এর প্রতি আমার আসক্তি এনেছিল। এর অকৃত্রিম আদর আপ্যায়ন আমাকে অস্থির করে তুলতো। য়ুরোপের সর্ব্বত্র এবং ভারতেও বয়সে কিছু বড়ো কনের চল আছে। এই ভেবে আমরা পরস্পরের সান্নিধ্য ত্যাগ না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। শেষের দিকে বাপ-মার মুখ চেয়ে কিছু সময় যে আমি আমার এই মত পরিবর্ত্তন না করে-ছিলাম তা' নয়। এই সময় কাশী হতে প্রমীলাকে আমি লিখি যে অমর প্রেমই প্রকৃষ্ট প্রেম। বাপ-মাকে খুশী

করীর জন্যে অন্যত্র বিয়ে করলেও তাকে আমি ভুলবো না। ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ ওই থাকবে আমার সহধর্ম্মিণী। পরজন্মে আমাদের লৌকিক মিলন নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু প্রমীলা পত্রে আমাকে জানায় যে একজনকে মন ও অন্যকে দেহ দেওয়া পাপ। তার পুনঃ পুনঃ পত্র পেয়ে আমি কাউকে না বলে কলকাতায় চলে আসি এবং যথারীতি বাবার অফিসে যাতায়াত সুরু করে দিই। এই সময় আমার পিতা তাঁর বন্ধুর এক কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক করে ফেলায় আমি কলকাতায় পালিয়ে আসি। এখানে প্রমীলা দেবীর সাহায্যে একটী হোটেলে একটা কক্ষে আমি উঠি; এর পর আমি পিতাকে আমার মনোভিলাষ জানিয়ে দিই। কিন্তু এই সম্বন্ধে তাঁর কাছ হতে এযাবৎ আমি কোনও উত্তর পাই নি। এর পর অমুক দিন আমি দু'জনে মিলে এর এই বাটীর মধ্যে ঢুকছিলাম। পাড়ার ছেলেদের বিরূপ মন্তব্যের ভয়ে প্রমীলা তার ভ্যানেটী ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছিল। এ'সময় সে একটু আমার থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। আমি এদের বাড়ীর ভিতর এগিয়ে দেখলাম যে প্রমীলা তাদের গলির গেটটা বন্ধ করছে। এদিকে কে একজন পিছন হতে আমাকে আক্রমণ করে জোর করে আমাকে চীৎ করে শুইয়ে চোখের ভিতর এক শিশি তরল পদার্থ ঢেলে দিলে। আমার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকলে সেই লোকটাকে আমি ঠিক চিনিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি কোনও ব্যক্তি বা বস্তু একটুও দেখতে পাই না। এই প্রমীলাকে না ছুঁলে বা ওর গলা না শুনলে ওকে প্রমীলা ব'লেও আমি বুঝতে পারি না। প্রমীলা তো ব'লে—যে ভালো ডাক্তারকে দিয়ে চীকিৎসা করিয়ে সে আমার দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়ে আনবে। একমাত্র এই আশাতেই আরও কিছুদিন আমি বেঁচে থাকবো। আমার বাপ'মা ত্যাগ করলেও প্রমীলা আমাকে কোনও দিন ত্যাগ করবে না। গুণ্ডাটা প্রমীলাকে আমার মত অবস্থা করতে পারেনি। এই জন্য আমি ঈশ্বরকে বারে বারে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আজ্ঞে হাঁ! ওই গুণ্ডাটা আমাকে আহত করে পেড়ে ফেলে আমার হাতের ভ্যানিটী ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলো। আচ্ছা! আপনাদের কি মনে হয় যে আমি আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে প্রমীলাকে ও আর সকলকে আগের মত দেখতে পাবো? হাঁ! আমার বাবা মা কেমন আছেন সেই সম্বন্ধে আপনারা কি কোনও খবর রাখেন? আপনারা দয়া করে আমার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাদের কোনও কিছুই জানাবেন না। এই খবর তাঁরা শুনলে তক্ষুণি তারা বোধ হয় দেহত্যাগ করবেন। আমি পিতৃ-মাতৃ হন্তারক হতে চাই না।"

এই বিবৃতিটি প্রদান করতে করতে এই আহত যুবকটী বারে বারে কেঁদে উঠছিল। এর চোখের জল দেখে আমারও চোখে জল এসেছে। আমি মুখ ফিরে দেখলাম যে প্রমীলা দেবীরও চোখে জল। কিন্তু তার চোখে এই জল অনুতাপপ্রসূত কি'না তা বুঝা গেল না। এর পর আমি অন্য কয়েকটী বিষয় বুঝবার জন্য তাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দিলাম।

প্রঃ—তুমি কি শুনেছো যে তোমার পিতা তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে তার যাবতীয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাঁর কোনও এক আত্মীয়-পুত্রকে তাঁর পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। এখন তোমার বাবা তোমাকে ক্ষমা করে পুনঃগ্রহণ করলে তুমি সেখানে ফিরে যাবে?

উঃ—আমার বাবাকে তাহলে আপনারা চিনতে পারেন নি। তিনি কোনও দিনই আমাকে পুনঃগ্রহণ করবেন না। যাকে আমার বাবা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছেন সে আমার বাল্যবন্ধু। তার এই সৌভাগ্যে আমি একটুও ঈর্ষান্বিত নই। এই পোষ্যপুত্র নেওয়া-নেয়ির বিষয় আমি ডলির কাছে পূর্ব্বে শুনেছিলাম। এ'ছাড়া এ মুখ নিয়ে আমি কোনও দিনই বাপ-মার কাছে ফিরবো না। বহু কষ্ট আমি এতদিন তাঁদের দিয়েছি। আর বেশী কষ্ট তাঁদের আমি দেবো না। আমার দৃষ্টিশক্তি না ফিরলে আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না।

এই আহত যুবকের শেষ উত্তরটী শোনা শেষ হওয়া মাত্র সেখানে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সকল সমাচার অবগত হয়ে এই আহত যুবকের মামা মামি ও বৃদ্ধা দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে আমার সহকারীর সঙ্গে রোগীর ঘরে ঢুকলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য মনে করলে আজও পর্য্যন্ত আমি শিউরে উঠি। এতগুলি নারীর সে কি

আছড়া-পিছাড়ী ও করুণ ক্রন্দন। তাদের এই দিনের অভিব্যক্তির সঙ্গে আমি একমত ছিলাম। ঈশ্বর যা দেবার তা মুক্তহস্তে এই দুই পুরুষের ধনী বংশের একমাত্র দুলালটীকে দিয়েছিলেন। রূপ স্বাস্থ্য যৌবন ধন-দৌলত শিক্ষা-দীক্ষা কর্ম্মক্ষমতা—এমন কি একজন সুন্দরী গুণবতী ভাবী ভার্য্যাকেও দিচ্ছিলেন। আবার সেই ঈশ্বরই মধ্যপথে এক নিমেষে তার কাছ হতে সবগুলিই নিঃশেষে নিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝে স্বর্গের পরীরা ঘুমিয়ে পড়লে শয়তানরা বোধ হয় এমনি করেই সব ওলট-পালট করে দেয়। এর পর এঁর এই সব আত্মীয়েরা বহুবার এই আহত যুবকটীকে নিজেদের আলয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ঐ ব্যাপারে তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত হলো।

'না না! আমি কোথাও যাবো না' হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বা অপদেবীর দ্বারা ভরগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রমীলাদেবীকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে এই হৃতচক্ষু যুবকটি বলে উঠলো —'একে ছেড়ে আমি আর কোথায়ও যাবো না। ওগো! তোমরা আমাকে ভুলে যাও। আমি আর তোমাদের কেউ নয়। তোমাদের কাউকে আর কোনও কষ্টই আমি দেবো না।

[ক্রমশঃ

বাঘ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

স্যাঁত-সেঁতে বন—জঙ্গল চারিদিকে ;
দারুণ দিনেও এখানে রৌদ্র ফিকে ;—
তরু-শিরে শুধু বর্ণালি যায় লিখে।

(২)

নাবাল জমিতে গুল্মগুচ্ছ ঘিরি'
টিলায় টলিয়া টাল্‌বাহানায় ফিরি'
গলিয়া—চলিয়া সোঁতা বয় ঝিরি-ঝিরি।

(৩)

রুক্ষ পথের সূক্ষ্ম সোঁতার পাশে—
বন্যতা যেথা ঘনতর হ'য়ে আসে,
সেথায় ঝিমায় দিবসে ব্যাঘ্র ঘাসে।

(৪)

গায়ের গন্ধে হিংস্রতা তা'র ঘোষে ;
নিশ্বাসে তা'র ফুলে-দুলে বায়ু রোষে
নিবিড় বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফোঁসে।

(৫)

শর্ব্বরী এলে সর্ব্ব
কানন ব্যেপে,
স্বভাব-হিংস্র ব্যাঘ্র সহসা ক্ষেপে
গর্জ্জে যখন, অরণ্য ওঠে কেঁপে।

(৬)

বিবরে বিবরে ভীতি-কুঞ্চিত কায়ে
রোমাঞ্চ জাগে ; ওৎ-পাতা বন-ছায়ে
নিশাচরও চরে নিভৃত ত্রস্ত পায়ে।

(৭)

তবু অলক্ষ্যে শিকার-বক্ষে পড়ি',
দংষ্ট্রাতে কভু গর্দ্দান রোষে ধরি',
ফেলে সে মাংস ছিন্ন-ভিন্ন করি'।

(৮)

চোয়াল বাহিয়া টাট্‌কা রক্ত ঝরে ;
দন্তে দন্তে উল্লাস ফেটে পড়ে ;
অক্ষি-গোলকে মৃত্যু নৃত্য করে।

(৯)

খাদ্যে-খাদকে বীভৎস—মনোহর
এ কোন্ দৃশ্য-স্তম্ভিত চরাচর !—
জীবন-মৃত্যু রঙ্গ ভয়ঙ্কর !

দুই পুরুষ

বাগানের মালিক ঃ তবে রে হতভাগা !···এই···এই ছোঁড়া···ফের আমার বাগানে সেঁধিয়ে গাছের ফল চুরি করতে এসেছিস !··· শীগগির নেমে আয় বলছি, নইলে এখুনি তোর বাবাকে বলে মজাটা টের পাওয়াচ্ছি তোকে !

পাড়ার ছেলে ঃ আজ্ঞে, বাবাকে আর ডাকবেন কেন ? ···বাবাও এই গাছে···ঐ মগ্‌ডালে··· আপনার হুঙ্কার শুনে ভয়ে ঐ পাতার আড়ালে লুকিয়েছে—পাছে আপনি হাতেনাতে ধরে ফেলেন !

শিল্পী ঃ পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক জন্মদিন

উপানন্দ

এ মাসের প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা। স্বামিজীর জন্মশতবার্ষিক উৎসব চলেছে বিশ্বের একপ্রান্ত হোতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। ইতিপূর্ব্বে এই মহাজীবনের জীবনী নিয়ে তোমাদের কাছে আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আজ তাঁর পুণ্য জন্মদিনে এসো আমরা তাঁকে আমাদের প্রাণের প্রণাম জানাই।

তিনি আমাদের কাছে দেহের ভিতরে আত্মার মত—স্বচ্ছ মধ্যদিনের মত। তিনি নব ভারতের বেদব্যাস—সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য। চল্লিশবৎসর পূর্ণ হবার পূর্ব্বে তিনি তাঁর মর্ত্ত্যলীলার সমাপ্তি রেখা টেনে দিয়ে মহা-সমাধিতে নিমগ্ন হয়েছেন। তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মদর্শন করেছিলেন মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বামীজির বহুমুখী ও সমন্বয়কারী ভাবধারা সম্বন্ধে তাঁর "পূর্ব্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের ভেতর কবিগুরু বলেছেন —'ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখা তাঁহার (বিবেকানন্দের) জীবনের উপদেশ নহে।...গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভারতের সমস্ত কুসংস্কার বিবেকানন্দ একাই ভেঙে দিতে পারতেন। দুঃখের বিষয় আমরা তাঁকে অল্পবয়সেই হারিয়েছি।' তিনি একবার রোমা রোঁলাকে বলেছিলেন—'If you wish to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative.

স্বামীজির সাধনা গুহাশায়ী আত্মকেন্দ্রিক সন্ন্যাসীর নির্ব্বাণ-মুক্তির সাধনা নয়, রাজনীতিপরায়ণ ব্যক্তির পরাধীনতার শৃঙ্খল-বন্ধন-মুক্তির সাধনা নয়, ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন পরিপূর্ণ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা। শক্তিমদমত্ত জড়বাদী ইউরোপ ও আমেরিকার ভোগদর্শনের সম্মুখে তিনি তুলে ধরেছিলেন প্রাচীন ভারতের অনাসক্ত সরল স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য ও সংযম, আবার আত্মপ্রত্যয়হীন ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন পাশ্চাত্যের রজঃশক্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিধারার সমন্বয়ে ভারতবর্ষকে এক অপূর্ব্ব তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করবার জন্যে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহচর হয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরের মানস পুত্র। তাঁর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-বাণীর উদ্‌গাতা ছিলেন স্বামীজি। তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে বলেছিলেন—'বিপদে প্রলোভনে ভগবান রক্ষা কর বলিয়া কান্দিয়া সারা হইয়াছি—কেহ উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার যাই হউন, নিজের অন্তর্যামিত্ব গুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহরণ করিয়াছেন।'

তাঁর মত—জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা। ধর্ম্মমত বলতে

তিনি বুঝ্তেন—'পৌরুষ, আত্মবিশ্বাস, মানবপ্রেম, তেজস্বিতা, সংযম, নৈতিক পবিত্রতা, হৃদয়বত্তা, নিঃস্বার্থ মানবপ্রীতি এবং উপাস্য দেবতার জীবন্ত মূর্ত্তিজ্ঞানে দীন দরিদ্র অসহায় নরনারী ও শিশুদের সেবা।' তিনি বলেছেন—'প্রত্যেক পূর্ব্বধর্ম্মমত পরধর্ম্মমতে বিদ্যমান। ধর্ম্মপরিবর্ত্তন মিথ্যা হইতে সত্যতে গমন নহে, পরন্তু এক সত্য হইতে সত্যান্তরে গমন।' শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন—'জ্ঞান মানবের মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে, বাইরে থেকে কোন জ্ঞান হয়না, জ্ঞান অন্তরেই রয়েছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে জানার অর্থ 'আবিষ্কার করা বা আবরণ উন্মোচন করা।'

মহাপ্রস্থানের কিছুদিন আগে বেলুড় মঠে সাঁওতাল শ্রমিকদের এক ভোজ দিয়ে স্বামীজি তাদের সকলকে বলেছিলেন—'তোমরা নারায়ণ, আজ আমি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণকে ভোজন করাচ্ছি—'

তিনি বলেছেন—'ভারত-মাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্নপ্রদান করবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ কর্‌বার জন্যে আমরণ চেষ্টা করবে।

ধীরে অথচ নিস্তব্ধভাবে কায করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুগ করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয়না, চরিত্রেই বাধাবিঘ্নের বজ্র দৃঢ় প্রাচীর ভেদ কর্‌তে পারে।

'দুটি জিনিষ হতে সর্ব্বদা বিশেষ সাবধানে থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।'

'পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় এই তিনটি গুণ আবার সর্ব্বোপরি প্রেম-সিদ্ধি লাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

স্বামীজি বলেছেন—'মানুষগঠনই আমার ধর্ম্ম।' তাঁর মতে—'So long as the millions die in hunger and ignorance, I hold every man, a traitor who having been educated at their expense, pays not the least heed to them.'

তিনি বলেছেন—'যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্ব্বলতাই সেই পাপ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—দুর্ব্বলতাই মৃত্যু। দুর্ব্বলতাই পাপ।' এ প্রসঙ্গে তিনি আবার বলেছেন—'দুর্ব্বল, ভীরু, স্বার্থপর, নির্জীবের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। তেজস্বী বীর্য্যবান সংযমীই ধর্ম্মলাভের অধিকারী। হে যুবকগণ, আগে নিজের উপর বিশ্বাস আনো। আত্মবিশ্বাস থাক্‌লে ঈশ্বরে বিশ্বাস আপনিই আসবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

"শত শত শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত জাতি, রাজা ও বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদের পিষিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের বলহরণ করিয়াছে।' তোমরা এক্ষণে পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের ন্যায় হইয়াছ। কে আমাদিগকে এক্ষণে বল দিবে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীর্য্য।'

"শক্তি, শক্তি—ইহাই আমাদের চাই, আমাদের শক্তির বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কে আমাদের শক্তি দিবে?...উপনিষদসমূহ শক্তির বৃহৎ আকর স্বরূপ।...মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহাতে উদ্ধারের (Salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হও।"

আজকের দিনে স্বামীজির এই সব বাণী তোমাদের পরম পাথেয় হোক। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সেদিন সার্থক হবে, যেদিন তোমরা স্বামীজির বাণী অনুসরণ করে ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করবে। যে দেশের ঘরে বাইরে অন্তর্ঘাতী গৃহদাহী স্বদেশ ও সমাজঘাতী শত্রুর আধিক্য, যে দেশে তোমরা জন্মেছ, যে দেশের স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করে রাখা তোমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য, তোমাদের কর্ত্তব্য নবভারত গঠনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা, তোমাদের কর্ত্তব্য সমাজ ও স্বদেশের উন্নয়ন, আর শত্রু নিপাত। এ জন্য

স্বামীজির গ্রন্থগুলি পাঠ করে তাঁর পথ নির্দ্দেশ অবলম্বন করে শক্তি সঞ্চয় করা আর এগিয়ে যাওয়া প্রধান কর্ত্তব্য, তা না হোলে ভারতবর্ষকে আবার শোচনীয় পতনের সম্মুখীন হয়ে পরপদানত হোতে হবে। তোমাদের পূর্ব্ব দ্বারে দস্যু চীন করাঘাত করছে। মনে রেখো স্বামী বিবেকানন্দই তোমাদের ধ্যানের বিগ্রহ, তাঁর আদর্শই তোমাদের ধর্ম্ম।
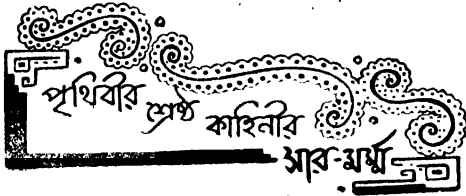
স্যার ওয়ালটার স্কট
রচিত

রব রয়

সৌম্য গুপ্ত

[খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বনামধন্য কবি-ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কটের অসামান্য প্রতিভার বিচিত্র অবদান বিশ্ব-সাহিত্যে আজো অমর হয়ে রয়েছে। জাতে 'স্কচ্ (Scotch) অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী হলেও, স্যার ওয়ালটার স্কট ছিলেন ইংরাজী-সাহিত্যে দিকপাল-লেখক। অভিনব সাফল্য-গৌরবমণ্ডিত সুদীর্ঘ সাহিত্যিক-জীবনে তিনি অপরূপ-রোমাঞ্চকর বহু কাব্য আর উপন্যাস লিখে গেছেন। স্কটের এই সব কাব্য-কাহিনী ইতিহাসকে ভিত্তি করে রচিত। কয়েকটি খণ্ডে লেখা তাঁর সুবিখ্যাত 'ওয়েভার্লি নভেলস্' (Waverly Novels) সেকালের মতোই, একালের সাহিত্যানুরাগীদের কাছেও অবিস্মরণীয়-সম্পদ। স্যার ওয়ালটার স্কটের জন্ম—১৭৭১ সালে…স্কট-ল্যাণ্ডের এডিনবরা সহরে। সুদীর্ঘকাল সাহিত্য-সাধনার পর, অবশেষে ১৮৫২ সালে, ৮১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। 'রব রয়' (Rob Roy) স্যার ওয়ালটার স্কটের রচিত বিশেষ জনপ্রিয় একটি অমর উপন্যাস।]

প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা…ইংলণ্ডের সঙ্গে তখন স্কটল্যাণ্ডের চলেছে প্রচণ্ড বিরোধ। স্কটল্যাণ্ডের প্রজারা চায়—ইংরেজ-শাসন থেকে মুক্তি! স্কটল্যাণ্ডের পথে-প্রান্তরে, গিরিবর্মে চলেছে বিদ্রোহী-স্কচদের সঙ্গে ইংরেজদের তুমুল সংগ্রাম। এমনি এক স্কচ-বিদ্রোহীদের দলের নেতা—রব রয়। তিনি আগে ছিলেন বণিক…কিন্তু ইংরেজের অত্যাচারে হয়েছেন বিদ্রোহী-দস্যু এবং জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ড থেকে ইংরেজদের দূর করবার জন্য বিরাট দল গঠন করেছেন। রব রয়ের দলের ব্রত—দুষ্টের দমন…শিষ্টের পালন…দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার অনাচারের অন্যায়-জুলুম থেকে দীন-দুঃখী-অসহায়দের রক্ষা করা। রব রয় আর তাঁর দুর্দ্ধর্ষ-দলের দাপটে সকলে সন্ত্রস্ত।

এই সময়ে ইংলণ্ডের এক ধনী সদাগর-পুত্র ফ্রান্সিস ফ্রান্সে থেকে লেখাপড়া করছিলেন…পিতার জরুরী-পত্র পেয়ে তিনি বাড়ী ফিরেছেন। পিতার একমাত্র পুত্র…বাপ বললেন,—বয়স হয়েছে এবার আমার ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার নাও। ফ্রান্সিস বললেন,—না, আমার ফুরসৎ নেই। আমি এখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো…নানা জাতের নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করবো।

বাপ কিন্তু জিদ ধরলেন—ছেলের মন তবু অটল। বাপ তখন ফ্রান্সিসকে পাঠালেন উত্তর-ইংলণ্ডে—তাঁর ছোট-ভাইয়ের কাছে। ছোট-ভাইয়ের ছয় পুত্র… ফ্রান্সিসকে নিয়ে তাঁর সংসার থেকে ফ্রান্সিসের বদলে নিজের ছয় ছেলের মধ্যে একটি ছেলেকে বড়-ভাইয়ের কাছে পাঠাতে হবে…সেই ছেলের হাতে বড়-ভাই সদাগর দেবেন বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার।

ফ্রান্সিস বাপের এই ব্যবস্থামতো ঘোড়ায় চড়ে চললেন স্কটল্যাণ্ডে তার কাকার কাছে। পথে ফ্রান্সিসের সঙ্গে আলাপ হলো স্যার মরিসের সঙ্গে। স্যার মরিস বিশিষ্ট একজন রাজকর্ম্মচারী… যেমন মোটা দেহ তাঁর, তেমনি মোটা বুদ্ধি! স্যার মরিসের সঙ্গে আছে—প্রকাণ্ড একটি

থলি···সে থলিতে রয়েছে বহু অর্থ, আর একরাশ দরকারী দলিল-দস্তাবেজ।

বিরাট থলি হাতে বিপুল-বপু ঘোড়সওয়ার স্যার মরিসকে দেখে ফ্রান্সিসের কৌতূহল হলো··সে প্রশ্ন করলে,—ঐ প্রকাণ্ড থলিতে ভরে কি বিপুল সম্পত্তি নিয়ে চলেছেন আপনি ?

একে অচেনা লোক, তার উপরে এমন বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে কম্পিত-কণ্ঠে স্যার মরিস জবাব দিলেন,—না, না, ধন-সম্পত্তি নেই···আছে শুধু কটা পোষাক-আশাক !

স্যার মরিসের মনে ভয় হলো···তিনি ভাবলেন—ফ্রান্সিস নিশ্চয় কোনো ডাকাতের দলের লোক। কারণ, সেকালে নিরালা-পথে পথচারীদের উপর হামেশা চলতো ডাকাতের এমনি আচমকা উৎপাত-উপদ্রব—আর খুন-রাহাজানীর হামলা।

কিন্তু উপায় নেই···স্যার মরিস যেদিকে চলেছেন, ফ্রান্সিসও সেই পথের পথিক। সুতরাং দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে পাশাপাশি একই পথে চলে সন্ধ্যার সময় দুজনে এসে আশ্রয় নিলেন গ্রামের একটা সরাইখানায়। সরাইখানার মালিককে স্যার মরিস জানালেন—তাঁর সন্দেহের কথা। সে কথা শুনে সরাইখানার মালিক তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন,—ডাকাতের হামলার কোনো ভয় নেই এখানে।

দুজনের আলোচনা চলেছে, এমন সময়, সেই সরাইখানায় এসে হাজির হলেন দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক। সরাইখানার মালিক স্যার মরিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—আগন্তুকের নাম মিষ্টার ক্যাম্পবেল···সদ্য-কিছুদিন আগেই দুর্দ্ধর্ষ দুই ডাকাতকে উনি একাই শায়েস্তা করেছিলেন !

এ কথা শুনে স্যার মরিস তো মহাখুশী···নিমেষের মধ্যেই তিনি ক্যাম্পবেলের সঙ্গে রীতিমত আলাপ জমিয়ে তুললেন।

সে রাত নিরাপদেই কাটলো। পরের দিন সকালে নতুন বন্ধু ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে স্যার মরিস বেরুলেন—সরাইখানা ত্যাগ করে পথে। পথের সঙ্গী স্যার মরিসকে হারিয়ে বেচারী ফ্রান্সিস চললো একা—তার নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে !

পথে একা-নিঃসঙ্গ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ফ্রান্সিস··· প্রকৃতির শোভা মাধুরী দেখতে দেখতে শ্যাম-তরুশ্রেণীতে খচিত মনোরম পল্লী-উপত্যকা পার হয়ে···কাকার গৃহে পৌছুতে মাত্র আর ক'মাইল পথ বাকী, এমন সময় হঠাৎ তার কানে এলো—পিছনে ছুটন্ত-ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ! ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ফ্রান্সিস দেখে—পরমাসুন্দরী এক কিশোরী সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে! পথে কি যেন বাধা পেয়ে কিশোরীর ঘোড়া হঠাৎ বেটক্কর হোঁচট খেলো···বিপদের আশঙ্কা বুঝে ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে এনে পাশে দাঁড়াতেই, কিশোরী আর তার ঘোড়া কোনোমতে পতন থেকে রক্ষা পেলো।

বিপদে সহায়তার ফলে, কিশোরীর সঙ্গে ফ্রান্সিসের হলো আলাপ-পরিচয়। ফ্রান্সিস জানতে পারলেন অপরিচিতা সেই কিশোরীর নাম ডাইনা···ফ্রান্সিসের খুড়িমার ভাইঝী···ছেলেবেলা থেকেই সে মানুষ হচ্ছে খুড়িমার কাছে।

ডায়নার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে ফ্রান্সিস এলো তার কাকার গৃহে। ফ্রান্সিসকে পেয়ে সকলে মহাখুশী···খুড়তুতো ভাইয়েরাও খুশী, শুধু কাকার ছোট ছেলে র‍্যালের ভালো লাগলো না তাদের সংসারের এই নতুন অতিথিটিকে !

ফ্রান্সিসের কাকা স্থির করেছেন—তাঁর ছোট ছেলে এই র‍্যালেকেই পাঠাবেন ইংলণ্ডে—দাদার কাজ-কারবারের ভার নেবার জন্যে। র‍্যালে যেমন অধ্যবসায়ী, তেমনি বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান···কাজের মানুষ সে। র‍্যালের মনে দারুণ ঈর্ষা···সে দেখলো—এ-বাড়ীতে ফ্রান্সিসের খুব আদর···ডায়নাও তাঁকে প্রায় মাথায় তোলে! ফ্রান্সিসের সঙ্গে ডায়নার এ অন্তরঙ্গতা দেখেই র‍্যালের এমন বিরাগ জন্মালো। র‍্যালে ওদিকে মনে মনে স্থির করে রেখেছে—এই ডায়নাকে সে একদিন করবে বিবাহ! সেইজন্যই ফ্রান্সিসের সঙ্গে ডায়নার এ মেলামেশা সে পছন্দ করে না। তাছাড়া সে চলেছে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সিস থাকবে এখানে···কে জানে, এই সুযোগে ডায়না যদি শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সিসকেই বিবাহ করতে চায় !

র‍্যালের দারুণ দুশ্চিন্তা···কাকে এ সব কথা প্রাণ

খুলে বলতে পারে না সে···সারাক্ষণ মনে শুধু ভয়-সংশয়! শেষে র‍্যালে একদিন নিজের বাড়ী ছেড়ে করলো ইংলণ্ডে যাত্রা···ডায়না খুশী মনে হাসি মুখে তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালো।

এদিকে ঘটলো আরেক ঘটনা!

ইতিমধ্যে পথের মাঝে স্যার মরিসের সেই বিরাট থলিটি হঠাৎ লুঠ হলো ডাকাতের হাতে। স্যার মরিস করলেন পুলিশে নালিশ। পুলিশকে তিনি খবর দিলেন—পথের সেই অচেনা-অজানা সঙ্গী ফ্রান্সিস ডাকাতের দলের লোক,—এ নিশ্চয় তারই কারসাজি!

[ক্রমশঃ

—
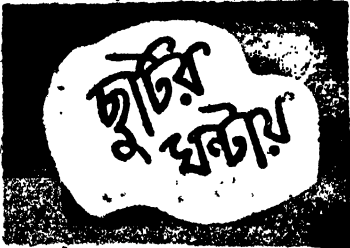
চিত্রগুপ্ত

এবারে যে মজার খেলাটির কথা বলছি, সেটি থেকে শুধু যে বিজ্ঞানের অভিনব-তথ্যের সন্ধান মিলবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় পাবে—'ভার-সাম্যের' (Balancing) বিচিত্র-আজব এক কারসাজির। বড়দিনের ছুটিতে তোমাদের মধ্যে যারা সার্কাশ দেখতে গিয়েছিলে, তাদের নিশ্চয় মনে আছে—তাঁবুর এক-প্রান্ত থেকে অপর-প্রান্তে শক্ত টান্-করে-বাঁধা লম্বা তার (Wire) কিম্বা দড়ির উপরে দিব্যি সহজ-সচ্ছন্দগতিতে রঙীণ পোষাক-পরা খেলোয়াড়দের হেঁটে-চলা আর দৌড়-ঝাঁপের নানা রকম তাক্-লাগানো কসরৎ-বাহাদুরীর অদ্ভুত কীর্ত্তি-কলাপ। সার্কাশের তাঁবুতে বসে সরু-লম্বা তার কিম্বা দড়ির উপরে খেলোয়াড়দের এ সব বিচিত্র-কসরতীর খেলা দেখতে দেখতে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠে তোমরা অনেকেই হয়তো তখন ভেবেছো—এই বুঝি পা ফশ্‌কে পড়ে গেল তারা···কিন্তু নিমেষেই রুদ্ধ-বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছো যে কেমন অনায়াসে অবলীলাক্রমে নিজেদের শরীর এবং ছাতা, চেয়ার, সাইকেল, লোহার বা কাঠের ডাণ্ডা প্রভৃতি নানা-ধরণের সাজ-সরঞ্জামের সহায়তা অভিনব-কৌশলে ভার-সাম্য (Balance) বজায় রেখে প্রত্যেকটি খেলোয়াড় নিপুণ-ভঙ্গীতে একের পর এক বিভিন্ন খেলা দেখিয়ে চলেছেন। এমন সহজ-সুন্দর-ভাবে সরু তার বা দড়ির উপরে এই সব বিচিত্র কসরৎ সার্কাশের খেলোয়াড়েরা দেখাতে পারেন শুধু দীর্ঘ দিনের নিয়মিত অভ্যাস-অনুশীলনের ফলে। এবারে বিজ্ঞানের যে মজার খেলাটির কথা তোমাদের বলছি, সেটিও ঠিক এমনি-ধরণের···তবে সার্কাশের তাঁবুর আসরে এ কসরৎ দেখান—প্রাণবন্ত মানুষ-খেলোয়াড়, আর বাড়ীর ছোটখাট ঘরোয়া-মজলিশে 'ভার-সাম্যের' এই আজব-কারসাজি দেখাতে হলে, দরকার শুধু নিতান্তই সাধারণ সামান্য কয়েকটি টুকিটাকি সরঞ্জাম—এইটুকুই যা তফাৎ। কাজেই এ খেলা দেখানোর সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা খুব একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়—তোমরা অনায়াসে নিজেদের বাড়ীতে এ সব উপকরণ জোগাড় করে নিতে পারবে। 'ভার-সাম্যের' এই আজব-কারসাজির খেলা দেখাতে হলে, কি কি জিনিষ দরকার—গোড়াতেই তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—দুটি 'শোলা' বা 'কর্কের' (Cork) ছিপি—একটি বড় এবং আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের, একটি পেন্সিল-কাটার ছুরি, দুটি বিলাতী খানা-খাবার কাঁটা (Table-Forks), খানিকটা 'কোথাও এতটুকু মরচে-না-ধরা' দিব্যি ঝক্‌ঝকে-মসৃণ লম্বা 'তার' (wire) কিম্বা 'টোয়াইন সুতো' (Twine-chord), আর পাঁচটি লম্বা-ছাঁদের সরু-মজবুত কাঠি বা দেশলাই-শলাকা (Match Stick)।

উপরের ফর্দ্দমতো খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, এ কারসাজি দেখানোর যে সব কায়দা-কানুন জেনে রাখা দরকার, আপাততঃ তার হদিশ দিই তোমাদের।
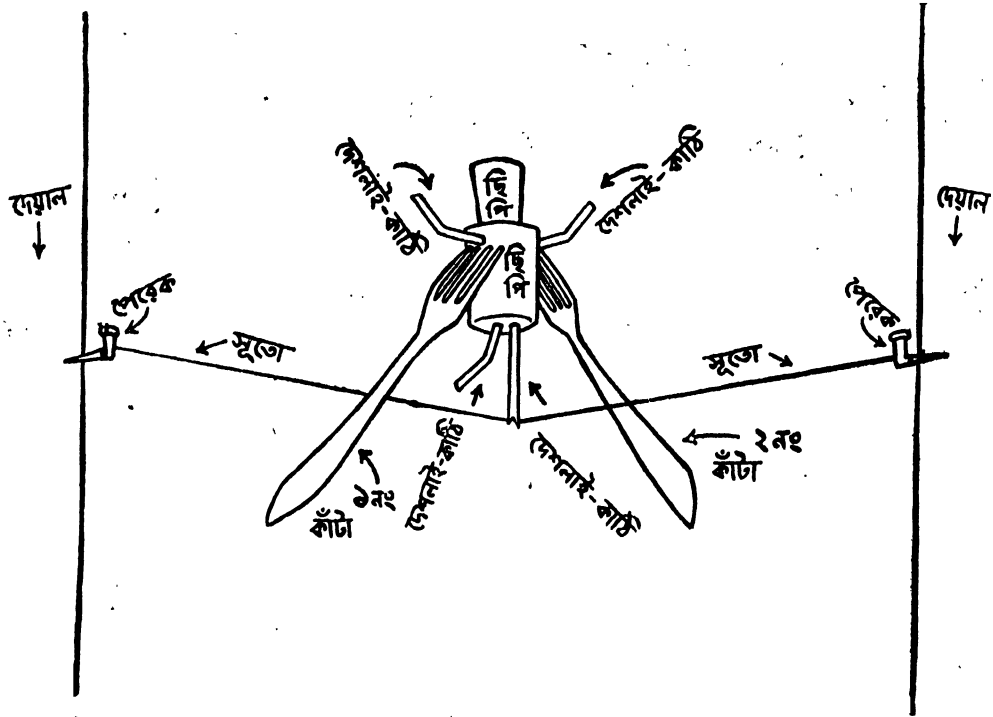
উপরের ছবিতে যেমন নমুনা দেখতে পাচ্ছো, ঠিক তেমনিভাবে বড়-ছিপির মাথায় ছোট-ছিপিটিকে বসিয়ে, উপরোক্ত পাচটি লম্বা-কাঠির মধ্যে থেকে একটি কাঠি বেছে নিয়ে, সেই কাঠিটির একদিকের শেষ-প্রান্ত ছুরি দিয়ে পেরেকের ছুঁচোলো-ফলার মতো ছাঁদে কেটে, ছিপি দুটিকে একত্রে গেঁথে দাও। এবারে ঐ ছোট-ছিপিটির একদিকে রঙ-তুলির রেখা টেনে নাক, ঠোঁট, একজোড়া চোখ আর ভুরু এঁকে দিলেই, সেটি দিব্যি মানুষের মুখের মতো চেহারা ফুটে উঠবে। তারপর ঐ ছিপি-দিয়ে-তৈরী আজব-পুতুলটির দেহ অর্থাৎ ছোট-ছিপির তলায় কাঠের পেরেক-গাঁথা বড়-ছিপিটির গায়ে বাকী চারটি লম্বা-কাঠি দিয়ে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, হুবহু তেমনি-ধরণে একজোড়া হাত আর পা এঁটে দাও। বড়-ছিপির গায়ে এঁটে-বসানোর আগে, আজব-পুতুলের হাত-পা রচনার জন্য প্রত্যেকটি কাঠির একদিকের শেষ-প্রান্ত কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-পদ্ধতিতে ছুরি দিয়ে কেটে পেরেকের মুখের মতো ছুঁচোলো করে নিতে হবে। এছাড়া আরো একটি কাজ সেরে রাখা দরকার। সেটি হলো—পুতুলের হাত-পা বানানোর উদ্দেশ্যে, বড়-ছিপির গায়ে গেঁথে-বসানোর সময় চারটি কাঠির মধ্যে তিনটিকে উপরের ছবিতে দেখানো নমুনার ছাঁদে ঈষৎ দুমড়ে বাঁকিয়ে নিতে হবে…শুধু একটি কাঠি অর্থাৎ ছিপি-দিয়ে-তৈরী পুতুলের একদিকের পা থাকবে অটুট এবং খাড়াখাড়িভাবে বড়-ছিপির তলায় আঁটা। বড়-ছিপির তলায় খাড়াখাড়ি-ভঙ্গীতে গাঁথা আজব-পুতুলের দুটি পায়ের মধ্যে যেটি সোজা, সেটির তলায় কাঠির শেষ-প্রান্তে সন্তর্পণে ছুরি দিয়ে কেটে সুক্ষ্ম-ছাঁদের ছোট্ট একটি দু-কোণা 'খাঁজ' (Notch) বানাও—উপরের ছবিতে যেমন নমুনা দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ধরণে। এভাবে 'খাঁজ-রচনার সময়, সর্ব্বদা নজর রাখতে হবে যে সেটি যেন দুদিকের দেয়ালে-খাটানো 'তার' বা 'দড়ির' মাপ-অনুযায়ী হয়। কারণ, এ কাজে ত্রুটি, অর্থাৎ, 'তার' কিম্বা 'দড়ির' আর 'খাঁজের' মাপ কম-বেশী হলে 'ভার-সাম্যের' এই আজব-কারসাজির খেলাটি (Balancing-Trick) তেমন জমবে না…কসরৎ-দেখানোর সময়েও নানান অসুবিধা ঘটবে। কাজেই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ছিপি আর কাঠি দিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের এই পুতুলটি রচনা পর, ঘরের দু'দিকের দেয়ালে মজবুতভাবে দুটি পেরেক এঁটে, সেই পেরেকে বেশ 'টান্' করে ঐ লম্বা-

সরু 'তার' (Wire) বা 'দড়ি' (Chord) খাটিয়ে রাখো—সার্কাশের তাঁবুতে 'তারের' বা 'দড়ির' খেলার কসরৎ দেখানোর সময় যেমন চোখে পড়ে, অবিকল তেমনি-ভঙ্গীতে!

এভাবে ঘরের দেয়ালে 'তার' বা 'দড়ি' খাটানোর পালা শেষ করে, এবারে বড়-ছিপিটির দুই পাশে বিলাতী 'খানা-খাবার 'কাঁটা' (Table-Forks) দুটিকে এঁটে দিন—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, হুবহু তেমনি ধরণে···তাহলেই টান্-করে-খাটানো 'তার' বা 'দড়ির' উপরে ছিপি-আর কাঠি দিয়ে তৈরী আজব-পুতুলের 'ভার-সাম্য' (Balancing-organs) বজায় রাখার চমৎকার ব্যবস্থা হবে।

এ ব্যবস্থা সেরে নিয়ে সুরু করতে হবে—খেলার কসরৎ দেখানো। ঘরোয়া-মজলিশে প্রাণহীন-পুতুলের সাহায্যে কসরৎ-দেখানোর কায়দা-কানুন কিন্তু নিতান্তই সহজ-সরল···সার্কাশের প্রাণবন্ত-খেলোয়াড়দের মতো কোনোরকম মেহনৎ বা কৌশলের প্রয়োজন নেই··· বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে, অন্য কারো সাহায্য না নিয়েই 'ছিপি আর কাঠির তৈরী পুতুল' নিজে নিজেই শরীরের ভার বজায় রেখে 'তার' বা 'দড়ির' উপর দিব্যি হেলে-দুলে দাঁড়িয়ে থেকে অনায়াসেই দর্শকদের সবাইকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেবে। তোমরা হয়তো ভাবছো—কেমন করে ঘটবে এমন কাণ্ড?···শোনো তাহলে—সে রহস্যের আসল মর্ম্ম!

খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলি আয়োজনের সময়, 'খানা-খাবার কাঁটা' বেঁধা 'ছিপি আর কাঠির তৈরী পুতুল' এবং 'তার' বা 'দড়ি' খাটানোর কাজটুকু যদি নিখুঁতভাবে সারতে পারো তো, ঘরোয়া আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখাতে গিয়ে এতটুকু হাঙ্গামা বা দুর্ভোগ সইতে হবে না তোমাদের। অর্থাৎ, খেলা দেখানোর সময় শুধু হুঁশিয়ার হয়ে ঘরের দেয়ালে টান্-করে-খাটানো 'তার' বা 'দড়ির' উপরে ছিপির-পুতুলের অক্ষত-পায়ের 'খাঁজ'-কাটা অংশটিকে বসিয়ে দাও···তাহলেই দেখবে—বড়-ছিপির দু'পাশে 'খানা-খাবার-কাঁটা' দুটি গেঁথে রাখার জন্য, পুতুলটি নিজেই বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মানুসারে শূন্যে-ঝোলানো ঐ 'তার' বা 'দড়ির' উপর তার দেহের 'ভার-সাম্য, (Balance) আগাগোড়া বজায় রেখে দু'চারবার টাল্ সামলে শেষ পর্য্যন্ত দিব্যি-সুন্দর খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে·· কোনমতেই 'ভার-সমতা' হারিয়ে বেটাল্ হয়ে 'দড়ি' বা 'তারের' উপর থেকে খশে নীচে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে না! এই হলো—এ মজার খেলার কার-সাজি! এভাবে 'তার' বা 'দড়ির' উপর খাড়া দাঁড়িয়ে থাকার সময়, যদি তুমি পিছন থেকে মৃদু ফুঁ দাও, তাহলে দেখবে—ছিপির-তৈরী পুতল নিজেই হেলে-দুলে ধীরে গতিতে মসৃণ 'তার' বা 'দড়ি'র উপর দিয়ে দিব্যি গড়্‌গড়িয়ে এগিয়ে চলতে সুরু করেছে। চলবার সময় যদি ছাখো যে পুতুলটি সাবলীল-গতিতে না চলে থমকে-থমকে এগুচ্ছে, তাহলে ঘরের দেয়ালের দুই-প্রান্তে খাটানো ঐ 'তার' বা 'দড়িটিকে আরো একটু কষে টান্ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নাও এবং সেটির উপর হাতে করে অল্প একটু পাতলা তেল কিম্বা মুখে-মাখবার 'প্রসাধনী-ক্রীম' (Face-Cream) মাখিয়ে 'তৈলাক্ত-পিচ্ছিল' (Greasy) করে দাও। দেখবে—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেয়ালে শক্ত-টান্ করে খাটানো ঐ 'তার' বা 'দড়ির' উপরে খাড়াখাড়ি-ভাবে-রাখা ছিপির-তৈরী পুতুলের চলার গতিও হবে সহজ-সরল আর সাবলীল!

মনোহর মৈত্র

১। অঙ্কের আজব হেঁয়ালিঃ

১১১	৪৪৪	৭৭৭
২২২	৫৫৫	৮৮৮
৩৩৩	৬৬৬	৯৯৯

উপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছো—একখানি শ্লেটে নয়-রকমের সংখ্যা লিখে প্রত্যেকটিকে আলাদা-আলাদা লাইনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

এমন একটি নতুন সংখ্যার নাম করো—যে সংখ্যাটিকে কোনো সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা যায় না—অথচ সে সংখ্যা দিয়ে উপরের ঐ শ্লেটে লিখে-রাখা নয়টি সংখ্যার প্রত্যেকটি সংখ্যাকে অনায়াসেই ভাগ করা চলে। ছাখো তো চেষ্টা করে—অঙ্ক কষে এই আজব-হেঁয়ালির সঠিক-উত্তর দিতে পারো কিনা তোমরা কেউ!

২। 'কিশোর-জগতের'

সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

ভারতবর্ষের এমন একজন মহান্-ব্যক্তির নাম করো, যিনি মহামূল্য জিনিষ হাতে পেয়েও গ্রহণ করেননি…যাঁর নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি জলচর-জীব, বাঙালী জাতির একটি পদবী এবং পৃথিবীর উন্নতিশীল এক বিরাট জাতি।

রচনা ঃ ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী)

৩।

নানা রঙে তৈরী আমি,
দেহেতে প্রাণ নাই…
গ্রীষ্মকালে তোলাই থাকি,
শীতে মানুষ পাই!

রচনা ঃ রেখা ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ
(যশপুরনগর, রায়গড়)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১।
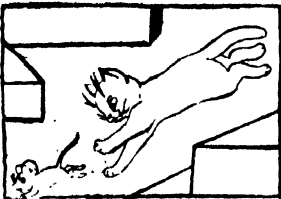
ছবির বিভিন্ন টুকরোগুলিকে ঠিকমতো সাজিয়ে বসালেই উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, খামখেয়ালী চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা হেঁয়ালির ছাঁদে রচিত 'ইঁদুর আর বেড়ালের' আসল-চিত্রটির সঠিক-সন্ধান মিলবে।

২। আমড়া

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), প্রমীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কুলু মিত্র (কলিকাতা) পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা), আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কাশীপুর)।

গত মাসের প্রথম ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বুবু ও মিধু গুপ্ত (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), লাড়ু ও কবি হালদার (কোরবা)।

গত মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পিণ্টু হালদার (বর্দ্ধমান), পঞ্চু ঘোষ (কলিকাতা), ধনু, কৃষ্ণা, কালো, চীনু ও চন্দন (লাভপুর), সুরাগময়, ধীরাগময়, ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), পল ও ডলি মিত্র, সতীরূপা, বন্দনা, রঞ্জনা, বাণীরূপা, সীমা ও বনানী সিংহ (মেদিনীপুর), ইলা, ছন্দা, সুভাষ, রেখা, সোনা, শ্যামলী, কল্যাণী, দীপালী, মণিকা, কণিকা, সুপ্রিয়া ও বাবলী দত্ত (আসানসোল), বিপুল সরকার (পতিরাম), প্রদ্যোৎ, বিদ্যুত, করুণা, স্বপ্না ও গোকুল মিত্র (জয়নগর), বিদ্যাধরপুর বাণীশ্রী পল্লীগ্রন্থাগারের সভ্যগণ(বাঁকুড়া)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

বিচিত্র-ছাঁদের এই যে জলযানটি দেখছো, এগুলির নাম 'বালসা' (BALSA) এই ধরণের নৌকা ব্যবহার করা হয় দক্ষিণ-আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু (PERU) ও ব্রাজিল (BRAZIL) এলাকায় প্রচুর পাওয়া যায় 'বালসা' নামে বিচিত্র এক-জাতের গাছ, সেই গাছের মজবুত-কাঠ দিয়ে এ সব জলযান তৈরী হয় বলেই এগুলিকে ওদেশী-বাসিন্দারা বলেন 'বালসা'। শুধু কাঠই নয়, 'বালসা' নৌকা তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয়— গরু আর মোষের চামড়া দিয়ে বানানো ছোট-বড় বিবিধ-আকারের লম্বা-লম্বা বেলুনের মতো বাতাস-ভরা 'মশক'। এই সব 'মশকের' উপর বাঁধা থাকে কাঠের পাটাতন।

অদ্ভুত-ছাঁদের এই পাল-তোলা জলযানের নাম — 'সাম্‌পান্‌' (SAMPAN)। এই ধরণের 'সাম্‌পান্‌' নৌকা ব্যবহার হয় বর্ম্মা, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালয় ও চীন দেশে। এগুলি তৈরী হয় কাঠের তক্তা দিয়ে। 'সাম্‌পান্‌' নামটি এসেছে চীনা-ভাষা থেকে... চৈনিক-ভাষায় 'সাম্‌' কথাটির অর্থ হলো — 'তিন', এবং 'পান্‌' শব্দ বলতে বোঝায় — 'তক্তা' বা 'পাটাতন'। অর্থাৎ, তিনটি করে কাঠের তক্তা জুড়ে এ-ধরণের জলযান বানানো হয় বলেই এগুলিকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। শুধু জলপথে ভ্রমণ আর মালপত্র পরিবহন ছাড়াও চীন দেশের বহু লোক সপরিবারে বসবাস করে 'সাম্‌পানে'।

কাঠের তৈরী মজবুত 'ফ্রেমের' (FRAME) কাঠামোর 'সীল-মাছের চামড়া' (SEALSKIN) মুড়ে বানানো ডিঙির মতো এই বিচিত্র-ছাঁদের জলযান ব্যবহার করেন আলাস্কার (ALASKA) মেরু-প্রদেশের 'এস্কিমো' (ESKIMO) জাতীয় অধিবাসীরা। এ সব নৌকার নাম দিয়েছেন তাঁরা 'ক্যায়াক্‌' (KAYACK)। 'ক্যায়াক্‌' ডিঙিতে থাকে মাত্র একজন নৌ-চালক বসবার ব্যবস্থা... যিনি দাঁড়ী, তিনিই আরোহী। এই নৌকায় চড়ে এস্কিমোরা জলপথে যাতায়াত ও 'সীল-মাছ' শীকার করে বেড়ান মেরু-প্রদেশে হিম-শীতল জলে, বরফে-ঢাকা নদী, নালা, সমুদ্রোপসাগরের সর্ব্বত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গৌরাঙ্গ লীলার তুমি প্রকাশানন্দের মত, রামকৃষ্ণলীলা
করে গেলে শাশ্বত সুন্দর, বস্তু চেতনার সাথে দিব্যময়
করি যুগচেতনারে। দিয়ে গেলে সত্যসন্ধ আত্ম-পরিচয়
চৈতন্যের উদ্বোধনে, চূর্ণ করি তামসিক সভ্যতার শিলা।
অন্তরে পরমহংস, বাহিরে সারদাশক্তি অব্যক্ত মধুর
দেখায়েছ বিশ্বজনে, অদ্বৈতেরে দ্বৈতে এনে
দ্বৈতাদ্বৈত করি';
পরমব্রহ্মেরে তুমি এনেছ যে নররূপে দর্প করি চূর
চার্ব্বাকবাদের, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় তরে দ্বন্দ্ব পরিহরি।
আত্মস্বরূপের সাথে ঈশ্বরের পূর্ণরূপ করিতে দর্শন
পথের সন্ধান দিলে রামকৃষ্ণ মহামন্ত্রে জীবের কল্যাণে;
অনাদি অনন্ত বিশ্বে, ভূমি ও ভূমায় আর জ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে,
তমোহত মানুষেরে করুণায় হেরি তব নিত্য আকর্ষণ।

উপনিষদের অভীমন্ত্র ভুলি, এ ভারত যবে বীর্য্যহীন,
আত্মহননের পথে দাঁড়ালো বিভ্রান্তি লয়ে অবনত শিরে,
পরপদানত হয়ে দ্বন্দ্ব দ্বেষ সমাচ্ছন্ন তমসার তীরে,
মৌন মরণেরে ঘিরি ধীরে ধীরে জড়িমার স্রোতে অবলীন
হোতে চলেছে আবেগে, পাশ্চাত্যের আদর্শেরে পূজি
আপনারে—
ভাবে যবে এ ভারত, কৃপাধন্য নিত্য পরপদামৃত পানে,
তুমি এলে সেই দিন বিরাট জ্যোতিষ্কসম, বিপন্ন যেখানে
সংখ্যাতীত শতাব্দীর তপস্যার বেদবাণী;—জড় জনতারে
অজ্ঞানের অন্ধকূপ হোতে উদ্ধারিলে তুমি;
জগন্মাতা এসে—
তোমারে নিয়েছে অঙ্কে বঙ্গের গাঙ্গেয় তটে ব্রাহ্মণীর বেশে।

নবযুগ সভ্যতার উদয়ন করে গেছ, হে মহাজীবন!
বিংশোত্তর বর্ষে তব সমাধি মন্দিরে বসি মূর্ত্ত মহেশ্বর
শুনায়েছ আত্মদর্শনের কথা বেদান্তের মহিমা ভাস্বর—
ব্যাপ্ত করি দিকে দিকে। নিঃশ্রেয়স লভিবার দৈব-দীপায়ন
দ্বৈপায়ন সম রচি রেখে গেছ ভাগবত নব পরিচ্ছেদ,
রামকৃষ্ণ-সারদার জীবনীর মাঝে যেন জীবনের বেদ।
জীব সেবা প্রচারিলে শবেরে করিয়া শিব বিশ্বব্রহ্মপুরে,
নিখিলের দুঃখ-দৈন্য বুকে নিয়ে ক্লৈব্য গ্লানি করে গেলে লয়,
জড়ধর্ম্মী বিজ্ঞানের চূর্ণ করি মহাদর্প অধ্যাত্মের জয়
দেখায়েছ লক্ষরূপে, বেঁধেছ যে বীণা তব আশাবরী সুরে,
জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগে শুনায়েছ নব নব লীলাতত্ত্ব গীতি,
রচিয়াছ মানবতা যন্ত্র সভ্যতার স্তরে দূর করি ভীতি।

সঙ্গীহীন বিত্তহীন হে স্বামীজি! সিন্ধুপারে বিনা আমন্ত্রণে
তারুণ্যের দৃপ্ত তেজে গৈরিক বসন পরি গিয়েছ যে একা;
বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনে উদ্ভাসিত করি তব চন্দ্রচূড় লেখা,
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সম দাঁড়ায়েছ শিকাগোতে মাহেন্দ্র লগনে
শুনাইতে ধরণীর মনীষার স্তম্ভগণে ভারতের বাণী,
সনাতন সত্যধর্ম্ম প্রচারিলে বেদান্তের ভাবধারা আনি।

বিস্ময় বিমূঢ় হোলো য়ুরোপ মার্কিণ—গৈরিক পতাকা ধরি
চলেছ বিজয়ী বীর দেশ হোতে দেশান্তরে, জয় রথে রহি
তব মন্ত্রে হয়েছে দীক্ষিত নরনারী। তুমি চীরবাস পরি
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে রাজরাজেশ্বররূপে সদা কহি
গুরুদত্ত কথামৃত পাশ্চাত্য জাতির মর্ম্মে দিলে বার্ত্তা নব,
সিন্ধুপার হয়ে আসে যুগযাত্রী এ ভারতে তীর্থপীঠে তব।

নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য জাতি পেলো তার স্বাধীনতা
তব আবির্ভাবে;
স্বদেশের মোহনিদ্রা ভেঙে দিলে যোগিবর! ক্ষাত্রতেজ সাথে
ব্রহ্মতেজ করি সমন্বয়; কত যুগ কত বর্ষ চলে যাবে,—'
আলোকের অতীত আলোকে, তুমি ভারতেরে
কৃপাদৃষ্টি পাতে
রাখিবে কি মৃত্যুহীন করে প্রভু! লহ মোর প্রাণের প্রণাম,
জয়ন্তী উৎসব ক্ষণে—ছন্দের মালায় অর্ঘ্য তোমারে দিলাম।

ভারতে মিগ ও অন্য বিমান—

এতদিনে খবর আসিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়া হইতে ৪টি মিগ২১ জঙ্গী-বিমান জাহাজযোগে ভারতে পাঠানো হইয়াছে—শীঘ্রই সেগুলি ভারতে পৌছিবে। যাহাতে ভারতে মিগ বিমান নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য একজন ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার রাসিয়া যাইয়া শিক্ষালাভ করিতেছেন—একদল ভারতীয় বৈমানিক রাশিয়ায় যাইয়া মিগ-বিমান পরিচালনা শিখিয়া আসিয়াছেন। বৃটেন ও ভারতকে ভি-বোমারু বিমান পাঠাইতে সম্মত হইয়াছে। উচ্চ-বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩০ হাজার পাউণ্ডের বোমা ভি-বিমান বহন করিবে। ঐ বিমান ১২ মাইল উচ্চ দিয়া উড়িয়া গিয়া বোমা ফেলিতে পারে। ভারতীয়গণ ভি-বিমান চালানো শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ধ্বংসকারী অস্ত্রব্যবহার কি শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ করা যাইবে না?

সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি—

কর্তব্যে অবহেলাকারী সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি দিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৬২ সালের ভারত রক্ষা আইন সংশোধন করিয়া কয়েকটি অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে কোন সরকারী কর্মচারী—সরকারী আদেশ অমান্য করিলে অথবা যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত চাকরী ছাড়িয়া দিলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অত্যন্ত পরিতাপ ও বেদনার বিষয় যে বহু সরকারী কর্মচারী তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেন না। এই আইন অনুসারে একদলকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিলে অপর সকলে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন—সে জন্য সত্বর ব্যাপকভাবে এই আইনের প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে আহ্বান জানাই। দেশরক্ষার জন্য এ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

পশ্চিম বংগের নাম বদল—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করিয়া 'বাংলা' করা হইবে। গত ৭ই জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা নাই। বাংলা নামের সংগে এ দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও ভাবগত সম্পর্ক আছে। সে জন্য বাংলা নামই সকলে পছন্দ করেন। পূর্ব পাকিস্তান হওরার পর পূর্ববঙ্গ বলিয়া কোন স্থান নাই—কাজেই পশ্চিমবঙ্গ বলারও কোন সার্থকতা নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই পরিবর্তনে অধিকাংশ বাঙ্গালী সন্তুষ্ট হইবেন।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে গণতন্ত্র—

কেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরা, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ, গোয়া, দমন ও দিউ এবং পণ্ডিচেরীতে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আইন ও সংবিধান সংক্রান্ত যাবতীয় খুটিনাটি কাজ করা হইয়াছে—গত ৭ই জানুয়ারী দিল্লী হইতে এ সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রেত। সংসদের উভয় সভাতেই এ বিষয়ে সংশোধন বিল গৃহীত হইয়াছে। ভারতের সকল অংশে একই প্রকার শাসন ব্যবস্থা চালু করা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য। এতদিন তাহা না হওয়ায় বহু লোককে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।

বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন—

কলিকাতা মেট্রপলিটান জেলা কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলার পূর্ণ বা অংশ লইয়া গঠিত হইবে। তাহাতে ২টি কর্পোরেশন, ৩৩টি মিউনিসি-পালিটী, ৩৭টি সহর-ইউনিট মোট ৪৭৬ বর্গ মাইল এলাকার আওতায় পড়ে। হুগলী নদীর উভয় পার্শ্ব বরাবর —পশ্চিমে বাঁশবেড়িয়া হইতে উলুবেড়িয়া এবং পূর্বে কল্যাণী

হইতে বজবজ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড ইহার অন্তর্গত। আগামী ২৫ বৎসরের মাথায় ১৯৮৬ সালে এই ৪শত বর্গ মাইল এলাকার লোক সংখ্যা হইবে অনুমান ১ কোটি ১২ লক্ষ। কর্মপ্রার্থী ও কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হইবে ৫১ লক্ষ ৩৭ হাজার। সুতরাং অতিরিক্ত ২৩ লক্ষ ১৭ হাজার লোকের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। কলিকাতা মেট্রপলিটান সংস্থার পক্ষ হইতে আর্থিক কাঠামোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত সমীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার ফলে এই হিসাব জানা গিয়াছে। গত ৭ই জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ বর্তমান জানুয়ারী মাসের মধ্যে ২টি পরিকল্পনা শেষ হইবার কথা (১) জরুরী বস্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (২) কাশীপুর—দমদম এলাকা হইতে জরুরী জল নিষ্কাসন ব্যবস্থা। আরও ২টি পরিকল্পনা সম্বন্ধে সরকারী অনুমোদন প্রার্থনা করা হইয়াছে—(১) বৃহত্তর কলিকাতার জন্য জরুরী জল সরবরাহ ব্যবস্থা (২) জরুরী বস্তী পরিষ্কার ও প্রটো-টাইপ হাউসিং স্কীম। কলিকাতা মেট্রপলিটান উন্নয়ন সংস্থা যে বিরাট কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোক প্রায় কিছুই জানে না। এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রচারের দ্বারা সকলকে সকল খবর জানাইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বৃহত্তর কলিকাতার সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা হইবে, তাহা পূর্ণভাবে জানিতে পারিলে লোক আশ্বস্ত হইবে।

পাকিস্তানের আব্দার—

৬ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে খবর আসিয়াছে যে পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হইলে কেহ যেন ভারতকে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য না করেন। এই অনুরোধ জানাইবার জন্য ও কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের শেষ অভিমত জানাইবার জন্য পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী শ্রীএস-কে-দেলাভী বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যাইবেন। চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতকে বিপন্ন দেখিয়া পৃথিবীর বহু দেশ ভারতকে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন—এ ঘটনা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নিকট অসহ্য। সে জন্য পাকিস্তান ঠিক এই সময়ে চীনের সহিত নূতন বন্ধুত্ব করিতেছেন এবং সকল দেশের উপর চাপ দিয়া ভারতকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সকল ঘটনার পর পাক-ভারত মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা কি সার্থক হওয়া সম্ভব?

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি—

ধ্বনিটা প্রথম উঠিয়াছিল পিকিং হইতে—অবিরাম প্রচার করা হইয়াছে—ভারতের নেহরু-সরকার পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র, তাহাদের সমর-লিপ্সা নেহরুর তথাকথিত নিরপেক্ষতা নীতির আড়ালে থাকিয়া হিমালয় সীমান্তে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে মস্কো হইতে। সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাস এই অভিযোগ করেন যে, সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রজোট ভারতবর্ষকে তাহার নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করিয়া আগ্রাসী জোটে টানিয়া নিবার মতলবে ভারতে যুদ্ধ-বিকার জাগাইয়া তুলিতেছে। তাদের ভাষ্যকার শ্রীওপিশোভ বলেন—দুইটি উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী মহলের আছে—(১) ভারতের অর্থনীতিক উন্নতি ব্যাহত করিয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োগ করিতে ভারতকে বাধ্য করা। এরূপ কিছু করিতে পারিলেই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল থাকিতে বাধ্য হইবে। (২) ভারতের প্রগতিবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে চূর্ণ করিয়া দেওয়া—কেন না ইহারাই স্বাধীন রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ, অর্থনীতিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলের পুরোভাগে রহিয়াছে। চীন ও রাশিয়া এইভাবে ভারতকে বিভ্রান্ত করিতে চায়—সাধু সাবধান।

নির্ঝরিণী সরকার—

আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ'এর সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকারের মাতা, বাংলা দেশের সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা নির্ঝরিণী সরকার গত ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে ১০টায় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীসারদামাতার মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন এবং বাল্যকালে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালেই তিনি কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের পরিচিতা হন এবং তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১৯৩০ ও

১৯৩২ সালে দুইবার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার তাঁহার স্বামী ছিলেন। এটর্নী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ও যাদবপুরের অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সর্বাধিকারী তাঁহার জামাতা। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

সঙ্গীত শিল্পীর কৃতিত্ব—

ষোল বৎসর বয়স্ক শ্রীমান নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গত অক্টোবরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ-ধামারে পুরুষ-মহিলা বিভাগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি ভারতবিশ্রুত গীতবাদ্যকলাবিদ্ শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের নিকট হইতে শ্রীমান নীহাররঞ্জন পুরস্কার গ্রহণ করিতেছেন

বাঙ্গালা রেজিমেণ্ট গঠন—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ৮ই জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে জানাইয়াছেন যে—বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব বাস্তবে রূপ দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। মুখ্যত বাঙ্গালী যুবকদের লইয়া বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরে বিবেচিত হইতেছে। শ্রীসেন দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে উপযুক্ত সংখ্যক বাঙ্গালী যুবক সৈন্যদলে কাজ করিতে এখনও অগ্রসর হন নাই। আমরা এ বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করি। যাহাতে অধিকসংখ্যায় বাঙ্গালী যুবক সৈন্যদলে যোগদান করে, সে জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। টাকা ও সোনা দেওয়ার আবেদনের সঙ্গে সর্বত্র মানুষ দেওয়ার আবেদন করা বিশেষ প্রয়োজন।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি—

চীন-আক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে ভারত সরকার সকল রাষ্ট্রীয় সরকারের কয়েক শ্রেণীর সরকারী কর্মীকে ট্রেণিং দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে গত ৫ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবগণ মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ৩ প্রকার ট্রেণিং এর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। (১) পরিবহন-কর্মী ট্রেণিং এর জন্য কতকগুলি স্কুল খোলার ব্যবস্থা (২) স্বল্পকালীন কোর্সের ভিত্তিতে নার্স ট্রেণিং এর ব্যবস্থা (৩) পশ্চিমবঙ্গের কারিগরী স্কুলগুলিতে যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মিটাইবার দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্প সেক্রেটারী শ্রীএস-দত্ত মজুমদারের উপর এই সকল কার্য্যের ভার দিয়া তাহাকে সমন্বয়কারী অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। সত্বর এই তিনটি বিষয়ে কাজ করা হইলে যুদ্ধের সময় ভারত উপকৃত হইবে।

চীন পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি—

গত ৫ই জানুয়ারী করাচীতে এক চীন-পাকিস্তান বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি চীনা প্রতিনিধিদল ঐ চুক্তির জন্য করাচীতে আসিয়াছেন—লিন হাই উন ঐ দলের নেতা। এই চুক্তির ফলে উভয় দেশ পরস্পরকে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা দিতে সম্মত হইয়াছে। উভয় পক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হৃদয় ও মনের দিক দিয়া তাহারা পরস্পরের নিকটে আসিয়াছে। জগতের সকল দেশ এই চুক্তির সংবাদে বিস্মিত হইয়াছে—কারণ পাকিস্তানের এই চুক্তি চীনের পররাজ্য আক্রমণের সহায়ক হইবে বলিয়া সকলে মনে করেন। পাকিস্তান চীনের সহিত এই চুক্তি করিয়া আমেরিকাকে প্রায় চ্যালেঞ্জ করিল। যে সময় ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভারত-পাকিস্তান-মৈত্রী সাধনে উদ্যোগী—সে সময়ে ভারতের আক্রমণকারী শত্রুর সহিত পাকিস্তান যদি মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তাহার ফলে কি ভারত-পাকিস্তান মিলন—কি চীন-ভারত মিলন—উভয় কার্য্যই বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

ভারতকে কাগজ উপহার—

পশ্চিম সুইডেনের লোরেনবার্গের ২রা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ—সুইডিস সরকার স্কুলপাঠ্য পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ভারত সরকারকে ৮ হাজার টন কাগজ উপহার দিয়াছেন। সুইডেন তাহার প্রস্তুত কাগজ ১৪ হাজার ৫ শত টন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে দান করিবে—ভারত তন্মধ্যে যে ৮ হাজার টন পাইবে, তাহার ৪ হাজার টন ভারতে পাঠানো হইয়াছে—বাকী ৪ হাজার টন ২ মাস পরে আসিবে। ভারত যেন এই দানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে—ইহাই আমাদের নিবেদন।

একটি আদর্শ গ্রাম—

মধ্য ভারতের রিহান্দ জেলার নগণ্য গ্রাম বাণীপুর দেশের সৈন্য বাহিনীর জন্য প্রতি পরিবার হইতে গড়ে তিন জন করিয়া লোক দিয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সেখানকার ৭ শত অধিবাসীর মধ্যে ২ শত জন সেনাদলে নাম লিখাইয়াছে। ইহা সত্যই প্রশংসার বিষয়। আজ চীন আক্রমণের পর ভারতের সৈন্য বাহিনীতে অধিক-সংখ্যক লোক দান করা একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজনে সকলের সাড়া দেওয়া দরকার। রিহান্দ গ্রাম সকলের অগ্রবর্তী হইয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

যশোবন্ত সিং—

নেফার পর্বত ও অরণ্যসংকুল রণক্ষেত্রের বীর সেনা এয়ার ভাইস মার্শাল যশোবন্ত সিং ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার রাত্রে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৭ বৎসর—তিনি অধিক রাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া তখনই হাসপাতালে নীত হন ও মারা যান। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র বর্তমান। মাত্র গত মার্চ মাসে তিনি পূর্বাঞ্চলের বিমান সেনার প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার রিখ্যে—

ভারতীয় সেনা বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ইন্দ্রজিত রিখ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্টের সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কঙ্গো অভিযানের সময় সেক্রেটারী জেনারেলের উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন। ৪২ বৎসর বয়স্ক এই অফিসার ১৯৩৯ সালে কমিশন পান এবং গত বিশ্বযুদ্ধে নানা স্থানে কাজ করেন। কয়েক বৎসর জম্মু ও কাশ্মীরে কাজ করার পর তিনি ১৯৫৭ সাল হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে নিযুক্ত আছেন। একজন ভারতীয়ের এই সম্মান লাভে ভারতীয় মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

ভেষজ কারখানা স্থাপনের দাবী—

ডাঃ কে-পি-বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভেষজ গাছ-গাছড়া সংক্রান্ত ডিরেক্টর ও বঙ্গীয় উদ্ভিদ বিদ্যা সমিতির সভাপতি। তিনি গত ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতা ৩৫ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বলিয়াছেন—কলিকাতার বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্‌গণের পক্ষ হইতে দেশী গাছ-গাছড়া হইতে ভেষজ প্রস্তুতের জন্য কলিকাতায় গবেষণা কার্য্যের সুবিধাসহ একটি কারখানা স্থাপনের দাবী উঠিয়াছে। তিনি মনে করেন, দেশে যে সকল গাছ পাওয়া যায়, তাহা হইতে ঔষধ তৈয়ার করিয়া এ দেশের চিকিৎসকগণের প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা যাইতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে উদ্ভিদজাত ঔষধ দিন দিন অধিকতর আদর লাভ করিতেছে। এ দেশে গাছের অভাব নাই—সেগুলি সত্বর কাজে লাগানো প্রয়োজন। এ বিষয়ে বহু বক্তৃতা হয়। কিন্তু কাজ হয়

না। মেজর বি-ডি-বসু, কর্ণেল চোপরা প্রভৃতির সময় হইতে এ বিষয়ে বহু কথা বলা হইয়াছে। ডাঃ বিশ্বাস তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলে দেশের একটি বিরাট সমস্যার সমাধান হইবে।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য সাহিত্য—

বঙ্গীয় কবি পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক রবীন্দ্রোত্তর কাব্য সাহিত্য নামে কয়েকজন কবির কথা এক খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন—পুস্তিকার মূল্য মাত্র ২৫ নয়া পয়সা—তাহা ৩৫ ব্যারিষ্টার পি-মিত্র ষ্ট্রীট কলিকাতা—৩৫এ পরিষদের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সতীশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্রদেব ও কালিদাস রায়—এই ১২ জন কবির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহারা সকলেই ১৮৭০ হইতে ১৮৯০ সালের সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী ৫ খণ্ডে বাংলা প্রদেশের অন্যান্য কবিদের পরিচয় প্রকাশ করিবেন। কবি পরিষদ এইভাবে সকল কবির পরিচিত প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সমাধান করিবেন। আমরা পরিষদ তথা মল্লিক মহাশয়ের এই কার্য্যের সাধুবাদ জানাই। আধুনিকতম কবিরাও এইভাবে প্রচারিত হইবার সুযোগে বঞ্চিত হইবেন না। গত ১৬ই ডিসেম্বর ২৪পরগণা জয়নগর মজিলপুরে পরিষদের শীতকালীন অধিবেশনে প্রথম খণ্ড পঠিত হইয়াছিল।

নারী বিচিত্রা
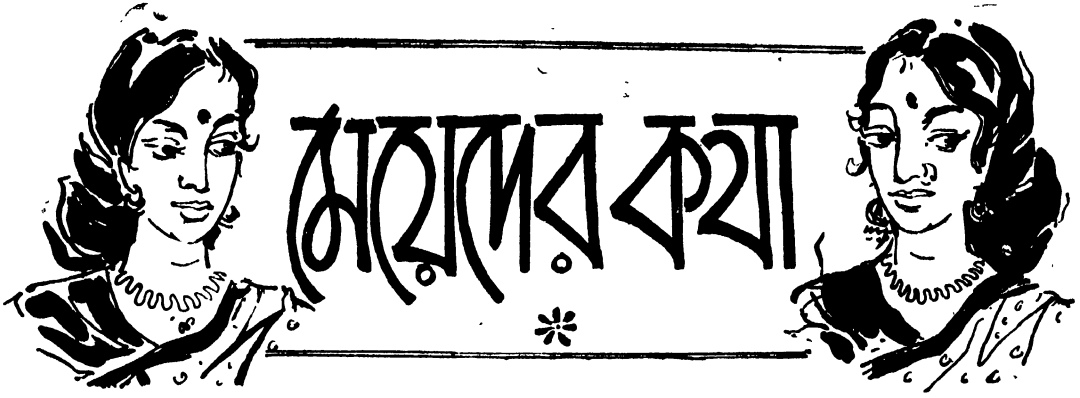
স্থ-নন্দা

পূজনীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "নারীর মূল্য" লিখে নারীর উপর অত্যাচার অবিচার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেছেন। তিনি নারীর প্রতি প্রকৃত দরদ নিয়েই তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার সমগ্র উপন্যাসে, গল্পে ও প্রবন্ধে এটা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে নারীর মূল্য সতী-সাধ্বী-পতিতা নির্বিচারে তিনি যে ভাবে অন্তরের সাথে উপলব্ধি করেছেন, ইদানিং কালে আর কেহ সে ভাবে করেছেন কিনা সন্দেহ।

এ প্রবন্ধে তিনি শুধু সমাজে নারীর স্থান ও তার মূল্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উপন্যাসে ও গল্পে তিনি তাদের প্রেম, স্নেহ, মায়া, সেবাপরায়ণতায় তাদের খুবই উচ্চ স্থান দিয়েছেন। অবশ্য নারীর এ সমস্ত গুণাবলী সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু ভাবি 'নারীর মূল্য' লিখে তিনি কি দেখিয়েছেন। নারীকে বহুদেশে ও বহুযুগে যে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ে রাখা হয়েছে সে কথা অস্বীকার করছি না; কিন্তু সেই সাথে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজে ও সংসারে তাকে অনেক বিষয়ে পুরুষের থেকে উচ্চাসনও দেওয়া হ'তো এবং তাদের প্রশংসা মহান করিয়া বিশ্ব-জগতে গেয়ে গিয়েছেন। তাই প্রশ্ন এই যে—সামাজিক পঙ্ক উদ্ধার ক'রে সেইটাই নিয়ম বলে দেখিয়ে লাভ কি। এইরূপ পঙ্কিলতা, আবর্জনা সর্বদেশে সর্বকালে, সর্বসমাজেই ছিল এবং এখনও আছে। এতে আমাদের লজ্জার ও ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সেইটাই সত্য, সেইটাই বড়, আর সব নগণ্য উপেক্ষনীয়—একথা স্বীকার করতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, নারী তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে সংসারে এবং সমাজে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছে, এর জন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। তাতে তার সম্মান বাড়ে না, বরং অসম্মান ও অপমানই বেড়ে যায়।

যুগে যুগে নারীর মহিমা, নারীর মাহাত্ম্য, নারীর গৌরব শুধু কবিদের কাব্যেই লেখা হয় নাই, সমাজেও তাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম ও সম্মান দেখিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল তো নয়ই, বরং তার প্রাচুর্য্য আছে। আমরা সেই দিকটাই কিছু বিচার করবো।

Women govern us. Let us render them perfect, the more they are enlightened so much the more shall we be. On the cultivation of the mind of the woman depend the wisdom of man. It is by woman that nature writes on the hearto of man"—Sheridon.

এ তত্ত্ব কোন কালেই অবিদিত ছিল না। সেই বিষয়ই আলোচনা করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অতিপ্রাচীন যুগে প্রাক্-সভ্যতার কালে আদিম নর-নারীর সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও সরল ছিল না। রজঃস্বলা ও গর্ভবতী নারী সমাজে অশুভ প্রভাব বিস্তার করে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল সেকালে এবং সেই একই কালে তাদের জীবনদাত্রী বলেও বিশেষ সম্মান দেওয়া হ'তো। তখন মাতার পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হতো, কারণ সেকালে পিতৃত্বের পরিচয় স্পষ্ট ছিল না! পুরুষ শিকার ক'রতো; আর যখন কৃষিকার্য্য আরম্ভ হোলো তখন এ কাজ নারীর কর্তব্য বলে পরিগণিত হ'লো। কৃষিকার্য্যে রমণীর এই দান তাকে সমাজে অনেক সম্মানিত ক'রে তুললো; এবং এই নারী শুধু যে জীবন দেয় তা নয়, সে সমস্ত নৈসর্গিক উর্বরতারও জননী ব'লে প্রবাদবাক্য প্রচলিত হয়েছিল। এরই পরিণাম—দেব-মাতৃকার পূজা। প্রাচীন যুগে ব্যাবীলনে ও ফিনিসিয়ায় "ইষ্টার" দেবী ও মিশরে "আইসিস্" দেবীর পূজা প্রচলন হ'লো। সেকালে অনেক দেশে এই দেবী-মাতৃকার পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। আমাদের দেশেও দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর পূজা নারীভক্তির প্রামাণ্য প্রমাণ। এই সব দেশে নারীর সম্মান অতি উচ্চস্তরে ছিল।

ব্যাবীলনের স্বনামধন্য নৃপতি হাম্মরাবী উর্দ্ধতন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে আইন লিপিবদ্ধ ও প্রচলন করেছিলেন, তাতে সমসাময়িককালে রমণীর মর্যাদা ও সম্মান বিশেষ ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। যদিও কন্যা পিতার অধীন বলে পরিগণিত ছিল, বিবাহের পর সে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হ'তো। কুমারী কন্যাও অনেক সময় স্বাধীনতা ভোগ ক'রতো। বর কন্যাকে যে পণ বা মূল্য দিতো, তা কন্যার নিজস্ব যৌতুক হিসাবে পরিগণিত হতো এবং তাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার থাকতো। স্বামীর ব্যাভিচার ও নৃশংসতার জন্য স্ত্রী তাকে ত্যাগ করতে পারতো এবং স্বামীরও ইচ্ছা হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অধিকার ছিল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে স্ত্রী তার সমস্ত যৌতুক ও সন্তানের অধিকারপ্রাপ্ত হ'তো। সাধারণত পুরুষ এক বিবাহ ক'রতো; কিন্তু সে স্ত্রী সন্তানধারণে অক্ষম হলে সে তার দাসীকে স্বামীর নিকট পাঠিয়ে দিতো, কিংবা স্বামীকে কোন উপপত্নী নিতে অনুমতি দিতো। উপপত্নী দ্বিতীয় পর্য্যায়ের স্ত্রীর ন্যায় সম্মান পেতো এবং তাদের সন্তানাদি আইনতঃ উত্তরাধিকারী হতো। আর সে উপপত্নী যদি দাসী হতো, তাহলে সে দাসীই থাকতো—এবং স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে তাকে আবার দাসীর পর্যায়ে ফিরে যেতে হ'তো। কিন্তু তার সন্তানাদি আইনতঃ বৈধ বলে গণ্য হ'তো। স্ত্রীর কুমারী অবস্থার ও বিবাহের পরবর্তী কালের ঋণের জন্য স্বামী দায়ী হ'তো। বিবাহিতা রমণীর নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রবার অধিকার ছিল এবং তাতে স্বামীর কোন স্বত্ত্ব থাকতো না। অবশ্য সেকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বহুলাংশে রমণীদের হাতেই ছিল। অনেক নারী আইনজ্ঞ ছিল এবং তারা আইন ব্যবসাও ক'রতে পারতো। বাবীলনের আইনে তারা এমন কি বিচারক পদেরও অধিকারী ছিল। ব্যাভিচারের শাস্তি ছিল উভয়কে জলে ডুবিয়ে মারা। কিন্তু স্বামী ক্ষমা ক'রলে রাজা স্ত্রীকে মুক্তি দিতেন।

হাম্মরাবীর এই আইন ব্যাবীলন ও সিরিয়া ছাড়াও তদানীন্তনকালে পার্শ্বস্থিত প্রায় সমস্ত রাজ্যেই প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন যুগের সমস্ত সুসভ্য জাতির মধ্যে মিশরের নারীদের সম্মান ছিল সর্বস্তরে। রাজ্য শাসনেও তাদের অবাধ অধিকার ছিল। ক্লিওপেট্রা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ছাড়া অনেক রমণী মিশরে কৃতিত্বের সাথে রাজ্যশাসন করেছেন। নারীর অবাধ স্বাধীনতা ছিল ও তারা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারতো। সমস্ত প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যের কাজে তারা পুরুষের সাথে অবাধে মেলামিশা ক'রতো এবং রাজকার্য্যে, সংসারে ও পূজাপদ্ধতিতে সমধিক অংশ গ্রহণ ক'রতো।

সেকালে আমাদের দেশেও নারীর সম্মান সমধিক উচ্চস্তরে ছিল। সে কথা পরে বলবো।

প্রাচীন যুগে কেবল ইসরেইল দেশে সাধারণের কাজে রমণীর বিশেষ স্থান ছিল না। তাদের কর্তব্য ছিল বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তা অসম্মানের ছিল না। তাদের নিজের সংসারে তারাই ছিল সর্বময়ী কর্ত্রী। Ten Commandments (দশ নির্দেশ) এর একটা হচ্ছে "তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।" এই বিধান সসম্মানে পালিত হতো। মাতাকে গালি দিলে কিংবা আঘাত করলে তার মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত হ'তে পারতো।

প্রত্যেক পুরুষের বিবাহ করা বাধ্যকতা ছিল এবং স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করা আইনের বিধি ছিল।

গ্রীসে হোমারের সমকালীন নারীরা আনুমানিক ৮০০ বৎসর খৃঃ জন্মের পূর্বে উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিল ও তাদের অবাধ স্বাধীনতাও ছিল। পেরিক্লসের সময় ৪৯০—৪২৯ খৃঃ পূঃ এথেন্সে নারীর সম্মান সঙ্কুচিত হ'য়ে অতি নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। তখন স্ত্রীশিক্ষা ছিল না এবং তারা বাহিরে পুরুষের সামনে বের হ'তে পারতো না। বৈধ সন্তানধারণ করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য ব'লে নির্ধারিত হ'য়েছিল। তারা বাহিরের কোন কাজে যোগদান করতে পারতো না এবং এমন কি বাহিরে স্বামীর কোন কাজে সাহচর্য করবারও অধিকার তাদের ছিল না। এই কাজের জন্য "হিটেয়ার" নামক উচ্চস্তরের গুণান্বিতা, শিক্ষিতা এক বারবণিতা সম্প্রদায় ছিল। তারা প্রকাশ্যে বাহিরে পুরুষের সঙ্গিনী হ'তো। ঠিক এক প্রকারের না হ'লেও জাপানের "গ্রীথা" সম্প্রদায়ের মত।

রোমে প্রথম যুগের সমাজে স্ত্রী-স্বামীর অধিকারভুক্ত ছিল। পরে তাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। সেখানে প্রৌঢ়া মহিলারা অত্যন্ত সম্মান ও মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেক উচ্চস্তরের মহিলা ছিলেন। পরে "ডিভোর্স" আইন সহজলভ্য হ'লো, তখন নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা প্রকটিত হয়ে উঠলো, ও সমাজ অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে গেল।

এ যুগের চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে যেমন চার্চের আধিপত্য সমধিক বিস্তার লাভ করলো, তখন ইউরোপে নারীর স্থান নিম্নতম স্তরে ধার্য্য হলো। এককালে পশ্চিম ইউরোপে স্ত্রী স্বামীর সম্পূর্ণ এক্তিয়ারভুক্ত ছিল এবং স্বামী স্ত্রীকে আইনতঃ প্রহার পর্য্যন্ত করতে পারতো। এই অধিকার কার্য্যকরী ক'রতে তাদের কোন প্রকার লজ্জা কিংবা দ্বিধাবোধ হ'তো না।

"ফিউডাল" (জায়গীর স্বত্বার) যুগে পুরুষদের প্রায়ই যুদ্ধে যেতে হতো—যা নারীর দ্বারা সম্ভব হ'তো না। ধনী বিধবার ও সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণীদের বিবাহ দেয়া হতো এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর প্রাপ্য হ'তো। এ বিবাহে অবশ্য তাদের মতামত গ্রাহ্য হ'তো না। কিন্তু রাজকার্য্যে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হ'তো না। কোন কোন রমণী উচ্চ রাজকার্য্যে আসীন ছিলেন। কালক্রমে সহর পত্তনের সাথে অনেক মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়েরা ব্যবসাবাণিজ্যে যোগ দিবার সুযোগ পেয়েছিল এবং এক কালে পড়তে জানতো এমন শ্রেণীর মেয়ে পুরুষের চাইতে বেশী ছিল। উচ্চশিক্ষা বলে অবশ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু সে যুগেও "সালার্নোর" প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিষয়ক বিদ্যালয়ে মহিলা অধ্যাপিকা ছিলেন। এই সময় অনেক ছাত্রীও সেখানে অধ্যয়ন করতো। এ ছাড়া বিখ্যাত "বোলোনা" বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহিলা আইনবিভাগে তাঁরা বক্তৃতা দিতেন।

রেনার্সাস অর্থাৎ ইউরোপের পুনরভ্যুদয়ের পরবর্তীকালে —বিশেষ ক'রে ফরাসী ও ইটালী দেশে বহু উচ্চশিক্ষিতা ক্ষমতাশালী রমণীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু তারপর দুই শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত রমণীর অবস্থার ক্রমশঃ অধোগতি হয়। শিল্পের ক্রমোন্নতির সাথে নারী শ্রমজীবিদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে, কারণ বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রসারতার সাথে শ্রম গৃহ কার্য্যালয়ে অপসারিত হয়—যার ফলে নারীর বেকার সমস্যা প্রকট হ'য়ে উঠে। কুটীর-শিল্প না থাকাতে নারী শ্রমকার্য্য ছেড়ে গৃহকর্মেই নিযুক্ত হ'লো এবং পুরুষ একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তিও অন্নসংস্থানের মালিক হয়ে উঠলো। যে সব নারী কাজের সন্ধানে বাইরে বের হ'লো, তারা পুরুষের সাথী না হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র ইউরোপে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অধস্তন স্তরে নেমে এলো। তখন শুরু হ'লো সংঘবদ্ধ নারীগণ আন্দোলন। ১৭৯১ খৃঃ ফরাসী দেশের এক মহিলা অলিম্পে-দে-গুজে (olympe de gonges) প্রথম "Declaration of tha Right of women" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, ও পরবর্তী বৎসর মেরী ওলষ্টন ক্রাফট (Mary woolston craft) তার "Veis dication of the Right of women" প্রকাশ করেন। কিন্তু সেকালে এতে কেহই কর্ণপাত করেনি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শুরু হতে নারী আন্দোলনের সম্যক বিস্তার লাভ করে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে

"সাফ্রাজিষ্ট" আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে। আজ প্রাচ্য দেশে নারী পুরুষে কোন প্রভেদ নেই। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডে একাধিক রাণী অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে রাজ্যশাসনে কৃতিত্ব অর্জন করে গিয়েছেন।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বে আমাদের দেশেও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে হিন্দু রমণীর সমাজে সম্মান ও আধিপত্য ছিল। বিধবা-বিবাহ সম্যকভাবে প্রচলিত না থাকলেও রামায়ণে এর নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। তৎকালীন সমাজে স্ত্রী স্বামীর অধীন ছিল বটে, কিন্তু এ ব্যতীত অন্যান্য সব কাজে তারা স্বাধীন ছিল। তখন রাজদম্পতির অবর্তমানে রাজ দরবারে কোন মঙ্গলক্রিয়া হতে পারতো না। স্বয়ম্বরের নির্দেশ ছিল--যা স্ত্রী-স্বাধীনতার সাক্ষ্যদান করে। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে মুসলমান যুগে নারীর সামাজিক অধিকার ও অবাধ স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। সে যুগে এ ভিন্ন উপায় ছিল না। ক্রমশঃ অবশ্য নানা প্রকার নীচ ও গর্হিত বিধি-নির্দেশ সমাজ-জীবনকে পঙ্কিল করে তোলে। হিন্দুযুগে নারীর উচ্চ মর্য্যাদা প্রকাশ পেতো নারী-পূজার মধ্যে। নানা প্রকার পূজার মধ্যে দেবীপূজাই প্রাধান্য লাভ করেছিল—যথা দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী ইত্যাদি। শিবপূজা ছাড়া, কার্তিক, গণেশ পূজা কখনও সে প্রকার প্রাধান্য লাভ করেনি। নারী পূজার এই বৈশিষ্ট্য আমরা আজ পর্য্যন্ত অন্তরের সাথে পালন করে আসছি, তবে আমরা গো-মায়ের পূজাও করি—কিন্তু গো-মাতার প্রতি আমাদের ব্যবহার মনে করলে লজ্জায় মাথা নত করতে হয়।

এমন কি মুসলমান যুগেও একাধিক হিন্দু ও মুসলমান রাণী রাজত্ব করেছেন।

সমাজে রমণীর স্থান নিম্নস্তরে নির্দিষ্ট হয়েছিল প্রাগৈশ্লামিক যুগে ও পরবর্তী মুসলমান দেশসমূহে। মরুভূমির দেশে নারীদের কতক সম্মান দেখান হ'তো। কিন্তু এ ছাড়া আরব দেশে তাদের জন্য সামাজিক ও ধর্মের বিধি ব্যবস্থায় নীচ স্থান ধার্য্য হয়। সেখানে পুরুষের বহুবিবাহ বিধি সংগত ও ধর্মানুমোদিত হয়েছিল ও নারী পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হ'তো। অবাঞ্ছনীয় কন্যা শিশু-সন্তানকে মাটিতে কবর দেওয়া হ'তো। এই সব দেশে মুসলমান ধর্ম প্রবর্তনের পর যদিও নারীর অবস্থা পুরুষের নিম্নে ধার্য্য হয়েছিল, তথাপি পূর্বতন যুগের তুলনায় নারীর মর্যাদা কতক পরিমাণে উন্নত হ'য়েছিল। কোরাণে নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে ধার্য হয়েছে সত্য, কিন্তু মহম্মদ নারীকে সম্মান দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহুবিবাহ (চার জন পর্যন্ত) প্রচলিত থাকলেও সকল স্ত্রীকেই সমান ভাবে দেখবার বিধিনির্দেশ ছিল। কন্যা পরিবারের সম্পত্তির একাংশ পাবার অধিকারী ছিল এবং বিবাহিতা রমণীর সম্পত্তি তার নিজস্ব বলে পরিগণিত হ'তো। বর-কন্যাকে যৌতুক দিত এবং সে যৌতুক স্ত্রীর নিজস্ব বলে বিবেচিত হ'তো। এমন কি স্বামী-স্ত্রীকে ত্যাগ করবার পরও সে সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার থাকতো। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সে যদি পুনঃ বিবাহ না ক'রতো তা হ'লে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও ছিল। "বোরখা" পরিধানের ব্যবস্থা পূর্বোক্ত যুগ থেকে চলিত ছিল, তার কোন পরিবর্তন হলো না; তবে আমাদের মনে হয় যে আরব দেশে "বোরখা" প্রচলিত হয়েছিল। মেয়েদের মুখ উষ্ণ বালুপ্রবাহের আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য—যেমনটি আছে আরব-বেদুইন দেশে পুরুষদের পরিচ্ছদের মধ্যে আংশিক ভাবে—সেই নিয়ম পরবর্তী মুসলমান যুগে চলিত রইল এবং সেই নিয়মই কালক্রমে ধর্মের নামে অধি-কাংশ মুসলমান সমাজে প্রচলিত হলো—যেমনটি হয়েছিল অনেক কিছু হিন্দুধর্মের রক্ষাকবচের অন্তরালে। এমন বহু শিক্ষিত মুসলমান দেশে এর প্রচলন নেই। কাল-দেশ ভেদে অনেক দেশে অনেক প্রথা প্রচলিত হয়—যার যৌক্তিকতা অপর দেশে, ভিন্ন কালে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। এতে নারীর অমর্যাদা কিছুই হয় নাই। ধর্ম-কার্যে মেয়েদের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কারণ তারা প্রার্থনারত পুরুষের মন-চাঞ্চল্যের হেতু হ'তো ব'লে।

চীন দেশে ও জাপানে হিন্দুদের মত পূর্বতন যুগে রমণীর সম্মান উচ্চস্তরে ছিল। কিন্তু কালক্রমে এর অবনতি ঘটে। চীন দেশে কোন কালেও মেয়েদের ঘোমটার প্রচলন হয় নাই; যেমনটি হয়েছিল ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে মুসলমান যুগে। চীনা মুসলমানদের মধ্যেও এ প্রথা কোনদিন স্থান পায়নি। টুং বংশের রাজত্বকালে

চীনা মেয়েদের পা বেঁধে ছোট ক'রবার রীতি ছিল। কি উদ্দেশ্যে এ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল সঠিক না জানলেও এতে যে তাদের গতিবিধি অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হ'য়ে তাদের অবাধ স্বাধীনতা খর্ব হ'লো এ বুঝতে কষ্ট হয় না। ১৯১১ খৃঃ এ প্রথার বিলোপ ঘটে। পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধা রমণীর স্থান ছিল সকলের উপরে। এখন নব্য-চীনে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ প্রায় কিছুই নাই।

জাপানেও পূর্বতন যুগে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলন ছিল এবং নারী অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে পারতো। তারা নিজ ইচ্ছার স্বাধিকারে বিবাহ করবার অধিকার রাখতো। ১৮৮৯ খৃঃ "সালিক" আইন (Salic law) প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত জাপানে দশজন রমণী রাণী হয়ে দেশ শাসন করেছিলেন। তার মধ্যে রাণী জিঙ্গোর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সম্মানার্হ। কিংবদন্তী আছে যে সালিক আইন পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে লিপিবদ্ধ হয় এবং দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফরাসীদের দেশে এর প্রথম প্রচলন হয় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে—যাতে রমণী সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এখন পর্যন্ত বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, মোনাকো, নরওয়ে এবং সুইডেনে এই আইন প্রচলিত আছে। যার জন্য এই সব দেশে এখনো রমণী সিংহাসনের অধিকারী হতে পারে না।

রাণী জিংগো খৃঃ জন্মের তিন শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। সপ্তম শতাব্দীতে আইন করে নারীর অধিকার অনেক সংকুচিত করা হ'লো। এর কারণ বোধ হয় তিনটা, প্রথমতঃ চীন থেকে তখন পারিবারিক প্রথা জাপানে প্রচলিত হ'লো, যার ফলে নারীর স্বাধীন ও অবাধ বিবাহ প্রথা বন্ধ হ'লো এবং পুরুষ সমস্ত পরিবারের কর্তা হিসাবে পরিগণিত হ'লো। দ্বিতীয়তঃ "ফিউডাল" বা জায়গীর প্রথা প্রবর্তনের সাথে যোদ্ধাদের ক্ষমতা অত্যধিক বেড়ে গেল; এবং তৃতীয়তঃ "কনফিউসিয়াল" ধর্মবাদের ভিত্তি ছিল নারী পুরুষকে প্রাধান্য দেবে, তাদের সম্মান দেবে ও তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে চলবে। এর প্রভাব জাপানেও প্রতিফলিত হয়। জাপানের মত উচ্চ নিয়মাধীন জাতির পক্ষে এ বিধিনির্দেশ মেনে নিতে মেয়েদের কোনই আপত্তি হ'লো না। এর ফলে কন্যা তার পিতার, স্ত্রী তার স্বামীর ও বিধবা মাতা তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিলো।

বর্মায় মেয়েদের স্থান অতি উচ্চে। এসিয়ার—এমন কি ইউরোপেরও কোন দেশেই মেয়েদের এত অবাধ স্বাধীনতা নেই। তারা নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করতে পারে, যদিও সাধারণতঃ পিতামাতাই কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। সংসারে সমস্ত কাজ করেও বাহিরের অধিকাংশ কাজও তারাই করে। ব্যবসা বাণিজ্যে রমণীর কোন বাধা নিষেধ নেই। প্রকৃতপক্ষে ওসব কাজ নারীরাই করে থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে নারীর মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকারের আমূল পরিবর্তন হয়েছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। শিক্ষাদীক্ষায় নারীর স্থান আমাদের দেশে এমন অনেক উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে; এবং শাসন ও কূটনৈতিক ব্যাপারে তারা এখন যে কোন পদের অধিকারী ব'লে আইনে স্বীকৃত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে যে কোন কার্যে তাদের পুরুষের সাথে সমান অধিকার ধার্য হয়েছে। ডাইভোর্স করবার অধিকার পুরুষের মত নারীদেরও সমান পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এখন পৈতৃক ও স্বামীর সম্পত্তির আংশিক অধিকারী ও ভোট দিবার সমান অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছে। পুরুষের বহুবিবাহ এবং এক স্ত্রী বর্তমানে অপর দারগ্রহণ করবার অধিকার নিবদ্ধ আছে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়েছে। বাল্যবিবাহ-নিরোধ করা হয়েছে ও পণপ্রথাও আইনের দ্বারা বিলুপ্তি করা হয়েছে।

সিংহলে আজ এক রমণী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন এবং দক্ষতার সঙ্গেই বলা যেতে পারে।

পাকিস্থানেও নারী এমন পর্দার বাহিরে এসে আপনাদের অধিকার দাবী করছে। চীন জাপানে নারীর মর্যাদা বহু পরিমাণে উন্নত হ'য়ে তাদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। তুরস্কে স্ত্রী স্বাধীনতা ও তাদের স্বাধিকার কামাল পাশার আমল থেকে অতি দ্রুত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইউরোপ এশিয়ার সমস্ত দেশেই আজ স্ত্রী পুরুষ আইনের চক্ষে সমান এবং নারী ব'লে সমাজে তার কোন বাধা বিঘ্ন নেই।

প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে

আধুনিক যুগের মত সমাজে, রাষ্ট্রশাসনে, বিবাহে, স্বাধীনতায় নারীর স্থান কোন অংশেই পুরুষের থেকে অধিক নিকৃষ্ট ছিল না। কোন কোন অসভ্য দেশে ও মধ্যযুগে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এর অবনতি ঘটে কতকটা ধর্মের শাসনে, ধর্মযাজকদের বিহিতে ও কতকটা তৎকালীন রাজনৈতিক ও সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সমাজে নারীর প্রতি যে বিধি নির্দেশ করেন, তারা তাই শ্রেয় এবং প্রকৃষ্ট বলে মনে করেছিলেন। কি পরিস্থিতিতে এ হয়েছিল—সে তর্কের মীমাংসা এখন হতে পারে না। তবে সামাজিকপ্রথা একবার নিম্নস্তরে নামলে তাতে নানা প্রকার আবর্জনা ও পঙ্কিলতা জমে ওঠে, সে পঙ্কোদ্ধার করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ তখন পরস্পর-বিরোধী ঘাতপ্রতিঘাতে স্বার্থান্বেষী দল তাদের সমস্ত কৌশল নিয়োগ করে। এতকাল পরে সে বিচারের সম্ভাব্যতা অতি ক্ষীণ।

মধ্যযুগে ছিল ইউরোপে "শিভাল্‌রি" যুগ। তবে সে শিভাল্‌রি বীরত্ব দেখিয়ে নারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার মধ্যে পর্যবসিত ছিল। তার উপর আর কিছু ছিল না। কখনো কখনো অবশ্য এর থেকে হত প্রেমের সূত্রপাত। সাধারণতঃ নারীর জীবন ও মানরক্ষা হত বটে, কিন্তু তাকে সক্রিয় সম্মান দেখানো হ'তো না কিছু। এই ছিল "নাইটের" যুগ, বীরত্ব প্রদর্শনই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এ হ'লো অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য। ফিউডাল যুগের ইহাই ছিল বিশেষত্ব। পুরুষ ছিল কতকটা রোমান্‌টিক। "নাইটহুড্‌" ছিল কারো কারো পেশা, যার উপর কত চারণ-কবি তাদের গুণ কীর্তন করে গিয়েছে। তবে সেকালের সামাজিক অরাজকতার জন্য এদের প্রয়োজন হয়েছিল, তাই নারীর মর্যাদা কতকটা রক্ষা পেতো।

আদিযুগে ও কতকটা মধ্যযুগেও বটে, মানবের মান প্রতিপত্তি ছিল তার শারীরিক শক্তির উপর, এবং দৈহিক শক্তিতে পুরুষ প্রবল, নারী দুর্বল। তাই নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ছিল সেকালে; এবং সমাজও গঠিত হয়েছিল সেইভাবে। অধুনা যান্ত্রিক যুগে দৈহিক শক্তির মূল্য কমে গিয়েছে, মানসিক শক্তির উন্মেষ ও সম্মান বেড়েছে। তাই নারীর রক্ষার ভার আর পুরুষের উপর ততখানি নির্ভর করে না। এখন সে নিজেকে কতকটা রক্ষা করতে পারে। তাই এখন পুরুষের প্রাধান্য নেই পূর্বের মত। সমাজও ভেঙ্গেচুরে নূতন করে গড়ে উঠছে। এ তার স্বাভাবিক গতি। ক্রমবর্ধমান সমাজের এই রীতি। এর অন্যথা হতে পারে না; তাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা আসে; অরাজকতা আসে। সমাজ তার নিজস্ব গতিতে চলে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মত ইহাও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রকৃতি তার কাজ অটুট ভাবে করে যায়—যখন যার প্রয়োজন তা হবেই। সমাজের গতিও কেউ রোধ করতে পারে না; তাকে জোর করে এগিয়ে দিতেও পারে না। কাল ধর্মে তার গতি নির্ধারিত হয়। সময়োপযোগী বৃক্ষ রোপন না করলে যেমন সে ফলপ্রসূ হয় না, অকালে শুকিয়ে যায়, সমাজও তেমনি। যে কোন সমাজসংস্কার সময়োপযোগী না হ'লে তার গোড়া পত্তন হয় না, সে কার্যকরী হয় না। তাই পুরুষ নারীকে দাবিয়ে রেখেছিল একথা বলা সত্যের অপলাপ করা হবে। দৈহিক শক্তির মূল্য কমে যাওয়াতে এখন নারীই পুরুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। প্রয়োজন বোধে নারী এগিয়ে গেলে পুরুষ কখনও তাকে বাধা দিতে পারতো না। সে এগিয়ে যায় নি, কারণ প্রাকৃতিক সময় তখন তার অনুকূল ছিল না। এখন এসেছে তাই তারা এগিয়ে চলেছে এবং খুব ক্ষিপ্রগতিতেই চলেছে। কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে এরা এখন পুরুষকে ও ছাড়িয়ে গেছে। এর সুদূর পরিণাম কি হবে সে কথা এখন বিবেচ্য নয়—কোন লাভও হবে না সে চিন্তা করে, জল ধারার ন্যায় সেও তার গতিপথ নির্ধারিত করে নেবে—কারো মানা শুনবে না—সে আপন বেগে চলবে। আধুনিক পরিস্থিতি তার অনুপন্থী এবং নারীপ্রগতি এমন চলমান তার আত্মশক্তিতে। এর ইতিহাস ও ফলাফল নির্মিত হবে এককালে—যখন আমরা কেহই থাকবো না। তবে সে বিচার হবে সে যুগের ভাবধারা ও সে-কালের সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে। এ কালের সাথে তার মিল নাও থাকতে পারে, তাই সে বিচার নির্ভুল হবে না।

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে, তোয়ালে (Turkish-Towel) পুরোনো ও ছিঁড়ে যাবার মতো হয়ে গেলে. সচরাচর সৌখিন-গৃহিণীদের মধ্যে অনেকেই সেগুলিকে ঘরের নিতান্ত অনাবশ্যকীয় জঞ্জাল হিসাবে বাতিল করে দেন। তবে যাঁরা সুগৃহিণী, তাঁরা কিন্তু এসব সামগ্রী একেবারে অপ্রয়োজনীয়-আবর্জ্জনা মনে করে ফেলে দেন না···বরং কেচেকুচে ভালোভাবে সাফ্-সুতরো করে নিয়ে সযত্নে বাক্সে-আলমারীতে তুলে রাখেন—যাতে সময়ে-অসময়ে সংসারের অন্য কোনো দরকারী-কাজে এ সব পুরোনো জিনিষ ব্যবহার করতে পারেন—এই ভরসায়। এ থেকে তাঁদের নিপুণ-গৃহিণীপণা আর বিচক্ষণতার যথেষ্ট পরিচয় মেলে। কারণ, শুধু সংসারের বিভিন্ন দরকারী-কাজের চাহিদা মেটানো ছাড়াও, একটু চেষ্টা করলেই এ সব পুরোনো-অব্যবহার্য্য তোয়ালের টুকরো দিয়ে অনায়াসে এবং অভিনব-উপায়ে কাপড়ের কারু-শিল্পের নানা রকম বিচিত্র-অপরূপ খেলার-পুতুল, ঘর-সাজানোর টুকিটাকি সৌখিন-সামগ্রী প্রভৃতি বানানো চলে। পুরোনো তোয়ালে দিয়ে কি উপায়ে কাপড়ের কারু-শিল্পের এমনি সব সৌখিন-সামগ্রী রচনা করা যায়—এবারে তারই মোটামুটি আভাস দিচ্ছি।

সঙ্গের ১নং চিত্রে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার উপযোগী কাপড়ের কারু-শিল্পের যে 'ভাল্লুক-পুতুলের (Teddy Bear) নমুনাটি দেখানো হয়েছে, পুরোনো-তোয়ালে দিয়ে তেমনি-ধরণের সৌখিন-সামগ্রী রচনা করতে হলে বিশেষ কোন ব্যয়বহুল সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই···সামান্য কয়েকটি ঘরোয়া-উপকরণ জোগাড় করে নিলেই অনায়াসে এ সব শিল্প-কাজের চাহিদা মেটানো যাবে। এ-ধরণের শিল্প-কাজের জন্য দরকার—ছোট বা বড় আকারের একটি পুরোনো তোয়ালে (Turkish-Towel), ছুঁচ, সুতো, কাঁচি, গোটা কয়েক রঙীণ-বোতাম (Coloured Bu tons), কয়েকটি আলপিন, খানিকটা লম্বা 'টোয়াইন-সুতো' (Twine-chord) আর রঙীণ-ফিতে, (coloured Ribbon)। এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, উপরের নক্সার ছাঁদে 'ভাল্লুক-পুতুলটি' (Teddy Bear) রচনা করতে হলে—নীচের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে প্রথমেই তেমনি-ভঙ্গীতে তোয়ালেটিকে সমতল টেবিল কিম্বা ঘরের মেঝের উপর সমানভাবে (Flat) বিছিয়ে রেখে কাপড়ের
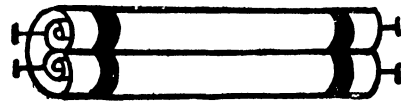
লম্বালম্বি-বহরের দিকের (width or opposite sides of the towel) দুই প্রান্ত বেশ পরিপাটি ও আঁটসাঁট-ধরণে নলের মতো (Tube) গোল-আকারে গুটিয়ে (Roll) তোয়ালের মাঝামাঝি-জায়গায় নিয়ে এসে প্রান্ত দুটিকে মুখোমুখি মিলিয়ে দিন এবং গোটা কয়েক আলপিন গেঁথে এমনিভাবে তোয়ালের কাঠামোর-ছাঁদটিকে (Form) অটুটভাবে বজায় রাখুন—যতক্ষণ না পুতুল তৈরীর বাকী কাজ সব মিটে যায়! এবারে ঐ একজোড়া নলের মতো ছাঁদে গোটানো তোয়ালেটিকে নীচের ৩নং

ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে
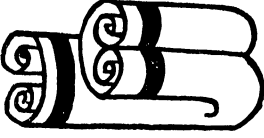
'ভাঁজ (Fold) করুন। এভাবে ভাঁজ করবার সময় নজর রাখবেন যে তোয়ালের নীচের 'পাটের' (Fold) উপরে যেন ⅓ অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ জায়গা ঢাকা পড়ে। অর্থাৎ তোয়ালের উপর-প্রান্তের 'ভাঁজটির' মাপ যেন নীচের-প্রান্তের ভাঁজের এক-তৃতীয়াংশ (⅓) হিসাবে রাখা হয়। এইভাবে 'ভাঁজ' করে নেবার পর, পূর্ব্বোক্ত-প্রথায় তোয়ালের কাঠামোটিকে (form) সাময়িকভাবে আলপিন গেঁথে যথাযথ অটুট-অবস্থায় রেখে দেবেন।

তোয়ালেটিকে এমনিভঙ্গীতে 'ভাঁজ' করে নেবার পর, 'ভাল্লুক-পুতুলের' 'মুণ্ড' (Head) রচনার কাজ করতে হবে। এ কাজ কি উপায়ে করতে হবে—তার সুস্পষ্ট-পরিচয় মিলবে নীচের ৪নং ছবিটি দেখলেই। অর্থাৎ 'ভাল্লুক-

পুতুলের' মাথাটি রচনা করতে হলে, দুই 'ভাঁজ'-করা তোয়ালের প্রান্তে ১½″ ইঞ্চি অংশ ছেড়ে রেখে, উপরের ৪নং চিত্রে দেখানো 'ফুটকি-চিহ্নিত' জায়গায় পরিপাটি-ভাবে এবং বেশ শক্ত করে পাক দিয়ে 'টোয়াইন-সুতো' জড়িয়ে নেওয়া দরকার। এভাবে সুতোটিকে এঁটে জড়িয়ে নেবার পর, পাকাপোক্তভাবে 'গিঁট' (Tie) বেঁধে নেবেন এবং সুতোর বাঁধনটি যাতে আগাগোড়া ঢাকা পড়ে ও বরাবর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, সে-জন্য সেটির উপরে সুচারুভাবে খানিকটা রঙীণ ফিতা জড়িয়ে সৌখিন-ছাঁদের একটি 'বাহারী-ফাঁশ (Decorative Bow-Tie) রচনা করে দেবেন। তাহলেই পুতুলের 'মুণ্ড-রচনার' কাজ শেষ হবে।

এবারে পুতুলের চোখ, নাক, মুখ, কান আর হাত-পা রচনার পালা। পুতুলের চোখ দুটি বানাতে হবে—ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে রঙীণ-বোতাম দুটিকে মুখের যথাস্থানে সেলাই করে দিয়ে। ভাল্লুকের নাক আর মুখ বানানোর জন্য, পুতুলের মাথার কাপড়টিকে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে ঈষৎ-ছুঁচোলো ধরণের করে নিন এবং ছুঁচ-সুতোর সেলাই দিয়ে পরিপাটিভাবে মুখের ও নাকের রেখা ফুটিয়ে তুলুন। ঠিক এমনি উপায়েই ভাল্লুকের কান দুটিকে রচনা করুন···অর্থাৎ, পুতুলের কানের-অংশের কাপড়ের প্রান্ত দুটিকে হাতে টেনে যথাযথ-ছাঁদের করে নিয়ে, প্রত্যেকটি কানের নীচের অংশে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় দিয়ে পাকাপাকিভাবে সেলাই করে ফেলুন। পুতুলের হাত-পা রচনার সময়, ছুঁচ-সুতোর সেলাই দিতে হবে। এ কাজের জন্য—উপরের ১নং ছবির নমুনানুসারে পুতুলের পা দুটিকে আলাদা-আলাদা ভঙ্গীতে ছড়িয়ে বসিয়ে এবং হাত দুটিকে তার কোলের উপর রেখে, ছুঁচ-সুতোর টাঁকা-সেলাই (Basting) দিয়ে পাকাপাকিভাবে যথাস্থানে গেঁথে দিন। তাহলেই পুরোনো-তোয়ালের কাপড় দিয়ে তৈরী দিব্যি-সুন্দর সৌখিন-ছাঁদের 'ভাল্লুক-পুতুলটি তৈরী হয়ে যাবে। এবারে কাপড়ের কারু-শিল্পের এই বিচিত্র-অপরূপ সৌখিন-পুতুলটি ঘরের আসবাবপত্রের উপরে সাজিয়ে রাখুন, কিম্বা ছোট ছেলেমেয়েদের সাদরে উপহার দিন···এটি দেখে সবাই আপনার হাতের কাজের নৈপুণ্যের প্রশংসা করবে!

বারান্তরে এই ধরণের আরো কয়েকটি কাপড়ের কারু-শিল্পের অভিনব-সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

—

পশমের গলাবন্ধ (স্কার্ফ)

সুলতা মুখোপাধ্যায়

শীতের প্রকোপ থেকে দেহ-রক্ষার জন্য, পশমী-কাপড়ের (Woolen-fabric) তৈরী সোয়েটার, মোজা, ব্লাউজ প্রভৃতির মতোই 'গলাবন্ধ' বা 'স্কার্ফে'রও' (scarf) বিশেষ প্রয়োজন···তাই এবারে নিতান্ত সহজসাধ্য এবং অল্প-ব্যয়ে ঘরে বসে অবসর-সময়ে নিজের হাতে বানানোর উপযোগী অভিনব-ধরণের একটি 'গলাবন্ধ' বা 'স্কার্ফে'র' (Scarf) নমুনা (Pattern) প্রকাশ করা হলো।
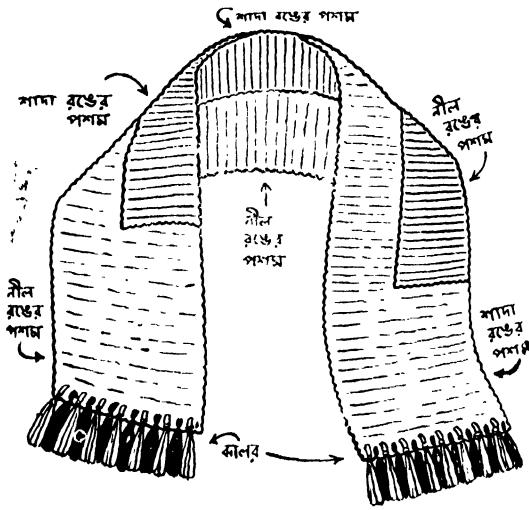
উপরে বিচিত্র 'প্যাটার্ণের' যে 'গলাবন্ধ' বা 'স্কার্ফে'র' ছবিটি দেখানো হয়েছে, সেটি বুনতে হলে চাই—২ আউন্স গাঢ়-নীল (Dark Blue) এবং ২ আউন্স শাদা (White) রঙের পশমী-সুতো (Knitting wool) একটি কাঁচি, এক টুকরো শক্ত কার্ডবোর্ড আর একজোড়া ৪ নম্বর পশম-বোনবার কাঁটা (No. 4 Knitting Needles)।

এগুলি সংগ্রহ হবার পর, উপরের ছবিতে দেখানো 'নমুনা' বা 'প্যাটার্ণ' (Pattern) অনুসারে পশমের 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধ' বুনতে হলে—নিম্নলিখিত-পদ্ধতিতে কাজ সুরু করবেন।

প্রথমে বোনার-কাঁটার (Knitting Needles) সাহায্যে গাঢ়-নীল রঙের পশমী-সুতো (Deep Blue Wool) দিয়ে, প্রত্যেকটি 'সারিতে' (Row) 'গার্টার-ষ্টিচ' পদ্ধতিতে (Garter-Stitch) অর্থাৎ সোজাসুজি-ভাবে ৬০টি করে 'ঘর' (Stitch) তুলে, উপরের 'প্যাটার্ণ' অনুসারে 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধের' ৮″ ইঞ্চি অংশ বুনে ফেলুন। তারপর 'ঘর' কমিয়ে, পূর্ব্বোক্ত ৮″ অংশের পরের 'সারিতে' ঐ গাঢ়-নীল রঙের পশমী-সুতো দিয়েই 'গার্টার-ষ্টিচ' পদ্ধতিতে অর্থাৎ সোজাসুজিভাবে ৩০টি করে 'ঘর' তুলে 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধটি' বুনে যান। এবারে গাঢ়-নীল রঙয়ে পশমী-সুতোর সঙ্গে শাদা-রঙের পশমীসুতো পাক দিয়ে মুড়ে (Twistng) জোড়া লাগিয়ে নিয়ে, উপরের 'প্যাটার্ণ মতো' এমনিভাবেই শাদা-পশমের সাহায্যে 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধের' বাকী ২০″ ইঞ্চি অংশটুকু আগাগোড়া বুনে ফেলুন। এভাবে নীল আর শাদা রঙের পশমী-সুতোকে পরস্পর পাশাপাশি মিলিয়ে রেখে বোনবার সময়, প্রত্যেকটি 'সারির'মাঝামাঝি-অংশে এসেই এদুটি বিভিন্ন-রঙের সুতোকে মজবুতভাবে পাক (Twisting the Blue yarn around the White each time you reach the centre of the row) দিয়ে পরিপাটি-ছাঁদে একত্রে জোড়া লাগিয়ে নেবেন···তাহলেই আর আলাদা দুই রঙের 'সুতোর জোড়' (Joint) আদৌ নজরে পড়বে না এবং উভয়েই বেমালুম মিলে-মিশে যাবে।

এমনিভাবে 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধের' তিনভাগ অর্থাৎ ⅔ অংশ পুনরায় উপরোক্ত-পদ্ধতিতে গাঢ়-নীল রঙের পশমী-সুতো দিয়ে পরের 'সারিতে' ৩০টি 'ঘর' বুনে, বোনার-কাঁটা থেকে নীল-রঙের সুতো খুলে নিয়ে, শাদা-রঙের পশমী-সুতোর সাহায্যে 'সারির' বাকী 'ঘরগুলি' বোনবার কাজ শেষ করে ফেলুন। তারপর পূর্ব্বোক্ত-প্রথায় শাদা-রঙের পশমী-সুতো দিয়ে প্রত্যেকটি 'সারি' বুনে গিয়ে 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধের' আরো ৮″ ইঞ্চি অংশ রচনা করে, এবারে 'ঘর' বন্ধ (Bind off) করুন। তাহলেই উপরের প্যাটার্ণ-অনুযায়ী 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধ' বোনার কাজ মোটামুটি শেষ হবে···বাকী থাকলো শুধু, স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধের' দুই প্রান্তে পশমী-সুতোর 'ঝালর' (Fringe বা Tassie) রচনার কাজ।

রঙীণ পশমী-সুতো দিয়ে কি উপায়ে 'স্কার্ফ' বা

বা 'গলাবন্ধের' এই 'ঝালর' বানাতে হবে—নীচের ১, ২, এবং ৩নং ছবিতে তার সুস্পষ্ট হদিশ মিলবে।
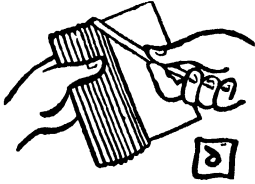
পশমের সুতো দিয়ে 'ঝালর' রচনার জন্য—উপরের ১নং চিত্রে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি-ভঙ্গীতে আলাদা-আলাদা দুটি মজবুত চৌকোণা কার্ডবোর্ডের টুকরোর (A square piece of thick cardboard-paper) গায়ে প্রয়োজনমতো মাপের লম্বা খানিকটা নীল আর শাদা রঙের পশমী-সুতো পরিপাটিভাবে পাক দিয়ে জড়িয়ে নেবার পর, নীচের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে কাঁচি চালিয়ে সুতোর দু' দিকের কিনারা নিখুঁত-ছাঁদে ছাঁটাই করে ফেলুন। তাহলেই সমান-মাপের একরাশ পশমী-সুতোর
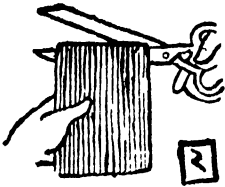
'ফালি' (Strands) তৈরী হয়ে যাবে…সেগুলি দিয়ে সহজেই 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধের' সুদৃশ্য 'ঝালর' বানানো চলবে।

এবারে ঐ নীল আর শাদা রঙের পশমী-সুতোর 'ফালি' দিয়ে মজবুত ও সুদৃশ্য 'ফাঁশ' বেঁধে নীচের ৩নং ছবির ভঙ্গীতে সদ্য-বোনা 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধের' দুই প্রান্তে পাশাপাশি কয়েকটি সুদৃশ্য 'ঝালর' ঝুলিয়ে দিলেই অভিনব-সৌখিন শিল্প-সামগ্রী রচনার কাজ শেষ হবে।
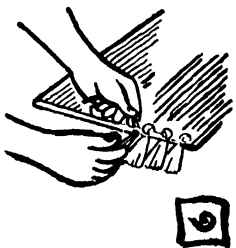
এই হলো উপরের প্যাটার্ন-অনুসারে বিচিত্র পশমের 'স্কার্ফ' বা 'গলাবন্ধ' রচনার সহজ-সরল পদ্ধতি।

সুধীরা হালদার

শীতের মরশুমে বাজারে গল্‌দা-চিংড়ী মাছ মেলে প্রচুর…এ মাছ খেতেও মুখরোচক এবং নানা রকমের অপরূপ-সুস্বাদু খাবার রান্নার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। তাই আজ চিংড়ী মাছ দিয়ে প্রিয়জনদের রসনাতৃপ্তিকর বাঙলা দেশের অভিনব-জনপ্রিয় একটি খাবার রান্নার হদিশ দিচ্ছি।

চিংড়ী-মাছের পাতুরী ঃ

এ খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—গোটা চারেক বড় ও পুরুষ্টু গল্‌দা-চিংড়ী মাছ, একটি নারিকেল, দুটি শুকনো লঙ্কা, আধ ছটাক সরিষার তেল, আন্দাজমতো পরিমাণে নুন, অল্প একটু সরিষা-বাটা, সামান্য চিনি, আর একখানা কলাপাতা।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, প্রথমেই মাছগুলিকে ছাড়িয়ে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন এবং মুড়ো আর দাড়াগুলি বাদ দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কুটে, সেগুলিকে নুন দিয়ে মেখে রাখুন। তারপর কুরুনীর সাহায্যে নারিকেলটি আগাগোড়া মিহিভাবে কুরে নিয়ে, পরিষ্কার একটি পাত্রে ঐ মাছের টুকরোগুলিকে রেখে, সেগুলির সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে লঙ্কা-বাটা, সরিষা-বাটা ও মিহি-ধরণে-বাটা নারিকেল-কুরো মিশিয়ে বেশ ভালো করে মেখে নিন। এগুলি ভালোভাবে একত্রে মেখে নেবার পর, আন্দাজমতো পরিমাণে নুন মিশিয়ে দিন। এ কাজ সারা হলে, কলাপাতাটিকে অল্পক্ষণ উনানের আঁচে সেকে ঈষৎ-তপ্ত করে নিন।

উনানের আঁচে অল্পক্ষণ সেঁকে নেবার ফলে, কলাপাতাটি নরম হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটিকে আগুনের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে, সেই নরম-কলাপাতাটির একদিকে আগাগোড়া বেশ ভালো করে সরিষার তেল মাখিয়ে, পাতাটিকে লম্বালম্বিভাবে দুইভাগে চিরে ফেলুন। এবারে দু'ভাগে-চেরা কলাপাতার একখানির উপর আরেকখানিকে লম্বালম্বিভাবে প্রায় অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত সমান করে পেতে নিয়ে, ঐ মশলা-বাটা আর নারিকেল-কুরোর সঙ্গে মেশানো মাছের টুকরোগুলিকে একের পর এক পরিপাটি-ভাবে সাজিয়ে রাখুন এবং সেগুলির উপরে আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য চিনি আর সরিষার তেল ছড়িয়ে দিন। তারপর ঠোঙায়-মোড়ার ভঙ্গীতে তেল-মাখানো ঐ কলাপাতা দিয়ে মশলা ও নারিকেল-কুরো মেশানো মাছের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে মুড়ে ফেলুন। এভাবে অন্ততঃপক্ষে চার-পাচবার 'পাট' (Fold) করে পরিপাটিভাবে মোড়বার সময় বিশেষ নজর রাখবেন, কলাপাতাটি যেন লম্বালম্বি এবং পাশাপাশি—দু'দিক থেকেই সাবধানে মোড়া হয়···অর্থাৎ অযথা-তাড়াহুড়ো বা অসাবধানতার ফলে, পাতাটি যেন কোনক্রমে এতটুকু ফেঁশে কিম্বা ছিড়ে না যায়।

এ পর্ব্ব চুকলে, রান্নার কাজে হাত দেবেন। খাবারটি রান্নার সময়, উনানের আঁচ কমিয়ে একেবারে নরম করে ফেলতে হবে। রান্নার রীতি হলো—উনানের নরম-আঁচে একখানা চাটু বসিয়ে, তার উপরে মশলা ও নারিকেল-কুরো মেশানো মাছের টুকরোগুলি মোড়া কলাপাতার-ঠোঙাটিকে রেখে দিন। খানিকক্ষণ এভাবে উনানের মৃদু-আঁচে রাখার ফলে, কলাপাতার ঠোঙায়-মোড়া মাছের টুকরোগুলির একদিক বেশ ভাজা-ভাজা হয়ে গেলে, সেগুলিকে খুব সন্তর্পণে উল্টে আরেকদিকে করে দেবেন। কলাপাতার ঠোঙায় মোড়া মাছের টুকরোগুলিকে বার কয়েক এমনিভাবে মাঝে মাঝে উল্টে-পাল্টে দিয়ে দু'দিকই আগাগোড়া বেশ ভালো করে ভেজে নেবার পর, যখন দেখবেন যে ঐ রান্না থেকে আর এতটুকু জল-নির্গম বা কোন শব্দ হচ্ছে না, তখনই বুঝবেন - খাবারটি তৈরী হয়ে গেছে। এমনটি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই উনানের উপর থেকে সাবধানে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে নিয়ে, অন্য একটি ঢাকা-চাপা-দেওয়া পরিষ্কার পাত্রে গরম-খাবারটি সযত্নে তুলে রেখে, কিছুক্ষণ জুড়োতে দেবেন। পরিষ্কার-পাত্রে তুলে রাখবার সময়, খাবারের উপরে অভিরুচি-অনুসারে অল্প কিছু ধনেপাতার কুচোও ছড়িয়ে দিতে পারেন···তাতে খাবারের সুস্বাদ আরো বেশী হবে। খাবারটি জুড়োনোর পর, ভাতের সঙ্গে সযত্নে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশন করুন···এ খাবার খেয়ে তাঁরা যে অকুণ্ঠচিত্তে আপনাদের হাতের অপূর্ব্ব-মুখরোচক আমিষ-রান্নার তারিফ করবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

এই হলো—বাঙলা দেশের অভিনব-প্রথানুসারে অপরূপ-সুস্বাদু 'চিঙড়ী' মাছের পাতুরী রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

পরেরবারে এ ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-উপাদেয় ভারতীয়-খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

জয়তু নেতাজী

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

সুভাষিত তুমি সুভাষচন্দ্র,
ভারতের তুমি নেতা;
আমাদের তুমি আপনার জন,
(সে যে) পুণ্য জীবন-কথা।
ভারত-স্বাধীন-যজ্ঞ-আহবে
অযুত কণ্ঠে উঠিল জয়,
তোমারে সকলে 'নেতাজী' বরিল,
জয়হিন্দ্-ধ্বনি বিগত-ভয়।

আজিকার দিনে জনম তোমার,
সে-কথা কেহ ভুলে নাই!
তোমারি নামের পতাকা ধরিয়া
মিলিয়াছি আজ সব ভাই।
তুমি আমাদের প্রাণের গর্ব,
রহিও মনেতে জাগি,
আবার আসিয়ো এ-ভারতভূমে
স্বদেশের সেবা লাগি।

স্বদেশমন্ত্রের ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

"Beware of everything that takes away your freedom."

ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় সূর্যের কণ্ঠে এই সাবধান-বাণী বজ্র নির্ঘোষে ধ্বনিত হয়েছিল হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা—সিকাগো থেকে লণ্ডনে। ভারতের মৃত্তিকায় যখন পরাধীনতার মোহনিদ্রা, পাশ্চাত্য জগতে যখন ভোগান্ধ উন্মত্ততা ঊনবিংশতি শতকের সেই দুর্যোগময় পৃথিবীতে ১৮৬৩ সালে কলিকাতার মাটীকে তিনি পবিত্র করেছিলেন। কৈশোর-যৌবনে ইউরোপীয় শিক্ষায় ও অবতার-বরিষ্ঠ রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের মন্ত্রে জাগ্রতপ্রাণ বিবেকানন্দ পৃথিবীকে জাগালেন। পরাধীনতার তামসিকায় মগ্ন কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রাণে জাগালেন স্বাধীনতার দুর্বার ক্ষুধা, তাঁদের প্রাণে উপ্ত করলেন স্বদেশ মন্ত্র; মুক্তির অমোঘ-বাণী—

"Aye, let every man and woman and child without respect of caste or birth, weakness or strength, hear and learn that behind the strong and the weak, behind the high and the low, there is that Infinite Soul, assuring the infinite possibility and infinite capacity of all to become great and good. Let us proclaim to every soul. Arise, awake, and sleep not till the goal is reached : Arise awake! Awake from the hypnotism of weakness. None is really weak, the soul is infinite, omnipotent and omnisient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you, do not deny Him !......"

......"What our country now wants are muscles of iron and nerves of steel, gigantic wills, which nothing can resist, which...will accomplish their purpose, in any fashion, even it meant going down to the bottom of the ocean and meeting death face to face..."

স্বদেশ মন্ত্রের ঋষি স্বামীবিবেকানন্দ

এই বজ্র-নির্ঘোষেই ত ঘুমন্ত ভারত জেগেছিল শত শত বর্ষের পরাধীনতার মোহনিদ্রা থেকে। এই জাগরণের ফলেই বাঙলায় এল রাজদ্রোহের প্রবল বন্যা যা সারা ভারতকে ভাসিয়ে দিল। পুনঃ পুনঃ আঘাত হেনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালে। স্বদেশ-মন্ত্রের ঋষি কীভাবে ভারতীয়দের জাগিয়েছেন তার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখেছেন বিশ্বমনীষী রোমা রোলাঁ:

"But the master's rowgh scourge made her turn for the first time in her sleep, and for the first time the heroic trumpet sounded in

the midst of her dream the formed March of India, conscious of her God. She never forgot it, from that day the awakening of the torpid colossus began. If the generation that followed, saw three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India today has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shocle to the mighty,

"Lazams, come forth" of the message (of Vivekanda) from Madras

মুক্তি মন্ত্রের ঋষির কণ্ঠেই উদ্গীত হয়েছে স্বাধীনতার জয়গান, আর দাসত্ব মোচনের সিংহ-নিনাদ। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের অধিবাসীদের সামনে তিনিই সেই প্রথম তুলে ধরলেন দাসত্বের, পরাধীনতার নগ্ন ঘৃণ্য রূপ। যে দাস সে দাসই, সোনার শিকলেই সে বাঁধা থাক, আর লোহার শিকলেই বাঁধা থাক, সে প্রভুর আদরই পাক, বা চাবুকই খাক।

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,
Of shining gold, or darker, baser one ;
Lone, hate—good, bad—and all the dual thing.
Know, stame is a slave, caressed or whipped, not free !
For fetters though of gold, are not less strong to bind ;

তিনিই প্রতিটি ভারতবাসীর সামনে তাদের নিজেদের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত করলেন :—

"এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, প্রাণে আশা নাই, আছে দুর্বলের যেন-তেন প্রকারে সর্বনাশ সাধনে একাই ইচ্ছা আর বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে।" তাদের তিনি আহ্বান করলেন কোটি কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রতগ্রহণের জন্যে। দৃপ্তকণ্ঠে আদেশ করলেন, "শত শত যুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।......দরিদ্র দুঃখী পদদলিতকে ভালবাস।...... সাহস অবলম্বন কর, তোমাদের দ্বারা মহৎ কর্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ।"

জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করে মিথ্যা ধর্মাচরণকে তিনি ঘৃণা করতেন। জীবরূপী প্রত্যক্ষ ভগবানকে উপেক্ষা করে অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরের পূজায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি গেয়েছিলেন :—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো, সখা এ সবার পায়,
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

ইহজগতের দুঃখ দুর্দশা হলাহল যে ধর্ম সাধনায় সম্ভব না হয়, সে ধর্মে তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলতেন যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে একটুকরা রুটী দিতে পারে না আমি সে ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না ···যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারে না, তিনি যে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

সকল জীবের সেবা কর—এই তাঁর মন্ত্র হলেও তিনি অন্য জীবের সেবা করার চেয়ে মানুষের সেবাকে অধিক মহত্তর ও আবশ্যক বলে মনে করতেন। একবার গো-সেবা সমিতির একজন প্রচারক তাঁর কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিলেন। তখন মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল। স্বামীজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা তাঁদের জন্যে কি করেছেন?' প্রচারক বললেন, "ঐ সব মানুষেরা নিজের কর্মদোষে দুঃখ পাচ্ছে। তাদের জন্যে কিছু করবার নাই। আমাদের সমিতির কাজ গো-মাতার সেবা। শাস্ত্রে যে বলেছে—গো আমাদের মাতা।" স্বামিজীর চোখে মুখে বিদ্যুৎ যেন চমকিত হল। তিনি স্মিতহাস্যে বললেন :—

"Yes, that the cow is our mother I understand ; who else could give birth to such accomplished children ? ·····But if I ever get money in my possession. I shall spend that in service of man. Man is first to be saved ; he must be given food, education and spirituality. If any money is left after doing all these then only some thing would be given to your society."

মানুষের মধ্যে আবার স্বদেশবাসীর সেবাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই প্রতিটি ভারতবাসীকে জাগানোই ছিল স্বামিজীর সাধনা—নিজের মুক্তি তিনি চান নি। মুক্ত কণ্ঠে তিনি বলেছেন:

I will go into a thousand hells cheerfully, if I can rouse my countrymen immersed in Tamas, to stand on their own feet and be men inspired in Karmayoga.......I am not a servant of Ramakrishna or any one but of him who serves and helps others, without caring for his own Bhakti or Mukti !"

ভারতের বিভিন্ন অংশে যে বিভেদ দানা বেঁধে উঠেছিল স্বামিজী তা অতিশয় দুঃখের সহিত লক্ষ্য করেছিলেন। হিন্দু মুসলমানের ভেদকে তিনি আঘাত হেনেছেন, আঘাত হেনেছেন অস্পৃশ্যতাকে।

"Don't touch me ! Dont touch this or that ! Is there any fellow feeling or sense of Dharma left in the country. There is only 'Don't-touchism' now. Kick out all such degrading usages !" আর চেয়েছেন "a Vedantic brain in an Islamic body প্রদেশে প্রদেশে, উত্তরে দক্ষিণে যে ভেদ-বিভেদ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তাতেই তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন। ভারতের প্রত্যেকটি মানুষ যে এক মহান আর্য জাতির বংশধর তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন মাদ্রাজের এক সভায়। বলেছিলেন: There is a theory that there was a race of mankind in Southern India called Dravidians entirely differing from another race in Northern India called the Aryans and that the Southern India Brhmanas are the only Aryans that came from the North, the other men of southern India belong to an entirely different caste and race to those of Southern India Brahmanas...the only proof of it is, that there is a difference of language between the North and South. I donot see any other difference, we are so many Northern men here, and I ask my European friends to pick out the Northern men and Southern men from the assembly, where is the difference ?...Do not believe in such silly things...The whole of India is Aryan, nothing else."

সমগ্র ভারতের মানুষ আজ শোনে! তোমরা সকলে এক মহান আর্যবংশসম্ভূত বিরাট জাতি। স্মরণ রেখো, স্বামিজী ঘোষিত নিঃসংশয় বাণী,

"The whole of India is Aryan, nothing else." নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আবিষ্কার করে বিভেদ সৃষ্টি করবার দিন চলে গেছে। জাতির জীবনে অখণ্ড সংহতি আনয়নের মহান দায়িত্ব আজ প্রত্যেকের সন্দেহ নাই। ভারতের সকল মানুষ অমর ঋষিদের বংশধর—এক জাতির মানুষ। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন; "আমি যে তোমাদের অযোগ্য দাস—ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষি বংশধর, সেই মহিমাময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর। আমি যে তোমাদের স্বদেশী ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও। তোমাদের পূর্বপুরুষের নামে লজ্জিত না হইয়া, তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর।

স্বামিজী পথের সন্ধান দিতে গিয়ে বলতেন, "যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করতে চাও, তোমাদের প্রত্যেককে এক একজন গুরু গোবিন্দ সিংহ হইতে হইবে।" আত্মজ্ঞানহীন ভারতবাসীর সামনে তিনি বার বার গুরু গোবিন্দের উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যিনি হিন্দু মুসলমানকে একীভূত করে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। স্বামিজী তাঁর অমোঘ প্রভাবের কথা বলেছেন:—

"সোয়া লাখ পর এক চড়াঁউ
জব গুরু গোবিন্দ নাম সুনাঁউ"

When Gurugovinda gives the name i. e. initiation, a single man becomes strong enough to triumph over a lakh and a quarter of his foes...He was a great worshipper of Shakti. Yes in Indian history, such an example is indeed very rare," সেই বিরল দৃষ্টান্তই প্রত্যেক ভারতবাসীকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনুসরণ করতে হবে। বিবেকানন্দের ইহাই অমোঘ নির্দেশ।

তাই আজ চাই প্রত্যেকের অন্তরে আত্মবিশ্বাস। গুরুগোবিন্দের বিবেকানন্দের জাতির প্রত্যেকের অন্তরে এই

আত্ম-নির্ভর। স্বামিজীর কথা: The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within you can do anything, you fail only when you do not strive sufficiently to manifest infinite power. As soon as a man or a nation loses faith in himself death comes. Believe first in yourself and then in God. A handful of strong men will move the world." এই মন্ত্র সর্বদা জাগরুক থাকা চাই প্রত্যেকটি ভারতবাসীর হৃদয়ে।

বিবেকানন্দের জাত আজ আত্মবিশ্বাসে শক্তিমান হও, আর প্রতি নিঃশ্বাসে জপ কর বিবেকানন্দের স্বদেশ মন্ত্র:

'হে ভারত, ভুলিও না, তোমাদের নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর। ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না, নীচ জাতি মুর্খ, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল আমি ভারতবাসী—ভারতবাসী আমার ভাই, বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে সদর্পে ডাকিয়া বল। ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের মৃত্তিকা আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর দিন রাত বল, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও. আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বদেশ মন্ত্রের ঋষি বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীর মধ্যে সেই মন্ত্রের ক্রিয়া লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন। মৃতের মধ্যে জীবনের লক্ষণ, নিদ্রিতের মধ্যে জাগরণের চিহ্ন তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন: "None can resist her (India) any more! No outward powers can hold her back any more; for the infinite giant is rising to her feet."

আসমুদ্রহিমাচল ভারত আজ অগ্রগতির উত্তেজনায় চঞ্চল। তার সম্মুখে বিবেকানন্দের দিগ্‌বিজয়ের আহ্বান:—

"শক্তির বিকাশ চাই, হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই, তাহারা আগুনের মত হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়াইয়া পড়িবে।

তার বক্ষ মধ্যে সদা জাগ্রত:—

"Better to die in the battlefield than to live a life of defeat!"

ভারতের জয় আজ অবশ্যম্ভাবী। বিবেকানন্দের ভারতকে পরাভূত করে সে সাধ্য কারও নেই।

বিবেকানন্দ : যুগের আলো

শচীন দত্ত

হৃদয়ে দারুণ ত্রাস: আকাশ পাণ্ডুর মুখ দ্যুতি
ম্লান সূর্য তারা সব ঘরে ঘরে কেউ কারো নয়,
প্রতিবেশী ফিরে যায় দূর হতে দূরের অন্বয়
হিংসা দ্বেষ বিশৃঙ্খলা—ঘন ঘোর আঁধার নিশুতি।

সমাজ রাষ্ট্রীয় ঘূর্ণিঝড়ে ছিন্ন প্রাণের শাসন
আবর্তন পৃথিবীর নিবু নিবু জোনাকির আলো
পথ প্রান্তে পাতা পুঁথি ধুলো মাখা ভারত দর্শন
চতুর্দিকে ভাঙ্গা স্বর মুক্তি চাই কেউ দীপ জ্বালো।

দিনান্তের আর্ত স্তব ধর্মীয় বল্কল খুঁজে আনে
দিকে দিকে উদ্ভাসিত ভারতের জীবনের গানে—
ত্যাগে বীর্যে মুক্তি-মন্ত্রে ফুটে ওঠে একক যে নাম।
হে স্মার্ত বিবেকানন্দ সত্যদ্রষ্টা তোমাকে প্রণাম॥

মেষলগ্ন

(দ্বাদশ ভাবে বৃহস্পতির অবস্থান হেতু ফলাফল ভৃগুসংহিতানুসারে)

উপাধ্যায়

বৃহস্পতি মেষলগ্নে অবস্থান করলেজাতক সুন্দর, সৌভাগ্যবান ও সন্মানিত ব্যক্তি হয়। ব্যয়বাহুল্য ও আড়ম্বরপ্রিয়তা। উত্তম স্বাস্থ্য। ধর্মপ্রবণতা এবং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। সন্তানগণ সুশিক্ষিত হয়। পারিবারিক টান থাকে। অদম্য অধ্যবসায়ের দ্বারা জীবিকাবৃত্তি বা পেশার উন্নতিসাধন করে। আভিজাত্য মর্যাদা বোধ ও অন্তর্দৃষ্টিশক্তি থাকে। আচরণে নম্র। বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে অনুরাগ। সজ্ঞানে মৃত্যু। জীবনের শেষে সৌভাগ্য ও সম্মান বৃদ্ধি। জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ দীর্ঘায়ু, বৃহস্পতি ধনস্থানে বৃষরাশিতে থাকলে জাতক ভাগ্যবান, বিত্তবান ও প্রচুর অর্থোপার্জন শক্তিলাভ করে। দৈবানুগ্রহে অর্থ বৃদ্ধি। সঞ্চয়ের পক্ষে সামান্য বাধাপ্রাপ্তি। ব্যয় সঙ্কোচে যথেষ্ট, তবু সময়ে সময়ে ব্যয় বৃদ্ধি। ধর্ম্ম গৌণ, ধনই জাতকের মুখ্য লক্ষ্য। শত্রুদমনে বিশেষ বুদ্ধি প্রয়োগ করে। পিতার উপর টান কম। অর্থই প্রধান, সম্মানের প্রতি আকর্ষণ কম। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুখে অতিবাহিত হয়। যানবাহনাদির জন্য প্রবল প্রচেষ্টা, বার্দ্ধক্যেও যৌবনের ভাব। মুখশ্রী সুন্দর। অতি সহজে অর্থোপার্জ্জন।

বৃহস্পতি সহজভাবে মিথুন রাশিতে থাক্‌লে জাতক হৃদয়বান্, উৎসাহী ও ভাগ্যবান্ হয়। ভাগ্যোন্নতিতে সক্ষম। ভ্রাতা ভগ্নীর উত্তম সাহচর্য্য লাভ। খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়। পদমর্য্যাদাসম্পন্ন, পেশায় সাফল্য, ধর্ম্মাসক্তি ও পারিবারিক আনন্দ। সজ্ঞানে মৃত্যু। প্রবৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষা উচ্চ। মন আশাপূর্ণ, সতেজ ও প্রফুল্ল। সামাজিক ও সদালাপী।

বৃহস্পতি কর্কটে সুখভাবে থাক্‌লে উত্তম ভাগ্যহেতু প্রচুর লাভ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা। ভূসম্পত্তি লাভ ও সম্মান বৃদ্ধি। মাতৃভাব উত্তম হয়। পিতার সম্বন্ধে উদাসীন। উন্নতির পথে অগ্রগমনের প্রচেষ্টায় অনাসক্তি ও কর্ত্তব্যবোটের অভাব। পুত্রের জন্য অপবাদ। জীবনী শক্তির প্রাচুর্য্য। শোভন গৃহ ও আসবাব পত্র। শেষ বয়সে খুব সুখ ভোগ। পরিবার বেষ্টিত হয়ে সুখে ও সজ্ঞানে মৃত্যু।

বৃহস্পতি সিংহে পুত্রভাবে থাক্‌লে উত্তম বিদ্যালাভ, সৌভাগ্যশালী ও বুদ্ধিমান। বিদ্যার্জ্জনের মাধ্যমে ভাগ্যোন্নতি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। সংসার যাত্রা নির্বাহ ভালো ভাবেই করে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। নাটকীয় প্রতিভাসম্পন্ন। বিজ্ঞান, দর্শন ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ। মানসিকতা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর। নূতন ধরণের ব্যবসায়ে বিশেষ ভাগ্যবৃদ্ধি। মনোমত সন্তান ও সন্তানের তরফ থেকে সুখ।

বৃহস্পতি শত্রু স্থানে কন্যাতে থাক্‌লে ধর্ম্ম ও ভাগ্য দুর্ব্বল হয়, সম্মান ও মর্য্যাদার অভাব। ভাগ্য বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট। সঞ্চয়শীলতার জন্য আগ্রহশীল। বেশ মতলববাজ

সমাজ ও রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভাব। ব্যায়ামের অভাবে স্বাস্থ্যহানি। ধর্ম্ম জীবনে সাফল্য। সন্তানের দ্বারা আর্থিক উন্নতি।

বৃহস্পতি জায়া স্থানে তুলাতে থাকলে ভাগ্যের জোরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুখে অতিবাহিত হয়। পারিবারিক কার্য্যে উন্নতি, ধর্ম্মপ্রবণতা, মর্য্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী লাভ, দৈবানুগ্রহ লাভ, পার্থিব বিষয়বস্তু লাভ। বিবাহের পর জাতকের উন্নতি। গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রী। বিবাহে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি ও লাভ।

বৃহস্পতি বৃশ্চিকে অষ্টম স্থানে অবস্থিতি হেতু ভাগ্যের দুর্ব্বলতা। বিদেশে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও সম্মান। পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী, মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন, জীবিকা নির্ব্বাহের উত্তম উপায় লাভ, মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, দীর্ঘ জীবন, অর্থাগমে সাফল্য এলেও ভাগ্যের দুর্ব্বলতা হেতু কিছু কষ্টভোগ।

বৃহস্পতি ভাগ্য বা ধর্ম্মস্থান ধনুতে থাকলে ভাগ্যের আংশিক দুর্ব্বলতা, দৈবানুগ্রহে সম্মানপ্রাপ্তি, বিদ্যাবুদ্ধি উত্তম, সন্তান সুখ, ধর্ম্মপ্রবণতা, কর্ম্মে উৎসাহ, ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহ প্রীতিপূর্ণ সহযোগ। বিচারক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠা হওয়ারও সম্ভাবনা। সদ্‌গুরুলাভ।

বৃহস্পতি কর্ম্মস্থান মকর রাশিতে থাকলে পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল, পিতার সহিত অসদ্ভাব, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সৌভাগ্য লাভ। সমাজে বা সরকারী স্থানে কোন উল্লেখ যোগ্য স্থান হয় না, সামান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হয়। শান্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে। মতলববাজ। ভাগ্যোন্নতির জন্য পরিশ্রমশীল। অত্যন্ত গর্ব্বিত ও অপব্যয়ী। বৈষয়িক ব্যাপারে সাফল্য। মৃত্যুর সময় সচ্ছল অবস্থা। স্ত্রীর সাহচর্য্যে পারিবারিক সুখ।

বৃহস্পতি একাদশ স্থানে কুম্ভরাশিতে থাকলে আয়ভাবের কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা। ভ্রাতা ভগ্নীর সাহচর্য্য লাভ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে কিছু কিছু বাড়তি আয় হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। সন্তান সুখ। বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য। বক্তৃতায় প্রশংসা অর্জন। মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবার মধ্যে শান্তি ও স্বচ্ছলতা। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা খ্যাতি লাভ। কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে সাফল্য।

বৃহস্পতি দ্বাদশ স্থানে মীন রাশিতে থাকলে নিজের বসত-বাড়ী ছাড়াও গৃহলাভ। পূর্ণভাবে ভাগ্যোদয় ঘটে না। অপরিমিতব্যয়ী, বিলম্বে সম্মানপ্রাপ্তি। সাংসারিক উন্নতির জন্য চিন্তা। সন্তানের মৃত্যুজনিত শোক। কর্ম্মকুশলতার জন্য খ্যাতি। বিদেশে সম্পত্তি।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। ভরণী নক্ষত্র জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। মাতার শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না। কর্মস্থলে ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধি। শত্রুর দ্বারা অপবাদ প্রচার। বন্ধুর দ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা শুভ। বিবাহ-যোগ্য সন্তান সন্ততির বিবাহ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ বলা যায় না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। অগ্রজের উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুখশান্তিলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ভালো বলা যায় না।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে মধ্যম, কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম, কর্মোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি। দেশভ্রমণ যোগ, পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি। ভূসংক্রান্ত বিষয় থেকে লাভ যোগ। ব্যয়ের প্রবণতা। ঋণের জন্য অশান্তি ভোগ। গুরুজন বিয়োগ। কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মোটামুটি ভালোই বলা যায়। সন্তান, পত্নী ও ভ্রাতৃবধূর বিশেষ পীড়া যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে দাম্পত্য সুখ, বিলাসিতার দ্রব্যাদির সুখ। গুপ্ত প্রেমের দিকে ঝোঁক। অতিরিক্ত সম্ভোগস্পৃহা। চিত্রতারকাদের

পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে অশুভ। স্বাস্থ্যহানি, স্বজন বিয়োগ, অপযশ, চৌর্য্যভয়। অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ, ধর্মপ্রবণতা। অর্থনাশ ও মানসিক উদ্বেগ। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তিরও যোগ আছে। সম্পত্তি বিষয়ে অশুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিস্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে সৌভাগ্যোদয়। অতিরিক্ত আমোদ-প্রিয়তার জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য। প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে আশাভঙ্গ বা মনোকষ্ট। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী নৈরাশ্যজনক।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে উত্তম। পুষ্যাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে অধম। মাসটি স্বাভাবিকভাবে চলবে। নারী প্রলোভন। অর্থাগম। কোন নারীর নিমিত্ত অনিষ্টযোগ। চাকুরি ক্ষেত্রে উন্নতির আশা, বেকার ব্যক্তির কর্মপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-জীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে সাফল্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ের সংস্রবে নানা রকম রোমান্টিক ব্যাপার এবং তা থেকে ঝঞ্ঝাট। পর পুরুষের সান্নিধ্যে চরিত্ররক্ষা শিথিল হবে। অবৈধ প্রণয়ে আনন্দের আতিশয্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ রাশি

পূর্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তর ফল্গুনী-জাতগণের পক্ষে মধ্যম। মঘাজাতগণের পক্ষে অধম। গুরুজন বর্গের বিশেষ পীড়া যোগ। পত্নীর শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। কোন নারীর জন্য মানসিক উদ্বেগ, বাসস্থানসংক্রান্ত গোলযোগ। অর্থোপার্জ্জনের উত্তম যোগাযোগ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ীর ক্ষতি। কর্মক্ষেত্র শুভ, বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম। বেকার ব্যক্তির কর্মলাভ। পরীক্ষায় সাফল্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। পরকীয়া প্রেমলাভ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়সংক্রান্ত ব্যাপার সুখকর, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যা রাশি

হস্তাজাত ব্যক্তির উত্তম। চিত্রাজাত ব্যক্তির মধ্যম। উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির অধম। নূতন সম্পত্তি। চাকুরি-ক্ষেত্র শুভ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে শুভ। আয়ভাব শুভ। অপরের নিকট গচ্ছিত বা লগ্নীকৃত অর্থের ক্ষতি। কোন নারীর নিমিত্ত অভিযোগ। জামাতা ও পুত্রবধূর পীড়া। কলহ, শত্রুর দ্বারা অশান্তি। গুপ্ত শত্রুবৃদ্ধি। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা, ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কলাশিল্পের দিকে ঝোঁক, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির মাত্রাধিক্যহেতু স্বাস্থ্য-হানি। অবৈধ প্রণয়। আনন্দ ও আর্থিক লাভ দুই-ই হবে। চাকুরিজীবী নারীর পক্ষে কম বেশী দুশ্চিন্তা। চিত্রতারকাদের উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

তুলা রাশি

চিত্রার পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধ্যম, স্বাতীর পক্ষে অধম। পিতামাতার পীড়াদি, কর্মস্থলে পরিবর্ত্তন। গবেষকগণের পক্ষে উত্তম, বন্ধুদ্বারা অশান্তি। প্রতিযোগিতা-মূলক কার্য্যে জয়লাভ। যানবাহন দুর্ঘটনার আশঙ্কা। সাংসারিক অশান্তি, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য। সম্পত্তি বিষয়ে শুভ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ ভালো বলা যায় না। গুপ্ত প্রণয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। নানা প্রকারে ব্যয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম। জ্যেষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। অনুরাধার পক্ষে অধম, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ। গৃহাদিনির্মাণ, অনুজের পীড়া, স্বাস্থ্য ভালো নয়, আয়স্থান শুভ, সম্পত্তি লাভের আশা, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ীর পক্ষে অশুভ। বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম, স্ত্রীলোকের পক্ষে অবৈধ-প্রণয়ে আশাতীত সাফল্যলাভ। চাকুরিজীবী নারীর

বিশেষ উন্নতি। কলাকুশলী ও মঞ্চ-অভিনেত্রীর পক্ষে উত্তম সুযোগ ও প্রতিপত্তি, সাংসারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু রাশি

পূর্বাষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ। মূলাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে অধম। ৩রা মাঘ ও ৫ মাঘ এই দুইটি তারিখে সর্ববিষয়ে হুঁসিয়ার হয়ে চলা দরকার। শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি যোগ। প্রতারক কর্ত্তৃক অর্থহানি, কর্মে অশান্তি, ছোট ভাইয়ের উন্নতি ও কর্মে যোগাযোগ, প্রতিযোগিতায় সাফল্য, বৃহৎ যোগাযোগ-প্রাপ্তি প্রভৃতি শুভ ফলের কারকতা আছে। রোমান্টিক আবহাওয়ার মধ্যে সুন্দর পরিস্থিতি। সম্পত্তি বিষয়ে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি; নূতন সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতির আশা। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে সাময়িক অচলাবস্থার হ্রাস। বৃত্তিজীবীর শুভযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অর্থনাশের ও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত প্রণয়ে বিভ্রাট ও অপবাদ বৃদ্ধি, পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক গতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মকর রাশি

শ্রবণার পক্ষে উত্তম। ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যহানি। চিকিৎসা বিভ্রাট-যোগ। বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠস্থলে পীড়া। দাম্পত্য অশান্তি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। ধনভাব বিশেষ শুভ ও আশাপ্রদ। গুরুজনবিয়োগ। কর্ম্ম প্রচেষ্টায় জড়তা। নূতন কর্ম্ম-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি-জীবীর পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ নয়। বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের সঞ্চিত অর্থনাশ ও প্রতারিত হওয়ার যোগ। অবৈধ প্রণয়ে উত্তম ফললাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র শুভ। আয়বৃদ্ধি ও ধনলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ রাশি

শতভিষার পক্ষে উত্তম। ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। পূর্ব্ব-ভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালো। সন্তানের পীড়া। কর্ম্মোন্নতি। মানসিক, পারিবারিক ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি। সম্পত্তি বিষয়ে গোলযোগ। শিল্পী, চিকিৎসক ও আইনজীবীর পক্ষে শুভ। বাড়ী-ওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরি-জীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে অশুভ, আকস্মিক কারণে অর্থনাশযোগ। দাম্পত্য কলহ। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্ত্রীব্যাধির প্রবণতা ও তজ্জনিত শারীরিক অসুস্থতা, পরপুরুষের সান্নিধ্যে অবৈধ প্রণয়সংযোগ, গুপ্ত প্রণয়ের পরিণতি অশুভ হবে। অন্যান্যভাব শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। রেবতীর পক্ষে মধ্যম। উত্তরভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে অধম। মূত্রযন্ত্র, যকৃৎ ও পাকযন্ত্রসম্পর্কীয় পীড়া। আর্থিক উন্নতি যেমন আশাতীত হবে, তেমনি হবে বুদ্ধিভ্রংশজনিত অর্থক্ষতি। পুত্রবধূ ও জামাতা হোতে অশান্তি বৃদ্ধি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো। কর্ম্মোপলক্ষে দেশভ্রমণ। সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরাতন গোলযোগের অবসান। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অর্থ উপায়ের যোগ ও আয়বৃদ্ধি। চাকুরীর ক্ষেত্রে উন্নতি বিলম্বিত হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। সর্ব্ব-ক্ষেত্রে শুভ যোগ। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। বুদ্ধির দোষে প্রণয়াস্পদের বিরক্তি সৃষ্টি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন—

কর্ম্মোন্নতি, ব্যয় বাহুল্য, আত্মীয় মনোমালিন্য, পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা, সহোদরভাব শুভ। নিজের শারীরিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে ব্যয়বাহুল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, প্রণয় হানি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

যথেষ্ট পরিমাণে ধনাগম। সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। উত্তম বন্ধুলাভ। সন্তানভাব শুভ। পত্নীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। দাম্পত্য প্রণয়। পিতার সহিত মতানৈক্যজনিত অশান্তি ও উদ্বেগ। তীর্থ ভ্রমণ। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। অপরিমিতব্যয়জনিত সাময়িক ঋণযোগ। সহোদরভাব শুভ। সদ্বন্ধুলাভ। ভাগ্যোন্নতি। গৃহনির্ম্মাণ বা সংস্কারে ব্যয়। চাকুরির ক্ষেত্র আশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টি মধ্যম। প্রণয়াশক্তির আতিশয্য ও অবৈধ প্রণয়ে ঝোঁক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

কর্কট লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ। আর্থিকোন্নতি ও আয় বৃদ্ধি। ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব প্রীতি। বন্ধুবান্ধবের সহিত মনোমালিন্য। সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতি। মাতৃপীড়া। নূতন কর্ম্মে অর্থ বিনিয়োগে ক্ষতি। চাকুরীর ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি ও ধনক্ষয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

সিংহ লগ্ন-

শারীরিক অসুস্থতা। পিত্তাধিক্যজনিত পীড়া। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যে সাফল্য। সহোদরের সহিত মনান্তর। পিতার অসুস্থতা। পত্নী প্রেম। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। সন্তান সন্ততির বিবাহ। সম্পত্তি লাভের সুযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক কষ্ট, মানসিক উদ্বেগ, আর্থিকোন্নতি, দাম্পত্য-প্রণয়, মাতার দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া, সৌভাগ্যোদয়, সন্তানের উচ্চ বিদ্যালাভ, সদ্বন্ধু লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ফল মধ্যবিধ।

তুলা লগ্ন—

দেহভাব অশুভ, দাঁতের পীড়া, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। সাময়িক ঋণযোগের সম্ভাবনা। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ, কর্ম্মস্থানে গুপ্তশত্রু. পারিবারিক অশান্তি, ভাগ্যভাবের ফল শুভ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শরীর ভালো বলা যায় না, স্বাস্থ্যের অবনতি, সহোদরভাব অশুভ, সদ্বন্ধু লাভ, সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা ও বিদ্যালাভে বিঘ্ন। পত্নীর স্বাস্থ্য ভালো, ব্যয়াধিক্য, অর্থাগম শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, কর্ম্মোন্নতি। ধনাগমে বাধা, ব্যয়াধিক্য হেতু বিব্রত। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। মাতার শারীরিক অবস্থা শুভ। ভাগ্যভাবের উন্নতিযোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

মকর লগ্ন—

পত্নীর পীড়াদি ভোগ, চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি, দেহ-ভাবে ক্ষতির আশঙ্কা, ধনাগম, সহোদর-ভাব শুভ। মিত্র-লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রীতি, ধনাগম, সহোদরের সাহায্যে আর্থিকোন্নতি, সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। সন্তান-সন্ততির বিবাহযোগ, পিতার পীড়া, ভাগ্যভাব শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

শারীরিক কষ্ট, বেদনাসংযুক্ত পীড়াভোগ। মানসিক উদ্বেগ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্থব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, সম্বন্ধুলাভ, সাংসারিক ব্যাপারে মতানৈক্য, পুত্র-কন্যার বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা, যথেষ্ট বাধা সত্ত্বেও ধনাগম, ভ্রমণ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

চিঠি

সতীন্দ্রনাথ লাহা

বেশ আছি এখানে,—একলা বেড়াই,
সকলের কাছ থেকে নিয়েছি ছুটি।
পাহাড়ীয়া নদী আর ঝরণা ধারা—
এরাই এ নিরালায় আমার জুটি ॥

তুমি ভাবো একলা কি করে কাটাই—
দুটো কথা বলবার নাই কোন লোক!
কিছু দিন প্রথমে লেগেছে খারাপ,
এখন পেয়েছি সাথী, পলাশ অশোক ॥

সকালের কুয়াশায় শিমুলের বন—
আব্‌ছা ধোঁয়াটে এক জাপানী ছবি।
'নিউট্রাল টিন্‌টে'র হাল্‌কা ওয়াস্—
কখন কে টেনে গেছে রঙের কবি ॥

রোদ নেই, তাপ নেই,—আব্‌ছা সকাল,
কাঠ কাঁধে হাটে যায় বুনো কাঠুরে।
সচল ছায়ারা যেন দল বেঁধেছে—
সুদূরের বন থেকে,—পাহাড় ঘুরে ॥

ঘড়িতে বেজেছে ক'টা—জেনে কাজ নেই,
হয়তো বা দশটা, নয়তো বারো।
শীতের আমেজ টুক্ থাকবে না তো
যতই বলি না তাকে থাকতে আরো ॥

আরো ক'টা দিন তবে এমনি কাটুক,
আবার তো টেনে নেবে এক ঘেয়ে দিন।
যন্ত্র যুগেতে যত যন্ত্র দানব—
কান ধরে ডাক দেয়—চালাও মেসিন্!

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনুরাধা তাঁর খাতা থেকে পড়তে লাগলেন, 'আমার বাবার এক বন্ধুই প্রথমে তাঁকে নিয়ে এলেন। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলুম তিনি বিপ্লবীদলের একজন কর্মী। দেশের স্বাধীনতালাভই এঁদের জীবনের ব্রত। সেই ব্রত পালনের জন্য তাঁরা যে কোন কাজ করতে পারেন।

বাবাও স্বাধীনতা চাইতেন। কিন্তু অহিংসার পথ ছাড়া অন্য কোন পথ তিনি নিতে পারতেন না। এই নিয়ে তাঁর যুবক-অতিথির সঙ্গে তাঁর খুব তর্ক হত। সেই তর্ক বিতর্কের আলোচনা এখানে আমি তুলব না। সেই মাথাও আমার নেই। আমি মুগ্ধ হয়ে ওঁদের আলোচনা শুনতাম। ওঁদের চা দিতাম, খাবার এনে দিতাম। গোপন করব না, বাবার চেয়ে অতিথির কথা আমার কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হত। তিনি বলতেন, পথটা তুচ্ছ, উদ্দেশ্যসিদ্ধিই বড় কথা। অন্যায় অত্যাচার অবিচার কোনদিন বিনা অস্ত্রাঘাতে বন্ধ হয় নাই। এখনও হবে না। তাঁর কথাগুলিই আমার সত্যি বলে মনে হত। তাঁর মতের সঙ্গে যে আমার অন্তরের সায় আছে, একথা তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতেন। আর বুঝতে পেরে তাঁর উৎসাহ বেড়ে যেত। তাঁকে দেখে আমার মনে হত এতদিন আমি যে শৌর্যবান বীর্যবান পুরুষের ধ্যান করে এসেছি, বাবার মুখে যাঁদের কথা শুনেছি, আমাদের তরুণ অতিথি তাঁদের একজন। দেখতাম মতের সঙ্গে না মিললেও বাবা তাঁকে পছন্দ করেন। তাঁর মধ্যে এমন একটা তেজ আর দীপ্তি ছিল যাতে সবাই মুগ্ধ আর অভিভূত হত।

মাঝে মাঝে তিনি বহুদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। আমি আর বাবা দুজনেই তাঁর জন্যে শঙ্কিত হয়ে থাকতাম। কখন কি বিপদ ঘটে কে জানে। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু যে পথে তিনি চলেছেন তাতে যে অনেক বাধাবিঘ্ন। পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। আমি তাঁর জন্যে ভয়ে ভয়ে থাকতাম। আবার কখনো বা তিনি দিনের পর দিন আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় নিতেন। অসুস্থ হয়ে আসতেন, পুলিসের হাত এড়াবার জন্যে আসতেন। এতে আমাদেরও বিপদ কম ছিল না। তবু তাঁর জন্যে এই বিপদের ঝুঁকি নিতে হত বলে আমার এক ধরণের গর্ব আর আনন্দও হত।

একবার তিনি জ্বর নিয়ে এলেন। কতদিন ধরে ভুগছিলেন কে জানে। আমাদের বাড়িতে এসেও ভুগতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকলেন, ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। আর আমার উপর ভার পড়ল সেবার। ওঁর জন্যে কিছু করতে পেরে আমার খুব আনন্দ হল। আমার তো আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই। যিনি দেশের কাজ করছেন আমি তাঁর সেবা করে ধন্য হচ্ছি। আমি তাঁকে ওষুধ খাওয়াতাম, পথ্য খাওয়াতাম, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। অনেক রাত অবধি তাঁর বিছানার পাশে বসে তাঁর শুশ্রূষা করতাম। সেইবারই তিনি জোর করে আমার হাতখানা তাঁর বুকের ওপর চেপে ধরলেন। আমি ছাড়িয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, 'তোমার চেয়ে আপনজন এ সংসারে আমার আর নেই।'

আমার মনে হল বাবার চটি জুতোর শব্দ এদিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু একটু থেমে তা আবার পিছিয়ে গেল। আমি লজ্জায় মরে গেলাম।

কিন্তু জ্বরের ঘোরে যা বলেছিলেন সুস্থ হয়েও সেই

কথা বললেন। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাকে আপন করে নিতে চান। আমি ভাবলাম এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার আর কী হতে পারে। আমি যা মনে মনে চাইছিলাম—কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না, তিনি তাই অসঙ্কোচে বলে ফেললেন। কিন্তু আমার বাবা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিতে পারলেন না। তাঁর মুখখানা গম্ভীর হয়ে রইল। আমাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমারও কি এই মত ?'

আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

বাবা বললেন, 'ভালো করে ভেবে দেখ। ওর মা নেই, বাবা নেই। বাড়ি ঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সংসার চালাবার জন্যে কোন কাজকর্ম করে বলে জানিনে।'

বললাম, 'কাজ উনি নিশ্চয়ই করবেন।'

বাবা বললেন, 'কবে করবে কি জানি। এখন যে কাজ নিয়ে আছে তাতে জেল নির্বাসন ফাঁসি—না আসতে পারে এমন কোন বিপদ নেই।'

আমি বললাম, 'বাবা, তাই বলে কি ওঁর আত্মীয়-বন্ধুরা ওঁকে ত্যাগ করবেন? ওঁর এত বিপদ বলেই তো ওঁর সঙ্গে আমাদের থাকা দরকার।'

বাবা চুপ করে রইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বাধা দিলেন না। বাধা দিলে কী হত তা বলতে পারব না। হয়তো বাবার অমতে কিছু করতে পারতাম না।

আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পর আমি শ্বশুর বাড়ি গেলাম না। উনি-ই শ্বশুর ঘর করতে গেলেন। জেলে গেলেন। পুলিস আমাদের বাড়ি থেকেই ওঁকে গ্রেপ্তার করে নিল।

তারপর থেকে কখনো জেলে, কখনো জেলের বাইরে ওঁর জীবন কেটেছে। দীর্ঘ দিনের জন্য উনি যখন আমার চোখের আড়ালে চলে যেতেন আমার চোখে জল এলেও আমি বাবার সামনে চোখের জল ফেলতাম না। আমি জানতাম তাতে বাবা আরো বেশি দুঃখ পাবেন। আমি তো নিজে জেনে শুনেই এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করেছি। এখন আক্ষেপ করে কী হবে। আমি তাই সহজ ভাবে আমার সমস্ত দুঃখকে মেনে নিয়ে শান্তভাবে বাবার সেবা করতাম। পড়াশুনো করতাম। স্কুলের গণ্ডী ডিঙিয়ে কলেজের পড়া পড়তাম। একটার পর একটা পরীক্ষা দিতাম। পরীক্ষা দিয়ে বলতাম, 'বাবা' এবার আর পাশ করতে পারব না।'

যেন ফেল করবার ভয় ছাড়া আমার আর কোন ভয় নেই।

বাবা সবই বুঝতেন। আমাকে সান্ত্বনাও দিতেন না, আবার তিরস্কারও করতেন না। আমিও যেমন পড়াশুনো ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কোন রকম সাহায্য চাইতাম না, তিনিও তেমনি অযাচিত ভাবে কোন আশ্বাস কি উপদেশ দিতে আসতেন না। আমাকে পরীক্ষার পড়ায় সাহায্য করাই যেন তাঁর একমাত্র কর্তব্য—তিনিও এমন ভাব দেখাতেন।

বাবার অমতে আমি আরও একটি কাজ করেছিলাম। পাড়ার স্কুলে মাষ্টারী নিয়েছিলাম। বুড়ো বয়সে তিনি আমার সব খরচ চালাবেন, আর আমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে বসে খাব এ ব্যবস্থায় কিছুতেই আমার মন সায় দেয়নি।

কিন্তু বাবাকে বেশি দিন রোজগার করে খাওয়াবার ভাগ্য আমার হল না। বেশি দিন সেবা যত্নও আমি তাঁর করতে পারলাম না। আমাদের মায়া কাটিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

আমি চলে গেলাম বউবাজারে মাসীমার আশ্রয়ে। সেখানে বছর দুই রইলাম। তারপর আমার স্বামী শেষ-বারের মত জেল থেকে বেরোলেন। আর তাঁকে জেলে যেতে হয়নি।

এতদিন আমি নামে-মাত্র বিবাহিতা ছিলাম। নিজস্ব সংসার বলতে কিছু ছিল না। স্বামী জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর সেই সংসার হল। যে স্বাধীনতার জন্যে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন সেই স্বাধীনতাও এল। যে পথেই আসুক, এল। অখণ্ড ভারতের বদলে আমরা খণ্ডিত ভারত পেলাম। দ্বিখণ্ডিত হবার আগে রক্তপাত হল। আমরা শত্রুর সঙ্গে আর যুদ্ধ করলামনা, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি করলাম।

স্বামীকে কাছে পেলাম, ঘর বাঁধলাম, সংসার পাতলাম। কোলে ছেলে এল। জীবনের যে সব বাসনা অপূর্ণ ছিল একে একে সবই পূর্ণ হতে লাগল। কিন্তু যে সুখের আশা করেছিলাম সেই সুখের যেন ধরা ছোঁয়া পেলাম না।

আমার এই নৈরাশ্যের কথা সহজে মানুষকে বোঝানো যাবে না, বললেও মানুষ বিশ্বাস করবে না।

জেল থেকে বেরিয়ে আমার স্বামী শুধু আর রাজনীতি নিয়েরইলেন না ; অর্থনীতির দিকেও ঝুঁকলেন। ওঁর কয়েক-জন বন্ধু অনেকদিন আগে থেকেই যাদবপুর গ্লাস ওয়ার্কস নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমার স্বামী তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রথমে সামান্য একটা ডিপার্টমেন্টের ভার ওঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওঁর অসামান্য বুদ্ধি আর ক্ষমতাবলে উনি ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগলেন। অনেক ক্ষমতা ওঁর আয়ত্তে এল। কর্তৃত্ব হাতে এল। ওর যে সব বন্ধু এই প্রতিষ্ঠানকে গোড়া থেকে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন, কউবা হীনবল হয়ে অফিসের এক কোণে পড়ে রইলেন। কেউ কেউ এলেন আমার কাছে নালিশ জানাতে। আমি সব শুনলাম। তাঁদের জন্য যথাসাধ্য করব বলে প্রত্যেককে অভয় দিলাম, আশ্বাস দিলাম। কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করতে পারলাম না। আমার স্বামী সব হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'হরিমোহনবা বুঝি তোমার কাছে ওই সব লাগিয়েছে? আশ্চর্য, মানুষ এসবও পারে। ক্ষমতায় এঁটে উঠতে না পেরে মেয়ে-মানুষের আঁচল ধরতেও পারে ওরা। তাও পরের মেয়ে-মানুষের।'

তিনি হাসতে লাগলেন।

মেয়েমানুষ কথাটা আমার স্বামীর মুখে খুব খারাপ লাগল। মেয়েদের সম্বন্ধে অমন অবজ্ঞা করে কথা বলতে আমি তাঁকে এর আগে দেখিনি।

তিনি আমাকে বললেন—ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সহজ নয়, দুর্গম। পথের যারা বাধা, তাদের সরিয়ে দিতে না পারলে নিজে সরে যেতে হয়।

স্বামীর এসব যুক্তিতে আমার মন সায় দিল না। কিন্তু আমি কিছু করতেও পারলাম না। শুধু অভিমান করলাম। কখনো নীরবে কখনো সরবে ঝগড়া করলাম। সেই ঝগড়াও বাইরের দশজনের চোখের আড়ালে। তাঁদের চোখের সামনে আমি আমার স্বামীর সহধর্মিণী সহকর্মিণী পরম সহায়িকা।

আমার অন্তর ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। মাঝে মাঝে ভাবতাম পালিয়ে যাই। কিন্তু ছেলে আর স্বামীকে ফেলে পালাব কোথায়? দুদিনের মত যে রাগ করে গিয়ে সরে থাকব, তেমন বাপের বাড়িটি পর্যন্ত নেই।

যেমন ব্যবসাক্ষেত্রে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার স্বামীর এমন সব বন্ধু জুটতে লাগল—দেশের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থই যাঁদের কাছে বড়। তবু আজ একটা দলের ভাবনা তাঁরা ভাবলেও বুঝতাম তাঁরা একটা কিছু বড় আদর্শ নিয়ে রয়েছেন। কিন্তু দলের কথা তাঁরা বললেও উপদলীয় স্বার্থই ছিল তাঁদের কাছে বড়। ব্যক্তিগত উন্নতির সিঁড়ি তৈরি করা ছাড়া তাঁরা আর কিছু ভাবতেন বলে মনে হয় না। নিজেদের ক্যারিয়ারই তাঁদের কাছে আসল কথা। সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেশের যদি কিছু হয় দেশবাসীর বরাত জোর।

আমার স্বামীকে এই দলে ভিড়তে দেখে আমার কষ্ট হতে লাগল। আমি আপত্তি করলাম, প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু তাঁর মনের জোর আর গায়ের জোর এতই বেশি ছিল যে, আমার কথা তিনি গ্রাহ্যই করলেন না। এতকাল তাঁরা কষ্ট করেছেন বছরের পর বছর জেল খেটেছেন এখন কি ভোগসুখের অধিকার তাঁদের নেই। এই যেন তাঁদের যুক্তি।

আমার স্বামী বলতেন, 'কে না করছে? কে না ভোগ করছে? আমিইবা কেন ছেড়ে দেব? ঢের উপোস করেছি। এখন কেন করব?'

আমি কখনো তর্ক করতাম, কখনো চুপ করে থাকতাম। আমার মন কিছুতেই তাঁর কথায় সায় দিত না। আমি আমার স্বামীর মধ্যে আমার সেই প্রথম জীবনের বীরপুরুষদের খুঁজতাম। বাবার মুখে যাঁদের গল্প শুনেছি, নিজের কল্পনায় যাঁদের নানা রূপ দিয়ে আকার দিয়ে গড়ে তুলেছি, তাঁদের আমি একজনের মধ্যে, খুঁজতে চাইতাম, পেতামনা অথচ, আশ্চর্য, প্রথম প্রথম তো পেয়েছিলাম। প্রথম দিন তো আমি আমার স্বামীকে যথার্থ আদর্শবান বীরপুরুষ হিসাবেই দেখেছিলাম? সে কি আমার দেখবার ভুল? না কি তাঁর ছদ্মবেশ? কয়েক বছরের মধ্যে মানুষ কি এমন আগাগোড়া বদলে যেতে পারে? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করলেও তাঁকে অমান্য করতাম না। সামনে কি আড়ালে অসম্মানকর কোন কথা আমি তাঁর

সম্বন্ধে বলিনি। তবু কী করে তাঁর ধারণা হল আমি তাকে আগের মত শ্রদ্ধা করিনে, ভালোও বাসিনে। তিনি অশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর অসঙ্গত অশোভন চাল চলনের কথা আমার কানে যেতে লাগল। আমি একদিন আর থাকতে না পেরে বললাম, এসব কী শুনছি?"

তিনি প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁকে ছাড়লামনা।

তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তাহলে শোন। তুমি যা শুনেছ তার সবই সত্যি। আমি আমার পাশে এমন একজনকে চাই যে তর্ক করবেনা. পদে পদে ন্যায়-শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে আমাকে বাধা দেবেনা—শুধু আমাকে আনন্দ দেবে।'

আমি বললাম, 'তাই কি স্ত্রীর কর্তব্য?'

তিনি বললেন, 'স্ত্রীর যা কর্তব্য তুমি করে চলেছ। অন্য একটি স্ত্রীলোক আমার আশে পাশে যদি থাকে তাদের আমি কর্তব্য করবার জন্যে ডাকবনা। তাদের জায়গা আর তোমার জায়গা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের সঙ্গে তোমার তো কোন বিরোধ নেই।'

কিন্তু এমন মীমাংসা কি কোন মেয়ে সহ্য করতে পারে? আমিও পারলামনা। স্বামীর সঙ্গে আমার নিত্য বিরোধ লেগে রইল। অবশ্য সে বিরোধের কথা আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধুদের জানতে দিইনে। তাদের সামনে আমরা সুখী-দম্পতীর হাসিকথা বলি, গৃহস্থের করণীয় কাজ করে যাই। কিন্তু ভিতরে কোন সুখ নেই, শান্তি যেন চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

আমার স্বামী ধরা পড়বার পর আর কিছু গোপন করেননা। সবই স্বীকার করেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেন যে তাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়। কারণ আমার মত তাদের কারো ব্যক্তিত্ব নেই। আসলে তারা কেউ ব্যক্তিই নয়। সবাই বস্তু। যেমন বস্তু চা সিগারেট কি মদ। তারাও কি তেমনি খানিক অবসর যাপনের সহায় কি সহযোগিনী। সহধর্মিণীর সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই হয়না।

আমি আমার স্বামীকে নানা ভাবে বাঁধতে চেষ্টা করলাম। সদুপদেশ দিতে ক্ষান্ত হলাম। বেশে-বাসে কথায়-বার্তায় চটুল হলাম। যাদের আমি সমকক্ষ মনে করা দূরের কথা, মানুষ বলেই জ্ঞান করিনে, বরং পরম ঘৃণা করি, অসহায়ের মত তাদেরই অনুকরণ করতে শুরু করলাম। কিন্তু যিনি হাত বাড়ালেই আমাকে পাচ্ছেন, নকলে তার মন উঠবে কেন?

আমার দুর সম্পর্কের পিসতুতো বোন শান্তি ছিল ভিন্নজাতের মেয়ে। সে দেখতেও সুন্দরী নয়, লেখাপড়াও বেশি জানে না, কথাবার্তায় তার সংকোচের সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে সে আসত আমার কাছে। সংসারে একটি বেকার ভাই, আর রুগ্না বুড়ী মা। শান্তি মুখ ফুটে কিছু চাইত না। আমি সাধ্যমত ওকে যা পারতাম তাই দিতাম। গোঁয়ার, অল্পশিক্ষিত ভাইটির জন্যে চাকরির উমেদারি করত শান্তি। আমি একদিন বললাম, 'চাকরি দেওয়ার মালিক তো আমি নই। তুই তোর জামাইবাবুকে বল।'

শান্তি বলল, 'ওরে বাবা! ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলতেই ভয় করে।'

আমার কিন্তু কোন ভয় ছিল না। শান্তি দেখতে তো ভালো নয়ই, চালাক চতুরও নয়। তাছাড়া ও নিতান্তই আমার আপনজনের মধ্যে। তাই ওর দিক থেকে যে কোন বিপদ আসতে পারে আমি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু সংসারে মাঝে মাঝে কত রকম অভাবিত ঘটনাও ঘটে। আমার ভাগ্যেও তো ঘটতে দেরী হল না। শান্তির ভাই নিমাইকে আমার স্বামী তাঁদের কারখানায় চাকরি দিলেন। তারপর থেকে ওদের বাসায় তাঁর যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। আমার সেই পিসীমা হাতে স্বর্গ পেলেন। ওঁর মত মানুষ তাঁদের মত কুটুম্বের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা করবেন একথা তাঁরা ভাবতে পারেননি।

কিন্তু কিছুদিন বাদে নিমাইর বিরুদ্ধে আমার স্বামী প্রায়ই অভিযোগ করতে লাগলেন। তার চালচলন ভালো নয়, কথাবার্তার ধরণ ভালো নয়। ছেলেটি যেমন উদ্ধত তেমনি দুর্বিনীত। অকৃতজ্ঞও খুব। যিনি চাকরি দিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধেই সে জোট পাকায়। নিচু শ্রেণীর শ্রমিকদের নিয়ে দল বাঁধে, ইউনিয়ন করে।

আমি বললাম, 'অমন ছেলেকে কাজে রাখছ কেন।

ছাড়িয়ে দিলেই হয়। আমার আত্মীয় বলে অযোগ্য লোককে তুমি খাতির করবে তা আমি কিছুতেই চাইনে।'

কিন্তু আমি দেখে অবাক হলাম আমার স্বামী নিমাইকে শাস্তি দিলেন না। কারখানায় রেখে দিলেন। আমার স্বামী তাঁর সামান্য শত্রুকেও ক্ষমা করেন না। কিন্তু নিমাইকে ক্ষমা করতে লাগলেন, প্রশ্রয় দিতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'ওকে কেন অত আস্কারা দিচ্ছ ? ও যখন তোমার বিরুদ্ধে লেগেছে, ছাড়িয়ে দাও ওকে।'

আমার স্বামী বললেন, 'ও যদি আমার সমকক্ষ কেউ হত, দেখতে আমি ওর কি হাল করে ছাড়তাম। কিন্তু মশা মেরে হাত নষ্ট করে লাভ কি।'

শান্তির সঙ্গে ওঁর মেলামেশার কথা আমার কানে যেতে লাগল। শুনলাম, উনি তাকে নিয়ে সিনেমায় যান, রেষ্টুরেন্টে খান, গাড়িতে করে বেড়ান।

শুনে ভালো লাগল না। কিন্তু এ নিয়ে কাউকে কিছু বলতে আমার লজ্জা হল। আত্ম-সম্মানে বাধল। ওই একটা গেঁয়ো ধরণের মেয়ে যার বয়েস এখনো উনিশ পেরোয়নি, যে ভালো করে কথাটা পর্যন্ত বলতে পারে না, আমি তাকেও ঈর্ষা করব ? ছি ছি ছি ! আমার কি কিছুমাত্র মান সম্মান নেই ? যা হবার হোক, যা ঘটবার ঘটুক, মহাপ্রলয় হয়ে যাক সংসারে, আমি কথাটি পর্যন্ত বলব না।

তবু একদিন বললাম। ঠাট্টার সুরেই বললাম বোনকে 'শান্তি, তুই নাকি তোর জামাইবাবুর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে খুব বেড়াচ্ছিস ? আমাকে ফাঁকি দিয়ে খুব নাকি কাটলেট ফাটলেট খাচ্ছিস ? কাজটা কি ভালো হচ্ছে ?'

শান্তি প্রথমে অস্বীকার করল, 'এসব কথা তোমাকে কে বললে রাঙাদি ? যত সব বাজে কথা।'

কিন্তু আমি আরো দু-একটা প্রশ্ন করতেই ও সব স্বীকার করে বলল, 'কী করব রাঙাদি, উনি যে কিছুতে ছাড়েন না।'

আমি আর কিছু বললাম না। সত্যি ওকে দোষ দিয়ে লাভ কি। এ ব্যাপার নিয়ে ওকে শাসন করাও যে আমার পক্ষে লজ্জাকর।

যাঁকে শাসন আমি করতে পারি, যাঁর কাছে আমার লজ্জা সংকোচের বালাই নেই তাঁকে আমি সহজে ছেড়ে দিলাম না। বললাম, 'ছি ছি ছি, ওর মত একটা মেয়ের মধ্যে তুমি কী দেখলে বল তো।'

তিনি বললেন, 'একটি মেয়েকেই দেখেছি।'

বললাম, 'বলতে লজ্জা করল না তোমার ? মেয়ে কি তুমি জীবনে এই প্রথম দেখলে ?'

তিনি বললেন, 'তা কেন। যতবার দেখি তত মনে হয় অদৃষ্টপূর্বা। সেই একই বস্তু, অথচ পুরোপুরি এক নয়। Always the same and still different'

আমি কয়েক দিন ওঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করে রইলাম। তিনি বললেন, 'তুমি কেন অমন করছ। তোমার সঙ্গে আর কারোরই তুলনা হয়না। তোমাকে যা দিয়েছি তা আর কাউকে দিইনি, দিতেও পারব না।'

আমি নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী বলে তাঁকে গাল দিলাম। আমার ইচ্ছা হল সব ভেঙে চুরে ছারখার করে দিই। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে বেঁধে রাখলাম। ছারখার অবশ্য হল। কিন্তু আমার হাতে নয়, নিমাইর হাতে।

মাস তিনেক বাদে সে একদিন ঝড়ের মত আমার ঘরের মধ্যে এসে হাজির হল। আমি সিঁথিতে সিঁদুর পরছিলাম আমার হাত কেঁপে গেল। ওর মূর্তি দেখে বুকের ভিতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। নিমাই চির-কালই গোঁয়ার। খারাপ সংসর্গে থেকে চেহারাটাও গুণ্ডার মত হয়েছে। কিন্তু এমন পাগলের মত বেশ ওর আমি আগে দেখিনি।

নিমাই বলল, 'জানো রাঙাদি কী হয়েছে ?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কী হয়েছে ?'

'শান্তি মারা গেছে।'

বললাম, 'সে কি, কী হয়েছিল তার ?'

নিমাই বলল, 'তুমি কিছুই জানো না ?'

'না। জানলে তোকে কেন জিজ্ঞেস করব ?'

নিমাই বলল, 'তাকে নার্সিংহোমে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে সে আর ফেরেনি। আর এর জন্যে জামাই-বাবুই দায়ী। আমি কিন্তু এর শোধ নেব রাঙাদি ; আমি কিন্তু কিছুতেই ছেড়ে দেব না।'

তীব্র জ্বালায় আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, 'শোধ নিবি বই কি, অবশ্যই শোধ নিবি।'

কিন্তু নিমাই যে এমন করে শোধ নেবে তা কি আমি ভেবেছিলাম ?

কারখানার শ্রমিকদের জীঘাংসায় আমার স্বামী নিহত হয়েছেন এই কথাই কাগজে বেরোল। আমি কোন প্রতিবাদই করলাম না। বরং এ ধরণের প্রচারকে সমর্থন করলাম। কারণ ওর মধ্যেও আংশিক সত্য আছে। শ্রমিকদের সঙ্গে গ্লাস ওয়ার্কের কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ভালো ছিল না। সঙঘর্ষ সংঘাত লেগেই ছিল।

নিমাইকে পুলিসে খুঁজে পায়নি। কেউ বলে সে ফেরার হয়েছে, কেউ বলে সে আর নেই। পুলিস আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে চার্জ দিয়েছিল, কিন্তু প্রমাণের অভাবে তারা সবাই ছাড়া পেয়ে গেল।

মুক্তি পেলাম না শুধু আমি। ভিতরে ভিতরে অনুশোচনায় পুড়ে মরতে লাগলাম। যে অঘটন ঘটল তার জন্যে আমার দায়িত্ব কতখানি আমি ভাবি। আদালতে আত্মসমর্পণের কোন অর্থ হয় না, সাধারণের কাছে আত্মদোষ স্বীকারেরও কোন মানে নেই। কারণ বিষয়টি একান্ত ভাবেই আমার ব্যক্তিগত। মুক্তির পথ আমাকে নিজের চেষ্টাতেই খুঁজে বার করতে হবে।

মৃত্যু-অপমৃত্যু তাঁকে আমার কাছ থেকে অকালে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আবার কিছু ফিরিয়েও দিয়েছে। তাঁর কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা আমি পেয়েছি, সেই সব দিনের স্মৃতি আমার মনে পড়ে। আমি তাঁর দেওয়া সুন্দর সুগন্ধ ফুলগুলি দিয়ে মালা গাঁথি। তিনি অনেক ভালো কাজ করেছেন। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছেন, যাদের অন্নের সংস্থান ছিল না তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর চেষ্টায় শিল্পভবন, মহিলাশ্রম, বিদ্যায়তন গড়ে উঠেছে। তাঁর এইসব সংকাজের প্রমাণ দশজনের কাছে আছে, শত সহস্রজন তাঁর সেই সংকর্মের ফল ভোগ করছে। কালক্রমে তাঁর এইসব কাজই তো থাকবে। ব্যক্তিগত স্খলন পতনের ইতিবৃত্ত ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। মাছির মত যারা শুধু ক্ষত খুঁজে বেড়ায় তারাই শুধু সে কথা মনে রাখে। তাই নিয়ে গল্পগুজব করে আনন্দ পায়। তাতে সংসারের কারো কোন লাভ হয় না।

আমি তাই ভেবেছি তাঁর মধ্যে যে সব দুর্লভ গুণ ছিল সেগুলিকেই তুলে ধরব, যত কালি আর মালিন্য সব দিয়ে তাঁর সত্তার উজ্জ্বল অংশটুকুকেই আমি আরো উজ্জ্বল করে তুলব।'

অনুরাধা থামলেন।

উৎপল মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর পরম উৎসাহে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বাঃ সুন্দর হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। দিন আমাকে দিন। খুব কাজে লাগবে আমার, দিন আমাকে।'

হঠাৎ অনুরাধা যেন চমকে উঠলেন, ভীত শঙ্কিত ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে দেব ? কেন ? আপনি কে ? কেন আপনি আমার গোপন ডায়েরি নিতে চাইছেন ? এত স্পর্দা আপনার কী করে হল ?'

উৎপল অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে থাক। নিয়ে দরকার নেই। যেটুকু পাবার আমি পেয়েছি। আমিও ঠিক এই রকমের অনুমানই করছিলাম। আশ্চর্য, সত্যের সঙ্গে কল্পনার অদ্ভুত মিল হয় দেখতে পাচ্ছি। প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিল।'

অনুরাধা তীব্রস্বরে বললেন, "মিলে যায়! কে আপনাকে মেলাতে বলেছে! কে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের জীবনের সমস্ত গোপন কথা শুনে নিতে বলেছে ?'

উৎপল বলল, 'আশ্চর্য! মিসেস রায়, আপনি নিজেই তো—' অনুরাধা অসহায়ের মত বললেন, 'আমার খেয়াল ছিল না। আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমি নিজেই নিজেকে পড়ে শোনাচ্ছি। এমন মাঝে মাঝে আমি করি। নিজেকে চিরে চিরে আমি দেখি। কখনো নীরবে, কখনো সরবে। সেখানে কেউ থাকে না। কেন আপনি রইলেন ? কেন আপনি উঠে চলে গেলেন না ? যান, এক্ষুণি চলে যান। বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

উৎপল উঠে দাঁড়াল, দোরের দিকে পা বাড়াবার আগে শান্ত অনুত্তেজিত স্বরে বলল, মিসেস রায়, আজ আপনার মন ঠিক নেই। তাই সমস্ত শিষ্টতা ভদ্রতার সীমা আপনি আজ ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ? আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি, আপনিই ডেকে এনেছেন। আমি লুকিয়ে আড়াল থেকে আপনার গোপন কথা শুনিনি। আপনি নিজে সামনে বসে আমাকে সব পড়ে শুনিয়েছেন। হয়তো আপনাকে

কোন নেশায় পেয়ে বসেছিল, নিজেকে মেলে ধরবার নেশা, নিজেকে প্রকাশ করবার নেশা। এই পথেই আপনি নিজের মুক্তি খুঁজেছিলেন। ছোট বড় আমরা অনেকেই তাই করি। নিজের কথা পরকে শুনিয়ে নিজের হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। ভেবে দেখবেন, এতে আমার সতিাই কোন দোষ আছে কিনা। আমি যাচ্ছি।'

অনুরাধা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, 'ক্ষীণ দুর্বল স্বরে বললেন, 'না। যাবেন না শুনুন। বসুন আর একটু বসুন।'

উৎপল পরম অনিচ্ছায় ফের তার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসল।

অনুরাধা উঠে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলেন। তারপর হঠাৎ উৎপলের হাতখানা ধরে বললেন, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন উৎপলবাবু?'

'বলুন।'

'আপনি লিখবেন না।'

'লিখব না?'

অনুরাধা বললেন, 'না। সতীশঙ্কর রায়ের জীবনী লেখার দায়িত্ব থেকে আপনাকে মুক্তি দিলাম। আমাদের যে চুক্তি ছিল তা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

উৎপল একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আপনি যে টাকা আমাকে দিয়েছিলেন।

অনুরাধা বললেন,'ওসব ছেড়ে দিন। ও টাকা আপনাকে আর দিতে হবেনা। চুক্তি তো আমিই ভাঙলাম!'

উৎপল চুপ করে রইল।

অনুরাধা বললেন, 'আপনার সংকোচ যাচ্ছেনা না? বেশ ওই সামান্য টাকা কটা একজন বন্ধুর উপহার বলে আপনি নেবেন। তাহলে তো আর কোন আপত্তি নেই।'

উৎপল আর কোন কথা বললনা।

অনুরাধা বললেন, 'আপনি যা কিছু আমাকে দয়া করে দেখতে দেবেন?'

উৎপল ফাইল থেকে তার কাগজগুলি নিয়ে এল, লেখা কিছুই নেই। সবগুলি পাতাই শাদা শুধু একটি দুটি পাতায় কাটাকুটি আকা বাঁকা রেখা শিল্পের নমুনা আছে।'

অনুরাধা একটু হেসে বললেন, 'কয়েক পাতা তো লিখেছিলেন, সে সব কী হল?'

উৎপল বলল, 'ছিঁড়ে ফেলেছি।'

অনুরাধা বললেন, 'সেই ভালো। আমিও আপনার পথ নিচ্ছি।'

ডায়েরির পাতাগুলি অনুরাধা একটির পর একটি করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগলেন।

বাইরে কড়া নাড়ার সঙ্গে বিশ্বরূপের গলা শোনা গেল। দোর খোল মা। আমরা এসেছি।'

শেষ

ডলির ব্যথা

শ্রীহরিপদ গুহ

ডলি রাণী কেঁদে সারা
খেতে কিছু চায় না,
'নেফা'তে সে যাবে চলে
শুধু তার বায়না।
মা এসে বলে তারে—
মেয়ে সেথা যায়না,
সেখানে হামলা করে
দস্যু সে চায়না।
তারা যে নিঠুর বড়
গুলি করে মারবে,

কিছু নেই ভারতের
কী করে বা পারবে?
ডলি বলে—সব আছে,
জান না মা কিচ্ছু,
দেখো না গো জোয়ানরা
কত বড় বিচ্ছু।
আমি গিয়ে সেবা করে
ভাল করে তুল্‌ব,
শয়তানের হানা মা গো
সহজে কি ভুল্‌ব?

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ঃ

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩১৬ (লরী ৫২ এবং ম্যাকে ৪৯। টিটমাস ৪৩ রানে ৪ এবং ট্রুম্যান ৮৩ রানে ৩ উইকেট) ও ২৪৮ (বুথ ১০৩ এবং লরী ৫৭। ট্রুম্যান ৬২ রানে ৫ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ৩৩১ (কাউড্রে ১১৩ এবং ডেক্সটার ৯৩। ডেভিডসন ৭৫ রানে ৬ উইকেট) ও ২৩৭ (৩ উইকেটে। ডেভিড শেফার্ড ১১৩, কাউড্রে ৫৮ এবং ডেক্সটার ৫২)

মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড ৭ উইকেটে জয়লাভ ক'রে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলা ড্র যায়।

টসে জয়লাভ করে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ৭টা উইকেট পড়ে ২৬৩ রান দাঁড়ায়। ফাস্ট বোলাররা খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩১৬ রানে শেষ হয়। পেস এবং স্পিন বোলাররা এই খেলায় সাফল্য লাভ করেন। খেলার বাকি সময়ে ইংলণ্ড ৩টে উইকেট হারিয়ে ২১০ রান তুলে দেয়। ইংলণ্ডের খেলার সূচনা কিন্তু ভাল হয়নি। তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক ডেক্সটার এবং সহ-অধিনায়ক কাউড্রে দলের পতন রোধ ক'রে দলকে বিপদমুক্ত করেন। তাঁদের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১৭৫ রান ওঠে। এই দিনে অষ্ট্রেলিয়া ৯৭ মিনিট ব্যাট ক'রে তাদের বাকি তিনটে উইকেটে পূর্ব্ব দিনের ২৬৩ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৫৩ রান যোগ করে।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানে শেষ হলে ইংল্যাণ্ড মাত্র ১৫ রানে অগ্রগামী হয়। কিন্তু তারা এই দিনে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট পায় মাত্র ১০৫ রানে। এই সাফল্যই তাদের বড় লাভ।

চতুর্থ দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া নিজ দলের শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। অষ্ট্রেলিয়া বাকি ৬টা উইকেট খুইয়ে তৃতীয় দিনের ১০৫ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ১৪৩ রান যোগ করে। ২৪৮ রানে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'লে ইংলণ্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ২৩৪ রানের প্রয়োজন হয়। এই দিনে ইংলণ্ড ১টা উইকেট হারিয়ে ৯ রান করে। খেলায় জয়লাভের জন্যে তখন প্রয়োজন হয় ২২৫ রানের।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে খেলতে হয়নি। ৭৬ মিনিট আগেই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩টে উইকেট খুইয়ে ২৩৭ রান তুলে ৭ উইকেটে জয় লাভ করে। দলের ২৩৪ রানের মাথায় জয়সূচক এক রান করার ভার পড়ে ডেভিড শেফার্ডের উপর। তাঁর নিজস্ব রান তখন ১১৩। শেফার্ড বল মেরে এক রাণের জন্যে দৌড়ও দিয়েছিলেন কিন্তু এক রান যোগ করতে তো পারেননি উপরন্তু রান আউট হয়ে যান।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় সেঞ্চুরী রান করার গৌরব লাভ করেন ইংলণ্ডের কলিন কাউড্রে এবং ডেভিড শেফার্ড। উভয়েরই রান ১১৩। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী করেন ব্রায়ান বুথ (১০৩ রান)। প্রথম টেস্ট খেলায় ফাষ্ট বোলারদেরই সাফল্য—ইংলণ্ডের ট্রুম্যান ১৪৫ রানে ৮টা এবং অষ্ট্রেলিয়ার এ্যালেন ডেভিডসন প্রথম ইনিংসে ৭৫ রানে ৬টা উইকেট পান। ডেভিডসন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৫৩ রান দিয়ে কোন উইকেট পান নি। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ইংলণ্ডের শেফার্ড এবং ডেক্সটার রান আউট হন। অপর দিকে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসেও একজন রান আউট—নীল হার্ভে।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৪০৪ (বুথ ১১২, ম্যাকে নটআউট ৮৬, বেনো ৫১ এবং সিম্পসন ৫০। ট্রুম্যান ৭৬ রানে ৩ এবং নাইট ৬৫ রানে ৩ উইকেট) ও ৩৬২ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরী ৯৮, সিম্পসন ৭১, হার্ভে ৫৭ এবং ও'নীল ৫৬। ডেক্সটার ৭৮ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ৩৮৯ (পারফিট ৮০, ব্যারিংটন ৭৮, এবং ডেক্সটার ৭০। বেনো ১১৫ রানে ৬ এবং ম্যাকেঞ্জি ৭১ রানে ৩ উইকেট) ও ২৭৮ (৬ উইকেটে। ডেক্সটার ৯৯, পুলার ৫৬ এবং শেফার্ড ৫৩। ডেভিডসন ৪৩ রানে ৩ এবং ম্যাকেঞ্জি ৬১ রানে ২ উইকেট)

ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই টেষ্ট খেলাটি ছিল উভয় দেশের ৪৬তম টেষ্ট সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলা।

অষ্ট্রেলিয়া টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৭টা উইকেট পড়ে ৩২১ রান ওঠে। খেলার গোড়াপত্তন ভাল হয়নি। দলের ১৯৪ রানের মাথায় ৬টা উইকেট পড়ে যায়। ৭ম উইকেটের জুটিতে বুথ এবং ম্যাকে ১১৯ মিনিট খেলে দলের ১০৩ রান যোগ করেন। বুথ সেঞ্চুরী (১১২) করেন।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪০৪ রানে শেষ হয়। ম্যাকে ৮৬ রান ক'রে নটআউট থাকেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে ম্যাকে এবং বেনো দলের ৯১ রান যোগ করেন। শেষের চারটে উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া ২১০ রান তুলে দেয়। এই দিনে ইংলণ্ড ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৬৯ রান করে। বেনো একাই ৪৫ রানে এই দিন ৩টে উইকেট পান।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৮৯ রানে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যায় ইংলণ্ডের থেকে মাত্র ১৫ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং বাকি সময়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ১৬ রান করে।

চতুর্থ দিনের খেলাতে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৬২, ৪টে উইকেট পড়ে। ফলে অষ্ট্রেলিয়া ৩৭৭ রানে অগ্রগামী হয়। লরীর দুর্ভাগ্য, মাত্র দু'রান বাকী থাকতে তিনি সেঞ্চুরী রান করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হ'ন। প্রথম উইকেটের জুটিতে লরী এবং সিম্পসন ১৮১ মিনিট খেলে দলের ১৩৬ রান তুলেন—এই রানই দলের ভিত শক্ত করে।

পঞ্চম দিনে অষ্ট্রেলিয়া আর ব্যাট হাতে মাঠে নামেনি। চতুর্থ দিনের ৩৬২ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পঞ্চম দিনে ইংলণ্ড ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৭৮ রাণ করে। ইংলণ্ড খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার রাণ সংখ্যা অতিক্রম করতে না পারায় এবং অপর দিকে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে সকলকে আউট করতে না পারায় এই প্রথম টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না—খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেল।

সন্তোষ ট্রফি ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে (১৯৬২) বাংলা ২—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত ক'রে একাদশবার সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ফাইনাল খেলার উভয় অর্দ্ধে গোল দেন দীপু দাস এবং সন্তোষ চ্যাটার্জি। এই ফাইনাল খেলাটি গত ৯ই জানুয়ারী হওয়ার কথা ছিল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের অজুহাত দিয়ে ঐ দিন খেলা আরম্ভের কিছু আগে খেলাটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সামান্য বৃষ্টির কারণে পূর্ব্ব-ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল খেলা যে এভাবে বন্ধ হ'তে পারে তা লোকের অনুমানের বাইরে ছিল। এই খানেই শেষ নয়, এর পর ঘোষণা করা হয় ১২ই জানুয়ারী খেলা হবে। কিন্তু ঐ দিনেও খেলা হ'ল না। কারণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সম্ভাবনা ছিল। এ সম্ভাবনার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া গিয়েছিল নাকি আবহাওয়া আফিস থেকে। কিন্তু ঐ দিনে বৃষ্টির নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেষে ফাইনাল খেলার দিন স্থির হয় ১৪ই জানুয়ারী। পঞ্জিকাতে এই দিন সম্বন্ধে কি আছে খোঁজ করিনি। খেলার মাঠে মহীশূর দলের যাত্রা করার

পক্ষে দিনটি মোটেই শুভ হয়নি। অবিশ্যি আর্থিক দিক থেকে দিনটি যে শুভ ছিল তার প্রমাণ, খেলার মাঠের জন সমাগম; মাঠে ৩০,০০০ হাজার দর্শকের ভীড় হয়েছিল। ইতিপূর্বে ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সালের ফাইনালে বাঙ্গালোরের মাটিতেই বাংলা মহীশূর দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল। সুতরাং বাংলার পক্ষে এই জয়লাভ পূর্ব্ব-পরাজয়ের অর্দ্ধেক শোধ নেওয়া হ'ল বলা চলে। এবার নিয়ে বাংলা এবং মহীশূর উভয়ের মধ্যে পাঁচ বার ফাইনালে খেললো, ফলাফল—বাংলার জয় ৩ বার এবং মহীশূরের ২ বার। সন্তোষ ট্রফি প্রতিযোগিতা ১৯৪১ সালে আরম্ভ হলেও তিন বছর (১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৮) খেলা হয়নি—এ পর্য্যন্ত মোট ১৯ বার খেলা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের প্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সর্ব্বাধিক ১১ বার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। তাছাড়া প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত বাংলা একাদিক্রমে ১০ বার সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলে ৭ বার জয়লাভ করে—উপর্য্যুপরি জয়লাভ চার বার (১৯৪৭, ১৯৪৯-৫১)। প্রতিযোগিতার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (১৯৫৪-১৯৬২) বাংলার প্রাধান্য হ্রাস পায়। এই সময়ে ৯ বারের মধ্যে বাংলা ৫ বার ফাইনালে খেলে ৪ বার সন্তোষ ট্রফি জয় করে। এ পর্য্যন্ত সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে এই সাতটি প্রদেশ—বাংলা (১১ বার), মহীশূর (২ বার), হায়দরাবাদ (২ বার), বোম্বাই (১ বার), দিল্লী (১ বার) সার্ভিসেস (১ বার) এবং রেলওয়ে (১ বার)। সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলেছে বাংলা ১৫ বার, বোম্বাই ৭ বার, মহীশূর ৫ বার, হায়দরাবাদ ৪ বার, সার্ভিসেস ৩ বার, দিল্লী ২ বার, রেলওয়ে এবং মহারাষ্ট্র ১ বার ক'রে।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান নির্ণয় করা হয় সেমি-ফাইনালে বিজিত দুই দলের খেলার ফলাফল থেকে। এই খেলায় বিজয়ী দলের পুরস্কার সাম্পাঙ্গি কাপ। ১৯৬২ সালে রেলওয়ে এবং মহারাষ্ট্র যুগ্মভাবে এই কাপ পেয়েছে। এই রেলওয়ে এবং মহারাষ্ট্র দলই ১৯৬১ সালের সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলেছিল।

	বিজয়ী	বিজিত	গোল
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫—১
১৯৪৪	দিল্লী	বাংলা	২—০
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই	২—০
১৯৪৬	মহীশূর	বাংলা	১—১, ২—১
১৯৪৭	বাংলা	বোম্বাই	০—০, ১—০
১৯৪৯	বাংলা	হায়দরাবাদ	৫—০
১৯৫০	বাংলা	হায়দরাবাদ	১—০
১৯৫১	বাংলা	বোম্বাই	১—০
১৯৫২	মহীশূর	বাংলা	১—০
১৯৫৩	বাংলা	মহীশূর	০—০, ৩—১
১৯৫৪	বোম্বাই	সার্ভিসেস	২—১
১৯৫৫	বাংলা	মহীশূর	০—০, ১—০
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	১—১, ৪—১
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৩—০
১৯৫৮	বাংলা	সার্ভিসেস	১—০
১৯৫৯	বাংলা	বোম্বাই	৩—১
১৯৬০	সার্ভিসেস	বাংলা	০—০, ১—০
১৯৬১	রেলওয়ে	মহারাষ্ট্র	৩—০
১৯৬২	বাংলা	মহীশূর	২—০

ডেভিস কাপঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় মেক্সিকোকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি চারবার এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাসে মোট ১৮বার ডেভিস কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। মেক্সিকোর পক্ষে এই প্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে ১৯০০ সালে। দুটি মহাযুদ্ধের জন্যে ১০ বছর (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫) খেলা হয়নি। তাছাড়া ১৯০১ এবং ১৯১০ সালেও ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশকে (আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেশিয়া) চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। অর্থাৎ এই দু'বছরেও খেলা হয়নি।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালের প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬-৬২) অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা একটানা ১৪ বার (১৯৪৬-৫৯) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকা ৬বার এবং অষ্ট্রেলিয়া ৮বার ডেভিস কাপ জয় করে। পরবর্ত্তী তিন বছরে (১৯৬০-৬২) অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধোত্তর কালে অষ্ট্রেলিয়া একটানা ১৭বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে (১৯৪৬-৬২) ১১বার ডেভিস কাপ পেয়েছে; বাকি ৬ বার পেয়েছে আমেরিকা। গত তিন বছর (১৯৬০-৬২) অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে ইতালী (১৯৬০-৬১) এবং মেক্সিকো (১৯৬২)।

আন্তঃপ্রদেশ ব্যাডমিণ্টনঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ১৮শ আন্তঃপ্রদেশ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফলঃ

পুরুষদের দলগত বিভাগঃ মহারাষ্ট্র ৪-১ খেলায় ইউ পি'কে পরাজিত করে।

মহিলাদের দলগত বিভাগঃ রেলওয়ে ২-১ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জুনিয়ার বিভাগঃ মহারাষ্ট্র ২-১ খেলায় ইউপি'কে পরাজিত করে।

সাহিত্য সংবাদ

দোটানা (উপন্যাস, প্রকাশক—বাক্‌সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯) মূল্য—৩৲

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের উপন্যাস "দোটানা" একনিশ্বাসে প'ড়ে শেষ করবার মতনই বই। শ্রীহুমায়ুন কবীর ঠিকই লিখেছেন : "সকলের মধ্যেই দোটানা, যদিও তার উপলক্ষ্য এবং প্রকাশ বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিচিত্র এবং বিভিন্ন। দোটানা প'ড়ে খুবই ভালো লাগল। স্বল্পকায়া বইখানিতে চরিত্রগুলি সুন্দর ফুটে উঠেছে।"

"দোটানা" নামকরণটিও সুষ্ঠু হয়েছে। কারণ এর নায়ক প্রদীপ ফুলে-ফুলে মধুলোভী—কিনা philanderer—নয়, তার আসক্তি ও সমস্যা অন্য জাতের। সে নারীকে ভোগের উৎসরূপে দেখে না, দেখে প্রেরণার উৎসরূপে। তাই ডায়ানা তাকে একভাবে টেনেছে, শ্রীলা আর এক ভাবে।

দোটানার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত প্রদীপের অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় চমৎকার ফুটেছে। আরও নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে নারী-চরিত্র দুটির বিশ্লেষণে। ডায়ানা ও শ্রীলার অন্তর্গূঢ় মনোলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যথা-বেদনাকে ঔপন্যাসিক তাঁর সংবেদনশীল অন্তর দিয়ে প্রস্ফুট ক'রে ধরেছেন ছত্রে ছত্রে। গোড়ার দিকে শ্রীলার প্রতি মনে ক্ষোভ জ'মে ওঠে বটে—তার আপাত-অকৃতজ্ঞতার জন্যে, কিন্তু দিলীপকুমারের দরদী লেখার গুণে সে-ক্ষোভ স্থায়ী হয় না শেষ পর্যন্ত—কেমন যেন কর্পূরের মতনই উবে যায়। তাছাড়া শ্রীলার প্রেমজীবনের রূপায়ণে গ্রন্থকার এম্‌নিই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন যে, সময়ে সময়ে সত্যিই মনে খট্‌কা জাগে—কে বেশি কৃপাপাত্রী, ডায়ানা না শ্রীলা? ডায়ানা, এককথায়, চমৎকার—মাতৃত্বের মমতায় গড়া স্নেহে প্রেমে সেবায় সমান অকৃপণা এই সুস্থিরমতি চারুভাষিণী নিষ্ঠাবতী কুমারীকে কারুরই ভালো না বেসে উপায় নেই। সে রূপে কিছু খাটো হ'লেও তার সব অভাব পূরণ হয়েছে তার হৃদয়ের ঔদার্য-গুণে, তথা নিষ্কলঙ্ক অন্তরের মমতাময়ী চরিত্র শক্তির প্রসাদে। প্রখর বুদ্ধি বা বিদুষিতার চেয়ে ধীর বুদ্ধি ও স্নেহ সেবার আধাররূপেই যেন নারীকে দেখতে বেশি ভালো লাগে। ডায়ানার আকর্ষণ তাই তো এত দুর্নিবার।

ডায়ানা ও শ্রীলার চরিত্র পর্যালোচনা করলে মনে হয়—এদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নারী-প্রকৃতি বিষয়ক প্রসিদ্ধ উক্তিটি সর্বাংশেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "দুই বোন" উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন—নারীর দুই রূপ : জায়া ও প্রিয়া। কারো মধ্যে জায়া রূপ প্রবল, কারো মধ্যে প্রিয়া। ডায়ানা স্বভাবে—জায়া, শ্রীলা—প্রিয়া। একটির মধ্যে দিয়ে তার জায়া ও জননী প্রকৃতিটি নিজেকে জানান দিচ্ছে। অন্যটি একটি বহ্নিময়ী বিদ্যুল্লতা—প্রখর প্রবল অপ্রতিরোধ, যাকে স্পর্শ করলে দেহে রোমাঞ্চশিরা জাগে, কিন্তু হৃদয় শীতল হয়না। মোহিতলালের উপমায় বলা যায়—ডায়ানার মধ্যে ম্যাডোনার মমতা, শ্রীলার মধ্যে রাধাভাব।

প্রদীপ এই দুই বিপরীত নারীপ্রকৃতির বিরুদ্ধতার দ্বারা আকর্ষিত বিকর্ষিত হয় নানা সময়ে নানা মুড-এ। ডায়ানার প্রতি তার আকর্ষণ শ্রীলার প্রতি আকর্ষণের ম'তই নিবিড়, কিন্তু সে—আকর্ষণের প্রকৃতি ভিন্ন—তাতে উদ্দামতা নেই, মাদকতা নেই, আছে—স্নেহবুভুক্ষা, নারী হস্তের সেবা ও নারীহৃদয়ের মমতার জন্য উদগ্র ব্যাকুলতা। আর শ্রীলার প্রতি প্রদীপের দুর্নিবার আকর্ষণের মধ্যে আছে পতঙ্গের রঙ্গ—দুর্দমনীয় জৈব আবেগ তাকে প্রবলভাবে টানে শ্রীলার অগ্নিময়ী রূপশিখার দিকে; শ্রীলা বন্ধুর বাগ্‌দত্তা জেনেও সে পারে না এই মোহকে

কাটিয়ে উঠতে। প্রেয়সীকে মানুষ এইরকম আবেগের দৃষ্টিতেই দেখে। প্রদীপের হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব—আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েন দিলীপকুমার তাঁর অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের তুলি দিয়ে এঁকেছেন চমৎকার করে।

ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের কবিতার চরণগুলির অনুবাদ কী সুন্দর! ছন্দোময় শব্দ ও মিলের কী সাবলীল প্রকাশ তথা অজস্রতা। দিলীপকুমারের হৃদয়ে ভক্তির মাধ্যমে ঐশী করুণা নেমেছে ব'লেই হয়ত তাঁর প্রকাশের পথের সব বাধাবন্ধ ভেসে গেছে, ভাষায় এসেছে বেগ, শব্দে প্রাচুর্য, মিলে ঐশ্বর্য। তাঁর বর্ণনার প্রসাদে পাঠক-পাঠিকা ইংলণ্ডে না গিয়েও ওয়র্ডসওয়র্থ কোলরিজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিকুল-অধ্যুষিত বিশ্বকবিতীর্থ লেক-ডিসট্রিক্ট তথা গ্রাসমিয়রে মানস-ভ্রমণ এমন ক'রে আসতে পারে। এ কি কম লাভ? দিলীপকুমারের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাঁর নানা বই থেকে অনেক কিছুই শিখবার জানবার ভাববার আছে। তিনি আজ আমাদের অনেকেরই পরোক্ষ শিক্ষাদাতাদের মধ্যে একজন প্রকৃষ্ট মনীষী একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

এ উপন্যাসে আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। গ্রন্থকারের সাম্প্রতিক জীবন যাত্রায় ভাগবত ভাবধারা ও অনুভূতি প্রবল হ'লেও "দোটানায়" তাঁর শিল্পমনস্কতাই বড় হয়ে উঠেছে। তার অর্থ—তিনি চান বা না চান শিল্পানুভূতি তথা নিপুণ প্রকাশের অভীপ্সা তাঁর মধ্যে অক্ষুণ্ণই আছে, নৈলে মানুষের আবেগের লীলার এমন মনোমুগ্ধকর চিত্রণ কী করে সম্ভব হ'ল তাঁর আজকের কলমে? এ থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে একবার যাঁর শিল্পের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে যায় শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী ঠাকরুণটি তাঁকে বড় সহজে ছাড়েন না: সতীনের ঘর করবেন তবু আপনার অধিকারভুক্ত মানুষটির 'পরে তাঁর দাবি ছাড়বেন না।

দিলীপকুমার সম্প্রতি একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছেন যে তিনি "অভাবনীয়" নাম দিয়ে একটি উপন্যাস ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপাতে দিয়েছেন—ভাগবত উপলব্ধিই হবে তার উপজীব্য। কিন্তু তাঁর রচনার ধারার সঙ্গে আমার যতটা পরিচয় আছে তার জোরে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, "অভাবনীয়"-তে শৈল্পিক অনুভূতি উপলব্ধির কথাও নিতান্ত কম থাকবে না। শিল্পলোকের রাজধানীতে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেছেন—এতকাল পরে চেষ্টা করলেও তার প্রভাব কাটাতে পারবেন না। তাছাড়া শিল্পের সঙ্গে অন্য কোনো উচ্চাঙ্গের অনুভূতির বিরোধও থাকতে পারে না—শিল্প চেতনার সঙ্গে যে ধর্মানুরাগ সানন্দেই ঘর করতে পারে তার প্রমাণ টলস্টয় বা রবীন্দ্রনাথের জীবন। শ্রীঅরবিন্দের ধর্মসত্তায়ও কি শিল্পসত্তা এসে মেশেনি? এসব দৃষ্টান্ত যখন রয়েছে তখন সাহিত্যেই বা সমন্বয়ের একটা দৃষ্টান্ত হবে না কেন? তাঁর দোটানা উপন্যাসে যে পার্থিব রসমাধুর্য ফুটে উঠেছে—সে তো শিল্পেরই রস। তাকে ছেঁটে বাদ দিয়ে যাব কেন। ধর্মীয় জীবন শুষ্ক নীরস তো নয়।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "বিবস্ত্র মানব" (৪র্থ সং)—৫·৫০

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "মণিবেগম" (৩য় সং)—৬·২৫

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ "পারাশরীয় সুশ্লোক-শতকম্" (২য় সং)—৪৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "প্রফুল্ল" (নব সং)—২·৫০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বোলো তারে বোলো"—৩৲

শ্রীনলিনকৃষ্ণ দাস প্রণীত নাটিকা "মুকুটা প্রতিভা"—১৲

শওকত আলি খান প্রণীত "সেনী রাগ মালা" (১ম খণ্ড)—৪৲

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "আনন্দমঠ"—২·৫০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত কিশোর সংকলন "অলকনন্দা"—৫৲

শ্রীমুরারিমোহন বীট প্রণীত রহস্য-উপন্যাস "গিরিগুহার রহস্য"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পল্লীর প্রান্তে — শিল্পী : পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাল্গুন—১৩৬৯

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

জাতি, দেবতা ও ধর্ম্ম

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

বহু প্রাচীন জাতির মধ্যেই বিশ্বাস ছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীই যাবতীয় চরাচর জগতের পিতামাতা। প্রাচীন মিশরে পৃথিবী পুরুষরূপে এবং আকাশ স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছিল—কিন্তু প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে তাহার বিপরীত। বরুণরূপী আকাশই প্রাচীনতম আর্য্যদেবতা এবং ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে (৩য়, ৪র্থ মণ্ডল) বরুণেরই স্তুতি সর্ব্বাধিক। আবার এই বরুণই সম্ভবতঃ 'অহুর মজ্‌দা' (মহান্ অসুর) নামে ইরাণে পূজিত হইয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে 'অসুর' ও 'দেব' একার্থক ছিল। 'অসুর' শব্দের অর্থ 'সুরবিরোধী' না বুঝিয়া 'প্রাণদাতা' (অসুন্ রাতি যঃ সঃ) বুঝিতে হইবে। উত্তরকালে আর্য্য জাতি দুইটী পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে—এক অসুরদের উপাসক (পারসী) ও অপর দেবগণের উপাসক (হিন্দু)। পারসীরা মিথ্র (মিত্র = সূর্য্য) কে এক অহুর (অসুর) বলিয়াই মানিত। পিতৃগণের (patriarchs) প্রধান আর্য্যমাই (গীতা ১০।২৯) বোধ হয় নিজদলকে ভারতে লইয়া আসেন। শিল্পী তুষ্টা এবং যমজ চিকিৎসক অশ্বিনৌও বোধ হয় তাঁহার সঙ্গেই ভারতে আসেন। ইহারা কৃষক ছিলেন, সুতরাং বৃষ্টি দেবতা ইন্দ্রেরই প্রধানতা দিতেন। মধ্য-এশিয়ার উষর

অঞ্চলে যাযাবর রূপে মেষপালকের জীবন যাপন করা যাহাদের কাজ ছিল, তাহাদের পক্ষে আকাশ-দেবতা বরুণের প্রাধান্য মানা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা কৃসিজীবনের স্বাদ পাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বৃষ্টির উপর অধিক নির্ভর করিতেন তাঁহারা ইন্দ্রকেই প্রধান মানিতে এবং তাঁহারই তৃপ্তিবিধানে তৎপর রহিলেন। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদল পূর্ব্বজদের প্রধান দেবতাকে ছাড়িলেন না এবং ইন্দ্রকে দেবরাজের বিদ্রোহী সন্তান, চোর, লম্পট, প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেন। পারসীদের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ-অবেস্তায় ইন্দ্রের এইরূপ অনেক নিন্দা আছে এবং ফারসীতে 'দেব' (দেও) শব্দই সাধারণত দানব, পিশাচ বা শয়তান অর্থে ব্যবহৃত হয়। বহুমতের সম্মুখে বোধ হয় ইন্দ্রপূজক পিতৃগণের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অতএব তাঁহারা ভারতে পলাইয়া আসেন।

প্রধান দেবতারূপে বরুণ কবে কিরূপে তাহার প্রতিপত্তি হারাইলেন তাহার কোন উল্লেখ বৈদিক বা পুরাণ সাহিত্যে নাই। কিন্তু এ বিষয়ে গ্রীক ও লাটিন পুরাণে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বরুণেরই লাটিন নাম Uranus, তাঁহার পুত্র Saturn স্বীয় মাতা Ge (পৃথিবী)-এর প্ররোচনায় পিতার অঙ্গহানি করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এই Saturn ও ইন্দ্র বোধহয় অভিন্ন। অমরকোস মতে 'সুত্রামন্' শব্দ ইন্দ্রের পর্য্যায়বাচী। আবার Mittani রাজাদের তালিকায় সুতর্ণ একটী নাম পাওয়া যায়। সুতরাং সুত্রামন্ ও সুতর্ণ হইতেই Saturn শব্দের পরিণতি হইয়া থাকিবে। এই দেবোপাসকদেরই এক শাখা (Mittoni) এশিয়া-মাইনরে বসতি স্থাপন করে এবং তথা হইতে গিয়া ট্রয় নগরের স্থাপনা করে। ভার্জিলের মতে ট্রয়ের পতনের পর—তথা হইতে এক রাজকুমার Æneus স্বীয় অনুচরবর্গ সহ ইটালীতে গিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং কালক্রমে তাঁহাদের সন্তানেরা রোমান জাতি রূপে পরিচিত হয়। তাঁহাদের লেখায় এইরূপ বিক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় যে পূর্ব্বে Uranusই প্রধান দেব (divus) ছিলেন, কিন্তু পরে Saturn দ্বারা তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। Jupitarকে প্রধান দেবতারূপে স্বীকার করিবার পূর্ব্বে রোমে বহুদিন Saturnই প্রধান দেবতা ছিলেন এবং সেখানে তাঁহার উদ্দেশ্যে স্থাপিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

রোমান জাতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই মধ্য-এশিয়া বা এশিয়া-মাইনর হইতে গিয়া আর্য্য জাতির এক শাখা গ্রীসে বসতি স্থাপন করে। বোধ হয় বরুণের (Coelus) পদচ্যুতির পরে তাহারা তখনও কোন প্রধান দেবতা নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারে নাই। পারসীদের মত তাহারাও ইন্দ্রকে (Cronos Saturn) দেবতা বলিয়া অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিন্দাসূচক Titan বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ দেবতাপদবাচ্য হন—যাহাদিগকে শক্র জানিয়া পিতা Saturn নিজেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন। এক পুত্র Zeusকে তাঁহার মাতা Rhea স্বামীর ক্রুদ্ধদৃষ্টি হইতে রক্ষা করেন এবং তিনিই পরে পিতাকে অপসারিত করিয়া দেবরাজরূপে অভিষিক্ত হন। কিংবদন্তী অনুসারে Zeus ক্রীট দ্বীপে ভূমিষ্ঠ ও লালিতপালিত হন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে—ক্রীট দ্বীপে যে মিশরীয়দের সমগোত্রীয় Ægean জাতি বাস করিত তাহাদের কাছেই গ্রীকরা এই দেবতা পাইয়াছে—যদিও Zeus নাম সংস্কৃত দ্যুস্ (স্বর্গ) শব্দের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। উত্তরকালে রোমানেরা সভ্যতার যাবতীয় উপকরণ উন্নত গ্রীকদের নিকট হইতেই ধার করে এবং Saturnকে ত্যাগ করিয়া Zeus (Jupitar) কে ও প্রধান দেবতারূপে গ্রহণ করে। Saturnকে তাহারা বোধ হয় ট্রয়নগর হইতেই আনিয়াছিল। কিন্তু পরে গ্রীকদের অনুকরণে Jupitarকে গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা অসম্ভব নয় যে, এক সময় গ্রীক-রোমানদের দেবতা ভারত-ইরাণের মতই ভিন্ন ছিলেন। পূর্বে রোমানেরা অবশ্যই দেবপূজক ছিলেন, কিন্তু গ্রীকেরা কখনও Saturn (Cronus)কে পূজে নাই, বরং তাঁহাকে Titan বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে। যেরূপ আমাদের দেবাসুর একই পিতার সন্তান হইলেও বিরোধী গুণসম্পন্ন বলিয়া কল্পিত হয় সেইরূপ উহাদের Theos ও Titan একই পিতা Uranus এর সন্তান হইলেও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া কল্পিত হয়। যেরূপ পারস্যের দেবতারা হিন্দুদের দ্বারা নিন্দার্থক 'অসুর' বলিয়া অভিহিত হন, বোধহয় সেইরূপ এশিয়া মাইনরের

দেবতারা গ্রীকদের দ্বারা নিন্দার্থক Titan নামে অভিহিত হয়।

আমার এইরূপ মনে করিবার এক কারণ এই যে, ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতেও রোমানদের লাটিন ভাষা গ্রীক অপেক্ষা সংস্কৃতের নিকটতর। সংস্কৃত দেবঃ, মানবঃ, মনঃ যথাক্রমে লাটিনে divus, manus ও mentis হইয়াছে, কিন্তু উহাদের গ্রীক প্রতিশব্দ যথাক্রমে theos, anthropos ও psyche. *

কিন্তু গ্রীক যে কতকটা ফারসীর সমান, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

সংস্কৃত	ফারসী	গ্রীক	লাটিন
ষষ্	ষষ্	Hexa	Sex
সপ্তন্	হফ্ত	Hepta	Septem
অষ্টন্	হস্ত্	Octo	Octo
শতম্	সদ্	Hecto	Centum
সম	...	Hemi	Semi
সূর্য্যঃ	...	Helios	Sol
অপ	...	Hypo	Sub
উপরি	...	Hyper	Super

বহু প্রাচীন জাতির মধ্যে পৌরাণিক জনপ্রবাদ আছে যে, এক মহাপ্রলয় বা বৃহৎ জলপ্লাবন হইয়া সমগ্র পৃথিবী বা পৃথিবীর এক বৃহৎ ভাগ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। পাদরীদের মতে এই প্রলয় ২৩৪৮ খৃঃ পূঃতে হইয়াছিল। কিন্তু এই তারিখ কখনও সত্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান গবেষণায় জানা গিয়াছে, প্রায় এই সময়েই বেবিলনে হামুরাবী রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার ইতিহাসে এইরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের কোন কথা পাওয়া যায় না। স্যর লিওনর্ড উলীর মতে এই কাহিনী এক সুমেরিয়ন জনশ্রুতির উপর আধারিত ছিল এবং এইরূপ এক জলপ্লাবন যথার্থতঃই হিমযুগের অবসানে প্রায় ৩২০০ খৃঃ পূর্ব্বে মেসোপটামিয়া অঞ্চলে ঘটিয়াছিল। 'উর' অঞ্চলে তিনি যে খনন কার্য্য চালান, তাহাতে অনেক নীচে ৮ ফিট পুরু এক পাঁকের স্তর পাওয়া গিয়াছে যাহা নিশ্চয়ই কোন বন্যার দ্বারা জমা হইয়াছিল। ইহাতে কিছু জলজীবের অস্থি ব্যতীত আর কোন কঠিন বস্তু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহার উপরে এবং নীচে অন্য প্রকারে মৃত্তিকা পাওয়া যায়—যাহাতে ঘরোয়া ছাই ও মৃৎপাত্রের টুকরায় পূর্ণ ছিল। প্রলয়-পূর্ব যুগেরও মৃৎপাত্রের কিছু অবশেষের চিত্র তাঁহার পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

বাইবেলের বর্ণিত কাহিনী অনুসারে Noah বা নূহ্ পয়গম্বরের আর্ক বা নৌকা ককেসাস পর্ব্বতমালার আরারাট (সুমেরু ?) শৃঙ্গে লাগিয়াছিল, যাহার নীচেই Media বা Medes দেশের পাহাড়সকল বর্ত্তমান। হিন্দু পুরাণ অনুসারে প্রলয়ের পরে ভগবান্ বিষ্ণু দুই অসুরের মেদস্ বা চর্ব্বি হইতে পুনরায় পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সেই জন্যই পৃথিবীর এক নাম মেদিনী হইয়াছে। এখন, এমন হইতে পারে যে যখন বন্যার জল কমিতে লাগিল তখন প্রথমে মেডিয়ার উচ্চভূমিই প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল যাহা ককেসাস পর্ব্বত হইতে দুই বিরাট অসুরের উদরের সমান মনে হইয়াছিল এবং এই ধারণা জন্মাইয়াছিল যে অবশিষ্ট পৃথিবী তাহাদের মেদ হইতেই প্রস্তুত হইয়াছে। বহুদিনের ঝড়-বাদল ও কর্দ্দমাক্ত জলরাশির (ক্ষীর-সমুদ্র) মধ্যে ঈশ্বর যেন সুপ্ত ছিলেন এবং অসুরদেরই রাজত্ব ও তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল। কিন্তু এক সুন্দর প্রভাত দেখাইল যে ভগবান বিষ্ণু (সূর্য্য) জাগিয়াছেন, অসুর নিহত এবং জল কমিতেছে। মনু এবং তাঁহার সঙ্গী যাহারা পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিলেন। 'মনুষ্য' বা 'মানব' শব্দের লাটিন রূপ Mans ইহাই সূচিত করে যে, রোমান ও ভারতবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ একদা ককেশিয়ায় একত্র বাস করিতেন এবং তাহারা নিজেদের মনুর সন্তান মনে করিতেন। মীদিসের অধিবাসীরা 'মাদ' নামে অভিহিত হইত এবং বাইবেলের মতে তাহারা Noahর পৌত্র মাদাইএর সন্তান ছিল।

বাইবেলে নোয়ার তিন পুত্রের উল্লেখ আছে—শেম, হাম ও জাফেত। পাদরীরা বলেন যে, আরব ও সীরিয়ার লোকেরা শেমের বংশজ (Semitic), মিশরের

* প্রাচীন আর্য্য ভাষায় অন্ত্য র্, স্, ন্ এর লোপ বা বিসর্গ হইত না, এবং ন্, ম্ ও অনুস্বার হইত না। আদি সংস্কৃত কতকটা এইরূপ ছিল—ত্বমেব পিতার (pater) ত্বমেব বন্ধুস্ (amicus), ত্বমেব মিত্রম্ (datum) পরম্ চ ধামন্ (nomen).

লোকেরা হামের বংশজ এবং গ্রীস ও ইরাণের লোকেরা জাফেতের বংশজ অর্থাৎ তাঁহারা আর্য্যজাতিকে জাফেতের বংশধর বলিতে চান। জাফেতের পুত্র জবন ও মাদাই যথাক্রমে গ্রীস ও মিডিয়াতে বসতি স্থাপন করেন। এই gavan শব্দ হিব্রু yawan শব্দের লাটিন রূপ। হিব্রু ভাষার y এবং w উচ্চারণ যাহা আরবী ভাষায় শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হয়, লাটিনে ক্রমশঃ G ও V দ্বারা লিখা হয়। সুতরাং আরবেরা গ্রীকদিগকে য়ুনানী বলে। ভারতীয়েরাও উঁহাদিগকে যবন বলিত। মাসিডনের লোকে আপনাদিগকে Ionian বলিত এবং 'যবন' বোধহয় তাহারই অপভ্রংশ। পুরাণ অনুসারে মহাপ্রলয়ের পরে একমাত্র Deucalion জীবিত থাকেন। Deucalionএর পুত্র Hellenএর নামানুসারে গ্রীকেরা আপনাদিগকে Hellenic এবং নিজ দেশকে Hellas বলিত। Hellenএর পৌত্র Ion-এর সন্তান বলিয়া মাসিডনের লোকে আপনাদিগকে Ionian বলিত। এখন Deucalion—Noah—মনু এবং Ion—gavan—যবন একই ব্যক্তি ছিলেন কিনা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ এই নামগুলি কল্পিত এবং সুবিধানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি (tribes) নির্দ্দেশ করিতে ব্যবহৃত হইত।

শেমের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম Asshur ও লক্ষণীয়। তাহার নামানুসারে আসীরিয়া দেশও জাতি হিব্রুতে Asshur লিখা হইত। ইহারাই কি পুরাণের বর্ণিত অসুর জাতি? হইতে পারে পুরাণোক্ত দেবাসুর সংগ্রাম দীর্ঘকালব্যাপী আসীরিয়া ও বেবীলনিয়ার যুদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। আসীরিয়েরাও পারসীদের ন্যায় অসুরদের উপাসক ছিল। পারস্যের সম্রাট মহান্ যশরু বা সাইরাস (Cyrus the great)এর সময় বোধহয় পারস্যে Saturn সর্ব্বপ্রধান 'দএব' (দেও-অপদেবতা) মনে করা হইত—যাহাকে ইহুদীরা আপনাদের ৭০ বৎসরের বন্দীজীবন কালে (Babylonian Captivity) Satan বা শয়তান নামে গ্রহণ করিয়াছিল। রোমান পুরাণানুসারে Saturn বরুণ বা Uranusএর বিদ্রোহী পুত্র ছিলেন। কিন্তু নিরাকার যেহোভার পুত্র থাকা সম্ভব ছিল না, সুতরাং ইহুদীরা তাহাকে ঈশ্বরের বিদ্রোহী ফিরিশ্‌তাহ, (Angel) রূপে পরিণত করিয়াছিল। Devil (diabolis) শব্দই 'দেব' শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে।

কালক্রমে দেব ও অসুর ভারতে উত্তম ও নিকৃষ্ট আত্মারূপে (Good and Evil Spirits) এবং ইরাণে তাহার বিপরীতরূপে গ্রাহ্য হইয়াছিল। উত্তরকালে ইরাণে জরথুস্ত্র (Zoroaster) আবির্ভূত হইয়া এই সকল কাহিনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—'আহুর মজ্‌দা' ও 'অহ্রিমানের' যুদ্ধ বস্তুতঃ চিরকালব্যাপী সু ও কুএর দ্বন্দ্বমাত্র। বন্দীদশায় ইহুদীরা এই তত্ত্ব শিখিল এবং ইহাকে জেহোভা ও শয়তানের যুদ্ধ-রূপে রূপান্তরিত করিল। পূর্ব্বে সেমেটিক জাতির মধ্যে বহু জাতীয় দেবতা (tribal gods) ও নগর দেবতা (city gods) হইত। ইহুদীরা নিজেদের জাতীয় দেবতা yahweh (Jehovah)কে অন্য দেবতাদের চেয়ে শক্তিমান্ মনে করিত এবং যুদ্ধে অন্য দেবতাদের উপর বিজয়ী মনে করিত। উত্তরকালে মুসা (Moses) তাঁহাকেই একমাত্র পরমেশ্বররূপে অভিষিক্ত করেন। লোকমান্য তিলকের সিদ্ধান্ত এই যে, অথর্ববেদোক্ত 'যহ্বঃ' নামক দেবতা এই yahweh হইতে অভিন্ন। অথর্ব্ববেদ তাহার অধিকাংশ সামগ্রী অনার্য্য জাতি হইতেই লইয়াছে, যেরূপ পরেও তাহাদের হইতে অনেক যাদুমন্ত্র (তন্ত্রশাস্ত্র) সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছিল।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে কয়েক তরঙ্গে আসেন। প্রথম তরঙ্গ বেদ ও ইন্দ্র পূজা আনিয়াছিল, কিন্তু মহাপ্রলয় ও অন্যান্য পুরাণকাহিনী পরবর্ত্তী তরঙ্গ দ্বারা আনীত হয়। পুরাণেতিহাসে যে নাগ জাতির উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ কোন অনার্য্যজাতি, সর্প বা নাগ যাহাদের 'টোটেম' ছিল। ইন্দ্রোপাসক যে আর্য্যদল প্রথমে ভারতে আসেন সম্ভবতঃ ধর্ম্মে নাগদের সঙ্গে তাহাদের একটা রফা হয়। পরবর্ত্তী বিষ্ণু-পূজক আর্য্যদলের সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ ক্রমেই স্পষ্টতররূপ ধারণ করে, কিন্তু প্রতিবারেই ইন্দ্রভক্তেরা নাগদের পক্ষ সমর্থন করেন। তক্ষক প্রভৃতির উপাখ্যানে এই কথার পরিচয় পাওয়া যায়। শুষ্ক প্রাণহীন যাগযজ্ঞে লোকে ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগে ইন্দ্রই দেবরাজরূপে মান্য ছিলেন এবং যজ্ঞাদির প্রধান ভাগ তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ক্রমে ত্রিদেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র) তাঁহার স্থান গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে তাঁহারা যথাক্রমে বায়ু, সূর্য্য ও

বজ্রের দেবতা ছিলেন। যদিও রুদ্র বৈদিক দেবতাই ছিলেন, কিন্তু পরে অনার্য্য দেবতা শিবের সঙ্গে তাঁহাকে একার্থক করা হয়। মোহেঞ্জোদাড়োতে খননের ফলে প্রাপ্ত পশুপতির মোহর (seal), লিঙ্গমূর্ত্তি ও মাতৃকা দেবী উহাদের অনার্য্য উৎপত্তি সূচিত করে। আর্য্য প্রভুতার সময়েও প্রাচীন ঢঙের শৈব আচার লকুটিন বা নকুলীশ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত হইতেছিল। উহাতে কতই ঘৃণ্য ও ভয়াবহ ব্রত পালিত হইত—যাহা পরে তন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু কিছু দিনেই আর্য্যানার্য্য ধর্ম্মের একটা রফার মত হইয়া গেল এবং রুদ্র ও শিব একই দেবতারূপে স্বীকৃত হইলেন। মিশর দেশেও বিজেতা ও বিজিত জাতির দেবতা এইরূপে মিলিয়া Amon-Ra হইয়া গিয়াছিলেন। গোড়া হিন্দুদের মধ্যে প্রধান দেবতা ধীরে ধীরে বিষ্ণুই হইতেছিলেন। নর এবং (বোধ হয় তাঁহার শিষ্য) নারায়ণ নামক দুই ঋষির দ্বারা ভাগবত (বৈষ্ণব) ধর্ম্ম এমন জোর পাইল যে, নারায়ণ বিষ্ণুরই অবতার বলিয়া গণ্য হইলেন এবং বিষ্ণুর এক নামই নারায়ণ হইল। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলনীতি হইল পরম দেবতা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি। মৎস্য-অবতার, সমুদ্র-মন্থন প্রভৃতি কতগুলি পুরাণ-কাহিনী বোধ হয় পরবর্ত্তী আর্য্যেরা ভারতের বাহির হইতে আনেন, কারণ বেবিলনীয়দের মধ্যেও মীন দেবতার উল্লেখ আছে। পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম আরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং তিনিও অবতার-বাচ্য হইয়া যান। ব্রহ্মা প্রধান দেবতারূপে কমই পূজা পান—শুধু একটী পৌরাণিক মূর্ত্তি অথবা এক ক্লীব, নির্ব্বিকল্প (abstract) তত্ত্বরূপে বেদান্তাদি দর্শনে স্থান পান। বৈষ্ণবেরা ভুলিয়া গেলেন যে বিষ্ণু পূর্ব্বে সূর্য্যই ছিলেন, সুতরাং সূর্য্যোপাসকেরা সৌর নামক একটী পৃথক সম্প্রদায় হন এবং গণতন্ত্রীদের জাতীয় দেবতা গণেশের পূজকেরা গাণপত সম্প্রদায়ের স্থাপনা করেন।

অতি প্রাচীনকালে যখন মানবসমাজ শৈশবাবস্থায় ছিল, তখন হইতেই মনুষ্য সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক শক্তিদের বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা ঐ সকল শক্তিদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। মানব জীবন দুঃখ কষ্টে ভরা ছিল। তাই তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই শক্তিসকলের তুষ্টিবিধান করাই ধর্ম্মের প্রথম সোপান হইয়াছিল। নিজ সরলতার জন্য তাহারা সেই শক্তিদিগকে ফল, জীব প্রভৃতি উৎসর্গ করিত—যেরূপ কোন অত্যাচারী শাসককে করা হয়। আদি মানব কাঁচা মাংস খাইত, সুতরাং দেবতাদিগকে খুশী করিবার জন্য জীব-হত্যা, এমন কি নরবলি পর্য্যন্ত করা হইত। বৈদিক আর্য্যেরা অগ্নি আবিষ্কারের সঙ্গে বলি উৎসর্গ করারও নূতন উপায় বাহির করেন। তাহা হইল ঘি, সোমরস প্রভৃতি খাদ্য পদার্থকে অগ্নিতে সমর্পণ। পূর্ব্বে দেবতাদিগকে যে সকল খাদ্য দেওয়া হইত, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু যখন ঐগুলি অগ্নিতে সমর্পিত হইত, তখন তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। ইহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইল যে নিশ্চয়ই দেবতা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা অগ্নিকে হুতবাহন বা দেবতাদের মুখ বলিতেন (অগ্নিমুখা হি দেবতাঃ)। সুতরাং সকল ধর্ম্মেই—যুক্তি-বাদী ধর্ম্মগুলিতেও—জীবহত্যা ও আহুতি ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে (বলিদান, কুর্ব্বানী, burnt offering)। বৈদিক আর্য্যেরা সভ্যতায় অন্যান্য প্রাচীন জাতি হইতে অগ্রসর ছিলেন বলিয়া স্তবস্তুতি রচনা ও গান দ্বারাও দেবতাদের পূজা করিতেন। কিন্তু শীঘ্রই উপাসনার এই সরলক্রম ভাঙ্গিয়া গেল এবং পুরোহিত নামক এক শ্রেণীর আবির্ভাব হইল, যাহারা নিজেদের ধর্ম্মের রক্ষক বা জিম্মাদার বলিতেন। ইহারা পুরাতন স্তবস্তুতিতে পারদর্শী ছিলেন এবং মনে করা হইত যে তাঁহারাই ঐগুলির এরূপ ব্যবহারিক প্রয়োগ জানিতেন—যাহাতে ঐগুলি ফলদায়ক হইতে পারে। ইহারা জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি প্রাচীন বিদ্যা জানিতেন এবং কিছু টোটকা ঔষধের ব্যবহারেও দক্ষ ছিলেন। অতএব লোকে তাঁহাদিগকে দৈবশক্তি-সম্পন্ন বা দেবতাদের মেলের লোক বলিয়া মনে করিত। এই সুবিধাকে তাঁহারা কাজে লাগাইলেন। তাঁহারা অজ্ঞানী জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম ক্রমশঃ আচার-বিচার, বিধি-নিষেধ, শুভাশুভ মুহূর্ত্ত, জাদু-টোনা ও জড়ী-বুটী প্রভৃতির এক জটিল সংমিশ্রণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাধীন বিচার-সম্পন্ন কিছু লোক নীতি এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং উপনিষদাদি তাহারই ফল। সংস্কারকদের দৃষ্টিকোণ যুক্তিমূলক হইলেও তাঁহারা মানবীয়

মনস্তত্ত্বের (Human Psychology) অধীন ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও প্রাচীন আদর্শগুলির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্যকে অভ্রান্ত বলিয়া মানা স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যখন তাহাদের উৎপত্তি বা উৎপাদকের নাম বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়া যায়। নবীন সংস্কারকদেরও প্রাচীন সাহিত্য হইতেই প্রমাণ দিতে হইত। গোঁড়া বৈদিক-ক্রিয়াত্মক ধর্ম্মের (ত্রয়ী বা মীমাংসা) অতিরিক্ত সংখ্যা ও যোগ নামক দুই মার্গ ভারতে পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। প্রথমে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু ছিল যে, এক (সাংখ্য) জ্ঞানোৎপত্তির পরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে বলিত এবং অপর (যোগ ও বেদান্ত) জ্ঞানোৎপত্তির পরেও আমরণ কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিত। যোগের সহিত ভক্তিবাদ মিলিত হইয়াই ভাগবতধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। ভক্তির মাত্রা যখন আরও বাড়িয়া গেল এবং তাহাতে কর্ম্ম বা জ্ঞানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিল না, তখন তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম হইল। সাংখ্যদর্শনের বিচারধারা দেখিলে মনে হয় যে, উহা হৃদয় হইতে বেদের প্রামাণিকতা মানিত না ; কিন্তু সময়ানুসারে নিজমতের জন্য বেদেরই দোহাই দিয়াছে। বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন মত সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণব মতকে বেদবিরোধী বলা উচিত কিনা —এই বিষয়ে আমার নির্ণয় এই যে—বৈষ্ণব মতের সঙ্গে বেদের ঐরূপই সম্বন্ধ—যতটা সুফী মতের কোরাণের সঙ্গে। সুফীরা প্রকাশ্যে কোরাণের বিরোধিতা করে না, বরং উহাকে খোদার কলাম বলিয়াই মান্যতা দেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ সাধনমার্গের জন্য কোরানের দ্বারস্থ হন না—নমাজ, রোজাও পালন করেন না। তাঁদের অদ্বৈতবাদ, সখ্য ও মধুরভাব কোরাণের অনুমোদিত নয়, সেজন্য সুফী-সাধক মনসুরকে মোল্লাদের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। সুফী-কবি অমীর খুসরু গাহিয়াছেন—"কাফিরে ইশ্‌কম্ মুসলমানী মরা দরকার নীস্ত্" অর্থাৎ প্রেম আমাকে কাফের বানাইয়াছে, আমার মুসলমানীতে দরকার নাই। এরূপই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ভাগবতাদি পুরাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই মার্গের সাধক নিজ ধর্ম্মের উপকরণ বেদ হইতে কিছু পাইতে পারেন না, কারণ বেদে ভক্তির নামও নাই। শ্রীচৈতন্য প্রকাশ্যে বেদের বিরোধ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ভক্তিধারায় বৈদিক যাগ-যজ্ঞ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনিও দেশাচারের অধীন ছিলেন। তিনি ভক্ত ছিলেন, তর্ক দ্বারা কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস উড়াইয়া দিবার প্রকৃতি তাঁহার ছিল না। এরূপ হইলে লোকে তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট, জাতিভ্রষ্ট মনে করিত এবং তাঁহার প্রেম-মহামন্ত্র গ্রহণ করিত না।

এই সকল কারণে যখনই কোন ধর্ম্ম-সংস্কারক নূতন মত আনিতে চাহিতেন তখন নিম্নলিখিত উপায়ের কোনটী অবলম্বন করিতেন—

(১) কিছু লোক প্রাচীন গ্রন্থের নিজ অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া উহাদের আধ্যাত্মিক অর্থ দিতেন—যথা, জরথুস্ত্র, শঙ্কর, লুথার, দয়ানন্দ। বেদের জীবহিংসাদি আপত্তিকর অংশকে explain away করার চেষ্টা উপনিষদের যুগ হতেই আরম্ভ হইয়াছে—যথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাখ্যা।

(২) কেহ কেহ বলেন প্রাচীন গ্রন্থে ঠিকই ছিল—কিন্তু কালবশে দুষ্টেরা উহাতে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছে। কোরাণে পয়গম্বর মুসা আদির অনেক দোহাই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বলা হইয়াছে যে 'তৌরাৎ' (Old Tastament) গ্রন্থ এখন ঠিক নাই, খৃষ্টানেরা উহাকে বিগড়াইয়া দিয়াছে। দিগম্বরী জৈনেরা প্রাকৃত ভাষার প্রাচীন 'অঙ্গ' আদিগ্রন্থের প্রামাণিকতা মানেন না। তাঁহারা বলেন যে মহাবীরের সময় উহা ঠিকই ছিল, কিন্তু শুক্লাম্বরীয়েরা উহাদিগকে বিগড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সংস্কৃতে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

(৩) কোন কোন সংস্কারক বলিলেন যে—প্রাচীন গ্রন্থ অসম্পূর্ণ। যীশুখৃষ্ট দেখিলেন যে তাঁহার শিক্ষা Old Tastament কথিত প্রাচীন ইহুদী মতের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিলে লোকে তাহা মানিবে না। তাই তিনি বলিলেন—"Think not that I am come to destroy the law or prophets ; I am not come to destroy but the fulfil." (Mat. v. 17). শ্রীকৃষ্ণও বেদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন উহা অসম্পূর্ণ। গীতার (২, ৪২-৪৬, ৫৩) অতিরিক্ত, মহাভারতের অন্যত্রও তাঁহার এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়। যথা—

শ্রুতেধর্ম্ম ইতি হেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যস্থয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে॥

(৪) ইহাদের অতিরিক্ত যাঁহারা সাহস করিয়া পুরাতন মতের খণ্ডন করিয়াছেন (চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন) তাঁহারা নাস্তিক পদবাচ্য হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বীয় মতের বিস্তার করিতে বহু কঠিনতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শেষ অবতার বা শেষ পয়গম্বরের মনস্তত্বও বলিতেছি। কাহাকেও 'শেষ' পয়গম্বর বলিয়া প্রচার করার উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে কেহ অবতারত্বের দাবী করিয়া নিজ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় না ঘটান। সেমেটিক জাতির মধ্যে prophets ছত্রাকের মত উদ্ভূত হইত। কথিত আছে ২৪ লক্ষ পয়গম্বরের মধ্যে মহম্মদই শেষ। ঐরূপ বৌদ্ধ শাস্ত্রে ৩০৬ জন বোধিসত্বের মধ্যে বুদ্ধই শেষ বলিয়া কথিত।

বস্তুতঃ ঈশ্বর কখনও মনুষ্যরূপে জন্ম লন না বা কোন এক 'সত্য' ধর্ম্ম কোন বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ ভাষায় প্রচারের জন্য কাহাকেও পাঠানও না। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বিকশিত হইলে যে কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের নিকটে আনে এবং নিজ সাধনার বলে ঐশ্বরিক প্রেরণাও পান—যাহা তাঁহার অনুভূত উক্তি ও কার্য্য হইতে বোঝা যায়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ধর্ম্মও এক ক্রমবিকাশের (evolution) বস্তু। কিন্তু এই ধারণা যে আমরা উহা সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছি বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানের প্রগতিতে বাধা জন্মায়। এরূপ ধারণা যে শেষে একমাত্র পুস্তকে বা কোন এক ব্যক্তির জীবনে ধর্ম্মের সব তত্ব নিহিত আছে, বস্তুতঃ ধর্ম্মকে সংকীর্ণ করে। ধর্ম্ম অত্যন্ত ব্যাপক বস্তু, যাহার জ্ঞানলাভ হয় জীবনী হইতে, ইতিহাস হইতে, দর্শন হইতে, বিজ্ঞান হইতে, সাহিত্য হইতে, কলা হইতে, পারস্পরিক ব্যবহার হইতে এবং সর্ব্বোপরি আপন বিবেক, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হইতে।

বীর বিবেক আহ্বান

প্রসিত রায় চৌধুরী

[স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে, চীন আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত।]

ইতিহাস-ক্রান্তি-লগ্নে আজ
তোমা' স্মরি,
স্বদেশ-আত্মার ওগো, জীবন্ত-বিগ্রহ
মৃত্যুঞ্জয়-জীবনের বীর-বার্তাবহ
প্রজ্জ্বলন্ত কর্মযোগী,
বেদান্ত-কেশরী।

এস, এস, দুরত্যয় দুর্দিনের ক্ষণে,
বজ্রের নির্ঘোষ সম "অভী" মন্ত্র তব
জনে, জনে বরাভয়, দিক অভিনব,

জাগুক সহস্র প্রাণ, সিন্ধুর গর্জনে।
অধর্ম সম্মুখে আজ, ধর্মের একতা
দুশ্চর তপস্যারত প্রাণ-বহ্নি জ্বালি'
তোমারই জীবন-মন্ত্রে অতন্দ্র প্রহরী,—
ভারতের মহাতীর্থে, বিশ্বের জনতা,
হেরিতেছে "উত্তিষ্ঠত" মন্ত্রের মহিমা,
বাজিতেছে দিকে দিকে তব জয় ভেরী।

লজ্জা

হরেন ঘোষ

মুচকি হেসে ঘাড় চুলকোয় শ্যামাকান্ত। মাথা নীচু করে বলে—লজ্জা করে বাবু।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, সত্যিই ওর লজ্জা করে। এখনি আমার সামনে কেমন কেঁচোর মত এতটুকু হয়ে গিয়েছে লজ্জায়। যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। এই মুহূর্তে ওকে আমার শামুকের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। ভাগ্যিস কোন শক্ত আবরণ নেই শামুকের মত।

লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান যুবক। বছর চৌত্রিশ-পয়ত্রিশ বয়েস হবে। শান্ত, ধীর স্থির, অত্যন্ত ভদ্র। প্রায়ই আসে আমার কাছে। জড়োসড়ো হয়ে বসে, দেখলে মনে হয় ও যেন বয়সের চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। কাজকর্মে হাবভাবে সজীব ভাব নেই। এমনিতে হাসি খুশি মুখ, কিন্তু হঠাৎই কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, বিমর্ষভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। জিজ্ঞেস করলে চটাশ্ হয়ে বলে—না, ও কিছু নয় বাবু, এমনি কেমন যেন হয়ে পড়ি। ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি আমার অগোছাল ঘর গুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে। হাসি হাসি মুখ করে বলে—একা থাকার এই অসুবিধে বাবু। আর বেশি কিছু বলার সাহস পায় না। বুঝতে পারি, ও অত্যন্ত ভদ্র ও সাবধানী। ওর সীমা-সম্পর্কে সচেতন। পাছে আমার সম্মান আহত হয় এজন্যে কথা বাড়ায় না। তবে ওর বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হয় না আমার। হাসি মুখেই ওর দিকে তাকাই—হ্যাঁ পদে পদে একা থাকার অসুবিধে ভোগ করছি। কি আর করা যাবে, যা দিনকাল। একটি পেটই চালানো কঠিন। আচ্ছা শ্যামকান্ত, তুমি বিয়ে করোনি?

মুহূর্তে একটা পরিবর্তন হয়ে যায় ওর চেহারায়, হাব-ভাবে। কেমন গুটিয়ে আসে যেন। ঘাড় নীচু করে মুখ লুকোবার চেষ্টা করে। ঘন ঘন ঘাড় চুলকোয়—সে অনেক কথা বাবু। যাই আপনার চা নিয়ে আসি, চাকরটা কোন কম্মের নয়। বুঝি, ও সরে পড়তে চায়। অগত্যা কৌতূহল দমন করে বলি—চা-ই আনো এককাপ, মনটাও চা-চা করছে বটে।

বিভাসবাবু বললেন—দুঃখ হয়-মশাই, ওই শ্যামাকান্তকে দেখে। এই ছোট থেকে দেখছি। এখানকারই ছেলে। কত ভালো ছেলে, নিরীহ, ভদ্র। তবে বাপমায়ের আদরে পড়াশুনা করলো না। তেমন দরকারও হোত না। অবস্থা ভালোই, নিজেদের ঘরবাড়ি, জমিজমা আছে। থামলেন তিনি। খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিলেন।—শেষে ষ্টেটবাসে চাকরি করতে গেল। তিনবছর কাজ করে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিয়ে চলে এলো। এমন বুদ্ধিও হয় মানুষের! এখানে চল্লিশ টাকা মাইনে, তাও তিনচার দফায় নিতে হয়। স্কুলের দপ্তরীর কাজ মশায়, সবচেয়ে বাজে চাকরি। বেটাকে কত বললুম। তা চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী! মরুক বেটা না খেয়ে। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বিভাসবাবু। অনুপস্থিত শ্যামাকান্তের ওপর ভয়ঙ্কর চটে উঠলেন।

—কেন বিয়ে-থা করে নি নাকি? জানতে চাইলাম।

—আরে মশাই, সেখানেই তো গলদ। টেবিলে সজোরে চাঁটি মারলেন। আরো কি যেন বলতে আরম্ভ করছিলেন, ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজ রেখে চশমা খুলে পকেটে পুরে উঠে চলে গেলেন তিনি।

বিকেলে যথারীতি এলো শ্যামাকান্ত। বিছানায় গা ছড়িয়ে এক খানা বই পড়ছিলাম। উঠে বসলাম।

—আপনি একটু চেয়ারে বসুন বাবু। বিছানার চাদর

বালিশের-ওয়াড় বড় নোঙরা হয়ে গিয়েছে, ওগুলো এই বেলা খুলে রাখি, যাবার পথে ধোপাবাড়ি দিয়ে যাবোখন। আপনার চাকরটা অকম্মার ঢেঁকি, কিছু বলেন না তাই মাথায় উঠেছে। বাক্সের চাবিটা দিন, ওয়াড়-চাদর বার করি।

সুবোধ বালকের মত চেয়ারে বসলাম, চাবিটা বার করে ওর হাতে দিলাম। চাকরটা থাকলেও এ সব কাজ শ্যামাকান্তই করে। অনেকটা অভিভাবকের মত হয়ে গিয়েছে আর কি! ও নিজের থেকেই এসব ভার নিয়েছে। আমিও অনেকটা নিশ্চিত হয়েছি।

চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে মাটিতে জড় সড় হয়ে বসলো শ্যামাকান্ত। মাথা নীচু করে মৃদুকণ্ঠে বললো —আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন বাবু?

—এর মধ্যে শুনেছ তুমি? অবাক হলাম। মানে, এখনও ঠিক হয়নি। তবে এর চেয়ে ভালো হলে যাওয়াই উচিৎ, কি বলো তুমি?

—সে তো ঠিকই! মাথা নীচু করেই বললো ও।—আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন জীবনে কতো কিছু করতে পারবেন। তাছাড়া এই জঙ্গলী গাঁয়ে পড়ে থেকে লাভ কি? শহরে গেলে কত ভালো হবে আপনার।

—আর তুমি যে সাধ করে শহরের চাকরি ছেড়ে গাঁয়ে এলে? ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললাম।

এবার মুখ তুললো। কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে।—আমার কথা আলাদা বাবু। প্রায় ফিসফিস করে বললো শ্যামাকান্ত। এবার বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—শোনো শ্যামাকান্ত, তোমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিনা, তবে মনে হয় খুব একটা ব্যথা পেয়েছ জীবনে। আমায় বলতে যদি আপত্তি না থাকে—

—আপত্তি কিসের বাবু! থামিয়ে দিল মাঝপথে। আমাদের কথা শোনবার কি আপনাদের সময় হবে, না ভালো লাগবে! তাই। এবার ওর চিরাচরিত প্রথায় চুঁকড়ে গেল হঠাৎ। মাথা চুলকে আস্তে আস্তে বললো—লজ্জা করে বাবু।

—রাখো তোমার লজ্জা! পুরুষ মানুষ, তার এত লজ্জা কিসের? তা ছাড়া এই বয়সে এত বুড়োটে হয়ে গেলে কেন?

ওর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এলো। আবার মাথা নীচু করেছে। কী যেন ভাবছে। বার কয়েক খক খক করে গলাটা পরিষ্কার করে নিল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে আরম্ভ করলো শ্যামাকান্ত।

ওদের বাড়ির কাছেই থাকে ব্রজহরি সামন্ত। ছোট-বেলায় খুব ভয় পেত ওরা। যেমন চেহারা, তেমনি গোঁফজোড়া, আর গোলগাল চোখ। অবস্থা ভালোই, দোকান আছে দুটো। কিন্তু খাবার লোক নেই। একের পর এক চারটি ছেলে মারা গেল, শেষে বেঁচে রইল একটি মেয়ে। মলিনা। ছোট থেকেই খুব আদরে আহ্লাদে মানুষ করেছিল ওকে। বৌ চিররুগ্ন, তবু মেয়ের যখন যা প্রয়োজন করতে হোত। কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না মলিনাকে। বড় হবার পর দেখেছে মলিনাকে—তবে কথাবার্তা হয়নি, ধারে কাছেও যায় নি। ওর বাবা মারা গেলেন তারপর। আর ও কোলকাতায় ষ্টেটবাসে চাকরি নিয়ে চলে গেল। মা কান্নাকাটি করলেও বাধা দেয়নি। কাছেই তো। হপ্তায় একদিন বাড়ি আসে। এমনি সময় মার কাছে একদিন শুনলো ব্রজহরি সামন্ত তার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চায়। মা দেখেছে মেয়ে, চেনা-জানাই তো. তাছাড়া পালটি ঘর, আপত্তি করা চলবে না, এইসব কথা হোল। মায়ের কথায় রাজি হোল ও। ও-তো ভাবতেই পারেনি—খুশিই হোল মনে মনে। সেই মাঘমাসেই বিয়ে হোল ওর। পনের দিনের ছুটি নিয়েছিল চাকরি থেকে। এ পর্যন্ত বলে থেমে গেল শ্যামাকান্ত। তাকালাম ওর দিকে। কী যেন ভাবছে আপনমনে।

—তারপর কি হোল?

—আগে তো বুঝতে পারিনি বাবু। আটমঙ্গলায় ওদের বাড়ি গেলাম। ব্রজহরি সামন্ত যে অমন লোক তা জানবো কেমন করে! হাড়ে হাড়ে প্যাঁচ। বলে কিনা, আমাকে তাদের বাড়িতে থাকতে হবে এবার থেকে। তাদের একটি মাত্র মেয়ে। খুব আদুরে, ছেড়ে থাকলে ওর মা বাঁচবে না, এই সব।

—তার মানে, ঘরজামাই? সে-তো ভালো কথা। হাসলাম।

—কি যে বলেন বাবু! পুরুষ মানুষ, শক্তসমথ, লজ্জা

করে না বুঝি ? কেমন মিইয়ে গেল শ্যামাকান্ত।—তাছাড়া আমার বুড়ো মাকে ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে আমি ওখানে থাকবো ? আমার মায়ের ও-তো আমি ছাড়া কেউ নেই। এ গাঁয়ের সবাই চেনে আমায়। শুনলে বলবে কি ? তাছাড়া, আমার একটা মান ইজ্জৎ নেই ? বললাম—আগে তো বলেননি আপনারা এ কথা ! হেসে বুড়ো বললো—আগে বলিনি, এখন বল্‌ছি। বুড়ো মানুষ, সব কথা কি সব সময় মনে পড়ে ? বললাম—তবে বিয়ে দিলেন কেন ? তখন বুড়ো চটে উঠলো। আমাকে শাসালো যে মিথ্যে কথা বলে আইন-আদালৎ করবে। আবার অনুরোধ করলো মিষ্টি কথায়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির লোভ দেখালো। আমি রাজি হইনি। শেষে বললো মলিনাকে আসতে দেবে না আমার সঙ্গে। ভেবেছিল ঐ ভাবে আমায় আটকাবে। একাই চলে এলাম।

—মলিনা কিছু বললো না ? তোমার সঙ্গে আসতে চাইল না ?

—না বাবু। সে বেচারা খুব কান্নাকাটি করেছে। তবে আমার সঙ্গে তো তেমন ভাব হয়নি তখনো। নতুন বৌ, তাই হয়ত লজ্জা পেয়েছে। থামলো ও।

—তোমাদের এই লজ্জাই তোমাদের খেয়েছে। যথারীতি বিরক্তি প্রকাশ পেল আমার কণ্ঠে। কিন্তু মলিনার কি দোষ ? বিয়ে করে বিনা দোষে তাকে তো ত্যাগ করতে পারো না তুমি ! এখন কোথায় আছে সে, এখানে ?

—আজ্ঞে না বাবু। হাবড়ায়। ওখানে ট্রেনিং নিচ্ছে, কি সব শিখছে না কি, তারপর স্বাধীনভাবে বাঁচবে।

—তুমি আর যাওনি সেখানে ? দেখাও হয়নি আর ?

—না বাবু, কি করে আর যাই। লজ্জা করে। আবার কুঁকড়ে গেল শ্যামাকান্ত।

—তোমার শ্বশুরমশায় কি বলেন ? তিনি গোলমাল মেটাতে চাননি ? সাধারণ একটা ব্যাপার, সেটা অনায়াসেই মিটে যেতে পারে, তাকে জিইয়ে রাখার অর্থ কি বুঝতে পারলাম না।

—না বাবু, বড় জেদি আর সাংঘাতিক লোক। মলিনা নাকি আসতে চেয়েছিল, তা ও বুড়োই বকাঝকা করে আসতে দেয়নি। তারপর এই বছর-খানেক হোল মারা গেছে বুড়ো। আর মলিনাও হাবড়া চলে গেল।

—ছিঃ ছিঃ তার কি দোষ ? সে মেয়েমানুষ, নিজে থেকে আসতে তার লজ্জা করতে পারে। তুমি তাকে আনলে না কেন ? এবার রাগ হোল শ্যামাকান্তর ওপর। কেমন পুরুষ মানুষ তুমি ?

—আজ্ঞে মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হোত বাবু, তবে বড় লজ্জা করে। উঠে দাঁড়াল শ্যামাকান্ত। একপাশে ঘাড় হেলিয়ে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

অনেকক্ষণ অন্য কাজে মন দিতে পারলাম না। মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। বারবার অদেখা মলিনার করুণ বিরহ-কাতর মুখ মনের চোখে ভেসে উঠলো।

বিভাসবাবুই বললেন কথায় কথায়—আপনাকে খুব মান্য করে আমাদের শ্যামাকান্ত। কথাবার্তাও শোনে। দেখুন যদি ওদের পুনর্মিলন ঘটাতে পারেন আপনি। বেচারার দিকে তাকালে বুক হু-হু করে।

—দেখা যাক। কিন্তু ওদের এই ব্যক্তিগত মান-অভিমানের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি ! ভেবে কোন কূলকিনারা পেলাম না।

সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যেই একবার যেতে হোল হাবড়ায়। কাজ ছিল ট্রেনিং স্কুলেই। ওখানে গিয়েই মনে পড়ে গেল মলিনার কথা। একবার খোঁজ নিলে হয়।

নানা বয়সের সধবা-কুমারী বিধবা মেয়ে কাজ করছে। চারি দিকে তাকিয়ে দেখছি। আপনমনে সেলাই করছে কয়েকজন কোণের দিকটায়। দুএকজন একবার মুখ তুলে দেখে আবার চোখ নামিয়ে কাজে মন দিল। মৃদুকণ্ঠে পরিদর্শিকাকে জিজ্ঞেস করলাম—মলিনা বলে এদের মধ্যে কেউ আছে কি ?

—কেন বলুন তো ? ঐ যে একবারে কোণের দিকে জানলার কাছে বসেছে যে ওর নাম মলিনা। ঐ কি ? ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলাম। পায়ের শব্দে আরো মনোযোগী হয়ে ঝুঁকে পড়ে সেলাই করছে ওরা। পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—তোমার নাম মলিনা ?

চমকে মুখ তুলে চাইল। মৃদুস্বরে বললো—হ্যাঁ।

তাকালাম ওর দিকে। বিষণ্ণ মুখ, বড় বড় দুটি

চোখ, আয়ত গভীর। শ্যামবর্ণ, কিন্তু অনায়াসে সুশ্রী বলা চলে। সিঁথিতে সিন্দুর চিহ্ন। হাসিখুশি ভাব নেই, বিষাদের কালো ছায়া মুখে-চোখে।

—তুমি তো আমাদের শ্যামাকান্তর স্ত্রী—সোজাসুজি বললাম।

কেমন যেন অসহায় হয়ে উঠলো মুখভাব। মাথা নীচু করলো। কোন কথা বললো না।

সহজ হবার চেষ্টা করলাম।—আমি তোমার কথা সব শুনেছি। এ সব শিখেছ খুব ভালো কথা। হাতের কাজকর্ম জানা দরকার আজকের দিনে। তবে সেই সঙ্গে ঘরসংসারও করা উচিত। মাথা নীচু করে প্রায় ফিসফিস করে বললো ও—আমার কি দোষ বলুন।

বুঝলাম গলা বুজে আসছে ওর। তবু পরিষ্কার করে বলাই ভালো। তাই বললাম—তোমার কি শ্যামাকান্তর কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে? সে বেচারীও কেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছে। মনে সুখ শান্তি নেই। বলোতো ব্যবস্থা করি। এখানকার ট্রেনিং তো আর দুসপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে।

মলিনা মাথা নীচু করলো। বুঝলাম থর থর করে কাঁপছে ও। নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছে। এখন আর কথা বলতে পারবে না। মুখ তুলতেও পারছে না। লক্ষ্য করলাম টপটপ করে জল পড়ছে ওর দুচোখ বেয়ে। আর বিরক্ত করা ঠিক নয়। স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন। অন্যদিকে এগিয়ে গেলাম।

কাজকর্ম সেরে ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। বড় ক্লান্ত লাগছে। চাকর জানালো, শ্যামাকান্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গিয়েছে। ধোপাবাড়ির জামাকাপড় রেখে গিয়েছে।

পরদিন বিকেলে এলো শ্যামাকান্ত। ওকে অবাক করে দেবার জন্যেই বললাম প্রথমেই—কাল তোমার মলিনাকে দেখলাম, আলাপও হোল। আহা বেচারী, অমন ভালো মেয়েকে তুমি এত অনাদর করে এতদিন এমন কষ্টে রেখে দিয়েছ। কেমনধারা লোক তুমি! একটু মায়ামমতাও নেই শরীরে?

মুহূর্তে ওর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। একটু সামলিয়ে নিয়ে বললো আস্তে আস্তে—আমার কথা বলেননি তো বাবু? ভারি লজ্জার কথা হবে তাহলে?

—বলবো না মানে। কপট ক্রোধ প্রকাশ করলাম। —বললাম, শ্যামাকান্ত হাহুতাশ করে, কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে—

—ছিঃ ছিঃ বাবু, আমায় থামিয়ে দিলে মাঝপথে, এ সব আপনি কি বললেন। কি ভাবলো বলুন দেখি। কী লজ্জার কথা।

—রাখো তোমার লজ্জা! ধমক দিলাম ওকে। তুমি যদি একবার যাও ঠিক আসবে মলিনা। রাজি আছে খুব। ও মেয়েমানুষ—নিজের থেকে আসতে লজ্জা পেতে পারে। আর পনের দিনের মধ্যেই ওর ট্রেনিং শেষ হবে। এবার গিয়ে ওকে আনা চাই।

কুঁকড়ে গেল শ্যামাকান্ত। ঘাড় নীচু করে কানের পাশে চুলকোতে আরম্ভ করলো। প্রায় চিঁ চিঁ করে বললো—কি ভাববে বলুন দেখি। আমার যে ভীষণ লজ্জা করে।

—বেরিয়ে যাও এখান থেকে। প্রচণ্ড ধমক দিলাম। আর কখনো এসোনা আমার কাছে। তুমি একটি অমানুষ জানোয়ার।

একটিও কথা না বলে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল শ্যামাকান্ত।

মন খারাপ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। অতটা রেগে ওঠা উচিত হয়নি আমার। একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। এত কড়া কথা না বললেও চলতো। তাছাড়া ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এতটা মাথা গলানো উচিত হয়নি আমার।

পরদিন এলো না শ্যামাকান্ত। তারপর দিনও নয়। বুঝলাম, খুব আঘাত পেয়েছে। যাক, না আসুক। আমার দিক দিয়ে খোঁজ করে ডেকে আনাটা উচিৎ হবে না। ওর ভালোর জন্যেই তো বকেছি ওকে। এটুকু বুঝলো না?

খবর এলো হঠাৎ-ই, আমায় চলে যেতে হবে। আর মাত্র সাতদিন সময় হাতে। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম সবকিছু গুছিয়ে নিতে। দু একবার মনে হলেও শ্যামাকান্তর কথা ভাববার অবসর ছিলনা আর। বিকেলে বাসায় ফিরতেই

দেখি, বসে আছে শ্যামাকান্ত। চাকরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। হয়ত খবর পেয়েছে, আমি চলে যাব তাই দেখা করতে এসেছে।

আমায় দেখে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এলো। হাসিহাসি মুখ। মাথা নীচু করে ঘাড় চুলকোতে আরম্ভ করলো—আপনার কথাই রাখলাম বাবু। ভেবে দেখলাম, ওর কোন দোষ নেই। দুজনার জীবনই এমনি করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরশু দিন ওকে আমাদের বাড়িতে এনেছি বাবু।

বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হয়ে গেলাম। যখন তখন একটা কাঁটা বিঁধছিলো মনে। অমন আঘাত দিয়েছি। তার ওপর ছেড়ে চলে যাচ্ছি এ জায়গা। আর হয়ত কখনো দেখাই হবে না। খুশি হোলাম। মনের মেঘ কেটে গেল আমার। নিজেকে অপরাধী বোধ করছিলাম ওকে তিরস্কার করবার পর থেকে। বললাম—এই তো বেশ করেছ। এ বুদ্ধিটা আগে হলেই তো ভালো হোত। তা তোমার লজ্জা করলো না-তো এবার। রসিকতা করলাম।

এবার তেমন গায়ে মাখলো না ও। দুহাত কচলাতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষণ পরে বললো—আমাদের তো ত্যাগ করে চললেন বাবু।

তা ভালোই। কি হবে এই গাঁয়ে পড়ে থেকে! আমিও এবার যাব শহরে। কাজকর্ম জুটিয়ে নেব একটা, হপ্তায় হপ্তায় বাড়ি আসবো—আগের মত। তবে বাবু, এখন একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিতে হবে একবার। মলিনা নিজে রান্না করেছে আপনার জন্যে।

—সে কি কথা, ওসব আবার করতে গেলে কেন? এদিকে তো রান্না সারা, নষ্ট হবে যে। বললাম ওকে।

—না বাবু, ওকে রান্না করতে দিইনি। শুধু একারটী রাঁধতে বলেছি। সেই কখন এসেছি আমি। একটু তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় বদলে নিন বাবু। বিনীত কাতর অনুরোধ ওর কণ্ঠে। না, বলা যায় না। মনে ব্যথা পাবে। কত আশা করে এসেছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হয়।

চমৎকার রেঁধেছে মলিনা। আয়োজন খুব বেশি নয়, তবে আন্তরিকতা প্রচুর। একহাত ঘোমটা টেনে যত্নের সঙ্গে পরিবেশন করলো। তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি নেই শ্যামাকান্তর। সদা সন্ত্রস্ত ভাব, ভদ্রতা বিনয়ে অদ্বিতীয়।

খাওয়া শেষ হলে পান এগিয়ে দিল মলিনা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। উঠে দাঁড়ালো। ঘোমটা সরে গিয়েছে। দেখলাম কালো চোখ দুটো হাসছে, ভালো লাগলো। শ্যামাকান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে তার চিরা-চরিত ভঙ্গিতে। বললাম ওর দিকে চেয়ে—দেখো দুজনে আবার ঝগড়াঝাঁটি কোরোনা। বেশ সুখেশান্তিতে ঘর কোরো। আমি তো চললাম কদিন পর।

কুঁকড়ে গেল শ্যামাকান্ত। ঘাড় নীচু করে মাথা চুল-কোয়—আর লজ্জা দেবেন না বাবু। ঘোমটা টেনে দিল মলিনা। বললাম—এখনো তাহলে লজ্জা করছে তোমার?

বিবেকানন্দ

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

জ্ঞান ও কর্মশিখা,
উজ্জ্বল ভানু-প্রতিভা ললাটে লিখা;
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
ভারত ধর্মে পরমানন্দ,
গিয়াছেন, তিনি কতই না দেশে, বিজয় তিলক আঁকা॥

জন্ম তোমার শতেকবর্ষ আগে,
ভারত তোমার শক্তিতূর্য মাগে;
সকল বিশ্বে সত্যের হোক্ জয়,
দাও তুমি বিবেকের বরাভয়,
(যেন,) জীবনে মোদের তোমারি ধ্বনির দৃপ্তগরিমা জাগে॥

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

শ্রীঅনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নাম সর্বত্র সুবিদিত। এই সম্মেলন প্রত্যেক বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া কেবল বাঙ্গালীদের মধ্যে নহে, বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালীদের মধ্যেও নিগূঢ় সৌহার্দ বন্ধনটীকে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলে। সেইদিক হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্মেলনাদির মধ্যেও সম্মেলনটী অন্যতম অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই কারণে আমরা যখন বিগত খ্রীষ্টমাসের বন্ধে গোরক্ষপুরের এই সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশনে পর পর দুইটি সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রিত হই, তখন আমরা প্রাচ্যবাণীর সদস্যেরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। পূর্বে বাঙ্গালোরের ৩৪তম অধিবেশনে প্রাচ্যবাণী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর পুণ্য জীবন অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত "শক্তি-সারদম্" নাটক বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও এইবার চারিদিনের মধ্যে দুইদিনই আমাদের সংস্কৃত অভিনয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখায় আমরা স্বভাবতঃই গৌরবান্বিত বোধ করিলাম। স্থির হইল যে বর্তমান পরিস্থিতিতে একটী দেশভক্তিমূলক এবং স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বামীজির পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত আর একটী সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইবে। নাটক দুইটীর রচয়িতা বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটক-রচয়িতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। নাটক দুইটীর অতি সুন্দর উপযুক্ত নাম "ভারত-হৃদয়ারবিন্দম্" এবং "ভারত-বিবেকম্"। আজকাল সকলেই ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের নাটকগুলির সঙ্গে পরিচিত। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বিশখানি অতি সুললিত, সুমিষ্ট সঙ্গীত-সমৃদ্ধ সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া দেশে বিদেশে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং এই নাটকগুলি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত-পালি নাট্যসঙ্ঘ কর্তৃক ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরেও অভিনীত হইয়া আপামর সমগ্র জনসমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। এই নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—অতি সুবোধ্য অথচ অতি প্রসাদগুণবিশিষ্ট সুমধুর ভাষা এবং বিভিন্ন ছন্দ, স্বর-লয়-তানে বিরচিত বহু সঙ্গীত। সেজন্য আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয় যে, বর্তমানে প্রাচীন নাটকাদির অপেক্ষা

গোরক্ষপুরে প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত-পালি নাট্যসঙ্ঘের অভিনেতৃ-মণ্ডলীর প্রতিকৃতি॥

বাঁ দিক থেকে উপবিষ্ট—(১) শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায়; (২) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিশ্র; (৩) ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী; (৪) শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার, ভাইজী; (৫) ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী।

বাঁ দিক থেকে দণ্ডায়মান—(১) শ্রীশান্তিলাল ঘোষ, (২) শ্রীপূর্ণেন্দু রায়; (৩) অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী; (৪) শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্য; (৫) শ্রীমতী রত্না গোস্বামী; (৬) শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য, প্রভৃতি॥

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের নাটকগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলির সত্যই তুলনা নাই; কিন্তু তাহারা জনসাধারণের নিকট সুবোধ্য নহে।

সেইজন্য, সংস্কৃতকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত করার মহাব্রতে ব্রতী ডক্টর যতীন্দ্রবিমল তাঁহার সংস্কৃত নাটকগুলি সর্বজনবোধ্য সুললিত ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬২, রাত্রে আমরা প্রাচ্য-বাণীর গায়কমণ্ডলী, রূপসজ্জাকরাদি সহ প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত-পালি নাট্যদলের বিশজন গোরক্ষপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। যোগিগুরু গোরক্ষনাথের পাদরজঃপূত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই গোরক্ষপুর বহুদূরের পথ। কিন্তু প্রত্যেক-বারের মতই পরমানন্দে কাটিয়া গেল ট্রেনের সময়টী—রিহার্সেল, গল্প ও সরস আলোচনায়। পথে একদিন পুণ্যধাম কাশীতেও যাপন করা হইল। গোরক্ষপুর আমরা পৌছাই ২৬শে প্রত্যুষে। তখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা; কিন্তু আমাদের সকলেরই হৃদয় তখন উৎসাহের আগুনে প্রদীপ্ত। সমাদর করিয়া আমাদের লইয়া গেলেন মহাত্মা গান্ধী কলেজে; সেখানেই অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিবর্গের থাকিবার ব্যবস্থাও সেখানেই হইয়াছিল। প্রকাণ্ড কলেজ, এবং চতুর্দিকে সুবিস্তৃত প্রান্তর। কলিকাতার পরে আমাদের সকলেরই এটী অত্যন্ত ভাল লাগিল।

চৌধুরী-দম্পতী এবং মেয়েদের ছয়জনকে অতি সমাদরে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন গোরক্ষপুরের উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীযুক্ত অজিতমোহন দাশ এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশ। তাঁহাদের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী লীলা কলিকাতা লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী। ইঁহারা উভয়েই অতি অমায়িক এবং স্নেহশীল। তাঁহাদের আদর-যত্নের তুলনা নাই। "ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়"—বিশ্ব-কবির এই বাণীর সত্যতা আমরা পুনরায় গোরক্ষপুরে গিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। দাশদম্পতী এবং গোরক্ষপুরস্থ অন্যান্য সকলেই আমাদের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমাদের অভিনয়ের দিন স্থির হয় ২৭ ও ২৮ তারিখ রাত্রিতে নৈশ-ভোজনের পরে—৮টা হইতে ১০॥০ বা ১১। গোরক্ষপুরে তখন ভীষণ শীত—আমরা উৎকণ্ঠিত হইলাম এই ভাবিয়া যে অত শীতে, অত রাত্রি পর্যন্ত কোনও দর্শক থাকিবেন না। কিন্তু শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় কার্যকালে দেখিলাম, তাহার ঠিক বিপরীত হইল। প্রথমদিন রাত্রে ৮টা হইতে সাড়ে দশটা এবং দ্বিতীয় দিন রাত্রি সাড়ে আটটা হইতে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত সম্মেলনের সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান ছিল না, এবং দুই সহস্রাধিক দর্শকের মধ্যে একজনও অভিনয় সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে চলিয়া যান নাই। সকলেই অত ঠাণ্ডার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে বসিয়া থাকিয়া সানন্দে অভিনয়ের রসগ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত যে সত্যই ভারতের সার্বজনীন ভাষা, ইহার পরিচয় আর একবার পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।

২৭শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে সর্বজনবরেণ্য সুবিখ্যাত লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের সর্বজনপ্রিয়াধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী দর্শনশাখার সভানেত্রীরূপে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল "বাংলার দর্শন" সম্বন্ধে মৌখিক ভাষণ দান করিয়া সুবিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিলেন। সম্মেলনাদিতে প্রায় সকলেই লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন; তাহাতে অবশ্য একদিক থেকে জনসাধারণের লাভই হয়। কারণ সেই তথ্যগুলি লিখিত আকারে তাঁহাদের সম্মুখে বর্তমান থাকে। অলিখিত মৌখিক ভাষণের চমৎকারিত্ব অনেক বেশী নিঃসন্দেহ। বিশেষ করিয়া, ডক্টর শ্রীমতী রমার তথ্যাদি-বহুল, অথচ অতি সুমিষ্ট ভাষা সকলেরই হৃদয় প্রভূতভাবে আকর্ষণ করিল। এই আধুনিক যুগের ব্রহ্মবাদিনী যখন ভাবব্যাকুলভাবে বলিলেন যে বাংলার দর্শনের বৈশিষ্ট্য হইল শ্রীভগবানকেও নিকটতম ঘরের জনরূপে গণ্য করা, তখন উপস্থিত সকলেরই হৃদয় এক অপূর্ব ভাবাবেশে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ২৮শে প্রত্যুষে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষণ দান করিয়া সকলকেই সমভাবে মুগ্ধ করিলেন। এই সভাতেও ডক্টর রমা চৌধুরীর সুললিত ভাষণ শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। অন্যান্য বহু সুধীবর্গের লিখিত ভাষণও মনোহারী হইয়াছিল। তথাপি আমি স্থানাভাব বশতঃ আমাদের প্রাচ্যবাণীর কর্ণধারদ্বয়ের বিষয়ে উল্লেখ করিলাম।

উভয়দিনই সন্ধ্যাকালে ঘটিল তুল্য আনন্দের ব্যাপার। দিবাভাবে আমাদের প্রাচ্যবাণীর কর্ণধার পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৌধুরীদম্পতী যে অত্যুচ্চ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সুমধুর ভাষণ দ্বারা, রাত্রিকালে সেরূপ তুল্য

প্রশংসাই অর্জন করিল তাঁহাদের প্রাচ্যবাণীর প্রাণপ্রিয় নাট্যসঙ্ঘ।

প্রথম রাত্রে অভিনীত হইল ডক্টর যতীন্দ্রবিমল বিরচিত অভিনব সংস্কৃত নাটক শ্রীভারত-হৃদয়ারবিন্দম্। পুণ্যশ্লোক ঋষি অরবিন্দের জীবনের কয়েকটী প্রধান ঘটনা নাট্যোপ-যোগী করিয়া চৌধুরী মহাশয় এই অপূর্ব নাটকটী রচনা করিয়াছেন। ইহা সর্বপ্রথমে অভিনীত হয় ১৯৫৯ সালের বড়দিনের বন্ধে পন্দিচেরীস্থ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীজননীর আশীর্বাদক্রমে। পরে এই নাটক কলিকাতা, নবদ্বীপ, কাঁথি প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। সেই দিন নাট্য পরিচালকরূপে আমি সকলের নিকট হইতে প্রচুর সহায়তা পাইলাম। রঙ্গমঞ্চ, আলো ও মাইকেরও যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত ছিল; সজ্জাঘর ছিল পরম রমণীয়। সেজন্য সমস্ত অভিনয়টী অতি নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন হইল পরমা জননীর কৃপায়। নাটকের অতি সহজ সরল অথচ সুমধুর ভাষা শ্রবণে দর্শকবৃন্দ কি প্রচুর আনন্দ লাভ করিলেন, তা চোখে না দেখিলে ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীভগবানের কৃপায় সেই দিন প্রত্যেকের উচ্চারণ ও অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। দর্শকদের চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিল নাটকের বহু সংস্কৃত কবিতা ও সঙ্গীত। ফলে সমগ্র অভিনয়টী হইয়া উঠিল ভক্ত হৃদয়ের একটী অপূর্ব শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। দর্শকবৃন্দও সেইভাবে ইহাকে গ্রহণ করিলেন। সমস্তক্ষণ সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে একটী আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল। সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু সুধীজন ও গোরক্ষপুরস্থ বহু বিশিষ্টনাগরিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইচ্যান্সেলার, অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; ঈদৃশ গুণিজনসমাগম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সভান্তে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোরক্ষপুরস্থ সমিতির সভাপতি সর্বজনবরেণ্য শ্রীযুক্ত হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার, স্থায়ী সভাপতি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ, গোরক্ষপুরস্থ অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখসুধীবৃন্দ নাটক ও নাট্যাভিনয় উভয়েরই ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। শ্রীযুক্ত হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার বলিলেন, একাধারে সংস্কৃত ভাষা এবং ভক্তিধর্মের প্রচারে ব্রতী হইয়া সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডক্টর চৌধুরীদম্পতী সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ পূর্বে দিল্লীতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে একদিক হইতে ডক্টর চৌধুরীর নাটক-গুলি আধুনিক যুগে কালিদাসপ্রমুখ প্রাচীন নাট্যকার-গণের নাটক হইতেও অধিকতর উপজীব্য ও প্রয়োজনীয় —কারণ, প্রাচীন নাটকসমূহ জনসাধারণের বোধের অগম্য। কিন্তু ডক্টর চৌধুরীর অতি সহজ সরল অথচ সুমধুর রচনাশৈলী সকলেরই সুখবোধ্য। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন যে ডক্টর চৌধুরীর সংস্কৃত নাটক-গুলি দেশের সর্বত্র ও বাহিরেও অভিনীত হইয়া সকলেরই প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। তিনি এই আশা

জামনগরে প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত-পালি নাট্যসঙ্ঘের সদস্যগণ সহ স্থানীয় বিশিষ্ট জনমণ্ডলী॥

প্রকাশ করিলেন, প্রাচ্যবাণী যেন পৃথিবীর সর্বত্রই ডক্টর চৌধুরীর এই প্রকার ভক্তি ও ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক সংস্কৃত নাটকগুলি অভিনয় করিয়া ভারতের শাশ্বত বাণী বিশ্বসমক্ষে প্রচারিত করেন।

পরের দিনে যেন আমরা রাজা হইয়া গেলাম এক নিমিষের মধ্যেই! যেদিকেই যাই, সেই দিকে কতজন ছুটিয়া আসিয়া অশেষ স্নেহভরে আমাদের নাটক ও নাট্যাভিনয়ের উদাত্ত প্রশংসা করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনিয়া নিজেদের পরম ধন্য মনে করিলাম ও বারংবার বিভুচরণে প্রণতি নিবেদন করিলাম। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যে সংস্কৃত নাটক এরূপ সমাদর লাভ করিবে,

তাহা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। গোরক্ষপুরবাসিগণের এরূপ অপূর্ব আদর জীবনে ভুলিবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম—ডক্টর শ্রীমতী রমার সুমধুর ভাষণেরও প্রচুর প্রশংসা। সবই সম্ভবপর হইল পরমা জননীর কৃপায়।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে অভিনীত হইল ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের নবতম নাটক "ভারত-বিবেকম্"। স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি স্বামীজি সম্বন্ধে দুইখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছেন "ভারত বিবেকম্" (১৮৮১-১৮৯৩) ও "বিশ্ববিবেকম" (১৮৯৩-১৯০২ খৃষ্টাব্দ)। তাহার প্রথমটী গোরক্ষপুরে অভিনীত হইল। পূর্বদিন সকলেরই সংস্কৃত নাটক বিশেষ ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া এই দিন রাত্রে আরো অধিক জনসমাগম হইল। এই দিনের অভিনয়ও শ্রীভগবৎ কৃপায় অতি সুন্দর হইয়াছিল, এবং পূর্বদিনের মতই প্রশংসা অর্জন করিল। এই দিনের সংস্কৃত সঙ্গীত গুলিও সকলের বিশেষ মনোরঞ্জন করিয়াছিল। সভান্তে প্রাচ্যবাণীর সকলকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতৃ-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও আমাদের অতিথি বৎসল হিতৈষী শ্রীঅজিত মোহন দাস। স্থানীয় সম্পাদক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চটোপাধ্যায় প্রাচ্যবাণীর সকলকে ভূয়সী প্রশংসাসূচক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। কেবল অভিনয় নয়—তাহারা সকলে প্রাচ্যবাণীর প্রত্যেকের আচার-আচরণে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন—তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম। কারণ ইহার অপেক্ষা বড় কিছুই হইতে পারেনা।

শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় সকলের পক্ষ হইতে প্রাচ্যবাণীকে একটি স্বর্ণ পদক প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাহা ছাড়া তিনি আমাদের প্রত্যেককে তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ রাধামাধবচিন্তন গ্রন্থের এককপি করিয়া এবং একটী করিয়া কাপ উপহার দিলেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ডক্টর যতীন্দ্র বিমলকে তাঁহার অপূর্ব নাটকের জন্য বঙ্গ ভাষা সমিতির পক্ষ হইতে একটি স্বর্ণখচিত পদক দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য দিল্লীস্থ অখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় শ্রীষষ্ঠীকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আসামস্থ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পণ্ডিতপ্রবর সম্পাদক শ্রীপরিমল দাস যথাক্রমে শ্রীসুনীল দাস ও শ্রীপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রৌপ্য পদক দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সর্বদিক দিয়াই আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা রহিল না। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুনীল দাস, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র, কানাইলাল ভট্টাচার্য, অনিন্দ্যসুন্দর চটোপাধ্যায়, শান্তিনাথ ঘোষ, হিরণ্ময় রায়চৌধুরী, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী, শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী রত্না গোস্বামী। সংগীতাংশে যোগদান করেন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য, শ্রীপূর্ণেন্দু রায় ও শ্রীমতী শ্যামাশ্রী রায়। স্থানীয় কয়েকজন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয়াংশে যোগদান করেও আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বিদায়ের দিন আসিয়া গেল। অশ্রুসজল চক্ষে সকলে আমাদের বিদায় দিলেন। গোরক্ষপুরের মধুর স্মৃতি কখনও ভুলিবার নয়। শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা প্রাচ্যবাণী হইতে ভারতের বহুস্থানে সংস্কৃত অভিনয় করিয়াছি এবং পরমা জননীর অশেষ আশীর্ব্বাদের ফলে প্রচুর প্রশংসাও লাভ করিয়াছি। কিন্তু বোধ হয়—এরূপ অজস্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা অন্যত্র কোথাও পাই নাই।

সত্যই সংস্কৃতের মহিমা অপার এবং এই কথা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলিতে পারি যে শত সহস্র বৎসর পরে আজও সংস্কৃত নামত না হইলেও কার্যত নিখিল ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা ও শাশ্বত মিলন সূত্র। বৃন্দাবনে, দ্বারকায়, জামনগরে, দিল্লীতে, মাদ্রাজে, পন্দিচেরীতে, গোরক্ষপুরে সর্বত্র দেখিলাম—একই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আপামর জনসাধারণ নরনারীবালবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই সরল সংস্কৃত বুঝিতে ও উপভোগ করিতে সমর্থ। যাহারা বলিয়া থাকেন যে সংস্কৃত মৃতভাষা, তাঁহাদিগকে কথাগুলি অনুধাবন করিতে বিনীত অনুরোধ জানাই। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও, যন্ত্রসভ্যতার যুগেও—এই সংস্কৃত জননী যুগযুগান্তরের মহত্তম আদর্শগুলিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সেই ভাষাকেই যদি আজ আমরা মৃত বলিয়া উপেক্ষা করি, তাহার অপেক্ষা অধিকতর পাপ আর কি হইতে পারে?

পরিহাস-রসিক বিবেকানন্দ

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়পুরের প্রতি ঘরে ঘরে, পথে প্রান্তে জাগর চোখ। বিস্ময়-বিহ্বল, পলক-বিহীন দৃষ্টি।

দিকে দিকে প্রচার হয়ে গেল এক স্বামীজীর কথা। এক অদ্ভুত ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী।

এলো যুবা। এলো বৃদ্ধ। যোগ দিল সবে ধর্ম, সাহিত্য, বেদান্ত আর দর্শন আলোচনায়।

বসল সভা জয়পুরের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরসিংহের বাসায়! কত লোকের ভিড়।

এক পণ্ডিত এসেছে সভায়। জয়পুরেরই বিখ্যাত তার্কিক ও পণ্ডিত সূরথ-নারায়ণ।

'আমি একজন বেদান্তী।' পণ্ডিত বললে, 'আমি অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করি না। পৌরাণিক অবতারেও আমার বিশ্বাস নেই। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। আমার সাথে একজন অবতারের পার্থক্য কি?'

'আপনার কথাই সত্য!' পণ্ডিতজীর প্রশ্নের উত্তরের সাথেসাথেই জবাব দিলেন বিবেকানন্দ: 'তবে হিন্দুরা মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহকেও অবতার বলে। তাঁদের মধ্যে আপনি কোন্‌টি?'

সভায় হাসির রোল উঠ্‌ল। পরিহাস-রসিক স্বামীজীর কথায় পণ্ডিতজী অপ্রস্তুত হয়ে তর্কে নিরস্ত হ'লেন। এমনি পরিহাস প্রিয় ছিলেন স্বামীজী। অবিশ্বাসী অথচ তার্কিক-দের জব্দ করে তিনি সব-সময়ই আমোদ পেতেন।

আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান-বাহাদুর-এর বাড়িতে আছেন স্বামীজী। দেওয়ান-বাহাদুর-এর আহ্বানে মহারাজ-বাহাদুর মংগল সিংহও স্বামীজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

মঙ্গল সিং বললে, 'স্বামীজী মহারাজ! আমি শুনেছি, আপনি একজন বিদ্বান ও 'মহাপণ্ডি'ত ব্যক্তি। আপনি তো ইচ্ছে করলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তবু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন কেন?'

'মহারাজ! আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি রাজকাজে অবহেলা করে দিনরাত্রি সাহেবদের সাথে খানা খেয়ে শিকার করে বেড়ান কেন?'

মহারাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করল। বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু কেন করি, তা' বলতে পারি না। তবে এটা যে আমার ভাল লাগে, তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।'

'ভাল লাগে বলে আমিও ফকীরের বেশে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই।' স্বামীজী একটু হেসে এবার মহারাজের প্রশ্নের জবাব দিলেন।

মহারাজ বাহাদুর বুঝতে পারলেন যে, এই কৃতবিদ্য সন্ন্যাসী কেবলমাত্র সুপণ্ডিতই নন, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী।

'দেখুন বাবাজী মহারাজ!' কৌতুহলবশেই হোক, আর প্রকৃত সত্য জানবার আগ্রহেই হোক, মহারাজ আবার প্রশ্ন করলে: 'মূর্তিপূজায় আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই, এর জন্যে আমার কি দুর্গতি হবে?'

'মহারাজ কি আমার সাথে রহস্য করছেন?' মহারাজকে হাসতে দেখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামীজী বললেন।

'না—না স্বামীজী!' মহারাজ বললে, 'প্রকৃতই আমি কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর মূর্তিগুলোকে সাধারণের মতন ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পারি না; এর জন্যে কি আমাকে পরকালে নিগ্রহ ভোগ করতে হবে?'

'নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে কেন? মূর্তিপূজায় আপনার বিশ্বাস নেই, মন্দ কি?' স্বামীজীর উত্তর শুনে উপস্থিত অনেকেই বিস্মিত হল। শ্রীশ্রীবিহারিণীর মন্দিরে শ্রীমূর্তির সামনে ভজন গাইতে গাইতে ভাবাবেশে যাঁর অশ্রু ঝরে পড়তো। কেন তিনি মূর্তিপূজার সমর্থনে যুক্তি দেখালেন না?

সহসা স্বামীজীর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো কক্ষবিলম্বিত মহারাজের একখানি আলোক-চিত্রের ওপর। স্বামীজীর নির্দ্দেশে চিত্রখানি আনীত হলে তিনি সেখানি হাতে নিয়ে দেওয়ান-বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানি বোধহয় মহারাজ-বাহাদুরের প্রতিকৃতি?' দেওয়ান বাহাদুর সম্মতি-সূচক মাথা নাড়লেন।

'উত্তম,' স্বামীজী চিত্রখানি মাটিতে রেখে দেওয়ান বাহাদুরকে বললেন: 'আপনি এর ওপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেওয়ান-বাহাদুর শঙ্কাকুল হয়ে স্বামীজীর দিকে চাইলে। উপস্থিত সকলেই স্বামীজীর অদ্ভুত কাজের কারণ বুঝতে না পেরে ছবির মতন স্থানুর হয়ে রইলো।

'আপনাদের মধ্যে যে-কেহ এর ওপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন।' স্বামীজী উচ্চকণ্ঠে সকলকেই লক্ষ্য করে বললেন, 'এটা তো একখণ্ড কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়? আপনারা অগ্রসর হচ্ছেন না কেন?'

সকলেই একবার স্বামীজীর দিকে, একবার মহারাজের দিকে তাকাতে লাগলেন। শেষে দেওয়ান বাহাদুর বললে, 'আপনি বলেন কি স্বামীজী! মহারাজের ছবির ওপর আমরা কি থুৎকার ফেলতে পারি?'

'মহারাজের চিত্র হোক, তাতে কি আসে যায়?' এতে তো আর মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত নেই, এ তো এক টুকরো কাগজ মাত্র। এ চিত্র তো মহারাজের মতন নড়তে, চড়তে বা কথা বলতে পারে না; তবু আপনারা অসম্মত হচ্ছেন কেন?

স্বামীজী হেসে আবার বললেন, 'আপনারা থুৎকার ফেলতে পারবেন না, তা' আমি জানতাম; কারণ আপনারা মনে করছেন এর ওপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করলে মহারাজের প্রতিই অসম্মান প্রকাশ করা হবে। কেমন ঠিক কিনা?'

উপস্থিত সকলেই এবার কুণ্ঠিত আনন্দে ও নীরব দৃষ্টিতে স্বামীজীর কথা সমর্থন করলেন।

'দেখুন মহারাজ!' মহারাজকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বললেন, "একদিক দিয়ে বিচার করলে এ' আপনি নন, আবার অপর দিক দিয়ে দেখলে এই চিত্রের মধ্যেও আপনার অস্তিত্ব আছে। এই জন্যেই কেউ নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে অগ্রসর হলেন না, কারণ এঁরা আপনার অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবক, মহারাজের অসম্মানজনক কোন কাজ করতে এঁদের সঙ্কুচিত হওয়া স্বাভাবিক। এঁরা আপনাকে ও এই চিত্রখানিকে সমান সম্ভ্রমদৃষ্টিতেই দেখছেন। তেমনি প্রস্তর বা ধাতুর প্রতিমাগুলিও শ্রীভগবানেরই বিশেষ গুণবাচক মূর্তি। ঐগুলি দেখামাত্র ভক্তের মনে সেই ভগবানের কথাই উদয় হয়। ভক্ত মূর্তির ভেতর দিয়ে ভগবানেরই উপাসনা করেন, ধাতু বা প্রস্তর পূজা করেন না। আমি বহু স্থান ভ্রমণ করেছি, কিন্তু কখনো কোন হিন্দুকে বলতে শুনিনি—'হে ধাতু! হে প্রস্তর! আমি তোমার পূজা করছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।' মহারাজ! একই অনন্ত ভাবময় ভগবান—যিনি সর্বজনোপাস্য ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—ভক্তেরা তাঁকেই নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা করে থাকেন।'

'স্বামীজী!' স্বামীজীর যুক্তিতে মুগ্ধ মহারাজ করযুক্ত করে বললে, 'আপনার কৃপায় মূর্তিপূজা সম্বন্ধে এক অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। বাস্তবিকই আপনার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে আমিও এ পর্যন্ত একজনও কাঠ বা প্রস্তরাদির উপাসক দেখিনি। এতদিন আমি মূর্তিপূজার প্রকৃত রহস্য বুঝিনি বা বুঝতে চেষ্টাও করিনি। আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন।'

'স্বামীজী!' বিদায়কালে স্বামীজীর পদধুলি নিয়ে মহারাজ বললে, 'কৃপা করে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।'

মনের ঘোর কাটল। ফিরে এলো আত্ম-বিশ্বাস। হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার গেল খুলে। পরাণ উঠল দুলে। দিকে দিকে জাগল শিহরণ। মন মুগ্ধ হয়ে গেল সবাকার।

১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। আলোয়ার রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাড়িতে আছেন স্বামীজী।

'বাবাজী!' প্রশ্নোত্তর সভায় কে একজন বললে, 'আপনি গেরুয়া পরিধান করেছেন কেন?'

'কারণ গেরুয়া ভিক্ষুকের বসন।' সকরুণ দৃষ্টিতে স্বামীজী বললেন, 'যদি আমি সাধারণের মতন বস্ত্র পরিধান করে ভ্রমণ করি, তা' হলে দরিদ্র ভিক্ষুকেরা আমাকে অর্থশালী মনে করে ভিক্ষে চাইবে। আমি নিজেই একজন ভিক্ষুক, বিশেষ আমার হাতে এক পয়সাও নেই। প্রার্থীকে

নিরাশ করতে আমি হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাই ; কিন্তু আমার গৈরিকবসন দেখে তাঁ'রা তা'দেরই মতন একজন ভিক্ষুক মনে করে আমার কাছে আর ভিক্ষে চাইবে না।'

এ শুধু মামুলি মুখের কথা নয়, এ অন্তরের কথা, দরিদ্রের প্রতি গভীর সমবেদনায় আকুল-উচ্ছ্বাসে ভরপুর। কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহী!

আমেরিকা যাবার আগে মহীশূর রাজের দেওয়ান আর, কে, শেষাদ্রি বাহাদুরের বাড়িতে আছেন স্বামীজী। তরুণ সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে মহীশূরাধিপ চামরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ার এসেছে দেখা করতে। কথায় কথায় স্বামীজীর তীব্র সমালোচনায় কুপিত হয়ে মহারাজ বললে, 'স্বামীজী! আমি এত বড় একজন মহারাজা, আমাকে আপনার ভয় করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। ভবিষ্যতের জন্যে আপনি সাবধান হবেন, নইলে আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন হতে পারে।'

'আপনার কাজ ও উক্তি সমর্থন করবার জন্যে তো বহু পারিষদ আছেন। আমি সন্ন্যাসী—সত্যই আমার তপস্যা। সামান্য জড়দেহের অনিষ্ট আশঙ্কায় সত্যকে পরিত্যাগ করব? আপনি হিন্দুরাজা হয়ে একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর কাছে কি এরূপ হীন কাজ প্রত্যাশা করেন?'

এমনি নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় বাহাদুরি আছে বৈ কি! নইলে প্রতাপশালী মহারাজাও বন্ধু হন কি করে? রাজা-মহারাজারা গুরুর মতন শ্রদ্ধা করেন কেন? পার্থিব যশ-সম্মান ও ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষাহীন বলেই তো—কপর্দকশূন্য অবস্থায় সমস্ত দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন রাজাধিরাজ থেকে দরিদ্র মেথরের পর্যন্ত হৃদয় জয় করতে। রামকৃষ্ণদেবও জানতেন, নরেন্দ্র নির্ভীক, সত্যবাদী, তাঁর কথায় ও কাজে কোথাও বিন্দুমাত্র 'ভাবের ঘরে চুরি' নেই।

'তুই যদি আমার কথা না শুনবি, তা'হলে এখানে আসিস্ কেন?' বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

'আপনাকে ভালবাসি, তাই দেখ্‌তে আসি, কথা শুনতে নয়।' উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন।

এমন স্পষ্ট জবাব ক'জনে দিতে পারে? রামকৃষ্ণদেবকে যেমন ভালবাসতেন স্বামীজী, দেশকেও তিনি তেমনি ভালবাসতেন।

'...আমি আমার স্বদেশকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি—গভীরভাবে ভালবাসি।' শিকাগো ধর্ম-মহাসভার পরে শিকাগো থেকে স্বামীজী মহীশূরের দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ারের কাছে এ কথা চিঠিতে বলেছিলেন।

'এই জগৎটা একটা কমলালেবুর মত, যতদূর পারা যায় নিঙড়ে এর রস পান করা উচিত।' আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মিঃ রবার্ট ইংগারসোল বললে, 'পরলোক বলে কিছু আছে, তা'র যখন কোন নিশ্চিৎ প্রমাণ পাচ্ছি না, তখন এই জীবনটাকেও একটা মিথ্যায় বঞ্চনা করে কোন লাভ নেই। কে জানে কবে মৃত্যু হ'বে, অতএব যথাসাধ্য তৎপরতায় জগৎকে উপভোগ করা উচিত।'

'কিন্তু জগৎরূপ কমলালেবুর রস বার করবার প্রণালী আমি তোমার চেয়ে ভালই জানি। কাজেই তোমার চেয়ে বেশী রসই পেয়ে থাকি। আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, অতএব তোমার মত আমার তাড়াতাড়ি নেই। আমার জগৎ থেকে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নেই। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সম্পত্তি প্রভৃতির কোন বন্ধন নেই, আমার কাছে জগতের সমস্ত নর-নারীই সমান ভালবাসার পাত্র, সকলেই আমার কাছে ঈশ্বরস্বরূপ। ভাব দেখি, মানুষকে ভগবান দেখে আমি কত আনন্দ পাই। আমি নিরুদ্বেগেই রস পান করছি। তুমিও আমার মতন এই জগৎরূপ কমলালেবুটি নিঙড়াতে আরম্ভ কর—দেখবে, হাজার গুণ বেশী রস পাবে। একটা ফোঁটাও বাদ যাবে না।'

'ভারতের হিন্দুরা কি করেছে?' লণ্ডনে সভার মধ্য থেকে কে একজন সমালোচক প্রশ্ন করে উঠ্‌ল: 'তারা এ পর্যন্ত একটা জাতিকেও জয় করতে পারেনি।'

'পারে নি নয়—তারা করেনি।' স্বামীজী গর্জন করে উঠলেন, 'আর এটিই হিন্দু-জাতির গৌরব যে, তারা কখনো ভিন্ন জাতির রক্তে ধরিত্রীকে রাঙা করেনি। কেন তারা পরদেশ অধিকার করবে? তুচ্ছ ধনের লালসায়? ভগবান চিরদিন ভারতকে দাতার মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন! তারা জগতের ধর্মগুরু, পরস্বাপহারী রক্ত-পিপাসু দস্যু ছিল না! আর এই কারণেই আমি আমার পিতৃপুরুষদের গৌরবে গর্ব অনুভব করে থাকি।'

আপনাদের মহাপুরুষেরা যদি মানব-সমাজকে ধর্মদান

করবার জন্য এতই ব্যগ্র ছিলেন, তা'হলে তাঁরা এদেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেননি কেন?' এ আর একজনের প্রশ্ন।

'তখন তোমাদের পুর্বপুরুষেরা বন্য বর্ব্বর ছিলেন, সবুজ-বর্ণ বৃক্ষপত্ররসে উলঙ্গ দেহ রঞ্জিত করে গিরিগুহায় বাস করতেন। তাঁরা কি অরণ্যে ধর্মপ্রচার করতেন?'

'স্বামীজী! আপনি তো খৃষ্টান নন, অতএব খৃষ্টধর্মের আদর্শ বুঝবেন কি ক'রে?'

"তিনি প্রাচ্যদেশীয় এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, আমিও প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী। আমার মনে হয়, পশ্চাত্য জগৎ এখনো তাঁকে চিনতে পারেনি, তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্যক্‌-রূপে বুঝতে পারেনি। তিনি কি বলেন নি, 'যাও, তোমার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে এস, তারপর অনুসরণ কর?' তোমাদের দেশের ক'জন বিলাসী ধনী-উষ্ট্র, স্বর্গ প্রবেশের দ্বার সূচীছিদ্র মনে করে সর্বত্যাগী হয়েছেন?"

বেলুড় মঠে আছেন স্বামীজী। 'হিতবাদী' সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর-এর সাথে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এসেছে দেখা করতে।

'স্বামীজী'! বিদায় নেবার সময় পাঞ্জাবীটি বললে, 'আপনার কাছে ধর্মের কথা, সাধন ভজনের কথা শোনবার জন্যে আমরা অনেক আশা করে এসেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে অতি-সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হল, আজকের দিনটাই বৃথা গেল।'

'মহাশয়', গম্ভীর হলেন স্বামীজী: 'যতদিন আমার জন্মভূমির একটা কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততদিন তাকে আহার প্রদানই ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম।'

১৮৯৬ সালের মে মাস। লণ্ডনের রেডিং নগরে স্টার্ডির বাড়ীতে আছেন স্বামীজী, সারদানন্দ আর গুড্‌উইন্‌। হ্যাঁ, সেই বিশ্বখ্যাত ক্ষিপ্রলিপিকার ও স্বামীজীর একান্ত সেবক জে, জে, গুড্‌উইন্‌। একদিন গুড্‌উইন্‌ বললে, 'যখন কোন মানুষ গাধাটাকে মারে, তখন আমিও ভয়ানক রেগে যাই।'

'ঠিক বলেছ', পরিহাস-প্রিয় স্বামীজী মৃদুহেসে বললেন, 'গাধাকে মারলে তোমার স্বশ্রেণীর প্রেম উথ্‌লে ওঠে, তাইতো তোমার এত রাগ হয়।'

চিকাগোতে জর্জ হেলের বাড়ীতে আছেন স্বামীজী। হাতের নখ, পায়ের নখ বড় হয়েছে। হেলের মেয়েদের কাছে চাইলেন একটা পেনসিল-কাটা ছুরি।

'কি করবেন?' মেয়েদের মধ্যে একজন বললে।

'হাতের পায়ের নখ বড় হয়েছে', বললেন স্বামীজী: 'কাটব'।

অমনি মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। একজন তো গালচের ওপর পিছন দিকে পা মুড়ে, থ্যবড়ানি খেয়ে বসে অতি সন্তর্পণে ভক্তি ক'রে পায়ের বুট খুললে—তারপর মোজা খুললে। তারপর সুরু হোলো নখ কাটা—এই নখ কাটে তো এই নখ কাটে। তারপর দু'পায়ে মোজা পরিয়ে দিলে, বুট পরিয়ে দিলে ও বুটের ফিতেও পরিয়ে দিলে। শেষে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "দিন, দাম দিন। আমরা আমেরিকান, দাম না পেলে কোন কাজ করি না। নাপতের দোকানে গেলে দু-তিন ডলার দিতে হ'ত। আমি ঘরে বসে নখ কেটে দিয়েছি—দিন আমাকে এক ডলার।"

'এই যে আমার পা ছুঁয়েছ এবং নখ কাটবার অধিকার পেয়েছ', স্বামীজী বললেন, 'এর দরুণ আমাকে কি দেবে, আমাকে বল—আমায় কি প্রণামী দেবে বল? আমার পা ছোঁয়া কি যার তার সাধ্য! পোপদের পা ছুঁতে পেলে কত টাকা দিতে হয়।'

উল্টে পোপের কথা শুনে মেয়েটি বললে, 'কাজও করব, আবার ঘর থেকে টাকাও দেবো?' সে আর বেশী জবাব করতে না পেরে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে অপর ঘরে চলে গেল।
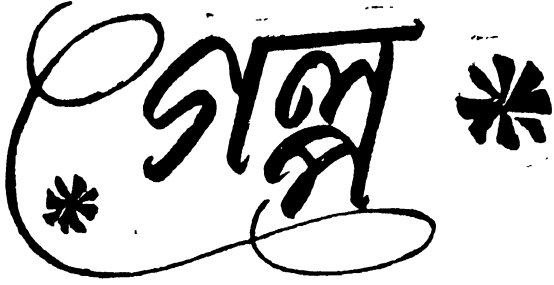
ঠাকুরঝি'র বিয়ে

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

১

সুরেশ ও লীলাকে রাখিয়া উহাদের পিতা স্বর্গে গমন করেন। মৃত্যুর বয়স তাঁহার হয় নাই। কিন্তু সত্যই, মৃত্যুর কি একটা বয়স আছে? উহাদের মাতা ছিলেন চিররুগ্না। স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরেই তিনি পুত্রকন্যা দুইটিকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া আত্মীয়-স্বজনকে চোখের জলে ভাসাইয়া এই সংসার হইতে বিদায় লইলেন।

সুরেশ ও লীলা চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। তাহাদের পরস্পরের প্রতি একটি অকৃত্রিম ভালবাসা ব্যতীত তাহাদের জীবনে সান্ত্বনার কিছু রহিল না। লীলা যখন ডাকিত "দাদা"—কিংবা সুরেশ যখন ডাকিত "লীলা", তখন তাহারা যেন একটা অপার্থিব সুর শুনিতে পাইত এই বঞ্চিত জীবনে। এই স্নেহ অবলম্বন করিয়াই তাহারা গড়িয়া তুলিল তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার। দুইজনেই পড়াশুনা করিতে লাগিল। পিতামাতা যে ছোট একখানি বাড়ী এবং যৎসামান্য টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাহারা কলেজে পড়িতে লাগিল।

বাড়ীতে একটি ঠিকা ঝি আছে। সে অনেকদিন এ সংসারে আছে। সে সুরেশকে ডাকে দাদাবাবু, লীলাকে ডাকে দিদিমণি। সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকে, কোথাও যায় না। দুপুরে যখন ভাই ও বোন কলেজে যায়, তখন সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ীর মধ্যে শুইয়া থাকে। বৈকালে উঠিয়া ঘরকন্নার কাজকর্ম আরম্ভ করিয়া দেয়। কাপড় তুলিয়া আলনায় রাখে, ঘর ঝাঁট দেয়, উনানে আগুন দেয়, খাওয়ার জল ভরিয়া রাখে, চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করিয়া রাখে।

সুরেশ ও লীলা প্রায় একসময়েই বাড়ী ফেরে। তবে লীলাই একটু আগে আসে। তাহার ক্লাশ আগে শেষ হয়। বাড়ী ফিরিয়া হাতের বইগুলি বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া মুখ হাত ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই সুরেশ বাড়ী ফেরে। লীলা বলে, এই যে এসে গেছ। একটুখানি বস'। আমি এখুনি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

সুরেশ বলে, আচ্ছা, এত ব্যস্ত কেন?

লীলা যায় চায়ের ব্যবস্থা করিতে। ঝি অবলা সব হাতের কাছে গুছাইয়া দেয়। চায়ের জল গরম করিয়া আনে। একখানি ছোট টেবিলের পাশে দু'খানি চেয়ারে তাহারা বসে। লীলা চা তৈরী করে। দুজনের সামনে দুইটি পেয়ালা রাখিয়া লীলা উঠিয়া যায় ছোট দেয়াল-আলমারির কাছে। আলমারি হইতে লইয়া আসে কিছু খাবার। দুইজনে ভাগ করিয়া চায়ের সঙ্গে খায়।

সুরেশ বলে, আজ কি রান্না হচ্ছে?

কি আর হবে?

হ্যাঁ, বেশি হাঙ্গামার মধ্যে যেও না। তোমার আবার ঠিক মায়ের মত রান্নাবান্না বাই হয়েছে। কি দরকার সাত রকম খাবার করে? মোটামুটি যা হয় তাই রাঁধবে। বুঝলে?

হ্যাঁ, তাই রাঁধবো। আজ তোমার জন্য একটু মাছের অম্বল রাঁধবো ঠিক করেছি। তুমি সেদিন বলেছিলে মনে নেই?

সে, এমনি বলেছিলাম।

তা যাই বল, আমি আজ অম্বল রাঁধবই।

যা হয় কর। তোমার সঙ্গে আর পারি নে।

সুরেশ চা খাওয়া শেষ করিয়া বারান্দায় একখানি

চেয়ার লইয়া বসিল। লীলা দাদার ঘরে গিয়া তাহার ঘর গুছাইতে লাগিল। বইগুলি গুছাইয়া কতক শেলফের উপরে, কতক আলমারিতে রাখিল। বিছানাটা ঝাড়িয়া পাতিল। টেবিলের উপরকার কাগজপত্র কলম পেন্সিল গুছাইয়া রাখিল।

লীলা তারপর গেল নিজের ঘরে। এই ঘরেই তাঁর মা থাকিতেন। দেওয়ালে মা বাবার ফটো। লীলা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর বিষণ্ণমুখে ঘরখানিকে ঝাঁট দিয়া কাপড় চোপড় গুছাইয়া রাখিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইয়া একটি এলো খোঁপা বাঁধিয়া মুখ হাত ধুইতে গেল। তারপর কাপড় ছাড়িয়া বারান্দায় গিয়া বলিল, দাদা, যাও না একটু বাজারের দিকে। ছু'একটা খুচরা জিনিষ আজ না কিনলেই নয়।

বেশ, যাচ্ছি। দাও একটা ফর্দ করে।

লীলা ফর্দ করিয়া দিল। ফর্দ হাতে করিয়া সুরেশ বাজারের দিকে যাত্রা করিল।

ঝি অবলা ডাকিল, দিদিমণি, উনুন ধরে গেছে।

এই যাচ্ছি, বলিয়া লীলা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াইল।

সুরেশ বাজার হইতে ফিরিয়া ডাকিল, অবলা! এই নে, এগুলো দিদিমণির কাছে নিয়ে যা। আর বল, আমি একটু ঘুরে আসছি।

সুরেশ যখন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন লীলার রান্না শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন কি টেবিলের দিকে চাহিয়া দেখিল, ভাতও বাড়া হইয়া গিয়াছে। সুরেশ বলিয়া উঠিল, একি! এর মধ্যেই রান্না শেষ?

লীলা। ভারি তো রান্না! দেরি হবার কি আছে? নাও বসে যাও। খাবার পর আজ বেশ খানিকক্ষণ পড়তে হবে। সামনের সপ্তাহে একটা পরীক্ষা আছে।

উহারা খাইতে বসিয়া কলেজের গল্প জুড়িয়া দিল। সুরেশ বলিল, যিনি আমাদের শেক্‌স্‌পীয়র পড়ান, প্রফেসর ভট্টাচার্য, উঃ কি চ্যাঁচানই চ্যাঁচান!

আমাদের হিস্‌ট্রির প্রফেসরও কম যান না।

এমনি গল্প করিতে করিতে তাহাদের খাওয়া শেষ হয়। খাওয়ার পর অবলা টেবিল পরিষ্কার করিয়া ঘর মুছিয়া নিজে খাইতে যায়।

সুরেশ আর লীলা নিজেদের ঘরে গিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করে।

২

এমনি করিয়া দিন কাটে দুই ভাই বোনের।

একদিন সকালে উঠিয়া সুরেশ দেখিল, অবলা রান্নাঘরে রান্নার যোগাড় করিতেছে।

সুরেশ লীলার ঘরে গিয়া দেখিল, সে তন্ময় হইয়া পড়াশুনা করিতেছে।

সুরেশ ঘরে ঢুকিতেই লীলা বলিল, আজ আর আমি রাঁধতে পারব না, দাদা। তোমার বোধ হয় মনে নেই, আজ আমার পরীক্ষে।

ও, হ্যাঁ। আমার পরীক্ষেও এগিয়ে এসেছে। আচ্ছা, এদিক আমি দেখছি। তোমাকে ভাবতে হবে না।

সুরেশ ও অবলাই লীলার কাজের ভার লইল। চা করিয়া, চা আর প্লেটে খাবার আনিয়া লীলার কাছে দিয়া গেল। তারপর নিজে কিছু খাইয়া লইল। রান্নাঘরে গিয়া অবিলম্বে রান্না সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। পড়া শেষ হইতেই লীলা তাড়াতাড়ি স্নান ও আহার সারিয়া কলম প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষার হলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সুরেশ বলিল, চল, আমি তোমাকে পরীক্ষার হলে পৌছে দিয়ে আসি।

কিছু দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারব।

তবু, চলো না, আমিও সঙ্গে যাই।

দুই-ভাইবোন পরীক্ষার হল পর্যন্ত গিয়া সুরেশ লীলাকে তাহার সীটে বসাইয়া দিয়া বলিল, বেশি উদ্বেগ করো না, ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে লিখো, প্রত্যেক প্রশ্ন লিখেই রিভাইজ করো। পরীক্ষার পর তোমার উত্তর নিয়ে বৃথা আলোচনা করো না। টিফিনের সময়ে কিছু খেয়ে নিও। এই প্রকার উপদেশ দিয়া সুরেশ হল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

যে কয়দিন লীলার পরীক্ষা চলিল, সুরেশ উদ্বিগ্ন মনে তাহার আহারাদির ব্যবস্থা ও যাতায়াতের ব্যবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল। লীলাও প্রতিপদে দাদার প্রতি সস্নেহ কৃতজ্ঞতা জানাইল। পরীক্ষার শেষ দিন পরীক্ষার হল

হইতে ফিরিয়া লীলা বলিল, দাদা, কেন তুমি আমার জন্য এত পরিশ্রম করছো ?

কি আর করছি, লীলা! বাবা যদি আজ থাকতেন—

লীলার চক্ষু সজল ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। উভয়েই নিজ নিজ ঘরের দিকে চলিয়া গেল। লীলা তাহার মা-বাবার ফটোর দিকে চাহিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

৩

একদিন সুরেশ জ্বর লইয়া বাড়ী ফিরিল। লীলা চিন্তিত হইল। অসুখ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। লীলার পরীক্ষা হইয়া হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কলেজ যাইতে হয় না। সে দিবারাত্রি দাদার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট, রোগ বাড়িয়াই চলিল।

লীলা তাহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দাদার সেবা করে। সাধ্যানুসারে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করে। অবলাও মায়ের মতই ইহাদিগকে স্নেহ দিয়া ও সেবা দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করে। ঔষধ খাওয়ান, ডাক্তার দেখান, পথ্যসংগ্রহ করা, সবই করে লীলা। পথ্য রাঁধা, গরম জল করিয়া দেওয়া, ঘর মেঝে পরিষ্কার করা, সবই করে অবলা।

পাড়ার ডাক্তার চিকিৎসা করেন। তিনি একদিন বলেন, একজন বড় ডাক্তারের পরামর্শ লইলে ভাল হইত। লীলা তৎক্ষণাৎ বলিল, আপনি এখনি ব্যবস্থা করুন।

পাড়ার ডাক্তার বলিলেন, একটু বেশি ফি দিতে হবে।

তা হোক।

কথাবার্তা সুরেশের অজ্ঞাতসারেই হইল। কারণ সুরেশ জানে তাহাদের আর্থিক অবস্থা। তাহার অসুখের জন্য যে কত বেশি ব্যয় হইতেছে তাহাও তাহার অজানা নাই।

বড় ডাক্তার আসিতেছেন। সুরেশকে জানাইতেই সে বলিয়া উঠিল, অত ফি কেমন করে দেবে ?

লীলা বলিল, তুমি চুপ কর। অসুখ না সারা পর্যন্ত খরচ-পত্র সম্বন্ধে কোন কথা তুমি বলো না।

ডাক্তার আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি আছে। লীলা তাহার হাত বাক্স খুলিয়া দেখিল, টাকা অতি সামান্যই আছে। তাহা দিয়া ডাক্তারের ফি দেওয়া চলিবে না। লীলা মনে করিয়াছিল, তাহার মায়ের গহনা হইতে কিছু বিক্রয় করিয়া আপাতত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে। কিন্তু সেও সময়-সাপেক্ষ। এখনই ডাক্তারকে টাকা দিতে হইবে।' উপায় কি ?

লীলা একটু গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিল। তারপর অবলাকে ডাকিয়া বলিল, আমি একটু বেরুচ্ছি। এখুনি ফিরবো। দাদাকে একটু দেখো।

এখন বেরুচ্ছ কেন ? শুনলাম, এখনই বড় ডাক্তার আসছে।

হ্যাঁ। ডাক্তার আসবার আগেই আমি ফিরে আসব।

এই কথা বলিয়াই লীলা কাপড় ছাড়িয়া পায়ে স্যাণ্ডাল পরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

৪

লীলাদের বাড়ীর পাচ ছয়খানা বাড়ী পরেই অজিতদের বাড়ী। অজিত লীলার চেয়ে বার চোদ্দ বছরের বড়। লীলার মা-বাবা বাঁচিয়া থাকিতে মাঝে মাঝে যাইত লীলাদের বাড়ীতে। মা-বাবার মৃত্যুর পর লীলা ইচ্ছা করিয়াই উহার যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে। কোন বিবাদ করিয়া নয়। কথায়, ব্যবহারে, বুঝাইয়া দিয়াছে, তাহার আর লীলাদের বাড়ী বেশি যাতায়াত করা উচিত নয়। বাড়ীতে না গেলেও অজিত লীলাকে ভুলিতে পারে নাই। ছোট্ট লীলাকে অজিত ক্রমশ বড় হইতে দেখিয়াছে। এখনও পথে এখানে ওখানে দেখা হয়। কিন্তু লীলা একেবারেই অজিতের দিকে মন দেয় না। বরং এড়াইয়াই চলে।

অজিত ধনী। কাজ-কর্ম নামমাত্র করে। নানা প্রকার ছবি বা খেয়াল লইয়াই দিন কাটায়। কুকুর পোষে, এস্রাজ বাজায়, পাড়ায় পূজা-পার্বণে মোটা চাঁদা দেয়। কখনো কখনো সখের অভিনয়েও যোগ দেয়।

লীলা সেদিন সোজা অজিতের বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখিল, অজিত একা একা এস্রাজ অভ্যাস করিতেছে। লীলাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া অজিত আশ্চর্য হইয়া গেল। এস্রাজ নামাইয়া রাখিয়া লীলার দিকে হাঁ করিয়া একটু তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি, মানে—আপনি ?

হঁ্যা।

কি মনে করে? বসুন, বসুন।

বসব না। একটু বিশেষ কাজে এসেছি। বড্ড তাড়াতাড়ি।

আমার কাছে আপনার কাজ? তা হোক, বসুন আপনি।

লীলা বসিল। বলিল, দেখুন—

লীলার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না।

অজিত বলিল, কি বলবেন, বলুন। এত দ্বিধা আপনার? মনে করে দেখুন, এই এতটুকু থেকে আপনাদের দেখছি। আপনিই তো ইচ্ছে করে দূরে সরে গেলেন।

লীলা বলিল, আপনারা ধনী। আমরা গরীব। বড়-লোকের সঙ্গে মিশতে আমার ভয় করে।

ওসব কথা বলবেন না। এতদিন ধরে দেখেও আপনি আমাকে এমন কথা বলতে পারলেন?

আচ্ছা, বলব না। শুনুন, একটা উপকার করতে হবে।

আচ্ছা, সে হবে'খন। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন। আপনাকে বড় চঞ্চল দেখাচ্ছে। স্থির হয়ে বসুন। একটু চা আনতে বলি।

না, না, না। আমার সময় নেই। আপনাকে একটা অত্যন্ত দরকারী অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। এখনই। এখনই।

কি, বলুন না।

এই ঘড়িটা রেখে চল্লিশটা টাকা দিতে হবে।

এই কথা বলিয়া লীলা তাহার রিষ্ট-ওয়াচ-টি খুলিয়া অজিতের সম্মুখে একটি টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল।

অজিত বলিল, কেন বলুন তো?

দাদার খুব অসুখ। অনেকদিন ভুগছেন। এখনই একজন বড় ডাক্তার আসছেন। তার ফি দিতে হবে। ঔষধ-পত্রও কিছু আছে।

কি আশ্চর্য! আমাকে—যাক। তোমাদের—মানে আপনাদের বাড়ীতে ক'বছর যাতায়াত নেই, বলুন তো?

লীলা নীরব। একটু পরে বলিল, আমার এ উপকারটা করুন। এখুনি ডাক্তার এসে পড়বে।

আপনার ঘড়ি আপনি হাতে পরে ফেলুন। আমি টাকা নিয়ে আস্‌ছি।

না, ঘড়ি আপনাকে রাখতেই হবে। বাবা আমাকে ও ঘড়িটা দিয়েছিলেন, আমার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করবার পর। ও ঘড়ি আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু এখন নয়। টাকা শোধ করে।

এই সামান্য টাকার জন্য আপনি কেন এত অস্থির হচ্ছেন? ঘড়ি আপনার রাখতে হবে না।

আপনাকে রাখতেই হবে।

লীলার বিপদ এবং সঙ্গে সঙ্গে এই জিদ দেখিয়া অজিত আর বিলম্ব না করিয়া টাকা আনিয়া লীলার হাতে দিল। লীলা প্রায় ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অজিতকে নমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল।

৫

সুরেশ সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। অজিত সেদিন আসিয়া-ছিল সুরেশকে দেখিতে। অজিত ঘরে ঢুকিতেই লীলা গরম জল করিবার অজুহাতে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অজিত সুরেশের বিছানার পাশে বসিয়া বলিল, কেমন আছ সুরেশ?

অনেকটা ভাল। ডাক্তার বলে, আর মাস খানেকের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাব। লীলা আমাকে বাঁচিয়েছে। অদ্ভুত মেয়ে! আর তোমার সাহায্যের কথাও আমি শুনেছি, কি বলে ধন্যবাদ দেব, জানিনে।

থাক, ও সব বাজে কথা বলতে হবে না। এই কয় বছরই না হয় তোমরা দূরে সরে গেছ। নইলে—। মনে নেই তোমার? কতদিন জ্যাঠাইমার কাছে এসে কত খাবার খেয়েছি, কত গল্প করেছি।

মনে আছে বই কি? এই অসুখটায় আমার পড়ার কত ক্ষতি হয়ে গেল।

তুমি তো এবার এম-এ দেবে, না?

হঁ্যা, আর তো মোটে সাত আট মাস আছে। কি যে হবে?

সব ঠিক হয়ে যাবে। শুনেছি, তুমি খুব ভাল পড়াশুনা করেছ। লীলার খবর কি?

সে এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। এখনো ফল বেরোয় নি। তবে, ও পাশ করবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

অজিত বার বার ঘরের এদিকে ওদিকে দরজার দিকে জানলার দিকে চাহিতেছে। কিন্তু লীলাকে দেখা গেল না। মাঝে একবার অবলা আসিয়া টিপয়ের উপরে গ্লাসে খানিকটা গরম জল ঢালিয়া রাখিয়া গেল। বলিল, দিদিমণি বললেন, এই গরম জলে কুলকুচি করে নিয়ে এক দাগ ওষুধ খেয়ে ফেলতে।

অজিত বেশ বুঝিল, ঔষধ লীলারই খাওয়াইবার কথা। সে ঘরে আসিতে চায় না বলিয়াই অবলাকে পাঠাইয়াছে।

অজিত একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তারপর বলিল, আমি আসি ভাই।

সুরেশ বলিল, এস। তোমার উপকার কখনো আমরা ভুলব না।

আবার ওই কথা! আচ্ছা, আজ আসি।

অজিত চলিয়া যাইবামাত্রই লীলা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই, ওষুধটা এখনও খাওনি দেখছি। নাও, ধর।

লীলা সুরেশকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। তারপর একটি কমলালেবু হাতে লইয়া ছাড়াইয়া সুরেশকে খাওয়াইতে গেল। সুরেশ বলিল, আর তোমাকে খাওয়াতে হবে না। দাও, আমি নিজেই খেতে পারব। উঃ, তাহলে এবার বেঁচেই গেলাম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

লীলা বলিল, কি কথা?

আচ্ছা, তোমার কি একেবারেই ইচ্ছে নয় যে অজিত আমাদের বাড়ীতে আসে?

দেখ দাদা, ওঁরা ধনী, আমরা গরীব। তাছাড়া ওঁর রুচি, অভ্যাস, কাজকর্ম সবই আমাদের থেকে কত আলাদা। কাজেই—

যাক গে, আমার একটু শুক্ত খেতে ইচ্ছে করছে। ডাক্তার বলেছেন, তাঁর আপত্তি নেই।

বেশ তো। দেবখ'ন শুক্ত করে। আমি এখুনি পাঠাচ্ছি অবলাকে, উচ্ছে নিয়ে আসবে। বেগুন, আলু আর কাঁচকলা ঘরেই আছে।

লীলা উঠিয়া গেল।

৬

লীলাদের বাড়ীর পাশেই রাস্তার মোড়। সেই মোড়ের পাশে ফুটপাথে বেশ ভিড় জমিয়াছে। সবাই তরুণ। দুই চারজন তরুণীও আছেন। দুই একজন বয়স্ক ব্যক্তিও আছেন। এই ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে একজন কাগজওয়ালা। সকলেই কাগজ কিনিবার জন্য ব্যাকুল।

ভিড়ের মধ্য হইতে একটি যুবক একখানি কাগজ বাহির করিয়া আনিয়া ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, এই, এই দেখ, আমি পাশ করেছি।

আর একটি তরুণ বলিল, আমিও পাশ করেছি।

একটি তরুণী একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া যুবকটিকে অনুরোধ করিল, দেখুন তো ৪৯৮ রোল নম্বরটা।

যুবকটি কাগজ দেখিয়া বলিল, পাশ। কনগ্রাচুলেশনস্।

তরুণীটির মুখ খুসিতে ভরিয়া গেল।

আর একটি তরুণী জিজ্ঞাসা করিল; আচ্ছা, দেখুন তো ৭৫২ নম্বরটা।

প্রথম তরুণীটি বলিল, ওটা কার নম্বর?

ওটা ওই—ওই বাড়ীর লীলার।

তরুণটি ওই নম্বর দেখিয়া বলিল, হাঁা, পাশ উইথ ডিষ্টিংশন।

তরুণীটি বলিল, যাই, এখুনি খবরটা দিয়ে আসি।

রাস্তার মোড়ে ভিড়ের কারণ জানিতে পারিয়া লীলাও অত্যন্ত উদ্গ্রীব হইয়া তাহাদের বাড়ীর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তরুণীটি তাহার নিকট যাইতেই লীলা ব্যস্তস্বরে বলিল, কি অপর্ণা, আমার নাম পেলে?

অপর্ণা পাশের বাড়ীর মেয়ে—আই-এ পড়ে। সে হাসিতে মুখখানি ভরিয়া বলিল, নিশ্চয়ই। শুধু পাশ নয়, উইথ ডিস্‌টিংশন।

লীলা বলিল, তাই নাকি?

অপর্ণা বলিল, শুধু তাই নাকি বললে হচ্ছে না। সন্দেশ চাই।

লীলা বলিল, আচ্ছা, হবে'খন।

অপর্ণা চলিয়া গেল। লীলা তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকিল, দাদাকে খবরটা জানাইতে।

৭

সুরেশের ঘর। পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুইয়া সুরেশ। মাথার দিকে একটু দূরে শেলফের উপর নানা প্রকার ঔষধের শিশি ও মোড়ক। তার পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর নানাবিধ পথ্য। হরলিকস্‌, ওভালটিন, কর্ণফ্লেক্‌স্‌, কমলালেবু, বেদানা, ইত্যাদি।

বিছানার পাশে সুরেশের হাতের কাছে একখানি ছোট চেয়ার, তার পাশে একটি টিপয়।

লীলা আসিয়া বসিল এই ছোট চেয়ারটায়। সুরেশ বলিল, লীলা, আমার আজ একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অমত নেই। কত দিন চা খাই নি।

লীলা বলিল, আমি এক্ষণি করে আনছি।

একটু পরে এক কাপ চা আর প্লেটের পাশে দুখানি বিস্কুট আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া, টিপয়টি সুরেশের কাছে সরাইয়া দিল। লীলা বলিল, তুমি আরম্ভ কর। আমিও এক কাপ নিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে খাব। লীলাও আর এক কাপ চা আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিল এবং দুজনেই—একটু একটু করিয়া চা খাইতে লাগিল।

সুরেশ বলিল, এ যাত্রা বেঁচে গেলাম তাহলে। এখন থেকে একটু পড়াশোনায় মন দিতে হবে।

না, এক্ষণি নয়। অন্তত আরো এক মাস চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে।

আচ্ছা, শরীরের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। একটা কথা। তুমি কোন কলেজে ভর্তি হবে, কিছু ভেবেছ? ইউনিভারসিটিতে, না প্রেসিডেন্সি কলেজে?

লীলা একটু গম্ভীর হইয়া গেল। একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি এম. এ. পড়ব না।

সে কি? তা কি হয়? নিশ্চয় এম. এ. পড়বে।

না দাদা, আমি এম. এ পড়ব না।

কেন?

লীলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার পক্ষে আর পড়াশোনা করা সম্ভব নয়।

কেন?

এতদিন তোমার শরীর খুব খারাপ ছিল। খরচ-পত্রের কোন কথা তোমাকে খুলে বলিনি। তোমার কাছে সামান্য যা কিছু ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে। তাছাড়া মার গহনারও কিছু কিছু বেচে ফেলতে হয়েছে। এখনও তোমাকে আরো অনেক দিন ভাল ঔষধ পথ্য খেতে হবে। তারপর আছে তোমার পরীক্ষার খরচ। আমাদের সংসারটি ছোট হ'লেও, আজকালকার দিনে এর জন্যও কিছু খরচ আছে। এর পরে আমার পড়ার খরচের ভার সইবে না।

আমারই জন্য এত সব খরচ-পত্র! মার গহনাও বিক্রি করতে হয়েছে?

সুরেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এতও অদৃষ্টে ছিল?

লীলা বলিল, কেন তুমি এত মন খারাপ করছ? ভগবান তোমাকে এতবড় অসুখ থেকে সারিয়ে তুললেন, সেইটেই একটা পরম সৌভাগ্য নয়? নাই বা হ'ল আমার পড়াশোনা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, ভাল করে পড়াশোনা করে ভাল করে পরীক্ষা দাও। তা হলেই সব হবে।

সুরেশ বলিল, আর এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। কতদিন পরে চা খাচ্ছি!

আচ্ছা, এনে দিচ্ছি আর এক কাপ। এর পরে কিন্তু আর চাইবে না।

না, আর চাইব না।

লীলা উঠিয়া গিয়া আর এক কাপ চা করিয়া আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিল। বলিল, আমার জন্য আর খরচপত্র করা কোন মতেই উচিত হবে না। সম্ভবও নয়।

সুরেশ বলিল, আমার বড় ইচ্ছে ছিল, তুমি এম. এ. পাশ কর।

আচ্ছা দেখা যাক। প্রাইভেট পড়েও তো এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া যায়। তাই না হয় চেষ্টা করব।

আমি আর কি বলব বল? জোর করে কিছু বলবার মত জোর কি আমার আছে?

অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমার পড়াশোনার চেয়ে তোমার পড়াশোনার আর তোমার স্বাস্থ্যের দাম অনেক বেশি।

এসব কথা তোমারই উদার মনের উপযুক্ত কথা।

সুরেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল।

লীলা বলিল, যাই দেখি রান্নাঘরের দিকে।

লীলা সোজা রান্নাঘরে না গিয়া নিজের ঘরে গেল।

সেখানে গিয়া তাহার বইগুলির শেলফের দিকে তৃষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এ বই—সে বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হইবে মনে করিয়া তাহার কান্না পাইতে লাগিল। নিজের বিছানার পরে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অবলা ঘরে ঢুকিয়া লীলাকে এই অবস্থায় দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল, কি হয়েছে দিদিমণি ?

না, কিছু হয় নি।

না, বলছিলুম কি যে রান্নার বেশি কিছু নেই। আমিই চড়িয়ে দি গে।

দাও গে।

৮

সুরেশের পরীক্ষা আসিয়াছে। লীলা সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দাদার সেবা করে। তাহার কাপড় জামা গুছায়। সময় মত স্নানাহারের ব্যবস্থা করে। রাত্রে বেশি পড়িতে বারণ করে।

পরীক্ষা আরম্ভ হইবার দিন সকাল হইতে দাদার পিছনে লাগিয়া থাকে। সময় মত রাঁধিয়া বাড়িয়া তাহাকে খাওয়াইয়া পরীক্ষা দিতে পাঠায়। পরীক্ষা শেষ হইলে লীলা জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হ'ল মোটের উপর ?

হয়েছে মন্দ না। তবে ফার্স্ট ক্লাশ বোধ হয় হবে না।

তা না হয় না হবে। তুমি সেজন্য ভেবো না। এত বড় অসুখের পরে এত পড়াশুনা করে শরীর যে খারাপ হয়নি, সে তো তোমারই জন্য।

বার বার ঐ এক কথা অমন করে বলো না। একজন কি আর একজনের শরীর ভাল করে দিতে পারে ? নিজেই ভাল হয়েছে, তাই মনে কর। এবার কিছুদিন একেবারে চুপ। কোন রকম পরিশ্রম করতে পারবে না। কোথাও যেতে পারবে না।

একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা—

সে হবে'খন। পরীক্ষার ফল বেরোবার পর। এখন একেবারে ঘুম।

এই কথা বলিয়া লীলা নিজের কাজে চলিয়া গেল।

একটু পরে নিজের ঘরে গিয়া লীলা দেখিল, তাহার ঘরের একটি জানালার পাশে একটি নীল রংএর এনভেলপ পড়িয়া আছে। অত্যন্ত কৌতূহল লইয়া লীলা খপ্ করিয়া এনভেলপখানি তুলিয়া লইয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িয়া ফেলিল। চিঠিখানিতে লেখা—

লীলা, অনেক দিন থেকেই তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব মনে করেছি। কিন্তু তোমার দাদার অসুখ, তারপর তাঁর পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে তুমি ব্যস্ত ছিলে বলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নি। তুমি বি. এ. পাশ করেছ জেনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমার সঙ্গে আমি একটু আলাপ করতে চাই। কিন্তু তোমার অনুমতি পাব কি ? পত্রের উত্তরের আশায় রইলাম। অজিত।

লীলা চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু তাহার চঞ্চলতা যেন বাড়িয়া গেল। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করিল। তাহার মা ও বাবার ফটোর দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। চোখে দু'ফোঁটা জল জমিয়া উঠিল। তারপর চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল এবং রাস্তায় গাড়ী ও মানুষের চলাচল দেখিতে লাগিল।

৯

সুরেশের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশ খবর জানিয়া বাড়ীতে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়াছে। লীলাকে বলিল, এই-নাও।

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, কোন ক্লাশ।

সেকেণ্ড ক্লাস। তবে নিশ্চয়ই উপরের দিকে নাম থাকবে।

যাক। পাশ করেছ। সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছ। উঃ কত বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। এক একটা পরীক্ষা এক একটা মস্ত ফাঁড়া। এখন পড়াশোনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে।

কিন্তু তোমার এম. এ. পড়াটা যে হ'ল না ?

ভাগ্যে থাকলে হবে। না হ'লে হবে না। কি দরকার আমার পাশ করবার। এইবার তুমি একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা দেখ। তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত।

১০

সুরেশ একটি চাকরি পাইয়াছে। বেতন খুব বেশি না হইলেও ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। আপাতত

তাহাদের ছোট সংসারের দৈনন্দিন অনটনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

দুই ভাই বোনের সুখের সংসার। সুরেশ নিয়মিত সময়ে অফিসে যায়, নিয়মিত সময়ে বাড়ীতে ফেরে। লীলা পড়াশুনা করে, ঘরকন্নার কাজ দেখে। ঠিকা ঝিও একটি রাখিয়াছে। এখন লীলা আর সর্বক্ষণ রান্নাঘরে থাকে না। অবলা রান্না শিখিয়া লইয়াছে, সেই রাঁধে। তবে মাঝে মাঝে ভাল মন্দ কিছু খাইতে ইচ্ছা হইলে লীলাই নিজে গিয়া হাজির হয় রান্নাঘরে। সুরেশ বাহির হইয়া গেলে সমস্ত দিন যেন কাটিতে চায় না। প্রাইভেট এম. এ'র জন্য পড়াশুনা আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতে বেশ খানিকটা সময় কাটে। সুরেশ একদিন বলিল, কলেজে ভর্তি হবে?

না, প্রাইভেটই পড়ি। কি হবে খরচপত্র বাড়িয়ে?

এখন আমি তোমার পড়ার খরচ দিতে পারব।

তা হোক। কিই-বা তোমার মাইনে? এখনই তোমার আর দায়িত্ব বাড়াতে হবে না।

সুরেশ অফিস হইতে ফিরিলে লীলা আগের মতই তাহার জন্য জলখাবার গুছাইয়া দেয়, চা করিয়া দেয়। পূর্বের মতই একসঙ্গে বসিয়াই চা খায়, গল্প করে। সুরেশ অফিসের গল্প করে। লীলা হয়তো পাড়ার কোন খবর থাকিলে তাহা শুনায়।

সুরেশের চেয়ে লীলা চার পাচ বছরের ছোট। কিন্তু কথা-বার্তায় যেন তাহারা সমান সমান। মেয়েদের বুদ্ধি বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি পাকে। তাহাদের কথাবার্তা সমান সমান হইলেও তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের মধ্যে একটু পরিবর্তন স্বভাবতই আসিয়া পড়িয়াছে। লীলার চাঞ্চল্য যেন কমিয়াছে। কথায় কথায় যেমন করিয়া হাসিয়া উঠিত, ঠিক তেমনটি যেন নাই। দাদাকে যেন একটু শ্রদ্ধা করিতে, সমীহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দাদার দিকেও একটু পরিবর্তন আসিয়াছে। এখন আর তুচ্ছ কথা লইয়া যখন তখন বোনের সঙ্গে বক বক করে না। বোনকে যখন তখন শাসন করিতে যায় না। কোন কথায় অবাধ্য হইলেও রাগ করে না।

উহাদের দুই জনেরই জীবনে এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন সমস্ত জগতের রং বদলাইয়া যায়। একটা নিগূঢ় আশা ও আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পল্লবিত হইতে থাকে। কথায়, কাজে ব্যবহারে এমন একটা অন্তর্নিহিত মাধুর্যের রেশ লাগিয়া থাকে, যা অদ্ভুত ও অনির্বচনীয়। এই সময়েই মানুষ নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। নিজের জীবনকে অপর একটি জীবনের সঙ্গে একত্রিত করিতে চায়। এই মনোভাবের উদ্ভব ও প্রসার উভয়ের নিকটই ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু লীলার গাম্ভীর্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ইহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। সুরেশের কথায় ও আচরণে কিন্তু এই নব-জীবনের উন্মেষ কখন কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

লীলা সব বোঝে। এখনই একটা নূতন দায়িত্বের বোঝা কাঁধে করা দাদার শরীর ও মনের পক্ষে শুভ হইবে কি না তাহা বুঝিতে পারে না। লীলা মনে মনে ভাবে, দাদার আর একটু উন্নতি হোক, তারপরই দেখিয়া শুনিয়া একটি বউদি আনিয়া ঘর সাজাইবে।

সুরেশও একেবারে নিশ্চিন্ত নাই। তাহার বন্ধু-বান্ধবের কাছে, আত্মীয় স্বজনের কাছে একটি সুপাত্রের জন্য খোঁজ খবর করে। তবে লীলাকে এখনও কিছু বলে নাই।

সুরেশ অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করে। তারপর কোন কাজ না পাইয়া যেন চঞ্চল হইয়া উঠে। কখনো কখনো একটু অন্যমনস্কও হয়। ছাদে গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। চারিদিকের আকাশ, বাতাস, পথ, বাড়ীঘরের মধ্যেও যেন একটা শূন্যতা অনুভব করিয়া উন্মনা হয়, বিভ্রান্ত হয়। কখনও বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ে যে কোন দিকে। লীলা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ দাদা?

'কোথাও না' বলিয়া সুরেশ বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে ওখানে খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে।

১১

একদিন অফিস হইতে বাড়ী ফিরিতেই সুরেশ লক্ষ্য করিল, একটি সুবেশা যুবতী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সুরেশ তখন কিছু বলিল না। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া চা খাইতে বসিয়াছে। লীলা চা ও খাবার গুছাইয়া দিতেছে। লীলা লক্ষ্য করিল, দাদা যেন একটু অন্যমনস্ক। পাশে বসিয়া নিজের জন্য চা ঢালিয়া লইয়া

এক চুমুক খাইয়া বলিল, তোমার চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে? না, আর একটু দেব?

'ঠিক হয়েছে' বলিয়া সুরেশ একটু অন্যমনস্কভাবেই বলিল, আমি বাড়ী ঢোকবার সময়ে দেখলুম, একটি মেয়ে বেরিয়ে গেল। ও কে?

লীলা বলিল, ও আমার মেয়ে-সাথী। কলেজে এক সঙ্গে পড়তাম।

সুরেশ বলিল, প্রায়ই আসে বুঝি?

না, প্রায়ই আসে না, তবে মাঝে মাঝে আসে। দুপুরে একা একা থাকি, ও এসে খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে। ওরও ইচ্ছে, প্রাইভেট এম. এ পরীক্ষা দেয়।

মেয়েটি কিন্তু বেশ, না?

পড়াশুনায় তেমন ভাল নয়। একবার বি এ ফেল করেছিল। তবে দেখতে শুনতে ভালই।

কি হবে আর পড়াশুনা করে? মেয়েদের চাকরি করা আমার ভাল লাগে না।

ওর মারও ইচ্ছে নয়। তবে, যতদিন বিয়ে থা না হচ্ছে একটু পড়াশোনা নিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে আসে আমার কাছে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে।

সুরেশ সংক্ষেপে বলিল, ও।

সুরেশ ও লীলা সেদিন দুজনেই একটু সংক্ষেপেই চা-পর্ব শেষ করিল।

১২

সেদিন সুরেশ অফিস যাইবার সময়ে লীলা বলিল, আজ বোধ হয় স্বাতী আসবে দুপুরের পরে। যদি আসে তাহলে আজ তাকে আমাদের সঙ্গে চা খেতে বলব ভাবছি।

সুরেশ নির্লিপ্তভাবে বলিল, তোমার ইচ্ছে হয়, বলো।

লীলা মনে মনে একটু হাসিল। সুরেশ অফিসে চলিয়া গেল। দুপুরের পর স্বাতী একখানি নোট বই হাতে করিয়া লীলার কাছে আসিল। খানিকক্ষণ সেই বই লইয়া আলোচনার পর লীলা বলিল, আজ ভাই একটু থেকে যাও। আমাদের সঙ্গে একটু চা খেয়ে যাবে। কোন আয়োজন নেই। একটু চা আর একটু মিষ্টি খেয়ে যেও, কেমন?

স্বাতী বলিল, আমাদের সঙ্গে মানে?

মানে আবার কি? দাদাও সে সময়ে অফিস থেকে ফিরবেন কি না। এ বাড়ীতে আমি আর দাদা ছাড়া আর কেউ নেই, তুমি ত জান।

তোমার দাদা থাকবেন?

তাতে আর লজ্জার কি আছে?

তোমার দাদার সঙ্গে আলাপই হয় নি কখনো। তবে হ্যাঁ, একদিন দেখেছিলুম বটে। আমি এখান থেকে বেরুচ্ছিলাম, আর তিনি বাড়ী ঢুকছিলেন।

আচ্ছা, ব'স একটু। বই-টই দেখ। আমি এখুনি আসছি।

এই কথা বলিয়া লীলা সম্ভবত চা ও খাবারের যোগাড় করিতেই বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই সুরেশ ফিরিল। স্বাতীর ঠিক সামনে পড়িয়া গিয়া কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সোজা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। লীলাকে বলিল, তোমার বন্ধু বাইরে বসে আছেন।

জানি, চট্ করে কাপড় চোপড় ছেড়ে নাও। তারপর ওর কাছে গিয়ে একটু ব'স। আমি আসছি একটু গুছিয়ে নিয়ে।

সুরেশ যেন একটু মুস্কিলে পড়িল। অপরিচিতার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ করার অভ্যাস তাহার নাই। তাছাড়া উহার মনের কোণে একটু সলজ্জ ইঙ্গিতও যেন অনুভব করিতেছিল। যাহা হউক সে যথাসম্ভব সহজভাবেই স্বাতীর নিকট গিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া, বলিল আপনিই বুঝি স্বাতী? বেশ, বসুন।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তারপরে সুরেশ বলিল আজ গরমটা একটু বেশি পড়েছে, না?

হ্যাঁ।

আবার দুইজনেই চুপ।

একটু পরেই সুরেশ বলিল, লীলার কাছে পড়াশুনা করছিলেন, বুঝি? এটা কার নোট?

পি, ভৌমিকের।

মিলটন পড়তে আপনার ভাল লাগে?

একটুও না। নেহাত পরীক্ষার দায়ে পড়া।

এই ধরণের কয়েকটি কথা কিছুক্ষণ পর পর তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইবার পর লীলা আসিয়া বলিল, দাদা, তোমরা এস। চা ভিজিয়েছি।

উহারা উঠিয়া গিয়া চায়ের টেবিলে বসিল। স্বাতী উঠিয়া গিয়া লীলাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

লীলা বলিল, তুমি ব'স। ভারি তো আয়োজন। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।

তথাপি স্বাতী একেবারে বসিয়া থাকিতে পারিল না। চিনি দুধ আগাইয়া দেওয়া, খাবারের প্লেট সরাইয়া দেওয়া, লীলাকে এটা ওটা খাইতে অনুরোধ করা, ইত্যাদি নানা কাজে তৎপর হইয়া উঠিল। কথাবার্তা দুই চারটা যেন লীলার জন্যই রহিল।.. সুরেশ খাইবার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় দুই-একবার স্বাতীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

চা-পর্ব শেষ হইতেই স্বাতী যেন একটু তাড়াতাড়িই বাড়ী ফিরিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। লীলার অনুরোধ সত্ত্বেও সে আর বিলম্ব করিতে চাহিল না। একটু দ্রুতপদেই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ লীলাকে বলিল, ও এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন? তুমি কিছু বলেছ?

কখন কি বললাম?

আজকের কথা বলছি নে।

কি আবার বলব?

না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। মনে হ'ল যেন ও আমার সামনে লজ্জা পাচ্ছে।

তা পেতে পারে। সবাই তো তেমন সপ্রতিভ নয়।

তা হবে। বেশ নম্রই মনে হ'ল।

একদিন দেখে বা একবার দেখে কি কারো স্বভাব বোঝা যায়?

তা বটে।

সুরেশ একটু যেন অন্যমনস্কভাবে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ

অসাময়িক

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এখনি কি হায়, নিতে চাও কেড়ে
যা' কিছু করেছ দান?—
হয়নি সন্ধ্যা—তবু বার বার
সন্ধ্যার আহ্বান!
আলোকে কালোর জাগে ইঙ্গিত,
বাজে নেপথ্যে বিদায়ের গীত!
এ রাঙা গোধূলি এখনি করিবে
তিমির-তড়াগে স্নান?
ভগবান! ভগবান!

দুটি আঁখি ভরি' দেখিবারে দাও—
দেখার যা' কিছু আছে,
তিমির-রাত্রি আসিবে যখন—
রাখিয়ো বুকের কাছে।
ক্ষুধার অন্ন করি' আহরণ
দ্বার হতে ফিরে গেল যৌবন!
উথল সুধার সায়রের তীরে
আজো বসি' কাঁদে প্রাণ।
ভগবান! ভগবান!

এ তো ক্ষণিকের গোধূলি-বিলাস!
তারপর—আঁধিয়ার!
দাও অবসর—বিদায়ের সুর
ধীরে ধীরে সাধিবার।

আর কিছু দিন বেশী কাঁদা-হাসা,
কুড়াই মমতা আর ভালোবাসা;—
তার পর দিয়ো সম্ভ্রমভরে
করিবারে প্রস্থান।
ভগবান! ভগবান!

বোঝার উপর শাকের আঁটির
প্রয়োজন আর নাই?—
এখনি কি প্রভু, কোল থেকে মোরে
ঠেলিয়া ফেলিবে তাই?
যতো সে খেল্‌না দিয়েছিলে আহা,
একসাথে কেড়ে নিতে চাও তাহা?—
এক ফুৎকারে দিনের আলোর
করিবে কি অবসান?
ভগবান! ভগবান!

দীপ্ত দিবসে নিশার সুপ্তি!
চিত্তে জাগিছে ভীতি!
মৃত্যু-মহলে ব'সে গাহি তাই
জীবনের জয়গীতি।
তরী আছে বাঁধা,—ধীরে—অতি ধীরে
উতরিব গিয়ে ওপারের তীরে;—
কেন তবে ত্বরা? দাও করিবারে
জীবনের মধুপান!
ভগবান! ভগবান!

প্রবাদ-প্রবচনের অন্তরালে সামাজিক তথ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলায় প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহের বই বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের অর্থ বা উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই। কালক্রমে হইবে আশা করি। এই সব প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে কবে কোন সাহিত্যিক কোথায় ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও লিপিবদ্ধ হইবে। এখন দরকার প্রবাদ-প্রবচনের মায় ইহাদের রকমফের বা variationsএর সংগ্রহ, এবং ইহাদের অর্থ, প্রয়োগ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাহার প্রকাশ।

(১) সম্প্রতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় "শম্ভুচরণ দত্ত মহাশয়কে" (তারাশঙ্কর বাবুর ভাষা ব্যবহার করিতেছি) আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর চলিয়া গেলে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। কথায় কথায় শম্ভুর মা বলিল যে তারাশঙ্করবাবুর এক বইয়ে পড়িয়াছি "ভাদ্র মাসের ১৫ দিন চাষীর, ১৫ দিন মুচির," কিন্তু আমরা ত বলি ভাদ্রমাসের '১৫ দিন চাষার, ১৫ দিন ধোবার,' ওঁদের দেশে কি মুচির প্রাধান্য? কেন এই পার্থক্য?

কথাটা শুনিয়া অবধি ভাবিতে লাগিলাম। এই বিষয়ে আমাদের মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহাই নিম্নে দিলাম। আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার পূর্ব্বে কতকগুলি তথ্য দেওয়া দরকার। সেগুলি দিলাম। যথা :—

	মুচিদের সংখ্যা (১৯৩১ সালে)	মোট লোকসংখ্যা।
সমগ্র বঙ্গে—	৪, ১৪, ২২১ জন	৫, ১০, ৮৭, ৩৩৮ জন
বীরভূম—	৪৫, ৩৯৫	৯, ৪৭, ৫৫৫
হুগলী—	১৭, ৭৪৬	১১, ১৪, ২৫৫
হাওড়া—	৬, ৪৩৫	১০, ৯৮, ৮৬৭
২৪ পরগণা—	৩৩, ৪৩৪	২৭, ১৩, ৮৭৪
কলিকাতা—	১২, ৯৪৩	১১, ৯৬, ৭৩৪
শেষ ৩ জেলায় কলিকাতা লইয়া	৭০, ৫৫৮	৬১, ২৩, ৭৩০

কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, ও ২৪ পরগণার সহর অঞ্চলে বাহির হইতে, দেশের অন্যান্য স্থান হইতে ব্যবসায়ের খাতিরে মুচির আসা সম্ভব। এজন্য হয়ত এই কয় জেলায় মুচির সংখ্যা খুব বেশী। এ বিষয়ে একটা আঁচ হইতেছে মুচিদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের অনুপাত।

নিম্নে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে মুচিদের স্ত্রী পুরুষের অনুপাত দিলাম।

প্রতি ১,০০০ পুরুষে স্ত্রীলোক
(মুচিদের মধ্যে)

		সমগ্র বঙ্গের তুলনায় বাড়িতে (+) বা কমিতে (−)
সমগ্র বঙ্গে	৮৬৯	
বীরভূম	১, ০২২	+১৫৩
হুগলী	৯৬২	+ ৯৩
হাওড়া	৬৮১	− ১৮৮
২৪ পরগণা	৮৩৮	− ৩১
কলিকাতা	২৪২	− ৬২৭

বুঝা যায় কলিকাতা ও হাওড়ায় বহু পুরুষ মুচি বাহির হইতে আসিয়াছে। আর বীরভূম, হুগলী ও ২৪ পরগণায় মুচিরা ওখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা।

এইবার লোক-সংখ্যার মধ্যে মুচিদের অনুপাত দেখাইব।

	শতকরা
সমগ্র বঙ্গে	০·৮১
বীরভূম	৪·৭৯
হুগলী	১·৫৯
হাওড়া	০·৫৮
২৪ পরগণা	১·২৩
কলিকাতা	১·০৮

মুচিরা বাংলার পল্লী অঞ্চলে চামড়া ছাড়াইয়া মাংস লাগিয়া থাকিলে তাহা চাঁচিয়া, চামড়ার উপর চুন ও নূন ছড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। এজন্য কড়া রৌদ্র দরকার। এই প্রকার শুকান চামড়াকে কাঁচা ট্যান্ করা বলে। এই কাঁচা ট্যান্ করা চামড়া গরুর গাড়ী

করিয়া সহরে, কলিকাতায় চালান আইসে। কোন কোন মুচি জুতা তৈয়ারী বা জুতা সেলাই করিয়া দিন গুজরাণ করে—তবে পল্লী অঞ্চলে এইরূপ মুচির সংখ্যা খুবই অল্প। পক্ষান্তরে সহর অঞ্চলে কাঁচা চামড়া বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহাও রৌদ্রে দিয়া শুকাইবার পক্ষে অসুবিধা আছে। ঘনবসতি পূর্ণ স্থানে দুর্গন্ধের জন্য প্রতিবেশীরা আপত্তি করে। জুতা তৈয়ারী বা জুতা সেলাইয়ের, এখন আবার চামড়ার সুটকেশ প্রভৃতি তৈয়ারীর ব্যবসা খুব জোর চলে।

দেখা যায় বীরভূমে মুচিদের অনুপাত খুব বেশী। বীরভূমে গো-মড়ক অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী জেলার চেয়ে বেশী। এইটী তান্ত্রিক সাধনার একটী কেন্দ্র—বহু লোকে পাটা (বলি না দিয়া) মারিয়া খায় ও ইহার ছাল মুচিদের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করে। মুচিদের প্রয়োজনে উপরোক্ত রূপ প্রবাদ সৃষ্টি হইতে পারে ও হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

আমরা তারাশঙ্করের গ্রাম লাভপুরে গিয়াছি ও দুই চারি দিন থাকিয়াছি। লাভপুর বা তাহার আশে পাশে ২।৩ মাইল ঘুরিয়া দেখিয়াছি। ঐ অঞ্চলে মুচিদের খুব প্রাধান্য (সংখ্যার দিক থেকে) নাই; অনেক খুঁজিলে তবে "জুতি সেলাই" পাওয়া যায়। "ভাদ্রমাসের ১৫ দিন চাষীর ১৫ দিন মুচির" কথাটী তারাশঙ্করের সৃষ্ট হইতে পারে না। তিনি স্থানীয় প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

শম্ভুর মা কলিকাতার মেয়ে। আমরাও এই অঞ্চলের—ভাগীরথী তীরের বাসিন্দা। অই অঞ্চলের প্রবাদ ভাদ্র মাসের ১৫ দিন চাষার, ১৫ দিন ধোবার। এইরূপ হইবার হেতু অনুসন্ধান করা যাউক। ধোবাদের সম্বন্ধে অনুরূপ তথ্যাদি এইরূপ। যথা—

	১৯৩১ সালে ধোবার সংখ্যা।	লোকসংখ্যা
সমগ্র বঙ্গে—	২,২৯,৬৭২ জন	৫,১০,৮৭,৩৩৮ জন
বীরভূম—	১,৭৬২ „	৯,৪৭,৫৫৪ „
হুগলি—	৪,২৯৪ „	১১,১৪,২৫৫ „
হাওড়া—	৯,৫১৭ „	১০,৯৮,৮৬৭ „
২৪ পরগণা—	১৪,৫৭৭ „	২৭,১৩,৮৭৪ „
কলিকাতা—	১১,২৫২ „	১১,৯৬,৭৩৪ „
কলিকাতা লইয়া শেষ ৩ জেলা	৩৯,৬৪০ „	৬১,২৩,৭৩০ জন

এইবার বিভিন্ন অঞ্চলে ধোবাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত দিলাম।

	প্রতি ১,০০০ পুরুষে ধোবাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত	সমগ্রবঙ্গের তুলনায় বাড়তি + বা কমতি –
সমগ্র বঙ্গ	৯০০	
বীরভূম	৯৪৩	+ ৪৩
হুগলী	৮১৯	– ৪১
হাওড়া	৮৩৬	– ৬৪
২৪ পরগণা	৭৫১	– ১৪৯
কলিকাতা	৫০৮	– ৪৯২

দেখা যায় কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলায় বাহির হইতে বহু ধোবা আসিয়া কাপড় কাচিতেছে।

এইবার লোকসংখ্যার মধ্যে ধোবাদের অনুপাত দেখাইব।

	শতকরা
সমগ্র বঙ্গ	০·৪৫
বীরভূম	০·১৮
হাওড়া	০·৮৭
২৪ পরগণা	০·৫৩
কলিকাতা	০·৯০

বাংলার পল্লী-অঞ্চলে গরীবরা নিজেরাই কাপড় কাচে, সপ্তাহের একদিন ক্ষার দিয়া কাপড় সিদ্ধ করিয়া নিজেরাই কাচে। পূর্ব্বে কলাগাছের বাস্না রৌদ্রে শুকাইয়া রাখা হইত। ঐ বাস্না ও ফাল মাঝে মাঝে পোড়াইয়া জলে গুলিয়া ক্ষার বাহির করা হইত। এই ভাবে কাপড় কাচিত। যাঁহারা মধ্যবিত্ত তাঁহারা নিত্য জলে কাপড় কাচিলেও মধ্যে মধ্যে ধোপার বাড়ি কাপড় দিতেন। এজন্য নাপিতকে যেমন বলা হয় 'নর-সুন্দর', ধোবাকে বলা হয় "সভা-সুন্দর"; অর্থাৎ সভায় উপস্থিত হইবার যোগ্য কাপড়-চোপড় ফরসা করিয়া দেয়। সহর অঞ্চলের লোক বেশীর ভাগই ধোবার বাড়িতে কাপড় কাচিতে দিতেন, কারণ নিজেরা ক্ষার ফুটাইয়া কাপড় কাচিবার অসুবিধা, সময়ের অভাব, আর্থিক স্বচ্ছলতা। আরও একটী কারণ সহর-অঞ্চলে কাপড়-চোপড় শীঘ্র শীঘ্র ময়লা হয়। সাধারণতঃ সপ্তাহে সপ্তাহে কাপড় ধোবার বাড়ি দেওয়া হয়। যাঁহাদের বেশী প্রস্থ কাপড়-চোপড় নাই, বর্ষাকালে ধোপাদের কাপড় শুকাইবার

অসুবিধা হেতু কখনও কখনও একমাসও দেরী হইত, তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। ধোবাকে কাপড়ের তাগাদা দিলে বলিত "এই আসি"। এজন্য কথায় বলে 'ধোপার আসি', অর্থাৎ delay for an indefinite period.

হাওড়া, হুগলী, ২৪পরগণা জেলার পল্লী-অঞ্চলের লোক এখনও নিজেরা কাপড় কাচে। এই তিন জেলায় সহরে লোকের সংখ্যা দেওয়া হইল।

সহর অঞ্চলের লোক-সংখ্যা (১৯৩১)

হাওড়া—	২,৫ ,২২০
হুগলী—	২,০৩,৫৯৩
২৪ পরগণা—	৫,৩৮,৬০৯
	৯,৯৭ ৪২২
কলিকাতা—	১১,৯৬,৭৩৪
সর্ব্ব-মোট :—	২১,৯৪,১৫৬ জন

অর্থাৎ এই কয়স্থানের মোটজনসংখ্যার শতকরা ৩৫৮ জন সহর-বাসী। বীরভূম জেলার সহরবাসীর সংখ্যা হইতেছে ২০,৮৭৭ জন, অর্থাৎ জেলার লোকসংখ্যার শতকরা ২'২ জন।

বীরভূমে ধোবার সংখ্যা, অনুপাত ও সহরে লোকের অনুপাত কলিকাতা অঞ্চল অপেক্ষা খুবই কম। এজন্য ভাদ্রমাসে রৌদ্রের উপকারিতা মুচিদের পক্ষে যতটা দরকার ধোবাদের পক্ষে ততটা নহে। অন্যদিকে কলিকাতা অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া সহর অঞ্চলে, যেখানে 'ফতো বাবুর' সংখ্যা বেশী ও যেখানে ফরসা কাপড় পরিবার প্রয়োজনীয়তা বেশী—সেখানে ধোবার পক্ষে ভাদ্র মাসে রৌদ্রের প্রয়োজনীতা বেশী। এজন্য এই অঞ্চলে প্রজাদের রকমফের হইয়াছে।

একই প্রবাদের অঞ্চলভেদে রকমফের হইবার সম্ভাব্য কারণ বুঝা গেল। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে এই প্রবাদের কিরূপ রকমফের আছে জানি না।

প্রথম দরকার প্রবাদ-সংগ্রহ। তারপর অঞ্চলভেদে ইহার রকমফের বা variants সংগ্রহ করা। এইরূপ সংগৃহীত তথ্য থাকিলে তবে ত তাহার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা হইবে।

(২) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাংলা ১২০৬ সালে ৬০ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান হয়েন ইং ১৭৭২ সালের (=১১৭৯ সালের) পর। সুতরাং আমরা যে প্রচলন লইয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহার উৎপত্তি ১১৮০ হইতে ১২০৬এর মধ্যে। লোকে কথায় বলে :—

"সিংহের মধ্যে সিংহ হ'চ্ছে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ"

এই প্রবচনের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপে। উলার বারোয়ারী পূজা খুব জাঁকজমকের সহিত হইত, গুপ্তিপাড়ারও খুব ধূমের বারোয়ারী পূজা হইত। দুই গ্রামের মধ্যে রেষারেষি ছিল। যাহাতে আমাদের গ্রামে বারোয়ারী পূজা খুব ধুমের হয়—এজন্য গ্রামস্থ কয়েকজন ব্রাহ্মণ চাঁদা আদায় করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে, গঞ্জে, কলিকাতায় আসিতেন। উলার ব্রাহ্মণেরা 'পাগল' সাজিতেন, চাঁদা দিতেই হইবে, নাছোড়বন্দা। একবার উলার বারোয়ারীর দুর্গা প্রতিমা খুব উঁচু করা হইয়াছে—গরুর গাড়ী করিয়া টানিয়া আনিতে হইবে। কুমার হাতে নগদ টাকা না পাইলে প্রতিমা ছাড়িবে না, অথচ বারোয়ারী ফণ্ডে চাঁদা তেমন ওঠে নাই। আবার প্রতিমা বারোয়ারী তলায় না আসিলে খুচরা চাঁদাও পাওয়া যাইবে না। উলার "পাগলরা" চাঁদা সাধিতে ব্যস্ত। শান্তিপুর হইতে কিছু দূরে ভালুকা বা ভাল্‌কোর সিংহবাবুদের বাড়িতে চাঁদা সাধিতে গেলেন 'পাগল'রা—বলিলেন যে এবার দ্বিগুণ চাঁদা দিতে হইবে। সিংহ মহাশয়রা বলিলেন যে আমাদের নিজেদের বাড়িতে দুর্গোৎসব—আমরা ভিন্নগাঁয়ের বারোয়ারীতে বরাবর যাহা দিয়া থাকি তাহাই দিব—বেশী দিব না। অনুনয়-বিনয়ে কিছু ফল হইল না। 'পাগলরা' মনে মনে চটিল। খবর পাওয়া গেল যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কলিকাতায় যাইতেছেন নৌকা করিয়া, বজরা শান্তিপুরের ঘাটে বাঁধা হইয়াছে। পাগলরা গঙ্গাগোবিন্দকে ধরিবার জন্য শান্তিপুরের ঘাটে ছুটিল। ভোরবেলা যখন সিপাহী-সান্ত্রীরা প্রাতঃকৃত্য করিতেছে, ফাঁকা পাইয়া কয়েকজন 'পাগল' হাতে দড়ি লইয়া দেওয়ানজীর নৌকায় হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল ও 'ধরেছি! ধরেছি' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল ও আনন্দে লাফাইতে লাগিল। দেওয়ানজীর লোকেরা হাঁ! হাঁ! করিয়া পাগলদেয় বাধা দিতে গেল। দেওয়ানজী গোলমাল শুনিয়া বজরার বাহিরে আসিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি ? পাগলরা বলিল যে এই বার মা দুর্গার বাহন সিংহ পলাইয়াছে, মাকে কুমারবাড়ি হইতে আনিতে পারিতেছি না, শুনিলাম যে বজরার মধ্যে একটা সিংহ আছে, তাহাকে এই দড়ি দিয়া (হাতের দড়ি দেখাইলেন) বাঁধিয়া লইয়া যাইলে মা আসিবেন। আমরা এইবার সিংহকে ধরিয়াছি, সেইজন্য আনন্দে সকলকে জানাইতেছি। দেওয়ানজী বলিলেন—কত টাকা পাইলে তাঁহারা সিংহকে ছাড়িয়া দিবেন ? পাগলরা একটা টাকার অঙ্ক বলিলে দেওয়ানজী তদপেক্ষা বেশী টাকা দিলেন। পাগলরা খুব খুশী ; আনন্দে বলিতে লাগিল—'সিংহের মধ্যে সিংহ হচ্চে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ"। ইহাতে ভালুকার সিংহবাবুদের প্রতি প্রচণ্ড শ্লেষ আছে ও দেওয়ানজীকেও বাড়ান আছে। ভালুকার সিংহবাবুরা দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ—ইহারা কুলীন নহেন ; সন্মৌলিক। দেওয়ানজী উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ; উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে সিংহ বিশেষ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দের বংশ মহাকুলীন ; দেওয়ানজী বংশমর্য্যাদায় খুব উচ্চ।

"সিংহের মধ্যে সিংহ হচ্ছে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ" ভাষার আরমারে "সিংএর মধ্যে সিং হোচ্ছে গঙ্গাগোবিন্দ সিং" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আকারে সহজে বুঝা যায় ইহার অর্থ কি, মর্ম্ম কি ?

এই বিষয়ে প্রবাদ-প্রবচনের অন্তরালে যে সব সামাজিক তথ্য লুক্কাইত আছে ; সম্যক আলোচনা হওয়া দরকার।

ভারতে ধর্মসাধনা

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ধর্ম বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বৈদিক ধর্মই যে হিন্দু ধর্ম, তা ঠিক নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতে অবৈদিক ও সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান ছিল, সুতরাং বৈদিক ও অবৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়েই হিন্দু ধর্ম। খৃষ্ট থেকে যেমন খৃষ্টীয় ধর্মের উৎপত্তি, তেমনই হিন্দুধর্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম নয়। ভারতীয় বা হিন্দু ধর্ম গঠিত হয়েছে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ধর্মের সমবায়ে। সুতরাং এ ধর্ম অপৌরুষের। সর্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয়ে এই ধর্মের উৎপত্তি। ভারতকে হিন্দ্ বলা হয় ; এই হিন্দ্ থেকেই হিন্দু। কাজেই হিন্দুধর্ম বলতে কোনো বিশিষ্ট জাতির ধর্ম বোঝায় না, উহা ভারতেরই ধর্ম। ভারতের ধর্মসাধনার এই সমন্বয়কে মনীষী কবীর বলেছেন ভারতের এক বিশিষ্ট তপস্যা। এই জন্য তার পন্থকে বলা হয় ভারতপন্থ। আধুনিক কালের মহাপুরুষরাও এই ভারতীয় তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে গেলেন ; এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, বহুকাল থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের সেই সাধনার ধারা অব্যাহতগতিতে চলেছে।

ভারতীয় ধর্মের দুইটি দিক—একটি কর্মকাণ্ড প্রধান, ও আর একটি ভক্তিপ্রধান। কর্মকাণ্ড বৈদিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে ভক্তিধর্ম এসেছে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি অবৈদিক ভাগবতসূত্র থেকে। গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতি বহিরাগত জাতি ঐ শেষোক্ত দলের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বৈদিক কর্মকাণ্ড। বিভিন্ন ধর্মের সংশ্রবে এসে ভারতীয় মননশক্তি এক নূতন দিকে ধাবিত হয়, তাতেই বেদান্তবাদের সৃষ্টি। এই উদার ধর্মের উৎপত্তি হল বহু সংস্কৃতির সংযোগে। এরই নাম হল সার্বজনীন হিন্দুধর্ম ; এই ধর্মের প্রাণ হচ্ছে উদারতা।

ভারতীয় ধর্মের স্বরূপলক্ষণ নিম্নোক্ত উপনিষদের শ্লোক-সমূহেই সুস্পষ্ট,—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় : সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ॥
এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে
সন্নিবিষ্টঃ ॥
সম্প্রাপ্যৈনং ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ
প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরী যুক্তাত্মানঃ সবমেবাবি-
শন্তি ॥

এক ঈশ্বর সর্বজীবে আচ্ছাদিত, তিনি সর্বব্যাপক এবং সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা। বিশ্বের সমস্ত কর্মের কর্তা বিশ্বাত্মা এই ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে সর্বদা প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। ঋষিগণ তাঁকে পেয়ে কৃতাত্মা; আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা পরম শান্তিলাভ করেন; সর্বত্র গমনশীল ঈশ্বরকে তাঁরা সকল স্থানে প্রাপ্ত হয়ে অচঞ্চল থাকেন এবং আত্মযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট হন।

এই ঈশ্বরকে জানতে হলে আত্মাকে জানতে হবে। এই আত্মা 'সত্যেন লভ্যস্তপসা।' আত্মাকে জানতে হলে সত্যাশ্রয়ী ও তপস্বী হতে হয়। আত্মজ্ঞান লাভ হলে সকলের প্রতি আসে সমদৃষ্টি; এতে বিভেদ হয় চিরতরে নির্মূল। আপন-পর ভেদ বিদূরিত হওয়ায় হিংসা দ্বেষ ধ্বংস হয়ে যায়, আর সকলের সঙ্গে স্থাপিত হয় প্রেমের সম্বন্ধ। এই হচ্ছে ভারতীয় ধর্মের স্বরূপ।

এই ধর্ম বলে দিয়েছে,—

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি সমীক্ষে॥

ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ॥

সকল জীবকেই মৈত্রীর দৃষ্টিতে দেখতে হবে; আর মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই। মানবদেহই যথার্থ দেবমন্দির; এই মন্দিরকে নিগ্রহ করলে ধর্ম-কর্ম সমস্তই ব্যর্থ। এই ধর্ম, এই সত্য, এই শাশ্বত। সুদূর অতীতের আর্যগণ থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, মহাত্মাগান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই মৈত্রী ও অহিংসার বাণী কতভাবে বলে গেছেন। ভারতবাসীর নাড়ীর সঙ্গে এই সত্য যুক্ত হয়ে আছে; ভারত তা কোনো দিন ভুলবেনা।

আজ দেশে দেশে যুদ্ধ; একজনের অন্নের গ্রাস আর একজনে কেড়ে নিচ্ছে। এতে যে অধর্মেরই সৃষ্টি হয় তা ভাগবতকার বলে গেছেন বহু পূর্বে;

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।

অধিকং যোঽভিমন্যতে স স্তেনো দণ্ডমর্হতি। ৭।১৪।৮

যতটুকু জীবের প্রয়োজন, ততটুকুই অন্নের প্রতি স্বত্ব রয়েছে মানুষের; তা থেকে যে অধিক চায়, সে চোর; সে শাস্তি পাবার যোগ্য। ধর্মের এই মহান্ নির্দেশে অপরের স্থান, অপরের রাজ্য অপহরণ করার কথা কল্পনাও করেনি ভারত। অহিংসাই তার শাশ্বতনীতি—অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। সেই বিশ্বদেবতার পূজায় অহিংসারূপ পুষ্পেরই প্রয়োজন, আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হল তাঁর অন্যতম পুষ্পাঞ্জলি।

ভারতধর্মের যে পরিচয় দেওয়া হল তা শুধু কথায় পর্যবসিত নয়, ভারতবাসী মনে প্রাণে তা গ্রহণ করেছে। কবে সেই সুদূর অতীতে ঋষিরা যে উদার ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, ভারতবাসী তা থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি। বাইরে থেকে যে-সব সাধক এসেছেন ভারতে, তাঁরাও সকলের সঙ্গে মিলে মিশে সাধনা করে গেছেন। এই মিলনের ফলে গড়ে উঠেছে অপূর্ব ধর্ম-সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি। এ-সম্বন্ধে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন যা বলে গেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'সমুদ্রে নদীর মত আগত সব ধর্মই ভারতে সাদরে গৃহীত হয়েছে। কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বকেই ভারত বাধা দেয় নাই বা নষ্ট করে নাই। সকলে মিলিয়া পাশাপাশি সাধনা করিয়াছে। ইনকুইজিশনের (inquisition) ইতিহাস আমাদের দেশের নয়। তাহা পশ্চিম দেশের। পশ্চিমই আমাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার হইতে শিখিয়াছে। উৎপীড়িত একদল খৃষ্টান প্রথম শতাব্দীতে দেশ ছাড়িয়া এখানে আসেন এবং সাদরে গৃহীত হন। রাজারা তাঁহাদের ভূবৃত্তি দেন। উৎপীড়িত পারশী এখানে আদর ও আশ্রয় লাভ করেন। মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বেই দেখা যায় মুসলমান সাধকের দল ভারতে আসিয়া সমাদর ও আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। জৈনদের পুরাতন প্রবন্ধে পাই—অনুপমা দেবী নিজের ব্যয়ে ভারতের নানা স্থানে মুসলমান উপাসকদের জন্য আশিটি মসজিদ তৈয়ারী করিয়া দেন' (দ্রষ্টব্য, ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, পৃষ্ঠা ১১)।

মুসলমান ধর্মের মধ্যেও উদারতা রয়েছে, কোরানের বাণী থেকেই তা সুস্পষ্ট। ইসলামের লক্ষ্য—মৈত্রী ও শান্তি—অভিবাদনকালে মৈত্রী ও শান্তির বাণী উচ্চারণ করার নির্দেশ আছে এই পবিত্র গ্রন্থে। কোরান বলেছেন, পূর্ববর্তী সত্যকে সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হবে; ঈশ্বর প্রকৃতি ও মানুষের যে স্বভাব রচনা করেছেন তাই সত্য ধর্ম; অসাধু ও অশুভ আচরণের প্রতিদানে শুভ ও কল্যাণ

সম্পাদন। ইসলামের এই উদারতা প্রকাশ করেছেন অনেক মুসলমান সাধক ভারতে এসে। এঁদের মধ্যে নাম করা যায় আজমিরের মৈনুদ্দিন চিশ্‌তী, পাঞ্জাব প্রদেশের সাধকশ্রেষ্ঠ হুজবেরী, পাকপত্তনের সাধক করীমুদ্দীন, শকরগঞ্জ, সুরবর্দী সম্প্রদায়ের গুরু বাহাউদ্দীন জাকারিয়া প্রভৃতি। এ ছাড়া বহু সুফী সাধক এই ভারতকেই কার্যতঃ বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের সাধনভূমি হিসাবে। সুফীদের ধর্ম একাধারে প্রেমমূলক এবং অন্যদিকে উদারমতপ্রসারক। মুসলমান রাজারাও যে ভারতধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। মহম্মদ গজনী ভারত আক্রমণ করেন, অথচ তাঁর সভায় সংস্কৃতশাস্ত্রের যে কত গৌরব ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত আলবিরুনীর পরিচয়ে। সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপির প্রচলন করেছেন অনেক মুসলমান রাজা; হিন্দুদের জন্য মঠ, মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেবার নিদর্শনও নিতান্ত অল্প নয়। কত মুসলমান রাজা নিজেদের সভাপণ্ডিত দিয়ে হিন্দু গ্রন্থ রচনা করিয়েছেন। আবার হিন্দুরা মুসলমান রাজাদের জন্যও প্রাণপাত করেছে। মানসিংহ তো আকবরের ডান হাত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলালের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সুতরাং বলা যায়, মুসলমানরা বাইরে থেকে এলেও ভারতের উদার ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানের এই যুক্তসাধনা ভারতকে শক্তিশালী ও গৌরবময় করে তুলেছিল। যারা ভারতে এসে অত্যাচার করে, তারা হল তুর্কি। এই তুর্কি কেবল ভারতেই অত্যাচার করেনি; পারশ্য প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যও তুর্কিদের হাতে লাঞ্ছিত হয়।

ভারতে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে কবীর, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতির অবদান অনস্বীকার্য। এঁরা ছিলেন প্রায়ই নিরক্ষর; কিন্তু কী গভীর তাদের জ্ঞান! ভারতের সত্যধর্মকে আত্মসাৎ করে তাঁরা জগৎবাসীকে কত মূল্যবান্ কথা শুনিয়ে গেছেন। তাঁদের ধর্ম ছিল বিশ্বজনীন—সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও দেখতে পাওয়া যায় না। 'জাত' কথাটার মূল্য তাঁরা কোন দিন দেন নি। তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন, 'হিংদ তুরুক নহোইবা সাহিব সেতী কাজ' (ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা)। যদি ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, তবে তার হিন্দুত্বেই বা কি, আর মুসলমানত্বেই বা কি। আসল কথা হল ভগবানকে কি করে পাওয়া যায়। দাদূ তো স্পষ্টই বলেছেন, 'না হম হিংদু হোহিং গে না হম মুসলমান। ষট্‌দর্শন মেঁ হম নঁহী হম রাতে রহিমান (ঐ)। আমি হিন্দু বা মুসলমান কিছুই হতে চাই না। সড়দর্শনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি কেবল চাই ঈশ্বরকে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা কেবল তর্ক নিয়েই থাকেন এবং নিজেজের মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মাঝে মাঝে অনর্থেরও পুষ্টি করেন। এঁদের উদ্দেশে বলা হয়েছে 'পঢ়ি পঢ়ি তো পথর ভরা লিলি লিলি ভয়া জো ঈঁট' (ঐ)। অসংখ্য শাস্ত্র পড়ে পড়ে পণ্ডিতরা পাথর হয়ে গেছেন, আর তাঁরা যা লিখেছেন, তা এক একটা ইটের মত শক্ত—একেবারে নীরস। ধর্মের ক্ষেত্রে এঁরা যে কত উদার হয়েছিলেন তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতেই সপ্রমাণ,—

কালা মুহঁ করি করদকা দিল তেঁ দূর নিবার।
সবহী সুরত সুবহানকী মুল্লা মুরুখন মার॥ (ঐ)

তোমার মন থেকে হিংসার ছুরি দূর করে দাও; ওগো মূর্খ মোল্লা, সকলেই সেই ঈশ্বরের মূর্তি, কাকেও মেরো না।

যেমন ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে, তেমনই ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমানের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'হোরান জরিপ' নামক পুঁথির আরম্ভাংশ ভাঙ্গা সংস্কৃতে। ভক্ত দাদূ মুসলমান হলেও গ্রন্থের প্রতি অঙ্গের প্রারম্ভে আছে ভাঙা সংস্কৃত; নৈষধের অনুবাদ করেছিলেন ১৭৪৩ সালে পিহানীর রাজা আকবর আলী খাঁ; দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের সর্দার নসরুল্ল খাঁ সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন; দ্বাদশ শতকে রচিত আবদুল রহমনের অপভ্রংশ-কাব্য 'সন্দেশ-রাসক' উল্লেখযোগ্য; এই গ্রন্থের শেষে আছে 'জয়উ অণাই অণংতু'—অনাদি অনন্তের জয় হোক, মহম্মদ্ জায়সী ও আলাওল 'পদ্মাবতী' রচনা করেন; পরম বিদ্যোৎসাহী হোসেনশাহের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন; রুকনুদ্দিন বারবকসাহের দরবারে শিবসেন আয়ুর্বেদের টীকা লেখেন। হুসেন সাহের পুত্র নসরাতে সেনাপতি জুটি খাঁ মহাভারতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; নশরত শাহের পুত্র ক্ষীরোদ শাহের উৎসাহে শ্রীকর নন্দী বিদ্যাসুন্দর লেখেন, মুসলমান কবি শাহ বিরিদত্ত এক বিদ্যাসুন্দর কাব্য লেখেন; চট্টগ্রাম-নিবাসী জ্ঞানপ্রদীপ তান্ত্রিক যোগগ্রন্থের লেখক বৈষ্ণব কবি

সৈয়দ সুলতান নবীবংশের বারজন নবীর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব ও শ্রীকৃষ্ণও উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান আছেন; এঁদের মধ্যে কবীর, ফয়জুল্লা, আফজল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য; সতী ময়নামতী বা লোর চন্দ্রানী কাব্য লেখেন দৌলতকাজী; আকবরের মন্ত্রী ও সেনাপতি আবদুর রহিম খানখানান সংস্কৃত দোহা লেখেন; ইনি সংস্কৃত ও হিন্দি মিলিয়ে যে রচনা করেন, তার নাম 'মানোষ্টক'—শ্রীকৃষ্ণলীলাই মানোষ্টকের বিষয়বস্তু।

বাউলদের যোগ সাধনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাউলদের সাধনা হচ্ছে অধ্যাত্মরসের। বাংলা দেশে যে-সব উৎসব আনন্দ আছে, তাই অবলম্বনকরে বাউলরা সংগীত রচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে চড়ক পূজা ও পূর্ববঙ্গের নীল পূজা অবলম্বনে শিব-দুর্গার কথা নিয়ে অধ্যাত্মলীলার অনেক গান রচিত হয়েছে। গৌরী বলেছেন,—

সকল দিয়া কাঙ্গাল সাজে
সেই সে মহেশ্বর।
তার ডাকেই মুই কাঙ্গালিনী
ঘুচলো আমার ঘর॥ (ভারতে হিন্দু-
মুসলমানের যুক্ত সাধনা, পৃষ্ঠা ১১১)

পূর্ববঙ্গের গোলাম মৌলা আগমনীর গানে বাংলাদেশের অল্পবয়স্ক বধূর প্রাণের কথাটি বলে গেছেন,—

গোলাম মৌলা মোছে নয়ন
কেবা দিবো ভাও।
কোন্ নায়ে বা গৌরী আমার,
যায় তো কতই নাও॥ (ঐ)

এই গৌরী অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী—যাকে দান করে বাপ-মা গৌরীদানের ফল পেয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলায় 'গম্ভীরা' উৎসব উপলক্ষে শিবের গান করা হয়। সেই গানের রচয়িতাদের মধ্যে অনেক মুসলমান কবি আছেন। হোলি বা বসন্তোৎসবের প্রাচুর্য দেখা যায় উত্তর প্রদেশে। এই উৎসবে যে-সব গান করা হয়, তার মধ্যে স্বরূপ মিঞা নজিরের গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব গানের মধ্যে চরম আধ্যাত্মিকতা ফুটে উঠেছে। একজন মুসলমান কবি গাইলেন,—

ফাগুন আয়ো ঝাঁঝা ডফ বাজৈ
ভীর ভঈ অতিভারী।
মোহি তো আস তিহারে মিলন কী
ভুল গঈ সুধ সারী॥ (ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭-১৮)

ফাল্গুন মাস এসেছে, হোলির বাজনা বেজে উঠেছে; কিন্তু আমার তো মনে সুখ নেই। তোমার সঙ্গে মিলনের জন্যই তো আমি এতদিন ধরে আশাপথ-পানে চেয়ে আছি, আর তুমি আমাকে একেবারেই ভুলে থাকলে?

হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য বহিরাগতদের যুক্ত সাধনায় ভারতের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গঠিত হয়েছে। যুগে যুগে সাধকগণ ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে যে-বাণী প্রচার করে গেছেন তা আজও আছে অক্ষুণ্ণ। ভারত সেই ধর্মাদর্শ ভোলেনি; এই আদর্শের জয়গান জগৎবাসীকে একদিন করতেই হবে, সে-দিনের পদধ্বনি আগতপ্রায়।

(পূর্বানুবৃত্তি)
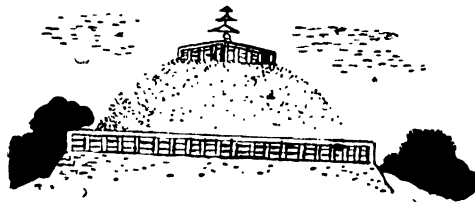
তেইশ

প্রহ্লাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে—সাবিত্রীও হাসে—যেম্নি সে পড়া সুরু করে:

সভায় ছিলেন প্রায় দুতিন শো সাধক, শতাধিক সাধিকা, জন পঞ্চাশেক পণ্ডিত ও শাস্ত্রী এবং বোধ হয় কুড়ি পঁচিশটি গৃহিণী। মেয়েরা সবাই বসেছিলেন জটাধারীজির পিছনে, আমরা তাঁর সামনে আসীন।

জটাধারীজি—গম্ভীরানন্দ তর্কচঞ্চু—এসে প্রথমেই এক টিপ নস্য নিলেন সশব্দে। পরে বললেন ফশ্ করে: "আপনি ঠাকুর, যোগ ব'লে যাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছেন সে হ'ল আসলে খিচুড়ি যোগ—পাঁচমিশেলি—সাত নকলে আসল খাস্তা।" বলেই নস্যদান তাঁর সামনে এগিয়ে দিলেন।

গুরুদেব নস্য না নিয়েই বললেন হেসে: "মানুষ কবে একটিমাত্র তরকারী খেয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে বা কক্ষণো এদিক ওদিক পা না ফেলে একটানা সোজা পথেরই পথিক হয়েছে? জীবন মানেই তো প্রাণলীলা, আর প্রাণলীলা বহুমুখী ব'লেই না জগত—অথর্ববেদের ভাষায়—সনাতন হ'য়েও আজো পুনর্ণব রইল। তাছাড়া ডালভাতও যখন আমরা আলাদা আলাদা খাই না—মেখেই খাই, তখন এই মাখামাখিটা হাঁড়িতে ঘটিয়ে যে শ্রীখিচুড়িভোগের উদ্ভব, তাকেই বা নামঞ্জুর করতে হবে কেন মহাভাগ?"

জটাধারীজি সব্যঙ্গে বললেন: "নিষ্ঠার জন্যে ঠাকুর, নিষ্ঠার জন্যে। মানুষ স্বভাবতঃই চঞ্চল ও অধীর—হাতে হাতে নগদ বিদায় চায়। নিষ্ঠাই আমাদের ধৈর্য শেখায়, সংকল্পকে দৃঢ় করে। চঞ্চলমতি কবে পেয়েছে ধ্রুবের দিশা?' আচার্য শঙ্কর বলেছেন: 'সেন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবম্ দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্'—অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশ ক'রে একমুখী করলে তবেই হৃদয়স্থ দেবতার দর্শন মেলে। আপনার উপাস্য খিচুড়িপন্থ এই নিষ্ঠার পরিপন্থী ব'লে মাদৃশ একান্তী সাধকেরা ভবদীয় সস্তা লীলাবাদকে ভ্রষ্ট নাম দিতে বাধ্য হয়েছেন—সদুঃখে।'

গুরুদেব তাঁর ব্যঙ্গের উত্তরে বললেন: "সাধনার পথে নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মাদৃশ অধমেরাও অস্বীকার করেন না। ঐকান্তিকতা বিনা বস্তুলাভ অসম্ভব, এ আমরাও মানি। কেবল আপনারা আর একটি সমান অনস্বীকার্য সত্যটি স্বীকার করলে আমরা একটু আশ্বস্ত হতাম। সে-সত্যটি এই যে, রামবাবুর যে-পন্থে নিষ্ঠা শ্যামবাবুর নিষ্ঠা ঠিক তার উল্টো পন্থেও হ'তে পারে এবং হ'য়েও থাকে। আপনারা যে-শঙ্করাচার্যের কথা বেদবাক্য মনে ক'রে কথায় কথায় উদ্ধৃত করেন, তিনিও কি অধিকারিভেদে দীক্ষা-ভেদের কথা বলেন নি? প্রত্যেকের নিষ্ঠা হবে তার স্বধর্মাচরণে এও কি আপ্তবাক্য নয়, না গীতা পরধর্মকে ভয়াবহ বলেছে অকারণ?"

জটাধারীজি বোধহয় শঙ্করাচার্যের উল্টো নজিরে উত্যক্ত হ'য়ে একথার উত্তরে যুক্তি ছেড়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুর ধরলেন, বললেন: "মাথাই, নেই, তার মাথাব্যথা! ধর্ম থাকলে তবে তো স্বধর্মের প্রশ্ন ওঠে। গৃহীর আবার ধর্ম! সোনার পাথরবাটি! গৃহীর প্রাপ্য কেবল সুখসিদ্ধি, সন্ন্যাসীর—ব্রহ্মনিষ্ঠা।"

গুরুদেব বললেন মৃদু হেসে: "রাগের মাথায় গোড়ায়ই

গলদ হ'ল মহারাজের। কারণ গৃহী সাধক শান্তির সমুদ্রে পা ভাসিয়ে তৃপ্তির হাওয়ায় সুখসিদ্ধির পাল তুলে দেখতে দেখতে অমৃতবন্দরে পৌঁছে যান—একথা বলতে পারেন কেবল সেই সন্ন্যাসী যিনি গৃহস্থাশ্রমের কোনো খবরই রাখেন না।"

জটাধারীজি অপ্রসন্ন হ'য়ে বললেন: "আপনি ইচ্ছে ক'রে আমার কথার কদর্থ করছেন। গৃহস্থের দুঃখ নেই একথা আমি বলি নি। কিন্তু সুখই তার একমাত্র লক্ষ্য, যেখানে সন্ন্যাসীর লক্ষ্য মুক্তি মোক্ষ কৈবল্য। সুখ লক্ষ্য হ'তে পারে কেবল ক্ষুদ্র আধারের।"

গুরুদেব স্নিগ্ধস্বরে বললেন: "সুখ সবারই লক্ষ্য মহারাজ! মহাভারতে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন: 'নাতপ্ততপসো লোকে প্রাপ্নুবন্তি মহৎসুখম্'—অর্থাৎ তপস্যাবিমুখ মানুষ মহৎসুখ পায় না, পেতে পারে না। গীতায় বলেছে অশান্তস্য কুতঃ সুখম্—অশান্তের সুখ কোথায়? ব্রহ্ম ব্রহ্ম করছেন আপনি—ব্রহ্মকে মানুষ কি চাইত কস্মিন্‌কালেও যদি তাঁকে পেলে অসুখই হ'ত পরিণাম? গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঠাকুর কী বলছেন স্মরণ করুন: যোগী 'বিগতকল্মষ' কিনা নিষ্পাপ হ'য়ে যোগচেতনায় পৌঁছে "ব্রহ্মসংস্পর্শ" লাভ ক'রে কী লাভ করে? না, 'অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে'—অগাধ সুখের স্বাদ পায়। ঋষি সনৎকুমারও নারদকে কী ব'লে ভূমা-র দিকে টানলেন? না, 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'—অল্পাশী হ'লে সুখ নেই, অসীমকে পেলে তবেই সুখ। এই ভূমা বা অসীমকে বরণ করার নানা পথ পদ্ধতি ছন্দ কৌশলের নির্দেশ দিয়েছেন নানা মুনি নানা শাস্ত্রে। কিন্তু একথা কেউই ভুলেও বলেন নি যে, ব্রহ্মকে পেলে জীব অসুখী হয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে মনে করেন কি—এ-সংসারে একজন সাধকও ব্রহ্মকে চাইত বা তাঁর নামে গদ্‌গদ হ'য়ে স্তব করত:

> অহো ভূমন্! প্রভো ধাতঃ! ধন্যস্তং দুঃখকারণ!
> দুঃখে যস্যাদিমধ্যান্তচেতনা বিধৃতা সদা!

> জয় হে অসীম ধাতা! ধন্য দুঃখদাতা জয়!
> আদি মধ্য অন্ত্য পর্ব যার চির দুঃখময়!

না মহাভাগ! না, আমাদের ব্রহ্মঠাকুরের সব চেয়ে বড় উপাধি সচ্চিদানন্দ—সচ্চিৎনিরানন্দ নয়। না, শুনুন, আমার কথাটা শেষ করতে দিন। সন্ন্যাসী বলুন, তপস্বী বলুন, ভক্ত বলুন, বৌদ্ধ বলুন, মায়াবাদী বলুন—এক জায়গায় সবাই একমত যে, সাধকের সাধনার শেষ হবে দুঃখনিবৃত্তিতে। তবে কোন্ পথে কী উপায়ে দুঃখকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে সুখকে স্থায়ীভাবে পাওয়া যাবে—এ নিয়ে তর্কের আর অন্ত নেই। কিন্তু লক্ষ্যণীয়: নানা মুনির নানা মত—অর্থাৎ কিনা মতভেদ হয়—ভবরোগের নিদান-নির্ণয়ে নয়—চিকিৎসা-পদ্ধতিতে। আমরা, মানে গৃহী যোগীরা, এ চিকিৎসা করতে চাই মানবজন্মকে রোখ ক'রে থামিয়ে দিয়ে নয়, সর্বাস্তিবাদকে মেনে ঠাকুরের কৃপা-উপলব্ধির ছোঁওয়ায় অভী হ'য়ে বেদনার মধ্যে দিয়েও নব—চেতনার দিশা পেয়ে। এ-নবচেতনার প্রসাদে-যে দুঃখের মধ্যেও শান্তি মেলে, ক্ষতির বুকেও অক্ষতির দেখা পাওয়া যায়—এ-কথার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাই লীলাবাদী ভক্তিমার্গে যে-পথে চলতে চেয়ে কুন্তী বলেছিলেন ঠাকুরকে:

> বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগৎগুরো!
> ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদ্ অপুনর্ভবদর্শনম্।

অর্থাৎ, হে জগৎগুরু, আমাকে চিরদিন বিপদের মধ্যেই রেখো তুমি, কেন না বিপদেই আমি বরাবর তোমার দেখা পেয়ে এসেছি।' কিন্তু মুস্কিল এই যে, লীলাবাদী ভক্তেরা আত্মসমর্পণে যে কী বিষম দুঃখের খেয়া বেয়ে অভয় আনন্দের বন্দরে পৌঁছয় সে-কথা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের বোঝানো অসম্ভব, কেন না তাঁরা দুঃখভোগ থেকে উত্তীর্ণ হতে চান কেবল একটি পথে—মায়া ব'লে তাকে নামঞ্জুর ক'রে। এ-ও একটা পথ—মানি, কেন না কয়েকজন বরেণ্য মায়াবাদী এই "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" মন্ত্র জপতে জপতে জগৎকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে স্থিতধী হ'তে পেরেছেন দেখা গেছে, কেবল আমাদের বলবার কথা এই যে, যাত্রাশেষে ব্রহ্ম লাভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে প্রত্যাবর্তন ও স্থিতি নিশ্চিত হলেও, যাত্রাপথে মায়াবাদীর দৈনন্দিন জীবন একটু রুক্ষ ও নীরস হ'য়ে ওঠে—লীলাবাদীর পথের তুলনায়।

জটাধারীজি উষ্ম কণ্ঠে বললেন: "আপনার বাগাড়ম্বরের ফেনাটুকু বাদ দিলে যেটুকু থিতিয়ে পরিদৃশ্যমান হয়—অর্থাৎ যাকে আপনি বলছেন লীলাবাদ বা

সর্বাস্তিবাদ—আমরা—মায়াবাদীরাও মানি। উদাহরণতঃ বেদান্তের প্রথম পাঠ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম—সর্বাস্তিবাদ নয় তো কী-বাদ—বলবেন আমাকে করুণা ক'রে ?

'গুরুদেব হেসে বললেন: "বেদান্তের কথা যদি সত্যিই অকাট্য ব'লে মানেন মহারাজ, তাহ'লে কিন্তু আপনাকে বেশ একটু বিপদে পড়তে হবে, কেন না মানতে হবে যে, সর্বম্-এর মধ্যে শুধু গুহা নৈমিষারণ্য শ্মশান ও তুষার শিখরই পড়ে না, গৃহও পড়ে। আর গৃহ কী ক'রে টেঁকে গৃহিণী ও সন্তান বিনা—আপনারা হয়ত বুঝতে পারেন, কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অগম্য।"

জটাধারীজি এবার গর্জে উঠলেন: "উপহাস যুক্তি নয়।"

গুরুদেব বললেন: "কিন্তু মহারাজ আপনি যখন প্রথম থেকে যুক্তিবাদ ছেড়ে উপহাসেরই তীরন্দাজি স্বরু করেছেন তখন পরিহাসরূপ ঢাল না উঁচিয়ে করি কী বলুন? প্রাণে বাঁচতে হবে তো! কিন্তু আমি শুধু পরিহাস দিয়ে আপনার উপহাসকে ঠেকাতে চাই নি। আমার বলবার কথাটা একটু শান্ত হ'য়ে ভাবলে হয়ত বুঝতে আপনার এত বেগ পেতে হ'ত না। আমার বক্তব্য এই যে, গৃহে আসীন হ'য়ে লক্ষ খুঁটিনাটি দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মঠাকুরটির সবব্যাপী সত্তাকে সবচেয়ে বেশি সহজে ও সমগ্রভাবে দেখা যায়, তাঁর নানা স্ববিরোধী রূপের মধ্যেও সুকুমার—harmony-র—দেখা পেয়ে বলার মতন ক'রে বলতে পারা যায়: শরশয্যায় ভীষ্মের কৃষ্ণ-বরণের সুরে সুর মিলিয়ে:

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ।"

ব'লেই সুর ধরে দিলেন:

"সর্ব মাঝে যার, সর্ব যাহা হ'তে, স্বয়ং সর্ব যে, সর্বাধার,
সর্বময় বিভু চিরন্তন—সেই সর্ব-স্বরূপেরে নমস্কার!"

জটাধারীজি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন: "বিচার-সভায় এভাবে হঠাৎ গান ধ'রে দেওয়া অশাস্ত্রীয়। সুর গান আবেগ পরিহাস এরা তর্ক বিচারে অপাংক্তেয়। কিন্তু সে যাক্। আপনি কি বলতে চান যে, এই 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা'-র কোনো খবরই আমরা রাখি না? না, আমরা উপনিষদের মহান্ উপলব্ধির সঙ্গে সায় দিই না যে, তাঁর পাণিপাদ শিবকণ্ঠ সর্বব্যাপী?—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

তিনি "অণোরণীয়ান্" তথা "মহতো মহীয়ান্"—এ কি আমরাও মানি না?

গুরুদেব বললেন, "শাস্ত্রের শ্লোককে আবৃত্তিতে মানা এক, আর জীবনে মানা আর। আপনারা—মানে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা—সর্বতোমুখ সর্বভূতান্তরাত্মা অনীয়ান্ তথা মহীয়ানের কোনো খবরই রাখেন না—এতবড় কথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আমার মনে প্রায়ই একটি সংকট প্রশ্ন ওঠে, যার কোনো সত্যিকার উত্তরই আপনাদের আচরণে পাই না। সে-প্রশ্নটি এই যে, ব্রহ্ম এ-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মধ্যেই আছেন এবং যা কিছু আছে তিনি আছেন ব'লে আছে—একথা যদি আপনারা সত্যিই মানেন—তাহ'লে শুধু গৃহের 'পরেই বা আপনাদের এত আক্রোশ কেন? আর একটি কথাও আমার প্রায়ই মনে হয় এ-সম্পর্কে—কিছু মনে করবেন না মহারাজ! কথাটা এই যে, হিমালয়ের গুহায় আপনারা স্বল্পাহারী মানি। কিন্তু সে-অল্প খোরাকও জোগায় আপনাদের কারা? গৃহীরাই নয় কি? ভারতবর্ষে এতগুলি সন্ন্যাস-আশ্রম আছে—সেখানে সাধকেরা গৃহীদের নিন্দা করেন উঠতে বসতে। কিন্তু এ-আশ্রমগুলির খরচা জোগায় কে? না মহারাজ, এ-প্রশ্ন আমার অবান্তর—এমন কথা কিছুতেই মানব না। আপনাদের মধ্যে যদি একজনও শুকদেবের মতন মহাভাগবতের দেখা পেতাম যিনি বলতেন: 'বনে কি ফল নেই, গাছের কি কম্বল নেই, গুহায় কি আশ্রয় নেই, বাহু কি উপাধান নয়? তাহ'লে গৃহীর কাছে হাত পাততে যাব কী দুঃখে? তাহ'লে আমি সে-তপস্বীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অক্ষম হ'লেও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধায় দণ্ডবৎ প্রণাম করতাম। কিন্তু যখন দেখি নাগা সন্ন্যাসীরাও দুমুঠো অন্নের জন্যে দিনের পর দিন গৃহীরই দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া প্রাণে বাঁচার কোনো অলৌকিক শক্তির খবর দিতে পারেন নি, তখন গৃহীরা কি বলতে পারেন না: যাদের গাল পাড়ো ঠাকুর, তাদের কাছে হাত পাততে তোমাদের লজ্জা করে না?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেনঃ "এ আপনি কী বলছেন? আমাদের বিচার আদর্শ নিয়ে, জীবনের বিকাশ নিয়ে—সাধনার কোন্ স্তরে সাধক কার সঙ্গে কী আচরণ করেন বা কার সম্বন্ধে কী ভাবেন না ভাবেন—এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।"

গুরুদেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেনঃ মোটেই না। কারণ জীবনের বিকাশ নির্ভর করে মূলতঃ তিনটি জৈব ক্রিয়ার 'পরেঃ আচরণ, চিন্তা ও ধ্যান। যে-কোনো মহৎ জৈব-বিকাশের মূলেই আছে—এই ত্রয়ীর সমন্বয়। কারণ কোনো না কোনো উপায়ে এ-সমন্বয় সাধন না করতে পারলে বিকাশ তো দূরের কথা, দুদণ্ড বেঁচে থাকাও অসম্ভব। কথাটা আর একটু খুলে বলিঃ কে না জানে বলুন যে, দেহ মন প্রাণ হৃদয়—এদের নানা চাহিদার মধ্যে অনেক সময়েই বিরোধ ঘটে? তাই কোনো জীবনেরই মহনীয় বিকাশ হতে পারে না—যতক্ষণ না মানুষ এ-বিরোধ-সমস্যার সমাধান করতে পারে একটা সমাহারে পৌঁছে! একে ছেঁটে দিয়ে, ওকে বাদ দিয়ে, তাকে গাল দিয়ে মানুষ ক্ষণিক স্বস্তি বা আত্মপ্রসাদ পেতে পারে, কিন্তু কোনো স্থায়ী সুষমার, হার্মনির, দীপ্ত আনন্দের দেখা পায় না।"

জটাধারীজি সভ্রূভঙ্গে বললেনঃ "তাহলে আপনি কি বলতে চান, অনিকেত সন্ন্যাসীদের জীবনে কোন স্থায়ী বিকাশ বা সমাহারের দীপ্তিই আপনার চোখে পড়ে নি?

গুরুদেব বললেনঃ "বিকাশ তো নানা রকমেরই হ'তে পারে। খুব দুশ্চরিত্র লম্পটের মধ্যেও অনেক সময় আশ্চর্য শিল্পপ্রতিষ্ঠার বিকাশ দেখা যায়, কিম্বা নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যে আশ্চর্য রাজ্যগঠন প্রতিভার বিকাশ। কিন্তু কোনো মানুষের একটিমাত্র একমুখী বিকাশ বিস্ময়কর হ'লেও তাকে মহনীয় বলা চলে না—যদি দেখা যায় সে নৈতিক বুদ্ধিতে তথা আচরণে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়াসক্ত, কি স্বার্থপর। বলি রাজা হিসেবে প্রায় নিখুঁৎ ছিলেন—তার রাজ্যে অভাব ছিল না, উদ্বাস্তু ছিল না, অলস প্রজা ছিল না—দলাদলি ছিল না। তাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। কিন্তু তবু তিনি লাঞ্ছিত হবার আগে বরেণ্যপুরুষ ব'লে সর্বজনপূজ্য হন নি। কেন? না, তিনি আসুরিক বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে বিক্রমাদিত্য তথা দাতা নাম কিনতে চেয়ে হয়েছিলেন—দাম্ভিক, নাস্তিক ও পরস্বাপহারী। তাই না বামনকে অবতীর্ণ হ'তে হ'ল তাঁকে ভক্তি ও বিনতির দীক্ষা নিয়ে পূর্ণকায় মহান্ ক'রে তুলতে। অতদূরে যাবারই বা দরকার কী! এ যুগে নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনি, স্ট্যালিনের কৃতিত্ব কি কম ছিল? না, সামরিক শক্তির দিক দিয়ে তাদের বিকাশ জগতের বিস্ময় জাগায় নি। কিন্তু তবু তাঁদের কীর্তিদীপ্ত বিকাশে বিশ্বের মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিল কেন? কেনই বা প্রেমিক ও মহৎ মানুষ কেউই তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি সত্যজিজ্ঞাসায়? কারণ ঐ যে বললাম—মন প্রাণ বুদ্ধি ও অন্তরাত্মার সে-সমৃদ্ধ বিকাশ তাদের মধ্যে হয় নি—যে-বিকাশ হ'লে তবে কঠোপনিষদের ভাষায়—'অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে—মানুষ অমৃতের অধিকারী হ'য়ে এই দেহেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে।"

জটাধারীজি সব্যঙ্গে বললেনঃ "আপনার শ্রীমুখে এতক্ষণে শুনলাম প্রথম একটি জ্ঞানগর্ভ কথাঃ যে, ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হ'লে তবেই মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। কিন্তু এই মাপকাটিতে বিচার করলে কী দেখা যায়—একটিবার ভেবে বলবেন কি করুণা করে? ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হন এ জগতে কে বলুন তো? বাসনান্ধ অজ্ঞান গৃহস্থ, না সর্বত্যাগী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী?"

গুরুদেব হেসে বললেনঃ "আপনার জ্ঞানপ্রবুদ্ধ মন দেখছি বিচারের একটি নবপদ্ধতি আবিষ্কার ক'রে পরম আনন্দে আছে। যেটা তর্কযুক্তিতে 'প্রতিপাদ্য'—অর্থাৎ, সর্বত্যাগী তপস্বীই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ—তাকে আপনি আগে থেকেই 'প্রতিপন্ন' বা স্বতঃসিদ্ধ ধ'রে নিয়ে রাতারাতি প্রতিপক্ষকে দমিয়ে দিতে চাইছেন।"

জটাধারীজি বললেনঃ "মোটেই না। বরং আপনিই আমাকে হসনীয় প্রতিপন্ন করতে চাইছেন যুক্তি ছেড়ে আমার মুখে বিদ্রূপের চুণকালি দিয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিঃ যদি গৃহস্থদের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুদের দেখা পাওয়া যেত, তাহ'লে মুক্তিকামীরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হ'য়ে আবহমানকাল অনিকেত সন্ন্যাসীদেরই প্রণম্য দিশারি ব'লে বরণ ক'রে তাঁদের শরণাগত হতেন

কি? কৌপীনবন্তদের ভাগ্যবন্ত বলা হয়েছে কি 'ওর এইজন্যেই নয়?

গুরুদেব বললেন: "জীবনের কোন পথেই মহাপুরুষেরা ঝাঁকে ঝাঁকে পদযাত্রায় বেরোন না। কিন্তু সে যাক্। অনিকেত সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দু চারজন প্রণম্য জীবন্মুক্ত পুরুষ মেলে না—এমন কথা বলতে পারে শুধু মূঢ় অন্ধ ও উন্মাদে। আমাদের বর্তমান তর্কের জিজ্ঞাস্য—গৃহস্থাশ্রমেও এই বরণীয় জীবন্মুক্তি লাভ হয় কি না। আমি বলতে চাই—হয়, যেহেতু গৃহস্থ যোগীর কাছেও বহু জিজ্ঞাসু দীক্ষা নিয়ে জীবন্মুক্ত হয়েছেন—শুধু সন্ন্যাসীদেরই শরণ নেন নি তাঁরা আবহমানকাল। উদাহরণ যথেষ্ট পাবেন, যদি একটু শান্ত মনে আমাদের উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ ভাগবতাদি পড়েন। যাজ্ঞবল্ক বশিষ্ঠ কশ্যপ অত্রি এঁদের সবাই কৃতদার গৃহস্থ ছিলেন—জনক নাভাগ পৃথু অম্বরীষ রন্তিদেব প্রমুখ রাজারাও মহাভাগ জ্ঞানী বা 'পরম ভাগবত' উপাধি পেয়েছেন এবং তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্তে বহু গৃহস্থ তথা রাজারা পেয়েছেন মুক্তিসাধনা ও ভগবৎপ্রীতির প্রেরণা। উপনিষদে ও মহাভারতে দেখতে পাবেন কত তত্ত্বান্বসন্ধানী মুনিকেও গৃহস্থ জনক-রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের দিশা দিয়েছেন। তিনি বারবারই বলেছেন যে শুধু গৃহত্যাগ করলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না—জীবন্মুক্ত হ'তে চাইলে মুক্তিকামীকে সব আগে হ'তে হবে নিষ্কাম অনাসক্ত। মহাভারতে যোগিনী সুলভাকে জনক কী তিরস্কার করেছিলেন স্মরণ করুন:

দোষদর্শী তু গার্হস্থ্যে যো ব্রজত্যাশ্রিমান্তরে।

উৎসৃজন্ পরিগৃহ্ণংশ্চ সোঽপি সঙ্গান্ন মুচ্যতে॥

অর্থাৎ শুধু গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাস নিলেই আসক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই বলেছেন, তিনি আরো:

'আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্'—অর্থাৎ, শুধু নিঃস্ব অকিঞ্চন হ'লেই মোক্ষলাভ হয়না, বা ধনী হ'লেই বদ্ধ হয় না, কেননা 'জীবোজ্ঞানেন মুচ্যতে'—জীব কেবল জ্ঞানের প্রসাদেই জীবন্মুক্ত হয়। এই জন্যেই বাইরের যে ত্যাগ দেখে সাধারণঃ লোকে এত অভিভূত হয় সে-বাহ্য ত্যাগকে সর্বোত্তম ত্যাগ বলা চলে না। বৈরাগীরা অন্তরে সর্বতোভাবে নিষ্কাম হয়ে জীবন্মুক্ত হ'লে তবেই সত্যিকার বরেণ্য ব'লে গণ্য হন। আপনি সরাসর ধরে নিচ্ছেন যে, কেবল গৃহকে ত্যাগ ক'রে জাঁকালো কৌপীনবন্ত হ'তে না হ'তে সন্ন্যাসীরা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মবিৎ হয়েছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেন নি কি যে, বহুবর্ষব্যাপী তপস্যার ফলে চিত্তশুদ্ধি হ'লে তবেই জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত হওয়া যায়—নৈলে নয়? এ শুধু কথার কথা নয় মহারাজ—যোগীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে চোখে না প'ড়েই পারে না। ভেবে দেখুন: গৃহত্যাগ ক'রে গেরুয়াকে বরণ করতে না করতে সাধক জীবন্মুক্তের পদবীতে আত্মারাম হ'য়ে আসীন হল—এই কথাই যদি ঐতিহাসিক সত্য হ'ত, তা'হলে কি উপনিষদের ঋষি লিখতেন যে ব্রহ্মলাভের পথে চলা ক্ষুর-ধারের উপর দিয়ে রোপ-ডান্সারের চলার মতনই কঠিন—না, একের পর এক উগ্র তপস্বী (বহু তপস্যার পরেও) একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখতে না দেখতে ব্রহ্মবিহার ছেড়ে রমণীবিহারে মশগুল হ'য়ে যেতেন? মহারাজ, মিথ্যে আমার 'পরে ভ্রূকুটি ক'রে কী হবে বলুন? এ তো আমার ব্যবস্থা নয়। স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ গীতায় এই নিদারুণ বিধান দিয়ে বসেছেন যে "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে, যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"—অর্থাৎ হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে চায়, আর এই মুষ্টিমেয় প্রার্থীদের মধ্যেও কালেভদ্রে এক আধ-জন সাধক তাঁকে পুরোপুরি জানতে পারে। তাই এক্ষেত্রে আমার অপরাধ কী বলুন? জীবন লীলার নিয়ন্তা তো আমি নই।"

জটাধারীজি একটু কোনঠাশা হ'য়ে বললেন: "একথা আমরাও মানি যে, ব্রহ্মবিৎ হওয়া সুসাধ্য নয়। কিন্তু থিওরিতে যাই হোক—কার্যক্ষেত্রে ব্রহ্মবিৎ হন কাঁরা? ত্যাগী যোগী তপস্বীরা, না ভোগী গৃহী ইন্দ্রিয়বিলাসীরা?"

গুরুদেব বললেন: "ত্যাগী মুনি ঋষি তপস্বীরাও মোক্ষ-পথের দিশা দিতে পারেন এ তো আমি প্রথমেই মেনে নিয়েছি মহারাজ! মানতে পারছি না শুধু আপনার এই বিস্ময়কর রায়টি—যে তাঁরা জীবন্মুক্ত হয়েছেন শুধু সংসারকে ত্যাগ করার দরুণ। আর পারছি না এইজন্যেই যে, অনেকেরই যে সংসারে থেকেও এ-জীবন্মুক্তি লাভ হতে পারে এবং হয়েছে একথার স্বপক্ষে বহু অপ্রতিবাদ্য প্রমাণ আছে।

শান্তিপর্ব মহাভারতে রাজর্ষি জনক কী বলেছিলেন নিজের সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে স্মরণ করুন। তিনি মহাযোগিনী সুলভাকে বলেছিলেন জোর ক'রেই:

রাজ্যৈশ্বর্যময়ঃ পাশঃ স্নেহায়তনবন্ধনঃ।
মোক্ষাশ্মনিশিতেনেহচ্ছিন্নস্ত্যাগাসিনা ময়া॥

অর্থাৎ আমি রাজ্যে থেকেও অনাসক্তির অসি দিয়ে সব মমতার বন্ধন কেটে জীবন্মুক্ত হয়েছি—তাই রাজ্যপাটের ধুমধাম বা স্নেহমমতার বন্ধন আমাকে বাঁধতে পারে না—শান্তিপর্বে আরো দুই স্থলে জনক বলেছেন: 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে কিঞ্চন দহ্যতে'—আমার রাজধানী মিথিলা পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না—যেহেতু আমার রাজ্যের কোনো কিছুতেই আমি আসক্ত নই।"

জটাধারীজি উত্তেজিত হ'য়ে বললেন: "আপনি কি বলতে চান, রাজর্ষি জনকের মতন বিরাট্ আধার জন্মায় ঘরে ঘরে—ঝাঁকে ঝাঁকে? না জীবন্মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁকে দুর্ধর্ষ তপস্যা করতে হয় নি?"

গুরুদেব বললেন হেসে: "মহারাজ, আমি দেখতে যতটা মূর্খ আসলে ততটা অর্বাচীন নই। তাই আমি জানি ও মানি যে, জগতে তপস্যা না করে শুধু যে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না তাই নয়—হওয়ার-মতন কিছুই হওয়া যায় না। আমি শুধু বলতে চাই যে, রাজর্ষি জনক বিরাট আধার হওয়া সত্ত্বেও শুধু যে সংসারে থেকেই দুর্ধর্ষ তপস্যা করেছিলেন তাই নয়, সিদ্ধির পরেও সংসারে এসেই বসেছিলেন—সংসারকে মায়া ব'লে তিনি অবজ্ঞা ক'রে অনেক সন্ন্যাসীর মতন গুহায় গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে তনুত্যাগ করেন নি। পরম-ভাগবতদের মধ্যে আরো অনেকেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন: ভক্তরাজ প্রহ্লাদ, মহাতপস্বী ধ্রুব, অবতারকল্প পৃথু, নারায়ণপরায়ণ অম্বরীষ—আরো অনেক মহৎ রাজা ভগবানের প্রসাদ লাভ করার পরেও গৃহী হ'য়ে অনাসক্ত ভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন ক'রে গেছেন আজীবন। এই বরণীয় দৃষ্টান্তকেই আমি নাম দিতে চাই—গৃহস্থাশ্রমে থেকেও যোগসিদ্ধ হওয়া।"

জটাধারী বললেন: "কিন্তু প্রহ্লাদ ধ্রুব বা জনকের মতন পরম-ভাগবত সংসারে কটা মেলে শুনি—লাখে না মিলল এক।"

গুরুদেব বললেন: "বটেই তো। সিদ্ধি যতই বড় হবে তার অধিকারীও হবে ততই কম—এ কে না মানবে? কিন্তু আসলে আমাদের তর্ক কী নিয়ে? সংসারে সাধনা ক'রে মহত্তম সিদ্ধিরও অধিকারী হওয়া যায় কি না—এই তো? আপনি বললেন প্রথমেই যে, সংসারে থেকে যোগের নাম খিচুড়িযোগ। আমি নামকরণ করতে চাই—মহৎ যোগ, কেন না তার ফলে লাভ হয় এক মহৎ সুষমা, হার্মনি। না, শুধু মহৎ বললেও সব বলা হবে না—আমি বলতে চাই সবিনয়ে যে, গৃহস্থাশ্রমে থেকে যে-সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব এবং অনেক মহাভাগ করেছেন, সে-সিদ্ধি মহিমায়ও সন্ন্যাসসিদ্ধির চেয়ে কম বরেণ্য নয়। তাই তো আমাদের সাধনশাস্ত্রে সংসারে থেকেও ব্রহ্মবিৎ হওয়ার আদর্শের এত নামডাক—মহাত্মা বলা হয়েছে তাঁকেই যিনি 'জলমে কমল আলপ'—অর্থাৎ জলে থেকেও সব সময়ে পদ্মের মত নির্লিপ্ত থাকতে পারেন।"

জটাধারীজি বললেন: "এ উত্তম কথা। কিন্তু ঠিক এই জন্যেইতো সন্ন্যাসীর মহিমার এত জয় জয়কার—তিনি নির্লিপ্ত হবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে।"

গুরুদেব হাসলেন: "বটেই তো। মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে যিনি জীবন্মুক্ত হয়েছেন সে-মহাত্মার জয়জয়-কার না করবে কে? যেখানেই কোনো বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী কামনা-বাসনাকে জয় ক'রে ব্রহ্মবিৎ হয়েছেন সেখানেই সবাই তাঁর জয়গান করেছে—কেন না যা সবাই চায় কিন্তু খুব কম লোকেই আয়ত্ত করতে পারে—এমন কীর্তিতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বহু সাধনায়। কেবল মনে রাখবেন—এখানে এই পারাটাই বড় কথা—কী ভাবে কোন্ পরিবেশে পারা হ'ল সে-বিচার অবান্তর না হ'লেও গৌণই বটে। আমার আপত্তি শুধু এইখানে যে, আপনারা এই পারাটাকে প্রায় গৌণ ক'রে পরিবেশটাকেই মুখ্য ব'লে হুহুঙ্কার করেন। আপনাদের মতন আমিও সন্ন্যাসীর পরম-সিদ্ধির গুণগান করতে গৌরব বোধ করি। আমি দুঃখ পাই কেবল আপনাদের এই রোখালো ঘোষণায় যে, যারা গৃহস্থাশ্রমে অধ্যাত্ম-সাধনা করেছেন তারা জীবন্মুক্তির অনধিকারী বা নিম্নাধিকারী। আর দুঃখ পাই—এ রটনা

সত্যভিত্তি নয় ব'লে। কারণ একটু শান্ত হ'য়ে ভারতের নানা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের জীবনী পর্য্যালোচনা করলেই দেখতে পাবেন একটি অপ্রতিবাদ্য সত্য : যে, যেমন বহুর মধ্যে কয়েকজন মহাত্মা সন্ন্যাস নিয়ে ব্রহ্মবিৎ হয়েছেন, ঠিক তেম্‌নি বহু গৃহী-যোগীর মধ্যে কয়েকজন মহাভাগ গৃহস্থাশ্রমে জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন নিষ্কাম মন্ত্রদীক্ষায় বহুসাধনায় সিদ্ধিলাভ্‌ করে। এইজন্যেই সন্ন্যাসপথেও মুক্তিলাভ হয় মেনেও ঠাকুর গীতায় 'কর্মজ্যায়ো হ্যকর্মণঃ' সূত্রে শুধু যে কর্মসন্ন্যাসের চেয়ে কর্মযোগকেই মহত্তর সাধনা বলেছেন তাই নয়—আরো জোর দিয়ে বলেছেন যে, কেবল সন্ন্যাসী হ'লেই ত্যাগী হওয়া যায় না, কর্মফল ত্যাগীই আসল ত্যাগী—'সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুঃ ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।'

জটাধারী আতপ্ত স্বরে বললেন: "আপনি বারবার গীতার তীক্ষ্ণ ভল্লে আমাকে বিদ্ধ করবার বৃথা চেষ্টা করছেন। আপনি আপত্তি করলে হবে কী? গীতা লেখা হয়েছিল নিম্নাধিকারীদেরই সান্ত্বনা দিতে। তাই ওতে বেদের নিন্দা আছে ও কর্মের জয়ধ্বনি করা হয়েছে। যারা ত্যাগ করতে পারে না, তপস্যায় ভয় পায় তাদেরও কিছু দেওয়া চাই তো—তাই তাদের বলা হয়েছে—তোমরা সংসারে থেকেই কোনোমতে কর্মযোগের সাধনা করো। কিন্তু সংসারে থেকে সাধনা ক'রে বড় জোর একটু আধটু শক্তি বিভূতি বা শান্তি পাওয়া যেতে পারে—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হ'তে পারে শুধু সর্বত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচারী হ'লে—নৈলে নয়।"

গুরুদেব বললেন: "এ আপনার রাগের কথা মহারাজ! গীতাকে আপনি কখনই প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এভাবে বরখাস্ত করেন না। কারণ বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের মধ্যেও প্রায় সকলেই আজও গীতাকে কী গভীর শ্রদ্ধা করেন, আপনার কাছে অজানা থাকতে পারে না। তাছাড়া গীতা যদি শুধু নিম্নাধিকারী, বাসনান্ধ, সংসারীকে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই লেখা হ'ত, তাহ'লে কি শঙ্করাচার্যের মতন যুগাবতার মহাপুরুষও গীতার ভাষ্য রচনায় পণ্ডশ্রম করতেন?"

জটাধারী বললেন: "কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে কি কর্মযোগকে অস্বীকার করেন নি বলতে চান আপনি? তাঁর প্রধান বাণী কি সন্ন্যাসদীক্ষারই স্বপক্ষে নয়? তিনি কি উঠতে বসতে বলেন নিঃ 'ভস্মাঙ্গরাগ! নৃকপালকলাপমাল! সংসার দুঃখগহনাজ্জগদীশ! রক্ষ?'—অপিচ, তিনি এ-সংসারকে শুধু ঘোর অরণ্য ব'লেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর ইষ্ট ছিলেন শ্মশানবাসী শিব। ললিত লীলাবাদের মৃদুগুঞ্জনে তাঁর বিরাট অন্তর পুলকিত হয় নি—তিনি বলেছিলেন 'বিনাপরোক্ষানুভবং ব্রহ্ম শব্দৈর্ণ মুচ্যতে' অর্থাৎ ব্রহ্মকে দুটো কথালাপে মেলে না, মেলে শুধু অপরোক্ষ অনুভবে। সংসার-গহণারণ্যের মায়ান্ধকারে জীব মুক্তির দিশা না পেয়ে ভ্রান্তিবিলাসে ঘুরে মরে ব'লেই কি আশ্চর্য শঙ্কর শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রে লেখেন নি শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে:

'কিং যানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং?
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিং?

অর্থাৎ যানবাহন ধন হস্তী অশ্বাদি মণ্ডিত রাজ্যপাটে কী হবে? পুত্রমিত্রকলত্রবন্ধু দেহসুখ গৃহসুখেই বা কী হবে?"

বলতে বলতে জটাধারীজির কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হয়ে আরো উঁচু পর্দায় উঠল, তিনি সমানে ব'লে চললেন ব্যঙ্গভরে: "সংসারের বাসনাবাদী বীণাঝঙ্কারে যে-অল্পাশীরা মুগ্ধ, তাদের অন্তরে বড়জোর একটু আধটু হর্ষের হিল্লোল আসতে পারে—কিন্তু 'সোঽহং' উপলব্ধি আসা অসম্ভব। সংসারের পরিবেশে বড়জোর গৃহিণীসুখ ও বৈষয়িক আমোদ-প্রমোদই লাভ হ'তে পারে—'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্‌' উপলব্ধি করতে হ'লে 'জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী' সব মায়াবন্ধন কেটে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ বরণ করতে শেখা চাই—আচার্য শঙ্করের ভাষায়: 'সুরমন্দির-তরুমূলনিবাসঃ শয্যাভূতলমজিনং বাসঃ'—অর্থাৎ, দেবমন্দিরে আসন পাতা, তরুতলে বাস, ভূতলে শয়ন ও মৃগচর্মপরিধান।"

গুরুদেব হেসে বললেন: "আমি একথা মোটেই বলতে চাই নি মহারাজ, যে আচার্য শঙ্কর সন্ন্যাসবাদী ছিলেন না। শুধু আচার্য শঙ্কর কেন? তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যেও বহু মুনিঋষিই তো রিক্ত সন্ন্যাসী হ'য়ে মোক্ষসিদ্ধি লাভ ক'রে সর্বপ্রণম্য হয়েছেন। আচার্য শঙ্কর একজন বিরাট্‌ দিক্‌পাল

ও তত্ত্বদর্শী ছিলেন একথাই বা কে অস্বীকার করবে এক মূঢ় ছাড়া? আমাদের ভারতবর্ষে বহুকাল থেকেই চ'লে আসছে বিরক্ত সন্ন্যাসবাদ, ঊর্ধ্ববাহু দেহধিক্কারবাদ, সংসার-বিতৃষ্ণ অরণ্যবাদ—আরো কত রকমের দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনের জয়জয়কার। স্বয়ং পরমকারুণিক বুদ্ধও সে-যুগের এ-ব্যাপক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে বলেছিলেন যে, জন্মচক্র থেকে মুক্তি—অর্থাৎ নির্বাণই—দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। মানুষ সংসারে দুঃখশোকজরামৃত্যুর চাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে এসেছে সৃষ্টির অরুণোদয় থেকে—বটেই তো। সন্ন্যাসীরা দেখে শুনে থ হ'য়ে এ-দুঃখজ্বালা-যন্ত্রণাকেই বড় দেখে পই পই ক'রে নিষেধ করলেন সংসারে থাকতে, বললেন—সব ছেড়ে চ'লে যাও বনে জঙ্গলে, যত পারো কর্ম কমাও, কারণ কর্ম অজ্ঞানমূল, সুতরাং বাঁধবেই বাঁধবে হাজারো কর্মবন্ধনে, কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে দেহকে যত দুঃখ দেবে তত বেশি ব্রহ্মানন্দের দিকে এগুবে—এসব ঘোর কঠোর বিধি ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় বহু বিরক্ত সন্ন্যাসীই দিয়ে এসেছেন—যাঁরা শঙ্করকেও হার মানিয়েছেন। চ্যবন এম্নি তপস্যা করলেন যে তাঁর দেহের চারদিকে উইঢিবি গ'ড়ে উঠল। শুধু দুটি চোখ দেখা যায়। কিন্তু লক্ষণীয়—এ ঘোর তপস্যার পরেও এক রাজকন্যা এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে তিনি সে-সুকন্যার রূপের দ্বারে অতিথি হবার জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠলেন। এইভাবে ভারতের বহুবিচিত্র আশ্চর্য ইতিহাসে একদিকে কতিপয় তপস্বীর সন্ন্যাসের কঠোর সাধনায় সিদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পাশাপাশি কি পদে পদে স্খলনের দৃষ্টান্ত মেলে না?—বহু বৎসর তপস্যার পরেও সুন্দরী মেয়ে দেখতে না দেখতে নানা বিশ্বামিত্রের মতন উগ্র সন্ন্যাসীরও আত্মহারা হওয়ার শোচনীয় অধঃপতনের কাহিনী কি আমাদের ভাবিয়ে দেয় না—কেমন ক'রে এহেন দুর্বিপাকে পড়লেন বড় বড় যোগী যতি জ্ঞানী মুনি?"

জটাধারীজি বললেন: "এ কী সব অবান্তর অসার প্রসঙ্গ আনছেন আপনি? কোনো যোগের সার্থকতার বিচার হ'তে পারে যোগারূঢ়ের সিদ্ধির মূল্যনির্ণয়ে, যোগভ্রষ্টদের পদস্খলনের দৃষ্টান্ত দিয়ে নয়।"

গুরুদেব বললেন: "অবান্তর মোটেই নয় মহারাজ—কথাটা আমাকে শেষ করতে দিন আগে। আমি বলতে চাইছি—সংসারে আমাদের হাজারো আসক্তি নিত্যই চারদিক থেকে ছেঁকে ধ'রে দুঃখের ফাঁদে ফেলে ব'লেই সন্ন্যাসীরা প্রধানতঃ সংসারকে বর্জন করতে চেয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে অবশ্য ভগবদুপলব্ধির প্রেরণাও ছিল, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, সংসারের নানা দেহবিলাস ও ইন্দ্রিয়সুখের ফলে বড় বেশি ভুগতে হয় ব'লেই মানুষের বুকে আদিম প্রার্থনা জেগেছিল: 'সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ'—হে জগদীশ্বর আমি দুঃখকে বাদ দিয়ে সুখ পেতে চাই, কিন্তু সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি ('সুখাৎ বহুতরং দুঃখম্') অতএব দোহাই তোমার প্রভু, আমার সব সংসারবন্ধন এক কোপে কেটে আমাকে বসিয়ে দাও বনে জঙ্গলে কোনো গুহায়, যেখানে মানুষের সঙ্গ মিলবে না, কাজেই আসক্তি আশ্রয় পাবে না। এ-রণছোড় পলায়নের পথে কোনো আনন্দের উপলব্ধিই হয় না এমন কথা কেউই বলে না, যদিও একথার মানে নয় যে, যাঁরাই সংসার ছেড়েছেন তাঁরাই সরাসর আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হয়েছেন—প্রমাণ, ঐ যে বললাম বহু তপস্যার পরেও উগ্রতপস্বীদের পদস্খলন। তবু একথা আমি মানি যে, এককোপে সব বন্ধন কাটতে পারলে মনকে একাগ্র করা একটু বেশি সহজ হয়—কারুর কারুর পক্ষে। আর যাঁদের পক্ষে সহজ হয়, সন্ন্যাস শুধু তাঁদেরই স্বধর্ম হ'তে পারে। কিন্তু সকলের স্বধর্ম এক নয় এই সাদা কথাটা তাঁরা বোঝেন না ব'লেই গোল বাধে। তাই তাঁরা দেখেও দেখেন না যে, সব মুমুক্ষুই শুধু যে এভাবে এক-কোপে বন্ধন কাটতে পারে না তাই নয়, কেটে বেরিয়ে এলেও পণ রাখতে পারে না—হয় পুনর্মূষিক হ'য়ে ফিরে আসে, না হয় দেখতে দেখতে শুধু অহং-সম্বল কৃচ্ছ্রসাধনেই কীর্তিমান্ হ'য়ে ডোবে। আমার বক্তব্য এই যে, গৃহস্থাশ্রমে যোগসাধনায় বহু দুঃখবাধা পরীক্ষা থাকলেও সাড়ে পনের আনা ভগবৎসন্ধানীর সংসারে থেকেই ধীরে ধীরে অধ্যাত্মসাধনায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৈচিত্র্য থাক্ না—কয়েকজন দুর্দান্ত তপস্বী হ'য়ে জলে নেমে দশঘণ্টা সূর্যে ত্রাটক ক'রে সিদ্ধিলাভ করুন না যদি প্রাণ চায়; 'কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত' মন্ত্র জপ ক'রে ছাই মেখে ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে অধ্যাত্মসাধনের মহানন্দে কীর্তিমন্ত হ'য়ে একটি বাহু হারানোর ক্ষতিপূরণ পান না যদি পেতে পারেন্; নখাগ্রদৃষ্টি হ'য়ে পথ চ'লে নারীদর্শনলালসাকে দমন করতে

ব্রতী হোন না—যদি এভাবে কাম জয় করতে পারেন। শীতাতপে অনশনে দেহকে অযথা ক্লিষ্ট ক'রে আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হোন না, যদি এ-আনন্দ স্থায়ী হয়; গুহাবাসী বা আরণ্যক হ'য়ে প্রচার করুন না—যদি ইচ্ছা হয়—যে, এ-সংসার মিথ্যার নরককুণ্ড, যন্ত্রণার জ্বালামুখী, তাই যে ক'রে হোক জন্মচক্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার নামই পরম মুক্তি। যাঁরা এ-জাতের সন্ন্যাস বা কৃচ্ছ্রবাদকে স্বধর্ম বলে চিনেছেন তাঁরা যদি এমন কি অঘোরপন্থী আদর্শকে বরণ করেও বিষ্ঠাকুণ্ডে বা ভয়াল শ্মশানে শবাসনে সিদ্ধিলাভ করেন তবে তাঁদের আমি প্রণাম করব, আশীর্বাদ চাইব—তাঁদের পবিত্রতা, ঐকান্তিকতা ও মনের বল থেকে প্রেরণা ও শক্তি পেতে। আমি লীলাবাদী মহারাজ, কাজেই আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসে যিনি যেখানেই কোনো দারুণ পথেরও পথিক হয়েছেন তাঁকেই আমি নমস্কার করতে রাজী। আমি শুধু তাঁদের এইটুকু নিবেদন করতে চাই যে, তাঁরা নিজের স্বভাবে স্বধর্মে আসীন থাকুন খুশ-খেয়ালে, কেবল যেন না বলেন যে, যাঁরা সংসারে থেকেই লক্ষ আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সাধনাকে তাঁদের স্বধর্ম ব'লে চিনেছেন তাঁরা সবাই মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত, খিচুড়িপন্থী। জানি না আমার বক্তব্য প্রাঞ্জল হ'ল কি না।"

জটাধারীজি বললেন: "শুধু প্রাঞ্জল নয় অতিপ্রাঞ্জল হয়েছে। কেবল দুঃখ এই যে, এই সব বিলিতি বুলি এ-যুগে আমাদের পেয়ে বসেছে ব'লেই আমাদের হিন্দুধর্ম আজ মজ্জমান। হার্মনি, সিন্থেসিস, ইন্টিগ্রাল—এসব গালভরা বিশেষণ আমার আজানা নেই ঠাকুর। আমি দর্শনশাস্ত্রে এম. এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বিলিতি দর্শনও পড়েছি দশ বারো বৎসর। কিন্তু শেষে দেখলাম যে ওদের দর্শন শুধু কথার কচকচি—বুদ্ধির বাহ্বাস্ফোট। ওদের, মানে সাহেবদের, একটি মাত্র সাধনা আছে—ঐহিক জীবনবাদকে উপাস্য করা এবং নিরীশ্বর যুক্তিবাদ ও জড়বিজ্ঞানবাদের দুন্দুভি বাজিয়ে ভোগবাদের জয়ধ্বনি করা। পক্ষান্তরে আমাদের হিন্দুধর্ম চেয়েছে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা। এ-সাধনাকে আপনারা ছোট করবেন না সাহেবি বুলির মোহে—এই অনুরোধ করতেই ঠাকুর, আজ আমি এসেছি আপনার কাছে, মিথ্যে বাগ্বিতণ্ডা করতে নয়। এই দেখুন না—আমাদের শাস্ত্রে লিখেছে তো—ভগবানকে পেতে হ'লে ব্রহ্মচর্য চাইই চাই? কিন্তু শেয়ানা সাহেবরা হাঁকছেন, ব্রহ্মচর্য হ'ল সেকেলে কুসংস্কার—aberration আরো কত কি! আমার অনুরোধ—আপনার প্রতিষ্ঠা বিদ্যা বুদ্ধি ও সাধুচরিত্রের প্রভাব নিয়ে আপনি হিন্দুধর্মেরই তরফে দাঁড়ান—ব্রহ্মবাদেরই উদ্গাতা হোন—বিলিতি গতিবাদ, জড়বিজ্ঞানবাদ, মেটীরিয়ালিস্‌ম বা আর কোন নয়া ইস্‌মের উকিল হ'য়ে দাঁড়াবেন না।"

গুরুদেব স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: "ঠাকুরের জয় হোক যে, অবশেষে এক জায়গায় আমরা সমব্যথী, আপনার এ-মহৎ খেদের আমিও মরমী—কারণ এ-দুঃখ আমাকেও পেতে হয়েছে, নানা সময়েই নানা বিজ্ঞম্মন্যের মুখেই শুনি যে, হিন্দুধর্ম মিডীভাল, ব্রহ্মচর্য ম্যাডনেস, ঐশী করুণা অটো-সাজেস্‌চন, পরলোক সুপার্সটিশন, ভগবদ্দর্শন হ্যালুসিনেশন—ইত্যাদি। তাই আমিও সবিনয়েই বলছি আপনাকে যে, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি গৃহস্থাশ্রমে বিশ্বাস করি একথার মানে নয় যে, আমি বিলিতি ভোগবাদ বা নাস্তিক বিজ্ঞানবাদের জয়গান করতে কেঁদে ভাসিয়ে দিই। ওদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে কেবল আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, ওরা জীবনকে প্রাণশক্তিতে সমৃদ্ধ ও রূপরাগে রমণীয় করতে চেয়ে কোনো গোড়ায় গলদ করে ব'সে নি, ভুল করেছে শুধু ভগবানকে বাদ দিয়ে প্রাণলীলাকে ও রূপানুরাগকে সার্থক করতে চেয়ে। আর একথা আমি বলছি বিলিতি কোনো নয়া ইস্‌মকে নিয়ে সিংহনাদ করতেও নয়—বলছি এই জন্যে যে, আমরা গৃহস্থাশ্রমেও অধ্যাত্মবাদী হ'তে পারি—সন্ন্যাসবাদের তেজস্বিতা, তপঃশক্তি ও সংযমকে মনে প্রাণে বরণ করে। আমি কোনো নতুন মতবাদও প্রচার করছি না মহারাজ! আমি বলছি শুধু—যে কথা আমাদের উপনিষদে বারবারই বলা হয়েছে গৃহস্থাশ্রমের স্বপক্ষে। আমাদের শ্রেষ্ঠ ঋষিরা বরাবরই বলেছেন যে, শুধু দেবঋণ ও ঋষিঋণ নয়—পিতৃ-ঋণও শোধ করা চাই—গৃহী হ'য়ে পিতৃত্বের দায়িত্ব স্বীকার ক'রে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে তাই এত জোর দিয়ে বলা হয়েছে বারবার পুনরুক্তি করে: 'প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ—প্রজননশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ'…এ আপনার ভাষায়—বেদনিন্দক গীতার কথা নয়,

মহারাজ, নিখিলশাস্ত্রের ভিত্তি উপনিষদের কথা—যাকে আপনিও কাটতে পারবেন না। উপনিষদের ঋষি স্বাধ্যায় ও সন্তান প্রজনন পেয়েছিলেন—

জটাধারীজি ত্রস্ত স্বরে বললেন : "এ আলোচনা থাক্—"

গুরুদেব হেসে বললেন : "কোনো কিছুকে একবার গতি দিলে সে হুকুম করলেই থামে না মহারাজ! আর বিচার সভায় নেমে সত্য উদ্ধৃতিকে ভয় করলে চলবে কেন বলুন? মনে রাখবেন—আপনাদের আদর্শপুরুষ শঙ্করাচার্যকে যখন মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী কামশাস্ত্র আলোচনা করতে আহ্বান করেন, তখন তিনি বাধ্য হ'য়ে রাজ শরীরে প্রবেশ ক'রে, রাজদেহে দেহবিলাস-তত্ত্ব জেনে ফিরে এসে বলেন—তিনি আলোচনা করতে প্রস্তুত।"

জটাধারীজি বিপন্ন কণ্ঠে বললেন : "জানি—কিন্তু এ-প্রসঙ্গ—"

গুরুদেব বাধা দিয়ে বললেন্ : "না, অবান্তর নয় মোটেই। কারণ এ-সূত্রে আমি দেখাতে চাইছি যে উপনিষদের মুনিঋষিরা স্ত্রীসহবাসে সন্তানজননকে সাধন-পথে শুধু যে মহাবিঘ্ন ব'লে গণ্য করতেন না, তাই নয়—ছান্দোগ্য উপনিষদে বামদেবী সামের প্রসিদ্ধ উপাসনায় এমন কথা লিখতেও কুণ্ঠিত হন নি যে, যে-দম্পতী যথাবিধি সহবাসে সন্তান-উৎপাদন করেন তিনি কীর্তিমান্ তথা আয়ুষ্মান্ হন। অপিচ—"

জটাধারীজি দুহাত তুলে মিনতির স্বরে বললেন : ক্ষান্ত হোন্—আমি জানি, জানি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ মুখে আনলেও আমি ভ্রষ্ট হব—নারী সংক্রান্ত কোনো দৈহিক আলোচনা করলে আমার মন—"

গুরুদেব হেসে বললেন : "উচাটন হয় এই তো? জানি। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই শঙ্করাচার্যকে মণ্ডনজায়া ঐ প্রশ্নই করেছিলেন।

জটাধারীজি বললেন বিরক্ত হ'য়ে : "বারবার কি সব অপ্রাসঙ্গিক—"

গুরুদেব বললেন : "মোটেই নয়। আপনার নিজের ভড়কে যাওয়াই প্রমাণ যে, এ-সমস্যার সমাধান না হ'লে ভড়কানো ছাড়া উপায় নেই—আর তবে তার মূল কারণ এই—যা বৈদিক ঋষিরা ধরেছিলেন ঠিকই—যে, জীবন-সমস্যার কোনো পূর্ণায়ত সন্তোষজনক সমাধান সন্ন্যাস-দর্শনে নেই, কারণ তার মূল বাণী হ'ল ধরণী তথা গৃহিণীকে বরখাস্ত ক'রে চলতে চাওয়া। এ-পথে চ'লে দুচারজন কীর্তিমান্ হতে পারেন মানি, কিন্তু তা বলে মানতে পারি না যে এ পথে কোনো মহৎ সুষমা বা হার্মনির সন্ধান পাওয়া যায়---যার আহ্বানে এই বিরাট বিশ্বের অশ্রান্ত প্রাণ-লীলার নানা বেসুর ঘর্ঘরকে আনন্দের ধন্য ঝংকারে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ উপনিষদের ঋষিরা ঠিকই ধরেছিলেন যখন তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে, সর্বাস্তিবাদের মন্ত্র বরণ করে গৃহস্থাশ্রমের পূর্ণ দায়িত্ব অঙ্গীকার ক'রে পর পর পিতৃ-ঋণ ঋষিঋণ ও দেব-ঋণ শোধ করতে পারলে তবেই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে মানুষ কৃতকৃত্য হয় পুরোপুরি।"

জটাধারীজি উষ্ণস্বরে বললেন : সমন্বয়ন, না বাতুলের প্রলাপ? যদি এ-সমন্বয় সন্ন্যাসী না করতে চান তবে ক্ষতি কী শুনি?"

[ক্রমশঃ

সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা ও ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য

তারকেশ্বরের মোহন্ত ১০৮ শ্রীযুক্তহৃষীকেশ আশ্রম

বৈদিক দর্শন বা ঔপনিষদ দর্শনের চরম ও পরম প্রতিপাদ্য বিষয় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পরব্রহ্ম। বস্তুতঃ পরব্রহ্ম নিরূপণেরই বৈদিক দর্শন তাৎপর্য্য লাভ করিয়াছে, পরিদৃশ্য বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে নিখিল প্রপঞ্চের কারণীভূত ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থতঃ ছিলেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (শ্রুতি)। উপনিষদের তত্ত্ববেত্তা আচার্য্য স্বীয় অনুগত অন্তেবাসীর অন্তরে সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন দ্বারা মুখ্যতঃ ব্রহ্মরহস্য জ্ঞাপন জন্য প্রসন্ন হৃদয়ে বিবিদিষু বিদ্যার্থীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্রই ছিলেন। এক ও অদ্বিতীয় পদদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ পার্থক্যের বিষয় ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—স্বকার্য্যপতিতমন্যন্নাস্তীত্যেকমেবেতি। মৃদ্ব্যতিরেকেন মৃদো যথা অন্যদ্ ঘটাদ্যাকারেণ পরিণময়িতৃ কুলালাদি নিমিত্ত কারণং দৃষ্টংতথা সদ্‌ব্যতিরেকেণ সতঃ সহকারি-কারণং দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিবিধ্যতেহ দ্বিতীয়মিতি। বিবর্তবাদী বৈদান্তিক সিদ্ধান্তে এই স্থলে—"বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—প্রভৃতি শ্রুতি সামর্থ্যে ভাগবদ্রূপ কার্য্যের কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে "অনন্যত্ব" নিবন্ধন পূর্ব্বউদ্ধৃত শ্রুতির "সদেব" এই স্থলে "ইদং"—এই পদ দ্বারা জগৎকে লক্ষ্য করিয়া এই জগৎ তাহার বর্ত্তমান আকৃতি পাইবার পূর্ব্বেই 'সদ্'রূপে ছিল এইরূপ ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। বস্তুতং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোনও বস্তুর পরমার্থতঃ সত্তা স্বীকৃত না হওয়ায় 'সদেব' শ্রুতিবাক্য মূলতঃ তাৎপর্য্যানুসারে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। উপনিষদের (ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়) এই প্রকরণ আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তই সুদৃঢ় হয়—ব্রহ্মবিদ্যার কৃত্যর্থে যে আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে অনূচানমানী (অর্থাৎ পণ্ডিতম্মন্য) পুত্র শ্বেতকেতুকে তদীয় পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে শিক্ষাভিমানগ্রস্ত পুত্র! তুমি এই রহস্যের কথা আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি? যাহার বোধমাত্রে সমগ্র বিষয়ে বোধ হইয়া থাকে—একমাত্র ব্রহ্মবোধেই ব্রহ্মকার্য্যভূত অখিল বিষয়ের বোধ সম্ভব। পরের শ্রুতিবাক্যে সেইভাবেই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে—বৈদিক দর্শনের পরমপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম অদ্বৈতবাদেই সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা বৈদিক পরমতত্ত্ব পরমব্রহ্মের যথাযথ উপলব্ধি হইতে পারে। অখিল বেদ বা বেদান্তবাক্য বা বেদার্থানুসারী স্মৃতি সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতিও এই অদ্বৈততত্ত্বকে পরমতত্ত্বরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের প্রথম তাত্ত্বিক বিচারেই বলা হইয়াছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজজ্ঞতাসমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(ভাগবত)···

অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ প্রাজ্ঞগণ তাহাকেই "তত্ত্ব" বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন যাহা অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ। এই এক অদ্বয় জ্ঞানই বিবিদিষুর যোগ্যতার তারতম্যানুসারে ত্রিবিধ আকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, উপনিষন্মার্গানুসারী সত্য তপস্যা সম্যগ্‌জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যরূপ সাধনে সিদ্ধ হইয়া তত্ত্ববিৎপ্রোক্ত "অদ্বয়তত্ত্ব"কে "ব্রহ্ম" রূপে অনুভব করেন, "তত্ত্বমসি"—প্রমুখ অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতি-সারাবলম্বনে বিচারের পরিপক্কাবস্থায়—পরির্ব্বেষে—"অহং ব্রহ্মাস্মীতি" নিষ্ঠানুসারে ব্রহ্মানুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যান। যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তয়িতা হিরণ্যগর্ভ-প্রোক্ত প্রাণাচার্য্য অবলম্বনকারী যোগিগণ যোগজ পরিশুদ্ধনেত্রে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে পরমাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং ভজনরসিক ভক্তগণ একই অদ্বয় তত্ত্বকে স-গুণ রূপে অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট অনুকম্পাপরায়ণ শ্রীভগবদ্রূপে ভজন করিয়া সফল-মনোরথ হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-

সূত্রের শারীরকভাষ্য ও গীতাভাষ্য এবং বেদান্তদর্শনের মুখ্য উপজীব্য উপনিষদসমূহের অদ্বৈতপরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলতঃ বিচারের পর্য্যবসান অদ্বৈততত্ত্বে হইলেও—ব্যবহারিক জগতে তাৎকালিক হইলেও "দ্বৈতসত্তা" রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ জ্ঞানের তাদৃশ পরিপক্কদশা না আসিলে অহংব্রহ্মাস্মীত্যাকারক অদ্বৈতবোধ আবির্ভূত হইতে পারে না। তাদৃশ বিভূতিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য উপাস্য উপাসকরূপ ভেদ (দ্বৈত) ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত উপাসনা প্রসঙ্গ উক্ত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন, এমন বিবিদিষু ব্যক্তির জন্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইযাছে। যাহাতে ক্রমমুক্তির দ্বারা তাঁহারা অভীষ্ট চরম ও পরম লক্ষ্যে ক্রমশঃ স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক উপনীত হইতে পারেন। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য কিভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষেপে যথাবুদ্ধি বিবৃত করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে—ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণের ভূমিকায় আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন "দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপ বিকার ভেদোপাধিবিশিষ্টন্তত দবিপরীতঞ্চ সর্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্।" দ্বিপ্রকারে ব্রহ্মাবগম হইতে পারে—নামাদিবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মের বা তদ্‌বিপরীত সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্গুণ ব্রহ্মের। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বৈত ভূমিকায় (অবশ্যই তাহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে) প্রতিষ্ঠিত; প্রমাণরূপে তথায় শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে "যত্রহিদ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" এক্ষেত্রে ও দ্বৈতমিব বলা হইয়াছে, সুতরাং মূল শ্রুতিবাক্যে ও "দ্বৈতাবস্থা" ব্যবহারিক মাত্র। অর্থাৎ যাবৎ কাল ব্যবহার থাকে তাবৎ তাহার স্থায়িত্ব, পরমার্থ দশায় তাহার অস্তিত্ব (তদাকারে) অবলুপ্ত হইবে—ইহাই শ্রুতিবর্ণিত "ইব" শব্দের তাৎপর্য্য। প্রমাণরূপে শ্রুতিবাক্যে উদ্ধৃত হইয়াছে—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমত্মৈব বাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ—এই বাক্যের দ্বারা তাদৃশ—অদ্বৈতনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট উপাস্য-উপাসক-ভেদজ্ঞান অবশিষ্ট থাকেনা। বস্তুতঃ ইহাই স্থির হইল—আবিদ্যক দ্বৈত ভূমিকায় উপাস্য উপাসকাদি বিবিধ ভেদবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত আনন্দময়াধিকরণের প্রাক্‌কথনে আচার্য্যপাদ নিত্য-নিরঞ্জন নির্বিশেষে সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্গুণ পরব্রহ্মতত্ত্বের ও সগুণ ব্রহ্মের প্রমাণবাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া অনন্তর বলিয়াছেন······এবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।" অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অপেক্ষা করিয়া একই পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম দুইরূপে নির্গুণ ও সগুণ রূপে প্রতীত হন। বেদান্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মের উভয় রূপই প্রকাশ করিয়াছেন, "তত্রবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদি লক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহার ঃ। তত্র কানিচিদ্ ব্রহ্মণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি, কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থানি, তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ।" (শাঙ্কর ভাষ্যে) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—আবিদ্যক দ্বৈতভূমিকাতেই ব্রহ্মের উপাস্যউপাসনাদি লক্ষণসমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে, তাত্ত্বিক অদ্বৈত ভূমিকায় নহে। এই প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সগুণোপাসনাও বিভিন্ন প্রয়োজনে সাধিত হইয়া থাকে। "কানিচিৎ"······এই সন্দর্ভে আচার্য্যপাদ সেই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, যদ্যপি গুণগত ও উপাধিগত ভেদ অনুসারে উপাস্যের রূপাদির বিভিন্নতা হইয়া থাকে তথাপি মূলতত্ত্ব একই— যাহাকে শ্রৌতবিজ্ঞান "ব্রহ্ম" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন, আচার্য্যপাদ তাহাই সুস্পষ্ট করিয়া বলিলেন "এক এব তু পরমাত্মেশ্বর স্তৈস্তৈর্গুণবিশেষৈ বিশিষ্ট উপাস্যো যদ্যপি ভবতি, তথাপি যথাগুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে।" এই সন্দর্ভের শেষাংশের বক্তব্য এই যে, যদিও এক অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বই তদ্‌তদ্ গুণাদিবিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া বিবিধ উপাসনায় উপাস্যরূপে প্রতীত হন তথাপি উপাস্যগত মৌলিক কোন ভেদ না থাকিলেও (পরমার্থদৃষ্টিতে) উপাসনা যে আকারের বা যে প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইবে, ফল ঠিক তাদৃশই হইবে এবং তজ্জন্যই উপাস্য মূলত এক হইলেও উপাসনার ফল বিভিন্ন আকারে হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে আচার্য্যপাদ স্বীয় বক্তব্যকে সুদৃঢ় করিবার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি, যথা ক্রতুরস্মি লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি॥" স্মৃতিবাক্যরূপে গীতার যং যং বাপি স্মরণ ভাবন্"···এই শ্লোকে ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেদান্তশাস্ত্রের উপজীব্য উপনিষদ্ মধ্যে অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা মহর্ষি পিপ্পলাদ জিজ্ঞাসু শিষ্য সত্যকামকে সাক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"এতদ্বৈ সত্যকাম! পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোংকারঃ—এই শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারি-ভাষ্যপ্রণয়ন-কালে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—"পরং হি ব্রহ্মশব্দাদ্যুপলক্ষণানর্হং সর্ব্বধর্ম্মবিশেষবর্জিত মতো ন শক্যমতীন্দ্রিয়-গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসাবসাহিতুম্। ওকারে তু বিশ্বাদি প্রতিমাস্থানীয়ে ভক্ত্যাবেশিত ব্রহ্মভাবে ধ্যায়িনং তৎ প্রসীদতীত্যবগমাতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যাত্তথাহ পরং চ ব্রহ্ম (প্রশ্নোপনিষদ্ শাঙ্করভাষ্য)। যে হেতু পরমব্রহ্ম শব্দাদি বিষয় দ্বারা উপলক্ষণের অযোগ্য সর্ব্বধর্ম্ম বিরহিত, অতএব অতীন্দ্রয়ত নিবন্ধন কেবল মনোমাত্র সম্বল করিয়া সেই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওরা সম্ভব নহে, অবশ্যই ইহা অদ্বৈতপ্রাণদপ্রসন্ন নিরস্ত সমস্ত কুহকআত্মারামকৃত কৃতার্থ বিজ্ঞানবান্ অপেক্ষা যাঁহারা নিম্নভূমিকায় অর্থাৎ সগুণব্রহ্মোপাসনায় রত রহিয়াছেন তাঁহাদের সামর্থ্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। যেরূপ অভিলষিত বিষ্ণুমূর্ত্তিতে তত্তদুপাসকগণ কর্ত্তৃক ভক্তিবশতঃ ব্রহ্মভাব আবেশিত হইলে তন্মূর্ত্তিধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি "তৎ" পদলক্ষিত ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তদ্রূপ যিনি তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইয়া ব্রহ্মরূপে প্রণবের উপাসনা করেন তিনিই কৃতার্থ হন। অবশ্য ওঁকার ও ব্রহ্মের অভিন্নতা এখানে উপাচার মাত্র। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, বাচ্যবাচকের অভিন্নতা বিবক্ষায় এইভাবে বলা হইয়াছে; এখানে প্রাণধাতব্য বিষয় এই যে যথাশাস্ত্র মূর্ত্তি-পূজা বা ধ্যান প্রভৃতি সগুণব্রহ্মোপাসনাবিশেষ এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরমণিঃ শ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সগুণোপাসক প্রণব অবলম্বনেই হউক বা অভিলক্ষিত বিষ্ণাদি প্রতিমা অবলম্বনেই হউক বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। আচার্য্যপাদচরমতত্ত্বরূপে অদ্বৈতকে নির্দিষ্ট করিলেও অধিকৃত ব্যক্তির পক্ষে সগুণোপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের "সর্ব্বত্র-প্রসিদ্ধ্যধিকরণে" (১৷২) এ বিষয়ে আলোচনা আছে। এই অধিকরণেই প্রসঙ্গক্রমে সর্ব্বব্যাপি-ব্রহ্ম বস্তুত হৃদয়াদি পরিচ্ছিন্ন দেশে অবস্থানরূপ আপাতত প্রতীয়মান বিরোধের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। মূল সূত্রই এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচার্য্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ"—(বেদান্তসূত্র ১৷২৷৭) এই সূত্রের প্রথমাংশে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয় প্রকাশ হইয়াছে যে যদ্দ্বারা প্রথমতঃ "অর্ভকৌকস্ত্ব" (অল্পস্থানে নিবাসিত্ব) জীবাত্মাতে সম্ভব হয়। কারণ পরিচ্ছিন্ন স্থানে পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মাই থাকেন। সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা নহেন। সূত্রের উত্তরভাগে ইহার পরিহার রহিয়াছে। পরিহার প্রসঙ্গে আচার্য্যভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। "নসর্ব্বগতঃ পরমাত্মেতি যদুক্তং তৎ পরিহর্তব্যম্। অত্রোচ্যতে-নায়ংদোষঃ। ন তাবৎ পরিচ্ছিন্নদেশস্য সর্ব্বগতত্বব্যপদেশঃ কথমপ্যুপপদ্যতে, সর্ব্ব-গতস্য তুঃ সর্ব্ব দেবেষু বিদ্যমানত্বাৎ পরিচ্ছিন্ন দেশব্যাপ্য দেশোঽপি কয়াচিদপেক্ষয়া সম্ভবতি।" জীবাত্মা যাহার পরিচ্ছিন্ন দেশাবস্থানই শাস্তদৃষ্ট তাহার পক্ষে "সর্ব্বগত" পদ ব্যপদিষ্ট হওয়া কোনও প্রকারে সম্ভব না হইলেও যিনি পরমাত্মা—সর্ব্বগতত্বরূপ ব্যপদেশ যাঁহার নিত্যসিদ্ধ—তাঁহার পক্ষে সর্ব্বদেশে সর্বকালে বিদ্যমানতা নিবন্ধন পরিচ্ছিন্ন-দেশাবস্থানত্বরূপে ব্যপদেশ ও সম্ভব হয়। কারণ পরিচ্ছিন্ন দেশে তাঁহার অবস্থান স্বীকার না করিলে সর্ব্বগতত্বরূপ ব্যপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তরূপে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—"যথা সমস্ত বসুধাধিপতিরপি হি সন্নযোধ্যাধি-পতিরতি ব্যপদিশ্যতে।" যেমন কোন রাজা অখিল পৃথিবী-পতি হইয়া অযোধ্যাপতিরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকেন। পূর্ব্ব সন্দর্ভে বলা হইয়াছে "কয়াচিদপেক্ষয়া" এইস্থলে পূর্ব্ব-পক্ষী তাই প্রশ্ন করিলেন—কয়া পুনরপেক্ষয়া সর্ব্বগতঃ সন্নীশ্বরোঽর্ভকৌকা অণীয়াংশ্চ ব্যপদিশ্যতে? উত্তরে বলা হইল "নিচার্য্যত্বাদিতিক্রমঃ।" অর্থাৎ এমন কি অপেক্ষা রহিয়াছে যাহার জন্য সর্ব্বব্যাপী হইয়াও পরমাত্মার" অর্ভ-কৌকস্ত্ব (অল্পস্থান নিবাসিত্ব) ও অনীয়স্ত্ব (ক্ষুদ্রত্ব) ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে? সূত্রের উত্তরভাগ উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে "নিচায্যত্বাৎ," ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—এবমনীয়স্ত্বাদি গুণগণোপেত ঈশ্বরস্তত্র হৃদয়পুণ্ডরীকে "নিচায্যো" দ্রষ্টব্য। উপদিশ্যতে" অর্থাৎ এইরূপ অনীয়স্ত্বাদি গুণগণবিশিষ্ট মহেশ্বর সেই হৃদয় পুণ্ডরীকরূপ উপলব্ধি স্থানে "নিচায্য" অর্থাৎ দ্রষ্টব্য। সুতরাং দ্রষ্টব্যত্বকে অপেক্ষা করিয়াই সর্ব্বগত পরমাত্মার হৃৎপুণ্ডরীকরূপে পরিচ্ছিন্ন স্থানে অবস্থান-

রূপ ব্যপদেশ সঙ্গত হয়, এই স্থলেও বিবিদিষুর নিকট বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য ভাষ্যকার দৃষ্টান্তদ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করিতেছেন, "যথা শালগ্রামে হরিং, তত্রাস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানং গ্রাহকম, সর্বগতোঽপীশ্বরস্তত্রোপাস্যমানঃ প্রসীদতি। যেরূপ শালগ্রাম শিলায় হরি রহিয়াছেন, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণু উপাসকের প্রয়োজনে শালগ্রামরূপ পবিত্র প্রতীকে অবস্থিত এবং উপাসক কর্তৃক সাধিত উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া উপাসককে কৃতার্থ করেন, বস্তুতঃ শালগ্রামশিলা এখানে উপলক্ষণমাত্র। শাস্ত্রবিধানানুসারে তত্তদুপাসক কর্তৃক তত্তৎ-প্রতীকোপাসনা দ্বারা প্রতীক উপলক্ষিত পরমেশ্বর প্রীতি-লাভ করেন—যদ্দ্বারা উপাসকের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিচায্যত্বা-পেক্ষং ব্রহ্মণোঽর্ভকৌকস্ত্বং চ, ন পারমার্থিকম্। উপনিষদে সগুণব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে, সগুণ ও নির্গুণ এই উপাসনা (অবশ্য নির্গুণ উপাসনা-বলিতে ভাবনা বুঝিতে হইবে) দ্বয়ই উক্ত হইয়াছে, অনেক স্থলে সগুণ ব্রহ্মরূপে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ নির্বিশেষ পরমব্রহ্মের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে প্রথমতঃ একটী স্তুত্যর্থ আখ্যায়ি-কায় অবতারণা করা হইয়াছে। নারদ অনাত্মজ্ঞত্ব নিবন্ধন শোকাভিভূত হইয়া আত্মশোক নিবারণ জন্য ভগবান্ সনৎ-কুমারের শরণাপন্ন হইলেন। 'অধীহি ভগব ইতি হোপস-সাদ সনৎকুমারং নারদঃ··(ছাঃ উঃ ৭।১।১) আত্মতত্ত্ব বিষয়ে পরিপৃষ্ট শ্রীসনৎকুমার জিজ্ঞাসু নারদকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি জান তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ কর। নারদ বথাযথভাবে তাহা প্রকাশ করিয়া খেদ সহকারে বলিলেন—সোঽহং ভগবোমন্ত্রবিদেবাস্মীতিনাত্মবিৎ, হে ভগবন্। সেই আমি (নারদ) মন্ত্রবিদ্‌মাত্র হইয়াছি, আত্মবিষয়ে কোন জ্ঞান আমার নাই। শ্রুতংহ্যেব ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি-শোকমাত্মবিদিতি—যেহেতু শুনিয়াছি আপনাদের ন্যায় তত্ত্ববিদ্‌গণের উপদেশ দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া জিজ্ঞাসুশোকসাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকে। সোঽহং-ভগবন্‌শোচামি,তংমাভগবাঞ্ছোকস্য পারংতারয়তু—এই ভাবে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বস্তু নিরূপণ দ্বারা পরিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্বিশেষে ব্রহ্ম বস্তু নিরূপণ করা হইয়াছে। আচার্য্যপাদ এই অধ্যায়ের প্রাক্‌কথনে বলিয়াছেন—ন সতোঽর্বাগ্‌ বিকার লক্ষণমিতত্ত্বানি নির্দিষ্টা-নীত্যতস্তানি নামাদীদি প্রাগাস্তানি ক্রমেন নির্দিশ্য তদ্-দ্বারেনাপি ভূমাখ্য নিরতিশয়ং তত্ত্বং নির্দ্দেক্ষ্যামি শাখা চন্দ্র-দর্শন বদিতীমংসপ্তমং প্রপাঠকমারভতে।" সংক্ষেপতঃ ইহাই ব্যক্তব্য যে জ্ঞাতব্যবস্তু দুর্জ্ঞেয় হইলে তাহার বোধের জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমজিজ্ঞাসুর পক্ষে প্রথমতঃ সেই দুর্জ্ঞেয় বস্তুর নিরূপণ সু-কঠিন বলিয়া প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত সুজ্ঞেয় বস্তুনিরূপণদ্বারা শাখাচন্দ্রদর্শন ন্যায়াবলম্বনে পরমদুরূহ ভূমাখ্য ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ করা হইয়াছে। শ্রীনারদের প্রশ্নোত্তরে শ্রীসনৎকুমার "নাম" ইহাকেই ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তীস্তরে উন্নীত নারদের—"অস্তি ভগবানাম্নোভূয় ইতি—প্রশ্নের দ্বারা" "বাগ্‌বাবনাম্নো ভূয়সী" উত্তরে "নাম" হইতে "বাকের" শ্রেষ্টত্ব (সূক্ষ্মত্ব) নিরূপণ করা হইয়াছে। এই রূপে প্রাণ পর্য্যন্ত নানা বস্তু নিরূপণান্তে ভূমাখ্য পরম দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বনিরূপণদ্বারা ইহার পর্য্যবসান ঘটিয়াছে॥ আচার্য্যপাদ এই ক্ষেত্রে সোপানারোহণের ন্যায় ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বিষয়ের তত্ত্বনিরুপণ কৌশল বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "অথবা সোপানা-রোহণবৎ স্থূলাদারভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরংচ বুদ্ধিবিষয়মিত্যাদি"। বস্তুতঃ সগুণব্রহ্মোপাসনার দ্বারা ক্রমশঃ যোগ্যতা পরি-বর্দ্ধনে নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধিরূপে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়—শ্রুতির তাৎপর্য ইহাই। আচার্য্যপাদ এই তাৎপর্য্যকে তাঁহার ভাষ্যে অতি প্রাঞ্জলভাবে বলিয়াছেন। তাহাই অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষেত্রে বিশেষ বক্তব্য এই যে, ভাষ্য ব্যতিরেকে আচার্য্যপাদ বহু স্তবস্তুতিতে সগুণ ব্রহ্মো-পাসনার "দ্বৈত" ভূমিকার অধিকারীগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ তৎকালে তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়াই সগুণ-ব্রহ্মপর বাক্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন,এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ আচার্যপাদের ভাষ্যাবলম্বনপূর্ব্বকই লিখিত হইয়াছে। স্তব ও স্তোত্রাদিতে সন্নিবেশিত সগুণপর বাক্য ইহাতে উদ্ধৃত হয় নাই।

রহস্য রোমাঞ্চ

শ্রীজয়দেব রায়

সাহিত্যের সবচেয়ে নিম্নস্তরের আসন নাকি রহস্য ও রোমাঞ্চ কাহিনীর। কিন্তু বাস্তবিকক্ষেত্রে রহস্য-রোমাঞ্চ ও অলৌকিক কাহিনীর আবেদন সার্বজনীন—এমন ক'রে সাধারণ পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ ও তন্ময় ক'রে রাখতে আর কোন সাহিত্যই পারে না।

সৎসাহিত্যের শাহীতক্তে বসবার সৌভাগ্য অধিকাংশ ডিটেকটিভ গল্পের না হলেও স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের গল্পগুলির সে সৌভাগ্য হয়েছে। বিশ্বের গোয়েন্দা কাহিনীর ইতিহাসে তিনি এক নবযুগের সূচনা করেছেন। কোনান ডয়েলের সঙ্গে আরও দুটি নাম করতে হয়—জি. কে. চেষ্টারটন ও এডগার য়্যালেন পো। তাঁদের লেখা এই শ্রেণীর গল্পও সৎসাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয়েছে।

রহস্য-রোমাঞ্চের অপরধারা অলৌকিক কাহিনী। প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ম-বাঁধাধারার বাইরে আমাদের কল্পনাকে নিয়ে গেলেই সে রচনা হয়ে ওঠে অলৌকিক কাহিনী। মানুষ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না—কিন্তু তাই বলে সে গল্প উপভোগ করতে বাধা কি? পুরাণের গল্পের মুনিঋষিদের তপঃশক্তির কথা, স্বর্গের দেবদেবীদের লীলার কথা আমরা যে ভাবে বিশ্বাস করি, ভৌতিক কাহিনীগুলিকে সেইভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে এবং আনন্দ পাওয়াও যেতে পারে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়—গল্পমাত্রই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে অপ্রত্যক্ষলোকে আমাদের মনকে নিয়ে যায়। বাস্তবলোক থেকে কল্পলোকে সহজে প্রয়াণ করার শক্তি সবার নেই, যাদের এ শক্তি আছে সব রকম গল্পই তাদের পক্ষে উপভোগ্য।

যা সচরাচর ঘটে তা উপভোগ্য, কারণ তা আলোকচিত্র (photography), আর যা সচরাচর ঘটে না তা আরও উপভোগ্য; তা হচ্ছে প্রতিকৃতি-অঙ্কন (portrait)—তাতে একটা অতিরিক্ত রস পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে Idea-র সঙ্গে Idea-র সুন্দর সমাবেশ।

অলৌকিক কাহিনীর বস্তু মানুষ, ঘটনা সব বাস্তবিক, আর অলৌকিক কাহিনীতে যে সব জীবজন্তু, মানুষ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, ভূত, প্রেত প্রভৃতি থাকে সেগুলি সব Idea। Idea-র সঙ্গে Idea-র লীলা বা আদান প্রদান মনে ক'রে নিলেই তা শিক্ষিত মনের উপভোগ্য হবে।

শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে, এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানের খাসমহল ইউরোপ আমেরিকাতেও হাত-দেখা ও ভাগ্য-গণনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। হস্তরেখাবিদ্‌রূপে কাইরো (Cheiro) বা চেরো সাহেবের জগৎজোড়া সুনাম আছে। প্ল্যানচেট-সিয়ান্স নিয়ে তাঁর লেখা অলৌকিক কাহিনীগুলিও রহস্য-রোমাঞ্চ উপসাহিত্যধারার বিষয় বস্তু।

অলৌকিক কাহিনী সাহিত্যে এইচ. জি. ওয়েলস বা ডি. এইচ. লরেন্স-এর ন্যায় মহাসাহিত্যিকের দানও অল্প নয় দেওয়ালের একটা অদৃশ্যদ্বারের মধ্য দিয়ে এক সুখময় জগতে চলে যাওয়ার গল্প বলেছেন এইচ. জি. ওয়েলস। লরেন্সের একটি গল্পে কাঠের ঘোড়ায় চেপে একটি বালক ঘোড়দৌড়ের মাঠের বিজয়ী ঘোড়ার নাম জানতে পারত।

বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর পরিচ্ছন্ন অলৌকিক কাহিনীর দেখা বিশেষ পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁর 'কঙ্কাল', 'মণিহারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্প অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ লাভ করেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই ধারার কয়েকটি উপভোগ্য গল্প আছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'দেবযান' প্রভৃতি লেখার মধ্যে এই শ্রেণীর কাহিনী-বস্তুর সমাবেশ হচ্ছিল, তাঁর অকাল বিয়োগে সে সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হয়েছে।

বাংলার ভৌতিক কাহিনী চিরকালই আদৃত হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি পরিণতবয়স্কদের উপযোগী ক'রে রচিত নয়। গল্পগুলির মধ্যে তুচ্ছ বাহুল্য আছে, বক্তব্যের একটা অযথা

ছেলে ভুলানো ন্যাকামি আছে, জোর করে ভয় দেখানোর একটা প্রচেষ্টা আছে, ফলে সেগুলি শিশুমনোরঞ্জন সাহিত্যেই পরিণত হয়েছে। বয়স্কদের জন্যেই রচিত আর এক শ্রেণীর ছেলেভুলানো গল্প প্রচলিত আছে, ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা, অপদেবতার সেখানে যথেচ্ছ বিহার, কিন্তু সেগুলি সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

গল্প ইতিহাস নয়, গল্প মিথ্যা কল্পনার সৃষ্টি। অলৌকিক কাহিনী, ভৌতিক কাহিনী ইত্যাদিও তাই, ইতিহাসের সঙ্গে এসবের সঙ্গতি হয় না, কিন্তু গল্পের সঙ্গে এসবের অসঙ্গতি হবে কেন ?

ইংরেজি ভৌতিক কাহিনী পড়তে পড়তে পাঠকের যে শিহরণ ও রোমাঞ্চ অনুভূত হয়, যাকে বলে Uncanny Feling ; বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে দোলায়মান কুহকাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মনও তন্ময় হয়ে পড়ে, সাহিত্যের ভাষায় একেই বলে রসাবিষ্ট অবস্থা।

কেবল ভৌতিক কাহিনী নয়, অলৌকিক কাহিনী বা Fantasy জাতীয় রচনা আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ। বিজ্ঞান বৈচিত্র্য বা Science Fiction জাতীয় গল্পের পাশাপাশিই সেগুলি প্রবাহিত। টলষ্টয় থেকে এইচ-জি-ওয়েলস, সমরসেট মম থেকে শুরু করে এম-আর-জেমস, এসকুইথ প্রভৃতি বহু লেখকই এ ধরণের বহু গল্প লিখেছেন।

Science Fiction বা বিজ্ঞান বৈচিত্র্য কাহিনী আমাদের সাহিত্যে এখনও প্রবেশলাভ করেনি। বিশ্বসাহিত্যে এই ধারায় গল্প লেখার একটি বিশেষ ঢেউ এসেছে। এই সকল গল্প যদি বাংলায় অনুবাদ করাও যায়, তাহলে এগুলি আমাদের সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করবে ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবে।

এই শ্রেণীর কাহিনীতে কেবল পৃথিবী নয়, ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানই পাঠকের অগম্য থাকেনা—মঙ্গলগ্রহে, চাঁদে আমরা যাচ্ছি, পৃথিবীর অভ্যন্তরে জলন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে ঢুকছি, প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে দিনের পর দিন বাস করছি। আবার যে কোন বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের পরিচিত জগতে ঘটতে পারে, মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ভারশূন্য হয়ে মানুষ শূন্যে ভাসছে, মানুষের সৎ ও অসৎ দুটো প্রবৃত্তি আলাদা রূপ নিচ্ছে, ইতর জীবজন্তু কথা বলছে। বিদগ্ধ লেখক ছাড়া এগুলি সাধারণ লোকেরা লিখতে পারেন না।

এই শ্রেণীর সাহিত্যের পথিপ্রদর্শক স্যার লুই ষ্টিভেনসন, তাঁর 'ডক্টর জেকিলয়্যাণ্ড মিষ্টার হাইড' এই ধারার প্রথম উপন্যাস। ফরাসী ঔপন্যাসিক জুলুভার্ণ শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল এবং এইচ-জি-ওয়েলস এই ধারায় বিশ্ববিশ্রুত লেখক।

অতীতের ভূত (Ghosts) নিয়ে যেমন অনেকে গল্প লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক লেখক এখন ভবিষ্যতের ভূত (Ghost) নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু করেছেন। এই শ্রেণীর ভবিষ্যতের ভূত নিয়ে বহু গল্প রচিত হচ্ছে। ভিন্ন গ্রহের জীবের সঙ্গে মানুষের প্রেমের গল্পও বলা হচ্ছে।

'রোবট' বা কলের মানুষ নিয়ে বিজ্ঞান বৈচিত্র্য কাহিনী প্রচুর রচিত হয়েছে। তারাই যে একদিন মানুষের উপর প্রভুত্ব করবে, সে নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য নিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যে কিছু কিছু লেখা হয়েছে, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্পগুলি কতটা মৌলিক রচনা জানি না, তবে শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের 'মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর' মৌলিক রচনা।

রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের আর একটি ধারায় আছে—দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনী ও শিকার কাহিনী। ব্যালেণ্টাইনের 'গরিলা হাণ্টার্স', জিম করবেটের 'ম্যান হাটার্স অব কুমায়ুন' জাতীয় গল্পের একটি রোমাঞ্চকর আবেদন আছে।

দুঃসাহসিক অভিযান বা Tales of Adventure কেবল শিশুদের নয়, সকল শ্রেণীর পাঠকেরই পরম আকর্ষণীয় সাহিত্য। এই সকল গল্পে লেখক পাঠকদের দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায়, দুর্ভেদ্য অরণ্যভূমিতে অথবা মহাসাগরের অজানা দ্বীপে, দুস্তর মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেন। দস্যুদের হাতে কোথাও নায়ক বন্দী হয়, গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়ে কোথাও যখের পাল্লায় পড়ে, আবার কোথাও বা নরখাদকের ভোজ্যবস্তু হয়ে থাকে, আর পাঠক প্রতিপদে লাভ করে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা বাংলায় এই ধারায় রচিত প্রায় সকল লেখাই ছোটদের

জন্যে রচিত, বয়স্কদের জন্যে এ ধারায় কেউই লিখতে সাহস করেন নি।

বাংলাদেশে বয়স্কদের জন্যে রচিত রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী প্রধানত ডিটেকটিভ গল্পকেই কেন্দ্র ক'রে আবির্ভাব। বাংলায় ডিটেকটিভ কাহিনীর সূত্রপাত পাঁচকড়ি দের কলমে। তাঁর গল্পগুলি তেমন সুখপাঠ্য নয়, বিশ্লেষণ পদ্ধতি নেই বললেই হয়। লোমহর্ষণ ঘটনার সমাবেশের জন্য সেকালের পাঠক সন্তুষ্ট ছিল। একালের শশধর দত্তের 'মোহন' তাঁর ধারার অনুগামী, অত্যন্ত হালকা অন্তঃসারশূন্য রচনা।

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা কাহিনীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়। দীনেন্দ্রকুমার ইংরেজি গল্পের অনুবাদই করেছেন এবং সে কথা তিনি গোপনও করেন নি। তাঁর পরে অধিকাংশ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক মৌলিক সাহিত্য বলে বিদেশী গল্পের ভাবানুবাদ প্রচার করে আসছেন। দীনেন্দ্রকুমারের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য সাবলীল ও সুমিষ্ট ভাষা, অনুবাদ পড়ছি বলে কখনও মনে হয় না।

পিয়ারসন্স ম্যাগাজিন, স্ট্রাণ্ডারসন্স ম্যাগাজিন জাতীয় পত্রিকা ছিল তাঁর ও কুলদারঞ্জন রায়ের অন্যতম কাহিনী উৎস। এগুলিতে ফ্যানটাসি জাতীয় গল্প প্রচুর প্রকাশিত হত।

এ প্রসঙ্গে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। হেমেন্দ্রকুমারের লেখা শিশু-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত, শরদিন্দু মৌলিক রহস্যকাহিনীর শক্তিশালী স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট ব্যোমকেশ প্রায় শার্লক হোমসের ন্যায়ই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। গোয়েন্দা কাহিনীর আরও একজন শক্তিশালী মৌলিক লেখক ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তাঁর সৃষ্ট 'হুকাকাশি' একটি সার্থক জীবন্ত চরিত্র।

সৈনিক

শ্রীসুকমল দাসগুপ্ত

আমি সৈনিক
হিমালয় বুকে রোধ করি আমি
মত্ত বাসনা চৈনিক
(আমি) দুর্দম বীর সৈনিক।

আমি বৈশাখ,
তপ্ত তপন দগ্ধ ধরার
তীব্র গভীর ওই ডাক
(আমি) ধূলি ধূসরিত বৈশাখ।

আমি ভৈরব,
মাভৈঃ মাভৈঃ হুঙ্কার ছাড়ি
ক্রন্দসী বুকে ঐ-রব।
(আমি) বিশ্বের মহা ভৈরব।

আমি অগ্নি,
তাণ্ডব—তালে নটরাজ আম
দুর্বাশা, জামদগ্নি,
(আমি) খাণ্ডব—বন অগ্নি।

আমি ঝঞ্ঝা,
বিদ্যুৎ বুকে প্রলয়-অশনি
ব্যাঘ্র—নখর—পঞ্জা,
(আমি) শত্রুর বুকে ঝঞ্ঝা।

* * *

আমি শান্তি,
মহাদেব বুকে মহাধ্যান আমি
বিভূতিভূষণ—কান্তি
(আমি) রণ জয়ী—মহাশান্তি।
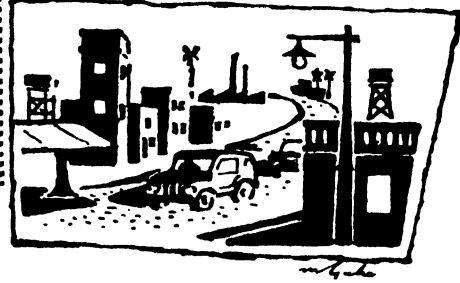
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনেকদিন পর আবার অবিনাশ ডোম ফিরে এসেছে গাঁয়ে। আজ সে যেন বদলে গেছে অনেকখানি। যে হতাশা আর ব্যর্থতা নিয়ে গাঁ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল আজ সেই ব্যর্থতা বাধা উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সে।

—ছোটবাবু!

···চুপ করে কি সব হিসাবপত্র দেখছিল অশোক—এসে প্রণাম করে তাকে অবিনাশ। পরণে পরিষ্কার জামা কাপড়, চেহারাতেও একটা ভদ্রছাপ, হাতে চামড়ার একটা ছোট্ট বাক্স।

—অবিনাশ।

—হ্যাঁ ছোটবাবু।

—কোথায় ছিলি এদ্দিন? বস।

অবিনাশ দাওয়াতেই বসে, দুচোখে তার বৃহত্তর জগতের স্বপ্ন। ছোট্ট এই পাতাজোড়া আর গদারগাঁয়ের সীমানা পারে ওই দূর জগতে কোন মহানগরীর আলো আর লাস্যময়ী রূপ তার দুচোখে কেমন জয়ের আভাষ এনেছে।

—কলকাতায় ছিলাম। তালিম নিচ্ছি ছোটবাবু। ওস্তাদ নকীব খাঁ এর কাছে, বারাণসী ঘরওয়ানা।

অশোক ওরদিকে চেয়ে থাকে।

যে মানুষটাকে দেখেছিল এখানের স্বপ্ন পরিবেশে ব্যর্থ আর পরাজিত হতে, সেই মানুষই আজ বৃহত্তর জগতের মাঝে তার স্থান খুঁজে নিয়েছে—সার্থক হতে পেরেছে।

প্রীতির কথাটা বার বার ভেবে দেখেছে সে।

প্রীতিই বলে—এখানে মানুষ বাঁচতে পারে না। সে শুকিয়ে কুঁকড়ে তিলে তিলে মরবে কঠিন গুমোট এই স্বার্থান্ধ নিষ্পেষণে। হয়তো প্রীতির কথাই সত্যি—আজ অবিনাশকে দেখে অশোকও কথাটা মনে মনে কোথায় বিশ্বাস করতে সুরু করেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চেয়ে থাকে সে অবিনাশের দিকে—চাকরটা চা দিয়ে গেছে ওকে। অবিনাশ চায়ে চুমুক দিচ্ছে কলাইকরা একটা কাপে।

···অশোকের কথায় মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

অশোক বলে ওঠে—সহরই ভালো না রে? বিশেষ করে এখানের আবহাওয়ায় মানুষ টিকতে পারে না।

অবিনাশ যেন চমকে উঠেছে ওর কথায়। যে ছোটবাবুকে দেখেছে এ মাটির এই জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, যার কথাই সর্বাগ্রে তার মনে ভেসে উঠেছে গ্রামকে কেন্দ্র করে, এর শ্যামসবুজ জীবনের মাঝে একটি জীবন্ত সুর, সেই অশোকবাবুর মুখে একথাটায় যেন বেদনাই পায় সে। বলে ওঠে অবিনাশ—তবু এ মাটিতে শেকড় না থাকলে মানুষ বাঁচে কই ছোটবাবু। গাছ লক-লকিয়ে যতই উঠুক, ফুল ফোটাক—ফল ধরুক

তার গোড়া তবু সেই মাটিতেই যে পোঁতা রয়েছে ছোটবাবু, গাঁয়ের মায়া কাটালেই মানুষ কেমন সহুরে আজব জীব তৈরী হয়ে ওঠে।

অশোক চুপকরে বসে রয়েছে।

ও কথা সেও ভেবেছে। দেখেছেও—সহরের মানুষকে। তাদের জীবনের বিলাস-সৌন্দর্য মনুষ্যত্বের মাঝে কোথায় একটা রূপান্তর ঘটেছে, হারিয়েছে মৃত্তিকার নিবিড় সাযুজ্য আর আন্তরিকতার স্পর্শমাখা সহজ সারল্য, সহর আর বর্তমান সভ্যতার এও অবদান।

তবও গ্রামছেড়ে সহরের বিলাসের দিকে—তার জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে যাবার মোহ আসেনি, সমুদ্রমুখী নদীর মত ছুটে চলেছে সে; কিন্তু তবু জোয়ারের বেগ আসে—সেই জীবনকে আবার গ্রামমুখী হতে হয়, পশ্চাদমুখী হতে হয়, প্রকৃতির বিধানেও এর নির্দেশ আছে।

তাই হয়ত অবিনাশও গ্রামে ফিরে এসেছে, না এসে পারেনি। অবিনাশও ভেবে দেখেছে।

ওই কথাটা—ওই যে গাছের সঙ্গে তুলনার কথাটা ওটা তার মনেরই কথা। নিজের জীবন দিয়ে ওটা বুঝেছে, অনুভব করেছে সে বারবার এতদিন সহরের জীবনযাত্রায়।

…সুর সে বাজায়, বাঁশীতে তার সুর ওঠে।

পিছনে থাকে একটি মন। তারই ব্যাকুলতা আর্তি আর আনন্দ ফুটে ওঠে সুরে সুরে।

সেই মনটির কথাই বলেছে অবিনাশ তার নিজের অমার্জিত ভাষায়। বারবার অনুভব করেছে সহরের পরিবেশে তার ফেলে আসা জীবনের কথা।

পাতাজোড়ার শালবনে—আরক্তিম প্রান্তরে সন্ধ্যা নামে; তারাজ্বলা সন্ধ্যা। নীরব নিস্তব্ধ আকাশে ডেকে যায় ঘরফেরা পাখীর দল, ঝরাপাতার মর্মরে দিক-হারা বাতাস দীর্ঘশ্বাস তোলে কি এক নিবিড় বেদনায়। সারগমে…আর সুরের নিবিড় আলাপে সেই বিদেহী সন্ধ্যায় নির্জন বনপ্রান্তরের ছবিই ফুটে ওঠে।

অবিনাশ ভোলেনি বর্ষার সেই ছবিগুলো—কেমন একটি সুন্দর অনুভূতিতে তাকে ভরিয়ে দিয়েছে। কালো কালো পুঞ্জমেঘ জমে নীল পাহাড়সীমায়, গাছগুলো [illegible] ওঠে কালো মেঘছায়ায়;

…শন শন হাওয়া হাকে।

…বৃষ্টির সুর বাজে দিকপ্রসারী ধানক্ষেতের বুকে হাজার নুপুরের ছন্দে।

…অজ্ঞাতেই সেই ছবি তার মনে মল্লারের সুর হয়ে বাজে।

সুরবাজে বসন্তের আলোক ঝলমল বনতলে ভ্রমরের গুঞ্জরণে। কোন নাম না জানা বনফুলের নিটোল মদির সৌরভ মন ছেয়ে রাখে—

…হলুদ লাল কত রং-এর ফুল।

কত সুর—কত পাখীর সুর মেলা—তার বসন্ত রাগকে বিচিত্রিত করে তোলে ওই তার মনের সুরজন্ম।

…হাসে অবিনাশ—তাই ফিরে ফিরে না এসে পারিনা বাবু। ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক শেষ-মেষ সেই গড়েই পড়তে হবে তাকে।

অশোক বলে ওঠে—তা থাকবি কোথায়?

হাসে অবিনাশ। জবাব দেয় না। কি যেন ভাবছে। সেই পরিচিত বাড়ীর পরিবেশে যেতে মন মানেনা।…আজ সে নিরিবিলি চায়।

—ওপাশে বনের ধারে একটা আস্তানা তুলেনে। বাঁশ কাঠ জায়গা দিচ্ছি।

—দেখা যাক।

…অবিনাশ কি ভাবছে। মন যেখানে ভাল লাগে সেইত ঘর, নাই বা রইল সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই, মনের ঘর তো পাঁচীলের আটক মানে না।

কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

বাঁশীটা বের করে।

…সহজ সাবলীল ভাবে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

রাতের অন্ধকারে গ্রামসীমান্তে জেগে উঠেছে একটি সুর; বহুমনের আকুতি আর কান্নামেশা তার প্রকাশ।

জীবনকে—এমাটিকে ভালবাসার সুর; সেই ভালবাসার মাঝে আঘাতের ব্যর্থতায় গুমরে ওঠে পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ যেন ওই সুরে।

অশোক স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে। আজ অবিনাশকে নোতুন করে চিনেছে অশোক।

প্রীতি চুপ করে বসে আছে।

কোথায় তারা চলেছে দুজনে কোন মহানগরীর

আলো ঝলমল পথে, রাস্তার দুদিকে চলেছে লোকজন মাঝে মাঝে কঠিন ইটকাঠের বেষ্টনীর মাঝে মাথা তুলেছে দু একটা গাছ, একটু সবুজ রং বহুকষ্টে তার মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে—ধুঁকছে।

বাতাসে কিসের সুর।

কেমন একটা সাড়া ওর দুচোখে; প্রায়ান্ধকার গ্রাম নয়—লাল কাঁকুরে ডাঙ্গার অসীম নির্জনতা শ্বাসরোধ করে আনেনা। প্রাণ এখানে ওই হাসির স্রোতে উধাও হতে চায়।

—কি দেখছ!

প্রীতি জবাব দিলনা, ওর হাতখানা অশোকের হাতে। সারা শরীরে একটা বিচিত্র শিহরণ; অতীতের একটি সন্ধ্যায় ওই অনুভূতির নবজাগরণ সে প্রত্যক্ষ করেছিল অশোকের চাহনিতে—কোন অন্ধকার গ্রামপ্রান্তের একটি নির্জন বাড়ীতে।

—কিছু না!

…প্রীতির সবকথা যেন শেষ হয়ে যায়। দুর্বার উছল ওই প্রাণের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে আজ উধাও হতে চায়, হারিয়ে ফেলতে চায় ওই কর্মব্যস্ত জীবনের ভিড়ে।

এইখানে এই গাঁয়ের ধারেই যেন নীড় বাঁধবে সে। নিজেকে তাই সঁপে দিতে চায় ওর নিবিড় বন্ধনে।…অশোকের দিকে চেয়ে থাকে সে।

—ভালবাস না?

—কেন? আনমনা অশোক যেন জবাব দেয়।

—কথা কইছ না যে?

—এমনি!

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। বাঁচতে হলে এরই মাঝে বাঁচতে হবে। দিন বদলের দিনে ঝড়ের মাঝে এসে তাকে জয় করেই বাঁচতে চাই। সরে কোন নিরাপদ পল্লীর বুকে কুনোব্যাঙ-এর আত্মরক্ষা করার মূলে আর যাই থাকুক না কেন—সৎসাহস নেই তাই বলবো। আর সেই দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য গ্রামসেবার আদর্শের দোহাই পাড়াও ভীরুতা।

…অশোককে যেন জয় করেছে সে।…হাসছে অশোক।

নিবিড় করে তোলে তাদের বাঁধন। প্রীতি আজ বিচিত্র স্বাদে মনভর তুলেছে। কেমন একটা সুর।

…হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়…কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। রাত নেমেছে নীরব পল্লীর বুকে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ব্যাকুল বেদনায় তারাগুলো জ্বলছে।

কেমন স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রীতি চেয়ে থাকে—নিজের অন্তরের নিভৃতে একটি লজ্জা তার সত্বাকে প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছে সে।

সুরটা কেমন অশরীরি একটি কল্পনার মত সমস্ত চেতনাকে নিবিড় একটি মাধুর্য্যে ভরিয়ে তুলেছে।

…কদমবৌ-এর ঘুম আসে না। সংসারের চাকাটা কঠিন হাতে ধরে থাকতে থাকতে কেমন ক্লান্ত অসাড় হয়ে উঠেছে এর চেতনাগুলো। মানুষের সব কামনা বাসনা-গুলোকে এতদিন সে পিষে ফেলেছিল ওই চাকাটার চাপে।

শ্বশুর—স্বামী—দেবর—পোষ্যবর্গ—জা—নানা জনের প্রতি নানা কর্তব্য। সেই কর্তব্যই করে এসেছে এতদিন কদমবৌ।

ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছে জীবনের নিভৃত গহনে কোথায় একটা ফাঁক আর ফাঁকি বিরাট হয়ে উঠেছে।

…সেই পরম দৈন্য আবিষ্কার করে সেদিন ব্যর্থ মাতৃত্বের নিদারুণ বেদনায়। মা সে হয় নি। হতে পারেনি—হয়তো যোগ্যতা তার নেই। অন্তর মনের সেই নীরব হাহাকার—প্রতিটি দিনের প্রতিটি কাযের মাঝে এনেছে কেমন একটা নীরব অবহেলার আভাষ।

চাপা ইঙ্গিত—সেই কদর্য্য কথাটার স্মৃতি মনে জাগে বারবার। অনেকেই হেসেছিল গোকুলের সেই প্রকাশ্য ঘোষণায়, অনেকে দুঃখও পেয়েছিল।…কেউবা উড়িয়েই দিয়েছে কথাটা।

কিন্তু কদমবৌ-এর মনে তার স্বামীর ব্যবহারটা গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল, আজও ভোলেনি কদম।

ভুবন কোথায় তাকে ভুল বুঝেছে। কান্না আর কান্না—কত আবেদন নিবেদনে হয়তো আপাততঃ থেমেছিল ভুবন, কিন্তু তবুও মনের মাঝে একটা অবিশ্বাসের কালো ছায়া…বিশ্বাসের নীল নির্মল আকাশটুকুকে মলিন করে রেখেছে আজও।

সেই পরম দুঃখের কথা আর কেউ না জানলেও কদম-বৌ জানে। সেইটাই তার জীবনে এনেছে একটা নীরব ক্লান্তি, অবসাদ আর অপমানের আভাষ। কি তার দাম! ·· মা-ই হতে পারেনি কদম।

···এ অভিযোগ সে ভুবনকেও করতে পারে? করতে চেয়েছেও। কিন্তু পারেনি। পুরুষের কাছে নারীর এ অভিযোগ কোনকালেই যেন টেঁকেনি।

তাই কদমও সে চেষ্টা করেনি।

রাত হয়ে আসে! গভীর নিঝুম রাত। বনের দিক থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসে। কোথাও অর্জুন গাছের মাথায় শকুন ঝটপট করছে। কাঁদছে শকুন শিশু—ছোট্ট ছেলের মতই ওই কান্নাটা।

·· জেগে আছে কদম। ঘুম তার আসেনা। কি সব আজে বাজে চিন্তা তার মনে।

অতীতের সেই হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। উঁচু চড়াইএর মাথায় আমবাগানের সীমানা পারে তার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের সেই ছায়াচ্ছন্ন সবুজ কৈশোরের দিনগুলো। বাবুদের বাগানে আমের বোল আসত, শীতের রোদে চারিদিকে বন ভরে উঠতো মিষ্টি একটি স্বপ্নের ইসারায়।

দূর থেকে কদম চেয়ে থাকতো বাবুদের সাদা চক-মিলানো দালানের দিকে। দেউড়ির ফটকে বিচিত্র সাজপরা দ্বারোয়ানজি রোদে বসে খৈনী দলতো—মাঝে মাঝে দেখা যেত ঘোড়া দাবড়ে বাবুরা কেউ বার হয়ে গেল।

ছোটবাবু ওদের থেকে যেন আলাদা ধাতের। বাগানের ফাঁক দিয়ে পাঁচিল টপকে আমগাছ বেয়ে নেমে আসতো ওই বন্দী কোন রহস্য পুরীর বাইরে।

—চল?

···দুহাতে ধুলোময়লা ঝাড়তো জামা কাপড় থেকে। কদম তখনও অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো অশোকের দিকে। সেদিনে তরুণ একটি কিশোর। চঞ্চল উদ্দাম। কেমন যেন ভয় করতো তার।

···ওই বিরাট পাঁচীল-ঘেরা দুমহলা বাড়ীটাকে কেন্দ্র করে তার কিশোর মনে একটা পুঞ্জীভূত রহস্য জমে আছে, ওদের সম্বন্ধে কেমন বিচিত্র ধারণা। অশোককেও তাই কেমন অবাক লাগে তার।

···তেলবিহীন রুক্ষ ঝাঁকড়া মাথা, পরণে একটা শাড়ী—তাও ধুলো আর ময়লায় বিবর্ণ।···কদমের মুখখানা তবুও কচি কাঁচা।

তরুণ দুটি কিশোর কিশোরী কেমন অবাক আনমনা হয়ে চেয়ে থাকে দূরে—গ্রামের ওপাশে নির্জন মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেণখানা—একটু গিয়েই বন-সীমা আর পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যায়।

কাশে তখনও কালো ধোঁয়া কেমন পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমে রয়েছে, বাতাসে ভেসে চলেছে।

পলাশ বনে নেমেছে রংএর হোরি।

আনমনে অশোক বলে—অমনি ট্রেণে করে দূরে দূরে চলে যাবো আমি।

—কদম ট্রেণই দেখেছে। একবার মাত্র চড়েছে সেবার পানাগড়ে মেলা দেখতে গিয়ে। কেমন ভয় করে।

—সত্যি!

—হ্যাঁ। বর্দ্ধমানে পড়তে যেতে হবে এইবার।

কদম কথা বলে না।

দিনের আলো ঝলমল ওই মাঠ—পলাশের রং, পাখী-ডাকা নীল নির্জন কেমন বিষাদময় পাণ্ডুর হয়ে ওঠে।

মনে হয় ছোটবাবু কেমন অজানা দূর ওই আসমানের লোক—ওকে ধরা যায় না।

···অবাক হয়ে বলে—অশোক কাঁদছিস?

—কই না!

···চেপে গেল কদম। কেমন যেন এড়িয়ে যায় তাকে। সেদিনের কিশোর দুটি মন কেমন যেন চিনেছিল দুজনকে।

···অশোককে সেই রুদ্ধ বন্দীশালার পাঁচীল টপকাতে শিখিয়েছিল, মনে এনেছিল নোতুন মানুষ—অন্য জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা। সারা গ্রামের অন্ধিসন্ধি—বন—মাঠ ঘুরে ঘুরে সেই তরুণ মন মুক্ত উদার পৃথিবী তার মানুষকে চিনেছিল। যাদের চেনবার উপায় ছিল না তিন মহলা সেই বিলাসের প্রাসাদ থেকে। কেমন তাদের ভাল-বেসে ফেলেছিল অশোক—নোতুন সেই সুন্দর বৃহৎ পৃথিবীকে ভালবাসতে গিয়ে। তার থেকে কদমও আলাদা নয়। অবাক হয়···ওর চোখে জল দেখে।

···কদম কথার জবাব দিল না, সরে গেল। তার কাছে ওই সবুজ বনানী, ফুলফোটা পলাশ বন—সব কেমন কালো

আঁঠার ঢেকে গেছে! প্রথম অনুভব করে একটি কিশোর মন বিচ্ছেদের নিবিড় বেদনা।

· আজও তা ভোলেনি কদম।

তারপরই বিয়ে হয়ে যায়, হারিয়ে যায় মেয়েটি।

কদমও ভুলে গিয়েছিল সেই দিনগুলোর কথা, অনেক মেয়ের জীবনেই সেই রঙ্গীণ দিন আসে প্রজাপতির মত পাখনা মেলে—আবার কোন দিগন্তে হারিয়ে যায়। দুঃখ পায়—সে দুঃখও ভোলে, নোতুন জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলে।

কদমও তাই চেষ্টা করেছিল স্বামীর ঘরে এসে। নিদারুণ সেই চেষ্টা।

অবাধের সংসার, এতগুলো খাটিয়ে মরদ। স্বামী—বৃদ্ধ শ্বশুর—দেওর পোষ্যবর্গ—সব হাল সে ধরেছিল।

ভেবেছিল বানচাল সংসারের নৌকাটাকে উত্তাল-তুফান থেকে বাঁচাতে পারাটাই সবচেয়ে বড় চাওয়া তার।

···দিনরাত কায আর কায।

ধান ভানতেও দেয়নি বাইরে, ভানারীকে মজুরি বাবদ যে ধান দিতে হবে তাও কম নয়, নিজেই সিজেভিজে করেছে। মুড়ি ভেজেছে ভোর থেকে উঠে। কামিনও রাখেনি, একাই উঠোন—ঘরদোরে ঝড়ামাড়ুলি দিয়েছে ভোরে উঠে, সংসারের অবিরাম ঘূর্ণায়মান চাকাটায় তিলে তিলে পিষে মরেছে।

···বুড়ো অতুল কামার বলে—বৌমা, একটা লোকজন রাখি। তিন বাপবেটায় ওজকার করছি।

মত দেয়নি কদম। ডাঁটো পুরু শক্ত সমর্থ একটি মেয়ে। ভুবন স্ত্রীর দিকে চাইবার সময় পায়নি। সারাদিন ওই শালের আগুনে তেতেপুড়ে হাতুড়ি পিটে এসে পড়েছে আর ঘুমিয়েছে।

···ক্রমশঃ দিন বদলেছে।

আজ বাড়ীতে ধানের মরাই বেঁধেছে অতুল। ভুবন আজ আর পরের শালে মজুর খাটে না, নিজে শাল করেছে দুটো। শূন্য অভাবের সংসারে আজ পূর্ণতার দিন এসেছে।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে?

এতদিন কোন হিসাব কষেনি—লাভ লোকসান খতিয়ে দেখেনি কদম। আজ মনের কোণে জমেছে কোথায় শ্লেষ আর গ্লানির আবছা কালো মেঘ। কি সে পেয়েছে?

নোতুন জা এসেছে—ছোট জা মালতীর কোল ভরে এসেছে একটি নবাগত। কেমন ঘর ভরে উঠেছে।···তাকে বুকে তুলে নিয়েছে কদম।

···কিন্তু দিনের আলোয় যে দুঃখ চাপবার জন্য নিবিড় করে ওকে জড়িয়ে ধরে, রাতের অন্ধকার নির্জনে সেই বুক-চাপা দুঃখ আর হতাশার ঝড় ওঠে।

হু হু ঝড়। একটার পর একটা আঘাত তার মনের সব শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে, ব্যাহত করেছে।

—কেমন যেন চমকে উঠেছিল কদম সেদিন গোকুলের কথা শুনে—একবার সামনাসামনি দেখা হয় নি—ওকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। করবে একদিন।···কিন্তু আশ্চর্য্য হয়েছে সে—যে ভুবনকে—যাদেরকে এতকাল বিশ্বাস করে এসেছে—সে যে মাটিতে ঘর বেঁধেছে সেই ঘর বাঁধার কি দাম, সেই বিশ্বাসের মূল কত হালকা মাটিতে পোতা—দেখে বিস্মিত হয়েছে সে। চমকে উঠেছে।

···বিতৃষ্ণা এসেছে মনের গহনে—সংসারের উপর নিবিড় একটি গোপন কোণে উঠেছে কালো মেঘ।

···ব্যর্থ সে! মা হতে পারেনি।

···পূর্ণ হলে বোধ হয়, এই ঝড় আঘাতগুলো কোথায় স্পর্শ করতোনা। একা অত্যন্ত একক অসহায় সে। স্বামী কোন অন্য মানুষ; কিন্তু সন্তান—নিজের দেহরক্তসঞ্জাত একটি সত্তা—যার সঙ্গে নারীর সম্পর্ক সব চেয়ে আপন, সেই সবচেয়ে বড় নির্ভর।

স্বামীর চেয়েও। স্বামী মারা যাবার পরও সেই পুত্রের নির্ভরেই বেঁচে থাকে মেয়েরা।

তেমনি কেউ নেই কদমের, জীবনের অসীম শূন্যতা তাই মন ভরে তোলে।

···সবদিক থেকেই যেন ব্যর্থ বঞ্চিত সে।

আঘাতই পেয়েছে নানা ভাবে।···তবু একটা নির্ভর তার ছিল। গোপন মনের অন্তরে সেই পরম নির্ভর-টুকুকে সযত্নে স্মৃতির মণিকোঠার অক্ষয় সম্পদের মত আগলে রেখেছিল। আবাল্যের সেই স্মৃতির অমূল্য স্মরণ সম্পদটুকুও আজ কে নিষ্ঠুর হাতে লুণ্ঠন করে নিতে চলেছে।

এই আঘাতটাই বেজেছে সব থেকে বেশী তার অবুঝ মনের অতলে।

সন্ধ্যারাত্রের সেই ছবিটা ভোলেনি কদম।

…ছোটবাবু আর প্রীতির সেই নিবিড় দুর্বল মুহূর্তের দৃশ্যটা। এক নিমিষে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

…সরে এসেছিল অন্ধকারে; আবিষ্কার করেছিল—নিদারুণভাবে হেরে চলেছে সে একটার পর একটা ক্ষেত্রে—জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে।

আজ তাই হিসাব করে। দেখেছে জমার ঘরে কেবল শূন্যই।

রাত কত জানে না।

অসাড়ে ঘুমুচ্ছে ভুবন, একটা জড় পদার্থের মত।

কোন সাড়া নেই, চেতনা নেই। বলিষ্ঠ দুর্মদ দেহটা নিশ্বাসের সঙ্গে নড়চে মাত্র। ওইটুকু ওর বেঁচে থাকার একমাত্র পরিচয়। আর দিনমানের হাঁকডাক ব্যর্থ ওই পর্যন্ত।

গায়ে কেমন যেন শালের আরা আর রাংখাদের ঘাম মেশানো বিশ্রী উৎকট গন্ধ।

প্রথম আজ বিদ্রোহী কোন অতৃপ্ত নারীসত্ত্বা জেগে উঠছে শান্ত ও কল্যাণী কদমের অন্তরের অতলে। সে আজ সবকিছুকে নীরবে ঘৃণা করে। মনে করে এই ঘর বাঁধা—এই ভালোবাসার অভিনয়ে বেঁচে থাকটোই কেমন অর্থহীন—শুধু একটা বোঝা বওয়াই মাত্র।

হু হু বাতাস বয়, তারাজ্বলা আকাশের অসীমে কেমন যেন হুহু কান্না জাগে।

বাঁশীর সুরটা ব্যর্থ অন্তরের নিবিড় কান্নায় গ্রামসীমায় বেণুবন মর্মরে মিশেগেছে। কদম কাঁপছে—একক অসহায় ব্যর্থ একটি নারী।

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রির অন্ধকারে বিস্ফোরণের শব্দ আসে, মালিয়াড়ার জঙ্গল শৃঙ্গে মহিষাণী পাথরের স্তরে ওরা ডিনামাইট চার্জ করে পাথর ফাটাচ্ছে। আবছা আলো দুএকটা দেখা যায় বন পাহাড়ের কোলে—ধরিত্রীর বুক কি এক নবকালের জন্মবেদনায় কেঁপে ওঠে দুঃসহ আর্তিতে।

…ফাটছে কঠিন মৃত্তিকার অতলে পাগল শিলার বুক।

বুম্…ম্… ম্!

নৈশ অন্ধকার কেঁপে ওঠে—

তবুও বাঁশীর সুরের পরশ তেমনিই রয়ে গেছে। বাতাসে বাতাসে পুঞ্জীভূত একালের বেদনায় কাঁপছে সেই সুরটা রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকারে।

…ক'দিন ধরে অশোক নিজের কায নিয়েই ব্যস্ত ছিল। সদরে গিয়ে ওই বনমহালের নিম্নস্বত্ব রেজিষ্ট্রী করা—আরও কয়েকটা কাযে ডুবে ছিল। মনের মধ্যে কেমন একটা অন্য সুর বাজে।

…প্রীতিদের ওখানেই উঠেছিল সদরে। সহরের বাইরে নোতুন চটির দিকে।

…ছোট্ট বাড়ীটা। নীলকণ্ঠবাবু ওকে দেখে খুশীই হন।

নোতুন সহর গড়ে উঠছে ওদিকে।

বাংলার সবুজ সমতলের মাধুর্য্য কেমন অতর্কিতে হারিয়ে গেছে এই দিকটায়।

একেবারে উঁচু চড়াই—স্তরে স্তরে নেমে চলেছে, মাঠের বুকে মাথা ঠেলে উঠেছে কালো কালো পাথরগুলো। তারই ফাঁকে মাথা তুলেছে দু-একটা শাল মহুয়ার গাছ। কালো পাথর আর লাল রং মাটি মিশে কেমন বিচিত্র বর্ণময় হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে ওই সবুজ একটু স্বপ্ন। তার ওদিকেই কালো বন গাছগাছালির সীমা পারে শুশুনিয়া পাহাড়টা উঠে গেছে—নীল জমাট বাধার মত, ওদিকে মাথা তুলেছে বিহারীনাথ, দলমা—একটার পর একটা পাহাড়।

…খুব বেশী দিন নয়—এদিকটা বনপাহাড়ের রাজ্যই ছিল। মানুষ দখলজারি করেছে সহরের শাসনের পরোয়ানা নিয়ে।

…নীলকণ্ঠবাবু ওকে দেখে খুশীই হন। ক'দিন এ বাড়ীতে এসেছেন তিনি।

—এসো। এসো।

…সহরের বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে নেমে ওরা রিক্সা করে গেছে বাড়ীতে। প্রীতি কেমন যেন হারিয়ে যায় খুশীর আভায়। লাল ধুলো ঢাকা এবড়ো থেবড়ো পথে রিক্সাটা চলেছে। দুজনের সান্নিধ্য দুজনের মনে কেমন যেন বিচিত্র সুরের রেশ আনে।

দরজা থেকে নীলকণ্ঠবাবু প্রীতিকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে একটু অবাক হন।

—তুমি!

প্রীতির চোখেও বাবার এই পরিবর্তনটা ধরা পড়ে। থমকে দাঁড়াল একটু। এক মুহূর্ত। কি কর্তব্য স্থির করে নিয়ে সহজভাবেই এগিয়ে যায় প্রীতি। শাড়ী থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে।

—চলে এলাম। ভাল লাগছিল না ওখানে, ওই বনবাসে।

—ও।

…কথার জবাব দিলেন না নীলকণ্ঠবাবু—মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। অশোক রিক্সাওয়ালার দাম মিটিয়ে এই দিকে আসছে।

প্রীতি দাঁড়াল না, ভিতরে চলে গেল। এক মুহূর্তে সে বাবার মনের খবরটাও যেন পেয়ে গেছে। একটু ক্ষুণ্ণ, বিস্মিত হয়েছে প্রীতি বাবার এই বিরক্তিতে।

…অশোকের হাসির শব্দ শোনা যায়।

নীলকণ্ঠবাবু কি যেন বলছেন।

প্রীতি চুপ করে এঘরে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। কেমন যেন অন্য রকম ঠেকে তার কাছে বাবার ওই চাহনিটা।

নীলকণ্ঠবাবু জীবনে অনেক দেখেছেন। দীর্ঘ জীবনে চাকরীর খাতিরে বহু জেলায় ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। হাকিম—ডেপুটি—সাবডেপুটি থেকে মুনসেফ—সাবজজ মায় ম্যাজিষ্ট্রট অবধি চরিয়েছেন। তার উপর উকিল মোক্তার —নানা শ্রেণীর সুবিধাবাদী উপরের তলার সমাজের অনেককেই দেখেছেন। সেদিন যাদের দেখেছিলেন সমাজের সব সুবিধাভোগ করতে,আজও সেই শ্রেণী টিকে আছে বরং বেড়েছে সংখ্যায়। তাদের চেনেন তিনি।

হঠাৎ অতর্কিতে অশোকের চালচলনে সেই ছবিরই আভাষ খুজে পান তিনি।

কথাটা অশোকই পাড়ে।

নীলকণ্ঠবাবু বৈকালের চা-টা বারান্দায় বসে খান, নীচে নিজের হাতে গড়া ছোট একটু ফুলের বাগান। শক্ত মাটিতে গাছগুলো কোন রকমে বহু যত্নের জন্যই বোধহয় চক্ষু লজ্জার খাতিরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। গেটের মাধবীলতার সবুজ রং লাল ধুলোয় মাখামাখি হয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

‥দূরে স্তরে স্তরে উঠে গেছে চড়াই—ঘাসবিহীন রুক্ষ পিঙ্গল জটাজুট সমাকীর্ণ কোন সন্ন্যাসীর মত বিশুষ্ক শীর্ণতা ওর সর্বাঙ্গে মাখানো।

…চুপ করে ওই দিকে চেয়ে আছেন নীলকণ্ঠবাবু। অশোকের কথাগুলো আনমনা হয়ে শুনে চলেছেন।

এমনিই একটা কিছুর কল্পনা করেছিলেন তিনি। অশোক বেশ কিছু টাকা পেয়েছে ওই পাথর বিক্রী করে—মাস মাস মোটা টাকাও পাবে। তাছাড়া জমিদারী—সাজা খাজনা চলে যাচ্ছে, তার বাবদও ক্ষতিপূরণ যা পাবে তা সামান্য নয়।

…বাবা তাকেই এদিককার এষ্টেটের আমমোক্তারনামা দিয়েছেন।

—নীলকণ্ঠবাবু বলে ওঠেন—গ্রামে থাকবেনা তাহলে?

অশোক ওর প্রশ্নে একটু চমকে ওঠে। কেমনযেন অন্তরের নিবিড় গহনে ওর কথাগুলো তীক্ষ্ণধার ফলার মত প্রবেশ করে। ওর দিকে চেয়ে জবাব দেয়—কেন থাকবো না?

—না, এমনিই বলছিলাম।

প্রীতি নিজেই ওদের চা দিতে এসেছিল। বাবার ওই কথাগুলো সেও শুনেছে। কেমন একটু থমকে দাঁড়াল।

একটি নীরব মুহূর্ত!

চাটা ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

—তোমার কোঅপারেটিভ আর সেই স্কুল কি বলছিলে —কতদূর এগোল?

নীলকণ্ঠবাবু ঠিক আগেকার সুরেই কথা বলছেন—যেন আজ অন্য কোন অশোকের সামনে।

অশোক চুপকরে কি ভাবছে।

কেমন যেন আজ সব ভুলে গেছে সে, ওই ওদের কথা।

সদরে এসে সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে একটা বিহিত করবে, আলাপ আলোচনা করবে—অনেক-দিন থেকেই ভেবেছিল। কিন্তু সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে—এই কদিন নানা চিন্তার ভিড়ে। অনেক-গুলো নোতুন ভাবনাও এসে পড়েছে। নিজের ভাবনা। হঠাৎ তারই মাঝে নীলকণ্ঠবাবু কথাগুলো শোনাতে থাকেন ইচ্ছা করেই।

—দেখি ! কতদূর এগোন যায়।

…হঠাৎ প্রীতিকে বের হয়ে আসতে দেখে মুখতুলে চাইলেন নীলকণ্ঠবাবু। বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে প্রীতি। পরণে হালকা নীল রংএর শাড়ী তার সঙ্গে সাদা সিল্কের ব্লাউজটা মানিয়েছে চমৎকার।

—কই তৈরী হয়ে নিন। যাবেন না ?

অশোক আমতা আমতা করে। নীলকণ্ঠবাবুই বলে ওঠেন—যাবে কোথায় ?

—এমনিই। প্রীতি জবাব দেয়।

নীলকণ্ঠবাবু আবার পরিত্যক্ত কাগজখানায় মন দেন। বড় বড় অক্ষরে কাগজে বের হয়েছে জমিদারী প্রথা বিলোপের আনুষ্ঠানিক উৎসব। দীর্ঘ দুশোবছর ধরে কায়েমী শাসনের শেষচিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কর্ণওয়ালিসী আমলের যুগ গেল—আসছে নতুন যুগ। অদৃশ্য আকাশে সেই নবাগত যুগের চরণধ্বনি শোনা যায়।

দুর্গাপুর যেন সেই আগামী কালের জয়যাত্রার পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। চারিদিকে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য—সুপ্ত বনভূমি আর পর্বতসানুর নীচে এতকাল দুর্দম দামোদর নদ বয়ে যাচ্ছিল, তার দিগন্তবিস্তৃত বুকে এতদিন গজিয়েছে ঘন মানা আর কাশ ঘাসের বন, দাঁতাল শূয়োর আর চিতেবাঘ ঘুরে বেড়িয়েছে সেই শিশিরসিক্ত ভিজে বালিতে পায়ের ছাপ মেলে, ওর ধারে নির্জন অসীম বনজঙ্গলে নেমেছে রাত্রির অন্ধকার। বের হয়েছে দস্যু খুনে ডাকাতদল, রেললাইনটা ভয়ে ভয়ে যেখানে উচু পাহাড়ী গর্জে ঢুকছে বনের মুখেই – সেখান থেকেই সুরু হত ওয়াগন লুঠ করার কায।

…আজ সেখানের অতল অন্ধকার দূর হয়েছে—দুর্মদ দামোদর এতকাল প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে এসেছে ঘরবাড়ী—সবুজ শস্যক্ষেত, সারাদেশের দুঃখ আর চোখের জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল তার বুক—সর্বনাশা দামোদর। আজ তাকে বাঁধ দিতে চলেছে মানুষ।

একালের নোতুন মানুষ, নোতুন সমাজ।

হয়তো সেই দস্যুর দল আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে আছে, তারা আজও নিঃশেষ হয় নি। রূপ বদলাবে মাত্র। তাদের কাউকে কাউকে দেখেছেন আবার নীলকণ্ঠবাবু—নোতুনরূপে।

মিলমালিক নিবারণবাবুরছেলে প্রশান্তকেও দেখেছেন। হঠাৎ যেন ঠিকেদারী নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বন-পাহাড় থেকে পাথর সাপ্লাই দিচ্ছে—ওদিকে আরও কি সব ঠিকে নিয়েছে।

মহৎ যজ্ঞে কিছু অপচয় অপব্যয় হয়ই—হচ্ছেও। সমাজের বুকে কিছু পাপ চিরকালই থাকবে। সুযোগ পেলে তারা মাথা তোলে, তাই বলে যজ্ঞের উদ্দেশ্য অসাধু নয়—জড়বুদ্ধি যদি অকল্যাণের কাছে পরাজিত হয়—সে ওই শুভবুদ্ধিরই দুর্বলতা এবং তা নিশ্চয়ই সাময়িক।

কথা বলেন না নীলকণ্ঠবাবু। বয়স হয়ে আসছে। জীবনের শেষ পাদের দিকে এসে এমনি একটি যুগসন্ধিক্ষণকে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্যে তিনিও বিস্মিত হয়েছেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবটাকেই বিচার করতে পারেন।

সন্ধ্যা নামছে !

শুশুনিয়ার পাহাড় শ্রেণীর দিক থেকে ভেসে আসছে পাখপাখালীর ডাক। শান্ত স্তিমিত দিগন্তে ঘুমের স্তব্ধতা নামছে। আঁধারে মিশে গেল কালো পাহাড়—গাছগুলো। গ্রীষ্মের গুমোট গরম বাতাস—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে আসে—মনোরম একটি পরিবেশ। নীলকণ্ঠবাবু চিন্তার অসীমে কেমন যেন হারিয়ে গেছেন।

—বাবু।

চাকরটার ডাকে চমক ভাঙ্গল।

আলোটা নামিয়ে দিয়ে যায়—সেই সঙ্গে এনে দেয় গড়গড়া। সদ্য-ধরানো তামাকের মিষ্টি গন্ধে বাতাস মো মো করছে—জীবনে ওই একটি তার বিলাস। তামাকটুকু। স্ত্রীও তাকে এর থেকে বিরত করতে পারেনি। কত চেষ্টা করেছে।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

একটা নিবিড় প্রেমের স্নিগ্ধ স্মৃতি এখনও মনের অতল রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়। শান্ত কল্যাণময়ী একটি নারী।

…তার পাশে আজকের প্রীতিকে কেমন নিদারুণ বেমানান ঠেকে। এরা আরও উগ্র—প্রকট নিজের কথা—স্বার্থের কথা—আর চাওয়া পাওয়ার স্বপ্নেই বিভোর।

সেদিনকার মেয়েরা এদের তুলনায় শিক্ষিত মার্জিত ছিল কিনা সেটা আলোচনার বস্তু। কিন্তু মানিয়ে নিয়ে

চলতো, সকলকে নিয়ে বাঁচবার দুর্বার আগ্রহ তাদের ছিল, আর চাওয়াও ছিল কম। সেই ভালোমানুষী সকলকে নিয়ে থাকাটা যদি অশিক্ষা আর মূর্খতারই পরিচয় হয়—তবু সেও হয়তো ভালো ছিল—এই আত্মকেন্দ্রিক জীবন আর স্বার্থান্ধ সমাজশিক্ষার থেকে।

…আলোটার চারিপাশে কয়েকটা পোকা ঘুরছে, কোত্থেকে এসে জুটেছে তারা, উড়ছে বাতাসে—মাঝে মাঝে একটা প্রজাপতি কাঁচের গায়ে আছড়ে পড়ে ব্যর্থ উন্মাদনায়।

…চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকেন নীলকণ্ঠবাবু। সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি। একই মোহের অন্ধ উন্মাদনায় পতঙ্গ ছুটে এসেছে বারবার—ডানা পুড়ে ঝলসে না মরা অবধি রেহাই নেই তাদের।

অশোকের কথা মনে পড়ে।

সারাবাড়ীটা নিথর নিস্তব্ধ। এখনও ফেরেনি ওরা। …কলকেতে টিকের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে আবছা অন্ধকারে। বাতাসে ভেসে আসে কোথায় সঙ্গোপনে ফোটা রজনীগন্ধার ম্লানসৌরভ। এত পরিবর্তন এত অনাগতকালের পদধ্বনির মাঝে—ওই পতঙ্গ আর আলোর মাতামাতি, বাতাসে রজনীগন্ধা ফুলের সৌরভটুকু আজ মদির কল্পনায় ছেয়ে দেয় মন।

কোথায় একভাবেই সেই জীবনধারা বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে—যুগকালের সীমা পার হতে—কোন অনাগত কালের দিকে, ভালোমন্দ পাপপুণ্যে মিশিয়ে।

তবু কোথায় যেন হারে মানুষ—নীলকণ্ঠবাবুর আশাও কোথায় ব্যাহত হয়েছে। একালের মানুষের উপর এসেছে কেমন হতাশার ভাব।

হয়তো বয়সের দোষ। বেশীবয়সের সবাই যেন তাদের বিগত দিনগুলোকেই আদর্শময় আর গৌরবের বলে মনে করে। একালের যতকিছু সব মনে হয় তাদের কাছে অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য।

কিন্তু একে—এই আগামীদিনগুলোকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, বিরাট সম্ভাবনাময় কোন নোতুন দিন, তাকে গড়বার—সার্থক করবার মানুষেরই অভাব।

এই কথাটাই মনে হয় বারবার।

[ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

আমাদের মাঝে এসেছিলে তুমি একশো বছর আগে
ভাবিতে সে কথা সবাকার বুক ভ'রে ওঠে অনুরাগে।
　　দেবশিশু এক নৃত্যচপল
　　এসেছে জাতির বুকে দিতে বল,
তেজোদীপ্ত মূরতি তোমার আজিও হৃদয়ে জাগে।
দিয়েছ সবারে ত্যাগের মন্ত্র, 'মানুষ' হইতে শিক্ষা
হে তাপস কবি, তোমার কাছেই আমরা নিয়েছি দীক্ষা।
　　তোমার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বাণে
　　ভণ্ড-কপটে নীচে টেনে আনে
বলে, "ওগো কবি, তব সরলতা দাও
　　　　আমাদের ভিক্ষা।"
অমর তোমার নাট্য-প্রতিভা, তোমার হাসির গান
স্বদেশপ্রেমের সেই সে কবিতা জড়বুকে দেয় প্রাণ।
　　পাহাড়ের বুকে নির্ঝর সম
　　সুরের লহরী কি বা অনুপম!
জটিলতা ভরা এ জীবন থেকে দিতে পারে জানি ত্রাণ।
ভারতীর শুভ আশিস্ তোমায় দিয়েছে পরম সিদ্ধি
পেয়েছ জীবনে স্বর্গীয় সুখ,—সাধন পথের ঋদ্ধি।
　　স্মরিয়া তোমার মহানাদর্শ
　　জাগিবে আবার ভারতবর্ষ,
জগৎ-সভায় আসন তাহার নিশ্চয়ই হবে বৃদ্ধি।
শতবরষের পুণ্যলগনে মনে জাগে বারবার
নিঃস্ব আমরা কি দিয়ে সাজাবো অর্ঘ্যের উপচার।
　　শ্বেতচন্দন, বরণের ডালা—
　　এনেছি গাঁথিয়া কুসুমের মালা,
এনেছি গভীর হৃদয়ের প্রীতি—একটি নমস্কার।

আহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

আহার সম্পর্কে আমাদের দেশের সংস্কার পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় সুদৃঢ়। আহারের অভ্যাস সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট গোঁড়ামি আছে সন্দেহ নেই; তা ছাড়াও নিষিদ্ধ-আহার সম্পর্কে আমাদের দেশে যে পরিমাণ স্মার্ত বিধান আছে, তা অন্যত্র কল্পনার অতীত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ভক্ষ্য বস্তু সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে তার উপর লোকাচারের অলিখিত বিধি-নিষেধ আছে। প্রাচীনপন্থীরা এই সব বিধিনিষেধ যে কী ভাবে পালন করবার চেষ্টা করতেন তা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আচার প্রবন্ধ' গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদ থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে। ভূদেব বলেছেন, "ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়ুর্বেদসম্মত গুণদোষাদি বিবৃতি করিয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ সম্বন্ধের কয়েকটী উদাহরণ প্রদান করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন যে অপথ্য ভোজন এবং ভোজনজনিত দোষ, বিরেচন বমন শয়ন এবং [পরবর্তী] হিতভোজনের গুণে শমতা প্রাপ্ত হইতে পারে; বিশেষত তরুণবয়স্ক অথবা ব্যায়ামশীল কিংবা বলবান এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিগণের শরীরে ঐ দোষ 'যেন' অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনের দ্বারা যে পাপ জন্মে তাহা ঐ রূপে বিতথপ্রায় হয় না।"

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি লক্ষণীয়। এই 'পাপ' জন্মাবার কল্পনাটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হতে পারে। অধুনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আহার ও আহার্য-নিরূপণ করবার একটা প্রয়াস দেখা যায়। অবশ্য খাদ্য-তাত্ত্বিকের নির্দেশ অনুসারেই যে সব সময় খাদ্যাখাদ্য নির্বাচন করা হয় এমন নয়, প্রধানত রসনার তৃপ্তির দিকে দৃষ্টি রেখেই খাদ্য নির্বাচন করা হয়, অবশ্য সেই সঙ্গে রুচির একটা অলিখিত নিয়ম থাকে।

আহার ও আহার্য সম্পর্কে কয়েকটি আধুনিক মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকে পরিপাক-ক্রিয়ার (metabolism) কথা স্মরণ করে খাদ্য নির্বাচন করতে বলেন। কেউ কেউ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, কেউবা ভিটামিন-যুক্ত খাদ্য, আবার কেউবা সব্‌জির পক্ষপাতী। অধুনা খাদ্যগত এলার্জি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় খাদ্যবিধির পুনর্বিচার হয়। অনেক বাঙালী মাছ-ভাতকে মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধির কারণ বলে মনে করেন। মতান্তরে মাছের মূল্য স্বীকৃত হলেও ভাত গমজাত খাদ্যের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত। আমিষ-ভোজী নিরামিষ-ভোজীর চেয়ে শক্তিমান্ এরকম একটি বিশ্বাস বহুল-প্রচারিত; আবার নিরামিষ ভোজীরা বেশি শ্রমসহিষ্ণু এ অভিমতও অনেকে পোষণ করেন।

প্রাচীন বা মধ্যযুগের অনেক মনীষীর মতোই স্বামী বিবেকানন্দও আহার্য সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। তিনি কোনো আদর্শ আহার্যের তালিকা প্রণয়ন করেননি বটে কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা উল্লেখযোগ্য, প্রণিধানযোগ্যও বটে। বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি আহার্যের শুদ্ধি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের খাদ্যের তুলনা করবার আগে তিনি বলেছেন।

"আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্ম-সম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্যের মতে আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, রামানুজাচার্যের মতে ভেষজ-দ্রব্য। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কার্য কি করেই বা করে? কদর্য আহারে ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ-শক্তির হ্রাস বা বিপর্যয় হয়, এ কথা সকলের প্রত্যক্ষ। অজীর্ণদোষে এক জিনিষকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোনও বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং

শীতের শেষে

(পহেল্‌গাঁ—কাশ্মীর)

বন্ধুর

(সোনমার্গ গ্লেসিয়ার—
কাশ্মীর)

ফটো : সন্তোষকুমার দাস
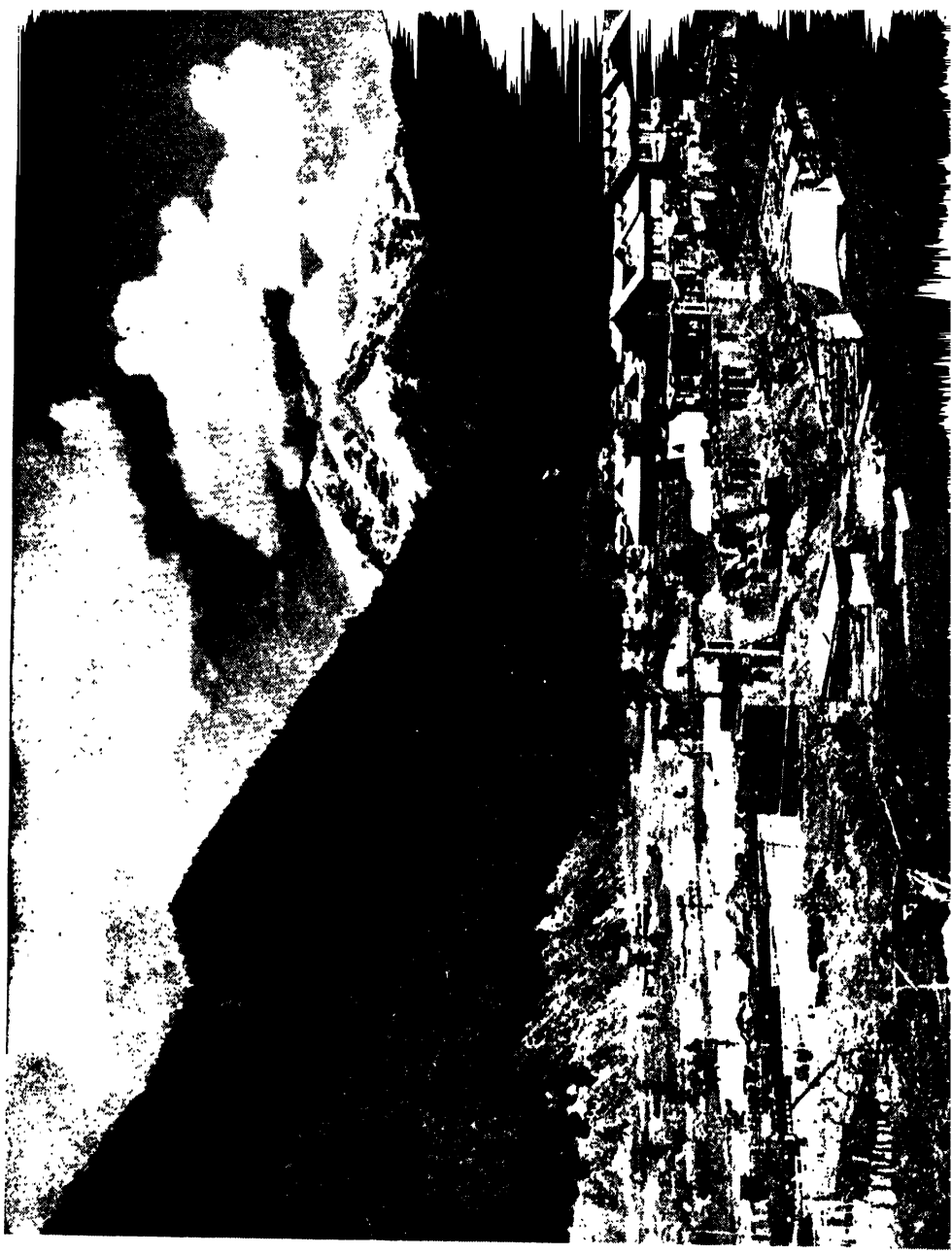
মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাচবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব—যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে আধারটা নিয়েই টানা হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলেছেন, জাতিদোষ, অর্থাৎ যে দোষ ভোগ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ রসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। আশ্রয় দোষ, অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে। দুষ্ট লোকের অন্ন খেলে দুষ্ট বুদ্ধি আসবেই, সতের অন্ন খেলে সৎবুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্ত দোষ, অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট কেশাদি দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ ও নিমিত্ত দোস থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই কর্তে পারে, আশ্রয় দোষ থেকে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুৎমার্গ, 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না।' তবে অনেক স্থলেই 'উল্টা সমজ্‌লি রাম' হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভুতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।"

স্বামীজী ভারতবর্ষের খাদ্যকে জাতি দোষের দিক থেকে আদর্শস্থানীয় বলেছেন। নিমিত্ত দোষ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

"নিমিত্ত দোষ সম্বন্ধে বর্তমান কালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে: ময়রার দোকান, বাজারের খাওয়া —এ সব মহা অপবিত্র এবং দেখতেই পাচ্ছ কিরূপ নিমিত্ত দোষে দুষ্ট, ময়লা, আবর্জনা পচা পক্কড় সব ওতে আছেন, এর ফল হচ্ছে তাই।"

আমিষ ভক্ষণ সংগত কিনা এ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতে যে মাংসের সুপ্রচুর ব্যবহার ছিল তা তিনি স্বীকার করেছেন। ভারতবর্ষে নিরামিষ আহার প্রধানত জৈন, বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব প্রভাবের ফল। আমিষাশী আর নিরামিষাশীদের মধ্যে দুই পক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি আছে। স্বামীজী ঐ যুক্তিগুলির কয়েকটি উল্লেখ করে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য।—

"সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার ত বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে হিন্দুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিন্দুদের ঐ যে ব্যবস্থা জন্মকর্মভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তার পক্ষে নিরামিষ—আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরি চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈকি। যতদিন মনুষ্য সমাজে এই ভাব থাকবে 'বলবানের জয়', তত দিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার কর্তে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বল্লে চলে না—জাতির তুলনা করে দেখ।"

খাদ্য যে পুষ্টিকর হওয়া প্রয়োজন স্বামীজী তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

"অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি ও শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে;—যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?"

ডাল, ভাত, আটার রুটি, মাছ, শাক-সবজি আর দুধ —এইগুলি স্বামীজীর মতে আদর্শ খাদ্য। তিনি পয়সা থাকলে মাংস খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, অবশ্য প্রচুর মশলা বাদ দিয়ে। তিনি ডালকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে স্বীকার করেছেন, তবে ডাল দুষ্পাচ্য বলে তিনি ডালের ঝোলটুকু মাত্র খেতে উপদেশ দিয়েছেন। কলাইসুঁটির ডাল সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"কচি কলাইসুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য ও সুস্বাদ; প্যারিস রাজধানীর ঐ সুপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইসুঁটি খুব সিদ্ধ করে তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধ-ছাঁকনির মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ, ধনে, জিরে, মরিচ, লঙ্কা, যা দেবার সাঁতলে নাও— উত্তম সুস্বাদু সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে ত উপাদেয় হয়।"

পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করে বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করবার **পরও বাঙালীর খাদ্য স্বামীজীর কাছে বিশেষ রুচিকর**

ছিল! তাঁর একটি উক্তি বাঙালীর রসনাগত প্রাণকে তৃপ্ত করবে।—

"নানান দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, সুক্তো, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না।"

অবশ্য বাঙালীর খাদ্য কেবল রসনার তৃপ্তির জন্য তাঁকে আকৃষ্ট করেনি; তিনি এই খাদ্য আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী বলেছেন। তাঁর এ সম্পর্কে উপদেশ প্রণিধানযোগ্য।—

"এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব বাঙ্গালার, ওদের নকল কর যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক মাত্র —আধা সাঁওতালী বীরভূম বাঁকড়োয় দাঁড়াবে !!"

একালে শহরে শহরে যে খাবারের দোকান স্থাপিত হয়েছে তার ঘৃতপক্ক খাবারকে তিনি 'বিষলড্ডুক' বলে অভিহিত করেছেন। লুচি কচুরি প্রভৃতি পশ্চিমা খাবার। তিনি বলেছেন যে 'পাকি রসুই' ও অঞ্চলে লোকে কালে-ভদ্রে খায়। বাংলা দেশের শহর অঞ্চলে এই খাবারের প্রচলন যে অজীর্ণ রোগের কারণ। তিনি বাঙালীর পল্লী অঞ্চলের খাদ্য পরিত্যাগ করে একালের শহুরে খাদ্য গ্রহণ করার জন্য তিরস্কার করে বলেছেন,—

"তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে মাটি দেওয়া—ময়রার দোকান-রূপ সর্ব-নেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম, বাঁকড়ো, ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলাইয়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও ট্যাঁই মাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে, সইভ্য হচ্ছে !!! নিজেরা ত উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশশুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, শহুরে লোক। তোমাদের মুখে ছাই! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর মর হবে, তবু বলবে না যে এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে !! কোনও রকম করে শহুরে হবে !!"

রামকৃষ্ণের দর্শন

জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার আই, এ, এস

(১) পাশ্চাত্ত্যদর্শনের প্র্যাগম্যাটিজম্ এর মূলকথা এই যে সত্যের প্রবৃত্তি সামর্থ্য আছে, কার্য্যকরিতা আছে: সুতরাং যে-তত্ত্ব বিশ্বাস ক'রে কাজ করলে কাজে সার্থক ও সবল হওয়া যায়, সেই বিশ্বাস সত্য। এককথায়, সত্যের প্রমাণ তার প্রবৃত্তি—সংবাদে, তার ফলে। বিখ্যাত মার্কিনী দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়ম জেম্‌স এই মতের সমর্থক। অধুনা মার্কিনী পণ্ডিত ডুয়ীও এই মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী।

(২) প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরতত্ত্বকেও রামকৃষ্ণ কার্য্যতঃ যেন-সত্য—এই ভাবে বিশ্বাস করতেও গ্রহণ করতে বলেছেন। এই বিশ্বাসে ফল পাওয়া যায়। তর্কের নীতি অনুযায়ী যদি অচলও হয় (তবে একথা একেবারেই বলা চলে না যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারে অসিদ্ধ) তবুও ফল পাওয়া গেলে ঈশ্বর সত্য স্বীকার করতেই হবে। ঈশ্বরকে সাকার বিশ্বাস ক'রে যে লাভ হয়, সেই একই লাভ যদি ঈশ্বরকে নিরাকার বিশ্বাস ক'রে পাওয়া যায়, তাহ'লে এই যুক্তি অনুযায়ী প্রমাণিত হবে ঈশ্বর, যুগপৎ সাকার ও নিরাকার। ঈশ্বর-তত্ত্বের এই অভিনব প্রমাণ রামকৃষ্ণ দিয়েছেন। তর্কশাস্ত্রের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যা সত্য তা সব-সময়ই সত্য, তাতে ফল ভালই হ'ক বা খারাপই হ'ক; সত্য আমার হিতের দিকে মুখ চেয়ে কথা বলে না। প্রশ্ন ওঠে সফলতা বলতে, রামকৃষ্ণ কি বুঝেছেন? সাংসারিক সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয়ই নয়। এই লাভ সেই লাভ—যা পাওয়ার পর অন্য কোনও লাভে লোভ থাকে না। তার যুক্তি এই: একমাত্র ঈশ্বরই অপবর্গ দিতে পারেন, ঈশ্বর বিশ্বাস করে অগ্রসর হওয়া গেল; অপবর্গ পেলাম; সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

(৩) বর্তমান যুগে বিশ্বাসের আবশ্যকতা স্বীকৃত

হচ্ছে। জীবনে বাঁচতে হ'লে কতগুলো বিশ্বাসকে গ্রহণ করতেই হবে এবং এই বিশ্বাস থেকেই দায়িত্ব বোধ জন্মায়। শুদ্ধাস্তিত্ববাদীরাও অনেকটা এইরকম কথা বলছে। ঈশ্বরকে প্রমাণ করবার অন্য কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ নেই। প্রথমে বিশ্বাস, তারপর বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আলোকে কিংবা অন্ধকারে ঝাঁপ। এই বিশ্বাসের ডাল ভাত, কাপড় চোপড় যোগাড় ক'রে দেবার ক্ষমতা বা সামর্থ্য হয়তো নেই। এই বিশ্বাস জীবনকে গতিশীল ও চালিত করবার জন্য। জীবনে যা মহৎ ও মূল্যবান, এই বিশ্বাসে সেগুলো পাওয়ার সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই জন্যই এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য।

(৪) রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যের সাথে আধুনিক চিন্তা-ধারার বিশেষ অসংগতি নেই।

(৫) এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার বিবেচনা করাতে কোনও স্বতোবিরোধ নেই। দেখা বা জানা নির্ভর করে অধিকারের ওপর। অধিকারীভেদ অনুযায়ী জ্ঞানের ভেদ উপস্থিত হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংস্পর্শজাত যে-জ্ঞান তা আপেক্ষিক হ'তে বাধ্য। নিরপেক্ষ সত্য চিন্তার দ্বারা সম্পূর্ণ ধরা যায় না, যদি নিরপেক্ষ সত্য কিছু থাকে। মানুষের অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় তার সবই আপেক্ষিকতার ছায়া-বিনষ্ট। এক ব্যক্তির কাছে যে বস্তু সাকার রূপে উপস্থিত হয়, অন্যের কাছে সেই—বস্তুই নিরাকারের প্রতীতি আনে। সত্য জানবার ক্ষমতা সকলেরই একপ্রকার নয়। চোখে দোষ থাকলে ভিন্ন রং দেখা যায়। মস্তিষ্কের দোষ থাকলে অনুভবের পার্থক্য হয়। পেটের গোলমাল থাকলে মেজাজ ও নজর দুইই অল্প হয়। এসব তো আমরা নিত্যই দেখছি। বস্তুতঃ একই দ্রব্য দুইজন দুই বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারে, এতো খুবই সম্ভব। একই দ্রব্যকে বড়ো ও ছোট, চলমান ও অচল—দুইই প্রতীয়মান হয়। কতদূর থেকে ও কোন স্থান থেকে দেখা হচ্ছে তার উপর এই প্রতীতি নির্ভর করে। ঈশ্বরের বেলাতেও যার পেটে যা সয়। এই পেটে সওয়ার উপমার মধ্যে দ্রষ্টা ও জ্ঞাতার সামর্থ্য ও সংস্কারের তত্ত্ব নিহিত আছে, আপেক্ষিকতার কথা আছে। জ্ঞানের জন্যও এক বিশেষ প্রকার সামর্থ্য দরকার, তা পারমার্থিক জ্ঞানই হ'ক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

(৬) যারা কঠোর-প্রকৃতির তাদের ভাব একরকম; যারা কোমল-প্রকৃতির তাদের ভাব আর এক রকম। আসল কথা সংসারে আমাদের কাম্য শান্তি, সৌহার্দ, সন্তোষ ও শুভবুদ্ধি। যে জীবনের তাপে দগ্ধ হ'য়ে শান্তি পেয়েছে, সে প্রথম প্রেমিকের নবারুণ দৃষ্টি নিয়ে জগৎকে দেখতে পারে না। যার যা পেটে সয়, এটা শুধু খাদ্য নির্বাচনের সূত্র নয়। এটা সত্য—নির্বাচনেরও সূত্র। কারও কাছে, বাবা দেবতা, কারও কাছে বাবা বন্ধু, কারও কাছে বাবা শত্রু। এমন মন কি হ'তে পারে যার মধ্যে কোনও চিন্তা নেই? ক্লেশ নেই? ভঙ্গি নেই? যদি থাকে, সে মন কিছুই দেখবে না। দেখবার জন্য আমাদের দাম দিতে হয়। একপেশে ও একরঙা দেখতে পাব, এই সর্তে আমরা সত্যকে পাই।

(৭) জৈন দার্শনিকেরা এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর নাম অনেকান্তবাদ। রামকৃষ্ণের মধ্যে এই আপেক্ষিকতা থাকা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারান নি। সত্যকে কল্পনা বা ব্যক্তিবিশেষের মনের বিকাশ ব'লেই উড়িয়ে দেন নি। এইখানেও তিনি অত্যন্ত আধুনিক। নানারকম দৃষ্টিকোণ আছে, এই যুক্তির উপর দৃষ্টবস্তুকে অলীক এরকম ধারণার প্রশ্রয় তিনি দেন নি। দৃষ্টির নানাত্ব সত্ত্বেও দৃষ্ট যে বস্তু হ'তে পারে এই তত্ত্বের সমাধান রামকৃষ্ণের মধ্যে কি ভাবে, হয়েছে তা আমরা পরে দেখব।

(৮) জ্ঞানের পথে বিচার ক'রে চললে শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সবই অ-সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়। জ্ঞান-মার্গীর কাছে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য। অন্যান্য সব মায় জগৎ জীব, সমস্তই অলীক। এই ব্রহ্মের বর্ণনা সম্ভব নয়। ভাষা দিয়ে একে প্রকাশ করা যায় না। দেশকালপাত্র গুণ, কারণ, সম্বন্ধ কিছুই ব্রহ্মে প্রযোজ্য নয়। ব্রহ্ম সেইজন্য অনির্বচনীয়।

(৯) বুদ্ধির পথ ছেড়ে, ভক্তির পথে চলতে ব্রহ্মকে ঈশ্বর ব'লে মনে হয়। ঈশ্বর আবার কখনও পুরুষোত্তম-রূপে, কখনও সাকার-দেব-দেবী রূপে উদিত হন। যতক্ষণ আমি-বোধ থাকে, ততক্ষণ সীমার মধ্যে থাকতে হয়; ও যতক্ষণ দেশকাল-কার্য্যকারণের সীমা অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়, ততক্ষণ ব্রহ্মকে সসীম মনে হয়।

এই মনে হওয়াকে মিথ্যা বলা চলে না। যে-হেতু সত্য ও মিথ্যার বিচার মনকে নিয়েই করতে হবে। দৃষ্টি-বিভেদে একই বস্তু ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইজন্য নিরাকার অসীম ও নির্গুণ ব্রহ্ম, ধারণার নানাত্বের জন্য নানারূপে প্রতিভাত হন। সব রূপই ব্রহ্মর রূপ, এই অর্থে সব রূপই সত্য।

(১০) বিখ্যাত পেঁয়াজের খোসার উপমা দিয়ে রামকৃষ্ণ এই বোঝাতে চেয়েছেন যে খোসার সমষ্টিই গোটা পেঁয়াজ; খোসা বাদ দিলে কিছুই থাকে না। সমস্ত খোসার সমন্বয়ে যে বস্তুটি সঞ্জাত তারই নাম পেঁয়াজ। তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীব, জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব নিয়ে ব্রহ্ম। খোসার মধ্যে পেঁয়াজ আছে এবং পেঁয়াজের মধ্যে খোসা আছে। নেতি নেতি বিচার ক'রে যে ব্রহ্মে পৌছান যায় সেটা সমগ্র সত্তা। সেটা কোনও সত্তার শেষ পরিত্যক্ত এক বিশেষ অংশ নয়। যে-হেতু সমগ্র, সেইজন্য বিশেষের কোনও বর্ণনাই তাতে খাটে না। সমগ্র বিশ্ব যে একটা সুসমঞ্জস সত্তা, অসংখ্য অনু-পরমাণুর বিশৃঙ্খল গোলমাল নয়, এই বোধের উপর ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত।

(১১) প্রশ্ন স্বতঃই ওঠে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। প্রথমে তাঁকে কোনও এক বিশেষ সমর্থক ব'লে ধারণা করাতে অনেক বাধা। তাঁর উক্তি তাঁকে কোনও একটা বিশেষ মতাবলম্বী ব'লে প্রচার করে না। তাঁকে বলা যেতে পারে সমগ্রবাদী। জীব ও ঈশ্বর দুইই সত্য। জীব বহু। জীবাত্মা ও ব্রহ্মাত্মার বিভেদও সত্য, একত্বও সত্য। এক হ'য়েও তারা ভিন্ন। ভিন্ন হয়েও তারা এক। প্রত্যেক ধারণাই সমগ্রের একটা অংশ উন্মোচিত করে। নামের পার্থক্য সমস্ত দেখাই নিজের মনের উপর। যেমন যেমন মানুষের মনের গঠন বদলাবে, শরীরের গঠন বদলাবে, সংস্কারের ধারা বদলাবে, তেমন তেমন নবনব রূপে সত্তা প্রকাশিত হবে।

(১২) একটা সরীসৃপের কাছে বিশ্ব যে-রূপ নিয়ে ধরা দেয় মানুষের কাছে সে-রূপে ধরা দেয় না। এর থেকে সীমা ও মাত্রার শাসন প্রতিপন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রতিপন্ন হয় যে বিভেদ ও বিরোধের মধ্যে অনেক তফাৎ। দৃষ্টিভঙ্গির বিনাশে, দর্শনেরও বিনাশ। এই বিশ্ব সংসারে বস্তু কি? এই প্রশ্ন উত্থাপন করার সঙ্গে-সঙ্গেই এর সদুত্তর পাওয়াতে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বস্তুর অভিধা নিয়েই তো কত গোল? সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর, যে যেভাবে বস্তু শব্দের অর্থ নির্ণয় করবে, তার উপর নির্ভর করবে। মানুষের বেদনাদায়ক এই দৌর্বল্য অতিক্রম করা সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ মানুষের এই মাত্রাকে স্বীকার ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন।

(১৩) হৃদয়ের ক্ষুদ্র-দৌর্বল্য পরিত্যাগ ক'রে সংগ্রাম করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে। সে অনেক যুগ আগেকার কথা। হৃদয়ের ক্ষুদ্র-দৌর্বল্য ছাড়া বৃহৎ দৌর্বল্যও আছে; ব্রহ্মের রস আস্বাদন করবার, তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করবার দৌর্বল্য। এ দৌর্বল্য পরিহার ক'রে অসীম সঙ্গীহীন পথের পথিক হওয়ার আহ্বান রামকৃষ্ণ দেন নি। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুইকে সাগ্রহে ভোগ করার মনুষ্যত্ব ও সার্থকতা তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

(১৪) ঈশ্বরের বিভিন্নরূপকে তিনি জলের বিভিন্ন নামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বরফ ও জল এর তুলনা দিয়েছেন। দূর থেকে দেখা ও কাছ থেকে দেখার উপমা দিয়েছেন। বহুরূপীর উদাহরণ দিয়েছেন। সব সময়েই যেন এই কথা বলতে চেয়েছেন যে—বিরাট সত্তবান ব্রহ্ম নাম-রূপের বাইরে হ'য়েও নামরূপের মধ্যে রয়েছেন। এক হ'য়েও বহু প্রকাশের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছেন, যেমন ঊর্ণনাভ। এক ও বহুর সম্বন্ধ, বস্তু ও গুণের সম্বন্ধ, নিরাকার ও সাকারের সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও লীলার সম্বন্ধ, সবই এই একই ভাবে তিনি বুঝতে চেয়েছেন।

(১৫) আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মধ্যে ব্রেডলি এক ও বহুর সম্বন্ধে যা বলছেন তা অনেকটা রামকৃষ্ণের মতের সমান। ব্রহ্মকে কোন উপাধি দিয়ে বর্ণনা করা চলে না। সব উপাধিই ব্রহ্মের মধ্যে লীন হ'য়ে আছে। পরস্পর-বিরোধী বহুর মধ্যে অজ্ঞেয় কোন সামঞ্জস্য বা ঐক্য আছে—যার বলে সবই ব্রহ্মের মধ্যে বৃত। সবই ব্রহ্মের মধ্যে; তথাপি ব্রহ্ম সবার উপরে ও কোনও কিছুর মধ্যে সীমিত নয়। এই ব্রেডলিই বলেছেন এমন কোনও কর্ম বা সাধনা নেই যেটাকে ঈশ্বর পৌছবার একমাত্র নির্দিষ্ট

পথ বলা যেতে পারে। যেমন রামকৃষ্ণ বলতেন, যত মত তত পথ।

(১৬) ব্রহ্ম শুধু নাম নয়। পানি, জল, ওয়াটার সব কিছুই নাম। কিন্তু নামগুলো একটা বস্তুর নির্দেশ দেয়। সেইরূপ দেবতা, ঈশ্বর, পুরুষোত্তম, মায়া ও শক্তি —সবই ব্রহ্মের এক একটা বিশেষ অংশের নাম। নামগুলো শুদ্ধ শব্দের সমষ্টি নয়। বরফ ও জলের তুলনায় মনে হয় তিনি ব্রহ্মের দুই রূপের কথা উল্লেখ করেছেন: একটি নিষ্ক্রিয় রূপ ও অপরটি সক্রিয় রূপ, একটি অব্যক্ত অবস্থা ও অপরটি ব্যক্ত অবস্থা। বরফ গলে জল হয়; যা-অব্যক্ত তাই হয় জল। আবার বলেছেন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি এক। বস্তু ও বস্তুশক্তি পৃথক নয়। দুটো একই পদার্থের ভিন্ন দিক। ব্রহ্ম সেই বরফ—যার মধ্যে গলবার শক্তি আছে ও যা গ'লে জল হয়।

(১৭) এই সব বিচার করতে গেলে কার্য্যবাদ ও কারণবাদের আলোচনা এসে পড়ে। ব্রহ্মবোধ, বিশ্বজনিত-বোধ সমগ্র বিশ্ব, মানুষের মনে যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তাই থেকে আধ্যাত্মিক জাগরণ হয়। এমন সময় হয়ত ছিল বা হবে যখন মানুষ যে বিশ্বের থেকে পৃথক, এই বোধ তার ছিল না বা চ'লে যাবে। একটা বিরাট একের ঘনিষ্ঠ ও অপরিহার্য্য অঙ্গ আমি, এই বোধকে ফিরে পাওয়ার সাধনাই অধ্যাত্ম-সাধনা। কোথা থেকে যেন পার্থক্যের ও বিচ্ছেদের এক মরুভার আমাদের চিত্ত অধিকার করে বসেছে।

(১৮) এই বিচ্ছিন্ন ভাব অপসারণ করাই ধর্ম। বহুর বিশৃঙ্খল সমষ্টি থেকে ব্রহ্ম সুশৃঙ্খল সমন্বয়ী চেতনা আমাদের অন্যরকম স্তরে উপনীত করে। অধ্যাত্ম সাধনা মূলতঃ সমগ্রের সাধনা, সমন্বয়ের সাধনা। ঐক্যকে মেনে নিলে সবই একসূত্রে বদ্ধ। তবে সত্যই কি এই বিশ্বসংসারে ঐক্য আছে? জগতে নিয়ম আছে, নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে যেমন সংসারে আছে। সুতরাং এক ব্রহ্ম ছাড়া অন্য—কিছু নেই ও সব-কিছুই শুধু (খলু) ব্রহ্ম একথা কি আধুনিক যুগে বিচারসহ? ব্রহ্মকে আগে পৌটলার মধ্যে ভর্তি ক'রে, ব্রহ্মই পৌটলা বলার সার্থকতা কি?

(১৯) এই বিশ্ব-সংসার যে ভ্রমাত্মক বস্তু, এ আমাদের সাধারণ চেতনায় ধরা পড়ে না। মাটিতে পা ঠুকে বলবার সাধ যায়, "ভ্রম নয়, ভ্রম নয়, অতি কঠোর সত্য এ মাটি।" তবে বিচার করতে গিয়ে যদি দেখা যায় নানা রকম বিরোধী বর্ণনা একই বস্তু সম্বন্ধে দিতে হচ্ছে—তাহলে এমন হয়তো হ'তে পারে যে আমাদের বিচারেই ভুল। প্রত্যক্ষকে তর্ক দিয়ে উড়োন যায় না। প্রত্যক্ষ বাধিত হয় অন্য প্রকার প্রত্যক্ষ দিয়ে।

(২০) সুতরাং ব্রহ্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি বিচারের বিষয় প্রধানতঃ নয়। প্রচলিত সাধারণ বোধ যখন অসাধারণ বোধ দিয়ে বাধিত হয়, তখনই বিচার পিছিয়ে আসে। পাণ্ডিত্য দিয়ে, তর্ক দিয়ে ঈশ্বর লাভ করা যায় না, একথা রামকৃষ্ণের। বিশ্বাস ও সাধনার বলে এই বস্তু লাভ করতে হয়। একটা অন্য স্তরের, অন্য প্রকারের চেতনা, অধ্যাত্ম-বিদ্যার গোড়ার কথা।

(২১) শুধু লেখাপড়া করলেই, টাকা পয়সা কামালেই, কামিনীকাঞ্চনের সেবা করলেই এই বোধ জাগে না। কখনও এই বোধ আসে সহসা ও স্বতঃই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরকার হয় সাধ্য ও সাধনার। জগৎ ব্রহ্মের অংশ বিচারিত হ'লেও প্রকৃত অধ্যাত্মবোধের জন্য প্রয়োজন জগৎকে অকিঞ্চিৎকরণ। বিশ্বকে, সংসারকে অকিঞ্চিৎ-কর ধারণা না ক'রে বিশ্বাতীতের বোধ আনা সম্ভব নয়। বিষয় সেইজন্য পরিহার করবার কথা ওঠে যদি বিষয়ও ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্মানুভূতির কোনও ভাষা নেই। সেই জন্য ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।

(২২) দার্শনিক দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের ব্রহ্ম একটি বিশেষ অনুভূতি। সেই অনুভূতিতে বহু জীব, জগৎ সংসার সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়। এই নেতিমূলক বর্ণনা ব্রহ্মের সম্বন্ধে চলে। কিন্তু কারবার করতে হ'লে, কথা কইতে গেলে, জগৎ ও অন্যান্য জীবের সংগে সম্বন্ধ স্থাপন করতে থাকার অবস্থায় ইতিবাচক বোধে এই সমস্তকে স্বীকার করতে হয়। এই একত্বের স্বীকৃতি সমগ্র বেলের উপমায় রামকৃষ্ণ আমাদের সামনে ধরেছেন।

(২৩) একেকে স্বীকার করলে এক থেকেই বহু হয়েছে এবং বহুর সম্ভাবনাকে এক থেকে বাস্তবে আনবার শক্তিও একের মধ্যে আছে, এই তত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। শক্তিকে মায়া (মিথ্যা) অর্থে স্বীকার করলে বহুকেও মিথ্যা করতে হয়। যতক্ষণ অহং আছে ততক্ষণ অন্যান্য

জীব ও ঈশ্বর, (সাকার, নিরাকার) সবই আছে এবং সবই সত্য। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশের তারতম্য আছে। বৃটিশ দার্শনিক ব্রেডলির বস্তুসত্ত্বার তারতম্যেরও শংকরের ত্রিবিধ সত্যের যে মতবাদ, সেই মতবাদের সাথে রামকৃষ্ণের এই মতবাদের মিল আছে। প্রকাশের তারতম্যের উপর সত্যের তারতম্য নির্ভর করে।

(২৪) বিশ্ব এক। এক থেকে বহু। বহুর মধ্যে এক এবং বহুর অতীত এক। এক থেকে বহুতে যাবার শক্তির নাম কালী। বহুর অতীত যে এক তার নাম মহাকাল। রামকৃষ্ণের আধুনিকতা এইখানে যে তিনি জগতকে মিথ্যা বলেন নি। অন্যান্য জীব ও তাদের এই জগৎকে সত্য বলেছেন। এর থেকে এই অনুমিত হয় যে মানুষের সুখ, দুঃখ, প্রণয়, কলহ, আবেগ, উদ্বেগ এই গুলোকে তিনি মিথ্যা বলেন নি। মানুষের মানুষামি পরিত্যজ্য, এই কথা তিনি বলতে চেয়েছেন, বলা যায় না। তবে ঈশ্বর লাভের পর সংসারে থাকার তাৎপর্য্য এই যে সব কর্মের পটভূমিকা বদলিয়ে যায়, অনেক কর্ম খসেও যায়। এইখানে রামকৃষ্ণকে ভাল ক'রে জানবার দরকার। সামাজিক যে-সব কর্ম যার উপর মনুষ্য-সমাজের জীবন নির্ভর করছে সেগুলো কি ধর্ম সাধনার অন্তরায়, যেমন কৃষি, বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান—এগুলো কি ঈশ্বর লাভের সঙ্গে সঙ্গে লয় হয়? আমার মনে হয় চাপরাশ-তত্ত্বের মধ্যে এর উত্তর আছে। যে যে বিষয়ে চাপরাশ পেয়েছে, সেই বিষয়ে সাধনা করাতেই তার জীবনের সার্থকতা। যার সাহিত্যে চাপরাশ নেই, সে সাহিত্য সাধনা করলে শুধু পণ্ডশ্রমই হবে। তবে প্রত্যেককেই ঈশ্বর চাপরাশ দেন এমন কথাও নেই।

(২৫) শেষ জিজ্ঞাসা। ঈশ্বর লাভের সার্থকতা কি? ঈশ্বর লাভের সার্থকতা কি? ঈশ্বরকে পেলে ডাল ভাত, জামা কাপড়, মেয়ে মদ পাওয়া যায় না; চাকরীতে উন্নতি হয় না; লটারীতে টাকা পাওয়া যায় না; মোকদ্দমায় জেতা যায় না। এতে কি আমার শক্তির কিছু বৃদ্ধি হয়? দশের উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা কি বাড়ে? তাও যদি না হয়, তবে ঈশ্বর লাভের দরকার কি? উত্তর, আনন্দ পাওয়া যায়। যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। এমন একটু কিছু পাওয়া যায় এই পাওয়াতে, যার পরে আর সব পাওয়া পানসে লাগে। তাছাড়া ঈশ্বর তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন, এও একটা লাভ আছে। যে-ভাবে রক্ষা করলে ভক্তের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ হয় সেইভাবে তিনি তাকে রক্ষা করেন, অবশ্য ভক্তের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়।

রণ হুঙ্কার

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

"জয় হিন্দ্ জয়।" মন্ত্রে
ভারত মাত্‌লো।
জয়ের নেশায় মাত্‌লো।

হিমাচলের অচল প্রাচীর
যে ছিল গো উন্নত শির,
আজ কিনা তাই মিত্র বেশে
শত্রু এসে ভাঙ্‌লো।
অচল প্রাচীর ভাঙ্‌লো।

ভারত মায়ের বীর ছেলেরা,
সমর ভীত নয় তো এরা,
মৃত্যু পণে শত্রু নাশে
জয়ের আশে রাঙ্‌লো!
শোণিত লালে রাঙ্‌লো।

সসাগরা এই হিমালয়
গর্জে ওঠে "ভারত কি জয়"—
যুয়ান যত ছুটলো ঈশান,
বাজিয়ে বিষাণ জাগ্‌লো!
রণ দামামায় জাগ্‌লো!

মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় কি মাগো,
ভাই বোনেরা, জাগো জাগো,
জীবন দিয়ে হঠাও ওদের
শত্রু মোদের ভাগ্‌লো,
দেখবি ওরা ভাগ্‌লো।

কৃতজ্ঞ

শ্রীঅনিল মজুমদার

ঠাকুরদা যে আমাদের জন্যে দেশে একখানা প্যালেস রেখে গেছেন সেটা কোনদিনই দেখা হয়নি, গ্রামে বেড়াতে এসে সেইটেই নজরে পড়লো সবার আগে। এই তিন মহলা বাড়ী, বিরাট বিরাট ঘর, বড় বড় দালান, দামী দামী আসবাবপত্র, ঝাড় লণ্ঠন, আয়না ঝালর, এই সব দেখেই দিনকতক কাটলো। কলকাতা সহরে তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকি—তার একখানা বৈঠকখানা একটা খাবার ঘর, আর একখানাতে দাদা বৌদি থাকেন। আমার ভাগ্যে রাত্রে শোওয়া বৈঠকখানা, ঘরে, অন্য সময়ে যত্রতত্র, নড়তে চড়তেও সব সময়েই এর ওর সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া—এই তো সেখানকার জীবন। আর এখানে একখানা বড় ঘরে খাস বার্মা-টিকের তৈরী একটা বিরাট খাটে একাই শুয়ে থাকি। মনে মনে তাই ভাবি—কেন ঠাকুরদা দেশ ছেড়ে কোথাও নড়তে চাইতেন না। সত্যিই ত, এমন আরাম ছেড়ে কোথাও কি যাওয়া চলে? তবে হ্যাঁ—ঠাকুরদার ছিল বিশাল জমিদারী,ঘরে ছিল গরু, মাঠে ছিল ধান, পুকুরে ছিল মাছ, দিব্যি তোফা খেয়ে দেয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন তিনি। তার অবর্তমানে এই প্যালেস-খানা যদিও আমাদের কপালে জুটেছে, কিন্তু জমিদারিটি জোটেনি। সেটি গেছে গভর্ণমেন্টের গর্ভে। নিজেরাও আমরা লাঙ্গল চালাতে শিখিনি, তাই কলম ধরেছি, দুদিন বাদে হয়ত ঝাড়ু নিয়ে জমাদার হব, কিন্তু জমিদার হবার আর কোন আশা নেই। আর জমিদারীও যখন নেই, তখন এই বিশাল সৌধও বেশী দিন টিকবে না, কালে একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

অনাদরে অযত্নে বাড়ীখানা আজকাল বেজায় শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। দেখলে **সত্যিই** বড় মায়া হয়, দুঃখও হয়, কিন্তু উপায় কি? যেখানে মানুষ বাস করেনা সেখানে শ্রী থাকবে কোত্থেকে? এখনও যে দাঁড়িয়ে আছে এই যথেষ্ট। আবহাওয়াটাও বড় ম্রিয়মাণ, সব সময়ই একটা গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে একে ঘিরে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা হানা বাড়ী। বর্তমানে এর এ দশা হলেও একদিন কিন্তু এর প্রাণ ছিল, জমজমাট ছিল, ঐশ্বর্য ছিল, সব কিছুই ছিল। বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছে এখানে, বহু মানীর পদধূলি পড়েছে এর বিশাল অঙ্গনে। সে সৌভাগ্যসূর্য আজ অস্তমিত।

দিন কাল অনেক বদলে গেছে, মানুষেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ে এই বিশাল সৌধেরও আজ তেমন কোন দাম নেই। তাকে রক্ষা করাও আমাদের ক্ষমতার বাইরে। একদিন হয়ত সে ভেঙ্গে পড়বে, ধ্বসে পড়বে, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়ত তাই দেখব, কিন্তু রক্ষা করতে পারবোনা। তবু মনে হয় এ ভেঙ্গে পড়লেও এর কি কিছু অবশিষ্ট থাকবে না? মনে হয়—থাকবে নিশ্চয়ই থাকবে। ওর ওই ভাঙ্গা ইট-কাঠের সঙ্গেই হয়ত বেঁচে থাকবে ওর একটা বহুদিনের ঐতিহ্য, একটা ইতিহাস, যার হয়ত কোন শেষ নেই, মৃত্যু নেই, চিরদিনই হয়ত সে বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, মানুষের অন্তরে অন্তরে।

বসে বসে এই সবই ভাবছিলাম, এমন সময় বৌদি এসে ঘরে ঢুকলেন। হেসে জিজ্ঞেস করলেন. তোমার হলো কি, নিমাই, দেশে এসে তুমি যে দেখছি একেবারে ভাবুক বনে গেলে।

সত্যিই তাই, কি যেন একটা হয়েছে আমার। কলকাতা সহরে হট্টগোলের মধ্যে একটু ভাববার চিন্তবারও অবকাশ খুঁজে পেতামনা, এখানে এসে সেইটেই পেয়েছি যেন। অফুরন্ত সময়, অফুরন্ত অবসর। কত কি যে

ভাবি তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই, অনেক কিছুর কোন মানেই হয়না, তবু ভাবি হয়ত ভাবতে ভাল লাগে বলে। আসলে এই বাড়ীখানাই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে, একে নিয়েই আমার যত ভাবনা।

বৌদিকেও সেই কথাই বললাম।

বৌদি শুনে হাসলেন, বললেন, আজে-বাজে ভেবে মাথা খারাপ করে লাভ কি, বল? আর এই বাড়ীখানার কথা বলছ? আজকালকার দিনে এর আর দাম কি? তোমার ঠাকুরদার কাছে এটা ছিল হয়ত একটা মস্ত বড় সম্পদ, কিন্তু তোমাদের কাছে এটা একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। একে তোমরা রাখতেও পারবে না, রাখতে যাওয়াও ভুল।

ঠিক কথাই বলেছেন বৌদি, একটা খাঁটি সত্যি কথা বলেছেন তিনি। যে বোঝা বইবার ক্ষমতা নেই, সে বোঝা যদি ঘাড়ে এসে পড়ে তবে সেটা অভিসম্পাত ছাড়া আর কি? যুগও হয়ত সেই কথাই বলবে। অতীতের আজকাল কোন দাম নেই, ঐতিহ্যকেও কেউ তেমন আমল দেয়না, মানুষ ও বস্তুর মধ্যেও বোধহয় কেউ কোন পার্থক্য খুঁজে পায়না, দুনিয়াটাই চলছে এক সুরে, এক তালে সবারই পিছনে রয়েছে একটি প্রশ্ন বিনিময়-মূল্য মানুষেরও আজকাল বিচার চলে তারই ওপর।

বৌদি হচ্ছেন অত্যন্ত আধুনিকা, যুগের আলোকপ্রাপ্তা তিনি। সারা জীবন সহুরে আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে জীবনে যা তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি বলেছেন, এর জন্যে তাঁকে আমি দোষ দিই না মোটেই। কিন্তু আমার রক্তে আছে ঐতিহ্যের মোহ, তাই আমি সব বুঝেও বুঝতে চাই না, অযথা ভাবি, অকারণে মনকে উত্তেজিত করে ফেলি।

বৌদির মত আমিও কলকাতাতেই মানুষ, পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে আমারও তেমন কিছু সম্পর্ক ছিলনা, কিন্তু এখানে এসে আমি যেন হঠাৎ বদলে গেছি। এর নির্জন শান্ত পরিবেশ, অক্লান্ত পাখীর ডাক, দিগন্ত ছোঁয়া খোলা মাঠ, কাঁঠালের বাগান, যুঁই-চামেলীর গন্ধ আমার মনে আনে অনাবিল এক আনন্দ। তাতেই আমি মেতে উঠি যেন। এসে অবধি যে এর কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। নীলকুঠি দেখা হয়েছে, শিবমন্দিরে গিয়ে মাথা ছুঁইয়েছি ষষ্ঠীতলা রথতলার মাঠেও ঘুরে এসেছি একদিন। সেদিন ত মল্লিকদের পুকুরপাড়ে গিয়ে সারা দুপুরটাই কাটিয়ে এলাম। তবু যেন মনে হয় আমার কিছুই দেখা হলো না, আরও এখনও বাকী রয়েছে। সেদিন ঠিক করলাম নদীর দিকে যাব। নদী মানে গঙ্গা। একদিন আমাদের গ্রামের পাশেই ছিলেন, এখন অনেকখানি দূরে সরে গেছেন। ফেলে যাওয়া পথটির আজকাল নাম হয়েছে ছাড়ি-গঙ্গা। বর্ষাকালে কিন্তু এই ছাড়ি-গঙ্গাও আসলের সঙ্গে মিশে যায়, তখন তার ঘোলাটে জল এসে আমাদের গ্রামকেও পুণ্য পরশ দেয়।

বৌদি ধরে বসলেন তিনিও যাবেন। নদীর ধারে বেড়াতে তাঁরও নাকি খুব ভাল লাগে। আপত্তি করবার কিছু নেই, তখনই রাজি হয়ে গেলাম।

দু জনে বেড়িয়ে পড়ি। বৌদি সেদিন খুব সাজলেন। একখানা ভাল সিল্কের সাড়ি পরেছেন, তার ওপর চাপিয়েছেন একটা দামী ওভারকোট। গলায় সিল্কের মাফলার, পায়ে চপ্পল, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। হেসে জিজ্ঞেস করি, খুব যে সেজেছ বৌদি, কিন্তু দেখবে কে? —যারা আছে তারাই দেখবে। একটু না সাজলে কি ভাল দেখায়? বংশের একটা ইজ্জৎ নেই।—সোজা কথার লোক বৌদি। শুনে মনে মনে হাসি।

শীতকাল। সূর্যাস্তের তখনও অনেক দেরী। রোদ্দুরেরও তেমন তেজ নেই। বেশ ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। পথ চলাটাও তাই তেমন ক্লান্তিকর মনে হচ্ছেনা।

দেখতে দেখতে ডাক্তারখানা পেরিয়ে এলাম, পেরিয়ে এলাম ডাঙ্গাপাড়ার বিল। নগর-পোতা গ্রামও আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে গেল। ছাড়ি-গঙ্গার পাড় ধরে চলেছি। এক জায়গায় একটা বড় কলাবাগান পেলাম। লম্বা লম্বা কলাপাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের ঝিকিমিকি আলো। ভারী ভাল লাগলো দেখতে।

আরও খানিকটা হেঁটে তবে আসল গঙ্গাকে পেলাম। নদীতে এখন তেমন জল নেই, একদিকে বিরাট বালির চর পড়েছে। চরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে খান দুই গরুর গাড়ী, দুচারজন মানুষ, মনে হয় পারাপারের খেয়ার জন্য অপেক্ষা

করছে তারা। নদীর অপর পারে ঘন আমকাঁঠালের বাগান, বাঁশের ঝাড়, দু'চার খানা কুঁড়ে ঘর।

চারিদিক জুড়ে কি এক নিবিড় প্রশান্তি। তারই মধ্যে ডুব দিলাম যেন। চমক ভাঙ্গলো বৌদির কথায়। তিনি বললেন, নৌকো করে একটু ঘুরে এলে হয় না, নিমাই ?

বৌদি যেন আমার মনের কথাটা জানতে পেরেছিলেন। দুজনেই নীচে নেমে এসে ঘাটের দিকে গেলাম। আমাদের দেখে দুচারজন মাঝিও কাছে এগিয়ে এল। একজন বুড়ো মাঝি আমায় জিজ্ঞেস করলে—'কোথায় আপনারা যাবেন, বাবু ?

—কোথাও যাবনা বাপু, নৌকো করে নদীতে একটু ঘুরে বেড়াবো। যাবে তুমি।

—কেন যাব না ? আসুন না আমার সঙ্গে।

বুড়ো মাঝিকেই অনুসরণ করি। ঘাটে অনেকগুলো নৌকা বাঁধা। তারই একখানায় গিয়ে উঠলাম। বুড়ো মাঝি বৌদিকে খুব খাতির করে পাটাতনের ওপর একখানা চাটাই বিছিয়ে দিলে। বৌদিও দেখলাম বেশ খুসী মনে তার ওপরেই বসলেন। আমিও একটা জায়গা করে নিলাম এক ধারে। নৌকা ছেড়ে দিলে।

ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা। দুজন মাঝি। বুড়ো হাল ধরে বসে আছে, অপরজন সমানে দাঁড় টেনে চলেছে। নৌকা চলেছে উজানে, ধীর মন্থর গতিতে। দাঁড় টানার শব্দ কানে আসে, আর শুনি জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

বৌদি দেখি বুড়ো মাঝির সঙ্গে এরই মধ্যে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছেন।

—এখানে বুঝি লোকে খুব নৌকো চড়ে ?

—কোথায় মা ? সেদিন কি আর আছে ? দেশে মানুষই নেই, এখন তোমাদের মত দুচার জন এসে ক্বচিৎ কখনও চড়ে।

—তাহলে তোমাদের চলে কি করে ?

—এই কোন রকমে চলে যায় মা। বর্ষাকালে ত আর কিছু চলে না, তখনই যা দু চার পয়সা রোজগার হয়। তাতেই সোমবছর চালাতে হয়।

—অন্য সময় কিছু করনা ?

—আগে ধান পাট বইতাম, এখন আর হয় না। দেশে রাস্তা ঘাট হচ্ছে, হাওয়া গাড়ী চলছে, সে সব তাতেই যায়। নৌকোর দিন চলে গেছে, মা।

—মাছ ধরনা কেন ?

—সব জায়গায় কি মাছ ওঠে, মা।

তাদের কথাবার্তাগুলো আমার কানে আসছে, কিন্তু তাতে কোন মন দিতে পাচ্ছি না। আমি তখন নদীর দুধারের দৃশ্য দেখতেই ব্যস্ত। নদী গেছে এঁকে বেঁকে, কোথাও জল কম, কোথাও বেশী। বুড়ো মাঝিকে তাই খুব সাবধানে নৌকো চালাতে হচ্ছে, পাছে চড়ায় কোথাও আটকে পড়ে। একটু যেতেই একখানা বড় গ্রাম পেলাম। নদীর ধারে বিরাট একখানা বাড়ী। শুনলাম সেটা সেখানকার জমিদারের কুঠিবাড়ী। আরও একটু দূরে একটা স্নানের ঘাট, অনেকেই স্নান করছে সেখানে। এক জায়গায় গোটাকয়েক মোষকেও জলে ডুবে থাকতে দেখলাম।

সূর্য অস্ত যেতে আর বেশী দেরী নেই। আকাশের আলোও বেশ একটু ম্লান লয়ে গেছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। শীত-কালে এমনিই হয়, হঠাৎ যেন অন্ধকার নেমে আসে। হেঁটেই বাড়ী ফিরতে হবে, পথটাও বড় কম না, এই সব সাতপাঁচ ভেবে মাঝিকে নৌকো ঘোরাতে বললাম।

ঘাটে এসে যখন নৌকো ভিড়লো, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারিদিকে একটা আবছা অন্ধকার। অবস্থা দেখে বৌদি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বললেন, পথ চিনে ঠিক বাড়ী যেতে পারবো ত, নিমাই।

তাঁকে অভয় দিয়ে বলি, কিছু ভেব না বৌদি, বাড়ী ঠিক পৌছে যাব।

বেজায় দেরী হয়ে গেছে, বৌদি যেন তখন কোন রকমে বাড়ী ফিরতে পারলেই বাঁচেন। অসম্ভব তাড়া। তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে বুড়ো মাঝির হাতে দিলেন তিনি।

মাঝি বোধহয় এতখানি আশা করেনি, তাই খুসী হয়েই জিজ্ঞেস করলে—তোমরা কোন গাঁয়ের মা, আগে ত কখনও দেখিনি তোমাদের ?

—আমরা আসছি মধ্যমগ্রাম থেকে।

—মধ্যমগ্রাম থেকে ? কাদের বাড়ী বল তো ?

—বিশ্বেশ্বরবাবুর বাড়ী। চেনো তাঁকে ?

কপালে দুহাত ঠেকিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মাঝি বললে, তাঁকে চিনবো না মা ? তাঁর দয়াতেই ত এখনও দুবেলা দু মুঠো খেতে পাচ্ছি। এ নৌকো তাঁরই টাকায় তৈরী—সে টাকা আমি তাঁকে কোনদিনও ফেরৎ দিতে পারিনি। খুব ভাল হয়েছে, মা, আজ তোমরা এসে সে নৌকো চড়ে গেলে। আমারও কিছু ঋণ শোধ হলো।

তারপরেই নোটখানা বৌদির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সে জোড়হাত করে বললে, আমায় মাপ করো মা, তোমাদের কাছে ত আমি টাকা নিতে পারবো না, কর্তাবাবু তাহলে কি ভাববেন।

পৃথিবী যে এখনও ধ্বংস হয়নি, এখনও আকাশে সূর্য ওঠে, চন্দ্র ওঠে, তারায় তারায় আকাশ ভরে যায়, মানুষও এখন মরেনি, কৃতজ্ঞতাও পৃথিবীতে এখনও লোপ পায়নি, মাঝির কথায় সেইটেই বারবার মনে হলো আমার। আনন্দে আবেগে আমার দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, মুখের কথাও বন্ধ হয়ে গেছে, হতবাক হয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। বৌদির প্রায় সেই অবস্থা, তবু তিনি শেষ চেষ্টা করে দেখলেন।

—তোমার পাওনা টাকা তুমি কেন নেবে না, মাঝি ? এ যে বড় অন্যায় হবে।

—অন্যায় কিছুই হবে না, মা। এ নৌকো তোমাদেরই। যখন খুসী এসে চড়ে বেড়িও। আমিও খুসী হয়ে তোমাদের ঘুরিয়ে আনবো। কিন্তু দয়া করে আর টাকার কথা তুলো না, মা।

চুপ করে গেলেন বৌদি, আর পেড়াপেড়ি করলেন না।

সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছেন, ঘন অন্ধকার নেমেছে নদীর এধারে ওধারে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। অনেকখানি যেতে হবে, অনেক কিছু পেরুতে হবে, বাড়ীর অন্যান্য লোকজন হয় আমাদের জন্য চিন্তা করছেন, এসব কথাগুলো যেন মনেই আসছে না, একজায়গায় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি শুধু। বৌদিও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি তার স্থির, মুখেও কোন কথা নেই, হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা তখনও তেমনি খোলা, নোটখানাও মুঠোর মধ্যে জোর করে ধরে রেখেছেন তিনি।

আর থাকতে পারলাম না, নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারলাম না, মুখ ফুটে বলেই ফেললাম তাই।

—দেখেছ ত বৌদি, ঠাকুরদা শুধু বাড়ীখানাই রেখে যাননি, আরও অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন তিনি, যা ভাঙ্গিয়ে আরও ক'পুরুষ খেতে পারবো আমরা।

বৌদি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। নিঃশব্দে নোটখানা ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পুরে ব্যাগটা বন্ধ করলেন তিনি।

ইত্যবসরে মাঝিও তার নৌকায় ফিরে গেছে।

পথে পাওয়া

শ্রীঅমরনাথ ঘোষ

চলেছি আজ সুদূর মেঘের পারে
তুহিন শৃঙ্গের ধারে
জানিনা সেথায় কি আছে চাহিবারে
মুকুট শৃঙ্গের পারে।
আমি যাই, আর আছে মোর সাথে
কোন সে সাথী মরুপারের,
আমি চাই, পাই নাতো তারে
মিশে যায় মরুপারে।

যেথা হতে আসে চলে যায় সেথা
আমি খুঁজি হেথাহোথা
পাই না, হায়রাণী কেবলি হায়রাণী
মন বলে কর্‌ছে বুঝি বেইমানী।
মন মানে যখন বলি
পথে গেছে পথের সাথী
দুঃখ, সে তো পথের ধারের—
থাকবে চিরকালের তরে।

দারুব্রহ্মের ঠাঁই

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

লবণাম্বুর বেলাভূমি,…পুরীর সাগর সৈকত।

ফ্ল্যাগ্ পোস্ট্-এর কাছে বালির ওপর ফেলে রাখা মস্ত নৌকাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এল ভাব-সিক্ত কণ্ঠের আবৃত্তি ঃ

'সাগর জলে সিনান করি
সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে
শিথিল পীতবাস'…

—ধেৎ!' মেয়েলী গলার আপত্তি আবৃত্তিটার পথরোধ ক'রল।

—'ধেৎ বললে? কা'র লেখা জানো?'—আবৃত্তি-কারীর প্রশ্ন শোনা গেল।

—'জানি জানি, খুব জানি। তবু, আমার ভাল লাগে না।'

—'কেন কল্যাণী?'

—'ওই যে…অঙ্গে তব শিথিল'…।

—'হায় বঙ্গ ললনা! জীবনে প্রথম সমুদ্রের উর্মিমালা দেখেও তোমাদের মনে…নাঃ তোমরা, বাঙ্গালী মেয়েরা, বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাও কল্যাণী।'

—'অর্থাৎ বিয়ের পরেই আমরা ফুরিরে যাই, এই বলতে চাও তো?' বলে কল্যাণী হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে—'পুরীতে সমুদ্র দেখতে এসেছ, না আমায় দেখতে এসেছ বল তো?'

—'মানে তু…মি…।'

—'না কোনও মানে নেই। দেখতো সমুদ্রটা কি দামলে! কেমন একটানা উত্তাল হয়ে তীরে আছড়ে পড়ছে।'

—'ওরকম দুর্দম কেন জান তো?…এটা উপসাগর, খুব অগভীর। তার তাই অত হই-হল্লা।… ঠিক মানুষেরই মত। যা'র যত গভীরতা কম, তা'রই তত বাচালতা।'

—'দোহাই তোমার, সুন্দর সমুদ্রকে শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখো, বৈজ্ঞানিকের চোখে নয়।' কল্যাণীর কণ্ঠে অনুরোধ ফুটে উঠল।

ওদের কথার আওয়াজ কানে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। নৌকাটার অন্যদিকে ঘুরে যেতেই ওদের দেখতে পেলাম। মনে হ'ল বেশীদিন ওদের বিয়ে হয়নি। সঙ্গে বছর দু'এর একটি বাচ্চা। ওরা আমায় দেখে গম্ভীর হ'ল। তাড়াতাড়ি বি. এন. আর. হোটেল-এর পথ ধ'রলাম। বেলা তখন তিনটে।

ওরা যে এই প্রথম সমুদ্র দে'খল, তা' বোঝা যায় বেলা তিনটে না বাজতেই ওদের সমুদ্রের ধারে ছুটে আসা দেখে। নিশ্চয় আজই সকালে এসে পৌচেছে, আর বিকাল হওয়ার অপেক্ষা করতে পারেনি!

সব মানুষের পক্ষেই এটা স্বাভাবিক। প্রথম দেখায়, বিশেষ করে শহর-জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মানুষের পক্ষে সমুদ্রের প্রথম দর্শনে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটতে বাধ্য। তা'র আত্মপ্রকাশ সমুদ্র সৈকত ভরে ছড়িয়ে পড়ে তরুণদের অর্গলহীন কথায়,…মন দেওয়া নেওয়ার গুঞ্জনে, …কাব্য বিলাসীদের কবিতায়,…আর শিশু ও দার্শনিকের বিস্ময় ভরা চোখে।

পুরীর সৈকত

সূর্য্যোদয়
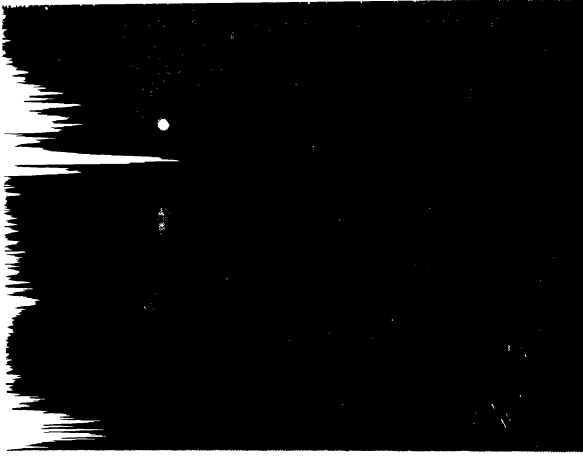
সাগর তটে এসে দাঁড়ালেই প্রবীণদের মনে জাগে পরপারের কথা। মনে পড়ে যায়—জীবন-সমুদ্রটার পারে একদিন যেতে হ'বে। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের কলতানের সঙ্গে তখন তার হৃদয়ের ঐক্যতান ঘটে; কণ্ঠ গায়—

'সমুদ্দুরের সাদা ফেনা
আমার পরাণ পাগল করা
তোরই সাথে ভেসে ভেসে
যাবরে সেই অচিন দেশে
যেথায় আছে অখিল শেষে
সকল ক্লান্তি হরা।'

এমনই সমুদ্রের রূপ!

সমুদ্রের আরও রূপ আছে।

নুলিয়াদের নৌকা ভাসান

সে রূপের সঙ্গে পরিচয় হ'ল পরদিন সূর্য্যোদয় দেখতে গিয়ে।···সমুদ্রের উপর অন্ধকার আকাশের পূর্ব্বদিক চক্র-রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রথমে লাল, তা'রপর মেটে-সিঁদুর ও তা'রপর কমলা রঙের দ্যুতি ছড়া'তে ছড়া'তে, কুম্ভের আকার হ'তে অগ্নি গোলক হয়ে, যেন সমুদ্রের জল থেকে লাফিয়ে উঠলেন ভাস্করদেব। তাঁ'র ঘোড়া সাতটা অর্থাৎ সাত রঙের কিরণগুলো মিলে মিশে, তেজোময় একটা রূপ ধারণ করে, নিশার তমিস্রাকে পশ্চিম দিগন্তের পরপারে বিদূরিত করে এল। তমসা হ'তে জীবন ছু'টল জ্যোতির পথে,—জড়তা হ'তে প্রবেশ করল চেতনার রাজ্যে।

মাত্র কয়েক টুকরো কাঠ বেঁধে তৈরী ডিঙ্গিতে চেপে বেরিয়ে প'ড়ল মেছো-নুলিয়ার দল, তা'দের সমুন্দর দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে। ভাল উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় তো বটেই, নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যও। ফিরতে দুপুর হ'বে। ফিরবে সমুদ্দুরের ফসল, মাছ নিয়ে। সমুদ্র ওদের অন্নবস্ত্রের জোগান দেয়। সমুদ্রই ওদের চাষের ক্ষেত, ওদের লক্ষ্মী, ওদের দেবতা। রোজ ওরা সমুদ্রমন্থন করে লক্ষ্মীকে আনতে যায়।

নুলিয়ারা তেলুগু,—অন্ধ্রের লোক। বেশীর ভাগই শ্রীকাকুলম্ ও বিজয়নগরম্ জেলার বাসিন্দা।

একটু বেলা বা'ড়তেই আরম্ভ হ'ল সমুদ্র-স্নানের পালা।

কিছুসংখ্যক নুলিয়া, যা'রা সমুদ্রে যায়নি, তা'রা মজুরি নিয়ে স্নান করাবার কাজে লেগে প'ড়ল।

বেলা নটা নাগাত একটা সাইকেল-রিকশা নিয়ে ঘুরতে বেরোন গেল। প্রোগ্রাম রিকশাওলাই করে দিল। মহাপ্রভুর মন্দির ছাড়া দেখবার আছে—গুণ্ডিচা, গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুল, গোবর্দ্ধন মঠ, সোনার গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।

সবগুলো একবেলায় দেখা সম্ভব নয়। কাজেই সকালের ভাগে রাখা গেল গোবর্দ্ধন মঠ, গম্ভীরা ও সিদ্ধ বকুল। বাকীগুলি রইল বিকালের ভাগে।

গোবর্দ্ধন মঠ আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত মঠ। আচার্য্য চতুর্ধামে যে চারটি মঠ স্থাপনা করেছিলেন, তা'র মধ্যে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' মহাবাক্যের অনুসরণকারী এই

গোবর্দ্ধন মঠ দ্বিতীয় স্থানীয়। মঠটির অবস্থান লোকালয় হ'তে প্রায় বাইরে হওয়ায় আশ্রমের উপযুক্ত পরিবেশটি নষ্ট হয়নি। মঠের অধিকাংশই সমতল থেকে অনেক নীচুতে, যেন একটা খাদের মধ্যে। লোকমুখে শোনা যায় যে, সমস্ত মঠটিই বালির নীচে বহুকাল চাপা পড়েছিল। বর্ত্তমান রূপটি খনন ও সংস্কার সাধনের উত্তরকালীন।

আচার্য্যের মর্ম্মর মূর্ত্তিটি অপূর্ব্ব দর্শন! এমন সজীব মূর্ত্তি দুর্ল'ভ। আচার্য্যের ব্যবহৃত খড়ম দু'খানি শিষ্য-পরম্পরায় রক্ষিত হয়ে আসছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে এসেছিলেন।

জনশ্রুতিতে প্রকাশ, জগন্নাথের মূর্ত্তি দর্শনে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেব জগন্নাথের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভে হাত রাখতেই পাথর গ'লতে আরম্ভ করে। এখনও স্তম্ভটিতে আঙ্গুলের দাগের মত কয়েকটি চিহ্ন আছে।

গম্ভীরায় শ্রীচৈতন্য প্রায় উনিশ বছর বাস করেছিলেন। পুরীতেই তাঁর তিরোভাব ঘটে।...

পুরীর এক সম্প্রদায় বলেন যে, ভাব-সমাহিত শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন ও তাঁর মূর্ত্তিতেই লীন হয়ে যান।

অপর এক দলের মতে তিনি পুরীর তোতা গোপীনাথের মূর্ত্তিতে অন্তর্হিত হন।—গম্ভীরায় তাঁর ব্যবহৃত খড়ম ও কাঁথার একটি টুকরো সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে।

যবন হরিদাসের সিদ্ধিলাভের স্থল, সিদ্ধবকুলও শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিবিজড়িত। বকুল গাছটির গঠন বিস্ময়কর। গাছটি যেন একখানি বল্কল হ'তে উৎপন্ন। গাছের মূল কোনটি তা' নির্ণয় করা দুরূহ।

সিদ্ধ বকুল পর্যন্ত দেখা শেষ করতেই বেশ বেলা হয়ে গেল। সকালের প্রোগ্রামও শেষ হ'ল।

বাকী দিনটা বড়ই অস্বস্তিতে কা'টল।

সাগর তীরের অবিশ্রান্ত দুরন্ত হাওয়া একেবারে উধাও হয়ে রইল। বিকালের দিকে আকাশে সামান্য মেঘের সঞ্চার হ'তে লাগল। তবু, চক্রতীর্থ ও সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল।

সোনার গৌরাঙ্গ দেখে চক্রতীর্থের মন্দিরটিতে পৌঁছতেই হাওয়ার বেগ বাড়তে লাগল। মন্দিরটি টিলার মত উঁচু জায়গায় হওয়ায় মন্দিরের চত্বর থেকে পুরী ষ্টেশন ও রেল লাইনগুলি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় উঠল। প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কর ঝড়! কিন্তু সেই টিলার উপর থেকে দেখা গেল ঝড়ের অপূর্ব্ব রূপ! সমস্ত পুরী শহরটা গাঢ় কাল উড়ন্ত মেঘে ছেয়ে গেছে, আর তারই মধ্যে ওই উঁচু টিলার মত জায়গাটা থেকে দেখা যাচ্ছে দিকচক্রবাল উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। সেখানে মেঘ নেই। দেখা যাচ্ছে তাল নারকেল গাছের মাথায় মাথায় ঝড়ের মাতামাতি, আর উড়ন্ত বালির তীব্র বেগে ছুটে আসা।

ঝড় যখন মাটির উপর নেমে আসে'নি, তখন মেঘের রঙ ছিল গাঢ় কাল। কিন্তু বালি উড়তে আরম্ভ করতেই মেঘের রঙ হয়ে গেল পিঙ্গল—দিগন্তের সেই আলোকচ্ছটায় জ্বলন্ত পিঙ্গল। মেঘের এমন বিচিত্র বর্ণসম্ভার খুব কম দেখা যায়।

ঝড়ের দেখাদেখি সমুদ্রও যেন আনন্দে ফুলে উঠতে লা'গল। তা'র হাঁক ডাক ও উদ্দামতা দেখে মনে হচ্ছিল—ঝড়ের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেলেই বুঝি দু'জনে মিলে সমস্ত শহরটাকে ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে—মাটির উপরের সব কলঙ্ক মুছে দিতে পারে। ঢেউগুলোর উদ্দামতা ও কলনাদ মনে করিয়ে দিতে লা'গল কবির সেই পঙক্তিটি,—

'কি রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দ্দাম।'

সত্যই সিন্ধু যেন রুদ্রেরই সন্ধান করছিল, আবাহন জানাচ্ছিল। রুদ্র কিন্তু পাঠালেন বর্ষণের দেবতাকে। শান্তি ধারার ক্ষরণ সুরু হ'ল। উত্তেজিত পবন ও সমুদ্র শান্ত হ'ল।

ঘণ্টা খানেক পরে বৃষ্টি থামল।

তিথিটা পুর্ণিমার কাছাকাছি থাকায় একটু পরেই আকাশ নির্ম্মল হয়ে চাঁদ উঠল।

ফিনিক দেওয়া জ্যোৎস্নায় দেখা গেল সমুদ্রের সে আর এক রূপ!...

ফিরবার দিন সকালটা দারুব্রহ্ম মহাপ্রভুর মন্দিরে কেটে গেল। দেখা হ'ল ঈশ্বরের অনুধ্যানে ব্যস্ত

দারুব্রহ্মের মন্দির

যাই হোক, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে বর্ত্তমান মন্দির ও দেবস্থানের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর History of Orissa-য় লিখেছিলেনঃ 'Puri, Nilachala or Purusottam-kshettra, as the place and temple are now called, is a modern Hindu Tirtha, is not connected either withthe legend of Rama, Krishna or Siva and its great sanctity is entirely due to very active propaganda. Originally the shrine may have been either Buddhist, or Jainic or Animistic.' অনেকের ধারণা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার এই অঞ্চল হ'তে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন অপসৃত হ'তে থাকে তখন বৌদ্ধতীর্থ পুরী ক্রমে ক্রমে হিন্দুদের জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত হয়। কারণ, কিছু-সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে হুয়েন্ শাঙ্ চরিত্রপুরে (পুরীর প্রাচীন নাম) পাঁচটি সুউচ্চ মন্দিরের চূড়ার কথা উল্লেখ করে গেছেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ব-বিদদের মতে সেগুলি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। ওই স্তূপগুলিতে বুদ্ধের অস্থি, কেশ, নখ, দন্ত ইত্যাদি রক্ষিত ছিল। তা'রই একটি স্তূপ বর্ত্তমান জগন্নাথ মন্দির। জগন্নাথের বিগ্রহের মধ্যে যে বিষ্ণুপঞ্জরের প্রবাদ আছে তা' বুদ্ধেরই অস্থি।

এই মতের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, দ্বাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে মহারাজ যযাতি (২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন) নবম শতাব্দীতে জগন্নাথ মন্দিরের পুনর্বিন্যাস করেন ও দারুময় মূর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। (Orissa—Sterling) তা' হ'লে ধরা যেতে পারে যে, হুয়েন্ শাঙ্ দৃষ্ট পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি স্তূপ এই সময়েই একটিতেই রূপান্তরিত হয়েছিল, অথবা, যযাতি ও হুয়েন্ শাঙ্-এর মধ্যবর্ত্তীকালের স্তূপগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

মানুষদের রেখে যাওয়া নিদর্শন, বিশাল এক স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের কীর্ত্তি।

সারা ভারত জুড়েই ছড়িয়ে আছে, এমনি অসংখ্য নিদর্শন। ওই ব্যস্ততায় যাদের দিন গেছে তা'রা যন্ত্রবিদ্যায় মাথা ঘামাতে পারেনি, আণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবনের তাগিদও অনুভব করেনি।

জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি এবং মন্দির সম্বন্ধে নানা মত ও তথ্যতত্ত্বাদি প্রচলিত। মন্দিরটির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক স্বীকৃত মত এই যে, গঙ্গ-(পূর্ব্ব) বংশীয় রাজা অনন্ত বর্ম্মণ চোড়গঙ্গ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। ফার্গুসন প্রমুখ গবেষকরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়েছিল। ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উড়িষ্যার বহিঃরাজ্যের কয়েকজন রাজার শিলালিপি হ'তে প্রমাণ করে গেছেন যে, দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমেই জগন্নাথ মন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। *

* History of Orissa—৺রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজ যযাতির পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আচার্য্য শঙ্কর যখন পুরীতে আসেন তখন জগন্নাথ মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল, একথা শঙ্কর-জীবনীতে পাওয়া যায়। অবশ্য, আচার্য্য মন্দিরে কোনও বিগ্রহ দেখতে পাননি। স্থানীয় অধিবাসীরা আচার্য্যকে বলে যে, কিছুদিন আগে যবনদের লুণ্ঠন ভয়ে বিগ্রহ চিল্কাহ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বিগ্রহের মধ্যে যে রত্ন পেটিকাটি ছিল তা' পূর্ববর্ত্তী পূজকরা কোথায় পুঁতে রেখে গেছেন জানা না যাওয়ায় পুনর্ব্বার বিগ্রহ নির্ম্মাণ সম্ভব হয়নি।...আচার্য্য শঙ্কর যোগ-বলে ঐ পেটিকার অবস্থান জানতে পারেন। পেটিকাটি উদ্ধার করা হয় ও পূর্ব্বের মত নিমকাঠের জগন্নাথ মূর্ত্তি প্রস্তুত করে রত্নপেটিকাটি (মতান্তরে বিষ্ণুপঞ্জর) মূর্ত্তির মধ্যে রেখে দারুব্রহ্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। আচার্য্য এই উপলক্ষে জগন্নাথদেবের যে স্তোত্রটি রচনা করেন সে'টিকে জগন্নাথদেবের তথা মন্দিরটির ঐ সময়ে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে) অস্তিত্বের প্রামাণ্য সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আ'রও পূর্ব্বে, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি, হুয়েন্ সাঙ্ যে পাঁচটি মন্দিরের চূড়া দেখেছিলেন—তার অর্থ—বুদ্ধের দন্ত, অস্থি ইত্যাদি রক্ষিত পাঁচটি বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন। এরূপ কল্পনার অবকাশ গ্রহণের বিপক্ষে এরূপও তো ভাবা যেতে পারে যে, মন্দিরগুলি হিন্দুদের পঞ্চদেবতার ছিল।

তা' ছাড়া হুয়েন্ শাঙ্ যখন উড়িস্যায় আসেন তা'র অনতিকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উড়িষ্যার গঞ্জাম অবধি বঙ্গাধিপ শশাঙ্কের অধীন ছিল। যে শশাঙ্ক উরবিল্ব (বোধগয়া) স্থিত বুদ্ধের সিদ্ধিস্থলের মন্দিরটি পর্য্যন্ত ধ্বংস করেছিলেন, তাঁ'র রাজত্বে চরিত্রপুরে (অর্থাৎ পুরীতে) পাঁচটি বৌদ্ধস্তূপের পরিত্রাণ ও অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্বন্ধে সংশয় জাগে।...ভারতবর্ষের আর কোথাও যে বৌদ্ধ স্মারকাদি হিন্দুর দেবস্থানে রূপায়িত হয়েছে এ ধরণের নজীরও তো ঐতিহাসিকরা দেখান না। কাজেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বৌদ্ধতীর্থের রূপান্তর—এরূপ ধারণা ঠিক মনে হয় না।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র বংশধর শবর জাতির উল্লেখ আছে। এই শবররা ওড্র (উড়িষ্যা) ও কোশলে (মধ্যপ্রদেশে) বাস করতেন। শবররা প্রাচীন কাল থেকেই দারুনির্ম্মিত বিষ্ণুর পূজক ছিলেন। কটক জেলার কপালেশ্বরের শিলাশিপি হ'তে জানা যায় যে, মহানদীর তীরে, রাজিমনগর শবর রাজাদের রাজধানী ছিল। সেখানে তাঁরা অনেক বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। যা'র মধ্যে এখনও একটি জগন্নাথের মন্দির বর্ত্তমান।

এ থেকে বোঝা যায় যে, জগন্নাথের উৎপত্তি বৌদ্ধ অনুসরণ নয়।*

প্রবাদ আছে ভল্কাতীর্থে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ কর্ত্তৃক শরাহত হয়ে দেহত্যাগ করলে পাণ্ডবরা তাঁ'র দেহ সৎকারের আয়োজন করেন। কৃষ্ণের দেহ কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আগুনে পুড়ল না। তখন সেই পূত দেহ সাগরে ফেলে দিতে দৈববাণী হ'ল। পাণ্ডবরা দেহটি সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলেন। দাহকার্য্যে ব্যবহৃত শ্রীকৃষ্ণের চিতার ব্রহ্মতেজো-সিক্ত একখানা কাঠ জলে ভাসতে ভাসতে পুরীর চক্রতীর্থে এসে আটকে গেল।

এদিকে অবন্তিকার তৎকালীন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের প্রখ্যাত লুপ্ত নীলমাধব মূর্ত্তির সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণকে পুরীতে পাঠালেন। বিদ্যাপতি বিশ্বাবসু শবরের অতিথি হয়ে বিশ্বাবসুর অনুগ্রহে, ঐ স্থানই যে নীলমাধবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র একথা নিশ্চিতরূপে জেনে রাজাকে সংবাদ দি'লেন। তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসে নীলমাধবের দর্শন লাভের জন্য স্তবস্তুতি এবং যজ্ঞাদি করতে লাগলেন।...একদিন রাজা স্বপ্নাদেশ পেলেন যে রাত্রিশেষে সাগরতীরে বিশাল একখণ্ড কাঠ দেখা যা'বে ও তাই থেকে বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে।

নিশাবসানে সত্যই সমুদ্রতীরে ঐরূপ একটি কাঠ দেখতে পেয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন তা' থেকে বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। প্রতি উনিশ বছর অন্তর জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তির পুননির্ম্মাণ বা নব কলেবর করা হ'লেও, বোধ হয়, সেই আদি কাঠটির একটুকরাই এখনও বিষ্ণু-পঞ্জর নামে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

এই দারুময় দেবতার অস্তিত্বের সমর্থনে প্রাচীনতম সূত্র

* দেবদেবীতত্ত্ব—সতীশচন্দ্র শীল।

হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় কর্তৃক সতীশচন্দ্র শীল মহাশয়ের 'দেবদেবীতত্ত্ব' গ্রন্থের মুখবন্ধে ঋক্ সংহিতার একটি শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে ঃ

'অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥'

(ঐতিহাসিকগণের মতে ঋক্ সংহিতার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ হ'তে ১৫০০ বৎসরের মধ্যে)।

জগন্নাথদেবের নাটমন্দিরের গায়ে যে সব মৈথুন ও আপত্তিকর ভঙ্গীমাময় স্ত্রী-পুরুষের মূর্ত্তি আছে সে'গুলি সম্বন্ধে বহুজনের বহু মত। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এগুলি ইতর রুচির পরিচায়ক। এই ধরণের চিত্রণ কোণার্ক ও খাজুরাহোর মন্দিরেও দেখা যায়। বাদামির গুহা-ভাস্কর্য্যে এবং মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরে এ'রূপ দু' একটি অলঙ্করণ আছে।

প্রশ্ন জাগে—যে সব শিল্পী কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের মত স্থাপত্যের সৃষ্টি করেছিলেন, খাজুরাহোর মন্দিরগুলির সূক্ষ্ম অলঙ্করণের শিল্পবোধের অধিকারী ছিলেন, মীনাক্ষী মন্দিরের অষ্টশক্তি মূর্ত্তিগুলির কল্পনা করেছিলেন, তাঁদের কি সামান্য কয়েকটি যৌনচিত্র সৃষ্টি করে নিজেদের সুনাম ক্ষুণ্ণ ক'রবার ভয় ছিলনা ?···অবশ্যই ছিল। আর সেই কারণেই ওইসব চিত্রণের পিছনে নিশ্চয় গভীর একটা তত্ত্ব নিহিত আছে—যা'র সঠিক মর্ম্মোদ্ঘাটন হয়তো একদিন সম্ভব হ'বে।

আনুমাণিক ভাবে বলা যায়,—

(ক) সাধন মার্গের বা ঈশ্বরের দর্শনের পথে মন্মথ ও রতির বা কামের বাধা সৃষ্টির বিষয় ব্যক্ত করাই ওই সব চিত্রের উদ্দেশ্য।

বিশ্বামিত্র সাধন পথে মেনকার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আরও অনেক মুনিঋষির ঐরূপ অবস্থা ঘটেছিল। গৌতম বুদ্ধও 'মার'-কন্যাদের দ্বারা বুদ্ধত্বের পথে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'মার' শব্দও কামদেব বা মন্মথ-বোধক। (মদনো মন্মথো মারঃ প্রদ্যুম্ন মীনকেতনঃ। অমর কোষ।) বোধ হয় কামপ্রতিভূ মূর্ত্তিগুলি দেবদর্শনের পথে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মন্দিরের বাইরে ভিড় করে আছে।

অথবা,—

(খ) হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক দেবতারই একটি স্ত্রী অংশ আছে। উচ্চ-আধ্যাত্মিক দর্শনের মতে ঐ নারী অংশ দেবতার সেই শক্তিকেই সূচিত করে শক্তির ক্রিয়াতে তিনি জগতে প্রকট হন বা যে শক্তি-দেবতার ক্রিয়াতে প্রকট। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি। অগ্নির কাঙ্গে দাহিকা শক্তি প্রতিপন্ন হয় বা দাহিকা শক্তি দ্বারা অগ্নি প্রকট হন। ঈশ্বরের যে শক্তি প্রজনন বা প্রজাবৃদ্ধির কারণ বা সহায়ক সেই শক্তিই স্ত্রী বা নারীরূপে সৃষ্টিব্যাপী বিরাজিত। (নারী অংশের বিদ্যমানতাই তো পুরুষ অংশের জনন বা সৃজনী গুণকে প্রতিপন্ন করে।) একই স্রষ্টার বা পর-মাত্মার, স্ত্রী ও পুরুষের দ্বিধা বা দ্বৈত মূর্ত্তিতে বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে এবং একটি অপরটির সম্পূরক হিসাবে তাঁ'র সৃষ্টির ইচ্ছাকে, বহু হওয়ার ইচ্ছাকে, প্রতিপন্ন করছে।

মৈথুন চিত্রণের মাধ্যমে স্রষ্টা ও তাঁর সৃজনী শক্তিকে, পুরুষ ও নারীর ভিন্নরূপে এবং মিলিত অবস্থায় দেখান হয়েছে। তাঁ'র সৃজনী শক্তিকে নারী মূর্ত্তিটির দ্বারা করা হয়েছে। ভঙ্গীগুলি অবশ্য বাৎসায়ন অনুযায়ী গৃহীত।

হিন্দু ধর্ম্ম মানব জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া কর্ম্মে, ঘটনায়, জন্মে ও মৃত্যুতে, ঐশ্বরিক ইচ্ছারই অভিব্যক্তি বা প্রকাশ দর্শন করে। প্রজননের ক্ষেত্রেও তা'র ব্যতিক্রম নেই। তাই মৈথুন ক্রিয়াও হিন্দুর দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক স্তরে অকথ্য নয়।

জগন্নাথের মূর্ত্তির অন্যান্য কোনও দেবদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে মিল নেই। বিশেষ করে হস্তপদাদি বিহীন হওয়াটা। এ সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত। তবে সবচেয়ে সমীচীন মনে হয় যে, কালাপাহাড়ের আক্রমণে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির অঙ্গচ্ছেদ ঘটায়, পরবর্ত্তীকালে, অবশিষ্ট মূর্ত্তির অনুসরণেই নবকলেবর রচনা করা হয়।

জগন্নাথের বিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণকে শাস্ত্রে ব্রহ্মবর্ণ বলা হয়। ব্রহ্ম চক্ষুর অগোচর, জ্ঞানাতীত, কল্পনাতীত। তাই দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দৃষ্টির অতীত ব্রহ্মবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। (কৃষ্ণবর্ণ বা কাল রঙ যে, কোনও রঙ নয় এ'কথা আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও সমর্থন করে।)

জগন্নাথ দারুময় হ'লেন কেন ?···

এর কারণ নির্দ্দেশে কেউই কিছু ব'লতে পারেন না,—বলা সম্ভবও নয়। দেবতার গোপন ইচ্ছার কথা কে ব'লতে পারে! তবুও, বাঙ্গলা দেশের এক সুরসিক ব্রাহ্মণ তা'র কারণ বলে গেছেন। পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন দারুব্রহ্মের মূর্ত্তি দেখে বলেছিলেন,—

'একা ভার্য্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ।
স্মারং স্মারং স্বগৃহ চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥'

অর্থাৎ, দুই স্ত্রীর একটি মুখরা (সরস্বতী) ও অপরটি চঞ্চলা (লক্ষ্মী)—বাহন একটা পাখী (গরুড়), জলের উপর সাপের বিছানা সম্বল, এহেন নিজের সংসারের কথা ভেবে ভেবে বিষ্ণু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন।

ভারতমাতা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলালের শততম জন্মোৎসবে—উভয়ের অনুভাবে)

১

আজ দেখা দিলে ঝলকি' নিখিলে মৃন্ময়ী মাগো, কালো
নিশায়
দলিয়া তিমির চিরন্তনীর বিলায়ে আশীষ আলো শিখায়।
আমরা যে সাড়া দিই খণে খণে
মিথ্যা মলিন কামনা-কূজনে,
সাধিয়া আঁধার শুনি না তোমার শঙ্খ—যে ডাকে ঃ
"আয় রে আয়!"
তাই কি অশনি মন্দ্রি' জননী, জাগালে তন্দ্রালস হিয়ায় ?

২

মাটি নও তো মা, তুমি নিরুপমা! চিন্ময় তব প্রতি অণু।
নারায়ণ যুগে যুগে তব বুকে এসেছেন ধরি' নরতনু।
তোমারি তো ডাকে গোলোক-মুরলী
কত শত প্রাণে পুলক উছলি'
শ্যামল-করুণা কোমল-যমুনা বহালো বৃন্দাবন লীলায়।
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে আজো সে-অমরা-
স্মৃতি বিছায়।

৩

কত কবি গুণী যোগী ঋষি মুনি নমি' মা তোমার ধূলিকণা
হয়েছে ধন্য চিরবরেণ্য—অলখ-উছাসে উন্মনা!
তোমারি কোলে মা গগনগঙ্গী
ধায় গান গেয়ে নীলতরঙ্গী,
তপনবাহিনী, মরণতারিণী! কৈলাস শিরে
তোমার ভায়
কনককান্ত ধ্যানপ্রশান্ত যুগযুগান্ত বন্দনায়।

৪

আজ প্রার্থনা ঃ তোমার সাধনা পল তরেও না যেন ভুলি,
ত্যজিয়া স্বার্থ যেন পরার্থ-ব্রতে অন্তর ওঠে দুলি'।
যেন পারি মাগো তোমার প্রসাদে
আপনারে দিতে বিলায়ে দুহাতে,
প্রতি জীব মাঝে যে-শিব বিরাজে বরি' তারে তাপিতের
সেবায়।
আজ দেখা দিলে স্বরূপে নিখিলে প্রেমের-প্রতিমা-
মধুরিমায়॥

(হরিকৃষ্ণ মন্দির—পুণা) (জন্মদিনে ২২।১।১৯৬৩)

Swami Vivekananda: "If there is any land on this earth that can claim to be the blessed *Panya Bhumi*,·········it is India." (Colombo Speech······1897)

দ্বিজেন্দ্রলাল: "এ-দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি।" (শেষ গান···২ জ্যৈষ্ঠ ১৯১৩)

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ ব্যর্থ চেষ্টার পর এই নরনারীর দল অদূরে উপবিষ্ট প্রমীলা দেবীকে উচ্চৈস্বরে অভিশাপ দিতে দিতে এই বাড়ী হতে বার হয়ে গেলেন। প্রমীলা দেবী সারাক্ষণ বিরস বদনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে এদের গালিগালাজ গলাধঃকরণ করছিলেন। আমরা সকলে মিলে রোগীর ঘর হতে বার হয়ে গেলে তিনি উন্মত্ত (কি সে ?) হয়ে দড়াম করে সেই ঘরের দরজাটা ভিতরের দিক থেকে সকলের মুখের উপর বন্ধ করে দিলেন।

'আপনারা কলকাতায় থেকেও এই হতভাগা ছেলের উপর একটু নজর রাখতে পারলেন না, আমি এদের সকলকে এদের বাড়ীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে আহত যুবকের মাতুলকে উদ্দেশ করে বললাম,আপনারা একে একটু দেখা-শুনা করলে এ এমন ভাবে বয়ে যেতে পারতো না। শুনেছি এ কিছু কাল আপনাদের বাড়ীতেও ছিল। সেখান থেকে একে চলে আসতেই বা দিলেন কেনো। যাই হোক আপনাদিগকে আমাদের এই তদন্তে প্রয়োজন আছে। এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা বোধ হয় ইচ্ছে করেই নিঃখোঁজ হয়েছেন। এখন আপনাদের একজনকে এই মামলার ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়াতে হবে। এর কারণ আপনাদের এই নাবালক আহত ভাগীনেয় এই মামলার আসামী ধরা পড়ার পর তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়াবেন ব'লে মনে হয় না।

'আজ্ঞে! আমরা এই মামলার নিশ্চয়ই ফরিয়াদী হবো। তবে তার আগে আপনাদের ঐ শয়তানীকে এই মামলার প্রধান আসামী করতে হবে।' রোষ-কষায়িত নেত্রে আপন মাতা ও স্ত্রীর ক্রন্দন-রোলের উর্দ্ধে নিজের গলার স্বর তুলে ভদ্রলোক বললেন, 'এই শয়তানী আমাদের মত ঝানু লোকদের পর্য্যন্ত বাক্যবিন্যাসে মোহিত করে তুলেছিল। এখানে আমাদের ঐ অবোধ অল্পবয়স্ক সংসার-অনভিজ্ঞ ভাগীনেয় তো সেই তুলনায় এক নির্ব্বোধ শিশু মাত্র। আমাদের বাড়ীতে রেখে কি ওকে শাসনে রাখতে চেষ্টা করি নি নাকি ? এক এক দিন বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরলে ওকে খেতে পর্য্যন্ত দিই নি। কিন্তু তা এত সব করলেও কি আর হবে, মশাই। এ ঐ বুড়ি-দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বাড়ীসুদ্ধ লোককে ভুলিয়ে দিত। এদিকে ওর এই ভাবে রাত করে সিনেমা দেখার কারণ না জেনে ওদের অফিসের ঐ প্রমীলা দেবীকেই আমরা ওর ওপর নজর রাখতে বলতাম। আমার বিশ্বাস, ইংরাজী ফিলিমের প্রেমের কাহিনীর ছবি দেখেই ওর এই সব মাথায় ঢুকেছে। এখন আমি ভাবছি যে আমার এই বুড়ী মা'কে কি করে বাঁচাবো। এই নাতিটী যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় নাতি ছিল। ওদিকে মাকে—না থাক এখন—

এঁর শেষের বাক্যটী মাঝপথে থেকে যাওয়ায় আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। এ ছাড়া এই মামলার প্রয়োজনে এঁর একটী বিবৃতি ও লিপিবদ্ধ করা দরকার। আমি এঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মেয়েদের গাড়ীটিকে বাড়ী পাঠাতে ব'লে তাঁকে আমার ট্রাকে উঠে আমার সঙ্গে আমাদের থানাতে একবার আসতে রাজী করালাম। তাঁকে থানায় এনে তাঁর মুখে যা শুনলাম, তাতে আমি বহুক্ষণ বাক্শক্তিরহিত হয়ে গিয়েছিলাম। থানায় এনে এই সম্পর্কে আমরা তাঁর একটা বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলাম। অকুস্থলে তার না বলা অংশটুকু তার বিবৃতিতে আমাদের তিনি জানিয়ে দিলেন। এই ভদ্রলোকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"গত পরশু কাশীধাম থেকে একটা জরুরী তার পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি প্লেনে সেখানে রওনা হয়ে যাই। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে আপনারা থাকতে থাকতেই আমার বড়-দিদি] হৃতচক্ষু যুবকের মাতা] তাঁর সেই বাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এর পর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা এই অবস্থায় থাকার পর তিনি দেহত্যাগ করেন। এর পর আমার ভগিনীপতি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে একেবারে উন্মাদ হয়ে পড়েন। তিনি এখনও পর্য্যন্ত বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এক-দিন পূর্ব্বেই তিনি দত্তক-পুত্র নেওয়ার কাষ সেরে ফেলে-ছিলেন। এখনও আমি ভগিনীপতির এই বিকৃতমস্তিষ্কের অজুহাতে আদালতে মামলা দায়ের করে, উইলপত্র নাকচ করবো কিনা ভাবছি। কিন্তু তা'বলে ভগিনীপতির এই বিপুল সম্পত্তি আমি ঐ রাক্ষসী প্রমীলার জঠরে তো পুরে দিতে পারি না। যদি কখনও আমার ঐ গুণধর ভাগীনেয়কে এই কুপথ হতে ফেরাতে পারি, তা'হলে আমাকেই এই উইল নাকচের বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় আমার এক পুত্রকে ভগিনীপতির ওয়ারীশ দাঁড় করিয়ে ওঁর ঐ জোচ্চর দূরাত্মীয়ের পুত্রটীকে [দত্তক পুত্র] আদালতের সাহায্যে আমি নাকচ করে দেবো। আপনারা শুনে এসেছেন যে আমার ভগিনীপতির এক কাশীস্থ বন্ধুর কন্যার সঙ্গে সুশীল বাবাজীর বিবাহের কথা চলছিল। এখন ওঁর ঐ ধনী বন্ধুটীকেই তাঁর সকল অভিমান, ক্ষোভ ও ক্রোধ মুলতবী রেখে তাঁর ঐ বর্ত্তমানে উন্মাদ বন্ধুটির দেখা-শুনা করতে হচ্ছে। আমার তো বিশ্বাস ওঁর ঐ জোচ্চর আত্মীয়টী বা অন্য কেহ, নিজেরা বা কোনও লোক মারফৎ ভুল ঔষধ বা বিষ প্রদানে আমার ভগ্নীর মৃত্যু এবং ভগিনী-পতির উন্মাদ হওয়া ঘটিয়েছে! এদিকে পুলিশে এ'সব কথা জানালে তো পোষ্টমর্টম্ পরীক্ষার জন্য ভগিনীর মৃত দেহ তারা মণিকর্ণিকার ঘাটের বদলে শব ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাবে। এই জন্য এই কয়দিন এই সন্দেহের বিষয়ে আমরা কাউকে জানাতে পর্য্যন্ত পারছি না। এখন আবার আমার এও সন্দেহ হচ্ছে যে—ঐ প্রমীলা দেবীই হয়তো কাউকে পাঠিয়ে কায়দা করে আমার ভগিনীকে নিহত এবং ভগিনীপতিকে উন্মাদ করে দিলে। এই ভাবে নিষ্কণ্টক হয়ে বিনা বাঁধায় সে তাদের একমাত্র বংশধরটিকে 'ভোগ দখল' করিতে চায় আর কি? এই একই উদ্দেশ্যে ওঁর ঐ অপদার্থ আত্মীয়টীর সহিত যোগসাজসে এঁর এই অপকার্য্য করানোও অসম্ভব নয়। এতে এদের উভয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সফল হবার কথা। আপনারা এই দিকটাও একটু তদন্ত করে দেখলে ভালো হয়। এর পর ওখানকার সব কাষ সেরে কলকাতার ফিরি বটে, কিন্তু এই সব নিদারুণ দুঃসংবাদ আমার বৃদ্ধা মাতাকে এখনও জানাতে পারিনি। কলকাতাতে প্লেনে ফিরে আমি আমার ভাগিনেয়টীকে বহু খোঁজাখুঁজি করেছি। ওঁদের অফিসে কাল গেলে ওখান-কার পুরুষ ডিরেকটরদ্বয় আমাকে আপনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে বলেছিলেন। আজ এই জন্য বাইরে বেরুবো মনে করছিলাম; এমন সময়ে আপনাদের এক অফিসার এসে আর এক নিদারুণ দুঃসংবাদ আমাদের দিলেন। এর ফলে আমার স্ত্রী ও মা'কেও আমাকে সঙ্গে নিতে হয়েছিল।'

এঁর এই বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করে আমার মনে হলো যেন 'চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস'। এতক্ষণে আমি নিজেকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছিল যে আমার সহকারীই বুঝি কখন পিছন দিক থেকে আমার পিঠে ছুরী বসিয়ে না দেন। এইরূপ মানসিক অবস্থায় আর অন্য কোনও কাষ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। আমি ঐ হৃতচক্ষু যুবকের মাতুল মহাশয়কে তখনকার মত বিদায় দিয়ে উপরের কোয়াটারে এসে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে সভয়ে ভিতর থেকে দরজাটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিলাম। তবুও এই খালি ঘরে একাকী থেকেও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছিলাম না। এই সময় আমি এও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, আর কোনও দিন কোথায়ও যাবার প্রয়োজন হলে একাধিক সশস্ত্র সিপাই সঙ্গে না নিয়ে থানার বাইরে বেরুবোই না।

প্রত্যুষে আট ঘটিকায় আমি নীচের আফিসে এসে সহকারী কনকবাবুর নিকট শুনলাম যে আমাদের বড়ো-সাহেব এই মামলা সম্পর্কীয় এই কয়দিনের স্মারকলিপি বিশ্লেষণ করে একটা দুই পাতা ব্যাপী মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছেন। এই মন্তব্যের মধ্যে কয়েকটী নির্দ্দেশ ও

আদেশ—তথা হুকুমনামাও লিখে দিয়েছেন। আমার তদন্ত সম্পর্কীয় কোনও ভুলচুক বা কোনও কায করা বা না করা সম্বন্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য আজ পর্য্যন্ত কোনও মহারথীই করতে পারেন নি। এর কারণ এই শহরে একজন দক্ষ তদন্তকারীরূপে আমার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তবুও বড়-সাহেবের সহিত তদন্ত সম্পর্কে মতভেদের আশঙ্কায় আমি তাঁর ঐ মন্তব্যপত্রটী গভীর আগ্রহে পড়তে সুরু করে দিলাম। এই মন্তব্যপত্রে উল্লেখিত মন্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশে নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'এতো দিন যাবৎ তোমার প্রেরিত ডাইরী পড়ে রাত্রে ঘুম হতো না, বারেক একে—বারেক ওকে সন্দেহই করে চলেছি। অথচ এদের সকলেরই একই সঙ্গে অপরাধী হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য কাউকে গ্রেপ্তার করবার পর্য্যন্ত হুকুম দিতে পাচ্ছিলাম না। এখনও যে দোদুল্যমান মনের সকল সন্দেহ কেটে গিয়েছে তাও নয়। এখন মনে হয় যে এখুনি তোমাদের কাশীপুর রাজষ্টেটের উভয় তরফের ম্যানেজারদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে তাদের ডেরাগুলি থানা-তল্লাস করা উচিৎ হবে। একেবারে গ্রেপ্তার না হলে কোনও লোকই সরল ভাবে কথা বলতে চায়নি। আমার মতে গ্রেপ্তারের পর এদের মুখে বহু নতন তথ্য শুনা যেতে পারে। এদের বাড়ী তল্লাস করেও বহু মূল্যবান প্রামাণ্য দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে। এই বিষয় কৃতকার্য্য হলে আমরা তখন বিনা দ্বিধায় প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবীকে গ্রেপ্তার করে তাদের গৃহগুলি তল্লাস করতে পারবো। এই সব করণীয় কার্য্যের পর আমরা এমন মাল মশলা পেতে পারি যাতে আমরা আরও বহু সন্দেহমান ব্যক্তিকে আসামীর পর্য্যায়ে এনে ফেলতে পারবো। এখন আমার হুকুম হচ্ছে এই যে এখুনি ঐ দুইজন ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে ফেলা হোক।"

'এই দেখ আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই বড়সাহেব পরিষ্কার একটা হুকুম দিয়ে দিলেন; আমি বড় সাহেব প্রেরিত মন্তব্য-পত্র হতে মুখ তুলে সহকারী কনকবাবুকে বললাম, 'আমার ইচ্ছে ছিল ওরা ওদের স্ব স্ব বাটীতে উপস্থিত আছে কিনা তা না জেনে ঐ দুজায়গায় হানা না দেওয়াই উচিৎ ছিল। এর কারণ একবার ওরা পালাতে পারলে আর কোনও দিনই ওদের পাওয়া যাবে না। অন্ততঃ এদের বড় তরফের ম্যানেজার সম্বন্ধে এইটুকু আমি জোর করে বলতে পারি। তা' উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হুকুম যখন হয়েছে, তখন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই হবে। তা'হলে কনক—তুমি ঐ বেনিয়াপুকুরের সেই বাড়ীতে চলে যাও। আর তুমি সুবোধ এখনি তাজ-মহলে রওনা হও। ওখানকার ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটার দুইজনেই হচ্ছেন সংলোক। দুষ্ট ব্যক্তিদের দমনে তাঁরা উভয়েই তোমাকে প্রয়োজনীয় সঙ্গ দেবেন। তবে বেনিয়াপুকুরের বাড়ীতে ঢোকবার আগে স্থানীয় থানা থেকে বেশী করে লোকজন নিয়ে যেও। আমি বেনিয়া-পুকুরের থানার বড়বাবুকে টেলিফোনে তোমাকে সাহায্যের জন্য বলে দিচ্ছি।

আমার এই সুযোগ্য সহকারীদ্বয়কে বিদায় দিয়ে আমি ভাবছিলাম যে এইবার কি করা যায়। এমন সময় অবাক হয়ে আমি দেখলাম যে জনৈক ব্যক্তি গুটি গুটি করে আমার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। আগুয়মান লোকটিকে দূর থেকে দেখেই আমি একজন ধড়ীবাজ লোক বলে বুঝেছিলাম। লোকটি ধীরপদবিক্ষেপে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে ভয়ে কি যেন সে আমাকে বলতে চায়।

'আজ্ঞে! আমাকে ডাক্তার সুরজিৎ রায় আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন', একটু মুচকী হেসে হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো—'আপনি শুনলাম আমাকে খুঁজেছিলেন। সুরজিতবাবু তাই আমি আসা মাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে বলে দিলেন। এখন কি আজ্ঞা হয় তা আপনি আমাকে বলুন।'

এই ভদ্রলোককে অযাচিতভাবে থানায় এসে উপস্থিত হতে দেখে আমি বুঝলাম যে—এটা বোধ হয় বিধাতার একটা আশীর্ব্বাদ। এখানে না এসে বাড়ী ফিরে তার ডেরায় পুলিশ তল্লাসী করে গেছে শুনলে ও আবার তখুনি ফেরার হয়ে যেতো। আমি ধীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণ দুটো পর্য্যন্ত নীচের দিকে অনেকটা ঝুলে পড়েছে। আমি আরও লক্ষ্য করলাম যে তার হাতের কুনুই-এর কাছে উল্কিতে কোনও কালে লেখা ছিল 'রাম'। এখন সেটিকে জোর করে উঠাবার চেষ্টা করা সত্বেও পূর্ব্বের ক্ষীণ রেখা গুলো সেখানে রয়ে

গিয়েছে। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে পরবর্ত্তীকালে এই উল্কিতে উৎকীর্ণ নাম বিসদৃশ্য মনে হওয়ায় ইনি তা উঠিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রেয়সীদের নাম কখনও কখনও উল্কীকৃত করা হলেও 'পুরুষের নাম' নিজের না হলে তা নিজের হাতে লেখা হয় না। আমি অনুমানে বুঝলাম যে ভদ্রলোকেরই পূর্ব্বেকার নাম ছিল 'বাম'। এই সময় হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়লো ভদ্রলোকের বাম হাতের দিকে। এখানে একটা সাপ আঁকা ও তার পাশে তার এখনকার নাম 'সুরেশ' উল্কীকৃত রয়েছে। এই হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে উল্কীর উপর এঁর এখনও যথেষ্ট মোহ রয়েছে। এরপর আমার আর বুঝতে বাকী থাকে নি যে, পরবর্ত্তী-কালে তিনি নাম ভাঁড়ীয়ে এঁদের এই জমীদারী সেরেস্তায় চাকুরী নিয়েছেন। অতএব এর পক্ষে কোনও এক ফেরারী আসামী হওয়াও অসম্ভব নয়। আমার এই সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে তার মনবল ভেঙ্গে তাকে ঘায়েল করবার ইচ্ছা আপাততঃ মুলতুবী রেখে আমি তার স্বেচ্ছাকৃত একটী বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে সুরু করে দিলাম। তার সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আমার নাম সুরেশচন্দ্র নিরোগী। পিতার নাম ৺অমুক নিয়োগী, সাং গ্রাম, পোঃ ও জিলা অমুক। বর্ত্তমানে আমি কলিকাতায় কাশীপুরের ছোট তরফের ডাঃ সুরজিৎ রায়ের অধীনে কর্ম্মবহাল আছি। আজ্ঞে! আমি বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে যে বাড়ীটাতে বাস করি সেটা আমার নিজের বাড়া নয়। হাঁ! আবার ওই বাড়ীটি আমার নিজেরও বাড়ী বলা চলে। প্রথমে আমি ঐ বাড়ীর ভাড়াটে ছিলাম। কিন্তু বিপত্নীক নিঃসন্তান মালিক মারা গেলে ওটা আমিই দখল করে থাকি ও ভাড়া দিই। মিউনিসিপাল ট্যাক্স-আদি আমি মৃত মালিকের নামেই এযাবৎ কাল দিয়ে আসছি। আজ্ঞে হাঁ। আমি সংসারী। তবে বিবাহিত না হয়েও আমি তাই-ই বটে! আমার এক বাল্যবন্ধু মৃত্যুশয্যায় আমাকে তাঁর তরুণী স্ত্রীকে বিবাহ করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে তার স্ত্রীর হাত আমার হাতে তুলে দেয়। আমার ঐ বন্ধুর মৃত্যুর পর আমাকে আমার সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে হয়েছে। আজ্ঞে হাঁ। তাও ঠিক। আমি একজন হিসেবী লোকই বটে! বাড়ীর উঠানে লাউ কুমড়া গাছ পুতে সেইগুলোকে চালের উপর তুলে দিয়েছি। এ'ছাড়া বাড়ীর উঠানে কয়েক খাঁচা মুরগীও আছে। বাড়ীর এঁটো-কুটো জঞ্জালরূপে বাইরে না ফেলে সেইগুলোই ওদের খেতে দিই। তার পরিবর্ত্তে তারা আমাদের কয়েকটা করে ডিম দেয়। যেগুলো তা দেয় না, সেগুলো দিয়ে উদর পূর্ত্তি করি। আজ্ঞে! কি বলছেন আপনি? ঐ বড় তরফের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ আছে বৈকি? তিনি কখনও কখনও আমাদের বেনিয়াপুকুরের বিরাট বস্তীতে কাজকর্ম্মের তদারকে আসেন। কখনও কখনও আমার সঙ্গে দেখাও হয়ে যায়। তবে আমরা বিরোধী পক্ষীয়দের তাঁবেদার কর্ম্মচারী হলেও, নিজেদের মধ্যে যথাসম্ভব সদ্ভাবই রেখে চলেছি। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তো নিজেদের মধ্যে অকারণে খেয়োখেয়ী করতে পারি না। ওঁদের ঐ বড় বাড়ীর আসলে দেখা-শুনা করে থাকে ঐ বড় ম্যানেজারের অধীনস্থ এই বস্তী-গ্রামের দুজন, বড় সর্দ্দার হাঁরু গোঁসাই ও রহমনিয়া খান। আজ্ঞে না! বড় তরফের ঐ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। পূর্ব্বে এই ষ্টেট যৌথ-ভাবে ম্যানেজ হবার সময় আমি ওঁরই এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার ছিলাম পরে এঁদের বিবাদ বাঁধার পর আমি আমাদের ছোটতরফের তরফে কর্ম্মবহাল হই।

এই ভদ্রলোককে ডাঃ সুরজিৎ রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে থানায় পাঠানোর জন্য আমাদের এই চক্ষু বিশারদ ডাক্তারের উপর এই সময় খুব বেশী সন্দেহ হচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর এই ম্যানেজারের উপর আমাদের সন্দেহ অতিরিক্তরূপে বেড়ে গিয়েছে। এক্ষণে বেশ বুঝা গেল যে এঁদের এই উভয় ম্যানেজারের মধ্যে স্ব স্ব মনিবদের অগোচরেই ভালোরূপেই যোগসাজস স্থাপিত হয়েছে, এঁকে বেশ কিছুটা ভড়কে দিয়ে এঁর মনোবল ভেঙ্গে এঁর কাছ হ'তে আমাদের আরও কথা বার করবার প্রয়োজন হলো। এক্ষণে আমি আমার পূর্ব্ব-আবিষ্কৃত মক্ষম অস্ত্রটী এঁর উপর প্রয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আপনি যে সারা জীবন পরস্মৈপদী হয়ে জীবন-

যাপন করেছেন তা তো বুঝাই গেল। এ'ছাড়া আপনার স্বীকৃতি মতে আপনি একজন সচ্চরিত্রও বটে! কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে বড়তরফের ম্যানেজার যেটুকু বললেন তাও তো আপনি বললেন না। এখন আপনি বলুন দেখি তো রামবাবু—আপনি আপনার প্রকৃত নাম 'রাম' নাম ত্যাগ করে সুরেশ নামটী গ্রহণ করলেন কেন? এ সব আমরা জানলেও তো এখন আপনার নিজের মুখ হতেই শুনতে চাই। অবশ্য এখানেই আপনার বিপদ শেষ হয় নি। ইতিমধ্যে বেনিয়াপুকুরে আপনার বাসগৃহে খানাতল্লাস সুরু হয়ে গিয়েছে। ওখানে আপনার মনিব ডাক্তার সুরজিৎ রায়ের গুদাম থেকে চুরি করে আনা 'ভিরোল বিষের' একটা প্যাকেট যদি পাওয়া যায়, তা'হলে তো আপনি গেলেন। এখন ঐ গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে পরিত্যাগ করে আপনি নিজে বাঁচবার চেষ্টা করুন, আপনার ঐ ধুরন্ধর বন্ধুবর তো আপনাকে ভালো করেই ফাঁসিয়ে গেলেন। না—তাকে নয়—আপনাকে আমাদের রাজসাক্ষী করে নিতে হবে। আপনি যখন ওনার তুলনায় বহুগুণে 'কম দোষী' তখন আপনাকেই রাজসাক্ষী ক'রে নেওয়ার আমরা পক্ষপাতী। এখন আপনার যা অভিরুচি তা বুঝে সুঝে আমাকে বলুন।

আমার এই প্রশ্নে এই ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বোধহয় ভেবেছিল এই সব গুহ্য সংবাদ তা'হলে আমি বড়তরফের ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের মুখেই শুনেছি। এর কারণ, তার এই নাম ভাড়ানোর বিষয়টুকু একমাত্র ঐ বড় ম্যানেজার ভিন্ন অন্য কারুর তো দূরের কথা—তাঁদের নিয়োগকর্ত্তাদেরও জানবার কথা নয়। বস্তুত পক্ষে আমার এই ধাপ্পায় ভুলে দিশেহারা হয়ে ভদ্রলোক ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে সে তার মনের প্রতিরোধ শক্তি পরিপূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। এক্ষণে সে পরের সংসার নিজের ঘাড়ে নিয়ে সংসার পেতে ব'সেছে—এক্ষুণি আবার এই সব সুযোগ সুবিধা হেলায় হারিয়ে ফেলতে বোধহয় রাজী ছিল না। এই সময়টুকুর আমি এজন্য যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে মনস্থ করলাম। এরপর আরও কয়েকটী অনুরূপ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা মাত্র ভদ্রলোক ভেঙে মুষড়ে পড়ে আমাদের নিকট একটী অতিরিক্ত বিবৃতি প্রদান করেছিল। এই অতিরিক্ত বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আজ্ঞে! আমি এখন আর কোনও কথাই আপনাদের নিকট গোপন করবো না। যৌবনে আমি এবং ঐ বড় ম্যানেজার বর্মাবাসী ছিলাম। এই সময় রেঙ্গুনে খুনসহ এক ডাকাতিতে আমরা উভয়ে একত্রে জড়িয়ে পড়ি। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে আমরা দু'জনেই জাহাজে জাল নাম নিয়ে ভারতে ফিরে আসি। এখনও পর্য্যন্ত আমি জাল নাম 'সুরেশই' ব্যবহার করে আসছি। আমার যে বন্ধু তাঁর স্ত্রী'কে আমায় দিয়ে গেলেন তারও নাম ছিল সুরেশ। এই জন্য এতে আমার আরও সুবিধে হয়। আমি কল-কাতায় থাকলেও ঐ বড় ম্যানেজার এখানে ওখানে ঘুরে কাশীপুরের সাবেকী কর্ত্তাদের মনোরঞ্জন করে চাকুরী গ্রহণ করেন। এরপর নিজের কর্ম্মদক্ষতার গুণে বড়ো ম্যানেজার হওয়ার পর আমাকে ডেকে এনে তাঁর অধীনে জনৈক সহযোগী কর্ম্মীরূপে বহাল করে নেন। আমি আমার পূর্ব্ব-স্বভাব বন্ধু-স্ত্রীর প্রভাবে পড়ে অপসৃত করে স্বাভাবিক হয়ে উঠি। কিন্তু আমার ঐ পূর্ব্ববন্ধু বড়ো-ম্যানেজার তার পূর্ব্ব স্বভাব বদলাতে পারলেন না। তিনি কাশীপুরে বদলোকদের একত্র করে জমীদারের ও নিজের সঙ্গতির জন্য জমী দখল ও প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কাজ করে অপরাধ তো করেই থাকেন, এখন ওঁদের এই কলিকাতার বস্তীগুলোতেও বহু চোর বদমায়েসদের আড্ডা করে তুলেছেন। তবে এই বিষয়ে রহমনখান ও হারু গোঁসাই হচ্ছেন ওঁর দক্ষিণ হস্ত। সম্প্রতি দুটো বড়ো বড়ো চুরি এই মহানগরীর বুকের ওপর ইনিই করিয়ে দিলেন। এ'সব আমি অবশ্য হারু গোঁসাই-এর মুখে আজই শুনলাম। তা'হলে যখন ফেঁসেই গেলাম, তখন বাকী খবরগুলোও আপনাকে দিয়ে দিই। এই বেণীয়াপুকুর বস্তীরই মধ্যস্থলের কোনও একটা জায়গায় ওরা কোনও একটা ভালো মানুষকে একটা এঁদো ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে। আমি প্রাণের দায়ে আমার নিজের আফিমের কৌটা থেকে ওই হারু গুণ্ডাকে রোজ সন্ধ্যায় একটু আফিম খাওয়াই। তবে এর পরিবর্ত্তে প্রয়োজন মত আমারও সে ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটে। সন্ধ্যাকালে মৌতাতের সময় সে অনেক মনের প্রাণের কথা আমাকে বলে ফেলেছে। আমাকে যখন বড়ো ম্যানেজার ফাঁসালে তখন আমিও তাকে ফাঁসাবো। আমিও একজন বড় ঘরের মানুষ ছিলাম মশাই। কাশীধামের মহাধনী অমুকবাবুর নাম শুনেছেন তো। কাশীতে তাঁদের দুটো ধর্ম্মশালা ও মস্ত জমীদারী ও বহু বাড়ী গাড়ী আছে। তিনি আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হন। তাঁর পিতা আমার পিতামহের বাড়ীতে থেকে একদা লেখাপড়া করতেন। এদিকে আমাদের অবস্থা পড়ে গেলেও ঈশ্বরের দয়ায় তিনি হয়ে উঠলেন মহাধনী। কিন্তু ওঁর স্বর্গতঃ পিতা-মহের বংশধরদের উপর নির্দ্দেশ আছে যে আমাদের বংশের কখনও কেউ ওঁদের পরিবারের কাউর কাছে গেলে যেন উপকার পায়। কাশীধামে গেলে আমার ৺পিতা-ঠাকুরের ন্যায় আমিও ওঁদের বাড়ীতেই উঠি। এখন আরও একটী বিষয় আপনাকে আজ জানাবো। ঐ বড় ম্যানেজারবাবু গত পরশুর পূর্ব্বদিন হন্তদন্ত হয়ে আমার নিকট এসে পাঁচশত টাকা কবুল করে প্রস্তাব করেছিলেন যে আমি যেন আমার বর্ত্তমান মনিব ডাঃ সুরজিত রায়ের পকেট, বাক্সো ও ড্রয়ার তল্লাস করে একটা পত্র উদ্ধার

করে দিই। আমি এতক্ষণে ব্যাপার গোলমাল বুঝে প্রত্যুত্তরে তাকে বলেছিলাম যে আমি বদ্ হলেও বেইমান নই। একবার বেইমানি করেছি ব'লে বার বার বেইমানি করতে পারবো না। সেই দিন যদি বুঝতে পারতাম যে এর মধ্যে মনিবের বিপদ আছে তা'হলে সে কাযটাও আমি কখনই করতাম না। এই কিছুদিন আগে সে বললে যে, একটা ঔষুধ তৈরী করবার জন্যে মাত্র এক শিশি ভিরোল দরকার, কিন্তু লাইসেন্সের অভাবে তাঁরা সেই একটী শিশিও কোথা হতে জোগাড় করতে পারছেন না। তাই আমি মনিবের ওখান থেকে এক প্যাকেট নিয়ে এসে তা থেকে একটা শিশি বার করে তাঁকে দিয়েছিলাম। আমি আমার বর্ত্তমান মনিবের সব সময়েই মঙ্গল কামনা করে থাকি। এই তো কাশীধামে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ আমিই পাকাপাকি করে এসেছিলাম। ভগবানের দয়ায় এই সম্বন্ধটা ফেঁসে যেতে যেতে আবার বোধ হয় ঠিক হয়েই গেল। মাঝখান হতে উড়ে এসে জুড়ে বসা অপর এক পাত্রকে সরাবার জন্যে আমাকে কি কম খোঁজখবর ও প্রমাণ জোগাড় করতে হয়েছিল। তবে এই সব খবর জোগাড় করে কাশীধামে আমার ঐ আত্মীয়ের নিকট পাঠানোর ব্যাপারে ঐ গোঁফওয়ালা বড়ো ম্যানেজারও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আমার প্রয়োজন ও তার প্রয়োজন পৃথক হলেও আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঐখানে ঐ পাত্রীর বিয়ে না হয় এবং আমার উদ্দেশ্য ছিল যাতে পাত্রীর এই-খানে বিয়ে হয়। তবে এই পাত্রী নিয়ে কাড়াকাড়ীর ব্যাপারের মধ্যে একটা রহস্য নিহিত ছিল। এই রহস্য আপনাদের জানার প্রয়োজন নেই ব'লে তা আর আমি আপনাকে বললাম না। এখন দয়া করে আমাকে রাজ-সাক্ষী [এপ্রুভার] না করে নিলে আমি ধনে-প্রাণে মারা যা'বো। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে ঐ ভিরোল বিষ দিয়ে ওরা নিশ্চয়ই কাউকে খুন করেছে। কিন্তু দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি এই মহা অপরাধে একেবারেই নির্দ্দোষ।"

[ক্রমশঃ

জাতীয় পতাকা

নরেন্দ্র দেব

ইতিহাসে দেখা যায় কতবার কত মহারথ,
চাহিয়াছে বাঁধিবারে এক ধর্মরাজ্য পাশে
খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত।
ব্যর্থ করি সে প্রয়াস ঘটিয়াছে আত্মঘাতী রণ,
ভারতে মরেনি আজও ভেদ-বুদ্ধি রক্ষঃ বিভীষণ।
পরাজিত পুরু তাই, পৃথ্বীরাজ দিয়ে গেছে প্রাণ,
ইরাণী, তুরাণী সেনা, শক, হুন, মোগল, পাঠান
এদেশে করেছে অভিযান।

* * *

বারে বারে শত্রু এসে আমাদের করেছে আঘাত;
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ দুর্যোগের সে দুঃসহ রাত
কাটিয়াছে এতদিনে বহু দুঃখ বেদনার মাঝে,
মিলিয়াছি আজ সবে যে পবিত্র কাজে
অতীতের কোনো ব্যথা রাখিবনা মনে,
পলাশী ও পাণিপথ—ডুবে যাক্ চির বিস্মরণে;
বন্ধন-বিমুক্ত প্রাতে, শহীদ-সৈনিক-বেদী মূলে
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত এই জাতীয় পতাকা উর্দ্ধে তুলে
মিলিয়াছি ভারতের স্মরণীয় শুভ পুণ্যক্ষণে—
বিগত দুঃস্বপ্ন যত যাক মিলাইয়া নবীন অরুণোদয় সনে।

* * *

আজ শুধু এই স্মৃতি উজ্জীবিত করুক জীবন,—
মহারাণা প্রতাপের চিতোর রক্ষায় মৃত্যুপণ
ছত্রপতি শিবাজীর মহারাষ্ট্রে মহান উদয়,
পাঞ্জাব-কেশরী যারা মুঘলের ছিল মহাভয়-
চাঁদ কেদারের কথা, যশোরের আদিত্য প্রতাপ,
যাদের বীরত্ব-স্মৃতি রক্তরাঙা অগ্নিময় ছাপ
রেখে গেছে আমাদের মনে,
সে কথা স্মরিয়া আজ ছুটে এস হেথা জনে জনে,
শ্রদ্ধাভরে তাহাদের নতশিরে জানাও প্রণতি,
শৃঙ্খল মোচনলাগি যুগে যুগে যারা কৃচ্ছ্র তপে হয়েছিল ব্রতী।

* * *

মহাভারতের ধ্যানী! চক্রধারী হে পার্থসারথি!
তব সুদর্শন চক্র লাঞ্ছিত এ ত্রিবর্ণ কেতন,
তোমারে স্মরিয়া সবে করি আজ গর্বে উত্তোলন
সার্দ্ধসপ্ত শতাব্দীর পরাধীন দাসত্বের পরে
ভারতের ভাবগ্রাহী প্রতি ঘরে ঘরে।

* * *

অনুকূল বায়ু বেগে নাচুক পতাকা উড়ে উড়ে
অশোকের কীর্তি-চক্র আবর্তিয়া সিংহধ্বজ চূড়ে।

রাষ্ট্রপথে যে চক্রের অবিরাম সঘন ঘর্ষণ
রেখেছে ধূলিতে আঁকি কত যুগ যুগান্তের উত্থান পতন,
সেই বার্তা স্মরি আজ তুলে ধরো এ বীর্য-প্রতীক,
উঠুক উজ্জ্বল হয়ে এ দেশের গৌরবের দিক।

* * *

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত এই নবোদিত পতাকা সম্মুখে,
বহু আকাঙ্খিত স্বপ্ন সাফল্যের সার্থকতা সুখে,
এস বন্ধু! স্মরি আজ সেই সব সুকৃতী সন্তান—
স্বাধীনতা লাগি যারা অকাতরে দিয়ে গেছে প্রাণ!
হাসি মুখে যে বীরেরা ফাঁসী-মঞ্চ করেছে বরণ,
দূর দ্বীপান্তরে যারা সহিয়াছে চির নির্বাসন,
যাদের যৌবন গেল বন্দী হয়ে শত্রু কারাগারে,
আহত রক্তাক্ত যারা বিদেশীর লাঞ্ছনা প্রহারে,
তাদের স্মরণ করি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধানত শিরে—
মৃত্যুজয়ী সেই সব দেশভক্ত দুঃসাহসী বীরে।

* * *

যাহাদের শৌর্যে বীর্যে ত্যাগের দুশ্চর তপস্যায়
শতাব্দীর মৃত জাতি অকস্মাৎ নব প্রাণ পায়,
যাহাদের কণ্ঠে বাজে শৃঙ্খল ভাঙার দৃপ্ত গান,
করেছিল কাড়াকাড়ি—আগে প্রাণ কে করিবে দান?
তাহাদের জনে জনে সসম্ভ্রমে করিয়া বন্দন
আমাদের ভক্তি-অর্ঘ যুক্তকরে করি নিবেদন।

* * *

দেশপ্রেমিকের পুণ্য-তর্পণ-উদকে বদ্ধাঞ্জলি ভরি'
তোমারে বরণ আজি করি—
মুক্ত ভারতের নব জাতীয় পতাকা!
তোমার ত্রিবর্ণে আছে আঁকা
ত্যাগের গৈরিক মন্ত্রে জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্বোধন,
কাশশুভ্র শান্তি মাঝে—প্রেমময় সবুজ জীবন;
চক্রসম আবর্তিত নিত্য যাহা অনিত্য জগতে
তাহারি শাশ্বত চিহ্ন বক্ষে ধরি জয়কীর্তি রথে
লয়ে যাবে তুমি আজ গৌরবের গণ-পথে জানি—
প্রসন্ন রুদ্রের যেথা প্রসারিত সুদক্ষিণ পানি।

* * *

দেশ মাতৃকার তুমি অসামান্য শক্তির প্রতীক।
তোমার মর্যাদা লাগি কত বীর তরুণ সৈনিক
আগ্নেয়-অস্ত্রের বুকে পাতিয়া দিয়াছে নিজ বুক
পুত্রহারা কত মাতা ভুলি শোক গর্বদীপ্ত মুখ—
সন্তানের বীরত্বের অসামান্য কীর্তিগাঁথা স্মরি'!
তোমারে বরণ আজি করি—
হে অপূর্ব, মনোহর ত্রিবর্ণের নন্দন নিশান!
বাজায়ে মঙ্গল-শঙ্খ, নিনাদিয়া সমর বিষাণ,
এ পতাকা উচ্চে তুলে ধরি!

* * *

জানি, জানি, রেখে যাবে লিখে
বিপুলা এ পৃথিবীর দিগন্তে চৌদিকে
পবন-তাড়িত তব পত-পত প্রতি সঞ্চালন—
তোমার রাখিতে মান যারা দিলে বিলায়ে জীবন!
ব্যর্থ নহে তাহাদের সুকঠোর ব্রত,
দেশে দেশে ইতিহাসে উৎকীর্ণ হইয়া আছে কত
পতাকাবাহীর সেই শেষ রক্ত দানের কাহিনী,
মহারণে মৃত্যুপণে দুঃসাহসী বীরের বাহিনী
রেখেছে তোমারে উচ্চে ধরি
প্রাণ তুচ্ছ করি।
তাহাদের অতুলন বীর্য গাথা স্মরি;
যে পতাকা দিনু আজ উর্ধ্বাকাশে তুলি
ইহার মর্যাদা যেন জীবনে কখনো নাহি ভুলি।

* * *

এই পতাকায় লেখা শহীদের শোণিত তর্পণ
পিতৃ-পিতামহ যাহা ভবিষ্যদ্বংশধরে করিবে অর্পণ
ভারতের যেথা যত রণদক্ষ তরুণ সৈনিক
এ গুরু দায়িত্বভার তারা আজ স্কন্ধে তুলে নিক।
জননীর জয় রবে এ সংকল্প হোক উচ্চারিত,
কারও ভয়ে কোনো দিন এ জীবনে নাহি হ'য়ে ভীত
দণ্ড এর উচ্চে যেন চিরদিন রাখিবারে পারি,
দৃঢ় করি বজ্রমুষ্টি ধরুক পতাকা ভারতের বীর নর-নারী।
বহিয়া চলুক এরে ভুবনের দিকে দিকে আজ,
শ্রদ্ধা যেন করে এরে এ বিশ্বের বীরেন্দ্র সমাজ।
শান্তি-প্রীতি-সৌহার্দ্দের মর্মছোঁয়া বাণী প্রচারিয়া
বিশ্ব মানবেরে আজ বেঁধে দিক প্রেম-মন্ত্র দিয়া।
ভারত পতাকা দিক ফিরাইয়া এশিয়ার গৌরব সম্ভ্রম,
আসমুদ্র হিমাচলে কোটি কণ্ঠ উঠুক ধ্বনিয়া—বন্দেমাতরম।

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

উপানন্দ

একদা প্রোজ্জ্বল হয়েছিল বাঙ্গালীর গৌরব পলাশীর প্রান্তরে। এই প্রান্তরে প্রত্যক্ষ হয়েছিল বাঙ্গালী বীর-সেনানী মোহনলালকে। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালক মোহনলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সেদিন তেজোদৃপ্ত বাণী, প্রকাশ পেয়েছে তার অমিত বিক্রম। বিকীর্ণ করেছে সে তারুণ্যের শ্রী। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, দুর্বলচিত্ত সিরাজউদ্দৌলা তাকে বুঝতে পারেন নি, আস্থা রাখতে পারেননি তার ওপর। ফলে অস্তমিত হোলো স্বদেশের ভাগ্যসূর্য্য। তার পর এলো তমসাচ্ছন্ন দিন। বাঙ্গলা তথা ভারতে পলাশীর পরবর্ত্তী প্রায় দুইশত বৎসরের ইতিহাস দাসত্বের ইতিহাস, দুঃখের ইতিহাস, গ্লানি ও ক্লৈব্যের ইতিহাস। এরই মাঝে হঠাৎ ফুটে উঠলো ঊষার আলো, বেজে উঠলো প্রভাতীস্বর ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে।

আমরা পেলাম উনবিংশ শতাব্দী। এই শতাব্দী আমাদের চিরপ্রণম্য। সমগ্র শতাব্দী জাগরণের যুগ। এ জাগরণের উদ্‌গাতা রাজা রামমোহন রায়। দুঃখের বিষয় রাজা রামমোহনকে মানুষ ঠিক মত আজও চিনতে পারেনি। তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্য্য সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি হোলো—যেদিন ভগবান স্বয়ং তাঁর তিরোধানের দুবছর পরে নরদেহ ধারণ করলেন নিরক্ষর ব্রাহ্মণের বেশে। বাঙলার গাঙ্গের উপত্যকা উদ্ভাসিত করলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে।

ভারতের প্রথম জাগ্রত পুরুষ 'ভারতপথিক রামমোহন'। এজাতির মুক্তি-যজ্ঞের প্রথম উদ্যোক্তা তিনিই। তাঁরই উত্তরসাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের পদধ্বনি এলো কানে, দেখা গেল স্বদেশের সর্বতোমুখী জাগরণের বিপুল সমারোহ। জনারণ্যে পেলাম আমরা নবোদ্ভূত বনস্পতির দল। ধর্মে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ; কেশবচন্দ্র, সমাজ-সংস্কারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, চিকিৎসা বিদ্যায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল; স্যার নীলরতন, বিধানচন্দ্র -দর্শনে ব্রজেন্দ্র শীল, শ্রীঅরবিন্দ, সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় কুমার, কালীপ্রসন্ন, কাব্যে রঙ্গলাল, হেম, নবীন, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি এই সব বনস্পতির ছত্রছায়ায় যুগযাত্রী পেলো পরম আশ্রম। এঁদের সবার উপরে অধিষ্ঠিত ঠাকুরের সর্বোত্তম লীলা সহচর ও শক্তিধর 'সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এঁরই তূর্যনাদে জাগ্রত হোলো ভারতের অন্তর দেবতা।

শঙ্করাচার্য্যের নব-রূপই স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এক ও অভেদ—কবিগুরু ভগবান পরমহংসের প্রশস্তি করে বলেছেন—

> বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
> ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
> তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
> নূতন তীর্থ রূপনিল এজগতে;
> দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
> সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'

আমরা যে যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছি এটা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ। বিবেকানন্দের অশরীরী বাণী আজও বিশেষভাবে সক্রিয়। রামমোহন থেকে গান্ধী পর্য্যন্ত দেড় শত বৎসর ধরে যে অধ্যাত্মসাধনা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী চলেছিল

তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভারতের স্বাধীনতা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে নতুন অধ্যায়। এদিনে আমেরিকার চিকাগো সহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে মূর্তিমান বৈদিক ভারত, ত্রিংশবর্ষীয় তরুণ সন্ন্যাসী দিলেন ভারতের শাশ্বত আত্মার বাণী। সুরু হোলো পৃথিবীর চিন্তা—জগতের আমূল পরিবর্তন। সে পরিবর্তনের গতিপ্রবাহ আজও চলেছে দিকে দিকে উদ্দাম বেগে। যতদিন না অদ্বৈত বেদান্তবাদকে আশ্রয় করে হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ঐক্যসূত্রে মানব সমাজ গঠিত হবে, আর বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, ততদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের চিন্তা প্রবাহের বিরাম নেই।

স্বামীজী মাত্র পনরো বছর ধরে শ্রীগুরুর অভ্রভেদী বিজয় কেতন উড়িয়ে সারা পৃথিবীকে দিব্য জীবনের পথে আকর্ষণ করেছেন, করেছেন নবযুগ সভ্যতার উদ্বোধন। ভগবান শঙ্করদেব পর আর কেউ এমন ভাবে ধরিত্রীকে দিব্যরূপ দেননি! স্বামীজী ভারতের জরাজর্জরিত অঙ্গকে যৌবনশ্রী দিয়েছেন, আর তাকে করে গেছেন সহস্র বৎসরের ওপর দৃপ্ত ও সতেজ। স্বামীজী বললেন—তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার উপাস্য। উন্নতির জন্যে প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা—তার আদর্শ Be and make গঠিত হও ও গঠন করো।

স্বামীজীর তিরোভাবের তিন বৎসর পরে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হোলো। এই আন্দোলনে এলো ভারতের স্বাধীনতার উদগ্র অভিযান। বিবেকানন্দ মানুষ নন, অশরীরীবাণী। মহাপুরুষগণের মৃত্যু হয়না, তাঁরা জীবিত লোকদের চেয়ে অধিক তর জীবন্ত ও আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজী তাঁর জন্মভূমি কলকাতায় নাগরিকদের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা সভায় অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন "যদি আগামীকাল আমার দেহত্যাগ হয় আমি কোন চিন্তা করিনা। আমি জানি—আমার অসমাপ্ত কাজ বাঙলার যুবকরাই সম্পন্ন করবে। বাঙলার যুবকদের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস, তাদের ওপর আমার অফুরন্ত আশা—'

স্বজাতিকে সর্বতোমুখী দুর্গতি ও অবনতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে বাঙ্গলার যুবকরা স্বামীজীর আশা আকাঙ্খা আজও পূর্ণ করতে পারেনি, তা হোলে সমগ্র দেশের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে দেখা দিতনা সমাজধ্বংসী দুর্নীতি, ব্যবহারে অসংযম, চারিত্রিক পদস্খলন, মহান্ আদর্শে অনাস্থা, শিষ্টতা বিনয় চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, ধর্মভাবের বিলোপ সাধনের উৎসাহ ও নির্লজ্জ অহংমন্যতা, দেখা দিতনা অসংযত ভোগের তীব্র বাসনায় চিত্তের বিভ্রান্তি, দেখা দিতনা পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষিতা ও পরাশ্রয়, ধর্মকে ঠেলে দিয়ে অর্থও কামের জন্য উন্মাদনা। কিন্তু বাঙলার যুবকদের মধ্য থেকে স্বামীজীর আশা আকাঙ্খাপূর্ণ করবার জন্যে বেরিয়ে এলেন এমন একজন তরুণ—যিনি স্বামীজীর শক্তিবাদের আগ্নেয়গিরি আর অভীমন্ত্রসিদ্ধ তপস্বী। ইনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেতাজী বলেছেন—'If he had been alive, I would have been at his feet. Modern Bengal is his creation—if I err not.

স্বামীজী বলেছেন—'অহিংসা ঠিক নিগূঢ় সত্য, কিন্তু তুমি গেরস্ত, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ করো, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ,—পরকালেও তাই—'

তাঁর সব কথার সার কথা—শক্তিবাদ, অভীধর্ম। তিনি গোটা ভারতবর্ষকে এই অভীধর্মে দীক্ষিত করে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বীরত্ববাদের মানসিকতা।

নেতাজী তাঁর বীরত্ববাদের মূর্তবিগ্রহ। তিনি স্বামীজীর বাণীকে রূপ দিয়েছেন। নেতাজীর আবির্ভাব না হোলে আর ১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী জার্ম্মানীতে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে স্বদেশের মুক্তির জন্যে তিনি অভিযান না করলে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ সম্ভব হোতো কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িয়ে পড়ে, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় রাষ্ট্র নায়ক। সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবে এই কথাই জেগে ওঠে। আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে এসে কীর্তিশালী হয়েছিলেন। স্বামীজীর অসহায় নিঃসম্বল আর একক অবস্থায় আমেরিকা যাত্রার মত তাঁরও যাত্রা সুরু হয়েছিল অগোচরে কাবুলের পথে। এই একক, রিক্ত ও সহায়সম্বলহীন তরুণ সুভাষ বহির্ভারতে গিয়ে মহাশক্তিকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন।

একাধিকবার ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার ফলে তাঁকে এক বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, রাষ্ট্রপতির আসন ছেড়ে দিতে হয়েছে। তাঁর সাফল্যে গান্ধীজীর মত বিরাট পুরুষেরও টনক নড়েছিল। গান্ধীজীকে তিনিই Father of the nation অর্থাৎ রাষ্ট্রপিতা আখ্যা দিয়েছেন। ত্রিপুরীর নীচতা সুভাষচন্দ্রের অন্তর স্পর্শ করেনি, এ থেকেই প্রমাণিত হয়॥ ১৯৩৮—১৯৪০ সাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়ও বটে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের হরিপুরা কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতিরূপে সুভাষ চন্দ্র যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তিনিও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রেরিত দিব্যশক্তি। তিনি বলেছিলেন—'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ ইতিহাসের এক

পথ সন্ধিতে দাঁড়িয়েছে। যে পথে অন্যান্য সাম্রাজ্য গিয়েছে সে পথে তাকে যেতে হবে, নয়ত তাকে অনেকগুলো স্বাধীন দেশের ফেডারেশনে রূপান্তরিত হোতে হবে। এই দুটিপথ তার সামনে খোলা আছে'—দ্বিতীয় পথই গ্রহণ করলো ইংরেজ। ব্রিটিশ সাম্রাজের কমনওয়েলথ নেশনস্ এ রূপান্তর তার ন বছর পরের ঘটনা।

যেদিন নেতাজী রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করলেন, সেদিন একটি টেলিগ্রামে কবিগুরু লিখলেন—'এক অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তুমি যে সম্মান বোধ ও সহনশীলতা দেখিয়েছ তা তোমার নেতৃত্বে আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে। আত্মসম্মান বজায় রেখে এক ক্ষণিকের পরাজয়কে চিরদিনের তরে পরিণত করতে হোলে বাংলা দেশকে আজ ঠিক এই রকম পূর্ণসংযমের পরিচয় দিতে হবে।'

স্বামীজীর ভাবধারায় পুষ্ট নেতাজী ছিলেন কর্মযোগী, বীরেন্দ্রকেশরী ও মহামানব। নিজের বিশ্বাস, সঙ্কল্প ও আদর্শে তিনি কারো কাছে নত হন নি। তার সংগ্রাম বা যুদ্ধ সফল না হোলেও তার সঙ্কল্প জয়যুক্ত হয়েছে। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে মানবতার সুর। যত্র জীব তত্র শিব—তিনি মনে প্রাণে অনুভব করতেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নেতাজী যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার সেই সময়ে একদিন সকালে কাজে বেরিয়ে দেখতে পেলেন—ছোট একটি বালক রাস্তার ম্যানহোলের মধ্যে নেমে ময়লা পরিষ্কার করছে, তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো। এত অল্প বয়সের বালককে দিয়ে এই কাজ করানোর প্রথা বন্ধ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হোলেন, কিন্তু পারলেন না, তাঁকে আটক করে মান্দালয় জেলে পাঠানো হোলো। দেশের জন্য তিনি এগারো বার কারাবরণ করেছেন, অসহ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন, তবু নতি স্বীকার করেন নি।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীমাসে রেঙ্গুনের মিয়াংএ আজাদ হিন্দ হাসপাতালের ওপর ব্রিটিশ বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ শুরু করলো। চারতলার ওপর হাসপাতাল, আর তার ছাদের ওপরে খুব বড় একটি রেডক্রস থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালটি বোমার আক্রমণ থেকে রেহাই পেলো না। চলেছে বোমাবর্ষণ। নেতাজী খবর পেলেন। চঞ্চল হয়ে মোটরে উঠে ড্রাইভারকে হাসপাতালের দিকে গাড়ীচালাতে হুকুম দিলেন। ড্রাইভার আপত্তি করলো, ভীষণ বোমাবর্ষণের ভেতর কেমন করে গাড়ী চালাবে, নেতাজী চীৎকার করে বললেন, চুলোয় যাক্ ব্রিটিশ বোমার আক্রমন। আমার সৈনিকরা মরছে—আর আমি কি এ সময়ে প্রাণের ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকবো? গাড়ী চালাও।'

ড্রাইভার লজ্জা পেলো। রাস্তায় জনমানব নেই। বোমাবর্ষণ তীব্রভাবে তখনও চলেছে। বোমার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ীটা ধাক্কা খেলো একটা বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে। নেতাজী গাড়ী চালাতে হুকুম দিলেন। কোন রকমে ভাঙ্গা গাড়ীটাকে চালিয়েই হাসপাতালের সামনে এনে দাঁড় করালো ড্রাইভার। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ আর আর্তনাদ। আর্তকণ্ঠের ধ্বনি কাণে আসতে নেতাজী কাতর হয়ে পড়লেন। গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে ঢুকলেন নেতাজী হাসপাতালের ভগ্নস্তূপের মধ্যে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ছশত আহত সৈনিক ছিল সেই হাসপাতালে—বোমা বর্ষণের ফলে তাদের মধ্যে ত্রিশোজন মারা গেছে তখন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন নেতাজী—তাঁর চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা। ২১শে আগষ্ট ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ স্থগিতের আদেশ দিলেন।

নেতাজীর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষ হবে একটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তিনি কোহিমা ইম্ফল পর্যন্ত এসে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, আন্দামান দ্বীপেও তুলেছিলেন বিজয় পতাকা, আজাদ হিন্দ স্বাধীনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পূর্ব এশিয়ায়। তার শাসন তন্ত্রকে মেনে নিয়েছিল পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র। শিবাজীর পর তার মত বীর ভারতবর্ষে আর দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সুভাষচন্দ্র আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই মধ্যাদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন। কর্তব্য ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনী শক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রিক শক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর—।'

তোমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর উত্তরসাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী পাঠ করবে, তা'তে যথেষ্ট উপকার লাভ করতে পারবে। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও জাতীয় শক্তি সুদৃঢ় করবার জন্য এই দুই মহামানবের আদর্শ তোমাদের অন্তরে প্রেরণা এনে দিক, এইটাই অন্তরের সঙ্গে কামনা করি।

স্যার ওয়াল্টার স্কট

রচিত

রব রয়
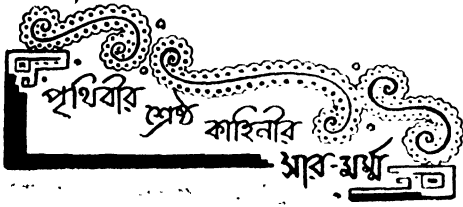
সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পুলিশের কাছে নালিশ-করার এ খবর ডায়না জানতে পারলো···সে একদিন ফ্রান্সিসকে নিয়ে হাজির হলো বিচারশালায়—হাকিমের কাছে···এসে প্রমাণ দিলে—ফ্রান্সিস্ আর স্যার মরিস একসঙ্গে পথে আসেননি···ডায়নার সঙ্গে ফ্রান্সিস্ আসেন এ-অঞ্চলে···কাজেই ফ্রান্সিস্ স্যার মরিসের টাকার থলি লুঠ করতে পারেন না! এ কথার প্রতিবাদে স্যার মরিস্‌ও স্পষ্ট-জবাব দিতে পারলেন না···ইতস্তত করতে লাগলেন।

হাকিমের সঙ্গে ডায়নার আর স্যার মরিসের এই বাদ-প্রতিবাদ চলেছে, এমন সময় সেখানে এলেন—পথে-দেখা সেই ডাকাত-শায়েস্তাকারী বীর ক্যাম্পবেল। তিনি বললেন,—ঘটনার দিন সরাইখানা থেকে বেরুনোর সময় ফ্রান্সিসের সঙ্গ ত্যাগ করে স্যার মরিস হয়েছিলেন ক্যাম্প-বেলের সাথী এবং দুজনে পথ চলবার সময়েই হয় স্যার মরিসের টাকার থলি চুরি! স্যার মরিস্ এ কথারও কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না···ফ্রান্সিস্ পেলো বেকসুর মুক্তি।

ফ্রান্সিস্‌কে অভিযুক্ত করার পিছনে কারো যে প্রশ্রয় ছিল, সে কথা বোঝা গেল। তবে কে সে ব্যক্তি···সেটা ঠিক জানা গেল না।

এ ঘটনার পর, খুড়োর গৃহে খুড়তুতো-ভাইদের সঙ্গে আনন্দে কাটে ফ্রান্সিসের দিন। ডায়নার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে সে ঘুরে বেড়ায়···এমন সময় হঠাৎ বাপের কাছ থেকে এক চিঠি এলো···মর্ম্মান্তিক খবর! বাপ লিখেছেন—তাঁর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে র‍্যালে কোথায় পালিয়েছে···সম্ভবতঃ স্কটল্যাণ্ডের দিকেই!

ডায়নাও দেখলো সে চিঠি···ফ্রান্সিস্‌কে বললে,—শোধ নেবেনা এই অন্যায়-অপকর্ম্মের?

ফ্রান্সিস্ বললে,—নেবো! বনে-পর্ব্বতে সর্ব্বত্র তার সন্ধান করবো! যথাযোগ্য শাস্তি দিতে হবে তাকে!

ফ্রান্সিস্ বেরিয়ে পড়লো তার শত্রুর সন্ধানে!

দিন যায়···অবশেষে ফ্রান্সিসের অনুপস্থিতিতে ব্যাকুল হয়ে ডায়না একদিন বেরুলো স্কটল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে। ওদিকে গিরি-বন-উপত্যকায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন র‍্যালের দেখা পেলো ফ্রান্সিস।

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে নদীতে নেমে আজ্‌লা-ভরে জল খেয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠতেই ফ্রান্সিস্ দেখে—দূরে বনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন মানুষ! দেখেই ফ্রান্সিস চিনলো—তাদের একজন হলো র‍্যালে, আর একজন স্যার মরিস্!

ফ্রান্সিস্ এতক্ষণে বুঝতে পারলো—তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ স্যার মরিস্ দিয়েছিলেন কার পরামর্শে! এমন দুর্ব্বৃত্ত র‍্যালে—তার উপর ফ্রান্সিসের বৃদ্ধ পিতার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে সে হয়েছে ফেরার!

কিছুক্ষণ বাদে স্যার মরিস্ সেখান থেকে চলে যেতেই, খোলা তলোয়ার হাতে ফ্রান্সিস দাঁড়ালো বিশ্বাসঘাতক-চোর র‍্যালের সামনে!

র‍্যালে এমন অতর্কিত-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না···তবু সে খাপ থেকে তলোয়ার বার করে রুখে দাঁড়ালো! দুজনে তুমুল সংগ্রাম···একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত এ যুদ্ধের বিরাম হবে না!···যুদ্ধ চলেছে···হঠাৎ সেই ডাকাত-শায়েস্তাকারী ক্যাম্পবেল এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালেন···বাধা দিতে। তিনি বললেন,—যুদ্ধ উচিত নয়···এতে মীমাংসা হবে না!

এ কথা শুনে র‍্যালে যুদ্ধ থামিয়ে তলোয়ার খাপে বন্ধ করে সেখান থেকে চলে গেল। বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে ফ্রান্সিস্

তখন ক্যাম্পবেলকে বললে,—আপনি বারবার আমাকে রক্ষা করছেন···কেন? কে আপনি?

মৃদু হেসে ক্যাম্পবেল বললেন,—এখন নয়···পরে তুমি আমার আসল-পরিচয় জানতে পারবে! আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার! এখন আসি!

এই বলে ক্যাম্পবেল সেখান থেকে বিদায় নিলেন··· ফান্সিস্‌ও ফিরে এলো তার সরাইখানার আশ্রয়ে!

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে উঠে ফ্রান্সিস্ দেখে—একদল ইংরেজ-সৈনিক এসে সরাইখানা ঘেরাও করেছে। সৈনিকদের দলপতি তাকে গ্রেফ্‌তার করে বললে,—ডাকাতদের সঙ্গে তোমার যোগসাজস আছে···তাই তোমাকে বন্দী করলুম!

বন্দী ফ্রান্সিস্‌কে নিয়ে ইংরেজ-সৈনিকরা চললো গ্রামের পথ ধরে। ফ্রান্সিসের আশা-ভরসা সব ভেঙ্গে পড়লো··· তার মনে হলো—এ ব্যাপারের অন্তরালে রয়েছে দুর্বৃত্ত র‍্যালের চক্রান্ত! কিন্তু উপায় কি?

খানিকদূর অগ্রসর হবার পর, হঠাৎ শোনা গেল—বাজনা-বাদ্যের শব্দ! চকিতে পথের দুদিক থেকে হুড়মুড় করে বিদ্রোহীদের দল বেরিয়ে এসে ইংরেজ-সৈনিকদের করলো আক্রমণ! সবাই দেখলো—সেই বিদ্রোহী-দলের অধিনায়িকা হচ্ছেন—দুর্দ্ধর্ষ রব রয়ের স্ত্রী···তরুণী হেলেন!

সঙ্গেসঙ্গে দুপক্ষে বেধে গেল তুমুল লড়াই···তবে বিদ্রোহীরা দলে ভারী···কাজেই তাদের সঙ্গে দাপটে ইংরেজ-সৈনিকরা পেরে উঠলো না···শেষ পর্য্যন্ত তারা হলো বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী!

যুদ্ধের পর, ইংরেজ-সৈনিকদের কবল থেকে ফ্রান্সিস্‌কে মুক্তি দিয়ে হেলেন বললেন,—তোমাকে মুক্ত করবার নির্দ্দেশ পেয়েছি—আমার স্বামী রব রয়ের কাছে।

এ কথা শুনে ফ্রান্সিস অবাক হলো! রব রয় কেন তাকে মুক্ত করবার নির্দ্দেশ দিয়েছে, ফ্রান্সিস্ তা বুঝতে পারলো না!

এ ঘটনার কিছুদিন পরের কথা।

নিশুতি রাত···হঠাৎ ঘরের দরজার কড়ানাড়ার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙলো···বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে এসে সদর-দরজা খুলে সে দেখে—ডায়না···তার সঙ্গে অপরিচিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক!

ডায়না বললে,—আজ রাত্রির জন্য আশ্রয় চাই··· কালই আমরা ফ্রান্সে চলে যাবো!

ফ্রান্সিস্ ডায়না আর সেই অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সাদর-অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে এলো···ডায়নাকে জিজ্ঞাসা করলো,—ভয়ের কিছু আছে?

ডায়না পরিচয় দিলো—ইনি আমার বাবা!···বহুকাল আগে বাবা ছিলেন বিদ্রোহীদের দলে···তাই পুলিশ এঁর সন্ধান করছে! একমাত্র র‍্যালে জানে এঁর কথা। সে তাই শাসাচ্ছে যে—আমি যদি তাকে না বিবাহ করি, তাহলে পুলিশে সে খবর দেবে। কাজেই আমরা ফ্রান্সে পালাতে চাই।

ফ্রান্সিস বললে,—র‍্যালেকে তুমি বিবাহ করতে চাও না?

ডায়না জবাব দিলে,—কোনো কালে না!

ফ্রান্সিস্ অবাক হলো!···র‍্যালে দুর্বৃত্ত, সে জানে··· কিন্তু এত বড় দুর্বৃত্ত, তা এই প্রথম উপলব্ধি করলো।

দুশ্চিন্তায় সে রাত্রে তার সুনিদ্রা হলো না। ভোরে সৈন্যদের ভারী-জুতোর পদশব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের দরজা খুলেই ফ্রান্সিস্ দেখে সৈন্যদলের সঙ্গে এগিয়ে আসছে র‍্যালে!

এ বাড়ীর প্রতি রন্ধ্রের খবর জানে র‍্যালে···কাজেই ডায়না আর তার বৃদ্ধ-পিতাকে সে ধরিয়ে দিলে সৈন্যদের কবলে! অসহায় ডায়না আর তার বৃদ্ধ-পিতাকে বন্দী করে সৈন্যরা গেল সেখান থেকে চলে—যাবার সময় ফ্রান্সিস্‌কেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললো!

ডায়নার অসীম সাহস···মৃত্যুকে সে ভয় করে না এতটুকু···কিন্তু তার দুঃখ শুধু ফ্রান্সিসের জন্য! তাদের জন্য ফ্রান্সিস্ বেচারা অনর্থক কষ্টভোগ করছে··দুর্বৃত্ত র‍্যালের চক্রান্তেই ফ্রান্সিসের এমন দুর্দ্দশা!

বন্দী তিনজনকে নিয়ে ইংরেজ সৈন্যদল সদর্পে চলেছে উপত্যকা-পথে···এমন সময় সারা উন্মুক্ত-প্রান্তর কাঁপিয়ে তীব্রস্বরে বেজে উঠলো বিদ্রোহীদের ভেরীনাদ··সঙ্গে সঙ্গে পথের দুদিকের ঘন-জঙ্গল থেকে ইংরেজ-সৈন্যদলের উপরে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিদ্রোহীদের সশস্ত্র-ফৌজ! তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে পারলো না ইংরেজ-সৈন্যদল···বিদ্রোহী-ফৌজের দুরন্ত-দাপটে তারা হলো

পরাজিত···বিধ্বস্ত! ইংরেজ-সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে, বিদ্রোহীরা শেষ পর্য্যন্ত বন্দী ডায়না, তার বৃদ্ধ-পিতা আর ফ্রান্সিস্‌কে দিলে মুক্তি!

বিপদ দেখে বিশ্বাসঘাতক র‍্যালে চুপিচুপি পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল···বিদ্রোহী-দলের নেতা ক্যাম্পবেল তাকে রুখে দাঁড়াতেই, দুজনের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বেধে গেল···সে যুদ্ধে ক্যাম্পবেলের তলোয়ারের আঘাতে র‍্যালের হাত থেকে তলোয়ার পড়লো খসে এবং ক্যাম্পবেলের সুতীক্ষ্ণ-তলোয়ারের চোটে শেষ পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ত র‍্যালের হলো মৃত্যু!

ক্যাম্পবেল তখন এগিয়ে এলেন ডায়নাদের কাছে··· কৃতজ্ঞকণ্ঠে ফ্রান্সিস বললে,—আপনার ঋণ শোধ দেবার নয় মিষ্টার ক্যাম্পবেল!···আমায় আপনি বারবার রক্ষা করেছেন!

হেসে ডায়না বললে,—উনি মিষ্টার ক্যাম্পবেল নন, ছদ্মবেশে বিদ্রোহী-ডাকাতদের সর্দ্দার রব রয়!

ফ্রান্সিস্ বললে,—ইংরেজের কাছে উনি ডাকাতদের সর্দ্দার হতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে উনি দেবতা!

বিদ্রোহী-দলের সর্দ্দার রব রয়ের সহায়তায় ফ্রান্সিস্ অবশেষে ফিরে পেলো তার বিষয়-সম্পত্তির দলিলপত্র! হারানো-সম্পত্তি উদ্ধার হবার পর, ফ্রান্সিস্ ফিরলো ইংলণ্ডে···তার পিতার কাছে!

তারপর মহা-ধুমধামে ডায়নার সঙ্গে হলো ফ্রান্সিসের বিবাহ···আনন্দে ভরে উঠলো তাদের সুখের সংসার! তাদের এই সুখ-শান্তি-আনন্দের সংসার গড়ে তুলতে বিদ্রোহী-দলের নেতা রব রয় যে কতখানি সহায়তা করে-ছিলেন, সে কথা ডায়না আর ফ্রান্সিস মনে রেখেছিল আজীবন।

চিত্রগুপ্ত

ছবি আঁকতে হলে, সচরাচর রঙ-তুলি, কালি-কলম, কিম্বা পেন্সিল-খড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করাই রেওয়াজ। কিন্তু এ সব সরঞ্জাম ছাড়াও, বিজ্ঞানের রহস্যময় অভিনব-কৌশলে বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তির (Electro-Magnetic Device) সহায়তায় তোমরা অনায়াসেই নানা রকম বিচিত্র-ছাঁদের ছবি এঁকে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। কথাটা শুনে তোমরা হয়তো খুব অবাক হচ্ছো··· ভাবছো—এমন আজব-ব্যাপার কখনো সম্ভব হয় নাকি? তাহলে শোনো···কি উপায়ে বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন-ছাঁদের ছবি এঁকে তোমরা বিজ্ঞানের এই আজব-রহস্যময় ভোজবাজীর খেলা দেখতে পারবে—তারই বিচিত্র কলা-কৌশলের কাহিনী বলি।

এ খেলার কলা-কৌশল আয়ত্ত করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়···এবং খেলাটি দেখাতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার—সেগুলি সংগ্রহ করাও খুব একটা ব্যয়বহুল বা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলি নিতান্তই ঘরোয়া-সামগ্রী—প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই মিলবে ···সুতরাং এ সব জিনিষ তোমরা সহজেই নিজেরা জোগাড় করে নিতে পারবে। বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-খেলাটি দেখানোর জন্য কি কি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, কলা-কৌশলের কাহিনী আলোচনা করবার আগে সেগুলির মোটামুটি পরিচয় জানিয়ে রাখি। এ খেলা দেখাতে হলে, চাই—একখানা চৌকোণা কাঁচের ফলক (a Square sheet of Glass), দুখানি সমান-মাপের বাঁধানো-বই, একটি শোলা বা কর্কের (cork) ছিপি, একশিশি 'গ্লিসারিন' (Glycerine), একটি ছবি-আঁকার তুলি, একখানা খর্‌খরে মোটা-দানাওয়ালা (Coarse-grained) শিরিষ-কাগজ (Sand-Paper) কিম্বা 'কুরুনী' (Grater) আর একটুকরো পশমী অথবা রেশমী (a piece of woolen or silk cloth) কাপড়।
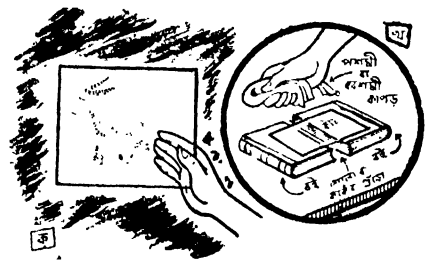
এ সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, গোড়াতেই তরল-গ্লিসারিন আর ছবি-আঁকার তুলির সাহায্যে, উপরের বাঁ-দিকের 'ক'-চিহ্নিত নক্সাতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ধরণে চৌকোণা ঐ কাঁচের-ফলকের একপিঠে নিজের অভিরুচিমতো বিচিত্র-ছাঁদের ফুল-পাতা, জীব-জন্তু, ঘর-বাড়ী কিম্বা মানুষের ছবি এঁকে নাও—সচরাচর কাগজের বুকে রঙ-তুলি দিয়ে যে-পদ্ধতিতে চিত্র রচনা করো, অবিকল সেইভাবে! তবে কাগজের বুকে ছবি-আঁকার সময়, রঙ তুলি দিয়ে তোমরা যেমন ফুল-পাতা, ঘর-বাড়ী

মানুষ বা জীব-জন্তুর চেহারার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি-বিষয় (Details) এঁকে ফুটিয়ে তোলো, তেমনিভাবে তরল-গ্লিসারিন দিয়ে কাঁচের-ফলকের উপর তুলি দিয়ে টেনে আঁকা চলবে না। এ খেলা দেখানোর জন্য, কাঁচের-ফলকের উপর তরল-গ্লিসারিনে তুলি ভরে নিয়ে যে ছবি আঁকবে—সেটি রচনা করতে হবে আগাগোড়া 'ছায়াচিত্র' বা 'Silhouette' চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে···অর্থাৎ সে নক্সার কোথাও রেখা টেনে কোনো খুঁটিনাটি-বিষয় বা 'details' আঁকা চলবে না—সবটুকুই 'ভরাট' (filling) করে দিতে হবে···নাহলে খেলাটি শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠভাবে দেখানো সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কাজেই এ বিষয়ে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

এমনিভাবে তুলির সাহায্যে তরল-গ্লিসারিন দিয়ে কাঁচের-ফলকের একপিঠে নক্সাটি পরিপাটি-ছাঁদে এঁকে নেবার পর, সেটিকে কিছুক্ষণ ছায়া-শীতল কোনো জায়গায় রেখে উন্মুক্ত-বাতাসে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। গ্লিসারিন দিয়ে আঁকা নক্সাটি আগাগোড়া বেশ শুকনো-খটখটে হয়ে গেলেই, সেটি আর নজরে পড়বে না—কাঁচের সঙ্গে বেমালুম মিশে যাবে। এ কাজটুকু কিন্তু খেলা দেখানোর আগেই, নেপথ্যে সেরে রাখতে হবে—যাতে দর্শকেরা আদৌ জানতে না পারে এই কারচুপির রহস্য। তাহলে খেলা দেখানোর সময় এ কাঁচখানি দেখে তাঁরা কেউ বুঝতেও পারবেন না যে কাঁচের-ফলকের একপিঠে কোনো ছবি আঁকা রয়েছে···ভাববেন—নিতান্তই সাধারণ একখানা কাঁচ···মনে তাঁদের এতটুকু দ্বিধা থাকবে না।

এমনি অভিনব কৌশলে দর্শকদের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করে, খেলার আসরে গ্লিসারিনের নক্সা আঁকা কাঁচের-ফলকখানি সবাইকে ভালোভাবে দেখানোর পর, সেখানিকে উপরের ডান-দিকের 'খ'-চিহ্নিত গোলাকার-চিত্রে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে সমতল-টেবিলে পেতে রাখা বাঁধানো-বই দুখানির মাথায় সাবধানে শুইয়ে দাও। বাঁধানো বই দুখানির উপরে কাঁচের-ফলকখানিকে শুইয়ে রাখার সময়, গ্লিসারিন দিয়ে আঁকা ছবিটি যেন সর্বদা মুখোমুখিভাবে নীচের ফাঁকা-জায়গার দিকে থাকে···সেদিকে সজাগ-দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ত্রুটি ঘটলেই, খেলার মজা মাটি! কারসাজি দেখানো সম্ভব হবে না কোনোমতেই! এবারে ঐ শোলা বা কর্কের ছিপিটিকে হাতে নিয়ে মোটা-দানাওয়ালা খরখরে শিরীষ-কাগজ বা 'স্যাণ্ড-পেপারের' উপর রেখে বারকয়েক বেশ করে ঘষো···তাহলেই দেখবে, শোলা বা কর্ক আর অক্ষত অটুট নেই···খরখরে-জিনিষে ঘষা-ঘষির ফলে, আগাগোড়া ধুলো-বালির মতো মিহি-গুঁড়োতে পরিণত হয়েছে। এ কাজ শেষ হলেই, শোলা বা কর্কের মিহি-গুঁড়োটুকু ছড়িয়ে দাও—টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা বাঁধানো-বই দুখানির মাঝখানে ফাঁকা-জায়গায়···গ্লিসারিনের নক্সা-আঁকা ঐ কাঁচের-ফলকখানির ঠিক নীচে। তারপর ঐ পশমী বা রেশমী কাপড়ের টুকরোটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ জোরে-জোরে ঘষো—বাঁধানো-বই দুখানির মাথায় পেতে-রাখা কাঁচের-ফলকের উপরে! খানিকক্ষণ এইভাবে পশমী বা রেশমী কাপড়ের টুকরোটিকে জোরে-জোরে ঘষাঘষি করলেই, দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে কাঁচের-ফলকের নীচে উদ্ভব হয়েছে বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তি এবং সে-শক্তির অভিনব-আকর্ষণে (attraction) বাঁধানো বই দুখানির মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় জড়ো-হয়ে-থাকা শোলা বা কর্কের মিহি-গুঁড়ো সব ক্রমশঃ ছুটে এসে আটকে থাকছে কাঁচের তলদেশের গায়ে!

এবারে কাঁচের-ফলকের উপরে পশমী বা রেশমী কাপড়ের টুকরো ঘষা বন্ধ করো। তাহলেই দেখবে—বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তি কমে যাবার ফলে, কাঁচের-ফলকের নীচের দিক থেকে শোলা বা কর্কের মিহি-গুঁড়ো সব ক্রমশঃ ঝরে পড়ে যাচ্ছে···শুধু গ্লিসারিন-দিয়ে-আঁকা নক্সাটুকুর গায়েই এঁটে রয়েছে শোলা বা কর্কের মিহি-গুঁড়ো এবং তারই জন্য বিস্ময়াচ্ছন্ন দর্শকদের চোখের সামনে কাঁচের-ফলকের বুকে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে—রহস্যময় অপরূপ এক চিত্র···কিছুক্ষণ আগে যার চিহ্নমাত্রও নজরে পড়েনি কারো! আজব-ভোজ-বাজীর মতো অভিনব-কৌশলে বিনা রঙ-তুলিতে কাঁচের ফলকের গায়ে অদৃশ্য-শিল্পীর রচিত এই বিচিত্র-নক্সার আবির্ভাব দেখে দর্শকের দল যখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবেন, তখন তাঁদেরই চোখের সামনে কাঁচের-ফলকের গায়ে বারকয়েক সন্তর্পণে হাতের আঙুলের টোকা কিম্বা জোরে-জোরে ফুঁ দাও···তাহলেই কাঁচের তলদেশে গ্লিসারিনের প্রলেপ দেওয়া চিত্রিত-অংশ থেকে বাকী শোলা বা কর্কের মিহি-গুঁড়ো সব ঝরে পড়বে এবং দর্শকরা স্তম্ভিত হয়ে দেখবেন যে সদ্য-ফুটে-ওঠা ভোজবাজীর আজব-নক্সা যেন কোন মন্ত্রবলে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে এবং কাঁচের ফলকটিও পুনরায় আগাগোড়া বেমালুম স্বচ্ছ-পরিষ্কার হয়ে গেছে!

এই হলো বিজ্ঞানের আজব-খেলাটির আসল রহস্য। যাই হোক, খেলার কলা-কৌশল তো শিখলে···এবারে নিজেরা ভালোভাবে রপ্ত করে নাও এর কায়দা-কানুন এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনদের বৈদ্যুতিক-চুম্বকের এই আজব-ভোজবাজীর কশরৎ দেখিয়ে চমক লাগিয়ে দাও তাঁদের! তবে এ খেলাটিকে যদি দর্শকদের কাছে আরো বেশী চমকপ্রদ করে তুলতে চাও তো গ্লিসারিন দিয়ে অদৃশ্য-নক্সা-আঁকা এই কাঁচের-ফলকটিকে ধরে রাখো একটি জলন্ত-বাতির সামনে···তাহলেই তাঁরা

সবাই দেখবেন—আগাগোড়া স্বচ্ছ-নির্ম্মল কাঁচের ভিতর থেকে যেন কোন যাদুমন্ত্রের মায়ায় সামনের দেয়ালের গায়ে দিব্যি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে অপরূপ এক 'ছায়া-চিত্রের' (Silhouette) নক্সা···যে নক্সার এতটুকু রেখা-চিহ্নও নজরে পড়ে না খেলার আসরে বাতির সামনে রাখা ঐ কাঁচের-ফলকের কোথাও! এ খেলা দেখে দর্শকের দল শুধু যে মুগ্ধ হবেন, তাই নয়···তোমাদের নিপুণ কারস্‌জীর তারিফ করবেন পঞ্চমুখে!

পরের সংখ্যায়, এ ধরণের আরো একটি বিচিত্র-অভিনব মজার খেলার হদিশ জানাবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। কাগজ-কাটার হেঁয়ালি ঃ
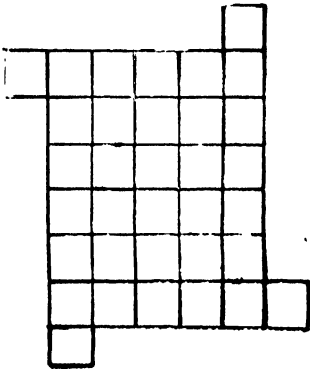
উপরের ছবিতে সমান-মাপের কতকগুলি চৌকোণা-ঘর (Square) আঁকা যে বিচিত্র নক্সাটি দেখছো, সেটিকে হুবহু অন্য একটি কাগজের বুকে এঁকে নাও। এবারে বুদ্ধি খাটিয়ে সদ্য-আঁকা ঐ নক্সাটিকে এমন কায়দায় চার টুকরো করে কাঁচি দিয়ে কাটো যে ছাটা-টুকরোগুলিকে পাশাপাশি সাজালেই, দিব্যি পরিপাটি-ধরণের একটি চৌকোণা-আসন তৈরী হয়ে যায়।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। ইংরাজীতে—বাদ্য, বাংলায়—খাদ্য···কি সে?

রচনা ঃ বাবলী দত্ত (আসানসোল)

৩। তিন অক্ষরে নাম মোর···মাথার পরে রই,
প্রথম ছেড়ে দিলে যে ভাই নদীর ধারে হই।
শেষ ছেড়ে দিলে সে সব ঘরেতে থাকে,
মাঝের ছেড়ে দিলে তা সব মানুষের থাকে!

রচনা ঃ চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। ৩৭
২। রুইদাস
৩। লেপ

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), কুলু মিত্র (কলিকাতা), লাড্ডু ও কবি হালদার (কোরবা), বাচ্চু, চিত্রা, ফটিক ও বাবি (কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা), বাণী, শুভ্রা ও শুভ্র হাজরা (আড়ুই, বর্দ্ধমান)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), প্রশান্তচন্দ্র (কলিকাতা), মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর, মেদিনীপুর)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম শত বার্ষিক—

গত ১৭ই জানুয়ারী ভারতের নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক, নবভাবধারার প্রবর্তক, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব দেশের সর্বত্র আরম্ভ হইয়াছে। আনন্দের কথা, ঐ দিন শুধু পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতে নহে, পৃথিবীর বহু সভ্যদেশে স্বামীজীর জীবন ও কার্য্যধারার কথা স্মরণ করিয়া সভা ও শোভাযাত্রাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিনে স্বামীজি প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠে সারা দিন উৎসব চলিয়াছিল। ২০শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতায় আসিয়া দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে এক মহতী জনসভায় বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। এক বৎসর ধরিয়া এই জন্মশতবার্ষিক উৎসব চলিবে এবং এই উপলক্ষে শুধু স্বামীজির রচনার সুলভ সংস্করণ নহে, স্বামীজি সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর রচিত গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হইবে। ভারতের প্রতি গৃহে যাহাতে স্বামীজীর কথা রক্ষিত হয়, সে জন্য মিশন কর্তৃপক্ষ বহু ভাষায় বহু প্রকারের সুলভ গ্রন্থাদি প্রকাশ করিতেছেন। স্বামীজির জন্মের পর একশত বৎসর অতীত হইলেও তাঁহার দেশবাসী আজিও স্বামীজির কথা ভাল করিয়া জানেন না। স্বামীজি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূর্তরূপ ছিলেন। তাঁহার কথা জানিলে মানুষ ভারতকে চিনিবে, জানিবে ও বুঝিবে। সে জন্যই আজ তাঁহার ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের কাহিনী প্রচারের জন্য সকলে উন্মুখ। বিপথগামী ভারতবর্ষকে তথা পৃথিবীকে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন কথা শুনাইয়া গিয়াছেন—নররূপী নারায়ণের সেবাই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম—স্বামীজি কথায় ও কাজে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মধ্য দিয়া সেই শিক্ষাই দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। আজ দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলকে সেই ধর্মে দীক্ষা দান করিয়া নূতন কাজের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিক পালন করার উদ্দেশ্যই তাই। শুধু স্বামীজিকে প্রণাম না করিয়া দেশ যেন তাঁহার আদর্শ জীবনে গ্রহণ করে, আমরা আজ একান্তভাবে সেই কামনাই জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন—

গত ১৯শে জানুয়ারী শনিবার কলিকাতা মহাজাতি সদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব হয়—বায় সঙ্কোচের জন্য মাত্র ডক্টরেট ও বিশেষ উপাধি প্রদান করা হয়—বি-এ, এম-এ পাশ ছাত্রগণকে সে জন্য হতাশ হইতে হয়। বাহিরের কোন গুণী ব্যক্তিকেও ভাষণ দানের জন্য আহ্বান করা হয় নাই—শুধু রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক ভাষণ দেন। অশীতিপরবৃদ্ধ আইনজীবী ও খ্যাতনামা লেখক ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৬১), অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পুলিন বিহারী সেন ও যোগেশচন্দ্র বাগল—৬০, ৬১ ও ৬২ সালের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ভুবন-মোহিনী স্বর্ণপদক এবং শ্রীমতী পুষ্প দেবী লীলা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এবার সর্বপ্রথম ২ জন মহিলা এল-এল-এম ও এম-ডি উপাধি লাভ করেন—(১) অধ্যাপিকা সাধনা সরকার ও (২) ডাঃ সুচরিতা দাশগুপ্ত। ডাক্তার আর-এন, চৌধুরী "নীলমণি ব্রহ্মচারী স্বর্ণপদক" পাইয়াছেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসে উপাধি লাভ—

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে বিভিন্ন উপাধি দান করিয়াছেন। সর্বোচ্চ উপাধি 'ভারতরত্ন' পাইয়াছেন—উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার জাকির হোসেন ও সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর পি-ভি-

কানে। তিনজন পদ্মবিভূষণ, ২১ জন পদ্মভূষণ ও ২৬জন পদ্মশ্রী উপাধি পাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি বিশিষ্ট কোবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীভি-পটাশকর ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার পদ্মবিভূষণ হইয়াছেন। কলিকাতার রোটারিয়ান শ্রীনীতিশচন্দ্র লাহিড়ী, বিশিষ্ট লেখক রাহুল সংস্কৃতায়ন, আসামের জনসেবাব্রতী শ্রীঅমিয়কুমার দাস ও রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারী শ্রীহরনারায়ণ সিং পদ্মভূষণ হইয়াছেন। খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীমুস্তাক আলি, পিকিংস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বমডিলার পলিটিকাল অফসার শ্রীকে-সি-জোহেরী, তুক্তিংএর সহকারী পলিটিকাল অফিসার এস-এস-যাদব পদ্মশ্রী হইয়াছেন।

নেতাজীর ৬৭তম জন্ম দিবস—

২৩শে জানুয়ারী ভারতের সর্বত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৭তম জন্মদিবস সভা-সমিতির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। ঐ দিন হাওড়া ষ্টেশনের সম্মুখে নেতাজীর এক মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন—পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ। হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়াই কলিকাতা প্রবেশের পথে যাত্রীসাধারণ যাহাতে নেতাজীর কথা স্মরণ করে, তাহার ব্যবস্থা হওয়ায় নেতাজীর ভক্তগণ তথা দেশের জনসাধারণ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে নেতাজীর দানের হিসাব না করিয়া তাহার অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, অনন্যসাধারণ সাহসিকতা ও দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি তাঁহার আজীবন সাধনার কথা ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীর সর্বদা স্মরণ করিয়া সেই আদর্শ হইতে প্রেরণা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। কলিকাতা সহর নেতাজীর প্রধান কর্মভূমি—কাজেই কলিকাতার বহু স্থানে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা শুধু প্রয়োজনীয় নহে—শোভনও বটে। আমরা এই শুভদিনে নেতাজীর কথা স্মরণ করি ও তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

সুভাষ গ্রামে নূতন সংস্থা—

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্ম দিনে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ২৪ পরগণা জেলার সুভাষগ্রামে নেতাজীর নামে সংস্কৃতি ও শিল্প আলোচনার একটি নূতন সংস্থার উদ্বোধন করা হইয়াছে—তাহার নাম হইয়াছে—"নেতাজী সুভাষ কালচারাল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনষ্টিটিউট।" ঐ সংস্থার সম্পাদক শ্রীমতী ললিতাবসু গ্রামে একটি বিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নেতাজীর পৈতৃক বাসভবনটি গ্রহণ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গ্রাম-সেবাকেই প্রধান কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—কাজেই তাঁহার নামে একটি গ্রামে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমতী ললিতা উপযুক্তভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রকারে সাফল্য লাভ করিয়া নেতাজীর নামের যোগ্যতা ও গৌরব রক্ষা করুক—দেশবাসী যেন সে বিষয়ে সকল সহযোগিতা দান করে—নেতাজীর কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া আমরা সেই প্রার্থনাই জানাই।

মন্ত্রী ডাক্তার জীবনরতন ধর—

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, দীর্ঘকালের কংগ্রেসকর্মী ও দেশসেবক ডাক্তার জীবনরতন ধর গত ১৯শে জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯টায় কলিকাতা সুখলাল কার্ণানি হাসপাতালে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৫২ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন এবং আবার ১৯৬২ সালে নির্বাচিত হইয়া মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনেই কংগ্রেসে যোগদান করেন ও ১৯৩০ হইতে ১৯৫০ পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত তিনি সেনা বিভাগে ডাক্তারের কাজ করেন। যশোহরের অধিবাসী জীবনরতন দেশ বিভাগের পর বনগাঁয় আসিয়া বাস করেন ও পরে কলিকাতা নাকতলায় বাড়ী নির্মাণ করেন। তিনি কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহঙ্কর, সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী ছিলেন বলিয়া তিনি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার নীলরতন ধর তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করি এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

পরলোকে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ—

বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক, আইনজীবী ও লেখক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত গত ২০শে জানুয়ারী সকালে ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কালীঘাটস্থ গৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ও সে সময়ে মুক্তি আন্দোলনে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর একমাস পূর্বেও তিনি আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। ঢাকা জেলার বিদগাঁও গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। রাজনীতির সহিত তিনি আইন ব্যবসা ও সাহিত্য সেবা করিতেন। নাট্য-সমালোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বাংলায় ৩ খণ্ড ভারতীয় নাট্যমঞ্চ গ্রন্থ ও ইংরাজিতে উহা ৫ খণ্ডে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আলিপুরে আইন-ব্যবসা ৫০ বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সুবৃহৎ জীবনী ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সু-অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

জেনারেল জে-এন-চৌধুরী—

নয়াদিল্লীর ২৪শে জানুয়ারী সংবাদে প্রকাশ—জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী পাকাপাকিভাবে ভারতের সামরিক বিভাগের বড়কর্তা পদে বহাল হইয়াছেন। জেনারেল থাপার দীর্ঘদিনের জন্য ছুটী লওয়ায় তাঁহার স্থানে জেনারেল চৌধুরী অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—এখন তিনি স্থায়ীভাবে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। তিনি বাঙ্গালী এবং জীবনে বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের এই চৌধুরী পরিবার সর্বজনবিদিত—জয়ন্তনাথ সেই পরিবারের গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

লোকমান্য বি-জি-তিলক—

গত ২৭শে জানুয়ারী সকালে কলিকাতা রাজভবনের দক্ষিণ দিকে ময়দানের ধারে দেশনেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের একটি মূর্ত্তির আচরণ উন্মোচন করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিলক স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে এই কার্য্য সম্ভব হইল। একদিন ভারতের ৩ নেতা—লাল, বাল ও পাল—লালা লাজপৎ রায়, লোকমান্য বি-জি-তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল—দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্দেশ দিতেন। তিলক মহারাজ শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ছিলেন না, তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য দেশবাসীকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশের বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন—কাজেই কলিকাতায় মূর্তি স্থাপিত হওয়ায় লোক তাঁহার কথা স্মরণের সুযোগ লাভ করিবে। তাঁহার আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদর্শ—আজ ভারতবাসীকে নূতন করিয়া সে আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আসিয়াছে।

বেঙ্গল রেজিমেণ্ট গঠনের দাবী—

গত ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের এক সভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে একটি বেঙ্গল রেজিমেণ্ট গঠনের অনুরোধ জানাইয়া এক বেসরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের জওয়ানদের সন্তানগণকে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের এবং দক্ষ ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈনিকদের পত্নীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সৈনিকদের পরিবার পোষণের পেন্সন ও বিনামূল্যে জমিদানের সুপারিশও জানানো হইয়াছে। বাংলার সৈনিকদের লইয়া এইটি স্বতন্ত্র সেনাদল গঠনের দাবী বহু পূর্ব হইতেই করা হইতেছিল। বিধান পরিষদের সদস্যগণ জনগণের এই দাবী সমর্থন করায় দেশবাসী আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের চেষ্টায় সত্বর এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে এবং বাঙ্গালীর সাহসের অভাবের অপবাদ দূরীভূত হইবে। একজন বাঙ্গালী বর্তমানে ভারতের সেনা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ—সে গৌরবের কথা বাঙ্গালী যেন ভুলিয়া না যায়।

ময়ূর—ভারতের জাতীয় পাখী—

ভারত সরকার ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখীরূপে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—এ সংবাদ গত ৩১শে জানুয়ারী দিল্লী হইতে প্রচার করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও সংবাদপত্রসমূহের অভিমত বিচার করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে ময়ূরের সৌন্দর্য্য

বর্ণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে—কাজেই ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে সকলে আনন্দিত হইবেন।

১৪ ক্যারেট স্বর্ণ অলঙ্কার যুগ—

৯ই ফেব্রুয়ারীর পর ভারতে গিনি সোনার গহনা বিক্রয়ের জন্য আর সময় দেওয়া হইবে না···দোকানের মজুত গহনা গলাইয়া ইহার পর ১৪ ক্যারেট সোনার অলঙ্কার তৈরী করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের বেকার স্বর্ণশিল্পীদের বিকল্প কাজের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। গত ১লা ফেব্রুয়ারী স্বর্ণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীজি-বি-কোটাক কলিকাতায় স্বর্ণ ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

নবরত্ন ও হংসেশ্বরী মন্দির—

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কলিকাতার দক্ষিণ সহরতলীর নবরত্ন মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে পোড়ামাটির কাজের জন্য বিখ্যাত অষ্টাদশ শতকের হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দিরও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে থাকিবে। এই সকল প্রাচীন কীর্তিগুলি রক্ষার ভার বহু পূর্বেই সরকারের গ্রহণ করা উচিত ছিল! মন্দিরগুলি পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসের সাক্ষ্যরূপে বর্তমান।

গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এক বেতার ভাষণে গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের সাড়ে ৫ লক্ষ গ্রামের প্রত্যেক সুস্থ, সক্ষম ও প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীর তাহার গ্রাম তথা সমগ্র জাতির সেবায় নিজেকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ঐ বাহিনীর ৩টি কাজ—উৎপাদন, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা। এই বাহিনী গঠনের জন্য সত্বর সর্বত্র চেষ্টা আরম্ভ হইলে দেশবাসী বহুভাবে উপকৃত হইবে।

পরলোকে মহম্মদ আলি—

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আলি ২৩শে জানুয়ারী ঢাকায় রাত্রি ৯টায় হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন—তাঁহার বয়স মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল। মাত্র ২ দিন পূর্বে তিনি ঢাকায় আসিয়া হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে বগুড়ায় তাঁহার জন্ম —তিনি নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলির পৌত্র এবং আলতাফ আলির পুত্র। নবাব আলি ১৯২১ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহিত বাংলার মন্ত্রী হইয়াছিলেন! মহম্মদ আলি বি-এ পাশ করিয়া ২২ বৎসর বয়সে দেশ সেবায় ব্রতী হন—তিনি বগুড়া মিউনিসিপালিটী ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকার পর ১৯৩৭ সালে আইন সভায় প্রবেশ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হন। ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি বাংলার মন্ত্রী হন ও কয়েকবার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর কাজও করেন। বঙ্গ বিভাগের পর তিনি পাকিস্থানে যাইয়া বহু উচ্চ পদে কাজ করেন এবং মৃত্যুকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। বগুড়ার এই নবাব পরিবার বাংলা দেশে নানাকারণে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।
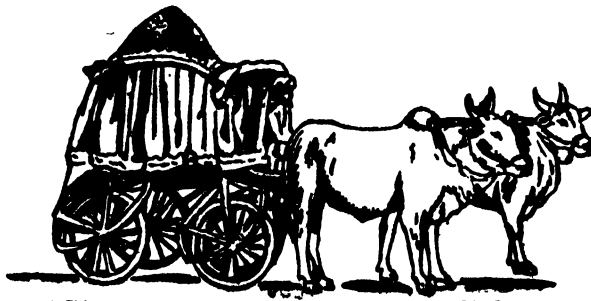
পঁচিশ বছর আগে ও পরে

শ্রীকিষাণলাল চট্টোপাধ্যায়

"আমার ছেলেমেয়েদের ত খাওয়ার বা পরবার কোন দুঃখ রাখিনি ডক্টর, আপনি একটু ভাল করে ছবিটা দেখুন"—নরেশবাবু—রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর নরেশ রায়—আমার চেম্বারে বসে উদ্‌গ্রীবকণ্ঠে কথাগুলি বললেন। আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর একবার ছবিটা দেখে বললাম—"খাওয়া-পরার কষ্ট ছাড়াও টি, বি, রোগ হয়, নরেশবাবু। শুধু মাত্র পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশের অভাবই টি, বি, রোগের কারণ নয়।"

সেদিন নরেশবাবুকে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ ও এরজন্য সাবধানতা সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে তাঁর মত অবস্থাপন্ন লোকের ছেলের যক্ষ্মা রোগ হ'তেই পারে না এবং ঐ রোগই যদি তাঁর ছেলের হয়ে থাকে, তা' হ'লে আর কোন আশাই নেই—ওর জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল।

তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আজকাল যক্ষ্মারোগ হ'লেই রোগী মারা যায় না বা চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে পড়ে না। প্রথম অবস্থায় বা বেশীদিনের পুরাতন রোগ না হ'লে, উপযুক্ত চিকিৎসায়, সাধারণ ডাল-ভাত খেয়েও যক্ষ্মা রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়—অবশ্য প্রায় দু'টি বছর তা'কে ডাক্তারের সব নির্দ্দেশই দ্বিধা-শূন্য মনে একাগ্রতার সঙ্গে পালন করতে হ'বে।

নরেশবাবুর ছেলে রবি কলেজে আই-এ পড়বার সময় ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সে দু'বছর নিয়মিত চিকিৎসা ও অন্যান্য নির্দ্দেশ মেনে চলে বি-এ পাশ করেছে এবং আজ পুলিশ-অফিসারের পদে প্রতিষ্ঠিত। মাসখানেক আগে তা'র বিবাহের নিমন্ত্রণ জানাতে এসে নরেশবাবু বললেন যে রবি কর্মদক্ষতার জন্য শীঘ্রই উচ্চতর পদে উন্নীত হ'বে।......মনে পড়ে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা...

তখন আমরা স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। একদিন শুনলাম যে রায় বাড়ীর সুবিমলদা'র শরীর খারাপ হয়েছে, তিনি আর আমাদের ক্লাবে ব্যায়াম করাতে আসবেন না। অমন ছ'ফুট দীর্ঘ, বলিষ্ঠ বক্সার সুবিমলদা'র যে কোন অসুখ হ'তে পারে তা' আমাদের কাছে একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোন ঋতুতেই সুবিমলদা'র নিয়মিত উপস্থিতি ও শিক্ষাদানের ব্যাঘাত ঘটতে দেখি নি। আমরা ক্লাবে যে কোন কারণে অনুপস্থিত হ'লে সুবিমলদা'র বকুনি হজম করতে বাধ্য হতাম। সেই সুবিমলদার অসুখ সম্বন্ধে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম যে ডাক্তারবাবুর নির্দ্দেশমত তিনি বাড়ীতে চিলেকোঠায় বন্দী হয়ে রয়েছেন। কি অসুখ তা' বাইরের লোক জানে না। তাঁকে দেখতে যাবার ইচ্ছা থাকলেও তাঁ'র ও আমাদের বাড়ীর অভিভাবকদের আপত্তির জন্য কোনদিন রায় বাড়ীর চিলেকোঠায় যাবার সুযোগ পাইনি ...

...প্রায় মাস ছয়েক পরে শুনলাম যে সুবিমলদার নাকি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দীর্ঘকাল রোগে ভুগলে নাকি রোগীর প্রায়শ্চিত্ত করলে রোগী হয় সেরে ওঠে, নয়তো তাড়াতাড়ি তা'র সব যন্ত্রণার শেষ হয়। হলোও তাই—প্রায়শ্চিত্ত করার দিনদশেক পরে আশ্বিনের এক শিউলি-ঝরা ভোরে রায় বাড়ীতে কান্নার শব্দ শোনা গেল এবং বেলা প্রায় দশটা নাগাদ চারজন লোক নাকে ইউক্যালিপটাস্ মাখা রুমাল বেঁধে আমাদের সুবিমলদা'র শবদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে যাত্রা করল। বাড়ীর বারান্দা থেকে দেখলাম—একটি শীর্ণ কঙ্কাল ফুলমালায় ঢাকা খাটে শুয়ে আছে—তা'র সঙ্গে বক্সার সুবিমল রায়ের কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পেলাম না।......

পরে শুনলাম তা'র নাকি টি, বি, হয়েছিল। আর এইজন্য আমাদের মত অল্পবয়সী ছেলেদের ও বাড়ীতে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ এবং রায় বাড়ীর লোকেরাও চুপি চুপি ঐ রোগ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, যা'তে বাইরে কেউ শুনতে না পায়। এ রোগ একবার

কোন বাড়ীতে প্রবেশ করলে, সে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বিবাহ হওয়াও নাকি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

...আজ পঁচিশ বছর পরে ঐ একই রোগে আক্রান্ত রবির স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ চেহারা অনেকের কাছে ঈর্ষ্যার বস্তু। তা'র বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে রাত্রে সুবিমলদা'র কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল...

* * *

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি কথা সকলেরই জানা দরকার, তাই সংক্ষেপে ঐ রোগ সম্বন্ধে কিছু জানাবার চেষ্টা করব।

...টি. বি. বা যক্ষ্মারোগ বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে আছে। আগেকার দিনে খোলা বাতাসে বাস করা, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া ছাড়া এ রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা ছিল না এবং যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হ'লে রোগী দীর্ঘদিন ভুগে প্রায়ই মারা যেত, অথবা যতদিন বেঁচে থাকত, তা'কে শঙ্কিতভাবে থাকতে হ'ত—এই বুঝি আবার জর এল, এই বুঝি কাসির সঙ্গে রক্ত পড়ল। এই-ভাবে সদাশঙ্কিত অবস্থায় বেঁচে থাকা রোগীর পক্ষে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হ'তে পারে!...

...তারপর বিভিন্ন সময়ে মানুষের মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে যে, এ রোগের কারণ কি তা' জানতে হ'বে এবং এ রোগকে জয় করতে হ'বে। বছরের পর বছর বিজ্ঞানী-চিকিৎসকদের আপ্রাণ পরিশ্রমের পর ধরা পড়ল এই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চোখে। যক্ষ্মা-রোগ জীবাণুর পূর্ণাঙ্গ সন্ধান পান ডক্টর রবার্ট কক্ ১৮৮২ সালে। সেইজন্য যক্ষ্মারোগ জীবাণুকে "ককস্ ব্যাসিলি" ও বলা হয়। এই বৈজ্ঞানিকের নাম অমর করে রাখার জন্য ঐ জীবাণু ধ্বংসকারী প্রতিকার ব্যবস্থা আবিষ্কারের চেষ্টাও চলল অবিরাম। বহু প্রচেষ্টার পর প্রায় ৬০।৬২ বছর পরে আবিষ্কৃত হ'ল এ রোগের ওষুধ—ষ্ট্রেপটো-মাইসিন, প্যারা এমাইনোস্যালিসিলিক এসিড বা পি. এ. এস। আরও পরে আবিষ্কৃত হ'ল আইসোনাশজিড প্রভৃতি যুগান্তকারী ওষুধ। এদের সাহায্য ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ওষুধের দ্বারা যক্ষ্মারোগ জীবাণুকে জয় করা সম্ভব হ'ল—মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম হ'ল সার্থক এবং যক্ষ্মারোগীরা সম্পূর্ণ নিরাময় হ'তে লাগল ও পূর্ণ কার্য্যক্ষম হয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পেল।

এ ছাড়াও অস্ত্রোপচারের সাহায্যে খুব খারাপ অবস্থার যক্ষ্মারোগীকে সুস্থ করে তোলার প্রচেষ্টা আজ শল্য-চিকিৎসার অন্যতম অবদান।

এই সঙ্গে চেষ্টা চলল এই রোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারের জন্য। মানুষের একাগ্র সাধনা এক্ষেত্রেও সাফল্য লাভ করেছে—সৃষ্টি হ'ল বি. সি. জি টিকা পদ্ধতির। এই টিকা ছেলেমেয়েদের বাল্যাবস্থায় দেওয়া হ'লে প্রায় দুই থেকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শরীর ঐ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। তারপরে মানুষের শরীরে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং এইজন্য সহজে যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করতে পারে না। ক্রমশঃ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ আজ অনেক কমে গেছে। তবে এই টীকা যা'র শরীরে যক্ষ্মা-রোগের সামান্যতম জীবাণু ও নেই বা যা'দের শরীরে ঐ রোগ-প্রতিরোধক স্বাভাবিক ক্ষমতা মোটেই গড়ে ওঠে নি, একমাত্র তাদেরই দেওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।...

...যক্ষ্মারোগ সাধারণতঃ জনবহুল শহরাঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। এক জায়গায় বেশী লোক একসঙ্গে বাস করলে, একজন রোগীর সঙ্গে একই ঘরে অন্য লোকেরাও বসবাস করলে, শহরের কলকারখানায় ধূলিমলিন আব-হাওয়া, অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম এবং যথোপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে এবং শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়, ফলে যক্ষ্মার রোগ-জীবাণু সহজেই শরীরকে আক্রমণ করার সুযোগ পায়। এ ছাড়া ঐ রোগে আক্রান্ত রোগীর কফ্, থুতু ও নিশ্বাসের সঙ্গে অসংখ্য রোগ জীবাণু—বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর সংস্পর্শে যারা থাকে তা'দের প্রশ্বাসের সঙ্গে ঐ জীবাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র অথবা তা'র ঘরের আসবাবপত্র যথোপযুক্তভাবে সংশোধিত হ'বার আগে অন্যে ব্যবহার করলে, তা'দের ঐ রোগ সংক্রমণ হ'তে পারে। রোগীর মূত্র ও বিষ্ঠাতেও ক্ষেত্র বিশেষে এই রোগ জীবাণু পাওয়া যেতে পারে।

যে ঘরে রোগী বাস করে, সে সব জায়গায় সূর্য্যালোক সোজাসুজি পড়ে না, সেই সব জায়গায় রোগীর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা জীবাণু—অনেকদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। সেই ধূলিসিক্ত জীবাণু প্রশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ লোকের ফুসফুসে প্রবেশ করে রোগসৃষ্টি করতে পারে। তবে রাস্তার ধূলিতে মেশা যক্ষ্মা রোগ জীবাণু খুব শীঘ্রই সূর্য্যালোকের দ্বারা বিনষ্ট হয় বলে, পথের ধূলির দ্বারা যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের আশঙ্কা খুবই কম।

শহরের হোটেল, রেস্তরা—যক্ষ্মারোগ বিস্তারের অন্যতম সহায়ক। আমাদের অজানা কত যক্ষ্মা রোগী ওখানে চপ, কাটলেট, চা খেয়ে যাচ্ছে। সেই ডিশ ও প্লেট এবং কাপ উপযুক্ত ভাবে ধোয়া না হ'লে, তা'তে লেগে থাকে ঐ রোগ জীবাণু। সুস্থ লোক সেই কাপ বা ডিশে মুখ দিলে তারও সহজেই ঐ রোগ হ'তে পারে। আমরা হয়ত বিলাস বা প্রয়োজনের তাগিদে রেস্তরায়, হোটেলে মূল্যবান রুচিকর খাবার খেয়ে তৃপ্ত হয়ে থাকি, কিন্তু ঐ বাসী খাবারের সঙ্গে বাড়তি রোগজীবাণুও যে ঐ সময়ে আমরা ফাউ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, একথাটা ভাবি না। ভাবলে হয়ত হোটেলে যাওয়া অতটা রসনাতৃপ্তিকর হ'ত না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যক্ষ্মাজীবাণুদুষ্ট গোদুগ্ধ পান দ্বারাও রোগ হতে পারে। তবে সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে দুধ ফুটিয়ে খাওয়ার প্রথা চালু থাকার জন্য এই ভাবে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা অনেক কম।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ঠিবন সংক্রমণ বা রোগীর হাঁচি, কাশি ও মুখোমুখি কথা বলার সময়ে রোগ জীবাণু অন্যের শরীরে সংক্রমণ, যক্ষ্মারোগ বিস্তারের সহায়ক। এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে আমাদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার অভাব। একজন যক্ষ্মা রোগী যদি ঐ রোগ সংক্রমণও বিস্তারের কারণগুলি সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা' হলে সে নিজেই ঐ রোগ বিস্তারের উপায় গুলিকে এড়িয়ে চলবে বা অন্যকেও সাবধান করে দেবে। তা' ছাড়া জনসাধারণ এই রোগ সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হ'লে নিজেরা সাবধান হ'তে পারবেন এবং বাড়ীতে কোন রোগী থাকলে তা'র বাসকক্ষ, সেবা, খাদ্য, ব্যবহৃত বাসন-পত্রাদি, কফ-মল-মূত্র প্রভৃতি ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন এবং ঐ বিষয়ে চিকিৎসকদের নির্দ্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন—যা'র অভাব বহুক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পীড়াদায়ক হয়েছে, অজ্ঞ রোগীর ততোধিক অজ্ঞ পরিজন-চিকিৎসকের সাবধানতাসূচক নির্দ্দেশ শুনে হয় রোগীকে সংসারের অন্যান্যদের সাংঘাতিক ক্ষতিকারক মনে করে অপাংক্তেয় একঘরে হিসাবে বাড়ীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে আবদ্ধ রেখে অবহেলা করেন, নয়ত চিকিৎসককে "অতি-সাবধানী" এই আখ্যা দিয়ে রোগীর সম্বন্ধে কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করে নিজেদের রোগাক্রমণের পথ সহজ করে তোলেন।

আবার এমন অনেক যক্ষ্মা রোগীকে জানি, যা'রা তাহাদের পূর্ণ বিশ্রাম ও অপরের সঙ্গে মেলামেশার বারণ না শুনে ওষুধ ও খাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে বাসে-ট্রামে বেড়ান ও অসতর্ক পরিচিত-অপরিচিতদের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশার দ্বারা নিজেদের রোগ বাড়িয়ে তুলছেন এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য-নাশের প্রত্যক্ষ অপরাধী হচ্ছেন।

এইসব কারণে রোগ সম্বন্ধে ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে জনশিক্ষা আজ আমাদের দেশে একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় সরকারও ঐ বিষয়ে সচেতন হয়ে নানাভাবে জন-শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন।

যক্ষ্মা রোগাক্রমণ সম্বন্ধে পিতামাতার সংস্পর্শ না থাকলে সন্তান-সন্ততির ঐ রোগ বংশানুক্রমিকভাবে হয় না। অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ বংশগত নয়। এ বিষয়ে অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে খুব সাবধানী লোকেরও যক্ষ্মা রোগ হ'তে পারে। এ রোগ—রাজা প্রজা মানে না। "তবুও সাবধানের মার নেই" এ প্রবাদ চিরকালই মূল্যবান।... ...

..এখন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কথা বলি। রোগের প্রথম অবস্থায় যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়লে উপযুক্ত চিকিৎসা ও সাবধানতা অবলম্বন করলে, রোগী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

সর্দ্দি, কাশি, সন্ধ্যাকালীন জ্বর বা মাথা ধরা, চোখ জ্বালা এবং বুকে ব্যথা—কয়েকদিনের সাধারণ চিকিৎসা সত্ত্বেও যদি না কমে, বা কাশির সঙ্গে গোলাপী রঙের

কফের ছিটা দেখলেই উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। কফের সঙ্গে রক্তের ছিটা এ রোগের অন্যতম লক্ষণ হ'লেও, রোগের শেষ অবধি রক্ত নাও দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশেও যক্ষ্মা রোগের বিভিন্ন লক্ষণ রোগ বিশেষে দেখা দেয়। অন্ত্রের যক্ষ্মা রোগ সন্দেহ করা হয় তখনই—যখন সর্ব্ববিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও পুরাতন আমাশয় বা পেটের অসুখ সারতে চায় না—অবশ্য এ অবস্থায় অনেকগুলি রোগের সন্দেহ আসতে পারে—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে রোগ নির্ণয় আজ সম্ভব হয়ে উঠেছে। অল্পবয়স্কদের গলায় একপাশে বা দু'পাশে একসঙ্গে লেগে থাকা গ্ল্যাণ্ডসমূহ; বয়স্কদের পিঠের শিরদাঁড়ায় বা কোমরে যন্ত্রণা ইত্যাদি—নানা প্রকার পুরাতন রোগে অনেকক্ষেত্রে যক্ষ্মা আক্রমণ হ'তে পারে।

অনেক সময়ে সামান্য অসুখকে যক্ষ্মা রোগ সন্দেহ করা হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে যক্ষ্মার লক্ষণগুলি ভ্রান্তিবশতঃ সামান্য বলে উপেক্ষা করা হয়। যাহা হউক সাধারণ চিকিৎসায় কোন রোগের প্রতিকার না হ'লে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া সর্ব্বক্ষেত্রেই একান্ত প্রয়োজন।...

চিকিৎসক প্রয়োজনবোধে, এক্স-রে ছবি, রক্ত পরীক্ষা, কফ পরীক্ষা ইত্যাদি দ্বারা যদি ঐ রোগ যক্ষ্মা বলে নির্ণয় করেন, তখন তাঁর নির্দ্দেশ মত ওষুধ, পথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থা সর্ব্ব অবস্থায় মেনে চলা উচিত। আগে এই রোগ হ'লে ভাবা হ'ত—সে রোগীকে হাসপাতালে বা স্যানাটোরিয়ামে না পাঠালে, তা'র সুস্থ হওয়ার আশা কম এবং বাড়ীর অন্যান্যদের স্বাস্থ্যও বিপন্ন। কিন্তু আজকাল দেখা গেছে যে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে রোগীকে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করলে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার সমান ফল পাওয়া যায় এবং বাড়ীর অন্যান্য পরিজনবর্গ উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে, রোগী এক বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও অন্যের রোগাক্রমণ আশঙ্কা খুবই কম। এ ছাড়া বাড়ীতে পরিজনবর্গের মাঝে থাকলে রোগীর মানসিক অবস্থা অনেক সুস্থ থাকে, কোনও "কমপ্লেক্স" বা "রোগ-জনিত হীনভাব" তা'র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেক কম। অসুস্থ রোগীর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানও রোগ মুক্তির অন্যতম ঔষধ।

খাদ্য সম্বন্ধে আগে ধারণা ছিল যে দামী ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে না পারলে, কেবলমাত্র ওষুধে যক্ষ্মা রোগীর রোগ সারে না। কিন্তু আজকাল দেখা যায় যে, রোগী যদি পূর্ণ বিশ্রাম পায় ও উপযুক্ত পরিমাণ ওষুধ তা'কে দেওয়া যায়, তবে কেবলমাত্র ডাল, ভাত ও অল্প পরিমাণ দুধ খেয়েও যক্ষ্মারোগী আরোগ্য লাভ করে। তবে পূর্ণ বিশ্রাম মানে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা বা বসে থাকা—চলাফেরা, বেশী কথা বলা, এমন কি অধিক চিন্তা করাও একেবারেই নিষেধ। প্রথম দিকে অন্ততঃ দেড়মাস প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া রোগী বিছানা ছেড়ে কখনও উঠবে না। এছাড়া রোগীর বাড়ীর অন্যান্য পরিজনবর্গ—যা'রা এক বাড়ীতেই থাকে, তা'দের প্রত্যেকের বুকের ছবি লওয়া, প্রয়োজন-বোধে উপযুক্ত পরীক্ষার পর বি, সি, জি টিকা লওয়া (বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের) এবং কাহারও সামান্যতম রোগ ধরা পড়লে, তা'র উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বারা যক্ষ্মা রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা দূর করা যায়।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জাতীয় সরকার যক্ষ্মা-রোগীদের চিকিৎসা ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন, নানা জায়গায় টি, বি. ক্লিনিক খোলা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী যে সব প্রতিষ্ঠান ঐ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, সে সব জায়গায় বিনামূল্যে ওষুধ এবং কম টাকায় বুকের ছবি, কফ ও রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েকটি ক্লিনিক ও হাসপাতালে বিনামূল্যে ছবি তোলা ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানও একাজে অগ্রণী হয়েছেন। ভারতীয় রেডক্রশ সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মারোগীর রোগ নির্ণয় ও ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া অন্যান্য ক্লিনিক বা যক্ষ্মা হাসপাতালে রোগীদের বিনামূল্যে গুঁড়াদুধ বা ক্ষেত্র বিশেষে চাল, আটা প্রভৃতি সাময়িকভাবে সরবরাহ করে এইসব প্রতিষ্ঠান দেশের যক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা-সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশে বঙ্গীয় যক্ষ্মাসমিতি (বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন্) এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হয়েছেন। তাঁ'রা বিভিন্ন খ্যাতনামা চিকিৎসকবৃন্দের সহায়তায় দুঃস্থ যক্ষ্মারোগীদের রোগ নির্ণয় ও বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া ছাড়াও, বিশেষক্ষেত্রে রোগীকে

সাময়িকভাবে মাসিক অর্থ সাহায্যও করে থাকেন এবং শারদীয়া পূজা ও শীতের সময়ে সম্ভব হ'লে বস্ত্র ও কম্বল বিতরণের চেষ্টা করে থাকেন। এছাড়া কয়েকটি ক্লিনিকের বিশেষ অবদান হ'চ্ছে, গৃহচিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ সেবিকা ও ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা। এঁরা বিভিন্ন এলাকায় এঁদের চিকিৎসাধীন যক্ষ্মারোগীর বাড়ীতে গিয়ে তা'র তত্ত্বাবধান ও চিকিৎসার নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা হাসপাতালে আসনসংখ্যা রোগীর তুলনায় অতি নগণ্য। যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্ত্তি হ'বার সুযোগসুবিধা খুব কম রোগীই পায়। এই সব কারণে গৃহ চিকিৎসা বা "ডোমিসিলিয়ারী" চিকিৎসা বিষয়ে সরকার বেশী চেষ্টা করছেন। আমরা আশাকরি, অদূর ভবিষ্যতে সরকারী ও বেসরকারী সমবেত প্রচেষ্টায় যক্ষ্মা-রোগ-সমস্যা ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত এ দেশেও অনেকটা দূরীভূত হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে যক্ষারোগী সুস্থ হয়ে ওঠার পরে তা'র পক্ষে সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হ'তে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। চিকিৎসকের নির্দ্দেশমত রোগী প্রথম অবস্থায় যা'তে অল্প পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম করে উপার্জ্জনশীল হয়, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। নয়ত একেবারে সুস্থ মানুষের মত স্বাভাবিক পরিশ্রম আরম্ভ করলে, আবার রোগাক্রান্ত হ'বার সম্ভাবনা থাকে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে হয়ও তাই। এর জন্য আমাদের দেশে যক্ষ্মা রেগীদের পুনর্বাসনের জন্য 'আফটার-কেয়ার ও রিহাবিলিটেশন্' ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন, যেখানে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগী, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ কার্য্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে, এরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাব আমাদের দেশে রয়েছে। তবে সরকার এ বিষয়ে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা ব্যা।ারে আমরা আরও একটি বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার নির্দ্দেশ দিয়ে আমরা রোগীকে বলি, "অসুখ সারাতে হলে অন্ততঃ দুটি মাস চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবে এবং আলাদা একটি ঘরে—যেখানে আলোবাতাস আছে, এরকম জায়গায় থাকবে।" অধিকাংশ রোগীই হতাশাভরা দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করে, "বাড়ীতে ত মাত্র দু'খানি ঘর, আর লোক প্রায় আট দশ জন, আলাদা থাকব কি করে ডাক্তারবাবু, আর আমাকে শুয়ে থাকতে বলছেন, কিন্তু তা'হলে সংসার চলবে কি করে ?"

প্রথমটার উত্তরে বলি যে, যদি আলাদা ঘরে শোয়া সম্ভব না হয় ত দালান বা বারান্দা দরমা দিয়ে ঘিরে থাকার ব্যবস্থা করলে চলতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার গরীব দেশে অধিকাংশ যক্ষ্মারোগীই মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পর্য্যায়ভুক্ত। আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি যে পরিবারের একমাত্র বা অন্যতম উপার্জ্জনকারী যুবকটি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তা'র সমস্যার সমাধান করা চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয়, যখন হতভাগ্য রোগীর প্রশ্নের উত্তরে নির্বাক হয়ে থাকতে হয়। সরকার যতদিন না যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনবোধে তা'র উপর নির্ভরশীল পরিবারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাতা দেওয়া এবং বাসগৃহ সমস্যার সমাধান করছেন, ততদিন যক্ষারোগ সমস্যার একটা বিরাট অংশের সমাধান হ'বে না। এটা অবশ্য আমাদের কাছে বর্ত্তমানে দুরাশাই। তবে আশাই মানুষের একমাত্র অবলম্বন। কালের পটভূমিকাতে যদি কখনও সেই সুদিন আসে, তখন আমরা জোর গলায় বলতে পারব যে মানবতার দিক থেকে একটা বিরাট সমস্যার সমাধান আমরা করেছি।

পরিশেষে জানাই যে, যক্ষ্মারোগ আর আগের মত ভীতিপ্রদ নয় এবং যত সমস্যাই থাক না কেন, যক্ষ্মা-রোগীকে সারিয়ে তোলার প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য মণ্ডিত হচ্ছে—বিবিধ সমস্যার জন্য রোগীর হতাশ হবার কোন কারণ নেই। তবে রোগী—চিকিৎসক ও সরকারী প্রচেষ্টা এই তিনটি জিনিষ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া আমাদের এই মারাত্মক শত্রুকে জয় করা কোন ভাবে সম্ভব নয়।

উল্‌টো বিপত্তি !
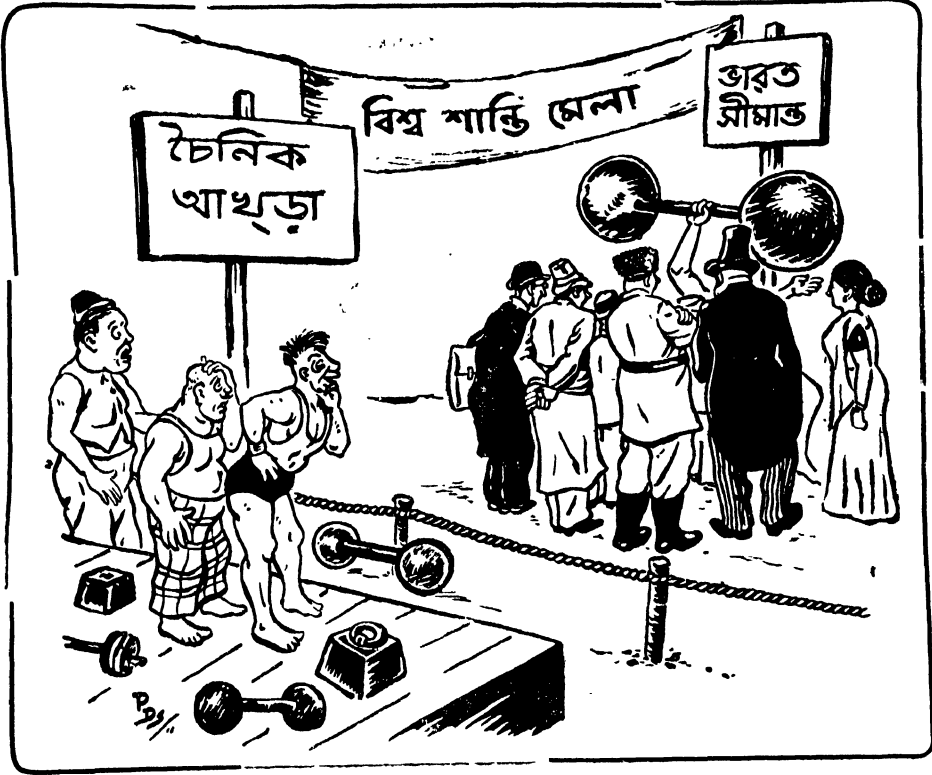
চৈনিক-খেলোয়াড় : তাই তো এত কারসাজি দেখালুম,
তার তারিফ নেই !···শুধু এই দুটি
চাচা আমার দিকে···আর তামাম্‌
দুনিয়া তাকিয়ে রয়েছে ওদিকে !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
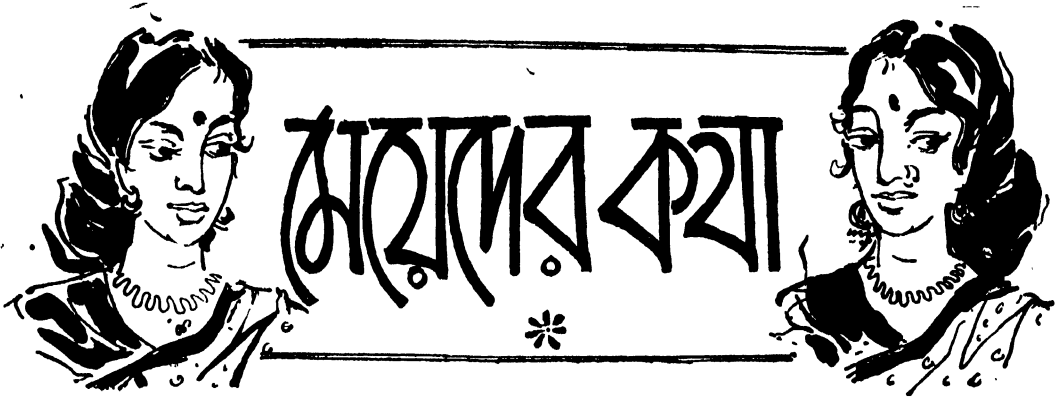
জীবন সংগ্রামে নারী

ধাত্রী

সরোজনলিনী রায়

কোলকাতা থেকে একশো মাইল দূরে বাঙলার এক সুদূর পল্লীতে আমার জন্ম, কিন্তু কোলকাতার প্রতি আমার আকর্ষণ যে কবেকার তা স্মরণ করতে পারছি না। মনে পড়ে আমার অতি কৈশোরের স্বপ্ন ছিল কোলকাতা। আমাদের গ্রামের প্রতিবেশী শ্যামাচরণ দত্তের ছেলে শ্যামল সেই শিশু বয়স থেকেই কোলকাতায় মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা করত। শ্যামল ছিল আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়,তবুও খেলার সাথী। ছুটিতে যখন সে বাড়ী আসত, কোলকাতার কত গল্প সে করত—সে সকল আমার মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করত। ভাবতাম আমার যদি কোলকাতায় একটা মামা থাকত। মামার বাড়ী থেকে যদি আমিও পড়তাম? মাকে একদিন মনের দুঃখটা বলেই ফেলেছিলুম। মা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এখন বাড়ীতে ভাল করে পড়, পরে তোকে কোলকাতার বোর্ডিংএ রেখে পড়াব। কতটা আনন্দ হয়েছিল, সে আশ্বাস পেয়ে। কিন্তু আমি গ্রামের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করতে না করতেই আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। কাল হল আমার রূপ। তখনকার দিনে আশে পাশের সাত গাঁয়েও নাকি আমার মত রূপসী কেউ ছিল না। তাই অষ্টগ্রামের পড়ন্ত জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায় তার একমাত্র মূর্খ পুত্র বরুণ নারায়ণ রায়ের বধূরূপে মহোৎসব সহকারে আমাকে তাঁর জীর্ণায়মান প্রাসাদে বরণ করে নিলেন। কত বড় ঘরের বধূ আমি, সে মিথ্যা অহংকারটি আমাকে আয়ত্ত করতে হল। আমার স্বামী বয়সে আমার চেয়ে বেশ বড় হলেও লেখা-পড়া করেন নি বলেই মনের দিক থেকে খুব বেশী বড় ছিলেন না। বাড়ন্ত ঐশ্বর্যের ছটায় মুগ্ধ না হোলেও স্বামীর ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। পড়তি-ঘরের অশিক্ষিত আদুরে যুবকদের যে-সব কদর্য অভ্যাস থাকে সে সব তিনি আমার জন্যেই পরিত্যাগ করেছিলেন। আমি নাকি ছিলাম তাঁর অন্তর রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। কত না কথা তিনি বলতেন।

কিন্তু সব সোহাগ তার একমুহূর্তে ভুলে গেলুম, যেদিন বাপের বাড়ী এসে শ্যামলের সঙ্গে দেখা হল। শ্যামল তখন বড় হয়েছে। বেশ বলিষ্ঠ সুন্দর যুবক—তার উপর আবার কোলকাতার বাবুয়ানার ছটা আর চালিয়াতি। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। কত গল্প যে সে বানিয়ে বলতে পারত, কত মিথ্যা প্রশংসা যে সে করতে পারত। বড় বড় সিনেমা ডাইরেকটার তার বন্ধু। একটা সিনেমায় সে অভিনয় করবে। আমার মত রূপসীকে পেলে তার ডাইরেকটার এক্ষুণি নায়িকা করে নেবে। সিনেমা মাত্র কয়েকবার দেখেছি শ্বশুরবাড়ীর মেলায়। তার আগে কোলকাতার গল্প শুনেছি শ্যামলের কাছে।

শ্যামল সে সিনেমার নায়িকা করবে আমাকে? তখন আমার ছবি দেখবে হাঁ' করে সারা দেশের লোক। কি মজা হবে।

তখন আমার শরীর খুব ভাল ছিল না, গা বমি বমি করত। সেই কারণেই বাপের বাড়ী এসেছিলুম। কিন্তু যে-ভাবে শ্যামল আমাকে ভুলালো, তাতে আমি পাগল হয়ে গেলুম। আমার বাপের বাড়ীর মর্যাদা, জমিদার-শ্বশুরের গৌরব সব একদিন মেঘনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে শ্যামলের সঙ্গে সুরমা মেলে চড়ে এলুম।

ঝলমলানো সুন্দরী নগরী কোলকাতা আমার চোখের সামনে। শ্যামল আমাকে নিয়ে এক হোটেলে উঠল। কয়দিন ঘুরে বেড়াল আমাকে বাসে, ট্রামে, টেক্সিতে, থিয়েটারে, সিনেমায় ও রেস্তোরায়। আমাকে সত্যি আমি হারিয়ে ফেললুম। নিজের কোন কাণ্ডজ্ঞান যেন ছিল না। কিন্তু আমার শরীর এমন অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল শ্যামলের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারলুম না। শ্যামল আমাকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল, গোপনে তাঁর সঙ্গে কি কানাকানি করল, শেষে বুঝলুম সে ডাক্তারের সঙ্গে অভিসন্ধি করছে আমার সন্তান-হত্যা করবার। আমার মাথার ভিতরে যেন আগুন জলে উঠল। আমি দৃঢ় কণ্ঠে তাকে বললুম আমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। শুনে হো হো করে হেসে উঠল শ্যামল—"দেশে ফিরে যাবে? স্বামীর ঘরে? সে রাস্তা বন্ধ। কে নেবে এমন সতী নারীকে ঘরে ফিরিয়ে।"

মাথায় আগুন আরও বেশী দাউ দাউ করে জলতে লাগল। আমি ভালমন্দ কিছু না বিচার করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু তখন আমি আবিষ্কার করলুম আমার যা অলঙ্কারপত্র এনেছি সব চুরি করে নিয়েছে শ্যামল। পথভ্রষ্ট, নিরুপায়, সর্বস্বহারা। তবু পথে বেরিয়ে পড়লুম। তখন পররাজ্যলোভীদের আক্রমণে উত্তেজিত কোলকাতায় সৈন্য. আর নার্সের চাকুরী পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। বেসরকারী হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তার যুদ্ধের চাকুরী নিয়ে চলে গেছে। শিয়ালদার দিকে যেতে যেতে দেখলুম একটা হাসপাতালে কয়টি মেয়ে লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কেন দাঁড়িয়েছে সে-সব না বুঝেই আমি সেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলুম। পরে বুঝলুম নার্সের চাকুরী খালি আছে,, নার্স লওয়া হবে. ছয়মাস শিক্ষা দেওয়া হবে, তারপরে চাকুরী হবে। ট্রেনিং এর সময়ও হাসপাতালের নার্স-কোয়াটারে থাকতে দেবে। আমার হাতে একটা স্যুটকেট ছিল, তাতে কয়খানা শাড়ী আর ব্লাউজ। সেটি একপাশে রেখে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ক্রমে ক্রমে আমার কাচের ঘরের ভিতরে যাওয়ার সময় এল। আমি ভিতরে গিয়ে দেখলুম দুজন ডাক্তার বসে আছেন কাগজ কলম নিয়ে। তারা আমায় নানা প্রশ্ন করলেন, আমার উত্তরে তাঁরা খুশি হলেন। আমি নার্সরূপে সেদিন থেকেই সে-হাসপাতালে নিযুক্ত হলুম শিক্ষার্থিণীরূপে। যে সব প্রার্থিণী বিফল হয়ে ফিরে গেল—তারা ফিস ফিস করে বলছিল "যেমন চাঁদপানা মুখ। চাকুরী ওর হবে না তো কার হবে?"

যে দুজন ডাক্তার ইণ্টারভিউ নিচ্ছিলেন, তাঁদের একজন আমাকে বড় অনুগ্রহ করতে লাগলেন। তিনি হাসপাতালের সবচেয়ে তরুণ ডাঃ উমেশচন্দ্র রায়। তিনি আমার শিক্ষার ভার নিলেন। লেখাপড়া তো বেশী করিনি। সেদিকেও তিনি নজর দিলেন। আমাকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহ দিতে লাগলেন। কিন্তু কারোর ভালো তো কেউ সহ্য করতে পারে না। ডাক্তার, নার্স, রুগীদের মধ্যে আমাকে নিয়ে বেশ কথা হতে লাগল। সে সব অবশ্যই ভালো কথা নয়। আর তা ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর কানে যেতেও দেরী হ'ল না। তিনি ডাক্তারবাবুর মতিগতির উপর সন্দেহাত্মক নজর রাখতে লাগলেন। আর একদিন অধৈর্য হয়ে আমাদের নার্স কোয়াটারে এসে হাজির হলেন। আমি তখন ডাক্তারবাবুকে চা করে দিয়েছি। তিনি চা খেতে খেতে আমার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আমার এডভান্স্ড ষ্টেজ। সন্তান জন্মিলে পরে কয়দিন ছুটি পাওয়া যাবে ঠিক। কিন্তু কিছুদিন পরে তাকে রেখে কি করে ড্যাটি করতে যাব? তিনি বললেন, 'তুমি না হয় সরোজ, তোমার স্বামীকে চিঠি লিখে দাও। তিনি বাপের জমিদারী ছেড়ে এসে এখানে নিজের জমিদারী দেখুন।' আড়ি পেতে একথা শুনে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ছুটে চলে গেলেন, যাতে ডাক্তারবাবু ঠাহর না পান। সত্যি বড় লজ্জা পেয়েছিলেন তিনি অকারণে স্বামীকে সন্দেহ করে-ছিলেন বলে।

আমি ডাক্তারবাবুর কথামত সত্যি সত্যি স্বামীকে

চিঠি লিখলুম। সকলকে অবাক করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এলেন আমার স্বামী আমার চিঠি পেয়ে। আমার বাপের বাড়ী ও স্বামীর বাড়ী উভয় স্থানেই আমি মৃত। স্বামীর একাজে বিস্মিত হল সকলে। বাপের অজ্ঞাতে তিনি আমার অনেক খোঁজ করেছেন। শেষে চিঠিতে খবর পেয়ে পালিয়ে এলেন। এখানে এসে যেদিন পৌছলেন সেদিন আমার মেয়ের ষষ্ঠী। নামকরণও সেদিনই করতে হয়। ডাঃ রায় নাম রাখলেন, বারুণী। মেয়েটি দেখতে আমার স্বামীর মত হয়েছিল। আর আমার স্বামী রাখলেন —গ্রাম্য নাম হারাণী। কারণ সে হারিয়ে গিয়েছিল।

আমার কাছে চলে আসার অপরাধে আমার স্বামী পিতার জমিদারী থেকে বঞ্চিত হলেন। জমিদারীতে প্রাচীন কালের অহংকার, আর আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমার জন্যে প্রাণে যে তার টান ছিল তার জোরেই তিনি সে সকলের মোহ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। ডাঃ রায় তারও খরচ দিতে স্থরু করলেন। সংসারে এমন লোক দু একটি থাকেন যাঁরা নিজের স্বার্থ-চিন্তা না করেও পরের উপকারে মেতে থাকেন। ডাঃ রায় ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি আমার স্বামীকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে ও সাহায্য করতে লাগলেন।

স্বামীর সাহায্য পাওয়াতে আমার মেয়েকে লালনপালন করার সুবিধা হল, আমি যে নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলুম তাতে আমার নিজেরও অনেক উপকার হল।

শ্যামল আমার সামাজিক দিক থেকে সর্বনাশ করলেও, আর একদিক থেকে উপকার করল নিজের অজ্ঞাতে। আমি ও আমার স্বামী গ্রামের অশিক্ষা, মিথ্যা অহংকারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর সমাজের কাজে লাগার সুযোগ পেলুম।

আমার মেয়ে যখন কিছু বড় হল, আমার স্বামীও হাসপাতালের একটা কাজ পেলেন। আমার বড় ভাল লেগে গেল প্রসূতি-সদনের কাজ। অজানা জগত থেকে নিত্য নতুন অতিথিরা আসছে। কত সুন্দর তারা। বড় হয়ে কত সুন্দর তারা হবে। কত রকম আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের হবে, তারা সার্থক মানুষ হবে, দেশের স্বাধীনতা তারা রক্ষা করবে, দেশের গৌরব তারা বর্দ্ধন করবে। প্রসূতি সদনের কাজে তাই কত আমার আনন্দ। ধাত্রী আমি।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে গত আষাঢ়-সংখ্যায় যেমন রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে বিচিত্র কারুকার্য্যময় সৌখিন-অথচ-নিত্য-প্রয়োজনীয় অভিনব-ধরণের আলপিন-রাখবার 'পিন্-কুশ্যন (Pin-Cushion) রচনার কথা আলোচনা করেছি, এবারে তেমনি-ধরণের আরেকটি 'পিন্-কুশ্যানের' নমুনা প্রকাশ করা হলো। নীচের ছবিতে যে নক্সা-নমূনাটি দেখানো রয়েছে, সেটি—একফালি তরমুজের ছাঁদে রচিত। 'তরমুজের-ফালির' ছাঁদে তৈরী এমন ধরণের 'পিন্-কুশ্যান'
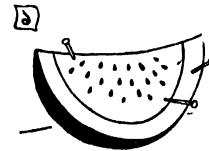
উপহার দিয়ে সুগৃহিণীরা সামান্য-ব্যয়ে এবং সহজেই প্রিয়জনদের প্রচুর আনন্দ দিতে পারবেন।

এ-ধরণের 'পিন্-কুশ্যান' তৈরীর জন্য—প্রয়োজনমতো মাপের ও রঙের কয়েকটি পাত্‌লা 'ফেল্ট'(Felt), মোটা 'ফ্লানেল' (Flannel), পুরু খদ্দর অথবা 'লিনেন' (Linen) জাতীয় কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করাই রেওয়াজ। সচরাচর এ-কাজের জন্য—গাঢ়-সবুজ, হাল্‌কা-সবুজ বা শাদা এববং লাল অথবা গোলাপী রঙের টুকরো কাপড় বেছে

নেওয়া হয়। গাঢ়-সবুজ রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানাতে হবে—'তরমুজের-ফালির বাইরের দিক, অর্থাৎ উপরের ১নং নক্সায় দেখানো 'ক'-চিহ্নিত অংশ। হালকা-সবুজ বা শাদা-রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে রচনা করতে হবে—'তরমুজে'র-ফালির মধ্যভাগ বা উপরের নক্সার 'খ'-চিহ্নিত অংশ...এবং লাল বা গোলাপী-রঙের কাপড় দিয়ে বানাবেন—'তরমুজের ফালির ভিতরের দিক বা উপরের নক্সায় দেখানো 'গ'-চিহ্নিত অংশ। কাপড়ের টুকরোগুলিকে যথাযথ-আকারে অঙ্কন, ছাঁটাই ও সেলাইয়ের জন্য দরকার—একটি রঙীণ পেন্সিল অথবা খড়ি, একখানি ভালো কাঁচি, হাল্‌কা-সবুজ বা শাদা, গোলাপী কিম্বা লাল এবং গাঢ়-সবুজ রঙের রেশমী স্থতোর গুলি, আর একটি মজবুত-ধরণের ছুঁচ।

এ সব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ হলে, আলাদা-আলাদা এই তিনটি রঙের কাপড়ের টুকরোগুলিকে নীচের ২নং ছবিতে দেখানো 'তরমুজের-ফালির' বিভিন্ন-অংশের নক্সার ছাঁদে যথাযথ-আকারে এঁকে নিয়ে, স্থষ্ঠুভাবে ছাঁটাই করে ফেলুন।
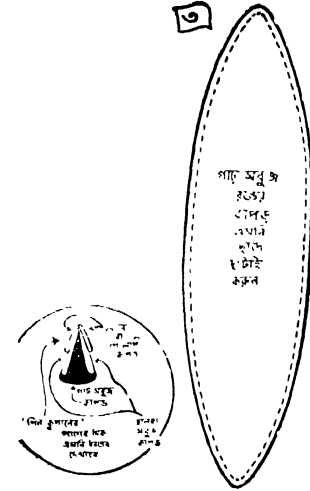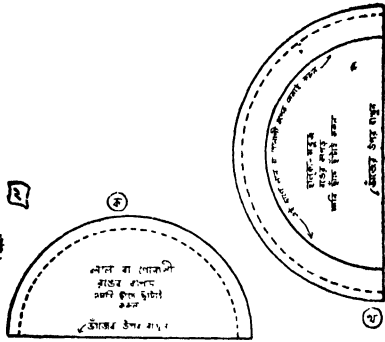
এমনিভাবে বিভিন্ন-রঙের কাপড়ের টুকরোগুলিকে নিখুঁত-ছাঁদে ছাঁটাই করে নেবার পর, উপরের 'ঘ'-চিহ্নিত নক্সায় যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হালকা-সবুজ বা শাদা-রঙের কাপড়ের রেখাঙ্কিত-অংশটুকুর চারি দিকে ¼" ইঞ্চি স্থান পরিপাটি-ধরণে মুড়ে নিয়ে ছুঁচ-স্থতোর ফোঁড় তুলে 'টাঁকাসেলাই' (Basting) দিয়ে দুই-রঙের কাপড়ের টুকরো দুটিকে একত্রে পাকাপাকিভাবে জোড়া লাগিয়ে ফেলুন। অবিকল এমনি উপায়েই একত্রে সেলাই করে নিন—লাল বা গোলাপী-রঙের কাপড়ের টুকরোর সঙ্গে শাদা বা হাল্‌কা-সবুজ রঙের কাপড়ের টুকরোটিকে। এবারে উপরের ২নং নক্সায় দেখানো 'ঙ'-চিহ্নিত ছবির ছাঁদে গাঢ়-সবুজ রঙের কাপড়ের টুকরোটিকে আগাগোড়া সেলাই করে পাকাপাকিভাবে টেঁকে দিন—হালকা-সবুজ অথবা শাদা-রঙের কাপড়ের টুকরোর গায়ে। তাহলেই অর্দ্ধচন্দ্রের-মতো-ছাঁদের অপরূপ একটি তেরঙা-কাপড়ের 'ব্যাগ' (Bag) বা 'ঠোঙা' তৈরী হয়ে যাবে। এবারে এই অর্দ্ধাচন্দ্রাকৃতি 'ঠোঙার উপর-প্রান্তের 'খোলা-মুখের' (Open-end) ফাঁক দিয়ে কাঠের-গুঁড়ো (Saw-dust) বা তুলা (Cotton) ঠেশে ভিতরের অংশটুকু আগাগোড়া ভরাট (Filling) করে ফেলুন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কাপড়ের-ঠোঙাটির ভিতরের অংশ পুরোপুরি ভরাট করে ফেল-বার পর, ছুঁচ-স্থতোর ফোঁড় তুলে পাকাপাকিভাবে সেদিকটি সেলাই করে ফেলুন। তারপর ঐ গোলাপী বা লাল রঙের কাপড়ের টুকরো দুটির দুদিকেই কালো রঙের

স্থতো দিয়ে উপরের ১নং নক্সায় যেমন দেখানো রয়েছে, সেই নমুনানুসারে স্থচারু-ছাঁদে ছোট ছোট কয়েকটি ডিম্বাকৃতি (Ovalshaped) তরমুজ-বীচির 'ফুটকি-চিহ্ন' রচনা করুন। ...তাহলেই 'তরমুজের-ফালির' ছাঁদে 'পিন্-কুশ্যন' তৈরীর কাজ শেষ হবে।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু-শিল্পের এমনি আরো কয়েকটি অভিনব-সামগ্রী রচনাদ-কলা কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা রইলো।

—

সূচী-শিল্পের নক্সা

সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যাঁরা নানা রকমের সূচী-শিল্পের অনুশীলন করেন তাঁদের সুবিধার জন্য এবারে সৌখীন সেলাইয়ের উপযোগী ফুল-পাতার নক্সা-আঁকা বিচিত্র একটি 'আলঙ্কারিক-নমুনা' বা 'Decorative-Pattern' দেওয়া হলো।
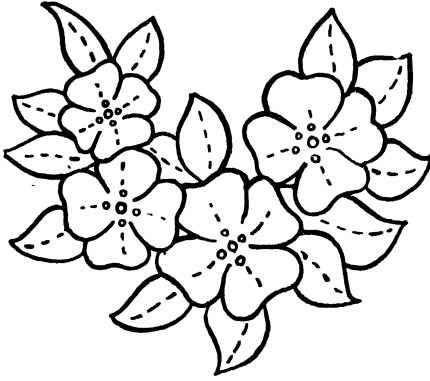
সুষ্ঠুভাবে সূচী-শিল্পের কাজ করে ঘরের দরজা-জানলার পর্দা, সোফা-কৌচ-চেয়ারের ঢাকা (Covers), বিছানার বালিশ ও 'কুশনের' (Cushion) ওয়াড়, টেবিল-ক্লথ, 'টি-কোজির' (Tea-cosy) গেলাব, 'ট্রে' ঢাকবার কাপড়, এমন কি, মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েদের ফ্রক, ব্লাউশ, চোলী প্রভৃতি জামা সুচারুরূপে অলঙ্করণের পক্ষে, ফুল-পাতার নক্সা-আঁকা উপরের এই 'নমুনা' বা 'প্যাটার্ণটি' সহজেই রচনা করা সম্ভব। সরল, সুন্দর অথচ সহজসাধ্য এই বিচিত্র নক্সাটি অনায়াসেই যে কোনো ধরণের মিহি আর মোটা, হাল্‌কা এবং গাঢ়—এক-রঙা সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের উপর রঙীণ সুতো দিয়ে 'এমব্রয়ডারী' (Embroidery) বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'এ্যাপ্লিকের' (Applique) কাজ করে ফুটিয়ে তোলা যাবে। তবে গাঢ়-রঙের কাপড়ের উপরে নক্সাটিকে মনোরম-ছাঁদে রচনার জন্য—মানানসই-ধরণের ও হাল্‌কা-রঙের সুতো (Cotton-threads), রেশম (Silk-threads) বা পশম (Woolen-threads) দিয়ে 'এমব্রয়ডারী' অথবা উপরোক্ত ধরণের রঙীণ কাপড়ের টুকরোর সাহায্যে 'এ্যাপ্লিকের' কাজ করবেন। কিন্তু যে কাপড়ের উপর সূচী-শিল্পের কাজ করে এ নক্সাটি ফুটিয়ে তুলবেন, সেটির রঙ যদি হাল্‌কা-ধরণের হয়, তাহলে সেলাইয়ের কাজের জন্য বেছে নেবেন—পছন্দমতো ও মানানসই ধরণের গাঢ়-রঙের উপকরণ। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরুন—কাপড়ের রঙ যদি গাঢ়-নীল হয়, তাহলে উপরের নক্সায় দেখানো ফুলের পাপড়িগুলির রঙ হবে—শাদা কিম্বা গোলাপী, অথবা ফিকে-হল্‌দে এবং ফুলের প্রত্যেকটি রেণু রচনা করতে হবে গাঢ়-হল্‌দে, লাল, বাদামী অথবা শাদা রঙের সুতো, রেশম কিম্বা পশম দিয়ে! ফুলের প্রত্যেকটি পাপ্‌ড়ির উপরকার ছোট-ছোট রেখাগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে—মানানসই-রঙের সূচী-শিল্পের ফোঁড় দিয়ে। পাতার রঙ হবে—ফিকে-সবুজ। পাতার শিরা-রেখাগুলি রচনা করতে হবে—গাঢ়-সবুজ রঙের সুতো, রেশম অথবা পশমের সুতো দিয়ে ছোট-ছোট ফোঁড় তুলে। এভাবে সেলাইয়ের কাজ করবার সময়—ফুলের পাপ্‌ড়ি ও পাতার 'কিনারা' বা 'outline' আগাগোড়া সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে—মানানসই-রঙের সুতী, রেশমী বা পশমী সুতো দিয়ে। তাহলেই নক্সাটি অপরূপ-সুন্দর ছাঁদে কাপড়ের বুকে সমুজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠবে।

এই হলো—এবারের বিচিত্র সূচী-শিল্পের নক্সাটিকে পরিপাটি-ধরণে রচনা করবার মোটামুটি নিয়ম।

বারান্তরে, সূচী-শিল্পের এমনি আরো কয়েকটি 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative-motifs) নমুনা প্রকাশ করার ইচ্ছা রইলো।

সুধীরা হালদার

এবারে দক্ষিণ-ভারতীয় অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় ও বিচিত্র-মুখরোচক দুটি খাবার রান্নার কথা বলছি। প্রথমটি—নিরামিষ জাতীয়···শাক-শব্জী, মূলো আর ডাল দিয়ে রান্না-করা অভিনব সুস্বাদু এক ধরণের তরকারী। সেটির নাম—'মূলোর ফুগাৎ' এবং দ্বিতীয়টি হলো—আমিষ জাতীয় চিঙড়ী-মাছ দিয়ে রান্না-করা বিচিত্র-ধরণের রসনা তৃপ্তিকর খাবার। দক্ষিণ-দেশীয় এই দুটি খাবার রান্নার উপকরণগুলি নিতান্তই ঘরোয়া ধরণের এবং রন্ধন-প্রণালীও অনায়াসসাধ্য। কাজেই অল্প-ব্যয়ে এ সব দক্ষিণী খাবার রান্না করে প্রিয়জনদের পরিতৃপ্তিদানের জন্য বাঙলা-দেশের সুগৃহিণীদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না।

গোড়াতেই জানিয়ে রাখি—'মূলোর ফুগাৎ' রান্নার কথা। দক্ষিণ-ভারতের বিচিত্র এই নিরামিষ খাবারটি রাঁধবার জন্য চাই—গোটা তিন-চার পরিপুষ্ট শাদা-মূলো, আধখানা ভালো নারিকেল, শিকি-আঁটি তাজা ধনে-শাক, চায়ের চামচের আধ-চামচ মাসকলাই ডাল, তিন-চারটি কাঁচা-লঙ্কা, বড়-চামচের (Table-spoon) এক চামচ পাতিলেবুর রস, চায়ের চামচের আধ চামচ সরিষা, বড়-চামচের দুই চামচ ঘী, আর আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো-নুন।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই, মূলো আর নারিকেল আলাদাভাবে কুরে নিয়ে পরিষ্কার-পাত্রে তুলে রাখুন। তারপর লঙ্কাগুলিকে মিহি-ধরণে কুটে ফেলুন এবং মোটা-ছাঁদে ধনেশাকের আঁটি কুচিয়ে নিন। এবারে উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্রটিকে চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো ঘী গরম করে সেই ঘীয়ে লঙ্কা আর ধনেশাকের কুচি, সরিষা ও মাসকলাইয়ের ডাল মিশিয়ে দিয়ে অন্ততঃপক্ষে প্রায় মিনিট পাঁচেক কাল ভালোভাবে ভেজে ফেলুন। এমনিভাবে ভেজে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে এই সব উপাদানের সঙ্গে কুরে-রাখা মূলো মিশিয়ে দিয়ে, কিছুক্ষণ ঢিমে-আঁচে রাঁধুন। রাঁধবার সময় পাত্রের উপকরণগুলিকে মাঝে মাঝে খুন্তি বা হাতা দিয়ে নেড়ে দেবেন···না হলে সেগুলি পাত্রের তলায় ধরে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে। খানিকক্ষণ উনানের ঢিমে-আঁচে রেখে মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে এভাবে রান্নার ফলে রন্ধন-পাত্রের ভিতরকার তরকারীটি যখন বেশ তৈরী হয়ে আসবে, তখন সেটির সঙ্গে ঐ নারিকেল-কুরো আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিয়ে, পাত্রটিকে আগুনের উপর থেকে নামিয়ে রাখুন। তাহলেই রান্নার কাজ মিটবে। এবার 'মূলোর ফুগাৎ' তরকারীটি প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণ করুন··· তাঁরা আপনার হাতের তৈরী এই অভিনব-সুস্বাদু দক্ষিণ-ভারতীয় রান্নাটি খেয়ে রীতিমত সুখ্যাতি করবেন।

এই হলো—দক্ষিণী-প্রথায় 'মূলোর ফুগাৎ' রান্নার মোটামুটি নিয়ম। ঠিক এমনি-পদ্ধতিতেই, মূলোর বদলে গাজর ব্যবহার করে বিচিত্র-মুখরোচক 'গাজরের ফুগাৎ' তরকারী রান্না করা চলে।

এবারে বলছি—দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় চিঙড়ী-মাছ দিয়ে তৈরী পরম-উপাদেয় আমিষ-তরকারীটি রান্নার কথা। এ রান্নাটির জন্য উপকরণ দরকার—তিন-পোয়া ভালো চিঙড়ী-মাছ, গোটাচারেক শুকনো লাল-লঙ্কা, আধখানা নারিকেল, একটা বড় পেঁয়াজ, কয়েকটি তেজপাতা, বড়-চামচের দু' চামচ ঘী, চায়ের চামচের এক-চামচ হলুদ-গুঁড়ো, আর চায়ের চামচের পৌনে-এক চামচ নুন।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, প্রথমেই চিঙড়ী-মাছগুলিকে পরিষ্কার-জলে ধুয়ে ভালোভাবে সাফ্ করে নিয়ে, সেগুলিকে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে ছোট-ছোট টুকরোয় কুটে ফেলুন। মাছের টুকরোগুলি কুটে নিয়ে, সেগুলিতে ভালোভাবে নুন আর হলুদ মাখিয়ে আলাদা একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। এবারে পেঁয়াজটিকে মিহি টুকরো করে কুচিয়ে ফেলুন। নারিকেলটিকে আগাগোড়া মিহি-ছাঁদে কুরে নিন এবং সেগুলির সঙ্গে তেজপাতা আর লাল-

লঙ্কাগুলিকে মিশিয়ে, পরিচ্ছন্ন শিল-নোড়ার সাহায্যে একত্রে ভালোভাবে বেটে থকথকে 'লেই' বানিয়ে ফেলুন।

অতঃপর চিংড়ী-মাছের টুকরোগুলিতে আগাগোড়া এই 'লেই' মাখিয়ে নিন এবং উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে অল্প একটু জল দিয়ে 'লেই-মাখানো' মাছের টুকরোগুলি ছেড়ে, রান্নার কাজ সুরু করুন। এ ভাবে কিছুক্ষণ রান্নার পর, মাছের টুকরোগুলি আধ-সিদ্ধ হলেই, সেগুলিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে আলাদা একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। তারপর রন্ধন-পাত্রটিকে পুনরায় উনানের আঁচে বসিয়ে, গরম-ঘীয়ে পেঁয়াজের কুচোগুলিকে আগাগোড়া ভেজে নিন। এভাবে ভেজে নেবার ফলে, পেঁয়াজ-কুচোর রঙ বেশ বাদামী হয়ে উঠলেই, রন্ধন-পাত্রে গরম-ঘীয়ে-ভাজা ঐ পেঁয়াজের কুচোর সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে নুন আর চিংড়ী-মাছের আধ-সিদ্ধ টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ভালোভাবে ভাজুন—যতক্ষণ অবধি না রান্নার রঙ সোনালী-বাদামী ধরণের হয়ে ওঠে। মাছের টুকরোগুলির রঙ আগাগোড়া বেশ সোনালী-বাদামী হয়ে উঠলেই, রন্ধন-পাত্রটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে নেবেন। তাহলেই দেখবেন—দক্ষিণ-ভারতের বিচিত্র-উপাদেয় চিংড়ী-মাছের আমিষ-খাদ্যটি প্রিয়জনের পাতে পরিবেষণের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

এই হলো—দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় অভিনব-মুখ-রোচক 'চিংড়ী-মাছের টুকরো ভাজা' রান্নার কৌশল।

পরের মাসে, এমনি ধরণের অপরূপ-রসনাতৃপ্তিকর আরো কয়েকটি জনপ্রিয় আমিষ ও নিরামিষ ভারতীয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর হদিশ জানাবার বাসনা রইলো।
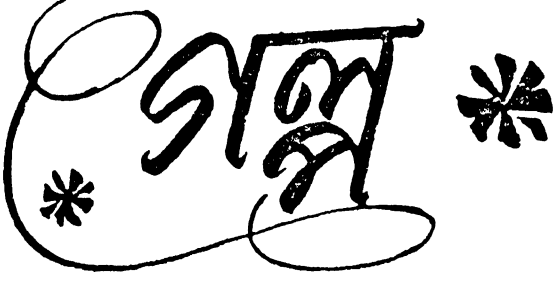
বসন্তের রং

অজিত চট্টোপাধ্যায়

শালতোড়া অঞ্চলে নীরা সাইমনের মেয়ে স্কুলটি এতদিন আছে কিনা জানিনা। হয়ত উঠে গেছে। হয়ত বা উন্নয়ন বিভাগের সাহায্য পেয়ে একটা বড় হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে। কিংবা নীরা সাইমনই চলে গেছে অন্য কোথাও। এসবই আমার কল্পনা। নীরা সাইমনের স্কুলটিকে আমি দেখে এসেছিলাম প্রায় বছর দশেক আগে এক বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্নে।

বাঁকুড়া শহর থেকে বাস সার্ভিস আছে,—পশ্চিমে। পুরুলিয়া, হুড়া, রঘুনাথপুর, সর্বত্রই বাসযোগে যাওয়া যাবে। শালতোড়া অঞ্চলে যেতে হলে ঐ বাসে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। জেলার এদিকটা বিহারের সংলগ্ন। অনুর্বর উপত্যকা, পাহাড়, বন-জঙ্গল ইত্যাদিই বেশী। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বড় সুন্দর। কালো পীচঢালা পথের দুপাশে ঋজু শাল গাছ, মাঝে মাঝে পাহাড়···দূর থেকে নীল, কাছে এলেই সবুজ চোখ জুড়ানো। বাঁকুড়া শহর থেকেই শুশুনিয়া পাহাড়ের একটা অংশ পরিষ্কার চোখে পড়ে। খাঁজ কাটা, ঢেউ খেলানো নীল পাহাড়টা যেন একটা অতিকায় হাতী। দিগন্তে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

নীরা সাইমনের সংগে আমার প্রথম আলাপ এই বাঁকুড়া শহরেই। তখনও স্বাধীনতা আসেনি দেশে। এই শহরেরই কলেজে বি. এ. পড়তে এসেছিলাম আমি। কলকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়। তাই মফঃস্বলই ভালো মনে করে ভর্তি হয়ে গেলাম। শহরের একপ্রান্তে কলেজ। কাছাকাছি হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা। বি, এ, ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা সীমিত। জন ত্রিশের বেশী হবে না। মাত্র দুজন ছাত্রী ছিল সে বছরে। একজন নীরা সাইমন, অন্যজনা সুপ্রভা হালদার।

আগে বলতে ভুলে গেছি নীরা সাইমন আদিবাসী মেয়ে। কবে কোন পুরুষে মিশনারীরা ওদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল, সে খোঁজ আমরা নিই নি। তবে মিশনারী হোস্টেলে থাকত নীরা সাইমন। শুনেছিলাম মিশন থেকেই ওর লেখাপড়া শিখবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কলেজেও সম্ভবত মাইনে লাগত না ওর।

নীরা সাইমনের সংগে সুপ্রভা হালদারের গলায় গলায় ভাব। আড়ালে আমরা ডাকতাম মাণিকজোড় বলে। হয়ত এই বেশী ঘনিষ্ঠতার একটা কারণও ছিল। ক্লাসে দুটির বেশী মেয়ে ছিল না। ফলে হৃদ্যতা এমনিতেই বেড়েছিল। কিন্তু চেহারায় এত বেশী অমিল দুজনার যে এক এক সময় আমাদেরই কেমন অবাক লাগত।

আদিবাসী মেয়ে নীরা সাইমনের গায়ের রং কুচকুচে কালো। মাথার চুল ঈষৎ কোঁকড়া। নাক মুখ চোখ সৌন্দর্য্যের বিচারেই আসে না। পিঠের উপর বিনুনী বাঁধা কেশভারের নৃত্য-দোদুল ছন্দ। সে তুলনায় সুপ্রভা হালদার রীতিমত ফর্সা। শাঁখের মত শাদা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এক তাল চুল বিরাট একটা খোঁপার আকারে মাথার পিছনে জড়ানো। টিকল নাক আর টানা চোখ রূপকথার রাজকুমারীদের বর্ণনার সামিল। তবু ওদের দুজনের দারুণ ভাব, যা দেখে আমাদের আশ্চর্য্য লাগত।

ইংরাজী অনার্স ক্লাসে আমরা তিনজন পড়তাম। আমি, সুপ্রভা আর নীরা সাইমন। আদিবাসী মেয়েটি আই-এ, তে বেশ ভালো নম্বর পেয়ে ছিল ইংরাজীতে। প্রফেসর অরুণাংশু সান্যাল সে কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন ক্লাসে।

—'মিস সাইমন, আপনি যদি একটু বেশী পরিশ্রম করেন, তাহলে খুব ভালো অনার্স পাবেন'—তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন,—'আপনারাও চেষ্টা করুন ভালো করে, অনার্স নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন'—

প্রফেসর অরুণাংশু সান্যালের বয়স বেশী নয়। ত্রিশের কম হবে। ব্যচিলর মানুষ। উড়ু উড়ু চুল সব সময় অবিন্যস্ত, ফর্সা চেহারায় ধুতি পাঞ্জাবীতে বড় সুন্দর মানাত তাকে। আড়ালে আমরা বলতাম, প্রফেসর বায়রণ।

সাধারণ ক্লাসগুলির শেষে অনার্স ক্লাস শুরু হত আমাদের। হয়ত প্রফেসরদের কমন রুমে কিংবা কোন একটা ছোট ঘরে। সে সময় ফাঁকা হয়ে আসত কলেজ। অল্প কিছু অনার্সের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর সকলেই বাড়ী ফিরে যেত।

আমাদের ক্লাসে নীরা সাইমন ছিল বড় মনোযোগী ছাত্রী। সুপ্রভার তেমন আগ্রহ ছিল না লেখাপড়ায়। সে বরাবরই একটু সেজেগুজে আসত ক্লাসে। কোনদিন ফিকে সবুজ রঙের শাড়ী, কোনদিন বা আকাশী নীল, কখনো মেরুণ রং। সপ্তাহে অন্তত চারখানা শাড়ী বদলাত সে। নীরা সাইমন এ ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। শাদা রং ছাড়া অন্য কোন রঙের শাড়ী কখনো দেখিনি তার গায়ে। পরে অবিশ্যি সবুজের ছোঁয়া লেগে-ছিল ওর। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি—

অনার্স ক্লাসে নোট দিতেন প্রফেসর সান্যাল। আমরা তিনজনে একমনে লিখে যেতাম। কখনো প্রশ্ন লিখতে দিতেন। আমরা লিখে নিয়ে এলে—বাড়ী থেকে দেখে আনতেন উনি। লেখার শেষে মন্তব্য করতেন। আমরা বেশ বুঝেছিলাম যে আমাদের মধ্যে নীরা সাইমনের অনার্স পাওয়া সুনিশ্চিত। আমি আর মিস হালদার সীমানায় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু। এখনও সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার পাইনি।

ফোর্থ ইয়ারে উঠে আমাদের পড়াশুনা বাড়ল। অনার্স ক্লাসের সংখ্যা এখন অনেক বেশী। ছুটির দিনে প্রফেসর সান্যালের বাড়ী যেতে শুরু করলাম আমরা। এ ছাড়াও সকালে সন্ধ্যায় যখনই প্রয়োজন হত ওর বাড়ীতে যেতাম। কখনো তিনজনে একসংগে, কখনো আলাদাভাবে। কোন-দিন গিয়ে দেখেছি সুপ্রভা হালদার কি একটা জিনিষ বুঝে নিচ্ছে ওর কাছ থেকে। কখনও দেখতাম, নীরা সাইমনের খাতার কিছু কিছু অংশ সংশোধন করে লিখে দিচ্ছেন উনি। আবার তিনজনে একই সংগে গিয়েছি ওর বাড়ীতে। কলেজের কাছেই ছোট একটা বাড়ী নিয়ে থাকতেন উনি। একা মানুষ, কোন ঝামেলা ছিল না।

নীরা সাইমনকে বলতাম—'আমাদের মধ্যে আপনিই ভরসা। প্রফেসর সান্যাল তো অনেক আশা করে আছেন'—

কৃষ্ণকায় নীরা সাইমন মিতভাষী। সে একটু হেসে বলল,—'কেন, আপনি আর সুপ্রভা কি দোষ করলেন?'—

—'আমাদের আশা কম। দেখলেন তো পরীক্ষার নম্বর। প্রফেসর সান্যালেরও খুব ভরসা নেই আমাদের উপর'—

—'কে বলল সে কথা আপনাকে? প্রফেসর সান্যালের সকলেরই উপর ভরসা। উনি বড় ভালো লোক। আমাকে কতদিন বলেছেন—আমার সব নোট-টোট দিয়ে আপনাদের সাহায্য করতে।'—

আমি হেসে বললাম,—'দেখা যাক। ধার তো নেই, যদি আপনার নোট পেয়ে ভারে কেটে যাই এবার'—

সুপ্রভা হালদার এসব ব্যাপারে বরাবরই নিরুৎসাহী। অনার্স না পেলেও যেন ওর কোন ক্ষোভ নেই। মাঝে মাঝে নীরা সাইমন ওকে খোঁচা দিত। বলত,—'কিরে সুপ্রভা, পড়াশুনায় চাড় দিচ্ছিস না কেন?—পরীক্ষা-টরীক্ষা দিবিনে নাকি?'—

সুপ্রভা জবাব দিত,—'দেবো না কেন?' বলেই সে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি হাসত। সে হাসির অর্থ আজো আমি বুঝতে পারিনি—

অনার্স ক্লাসে প্রফেসর সান্যাল যখন কোন কবিতা পড়াতেন কিংবা কোন বিশেষ প্রশ্নের উত্তরটি মুখে মুখে আলোচনা করতেন, নীরা সাইমনকে দেখতাম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা এই আদি-বাসী মেয়েটির চাউনীতে যেন কি একটা বস্তুর গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি। দৃষ্টিটা যেন ছাত্রীর নয়! বাঁশীর সুরে আবিষ্ট সর্পিনীর মত কৃষ্ণকায় মেয়েটির চোখের পলক যেন পড়তে চাইত না। প্রফেসর সান্যাল বলে যেতেন নিজের

ভঙ্গীতে। নীরা সাইমন একদৃষ্টে চেয়ে থাকত তার দিকে। যেন কোন মুগ্ধা রমণী একা পরম সৌন্দর্য্যের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

মিশনারী হোষ্টেলের বাগানে নানা ফুলের গাছ। ওর পুষ্পপ্রীতির কথা আমাদের অজানা ছিল না। অবসর পেলেই বাগানে গিয়ে ফুলগাছের পরিচর্য্যা করত নীরা সাইমন। মাঝে মাঝে বিকেলে বই পড়ত, বাগানের সবুজ ঘাসের উপর একটা কিছু পেতে। অনার্স ক্লাশে প্রায়ই কিছু ফুল আনত নীরা। জিপসী ফুলের বেষ্টনীতে বাঁধা একটি ছোট গোলাপের তোড়া কিংবা কিছু রজনীগন্ধা কখনো বা ভুঁইচাঁপা ফুল—অনার্স ক্লাসে প্রফেসর সান্যালের টেবিলে রেখে দিত সে। আমাদেরও মাঝে মাঝে দু একটা উপহার দিত—

প্রফেসর সান্যাল বলতেন,—'আপনি বুঝি খুব ফুল ভালোবাসেন মিস সাইমন?—'

মিতভাষী নীরা সাইমন উত্তর দেয়নি।

ওর হয়ে আমি বলেছি,—'ফুলগাছের পরিচর্যা করা মিস সাইমনের একটা হবি স্যর'—

—'খুব ভালো। এমন একটা সুন্দর হবি থাকলে অবসর সময়টিও সুন্দর হয়ে উঠবে। কি জানেন, আমাদের জীবন থেকে ফুল, লতাপাতা, আলো, গান, হাসি—এসব চলে গেলে জীবনটারই আর কোনো মানে হয় না। শুধু খেয়ে বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অর্থহীন।'

—'কিন্তু সাধারণ মানুষ তো তাই করছে স্যর—

—'মানুষের কথা আগে কেন? পশুরা শুধু তাই করে। পশু জীবনে খেয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। তবে মানুষের জীবন যখন পশুর সামিল হয়ে উঠে, তখন দুটো জীবনের পার্থক্যও কমে আসে। কিন্তু মানুষের পরিচয় তাই নয়'—

একটু থেমে গিয়ে প্রফেসর সান্যাল আবার বললেন, —'রূপ রস গন্ধ নিয়ে বেঁচে থাকে মানুষ। যেমন ধরুন একটি বিশেষ রং একজনের প্রিয়। কেউ ভালবাসে লাল রং, কেউ নীল কেউ বা সবুজ। আমি নিজে হাল্কা সবুজ পছন্দ করি খুব। বসন্তকালে গাছে গাছে যখন প্রথম কিশলয় আসে, তখন কতদিন কচিপাতার রঙের দিকে তাকিয়ে দেখেছি'—

সুপ্রভা হালদার আমাদের আলোচনায় অংশ নিত না। প্রফেসর সান্যালের দিকে সে বড় একটা চাইত না ভালো করে। বই কিম্বা পাতার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে অল্প একটু হাসত।

দিন কয়েক পরেই খুব আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম যে শাড়ীর রং পাল্টেছেন মিস সাইমন। একটা হাল্কা সবুজ রঙের সাড়ী উঠেছে কালো মেয়ে নীরা সাইমনের অংগে।

কিন্তু কচি কিশলয়ের সবুজ রং কখন অলক্ষ্যে যে প্রফেসর সান্যালের মনে লেগেছিল তা বোধহয় উনিও জানতে পারেননি। আমরা যখন তা আবিষ্কার করলাম তখন দুটি হৃদয়ের মন দেওয়া নেওয়া অনেক আগেই সমাপ্ত হয়েছে। শুধু শুভ লগ্নের অপেক্ষা মাত্র—

ভাদ্রমাসের এক সন্ধ্যায় প্রফেসর সান্যালের বাড়ী যেতে হল। কোন একজন সমালোচকের কি একটা বইয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েই একটু থমকে দাঁড়ালাম। দরজার পর্দার কাছে নীরা সাইমন দাঁড়িয়ে কান পেতে কি যেন শুনছে। এত তন্ময় যে আমার উপস্থিতিও বুঝতে পারেনি।

অন্ধকার পক্ষ। আকাশে কালো মেঘের চাদর টানা। হয়ত এখুনি বর্ষণ হতে পারে। গুমোট করে আছে। ভাদ্রমাসের ভ্যাপসা গরম প্রতি মুহূর্তে প্রাণান্তকর মনে হচ্ছে।

ঘরের ভিতরে খিলখিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ছে সুপ্রভা হালদার।

প্রফেসর অরুণাংশুর গলা—'আরে, অত হেসো না। বাইরে থেকে কেউ শুনলে ভাববে কি'—

সুপ্রভা বলল,—'তা কি করব? অত হাসির কথা বলছ কেন?'

—'নীরা সাইমন আমাকে ফুল দিলে তোমারই বা সহ্য হয় না কেন?'

—সহ্য হবে কেমন করে? আর তোমারও রুচির বলিহারি। ওই কালো আদিবাসী মেয়েটা'—

প্রফেসর সান্যাল বললেন,—'তোমার বাবাকে তাহলে প্রস্তাবটা করি, কি বল সুপ্রভা'—

—'বলেছি তো তোমাকে। মাকে আমার বলা

আছে। হয়ত বাবাও জানেন। তুমি বললেই ওরা রাজী,'—

'—তাই করি। তোমার বন্ধু নীরা সাইমনকে আর ভুল বুঝতে দিতে চাই না'—

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে মুশলধারে। আমি একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে আছি। আমার চোখের সামনে দিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল নীরা সাইমন। বিদ্যুতের আলোয় তার জলে-ভেজা সবুজ শাড়ী-পরিহিতা মূর্তিটা আমি দু একবার দেখেছিলাম।

সেই সময়ে প্রফেসর সান্যালকে একটা নৃশংস মানুষ বলে মনে হয়েছিল আমার। যেন নীরা সাইমনের দেওয়া ফুলগুলি কুচি কুচি করে ছিড়ছেন উনি। গোলাপের পাপড়িগুলি ধুলোয় পড়ে লুটোচ্ছে, আর তার উপর দিয়ে জুতোর মচমচ শব্দ করে হেঁটে চলেছেন প্রফেসর অরুণাংশু সান্যাল।

এরপর থেকে প্রফেসর সান্যালের বাড়ীতে একসংগে আর যাইনি আমরা। কোনদিন নীরা সাইমন যেত, বেশীরভাগ দিনই আথি একা। সুপ্রভা বড় একটা যেতই না আমাদের সংগে। সেদিনকার ঘটনা আমি ইচ্ছে করেই বলিনি কোন বন্ধুবান্ধবকে—হয়ত লজ্জা পাবে বেচারী নীরা সাইমন। এমনও হতে পারে যে ওর পরীক্ষাটাই ভালো করে দেওয়া হবে না। সাতপাচ ভেবে কোন কিছু প্রকাশ করিনি।

কিন্তু সবুজ রং যাকে প্রফেসর সান্যাল বলতেন তারুণ্য বা যৌবনের প্রতীক—তাকে বর্জন করেনি নীরা সাইমন। কলেজে সে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ী পরেই আসত। বেশ বুঝতাম সুপ্রভা হালদার মনে মনে হাসছে। ফুল আনাও সে বন্ধ করেনি। প্রফেসর আসবার আগে টেবিলে সে সযত্নে রেখে দিত গোলাপের তোড়া কিংবা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম সেদিনের ঘটনার পরও কি আঘাত পায়নি নীরা সাইমন। অন্তত জীবনে একটি প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়ার পক্ষে সেদিনকার ঘটনাই কি যথেষ্ট ছিল না।

ইতিমধ্যে সুপ্রভার এনগেজমেণ্টের খবর ছড়িয়ে গেছে শহরময়। কলেজও শেষ হয়ে গেছে তখন। আমরা দুরু দুরু বক্ষে পরীক্ষার প্রতীক্ষা করছি শুধু। শুনলাম পরীক্ষার পরই সুপ্রভার বিয়ে। অরুণাংশু সান্যাল এখন নাকি বাড়ীতে গিয়েও পড়াচ্ছেন সুপ্রভাকে।

প্রফেসর সান্যালের বাড়ীতে গিয়ে একদিন একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। নীরা সাইমন সেদিন আসেনি। টেবিলে রাখা ছোট ফোটোস্ট্যাণ্ডটা পাওয়া যাচ্ছে না ওর। বহুদিন টেবিলে সেটা দেখেছি। তাতে প্রফেসর সান্যালের একটা ছবি। সেই উস্কু উস্কু চুল,…বড় বড় চোখের রোমাণ্টিক চাউনী।

উনি বললেন,—'কি অদ্ভুত দেখুন, টেবিল থেকে ফোটোটা উধাও। সামান্য দাম স্ট্যাণ্ডটার। চাকর বাকরদের সন্দেহ করেও কোন লাভ নেই'—

বললাম,—'তা ঠিক স্যার। তবে কি অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছেন ভুলে'।

—'খুঁজে দেখলাম তো। পেলাম কই ?'—

ফোটো সমন্বিত স্ট্যাণ্ডটা প্রফেসর সান্যাল আর খুঁজে পাননি। আমি সেটা আবিষ্কার করেছিলাম বছর পাঁচ ছয় পরে বেথুয়াডহরী জুনিয়ার হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কোয়ার্টার্সে! একটা সরকারী পরীক্ষা দিয়ে উন্নয়ন বিভাগের অফিসার হয়েছি। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমায়। শালতোড়া থানার 'এ' ব্লকে কাজ। ব্লক অফিসেই একদিন একটা সাহায্যের প্রার্থনা এল। বেথুয়াডহরী জুনিয়র হাইস্কুলের ওদিকে খুব নাম ডাক। মেয়েদের স্কুল—ক্লাস এইট্ পর্য্যন্ত। পড়াশুনা নাকি খুব ভালো হয় ওখানে। সাধারণত আদিবাসী মেয়েরাই পড়ে। উন্নয়ন বিভাগ থেকে সাহায্যের প্রার্থনা করেছে বেথুয়াডহরী স্কুল কর্তৃপক্ষ। যথারীতি দরখাস্ত এল আমাদের অফিসে। স্কুল পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে হবে।

কি একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মেয়েদের স্কুলটি। মাটির ঘর, নিকোন পোছান মেজে, দেওয়াল। কাছেই মেয়েদের হোস্টেল। কালো কালো আদিবাসী মেয়েরা ক্লাসে ঢুকছে, বেরিয়ে আসছে। গাছের নীচে ছুটোছুটি করছে একদল ছোট মেয়ে। সাইকেল ঠেসিয়ে রেখে হেডমিস্টেসের ঘরে ঢুকলাম। বিস্মিত হবারই কথা। চেয়ারে বসে নীরা সাইমন।

—'আরে, শেষে আপনি এলেন পরিদর্শন করতে।

তবে তো আমাদের স্কুল খুব ভালো একটা সাহায্য পাবে'—আমাকে অভ্যর্থনা করতে করতে সে বলল।

হেসে উত্তর দিলাম—'আপনার নিষ্ঠার কথা তো জানি। আমি না এসে অন্য কেউ এলেও আপনার স্কুলের ভালো রিপোর্টই হত।

আগের চেয়ে বেশ একটু মোটা হয়েছে নীরা সাইমন। হয়ত বয়স বেড়েছে বলে, কিংবা পাহাড়ী জায়গার জল-হাওয়ার গুণে। পরণে কিন্তু সেই সবুজবরণ শাড়ী,—কচি কিশলয়ের রং।

নীরা সাইমন আমাকে সব কিছু দেখালেন। কি সুন্দর ফুলবাগান করেছে মেয়েরা। দেশী বিদেশী নানা জাতের ফুলগাছ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্কুল বাড়ী। মেয়েদের হোস্টেলটিও সুন্দর।

বললাম,—'ফুল তো আপনি বরাবরই ভালো-বাসতেন'—

—'হ্যাঁ ফুল ভালবাসি। সবুজ রং ভালোবাসি। যা কিছু সুন্দর সবটুকু ভালোবাসি। প্রফেসর সান্যালের কথা মনে নেই আপনার? পশুজাতের সংগে মানুষের পার্থক্য তো এইখানেই। মানুষ বাঁচতে চায়, শুধু খেয়ে নয়,—রূপে রসে গন্ধে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

নীরা সাইমন এবার হেসে বললেন,—'ওসব কথা থাক। আমার স্কুলের কিন্তু দারুণ দুর্দশা। পাহাড়ী বর্ষায় খোড়ো চাল আর টেকে না। এখানকার লোকও খুব গরীব। অনেকেই মাইনে দিতে পারে না। শিক্ষা-বিভাগ যা দেয়, তার থেকে শিক্ষয়িত্রীদের মাইনে দিই কোন রকমে। কিন্তু গঠনমূলক তেমন কিছু করতে পারি না। ভালো বইয়ের অভাব। একটা ভালো বাড়ী নেই। এবার আপনিই ভরসা।'

আমি হেসে বললাম,—'উন্নয়ন বিভাগের সাহায্য নিশ্চয়ই পাবেন। তবে কতটা যে স্যাংশন করবে ওপর থেকে, সেটা বলতে পারি না।'—

হোস্টেলেরই কাছে নীরা সাইমনের কোয়ার্টার্স। একটা কাঠের চেয়ারে আমাকে বসতে দিয়ে নীরা সাইমন ভিতরে গেলেন। আমি দেওয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডার, ছবি, টেবিলে রাখা বইগুলির উপর নজর বুলোচ্ছি। আশ্চর্য্য হলাম একটি বাঁধালো ছবির দিকে তাকিয়ে। দেওয়ালের এককোণে একটি ছবি। প্রফেসর অরুণাংশু সান্যাল হাসছেন—সেই উড়ু উড়ু চুল, বড়ো বড়ো চোখের রোম্যান্টিক চাউনী।

ছবিটা যে আমি লক্ষ্য করেছি নীরা সাইমনের কাছে আর বললাম না। সেও দেখলাম প্রফেসর সান্যালের কথা উল্লেখ করল না।

চা জলখাবার খেয়ে রওনা হলাম বেথুয়াডহরী থেকে। স্কুলের মেয়েদের রচনা করা সুন্দর ফুলবাগানটি পর্য্যন্ত নীরা সাইমন এগিয়ে দিলেন আমাকে। পর্য্যাপ্ত পুষ্পে ভরা ছোট্ট ফুল বাগানটি। গোলাপ, রজনীগন্ধা, ভুঁইচাঁপা, ডালিয়া ও আরো কত জানা অজানা ফুলের গাছ। সবুজ পাতা গাছে গাছে, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

নীরা সাইমন বলল—'আবার কবে আসছেন আমাদের স্কুলে?—

আমি বললাম,—'আসবো এক সময়'—

—'শরতের সময় আসুন না। কি সুন্দর তখন যে দেখাবে এ অঞ্চল। আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে।'—

বেথুয়াডহরী ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। প্রফেসর অরুণাংশু সান্যালের কথা মনে পড়ছে। সুপ্রভাকে বিয়ে করেই কলকাতা চলে যান ভদ্রলোক। একবার দেখা হয়েছিল কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলে। ভবানীপুরের কোথায় কোন একটা গলির দোতলায় দুখানা ঘর নিয়ে আছেন। সকাল দুপুর সন্ধ্যে তিন শিফটেই নাকি পড়ান বিভিন্ন কলেজে। দুখানা নোট বই লিখেছেন বেনামে। এখন নাকি প্রকাশকের কাছে টাকার তাগিদে আসেন এ অঞ্চলে।

নীরা সাইমনকে মনে নেই তার। বেথুয়াডহরী স্কুলের এক খোড়ো ঘরে একটি আদিবাসী কালো মেয়ে যে তাকে নীরবে পূজো করে, বেচারী অরুণাংশু সান্যাল কোনদিনই জানতে পারবে না।

তবে নীরা সাইমন এমন বেহিসেবী কাজ করল কেন একটা? সুপ্রভা হালদারের মত ফর্সা হরিণ চোখের মেয়ে থাকতে তার কি একটু সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল না?

হয়ত ওর দোষ নেই। বসন্ত এলেই পৃথিবীতে যে সবুজের ছোঁয়া লাগে। ফুল ফোটে নির্বিচারে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে বসন্তকাল বেচারা পক্ষপাতশূন্য,—শাদা কালোর বিচার করতে শেখেনি।

অবিস্মরণীয়

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শত শত শহীদের হৃদয় শোণিতে
এই তো সেদিন
রাজপথে লেখা হল মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস,
জনতার সে জয়-ঘোষণা
অগ্নির অক্ষরে লেখা অগ্রগামী শতাব্দীর বুকে।
আজি তাহা আনিয়াছে নূতন আহ্বান
নূতন সমরক্ষেত্রে বীর্য পরীক্ষায়
সৈনিকের জয়যাত্রা পথে।

সেদিনের সৈনিকের আত্ম বলিদান
তারই তরে স্বতঃস্ফূর্ত সহজ উল্লাস
আবার জাগ্রত হোক প্রাণে,
নিঃশঙ্ক নির্ভীক পদক্ষেপে
পথের সহস্র বাধা হোক অপসৃত,
অপসৃত হোক মৃত্যুভয়।

জানি সেথা জেগে আছে অটল বিশ্বাসে
দুর্নিবার মুক্তির কামনা,
তাদের যৌবন গর্বে মিশে আছে দুর্জয় সাহস,
তাদের নয়নে আছে তীক্ষ্নদৃষ্টি অব্যর্থ সন্ধানী
তাদের দু'বাহু মূলে আছে শক্তি অজেয় অমোঘ।
তারাই তো বার বার করিয়াছে অসাধ্য সাধন,
নিস্তরঙ্গ জীবন-সাগরে
তারাই তো বার বার তুলিয়াছে তরঙ্গ উত্তাল,
নিষ্কম্প অরণ্য মাঝে তারাই তো তুলিয়াছে উন্মত্ত তুফান,
ভয়ঙ্কর ভৈরবের যোগনিদ্রা ভাঙ্গিতে তাহারা
বার বার গাহিয়াছে প্রলয়ের গান।
তারাই আবার
নূতন সৃষ্টির উদ্বোধনে
নির্বিশেষে করিয়াছে আত্ম-সমর্পণ।
জীবনে হয়েছে তারা প্রাতঃস্মরণীয়
মৃত্যুতেও অবিস্মরণীয়।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

১২

লটারী-খেলার মতোই সেকালের লোকজনের আমোদ-প্রমোদের প্রবল নেশা ছিল—কবি-গান, পাঁচালী, কথকতা, তর্‌জা, খেঁউড়-লড়াই, যাত্রা আর থিয়েটার প্রভৃতির আসর জমানোর দিকে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পুরোনো সংবাদপত্রাদি আর পুঁথি-পাত্‌-তাড়িতে সেকালের এ সব কৃষ্টিকলা-চর্চ্চার বহু বিচিত্র পরিচয় মেলে। একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটানোর উদ্দেশ্যে, সেকালের এমনি সব জনপ্রিয় আমোদ-অনুষ্ঠানের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক-নিদর্শন উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * * *

কবি-গান

(রাজনারায়ণ বসু রচিত 'সে কাল আর এ কাল' প্রবন্ধ হইতে, ১৮৭৪)

…এক্ষণে সে কালের আমোদ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি সে কালের প্রধান আমোদ ছিল। তাহার মধ্যে কবি প্রধান। হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু নর্সিং, রাম বসু, ভবানী বেণে, ইঁহাদিগের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু যত্নে ইঁহাদের অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রভাকরে [৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' সাময়িক-পত্র] প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নিতে বৈষ্ণব অর্থাৎ নিতাইদাস বৈরাগী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে বায়না দিতেন; ইহার সহিত ভবানী বেণের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত। যথা—প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই'। এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোকসকল নিতে ভবানীর লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত। তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক্ এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট [একালের হালিসহর অঞ্চল], ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাশডাঙ্গা [হুগলী নদীর পশ্চিম-কূলে অবস্থিত সে কালের ফরাসী-শাসিত চন্দননগর অঞ্চল], চুঁচড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন, এমনি জ্ঞান করিতেন।

অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত। কত স্থানে কত বার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে 'নিত্যানন্দ প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহার গাহনার প্রাক্কালে প্রভু উঠেছেন বলিয়াই গোঁড়ারা ঢলঢল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।"

কবিওয়ালাদিগের এক একটি কবিতা এমন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হরু ঠাকুরের একটি কবিতাতে এইরূপ উক্তি দেখা যায়—

"নাম প্রেম তার, সাকার নহে, বস্তুটি সে নিরাকার,
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার।
সুখে লোক বলয়ে পিরিতি সুখের সার ;
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন জীবনে যেন মরে রই ॥"

কি চমৎকার ভাব! ইহা প্লেটো অথবা কোল্‌রিজের উপযুক্ত! কোল্‌রিজ্ এক স্থানে বলিয়াছেন—

"All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame
Are all but ministers of love
And feed his sacred flame."

হরু ঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না। হরু ঠাকুরের অপর একটি গীতি আছে—

"প্রেম কি যাচ্‌লে মিলে, খুঁজিলে মিলে ?
সে আপনি উদয় হয়, শুভ যোগ পেলে।"

হরু ঠাকুরের কবিতামধ্যে আছে—

"আমি ত পাষাণ হয়ে
ছিলাম তোমারে ভুলে
প্রেমসাধ ত্যজিয়ে
তুমি কেন আসি, প্রাণ! পুন দর্শন দিলে।"

রাম বসু এক স্থানে কোন সাধ্বী স্ত্রীর বিরহযন্ত্রণা বর্ণনা করিয়াছেন—

"মনে রৈল সই মনের বেদনা ;
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,
আর বলা হলো না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তারে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারীজন্ম যেন করে না।
একে আমার এই যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো,
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না ॥"

কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র! রাম বসু কোন স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"বসন্তে শুধাও সখি নাথের মঙ্গল কি ?
কাল আসিব বলে নাথ করেছে গমন,
ভাগ্যদোষে যদি, সে হল মিথ্যাবাদী,
চারা কি এখন ?
পতি গতি মুক্তি অবলার, সুখ মোক্ষ
সে গো আমার,
তাহার কুশল শুনে কুশলে কুল রাখি।"

রাম বসু অন্য এক স্থানে লম্পট স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"প্রাণ! তুমি আপনার নহ, আমার কি হবে!"

এই সামান্য বাক্যে কি গভীর মানব-স্বভাব-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে! নিতাই দাস বৈরাগী এক স্থানে বলিয়াছেন—

"বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে.
এ তিন অক্ষর, করিল সংযোগ
রসিকের সুখ আশ্রয়।"

সে তিন অক্ষর পি, রি, তি। যে ব্যক্তি এই কবিতাটি উক্ত করিয়াছেন, তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের মহত্ত্ব ও দেবভাব অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহে নাই; কোন লোকের মুখে পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে কবিতাওয়ালারা উচ্চ দার্শনিক ভাবেও আরোহণ করিতেন। গোঁজ্‌লা গুঁই নামে এক জন কবিওয়ালা স্বামীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন—

"তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তাই রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ, প্রাণ! তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।"

কবিওয়ালারা কেবল আমোদজনক কবিতা গান করিতেন এমন নহে, কবি গাইবার সময় পরমার্থভাবপূরিত সঙ্গীতও গাইতেন। হরু ঠাকুরের রচিত এইরূপ একটি গান আছে—

"হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা, যা হবার তাই হবে। ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি ঢেউ দেখে লা ডুবাবে।"

পাঠান্তর—

"ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে লা ডুবাবে।"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কি মনোহর! কি মোহহর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন মাত্রেই অশ্রুপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবালবৃদ্ধ-বনিতামাত্রেই মুগ্ধ হইতে থাকেন। সকলেরই অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়, সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করে; মনের সমুদয় মোহ বিকার হরণপূর্ব্বক ভাব ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে মরণ-হরণ-চরণ-স্মরণ করিতে থাকে। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নামসংকীর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর, কি ভদ্র, তাবতেই এমৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কি এক নিগূঢ় মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে ব্যক্ত করণে অশক্ত হইলাম।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই কথা অতি যথার্থ। এই সকল কবিওয়ালারা তখনকার বিশেষ প্রতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন অদ্ভুত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার নাম আণ্টুনি ফিরিঙ্গী। এক জন ফিরিঙ্গী হিন্দু-কবিওয়ালাদের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এই আশ্চর্য্য! শুনা গিয়াছে, আণ্টুনি ফরাশডাঙ্গার [একালের চন্দননগর অঞ্চল] এক-জন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন। [আণ্টুনি সাহেব গরীটির (গৌরহাটি বা বর্ত্তমান গরুটি) বাগানে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমার (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের) কোন আত্মীয় বলেন— "আণ্টুনি সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতি-পথে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাশডাঙ্গার সন্নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেলরোড হইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্ব্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আণ্টুনি সাহেবের ভগ্ন বাটী সর্ব্বদা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যু-দলের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।"]

তিনি দুর্গার প্রতি উক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী।"

পুনরায়—

"আণ্টুনি ফিরিঙ্গী বলে, নিদানকালে মা,
দিও চরণ দুখানি, দিও চরণ দুখানি।"

আণ্টুনি ফিরিঙ্গীর এক্ জন বিপক্ষ কবিওয়ালার গীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কফন্ চোর।
ভাঙ্গে রাত হোলে সব মৌত গোর॥
টাট্‌কা গোরে হুট্‌কা ভূতের রব, এ কি অসম্ভব,
এ হুম্‌কি দিয়ে বস্তু লোটে সব ;
এর ঠায় ঠিকানা গেল জানা ;
মাস্থর হলো তিন সহর॥"

হ, মো, সে।

আর এক জন বিপক্ষ কবিওয়ালা আণ্টুনির দুর্গার নিকট প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"ঈশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে।
তুই জাতফিরিঙ্গী জবড়জঙ্গি পারবি না ক তরিতে॥"

গ্রন্থকর্ত্তা (রাজনারায়ণ বসু)

* * * *

[ক্রমশঃ]

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ কেমন যাবে?

উপাধ্যায়

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ পৃথিবীর বহু অশুভ ঘটনার বার্ত্তাবহ। চীন-ভারত যুদ্ধারম্ভ এবং চারি বৎসর ব্যাপী স্থিতি। বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক তৎপরতা এবং তার ভয়াবহ গতি-বেগে সমগ্র ধরিত্রীর আর্ত্তনাদ।

বর্ষাধিপতি মঙ্গল। প্রধানমন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষ শনি। পরিচালক গ্রহসংসদের ভিতর অন্যান্যগ্রহদের শক্তিহীনতা। বর্ষপরিচালনায় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের মত ক্ষমতাও বৃহস্পতির ভাগ্যে জুটিল না! বৃহস্পতির প্রাধান্যহীনতা এবং রবি, বুধ ও শুক্রের নিষ্ক্রিয়তা ও বৈকল্য তাৎপর্য্যপূর্ণ। বুদ্ধি, মন্ত্রণা, সৎ অসদুপায়ের চিন্তার ক্ষেত্র পঞ্চমস্থান—সেখানে শনি অবস্থিত। লগ্নাধিপতি নীচস্থ ও দুর্ব্বল। আগামী ১৯ শে মে পর্য্যন্ত কর্কট ও মকরে শনি মঙ্গলের পরস্পর পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় সাংঘাতিক পরিস্থিতিকারক। শনি ও ও মঙ্গল দুইটী ক্রুর, ধ্বংসকারক ও দুঃখদায়ক গ্রহ—দুইটী অশান্তি ও বিপর্যয়ের স্রষ্টা। এরাই ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের সর্ব্বাধি-নায়ক ও ভাগ্য বিধাতা।

গণতান্ত্রিকতার মর্য্যাদাহানিকর স্বৈরতান্ত্রিকতা বা এক-নায়কত্ব ও সামরিকশক্তির অভ্যুত্থান। সাম্যবাদ বা কমিউ-নিজমের গতি হ্রাস। নানারাষ্ট্রে কমিউনিষ্টদের দুর্ব্বলতা, পতন ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণতি। বহু রাষ্ট্রের রাজসিংহাসন ও রাজ বংশের উচ্ছেদ। ব্যবসা বাণিজ্যের দুরবস্থা ও তজ্জনিত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিশ্বের নায়ক পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রংশ, চিত্তবৈকল্য, দ্বন্দ্বকলহ, দম্ভ ও আস্ফালন, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের বিলুপ্তি হেতু বিশ্বজনসমাজের চরম দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ। খাদ্যাভাব ও অর্থসঙ্কট। বিশ্বমানবসমাজপতিদের স্বার্থগৃধ্নুতা, হঠকারিতা ও অহংমন্যতা হেতু পৃথিবীর ভাগ্যাকাশের ওপর ঘনঘটাচ্ছন্ন কাজল মেঘের উপদ্রব। পৃথিবীর বহুস্থানেই তাণ্ডবনৃত্য। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রাধিনায়কগণের তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে লঙ্কাকাণ্ডের উদ্ভব। কতিপয় রাষ্ট্রে কমিউ-নিষ্টদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রচার। ভারতে পঞ্চম বাহিনীর গুপ্ত কার্য্যকলাপ, সামান্য অর্থের প্রলোভনে ভারতের স্থানে স্থানে কিছু কিছু লোকের দেশঘাতী নীতির অনুসৃতি, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ, ভারতের আভ্যন্তরীণ গৃহ-শত্রুদের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত সক্রিয়তা ও প্রকাশ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। বিশ্বের নেতৃ-স্থানীয়দের মধ্যে মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ। স্বর্ণ সম্বন্ধে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলতা।

জুলাই মাস যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দ্দিন। এ সময়ে চীনভারত যুদ্ধে আমেরিকার ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ এবং নিজেকে রণক্ষেত্রে জড়িত করে গণতন্ত্রের জয়-সাধনের প্রচেষ্টা। এ সময়ে প্রচণ্ড আঘাতে উৎক্ষিপ্ত কমিউনিষ্ট চীনের মধ্যে প্রচণ্ড আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ ব্যাপক ও প্রসারিত। বিদ্রোহ দমনের জন্য কমিউনিষ্ট চীন কর্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে নৃশংস পশু-শক্তি প্রয়োগ। মে মাসে ভূমিকম্প। জাপান ও পারস্য ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হবে।

বহু জনসমাজ ও জনপদের ধ্বংস, বহুপ্রাণীর অস্তিত্ব লোপ, বহুদুর্ঘটনায়, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে পৃথিবীর অনেক দেশ অশ্রুভারাতুর হবে। বিমান দুর্ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য।

মূল চীনভূমির ওপর ফরমোজার আক্রমণ অনিবার্য্য। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গৌণ এবং সামরিক সুদৃঢ় প্রস্তুতি মুখ্য হবে। ভারতের কর্ণধারগণ এরূপভাবে স্বদেশকে গঠন করবেন যাতে পৃথিবীর কোন জাতির লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ে ভারত আর কোন মতে না বিপন্ন হয়। কমিউনিষ্ট চীনের মঙ্গলের দশা শেষ হবে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় পর্য্যন্ত অধিকতর বিস্তৃতি সাধন ও আক্রমণই হবে চৈনিক লক্ষ্য। ভারতের শনির দশা ত্যাগের সময় আসন্ন, গ্রহটী ত্যাগের পূর্ব্বে বিশেষভাবেই মানুষের মুণ্ডপাত করে যায়, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। শ্রীমতী বেসিলিও তাঁর Planatary Influence গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"...But saturn, mighty and profound Minister of the Darkness, works with a deep love to chasten and to subdue, to awaken the sleeping Inner One, because he knows that in the hour of the deepest woe he is bringing the light of the father to the soul. অতএব দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে শনি আমাদের পুড়িয়ে খাটি সোনা করে দিয়ে যাচ্ছে। ভারত খাটি সোনা হয়ে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে সমগ্র পৃথিবীর কাছে অন্তরের অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। ভারত হবে বিশ্বের অধ্যাত্ম-গুরু—সেই দিন হতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে। সমগ্র পৃথিবী জড়বিজ্ঞানবাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে চল্‌বে অনাদি অনন্ত সৌন্দর্য্যের তীর্থযাত্রী হয়ে।

বর্ত্তমান বর্ষে ভারত সরকার সুদৃঢ়ভাবে বিশেষজ্ঞ দেশ-প্রেমিকদের নিয়ে পুনর্গঠিত হবে, পরিচালনাও হবে সুসংযত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। এ বৎসর দৈবদুর্ব্বিপাকে কিছু কিছু অপ্রিয় দুঃসংবাদ প্রাপ্তি ঘটলেও আমাদের যুদ্ধের পরিণতি যে বিজয় গৌরবে পর্য্যবসিত হবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে দুঃখ কষ্ট বেদনা শোক ও অর্থ কৃচ্ছ তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, মাতৃভূমির রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ ও দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে। কয়েকটি যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হোলেও যখন জয় সুনিশ্চয়, তখন কোন প্রকার চাঞ্চল্যের অবকাশ নেই—বীর্য্যবিশ্বাস ও ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ দুঃসময়ের একমাত্র মহৌষধি।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না এ বর্ষে, কেবল জটলাই হবে, ব্যাপারটা ধামাচাপা থাকবে। পাকিস্থানের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে যে ভারতের সঙ্গে হাতে হাত মিলানো ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তার আকস্মিক মনোভাবের পরিবর্ত্তন ও সদিচ্ছা ভারতকে বিস্মিত করে তুলবে। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের অবস্থা খারাপ হবে, হ্রাস পাবে তাঁর দম্ভস্ফীত স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শক্তিমত্ততা।

সিংহলের রাজনৈতিক বিপর্য্যয়, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের প্রাধান্যের হ্রাস। অনিশ্চয়তার ঘূর্ণী-বাতাসে বিপন্নতার সম্মুখীন হবেন সদল বলে শ্রীমতী বন্দরনায়েক। সিংহলের রাজনৈতিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে জ্বলে উঠবে খাণ্ডবদাহী আগ্নেয় ঝটিকা। বিপ্লব, লুঠতরাজ, নরহত্যা প্রভৃতি সিংহলকে বিক্ষিপ্ত করবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে রণলিপ্ত হবে। বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট বাক্ সর্ব্বস্ব হবেন না, সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করে মার্কিন শক্তির বৈশিষ্ট্য আবার বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরবেন। গত যুদ্ধের সময় রুজভেল্টের রণলিপ্ত হবার পূর্ব্বের অবস্থার মত প্রত্যক্ষ হবে মার্কিণ রাজনৈতিক ভাবপ্রবাহের গতিবেগ। ক্রুশ্চেভের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমেই খর্ব্ব হয়ে আসবে ঘরে বাইরে, বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে তিনি বিপর্য্যয়গ্রস্ত হবেন। যদি কোন রকমে তিনি আগামী মে জুনের পরও বিরুদ্ধ শক্তিকে দমিত করে নিজে সবল হয়ে উঠ্‌তে পারেন, তা হোলে তাঁর দ্বারা ভারতের বহু মঙ্গলসাধন হবে। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে রাশিয়া চীনকে সমর্থন করবে। ১৯৬৩ সাল রাশিয়ার পক্ষে শুভ নয়। ক্রুশ্চেভ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ফাঁড়া কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হোতে পারে। চীনের জনশক্তি দুর্ভিক্ষের তাড়নায়, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে, অভাব অনটনে আর গৃহচ্যুত অবস্থায় হাহাকার করবে, তার ওপর চৈনিক শাসকবৃন্দের পাশবিক অত্যাচার তো আছেই।

ব্রিটিশের আর্থিক সঙ্কট, তদুপরি তার ঘরেবাইরে বিশেষতঃ উপনিবেশগুলিতে অশান্তি। তার রাষ্ট্র শাসনের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন, সাধারণ বাজারে তার প্রবেশ, চীনের সহিত তার গণ্ডগোল প্রভৃতির সম্ভাবনা। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি। আলজেরিরা ও কঙ্গোতে শান্তি শৃঙ্খলার অভাব। মে জুনে বার্লিন সমস্যা গুরুতর। এজন্য বিশ্বশান্তিভঙ্গের সূচনা হবে। গুরুতর দাঙ্গা হাঙ্গামায় বার্লিন রাজপথ রক্তস্নাত হবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় সম্প্রীতি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক গোলযোগ, জন-উত্তেজনা এবং শাসনের বিশৃঙ্খলা। বিশ্বের আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কট ও দুর্যোগ পরিস্থিতির জন্য তার অদৃষ্টেও দুভোগ আছে। রাষ্ট্রীয় শোক ও বিপত্তিতে ভাবাতুর হবে জাপান।

বর্ম্মার চৈনিক প্রীতি ও বন্ধুত্ব হ্রাস হবে। বর্ম্মার আভ্যন্তরীণ সমস্যা গুরুতর। জেনারেল ন্যু উইনের অপসারণের ব্যবস্থা হবে। কেনিয়া ও রোডেসিয়ার অবস্থা গুরুতর হবে। চীন-ভারত সংগ্রামে প্রেসিডেণ্ট নাসের ভারতের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়বে। তাঁর বিরুদ্ধে একদল ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবে। চল্‌বে বিদ্রোহ। ইরাকের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন ও রক্তস্নাত শাসনের সমাধি।

আরবদের মধ্যে চল্‌বে দ্বন্দ্বকলহ, আরব জগতের নেতৃত্ব নিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেবে। ঘনার আভ্যন্তরীণ শান্তি ব্যাহত হবে। নক্রুমার হত্যার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাবে। কিউবা ও আর্জ্জেন্টিনায় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা হবে। ভূমিকম্পেরও সম্ভাবনা।

এ বৎসর সমগ্র পৃথিবী বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে। কিউবা বার্লিন রাজনৈতিক কৌশলজাল এরূপ বিস্তৃত হয়ে পড়্‌বে যাতে করে দেখা যাবে রাশিয়া ও আমেরিকা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমালিঙ্গন কণ্টকবিদ্ধ। আগামী তৃতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ হবে না। নিরস্ত্রীকরণের প্রসঙ্গ থেমে যাবে। পৃথিবীর দুই একটি মহান্ নেতার তিরোধান। ন্যাটোর শক্তি দৃঢ় হবে। জাতিপুঞ্জের প্রভাব আরও খর্ব্ব হবে। ন্যাটোও পৃথিবীর নানা অশান্তির স্রষ্টা হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে মধ্য এশিয়ায় এবং উত্তর ভারতে শনির প্রকোপে অধিবাসিগণ নানাপ্রকারে বিধ্বস্ত হ'বে। গুরুতর মহামারীর বিস্তৃতিতে বহুলোক ক্ষয় হবে। শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে। ২০শে মে পর্য্যন্ত আর্থিক ও সামাজিক স্তরে সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব। বহু পরিবারের অনাহারে ও অর্দ্ধাশনে দিনযাপন। বৃষ্টিপাত অল্পই হবে। বর্ষা তেমন হবে না। খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। পশমের দর চড়বে। স্বর্ণাদি ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। জামাকাপড় মহার্ঘ্য হবে। অষ্টগ্রহ-সম্মেলনজনিত দুর্দ্দশা ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ তখনও চল্‌বে। আরও ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ এ বৎসরও লক্ষ্য করা যাবে। সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে দুর্নীতির বিশেষ বৃদ্ধি, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুদ্গীরণ হবে। কিউবা, বার্লিন ও মধ্য এশিয়াকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুরন্ত ঝটিকা।

পৃথিবীর আসন্ন সঙ্কট দুর্য্যোগে ভগবানের কাছে বিশ্ব-শান্তি ও ভারতের সুখসমৃদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার বিপন্মুক্তির প্রার্থনা করি।

——

মেষ লগ্ন

(দ্বাদশভাবে শুক্রের অবস্থানহেতু
ফলাফল ভৃগুসংহিতানুসারে)

লগ্নে শুক্র থাকলে উত্তম বৃত্তি, উত্তম অর্থোপার্জ্জন, সুন্দরী স্ত্রী, কর্ম্মনৈপুণ্য, পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও সম্মান প্রাপ্তি ঘটে। উচ্চ সামাজিক আদর্শ। কলা ও শিল্পের দিকে ঝোঁক। ব্যবসায়ে দক্ষতা। লোকপ্রিয়তার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ। দ্বিতীয় স্থান বৃষে থাকলে অর্থের প্রাচুর্য, বৃহৎ পরিবারভুক্ত, নানা ধরণের বৃত্তি বা পেশা, বুদ্ধিবলে উপার্জ্জনক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে অর্থ সঞ্চয়, অর্থের আনুকুল্যে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার স্বচ্ছন্দ গতি, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, সম্মান লাভ, প্রণয়ের ব্যাপারে খ্যাতি, কর্ম্মে আনন্দ, বার্দ্ধক্যেও যৌবনের ভাব। তৃতীয় স্থান মিথুনে থাক্‌লে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন,

উত্তম বৃত্তি বা পেশা, ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহ লাভ, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী স্ত্রী, কর্ত্তব্যবোধ, ধর্ম্মপ্রবণতা, আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান ও চতুরতা। জীবনে দুটি প্রেমের ব্যাপার। কর্ম্মদক্ষতার জন্য খ্যাতি। প্রভাব প্রতি-পত্তি সম্পন্ন ও সুন্দর। চতুর্থ স্থান কর্কটে থাকলে সুদর্শন, সম্মানিত, ধনবান, মাতা ও পরিবারবর্গের স্নেহ-প্রীতি লাভ, গৃহ সম্পত্তি সুখ, রাজসরকারে ও সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, দাম্পত্য সুখ, আহার বিহারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, গুপ্ত প্রণয়ে আনন্দ, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিভূতি লাভ, মৃত্যুকালে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, দেনা-পাওনার ব্যাপারে সৌভাগ্যশালী। পঞ্চম স্থান সিংহে শুক্র থাকলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য ও শিল্পকলা সাহিত্য সংক্রান্ত পেশা, সহজ অর্থাগম, স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে মতের অমিলজনিত অশান্তি, কামপরায়ণ, শিক্ষিত, স্বাধীন প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ার সাহস। আমোদপ্রিয়তার জন্য কর্ম্মের ক্ষতি॥ ষষ্ঠস্থানে কন্যায় শুক্র থাকলে অর্থ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা, পারিবারিক ক্ষতি, স্ত্রীর জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য ও উদ্বিগ্নতা, জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা হেতু যৌন সম্ভোগে অসাফল্য, অতি কষ্টে কর্ম্মসিদ্ধি, ব্যয়াধিক্য, ঋণজালে জড়িত, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে আশাভঙ্গ বা মনোকষ্ট, তুলায় সপ্তম স্থানে শুক্র থাকলে উত্তম বৃত্তি বা পেশার আনুকুল্যে অর্থপ্রাচুর্য্য, সুন্দরী স্ত্রী, ধনী শ্বশুর। স্ত্রীর একনিষ্ঠ ভালোবাসায় সুখ লাভ, পারিবারিক শান্তি, সম্মান লাভ, পার্থিব সুখসম্পদ, প্রবল যৌন আকর্ষণ, অল্প পরিশ্রমে উপার্জ্জন, শিল্পকলা সাহিত্য কাব্যের প্রতি আকর্ষণ। অষ্টম স্থান বৃশ্চিকে শুক্রের অবস্থিতি ধনৈশ্বর্য্যের পক্ষে দুর্ব্বলতার কারক, পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন, বৈদেশিক সাফল্য লাভ, স্ত্রী বিয়োগ, পারিবারিক অশান্তি, স্ত্রীর প্রভাব খুব কম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা মৃত্যুর কারণ। নবম স্থান ধনুতে শুক্র থাকলে উত্তম পেশা থেকে ধনসম্পদ, সৌভাগ্য লাভ, পেশায় উত্তরোত্তর উন্নতি, ভাগ্যবতী উত্তমা স্ত্রী, ধর্ম্মপ্রবণতা ইন্দ্রিয়সংযমী, চতুর, সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি। মকরে দশমস্থানে শুক্র থাকলে উচ্চপদস্থ বা উচ্চ বৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি হয়, মর্য্যাদার সহিত অর্থোপার্জ্জন, পিতৃক্ষেত্র হোতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা উত্তমা স্ত্রী, যৌন সম্ভোগে তৃপ্তি, গৃহ ও ভূসম্পত্তি, পারি-বারিক মর্য্যাদা, মাতৃপক্ষের সুখ, গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে বন্ধু বিচ্ছেদ, নিজের কার্য্যক্ষমতায় উন্নতি ও আনন্দ, কোন বান্ধবীর মৃত্যুতে আশাভঙ্গ ও ক্ষতি। একাদশ স্থান কুম্ভে শুক্র থাকলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রীর আনুকুল্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, পারিবারিক শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ, মনোমত কর্ম্ম প্রাপ্তি, নিজের বংশ গৌরবের জোরে বহু বন্ধু লাভ, কোন গুপ্ত প্রেমের জন্য অপবাদ। দ্বাদশে মীন রাশিতে শুক্র থাকলে ব্যয়াধিক্য, পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের হ্রাস, প্রেমের ব্যাপারে নিষ্ঠার অভাব, গুপ্তপ্রেমের দিকে ঝোঁক।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে মধ্যম, ভরণীজাতগণের পক্ষে উত্তম এবং কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। বায়ু, স্নায়ু ও প্রদাহজনিত পীড়ার কারকতা আছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভালো বলা যায়না। চাকরিক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্ত্তন-যোগ। আর্থিক উন্নতি, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, নূতন কর্ম্মপ্রাপ্তির আশা। ব্যবসার ক্ষেত্রেশুভ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। গুপ্তপ্রণয়ে সাফল্য, সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুখস্বচ্ছন্দতা, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে উত্তম, রোহিণী নক্ষত্রজাত-গণের পক্ষে মধ্যম, মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। দেশ-ভ্রমণ, গুরুজনহানি,স্ত্রীর সহিত বারম্বার মতভেদ ও মনান্তর-জনিত অশান্তি। সাময়িক পীড়া, ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা। আর্থিক উন্নতি, বামপদে আঘাত, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকেয় পক্ষে বিশেষভাবে প্রতারিত হওয়ার যোগ। পরপুরুষের সান্নিধ্যে সুখ সম্ভোগ। পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা দাম্পত্য কলহ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম, আর্দ্রার পক্ষে মধ্যম, পুনর্বসুর অশুভ। স্বাস্থ্যের অবনতি, অনেক কাজ অসমাপ্ত থাকবে। সন্তানের আংশিক উন্নতি, ভাগ্যোন্নতির সূচনা, নিকটাত্মীয়ের মারাত্মক পীড়াযোগ, নূতন কোন পরিকল্পনার বৃহৎ যোগাযোগের সম্ভাবনা, ধনভাব শুভ, নূতন সম্পত্তি লাভের যোগাযোগ, ব্যবসা ক্ষেত্রে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ পরিস্থিতি। গুপ্ত প্রণয়ের সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র চলন-সই, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও পুষ্যার পক্ষে শুভ, অশ্লেষার পক্ষে ভালোমন্দ মিশ্র। স্বাস্থ্য ভালো যাবে, স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি, দাম্পত্য কলহ, ভ্রাতৃবধূর মারাত্মক পীড়া যোগ, প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে সাফল্য, কোন নারীর নিমিত্ত অনিষ্টযোগ, আয় স্থান শুভ, বৃহৎ গোলযোগের মাধ্যমে উন্নতি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। মামলা-মোকর্দ্দমা। চাকুরিজীবীর পক্ষে নানা ঝঞ্ঝাট, ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে চরিত্র রক্ষা শিথিল হোতে পারে—শুভাশুভ, আকস্মিক বিপদ, পরকীয় প্রেম, প্রণয়ীর সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদ, নানা প্রকার অশান্তি, অর্থ ও অলঙ্কার লাভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীর পক্ষে উত্তম, উত্তরফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম, মঘার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, মধ্যে মধ্যে শারীরিক কষ্ট, গুরুস্থানীয়ের পক্ষে মারাত্মক পীড়াযোগ, অর্থোপার্জ্জনের যোগাযোগ, ধনভাব মধ্যম। চাকুরি ক্ষেত্রে শত্রু ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তির ষড়যন্ত্র। বাসস্থান সংক্রান্ত গোলযোগ, ব্যবসায়ীর ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীগণের পক্ষে মধ্যম। বন্ধু দ্বারা ক্ষতি, প্রীতি-ভঙ্গ, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কন্যা রাশি

হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম, এবং উত্তরফল্গুনীর পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটি ভালো মন্দ মিশ্র ভাবে চলবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে শুভ। আয়স্থান উত্তম। সঞ্চয়ের যোগ। অপরের কাছে গচ্ছিত বা লগ্নীকৃত অর্থের ক্ষতি। সন্তানের পীড়াদি। গুপ্ত শত্রুর প্রভাব অধিক। অগ্রজ দ্বারা অশান্তি। জামাতা ও পুত্রবধূর রোগ ভোগ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ভূম্যাধিকারীর পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। দুষ্টলোকের প্রভাবের দ্বারা সন্তানের ক্ষতি। চাকুরিজীবীর পক্ষে প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র-কারীদের জন্য উন্নতির অন্তরায়। ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ। উপঢৌকনাদি প্রাপ্তি। চাকুরী-জীবী নারীর উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা রাশি

চিত্রার পক্ষে উত্তম, স্বাতীর পক্ষে মধ্যম এবং বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। যানবাহন ও ভৃত্য সংক্রান্ত গোলযোগ। স্ত্রীর পীড়া। অপরিমিত ব্যয়। ধনভাব শুভ। স্বজন বিরোধ। আত্মীয় বিয়োগ। সাংসারিক অশান্তি। সম্পত্তি বিষয়ে শুভ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উন্নতিতে বাধা। ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। দেশ ভ্রমণ। পারিবারিক অশান্তি। দাম্পত্যপ্রণয় ভঙ্গ। সমাজে প্রতিষ্ঠা। অর্থালঙ্কারাদি লাভ। বন্ধু দ্বারা অশান্তি। পর পুরুষের প্রলোভন জনিত মানসিক চাঞ্চল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখার পক্ষে মধ্যম, অনুরাধার পক্ষে নিকৃষ্ট এবং জ্যেষ্ঠার পক্ষে উত্তম। রক্তবিকার ও চর্ম্মপীড়াদির সম্ভাবনা, ঊর্দ্ধবায়ু প্রকোপ, বক্ষঃস্থলে বেদনা। পারিবারিক শান্তি। ভ্রমণ। সম্মানবৃদ্ধি। আয়স্থান শুভ। অনেক অসমাপ্ত কর্ম্মের সমাধান। স্ত্রীর সহিত কলহ। মামলা মোকর্দ্দমা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর

পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

ধনু রাশি

মূলাজাতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মধ্যম, পূর্ব্বাষাঢ়াগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক অবস্থা মধ্যম। রক্তচাপবৃদ্ধি। উদর, ফুস্‌ফুস্‌ ও চক্ষু আক্রান্ত হবার যোগ। শস্ত্রাঘাতের আশঙ্কা। দুর্ঘটনার ভয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতার জন্য অশান্তি। আর্থিক অবস্থা দুর্ব্বল। ব্যয়াধিক্য। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ বলা যায় না, পরিবর্ত্তনশীল। অস্থায়ী কর্ম্মীর বেকার হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে পরকীয় প্রেম বর্জ্জনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকা ভালো। সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্র প্রীতিপ্রদ নয়। বিদ্যাচর্চ্চায় লিপ্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত জাতকের পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম এবং শ্রবণাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। উদর-পীড়া, অজীর্ণতা, শূলবেদনা প্রভৃতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে চক্ষু পীড়া। গৃহে ঐক্যভাবের অভাব। পরিবারের বাইরের স্বজনদের জন্য কষ্ট ভোগ। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। মধ্যে মধ্যে অর্থের জন্য দুশ্চিন্তা। ভ্রমণকালে, প্রতারণায় এবং প্রলোভনে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায়না। উত্তরাধিকারিত্বের পক্ষে বাধা বিপত্তি। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও শুভ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সুখস্বচ্ছন্দতা। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট, শতভিষার পক্ষে উত্তম। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে। উদর ও চক্ষুপীড়া। পিত্তপ্রকোপ। পারিবারিক কলহ। নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে কলহ। দুশ্চিন্তা। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়। অর্থ এলেও থাকবে না, ব্যয় হয়ে যাবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। কষ্টপ্রদ ভ্রমণ। চাকুরীর ক্ষেত্র ভালোমন্দ মিশ্র। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুকুল, বিশেষতঃ যারা চাকুরিজীবী ও শিল্প কলা সঙ্গীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রীতিপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে উত্তম। রেবতী জাত-পক্ষে নিকৃষ্ট, পূর্ব্বভাদ্রপদগণের পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না। সন্তানদের পীড়া ভোগ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দিকে শুভ। আমোদ প্রমোদ। ভ্রমণ। প্রণয়ে সাফল্য। উৎসব অনুষ্ঠান। খ্যাতি প্রতিপত্তি। আর্থিক অবস্থা উত্তম। নানা প্রকারে আয়বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। স্বাস্থ্যোন্নতি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি। অবৈধ প্রণয়ে পরপুরুষের সাহচর্য্যে বিশেষ সাফল্য। চিত্রতারকাদের পক্ষে উত্তম মাস। সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীর খ্যাতি প্রতিপত্তি। ভালোবাসার পক্ষে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য সময়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন! বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন—

নিজের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা। অস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ। প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যাভাব শুভ। আশ্রিত প্রতিপাল্যের জন্য অর্থব্যয়। আর্থিকক্ষেত্র

আশাপ্রদ। ব্যয় প্রবণতা। পত্নীর পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

স্বাস্থ্যহানি। আমোদ প্রমোদে ব্যয়। বুদ্ধি কৌশলে উপার্জ্জন। ধনাগম আশাপ্রদ নয়। বৈষয়িক ব্যাপারে বিভ্রাট। চাকুরিক্ষেত্র শুভ। কর্ম্মস্থানে মুরুব্বির সাহায্য-লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মিথুন লগ্ন—

শারীরিক অবস্থার অবনতি। অপরিমিত ব্যয় ও তজ্জনিত ঋণযোগ। সন্তানের বিদ্যায় উন্নতি। মাতার স্বাস্থ্য ভালো যাবে। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। কর্ম্মোন্নতি। সাধারণের কাজে আনন্দ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

কর্কট লগ্ন—

নাড়ীমণ্ডলের পীড়া। নিজের হঠকারিতার জন্য অশান্তি। উদ্ধত শত্রুর দ্বারা অপবাদপ্রচার। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক কার্য্যে যোগদান। নূতন কর্ম্মে অর্থ বিনিয়োগ-জন্য ক্ষতি। দাম্পত্য প্রণয় যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালো বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

সিংহ লগ্ন—

পিত্তাধিক্য। শরীর ভালো বলা যায়। পিতার শারীরিক অসুস্থতা। মিত্র লাভ। গুপ্তপ্রণয়ে আনন্দ। কাজে অবহেলার জন্য আশাভঙ্গ, আমোদ প্রমোদ বা বিলাসিতার জন্য ব্যয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যা লগ্ন—

স্নেহপ্রীতি ব্যাপারে দুঃখ। আশা ভঙ্গের জন্য শারীরিক অসুস্থতা। সন্তানের উচ্চ বিদ্যালাভে অন্তরায়। ভাগ্যোন্নতি, সাধারণের কাজে আনন্দ। দেনা পাওনা ব্যাপারে ঝঞ্চাট। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন—

পারিবারিক অশান্তি। মানসিক উদ্বেগ। স্বাস্থ্য-হানি। কোন গুরুজনের মৃত্যুতে আশাভঙ্গ। কাজকর্ম্মে শৃঙ্খলার অভাব। খ্যাতিলাভের ইচ্ছা, কিন্তু সুযোগের অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক লগ্ন—

আত্মকেন্দ্রিতার জন্য নানা রকম দুঃখ, অর্থাগম, বায়ু-প্রকোপ, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, সম্বন্ধুলাভ, পত্নীর শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে, ধর্ম্মভাবের প্রবণতা, কর্ম্ম-ক্ষেত্র শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, মিত্রলাভ, তীর্থ-পর্য্যটন, সন্তানের ব্যাপারে আশাভঙ্গ, বান্ধবীর সাহায্য-লাভ, পদপ্রাপ্তি, গৃহভূমির ব্যাপারে বিবাদ ও ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। স্ত্রীর পীড়া, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অপরিমিত ধনক্ষয়, বিদ্যোন্নতিযোগ, সাময়িক ঋণযোগ, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি, সঞ্চয়ে অক্ষমতা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ লগ্ন—

পারিবারিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা, দৈহিক ও মানসিক পীড়া, ধনাগম যোগ, মিথ্যা লোকনিন্দা, অর্থাগম, বিদেশ-ভ্রমণ যোগ, সন্তানদের লেখাপড়ার উন্নতিযোগ। স্ত্রী-লোকের পক্ষে মধ্যম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

মীন লগ্ন—

বেদনাসংযুক্ত পীড়া ভোগের আশঙ্কা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্থব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। পুত্র-কন্যার বিবাহ বা বিবাহ আলোচনা, স্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্য, ভাগ্যোন্নতি, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বোমা

স্নুনন্দ

There are no tales finer than those created by life itself (Hans Anderson).

বাস্তব জীবনের কাহিনী অপেক্ষা স্নুন্দর গল্প আর কি থাকিতে পারে ?

১৯৪৪ সাল। ইংরেজ ও আমেরিকার অতিকায় বোমারু বিমান রেঙ্গুনের উপর নিত্য হানা দিচ্ছে। সেদিন দুপুর বেলায় এইরূপ একদল বিমানবহর প্রচণ্ড তেজে আক্রমণ ক'রলো রেঙ্গুনের উপর—অজস্র বোমা বর্ষণ করে ফিরে গেল। কত লোক হতাহত হ'লো তার ইয়ত্তা নেই। সাতদফা আক্রমণ চল্‌লো আই. এন. এর সদর হাসপাতালের উপর। কত রোগী ম'রলো বোমার আঘাতে, কত ম'রলো অগ্নিবোমার আগুনে পুড়ে ও কতক ম'রলো জলে ডুবে—যারা আগুনের ভয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল পুকুরে। এই নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ফিরে গেল বিজয় গর্বে। ভারতীয় রেডিওতে শুনলাম তারা জানিয়েছে যে প্রত্যেকটি বোমা নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পড়েছে। লক্ষ্যটা কি ছিল, অবশ্য তা জানি না, কিন্তু প্রকৃত যা ঘটেছিল দেখলাম স্বচক্ষে। সমস্ত হাসপাতাল ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

পরদিন সকালেই আবার এলো—পাঁচ দফা অতিকায় বোমা নিক্ষেপ ক'রে ফিরে গেল। এদিনকার লক্ষ্য কি ছিল জানিনা, কিন্তু বোমা পড়লো সবগুলিই ডাফ্‌রিণ হাসপাতালের চতুস্পার্শ্বে। তারি মাঝখানে ছিলাম আমি। ভাগ্যফলে মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গেলাম।

বাইরে এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তার বর্ণনা করা যায় না। হাসপাতালের চারিপার্শ্বে গাছপালা, বাড়ী-ঘর, দালান, রাস্তা সমস্ত বিধ্বস্ত হয়ে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়েও এতখানি তছনছ হয় কিনা সন্দেহ। এম্বুলেন্স এলো, ফায়ারব্রীগেড এলো, সিভিল ডিফেন্স দল এলো। তারা গাছ কেটে, মাটি সরিয়ে, ইট তুলে রাস্তা বার ক'রলো,—আর বার ক'রলো ছিন্ন হাত, ছিন্ন পা, কিম্বা ছিন্ন মুণ্ড—ছোট্ট একটু বাচ্চা। কারো হাত কাটা, কারো পা কাটা, কারো বা মুখ থেঁতলে গিয়েছে। কোথাও বা একপিণ্ড মাংস ও কয়েক টুকরা হাড় তার মানব জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আমরাও লেগে গেলাম মাটি খুঁড়তে, জঞ্জাল সরিয়ে মানুষ খুঁজতে—যারা এখনও জীবিত আছে আবর্জনার নীচে, উৎপাটিত বৃক্ষের তলায়, কিম্বা ভগ্ন-গৃহের মধ্যে। শুনতে পেলাম কোথাও একটু ক্ষীণ নিশ্বাসের শব্দ, কিম্বা একটু গোঙানি, অথবা কাতর ক্রন্দন। কোথাও বীভৎস চিৎকার, কোথাও আর্তনাদ! মাটি খুঁড়ে, গাছপালা সরিয়ে বের ক'রতেই হ'য়ে গেল অনেকের জীব-নলীলা শেষ!

তারই মধ্যে পেলাম এক বৃদ্ধার দেহ—তখনও তার মৃত্যু হয় নাই,—শ্বাস তখনও কিছু আছে। মুখে একটু জল দিতে গেলাম, গড়িয়ে পড়লো চুয়াল বেয়ে; চোখ মেলে একবার তাকালো। দুই বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চোখ বেয়ে। নালিশ নয়, কাতরতা নয়,—বিভ্রান্ত সে চাহনি—কি মর্মান্তিক! পর মুহূর্তেই হেলে পড়লো মাথাটা, নিস্তার পেলো সব যন্ত্রণার হাত থেকে! কিন্তু সে দৃষ্টি গেঁথে গেল আমার অন্তস্থল ভেদ করে।

চোখের জল মুছে কর্তব্যের খাতিরে যেতে হ'লো তখুনি হাসপাতালে। এতক্ষণ সেখানে মরসুম পড়ে গিয়েছে আহতদের। বিরাট হলে এনে ফেল্‌ছে তাদের এম্বুলেন্স ও ফায়ার-ব্রীগেডের দল। রক্তের বন্যা ভাসিয়ে দিয়েছে—জমে থক্ থক্ ক'রছে সারা মেজেটা। কেহ ক'রছে

আর্তনাদ, কেহ ক'রছে নীরব ক্রন্দন। কারো হাত নাই, কারো পা নাই, কারো পেট চিরে বেরিয়ে পড়েছে অন্ত্রস্থলি। কেহ মৃত, কেহ অর্ধমৃত, কেহ নিচ্ছে জীবনের শেষ নিশ্বাস; কেহ চাইছে জল, কেহ চাইছে মৃত্যু—চিৎকার করে বলছে—"আমাকে মেরে ফেলো, আমি আর পারছি না।" ভগবানের অশেষ দয়া যাদের উপর, তারা আছে অজ্ঞান হ'য়ে। এরই মধ্যে দেখলাম এক মর্মবিদারক দৃশ্য। অল্পবয়স্কা একটি মহিলা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, তার তারই বুকের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে একটুখানি ছোট ছেলে স্তন মুখে দিয়ে দুধ টেনে বের ক'রবার চেষ্টা করছে—ছেলেটার একটা পা উড়ে গেছে। দুধ না পেয়ে কেঁদে উঠছে। আবার চেষ্টা ক'রছে, আবার কাঁদছে—বেদনার জন্য নয়, ক্ষিদের জন্য! হাতে দিলাম একখানা বিস্কুট—কী তার আনন্দ! হেসে উঠলো খিল খিল ক'রে! কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে গেল একটু পরেই।

পাঠ্যপুস্তক সংকলয়িতাদের অবিমৃষ্যকারিতা

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পঠদ্দশায় বাঙলা সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক (text book) বলতে দুখানি বই বোঝাত—একখানি গদ্যের, একখানি পদ্যের। তারপর শিক্ষকদশায় উন্নীত হয়ে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে দেখে আসছি যে পাঠ্যপুস্তক মাত্র একখানি—যার বেশীর ভাগই গদ্য। কম ভাগ পদ্য। ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকও গদ্যেপদ্যে রচিত হয়, সুতরাং এরূপ মিশ্রিত পাঠ্যপুস্তক রচনার পদ্ধতি বিলাত হতে আমদানী। এই ধরণের পাঠ্যপুস্তকের বিশেষত্ব হল, গদ্যগুলি বা পদ্যগুলি সংকলনকারীর নিজস্ব নয়, অতীতের নামকরা লেখকদের বা বিখ্যাত কবিদের পুস্তক হতে ধার করা। অবশ্য যে-সকল সংকলয়িতা নিজেরাই লেখক বা নিজেরাই কবি, তাঁরা নিজেদের এক-একটা রচনা বা কবিতা নিজ নিজ পুস্তকে সাঁধ করিয়ে দেন। পরের লেখা বেশীর ভাগ থাকে বলেই এঁদের আর গ্রন্থকার বলা চলে না, বলতে হয় সংকলনকারী বা সংকলয়িতা, বা রচয়িতা।

এই সব পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতারা 'টেক্‌স্ট্‌ বুক্ কমিটি' নামক আধা-সরকারী সংস্থার অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হন, আবার বাজারে পুস্তকখানির কাটতির জন্য নিজ নিজ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিও প্রয়োগ করতে চেষ্টিত হন। তাঁরা দেশের যুগোপযোগী আবহাওয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সামাজিক, কি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে—যখন যেদিকে বাতাস বইতে থাকে তাঁরা সেই দিকেই হাল চালনা করেন।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা বলছি। তখন আবহাওয়া ছিল বিলাত-মুখো, অর্থাৎ ইংরেজ-প্রশস্তি। তাই পাঠ্যপুস্তক খুললেই দেখা যেতো গদ্যেতে ইংরাজের জয়গান বা গুণগান—আর পদ্যতে রাজারাণীর স্তুতি। এখনো মনে পড়ছে, ছাত্রদের ব্যাখ্যা করে দিয়েছি—

> "জয় জয় ভিক্টোরিয়া ভারতের রাণী।
> ধন্য তব শক্তি, মাগো! বলিহারি মানি॥"

এর পর এল স্বদেশী যুগ। তখন গদ্যাংশে বেরুতে লাগল, শিবাজী, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতির কীর্তি কাহিনী, ভারতীয় সাধু সন্তদের জীবনী, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা, ইত্যাদি। আর পদ্যাংশে দেখা দিতে লাগল—

১। যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি
ভারতবর্ষ, ইত্যাদি।

২। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়? ইত্যাদি।

৩। বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি।
কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন, উঠিল সে ধ্বনি ॥
ইত্যাদি।

৪। অয়ি ভুবন মনোমোহিনি, অয়ি নির্মল সূর্য-
করোজ্জ্বল ধরণি,
জনক—জননী—জননি! ইত্যাদি।

৫। বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার,
আমার দেশ, ইত্যাদি।

৬। বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার বায়ু,
বাংলার ফল, ইত্যাদি।

এই স্বদেশীযুগ যখন অগ্নিযুগে রূপায়িত হল তখন পাঠ্য-পুস্তকের পাতায় পাতায় গোটাকতক করে বিপ্লবাত্মক গদ্য-পদ্যও ছদ্মবেশে প্রকট হতে লাগল।

এর পর দেখা দিলে হিন্দু মুসলমান মিলনের যুগ অর্থাৎ মুসলমান-তোষণের যুগ। গদ্যাংশে বেরুতে লাগল—মহামতি আক্‌বরের নূতন ধর্ম প্রচার। কারবালার প্রান্তর, মামুদের ভারত বিজয়, মুসলমানদের সাম্যবাদের শ্রেষ্টত্ব, করিম নামক ছাত্রের বিদ্যানুরাগ আর ভুবন নামক ছাত্রের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা ইত্যাদি। আর পদ্যাংশে বেরুতে লাগল ছন্দোজ্ঞানবর্জিত হিন্দু-মুসলমান কবিদের অসার ও অশ্লীল কবিতা। বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত, নবম-দশম শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ সেদিনকার পাঠ্যপুস্তকে কোন এক মুসলমান কবির এমন এক অশ্লীল কবিতা বেরিয়েছিল, যা ছাত্রকে বোঝাতে শিক্ষকের মুখ রাঙা হয়ে যায়। অভিভাবকদের আন্দোলনে পরবর্তী সংস্করণে সে কবিতা বাদ পড়ল বটে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের চাপে শিবাজি-প্রতাপের কাহিনী বা দেব-দেবীর কাহিনী—যেমন যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পাঠ্যপুস্তকের পাতা হতে উধাও হয়ে যেতে লাগল।

মুসলমান সমাজের নাম-জাদা বাঙালী কবি, নজরুল ইসলামের কবিতাও পাঠ্য-পুস্তকের শোভাবর্ধন করতে লাগল বটে, কিন্তু হিন্দু-সংকলনকারীরা ঝোপ বুঝে কোপ মারবার জন্য নজরুল সাহেবের এমন-সব কবিতা বাছাই করতে লাগলেন, যাতে হিন্দু কৃষ্টি, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতার উপর তাঁর অনধিকারচর্চা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এখন চলেছে স্বাধীনতার যুগ অর্থাৎ সর্বভারতীয় জাতীয়তার যুগ। এখন পাঠ্যপুস্তকের নলচে-খোল প্রায় সবই বদলে যাচ্ছে। এখন সংকলয়িতারা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজ নিজ পুস্তক রচনা করতে লেগে গেছেন। বাঙলাদেশের শিক্ষানীতি যাঁরা পরি-চালনা করছেন তাঁরা সর্বভারতীয় বোধে উদ্বুদ্ধ, সুতরাং তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তকের লেখকরাও পুস্তকের নূতন ছাঁচ তৈরী করতে লেগে গেছেন। এখন স্রেফ্‌ হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে টুঁ-শব্দ করবার উপায় নেই, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত-সংস্কৃতির পরিচয় দিতে হবে। এখন, ‘বাঙলা এই, বাঙলা সেই, বলে চেঁচামেচি করলে চলবে না। সর্বদাই ‘ভারত’ নিয়ে কথা কইতে হবে। ছাত্র-গণের মধ্যে এমন ভাব ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের বাঙালী মনে না করে ভারতবাসী বলে মনে করে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের সংকলয়িতারা এই লক্ষ্যকে সুমুখে রেখে পাঠ-সংকলনে নিযুক্ত হয়েছেন।

এ ত ভাল কথা। এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হল আলাদা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, সংকলনকারীরা যখন নিজ নিজ পুস্তকে সাঁধ করিয়ে দেবার জন্য অতীতের প্রখ্যাত লেখকদের বা বিখ্যাত কবিদের লেখা বা কবিতা সঞ্চয়ন করতে বসেন, তখন সেই-সব গদ্য-পদ্য লেখকদের লেখায়, রচনায়, প্রবন্ধে, কবিতায়, কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেন কিনা—তা বানান-বিষয়ক হোক, বা শিরোনামা (heading) বিষয়ক হোক। অথবা, অতীতের লেখকের লেখনী প্রসূত কোন শব্দকে বদলে তাঁরা স্বকপোলকল্পিত নূতন শব্দ বসাতে পারেন কিনা, যাতে করে সমগ্র কবিতাটার মানে বদলে যেতে পারে, বা ছন্দের পতন ঘটতে পারে। আমার মনে হয় কোন সঞ্চয়নকারীর সে অধিকার নেই। আমার বক্তব্য কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দিতেছি।

৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের—

“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।”

—এমনকবিতার কি আর জুড়ী পাওয়া যায়? আর, এই কবিতা পড়েনি ও কণ্ঠস্থ করেনি এমন বাঙালী কে আছে? —কি যুক্তাক্ষরবর্জিত, সমস্ত-পদশূন্য পদাবলি! কি অনুপম সুললিত ছন্দ! কি অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি! আর কি নিপুণ হস্তের প্রভাব-প্রকৃতির বর্ণনা! "কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল"—আমরা ছাত্রদের বুঝিয়েছি—"এখানে 'সকলি' মানে, 'প্রায় সকলি'। কবিরা মাঝে মাঝে ভাবাবেগে এরূপ অতিশয়োক্তি করে থাকেন।"

এই ব্যাপার চলতে চলতে কোন বছর কোন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়াতে গিয়ে দেখি, সঞ্চয়নকারী উপযুক্ত ফুল দিয়ে সাজী ভরিয়েছেন বটে, কিন্তু "কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল"—এর পরিবর্তে লিখেছেন—"কাননে কুসুম-কলি কতুই ফুটিল!" একাধারে ছন্দোভঙ্গ আর খটমট উচ্চারণ! ভাবলুম, সংকলয়িতা কবিতা লেখকের একটা মস্ত ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। কবি যেন জানতেন না যে, ভোরবেলা সব কুঁড়ীই ফুটবে তার কোন মানে নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সংকলনকারীর এ অধিকার আছে কি না। বিখ্যাত ইংরাজ-কবি Wordsworthএর কবিতায়ও এমন অতিশয়োক্তির ছড়াছড়ি। তাঁর 'Daffodils' নামক কবিতা যুগে যুগে সর্বদেশে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ছাত্ররা পড়ে আসছে। সেথায়, এক জায়গায় লেখা আছে "ten thousands saw I at a glance!" কোন সংকলয়িতার এমন সাহস হয় না, যে 'ten thousands'কে বদলে 'many thousands বসিয়ে দেয়। টীকাকারদের বা অর্থপুস্তকরচনাকারীদের বোঝাতে হয়, 'এখানে কবির অতিশয়োক্তি। সত্যই তিনি দশ হাজার দেখেননি, অসংখ্য ফোটা ফুল দেখেছিলেন, তাই ভাবাবেগে বলেছেন দশ হাজার।'

তেমনি কোন কবিতার কবির স্বরচিত শিরোনামা পরিবর্তিত করবার অধিকারও কোন সংকলনকারীর আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আজকাল এরূপ দুঃসাহস আকছার দেখা যাচ্ছে। বিখ্যাত কবি কৃষ্ণচন্দ্রের একটি কবিতা ছাত্রাবস্থায় কণ্ঠস্থ করেছি এবং শিক্ষকরূপে ছাত্রদের বার বার পড়িয়েছি।

"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

সকল কবিই জানেন, শিরোনামা বা হেডিং যতই সংক্ষিপ্ত হয় ততই তার কদর বাড়ে। কবি মজুমদারও নিশ্চয়ই তা জানতেন। কিন্তু তবু তিনি উপরের কবিতাটির নাম দিলেন, "ঈশ্বর পরায়ণ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতি উক্তি।" হয়ত ছোট করা সম্ভব হয়নি বলেই এরূপ করেছিলেন। শিক্ষক জীবনের প্রথম পর্যায়ে এই শিরোনামার গভীর অর্থ ছাত্রদের বুঝিয়েছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে পদার্পণ করে হঠাৎ একদিন দেখি—কবির লেখা শিরোনাম উধাও হয়ে গেছে, আর তার স্থানে লেখা হয়েছে মাত্র একটি কথা 'মৃত্যু'। কবি যে মৃত্যুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করতে বসেন নি, কেবল গোটাকতক কথা শুনিয়ে দিয়েছেন—এ ধারণা সংকলয়িতা মহাশয়ের হয় নি। এখানেও Wardsworth এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তিনি একটি ছোট কবিতার হেডিং দিয়েছেন—Lines written on Westminister bridge—ছোট হেডিং দিয়ে ভাব প্রকাশ করতে পারেন নি বলে।* কোন ইংরাজ সংকলনকারী কি এই হেডিং পরিবর্তন করবার সাহস পেয়েছে? কিন্তু আমাদের বাঙালী সংকলনকারী এক সৃষ্টি-ছাড়া পুরুষ।

এর উপর প্রাচীন লেখক বা কবির নিজহাতে লেখা বানানকে উলটে পালটে দেওয়া অনেক সংকলয়িতার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। লেখক লিখেছেন, 'ক্রমশঃ' বা 'বাঙলা', সঞ্চয়নকারী লিখে বসলেন, 'ক্রমশ' বা 'বাংলা'। যুক্তি হল, বর্তমান লেখকদের (ঃ) বা (ঙ) লোপ করবার প্রবণতা। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন বেদকে পঞ্চতন্ত্রের ভাষায় লেখা যায় না, উপনিষদের ভাষায় "সত্যমেব জয়তে"কে সংস্কৃত ভাষায়, 'সত্য মেব জয়তি' করা চলে না। (এখানে একটি অবান্তর প্রসঙ্গের উল্লেখ করি। একবার কোন প্রকাশক I.A. 'নোট'বই লিখতে আমাদের উপর ভার দিয়েছিলেন। পাঠ্য পুস্তকখানির সংকলনকারী যে সে লোক নন, এক বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌। তিনি তাঁর পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খানিকটা লেখা তুলে দিয়েছিলেন। সেই লেখার মধ্যে এক স্থানে ছিল—

---

* আর একজন ইংরাজ কবি Keats এর কবিতার টাইটেল—On First Looking into Chapman's Homer.

"পুরাণ বাসন"। সংকলয়িতা মহাশয় পাদটীকায় লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগর মশাইএর বানান ভুল। 'পুরাণ' মানে একধরণের শাস্ত্রীয় বই, আর 'পুরান' মানে প্রাচীন। পড়ে আমার চক্ষু কপালে উঠিল! একদিকে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ, আর একদিকে অদ্বিতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্। কিন্তু আমার বিদ্যা বুদ্ধিতে জানা ছিল, 'পুরাণের মৌলিক অর্থই হচ্ছে প্রাচীন, আর গৌণ অর্থ হচ্ছে প্রাচীন কালের ঘটনা সম্বন্ধিনী আখ্যায়িকা। বুঝলুম ভাষাতত্ত্ববিদ্ মহাশয় 'পুরান' কথাকে 'পুরাতনের' অপভ্রংশ বলে মনে করেছেন। 'পুরাতন' আর পুরাণের প্রকৃতি এক হলেও প্রত্যয় আলাদা।)

এখানে তিনি বানান কাটতে সাহস করেন নি, কেবল পাদটীকায় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যাঁরা ফটফট করে প্রাচীন সাহিত্যিক বা কবিদের তথাকথিত ভুল বানান শুধরে দিয়ে বসেন তাঁদের কি বলব!

এইবার আমার প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করি।

গোড়ায় বলেছি বর্তমান যুগধর্ম হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। কি কিশোর, কি যুবক, সকলের অন্তরে যাতে সর্বভারতীয় জাতীয়তা-বোধ জাগরিত হতে পারে সে বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তকের রচয়িতারা সাবধান হয়ে উঠেছেন। এখন বাঙ্‌লার বৈশিষ্ট্য (যা অবশ্যই আছে), বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব (যা নিখিল ভারতে স্বীকৃত), বাঙলার ঐতিহ্য (যা চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতির অবদান)—এসব নিয়ে বড়াই করলে আর চলবে না, এখন প্রত্যেক বাঙালীকে ভারতীয় বলে মনে করতে হবে, এখন ভাব্‌তে হবে—একই ভারতীয় ঐতিহ্য কোথাও কম, আর কোথাও বেশী প্রকট। সুতরাং পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে এমন ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে বাঙালী ছাত্ররা কলিকাতার জন্য গর্ব না করে দিল্লীর জন্য গর্ব করে। বাঙ্‌লা ভাষার জন্য গর্ব না করে হিন্দী ভাষার জন্য গর্ব করে, কিম্বা রাইটার্স-বিল্ডিংএর জন্য গর্ব না ক'রে লাল কিল্লার জন্য গর্ব করে।

এসব ভাল কথা। কিন্তু বাঙলার প্রথম শ্রেণীর কবিদের যে গোটাকতক, বাঙালী জাতি বা বাঙলা ভাষায় প্রশস্তিবাচক অতুলনীয় কবিতা আছে তাদের গতি কি হবে? এরূপ গোটাকতক দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। রবীন্দ্রনাথের—

"বাংলার মাটী বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান।"

২। মধুসূদনের—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ,
পর দেশে ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

৩। দ্বিজেন্দ্রলালের—

"বঙ্গ আমার, জননি আমার, ধাত্রি আমার,
আমার দেশ।
কেন গো মা তোর মলিন বদন, কেন গো মা তোর
রুক্ষ কেশ?"

৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের—

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে।
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে, বরদ-বঙ্গে॥"

৫। অতুলপ্রসাদের—

"মোদের গর্ব মোদের আশা!
আমরি বাঙলা ভাষা!
তোমার বোলে তোমার কোলে কতই শান্তি
কতই আশা।"

এদের গতি কি হবে? ছাত্র সমাজ কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য এইসব উপাদেয় অমৃত-রসের আস্বাদ হতে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? একজন বাঙালী সংকলয়িতা এর চমৎকার উত্তর দিতেছেন। কথাটা খুলে বলি।

সেদিন Higher Secondary School-এর উচ্চ-শ্রেণীর এক পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা—

"বঙ্গ আমার জননি আমার, ধাত্রি আমার, আমার দেশ," ইত্যাদি। কিন্তু একি—দেখি! পাতায় উঠেছে—"ভারত আমার, জননি আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ ইত্যাদি" অর্থাৎ যেখানে-যেখানে 'বঙ্গ' কথা আছে সেখানে সেখানে বিদ্বান্ সংকলয়িতা 'ভারত' কথা বসিয়েছেন।" অর্থাৎ কবি যে উদ্দেশ্যে কবিতাটি লিখেছেন তার বিলকুল পরিবর্তন ঘটান হয়েছে এবং তার সঙ্গে ছন্দের মুণ্ডপাত করা হয়েছে! কবি বড় বড় 'ভারতের ইতিহাস' পর্যালো-

াচনা করে বঙ্গদেশের সম্বন্ধে যে তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতাটির রচনা।

"উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে স্বর্গদ্বার,"—এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল কপিলবাস্তুকে বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন (অবশ্যই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে)।

আবার, "অশোক যাহার কীর্তি ছায়িল গান্ধার হতে জলধিশেষ"। এখানেও কবি মগধকে বাঙ্‌লার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন (বড় বড় ঐতিহাসিকের অভিমত অনুযায়ী)।"

আবার, "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়"—এখানেও কবি সুস্পষ্টভাবে এবং ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বিজয়সিংহকে বাঙালী বলে মেনে নিয়েছেন। হতে পারে এঁরা সকলেই ভারতবাসী, কিন্তু কবি তাঁদের বাঙালী বলেই স্বীকার করেছেন। এ-হেন কবিতা হতে 'বঙ্গ' কথাটি তুলে নিয়ে 'ভারত' কথা বসালে কবির প্রতি অবিচার করা হয় এবং ছাত্রদের ভ্রান্ত ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। হয়ত সংকলয়িতা বলবেন—"পাছে কবি প্রাদেশিকতার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে যান তাই তার মান বাঁচাবার জন্য আমি এরূপ রদবদল করেছি।" তাঁর এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ এই মহাকবিরই রচনা—

> "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননি, ভারতবর্ষ!
> উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব সে কি মা ভক্তি
> সে কি মা হর্ষ।

এরূপ সর্বভারতীয়তার অনুভূতি ভারতের অপরাপর আঞ্চলিক ভাষায় কয়জন কবি দেখাতে পেরেছেন? দ্বিজেন্দ্রলালের ধ্যান, জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ছিল ভারতমুখী। সুতরাং কোন অ-বাঙালী ভারতবাসী বাঙলা ভাষা শিক্ষা করে কবির দুটি কবিতাই যদি এক সঙ্গে পাঠ করেন, তবে সহজেই বুঝতে পারবেন কবি কত বড় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পূজারী ছিলেন। তারপর তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রিকা—যা আজও প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্র বলে সর্বত্র প্রশংসিত—প্রমাণ করে দিতেছে—কবি কিরূপ সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। হতে পারে তিনি বাঙলাকে আশীর্বাদ করে, বাঙালীর শুভকামনা করে, "বাংলার মাটী বাংলার জল" লিখে গেছেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন—এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।" কিন্তু তিনিও ভারতকে দেবীরূপে সাক্ষাৎ করে ভক্তিভরে এই মহাদেবীর ধ্যানমন্ত্র ও নমস্কারমন্ত্র রচনা করে ভারতবাসীকে পূজাপদ্ধতি শিক্ষাদিয়েছেন। প্রাচীনকালের ঋষিরা তেত্রিশকোটি দেবতা আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হয়েছিলেন, আর বর্তমান ঋষি তার উপরও একটি পরমদেবতার আবিষ্কার করে দেব-দেবীর সংখ্যাকে বাড়িয়ে দিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি শুধু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন নি, বৈষয়িক দৃষ্টি দিয়েও দেখেছেন, যেমন—"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" এ হেন কবি যদি কখনো মহারাষ্ট্রকে, কখনো বৃন্দাবনকে, কখনো বঙ্গদেশকে কিছু প্রশংসা করে কবিতা লিখে থাকেন তবে কবিকে প্রাদেশিকতার প্রশ্রয়দাতা বলে মনে করবার কারণ নেই। সুতরাং, 'হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ' বা 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন,' অথবা, "নমো নমো নমঃ জননী মম," এই সব বাক্যাবলির সাহায্যে বঙ্গমাতার প্রশস্তি গাইলে কবিকে প্রাদেশিকতাবাদী বলে মনে করা চলতে পারে না। তাই সংকলয়িতাদের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা না লিখে বসেন, "হে মাতঃ ভারত শ্যামল ভারত।"

মধুসূদন দত্তের, "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" পড়লে সারা ভারতবাসী শিক্ষা লাভ করবে এবং তাদেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে। কারণ নিজের দেশের রত্নভাণ্ডারকে অবহেলা করে পরের দেশে রত্নভাণ্ডারের রত্নসংগ্রহের জন্য শুধু মধুসূদন নন্, আরো অনেক ভারতবাসী লালায়িত।

সত্যেন দত্ত বা অতুল সেনের কবিতা দুটি বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষার স্তুতি হলেও সত্যের উপর এবং ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান আবহাওয়ায় এই দুই কবিতা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে না থাকাই ভাল—তাতে কবিদ্বয়ের পাঠকদের অভাব হবে না—সাধারণভাবে যারা বাঙলা সাহিত্য চর্চা করে তাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। সংকলয়িতারা যদি ইচ্ছা করেন

তবে বর্তমান যুগধর্ম অনুযায়ী বাঙলা-সম্বন্ধিনী সকল কবিতাই কিছু দিনের জন্য চাপা দিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু তাদের বানান শোধরান, বা শিরোনামা বদলান, অথবা অঙ্গবিকৃতি অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয়। বানান ভুল থাকলে কোন্‌টা আর্যপ্রয়োগ, কোন্‌টা শিষ্টপ্রয়োগ শিক্ষকরাই ছাত্রদের বুঝিয়ে দেবেন, শিরোনামা কেন বড় হয়েছে তার ব্যাখ্যাও শিক্ষকরাই করে দেবেন, আর 'বঙ্গ' বলতে ভারতকে বা 'আ মরি 'বাংলা' বলতে 'আ মরি হিন্দীকে' বোঝায় কিনা, তার ব্যাখ্যাও শিক্ষকদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হবে।

শাশ্বতী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

হে শাশ্বতী, হে চির সান্ত্বনা
পৃথ্বীর প্রয়াণ-পথে চিরন্তন
অর্ঘ্য বিরচনা,—
এখনো হল না সারা,
কখনো হবেনা জানি,
যত শেষ তত হবে স্বরু,—
পথিকের বক্ষ দুরু দুরু,—
তুমিই জুড়াবে রাণী
তাই এ স্বাগত বাণী
বিরচিয়া গাঁথিনু বন্দনা।
অজয়ে বিজয় করি,—
চির-পরিচয়ে শৃঙ্খলিয়া,—
গোধূলি-মিলন-লগ্নে
বিভাবরী-রূপে এস প্রিয়া—
তিমিরের কৃষ্ণ রেখা
গৌরতনু চৈল শাটী তটে
হেম-কান্তি লাবণ্যের
আপনারে সসঙ্কোচে রটে।

নক্ষত্র নিথর হল
চেয়ে রয় তারকার তারা
নিষ্পলক সুনিশ্চল
মীণাক্ষির মত পদ্মহারা,
দৃষ্টি নাই,—নাহিক বিদ্যুৎ
নিভেছে চক্ষের প্রাণ,—
অন্তর্গূঢ় চেতনা অদ্ভুত!
হানো প্রাণ,—দানো স্পর্শ সাড়া,—
মরণের প্রেতাধ্যাস দূর কর—
অঙ্গে দিয়ে নাড়া।
স্মৃতি দিয়া—প্রীতি দিয়া—
জীবনের অঙ্গে অঙ্গে বুলাইয়া
করুণার কণা
সঞ্চারিয়া কর দান,—
অবিচ্ছেদ, অনির্বাণ,—
মানবের প্রাণ নীরাজনা।
হে শাশ্বতী.—অরুন্ধতী,—
চিরন্তন প্রাণের সান্ত্বনা

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

চতুর্থ টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৯৩ রান (হার্ভে ১৫৪, ও'নীল ১০০ এবং ডেভিডসন ৪৬। স্ট্যাথাম ৬৬ রানে ৩ এবং ডেক্সটার ৯৪ রানে ৩ উইকেট)

ও **২৯৩** রান (বুথ ৭৭ এবং সিম্পসন ৭১। ট্রুম্যান ৬০ রানে ৪, ডেক্সটার ৬৫ রানে ৩ এবং স্ট্যাথাম ৭১ রাণে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩৩১ রান (ব্যারিংটন ৬৩, ডেক্সটার ৬১ এবং টিটমাস ৫৯ নটআউট। ম্যাকেঞ্জী ৮৯ রানে ৫ এবং ম্যাকে ৮০ রানে ৩ উইকেট)

ও **২২৩** রান (৪ উইকেটে। ব্যারিংটন ১৩২ রান নট আউট)

এডিলেডে ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট সিরিজের চতুর্থ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ব্রিসবেনের প্রথম টেষ্ট খেলা ড্র যায়। মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে এবং সিডনির তৃতীয় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়লাভ করে। চতুর্থ টেষ্ট খেলা ড্র যাওয়াতে উভয় দেশেরই খেলায় জয়লাভ সমান ১—১ দাঁড়িয়েছে।

আলোচ্য চতুর্থ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করে। খেলার গোড়াপত্তন ভাল হয় নি। দলের ১৬ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ে যায়। ৩য় উইকেটের জুটিতে বুথ এবং হার্ভে ১০৬ মিনিটের খেলায় ৮৫ রান এবং ৪র্থ উইকেটের জুটিতে হার্ভে এবং ও'নীল ১৭১ মিনিটের খেলায় ১৯৪ রান যোগ করেন।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের বোলার স্ট্যাথাম তাঁর প্রথম ওভারের চতুর্থ বলে সিম্পসনকে আউট করেন। ফলে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৬টি—এই ২৩৬টি উইকেট পেয়েই ইংল্যাণ্ডের এ্যালেক বেডসার টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড এতদিন অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সুতরাং ষ্টাথাম টেষ্ট খেলায় সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে বেডসারের সমান সম্মান লাভ করেন।

প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৫টা উইকেট পড়ে ৩২২ রান দাঁড়ায়। হার্ভে (১৫৪) এবং ও'নীল (১০০) সেঞ্চুরী করেন। হার্ভে তাঁর ৬১ রানের মাথায় পৌঁছলে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর ৬০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্য্যন্ত মাত্র এই চারজন খেলোয়াড় ৬০০০ হাজার রান অথবা তার বেশী রান করার গৌরব লাভ করেছেন—ইংল্যাণ্ডের ডব্লিউ হামণ্ড (৭২৪৯ রান) এবং স্যার লিওনার্ড হাটন (৬৯৭১ রান) এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড জি ব্র্যাডম্যান (৬৯৯৬ রান) এবং নীল হার্ভে (৬০৯৯ রান)।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৯৩ রানে শেষ হয়। পূর্ব্বদিনের ৩২২ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে এইদিনে বাকি ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ৭১ রান যোগ হয়।

ইংল্যাণ্ড এইদিনে তাদের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৯২ রান করে। ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই চতুর্থ টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় দিনটি (২৮শে জানুয়ারী) টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এবং ইংল্যাণ্ডের বোলার জে ব্রায়ান স্ট্যাথামের জীবনে এক স্মরণীয় দিন হয়ে রইলো। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৩১ রানের মাথায় স্ট্যাথামের বলে অষ্ট্রেলিয়ার বেরী শেফার্ড আউট হ'লেন। ফলে স্ট্যাথাম টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে সর্ব্বাধিক উইকেট (২৩৭ উইকেট) পেয়ে বিশ্ব রেকর্ড করলেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ৩২৮ রান দাঁড়ায়, ৯ উইকেটে। এইদিন পুরো সময় খেলা হয়নি। প্রথমতঃ বৃষ্টির দরুণ ২ ঘণ্টা সময় মাঠে মারা যায়। তারপর আলো কম থাকায় নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে ৪৫ মিনিট আগে খেলা ভেঙ্গে যায়। এই দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, ইংল্যাণ্ড তখনও অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ৬৫ রানের পিছনে পড়ে আছে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড পূর্ব্ব দিনের ৩২৮ রানের সঙ্গে মাত্র ৩ রান যোগ করে—ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানে শেষ হয়। টিটমাস ৫৯ রান ক'রে নটআউট থেকে যান। তিনি ১৯৬ মিনিট খেলেছিলেন। টিটমাস দ্বিতীয় দিনে অধিনায়ক ডেক্সটারের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে খেলতে নেমেছিলেন। প্রধানতঃ তিনিই ইংল্যাণ্ডকে শোচনীয় পতনের গহ্বর থেকে উদ্ধার করেন। অষ্ট্রেলিয়ার আক্রমণ ভাগের প্রধান সেনাপতি এ্যালেন ডেভিডসন ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র চারটে ওভার বল ক'রে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি আর খেলায় বল করতে পারেননি। ফলে অষ্ট্রেলিয়াকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। তাঁর অনুপস্থিতি অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় আত্মরক্ষামূলক নীতির প্রধান কারণ বলা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার গোড়াতে বিপর্য্যয় দেখা দেয়। দলের ৩৭ রাণের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। দলের এই পতন রোধ করেন তৃতীয় উইকেটের জুটি সিম্পসন এবং বুথ। এঁরা ২¾ ঘণ্টা খেলে দলের ১৩৩ রান যোগ করেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল অষ্ট্রেলিয়ার রান ২২৫, ৬টা উইকেট পড়ে। অষ্ট্রেলিয়া তখন ২৮৭ রানে অগ্রগামী।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনেও অষ্ট্রেলিয়া খেলা চালিয়ে যায়। ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার মত মনের জোর অষ্ট্রেলিয়ার ছিল না। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বল দেওয়া থেকে ডেভিডসনকে ছাড়ান দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ব্যাট করা থেকে অব্যাহতি দেন নি। দলের ৮ম উইকেট পড়ার পর ডেভিডসনকে মাঠে নামতে হ'ল—তিনি একা খেলতে নামলেন না—দৌড়বার জন্যে সঙ্গে নিলেন সিম্পসনকে। ডেভিডসন মাত্র দু'রান করেছিলেন। কিন্তু তিনি উইকেটে খেলেছিলেন ১৪ মিনিট—এই সময়টাই যথেষ্ট লাভ। লাঞ্চের মাথায় অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হ'ল ২৯৩ রানে। পূর্ব্ব-দিনের ২২৫ রানের (৬ উইকেটে) সঙ্গে এই দিন অষ্ট্রেলিয়া বাকি ৪ উইকেটে ৬৮ রান যোগ করে। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হলে দেখা গেল তখনও ৪ ঘণ্টা খেলার সময় আছে। ইংল্যাণ্ডকে জয়লাভ করতে হ'লে ৩৫৬ রান তুলতে হবে এই সময়ে—অর্থাৎ ঘণ্টায় ৮৯ রান করতে হবে। ক্রিকেট খেলার ইতি-হাসে এ রকম অসম্ভব কাজ কোন দলই করতে পারে নি। সুতরাং এই অসম্ভব কাজে বাহাদুরী নিতে ইংল্যাণ্ড কোন রকম চেষ্টা করেনি। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ইংল্যাণ্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ২২৩ রান দাঁড়িয়েছে। কেন ব্যারিংটন সেঞ্চুরী (১০২) রান ক'রে নট আউট থেকে গেলেন।

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৭৯ (কাউড্রে ৮৫ ও পুলার ৫৩। ডেভিডসন ৫৪ রানে ৪ এবং সিম্পসন ৫৭ রানে ৫ উইকেটে)

ও ১০৪ (ডেভিডসন ২৫ রানে ৫ ও ম্যাকেঞ্জী ২৬ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩১৯ (সিম্পসন ৯১, হার্ভে ৬৪, এব

বেরী শেফার্ড নট আউট ৭১। টিটমাস ৭৯ রানে ৭ উইকেট)

ও ৬৭ রান (২ উইকেটে। সিম্পসন ৩৪ নটআউট। ট্রুম্যান ২০ রানে ২ উইকেট)

সিডনির বিখ্যাত ওভাল মাঠে অষ্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডকে ৮ উইকেটে পরাজিত করলে খেলার ফলাফল সমান (১—১) দাঁড়ায়। ব্রিসবেনের প্রথম টেষ্ট ড্র যায় এবং মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে।

ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট ধরে। আরম্ভ ভাল হয়নি। দলের ৪ রানে ১ম এবং ৬৫ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। কলিন কাউড্রে নিজস্ব ৮৫ রান ক'রে দলের রান অনেকটা ধোপ-দুরস্ত করেন। দলের ২২১ রানের মাথায় আবার ইংল্যাণ্ডের বিপর্য্যয় দেখা দেয়। ফ্যাটা পেস বোলার ডেভিডসনের উপর্য্যুপরি বলে পরপর আউট হন ব্যারিংটন এবং উইকেট-কীপার মারে। ফ্রেড ট্রুম্যান শূন্য উইকেটে নেমে ডেভিডসনের হ্যাটট্রিক প্রতিরোধ করেন। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের ৭টা উইকেট পড়ে ২৫৬ রান দাঁড়ায়। পেস বোলার ডেভিডসন ৪৮ রানে ৩টে এবং স্পিন বোলার সিম্পসনও ৩টে উইকেট পান ৪১ রানে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৭৯ রানে শেষ হয়। সিম্পসন তাঁর দ্বিতীয় ওভারের শেষ দুটো বলে ট্রুম্যান এবং স্ট্যাথামের উইকেট নিয়ে হ্যাট-ট্রিক করার সুযোগ পান· কিন্তু টিটমাস তাঁকে সে পেতে দেন নি।

সিডনির উইকেটে প্রচুর রান করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে যে ২৭৯ রান ক'রে তা তাদের ব্যাটিংয়ের দুর্ব্বলতারই পরিচয়।

এই দিনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পড়ে ২১২ রান উঠে। অষ্ট্রেলিয়ার খেলার গোড়াপত্তন ভালই হয়েছিল। স্কোর বোর্ডে একটা উইকেট পড়ে ১৭৪ রান। কিন্তু হঠাৎ খেলায় দারুণ বিপর্য্যয় নেমে আসে। ইংল্যাণ্ডের স্পিন বোলার ফ্রেড টিটমাস ৪টে উইকেট পেলেন ৪৬ রান দিয়ে। এক সময়ে টিটমাসের বোলিংয়ের পরিসংখ্যান ছিল ২৬টা বলে মাত্র ১ রান দিয়ে ৩টে উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড যে প্রাধান্য লাভ করেছিল তা তৃতীয় দিনের খেলায় অটুট রাখতে পারেনি, খেলার গতি তাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে ৩১৯ রান করে ৪০ রানে এগিয়ে যায়। তাছাড়া তারা ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় মাত্র ৮৬ রান দিয়ে ৬টা উইকেট পায়। অষ্ট্রেলিয়ার ফাষ্ট বোলার এ্যালেন ডেভিডসনের মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ডের এই শোচনীয় দশা হয়। ডেভিডসন ২৫ রান দিয়ে এই দিনের খেলায় ৩টে উইকেট পান। অষ্ট্রেলিয়ার বোলার সিম্পসন কোন উইকেট না পেলেও তিনটে ক্যাচ ধরেন—তাঁর হাতে আউট হন শেফার্ড ডেক্সটার এবং কাউড্রে। অষ্ট্রেলিয়ায় বেরী শেফার্ড তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৭১ রান করে শেষ পর্য্যন্ত নটআউট থাকেন। ইংল্যাণ্ডের ফাষ্ট বোলাররা বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ট্রুম্যান ৬৮ রান দিয়ে কোন উইকেট পাননি। স্ট্যাথাম ৬৭ রানে মাত্র ১টা। কোল্ডওয়েল ১টা উইকেট ৪১ রানে। বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন স্পিন বোলার ফ্রেড টিটমাস—৭৯ রানে ৭টা উইকেট। তাছাড়া টিটমাসের বোলিংয়ে অষ্ট্রেলিয়ার রানের গতিও সংযত ছিল।

চতুর্থ দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৫৬ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড তার বাকি ৪টে উইকেট হারিয়ে পূর্ব্বদিনের ৮৬ রানের সঙ্গে মাত্র ১৮ রান যোগ করে—দ্বিতীয় ইনিংস ১০৪ রানে শেষ হয়। এই দিনেও ডেভিডসন ৬টা বলে ২টো উইকেট পান কোন রান না দিয়ে। স্ট্যাথাম এবং কোল্ডওয়েল তাঁর বলে আউট হন। ডেভিডসন দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫ রানে ৫টা উইকেট পান। উভয় ইনিংস নিয়ে তিনি পান ৯টা উইকেট ৭৯ রানে। খেলায় জয়লাভের জন্যে অষ্ট্রেলিয়া ৬৫ রানের প্রয়োজন হয়। মাত্র ৬২ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়া ২টো উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান তুলে ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

দলীপ সিংজী ক্রিকেট ঃ

দক্ষিণাঞ্চল ঃ ১৩২ রান (বেলিয়াপ্পা ৪৮। বালু গুপ্তে ৫৫ রানে ৯ উইকেট)

ও ২৬৩ রান (আব্বাস আলী বেগ ৭৬ এবং জয়সীমা ৬১। বালু গুপ্তে ৭২ রানে ৩ উইকেট)

পশ্চিমাঞ্চল ঃ ৪১৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সুধাকর অধিকারী ১০৩, পলি উমরীগড় ১০৩ এবং অজিত ওয়াদেকার ৯৩। জয়সীমা ৭৬ রানে ৫ উইকেট)

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দলীপ সিংজী আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ২০ রানে গত বছরের রানার্স-আপ দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার দলীপ সিংজী ট্রফি জয় করেছে। গত বছরের ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলদল ১০ উইকেটে জয়লাভ করেছিল।

দক্ষিণাঞ্চল দলের অধিনায়ক এম এল জয়সীমা টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে পারেন নি। তিন ঘণ্টা দশ মিনিটের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৩২ রানে পড়ে যায়। তাদের এই শোচনীয় অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিলেন বালু গুপ্তে ৫৫ রানে ৯টা উইকেট নিয়ে। এই দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের দুটো উইকেট পড়ে ৯১ রান উঠে যায়।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ৮ উইকেটে ৪১৫ রান উঠলে পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই রান উঠেছিল মোট ৩৬৫ মিনিটের খেলায়। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে পলি উমরিগড় এবং অজিত ওয়াদেকার দলের ১৮৯ রান যোগ করেন। এইদিনে দক্ষিণাঞ্চল দল ১০ রান করে কোন উইকেট না খুইয়ে।

তৃতীয় দিনে খেলার শেষে দেখা গেল দক্ষিণাঞ্চলের রান ২১৯, এদিকে উইকেট পড়েছে ৭টা। এইদিনে তৃতীয় উইকেটের জুটিতে আব্বাস আলি বেগ এবং জয়সীমা ১৩০ রান যোগ করেন। বেগ তাঁর ৭৬ রানে ১৩টা বাউণ্ডারী করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ৪৫ মিনিটের খেলাতে দক্ষিণাঞ্চল দলের বাকি ৩টে উইকেট পড়ে যায় এবং ২৬৩ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ফলে পশ্চিমাঞ্চল দলকে আর দ্বিতীয় দফায় মাঠে নামতে হ'ল না—এক ইনিংস এবং ২০ রানে জয়লাভ করলো।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ঃ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি) ফাইনালে পুণা বিশ্ববিদ্যালয় দল ৭ উইকেটে মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে। পুণা বিশ্ববিদ্যালয় দলের এই প্রথম রোহিণ্টন ট্রফি জয়।

মাদ্রাজ : ১২৫ ও ১৮৬ রান।

পুণা : ২৫০ ও ৬২ রান (৩ উইকেটে)।

রাষ্ট্রীয় খেতাব ঃ

ভারতবর্ষের চতুর্দ্দশ প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রখ্যাত ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৈয়দ মুস্তাক আলি 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভ করেছেন।

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এ্যাথলেটিক ঃ

১৯৬৩ সালের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে মোহনবাগান ক্লাব (৫৫ পয়েণ্ট), মহিলা বিভাগে রেঞ্জার্স ক্লাব (৪২ পয়েণ্ট) এবং বালক বিভাগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (৭১ পয়েণ্ট) দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন মেটাল বক্স স্পোর্টস ক্লাবের পি সি হাউ (১৫ পয়েণ্ট) এবং মহিলা বিভাগে পেয়েছেন রেঞ্জার্স ক্লাবের মরীন হকিন্স (১৮ পয়েণ্ট)।

তিনটি ক'রে অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করেন এই তিনজন এ্যাথলীট : পুরুষ বিভাগে পি সি হাউ (৪০০ মিটার হার্ডলস, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়) এবং মহিলা বিভাগে মরীন হকিন্স (১০০, ২০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়) এবং এ্যান রিচসন (সটপুট, ডিসকাস এবং জাভেলিন)।

নতুন রেকর্ড

(১) ২০০ মিটার দৌড় (বালক বিভাগ)—তাপস রায় (ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব)—সময় ২৩·৬ সেঃ

(২) ৪০০ মিটার হার্ডলস (পুরুষ বিভাগ)—পি সি হাউ (মেটাল বক্স)—সময় ৫৮·৩ সেঃ

(৩) ২০০ মিটার দৌড় (মহিলা বিভাগ)—মরীন হকিন্স (রেঞ্জার্স)—সময় ২৭ সেঃ

নিখিল ভারত স্কুল ক্রিকেট ঃ

নিখিল ভারত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পূর্ব্বাঞ্চল দল ৮ উইকেটে পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার কুচবিহার কাপ জয় করেছে।

ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্যে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন দেব মুখার্জি (পূর্ব্বাঞ্চল দল), সোলকার (পশ্চিমাঞ্চল দল) এবং আর পার্কার (পশ্চিমাঞ্চল দল)।

সাহিত্য সংবাদ

*হিমাচলম্

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কালমাহাত্ম্যে আজকাল তীর্থযাত্রা ভ্রমণবিলাসের পর্য্যায়-ভুক্ত হয়েছে। রাস্তার সুবিধা-অসুবিধা, যানবাহনের ব্যবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা ও প্রকৃত কৌতূহল—তীর্থযাত্রার যে আসল উদ্দেশ্য তাকে আড়াল করে মাথা উঁচু করেছে। পথের দুর্গমতার সঙ্গে অল্প একটু প্রণয়াবেশের রং যুক্ত হয়ে প্রায়ই হিমালয়ের শুভ্রতুষার কিরীটকে অরুণোদয়ের বর্ণালী স্পর্শে স্বপ্নরঙীণ করে তুলেছে। তীর্থযাত্রী মানুষ আপনার হৃদয়ের আবীর ছড়াতে ছড়াতে দুর্গম পর্ব্বতশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত দেবতার দিকে এগিয়ে যায় ও ভক্তির তপঃক্লিষ্টতার মধ্যে একটা নূতন ভাববৃন্দাবন রচনা করে। কিন্তু এই সমস্ত লৌকিক জীবনের অতিপল্লবিত বিস্তারে,হৃদয়াবেগের অতি-প্রাচুর্য্যে তীর্থগমনের পরম উদ্দেশ্য দেবমহিমার অনুভূতি, দেবচরণে আত্মনিবেদন যে অনেকটা গৌণ হয়ে পড়ে সেটা নিঃসন্দেহ।

এই দিক দিয়ে, সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, নানা উপাদেয় গ্রন্থের রচয়িতা লালগোলা-রাজ শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'হিমাচলম্' গ্রন্থখানি একটি সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। অবশ্য তাঁর বই-এ ভ্রমণ-বিবরণ ও তাঁর প্রকৃতি-সিদ্ধ সরসমনের পরিহাসমধুর পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তাঁদের তীর্থযাত্রার দলভুক্ত মানুষকটির প্রতি তাঁর স্নিগ্ধ মনোভাব, তাদের নিয়ে হাসি-তামাসার উপভোগ্য বর্ণনাও এই উপলক্ষ্যে তাদের চরিত্রের কিছুটা উদ্ঘাটন,তাঁর লেখাটিকে মানবিক প্রীতিরসে পরিপূর্ণ করেছে। তা ছাড়া পথচলার মধ্যে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ—ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্র-পতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মন্দির কমিটির মহামান্য প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ থেকে ডাণ্ডীবাহী কুলি, দোকানদার, পাণ্ডা মহারাজ প্রভৃতি প্রাকৃত জনসাধারণ সকলের সঙ্গে তাঁর প্রীতি ও সমবেদনা রসে সিক্ত আলাপ-আলোচনা—সবই তাঁর উদার মানবিকতার পরিচয়রূপে আমাদের মুগ্ধ করে। পথের বর্ণনা ও বিভিন্ন চটিতে তাঁর ক্লেশকর অভিজ্ঞতাও তাঁর লিখন ভঙ্গীর সরসতায় সাহি-ত্যিক গুণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁদের সহযাত্রিনী মায়েরাও অবগুণ্ঠনের আড়াল ও কুণ্ঠিত নীরবতার ব্যবধান থেকে নিজেদের অস্তিত্বের যে অম্লমধুর প্রমাণ দিয়েছেন তাও গ্রন্থখানির উপভোগ্যতা বাড়াতে কম সহায়তা করে নি। পুরুষের সরব আস্ফালনের মধ্যে নারীজাতির এক একটি তীক্ষ্ণ, স্বল্পাক্ষর মন্তব্য যেন অনেক কুয়াসার মধ্যে এক ঝলক সূর্যালোকের ন্যায় আমাদের বিশেষভাবে দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

কিন্তু এহো বাহ্য। ধীরেন্দ্রনারায়ণ এই সমস্ত হাসি-খুশী ও ভ্রমণের খুঁটি নাটি তথ্য সমাবেশের মধ্যে আসল উদ্দেশ্যটি ভোলেন নাই। শ্রীমৎ কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ তাঁর গ্রন্থে চিরভাস্বর মহিমায় বিরাজিত। প্রকৃত তীর্থ-যাত্রীর মনে যে ভাবোদ্রেক হওয়া উচিত, যে আত্মনিবেদন-ময় ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠাই স্বাভাবিক—তাই তাঁর চিত্তকে প্লাবিত করে আমাদের মনেও সংক্রামিত হয়েছে। তীর্থক্ষেত্রে থেকে যে যাত্রী ভগবানের নিবিড়তর উপলব্ধি, আত্মসমীক্ষার নূতন মানদণ্ড, জীবনচর্চ্চার নবীন সঙ্কল্প না

* শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় রচিত ভ্রমণ কাহিনী।

নিয়ে ফিরে এল তার তীর্থযাত্রা বৃথাই হয়েছে। পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের পিছনে যে জগৎপতির দিব্য বিভার কিছুটা আভাস প্রত্যক্ষ না করল, তার চোখ তাকে ফাঁকি দিয়েছে। আমরা কি ও কে—জীবনের পরম চরিতার্থতা কিসে, এই সব প্রশ্ন যার অন্তরকে মথিত না করল, সেই হতভাগ্য তীর্থযাত্রী তার অনুভবশক্তিকে বাড়ীতে ফেলে এসেছে। সর্ব্বব্যাপী ভগবান যে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত তুঙ্গশৃঙ্গে আত্মগোপন করেছেন, তার উদ্দেশ্য ভক্তদের ভক্তিপরীক্ষা ও তাদের মায়া বন্ধন ছেদের দীক্ষাদান। আমাদের মনে তীর্থযাত্রার ফলে যদি বৈরাগ্যের ছোপ না লাগল, মোহপাশ যদি কিছুটা শিথিল না হল, তবে পাণ্ডা-মহারাজদত্ত সুফল আমাদের আঁচলে বাঁধা থাকলেও আমাদের মনের গ্রন্থি থেকে স্খলিত হ'ল। তীর্থগমনের অর্থ শাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অনুভব, ভগবানে নিবেদিত জীবনাদর্শের বাস্তব অনুশীলন, ধর্মমহিমার সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ। শুধু সাহিত্যরচনার জন্য তীর্থ যাত্রা নয়, শুধু মানবিক ভাবরোমন্থনের উপলক্ষ্য-সৃষ্টির জন্য দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণীর হাঁফধরান সোপান ভেঙ্গে তুঙ্গ শৃঙ্গস্থিত দেবমন্দির পর্য্যন্ত পৌছবার কোনও প্রয়োজন নাই। হিমালয়ের দেবতা দেখে যাঁর কাব্যভাব জাগে, তিনি হয়ত মহনীয়, কিন্তু যাঁর দিব্যভাবের উদ্বোধন হয় তিনি সত্যই বরণীয়।

ধীরেন্দ্রনারায়ণের বইখানি এই উদ্বেলিত ভক্তিরসের স্পর্শেই অনন্য হয়েছে। দেবমূর্ত্তির সামনে করযোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষণিকের জন্যেও ভাবতন্ময় ও বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হয়ে পড়েছেন। এক অননুভূত আবেগে তাঁর সমস্ত সত্তা আলোড়িত হয়েছে। তীর্থ মাহাত্ম্যে তাঁর মনে যে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা জেগেছে, তা শাশ্বত হিন্দু আত্মারই চিরন্তন জিজ্ঞাসা। ঠিক এই আত্মসমাহিত, ধ্যাননিশ্চল ভাবানুভূতিই তীর্থযাত্রার পরমবাঞ্ছিত সুফল। গ্রন্থকার নিজে এই সুফল পেয়েছেন ও তাঁর গ্রন্থমারফৎ আমাদেরও তার অংশীদার করে ধন্য করেছেন। যাঁরা সত্যিকার সুকৃতিবান্ যাত্রী—তাঁরা তীর্থদেবতার পাশেই এক জ্ঞানভক্তিসিদ্ধ মানবভাব বিগ্রহ দেখতে পান—দেবতার বাণী তাঁরই মুখ দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে একজন এইরূপ দোভাষী না থাকলে পরস্পরের মধ্যে ঠিক ভাববিনিময় ঘটেনা। গ্রন্থলেখক এই জাতীয় একাধিক সিদ্ধ তপস্বীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন ও তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা এঁদের সংস্পর্শে দিব্য চেতনায় বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আমি এই দিব্যভাব রোমাঞ্চ বর্ণনাকেই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ মনে করি। এরই বলে তাঁর গ্রন্থখানি ভ্রমণকাহিনী বা সুকুমার কথাশিল্প থেকে এক উন্নততর আসন লাভ করেছে। আমি তাঁর এই অনুভূতির নিকটই আমার নতি জানাই। তিনি যে শুধু জন্ম সূত্রে রাজবংশীয় ও শিক্ষাসংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ বাঙলার একজন সুসন্তান তাই নয়, ভগবানের দেওয়া সনন্দবলে আত্মিক মহিমার রাজকীয় অধিকারী। তাঁর তীর্থভ্রমণের মাধ্যমে ভগবৎ নৈকট্যের যে জ্যোতিঃ তাঁর মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে, তারই রশ্মিবিকীরণ আমাদের বৈষয়িক স্থুলতায় আচ্ছন্ন, তিমিরমগ্ন অনুভবকে স্পর্শ করুক, গ্রন্থপাঠশেষে এই প্রার্থনা বাণীই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে মনের গভীর হতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৭।২।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দিনান্তে

শিল্পী : পি. দালাল

চৈত্র—১৩৬৯

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

উপনিষদে দম ধর্ম্ম

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদে দম সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার পাওয়া যায়। আমরা এ বিষয়ে অল্পের মধ্যে আলোচনা করিতে চাই।

ছান্দোগ্য উপনিসদে বলা হইয়াছে, মানুষের ধর্ম্ম বলিতে তিনটি দ। অর্থাৎ দ, দ এবং দ। তিনটি দ'এর অর্থ, দয়া, দম ও দান। দয়া বলিতে ভগবানের দয়া বুঝায়। দম হইল সাধকের আত্মদমন এবং দানের অর্থ নিজকে বা নিজের যাহা আছে তাহা জীবসেবায় অর্পণ। এই তিনটি দ'কে সমন্বিতভাবে সাধন করিলে তাহাই পূর্ণ ধর্ম্ম। সে ক্ষেত্রে ভগবানের দয়া নামিয়া আসে, সাধকের অন্তরে দম জাগে ও সাধককে জীবনের সোজা পথ দেখায় এবং শেষে তাঁহার জীবন জীবসেবায় নামিয়া যায়। বলিতে গেলে সাধনের পথ একটি দ দ্বারা অঙ্কিত বা চিত্রিত করা যায়। আবার কোন সাধক যদি জীবসেবা অবলম্বন করিয়া দম ধর্ম্মে পৌছান ও তাহা অভ্যাস করিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ঈশ্বরের দয়া লাভ করেন, তখনও একটি দ অক্ষর অঙ্কিত হয়। তবে ত তিনটি দ মিলিয়া একটি দ'এ দাঁড়াইল। এক্ষণে এইরূপ একটি করিয়া দ প্রতিদিন সাধন করিলে ও তাহাদের সংযুক্ত করিতে থাকিলে একটি দ'এর সিঁড়ি প্রস্তুত করা হয়, যাহা দ্বারা দ'এর সাধক নিজ জীবনে উঠিতে বা

নামিতে পারেন। এইরূপ আরোহণ ও অবরোহণের ফলে সাধক-জীবনে ঈশ্বরের ও জীবের সহিত অভিন্ন যোগ স্থাপিত হইতে থাকে এবং তিনি যদি এইরূপ যোগে সিদ্ধ হ'ন তাহা হইলে তাঁর রচিত দ'এর সিঁড়ি, তাঁহার অবর্তমানে, আগন্তুক সাধকদিগের জীবনে কাজে লাগিতে পারে। এইভাবে সংসারে দ'র পূর্ণধর্ম্ম সনাতন-ধর্ম্মরূপে মানুষের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন তাহা আর ব্যক্তিগত ধর্ম্ম থাকে না, বরং শাশ্বত ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

এ কথার আভাস পাই, সকল অনুষ্ঠানের মূলে যজুরবেদীয় উপনিষদগুলির শান্তিপাঠ মন্ত্রে। সেই মন্ত্রে দ'এর ছড়াছড়ি দেখি এবং তাহার অর্থ অন্তরে ধারণ করিতে গিয়া সনাতন ধর্ম্মের গভীরতম সত্যগুলি জানিতে পারি। শান্তিপাঠের মন্ত্রটি এইরূপ :—

"ওঁ পূর্ণম্ অদঃ, পূর্ণম্ ইদম্, পূর্ণাৎ পূর্নম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্নম্ আদায়, পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে॥"

যাহাতে মন্ত্রটি সহজে ধরা যায়, তাহার জন্য সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া লিখিলাম। এইবার একটি করিয়া অংশ বুঝিতে হইবে।

পূর্ণম্ অদঃ। অদঃ বলিতে কাহাকে বুঝায়? বৈদিক ধর্ম্মের মূল কথা, এক ব্রহ্ম বহু হইয়া ধরা দিয়াছেন। যখন তিনি এক, তখন তিনি ব্রহ্ম, যিনি বড়র বড়, যাঁহার চেয়ে বড় কেহ নাই। আর যখন তিনি বহু হইতে চান, তখন তিনি অদঃ। তাঁর গুণাবলী পাই "দ" অক্ষরে। তিনি ধাপে ধাপে নামিয়া আসিলেন, দ, দ এবং দ রূপ, গুণে গুণান্বিত। ইহার মধ্যেই তাঁহার পূর্নতা। তাই তাঁহাকে বলা হয়, পূর্ণম্ অদঃ। সামবেদীয় সন্ধ্যা মন্ত্রে এইরূপ বহুমুখী "অদঃ"কে প্রণতি করিবার বিধি আছে, এবং তাহার মন্ত্র হইল, "ওঁ অদ্যোঃ নমঃ"। এইরূপে দেখা যায়, সেই আদি পুরুষ—যাঁহার নাম আদি অক্ষর "অ"তে আরম্ভ ও "দ"তে শেষ, তিনি সত্যই পূর্ন এবং "দ"তে পূর্ন। ইহা প্রত্যেক সাধকের মনে রাখিবার কথা নহে কি?

ইহার পরের অংশ, পূর্নম্ ইদম্। "ই" বলিতে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সেই ইহ জগৎ বুঝায়। তাহাও "দ"তে পূর্ন। তাই "ইদম্"। একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই জগতের দানের অন্ত নাই। ইহার মধ্যে "দম" ভাব প্রত্যহ, ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক ঋতুতে নিরবচ্ছিন্নভাবে, কবিতার ছন্দের মত: বৎসরে (বা উপনিষদের "সমে") পরিণত হইতেছে এবং এই মহা-কাব্যের শেষ নাই। যেমন আদিকবি "দ"তে পূর্ন, সেই মত আদিকবির সৃষ্টকাব্যও "দ"তে পরিপূর্ন। কবির গুণ সাধারণতঃ কাব্যে ধরা পড়ে। তাই "ইদম্" আমাদের কাছে জগৎ সংসারের প্রতি (অদঃ নামের) মহাকবির দয়া ঘোষণা করে। তবে ত "পূর্নম্ ইদম্" বলা সার্থক।

ইহার পরের অংশটি হইল, "পূর্নাৎ পূর্নম্ উদচ্যতে"। অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণই জন্মায়। তা আদি পুরুষ, ই তাঁহার সাকারময় সৃষ্টিমণ্ডল, উ হলেন তাঁহাদের সন্তান। বিশ্বপিতার যে সন্তান, যাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ নামে অভিহিত করিতে পারি, বিশ্বজননীর অংশে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও যাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম আমরা "দিব্য" বলিয়া পরিগণিত করি, তিনি "উদচাতে", অর্থাৎ সন্তানরূপী হইয়াও দ'তে পূর্ণ। পিতামাতার গুণ সন্তানে বর্ত্তিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে ত সংসারে কোথাও ফাঁক রহিল না, পিতা পূর্ন, মাতা পূর্ন, সন্তান পূর্ন—সনাতন ধর্ম্মের তিনটি নিগূঢ় সত্য এই শান্তিপাঠের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

এইবার যাঁহারা এই সত্যগুলি প্রচার করিবেন, সেই আচার্য্যদের কথা দ্বিতীয় পংক্তিতে পাই। তাঁহারা এই দ'এর সুর যেমন করিয়া প্রথম পংক্তিতে বাজিয়া উঠিল তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া "দ"তে আপ্লুত হইবেন। এখানে কথাটি হইল "আদায়"। সুর আদায় হইলে দ তার সমগ্র রসটুকু ঢালিয়া দেয়, ও তাহা মরমে পশিয়া যায়। এই সকল আচার্য্য নিজ ঋণ স্বীকার করিয়া মহাপুরুষদের আসন লইতে চান না, তাহা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় যে বিদ্যায় দ্রবীভূত হইয়া মানবসমাজকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, তাহা কি ভুলিবার কথা? তাঁহাদের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে মহাপুরুষদের মত পূর্ন না বলাই শোভন। তাঁহাদিগের কাজ হইল পূর্ণতা আয়ত্ত করিয়া, তাহা যেখানে সুবিধা ঢালিয়া দিয়া তাঁহাদের অনুগামী সাধকদের অর্থাৎ শিষ্যবর্গকে পূর্ন করিয়া দেওয়া। আচার্য্যের মর্য্যাদা সেইখানেই। তিনি পূর্ণ হইবার খ্যাতি চান না, কিন্তু

তাঁর শিষ্যগণ যে পূর্ণ হইবেন সে অভিমান তিনি রাখেন। এ কথা প্রত্যেক আচার্য্যের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য।

তাই বলা হইল, পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে। অর্থাৎ যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন (শিষ্যগণ), তাঁহারাও পূর্ণের ন্যায়। পূর্ণের মত কেন বলা হইল? ইহাতে একটু রহস্য আছে। পূর্ণ বলিলে ত তাহাদের সাধনার প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধনা করিলেই পূর্ণতা অর্জ্জন হইবে। কিসের সাধনা? "দ"এর সাধনা, দ'এর সিঁড়ি রচনা করিতে হইবে এই জীবনে। এই সকল শিষ্যদের একটি তরুণ রাজকুমারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে হয়ত আজ রাজ-উদ্যানে খেলায় ভুলিয়া আছে, কিন্তু বড় হইলে পর নিজ মর্য্যাদা ও অর্জ্জিত মহিমার জন্য রাজসিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে। ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রত্যেক মানব শিশুকে এই রাজকুমারের স্থান অকুণ্ঠিতভাবে প্রদান করেন ও প্রত্যেক সাধকের জন্য আশীর্ব্বাদসূচক জপমন্ত্র দেন, "তৎ ত্বম অসি" অর্থাৎ তুমিই সেই। তবে ত ঈশ্বর পূর্ণ, জগৎ পূর্ণ, মহাপুরুষগণ পূর্ণ, আচার্য্যগণ মহাপুরুষদের কৃপায় পূর্ণ, এবং সব শেষে শিষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ—সনাতন ধর্ম্মের এই পাচটি সত্য ভুলিবার নয়। এই পাঁচটি সত্যের মহিমা ঘোষণায় আমাদের শাস্ত্র পঞ্চমুখ। আমরা কত বলিব? শুধু আর একটিবার বৈকুণ্ঠের পথে যাত্রা করিতে হইলে বলিতে হয়, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্ব অবস্থায়, সবই "দ"তে পূর্ণ এবং ইহা উপলব্ধির জন্য দম ধর্ম্ম যত শীঘ্র হয়, অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহা দ'এর সিঁড়ির মর্ম্মস্থান, যাহাকে শক্ত করিয়া ধরিতে পারিলে আর পতনের ভয় নাই। উপনিষদের পর, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে দম ধর্ম্মকে "আত্মবিনিগ্রহ" আখ্যা দেওয়া হয়। গীতায় ইহা জ্ঞানীর পরিচায়ক বলিয়া বিবৃত হইয়াছে (১১।৭-৯ ও ৪।২৭ দ্রষ্টব্য)। ইহার মূল কথা—অনাসক্তি, ভোগে উদাসীনতা এবং সর্ব্ব অবস্থায় সমচিত্ত হওয়া।

গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন একটি প্রদীপের সাহায্যে অপর প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া ল'ন, তেমনই জগৎ-লক্ষ্মীর এমনই বিধান যে দয়াময় প্রযোজিত তাঁর চিরজ্যোতিঃ হইতে মানবসমাজের সকল শ্রেণীর সাধকহৃদয় দীপান্বিত হইয়া থাকে। উক্ত শান্তিপাঠের মন্ত্র এইভাবে অন্তরে ধারণ করিলে কোন অশান্তি আর থাকে না। তাই অন্তে বলা হয়, ওঁ শান্তি।

স্বামীজি স্মরণে

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুচ্ছ মোক্ষ লাগি' নির্জন গুহান্ধকারে
করোনি তপস্যা। নিঃসঙ্গ বন্ধদ্বারে
থাকোনি নিমগ্ন। মানুষের চিত্তভূমি
সাধনার প্রযুক্ত স্থান করেছিলে তুমি।

নিরন্ন, পাপী-তাপী যতো আর্ত্তজন
বিশাল বক্ষচ্ছায়ে তব লভিয়া আশ্রয়
জুড়াতো বহ্নিজ্বালা। ছিলে অনুক্ষণ
তাহাদের পরম নিশ্চিন্ত নির্ভয়।

তোমার নির্ম্মম, অসীম-উদার দৃষ্টি—
উচ্চ-নীচ কভু করেনি বিভেদ সৃষ্টি।
জ্ঞানী-অজ্ঞানী, মেথর-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ,
সবারে সমানভাবে ক'রেছ আলিঙ্গন।

সবারে দিয়েছ তুমি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা—
দুর্ব্বলতাই মৃত্যু—বলেছো,-কদর্য-পাপ ;
দুর্বল করে সবার করুণাভিক্ষা,
বেঁচে থাকা তার বিড়ম্বনা, ব্যর্থ, অভিশাপ।

জন্মভূমি ছিলো-যে তব পরমারাধ্যা দেবী—
আমৃত্যু দেহমন সঁপি' চরণ গিয়াছ সেবি।
তাহার বেদনা মর্মে-মর্মে করিয়াছ অনুভব,
সেই বেদনায় জন্ম নিল তোমার সাধনা—দুর্ল'ভ!

হে সন্ন্যাসী-বীর, দরদী-বন্ধু, মাতৃভক্ত সন্তান—
তোমার জন্ম-শতবর্ষে জানাই ভকতি-প্রণাম!
তুচ্ছ ভীরুতা দু'পায়ে দলি করি যেন অভিযান
সম্মুখ পানে তব আদর্শ বুকে লয়ে অবিরাম!

ক্ষণিকের পরিচয়

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

সকাল দশটা হবে। চলন্ত রেল গাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর কামরা। সকলেই দূর পথের যাত্রী এবং পৃথক শয্যার অধিকারী। গোটা কামরায় মাত্র চারজন মানুষ। দুই জন বাঙ্গালী, একজন মাদ্রাজী, শেষেরটি কোন দেশের মানুষ ধরা যায় না। বাঙ্গালীদের মধ্যে একটি পুরুষ, অপরটি স্ত্রীলোক। উভয়ই নবযৌবনের ডাকে তটস্থ। গাড়ীর দরজায় সকলেরই নামলেখা ছিল, কিন্তু খুঁটিয়ে পড়ার অবসর পাওয়া যায় নি।

মহিলার সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠন, রোখা-ভাবে চিত্তাকর্ষক। অর্থাৎ একবার দেখে ছাড়ান পাবার উপায় নেই। দ্বিতীয় বার আড় চোখে নজর লাগাতে হয়। পরিচ্ছদ ও প্রসাধন থেকে অনুমান করা চলে আধুনিকপন্থী, তবে যৎসামান্য ভ্যাজাল নেই এমন কথা বলা যায় না। শাড়ীর ভাঁজে আঁট সাঁট আড়ালের ত্রুটি না থাকলেও, চেলীর ফাঁকে উত্তেজক দেহাংশের উঁকি বাধাহীন। স্বেচ্ছাকৃত কিনা বলা যায় না। বাংলা শব্দের উচ্চারণ সাহেবী ধরণে আড়ষ্ট এবং ইংরাজী ভাষা ব্যাকরণ-বিদ্বেষী। সঙ্গের যুবকটিও নতুনের অনুগামী, গঠন শীর্ণ-কায়, চিবুকে নবাগত "আছে কিন্তু নেই" দাড়ী, মুখে ধুমহীন মোটা টোব্যাকো পাইপ। পরিচ্ছদ, উর্দ্ধাঙ্গে, হাওয়া বা গ্যাস ভরা ফানুসের মত বুষ কোট, নিম্নাঙ্গে কাউবয় জীন (cow boy jean)—মোটকথা ব্যক্তিত্বে প্রগতিশীল শিল্পীদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

সহযাত্রী পুরুষটির সহিত মেয়েটির কি সম্বন্ধ অনুমান করা শক্ত। ঘেঁসাঘেঁসি বসার তাগিদ দেখলে মনে হয় একটি আইনসঙ্গত শুভ ঘটনার সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠছে। নববিবাহিত দম্পতি নিশ্চয় নয়, কারণ গোপনে দখলের দাবী থাকলে, প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতার বিজ্ঞপ্তির জন্য তড়পানির প্রয়োজন হয় না। নীতির তাড়ায় ভ্রাতা ও ভগিনী ভাবাও চলে না, কারণ উভয়ের বাহ্যিক রূপ একেবারে অমিলে ভরা বয়সের যেটুকু তফাৎ তাও সপ্তাহ খানেকের বেশী নয়। অতএব নির্ভরশীল সিদ্ধান্তে আসতে হলে বলতে হয়, নয় Comrade জাতীয় বন্ধু, অথবা সন্দেহাতীত উর্দ্ধ-স্তরের জীব।

তৃতীয় যাত্রী বয়স্ক মাদ্রাজী। নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। খুব সম্ভবত হিসাব দপ্তরে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। প্রাতঃকৃত্য ও পূজাহ্নিক শেষ করেই একটি বৃহদাকারের ফাইলে সারা সকালটা হিসাবের কামড়াকামড়ি চালিয়েছেন—এখন পর্য্যন্ত ক্লান্ত হবার কোন লক্ষণ নেই। পেনসিলের শেষ প্রান্তে কেবল সীসের ডগা বেরিয়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে ব্যবহারোপযোগী করে রাখায় বোঝা যায়—মিতব্যয়িতার পরীক্ষায় তিনি একজন পাশ-করা মানুষ।

চতুর্থ মানুষটির পরিচয় জটিল। পিসীমার আদর্শ অনুসারে ননীর পুতুল বলা চলে না, কারণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে দৃষ্টান্তে বাধা এসে পড়ে অনেক। বলিষ্ঠগঠনের পিছনে বয়স কোথায় লুকিয়ে আছে ধরা ছোঁয়া শক্ত। যৌবনকে যেন ভদ্রলোক শাসন দ্বারা সাথী করে রেখেছেন। আলুথালু গৈরিক বেশ ও পরিচ্ছদের প্রতি নির্লিপ্ততা দেখলে প্রথমেই মনে আসে, কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধু সন্ন্যাসী হবেন, অপরিণীত বয়সে বৈরাগ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন—কিন্তু ধারণা ভ্রমাত্মক প্রমাণ হতে সময় লাগে না। দূরপথের যাত্রায় ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্যের আতিশয্য এমনই সামঞ্জস্যহীন যে ত্যাগীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ঘোরতর ভোগী বললেই মানায় ভাল। ত্যাগের আড়ম্বরে ভোগকে জড়িয়ে থাকায় সাধুবেশধারীকে

ভণ্ডাবতার বলাই বাঞ্ছনীয়। গল্পের সুবিধার জন্য এর পর তাঁহাকে ঐ নামেই সম্বোধন করতে চাই—তবে বিশেষণটির উপর অনেকের ধর্ম্মসঙ্গত দাবী থাকায় কেবল অবতার বললেই গৈরিকবেশধারীকে চেনার কোনরূপ অসুবিধা হবে না।

গাড়ী তীর বেগে চলছিল। সান্ত্বনা পাওয়া গেল, ঘণ্টা দুই পিছিয়ে পড়ার ত্রুটি ড্রাইভার সামলে নিতে পারবে—কিন্তু আশা কাজে লাগার আগেই গতি মন্থর হয়ে এল, তারপর একেবারে নিশ্চল। যেখানে গাড়ী এসে থামল সেখানে মানুষের বসতি নেই, ধু ধু করছে দিগন্ত-ব্যাপী অসমতল মাঠ। মাঝে মাঝে পাতা-ঝরা আগাছার ঝোপ। লাইনের পাশেই কাটা খাল। জল শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মকালের কাঠ-ফাটা রদ্দুর মাটিকেও ফাটিয়ে দিয়েছে। কাছে বা দূরে একটিও গাছ নেই, মাঠের সীমানা ঠেকেছে মেঘহীন আকাশের তলায়।

শোনা গেল লাইনে কি একটা বিপদজনক গোল বেধেছে, গাড়ী চলতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে শিল্পী-রূপী যুবকটি, এক চোখ বুজে বাহিরের দৃশ্য নানাভাবে দেখতে লাগলেন। দর্শনের ভঙ্গীতে গ্রীবার নৃত্য সুরু হয়ে গেল। একবার বাঁএ হেলেন—একবার ডাইনে হেলেন, কোন ভঙ্গিমাতেই দেখায় সন্তুষ্ট হন না। বাকি ছিল মাথা নীচু করে পা দুটো উপরে তুলে দৃষ্টিকে চরম সুবিধা দেয়া,কিন্তু মহিলা সঙ্গে থাকার জন্যই বোধ হয় এই ধরণের দেখা থেকে বিরত হলেন। তারপর হঠাৎ কি হোল বলা যায় না, ঝোলা বিছানার (upper berth) তলা থেকে বাস্তবিকই ছবি আঁকার সরঞ্জাম বার করে আনলেন। সরঞ্জামের মধ্যে ছিল, একটি মেসোনাইট বোর্ড (Masonite board) এবং দামী ছবি আঁকার কাগজ। কাগজ ও বোর্ডের সঙ্গে আরও কি খুঁজলেন, কিন্তু পাওয়া গেল না। ভাবোচ্ছাস তখন শিল্পীকে চেপে ধরেছে, খোঁজার জিনিস না পেলেও কাগজ আর বোর্ড বসার জায়গায় রেখে নিজে মেঝের উপর পাঠশালায় নিল-ডাউন (kneel down) হয়ে বসার অনুকরণে হাঁটুর উপর দেহ ভার রাখলেন। এই প্রথায় সহজ হবার চেষ্টা দেখলে অনুমান করা চলে, অভ্যাসটি পুরাতন। পরক্ষণেই বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন—"কি জ্বালা, ক্রেয়নটা (crayon) কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, তাড়াতাড়ি দেখ না, কোথায় রেখেছি। আবেদন যে বান্ধবীকে উদ্দেশ্য করেই হয়েছিল, তা মহিলা বুঝতে পারার আগেই শিল্পী কপালে করাঘাত করে, এটাচি কেস থেকে আরম্ভ করে সুট কেসের মধ্যে জামা কাপড় তছ্ নছ্ করে ফেল্লেন, ধোপ-দরস্ত পরিচ্ছদ লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল তথাপি ক্রেয়নের পাত্তা পাওয়া গেল না।

কাস্‌টমস্ (Customs) আপিসে খানাতল্লাসীর মত চামড়ার প্যাটরা তোলপাড় হওয়ায়, মাদ্রাজী ভদ্রলোক কুতুহলী হয়ে উঠেছিলেন। ক্রেয়ন বস্তুটি কি এবং তার জরুরী প্রয়োজনীয়তা জানতে পারায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁহার পেনসিল দিয়ে কাজ চলতে পারে কি না? পেনসিলের নামে, সোনার চাঁদ হাতে পাওয়ার মত ব্যাকুলভাবে শিল্পী জানালেন, "যদি দয়া করে দেন তাহলে প্রকৃতির রূপ থেকে একটি দুর্লভ রত্ন সংগ্রহ করতে পারি। যে রত্নের কথা বলছি, তার জন্ম সুন্দরের গর্ভ থেকে—আনন্দ দান হোল তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, ভাবের ঘোরে আরো অনেক কবিতা-ছোঁয়া বুলি হয়ত বলে ফেলতেন—কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত অতিক্ষুদ্র পেনসিল হাতে আসায় হতবাক হয়ে গেলেন। পৌনে এক ইঞ্চি লম্বা পেনসিল আঙুল দিয়ে ধরা যায় না। অপর দিকে সুন্দরকে গর্ভস্রাব থেকে না বাঁচালেও নয়, শিল্পী মরিয়া হয়ে কাগজের উপর আঁচড় কাটা সুরু করলেন; হিসাব লেখার কঠিন পেনসিলকে এককথায় বাগ মানান যায়? দেখা গেল ছবি রূপ নেবার আগেই কাগজ সবেগে ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। শিল্পী প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার জোগাড়। দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পীর অবস্থা দেখে অবতারের হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। অনতিবিলম্বে সর্ব্বাধার থলের (holdall) ভিতর থেকে বিভিন্ন প্রকারের কাল ক্রেয়ন (মোম মিশ্রিত অঙ্কন যষ্ঠি) শিল্পীর সামনে ধরে দিলেন। দ্রব্য-গুলি ছোট কাঠের বাক্সে রাখা ছিল, সব কয়টিই গোটা অবস্থায় শিল্পীর হাতে গিয়ে উঠল। ভগবান যেন সাধুর রূপ নিয়ে শিল্পীকে বরদানের জন্যই সহযাত্রী হয়েছিলেন।

ভোজবাজীর মত ঘটনায় মাদ্রাজী ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন। ভক্তিবিহ্বল নেত্রে সাধুবেশধারীর দিকে

খানিকক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায়, ভদ্রলোকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, গৈরিকবেশধারী মানুষটি নিশ্চয় একজন অন্তর্যামী সাধক, মন্ত্রদ্বারা যা খুসী তাই সংগ্রহ করতে পারেন, ভূত ভবিষ্যৎও হয়ত নখদর্পণে দেখে থাকেন। ভোগের আড়ম্বর পরিবেষ্টিত হয়ে থাকলেও তিনি যে একজন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। এক কথায় যদি ক্রেয়ন বেরিয়ে আসে, তাহলে ভিন্ন রূপা পাওয়াও অসম্ভব নয়। স্বার্থের কথা যে সময় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, সেই সময় শিল্পী চিত্রাঙ্গনের ক্ষতবিক্ষত নিদর্শন সরিয়ে নতুন কাগজের উপর ক্রেয়ন ধরলেন। দুর্লভ রত্ন কি ভাবে বেরিয়ে আসে দেখার জন্য মাদ্রাজী ভদ্রলোকের কৌতূহলও বেড়ে উঠল।

অবতার নির্ব্বিকার ছিলেন না, তিনিও ক্রেয়নের চাল-বেচাল সবই দেখতে লাগলেন।

নরম ও কঠিন ক্রেয়নের দাগ, নানাভাবে, নানাদিক দিয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করেছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম রেখার সে কি দারুণ জড়ামড়ি। একটার উপর আর একটা আছাড় খেয়ে পড়ছে। রত্ন তখনও অদৃশ্য হয়ে থাকায় রূপস্রষ্টার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি মনকে দৃঢ় করে ক্রেয়নকে চিং করে কাগজের উপর চেপে ধরলেন এবং দুর্দ্ধর্ষ শক্তি দ্বারা পিষতে লাগলেন—ঠিক যেভাবে বাটনা বাটার সময় শীলের উপর নোড়ার সংঘর্ষণ চলে। ছবি আঁকার চেষ্টায় বাটনা বাটার কসরৎ শিল্পীকে গলদঘর্ম্ম করে তুলল। তখন পর্য্যন্ত রত্নের সন্ধান নেই। মাদ্রাজী ভদ্রলোক শিল্পীকে পাপাত্মা ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এইরূপ ধারণা খুবই স্বাভাবিক, তা না হলে মন্ত্রপূত প্রাণ-কাঠিও চাপের চোটে ঘায়েল হয়ে যায়? অপর দিকে ভণ্ডাবতার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। তাহার আসন থেকেই দেখছিলেন ক্রেয়নের আক্রমণে কাগজের সাদা ক্রমান্বয়ে কালীমায় ভরে আসছে। সুস্থ মানুষের চামড়া হঠাৎ ঘায়ে ভরে উঠলে রোগ থেকে মুক্তি দেবার জন্য যেমন দয়ালু চিকিৎসক উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, ঔষধের সাহায্যে আরোগ্যের পথ দেখিয়ে দিতে চায় সেইরূপ শিল্পীকে সাহায্য করার জন্য ভণ্ডাবতার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রোগের প্রধান জ্বালা কোথায় জানার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন। মহিলা সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করলেন। মানা সত্বেও আসন্ন বিপদ সামনে থাকায় ভণ্ডাবতার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারলেন না, রূপস্রষ্টার পিছনে এসে দাঁড়ালেন এবং কাছ থেকে যা দেখলেন তাতে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। নির্ম্মম দৃশ্য, অদৃশ্য রত্নের দখল নিয়ে কাগজ ও ক্রেয়নের মাঝে দাঙ্গা বেধে গিয়েছে। ছবিও ধরা দিতে চায় না ক্রেয়নও ছাড়ার পাত্র নয়। দাঙ্গার মাঝে নিরীহের প্রতি অত্যাচার দেখলে যে কোন মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নির্ম্মমভাবে বলাৎকারের দৃশ্য অবতারকে চঞ্চল করে তুলল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি ছবি আঁকার চেষ্টা করছেন"?

অভাবনীয় স্পর্দ্ধার দৃষ্টান্তে শিল্পী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রোষ, ক্ষোভ, আত্মাভিমান, সব কয়টি উচ্ছ্বাস একসঙ্গে চেপে ধরায় শিল্পী হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তারপরই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝড় উঠল। ভণ্ডাবতারের ওদিকে লক্ষ্য ছিল না। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে পুনরায় বেহায়ার মত জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ যে ঐখানটা কালর উপর কাল চড়িয়ে একটা স্তম্ভের মত খাড়া করেছেন, ওটা কি গাছ?

রূপদক্ষ চিত্রকরকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "আপনি কি ছবি আঁকার চেষ্টা করছেন—তাহলে প্রশ্নকারীর অজ্ঞতাকে কেহ সমাদরে গ্রহণ করে না। বলাই বৃথা, যাঁহাকে নিয়ে আলোচনা তিনি আজকের জন্য ছবি আঁকেন না। ওনার আঁকা ছবিকে আজ যে অবুঝের দল বলে হিজিবিজি—তাই যে ভবিষ্যতে গভীর চিন্তাশীলতার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে একথা তিনি কেবল নিজে বিশ্বাস করতেন না বান্ধবীকেও বিশ্বাস অনুসরণে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এমত অবস্থায় মহিলা নির্লিপ্ত থাকতে পারলেন না, দৃঢ়ভাবেই জানাতে হোল—"ছবি যদি না বোঝেন ত অভদ্রোচিত প্রশ্ন না করাই ভাল।"

দরদীর তেজীয়ান সমবেদনায় শিল্পী যথেষ্ট মনে বল পেলেও ভণ্ডাবতারের প্রশ্নে গাছের উল্লেখ থাকায়—তাঁহার বক্তব্য চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। বাস্তবিক শিল্পী চেয়েছিলেন, শূন্য মাঠে দগ্ধ মাটির উপর একটি সবল, পুষ্ট সবুজে ভরা গাছ, কেবল একটি মাত্র গাছ, দিগন্তব্যাপী মাঠের প্রহরী হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকবে শূন্যতার সৌন্দর্য্যকে ভীড়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তিনি সবুজকে স্বশব্দে চিন্তা করছিলেন।

ভাবগতিক দেখে মাদ্রাজি ভদ্রলোক মহিলাকে বললেন জড়ান ভাষায়—উত্তর ঠিক হচ্ছেনা আপনি চিত্রকরকে বলুন সোজা কথায়। উত্তর দিলে সাধু বাবা নিশ্চয় মনস্কামনা পূর্ণ করে দিতে পারবেন। আসল কথা রত্নোদ্ধারের জন্য মাদ্রাজী ভদ্রলোক নিজেই উদগ্রীব হয়েছিলেন। রত্ন বলতে নিশ্চয় তিনি গাছের কথা ভাবেন নি। তাঁহার মনে কি ছিল তিনিই জানেন। যাই হোক অবতারের শক্তি পরীক্ষার জন্য, শিল্পী অবজ্ঞার স্বরে বললেন—"আমার ধ্যানের রূপ চাক্ষুস করাতে পারলে বুঝব উনি পূর্ব্ব জন্মে শিল্পী ছিলেন।"

ভণ্ডাবতারের পূর্ব্বজন্মের খবর আমি রাখিনা। মৃত্যুর পরেও বেকার বসে থাকব—অবতার কি ভূতের ব্যাপার খাটব—তা জানি না। বর্ত্তমানকে সামলান হল আমার কাজ। উপস্থিত আপনি যে ভাবে স্মৃতির দরজায় আছাড় খেয়ে অতীতের পূজায় নেমেছেন, তাতে মনে রাখার আড়ম্বর যথেষ্ট থাকলেও ভোলার দিকটাই বেড়ে উঠেছে। লোকে জানে আমি ঐন্দ্রজালিক, ও অন্তর্যামী অর্থাৎ thought reading কিছু জানা আছে, তাই ব্যাঙের ছাতা দেখে বুঝলাম ঐখানে একটি গাছ বসাবার চেষ্টা করেছিলেন। একটু আগেই পোলের নীচে এ পাশে ও পাশে যে বাবলা গাছের জঙ্গল দেখেছেন তার থেকে একটিকে এখানে লাগিয়ে দিলে চলবে ?

শিল্পী—তার মানে আমার আঁকা ছবির উপর আপনি হাত চালাতে চান, প্রকারান্তরে জবরদস্তি গুরু-গিরির প্রস্তাব। আপনার কথা শুনে হাসি পায়। জঙ্গল থেকে বাছাই করা যে গাছের উল্লেখ করলেন তা ক্ষণ-স্থায়ী। শুকুলে জ্বালানী কাঠ হয়ে যায়, যা স্থূল বাঁচার প্রয়োজনে হেঁসেলের সম্পদ হতে পারে, কিন্তু উদরপুষ্টিই আমার জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন নয়। আমার মানস বৃক্ষ হোল, চিরসবুজ চিরস্থায়ী এমন একটি দুর্ল্ভ বস্তুকে সকলে কি চামড়ার চোখে দেখতে পায় ?

অবতার। আমার দিব্য দৃষ্টি নেই স্বীকার করি, তবে অন্তঃদৃষ্টি আছে। তাই দিয়ে বুঝেছিলাম আপনি যা দেখতে চেয়েছিলেন অথচ ছবিতে দেখাতে পারেন নি তাই আমার কলা কৌশলের সাহায্যে ধরে দিতে পারি। গাছ ধরার প্রকরণে একটু ভোজবাজীর খেলা দেখানর ইচ্ছা ছিল, বেশী কিছু নয়। আমি জানি, আপনি একজন স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ, যাকে লোকে বলে জিনিয়াস। শিষ্যত্ব গ্রহণ যে জিনিয়াসের ধাতে সয় না সে খবরও রাখি, কিন্তু করি কি, আমার দুর্বলতার কথাটাও একটু ভাবুন, ঐ একটু ভেলকি বাজীর খেলা। একটা গোটা গাছ এইটুকু কাগজের মধ্যে দেখান কি খুব সোজা কথা—একেবারে তাজা বাস্তবের গাছ—ভেবে দেখুন আমার প্রস্তাবটা।

কল্পনার উপর বাস্তবের অত্যাচার শিল্পীকে জর্জ্জরিত করে ফেলছিল। পীড়ন অসহ্য হওয়ায় অন্তর্জ্বালা প্রকাশ না করে পারলেন না, ক্রূর অবজ্ঞার হাসি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "জঙ্গলী গাছের প্রতি যে রকম আশক্তি দেখছি, তা আপনাকে বুনো বলেই মনে হয় অথবা আপনি জাত Philistine—বর্ব্বরতার প্রচারক।

শ্লেষের বাণী যেভাবে উদ্গীরণ হোল তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে ভদ্রাচারের আড়ালে থাকা সম্ভব হোত না। কিন্তু অবতার কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্তবিপ্লবের যেটুকু বাহ্যিক আলোড়ন প্রকাশ হয়েছিল তা মল্ল-যোদ্ধার অনুকরণে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গী। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের বিশাল বক্ষ তখন ক্রমান্বয় স্ফীত হতে আরম্ভ করেছে। বাঘের থাবার মত হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হওয়ায়, পাথর ভাঙ্গা বড় হাতুড়ীর মত লাগছে। আস্তীন গোটান পাঞ্জাবীর হাতার বাইরে যেটুকু পেশিবহুল বাহু দেখা যাচ্ছিল তা বদ্ধমুষ্টির প্রতি-ক্রিয়ার জাহাজ বাঁধা মোটা দড়ীর মত পাক খেয়ে গিয়েছে। সংক্ষেপে গৈরিক বেশধারীর বিশাল ও অটল মূর্ত্তি দেখলে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে কেহ যেন আশু ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী লিখে দিয়েছে। যে কোন মুহূর্ত্তে পাহাড় টললেই পাদমূলের সব কিছুর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে।

শিল্পীর বান্ধবী অবতারের পূর্ণাবয়ব ও দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে যেমন প্রথমে বিপদের সম্ভাবনায় আতঙ্কিতা হয়েছিলেন তেমনি যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার আত্মসংযম দেখে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন। একটু আগে যে চোখের দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হয়েছিল তাই পাহাড়ের সান্নিধ্যে শীতল হয়ে আসতে লাগল। শীতল বললে ভাব পরিবর্ত্তনের পূর্ণ বিশ্লেষণ হয় না,

সম্মোহন জাতীয় প্রভাবে বিমুগ্ধ হয়ে অবতারের তেজস্বী মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এরই ভিতর তিনি (অবতার) কখন রসরাজের স্থান অধিকার করে বসেছিলেন বলা শক্ত। চার চক্ষুর মিলন হওয়ায় বান্ধবীর ঠোঁটে একটু কেমনতর ক্ষীণ হাসির আভাস পাওয়া গেল। আভাস ক্ষীণ হলেও প্রকাশ সতেজ। সে হাসির অর্থ অতি জটিল, যে বোঝে সেও কেমনতর হয়ে যায়। অবতার প্রয়োজন অনুসারে বাস্তবিক অন্তর্যামী হয়ে গিয়েছিলেন। প্রয়োজন উপ্কে দিলে তিনি অনেক কিছুই করে থাকেন। উপস্থিত হাব ভাবে তাঁহার বয়স কমার সাড়া পড়ে গেল।

সাড়া স্বীকার করার জন্য বান্ধবী তখন প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন। অবতারের দিক নিয়ে শিল্পীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওনাকে ক্রেয়নটা দিয়েই দেখনা, উনি কি করেন। ক্রেয়ন দেবার প্রস্তাব, শিল্পীর হৃদয় নিস্পেষিত করে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বার করে আনল।

ধ্বনি তার মুমূর্ষ রোগীর নাভিশ্বাসের মত। বান্ধবীর কাছ থেকে এই জাতীয় বর্ব্বরতার প্রশ্রয় নির্লজ্জের মত প্রকাশ হওয়ায় শিল্পীর মনে হোল তিনি সর্ব্বহারা হতে বসেছেন। অবতারের শক্তি যে কাল্পনিক তাই প্রমাণ করার জন্য শিল্পীর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আসুরিক শক্তিসম্পন্ন বর্ব্বরকে ছোঁয়ার আপত্তি থাকায় ক্রেয়ন বান্ধবীর হাতে দিলেন এবং গদীর উপর উঠে বসলেন। এই সময় শিল্পীর চোখে কেমন একটা ঘোর লেগে গেল। তিনি দেখলেন অবতারের আঙ্গুলগুলো বড় কাঁকড়ার দাড়ার মত বান্ধবীর নিটোল হাতের দিকে এগিয়ে চলেছে, মাংস খাদক হিংস্র নখীর মত তাদের গতি। বিষধর সরীসৃপের সামনে পড়ে গেলে ভেক যে ভাবে আড়ষ্ট হয়ে যায় সেই ভাবে দুর্ব্বল নারীর হাত অবশ হয়ে গিয়েছে. শেষ পর্যন্ত বিষাক্ত দাড়া বান্ধবীর আঙ্গুলগুলি জড়িয়ে ধরল। ক্রেয়ন হস্তান্তরিত হওয়ার পর শিল্পীর ঘোর কেটে গিয়েছিল। তিনি বুঝলেন যা দেখেছেন তা সবই সত্যি। মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের পূর্ণ উপলব্ধি হতে শিল্পী আর থাকতে পারলেন না, বান্ধবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সুন্দরকে এই ভাবে পেঁচিয়ে মারার চেষ্টা কৃষ্টির ইতিহাসে কলঙ্কের ছাপ রেখে দেবে।

বলীদানের পূর্ব্বে বধ্য ছাগশিশু যে ভাবে বাঁচার আবেদন জানায়, ধর্ম্ম কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটায় সেই ভাবে সুন্দরকে হত্যার বিরুদ্ধে শিল্পী প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বান্ধবীর ছোঁয়া ভণ্ডাবতারকে উৎসাহিত করে তুলেছিল, তিনি ক্রেয়নের কেরামতি দেখাবার জন্য বোর্ড আর কাগজ হাতে তুলে নিতেই পট পরিবর্ত্তন হয়ে গেল, গাড়ী ছেড়ে দিল। গল্পের গতিও এইখানে থেমে যাবার কথা কিন্তু ছোঁয়াছুতের টানা পোড়েনে ঘটনাটি যেখানে গিয়ে দাঁড়াল সেখান থেকে আর একটু না এগুলে একটি সরস কেলেঙ্কারীকেও বলীদান দিতে হয়। এতবড় নৃশংসতা আমার দ্বারা সম্ভব নয় সুতরাং পরবর্ত্তী ঘটনার পিছু নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

রদ্দুর এরই মধ্যে চড়া হয়ে উঠেছে। পোড়া মাঠ আর ঝলসান আকাশের দিকে তাকালে গলা আপনা থেকে শুকিয়ে যায়। মাদ্রাজী ভদ্রলোক গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য কমণ্ডলুর মত জলপাত্রটি পরীক্ষা করে দেখলেন শূন্য। প্রাতে অনশন ভঙ্গের সময় জলপাত্রটি নিঃশেষিত হয়েছিল এখন কোন বড় স্টেশন না এলে তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব নয়।

এইরূপ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েই যেন অবতার গাড়ীতে উঠেছিলেন। মাদ্রাজী ভদ্রলোক চাইবার আগেই তাঁহার জলপাত্রটি পূর্ণ করে দিলেন। জলদানের দৃশ্য মহিলাকেও আকৃষ্ট করে ছিল। তৃষ্ণার সহযোগীতা কতকটা হাই-তোলার মত অনুকরণীয় তাগিদ। তিনিও থারমস্ ফ্লাস্কের মুণ্ডু উৎপাটন করলেন, কিন্তু উৎফুল্ল হয়ে ওঠার মত কিছু পেলেন না। তাঁহার পাত্রটিও শূন্য। মহিলা যে দৃষ্টি অবতারের দিকে পাঠালেন তাতে তৃষ্ণার্থীর আবেদন যথেষ্ট থাকলেও অবতার নির্ব্বিকার হয়ে বসে থাকলেন। আচরণটি দোষণীয় বলা চলে না কারণ সৌন্দর্য্য প্রীতি যতই বেসামাল হোক, রূপের মালিক অপরিচিতা হলে, প্রীতির প্রকাশ সংযত করতে হয়। চোখাচোখির পর এইরূপ নির্ব্বিকারচিত্ততা মহিলা আশা করেন নি, কিন্তু তৃষ্ণা অরক্ষণীয় হওয়ায় তিনি অপরিচিতর কাছে জল চেয়ে বসলেন।

পাত্র ও পাত্রীর উপযুক্ততা অনুসারে ভণ্ডাবতার দানের প্রথাও প্রভেদ করে থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে পার্থক্যের বিচার কি ভাবে গড়ে ওঠে তা তিনি নিজেই জানেন না। তিনি নিজেকে ঘটনার নিমিত্ত মাত্র ভাবেন। ভণ্ডাবতার

থারমস্ ফ্লাস্ক পূর্ণ করার পরিবর্ত্তে কাচের গেলাসে জল নিয়ে এলেন। জলপূর্ণ পাত্রটি নেবার সময় যা ঘটার প্রয়োজন ছিল তা ঘটে গেল। স্বচ্ছ কাঁচের গেলাসের ভিতর দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় দেখা যায়। শিল্পীর দৃষ্টিতে ধার ছিল, পথ পরিষ্কার করে নিতে কোন অসুবিধা হয় নি। দৃষ্টির ধারে যা দেখলেন তাতে তাঁহার বুক পর্য্যন্ত চিরে গেল। জালা অসহনীয় হওয়ায় জানালার দিকে সমস্ত দেহটাই ঘুরিয়ে বসলেন।

দৈবদত্ত সুবিধা অবতারকে অধিকতর সাহসী করে তুলল। টিফিন বাসকেট থেকে, চীনে মাটির প্লেট বার করে তার উপর একজোড়া রাজভোগ রাখলেন এবং মহিলার পাশে ধরে দিলেন। ভোজনে তাঁহার প্রবৃত্তি আছে কিনা জানার কিছু মাত্র প্রয়োজন বোধ করলেন না। দানগ্রহণে যথেষ্ট ইতস্ততার বাধা থাকলেও ভব্যতার শাসন প্রত্যাখ্যানেরও বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। মহিলা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুধু হাসলেন না, ধন্যবাদ দিয়ে ফেললেন।

গাড়ী ইতিমধ্যে যেখানে এসে পৌছাল সেইখানেই লাইন খারাপ ছিল। গতি মন্থর হলেও দোলায় কমতি ছিল না। ঝাঁকুনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, রসে ডোবা রাজভোগের সহিত ছোট্ট চামচের বনিবনাও করাতে হলে সার্কাসের কায়দা জানা দরকার। মহিলা এ বিষয় পারদর্শী ছিলেন না। ক্ষুদ্র চামচের চাপ পড়তেই, মিষ্টান্নের বেশ খানিকটা অংশ পিছলে গিয়ে পড়ল শিল্পীর গায়ে। জামা, হাত, কোল রসে মাখামাখি হয়ে গেল। ঘটনাটি "ছ্যাঃ" এর পর্য্যায় তেড়ে উঠতে শিল্পী বিনা বাক্যব্যয়ে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মাখামাখি যেভাবে তাঁহাকে জড়িয়েছিল তাতে আত্মা পর্যন্ত শুদ্ধি না করে উপায় ছিল না। কলঙ্ককে ধৌত করতে গিয়ে স্নানের ঘরে বান ডাকিয়ে ছাড়লেন। ফেরার পথে আহার-রতা বান্ধবীর প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, তাতে ভস্মীভূতা না হওয়ায় বিচ্ছেদের আস্ফালন স্পষ্ট হয়ে উঠল। শিল্পী আবার জানালার ধারে গিয়ে বসলেন। এবারকার বসার ভঙ্গীতে অশোভনীয় সঙ্কল্প যে একটি বিশেষ দিকে চালিত হচ্ছিল তাহাতে সন্দেহ নেই।

অপর দিকে মিষ্টান্ন বিতরণে পক্ষপাতিত্বকে মাদ্রাজী ভদ্রলোক বোধ হয় সুনজরে দেখতে পারেন নি। একটা উস্‌খুস্ ভাব তাঁহাকে যেন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উদ্বাস্ত করে তুলেছিল। এক প্রকারের নিরামিষ-ভোজী চরিত্রবান ব্যক্তি থাকেন যাহারা আমিস্ কেলেঙ্কারীর সন্ধান পেলে আড়াল দিয়ে পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় বিশেষ আনন্দ পান। অবতার ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একদিকে বিস্ফোরণোন্মুখ শিল্পীর ভাবপ্রবণতা, অপর দিকে দরদী মাদ্রাজীর অপদৃষ্টি।

নিরীহ রসমন্থনের পরিচর্য্যায় এইরূপ একটি বিপর্যয়ের আবির্ভাব হবে তা অবতারের গণনায় ধরা পড়ে নি।

নিরীহ পরকীয়া চর্চ্চায় নির্বিঘ্ন হতে হলে উৎকোচদানে অপদৃষ্টিকে আড়াল দিতে হয়। অবতার ভেবে দেখলেন—একমাত্র রাজভোগই তাঁহাকে উৎপাত থেকে উদ্ধার করতে পারে।

কাল বিলম্ব না করে, আর একটি প্লেট পরিপূর্ণ করে বেদরদীর সামনে এমন ভাবেই রাখলেন, যাতে—প্রমাণ হয় ব্যবস্থা আগে থাকতেই ঠিক ছিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোকও যে ভাবে গ্রহণ করলেন তাতে অনুমান করা চলে এই রূপটিই তিনি প্রত্যাশা করছিলেন। ভক্ষ্যণীয়গুলি গুছিয়ে নিয়ে বসার সময় তিনিও সকলের দৃষ্টি আড়াল দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। (দৃষ্টি দানের ভয় থাকায় সংস্কারবদ্ধ মাদ্রাজীদের মধ্যে অনেকে এই প্রথায় আহার করে থাকেন)

ইতিমধ্যে মহিলার ভোজন শেষ হওয়ায় শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোয়ালেটা রাখলে কোথায়? সঙ্গীর মাথায় তখন ঝড় বইছে। ঝড়ের প্রবল প্রবাহে নিকটের সব কিছু দূরে চলে গিয়েছে, এমন দূর—যেখানে প্রেম বাসনা ব্যর্থতা সব একাকার হয়ে যায়। শিল্পী নিজেকে সীমাহীন দূরে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তন্ময় ব্যক্তিকে তোয়ালে খোঁজার বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য সামনের ফোলডিং টেবিল (folding table) থেকে একটি নতুন মুখমোছা ছোট্ট দামী তোয়ালেতে দামী আতর মাখিয়ে মহিলার হাতে দিলেন। কোথা থেকে আতর এসে গেল বলা শক্ত। ক্রেয়ন বার করার মতই যেন আতরের সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা জড়িয়েছিল। সৌখিনতার মধ্যেও জাত থাকে। খাস গোলাপের রং আভিজাত্যের দম্ভ নিয়ে আঁধার থেকে বাইরে আসতেই মন-মজান গন্ধে

পরিবেশকে মাতিয়ে তুলল। সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধে সুপ্ত উচ্ছ্বাস যেন সজাগ হয়ে উঠতে চায়। উচ্ছ্বাস কিসের এবং কার কাছে নিবেদনের জন্য ব্যাকুল তা মহিলার কাছে গোপন না থাকলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করার বাধা ছিল।

সুঘ্রাণকে উপযুক্ত সমাদর দেবার জন্য তোয়ালেকে মুখের অতি নিকটে নিয়ে এলেন, তারপর নিজের পাশে রেখে স্নানাগারে যাবার জন্য উঠছিলেন। অবতার পরিস্কার ভিজে গামছা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওদিকে যাবেন না, ঘর জলময় হয়ে গিয়েছে—বোধ হয় তলার পাইপ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে।

সুগন্ধের প্রভাবে যে উচ্ছ্বাস অন্তরকে চঞ্চল করে তুলেছিল তাকে শাসনাধীন করা সম্ভব না হওয়ায় দুটো কথা বলার জন্য ব্যাকুল তাগিদ মহিলার মুখ খুলে দিল। ক্রেয়ন আর গাছ আঁকার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও কি ছবি আকেন?

ভণ্ডাবতার:—আমি ভোজবাজীর খেলা দেখাই, লোকের মনের কথা বলে দিতে পারি, এমন কি দরকার হলে মানুষের হুবহু ছবি এঁকে দিতেও কোন অসুবিধা হয় না। এমন ছবি যে দেখলেই এক কথায় বলে দেওয়া যায়, অমুক মানুষের চেহারা।

মনের কথা বার করে আনতে পারেন শুনে, মহিলার মুখ যেন লজ্জায় নত হয়ে গেল, অবতারের শক্তি পরীক্ষা কৌতূহল চরিতার্থের ইচ্ছা প্রবল হলেও যা গোপনীয় তাকে অনুপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করার সাহস ছিল না। মৌন অবস্থায় খানিকটা সময় কেটে যেতে মহিলা বললেন, আমি জানতে চেয়েছিলাম, আমার ছবি এঁকে দিতে পারেন?

ভণ্ডাবতার:—আপনার চেহারা হুবহু এঁকে দিলে উনি আপত্তি তুলবেন না তো?

মহিলা:—আমার চেহারা অপরের মত হয়ে গেলে এঁকে লাভ?

অবতার—উৎসাহিত হয়ে বললেন—সামনের ষ্টেসনেই কাজ আরম্ভ করা যাবে। ইতিমধ্যে আপনার বন্ধুকে ড্রইং প্যাড (Drawing Pad) খালি করে দিতে বলুন, ওনার ছবির ওপর তো আর একটা ছবি চড়াও করা যায় না।

শিল্পীর দৃষ্টি বাইরের দিকে থাকলে কি হয়, কানকে কড়া পাহারায় ভিতরে আটক রেখেছিলেন। ছবি আঁকবার ও আঁকার প্রস্তাব শুনে শিল্পী প্রথমে ভেবে ছিলেন তাঁহার উপর টিটকারীকে জমজমায়েত করার জন্য উভয়ের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র চলেছে। বেআবরু শুভদৃষ্টির আদান প্রদানের সঙ্গে রস ছড়ানর যোগাযোগ, টিটকারীর অনুমানকে সুনিশ্চিত করে তুলল। ঐ মোষের মত দেখতে মানুষটির কাছ থেকে ছবি আঁকার প্রত্যাশা হাস্যকর মনে হলেও, উভয়ের অশোভনীয় আচরণ থেকে শিল্পী বুঝেছিলেন, ব্যাপারটি নিরীহ রসিকতার সীমানা পার হয়ে গিয়েছে। নিজের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস তাতে অবতারের পক্ষে হুবহু চেহারা এঁকে ফেলাও বিচিত্র নয়। সত্যই যদি এইরূপটি ঘটে, তাহলে ভোঁতা বাস্তবেরই জয়জয়কার হয়ে যাবে, ছবির সূক্ষ্মরস বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা কেউ ভাববে না। বিভৎস রুচির প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্যই বান্ধবীকে বলতে হোল, তোমার চেহারা হুবহু তোমার মত দেখতে হলে তুমি খুশী হবে না এবং অপরে যারা তোমাকে ঠিক তোমার মত করে দেখতে চায় না তাদেরও অসুবিধায় ফেলবে।

শিল্পীর উক্তিতে যে ঝাঁজ ছিল তাতে তেতে ওঠার উপকরণ যথেষ্ট থাকায়, নিজের বাহ্যিক রূপকেই যে তিনি (বান্ধবী) ভালবাসেন তাই প্রমাণ করবার জন্য অবতারকে বললেন, সামনের স্টেশনে তো গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াবে, আঁকুন না। অবতার দেখলেন, যে পাত্রে সুন্দরের অর্ঘ্য দেবেন তাই তো শিল্পীর জিম্মায়, বলতে হোল উনি ছবি আঁকার বোর্ড আর কাগজ দিলে তবে তো ক্রেয়নকে চালু করা যায়। অসুবিধার কথা জানিয়ে একটি লোভনীয় প্রস্তাবও এগিয়ে দিলেন। জানালেন, তাঁহার কাছে রঙ্গীণ ক্রেয়ন আছে-যা দিয়ে, লিপষ্টিক (lipstick) আর রুজের রং পর্য্যন্ত ছবিতে এসে যাবে।

এতবড় প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব হোল না বান্ধবী বললেন, আপনি ক্রেয়ন বার করুন, আমি বসছি।

শিল্পী। (বান্ধবীকে উদ্দেশ্য করে) শেষ পর্য্যন্ত দেখছি ভেলকি বাজীর খেলা না দেখা পর্য্যন্ত থামবে না। তার আগে আমার ছবিটা বাঁচাতে হয়। সদ্যজাত শিশুকে অভিজ্ঞ ধাত্রী যেমন রূপে আলগোছে মাতৃক্রোড় থেকে তু-

অতি যত্নে অন্যত্র শুইয়ে দেয় সেই ভাবে শিল্পী তাঁহার ছবিকে পাতলা টিস্যু কাগজে মুড়ে স্যুট-কেশে তুলে রাখলেন —মড়াকে আঁকড়ে থাকা ও মৃতপ্রায় গর্ভস্রাবের প্রতি আকর্ষণে কোনই প্রভেদ নেই। মাতৃস্নেহ যখন সত্যকে স্বীকার করতে পারে না, তখন মড়াকেই বাঁচা ভেবে যতক্ষণ পারে সান্ত্বনা খুঁজে নিয়ে থাকে। অবতার সাময়িক প্রভাব মেনে নিয়ে মড়ার পরিচর্য্যায় শিল্পীকে ছেড়ে দিলেন। অন্যথায় সত্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে নিজের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়।

নতুন কাগজের প্যাড হাতে আসতে পুনরায় সর্ব্বাধার হাতড়ে নতুন রঙ্গীণ ক্রেয়ন বার করে আনলেন এবং তোড়জোড় মনের মত হতে মহিলাকে বললেন, আলো ওদিকে বড্ড চড়া—আপনি এদিকে এগিয়ে আসুন, আর মুখটা সামান্য আমার দিকে ঘোরান। না না অতটা নয়, একটু হলেই হবে। আহা কি করলেন, ও যে বড্ড বেশি হয়ে গেল। আপনি পারছেন না, আমি পোজটা (pose) ঠিক করে দি। শাড়ীর ভাঁজগুলোও অগোছাল হয়ে আছে। উঠে নিজে না ঠিক করে দিলে কিছুই হবে না। শাড়ীর ভাঁজে হস্তক্ষেপ করায়, শিল্পীর বান্ধবী বা শিল্পীর সম্মতি আছে কিনা জানার অপেক্ষায় অবতার থাকতে পারলেন না। উঠে এসে মডেলকে গুছিয়ে বসার ভঙ্গী দেখিয়ে দিতে লাগলেন, তার সঙ্গে শাড়ীর অগোছাল ভাঁজ ও ঠিক হয়ে যেতে লাগল। বেগমান গতিতে অবতার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন—মডেলেরও সহযোগিতায় কোন আপত্তি দেখা গেল না। চিবুকে হাত রেখে মুখের ভঙ্গী নানাদিকে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন, কিছুতেই পোজ মনমত হতে চায় না। শাড়ীর ভাঁজেও রসাত্মক গোছানর প্রণালী যে ভাবে ছোঁয়ার সুবিধা একটু একটু করে এগিয়ে নিচ্ছিল, তাতে এখুনি বাধা না দিলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘায়ের মতই যে ঘটনাটি দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিল্পী কাল-বিলম্ব না করে, অবতারের রূপ চর্চ্চায় বাধা দেবার জন্য মডেলের গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন, ঘনীভূত হবার অধিকার কার বেশী দেখানর প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আচরণটি শোভনীয় বলেই মানতে হয়।

শিল্পী নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে সাফল্যলাভ করলেন তাতে যা দর্শনীয় তাই ঢেকে গেল। সাত্বিক প্রথায় রূপ ও রেখার ছন্দে যে হিংস্র উচ্ছাসের প্রকাশ হোল তাতে চিত্তাকর্ষক গঠন চূড়ার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। পরশ্রীকাতর শিল্পীর চেষ্টায় বান্ধবী একটি জীবন্ত পোটলা হয়ে গেলেন। পূর্ণাঙ্গী ও যৌবনমদমত্তা নারীকে সচল পুলিন্দা বানিয়ে দেয়ায় অবতারের ছবি আঁকার স্পৃহাও ঝিমিয়ে গেল। বেরসিকের প্রতি বশ্যতার এইরূপ নিদর্শন দেখে অবতারের মন তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি শিল্পীর বান্ধবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শিল্পীর আদর্শ সামনে রেখে ছবি আঁকা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে আপনার হুবহু চেহারা যদি চান তাহলে আমার রূপসৃষ্টির কারখানায় আসতে হবে। গণ্ডগোলে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল, অবতারও শেষ কথা বলে দেবার পর সব চুপ চাপ বসে রইলেন।

গাড়ী ছেড়ে দেবার পর ট্রেনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। পরের দিন খড়্গপুর ষ্টেশন আসতে, মাদ্রাজী ভদ্রলোক প্ল্যাটফরমে মাল নামাবার সময় অবতারের নাম পড়ে নিয়েছিলেন। বিদায় নেবার আগে রাজভোগের জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন, তিনি গোড়ায় অবতারকে চিনতে না পারার জন্য লজ্জিত। ত্রুটি ক্ষমা করলে তিনি খুসী হবেন।

খড়্গপুর থেকেও যথাসময় গাড়ী ছাড়ল। তিনটি প্রাণীই নির্ব্বাক, সমস্ত রাস্তাটাই এই ভাবে কাটল। হাওড়ায় গাড়ী আসতে বান্ধবী অবতারের কাছে গিয়ে বললেন, আপনার নাম আর ঠিকানা দেবেন? আমি আপনার কারখানায় যাব। ফোন থাকলে যাবার আগে জানিয়ে দেব।

অবতারের মুখশ্রীতে জয়োল্লাসের ইঙ্গীত পাওয়া গেল, তার সঙ্গে একটু মনচোরা বাঁকা হাসিরও প্রকাশ হয়েছিল, চোরাই কথা নির্ব্বিঘ্নে পার করে দেবার পর পকেট থেকে Visiting Card বার করে দিলেন। কার্ড বড় বড় দেশী ও বিদেশী খেতাবে ভরা। কোনার দিকে টেলী-ফোনের নম্বর ও ঠিকানাও লেখা ছিল।

অবতারের নাম পড়ে বান্ধবী খানিকক্ষণ বিস্ময়াভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তার পর তাঁহার অজ্ঞাতেই স্বগত দুইটি কথা বেরিয়ে এল, "এও কি সম্ভব"।

আমাদের গল্পের মালিক, অবতার, যিনিই হন তাঁহার

আসল পরিচয় জিনিয়াস-মার্কা শিল্পীর কাছে অগোচর রয়ে গেল। বান্ধবীর ব্যবহারে জিনিয়াসের ক্ষণভঙ্গুর আত্মসম্মান বোধ হয় এমনভাবেই বিধ্বস্ত হয়েছিল যে গৈরিক বেশধারী মানুষটিকে জানার ইচ্ছাকেও কৌতূহল নাড়া দিতে পারে নি।

ক্ষণিকের পরিচয়ে দুইটি প্রাণীর মাঝে যে আকর্ষণের সূত্র গড়ে তুলেছিল তা ভবিষ্যতের ঘটনায় কি ভাবে যোগ রেখেছিল তার বিষদ বিবরণের প্রয়োজন দেখি না। এইটুকু লিখলেই হবে যে রূপসৃষ্টির কারখানায় বান্ধবীর ডাক প্রায় টেলিফোনে শোনা যেত।

শরৎচন্দ্রের শিল্পধর্ম

শ্রীরাধাবল্লভ দে

সংসারে ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, স্খলন পতন এবং অন্তরের অসংখ্য দুর্বলতা আছে, কিন্তু জীবনবিধির এই ব্যতিক্রমকে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনের দোহাই দিয়া শরৎ-চন্দ্র কখনও রক্তচক্ষুতে শাসন করিতে প্রয়াস পান নাই। এই ত্রুটি বিচ্যুতি বা দুর্বলতার অন্তরালে যে আসল নরনারী ও তাহার মহান্ ধর্ম, তাহাকে তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধার স্বর্ণ-পীঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার সমগ্র সাহিত্যে হতভাগ্য হতভাগিনীদের নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া কৌতুক দেখিবার স্পৃহা কোথাও নাই। বরং তাহাদের মধ্যে যে আর একটি মানুষ অন্তরে প্রতিনিয়ত দগ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে, তাহাকে উজ্জ্বল ও মহান্ করিয়া তিনি এই হতভাগা হতভাগিনীদের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাহিরে ডানপিটে, দুর্দান্ত, কিন্তু অন্তরে মহাপ্রাণ ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন "সৃষ্টিকর্ত্তা এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া-ছিলে এবং কেনই বা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে? বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বার বার এই প্রশ্ন করিতেছে। ভগবান! টাকাকড়ি ধন-দৌলত বিদ্যাবুদ্ধি ঢের তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্য্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারলে।" (শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব) পাপিষ্ঠ, অসংযমী, চঞ্চলচিত্ত দেবদাসের জন্যও শরৎচন্দ্রের করুণার অক্ষয় উৎস। তাই দেবদাস উপন্যাসের উপসংহারে তিনি বলছেন, "যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হউক—যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে! মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌছে। যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহমুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।" দুভাগ্য এবং দুর্ভাগিনীদের জন্য করুণার বারি তাঁহার চিরদিনই এমনি অফুরন্ত। এমনি অপরিসীম। তাহাদের প্রতি ঘৃণায় কোথাও তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র বলেন—যাদের আমরা ঘৃণা করি, অবহেলায় সরিয়েছি দূরে, তাঁদের মধ্যেও বসে আছে মহিমাময়ী নরনারী প্রকৃতি-ধ্যানরতা। এ বিচারে চাই সহানুভূতি। এ বিচারে চাই অন্তর্দৃষ্টি। 'চরিত্রহীন'এর সাবিত্রী বালবিধবা, নীতি-শাস্ত্রের বিচারে তার ভালবাসার অধিকার নাই। কিন্তু যে ভালবাসায় দেহের প্রতি রক্তবিন্দু সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে সাবিত্রীর ভালবাসা সে ভালবাসা নহে। যে সর্বহারা প্রেমে মানুষ দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অন্তরকে শুচি ও মহান করে, এ সে প্রেম। সাবিত্রীর অকুণ্ঠ প্রেমের মন্দাকিনীতে স্নান করে সতীশের জীবনের ধারা একেবারে বদলে গেল। সতীশের একাগ্র ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে সে বললে "না আর একটা কথাও না। তোমার দেহকে তুমি পূর্ব্বেই নষ্ট করেছ। সে না হয় একদিন পুড়ে ছাই হতে পারে। কিন্তু একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে

আর কালী মাখিয়ো না।” নয় বৎসর বয়সের বিধবা সাবিত্রী ক্ষণিকের ভুলে দুর্বৃত্তের প্রলোভনে গৃহত্যাগ করেছিল সত্য, কিন্তু শিল্পী শরৎচন্দ্র তার অকলঙ্ক চরিত্রের অপরিসীম শুভ্রতায় ছায়াপাতের অবকাশ দেন নাই। শ্রীকান্তের পিয়ারী বিধবা না হইলেও তাহার বিবাহ বৈধব্যের নামান্তর। তাহারও সর্ব্বজয়ী ভালবাসার সার্থকতা আত্মার নিঃশেষ দানে। এমন একনিষ্ঠ প্রেম, সর্ব্বজয়ী সাধনা নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ। যে বৃহৎ তপস্যা মানুষকে সব বিসর্জ্জনের সন্ধান দেয়, আত্মসুখের বা আত্মতৃপ্তির নহে। শ্রদ্ধা না করিতে শিখিলে অন্তর ধর্ম্মই মিথ্যা। তাই শরৎচন্দ্র সাবিত্রী রাজলক্ষ্মীর মানবতাকে খর্ব করে সমাজ মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। সাপুড়ের মেয়ের একান্ত সেবা-যত্নে যমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুঞ্জয় যখন তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সনাতন হিন্দুত্বকেই অশ্রদ্ধা করিয়া বসিল, তাহা গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র বলেন “তবু এতবড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না।” (বিলাসী) শরৎচন্দ্রের মতে উৎপীড়িত ব্যথিত বা ঘৃণার পাত্রকে ঘৃণা করায় কোন পৌরুষ নাই। কিন্তু তাহাকে স্নেহালিঙ্গনে মহান করিয়া তোলার এবং অন্তরের সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ভিতর গৌরব আছে। তাই ঘৃণিত ‘আঁধারের আলোর’ বিজলী অথবা দেবদাসের চন্দ্রমুখীকেও তিনি জীবন যাত্রার বিপরীত স্রোতে পরিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। আপন ভুলের সংশোধন করিয়া অনুতাপ অনলে শুদ্ধ হইয়া সৌদামিনী যখন আবার স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসেন, সমাজের দোহাই দিয়া তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিয়া তিনি মানবতার অপমান করিতে পারিলেন না। এইখানেই শরৎচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ও দুঃসাহসিকতা। (স্বামী) ক্ষণিকের ভুলে, সৃষ্টির অপ্রতিহত দুর্নিবার বিচিত্র আকর্ষণে কুলের বাহির হইয়া যাহারা আত্মহত্যা করিয়া বসিল, আত্মদান করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও যাহারা চিরদিন বঞ্চিত, যাহারা ভালবাসায় সর্ব্বহারা রিক্ত, পৃথিবী তাহাদিগকে যত লাঞ্ছনাই করুক, তিনি তাহাদিগকে কখনও অপমানিত করেন নাই। আমি শরৎচন্দ্রের তিনটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কারণ এই তিনটি উক্তিতেই তাঁহার শিল্পধর্মের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাই। “সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না। নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নাই—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার—কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। (৫৭ জন্মদিনে প্রতিভাষণ)

“পাপকে যতদিন না সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া যাবে, যতদিন না মানুষের হৃদয় পাথরে রূপান্তরিত হবে। ততদিন এ পৃথিবীতে অন্যায়, ভুলভ্রান্তি থেকে যাবে এবং তাকে ক্ষমা করে প্রশ্রয় দিতেই হবে··· ভালবাসার মর্ম্ম যদি কখনও পাও, তখনই বুঝবে, অন্যায়, অমধ, অক্ষমতাকে ক্ষমা করে প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্মেরই অনুশাসন” (চরিত্রহীন)

“হেতু যত বড়ই হউক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়। আমার লেখায় যেন না এত বড় অন্যায় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছে এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পেয়েছি সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।” (ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মদিন অভিনন্দনের উত্তরে ভাষণ)

বিবেকানন্দ ও গার্হস্থ্যধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

আজ হতে শতবর্ষ পূর্বে যে মহামানব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর জীবনের আদর্শ প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনের চলার পথকে কুসুমাস্তৃত করে রেখেছে। স্বামিজী ছিলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসধর্ম সম্বন্ধে সিষ্টার নিবেদিতার উক্তিগুলি পড়লেই আমরা বুঝিতে পারিব তাঁর সন্ন্যাস সম্বন্ধে মতবাদ কি ;—"স্বামিজীর চক্ষে তাঁহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি যার পর নাই মূল্যবান ছিল। সকল অকপট সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার নিজের পক্ষেও বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। ঐ বিষয়ক প্রবৃত্তির স্মৃতি পর্যন্ত যাহাতে মনে মনে স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল এবং তিনি কায়মনোবাক্যে আপনাকে এবং নিজ শিষ্যবর্গকে উহার লেশমাত্র আশঙ্কা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার নিকট অবিবাহিত থাকাটাই একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা লাভের জন্যই সর্বদা উৎসুক থাকিতেন না, কিন্তু তৎসঙ্গে পাছে ব্রতভঙ্গ হয় এই ভয়েও সদা আকুল থকিতেন।" সিষ্টার নিবেদিতার এই আলোচনায় যদি আমরা মনে করি স্বামিজী স্ত্রীলোকদের ভয় করিতেন তাহা হইলে ভুল হইবে। স্বামিজী বাস্তবে স্ত্রীলোককে ভয় করিতেন না। তিনি ভয় করিতেন প্রলোভনকে। আমরা তাঁর পরিব্রাজক জীবন আলোচনা করলে দেখতে পাবো— তাঁর বহুকার্যের, লেখার সাথি স্ত্রীলোক। তিনি ভারতের প্রাচীন ধারা অনুযায়ী যেখানে কোন মেয়ের সংস্পর্শে এসেছেন তখনি তাদের সঙ্গে—মেয়ে, বোন, মাতা, মাসীমা, মামীমা ইত্যাদি করে একটা সম্বন্ধ পাতিয়েছেন। একথাও সিষ্টার নিবেদিতা আচার্য-বিবেকানন্দ গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। স্বামিজী-সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষায় নানাভাবে বলিয়াছেন—সন্ন্যাসী নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই ভাবিবেন না, কারণ সন্ন্যাসী ঐ দুয়ের বাইরের। সন্ন্যাসীদের কৌমারব্রত গ্রহণের অর্থই দশের হিতের জন্য নিজের হিত বিসর্জন দেওয়া। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে হইলে চাই সংযম। আচার্যের মতে—যে কোন পথ দিয়াই হউক প্রকৃত মহত্ত্ব অর্জন করিতে হইলে আত্মাকে দেহের প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতেই হইবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেছেন—একজন বড় সাধুর ভিতর আছে বড় কর্মী বা রাজ্যের গুণশালী প্রজা হইবার যোগ্যতা। কিন্তু ইহার বিপরীত পক্ষের সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা তাহা স্পষ্ট হয় নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালে সিষ্টার নিবেদিতাকে বলেছিলেন "একথা সত্য যে, এমন সব স্ত্রীলোক আছেন, যাদের দেখা মাত্রই মানুষ অনুভব করে যে কে যেন তাহাকে ঈশ্বরাভিমুখে ঠেলিয়া দিতেছে। কিন্তু আবার এমন স্ত্রীলোক আছে, যারা তাঁকে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।"

গার্হস্থ্যধর্মে প্রেম ভালবাসার স্থান অতি উচ্চে—প্রেম সর্বদাই আনন্দের বিকাশ মাত্র, যখনি উহার উপর দুঃখের এতটুকু ছায়া আসিয়া পড়ে, তখনি জানিতে হইবে, উহা সেই সুখ ও স্বার্থপরতা দুষ্ট হইয়াছে। স্বামিজীর মতে —আদর্শ পত্নী হইতে হইলে একমাত্র স্বামীর প্রতি জ্বলন্ত হ্রাসবৃদ্ধিহীন নিষ্ঠা থাকা চাই।

সিষ্টার নিবেদিতা স্বামিজীর জীবনকথায় বলেছেন— ১৮৯৯খৃঃ স্বামিজী ইংল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাগমনকালে আমাকে বলিয়াছিলেন—জাহাজে আসিবার সময় দেখিলাম, জাহাজে কয়েকজন পাদ্রি কয়েক গাছি রৌপ্যনির্মিত বিবাহবলয় সকলকে দেখাইতেছিল ; ঐগুলি দুর্ভিক্ষের সময় তামিল মেয়েরা বিক্রয় করিয়াছে। এই গল্পটির পশ্চাতে যে তাঁর মনে একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখবোধ রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিলাম অর্থাৎ মেয়েরা কতখানি দুঃখের মধ্যে পড়িলে তবে তাঁদের বিবাহবলয় বিক্রয় করিতে পারে এই দুঃখটা তাঁর মনে বারে বারে ঘা দিতেছে। আমরা তখন বলিলাম—বিবাহবলয় প্রয়োজনে বিক্রয় না করা একটা

কুসংস্কার মাত্র। স্বামিজী তখনই বলিয়া উঠিলেন—তোমরা ইহাকে কুসংস্কার বলিতেছ? উহার পশ্চাতে যে মহান্ সতীত্বের আদর্শ রহিয়াছে তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না? সিষ্টার নিবেদিতা সতীত্ব শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—স্বামিজীর মতে পত্নীর স্বামীতে শুধু নিষ্ঠাই থাকিবে তাহা নহে, যে নিষ্ঠার এতটুকু ইতর বিশেষ হইবে না। এই আদর্শ আমার ভাল লাগিতেছে না বলিয়া ঐ নিষ্ঠাকে এতটুকু এদিক ওদিক করা চলিবে না।

স্বামিজীর জীবনবেদ আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট হয় যে—বিবাহ দ্বারা আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ হয়। স্বাধীনতা অর্থে নৈষ্কর্ম্য পারের অবস্থাই লক্ষ্য। গার্হস্থ্যধর্মে বিবাহে দুইটী প্রাণীকে অনন্তকালের জন্য একটি বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিল। সিষ্টার নিবেদিতা আচার্য শ্রীবিবেকানন্দ পুস্তকে বলিয়াছেন—স্বামিজীর মতে মানুষের জীবনে বিবাহও আত্মার একটি মুক্তি পথ। তিনি আমাকে এক বৃদ্ধ দম্পতির যে গল্প বলিয়াছিলেন তাহা আমি কখনই ভুলিব না। এক বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী পঞ্চাশ বৎসর গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করিয়া, বার্ধক্যে তাহারা (work house) দরিদ্র নিবাসের দরজায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রথমদিনের অবসানে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কি; মেরী নিদ্রা যাইবার পূর্বে একবার আমি তাহাকে দেখিতে ও চুম্বন করিতে পাইব না? আমি যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রি ঐ রূপ করিয়াছি।" তাহার ঐ মহৎ কাজের কথা ভেবে স্বামিজী অতি আগ্রহের সঙ্গে বল্লেন —"একবার ভাবিয়া দেখ! একবার ভাবিয়া দেখ! এরূপ সংযম ও নিষ্ঠার নামই মুক্তি, এই মিলনেই দুটি আত্মার পরম শ্রেয়ঃ ও মুক্তির পথ হইয়াছে।

স্বামিজীর মতে, আদর্শানুযায়ী পুত্রকন্যার গার্হস্থ্য-ধর্মপালনে ঐচ্ছিক হওয়াই শ্রেয়ঃ। ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার। সিষ্টার নিবেদিতার একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন জীবন কথার মধ্যে—একবার একটি বালিকা ধর্মজীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগবশতঃ বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তদানীন্তন সমাজ ও তাহার পিতামাতা ইহাতে অনিচ্ছুক। তখন মেয়েটি স্বামিজীর শরণাপন্ন হয়। স্বামিজী তখন তাহার পিতামাতাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হন। এই মেয়েটি দীর্ঘকাল যাবত নির্জনে ধ্যান, চিন্তা জীবনের অঙ্গস্বরূপ করিয়া আছে। এইরূপ উচ্চ ভাব থাকায় মেয়েদের জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া স্বামিজী অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। স্বামিজীর মতে সমাজের নানা শ্রেণীর স্ত্রীলোক বিবাহিত হইলেও তাঁহাদের তিনি অবিবাহিত বলিয়াই গণ্য করিতেন—বালবিধবা, কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী, বিবাহের যৌতুক অভাবে পরিত্যক্তা স্ত্রী।

স্বামিজী হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে বলিতেন—"বিধবা-গণের সতীত্বরূপ স্তম্ভের উপরই সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্পদ দাঁড়াইয়া আছে। "কিন্তু পুরুষদিগকেও তিনি বলিতেন—স্ত্রীলোকদের যেমন বৈধব্য পালন ধর্ম, সেইরূপ পুরুষ-দিগকেও বিপত্নীক ধর্ম অবশ্য পালন করিতে হইবে। স্বামিজী প্রাচ্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিতেন—ঐ দেখ প্রাচ্যের নির্দিষ্ট বিবাহ পদ্ধতি—একটি অগ্নি—প্রজ্বালিত, গার্হস্থ্যধর্মী প্রকৃতি পুরুষ ঐ অগ্নিশিখার মত আজ হইতে তাঁরা আত্মায় আত্মায় এক, সমধর্মী, ইহারা আজ হইতে প্রতি সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্রেই অগ্নিতে হবিঃদান করিবে। এই নিয়মানুবর্তিতা হইতে কি আমরা শিক্ষা পাই না—গার্হস্থ্যধর্মী স্ত্রী পুরুষের আদর্শ ও দায়িত্ব সমান। মহর্ষি বাল্মীকির কাব্যে সীতারও যেমন রামের প্রতি অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা রামেরও সীতার প্রতি তেমনি নিষ্ঠা। গার্হস্থ্যধর্মের মধ্যে ও আধ্যাত্মিক শক্তিরাজ্যের বা মানব-হৃদয়ের কোমলতার বিশেষ ইঙ্গিত ভগবানের অপরতম দান। গার্হস্থ্য ধর্মের মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যেই একটা আধ্যাত্মিক—প্রবাহ প্রবাহিত আছে। এই আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সংযোগ সূত্ররূপে নিহিত আছে সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তি—এই তিন থাকলেই অতি সত্বর চরম অবস্থায় পৌছান যায়।
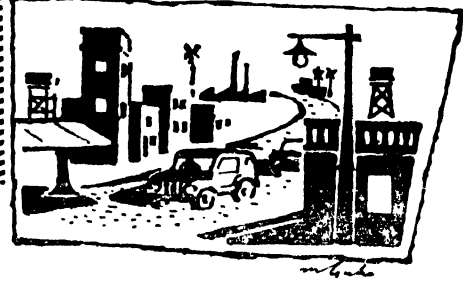
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রির নেমে আসে—স্তব্ধ রাত্রি।

দুজনে চলেছে ধুলোঢাকা পথ দিয়ে। মফঃস্বল সহরের মিউনিসিপ্যাল রোড, নামেই এতটুকুতে পিচ লাগানো—তারপরই সেই ধুলো আর দাঁত বের করা খোয়া।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন নির্জন হয়ে আসে। কোর্ট-কাছারীর মক্কেলরা ফিরে গেছে যে যার গ্রামে। বাসষ্টাণ্ড ফাঁকা—ওদিকে পাচীল-ঘেরা কলেজ বোর্ডিংএর সীমানায় গাছে নেমেছে রাত্রির অন্ধকার—পুকুরের ঘন-সবুজ পদ্মপাতার মাঝ থেকে উঁকি মারে দু' একটা পদ্ম।

রাস্তার মিটমিটে বিজলীবাতির আভায় ওই গাছ-গাছালি—পুকুর—কেমন একটা স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হয় প্রীতির কাছে।

অশোকের মনে নীলকণ্ঠবাবুর সেই কথাগুলো তখন ও জেগে রয়েছে। কেমন যেন সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ ভালো চোখে দেখেননি তিনি। অশোকের ও মনে হয় কোথায় একটা ভুল করে চলেছে সে—কি এক অলিখিত দায়িত্ব সে নিয়েছিল তার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে কিসের মোহে।

—কি ভাবছো ?

—কিছু না!···অশোক প্রীতির কথায় জবাব দেয়। একটি মূহূর্ত!

তারাজ্বলা আকাশে কোথায় যেন কি এক অসহ্য দীপ্তি—মাথার উপর একটা শিরীসগাছ ঘনকালো পাতায় ঢেকে রেখেছে ঠাঁইটা। প্রীতির দুচোখে কি এক মদিয় নেশার আহ্বান।

এক ঝলক আলো এগিয়ে আসছে।···বেগে ছুটে আসছে গাড়ীখানা। হঠাৎ ওদের দেখে সশব্দে ব্রেক কসে থামলো।

—হ্যাল্লো।

গাড়ী থেকে নেমে আসছে প্রশান্ত, নিজেই গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। পথে ওদের দেখে থেমেছে।

···আবছা আলোয় অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। পরণে একটা হাফ সাট আর প্যাণ্ট।···মুখে পাইপটা ধরা।···

—তোমার ওখানেই গিয়েছিলাম, শুনলাম বেরিয়ে পড়েছো। চলো।

—হঠাৎ অশোককে তার সঙ্গে দেখে একটু অবাক হয়। প্রীতি পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই হাসতে থাকে প্রশান্ত।

—আমি ওঁকে চিনি। চলুন!

···দুজনকেই গাড়ীতে তুলল প্রশান্ত। অশোক আমতা আমতা করে।—আবার রাত্রি হয়ে যাবে।

প্রীতি ওর কথায় কান দিলনা। উছল হাসি আর আনন্দে যেন ফেটে পড়ে। জবাব দেয় প্রশান্তই।

—নিশাচর প্রাণী মশাই। দিনের বেলায় আর সামাজিকতার সময় কই, অফুলি বিজি। রাতেই তাই সোসাইটি করি। উঠুন

প্রীতি সহজভাবেই ওর পাশে বসলো। পিছনের সিটে বসেছে অশোক। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে সে।

এ সমাজে আগেই সে মিশেছে।…কলকাতা—তাদের পাটনার বাড়ীতেও—এ শ্রেণীর অনেককেই সে চেনে। কিন্তু ক'বছরেই দেখেছে এরা কেমন বেশ বদলে গেছে। নিবারণবাবু সহরের মস্ত ধনী।

…বাড়ীখানাও তেমনি চমৎকার, সামনে গাড়ীবারান্দা —ওদিকে বেশ খানিকটা বাগান। যত্ন করে নানা গাছ লাগালো। কঠিন মাটিতে ফোটে রজনীগন্ধা—গোলাপ—নানা বর্ণের ডালিয়াও।

…কালো পাতার আড়ালে ম্যাগনোলিয়া ফুটে রয়েছে—বহু যত্নের ফুল। বাতাসে ভেসে আসে ভারি গলায় অ্যাল-সেসিয়ানের ডাক। সব কিছু মিলে ওদের এই পরিবেশকে চেনে অশোক।

…কিন্তু লোকগুলো কেমন স্বতন্ত্র। পাটনায় দেখেছে যাদের, তারা কলেজের অধ্যাপক—ডাক্তার না হয় উকিল —এদেরই। সেবার সোসাল ইকনমি নিয়ে আলোচনায় অশোকও যোগ দিয়েছিল। মিঃ দত্ত অর্থনীতির অধ্যাপক। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি অর্থনীতির দিক থেকেই বিচার করে চলেছেন।—কিন্তু ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

অশোকও তাঁর মত প্রকাশ না করে পারে না।

এরা সে জাতেরই নয়। হাসির শব্দে ওর চমক ভাঙ্গে। হাসছে প্রীতি, এ যেন অন্য কোন একটি মেয়ে। উজ্জ্বল আলোয় ওর সারা দেহে কেমন অবশ যৌবনের কলরোল। প্রশান্ত হাসছে—দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, দুচোখে কেমন তীব্র চাহনি। নিজের চেষ্টায় গড়ে ওঠা একটি একালের স্বয়ং-সিদ্ধ মানুষ।

—ওদিকে হাসছে বিশাল মোটা একটি মধ্যবয়স্ক মানুষ। বয়স কত ঠিক করতে পারে না। ওর দিকে চেয়ে থাকে অশোক। লোকটা কেমন কুৎসিতভাবে চেয়ে আছে প্রীতির দিকে—যেন গিলছে

হাসির তোড়ে কেঁপে ওঠে দেহটা—সোফার উপর। —ক্যা মিঃ রাঠোর। ঠিক নেহি বোলা?

প্রীতি ওকেই যেন সালিশী মানছে। লোকটা খুশীতে ডগমগ করে ওঠে—জরুর।

হাসি আর থামে না! কেমন করে আবার স্যাণ্ড-কনট্রাক্ট বাগিয়েছে প্রশান্ত ওই দামোদরের বাঁধের তাই বর্ণনা করে চলেছে।

মিঃ রাঠোর পরিষ্কার প্রশ্ন করে—কিতনা মারজিন রহেগা?

—যিতনা ম্যানেজ কর সকোগে! প্রশান্ত জবাব দেয়। অর্থাৎ যেভাবে পারো সরাতে—ঠিক সরাতে পারবে।

মিঃ রাঠোর এর দিকে চেয়ে থাকে অশোক। ওই যেন সব কিছুরই নায়ক, প্রশান্তের দীক্ষাগুরু কিংবা ওর হাতেরই পুতুল ওই প্রশান্ত।

রাত হয়ে আসছে। কলরব থেমে আসে। প্রশান্ত ওদের লিফট্ দিতে আসছে। জনহীন পথ দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ীটা। সুপ্তিমগ্ন সহর। একটা মাত্র বড় রাস্তা, তারই দুপাশে বাজার—বড় বড় বাড়ী; তাও যেন অন্ধকারে ডুবে গেছে।

প্রীতির খোপায় জড়ানো বেলফুলের মালা; শাড়ীটা গাড়ীর দোলানিতে খসে পড়েছে—বের হয়ে পড়েছে মাখনের মত নিটোল কাঁধের খানিকটা অংশ।

বাতাসে ফুলের মিষ্টি সৌরভ, প্রশান্ত ওর দিকে চেয়ে কি যেন বলছে। অশোক-এর উপস্থিতিটাকে বেশ ভাল ভাবে নেয়নি প্রশান্ত। বোধ হয় প্রীতিও।

··তবু প্রীতি তাকে নিয়ে বের হয়েছিল সহরের অভিজাত মহলে তার প্রসার প্রতিপত্তি দেখিয়ে হয়তো তার সম্বন্ধে অশোকের খানিকটা ধারণা জন্মাতে।

··গাড়ীখানা গেটের কাছে দাঁড়াতে প্রীতি নেমে পড়ে; কাঁধ থেকে আঁচলটা খসে গেছে, এক মুহূর্ত—শাড়ীটা তখনও কাঁধে তোলেনি। ব্লাউজের বন্ধনে অবশ যৌবনের চকিত উন্মাদ প্রকাশ।

প্রশান্ত হাসছে।

অশোক উঠে গেছে বারান্দায়, দাঁড়াল না।

—গুড নাইট।

—প্রীতির হালকা সুর ডুবিয়ে প্রশান্তের সেভ্রলে গাড়ীর

ইঞ্জিনটা চাপা কামনায়, উন্মাদনায় যেন গর্জন করে ওঠে।

—জেগে আছেন এখনও ?

অশোক নীলকণ্ঠবাবুকে পায়চারী করতে দেখে এগিয়ে যায়।

কেমন গম্ভীর থমথমে মুখ তার ; বারান্দা দিয়ে প্রীতি একটা সুগন্ধ আর যৌবনের মদির বন্যার আভাষ ছড়িয়ে ভিতরে চলে গেল।

অশোক চুপ করে বারান্দায় বসে আছে। সারা মনে কেমন একটা স্তব্ধ ক্লান্তি আর বদ্ধ আশার কলরোল। প্রীতি ক'দিনই তার মনে ঝড় একটা তুলেছে। নাহলে এই অস্বস্তি—এই কামনার সংঘাত এতদিন তো সে অনুভব করেনি।

নিজের কায নিয়েই ব্যস্ত ছিল। বারবার প্রীতিই বলেছে—তার মনে একটা কোথায় প্রশ্ন তুলেছে আসল কায কোনটা!

নিজেকে ঘিরে সুন্দর হওয়া—না সামগ্রিক সমাজকে সুন্দর করে তোলা!

...হয়তো নিজের বাঁচাটাই সবচেয়ে আনন্দের —প্রীতির এ ধারণা সে ও কোথায় যেন স্বীকার করেছে।

কি তিথি জানে না—অন্ধকার আকাশকোলে এক-ফালি চাঁদ উঠেছে। তারই ক্ষীণ আলোটুকু অন্ধকার পাহাড়কোল বনসীমায় কোথায় হারিয়ে গেছে ; ওরই দিকে চেয়ে থাকে অশোক।

হঠাৎ প্রীতিকে আসতে দেখে চুপ করে ওর দিকে চাইল।

—ঘুমোও নি ?

প্রীতি হাসল। কেমন আবছা ওই আলোতে ওকে একটি শুভ্রশ্বেত একটু স্বপ্নের মত মনে হয়। সারাদিনের কর্মব্যস্ত রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের জীবনযাত্রায় এসেছে সুপ্তির ছায়া, তারই বুকে ওই প্রীতির আবির্ভাব যেন ক্লান্ত হতাশ জীবনে কোথায় নিবিড় একটি শান্তমধুর অনুভূতির প্রকাশ আনে।

...সামনের চেয়ারটায় বসলো প্রীতি।

কোথায় রাতজাগা পাখী ডাকছে—আবার নেমে আসে সেই অখণ্ড স্তব্ধতা। আজকের সন্ধ্যায় প্রীতিকে কেমন বিচিত্র এক নেশার মত রঙ্গীণ চোখে দেখেছে অশোক।

...একটা গাড়ী কিনবে।...এই সহরের বিচিত্র আলো ঝলমল জীবনেই ওদের মানায়, আঁধার নামা পল্লী প্রান্তরে পাখী ডাকা সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকারে ওরা বেমানান। সেই উগ্র কামনামদির জীবনে অশোকও ঠাঁই খুঁজে নেবে প্রশান্ত রায়—মিঃ রাঠির সমাজে।

ওই অন্ধকার পল্লীগ্রামের স্তব্ধ হতাশ ক্ষয়িষ্ণু জীবনে যেন আজ বিতৃষ্ণা এসেছে।

—একটা বাড়ী করবো ভাবছি এখানে, ছোট্ট বাড়ী আর গাড়ী—

অশোকের কথায় হেসে ওঠে প্রীতি। কেমন দুচোখে ওর আকাশের তারার ঝিলিমিলি।

প্রীতি হালকাসুরে বলে উঠে—বাড়ী গাড়ী ঘর—এ নিয়েই খুশী হবেন ?

অবাক হয় অশোক—কেন ?

প্রীতি যেন অসহায় বোকামিতে উছলে ওঠে কৌতু ভরে। হাসি থামিয়ে জবাব দেয়—না। এমনি বলছিলাম।

অশোকের মনে অতীতের এমনি একটা সন্ধ্যার স্মৃ ফিরে আসে বারবার, সেদিনও এমনি কি এক দুর্বো হেঁয়ালির মত মনে সাড়া জাগিয়েছিল প্রীতি। আ সেই সুরের রেশ বাজে—কেমন আনমনা-মনে অ নিবিড় একটি ব্যাকুলতার সুর তোলে।

প্রীতি উঠে পড়ল কোন কথা না বলেই।

অশোক চেয়ে থাকে !

হঠাৎ কেমন চমকে ওঠে প্রীতি। রাত নির্জনে মন যেন ব্যাকুল কোন আর্তিতে ভরে উঠেছে। অশো হাতখানা ওর হাতে।

আজ অশোক যেন এগিয়ে আসতে চায়।

প্রীতি দাঁড়াল না, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বা দিকে। আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক, তখন সারা ঝড় বয়ে চলেছে। ব্যাকুল নীরব কামনার একটি ঝ তার সদ্য-জাগর মনে উঠেছে সেই ঝড়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না অশোক—হঠাৎ নীলকণ্ঠ-বাবুর পায়ের শব্দে চমক ভাঙ্গল।

—ঘুমোও নি?

—না, এমনিই বসে আছি।

নীলকণ্ঠবাবু ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করেছেন তিনি অশোককে, আজ এখানে আসার পর থেকেও সেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অশোকের কোথায় যেন অবলুপ্তি ঘটছে—তার আভাস তিনি পেয়েছিলেন।

আর কারোও কঠিন প্রভাব পড়লে মানুষও বদলায়, যেমন লোহা গলা অবস্থায় হাতুড়ির আঘাতে তাকে অস্ত্রও বানানো যায়, আবার শিকলও তৈরী করা যায়। ভালবাসা আর মোহের আগুনে পুড়ে মানুষ গলে যায়—হারিয়ে ফেলে তার ব্যক্তিত্ব, আত্মসচেতনতা—তখন আর কেউ ইচ্ছে করলেই তাকে সেই মত গড়ে তুলতে পারে।

অশোকের অবস্থা সেই পর্যায়েই এসে পৌচেছে। নিজেকে হারিয়ে আজ অন্য কিছু অবলম্বন করে বাঁচতে চায়—সেই অবলম্বন কি—কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভর-শীল তা বিচার করবার সামর্থ্য তখন থাকে না।

···একালের এই সামগ্রিক চেতনার মূলে নেই কোন আশা—কোন আদর্শ। তাই হয়তো ভুলের পর ভুলই করে চলেছে ওরা। অশোকও তার থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

—ওটা কি বলতে পারো অশোক? কোন তারা?

আবছা অন্ধকারে আকাশে ফুটেছে অজস্র তারার দল। ওর মাঝে নীলাভ দ্যুতিতে জ্বলছে একটা বড় তারা। অশোক কেমন যেন বিস্মিত হয়েছে ওঁর কথায়। জবাব দেয়—কেন? ধ্রুবতারা।

—অকূল সমুদ্রে একদিন ও নাকি বহু নাবিককে পথ দেখিয়েছে।

—হ্যাঁ!

নীলকণ্ঠবাবু একটু থেমে বলে ওঠেন—আমাদের কালে ও তেমনি পথ দেখাবার অনেক মানুষ ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী, আচার্য পি-সি-রায়—আরও অনেকে। আদর্শও একটা ছিল। ভারতকে স্বাধীন করা। মানুষ হয়ে ওঠা। তারই উন্মাদনায় আমরা লোভ—পাপ—কামনা সব ভুলেছিলাম। কতটা সার্থক হয়েছিল সেকালের তরুণরা—তার বিচার করবে ইতিহাস, আর আজকের দিনের মানুষ। কিন্তু একালের তরুণ—এ যুগের যৌবন আদর্শ আর নির্দেশ হারিয়ে কোথায় ভেসে যাবে কে জানে? আগামী কালের মানুষের কাছে এইটাই বড় হয়ে উঠবে—তারা একমুঠো শুকনো বাসি ফুলের মালা, দেবসেবাতেও লাগেনি, দেশসেবাতেও না। শুধু বিলাসের উপকরণ হয়েই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অশোক ওই দিকে চেয়ে থাকে। চমকে উঠেছে সে। প্রতিটি কথা যেন একটা নির্মম চাবুকের মত তার চেতনার মূলে আঘাত করে চলেছে।

···কথাটা সতিাই!···নিজের জীবন দিয়েও তা বুঝতে পারে অশোক। সব কায ভুলেছে। কি যেন এক উন্মাদ নেশায় আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে।

নীলকণ্ঠবাবু বলেন—কি কাজ, কি পথ, তা জানি না অশোক। মনে হয়—এরা ভুল করছে। মস্ত ভুল। এ যুগের ছেলে মেয়ে—সবাই। তাই আমার এ অভিযোগ। একা আমার নয়—প্রতিটি মানুষের আজ এই প্রশ্ন।

চুপকরে থাকে অশোক। নীলকণ্ঠবাবু চলে গেছেন ঘরের দিকে। ঘুম আসে না অশোকের। সারা মনে কি একটা দুবার ঝড় উঠেছে। মত্ত ঝড়।

ভোর হয়ে আসছে। কোনদিকে কেটে গেছে সারা রাত। পূবদিকের পাহাড়কোলে সূর্যের আলো পড়েছে—প্রথম অরুণ আলো। পাখী ডাকছে—বনে বনে ভোরের হিম হাওয়া ফুল গন্ধ বয়ে আনে। সারা বাড়ীটা সুপ্তিমগ্ন।

একা অশোক বের হয়ে এল পথে। বিনিদ্র একটি মন।··কি যেন কঠিন শপথের মত সোজা হয়ে নির্জন লাল পথ দিয়ে সহরের দিকে এগিয়ে চলে।

মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক পাখী বন থেকে বের হয়ে উড়ে গেল লোকালয়ের দিকে, ওদের কিচিমিচি শব্দে নির্জনতা মুখর হয়ে ওঠে।

দেড়-ঠেঙ্গে সতীশ ভটচাযও বাতাসের ইসারা বোঝে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আর অবচেতন মনের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছে—কেমন যেন দিন বদলাচ্ছে, সেই সঙ্গে

কালের হাওয়াও। তারকরত্নবাবুর বড় বাড়ীটার গায়ে অনেকদিন ধরেই চুন পলেস্তারা—এমনকি কলিও পড়েনি। খামারবাড়ীর মুলুক জোড়া পাচীর সেই যে ভেঙ্গেছে—তাও আর মেরামত হয়নি, বরং দু'এক জায়গায় ফাটলধরে ধ্বসে পড়েছে। বাড়ীর ভিতরের সাজানো বাগান সেই আগুন লাগার পর থেকে যে পুড়ে ঝলসে গেছে, তা আর সবুজ হয়ে ওঠেনি। ম্যাগনোলিয়া-গন্ধরাজ-শিউলি ফুলের সবুজ গাছগুলো পুড়ে গেছে—মাটিতে ছিটিয়ে রয়েছে এখনও কালো ছাই-এর দাগ।

নিঃশেষ হয়ে গেছে হলুদ খড়ের পাহাড়-প্রমাণ সঞ্চয়। কলাগাছের নিবিড় প্রহরাও কেমন শিথিল হয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেছে সতীশ ভটচায সকালের আড্ডাধারী ওই হেলুমাষ্টার—যতীনমুক্তি চাট্যো আরও অনেকের উপস্থিতি কেমন কমে যাচ্ছে। যদিও বা কেউ আসে—থাকে না বেশীক্ষণ।

চা এর মাত্রাও কমে আসছে, মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ চেয়েও চা আসে না, যদি বা আসে তাও গুড়ের বিবর্ণ বদ-গন্ধওয়ালা চা। সদরের সেই ফিকে গোলাব গন্ধওয়ালা চা আর দেখা যায় না।

সতীশ ভটচায জানে সামনের ওই গোলাগুলোও প্রায়ই শূন্য। মা লক্ষ্মী একবার হরে গেছেন এবং তাকে ফেরানো সত্যিই কঠিন। এ সতীশ ভটচাযও মানে। তারকরত্ন-বাবুর মুখে-চোখে কেমন যেন একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

…একদিন দেউড়ির দ্বারোয়ানদের জবাব হয়ে গেল। …বহুকালের পুরোনো দ্বারোয়ান—দেউড়ির শোভা হয়ে থাকতো, আলো জ্বালতো পরীওয়ালা লোহার গেটের মাথায়। অন্ধকার গ্রামে ওই একটি আলোর নিশানা। মাঝে মাঝে পেটা ঘড়িতে বাজতো কেমন অলস মধুর ঘণ্টার শব্দ।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও নির্জন ঘন রাত্রের মাঝে মনে হয় জেগে আছে ওই আলো—সদাজাগ্রত প্রহরী। পাড়ায় দিনরাত জেগে থাকে।

…তাও বন্ধ হয়ে গেল।

সতীশ ভটচায এবাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণ, দেবসেবা দোল হেনাতেনায় তার গতায়াত, তাছাড়া রোজকার আড্ডার মন্ত্রীও। বলে ওঠে—সে কি বড়বাবু? এতদিনের সরোওয়া—

হাসে তারকরত্ন - আবার দরকার কিসের? তা ছাড়া কি কাযই বা করতো তারা, বসে বসে ডালরুটি পাকানো—এই তো। তাই তুলেই দিলাম।

এতকাল পর যেন তারকবাবু আসল কথাটা ধরতে পেরে চালাক হয়েছে। মনে মনে হাসে সতীশ ভটচায। আবার ভয়ও পায় মনে মনে।

অন্য সময় হলে এই বুদ্ধির জন্য সভাসদরা তারিফ করতো বড়বাবুর। আজ যেন নির্মম অভাব আর আগামী ভবিষ্যতের অন্ধকার একটা ছবি কেমন ওদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তাই হয়ত চুপ করে গেল।

—এই! এই…

…গোটাকতক ছাগল খামারের পাচীল ভাঙ্গা দিয়ে ঢুকে পড়ে এসে একটুকু অবশিষ্ট সবুজ বাগানের গাছে মুখ লাগিয়েছে, পটপট করে ছিঁড়ছে।

কে তাড়িয়ে দিল।

—কার ছাগল রে?

ছাগলগুলো তাড়া খেয়ে ছুটছে। দেড়-ঠেঙ্গে সতীশ ভটচাযকেই হুকুম করে তারকরত্ন। ধরুন তো ভটচাযমশায় দু'একটাকে?

ভটচায দেড়ঠ্যাং নিয়ে চার ঠ্যাংএ ছাগলের সঙ্গে পারবে কেন? ওরা পালিয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

তারকবাবু উঠে বসেছে। আগে হলে ওই ছাগল-গুলোর একটাও আর ফিরতোনা। উপরন্তু যার ছাগল তাকে ধরে এনেই জুতোপেটা করে ছাড়ত। ভয়ে কোন জীবজন্তুও এদিকে মাড়াত না, আজ অবলা জানোয়ার-গুলোও যেন টের পেয়ে গেছে কোথায় ভাঙ্গন ধরেছে।

…বের হয়ে গেলো তারকবাবু বাড়ীর ভিতরের দিকে।

…সতীশ ভটচায খানিকটা দৌড় ঝাপ করে হাপিয়ে উঠেছে। একটু সামলাতে সময় লাগে। চেয়ে দেখে বারান্দা খালি, তারকবাবু উঠে কখন ভিতরে চলে গেছে। বিরাট বাড়ীটা কেমন ফাঁকা শূন্য।

…সতীশ ভটচায বের হয়ে ঠাকুরদালানের দিকে

চলেছে। এককালে হাকডাক জমজমাট ছিল খুব। ঠাকুরমহল একেবারে আলাদা। সামনে-ঘেরা নাটমন্দির চারিদিকে উচু রকের উপর ভোগমন্দির, ভাণ্ডার ঘর—সামনেই ঠাকুরদালান।

থামগুলোয় পদ্মের কাষ করা—মেজেতে কালো আর সাদা মার্বেল পাথর মাজা ঘসায় তকতক করতো। দুপুরের সময় ক বছর আগেও দেখেছে···কত লোকজন অতিথ ফকীর আসতো। নিত্যসেবার ভোগ সবই বিলিয়ে দেওয়া হতো ওদের মধ্যে, বাকী যেতো পূজারী ঠাকুর—পুরোহিত ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে। খোল-কর্তালের সঙ্গে সুরু হত ভোগারতি, তারপর কীর্তন।

আজ নাটমন্দিরের হুকে ঝুলছে দুটো বিবর্ণ ছেঁড়া খোল—তেলচিটে দড়ি ঝোলান কর্তাল। বাজাবার কেউ নেই—ভোগএর মাত্রাও কমে গেছে। সমারোহ নেই। অতিথ ফকিররাও কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

সতীশ ভটচায যেন তাদেরও অধম। তার বোধ হয় যাবার জায়গা কোথাও নেই। বাবুরা কাবু হয়ে আসছে —দৈনিক দশ সের ভোগ বরাদ্দ থেকে আড়াই পোয়ায় নেমেছে। রাতে লুচির জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ক'খানা ডালদায় ভাজা এইটুকু পদার্থতে। তা দিয়ে ওই পাথরের ঠাকুরের সামনে নামিয়ে পূজার ছলনা হয় মাত্র—মানুষের পেট ভরে না। চোখে দেখা যায় মাত্র।

···তার অবস্থাও এইবার ওই পাথরের ঠাকুরের মত হবে, উপোসই দিতে হবে হয়তো, দেড় ঠ্যাং টেনে টেনে ছেড়া নামাবলী জড়িয়ে সেই ভিক্ষাবৃত্তিরই নামান্তর হিসাবে দোরে দোরে চাল কলা কুড়িয়ে বেড়াতে হবে।

ক'টা পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে চুণ বালি খসা নোনাধরা দালানে। বাতাসে রঙ্গীণ কাঁচের ঝাড়টা শূন্য পুরীতে ব্যঙ্গের মত ঝুলছে একটা মৃদু শব্দে।

জনহীন মন্দির থেকে বের হয়ে এল সতীশ ভটচায। কেমন ভাবনার কালো ছায়া দেখা দেয় ওর মনে। আগত কোন চরম বিপদের ছায়া।

কামারপাড়ার মুরুব্বীদের সঙ্গেও ছোড় ছাড় করে এসেছে। ঘোষণা করেছিল সতীশ কয়েক বৎসর আগে ওদের বিরুদ্ধে জেহাদ। একেবারে দল ছেড়ে যজমান ছেড়ে এসে পড়েছিল তারকবাবুদের দলে, ভেবেছিল বড়গাছেই নৌকা বাঁধা নিরাপদ। ওই সব গাবভেরাণ্ডাবনে নৌকা বাঁধার চেয়ে।

কিন্তু অতর্কিত ঝড়ে সেই বনস্পতি যে সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে—বেড়ে উঠবে ওই ভেরেণ্ডার দল—তারাই গণ্য হবে বনস্পতি বলে—এ কল্পনা স্বপ্নেও করেনি কোনদিন।

আজ সেই অবিশ্বাস্য দিন এসেছে।

পরগাছা শ্রেণীর এই যাজকবৃত্তির ব্রাহ্মণ আজ অসহায় বোধ করে।

···টেঙ্গিয়ে টেঙ্গিয়ে চলেছে।

দুপুরের প্রায় জনহীন পথ। বাতাসে হু হু জ্বালাকরা রোদের তাপ মেশানো। দুর্দিন সমাগত। এইবার জল—সব সবুজ শুকিয়ে যাবে। প্রকটহবে মরুভূমির উষর রুক্ষতা। কালো মেঘ ক্রমশঃ লালধুলো মেখে উন্মত্ত গৈরিক সন্ন্যাসীর মত রুদ্র-গর্জনে হানা দেবে কালবৈশাখীর বেশে, উদ্দাম জটাজালে বিঘূর্ণনে ছিটিয়ে দেবে ওদের ছোট্ট গৃহটুকু।···

তীব্র রোদে ধুকতে ধুকতে চলেছে সতীশ ভটচায কোনরকমে দেড়পায়ে হেঁটে, ভিজে গামছাটা যথারীতি টাকে চাপানো। তাই ভেদ করে যেন রোদের তাপ এসে সূচ ফোটাচ্ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বড়রাস্তার এপাশে মস্ত ফাঁকা মাঠটায় উঠছে পানুদাসের টিনের শেড। ইট দিয়ে চারিপাশ গেথে তুলেছে, নোতুন ঝকঝকে টিনগুলো ঝকঝক করছে রোদে, চোখ ঝলসে দেয়।

টিন পেটার ঠং ঠং শব্দ নীরব-দিগন্ত ভরে তুলেছে। পানুদাসের জয়ধ্বনি ঘোষণা করছে।

মস্ত মাঠটায় পাচীল তুলেছে—খোয়া পিটিয়ে মাঠটাকে বাঁধিয়ে তুলবে। কথাটা ঠিক যেন ভুলে গিয়েছিল সতীশ ভটচায। শুনেছিল লোকমুখে পানুদাস নাকি খোয়া বাধানো ওই রাস্তার ধারে ধানকল করবে। এতদূর এগিয়ে গেছে খেয়াল করেনি।

একটা ঝাঁকড়া আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ পানুদাসকে আসতে দেখে কি যেন ভাবছে সতীশ ভটচায। পানুদাস অনেক বদলে গেছে।

শীর্ণ চেহারায় ইতিমধ্যেই বেশ শাঁসজল লেগেছে। আশপাশে গোবিন্দ বেণে—ডেঙ্গো বড়ঠাকুরও রয়েছে। কে যেন ছাতা ধরে চলেছে পান্নুদাসের মাথার উপর।

…সতীশ ভটচাযকে দেখে দাঁড়াল পান্নু। গ্রামের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কি ভেবে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে পান্নু—ভাল আছেন!

সতীশ ভটচায ওই দিকজোড়া ইট আর টিনের শেড-এর দিকে চেয়ে থাকে। ওর কথায় জবাব দেয়—কল্যাণ হোক। তা শোনলাম এলাহি কারখানা করছো। গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছ যা হোক। কিন্তু বাবা—

পান্নুকে এসব কথা বিশেষ কেউ বলেনি। এতদিন খেটে এসেছে, কিন্তু এমনি প্রকাশ্য স্বীকৃতিতে কেমন একটু খুশীই হয়।

—কিন্তু কি বলছিলেন কাকা!

—মানে তোমার মঙ্গল কামনা করি, তাই বলছিলাম ওই জায়গাটা বাল্যকালে আমরা দেখেছি গোভাগাড় ছিল, সেখানে মা লক্ষ্মীর আসন গড়ছো—সবই ঠিক আছে। তবে একবার গ্রহশান্তি-স্বস্ত্যয়ন একটা করিয়ে নিয়ো কাউকে দিয়ে। খরচ সামান্যই—তবু একটা করানো ভাল। কিসে কি হয় বলা যায় না। একবার না হয় পঞ্চতীর্থ মশায় আছেন কোতলপুরে—তাকে দিয়ে শুনিয়ে নিয়ো। চলি বাবা!

সতীশ ভটচায ঠোকটুকু দিয়েই সরে পড়ল, দাঁড়াল না। নিজের জন্যও উমেদারী করল না। মাত্র হিতাকাঙ্খীর মত উপদেশই দিয়ে গেল বিনা দর্শনীতে।

পান্নুদাস কথাটা ভাবছে। গদার গায়ের পেনো আজ পান্নুদাস—সোজা কথায় দাসজী মশায়ে পরিণত হয়েছে। কি অবস্থা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা নিজে আজও ভোলেনি এবং কি ভাবে কোন পথে এসেছে—কত-লোককে কি ভাবে ঠকিয়েছে তা সেও জানে।

এখনও খুব অভ্যস্ত হয়নি হয়তো এই পথে, তাই নীতিজ্ঞান, ধর্মের নামে একটা আতঙ্ক আর পতনের ভয়টা বিরাট হয়ে জেগে রয়েছে মনে, ওটাকে নিঃশেষে জয় করতে পারেনি। তবু মাঝে মাঝে দিব্যি কঠিন স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে। এই জায়গাটা দখল করবার বেলাতেই কি কম করতে হয়েছে পান্নুদাসকে? সামান্য জমি মাপের আমিন—চেনম্যান, কি তাদের মাইনে? অমন মাইনে দিয়ে পান্নুদাসও রাখতে পারে দু-একজনকে। তেমনি মেক্দারের লোকদের কি কম খোসামুদী—হেঁ হেঁ করতে হয়েছিল। তারপর ভেট—টাকা তো আছেই।

জায়গাটার আসল মালিক ওই নারাণঠাকুরই—বোবা প্যা ঠাকুর, আর ওই নাবালক সনাতন। একজন কথা বলতে পারে না, অন্যজনের কথা বলবার অধিকার নেই। গঙ্গামণি ঠাকরুণও কিছু করতে পারে না। কাঁদে শুধু, আর শূন্যের কোন অদৃশ্য দেবতার দিকে চেয়ে আবেদন নিবেদন জানায়।

পান্নুদাস অবশ্য ওসবের মধ্যে নেই। সে কাযের মানুষ—তার দৃষ্টি অন্য পথে চলে। তাই দখল নেবার জন্যই বড় রাস্তার ধারে রাতারাতি পঞ্চাশ-ষাট জন মজুর-মিস্ত্রী লাগিয়ে ট্রাকে করে ইট আনিয়ে দখলগাড়ী করে শেড তুলতে সুরু করেছে। অবশ্য একার বুদ্ধিতে এসব করতে সাহস করেনি পান্নু, গ্রামে এখনও সালিশী মধ্যস্থতা আছে। জমিদাররা ক্ষৌত হলেও হাকডাক কমেনি। পঞ্চজন আছে—কিন্তু তাদেরকে দাবিয়ে দেবার ক্ষমতা আর সাহস সে অর্জন করেছে। বুদ্ধিটা দিয়েছিল সদরের ব্যবসাদাররাই, মাণিক রাঠীই তার মহাজন সেই বুদ্ধিটা দিয়েছে।

ঝড়ের আগে ওঠে সিঁদুরে মেঘ—ধুলোমাখা কালো মেঘ। আর উর্দ্ধাকাশে ঝড়ের শোভাযাত্রার নিশান বয়ে আসে ঘূর্ণায়মান ঝরাপাতার পুঞ্জ।…দুর্গাপুরে কোন বিরাট নোতুন জীবনের ঝড় আসছে। শুধু বাঁধই নয়, মস্ত কার-খানা বসবে বার্ণপুর—জামসেদপুরের মত। দুর্গম ওই দামোদরের উপর দিয়ে রাস্তা হলে তাদের গ্রামের উপর দিয়েই যাবে জাতীয় সড়ক সদরের দিকে। ইলেকট্রিক লাইন আসবে—এই সময় বড় রাস্তার দুধারে ডাঙ্গা—সোল—আবাদী অনাবাদী বিল সব জমিরই রকম—কদর কিস্মৎ কতগুণ যে বাড়বে তার ঠিক নেই। আর এ মুলুকের সব ধানই পান্নুর হাতে। যদি ধানকল করে—রাঠীই গোপনে সাহায্য করবে তাকে।

—টাকা!

পান্নুদাস ওর গদিতে বসে স্বপ্ন দেখেছিল। রাঠী হাসছে।—তার ভাবনা হামার দাসজী মশায়। দশ আনা, ছ আনা ভাগ। তুমি কায সুরু করো। মোল লেও

যিতনা জাগা মিলে। শেড বানাও। টিন—সিমেণ্ট—বিলকুল দেগা।

কনট্রোল এর বাজার, টিন সিমেণ্ট মেলা দুষ্কর। রাঠীর দিকে চেয়ে থাকে—লোকটা ঠাট্টা করছে না ত? রসিকতা!

কিন্তু তা করেনি।

…পান্নুদাস বুঝেছে,ভেড়া লড়াই করে খুঁটোর জোরে। সদরের সব শাসনভার যাদের হাতে—রাঠীর তাদের দরবারে সম্মান প্রতিপত্তির অভাব নেই।

…বুকে ভরসা নিয়ে কাযে নেমেছে পান্নু। তাই নারাণঠাকুর—অবনী মুখুয্যে নিজের কাকা বৃদ্ধ লোচনদাস সবাইকে আজ ঠকিয়ে—আমিন কানুনগো অবধি সুচ এবং ফাল চালিয়ে সব মেরামত করে শেড তুলছে।

স্বপ্ন দেখে টাকা।…গাড়ী—বাড়ী সবই করবে সে। দুর্গাপুরের কাছে ওই ধানকলের পাশে আরও প্রায় শতখানেক বিঘে তার দখলে এনেছে।…

সবই করেছে—কিন্তু এক জায়গায় কেমন খটকা বাঁধে। অদৃশ্য কোন কঠিন শাসনরূপী কোন নিদানকে একেবারে ফেলতে পারে না। ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে—তাই আশা করে সেই অদৃশ্য দেবতাদের তৃপ্ত করতে। আরও পেতে চায় সে। লোভী মন—অন্তরে অন্তরে আরও কামনা করে।

রোদের আভা কমে এসেছে। দূরে ফাঁকা মাঠ; শস্যরিক্ত খাঁ খাঁ দিগন্ত ক্রমশঃ উঠে গেছে লাল পাথুরে মাটির বুক ঠেলে চড়াইএর দিকে—সবুজ আর নীল শাল কেঁদএর বন সুরু হয়েছে। তারই বুকচিরে চলে গেছে খোয়া-ঢাকা রাস্তাটা একদিকে সদর, অন্যদিকে দুর্গাপুরের এপারে দামোদরের দুস্তর বালিরাশির সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে—তৃষিত জনহীন ক্লান্ত পরিত্যক্ত পথ যেন নেমে গেছে দামোদরের জলরাশির দিকে নিদারুণ কোন পিপাসা মেটাবার জন্য।

মাঝে মাঝে দু-একটা গরুর গাড়ী এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় টহলহীন চাকার আর্তনাদ তুলে চলেছে বনের দিকে—সদরে যাচ্ছে ওরা মালপত্র আনতে, সারারাত যাবে। ভোরে পৌছবে সদরে।

…এ জীবন আর থাকবে না।

…ওর বুক ঢেকে আসবে পিচের রাস্তা—হাওয়ার বেগে ছুটে যাবে বড় বড় ট্রাকগুলো, জি টি রোডের মত—ঝড় তুলে। তারই পাশে সাইনবোর্ড তুলবে দাস রাইল মিল। প্রোঃ প্রাণগোবিন্দ দাস।

কিন্তু!…

বৈকালের ম্লান রোদে একটা আবছা মলিন বিষণ্ণতা জেগে ওঠে। বনের বাইরে মস্ত কেঁদ গাছে ঝটাপটি করছে পাখ-পাখালির ঝাঁক। সব কিছু সুন্দর শান্ত পরিবেশের মাধুর্য্য দূর করে টিনপেটার শব্দ উঠছে বাতাসে ঠং ঠং।

—কেমন যেন ভয় ভয় করে পান্নুর।

ভটচাযমশায়ের কথাটা কখনও মনের মধ্যে পাক দেয়, একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।

মুনিষ-জন-মিস্ত্রী-কারিগররা মালিককে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পূর্ণ উদ্যমে কায করছে। ছুটির সময় হয়ে গেছে—তবু এত কাযের লোক তারা—যে কায ফেলে চাল থেকে নামবারও নাম করে না।

নিতে বাউরী ইট বইছিল…সেই প্রথম ঝুড়িটা নামিয়ে মাথা সোজা করে বলে ওঠে—বেলা বাউড়ে গেছে আর ইট বইতে লারবো।

ছানু দাঁড়িয়ে ছিল, ধমকে ওঠে—শালা গতরকুড়েটা কোথাকার?

—মাইনে বেশী, দিবা চারপহর খাটবো। নইলে টাম হয়ে গেছে কেনে খাটবো?

—ভারি টাইমওয়ালারে?

আর সবাই যেন এই পথই খুঁজছিল। সারাদিন এই রোদে কায করে হাঁপিয়ে উঠেছে। ইট বয়ে চূর্ণ সুরকি—সিমেণ্ট বালি মাখিয়ে হাত-পা জালা করছে। তারাও কায ছেড়ে বের হয়ে এল।

গজ গজ করছে ছানু।

পান্নুদাস এসবই শোনে, কিন্তু চটতে জানে না সে। হাসছে—কায শেষ হল গো? মিষ্টি মধুর বাক্যি। ওরাও খুশী হয়। গলে পড়ে—সারাদিন কাঠফাটা রোদে প্রাণান্ত পরিশ্রমের পরও।

বেজা বাউরী ঝুড়িটা নিয়ে বের হচ্ছে—অনেকদিন পর খাটতে এসেছে বাধ্য হয়েই। ইট গাদার পিছনে হাসির শব্দ শুনে চাইল। ভাবি বৌ কোন রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই জমিয়ে নিয়েছে। নামেই যোগানদারী কায করে

মশলার কড়াই মাথায় দিয়ে। এখানেও এই সব সুরু করেছে—ওদের সঙ্গে আবার হাসি মশ্‌করা।

—আয়!

বেজার ডাকে ডাবি হাত-পা ধুতে ধুতে অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়—চল, যেছি।

…ওর দিকে ফিরেই চাইল না। আবার হাসিতে ভরে ওঠে রাজমিস্ত্রীর দিকে চেয়ে।…চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বেজা আবার চলতে থাকে।

হাসছে টেরি বাউরী। কুৎসিত দেড়চোখো মেয়েটা হাসছে বিশ্রী কদর্য হাসি বেজাকে দেখে।

বিরক্ত হয়ে ওঠে বেজা—এ্যাই! হাসছে দেখনা খ্যাক খ্যাক করে—খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে মেয়েটা।

—উকে ধমকাগা। কেনে রে? সী মুরোদ নাই বুঝি—এইরো ধমকাতে এয়েছিস। হঁ্যারে—আমি কি তুর মাগ নাকি? অ্যাঁ?

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বন ধারের আটাড়ি ঝোপের পাশে যৌবনবতী মেয়েটা কেমন মাদকতার আভাষ আনে সারা ক্লান্ত দেহ মনে।

চুপ করে সরে গেল বেজা।

…তখনও কলঘরের চালটায় হ্যারিকেন জেলে দিনকার কায আর মজুরির হিসাব মেলাতে পানুদাস ব্যস্ত।…অনেক টাকার খেল—দৈনিক তার হিসাব রাখা, মজুরির দর আর গরহিসাবের ফাঁকে রাঠির দাদনের টাকাটা কিছু বাড়াবার চেষ্টাও করে চলেছে।

বারো আনা মজুরির জায়গায় টিপ ছাপ দিয়ে দেড় টাকা করতেও পিছপা নয় পানু—দৈনিক নিদেন পঞ্চাশ টাকা রোজকার। ঠকানো? এ ব্যবসায় এ কারবার হামেশাই হয়। তবু মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি সতীশ ভটচাযের কথাটা। সেই উপদেশ বাণী।

[ক্রমশঃ

মানুষ বিবেকানন্দ

কানাইলাল দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন বিবেকানন্দের সহস্রটি গুণ ছিল। নিবেদিতা লিখিতেছেন—'যদি অধিকাংশ মানুষের দুইটি তিনটি অথবা দশ বা বারটি গুণ থাকে তবে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ দেব) নরেন্দ্র সম্বন্ধে শুধু এই বলিতে পারেন যে তাঁহার সহস্রটি গুণ আছে। তিনি সত্য সত্যই সহস্রদল পদ্ম।' সহস্রদল পদ্মের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিতে যেমন কবি মানসের প্রয়োজন, তেমনি সহস্রগুণ-সম্পন্ন বিবেকানন্দের কর্ম কৃতি যথার্থভাবে আলোচনা করিতে বিবেকানন্দের ন্যায় প্রতিভাধর আর একজন ব্যক্তির দরকার। "বিবেকানন্দ কি করিয়া গেল তাহা বুঝিবার জন্য আর একজন বিবেকানন্দ চাই—" কথাটির সার্থকতা সম্বন্ধে তিনিই নিঃসন্দেহ, যিনি এই মহামানবের জীবন ও কর্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তথাপি মৃত্যুকে তাঁহার চরণ ছোঁয়ায়ে 'অমৃত করিয়া' লইবার সুতীব্র আকাংখায় এই দুঃসাধ্য কর্মে ব্রতী হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরচরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার 'বিদ্যাসাগর চরিত্র' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "তিনি যে বাঙালি বড় লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বড় ছিলেন; তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়।" কবি যদি বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহাকেও তিনি মনুষ্যত্বের অপরিম্লান গৌরবে অত্যুজ্জ্বল এক আদর্শ মানুষের প্রতিচিত্র রূপেই আঁকিতেন বলিয়া আমি মনে করি। তাঁহার সমুদ্রসদৃশ বিপুল সাহিত্যকীর্তি স্পর্শ করে নাই এমন কোন বিষয় আমাদের নিকট অচিন্তনীয় বলিলেই চলে। সমসাময়িক কালের রাজনীতি, সমাজ-নীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি, লোক চরিত্র কবি তাঁহার কুশলী লেখনী মুখে বিচিত্র ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ বাঙালির অন্যতম গৌরব-ধন বিবেকানন্দ সম্পর্কে কবির লেখনী বিস্ময়কর রূপে নীরব? এ নীরবতা

সচেতন কিনা তাহা জানিবার আপাতত কোন উপায় নাই। কলিকাতার বুকেই বিবেকানন্দ কবির সহিত একই সময়ে বাল্য-কৈশোর অতিক্রম করিয়া কর্ম জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইংরেজ শাসনের দুঃসহ দুঃখ ও অপমান হইতে মুক্ত হইবার যে চেতনা দেশবাসীর চিত্তে উনিশ শতকে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার উষ্ণ স্পর্শ হইতে কবিগুরু বা স্বামিজী কেহই দূরে থাকেন নাই। আমেরিকার ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের সাফল্য শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা করে নাই, ইউরোপ-আমেরিকায় সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই জন্যই বিবেকানন্দকে সে দিন ধর্মনেতা অপেক্ষা বেশি মর্যাদার দৃষ্টিতে দেশবাসী দেখিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি যে বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যত না ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী প্রেরণা ছিল স্বদেশপ্রেমের, জাতীয়-গৌরবের। এ বিষয়ে কবির নীরবতা খুবই মর্মান্তিক। বিবেকানন্দ সম্পর্কে কবিগুরুর যে কয়টি বাক্য মাত্র পাওয়া যায় তাহাতে মানুষ বিবেকানন্দের মানবিক কর্মের স্বীকৃতি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। "তিনি (বিবেকানন্দ) দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান।" কবির এই একটি মাত্র বাক্য হইতে অনুমান করা যায় বিবেকানন্দ-চরিত্রে মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিতে ধরা পড়িয়াছিল? কবি তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে অল্প কয়েকটি কথায় শ্রেষ্ঠ মানুষের একটি চমৎকার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। "মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ—যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে।" কবিকৃত শ্রেষ্ঠ মানুষের এই সংজ্ঞানুসারে বিচার করিলে বিবেকানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে প্রতিভাত হন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণায় বিবেকানন্দের অনায়াসে ঈশ্বর দর্শন হইয়াছিল। সাধকবর্গ বহু জন্মের পুণ্যফলে ভগবদকৃপা লাভ করিলে এই পৃথিবীর বস্তুজগৎ হইতে নিজেদের নিরাপদ ব্যবধানে রাখিয়া সাধন ভজন প্রভৃতি সাধনোচিত কর্মে অহর্নিশি লিপ্ত হন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার ভূরি পরিমাণ উদাহরণ দুর্লভ নহে। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঈশ্বর লাভের পরও সাধারণ মানুষের হিতার্থে কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এই লৌকিক কর্মের মধ্যেই বিবেকানন্দের মানুষী সত্তার পরম প্রকাশ।

মাত্র ৩৯ বৎসর বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার আবির্ভাব এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি কেবলমাত্র আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে নহে, বস্তুত সমগ্র পৃথিবীতে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকল ধর্মের মধ্যেই বহু সুন্দর সুন্দর কথা আছে—যাহা সর্বকালের মানুষের চিত্ত স্পর্শ করে—আর ধর্মপ্রাণ মানুষ অন্ততঃ স্বীয় ধর্মের এই সব কথার সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত। সে জন্যই ধর্মের কথা মাত্র বলিয়া নিজের দলের বাহিরে অর্থাৎ সধর্মীয়দের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিখিল বিশ্ব-মানবচিত্তে বিরাট কোন আলোড়ন সৃষ্টি করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অতএব বিবেকানন্দ-চরিত্রে ধর্ম-নেতার বিশেষ গুণ ছাড়া অন্য আরও কিছু অলোক-সামান্য গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল এবং ইহাই হইতেছে তাঁহার 'মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য'। এই মনুষ্যত্বের গগনচুম্বী মহিমার নিকট অপরিচিত বিদেশী অধ্যাপক রাইট প্রণতি জানাইয়া বলেন "To ask you Swami for your credentials is like asking the sun to state its right to shine দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকৃতি দিলেন যুগোত্তর মহত্তম প্রতিভার। ডাঃ বারোজকে লিখিলেন "Here is a man who is more learned than all our learned professors put together," পরাধীন ভারতবর্ষের কালা সন্ন্যাসী সম্পর্কে এই উক্তির মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত মর্যাদা যতটুকু, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি আছে জাতীয় সম্মান।

বিবেকানন্দ কোন নূতন ধর্ম প্রচার করেন নাই। হিন্দুধর্মের মূলাধার বেদ ও উপনিষদের বাণীকে বিশ্ব-মানবের নিকট তাঁহার মানবীয় দৃষ্টিকোণ হইতে উপস্থিত করিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মতবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছে। ইহার

সর্বশেষ উজ্জ্বল নিদর্শন ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মগণ নিজেদের হিন্দু-ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি বিবেকানন্দ মতবাদ ও ব্রাহ্ম-মতবাদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, যদিও মূলে উভয়ই এক। এই পার্থক্যটুকুর জন্যই বিবেকানন্দকে যে সাধনা করিতে হইয়াছে, তাহা মানুষ হইবার সাধনা হইতে পৃথক নহে। তিনি একদা নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন "যত বয়স হচ্ছে, ততই আমার মনে হচ্ছে যে, এক মনুষ্যত্ব কথাটিতেই জাতি বল, ধর্ম বল--সবারই সার নিহিত।" অন্য স্থানে পাই এই জীবব্রত সন্ন্যাসী কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করছেন "যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না তাহা যথার্থ ধর্ম নহে।" আর তিনি ধর্ম অর্থে চরিত্র ভিন্ন অন্য কিছু বুঝিতেন না। মানুষের বড় হইবার মূল মন্ত্র যে তাহার চরিত্রশক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ কি! স্বামীজীর এই উদার মানব-বোধের জন্য খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য-বাসীগণ যেমন প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তেমনি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের জাতিধর্মবর্ণশ্রেণী নির্বিশেষে বহু শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি মুসলমানদের ভিতরেও স্বামীজির শিষ্য ছিলেন। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দীর্ঘদিন পাশা-পাশি বাস করিতেছেন, তথাপি উভয়ের মধ্যে যথার্থ সখ্য কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। মুসলমানগণের মধ্যে সম্প্রসারণের একটা অত্যুগ্র আকাংখা চিরকাল প্রবল-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা ও অন্যবিধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে সময়ে সময়ে কেবল ভাবরাজ্যে নহে,বস্তু জগতেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। হিন্দুমুসলমানের যুগ্ম সাধনায় অবশ্য আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বহু হিন্দু-মুসলমান হইয়াছেন--কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দু সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণের নজীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে একান্তই বিরল।

উনিশ শতকের শেষ পাদে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া মুসলমানদের ধীরে ধীরে হিন্দু-বিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছে। অথচ সেই সময় তাহারা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সংখ্যা ইহার যাহাই হোক না কেন—ব্যাপারটা যে, স্মরণীয় এবং বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবেকানন্দ মুসলমানদের খুবই প্রীতির চোখে দেখিতেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে কাজটি সহজ ছিল না। এখানে বিবেকানন্দের ধর্মবোধ অপেক্ষা মনুষ্যত্ববোধ বড় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জানি, তিনি ধর্মকে 'ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের ব্যাপার মাত্র' বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। দেশহিতে লোকহিতে তাই ধর্মটাই তাহার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তিনি অকুতোভয়ে বলিতে পারিয়াছেন—ভারতবর্ষের প্রকৃত মংগলের জন্য হিন্দুর বৈদান্তিক হৃদয় ও ইসলামিক দেহ দ্বারা গঠিত পূর্ণ মানব চাই।

কথাটির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন সত্য রহিয়াছে তাহা আমরা—এই বিশ শতকের ৬ষ্ঠ দশকের ভারতবাসী—মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু সে কোন্ মূল্যে? অনেক-গুলি ছোট বড় অন্তর্ঘাতী রক্তাক্ত দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে অবলুপ্ত কয়েকশত মহামূল্য মানব জীবনের বিনিময়ে, নীতিবোধ ও উদার মানবতাবোধের অপচয় ঘটাইয়া এবং সর্বোপরি জননী জন্মভূমিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া—এত করিয়াও কি ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের নরনারী আমরা সুখে শান্তিতে আছি? কোন অলীক কল্পনাবিলাসের দ্বারা বা ভাবাবেগের প্রাবল্যে যে এ উক্তি নয় তাহা আজ সকলকে একটু শান্ত ও সুস্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

স্বদেশের বা স্বজাতির মর্যাদা নষ্ট হয় এমন কোন চিন্তা তাঁহার নিকট কখনও প্রশ্রয় পায় নাই। তিনি যাহা সত্যরূপে লোককল্যাণবহরূপে উপলব্ধি করিতেন তাহাই নিঃসংকোচে প্রকাশ করিতেন। তাই ভারতবর্ষের কল্যাণ-কল্পে ইসলামীয় দেহের প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি বলিয়াছেন—"যদি ভারতবর্ষে কোন ইউরোপীয় পুরুষ বা নারীকে কাজ করতে হয় তাকে কালা ভারতবাসীর অধীনে থেকেই তা করতে হবে।" পাশ্চাত্যের অকৃপণ সাহায্য তাঁহাকে সত্য ভাষণ হইতে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

বিবেকানন্দ পরলোক অপেক্ষা ইহলোক সম্পর্কেই অধিক চিন্তা করিতেন এবং আগ্রহশীল ছিলেন। "তিনি চাহিতেন যে, সকলে বুঝুক--ভারতবর্ষে মানুষের বাস: ভারতবাসীদের চরিত্র খুব বিশেষত্বপূর্ণ বটে, এবং অন্যান্য সকলের অপেক্ষা তাহাদের--শিক্ষা-দীক্ষা অধিক, কিন্তু

মানব সাধারণের সকল কর্তব্য, দাবী দাওয়া ও সুখ দুঃখ তাহাদের আছে।" নিজে 'মানুষ' না হইলে মানুষের কথা এমন ঐকান্তিকতার সহিত হৃদয় দিয়া চিন্তা করা যায় কি ? তিনি সকলকেই সাধু সন্ন্যাসী হইতে বলেন নাই, বলিয়াছেন মানুষ হইতে। "পাপ করবে তাও মানুষের মত কর—যদি দুষ্টই হতে হয়, তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও।" ধর্ম নেতার পক্ষে এই কথাগুলি সামঞ্জস্য পূর্ণ নহে। কিন্তু মানব-প্রেমিক চিরভাস্বর বিবেকানন্দের নিকট ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। বিবেকানন্দ ভিন্ন অন্য লোকের মুখে এমন কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে একটা বীর্যময় পৌরুষ অবশ্য দেখা গিয়াছিল। তিনি অত্যাচারী মুসলমান শাসক চাঁদ-কাজীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাসগৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা আজ তাঁহাকে নির্বীর্য বৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছি—চৈতন্যমহাপ্রভু আজ বীর্যহীন ভীরু আপোষবাদী সবজীবেপ্রেমী ভক্ত রূপেই চিত্রিত হইতেছেন। জাতীয় জীবনে শক্তির অভাব হইলে তাহার প্রিয় নেতৃবর্গকে এবং সাধনার ধনকে সম পরিমাণে খর্ব করিয়া স্বীয় লজ্জা, অযোগ্যতা ও অপদার্থ-তাকে আবরিত রাখিবার সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা দেখা দেয়। এই কলঙ্কিত কর্মের জন্য মহাপ্রভু আজ দয়ালঠাকুর মাত্র। আশংকা করি আরও কয়েকশত বৎসর পরে বিবেকানন্দের অদৃষ্টে একই পরিণতি ঘটিবে। ক্ষত্রশক্তির উদ্বোধনের জন্য বিবেকানন্দের প্রচেষ্টা যে কত গভীর ছিল তাহার সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয় নাই। ভীরুতা অতিক্রম করিয়া আমরা যাহাতে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি তজ্জন্য এই দেশে অপরাধীর সংখ্যাবৃদ্ধিও তাঁহার নিকট কাম্য বিবেচিত হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি ধার্মিক ব্যক্তিগণ ঐহিক বিষয়ে সাধারণত সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। জাগতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁহাদের চিত্তে একটা ঘৃণার ভাব বিদ্যমান থাকে। এই ঘৃণার আবরণে তাঁহারা আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থাই দেখি। তিনি মানুষের কথা ভাবিতেছেন। মানবীয় কর্মে তাঁহার বিরাম নাই। ভাবিতেছেন সেই সব দীন দরিদ্র আর্ত আতুর অস্পৃশ্য মানুষের কথা—যাহারা তৎকালীন ভারতবর্ষে মানুষের অধিকারে বঞ্চিত ছিল ; তাহারাই বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ। এই দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও আপামর ভারতবাসীকে শক্তিমান ও চরিত্রবান পরিপূর্ণ মানুষ করিবার মহৎ স্বপ্ন নিয়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন। আজিকার মিশন দেখিয়া বিশ্বাস করা শক্ত যে, একদা রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলী অনাহারে-অর্ধাহারে থাকিয়া তিল তিল করিয়া এই মহান কার্যের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই দুঃসহ তপস্যার প্রথম ফলস্বরূপ বেলুড়ে মঠ স্থাপনের জন্য ৪০ সহস্র টাকা মূল্যে একখণ্ড ভূমি ক্রীত হইতে দেখি। এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই কলিকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। স্বামীজী তখন দার্জিলিংএ বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবর্গসহ সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই সময় ধূলি-ধূসর জীর্ণ বস্তিতে বস্তিতে রিক্ত নিঃস্ব মানুষের রোগ শয্যার পার্শে মূর্তিমতী করুণারূপে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। ভারতগতপ্রাণ এই বিদূষী ইংরেজ মহিলা সত্য সত্যই ভারতবর্ষের হিতসাধনে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদিত করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, শিল্প-বিজ্ঞান-কলা সাধনায়, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে, আর্ত আতুর সেবায়—সর্বত্রই তিনি সদাক্রিয়াশীলা কর্মীর সহায়—লোকমাতা।

প্লেগবিধ্বস্ত কলিকাতায় সেবাকার্যে অর্থাভাবের কথা শুনিয়া স্বামীজী মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে মঠের জমি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন। মনুষ্যত্বে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে অবলীলা-ক্রমে এমন সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। অবশ্য আমাদের ভাগ্য ভাল, মঠের জমি বিক্রয় করিতে হয় নাই অথবা সেবাকার্যে অর্থের অনটনও ঘটে নাই।

বিবেকানন্দ যে সাধনার উচ্চ মার্গে উঠিয়াছিলেন তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাহার আচার-আচরণে এমন একটা সহজ স্বাভাবিকতা ছিল যাহা অনুরূপ অধিকারীবর্গের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব মা কালীকে তাঁহার হাতে অন্ন-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন ; তৈলঙ্গস্বামী কাশীতে শিবের মাথায় পা

রাখিয়া শুইয়া থাকিতেন। এমন অজস্র উদাহরণ আছে। কিন্তু বিবেকানন্দ সাধক হইয়াও মানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই তিনি তীর্থে বা অন্যান্য স্থানে মানুষের আচরণীয় প্রতিটি আচারসংস্কার অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন, সাধারণ মানুষের করণীয় কর্মগুলি একান্ত শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিতেন। নিবেদিতা লিখিতেছেন "স্বামীজী এই যাত্রায় (ক্ষীর ভবানী) প্রত্যেক বিধানটি পালন করিয়া আসিয়াছিলেন।" আবার দোষকটি যাহা মানুষকে ক্ষুদ্র করে, তাহা সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। এখানে তিনি নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করিয়া কেবল মাত্র যেখানে যাহার মধ্যে যতটুকু শ্রেয় আছে তাহাই উল্লেখ করিতেন। মানুষের নিন্দনীয় কর্ম বা আচরণকে তিনি তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতই মনে করিতেন---'সব বাড়িতেই মেথর ঢুকবার জন্য একটি খিড়কির দরজা থাকে।'

বিবেকানন্দের যাবতীয় ভাবনার ঘনীভূত রূপ রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে --এ কথা বলিলে বোধ হয় খুব অত্যুক্তি হইবে না। স্বামীজী নিজেই মঠের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। সরলাবালা সরকারের স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ নামক পুস্তকে ইহা সুন্দর ও বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এইগুলি যথোচিত গুরুত্বের সহিত প্রণিধান করিলে মানুষ-বিবেকানন্দের মূর্তি আমাদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে বলিয়াই একটি মাত্র প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করিব।

যিনি দেশ, সমাজ ও দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য চিন্তা করেন এবং কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহাকেই সর্বকালের মানব সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ মনন করে। তিনিই কবি-প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে 'শ্রেষ্ঠ মানুষ।' সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরণ, শক্তি সাধনা, শিক্ষার প্রসার, সাধন ভজন ইত্যাদির মধ্যে মিশনের ক্রিয়াকলাপ সীমিত হইলে ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ ঘটিত না। কারণ ইহাই মিশনাদি প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্ম। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মানুষ বিবেকানন্দ ইহাতেই মাত্র সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। শরীর যাহাদের সমধিক বলবিশিষ্ট হয়, তাঁহার উপায় করাও বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম কর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 'লোক ভয়ে, অন্নাভাবের ভয়ে, মানহানির ভয়ে, মনুষ্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইলেও, নূতন উদ্যম উপযুক্ত হয় না। তাহার উপর যে সমাজ যত অধিকদিন পথবিশেষকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে নূতন কোন পন্থা অবলম্বন করা ততই কঠিন হয়। অতএব এই মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে, নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়। যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই।

"মধ্য ভারতের হাজারীবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর সজল স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি বৃহৎ শিল্প বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। ধন সমাগমের নূতন পথ যে সব আবিষ্কৃত হইবে লোক তেমনি উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে। তখন তাহাদিগকে যে প্রকারে গঠিত করিবে সে প্রকারেই গঠিত হইবে।

সর্বত্র একটা সুশৃঙ্খল সুনিয়ম স্থাপনের এমন আন্তরিক প্রয়াস এবং দেশবাসীর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা ও কর্মের নির্দেশ—মানুষ বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি তাঁহার সাধনালব্ধ সত্য দৃষ্টি দ্বারা ভারতবাসীর মানুষ হইবার যে সত্য পন্থা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারই একটি সামগ্রিক রূপ এই সব নিয়মাবলীর মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। এই বিশেষ উদ্ধৃতিটির একটু তাৎপর্য রহিয়াছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় মধ্যভারতে দণ্ডকারণ্যে নূতন উপনিবেশ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু এই নূতন বাসভূমি আমাদের (উদ্বাস্তু সহ সমগ্র বাঙালি সমাজের) একটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব আছে। ইহা যে ক্ষতিকর, তাহা উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সর্ব-প্রকার দ্বিধা এবং জনতা ও স্থান বিশেষে রাজনৈতিক নেতাদের প্রচার অপপ্রচারের বাধা অতিক্রম করিয়া

দণ্ডকারণ্য উপনিবেশের সুফল যুক্ত করে সমগ্র চিত্তে গ্রহণ করিবার জন্য জাতীয় স্বার্থে আমাদিগকে উদ্যোগী হইতে হইবে। দেশবাসীর নিকট বিশেষত উদ্বাস্তু জনসাধারণের মনে দুঃখ ক্ষয়ক্ষতির ঘনকৃষ্ণ মেঘের রূপালি রেখা এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা। যাহা আমরা হারাইয়াছি, তাহার জন্য অকারণ শোক করিয়া বা এই দুঃসহ অবস্থার জন্য যাহাদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে নিন্দাবাদ করিয়া পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইব না। অনাগত দিনের যে মহৎ ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নিয়মে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা যদি আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করি তাহা হইলে জাতি নব বলে বলীয়ান হইবে। আজকের ক্ষীয়মান ক্ষয়মান বাঙালী সমাজে 'নব নব উন্মেষশালিনী' বিরল প্রতিভার দেখা হয়ত বা অচিরকাল মধ্যে পাওয়া যাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ নিখিল মানব সমাজের মধ্যে মানবীয় ভাবভাবনা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশবাসীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এ সম্পর্কে সুচিন্তিত কর্মের নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "পাশ্চাত্য-বাসীর আদর্শ—একটা কিছু কর। প্রাচ্যবাসীর আদর্শ—নির্বিবাদে সয়ে যাও। সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন সেইটা, যাতে এরকম পথের অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকবে।" পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মধ্যে যে কিছু কিছু ভাল গুণ এবং কর্মের অভিব্যক্তি দেখা যায় তাহারই ভিত্তিতে মানুষে মানুষে প্রাকৃতিক, ভৌগলিক ও অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও যে মিলন সম্ভব—এ কথা আজিকার আনবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রে ভীত, আদর্শের দ্বন্দ্বে জর্জরিত ও স্বার্থের নিগড়ে শৃঙ্খলিত বিশ্বমানব তিল তিল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। অনেক আপাতব্যর্থ আন্তর্জাতিক সভা ও সম্মেলনের পর স্বামীজীর এ কথায় আমাদের প্রত্যয় হইতেছে।" যদি দেশভক্তি দেখতে চাও ত জাপানীদের দেখ, যদি পবিত্রতা চাও ত হিন্দুদের দেখ, আর যদি মনুষ্যত্ব দেখতে চাও ইউরোপীয়দের দেখ।" ইহাদের সকলের সম্মিলনেই মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেশভক্ত পবিত্র আন্তর্জাতিক মহামানব। ইহা কেবল মাত্র চিন্তার দ্বারা সাধিতব্য নহে। এজন্য প্রয়োজন নিবেদিতা লিখিতেছেন "তাঁহার (বিবেকানন্দের) পাশ্চাত্যে আগমনের কারণ এই যে, তিনি বিশ্বাস করেন জাতিসমূহের মধ্যে বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের ন্যায় পরস্পর আদর্শ-বিনিময়েরও সময় আসিয়াছে।" ইহা নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর উক্তির মত শোনায় না, কিন্তু মানবপ্রেমিক আন্তর্জাতিক মানুষের পক্ষে যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা ত ইহাই। মানুষ বিবেকানন্দের জীবন ছিল মানবহিতে নিবেদিত। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশ বিদেশের যে কর্মী ও বুধ-মণ্ডলী রামকৃষ্ণ মিশনে সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানকে সুন্দর ও মহান, আনন্দ-ময় ও শান্তিময় করিবার জন্য যে কর্ম-মহাযজ্ঞের সূচনা করিয়াছিলেন তাহা আজিও মনুষ্যত্বের গরিমায় উজ্জ্বল। বীরব্রত অগ্নিহোত্র সন্ন্যাসীসমাজ মানুষ বিবেকানন্দের আর এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভারতের মৃত্তিকাকে যিনি স্বর্গ, ভারতের কল্যাণকে যিনি স্বীয় কল্যাণ বলিয়া বিবেচিত করিতেন সেই স্বদেশপ্রেমিক মানুষ বিবেকানন্দ সকল মানবপ্রেমিক ও দেশব্রতীর শেষ আশ্রয় স্থল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও ইহা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। "স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন মানুষ—আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার চরণে আশ্রয় নিতাম।" মানুষ বিবেকানন্দের ইহা অপেক্ষা মহৎ স্বীকৃতি আর কি হইতে পারে? ভারতে দ্বিতীয় বিবেকানন্দের আবির্ভাব পর্যন্ত বাঙালি সমাজ তথা সমগ্র দেশবাসীর আশ্রয়স্থল যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাহা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিধ্বস্ত বাঙালি জাতিকে বিবেকানন্দ প্রমুখ বংগবীরগণের মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে পরি-চালিত হইলে দুর্দিনের ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া জাতীয় জীবনে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রসন্ন আলোক অচিরেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

ঠাকুরঝি'র বিয়ে
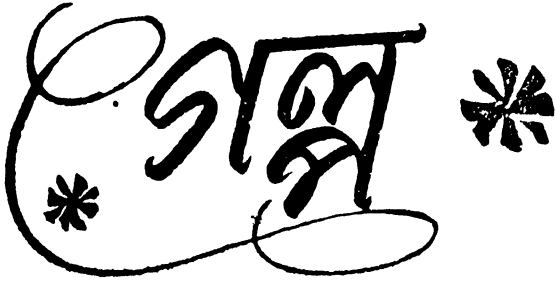
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৩

ইহার কিছুদিন পরে স্বাতী একদিন লীলাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। লীলারও ইচ্ছা ছিল, একদিন স্বাতীদের বাড়ী গিয়া স্বাতীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলাপ করে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছেন ভাই ? তোমার সঙ্গে এতদিনের পরিচয়, কিন্তু তোমাদের বাসা ছিল কলকাতার বাইরে। তাই তোমাদের বাড়ীর কারো সঙ্গে আলাপ হয় নি।

স্বাতী বলিল, হ্যাঁ। আমরা মাত্র কয়েক মাস হ'ল এবাসায় এসেছি। এখান থেকে তেমন বেশি দূরে নয়। তুমি এখানে থাক শুনে আমি এসেছিলাম আগে তোমার কাছে।

লীলা বলিল, তা বেশ করেছ। আমি এতে খুব খুসী হয়েছি। তোমার মা বাবা আছেন ?

স্বাতী বলিল, বাবা নেই। মা আছেন, দাদা আছেন, আর একটি ছোট ভাই আছে। আমার এক পিসিমা থাকতেন আমাদের সংসারে। তিনি এখন থাকেন না।

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের এ বাড়ীটা কি তোমাদের নিজেদের, না ভাড়া ?

এ বাড়ীখানা নিজেদেরই। বাবা কিনেছিলেন। এত দিন ভাড়া দেওয়া ছিল। এখন আমরা নিজেরাই থাকি।

বেশ। তাহলে কথা রইল, আমি ঠিক গিয়ে উপস্থিত হব ঠিক সময়ে।

স্বাতী বলিল, ভেবো না যেন, তোমার জন্য কিছু আয়োজন করেছি। এমনি যাবে, আমাদের সঙ্গে একটু মিষ্টি-মুখ করে আসবে।

হ্যাঁ যাব, নিশ্চয়ই যাব।

আচ্ছা, আসি তাহ'লে।

স্বাতী চলিয়া গেল।

লীলা স্বাতী এবং তাহার পরিবারের লোকজনের সাংসারিক পরিচয়ের জন্য উৎসুক ছিল। সুরেশের মনের ভাব লীলা বুঝিয়াছিল। তাই সে ভাবিতেছিল, যদি স্বাতীর পরিবারের সঙ্গে বিবাহের কোন কঠিন বাধা না থাকে, তাহা হইলে স্বাতীকেই বৌদি করিয়া লইবে।

১৪

লীলা স্বাতীদের বাড়ী পৌছিলে স্বাতী তাহাকে লইয়া তাহার নিজের ঘরে বসাইল। বলিল, এইটে আমার ঘর। বস। মাকে ডেকে নিয়ে আসি।

মাতা বিভাবতী আসিয়া লীলার পাশে বসিলেন। বলিলেন, স্বাতীর কাছে তোমার কথা কতদিন শুনেছি। কিন্তু আমরা থাকতুম অনেক দূরে। তাই যাওয়া আসা হয় নি। এখন কাছে এসেছি—এই তো এপাড়া ওপাড়া। বেশ।

স্বাতীর ছোট ভাই রণেন একবার দরজা হইতে উঁকি দিয়া দেখিয়া গেল মাকে, লীলাকে আর স্বাতীকে। ঘরে না ঢুকিয়াই পলাইয়া গেল। কিন্তু কৌতূহলী লীলার দৃষ্টি-এড়াইল না।

বিভাবতী বলিলেন, শুনেছি তোমার মা বাবা নেই।

লীলা নীরবে মুখ নত করিল।

বিভাবতী বলিলেন, আহা!

তোমার দাদাই বুঝি সংসার চালান ?

হ্যাঁ।

তোমাদের নিজেদের বাড়ী ?

হ্যাঁ

খুব ভাল। কলকাতায় বাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকা কি কষ্ট! তুমি আর তোমার দাদা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই বুঝি?

না। তবে কখনো একআধজন আত্মীয় আসেন যান।

স্বাতীর বড় ভাই গুণেন হঠাৎ ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াই চেঁচাইয়া উঠিল, মা, মা! তারপরই ঘরে অপরিচিত লোক দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু স্বাতী বলিল, দাদা, তুমি পালাচ্ছ কেন? এ হচ্ছে লীলা। এর কথা কতবার বলেছি তোমাকে। এস বস' এখানে।

গুণেন অগত্যা বসিল। প্রথমে গুণেন ও লীলা একটু আড়ষ্ট হইয়া রহিল। স্বাতীই শুধু কথা বলিতেছিল। বলিতেছিল, দেখ মা, লীলা কি অদ্ভুত মেয়ে। পড়াশোনায় এত ভাল। এবার ডিস্‌টিংশন পেয়ে বি এ. পাস করেছে। সমস্ত সংসার ঘাড়ে করে আছে। দাদাকে কিছু করতে দেয় না।

লীলা ধীরভাবে বলিল, স্বাতী কি সব বলছ যা তা।

ইতিমধ্যে লীলা ও গুণেন কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়াছে। লীলার চোখ মুখ একটু উজ্জল হইযা উঠিয়াছে। কিন্তু মনের চঞ্চলতা সে যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াছে। গুণেনও যেন একটু চিন্তাকুল হইয়াছে। গুণেন বলিল, স্বাতী, আমরা এত দিন হ'ল এ বাড়ীতে এসেছি। কই তোমার বন্ধুকে তো কোনদিন আনো নি এখানে। শুধু তুমিই বুঝি গিয়ে দিন রাত জালাতন কর ওঁকে।

লীলা নতমুখে বলিল, জালাতন করবে কেন? একা একা থাকি। ও যতক্ষণ থাকে, আমার খুব ভাল লাগে।

গুণেন বলিল, এবার তো বাড়ী-টাড়ী দেখে গেলেন। আসবেন মাঝে মাঝে।

লীলা কোন উত্তর দিল না।

গুণেন বলিল, আচ্ছা তোমরা ব'স। আমি চল্লুম।

স্বাতী বলিল, কোথায় যাচ্ছ?

গুণেন বলিল, একটা ক্রিকেট-ম্যাচ আছে। এই কথা বলিয়াই গুণেন বাহির হইয়া গেল।' যাইবার পূর্বে লীলার দিকে একবার চাহিয়া লইল।

স্বাতী বলিল, মা, তুমি বস একটু এখানে। যাই, দেখে আসি, একটু মিষ্টি-টিষ্টি আনলো কি না ঝি-টা।

স্বাতী চলিয়া গেল। বিভাবতী বলিলেন, তোমার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। শুনেছি। কি হয়েছিল?

তাঁর হার্টের অসুখ ছিল।

অন্য কোন অসুখ নয় তো?

লীলা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

দেনা টেনা আছে?

লীলা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

বেশ!

তোমার দাদা কত পান?

ঠিক জানিনে। তবে ভাল গ্রেড শুনেছি। মাইনে ক্রমে ক্রমে বাড়বে।

আমি যাব একদিন স্বাতীর সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে বেড়াতে।

নিশ্চয়ই আসবেন।

হ্যাঁ। স্বাতী তো দিনরাত লীলা, লীলা করছে। তোমার প্রশংসা ওর মুখে ধরে না।

ও অমনি সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে।

না, ও বাড়িয়ে বলবার লোক নয়। জানি তো ওকে। ভারি সূক্ষ্মবুদ্ধি।

সূক্ষ্মবুদ্ধি কথাটা লীলার তেমন পছন্দ হইল না। লীলা বলিল, স্বাতী গেল কোথায় ওকে বলে দিন, বেশি কিছু আয়োজন যেন না করে। আমি কিন্তু বেশি খেতে-টেতে পারি নে।

কেন, অসুখ-টসুখ আছে বুঝি।

না। আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল। কখনো কোন অসুখ-টসুখ করে নি।

তবে?

এমনই বলছিলুম, খুব বেশি খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

আমার গুণেন কিন্তু খুব খেতে ভালবাসে! খুব খেলা-ধুলা করে কি না।

স্বাতী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল—মা, আবার আরম্ভ করেছ দাদার গুণকীর্তন। দেখ লীলা, মার কি অভ্যেস জানো। কারো সঙ্গে দেখা হলেই—দাদার গুণকীর্তন। দাদা যেন একটা আইবুড়ো মেয়ে।

আচ্ছা যা, আর মার খুঁত ধরতে হবে না।

এস লীলা, ওঘরে। একটু খাবারের ব্যবস্থা করেছি।

লীলা স্বাতীর সঙ্গে চলিল। বিভাবতীও সঙ্গে গেলেন।

লীলা যতক্ষণ এ বাড়ীতে ছিল, সে কেবল মনে মনে লক্ষ্য করিয়াছে ইহাদের রুচি, কথাবার্তা, ব্যবহার, ইত্যাদি। লীলাই এখন সুরেশের অভিভাবক। দাদার বিবাহের সব দায়িত্বই যেন তাহার। সেইজন্য তাহাকেই বরকর্তা হইয়া দাদার ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

ইহার পর হইতে এই দুই পরিবারের মধ্যে পরিচয় আরো একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। গুণেনের সঙ্গে সুরেশের পরিচয় হইল এবং মধ্যে মধ্যে এ বাড়ী ওবাড়ীর মধ্যে মেয়েদের ও পুরুষদের যাতায়াত হইতে থাকিল।

১৫

একদিন লীলা সোজাসুজি সুরেশকে বলিল, দাদা, একটা দরকারী কথা আছে।

সুরেশ বলিল, তুমি কি বলবে, তা ঠিক না জানলেও কিছুটা অনুমান করতে পারি।

অনুমান যখন করেছ, তখন অনুমানটা সত্যি হয়ে যাক না। স্বাতীর সঙ্গেই তোমার বিয়েটা ঠিক করে ফেলি ?

ছোট বোনকে অভিভাবকত্ব করিতে দেখিয়া প্রথমে সুরেশ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তুমিই বুঝি বরকর্তা ?

ঠাট্টা করলে কি হবে ? এখন আমিই তো তোমার অভিভাবক। চট্ করে মতটা দিয়ে দাও। সব ঠিক করে ফেলি।

সুরেশ একটু গম্ভীর হইয়া গেল। পরে বলিল, তোমার একটা ব্যবস্থা না করে কি করে আমি বিয়ে করি ?

লীলা বলিল, আমার আবার ব্যবস্থা কি ? এমন একজন দাদা থাকতে অন্য ব্যবস্থার কি দরকার ?

চিরকাল কি দাদাই দেখবে ?

বাধা কি ? একটা মেয়ের ভার এমন কি দুঃসহ।

ছি লীলা। ওসব কি বলছ ? তুমি যে আমার মায়ের স্থান অধিকার করেছ, তা কি আমি কখনো ভুলতে পারি ?

ওসব কথা থাক দাদা। তোমার সংসারী হবার সময় হয়েছে। এখন তোমার একটি বউ ঘরে আনা দরকার। আমি আর পারব না তোমার চা করতে, আর তোমার আলনা গোছাতে।

দাদার পরে রাগ করেছ বুঝি ?

কি যে বল তুমি ? তোমার পরে রাগ করব আমি ?

না না, অমনিই বললাম। কিন্তু তোমারও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে।

লীলা গম্ভীর হইয়া একটু চিন্তা করিল। বলিল, আমার ভাবনা তোমার আছে, তা কি আমি জানিনে ? বোনের জন্য বড় ভাইয়ের এ দুশ্চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। তুমি যে কত ভাবছ আমার জন্য, তা কি আমি বুঝি নে ? কিন্তু দাদা, ভাবলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয় ? ভগবান্‌কে ভুললে কি চলে ? তিনি ব্যবস্থা না করলে কোন ব্যবস্থাই হয় না।

ও বুঝেছি। আমার ব্যবস্থা করবে তুমি। আর তোমার ব্যবস্থা করবেন ভগবান্।

শুধু তর্ক করলে কি হবে ? তোমার ব্যবস্থা কি সত্যিই আমি করছি। এত ভগবানেরই কাজ।

স্বাতীকে কি তোমার খুবই পছন্দ হয়েছে ?

দেখ দাদা, সব দিক দিয়ে সব পছন্দ কোন সময়েই হয় না। তুমিও ওদের দেখেছ শুনেছ সব। তোমারও মত থাকা উচিত। তুমিই বল না কেন।

আমার কাছে মন্দ মনে হচ্ছে না। তুমি যখন সত্যই একটা শেষ সিদ্ধান্তের কাছে এসে পড়েছ, তখন আমার আর লজ্জা করে কথা বলা সাজে না।

তোমার মত হয়েছে জেনেই আমি মত করেছি। এ যে কত বড় একটা দায়িত্ব, তা তুমি বোঝ। এ দায়িত্ব তোমারই নেওয়া উচিত। বিশেষত যখন দুই পরিবারের মধ্যেই আলাপ পরিচয় হয়েছে। স্বাতী পরে কেমন হবে তা তুমি বা আমি কেউই বলতে পারি নে। বিয়ের আগে কোন মেয়েকে চেনা যায় কি ? তবে হাঁ বেশ সুশ্রী দেখতে, বেশ বুদ্ধিমতী, আর কথাবার্তাও বেশ ভাল। ওর মার কথাবার্তার মধ্যে মাঝে মাঝে একটু বেশি সংসারী ভাব লক্ষ্য করেছি। তা হোক গে। অত ভাবলে কোন কাজই করা যায় না। যাই হোক, এতদিন দেখেছ, শুনেছ, এখন তোমাকেই শেষ মত দিতে হবে। কলকাতায় মেয়ের তো অভাব নেই। চেনা-শোনা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একটু খোঁজ করলেই কত সম্বন্ধ আসবে।

আমার কিন্তু ইচ্ছে ছিল, বরাবরই ভেবেছি—তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে তার পরে আমার নিজের কথা ভাববো।

কিন্তু দাদা, তোমার সংসারী হওয়াটাই আগে দরকার। তুমি আর দ্বিধা কর না। যদি স্বাতীকে তোমার ঠিক পছন্দ না হয়, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আর দেরি করতে আমি চাই নে।

তোমার যদি তর না সয়, তা হ'লে যা হয় কর। আমি কিছু বলব না।

তা বললে কি হয়? সত্যি তোমার মত আছে কি না আমাকে ঠিক করে বল।

আচ্ছা, আছে, যাও।

লীলা মনস্থির করিয়া ফেলিল। সুরেশের মন স্থিরই ছিল। সুতরাং আর বেশি কথাবার্তার প্রয়োজন হইল না। দিন স্থির হইয়া গেল। বিবাহ উপলক্ষ্যে উহাদের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন আসিলেন। উহাদের সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হইল না। শুভদিনে শুভক্ষণে লীলা তাহার বৌদিকে আনিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করিল। সুরেশ পরিতৃপ্ত হইল। লীলা পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া গোপনে একটু অশ্রু বিসর্জন করিল।

১৬

আজ বৌ-ভাত। আয়োজন সামান্য। তথাপি আজ সকাল হইতেই লীলা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহার নতন বৌদি স্বাতীকে রাণীর মত করিয়া সাজাইয়া গুজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। তথাপি তাহার কাছে আসিয়া একথা ওকথা শুনিয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যা আসিল। একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসিলেন। লোক খুব বেশি নয়। সুরেশ তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছে। মেয়েদের অভ্যর্থনা করিতেছে লীলা। তারপর আহারের পালা। সকলেই আহারে বসিয়া আহার্যের প্রশংসা করিলেন। রান্নাবান্না বেশ হইয়াছে। সকলেই পরিতৃপ্ত মুখে বিদায় লইলেন।

স্বাতীর বাড়ীর কয়েকজন অভ্যাগত স্বাতীকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা তখনও খাইতে বসেন নাই। খাইবার স্থান করিয়া দিয়া লীলা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া খাইতে বসাইল। বিভাবতী বলিলেন, আমি পরে বসব। তোমরা ব'স।

লীলা বলিল, আপনিও বসে যান; নইলে অনেক রাত হয়ে যাবে।

আর তুমি?

লীলা বলিল, আমার হবে'খন।

এক পাশে স্বাতী আর বিভাবতী, আর একপাশে সুরেশ, গুণেন আর রণেন। বিভাবতীর আসনখানি একটু পৃথক করিয়া পাতা হইল।

লীলা নিজ হাতে পরিবেশন করিতে লাগিল। বলিল, আমাদের আয়োজন অতি সামান্য। একটু চেয়ে টেয়ে নেবেন।

লীলার সঙ্গে লীলাকে সাহায্য করিতেছিল পাশের বাড়ীর অপর্ণা। অপর্ণা বলিল, লীলাদি, তোমার ওই নতন কুটুমদের ভাল করে খাওয়াও। নইলে বাড়ী গিয়ে নিন্দে করবেন।

এই কথা বলিয়া অপর্ণা গুণেন ও রণেনের দিকে চাহিল। লীলাও সেইদিকে মুখ ফিরাইল। দেখিল গুণেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। লীলা একটি মাছের গামলা লইয়া উহাদের কাছে গিয়া তাহা হইতে বড় বড় কয়েকখানি মাছ তুলিয়া লইয়া গুণেন আর রণেনের পাতে দিয়া বলিল, রান্না কেমন হয়েছে? খাওয়া যাচ্ছে তো?

গুণেন বলিল, চমৎকার রান্না হয়েছে। আপনার হাতের রান্না বুঝি?

লীলা লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।

গুণেন বলিল, শুধু আজ খাওয়ালে চলবে না। আসব কিন্তু আমি মাঝে মাঝে। আপনার হাতের রান্না খেতে।

লীলা নীরবে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বিভাবতী ও স্বাতীকে জিজ্ঞাসা করিল, মাছ দেবো?

না, অনেক খেয়েছি। আর না।

লীলা সরিয়া গিয়া, আপনারা আর মাছ নেবেন—এই কথা বলিয়াই গুণেন আর রণেনের পাতে আরো কখানা বড় বড় মাছের টুকরা দিল। স্বাতী মুখখানি গম্ভীর করিয়া তাহার মার গায়ে একটু ঠেলা দিয়া কাণে কাণে বলিল, দেখলে? যত সব আদিখ্যেতা।

এবার অপর্ণার হাতে সন্দেশ। লীলার হাতে দই। সন্দেশ ও দই পরিবেশনের সময়েও অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন গুণেন আর রণেনের দিকে একটু পক্ষপাতিত্ব হইয়া গেল। গুণেন ইহা লক্ষ্য করিয়া একটু আনন্দিত হইল। বলিল, —দেখি, আর একটু দই।

লীলা অতি তৎপরতার সহিত আর একখানি নূতন হাঁড়ি আনিয়া তাহার মাথা হইতে খানিকটা ঘন দই তুলিয়া গুণেনের পাতে দিয়া বলিল, আর একটু দেবো?

দাদা, ওদিক হইতে একটু যেন ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, দাদা, রাতে অত দই খাচ্ছ কেন? আর দই খেতে হবে না।

লীলা ইঙ্গিত বুঝিল। স্বাতীর দিকে তাকাইয়া বলিল, তোমার দাদা বেশ খেতে পারেন শুনেছি। এখানে লজ্জায় কিছু বলছেন না।

স্বাতী বলিল, অনেক খেয়েছেন, আর সাধাসাধি করো না।

সুরেশ বলিল, লীলা, মাসিমাকে জিজ্ঞেস কর, কিছু নেবেন কি না। উনি কিছু খাচ্ছেন না।

বিভাবতী বলিলেন, না না, আমি অনেক খেয়েছি। আমাকে আর কিছু দিতে হবে না।

আহারাদি শেষ হইল। বিভাবতী, গুণেন, রণেন বিদায় লইলেন। লীলা ও অপর্ণা দরজায় দাঁড়াইয়া উঁহাদিগকে বিদায় দিল। অপর্ণা বলিল, লীলাদি, সবই তো হ'ল। তোমার মুখে এখনও কিছু পড়ল না।

এই যাচ্ছি। তুমি খেয়েছ?

নিশ্চয়ই। আমি আগের ব্যাচেই খেয়ে নিয়েছি।

লীলা স্বাতীকে বলিল—এবার যাও, তোমরা শুয়ে পড় গে। রাত্রি হয়েছে।

স্বাতী বলিল, চল, তুমি খাবে চল।

লীলা বলিল, সে হবে'খন। আমার জন্য ভেবো না। যাও, লক্ষ্মীর মত ঘরে গিয়া শুয়ে পড় গে। এ' কদিন ভাল করে ঘুমুতে পার নি নানা গোলমালে।

উহারা ঘরে গেল। লীলা আর অপর্ণা এবং আরো দুই-একজন আত্মীয়া সাজানো খাটের উপরে সুরেশকে আর স্বাতীকে বসাইয়া একটু রসিকতা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বর কনে বড় হইয়াছে। উহাদিগকে লইয়া গতানুগতিক ভাবে খেলা করিবার উৎসাহ কাহারও তেমন ছিল না।

অপর্ণা বলিল, লীলাদি চল, আর দেরি নয়। এখুনি বসতে হবে তোমাকে। কিছু খেয়ে নাও।

লীলাকে ধরিয়া লইয়া খাইতে বসান হইল। অন্য একজন আত্মীয়া এবং অপর্ণা তাহাকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। লীলা, কেবলই, থাক থাক, করিয়া খাবার ফিরাইয়া দিতে লাগিল। আত্মীয়াটি চলিয়া গেলেন। লীলার খাওয়াও প্রায় শেষ হইল। অপর্ণা বলিল, একটু দই দেব?

লীলা বলিল, দাও।

দই খাইতে খাইতে লীলা বলিল, বৌদিকে কেমন দেখলে?

ভালই তো।

তবু, কেমন লাগল, বলই না।

ভালই লাগল। কিন্তু ভাই, তোমার কাছে বলছি, বেশ একটু চালাক কিন্তু।

লীলা একটু গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, তা হোক, দাদা সুখী হলেই হল।

অপর্ণা বলিল, এখন থেকে আর তোমার সংসারের কোন ঝামেলা রইল না।

লীলা বলিল, ভাবছি, এবার পড়াশোনায় একটু বেশি করে মন দেবো।

লীলা খাওয়া শেষ করিয়া মুখ ধুইয়া আসিয়া অপর্ণাকে বলিল, তোমায় আজ বড্ড খাটতে হ'ল। যাও, এবার বাড়ী যাও।

হ্যাঁ, লীলাদি, আসি আজ।

১৭

সুরেশের জীবন-তরণী মৃদুমন্দ বায়ুভরে নাচিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। লীলা সবক্ষণ দাদা ও বৌদির সুখসুবিধা বিধানে তৎপর। লীলা পূর্ববৎ রান্নাবান্না করে। একদিন স্বাতী বলিল, আজ আমি রাঁধব।

লীলা বলিল, কেন? আমিই তো যাচ্ছি। তুমি যাও, দেখগে দাদার কিছু দরকার আছে কি না। বরং কুটনোটা একটু কুটে দিয়ে যাও। না, না, থাক, ঝি-ই কুটে দেবে'খন।

স্বাতী কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। বৈকালে লীলা স্বরেশের ঘরে গিয়া বলিল, কই, এর মধ্যে তোমরা সিনেমায় গেলে না একদিনও। আজ যাও না।

তুমিও চল তা'হলে।

আমি? না, আমি আর একদিন যাব। আজ তোমরাই যাও।

স্বাতী বলিল, ঠাকুরঝি বলছেন যখন, তখন চল না, আমরাই যাই। ঠাকুরঝি'র কত কাজ রয়েছে। তাছাড়া, একটু গলা নীচু করিয়া স্বাতী বলিল, তিনখানা টিকিটের দামও তো আছে।

স্বরেশ মনে মনে অত্যন্ত আহত হইলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতে পারিল না।

তোমরাই যাও দাদা—বলিয়া লীলা সেখান হইতে সরিয়া গেল।

স্বরেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে বলিল, চল।

লীলা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। রান্না সারিয়া নিজের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। দাদা বৌদি সিনেমা হইতে ফিরিলে ভাত বাড়িয়া খাইতে দিতে হইবে। পাশের বাড়ী হইতে অপর্ণা আসিয়া ডাকিল, লীলাদি!

এই যে এ ঘরে, এস।

চুপ করে বসে আছ যে?

কি খবর? রান্না হয়ে গেছে। কিই বা রান্না!

দাদা বৌদি কোথায়?

সিনেমায় গেছেন।

আর তুমি হাঁড়ি ঠেলছ?

আমি কি আর নূতন হাঁড়ি ঠেলছি?

না, তা বলছি নে।

তবে কি বলছ?

বলব? রাগ করবে না তো?

কেন, রাগ করবো কেন?

তুমি ছিলে এ বাড়ীর রাণী—এখন—

এখন কি?

এখন হয়েছ দাসী।

যাও, কি যে বল, তার ঠিক নেই।

যাক্‌গে। বৌদি বলছিলেন—

অপর্ণা একটু থামিল। কথাটা বলিবে কি না বুঝিতে পারিতেছে না। একটু থামিয়া বলিল, বৌদি বলছিলেন, দাদা নাকি তাকে বলেছেন, ওই অজিত-বাবুটি নাকি বিয়ে করতে চায়।

লীলা বলিল, বেশ তো, করুক না বিয়ে।

সে নাকি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

তা হ'লে তার বিয়ে হবে না।

তুমিই বা এত জেদ করছ কেন?

কেন, সেকথা আমাকে বলতে হবে? ওরা কত বড়-লোক—ওদের চালচলন কত আলাদা। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

না, কিছু নয়।

আমাকে বলবে না?

না, বলবার মত এমন কিছু নয়।

আচ্ছা, আমি তাহলে জোর করব না।

শোন, কিছু খাবে?

কি আর খাব এখন?

বস, গরম মুড়ি আছে। তেল নুন দিয়ে মেখে নিয়ে আসি।

আর সঙ্গে দুটো লঙ্কা।

লীলা উঠিয়া গিয়া মুড়ি লইয়া আসিল। দুইজনে মুড়ি খাইতে লাগিল।

অপর্ণা বলিল, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

পড়াশোনা আর আমার হবে না।

কেন?

ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া সময়ই বা কোথায়। সংসারে লোক বাড়লে কাজও বাড়ে।

মুড়ি খাওয়া শেষ হইলে অপর্ণা বলিল, আমি এখন যাই।

আচ্ছা, এস।

অপর্ণা বাড়ীর বাহির হইতেই দেখিল, স্বরেশ ও স্বাতী বাড়ী ফিরিতেছে।

বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে স্বাতী বলিল, ওই যে, আবার এসেছিল।

কে ?

ওই তো, ও বাড়ীর অপর্ণা।

তাতে হয়েছে কি ? ভারি ভাল মেয়ে। লীলাকে খুব ভালবাসে।

ভাল না ছাই। আমার একটুও ভাল লাগে না। যখন আসবে, কেবল ঠাকুরঝি'র সঙ্গে গুজগুজ করবে। দেখলে না, যেই আমরা বেরিয়েছি, অমনি এসে জুটেছিল।

যাও, কি যে বল! কি আর গুজগুজ করবে লীলার সঙ্গে।

যাই বল, আমার ভাল লাগে না বাপু।

বাড়ীর ভিতর গিয়া তারা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া আহারের টেবিলে গিয়া বসিল।

১৮

আহারাদির পর লীলা নিজের ঘরে আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর একখানি বই খুলিয়া রাখিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল অপর্ণার কথা। আমি এ বাড়ীর দাসী ? এর পর নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিল, আমি এ বাড়ীর দাসী! কিছুক্ষণ অস্থিরচিত্তে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

১৯

আর একদিন। লীলা রাত্রে রান্নাবান্না সারিয়া টেবিলের উপর খাবার সাজাইয়া গুছাইয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তারপর নিজের ঘরে বসিয়া উলকাঁটা বুনিতেছে। দাদার জন্য একটি সোয়েটার বুনিবে।

সুরেশ ও স্বাতী সিনেমা হইতে ফিরিল বেশ একটু দেরি করিয়া। লীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া জল গরম করিতে গেল। বৌদি ঠাণ্ডা জল খাইতে চায় না।

স্বাতী বলিল, জল গরম করতে হবে না। আমরা খাব না।

কেন ?

আমরা বাইরে খেয়ে এসেছি।

লীলা বলিল, একটু যদি বলে যেতে, তাহলে এই রান্না-বান্নার হাঙ্গামা আর করতে হ'ত না। এই রাত পর্যন্ত—

তাতে আর হয়েছে কি ?

লীলা মর্মাহত হইল। সুরেশ বলিল, সত্যিই তো, যাবার সময়ই তুমি বলেছিলে, আজ বাইরে খাবে। লীলাকে বলে গেলেই পারতে।

ভুলে গিয়েছিলাম। নাও, চল।

স্বাতী এবং সুরেশ নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল। লীলা ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে উঠিয়া আসিয়া খাবারের বাসনগুলি গুছাইয়া রাখিয়া নিজে খাইতে বসিল।

সুরেশ স্বাতীকে বলিল, দেখ সমস্ত কাজ কর্ম লীলার ঘাড়ে পড়েছে। আর একটা ঝি বা চাকর রাখলে হয় না।

কেন বাক্সে টাকা বুঝি আর ধরছে না।

লীলার কত কষ্ট হচ্ছে, বোঝ না ?

আমি এসেই যত কষ্ট হচ্ছে। এর আগে আর কষ্ট হ'ত না। কোন কাজ নেই, কর্ম নেই। আজকাল দেখছি, একটু পড়াশোনার বালাইও নেই। সারাদিন কি করবে শুনি ? মেয়েছেলের অমন হাত-পা কোলে করে বসে থাকা আমি পছন্দ করি নে।

এতদিন করেছে বলে, চিরদিনই কি খেটে মরবে ?

ওগো বুঝেছি, আমি এসেই সব গোলমাল বাধিয়েছি। যাচ্ছি চলে কালই মার কাছে। থাক তোমরা। ভাই-বোনে সুখে সংসার কর।

কি সব যা তা বলছ ?

যা দেখছি, তাই বলছি। আমি তোমাদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েছি।

আঃ, কি যা তা বলছ। কত সখ করে, কত আদর করে লীলা তোমাকে এনেছে।

লীলা এনেছে ? তুমি আনো নি। বেশ!

সব কথাই তুমি অমন করে বাঁকা করে বোঝ কেন বল ত ?

আমি বেঁকা। আর সবাই সোজা, বেশ

থাক। আর কথা বাড়িও না।

সুরেশ চুপ করিল। কিছুক্ষণ একখানি চেয়ারে বসিয়া

থাকিয়া শুইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কালই আমি যাচ্ছি চলে মা'র কাছে—এই কথা বলিয়া স্বাতী গুমগুম করিয়া ঘরে গিয়া খাটের পাশে বসিয়া রহিল।

২০

লীলা সেদিন বেড়াইতে গিয়াছে পাশের বাড়ী। অপর্ণা বলিল, কতদিন পরে এলে। এস, বস বস।

অপর্ণার বৌদি সুনন্দাও আসিয়া বসিল। বলিল, কেমন আছ ঠাকুরঝি? অনেক দিন পরে এলে।

হ্যাঁ।

সুনন্দা বলিল, তোমার দাদাটি তো বেশ প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

লীলা বলিল, কেন, তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ না?

কি করে জানলে?

আমার চোখ কান নেই? দেখছি না চোখের সামনে? ওঘরে কথা বলছে কারা?

ওঘরে উনি আর অজিতবাবু।

অজিতবাবুর সঙ্গে ওঁর খুব আলাপ বুঝি?

আলাপ-টালাপ বুঝি নে। তবে আসেন মাঝে মাঝে—কি সব দরকারী কথাবার্তা নিয়ে।

অজিতবাবু সম্বন্ধে শৈলেনবাবু কি বলেন?

কই কিছুই বলেন না। তবে অজিতবাবু লোকটা বোধ হয় মন্দ নয়। কথাবার্তা বেশ।

তুমি ওর সঙ্গে আলাপ করেছ?

না। আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ-টালাপ করি নি। ওঁদের বাড়ীর কেউ আমাদের বাড়ী আসেন নি। ওঁরা শুনি খুব বড়লোক।

অপর্ণা বলিল, বল না ওঁকে সেই কথাটা।

সুনন্দা বলিল, কোন কথাটা?

অপর্ণা। আহা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

লীলা। (উদ্‌গ্রীব হইয়া) কি কথা বৌদি?

সুনন্দা। ও একটা বাজে কথা।

লীলা বলিল, তা হোক, তুমি বল।

সুনন্দা। কে নাকি ওঁকে বলেছে, অজিতবাবু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন না।

লীলা। ওঃ, এই কথা।' ওসব বড়লোকের খেয়ালের কথা ছেড়ে দাও।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর লীলা উঠিল। বলিল, যাই, দাদার আমার সময় হ'ল।

সুনন্দা। তাতে কি? বৌদি তো আছেন।

লীলা। তা হোক, যাই।

এই কথা বলিয়া লীলা যখন অপর্ণাদের বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছে, ঠিক তখনই দেখিতে পাইল, অজিতও বাহির হইতেছে। অজিত বলিল, ও, আপনি?

লীলা। হ্যাঁ।

অজিত। কেমন আছেন?

লীলা। ভাল আছি।

অজিত। আপনার দাদা?

লীলা। তিনিও ভাল আছেন।

অজিত। সেই যে ঘড়ি ফেরত নিতে এসেছিলেন, তারপর আর আমাদের দেখা হয়নি।

লীলা। না।

অজিত। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমার খুব আনন্দ হয়।

লীলা। ওরকম কথা যাকে তাকে বলতে নেই।

অজিত। যাকে তাকে! আপনাকে কবে থেকে দেখছি বলুন তো? এই এতটুকু থেকে।

লীলা। তা দেখতে পারেন।

লীলা এই ধরণের উত্তর দিতেছে বটে, কিন্তু একেবারে হঠাৎ চলিয়া যাইতেও যেন ভদ্রতায় বাধিতেছে।

অজিত বলিল, আমার সঙ্গে দেখা হলে কি আপনি খুব অসন্তুষ্ট হন?

লীলা। আমি কিছুই হই নে।

অজিত। আমি কিন্তু খুব আনন্দিত হই।

লীলা। আমার একটু কাজ আছে! আমি যাচ্ছি।

এই কথা বলিয়া লীলা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

২১

স্বাতীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। লীলার উদ্বেগ বাড়িয়া গিয়াছে। স্বাতীকে সে একেবারেই নড়িতে দেয় না। একদিন লীলা বলিল, তুমি এখন থেকে খুব সাবধানে

থাকবে। বেশি নড়াচড়া কর না। বাইরে বেরোনাও কমিয়ে দাও। এই নাও, একটু তেঁতুলের আচার করেছি। খেয়ে দেখ। স্বাতী খাইয়া বলিল, খাসা আচার হয়েছে।

লীলা বলিল, আরও দু'তিন রকম আচার তোমাকে করে দেব।

স্বাতী বলিল, এমন সুন্দর আচার তৈরি করা কোথায় শিখলে?

মার কাছে শিখেছি—এই কথা বলিয়াই লীলা গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, মার কত সাধ ছিল—বলিয়াই লীলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

স্বাতী বলিল, একটা কথা বলছিলাম—

কি কথা?

আমি ভাবছি, আমি কিছুদিন মার কাছে গিয়ে থাকি।

আচ্ছা, যেও আরো কিছুদিন পরে।

তুমি কিছু মনে ক'র না।

নিশ্চয়ই না। তোমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমি কখনো বাধা দিয়েছি? এ সময়ে সকলেই মার কাছে থাকতে চায়।

সুরেশ সামনে আসিয়া পড়িল। লীলা বলিল—দাদা, বৌদি কিছুদিন ওর মার কাছে গিয়ে থাকবে। তোমার অমত নেই তো?

আমার মতামতের কি দরকার?

লীলা বলিল, রাগ করছ?

সুরেশ বলিল, না, রাগ করব কেন? তোমরা যা ভাল বোঝ কর।

স্বাতী একদিন কাপড় চোপড় গুছাইয়া লইয়া মার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। লীলাকে বলিল, যাই ভাই। মাঝে মাঝে যেও। খোঁজ খবর নিও।

যাঁর খোঁজ নেবার তিনিই নেবেন। তোমাকে ভাবতে হবে না।

খুব কথা শিখেছ, দেখছি।

কই, আমি আর কবে কি শিখলাম?

আচ্ছা, আজ আমি ভাই।

স্বাতী রণেনের সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরদিনই লীলা স্বাতীদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। বিভাবতীকে বলিল, খালি বাড়ীতে আমার একেবারেই ভাল লাগছে না।

বিভাবতী। কি পাগল! বস, বস। স্বাতী দেখে যা, কে এসেছে?

স্বাতী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ওকি, ঠাকুরঝি! এস, এস।

লীলা। কেমন আছ তুমি?

স্বাতী। খুব ভাল আছি। কালই তো এলাম ওবাড়ী থেকে। এর মধ্যে কি হবে? তোমরা ভাল আছ?

লীলা। হ্যাঁ। আচ্ছা, আজ আর বসব না। রান্না বসিয়ে এসেছি।

লীলা চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ

গুড্ নাইট্ ভিয়েনা

ডাঃ সুবোধ মিত্র

ছাত্রাবস্থা থেকে এতাবতকাল বহুবার ভিয়েনায় এসেছি। বাস্তববাদীর চোখে অথবা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে যতটা অনুভূত হয় তার খানিকটা হয়ত করেছি এবং ভালই লেগেছে, কিন্তু ভিয়েনার যে আর একটা রূপ আছে সেটা শুনতে পেলাম যখন শ্রীমতী গতবার এসে ভিয়েনার আকাশে বাতাসে, দ্রাক্ষাকুঞ্জে ও বনবিথীতে বিটোফেন, ষ্ট্রাউস এবং শুবার্টের গীতিগাথা অনুভব করলেন। দানিয়ুব নদী ভিয়েনার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে। দানিয়ুব নাকি পীতধারা বহন করে। যখন জিজ্ঞাসা করলাম —জলধারা দেখছি নিশ্চয়ই, কিন্তু পীতধারা কোথায়? ভিয়েনাবাসী উত্তর দিলেন—দেখবার চোখ থাকা চাই; বাইরে না দেখতে পেলেও মানস চক্ষে দেখতে হবে। তাই শ্রীমতীর কাছে যখন বিটোফেন, ষ্ট্রাউস তথা শুবার্টের স্বরধারায় ভিয়েনার স্মৃতিমাখা গৃহকোন ও কাননবিথী থেকে সঙ্গীতের সুরধারা মূর্ত হয়ে উঠল—তখন অনুভব করলাম তিনি আমার মত বাস্তব দ্রষ্টা নন্, ভিয়ানা-বাসীদের ন্যায় মানস জগতের অভিযাত্রী।

ভরসার কথা এই যে বর্তমান যুগে আমার মত বাস্তবদর্শীর সংখ্যা নেহাৎ কম না, তাদের নিকট হয়ত আমি অপাংক্তেয় হব না!

অষ্ট্রিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয় বহুবার ঘটেছে, ফরাসী, জার্মানী এবং তাতারের (Turkey) দৌরাত্ম্য প্রভূত পরিমাণে ভোগ কত্তে হয়েছে। হিট্লারের প্রভুত্বই বোধহয় অষ্ট্রিয়া তথা ভিয়েনাকে বেশী অভিভূত করেছিল। অবশ্য ছয় শত (? বৎসর) পূর্বে টুর্কী যখন সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস কত্তে দৃঢ়সংকল্প করেছিল, তখন ভিয়েনায় এসে বাধা পায়। প্রায় সমস্ত ভিয়েনা সহর তখন তাতারের হাতে। কালেনবার্গ গিরিশিখরটুকু শুধু বাকী। সেখান থেকে সমস্ত ভিয়েনাবাসী জান কবুল করে নিজেদের দেশ রক্ষা করে। সেদিন ভিয়েনার পতন হলে, সমগ্র ইউরোপ টুর্কীর পদানত হত; এবং ভিয়েনা-বাসীরা বলে—সমগ্র ইউরোপে ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হ'ত, ইহা অবশ্য ভিয়েনাবাসীর কিম্বদন্তী, ইহার সত্য মিথ্যা ঐতিহাসিকের বিচার্য্য।

কালেনবার্গ গিরিশিখর নগরপ্রান্তে। ভিয়েনা সহর থেকে মোটরে যেতে প্রায় আধঘণ্টা লাগে। আঁকা-বাঁকা অসমতল পথের দুধারে অগণিত দ্রাক্ষাকুঞ্জ। দিনের শেষে ভিয়েনাবাসী কর্ম্মমুখর সহর থেকে বেরিয়ে এসে পরমানন্দে এই দ্রাক্ষাকুঞ্জভূষিত সহরতলীতে সন্ধ্যা কাটায়—হাস্য, লাস্য, সঙ্গীত ও গল্প গুজবের ভিতর দিয়ে; দ্রাক্ষারস তাদের সঞ্জীবিত করে। সেদিন স্থানীয় বন্ধু-পরিবারের সাথে এখানে এসেছিলাম। কোন আড়ম্বর নেই, কুঞ্জকাননের প্রতিকোনে অতি সাধারণভাবে বসবাস ব্যবস্থা। লোকসঙ্গীত এদের বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে চারণের দল এসে প্রতিজনের পাশে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে। লোকসঙ্গীতে সকলেই যোগ দিয়ে এক অপূর্ব সঙ্গীতের মুর্ছনা বইয়ে দিচ্ছে। এদের সঙ্গীত না বুঝলেও এদের প্রাণের ছোঁয়াচ লাগে। বন্ধুবর সঙ্গীতের ভাষা বুঝিয়ে দিলেন; "ও ভিয়েনা, আমাদের ভিয়েনা, তোমায় আমরা আধো-ফোঁটা উন্মুখ-যৌবনা প্রিয়ার মত ভালবাসি······।" কর্ম্মতৎপরতা ও অবসরপ্রিয়তার এক অপূর্ব সমাবেশ এদের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়।

পরদেশীকে এরা অন্তরঙ্গের মত গ্রহণ করে। সঙ্গীতের মুর্ছনায় তাকে মাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। এদের আলাপনের ভিতর দিয়ে বিটোফেন ও শুবার্টের স্মৃতি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। কোথায় কোন কাননবিথী বিটোফেন পরিক্রমা কর্ত্তেন, কোন দ্রাক্ষাকুঞ্জের কোনে বসে তিনি মর্মর গাথা রচনা করে গেছেন; ওধারের ওই বিথীতে—আঙ্গুরশাখা যেথায় লুটিয়ে আছে সেখানকার সেই আঙ্গিনায় বসে তাদের প্রিয় কবি তাঁর শেষ জীবনের বিষাদসিন্ধু গেয়ে গেছেন, এই সব কথা পরদেশীকে শুনিয়ে এরা খুব আনন্দ পায়। বিটোফেন নাকি কখনও এক বাড়ীতে থাকতে

পারতেন না ; ভিয়েনা সহরের বহু ছোট ছোট বাড়ীর সাথে তার স্মৃতিজড়িত। বন্ধুবর প্রমাণ কর্তে চাইলেন যে অর্থের অনটনের জন্য বিটোফেনকে অনবরত বাড়ী বদলাতে হয় নাই ; কবি-প্রকৃতিই হচ্ছে চঞ্চল, কবিত্বের উৎস আসে পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে—তা সে গৃহেই হোক বা ঘাটে, বাটে, মাঠেই হোক। বন্ধুবর হয়ত উৎসাহের আতিশয্যে ভুলে গিয়েছিলেন যে আমি সেই দেশেরই লোক—যেখানকার কবি বলে গেছেন—

'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি।'

আমাদের কবির শ্যামলী, শিলাইদহ, শান্তিনিকেতনের কথা বলে তার উৎসাহ ভঙ্গ করলাম না, রাতও হয়ে গিয়েছিল অনেক।

হাপ্‌সবার্গ রাজপরিবার বহু যুগ ধরে ভিয়েনায় রাজত্ব করে গেছেন। সহরের একটি বিশিষ্ট অংশ এই রাজ পরিবারের বিশাল বিশাল প্রাসাদে ভরা। প্রাসাদের গাত্রে বিশাল মর্ম্মর মূর্তিগুলি প্রচণ্ড বাহুশক্তিরই পরিচায়ক। রোমের মর্ম্মর মূর্তিগুলির সাথে এর বিশেষ সাদৃশ্য নেই, যদিও তখনকার 'বারোকো' ষ্টাইলের আধিক্য চোখে পড়ে। এইসব প্রাসাদগুলি এখন মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে তদানিন্তন রাজপরিবারের জীবন ধারার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। হাপস্‌বার্গ রাজ পরিবারের আড়ম্বরময় জীবনের কথা সকলেরই কিছু কিছু জানা আছে। এই প্রাসাদ-মিউজিয়মে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে বাইরে যতই প্রাচুর্য্য ও আতিশয্য থাক, অন্দরমহলে রাজা ও রাণী অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন কত্তেন। রাজা ও রাণীর শয্যা যে কোনও সাধারণ লোকের শয্যা থেকে ভাল ছিল না। মনে হয় ফরাসী রাজপরিবার কখনও এদের অন্দরমহল পরিদর্শন করেন নি ; তাহ'লে নিশ্চয়ই তাদের শ্রদ্ধা কমে যেত।

বর্তমান যুগের ভিয়েনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রমিক পরিবারের বাস আবাস। এই বাস আবাসের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, তিনি সকলের নমস্য। এইরূপ একটি আবাসের নাম কার্ল মার্কস মহল ; দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল ; আড়াই হাজার শ্রমিক পরিবার এই বাড়ীতে থাকেন, প্রত্যেকের ২ খানা করে শয়ন ঘর ও রান্না ঘর ; ভাড়া দিতে হয় মাসে ১৫ থেকে ২০ টাকা। ইদানীং শ্রমিক পরিবারদের জন্য আরও বাড়ী তৈরী হয়েছে—আরও উন্নত ; তবে ৩০ থেকে ৪০টি পরিবারের উপযোগী। ভাড়া সামান্য কিছু বৃদ্ধি হয়েছে।

দ্রাক্ষাকুঞ্জে ভিয়েনা পার্লামেণ্টের একজন সভ্যের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি স্যোসালিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত। তাদের পার্টি এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি মিলে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। বিধানসভায় কমুনিষ্টদের সংখ্যা অতি কম, শতকরা ৫ জন মাত্র। তিনি বললেন—তাদের স্যোসালিষ্ট পার্টি ইংলণ্ডের লেবার পার্টির কাঠামে তৈরী—তবে তার মার্কসপন্থী, কমুনিষ্টদের প্রভাব এখানে নাকি খুবই কমে গেছে—বিশেষতঃ এদের ওপর রাশিয়ানদের প্রভুত্বের পরে।

সেদিন ফ্রানসিস্‌কা নামক একটী পয়লা নম্বরের রেস্তোঁরাতে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে গেছলাম। খাবার সুন্দর কিন্তু দক্ষিণা খাবার আনন্দ ভুলিয়ে দেয়। আমাদের টাকায় প্রায় ১৫ টাকা পড়ে গেল। একটী জানালার ধারে বসে আহার করছিলাম—পাশে ছিল এদের ধর্ম্মমন্দির। আমাদের ঠাকুমা দিদিমার বয়সী মহিলারা কাতারে কাতারে মন্দিরে যাচ্ছিলেন। এত বৃদ্ধা মহিলার সমাবেশ কোথাও দেখেছি কিনা স্মরণ নেই। ধর্ম্ম কি তাহ'লে শুধু এদেরই উজ্জীবিত করে রেখেছে? তা যদি হয় তাহলে রাশিয়া আজ ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে বোধ হয় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

ভিয়েনাতে জন্মহার অত্যধিক ভাবে কমে গেছে। এখানে সবচেয়ে বড় প্রসূতিসদনে বৎসরে মাত্র ৮০০ সন্তান প্রসূত হয়। সে তুলনায় আমাদের এক চিত্তরঞ্জন সেবাসদনেই বৎসরে ১০ হাজার সন্তান প্রসব হয়। সন্ধান নিয়ে জানা গেল—আর্থিক অনটনই হচ্ছে এর প্রধান কারণ। আর্থিক অনটন আমাদেরও আছে, তবে এরূপ বিপরীত ফল কেন।

আজ ভিয়েনা থেকে বিদায় নিচ্ছি। যাবার সময় কেবল মনে হচ্ছে যে নিজের দেশকে সকলেই ভাল বাসে ; তার ভিতর পিতৃত্বের শ্রদ্ধা মাতৃত্বের স্নেহপ্রবণতা অনেক দেশ অনুভব করে ; কিন্তু দেশের প্রতি দয়িতার কোমল মধুর ভাব শুধু ভিয়েনাতেই দেখতে পাওয়া যায়। এই মধুর ভাবের ছোঁয়াচ পরদেশীকেও স্পর্শ করে। তাই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় যখন সে বলে—'গুডনাইট ভিয়েনা' তখন মনে হয় সত্যিই বুঝি সে প্রিয়ার কাছ থেকে ক্ষণিকের বিদায় নিয়ে দূরদেশে যাচ্ছে। এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আমি আমার শ্রীমতীকে তৈরী করতে দেখেছি। তাঁর কণ্ঠে 'গুডনাইট ভিয়েনা' এক অপূর্ব রূপ-মাধুরী সৃষ্টি করে। তাই আজ ভিয়েনা থেকে নিঃসঙ্গ বিদায়ের পালায় শ্রীমতীর অবাস্তব কণ্ঠস্বরের 'গুডনাইট ভিয়েনা' আমায় অভিভূত করে তুলেছে।*

---

* পরলোকগত ডাঃ সুবোধ মিত্রের পুরাতন রচনা হইতে গৃহীত।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহরম মাসের ৩রা তারিখ শুক্রবার (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৫২৮) আস্কারি (বাবরের তৃতীয় পুত্র, বয়স—১২ এবং মুলতানের গভর্ণর) এসে পৌঁছায়। তাকে চান্দোরি অভিযানের পূর্ব্বেই মুলতানের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার নিজের কক্ষে দেখা করি।

ইউনুস আলির বিশেষ বন্ধু—ঐতিহাসিক খন্দ আমির, হেঁয়ালীকার মেলিনা সাহেব, কানুম বাদক (কানুম—এক-রকম তারের বাদ্যযন্ত্র) মির ইব্রাহিম অনেকদিন পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য হেরি থেকে এসেছেন। পরদিন সকালে তাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

এই মাসের ৫ই তারিখ, রবিবার (সেপ্টেম্বর—২০) গোয়ালিয়ার পরিদর্শনের জন্য যমুনা নদী পার হয়ে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করি। সেখানে ফকর-জাহান বেগম ও খাদিজা-বেগমের সঙ্গে দেখা করি। তাঁদের দুই তিন দিনের মধ্যেই কাবুলে যাওয়ার কথা। তাঁদের নিকট বিদায় গ্রহণ করে আমি যাত্রা সুরু করি। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা আমার কাছে অনুমতি নিয়ে আগ্রাতেই থেকে যায়। সন্ধ্যায় চার পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে আমি একটি বড়পুকুরের ধারে রাত্রি যাপন করি। পরদিন ভোরের নমাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই সেরে নিয়ে আবার রওনা হই। দুপুর বেলাটা গাম্বির নদীর তীরে কাটিয়ে সেখানে মধ্যাহ্ন নমাজ সমাপন করে আবার বেরিয়ে পড়ি।

মোল্লা রাফার আমার শারীরিক বলরক্ষার জন্য যে ঔষধ তৈরী করেছিল ও যেটা আমি আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম সেই ওষুধ তালকানে এসে খাই। পথে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে করতে এগুতে হচ্ছিল এবং সেজন্য বিশেষ ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমার শারীরিক গ্লানি দূর করার জন্য মোল্লা রাফার গুঁড়ো ওষুধ খেতে হয়। ওষুধটা খেতে বিস্বাদ এবং বমির ভাব এনে দেয়।

ঢোলপুরের একক্রোশ মধ্যে যে জায়গায় আমি একটি উদ্যান ও প্রাসাদ তৈরীর জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম সেটা একটা পাহাড়ের গায়ে। আমি সেইখানে অপরাহ্ন নমাজের সময় এসে যাই। পাহাড়ের প্রান্তে কালো শক্ত পাথরে ছাওয়া একটা খাড়াই। আমি সেই পাহাড় কেটে সমতল করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। একটা শক্ত প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গেলে তা দিয়ে যদি একটি কক্ষ খোদাই করা সম্ভব হয় তাহলে সেই ভাবে সেইটি করা এবং যদি পাথরের গভীরতা বেশী না হয় তাহলে পাথর কেটে ফেলে সমতল করে সেখানে একটি পুকুর খনন করতে নির্দ্দেশ দিই। পাহাড়ে খুব উঁচু পাথর না পাওয়ায় একটা বড় পাথরে ঘর খোদাই করা সম্ভব হলো না। সেইজন্য আমার পাথর খোদাইকার, ওস্তাদ সা মহম্মদকে একটি আটকোণা ঢাকা জলাধার—সমতল করা পাথরের পাটাতনের ওপর তৈরী করতে আদেশ দিই। পাথর খোদাইকারদের বিশ্রাম না নিয়ে একটানা এই কাজ করতে বলা হয়। যে জায়গায় আস্ত পাথর খোদাই করে জলাধার নির্ম্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি, সেখানে অনেকগুলো আম, জাম এবং আরও নানারকমের গাছ আছে। এই গাছগুলোর মাঝখানে দশ হাত লম্বা দশ হাত চওড়া একটি ইঁদারা খনন করতে আদেশ দিই এবং এ কাজ প্রায় শেষ হয়। যে জলাধারের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এই ইঁদারা থেকে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই ইঁদারার উত্তর-পশ্চিম কোণে সুলতান সিকদার একটি উঁচু স্তূপ খাড়া করে ধীরে ধীরে কয়েকটি ঘর নির্ম্মাণ করে। স্তূপের মাথায় বর্ষার জল সঞ্চিত হয়ে একটা বড় পুষ্করিণী তৈরী হয়ে যায়। এই পুকুরটি একটি পাহাড়ে ঘেরা এবং পূর্ব্বে একটি

উদ্যান। আমি আদেশ দিই যে বিশ্রামের জন্য পুকুরের পূব দিকে আস্ত পাথর কেটে একটা পাটাতন এবং কতকগুলো বসবার আসন যেন তৈরী করা হয়। পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ তৈরীরও নির্দেশ দিই।

মঙ্গল ও বুধবার সমস্ত দিন এইসব কাজের তদারক ও নির্দেশ দেওয়ার জন্য এইখানে অবস্থান করি। বৃহস্পতিবার আবার রওনা হয়ে চম্বল নদী পার হই। দুপুরের নমাজের সময়টা আমি নদী তীরেই কাটাই এবং তারপর দুপুর ও বিকেলের নমাজের মাঝামাঝি সময় আবার ঘোড়ায় চড়ে নদী তীর ছেড়ে যাই। সন্ধ্যা ও রাতের নমাজের সময়ের মধ্যে কাওয়ারি নদী পার হয়ে বিশ্রামের জন্য থামি। বৃষ্টিতে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ঘোড়াগুলোকে সাঁতরিয়ে পার করানো হয়। আমরা নৌকোয় পার হই। পরদিন সকালে মহরম মাসের ১০ই তারিখ শুক্রবার ইদ-এ-আসুরা (উপবাসের দিন) উদযাপন করে আবার যাত্রা সুরু করি। দুপুর বেলাটা একটা গ্রাম্য রাস্তার ওপর কাটাই। রাতের নমাজের সময় চারবাগে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামি।

চারবাগ উদ্যানটি গোয়ালিয়রের এক ক্রোশ উত্তরে। গত বৎসর এই উদ্যান রচনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পরদিন সকালে দুপুরের নমাজের আগেই আবার রওনা হই এবং উঁচু টিপির দিকে অগ্রসর হই। (সর্গটনের গেজেটিয়ারে আছে—এই উঁচু টিপিটি উত্তর দিকে মোচার আকারের একটা পাহাড়—আর চার ধার ঘিরে আছে চমৎকার পাথরের অট্টালিকা—যেটা নিঃসন্দেহে একটি হিন্দু-মন্দির)। এই স্থানটি গোয়ালিয়রের উত্তরে। জায়গাটি, মন্দির এবং উপাসনা-গৃহ দেখে আমি 'হাতিপুল' ফটক দিয়ে গোয়ালিয়রে প্রবেশ করি। সেটা মান্‌সিংয়ের প্রাসাদ সংলগ্ন। [হাতিয়াপুর—উত্তর পূর্ব্ব দিকের ছয়টি ফটকের মধ্যে একটি। এই ফটক মানসিং (১৪৮৮—১৫২১) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।] সেখান থেকে বিক্রমজিতের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হই। এইখানে রহিমদাদে বাস করতেন। বিকেলের নমাজের সময় আমি এখানে পৌছাই। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে আমার কানের ব্যথার জন্য একটু আফিং খাই। (ভারতবাসী এবং পারশ্যবাসীদের ধারণা—চাঁদের আলো শীতল। ভারতবাসীদের জ্যোৎস্নাহত হওয়ার বিশেষ ভীতি আছে। তাদের ধারণা আফিং খেলে এর কুফল দূর হয়)।

পরদিন সকালে আফিং খাওয়ার প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়। আমি অনেকখানি বমি করে ফেলি। এই অসুস্থতা সত্বেও আমি মানসিং ও বিক্রমজিতের প্রাসাদগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি। এই প্রাসাদগুলি বিচ্ছিন্ন ও অবিন্যস্তভাবে নির্ম্মিত হলেও খুবই সুন্দর। প্রাসাদগুলি খোদাই করা পাথরে তৈরী। মান্‌সিংয়ের প্রাসাদ অন্য রাজার প্রাসাদের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু ও সুন্দর।

মানসিংয়ের প্রাসাদের একটা দেওয়ালের অংশ পূর্ব্বমুখী। এই দেওয়ালটি অবশিষ্ট দেওয়ালের চেয়ে বেশী কারুকার্য্যময়। এর উচ্চতা ৪০।৫০ গজ ও খোদাই পাথরে তৈরী। সম্মুখ ভাগে সাদা চুন বালির আস্তরণ। প্রাসাদটি অনেক জায়গায় চারতলা। নীচের দুইতলা খুব অন্ধকার, কিন্তু কিছুক্ষণ বসবার পর অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে এবং সব জিনিষ পরিষ্কার দেখা যায়। আমি এই সব জায়গা একটা আলো সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখি। প্রাসাদের একদিকে পাঁচটি গম্বুজবিশিষ্ট অট্টালিকা। সেই গম্বুজগুলো ঘিরে হিন্দুস্থানের রীতি অনুযায়ী ছোট ছোট গম্বুজ। পাঁচটি বড় গম্বুজ তামার পাতে মোড়া। দেওয়ালগুলির বহির্ভাগ সবুজ রংয়ের টালি দিয়ে ঢাকা। সমস্ত দিকের প্রাচীরই কলাগাছের ছবি আঁকা টালি দিয়ে সজ্জিত।

পূব দিকের উঁচু বুরুজের নীচেই হাতিপুল। ভারতীয়রা হস্তীকে বলে হাতি, আর পুল মানে ফটক। এই ফটকের বাহিরে একটি হাতির মূর্ত্তি, তার পিঠের ওপর দুইটি মাহুতের মূর্ত্তি। হাতির মূর্ত্তিটি দেখতে ঠিক জীবন্ত হাতির মত। এই জন্যই একে হাতিপুল বলা হয়। মান্‌সিংয়ের চারতলা প্রাসাদের নীচতলার একটি জানালা হাতির মূর্ত্তির নিকটেই। সেই জানালা দিয়ে সরাসরি এই মূর্ত্তি দেখা যায়। উপরতলায় পূর্ব্ববর্ণিত গম্বুজের মত ঐ একই রকমের ছোট গম্বুজ আছে। তিনতলাতে বসবার কক্ষ! চার তলা থেকে নীচের তলাগুলিতে আসা যায়। নীচের তলাটি মাটির নীচে। এই প্রাসাদ নির্ম্মাণে হিন্দুস্থানের সমস্ত উদ্ভাবনী কৌশল ব্যয় করা হয়েছে। এর কক্ষগুলিও অস্বাচ্ছন্দ্যকর নয়।

মান্‌সিংয়ের পুত্র বিক্রমজিতের প্রাসাদ দুর্গের উত্তর

দিকে একটি খোলা জমির মাঝখানে। পুত্রের প্রাসাদের কিন্তু পিতার প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা চলে না। প্রাসাদে একটি বড় গম্বুজ, কিন্তু তার নীচে অত্যন্ত অন্ধকার, যদিও কিছুক্ষণ থাকলে চেষ্টা করে কিছু কিছু দেখা যায়। বড় গম্বুজের নীচে একটি ছোট কক্ষ—তাতে কোন দিক থেকেই আলো প্রবেশ করে না। রহিমদাদ যখন বিক্রমজিতের প্রাসাদ তাঁর বাসস্থান ঠিক করেন, সেই সময় এই গম্বুজের ওপর একটি পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমজিতের প্রাসাদ থেকে তার পিতার প্রাসাদে যাওয়ার জন্য একটি গুপ্ত পথ আছে। সে পথ বাহির দিক থেকে চোখে পড়ে না। এমন কি প্রাসাদে ঢুকলেও কোন্ দিকে সেই গুপ্ত পথ তাও বোঝা যায় না। কতক জায়গা দিয়ে সেই গুপ্ত পথে আলো প্রবেশ করে। এই পথটি সত্যই অসাধারণ।

প্রাসাদগুলো দেখে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে রহিমদাদ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাভবন দেখতে যাই। দুর্গের দক্ষিণে পুকুরের ধারে তিনি যে উদ্যান রচনা করেছিলেন সেটা ঘুরে দেখে আমি অনেক দেরীতে চারবাগে পৌছাই। এইখানে আমার অনুচরবর্গ শিবির ফেলেছিল। চারবাগে অনেক রকমের ফুল—বিশেষ করে অসংখ্য মনোরম রক্তকরবী। গোয়ালিয়রের করবী সুন্দর লাল রংয়ের। আমি কয়েকটি লাল করবীর চারা এখান থেকে সংগ্রহ করে আগ্রার উদ্যানে রোপন করি। বাগানের দক্ষিণ দিকের পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড জলাধার। বর্ষার বৃষ্টিপাতে সেই জলাধারে জল জমে। জলাধারের পশ্চিমে একটি উঁচু দেব-মন্দির। সুলতান সামসুদ্দিন আলতামাস এই মন্দিরের গা ঘেঁষে একটি সুন্দর মসজিদ তৈরী করেছিলেন। দেব-মন্দিরটি সত্যিই খুব উঁচু। দুর্গ এলাকায় এইটিই সব চেয়ে উঁচু অট্টালিকা। ঢোলপুরের পাহাড় থেকে গোয়ালিয়র দুর্গ এবং এই মন্দির পরিষ্কার দেখা যায়। শোনা যায় এই মন্দির নির্ম্মাণের সমস্ত পাথর বড় পুষ্করিণী খননের সময় সংগ্রহ করা হয়। এই ছোট উদ্যানে স্তম্ভের ওপর নির্ম্মিত একটি দেওয়ালহীন মনোরম বৃহৎ কক্ষ। হিন্দুস্থানের রীতি অনুযায়ী তৈরী ফটকের সামনে বিশেষত্বহীন নীচু দরদালান।

পরদিন সকালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) দুপুরের নমাজের সময় গোয়ালিয়রের যে সব জায়গা দেখি নাই তা দেখবার জন্য বের হলাম। মানসিংয়ের দুর্গের বাহিরে বুদালগার নামে প্রাসাদটিতে প্রথমে যাই। এই প্রাসাদ দেখে হাতি-পুল ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আদোয়া নামে একটি স্থান দেখতে গেলাম। আদোয়া—দুর্গের পশ্চিম দিকের একটি উপত্যকা। যে প্রাচীরটি পাহাড়ের মাথা ঘিরে টানা হয়েছে, উপত্যকাটি তার বাহিরে হলেও একটির ভিতরে আর একটি—এইরূপ দুইটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে উপত্যকার মুখ আবৃত। দেওয়ালগুলির উচ্চতা প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গজ। ভিতরের প্রাচীরটি বেশী লম্বা ও উঁচু এবং এর দুই প্রান্ত দুর্গ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত। এই প্রাচীরের মাঝামাঝি আর একটি নীচু প্রাচীর—কিন্তু সেটা তেমন প্রতিরোধ-ক্ষম নয়। জলাধারের দিকে যাওয়ার জন্য রাস্তার আবরণ হিসাবে এটি তৈরী হয়েছে। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি কূপ। উপর থেকে জল পর্য্যন্ত দশ পনরোটি সিঁড়ি। রাস্তাটি বড় দুর্গ প্রাচীর থেকে আরম্ভ হয়ে ছোট প্রাচীরের মাঝামাঝি যে কূপটা আছে তার পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে। ফটকের উপরে সুলতান সামসুদ্দিনের নাম খোদাই করা প্রস্তর ফলক। বৎসর লেখা আছে—৬৩০। বাহিরের দুর্গ-প্রাচীরের নিকট একটি বড় পুকুর। এটা খুব ভাল পুকুর নয়। এর জল প্রায় শুকিয়ে যায়। নল দিয়ে পুকুরের জল দুর্গের মধ্যে নেওয়া যায়। আদোয়া উপত্যকার মাঝামাঝি আরও দুইটি বড় পুষ্করিণী। এখানকার লোকেরা এই দুইটি পুকুরের জলের খুব তারিফ করে। তিন দিকে খাড়া পাহাড়। পাথরের রং বিয়ানার পাথরের মত, যদিও ততটা লাল নয়—কিছু ফিকে। আদোয়ার ধারে পাহাড়ের কঠিন পাথর খোদাই করে ছোট ও বড় অনেক মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বিশ গজ লম্বা একটি বৃহৎ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি একেবারে নগ্ন—এমন কি জননেন্দ্রিয় ঢাকার জন্যও কোনও আবরণ নাই। আদোয়া উপত্যকার মধ্যের দুইটি পুষ্করিণীর চার-দিকে কুড়ি পঁচিশটা কূপ এরা খনন করেছে। এরা অনেক গাছ ও ফুলের চারাও এখানে রোপন করেছে। এই জল দিয়েই গাছগুলিতে সেচের কাজ করা হয়। আদোয়া মোটেই খারাপ জায়গা নয়, বরং অত্যন্ত মনোরম স্থান। এর সব চেয়ে বড় দোষ হলো চারিদিকের দেব-মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি ধ্বংস করার জন্য আমি আদেশ দিই।

আদোয়া থেকে দুর্গে ফিরে এসে আমি সুলতান পুলে যাই—যার দরজা বিধর্মীদের আমল থেকে বন্ধ আছে। সন্ধ্যা-নমাজের পর রহিমদাদের তৈরী উদ্যানে যাই। সেখানেই রাতটা কাটাই।

পরদিন মঙ্গলবার (২৯শে সেপ্টেম্বর) সঙ্গর দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমজিতের কাছ থেকে এক পত্রবাহক এখানে আসে। সে আর তার মা তখন রণতামভরে ছিল। আমার গোয়ালিয়র যাত্রার পূর্ব্বেই বিক্রমজিতের অতীব বিশ্বাস-ভাজন আশুক নামে একজন হিন্দু আমার কাছে দূত হিসাবে তার আনুগত্য ও বশ্যতার প্রস্তাব নিয়ে আসে। তার আশা এই যে, সে বাৎসরিক সত্তর লাখ টাকা বৃত্তি হিসাবে আমার কাছ থেকে পাবে। তখন একটি চুক্তি সম্পাদন হয় এবং ঠিক হয় যে সে রণতামভর দুর্গ আমাকে ছেড়ে দেবে। তার পরিবর্ত্তে তাকে এমন কতকগুলো পরগণা দেওয়া হবে—যার আয় সত্তর লক্ষ টাকা। এই ব্যবস্থা করে তার দূতকে ফিরে পাঠিয়ে দিই। যখন আমি গোয়ালিয়র পরিদর্শন করতে যাত্রা করি, তখনই তাকে গোয়ালিয়রে তার লোককে পাঠানোর জন্য জানিয়ে দিই। কিন্তু তারা ধার্য্য তারিখের কয়েকদিন পরে এখানে আসে। হিন্দু আশুক পদ্মাবতীর নিকট-আত্মীয়া। সে বিক্রমজিতের মা ও বিক্রমজিৎকে সমস্ত কথাই বুঝিয়ে বলে। আশুকের মনোভাব তারা সমর্থন করে। তারা যথারীতি আমার বশ্যতা স্বীকার করে ও আমার প্রজা-শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের গণ্য করতে রাজি হয়। যখন রাণা সঙ্গ সুলতান মামুদকে পরাজিত ও বন্দী করে (১৫১৯) সেই সময় সুলতানের মাথায় যে মণি-মাণিক্যখচিত মুকুট ও সোনার কোমরবন্ধ ছিল তা এই বিধর্ম্মীর হাতে পড়ে। সুলতান মামুদকে মুক্তি দেওয়ার সময় সে দুটি সে নিজে রেখে দেয়। এই জিনিষ দুটি বিক্রমজিতের কাছে ছিল। তার বড় ভাই রতনসেন পিতার উত্তরাধিকারী রূপে রাণা হয় এবং চিতোরের সিংহাসন অধিকার করে। সে তার ছোট ভাইয়ের কাছে লোক পাঠিয়ে এই ইচ্ছা জানায় যে, সে যেন ঐ জিনিষটি তাকে অর্পণ করে। কিন্তু বিক্রমজিত তাতে অস্বীকৃত হয়। যে লোকগুলিকে সে আমার কাছে পাঠায় তাদের সঙ্গে সেই রাজমুকুট ও সোনার কোমরবন্ধ আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তার অনুরোধ ছিল যেন রণতামভরের পরিবর্ত্তে তাকে বিয়ানার ভার দেওয়া হয়। আমি তাদের বিয়ানার দাবী প্রত্যাহার করিয়ে নিয়ে রণতামভরের সমতুল্য সামসাবাদ দেওয়া স্থির করি। এই দিনই আমি তাদের সম্মানসূচক পোষাক দান করে এবং নয় দিনের মধ্যে বিয়ানাতে আমার সঙ্গে দেখা করবার দিন ঠিক করে বিদায় দিই।

আমি বাগান থেকে গোয়ালিয়রের দেব-মন্দিরগুলি দেখতে যাই। অনেকগুলি মন্দির দুই-তিন-তলা উঁচু। তবে প্রতি তলাই আগেকার রীতি অনুসারে নীচু নীচু। মন্দিরের নীচু অংশগুলিতে পাথরে-খোদাই-করা দেবমূর্ত্তি। চার দিকে অসংখ্য দেব-মন্দির—ঠিক বিদ্যাভবনের কক্ষ-গুলির মত। সম্মুখে একটি বড় ও উঁচু গম্বুজবিশিষ্ট অট্টালিকা। এর কক্ষগুলি বিদ্যাভবনের ছোট ছোট কুঠুরির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি কক্ষের উপর পাথর কেটে তৈরী ছোট গম্বুজ। নীচে পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি। এই সব দেখে আমি গোয়ালিয়রের পশ্চিম ফটক দিয়ে বের হয়ে দুর্গের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে হতে সেখানকার ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করে যেখানে রহিমদাদ চারবাগ-উদ্যান রচনা করেছিল সেইখানে হাতিপুল ফটকের কাছে ঘোড়া থেকে নামি। চারবাগে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য রহিমদাদ অপেক্ষা করছিল। আমাকে সে উৎকৃষ্ট খানা খাওয়ায়। তারপর নগদে ও জিনিষপত্রে চারলাখ টাকার মত মোটা নজরানা দেয়। এই চারবাগ থেকে রওনা হয়ে অনেক রাত্রে চারবাগের যে অংশে আমার থাকার শিবির ছিল সেখানে পৌছাই।

১৫ই তারিখ বুধবার (৩০শে সেপ্টেম্বর) গোয়ালিয়রের দক্ষিণপূর্বে দেড় ক্রোশ দূরে একটি জলপ্রপাত দেখতে যাই, খুব ভোরে শিবির ত্যাগ করে মধ্যাহ্ন নমাজের পরে সেই প্রপাতের কাছে পৌছাই। জলস্রোত এমন যে তার বেগে একটা পেষণ যন্ত্র চালানো যেতে পারে। সাত আট গজ লম্বা একটা খাড়া পাথরের উপর এই জল ঠেলে উঠ্‌ছে। প্রপাতের নীচে একটি বড় পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়েছে। আরও উপরের দিকে দেখা যায়, একটি পাথরের উপর জল ঝাঁপিয়ে পড়ে নীচে নেমে আসছে। সেই জলস্রোত একটা পাথরের চাইয়ের নীচে গড়িয়ে পড়ছে, আর এই জলধারায় নানা জায়গায় পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। জলধারার দুই দিকের

ভূমিতে কঠিন পাথরের টুকরো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলো বসবার আসন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রপাতের জলধারা কিন্তু সব সময় বয় না। জলপ্রপাতের ওপরের দিকে আমরা বসি এবং মাজ্জন (এক প্রকারের উত্তেজক মোদক অথবা অরিষ্ট) খাই। তারপর জলধারার উৎস দেখার জন্য আরও উপরে উঠি এবং পরে নেমে আসি। তারপর আমরা একটা উঁচু টিলায় চড়ে সেখানে কিছু সময় কাটাই। সেই সময় বাদ্যযন্ত্রশিল্পীরা বাজনা বাজায়, আর গায়েকরা গান গায়। আমাদের মধ্যে যারা আবলুস গাছ দেখেনি—যে গাছকে এখানকার অধিবাসীরা বলে 'তিন্দু'—তারা এইবার সে গাছ দেখবার সুযোগ পেলো। এই স্থান ত্যাগ করে আমরা পাহাড় থেকে নেমে এলাম—তারপর ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যে ও রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময় একটা জায়গায় নেমে সেইখানে ঘুমিয়ে নিই। পরদিন ভোর ছয়টা বাজতে না বাজতেই আমরা চারবাগে পৌঁছে যাই।

১৭ই তারিখ শুক্রবার (২রা অক্টোবর) সিলাদ্দির জন্মস্থান 'সুখজানে' দেখতে যাই। (সিলাদ্দি—রাইসেনের রাজা ও রাণা সঙ্গর জামাতা। খানুয়ার যুদ্ধে হিন্দু জমায়েতের একজন সদস্য হিসাবে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই গ্রামের কাছে পাহাড়ে লেবু ও সীতা-ফলের বাগান আছে। সেই বাগান ঘুরে দেখে আমি রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যেই শিবিরে ফিরে আসি।—

১৯শে তারিখে রবিবার সূর্যোদয়ের আগেই আমি চারবাগ থেকে যাত্রা করি। কাবেরী নদী পার হয়ে দুপুরের নমাজের সময় থামি। তারপর আবার ঘোড়ায় চড়ি। সূর্য্যাস্তের সময় চম্বল নদী পার হয়ে সন্ধ্যা ও রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময়ে ঢোলপুর দুর্গে পৌছাই। লণ্ঠনের আলোতে আবুল ফতের তৈরী স্নানাগার দেখি। তারপর বাঁধের কাছে যে জায়গায় নতুন চারবাগ রচনার নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম সেইখানে এসে রাত কাটাই। যে সব কাজ করার আমি নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছিলমে সেই সব কাজ পরদিন সকালে দেখি। এই সোমবারেই আমি মাজ্জন খাওয়ার বৈঠক করি। মঙ্গল ও বুধবারেও এইখানেই থাকি। বুধবার সন্ধ্যায় আমি উপবাস ভঙ্গ করি এবং অল্প কিছু খাই। সিক্রি যাওয়ার জন্য মাঝরাতে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছিয়ে শয্যা গ্রহণ করি। আমি লক্ষণ দেখে বুঝলাম যে কানে ঠাণ্ডা লেগেছে। সে রাতে এমন কষ্ট হয়েছিল যে ঘুমোতে পারি নি।

পরদিন ভোরে আমি আবার বেরিয়ে পড়ি। এক প্রহরের মধ্যেই সিক্রিতে যে বাগান তৈরী করেছিলাম সেইখানে পৌছে যাই। বাগানের প্রাচীর ও কূপের ভেতরের ঘরের কাজ আমার পছন্দ মত না হওয়ায় এই কাজের ভারপ্রাপ্ত ওভারসিয়ারদের তিরস্কার করি এবং শাস্তি দিই। অপরাহ্ন এবং সান্ধ্য নমাজের মধ্যবর্ত্তী সময় আমি সিক্রি ত্যাগ করি। মাঠাকর অতিক্রম করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তারপর পুনরায় যাত্রা সুরু করে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যেই আগ্রা পৌছে যাই। এখানে এসে আমি খাদিজা সুলতান বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ফকর জাহান বেগম এখান থেকে চলে গেলেও ইনি নানা কাজের জন্য এইখানে থেকে যান। (এই দুই মহিলা আবুসৈয়দ মির্জ্জার কন্যা এবং বাবরের পিসিমা)। তারপর আমি যমুনা পার হয়ে হাসত-বেহেস্ত উদ্যানে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি।

সফর মাসের ৫ই তারিখে সোমবার (১৫ই অক্টোবর) আমি বিক্রমজিতের প্রথম দূত এবং যে শেষে আমার কাছে এসেছিল তাদের সঙ্গে বেঢ়ের হিন্দু অধিবাসী দির্ডরের পুত্র আমার অনেক দিনের কর্ম্মচারী হাবেশিকে পাঠাই বিক্রমজিতের কাছে। সে আমার পক্ষ থেকে রণতামভরের দখল এবং বিক্রমজিতের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে ও উভয় পক্ষের রীতি অনুযায়ী সন্ধিপত্র সম্পাদন করার ব্যবস্থা করবে। এই কর্ম্মচারীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, সে যেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ওখানকার পরিবেশ ভালভাবে লক্ষ্য করে এবং যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে। যদি সেই নবীন রাজপুত্র তার সর্ত্তগুলি পালন করে, তাহলে আমিও আল্লার আশীর্ব্বাদে তাকে তার পিতার স্থলে রাণা করে চিতোরের সিংহাসনে বসাব।

এই সময়ে দিল্লী ও আগ্রার খাদাঞ্চিখানায় ইস্কান্দার ও ইব্রাহিমের সঞ্চিত মুদ্রা নিঃশেষ হওয়ায় এবং অবিলম্বে সৈন্যদের জন্য সাজসজ্জা, বন্দুক কামানের জন্য বারুদ এবং গোলন্দাজ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জরুরি প্রয়োজন

হওয়ায় আমি সফর মাসের ৮ই তারিখ বৃহস্পতিবার সমস্ত বিভাগে এই আদেশ জারি করি যে, প্রত্যেক লোক যে বার্ষিক কর দেয় তাকে ধার্য্য করের অতিরিক্ত শতকরা ত্রিশ টাকা বেশী দেওয়ানখানায় জমা দিতে হবে এবং এই অতিরিক্ত রাজস্ব সৈন্যসংগ্রহ, যথাযথভাবে সৈন্যদের সাজসজ্জা এবং রসদের জন্য খরচ হবে।

১০ই তারিখ শনিবার সা' কাশিম নামে সুলতান মহম্মদ বকসির একজন পত্রবাহককে—যাকে পূর্ব্বেও আমি খোরাসানবাসীদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে পাঠিয়েছিলাম—তাকেই আবার নিম্নলিখিতভাবে চিঠি দিয়ে হিরাটে পাঠাই।—আল্লার দয়ায় আমি হিন্দুস্থানে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিদ্রোহীদের এবং হিন্দুদের পর্যুদস্ত করে জয়ী হয়েছি। পরবর্ত্তী বসন্তকালে আল্লার ইচ্ছা হলে আমি শশরীরে কাবুলে ফিরে যাব। এই ভাবেই আর একখানি চিঠি আমেদ আফসারকে লিখে পাঠাই। চিঠির এক কোণে আমি নিজের হাতে এই কথা কয়টি লিখে দিই যে—ফেরাদিন কাবুজিকে যেন আমার কাছে পাঠানো হয়। (কাবুজ-গিটারের মত বাদ্যযন্ত্র। ফেরাদিন—প্রসিদ্ধ কাবুজ-বাদক)।

সেই দিনই মধ্যাহ্ন নমাজের সময় আমি তরল পারদ সেবন করি। (তরল পারদ অনেকদিন থেকেই ভারতে কোষ্ঠবদ্ধতার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।)

২১শে তারিখ বুধবার কামরাণ ও খাজা দোস্তখন্দের চিঠি নিয়ে একজন হিন্দুস্থানি পত্রবাহক আসে। খাজা দোস্তখন্দ জিলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখ কাবুলে পৌছে এবং হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করে। (এই সময়ে হুমায়ুন বাদাকসানে জাফর দুর্গে এবং কামরাণ গজনিতে ছিল)। কামরাণ একজন লোককে খাজার কাছে পাঠিয়ে তাকে এই অনুরোধ জানায় যে—সে যেন ঐখানেই থাকে, যাতে সে স্বয়ং গিয়ে সে যে সব আদেশ নিয়ে এসেছে তার মুখেই শুনতে পায়। তার অর্থ এই যে সমস্ত সংবাদ তাকে জানানোর পর তাকে তার গন্তব্য স্থলে যেতে দেওয়া হবে। জেলহজ্জ মাসের ১৭ই তারিখ কামরাণ কাবুলে পৌছায়। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করে ২৮শে তারিখ খাজা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাফর দুর্গে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

পত্রবাহক মারফৎ যে চিঠিগুলি পাই, তাতে এই আনন্দদায়ক সংবাদ ছিল যে পারস্যের রাজা তামাস্ উজবেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়ে দামঘানে রিনিস্ উজবেক (রিনিশ বাহাদুর খাঁ—ও বেদুল্লা খাঁয়ের নিযুক্ত আস্তারাবাদের শাসক) এবং তার সঙ্গীগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে নিহত করেছে। সেবানি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওবদুল্লা খাঁ কিজলিবাসদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে হেরির অবরোধ তুলে নিয়ে মার্ভে ফিরে যায় ও সমরখন্দ সন্নিকটস্থ দেশ-গুলিকে তার সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে মাওরাল নাহারের সুলতানগণ তাকে সাহায্য করার জন্য সেই নগরে যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে।

সেই পত্রবাহক আরও সংবাদ নিয়ে আসে যে, হুমায়ুনের ঔরসে ইয়াদগার তাঘাইয়ের কন্যা বেগা-বেগমের গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে, আর কামরাণ তার মাতুল সুলতান আলি মির্জ্জার কন্যাকে বিবাহ করেছে।

২৩শে তারিখ, শুক্রবার (৬ই নভেম্বর) আমি এমন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হই যে শুক্রবারের নমাজ পড়া মসজিদে শেষ করতে পারিনি। দুপুরের নমাজের সময় আমার লাইব্রেরীতে যাই, কিন্তু তখন এমন অসুস্থতা বোধ করি যে অতি কষ্টে আমার নমাজ শেষ করতে পারি।

দুইদিন পর রবিবার (৮ই নভেম্বর) আমার কম্পন-সহ জ্বর হয়। ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে আমি মনে মনে এই আলোচনা করি যে, মহামান্য খাজা ওবিদের পিতামাতার সম্মানে যে ছোট পুঁথি লেখা আছে তা আমি কবিতায় রূপান্তরিত করবো। মহামান্য খাজার আত্মার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আমি মনে মনে এই আশা লালন করেছিলাম যে, তিনি হয়তো আমার কবিতা ভালভাবে গ্রহণ করে আমাকে রোগমুক্ত করবেন যেমন তিনি কাসিদের লেখককে করেছিলেন। সেই লেখক তাঁর লেখা 'কাসিদে' তাঁকে উৎসর্গ করলে তিনি তা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে সে পক্ষাঘাত রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমার এই প্রতিজ্ঞার ফলে আমি একটি কবিতা রচনা করি এবং সেই সন্ধ্যায় তেরোটি দ্বি-পদী কবিতা লিখে ফেলি। প্রতিদিন এই রকম কিছু কিছু দ্বি-পদী কবিতা লিখে যাব এবং তা কখনও দশটার

কম হবেনা এই কথা মনে মনে সঙ্কল্প করি। আমি মাত্র একদিন কবিতা লিখতে পারি নি। গত বছর এবং প্রকৃত-পক্ষে পূর্ব্বে যখনই আমি এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম তখন তখন এই পীড়ার ভোগ একমাস কি চল্লিশদিন চলেছে। কিন্তু আল্লার দয়ায় ১২ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার আমার ব্যাধির প্রকোপ কমে আসে এবং তারপর রোগমুক্ত হই। প্রথম রবিয়ল মাসের ৮ই তারিখ (২১শে নভেম্বর) সেই পুঁথি কবিতায় রূপান্তরিত করা শেষ করি। আমি গড়ে প্রতিদিন বাহান্নটি দ্বি-পদী কবিতা লিখে যাই।

[ক্রমশঃ

কথা কও, হিমালয়

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

তুষার-শুভ্র ধবল-গিরির
শান্তি-পতাকা অভ্রে তুলে,
পামীর-চূড়ার সূর্য্য-স্বপ্নে
মুগ্ধ মর্ম্ম-গ্রন্থি খুলে,
মহাবিশ্বের দৃশ্যপটের
বিবর্ত্তনে কি রয়েছো ভুলে।

(২)

স্তব্ধ পাহাড়, কও—কথা কও—
মুগ্ধতা তব বোঝে নি সবে ;
বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ-মাধুরী
নষ্ট হবে কি অপহ্নবে ?
উদাত্ত হও হে মহাবেত্তা,
যুগান্তকারী উপপ্লবে।

(৩)

বেদ-বিদ্যার শাশ্বত শুভ
স্থণ্ডিলময় শুভ্র বেদী,
তিমিরান্ধেরে পন্থা দেখাও
কুজ্ঝটিকার বক্ষ ভেদি' ;
সূর্য্য জালাও—সপ্ত শিখায়
সন্দেহ সব যাক্ না ছেদি'।

(৪)

অমৃত আহরি' প্রেমেতে-প্রেরিত
অভ্র-মেঘের বক্ষ হ'তে,
ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা সিন্ধু
তব সহস্র সরিৎ-স্রোতে
মন্দ্র-মুখর মন্ত্র বাজায়ে
মজাও সবারে অমৃত-ব্রতে।

(৫)

ওগো হিমাদ্রি, মর্ম্ম তোমার
মত্ত মানব বোঝে নি, তাই
ঘৃণা ঘৃৎকার—হানাদারি আর—
চণ্ডালি যত দেখিতে পাই।
মানুষ থাকে না—মানবতা থাকে—
এ মহাবার্ত্তা বুঝানো চাই।

(৬)

ভস্ম যে হয় শ্মশান-চিতায়
অশাশ্বত যা' পুড়িয়া সব।
স্তব্ধ হবেই রণোন্মাদনা
হুঙ্কার আর হুক্কা-রব :
বিলাও—বিলাও ওগো মহাগিরি,
প্রমত্তে প্রেম সুদুর্লভ।

(৭)

হিংস্র-হিংসা—জিঘাংসা নরে
জাহান্নামের দহনে দহে ;
ভারত-ভারতী-মানব-আরতি
সহস্র-শির গিরীন্দ্র হে,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত মূর্ত্ত প্রবাহে
যেন জঙ্গম জগতে বহে ;
ভ্রান্ত শ্রান্ত মানব যেন গো
'মারের' মারণ আর না সহে ;
তোমার মৈত্রী-মন্ত্রে যেন গো
বিশ্ব-রাষ্ট্র দীক্ষা লহে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গুরুদেব বললেনঃ ক্ষতি এই যে—সমাজ বড় হয় না—হয় মাত্র দুচারজন বরেণ্য সন্ন্যাসীর পুণ্য চরিত্রের বিকাশ। ব্যস্—বাকি সবাই থেকে যায় যে-তিমিরে সেই তিমিরে—আমাদের দেশ ঠিক যা হয়েছে বৈদিক যুগের পর থেকে। অবশ্য মুষ্টিমেয় দুচারজনের বিকাশেরও কিছু মূল্য থাকবেই—কেন না কোনো মহৎ বিকাশই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'তে পারে না। কিন্তু একথা মেনেও বলা যায় না কি যে, মাত্র দু চারজন সংসার বিতৃষ্ণ সন্ন্যাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এ-মহান্ বিশ্বলীলাকে নিত্যনবসৃষ্টিতে বীর্য সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের সমৃদ্ধ আনন্দের পথে উত্তরোত্তর পূর্ণকায় ক'রে তোলা অসম্ভব?

জটাধারীজি সবে একটু নরম হয়েছিলেন, কিন্তু গুরুদেবের একথায় ফের জ্ব'লে উঠলেন, বললেন সদাপটেঃ "আপনি আমাদের শাস্ত্রের কদর্থ করছেন। তত্ত্ব জিজ্ঞাসার লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ—'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ" বাণের মতন একান্ত লক্ষ্যমুখী না হ'লে লক্ষ্যভেদ অসম্ভব। আপনি এই মূল আদর্শের মোড় ফিরিয়ে দিতে চাইছেন গৃহসুখের দিকে—সুষমা-সমন্বয়-বিশ্বলীলা-বর্গীয় গালভরা বুলি উদ্গার করে। তাই আপনি দেখেও দেখতে চাইছেন না যে, উপনিষদ প্রজননের অনুমতি দিয়েছেন মাত্র, বিধান না। সাহেবি ভাষায়ঃ sanction এক, approval আর। অর্থাৎ ঋষিরা শুধু এইটুকু স্বীকার করেছিলেন যে, বেশির ভাগ মানুষ প্রজনন করবেই করবে। কিন্তু এ-স্বীকারের ভাষ্য নয় যে লোকোত্তর মহাপুরুষেরাও—কি না ব্রহ্মবাদীরাও—সেই সংখ্যা গরিষ্ঠদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। বিজ্ঞ ঠাকুর! এই মহাসত্যটি আপনি ভুলে ব'সে আছেন যে, ব্রহ্মবাদীর লক্ষ্য প্রজনন, গৃহগরিমা সুষমা সৌন্দর্যজাতীয় কোনো সিদ্ধি নয়। তাঁর একমাত্র ঈপ্সিত—ব্রহ্মনির্বাণ। এ-লক্ষ্যে পৌছনো যায় শুধু জ্ঞানৈকান্ত সন্ন্যাসমার্গে—ব্রহ্মজ্ঞের উপাধি 'আত্মক্রীড়'—'স্ত্রৈণ' নয়; 'আত্মমিথুন'—জায়াবল্লভ নয়, 'আত্মারাম'—ইন্দ্রিয়দাস নয়। যোগিরাজ সনৎকুমার ছান্দোগ্যে নারদকে কী বলেছিলেন স্মরণ করুন—'ব্রহ্মচর্যেন হি এব ইষ্ট্বা আত্মানম্ অনুবিন্দতে'—অর্থাৎ, একান্ত হ'য়ে ব্রহ্মচর্যের নির্দেশ পথে চললে তবেই আত্মাকে লাভ করা যায়—নৈলে নৈব নৈব চ। এই জন্যেই আচার্য শঙ্কর নারীকে নরকের দ্বার বলেছিলেন। অবধূত গীতাকার মহামুনি দত্তাত্রেয়ও এই জন্যেই সাধককে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যে নারীসহবাসকে যে সব মোহমুগ্ধেরা কাম্য মনে করে তারা দেব অসুর বা মানব হলেও নরকে যাবেই যাবেঃ

'তত্র মুগ্ধা রমন্তে চ সদেবাসুরমানবাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥'

আপনি এই নারীসুখকেই গৃহিণীসুখবাদ নাম দিয়ে নয়া দার্শনিক হ'তে চাইছেন।" ব'লে ক্রুদ্ধস্বরে বললেনঃ কিন্তু এ-ব্রহ্মৈকান্তবাদকে আপনি মিথ্যেই সন্ন্যাস বা কৃচ্ছ্রবাদ নাম দিয়ে নাকচ করতে চাইছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তো সন্ন্যাসী ছিলেন না। তবু তিনিও কি বলতে বাধ্য হন নি বারবার যে, কামিনীকাঞ্চনে বিহারকে বিষবৎ পরিহার না করলে ব্রহ্মবিহারের আশা দুরাশা? আপনি জনপ্রিয় হবার সস্তা লোভে পরশমণিকে নিলামে চড়িয়ে বলছেন যে, যে-কেউ কাঁচের মূল্য দিয়েই পরশমণি কিনতে

পারবে—ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যসাধনাকে খর্ব করতে চাইছেন গৃহস্থের গৃহগৌরবের তথা গৃহিণীগর্বের জয়ধ্বনি করতে। একেই বলে মতিচ্ছন্ন।"

গুরুদেব হেসে হাতজোড় করে বললেন: "মহারাজ! যে যথার্থ ব্রহ্মচারীর মহিমা খর্ব করতে চায়, সে শুধু মতিচ্ছন্ন নয়—অর্বাচীন। আমার নিজের গুরুদেব ছিলেন আকুমার ব্রহ্মচারী। কাজেই ব্রহ্মচর্যের অপমান করলে আমার নরকেও স্থান হবে না—গুরুদ্রোহীকে রৌরব নরকে কৃতান্তদেব ভাজবেনই ভাজবেন ফুটন্ত লৌহ-কটাহে। না, অকপটে বলছি—যথার্থ আকুমার ব্রহ্মচর্যে আমার গভীর আস্থা আছে আজও। তবে কি জানেন? সব কিছুর মতন ব্রহ্মচর্যসাধনায়ও পূর্ণসিদ্ধি আশুলভ্য নয়—ক্রমলভ্য। আপনি নিজেও নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন যে, শুধু রমণীরমণ বর্জন করলেই ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না—চিন্তায়ও পূর্ণ নির্মল হ'তে না পারলে চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, আর চিত্তশুদ্ধি যার হয় নি তার নাম যথার্থ ব্রহ্মচারী নয়। একথা যদি মানেন, তাহ'লে এও আপনাকে মানতে হবে যে, পূর্ণ চিত্তশুদ্ধির শিখরে এক লাফে ওঠা যায় না—বহুবর্ষব্যাপী বিনিদ্র সাধনায় তবে মানুষ মনেপ্রাণে ব্রহ্মচারী হ'তে পারে। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমে যে-ব্রহ্মচর্যকে আদর্শ ধরা হয়েছে সে-আদর্শ সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য নয়। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন মহাভারতে: 'ভার্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ'—অর্থাৎ সংযমী গৃহী-সাধক শুধু ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস করলেও ব্রহ্মচারীর পদবী পাবেন। আমাদের ঋষিরা স্মার্তরা শাস্ত্রীরা মূর্খোত্তম ছিলেন না, তাই তাঁরা সন্তান-উৎপাদন ক'রে ক্রমলভ্য ব্রহ্মচর্যকেই গৃহী সাধকের আদর্শ ব'লে পেশ করেছিলেন।"

জটাধারীজি বললেন: "একথা আমি মানতে পারলাম না। যুগাবতার পরমহংসদেব তো সন্ন্যাসী ছিলেন না তবু—"

গুরুদেব বাধা দিয়ে বললেন: "কিছু মনে করবেন না মহারাজ, কিন্তু আপনি পরমহংসদেবকে ভুল বুঝেছেন। কোনো মহাপুরুষকেই ঠিক বোঝা যায় না—তাঁর মুখের এক আধটি বাণীকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তারি আলোয় তাঁর ছবি আঁকতে চাইলে। দেখতে হবে দেশকালপাত্র। গুরুও যেমন নানা সাধককে নানা উপদেশ দেন, তেম্নি মহা-পুরুষরাও আধার বুঝে নানা শিষ্যকে নানা ব্যবস্থা দেন। পরমহংসদেব স্ত্রীসহবাস না করলেও তাঁর স্ত্রীকে গভীর স্নেহ করতেন—অবধূতগীতা প্রণেতার মতন নারীকে জঘন্যা 'বিশ্বাসঘাতকী' স্বর্গমোক্ষ মুখার্গলা' নাম দিয়ে দিয়ে অপমান করেন নি, বলতেন উঠতে বসতে: 'আমি মেয়ে-দের মা ভগবতী দেখি'। তিনি কামিনীকাঞ্চন শব্দটি ব্যবহার করেছেন মানি, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কি বদ্‌লে কামকাঞ্চন শব্দটিকেই চালু করেন নি?"

জটাধারীজি রুখে উঠে বললেন: "স্বামী বিবেকানন্দের কথা তো পরমহংসদেবের চেয়ে প্রামাণ্য নয়।"

গুরুদেব বললেন: "একথা সত্য। কিন্তু শাস্ত্রার্থ কি বহুক্ষেত্রেই নির্ভর করে না তার ভাষ্যের 'পরে? স্বামীজি ছিলেন পরমহংসদেবের শুধু প্রিয়তম শিষ্য নন, প্রতিভার অবতার, জ্ঞান ও শুদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি পরমহংস-দেবের কামিনী শব্দটিকে বদ্‌লে কাম বসিয়েছিলেন শুধু থিওরিতেই নারীকে সম্মান করতে নয়—তাঁর গুরুদেবের মতন তিনি নিজেও কুমারীপূজা করেছিলেন মহাভারতের চিরকুমার নারদের কথায় সায় দিয়েই: 'নিত্যং নিবসতে লক্ষ্মীঃ কন্যকাসু প্রতিষ্ঠিতা'—অর্থাৎ লক্ষ্মীর বসতি নারীরই আধারে। কিন্তু স্বামীজির ভাষ্য যদি আপনি অগ্রাহ্যও করেন তাহলেও কি বলা যায় না যে, পরমহংসদেব কামিনী বলতে কামই বুঝতেন? আপনি এইমাত্র প্রমাণ চাইলেন, তাই দিতে বাধ্য হচ্ছি। স্মরণ করুন: তিনি তাঁর মানস-পুত্র রাখাল মহারাজকে স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী দেবীর কাছে পাঠিয়ে-ছিলেন।* স্মরণ করুন: তিনি শ্রীম-কে বলেছিলেন যে, গৃহস্থের পক্ষে কখনো কখনো স্বদারার সহবাসে দোষ নেই। স্মরণ করুন: তিনি নানা ভক্তকে একাধিবার বলেছেন যে তাদের পক্ষেও ব্রহ্মচর্য সম্ভব—যদি দুয়েকটি সন্তানের পর

---

* ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগ বাকী ছিল।'… রাখাল প্রথমে খুব আপত্তি জানাইলেও ক্রমে যাতায়াত ও গৃহে অবস্থানের কাল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারাদিও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠে।" …শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা…স্বামী ব্রহ্মানন্দ…১০৮ পৃষ্ঠা।

স্বামী স্ত্রী ভাইবোনের মতন থাকে—সহবাস আর না ক'রে। স্মরণ করুন : তাঁর আর এক প্রিয় ভক্ত, যোগানন্দ, বিবাহ ক'রে লজ্জিত হয়ে ঠাকুরের কাছে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে একটা অছিলায় ডেকে পাঠিয়ে ভাবাবেশে বলেছিলেন : 'বে করেছিস তা কী হয়েছে? এই যে আমি বে করেছি। বে করেছিস, তা ভয় কি?' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকায় এ-কাহিনী তথা আরো অনেক গৃহী ভক্তদের কথা আছে, যাঁরা গৃহস্থাশ্রমে থেকেও ঠাকুরের শিষ্য হ'য়ে পরম-ভাগবত হয়েছিলেন, যথা শ্রীম, নাগমহাশয়, পূর্ণ, সুরেন মিত্র, নবগোপাল ঘোষ, গিরিশ ঘোষ···কত বলব? এসব ভক্তদের তিনি গৃহস্থাশ্রমে থেকেই সাধনা করবার উপদেশ দিয়েছিলেন ব'লে বলবেন কি—তাঁরও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল?"

জটাধারীজি একটু কোনঠেশা হ'য়ে বললেন : "এ-সব ভক্তরা ভক্তিমান্ ছিলেন হ'তে পারে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন একথার কোনো প্রমাণ আছে কি?'

গুরুদেব সবিস্ময়ে বললেন : "নেই? রাখাল মহারাজের সমাধি হ'ত না? নাগমহাশয়ের সম্বন্ধে স্বয়ং স্বামীজি বলতেন না কি—যে তাঁর মতন মহাপুরুষ তিনি আর দেখেন নি—নাগ মহাশয় পূর্ববঙ্গকে আলো ক'রে আছেন! শ্রীম, রামচন্দ্র দত্ত, পূর্ণ ঘোষ—এঁরা কত লোককেই ভগবানের পথে ঠেলেছেন কে না জানে? কিন্তু শুধু তো পরমহংসদেবেরই শিষ্য নয়—শ্রীচৈতন্যদেবেরও কি পরমভাগবত গৃহী শিষ্য ছিল না?—রায় রামানন্দ, শ্রীবাস মুরারি—আরো কত শিষ্য তাঁর হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশায় ও মহাপ্রয়াণের পরে—কে বলবে? অত দূরে যাবারই বা দরকার কি? প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী? তিনি কি বিবাহ ক'রে পিতা হন নি, না ব্রহ্মবিৎ হ'তে পারেন নি? রাখাল মহারাজেরও কি সন্তান হয় নি? মহাপ্রাণ সাধক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নাম কি আপনি শোনেন নি? তাঁর সন্তানবতী সহধর্মিণী মনোরমা দেবীর কি দিনের পর দিন সমাধি হ'ত না? মনোরঞ্জনবাবু তাঁর স্ত্রীর জীবনীতে লিখেছেন যে একবার মনোরমা দেবী বাহাত্তর ঘণ্টা সমাধিতে ছিলেন, পড়েন নি কি আপনি? কিন্তু দৃষ্টান্ত বাহুল্য অনাবশ্যক। আসল কথা কি জানেন মহারাজ? মানুষ বিবাহ ক'রে ডোবে না, ডোবে স্ত্রৈণ হ'য়ে, অসংযমী হ'য়ে, যোগ ছেড়ে ভোগ বরণ ক'রে, বিশ্বাসের পথ ছেড়ে নাস্তিক্যের পথ ধ'রে। আপনি শ্রীমুখে আমাকে 'মতিচ্ছন্ন' উপাধি দিয়েছেন। তথাস্তু।" ব'লে হেসে : "কেবল তাহ'লে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মণ্যদেবের প্রকৃতির সম্বন্ধে কী রায় দেবেন শুনি? সেই একলা মানুষটির আদিম শোকাবহ মতিভ্রমের কথা স্মরণ করুন—যার বিবরণ দিয়েছেন বৃহদারণ্যকে ঋষি সাশ্রুনেত্রেই নয় কি?—'স বৈ নৈব রেমে তস্মাদ্ একাকী ন রমতে···স ইমম্ এব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম···ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত'—অর্থাৎ তিনি একাকী আনন্দ পেলেন না ব'লেই নিজেকে দুভাগ ক'রে পতি ও পত্নী সৃষ্টি করলেন—যার ফলে প্রজা সৃষ্টি হ'ল।"

জটাধারীজি এবার অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন, বললেন : "ধিক্ প্রগল্ভতা! ভগবান যা করেন মানুষ কি তা পারে? ভাগবতে বলেন নি কি :

'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাৎ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥'

অর্থাৎ, অতেজস্বী গড়পড়তা মানুষ যেন মহাদেব না হ'য়ে মহাদেবের মতন বিষপান করতে না যায়, গেলে মরবেই মরবে। তা ছাড়া ব্রহ্মণ্যদেব মতিচ্ছন্ন হ'তে পারেন—ঠাট্টা ক'রেও বলা বালসুলভ প্রগল্ভতা, মহাপাপ। তাই আমি চললাম—আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ বিড়ম্বনা।"

ব'লে রেগে জটাধারীজি উঠে দাঁড়াতেই গুরুদেব তাঁকে করজোড়ে বললেন : "মহারাজ, আপনি আমার অতিথি—যাবেন না। আমার মতন মহাপাপী মতিচ্ছন্নের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে না চান নাই করলেন—কিন্তু পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন দয়া ক'রে। আমি আর তর্কাতর্কি করব না। বসুন··কেবল আর একটি কথা বলতে চাই মহারাজ—তর্ক করতে নয়, শুধু জানাতে যে আমি তর্কের খাতিরেই গৃহস্থাশ্রমের গুণ গাই না। আমি গৃহে থেকে পুণ্যশীলা সহধর্মিণীর সহযোগিতায় গৃহস্থাশ্রমের বহু দুঃখময় দায়িত্ব নিয়ে শুধু যে আনন্দস্বরূপকে হৃদয়ে পেয়েছি তাই নয়, প্রতি বাধাই আমার সাধনার সহায় হয়েছে আমার উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করতে। এই সমৃদ্ধিরই আমি নাম দিয়েছি সুষমা—হার্মনি, কোনো বিলিতি বুলির মোহে নয়—পদে পদে এই মহাসত্যকে উপলব্ধি ক'রে

যে তাঁর চরণে যে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ করতে পারে, গৃহস্থাশ্রম তার কাছে হ'য়ে ওঠে সত্যিই তপোবন। একথায় হিন্দুধর্মের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় ব'লে আমি মনে করি না মহারাজ, কারণ হিন্দুধর্ম বলতে আমার চোখে জেগে ওঠে ধর্মের এক বিরাট মহীরুহের বিরাট মূর্তি—যাহার হাজারো শাখায় হাজারো লতা পাতা ফুল প্রত্যেকেই ভগবানের এক একটি রূপ রস রঙ বিভাবকে প্রকাশ ক'রে সার্থক হয়েছে নিজের ধর্মের স্বকীয়তা বজায় রেখে—যার ছায়ায় আবহমানকাল লক্ষ লক্ষ আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী জীবনের জল ঝড় আঁধির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভগবানের শরণ নিতে পেরেছেন। তাই এ ধর্মে যেমন সর্বত্যাগী মহা-তপস্বীরাও শিষ্য তথা প্রসাদার্থীর পূজা গ্রহণ ক'রে তাঁদের দিয়ে এসেছেন তাঁদের তপস্যালব্ধ আশীষপ্রসাদ, তেমনি সর্বাস্তিবাদী বৈষ্ণব শাক্ত ও শৈব গৃহীরাও সমান আনন্দেই সাধকদের সাধনাকে সমৃদ্ধ করেছেন 'যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্' মন্ত্রের পাঠ দিয়ে—শুধু মুখের কথায় নয়, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের প্রেরণায় ও প্রেমানন্দ-সিদ্ধির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে। তাই একদিকে যেমন হিন্দুধর্মে ভগবানের জন্যে দেহের সর্ববিধ কামনা বাসনা—এমন কি ক্ষুধাতৃষ্ণাকেও জয় করবার সাধনা স্বীকৃত হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে প্রাণস্পন্দনকে ভগবানের চরণে নিবেদন ক'রে ভোগকে যোগের পদবীতে উত্তীর্ণ করার সাধনাকেও অঙ্গীকার করা হয়েছে মানব-মনের একটি বরেণ্য ও চিরন্তন অভীপ্সা ব'লে। মহারাজ! আমি আপনাদের মতন উপাধিধারী মহাপণ্ডিতও নই, দুর্দ্ধর্ষ কৃচ্ছ্রসাধনও করি নি কোনদিন—তবে গৃহস্থ হয়ে পদে পদে প্রতি কামনা বাসনাকে ভগবৎমুখী করার তপস্যা যে কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়ে কম কঠিন নয়, এ কঠোর সত্যটিকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি! কিন্তু কঠিন ব'লে পার পাই নি—একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঠেলে দিয়ে এসেছে—তার নাম দেই আমি বাঁশির ডাক। আমার দেহের মনের প্রাণের মন্দিরে তারি সুর আমাকে নিরন্তর উধাও করেছে অদেখার অভিসারে, কিন্তু জীবনকে শাপ দিয়ে নয়—বিধাতার পরম প্রসাদ ব'লে বরণ ক'রে। তাই আমি ব্রহ্মচর্যকে মেনেও নারীকে নরকের দ্বার বলে স্বীকার করতে পারি নি, পারি নি সেই বিশ্বশক্তিকে অস্পৃশ্যা ব'লে তিরস্কার করতে—যাঁর গর্ভে জন্মেছি, যাঁর বুকের দুধে প্রাণ পেয়েছি, যার সহধর্মিণী দীপ্তির আলোয় নির্দিশায় পেয়েছি দিশা।"

গুরুদেবের গভীর আন্তরিকতার মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য সুর হঠাৎ বেজে উঠল যে জটাধারীজির চোখের দৃষ্টি একটু বদলে গেল, মুখের রুক্ষতাও এল কোমল হয়ে। তিনি হঠাৎ প্রথম আর্দ্র কণ্ঠে বললেন: 'ঠাকুর, আপনাকে হয়ত আমি ভুল বুঝেছি। নারীকে আমিও নরকের দ্বার মনে করি না। নরকের দ্বার কাম, কামিনী নয়—একথা আমিও মানি। আমারও মা ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন পরম ভক্তিমতী। কিন্তু সে যাক গে। আজ আপনাকে শুধু একটি প্রশ্ন করতে চাই: গৃহীর সাধনা বলতে আপনি ঠিক কী বোঝেন?

"গুরুদেব বললেন: 'মহারাজ! মহাভারতে মহাদেব বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে:

> দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুঃ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
> মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুঃ ন মমেতি চ শাশ্বতম্॥

অর্থাৎ দুটি অক্ষরে মৃত্যু—"মম" কি না আমি ও আমার, তিনটি অক্ষরে মুক্তি—"ন মম" অর্থাৎ কিছুই আমার নয়—সবই তাঁর। এ-মহৎ উপলব্ধিটিকে শুধু আরণ্য তপস্যা-পীঠেই নয়, গৃহে সর্বকর্মের প্রাঙ্গণেও পাওয়া যায়—আর এই পাওয়ার সাধনাকেই আমি বলি গৃহীর সাধনা—যাকে গীতায় বলেছে: 'সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্-ব্যপাশ্রয়ঃ মৎপ্রসাদাৎ অবাপ্নোতি পদং শাশ্বতম্ অব্যয়ম্—অর্থাৎ তাঁর কাজ করছি ভেবে কর্মযোগ সাধনায় ব্রহ্মলাভ হবেই হবে। এ-সাধনায় নারীকে 'কামিনী' উপাধি দিয়ে অপমান করতে হয় না—বরণ করা হয় ভগবতী ব'লেই, যাঁর বরে নারী মাতা ভগ্নী জায়া কন্যা হ'য়ে আমাদের জীবনকে শান্তিসমৃদ্ধ ও প্রেমধন্য ক'রে এসেছে আবহমান-কাল।' বলতে বলতে অশ্রু-আভাসে গুরুদেবের স্বর গাঢ় হ'য়ে এল, তিনি সুর নামিয়ে ব'লে চললেন: "যদি সংসারে থাকি মার পূজারী হ'তে, মুক্তি চাই ভক্তির আলোয়, আর সবকিছুর মধ্যেই দেখতে চাই করুণাময়ী জগদ্ধাত্রীকে—তাহলে আমাকে বাঁধবে কে শুনি? মহারাজ,

আপনাকে সত্য বলছি—আমি পেয়েছি মার করুণা, প্রথমে তাঁর প্রতিমাকে বাইরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে, তার পরে হৃদয় মন্দিরে, তারপর বিশ্বমন্দিরে"—ব'লে ভাবাবেগে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলেন :

প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে, এ বিশ্বনিখিল
তোমারি প্রতিমা,
মন্দির তোমার কী গড়িব মাগো, মন্দির যাহার
দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা—শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জ, ভবন, বসন্ত, পবন, তরু, লতা, ফল, ফুল, মধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয়মধুর মা,
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি—তোমারি মাধুরী,
তোমারি মহিমা।
যে দিকেই চাই—এ-নিখিল ভূমি
শতরূপে মাগো, বিরাজিত তুমি :
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে বিকশিত তব
বিভব গরিমা।
তথাপি মাটির প্রতিমা এ গড়ি'
তোমারে পূজিতে চাই মা, ঈশ্বরী !
অমর কবির হৃদয় গভীর ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা।
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না—আপনি দিয়েছ মা, ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে ডাকিছ নিয়ত
করুণাময়ী মা !"

* * *

পড়তে পড়তে প্রহ্লাদের স্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল, একটু থেমে জলভরা চোখে সে প'ড়ে চলল :

এ-গানটি আমাদের উভয়েরই প্রিয় কবির রচনা, কতবারই তো গেয়েছি আমরা একসঙ্গে। গাইতে ভালো-ও লাগত বৈ কি। কিন্তু গুরুদেবের মুখে এ-গানটির যেন নবজন্ম হ'ল। কথামৃতে পড়েছি—পরমহংসদেবের পূজায় মহাকালীর পাষাণ প্রতিমা স্নেহময়ী জননীর মতনই হেসে উঠেছিলেন। গুরুদেবের গানে—সত্যি বলছি দিদি—মনে হ'ল যেন মা ঠিক্ তেম্নি সাড়া দিলেন—তাঁর প্রতিমা যেন আলো হ'য়ে উঠল। শুধু আমার নয়, সাবিত্রীরও মনে হয়েছিল যেন ভবানীর পাষাণ মূর্তির চোখে স্নেহাশ্রু, যেন চতুর্ভুজা প্রসন্ন হয়ে হঠাৎ দ্বিভুজা মার রূপ ধ'রে তাঁর ভক্ত সন্তানকে করলেন আশীর্বাদ। সঙ্গে সঙ্গে আমারও—কী ব'লে বোঝাব দিদি ?—যেন হঠাৎ শিবনেত্র লাভ হ'ল ! তুমি জানো আমি বরাবর বিঠোভাকেই ভালোবেসেছি, দুর্গাকালী ভবানীকে মা ব'লে ডাকি নি কোনোদিনও। কিন্তু সেদিন আমার আনন্দে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল, প্রতিমার চোখে অশ্রু দুলতে দেখে। তারপর দেহেমনে আনন্দের যেন প্লাবন ব'য়ে গেল—যেমনি গুরুদেব তাঁর দেবদুর্লভ কণ্ঠে গাইলেন শেষ চরণ :

"খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা, দেখি না আপনি
দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে ডাকিছ নিয়ত
করুণাময়ী মা !"

মনে হ'ল—সত্যি বলছি দিদি—যেন মা ডাকছেন : ওরে ! আয় আয়—আমাকে দূরে দূরে রাখিস ব'লেই তো আমি তোদের কোলে টেনে নিতে পারি না। আমি তো তোদের পর নই রে, আমি যে সত্যিই মা, মা, মা !

সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব অশ্রুগাঢ়কণ্ঠে আঁখর দেওয়া সুরু করলেন :

শুনি তোমারি ডাক মা, বাজেঃ
'আয় আয় ওরে, আয় কাছে !
আয় আয় ওরে কোলে, সন্তান দোলে
মায়ের বুকের মাঝে।'

তার পরেই যেন ফেটে পড়ল আঁখরের ফোয়ারা—বিদ্যুতের ফুলঝুরি—এরি তো নাম কীর্তনের সাধনা—গায়ক প্রতি ঠমকে পদাবলীর নানা পদকে ফলিয়ে তোলেন আঁখরে আঁখরে চিত্রায়িত ক'রে, নিজের প্রেমের সই দিয়ে মার চরণে নিবেদন করেন তাঁর মনের মিনতি, প্রাণের প্রণতি, অন্তরাত্মার আকূতি।

কিন্তু উচ্ছ্বাস থাক্। বলি শোনো কী হ'ল তার পরে —সে আর এক অঘটন। তবু লোকে বলে অঘটনের যুগ গত—ওসব হ'তে পারত এক বৈদিক কি পৌরাণিক যুগে! তারা জানে না—তাই মানে না দিদি! যারা জানে তারা চলে শুধু প্রেমের টানে—অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে প্রতি স্বরে তালে মিড়ে গমকে।

চব্বিশ

অশ্রুআবেগে প্রহ্লাদ আর পড়তে পারল না, সাবিত্রীকে বলল: "এবার তুমি পড়ো।"

সাবিত্রী আঁচলে চোখ মুছে প'ড়ে চলল: "গুরুদেবের গান শুনতে শুনতে জটাধারীজির মুখচোখের ভাব বদলে গেল ধীরেধীরে। প্রথম দিকে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল শুধু ঔৎসুক্যের ভাব। কিন্তু গানের শেষের দিকে গুরুদেবের কণ্ঠ ভাবাবেশে গাঢ় হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জটাধারীর চোখে অশ্রু টলটল ক'রে উঠল। পরে গুরুদেব যখন আঁখর দেওয়া সুরু করলেন, তখন তাঁর গম্ভীর মুখও কোমল হ'য়ে এল, ঠোঁট উঠল কেঁপে। তারপরে ঠিক যে-মুহূর্তে আমি ও সাবিত্রী প্রতিমার মুখে বরাভয় হাসির আভা চিকিয়ে উঠতে দেখলাম—অমনি কী যেন একটা ঘ'টে গেল। পরে শুনলাম—অনেক সাধকসাধিকারই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, কয়েকজন শিষ্য দেখেছিলেন স্বর্ণাভার পরিমণ্ডল মা ভবানীর মুখের চারধারে। গুরুমা সাবিত্রীকে বলেছিলেন—তিনি পেয়েছিলেন মার দর্শন খোলা চোখেই। তারপরেই গুরুদেবের গান থেমে গেল —দুটি যুক্তপাণি প্রসারিত প্রতিমার দিকে—অবিরল অশ্রুধারা গাল বেয়ে ব'য়ে চলেছে—মুখে দিব্য হাসির অপরূপ আভা!···সে যে কী অপরূপ দৃশ্য কী বলব দিদি? সময়ের খেয়াল ছিল না কারুরই।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙল। জটাধারীজি উঠে টলতে টলতে দুপা এগিয়ে গুরুদেবের পায়ের কাছে গিয়েই সশব্দে প'ড়ে গেলেন উপুড় হ'য়ে।

গুরুদেবের তখন সবেমাত্র সমাধিভঙ্গ হয়েছে, তিনি আমাকে ও ধ্রুবকে ইঙ্গিত করলেন জটাধারীজির মাথাটা সোজা ক'রে দিতে। আমরা তাঁকে ধ'রে ধীরে ধীরে পাশ ফেরাতেই তিনি তারস্বরে কেঁদে উঠে গুরুদেবের পায়ে মাথা কুটে বললেন: "আমাকে ক্ষমা করুন ঠাকুর! আমি অন্ধ, অর্বাচীন, ব্রাহ্মণকুলাঙ্গার! আমার অপরাধ নেবেন না। মা···মা···মা আমাকে আজ···" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরোধ···বাকি কথা আর বলা হ'ল না।

*　　*　　*　　*

সেদিন রাতেই আমাদের দীক্ষা দিলেন গুরুদেব। গুরুপূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে। আমার হাতে ঠাকুরের চরণ-তুলসী দিয়ে কানে দিলেন গুরুমন্ত্র, গুরুমাও সেই মন্ত্রই দিলেন সাবিত্রীকে।

সঙ্গে সঙ্গে কী যে হ'ল—কেমন ক'রে বর্ণনা করব দিদি? আমরা চেতনার যে-স্তরে বাস করি সে-স্তরে জগতের যে-চেহারা ফুটে ওঠে, চেতনার ঊর্ধ্বগতি হ'লে সে-চেহারারও বদল না হ'য়ে কি পারে? ঠিক্ কীভাবে এ-রূপান্তর ঘটে ভাষায় গুছিয়ে বলা যায় না। কেবল একটি উপমা মনে আসে: শুভদৃষ্টির পরে নববধূ যখন সবার চেয়ে আপন হ'য়ে ধরা দেয়, তখন সেই পরম পাওয়ার আলোয় যেন চোখের ঠুলি খ'সে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে দেখি বাইরের আলো যেন মিশে গেছে অন্তরের আলোয়, আর সেই সঙ্গে কালো যা কিছু ধুয়ে মুছে ভেসে গেছে। না, এও কম বলা হ'ল। গুরুদেব আমাদের দীক্ষা দেওয়ার পরে আরতির আগে গাইছিলেন জ্ঞানদাসের একটি অপূর্ব কীর্তন:

"কী রূপ হেরিলুঁ কালিন্দীকূলে
অতি অপরূপ কদম্বমূলে!
কী বা অপরূপ—কহিতে নারি:
যেথা মেঘ সেথা না হয় বারি!
হৃদিমাঝে মেঘ উদয় করি'
নয়নের পথে বরিখে বারি।
হেন মনে লয়—বিজরি হ'য়ে
জড়ায়ে রহি গো ও-মেঘে গিয়ে।"

এবার থামবার সময় এল—যদিও শোম বহুক্ষণ পেরিয়ে গেছে। কেবল আর একটি কথা বলবার আছে:

কথাটি এই যে, সাবিত্রীর সব ভয় গ'লে ভরসার ঢেউ তুলে চলেছে। কারণ গুরুমা তাকে বলেছেন—মেয়েদের স্ত্রী হওয়ার পরে মা হ'তে চাওয়ার মধ্যে শুধু যে অন্যায়

কিছু নেই তাই নয়, যে-সব মেয়েরা দাম্পত্য সুখের লোভে সন্তানের দায়িত্ব নিতে নারাজ তারাই অপরাধী। একথায় গুরুদেবও বললেন হেসে যে, এ-ধুয়ো এসেছে বিলেত থেকে যে বিবাহের পরম লক্ষ্য রোমান্স। গুরুদেব বলেন, বিবাহের দুটি লক্ষ্য : এক, স্ত্রীকে সহধর্মিণী-রূপে বরণ ক'রে ধর্মপথে তার শক্তির প্রসাদে পুরোপুরি 'শাক্ত' অর্থাৎ শক্তির উপাসক হ'তে শেখা; দুই, তার মাধ্যমে আত্মজের দেখা পেয়ে মাতৃশক্তির মহিমা উপলব্ধি করা। কেবল গুরুমা ও গুরুদেব বলেন যে, বিবাহিত দম্পতি আত্মিক সাধনাকে বরণ না করলে তাদের সে-বিবাহ ধর্মের দিক থেকে ব্যর্থ।

গুরুমা বলেন : এ-ধর্মের পথে চলতে হ'লে প্রথমে চাই সংযমনিষ্ঠা, তার পরে ব্রহ্মচর্য। দু-একটি সন্তানের পর দম্পতীকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতেই হবে—অর্থাৎ পিতৃঋণ-এর পরেই শুধতে হবে ঋষি-ঋণ ও দেব-ঋণ। গুরুমা দীক্ষার দিনে বৌকে আদর ক'রে বললেন : "মা, সন্তানবতী না হ'লে স্ত্রীর ধর্মজীবন সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু সন্তানকে সংসারী-গৃহিণী যে চোখে দেখেন, সাধিকা-গৃহিণী সে-চোখে দেখলে সে-মাতৃত্ব মা বা সন্তান কাউকেই পূর্ণ সার্থকতার নির্দেশ দিতে পারে না। তাই সাধিকা-মাকে এইটি সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে—আমার কিছুই না, সবই তাঁর। অর্থাৎ সন্তান মার সম্পত্তি নয়—ঠাকুরের দেওয়া ধন, তিনি গচ্ছিত রেখেছেন তোমার কাছে—সন্তানস্নেহের মধ্যে দিয়েও তাঁর স্নেহ আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে। ভাগবতে এই কথাই বলেছিলেন কৃষ্ণ গোপীদের : যেখানেই যাকে ভালোবাসো সে-ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে আমিই তোমাদের টানছি। কিন্তু এই কথাটি বইয়ে পড়লে বা মুখে আওড়ালে হবে না, উপলব্ধি করা চাই যে, প্রতি প্রেমই সেই পরম প্রেম-মণির একটি রশ্মি—যার সরলরেখা বেয়ে চললে সেই পরম মণিকে চাক্ষুষ করা যায়।"

এম্নি আরো কত সুন্দর সুন্দর কথাই যে বলেন মা! একটি কথায় কাল বিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম : "মা, গুরুদেব বলেন তিনি সবার মধ্যেই ঠাকুরকে দেখতে পান; আপনিও কি পান?" মা বললেন : "না বাবা আমি সবার মধ্যে দেখি কেবল দয়াময়কেই—মানে গুরুকেই। আমি প্রথমটায় একথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারি নি, তাই ফের তাঁকে ধরলাম একটু খুলে বলতে। তাতে গুরুমা বললেন : "বাবা! আমি শুধু যে দয়াময়ের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের করুণাকেই অন্তরে পেয়েছি তাই নয়, তাঁকে—দয়াময়কে—আমার সবচেয়ে আপন ব'লে চিনতে পারার পরেই ঠাকুর আমার আপন হয়েছেন। বলতে কি, ঠাকুরকে আমি মনেপ্রাণে কোনোদিনই তেমন ক'রে চাইতে পারতাম না—যদি না দয়াময়ের মধ্যেই প্রথম ঠাকুরকে দেখতাম। গুরুবাদের এ-দুটি ভাবই সত্য বাবা : গুরুর মধ্য দিয়ে ইষ্টকে পাওয়া আর ইষ্টের মধ্য দিয়ে গুরুকে। আমি গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সত্যি বুঝেছি যে, গুরু আর ইষ্ট অভেদ। উনি ইষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর দেখেছেন ইষ্টই তাঁকে দীক্ষা দিতে এসেছিলেন গুরু হয়ে।"

শুনে সাবিত্রীর আনন্দ ধরে না। বলল : "মা! আমিও ঠিক এই ভাবেই চাই ইষ্টকে বরণ করতে, আপনি আশীর্বাদ করুন।" মা হেসে বললেন : "আশীর্বাদ তো আমরা সব সময়েই করছি মা! কেবল তোমার মনে রাখতে হবে একটি কথা—যদি তোমার স্বামীকেই গুরুবরণ করতে চাও : যে স্বামীর বাইরের রূপকে আঁকড়ে ধরলে চলবে না। ভালোবাসবে, কিন্তু মানুষ ভেবে নয়—ঠাকুরের প্রতিনিধি ভেবে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে তোমাকে যে, যখন গুরুর মৃন্ময় রূপকে ডিঙিয়ে তাঁর চিন্ময় সত্তার পায়েই আত্মনিবেদন করবে তখনই তোমার সাধনা সফল হবে—মানে, তখনই ইষ্ট তোমার আপন হ'তেও আপন হবেন গুরুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যাকে ভালোবেসে না-চাইতেও হাতের কাছে পাই, তার নানা চ্যুতি ত্রুটি এত বেশি চোখে পড়ে যে তার মৃন্ময় রূপকে পাশ কাটিয়ে চিন্ময় সত্তাটিকে মনের প্রাণের অর্ঘ্য দেওয়া বড়ই কঠিন হ'য়ে ওঠে। এইজন্যেই ভাগবতে কৃষ্ণ এক জায়গায় ব্রাহ্মণপত্নীদের বলেছিলেন : "আমার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে দূরে থেকে আমার ধ্যান ও নাম গুণগান করলে আমাকে বেশি আপন ক'রে পাবে।" তাই তো আমরা প্রায়ই বলি মা, যে গৃহী হয়ে সাধনা করা সহজ যারা বলে তারা জানে না। গৃহের শত তুচ্ছতা, নীরসতা, গুরুভার দায়িত্ব কত ভাবে যে

আড়াল বোনে, গুহাজঙ্গল তীর্থবাসী সাধক বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা তার কী জানবে? আর একটি কথা সর্বদাই মনে রাখবে মা, যে, মেয়েদের একটা বিশেষ বাধা আছে—মমতা ও আসক্তি আমাদের চারদিক থেকেই ছেঁকে ধরে। এর কারণ: মেয়েরা সংসারের সব কিছু খুঁটিনাটিকেই জড়িয়ে ধরে—শুধু স্বামী সন্তান নয়, গৃহের প্রতি তৈজসেও আমাদের মায়া পড়ে দেখতে দেখতে। আমাদের মন-প্রাণের প্রতিটি তন্তু যে মমতা দিয়ে গড়া মা! তাই একদিকে আমাদের পক্ষে ভক্তি করা যেমন সহজ, অন্য দিকে সে-ভক্তিকে উঁচু সুরে বেঁধে রাখা তেম্‌নি শক্ত, সংসারের হাজারো তুচ্ছতা মমতা বাদ সাধে, সুরে বেসুর বাজে—ফলে ভক্তি দেখতে দেখতে মমতার স্তরে নেমে আসে। তাই ভালবাসা ভক্তি করা মেয়েদের স্বভাব স্বধর্ম মেনেও বলব, পুরুষদের প্রেম ভক্তি যত সহজে উদার মুক্ত হতে পারে আমাদের তত সহজে পারে না—যাকে আমরা সত্যি ভালোবাসি তাকে সহজেই আপ্রাণ ছেঁকে ধরি। এইখানেই পুরুষেরা জেতে—যদিও অন্যদিকে আত্মসমর্পণ করতে বা একনিষ্ঠ হ'তে তাদের বেশি বাধে আমাদের চেয়ে। তাই এই-খানে আবার মেয়েরা জেতে। একথাগুলি বলছি, যাতে তুমি সময়ে সতর্ক হ'তে পারো—কোন্ পথে বাধা অলক্ষ্যে এসে হানা দেবে জেনে সাবধানে তাদের এড়িয়ে চলতে পারো লক্ষ্য পথে। তাই ফের বলি—পরেও বলব উঠতে বসতে—তোমার দেবতুল্য স্বামীকে শুধু মুখেই দেবতা না ব'লে মনে মনেও দেবতা ভাবতে চেষ্টা করতে হবে তোমাকে, সজাগ থাকতে হবে—তাঁকে ভালোবাসতে গিয়ে যেন জড়িয়ে না ধরো। ভুলো না—সব প্রেমেরই শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেওয়ার পথে, পাওয়ার পথে নয়। এইখানেই কাম ও প্রেমের তফাৎ। কাম চায় হাতিয়ে নিতে, প্রেম চায় বিলিয়ে দিতে। চরিতামৃতে তাই বলেছে

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা প্রেম তার নাম।

গোপীরা এই কথা জানত ব'লেই তাদের প্রেমের এত নাম-ডাক—যার জন্যে কৃষ্ণ বললেন: আমি তোমাদের ঋণ শোধ করব কী দিয়ে—তাই তোমাদের প্রেমই হোক তোমাদের পুরস্কার।" এই কথাটি তোমার মনে রাখতে হবে যে স্ত্রী সহধর্মিণীর পদবী পায় তখনই যখন সে হয় স্বামীর ধর্মপথের সহায় ও শক্তিদাত্রী, অর্থাৎ যখন সে স্বামীকে ভালোবাসে দেহের কামনায় নয়, হৃদয়ের প্রেমের অর্ঘ নিবেদন ক'রে ধন্য হ'তে, যেমন ভক্ত ধন্য হয় ভগবান্‌কে তার ভক্তির নৈবেদ্য নিবেদন ক'রে।

সত্যি দিদি, কী সুকৃতিই যে করেছিলাম আমরা পূর্ব-জন্মে! আর তুমিই আমাদের দিশারি হয়ে এসেছিলে, এপরম সার্থকতার পথে আমাদের ঠেলে দিয়ে। তাই তোমার ঋণও আমরা শুধতে পারব না। ভাগবতের কথা ধার ক'রে বলি—তোমার শুভবৃত্তিই হোক তোমার পুরস্কার।

আমার কেবল একটা জায়গায় মনে খচখচ করে আজও: বাবাকে শুধু যে এসব কথার কিছুই বলার উপায় নেই তাই নয়, আমাদের দীক্ষার কথা শুনলেও তিনি বিষম ঘা খাবেন—হয়ত বা আমাকে ত্যজ্যপুত্রই করবেন। তাই গুরুমা চান না এখন তাঁকে কিছু বলা হয়। বলেন—সময় হয় নি। গুরুদেব সাবিত্রীকে সেদিন বলেছিলেন কথায় কথায় যে, দীক্ষা নেওয়ার পরে সাধকের সাধনার পথে যারা বাধা, যারা বেদরদী, তাদের দূরে দূরেই রাখতে হবে। তাদেরও প্রীতির চোখে দেখা চাই কিন্তু বহিরঙ্গভাবে—কেন না তারা অন্তরঙ্গ হ'তে পারে না যারা আমাদের সাধনার সহযাত্রী নয়। এ-প্রসঙ্গে সেদিন তিনি উদ্ধৃত করলেন খৃষ্টের একটি চমৎকার উক্তি, বললেন:

"একদিন খৃষ্টদেব শ্রোতাদের এক সভায় বলছিলেন ভগবানের কথা—এমন সময়ে একজন বলল: 'দেখুন, আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে। তাঁরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।' তাতে খৃষ্টদেব উত্তর দিলেন: 'কে আমার মা? কে আমার ভাই?' যারা আমার পরম পিতার ইচ্ছাকে বরণ ক'রে তাঁর শরণ চাইবে শুধু তারাই আমার ভাই বোন মা।' ব'লে শিষ্যদের দিকে একটি বাহু প্রসারিত ক'রে দেখিয়ে বললেন: 'দেখ! এরাই আমার মা ভাই বোন—আপন জন।'

গুরুদেব সত্যি এক আশ্চর্য মানুষ! একান্তী হ'য়েও সর্বগ্রাহী। কৃষ্ণৈকান্ত হ'য়েও জগন্মাতাকে মা বলতে কেঁদে সারা! কোমল হ'য়েও বলিষ্ঠ! মা কালীকে মা ব'লে ডেকেও প্রার্থনা ক'রে এসেছেন—যেন মা তাঁর

কোনো আসক্তিকেও নির্মূল করতে দ্বিধা না করেন ব্যথা থেকে রক্ষা করতে। আবার গৃহী হ'য়েও উদাসী! তাই শিবকে করুণাময় ব'লে চিনেও তাঁর কাছে এই বরই চেয়ে এসেছেন যে, যেন তিনি ব্যাসদেবের স্বরে স্বরে মিলিয়ে গাইতে পারেন:

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

অর্থাৎ জীবনও চাইবে না, মরণও নয়—শুধু কালের নির্দেশের পথ চেয়ে থাকবে—যেমন ভৃত্য থাকে প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায়।

কিন্তু সবচেয়ে আমার ভালো লাগে তাঁর আশ্চর্য ঔদার্য। নৈলে ভাবো—মনে প্রাণে হিন্দু হ'য়েও কথায় কথায় খৃষ্টের বাণী উদ্ধৃত করা—তাঁর ছবির নিচে ফুল দেওয়া—বলা: খৃষ্ট ও কৃষ্ণ অভেদ!

বহুভাগ্যে এমন গুরু পাওয়া যায় দিদি, নয়?

ইতি। তোমার ভাগ্য-গৌরবী ভাই প্রহ্লাদ।

[ক্রমশঃ

জানি না কথন

অমিত রায়

কথন বসন্ত এসে আম, জাম, শিমুলের শাখে
উড়িয়েছে এই নবজীবনের সবুজ কেতন,
উড়ে গেছে ধূলি ম্লান কুয়াশার দিন,
পুরনো খোলস ছেড়ে সময়ের বুকে
যেন এই পৃথিবীর নব উত্তরণ
জানি না কথন হ'ল,
জানি না কথন।

শুধুই দেখেছি মোর বাতায়ন পাশে
আশ্বিনের ঝড়ে পড়া কুল গাছটায়
ধীরে ধীরে মুছে গেলো জীবনের
শেষ চিহ্নটুকু।

অসংখ্য কাজের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে
জীবনের ক্ষয় শুধু হ'ল।
দু'দণ্ড বিশ্রাম ক'রে স্বপ্ন দেখার
সুযোগ হ'ল না আজো জীবনে আমার।

কৃষ্ণচূড়ার রঙে লাল হ'ল পৃথিবী কথন,
কথন বসন্ত এলো সাথে নিয়ে ফুলের সৌরভ
মুকুলের ঘ্রাণ মেখে দখিনা মলয়
চঞ্চল হ'ল সে পুনরায়
নীপশাখে কোকিলের মধুঝরা গান,
কুমারী মেয়ের মনে আনলো জোয়ার,
জানি না কথন তাই, জানি না কথন।
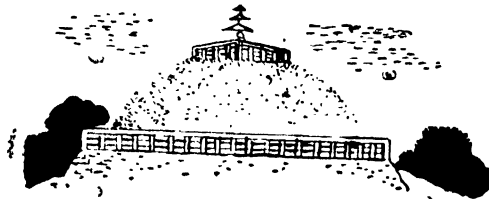
বাংলা সাহিত্যে নভেল ও রোমান্স

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে এখন পর্যন্ত নভেল শ্রেণীর তীব্র বাস্তববাদী এবং মহাকায় উপন্যাস—যাকে জীবনের একটা দিকের প্রদর্শনী ও ব্যাখ্যার ভার নিতে হয়—খুব বেশি লেখা হয় নি। তার কারণ, এদেশে এখনও ব্যক্তিচরিত্র প্রচণ্ড তীব্রতা আর বলিষ্ঠতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বাধা ঠেলে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে নি। দু চার জন অসাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলে প্রায় সমস্ত সাধারণ লোক এদেশে একেবারে ব্যক্তিত্বহীন, এমন-কি চিন্তাশক্তির সম্যক্ পরিচালনাতেও তারা অভ্যস্ত নয়। পাশ্চাত্যজগতে বিশেষত পশ্চিমোত্তর ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ লোকেরও ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল এবং উগ্র। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গড্ডালিকাপ্রবাহের অধীন; তারা কতকটা অবচেতনার দ্বারা পরিচালিত আচ্ছন্নপ্রায় অবস্থায় আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্যে ইউরোপে জীবনসমস্যা আর জটিল ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ দিয়ে ভরানো যে-ধরণের বিরাটকায় নভেল লেখা হচ্ছে, এদেশের স্বল্পপরিসর ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিমানসে তার অবকাশ অল্প ব'লে এদেশে তা সম্ভব হতে দেরী হবে। এটা হল জীবনবোধ ও সংস্কৃতির মূলগত পার্থক্যের ব্যাপার। নভেলে বিপুল তর্ক ও আলোচনা এবং চুলচেরা বিশ্লেষণের অবকাশ আছে; সঙ্গত কারণে তার আয়তনও প্রায়ই বিরাট হয়। বাঙালির জীবনে গীতিকবিতা, ছোটগল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন রোমান্সের উপযোগী উপকরণ থাকলেও নভেলের জটিল আয়োজন বড় দুর্লভ। নভেলের নিখুঁত সংজ্ঞা অনুসারে লেখা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের সংখ্যা বাংলা ভাষায় এখনও একশো পর্যন্ত ওঠে নি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। রোমান্সের সংখ্যা অনেক বেশি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়-চতুর্থভাগে অতিআধুনিক কালে (১৯২৬—৬২ সালে) ইউরোপীয় ধরণের চলমান জীবনের বৃহৎ প্রতিচ্ছবি এবং ব্যক্তিচরিত্রের সংক্ষুব্ধ আন্তর আলোড়নের যথার্থ প্রতিবিম্বস্বরূপ কয়েকটি নভেল বাঙালির হাতে লেখা হয়েছে। সময়ের দিক থেকে যথা-পর্যায়ে ঐ সব নভেল ও তাদের লেখকেরা আলোচনার যোগ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ রোমান্টিক প্রকৃতি ঐ সব নভেলেও বারবার দেখা দিয়েছে।

রোমান্টিক চেতনা আর নভেলের উৎসস্বরূপ যে বাস্তব-চেতনা, দুই-ই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দান। ব্যক্তিস্বাধীনতার দানে ব্যক্তিচেতনা যতটা সজাগ হয়ে উঠ্‌লে রোমান্সের জন্ম হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশে ব্যক্তিচেতনা তার চেয়ে অনেক বেশি উন্মুখ হয়ে উঠে আত্মবিশ্লেষণতৎপর হলে—তবে নভেলের জন্ম হয়। নভেল উগ্র গোষ্ঠীচেতনার বাহনও হতে পারে—তাতে রসের পরিমাণ যেমনই হোক, বিচার-বিশ্লেষণ, প্রচারকার্য, ভাব-আন্দোলন প্রভৃতির পূর্ণ সুযোগ যদি বর্তমান থাকে। এখন পর্যন্ত বাঙালির চেতনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বর্তমান উপলব্ধি শুধু রোমান্সের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে, নভেলের উৎসরূপে কার্যকরী হয় নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে এ-অবস্থার পরিবর্তন হবে কি না, জোর করে বলা যায় না।

বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের তুলনা ক'রে একটা কথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায়। ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে নভেলের আদর আরও বাড়বে। সম্ভবত কিছুদিনের জন্যে বাংলা নভেল ধরণের উপন্যাসে বাস্তবচেতনার উগ্র আতিশয্যও দেখা যাবে। কিন্তু রোমান্স রচনা বন্ধ হয়ে যাবে না। নভেল যে খালি বস্তুপরতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে অন্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ আঙ্গিক অব্যাহত রেখে রচনা করা সম্ভবপর, এ-সত্যও বাঙালি লেখকসম্প্রদায় ক্রমশ উপলব্ধি করবেন।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নভেল ও রোমান্স প্রায় এক সময়ে লেখা আরম্ভ হয়। বরং নভেল কিছু আগে লেখা সুরু হয়—১৮৫২ অথবা ১৮৫৫ সালে। যদি ফুলমণি ও করুণার বিবরণকে প্রথম বাংলা উপন্যাস ধরা হয়, তাহলে ১৮৫২ সালে বাংলা নভেলের প্রথম উদ্ভব বলা যায়। বাঙালির লেখনীতে বাংলা উপন্যাস তথা নভেলের প্রথম উৎপত্তি ১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা "আলালের ঘরের দুলাল" লিখিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। রোমান্সের কথাসাহিত্যে আবির্ভাব ১৮৫৭-৫৮ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের রচনায়। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসরূপে রোমান্সের আবির্ভাব ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্যে রোমান্সের জয় হয়। দুর্গেশনন্দিনী থেকে শেষের কবিতা পর্যন্ত ৬৩ বছর সময় রোমান্সের প্রাবল্য বর্তমান থাকে। এই সময়ে নভেলের ধারাটি পাশাপাশি চ'লে এসেছে মাত্র। দীর্ঘ ষাট বছর সময়ের মধ্যে নভেল তথা বাস্তবচেতনা কোন সময়ে প্রাধান্য লাভ করে নি।

শরৎ-পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যের আলোচনায় একথা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র আর এঁদের সমকালীন বহুসংখ্যক ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের রচনাবলী নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, এঁদের মধ্যে মাত্র দু-একজন ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে অন্য সবাই সাধারণত রোমান্টিক কথাসাহিত্যিক। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী অর্থাৎ ১৮৭৬ সাল থেকে পরবর্তী যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যিনি নিঃসংশয়ে সব চেয়ে বেশি প্রতিভার অধিকারী, সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশেষভাবে রোমান্টিক ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। শেষের কবিতা (১৯২৮) থেকে ইছামতী (১৯৫০) পর্যন্ত ২২ বছর সময়ের মধ্যেও রোমান্সের আধিপত্য কত প্রবল, তা বোঝা যায় বিভূতিভূষণ-দিলীপকুমার-মনীন্দ্রলাল-শরদিন্দু-অচিন্ত্যকুমার-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব প্রভৃতি লেখকদের মুখ্যত রোমান্টিক রচনাগুলির সমাদর দেখে। শনিবারের চিঠি, কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকাগুলি তাদের প্রথম আবির্ভাব ও সমৃদ্ধির যুগে বাস্তবতা নিয়ে খুব হৈ চৈ করলেও ইউরোপের মহাদেশীয় সাহিত্যের প্রভাবে এদেশেও নবরোমান্টিকতা ঘনীভূত চেতনায় আত্মপ্রকাশ করে। যা ইউরোপে নিতান্ত বাস্তব ছিল, এখানে তা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নেহাৎ রোমান্টিক হয়ে ওঠে। যাঁরা Intellectual বা মননপ্রবণ উপন্যাস রচনার সাধনায় ব্রতী হন, তাঁরাও কমবেশি রোমান্টিক হয়ে পড়েন। প্রচুর বুদ্ধিপ্রধান আলোচনার সমাবেশ সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদ-অন্নদাশঙ্কর, মনোজ-প্রবোধকুমারের মতোই রোমান্টিক ঔপন্যাসিক। অনেক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও এঁরা সকলে রোমান্সের স্বপ্নে আচ্ছন্ন। বৃহদায়তন উপন্যাসগুলির রচয়িতাদের মধ্যে দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "তরঙ্গ রোধিবে কে ?" রোমান্টিক রচনা। অন্নদাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি "সত্যাসত্য" নভেল হলেও তাতে অন্তত "কলঙ্কবতী" খণ্ডে রোমান্সের প্রাধান্য নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষের ইতিহাসে রোমান্সের আধিপত্য অনুসন্ধিৎসুর কাছে সহজে প্রত্যক্ষ। প্রশ্ন হল, বাংলা উপন্যাসে বাস্তব-চেতনার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠল কবে থেকে এবং কার বা কাদের লেখার জোরে ?

যত দূর দেখা যাচ্ছে, প্যারীচাঁদ-প্রতাপচন্দ্র-তারকনাথ-শিবনাথ-রমেশচন্দ্র-স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির লেখার বাস্তবতা নয়, আধুনিক বস্তুবাদী। সংশয়াত্মা মনের বাস্তব-চেতনা বাংলা উপন্যাসে প্রথম পাওয়া গেল ১৯৩০ সালের পর থেকে। বাংলা গল্পসাহিত্যে ঐ প্রবণতা আরও আগে দেখা যায় সর্বপ্রথম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় ; বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই আধুনিক বাস্তবতার প্রবর্তক। ১৯২০ সালের পর থেকেই তাঁর অতুলনীয় ছোট গল্পগুলির মারফতে প্রথম কথাসাহিত্যে নগ্ন, তীব্র বাস্তব-চেতনা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু উপন্যাসে তিনি এ-দক্ষতা সহজে দেখাতে পারেন নি। ১৯৩০ সালের পর তারাশঙ্কর, বনফুল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের রচনায় আধুনিক বাস্তবতা ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠতে থাকে। কালানুক্রমিকভাবে এই লেখকবৃন্দের উপন্যাসবলীর আলোচনা যথা পর্যায়ে করা হবে।

বাস্তব চেতনার স্ফুরণের দিক থেকে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে দুই যুগে ভাগ করা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র

মহাশয়ের রচনায় সমাজবোধ ও বাস্তবচেতনার প্রথম অভিব্যক্তি দেখা যায়। সেই চেতনা ও তার ঔপন্যাসিক বিকাশ-বাহন নভেল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মোটামুটি একটা ধারাই অনুসরণ করেছেঃ বস্তুপরতন্ত্রতাবিহীন বাস্তবতা। ১৯৩০ সালের পর থেকে আমরা সাহিত্যে ক্রমশ বস্তুপর-তন্ত্রতার প্রাবল্য দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং আলোচ্য যুগ দুটি হলঃ—(ক) ১৮৫৫-১৯৩০ সাল এবং (খ) ১৯৩০ সাল থেকে বর্তমান কাল।

প্রথম যুগে নভেলের তুলনায় রোমান্সের প্রাবল্য ১৮৬৫—১৯৩০ সালে বর্তমান ছিল। এই সিদ্ধান্ত এত বেশি প্রমাণসহ যে, শ্রীকুমারবাবুকে বারবার তাঁর গ্রন্থে শরৎ-পরবর্তী বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিশালী ঔপন্যাসিককে রোমান্টিক বলে ঘোষণা করতে হয়েছে; তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও আছেন। বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী নভেললেখকদের অন্যতম তিনি নিজেকে রোমান্সরচয়িতা হিসাবে ব্যাখ্যাত দেখে খুশি হয়েছেন কি না, তিনিই জানেন। আচার্য সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে নব রোমান্টিকতার আবির্ভাব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা ও রসোপলব্ধির শক্তি অনেক পণ্ডিত-মন্য ব্যক্তির মধ্যে দুর্লভ।

দ্বিতীয় যুগে নভেলের আধিপত্য ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে। কিন্তু ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ সালের ত্রিশ বছরের হিসেব নিলেও দেখা যায়, স্বয়ং শৈলজানন্দ রোমান্টিক ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেছেন, প্রমথনাথ বিশি রোমান্স রচনা করে চলেছেন 'জোড়াদিঘির চৌধুরি পরিবার' থেকে 'কেরি সাহেবের মুন্সি' পর্যন্ত, বিভূতিভূষণ-দিলীপকুমার-মণীন্দ্রলাল-শরদিন্দু-বুদ্ধদেব প্রভৃতি উপভোগ্য রোমান্সরচনায় ক্ষান্তি দেন নি। যদিও তারাশঙ্কর-বলাইচাঁদ-মানিক-হীরেন্দ্রনারায়ণেরা ক্রমশ রোমান্স থেকে নভেলের দিকে এগিয়ে গেছেন, তবুও তারাশঙ্করের রাইকমল, আগুন, কালিন্দী, সপ্তপদী প্রভৃতি রচনাগুলি রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত, বনফুলের দ্বৈরথও তাই, মাণিকবাবুর যৌনবিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয়বাহী উপন্যাসগুলিও অধোমুখ-রোমান্টিকতা ছাড়া আর কিছু নয়, মুমূর্ষু পৃথিবীর রূপ-রচনায় ব্যাপৃত হীরেন্দ্রনারায়ণেরও প্রথম দুটি উপন্যাসই রোমান্স। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বাস্তববাদী সাহিত্যিক হলেও তাঁর "অগ্নিসম্ভব" পরিপূর্ণ রোমান্টিক রচনা। তরুণ সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মুখ্যত রোমান্স-রচয়িতা; তিনি ক্রমশ বাস্তববাদের দিকে এগোবার চেষ্টা করলেও তাঁর আন্তরিক প্রবণতাটি প্রকৃতিতে রোমান্টিক।

প্রথম মহাযুদ্ধেই ইউরোপ বেশ কিছু বিধ্বস্ত হয়। এ-দেশে তার তেমন স্পর্শ লাগে নি। এদেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের পর থেকে সমর-কালীন দুর্দশা সুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইউরোপীয় মানসিকতায় যে প্রবল বস্তুপরতন্ত্রতা দেখা দেয়—মোটামুটি ১৯১৮—১৯ সাল থেকেই, বিশেষত রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর থেকে, এদেশে ১৯৩০ সালের পরও তার ক্ষীণ ছোঁয়া মাত্র লাগে। কিন্তু ১৯৪১ সালের পর থেকে অতিক্রত যুদ্ধজাত অবক্ষয়ের তাড়নায় এদেশের সাহিত্যিক মানসে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের জের এখন পুরোদমে চলেছে। পর্যায়ক্রমে যুগদুটির আলোচনার সময় এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক কারণ-সমূহ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রেখে আলোচনা করা হবে।

গভীরতর মনোযোগের সঙ্গে পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাস্তববাদী বাংলা উপন্যাসের প্রবণতা প্রধানত বহির্মুখী। দেহ ও প্রাণের রাজ্য অতিক্রম করে এলেও এখন পর্যন্ত উপন্যাসসাহিত্যে বিচারবিশ্লেষণপ্রধান মনো-জিজ্ঞাসা ভিন্ন কোন আন্তর-আকৃতির চিহ্ন দেখা যায় না। যে মনোজিজ্ঞাসা এ যাবং কাল বিশ্বসাহিত্যের উপন্যাস-বিভাগে প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়েছে, তাকে অতিক্রম করে মানবের অন্তর্লোকে সন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণের উৎসুক প্রয়াস আধুনিক ইউরোপীয় উপন্যাসে বার বার দেখা গিয়েছে। মানুষের সাহিত্যস্রষ্টা মানসচৈতন্য এখন দেহ ও প্রাণের রাজ্যে তার অনুসন্ধান শেষ করে মানসিক বিচার ও ব্যবচ্ছেদপ্রধান আবচেতনিক বিশ্লেষণ এক রকম চুকিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই উর্ধ্বতর চেতনার আলোকে সমগ্র জীবন ও বিশ্বকে নতুনভাবে নিরীক্ষণ করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁ যখন জাঁ ক্রিস্তফ (১৯০৪-১২) ১০

খণ্ডে রচনা করেন, তখন সেই উর্ধ্বচেতনা এদেশে না হলেও পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। অবচেতনার ব্যবচ্ছেদের দ্বারা জীবনসমস্যার রূপনির্ধারণের প্রয়াস কিছুদিন দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল ; কিন্তু এদেশে তার অন্ধ ও নীরস অনুকরণ আজও অব্যাহত আছে এবং মূঢ় জনের প্রশস্তিতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পদবীতে আরূঢ় হচ্ছে। আত্মার গোপন স্বপ্নের প্রমূর্ত প্রকাশ অবচেতনায় খুঁজে পাওয়া না গেলেও জেম্‌স্ জএস্ (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর বিখ্যাত ইউলিসিস উপন্যাসে ১৯২২ সালে যে-সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বাঙালি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক তাঁদের চতুষ্কোণ প্রভৃতি উপন্যাসে তার প্রকৃত হদিশ পান নি, অথচ গোপন মনের নিচের জগতের যাবতীয় আবর্জনা অনাবশ্যকভাবে তাঁদের কথাসাহিত্যের উপকরণ হয়ে থেকেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবচেতনা-অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে অনুকৃত হলেও উর্ধ্বাভিসারের প্রয়াস আজ পর্যন্ত দু'একজন মাত্র লেখকের রচনায় দেখা গেছে। সেই অভীপ্সা আধুনিক ইউরোপীয় উপন্যাসে, বিশেষত পশ্চিম-ইউরোপের ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্যে ক্রমশ অতি-পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে। ইংরেজি-ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের লেখকসমাজ সুপরিচিত। তাঁরা লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন, ইংরেজি সাহিত্যের এই উর্ধ্বাভিযানে সহায়তা করছেন ইংরেজ বাদে আমেরিকান, আইরিশ আর ভারতীয় সাহিত্যিকবৃন্দ। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাংলা নভেলসাহিত্যে এই উর্ধ্বপ্রয়াণের চিহ্ন প্রায় অনুপস্থিত। বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনেক রচনা উন্নত সাহিত্যিক কলাজ্ঞানের পরিচয় দেয়। কিন্তু বিশ্বমনের সবচেয়ে প্রগতিশীল অভিব্যক্তির দিক থেকে বাংলা নভেল যে বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ, তার অসংশয় পরিচয় বহন করছে ১৯৩০ সালের পরবর্তী যুগের তথাকথিত বাস্তববাদী রচনাপুঞ্জ। মনের ওপারের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের সাহায্যে জাগতিক সমস্যাগুলির বিচার, সংশ্লেষণী মননশীলতায় নতুন সমাধান খোঁজার কোন আয়াস প্রায় কোথাও দেখা যায় না। গত ত্রিশ বছরে বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা কোথাও কোথাও অবচেতনার দ্বার খুলে পাতালপুরীর রহস্যময় গহ্বরে সন্ধানী রশ্মির আলোকসম্পাত করলেও উর্ধ্বচৈতন্যের তোরণ অতিক্রম করার সাধনায় দু-এক ক্ষেত্রে ছাড়া তামসিক ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন।

কেবল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার না করলে অবশ্যই গত ত্রিশ বছরের বাংলা কথাসাহিত্যে দেহ ও প্রাণধর্মী তথাকথিত লঘু ও সরস সাধারণ রচনাবলীর সঙ্গে বুদ্ধিপ্রধান রচনাও বহু পরিমাণে পাওয়া যাবে, যেগুলি মোটের উপর উপভোগ্য। কিন্তু কেবল মামুলি চিত্তরঞ্জিনী শক্তি ছাড়া স্থায়ী কোন সাহিত্যসম্পদ প্রায় কোন রচনাতেই দেখা যায় না। মননশক্তির যে-গভীরতার সঙ্গে অন্তর্লোকের স্বত-উচ্ছ্বসিত রসপ্রবাহ সংযুক্ত হলে তবে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, যা একাধিকবার পাঠে প্রাণহীন বলে প্রতীয়মান হয় না এবং যা সমকালীনতার একান্ত বশংবদ নয়, সে-গভীরতার ক্ষীণতম আভাসও পাওয়া যায় না বেশির ভাগ নভেল-লেখকের লেখায়। যে মহৎ মানসের অভিব্যক্তিতে বাংলা উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশকে ঊষাসঙ্গমে রঞ্জিত পূর্বাকাশের মতো নবীনোন্মেষরাগরক্তিম হয়ে উঠেছিল, তা যেন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে দ্রুত আবির্ভূত রাষ্ট্রনৈতিক আর অর্থনৈতিক বিপর্যয় পরম্পরার প্রভাবে বাংলা সাহিত্যেরও অপকর্ষ সাধিত হতে দেখা গেল। সমগ্রভাবে বিচার করলে বাঙালি আজ যে সাংস্কৃতিক অধোগতির সম্মুখীন হয়েছে, সেই ধ্বংসোন্মুখ অপগতির প্রভাব পড়েছে তার সাহিত্যের উপর। মুসলিম শাসনের অবসানে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে এই বাংলাদেশেই একদা যে পতনোন্মুখ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, এখন ইংরেজ রাজত্বের অবসানে ভারত সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সূচনায় খণ্ডিত বাংলায় তার পুনরাবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সন্ধিপর্বে ১৭৬০—১৮৫৮ সালে যেমন রাশি রাশি কবিগান, পাঁচালি ও টপ্পাজাতীয় গীতিকা লেখা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি অন্তঃসারশূন্যতার জন্যে পরবর্তী যুগে শিক্ষিত সাধারণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হয়েছিল, তেমনি সাম্প্রতিক কালেও বাংলা সাহিত্যে অজস্র গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখা হচ্ছে যে গুলির শূন্যগর্ভতা সমধিক পরিস্ফুট। দূর কালে জন-

সমাদরলাভের গৌরব তো দূরের কথা, নিতান্ত বর্তমানেও এই সব রচনা প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পরমুহূর্তে মহা-বিস্মৃতির অতলস্পর্শী অন্ধকূলে চিরতরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এই অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, বাঙালির মন আজ বিশ্বমনের অভিব্যক্তির মূল ভাবটি উপলব্ধি করতে পারছে না। বিশ্বের মনোভূমিতে যেখানে আগাছার ফসল ফলেছে সবচেয়ে বেশি, সেই রাজনীতির মহা-অরণ্যে বাঙালি আজ পথহারা। বাঙালি কথা-সাহিত্যিক সেখানে এসে সাহিত্যিকের স্বধর্ম প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। অথচ যেখানে বিশ্বমন ঊর্ধ্বাশী হয়ে মহত্তর সার্থকতার নক্ষত্রলোকে আরোহণের আশায় তার বহুদিনের স্বপ্নকুসুমগুলি একে একে চয়ন করে সযত্নে নবীন অর্ঘ্য রচনা করছে বিশ্বদেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদানের সঙ্কল্প নিয়ে, সেই সমৃদ্ধ মানসের স্বপ্নরঙিণ কাননভূমিতে পুষ্প-চয়নব্রতী কোন বাঙালি সাহিত্যিককেই আজ দেখা যায় না বললেই হয়।

সাহিত্য যেখানে দলীয় মতবাদ প্রচারে রত, সাহিত্যে যেখানে এক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচেতনার প্রকাশ, সেখানে আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও গল্প বিশ্বসাহিত্যের অনুগামী। কিন্তু যেখানে সাহিত্যে মনের ঊর্ধ্বতর স্তরের চেতনার দ্বারা জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান করার প্রয়াস দেখা যায়, সেখানে বাঙালি কথাসাহিত্যিক পশ্চাৎপদ।

সাধারণ মানুষের মনের কাজ হচ্ছে যে কোন জিনিসকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা, অংশকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা। মহতী বুদ্ধি বা বোধির কাজ, বস্তুকে সমগ্ররূপে দেখা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ মিলিয়ে নেওয়া। আধুনিক বাঙালি লেখকের রচনায় এই বোধি বা সমগ্র দৃষ্টির একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথের লেখা সম-সাময়িক জীবনসমস্যাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এখনকার মনস্বীদের লেখা প্রবন্ধগুলির আলোচনা আর তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ বা কালান্তর প্রবন্ধ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি পড়লে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ভারত-বাসীর দুঃখদারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময় মুক্ত দৃষ্টিতে সমস্যাগুলি দেখে বিস্তীর্ণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকার উপর স্থাপিত করে সেগুলির সমাধান অনুসন্ধান করেছেন। তিনি অবিক্ষুব্ধ প্রশান্তি ও ধীরতার সঙ্গে সর্বত্র সমস্যাসমূহের সবদিক আলোচনা করে একটি সর্বজনহিতকর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানের প্রবন্ধ-লেখকেরা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করায় সময় সেই অটল মানস স্থৈর্য এবং চিত্তপ্রসার একেবারেই দেখাতে পারেন না। আর সেই কারণেই প্রধানত সমস্যাবিজড়িত সাহিত্য সৃষ্টি করেও এ যুগের ঔপন্যাসিক বা গল্পকার কোন স্পষ্ট বা বলিষ্ঠ সমাধান দিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং অপেক্ষাকৃত বেশি-আধুনিক শরৎচন্দ্রের মধ্যেও একালের মতো দ্বিধা ও সংশয় ছিল না। এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংশয় ও অস্থিরমতিত্ব নিয়ে কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়।

তার চেয়েও আশঙ্কার কথা এই যে, বাজারে যাঁরা খ্যাতিমান্ কথাসাহিত্যিক, তাঁদের কেউ কেউ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে সাহিত্যব্যবসায়ে বেশি মনোযোগী; ভালো সাহিত্য সৃষ্টি না হলে তাঁদের কিছু আসে যায় না। এক একটি শক্তিশালী অথচ ছোট গোষ্ঠীর দ্বারা তাঁরা নিজেদের মহিমা রটনা করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থায় মনোযোগী। দুঃখের বিষয়, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার মতো কয়েকটি সুলভ কৌশল এঁদের করায়ত্ত বলে সে-উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে তাঁরা সফলকামও হয়েছেন। তার উপর রাজনৈতিক দলগুলির পরিপোষণলব্ধ আনুকূল্যে স্ফীত কোন কোন কথাসাহিত্যিক ও কবি স্থায়ী সাহিত্যিক-খ্যাতির মরীচিকা নির্মাণ করতে পেরেছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো লেখকদের নিয়ে সাময়িক মাতামাতির অন্য কোন অর্থ হয় না।

বাংলা সাহিত্য এবং বিশেষভাবে কথাসাহিত্য এখন কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট গতিচক্রের মধ্যে বারবার আবর্তিত হচ্ছে। লেখকদের রচনায় আগে থেকে ঠিক করা পথ বেয়ে গতানুগতিক বিষয় নিয়ে বৈচিত্র্যহীন ভঙ্গিতে রস-সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস সব ক্ষেত্রে দেখা যায়। একজনের লেখা অভিনব কোন রচনার অনুকরণে অনেকগুলি বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি মঙ্গলকাব্য আর রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালি রচনার সময় থেকে বাঙালি লেখকের স্বভাব। তার পরিবর্তন আজও হয় নি।

আমাদের কিছুদিন অন্তর্মুখী হয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে আত্মানুসন্ধান প্রয়োজন। তা না হলে আমরা হারিয়ে-ফেলা অন্তঃপ্রেরণার উৎসবারি খুঁজে পাবো না। অন্য-মনস্ক বহির্মুখ প্রাণাবেগ আর মনোবিক্ষোভের মরুবালুকায় আমাদের অন্তর্জ্ঞানের স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিনী হয়ত চির-দিনের মতো শুকিয়ে যাবে।

এই আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে। যখন বাঙালি জাতিগতভাবে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে উদ্বাস্তু এবং চমৎকারা [illegible]চিন্তায় [illegible]। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অপমৃত্যুর সম্মুখীন, তখন রাষ্ট্রচেতনাপ্রধান যুগে রাষ্ট্র-[illegible] স্বকীয়তা লুপ্ত হলে সাংস্কৃতিক লুপ্তিও অবশ্যম্ভাবী [illegible] স্বাধীন রাষ্ট্রসাধনা নতুন করে স্বরু হওয়া দরকার। কিন্তু এ-ব্যাপারে বাঙালি কথাসাহিত্যিকের কোন দায়িত্ববোধ বা সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের যে রাষ্ট্রবোধ ছিল বা স্বজাতিপ্রেমের প্রবল মানসিকতা দেখা গিয়েছিল তাঁর উপন্যাসের রসভঙ্গ না ঘটিয়েই, এখনকার একজন লেখকের রচনাতেও তার অনুরূপ কিছু দেখা যায় না।

প্রাণশক্তির অভাবও বিশেষভাবে চোখে পড়ে যখন দেখি, সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনায় সমস্যাতাড়িত হয়ে স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে চলেছেন। সমস্যাগুলির দুর্জয় রূপ তাঁদের বিহ্বল করে ফেলছে ; তাঁরা বুঝতে পারছেন, সেগুলি ভয়ানক, বিপর্যয়কর ; কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় তাঁদের চোখে পড়ছে না। কেন যে সমস্যার উদ্ভব, তাঁরা তা দেখবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু অনুজ্জ্বল মননের আলোয় তাঁরা সামনের বিশাল প্রান্তরের সামান্য একাংশ বাদে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। যে অন্ত-র্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যাদের উদ্ভবস্থল চোখে পড়ে, তার সাধনা আমরা পরিত্যাগ করেছি। অনুশীলনের অভাবে আমাদের মানসনেত্র ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে পড়েছে। মার্ক্সীয় দর্শন ও সাহিত্যবোধের প্রয়োগে এই অবস্থা ক্রমশ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছে। মার্ক্স যত বড় অর্থনীতিবিদ্‌ই হন না কেন, তিনি সাহিত্যরসবোধ পরিশূন্য বর্বর এবং শিশুর মতো অজ্ঞ ও নির্বোধ দার্শনিক ছিলেন। অথচ এক শ্রেণীর বাঙালি কথাসাহিত্যিক মার্ক্সীয় জীবনদর্শন ও সাহিত্য-বোধের কাছে দিশা খুঁজে পেতে চান। কিন্তু যেমন গান্ধিবাদ, তেমনি মার্ক্সবাদের দ্বারা বাঙালির জীবন ও সাহিত্যের কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

সমসাময়িক জীবনের সমস্যা নিয়ে লিখবার প্রবণতা আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের সময় থেকে। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাল-হারবারে আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাপান বিদ্যুৎগতি আক্রমণ চালিয়ে ব্রহ্মদেশের নানা জায়গায় বোমাবর্ষণে সমর্থ হয়। ১৪ই ডিসেম্বর জাপান ভিক্টোরিআ পত্তনে আসবার পর কলিকাতায় বোমাবর্ষণের প্রবল সম্ভাবনা দেখা যায়। আকাশ পথে ঐ জাপানি ঘাঁটি মাত্র এক হাজার মাইল দূরে ছিল। বাংলা ও আসামকে বিপদ্‌গ্রস্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। এই সময় থেকে বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য সূচিত হয়। সেই দুর্ভাগ্য ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে। ঐ যুগান্তরের সময় বাংলাদেশে যদি শরৎচন্দ্র বসু আর ফজলুল হকের প্রস্তাবিত মন্ত্রণা-পরিষৎ গঠিত হতে পারত এবং সেই মন্ত্রীমণ্ডলী কয়েক বছর কাজ করার সুযোগ পেত, তাহলে বাঙালি জাতির ভাগ্য ভিন্নপথে পরিচালিত হত। কিন্তু তা না হয়ে ক্রমে ক্রমে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কবলে বাংলাদেশকে নিক্ষিপ্ত করা হল। মুসলিম লিগ আর কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচারকার্য সরকারি আনুকূল্যে কয়েক বছর অবাধে চলতে পেল। বাঙালি কথাসাহিত্যি-কেরা রুশ বিপ্লবের পর থেকেই প্রাক্‌সোভিএট রুশ-সাহিত্যিকবৃন্দের প্রেরণায় সমসাময়িক যুগের সমস্যাবলী নিয়ে রচনার প্রয়াস করে আসছিলেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট দল সরকারি বিধিনিষেধের প্রকোপ থেকে মুক্তিলাভের পর তাঁরা বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের প্রভাবে অভিভূত হলেন। এই সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব পুরো মাত্রায় এসে পড়ে। কংগ্রেস-সাহিত্যসঙ্ঘ প্রভৃতি রাজনীতিভিত্তিক সাহিত্যসংস্থা ক্রমশ গড়ে উঠল এবং দক্ষিণ ও বাম, উভয়পন্থীদের সংগ্রামে সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য দূরে সরে গেল।

কথাসাহিত্যিকেরা প্রথমত বোমার আতঙ্কে কলিকাতা থেকে পলাতক পল্লী অঞ্চলে উপস্থিত কুখ্যাত সহুরে বাবুদের নিয়ে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন ; তার পরে যুগজীবন সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সাহিত্যে অতি দ্রুত অভিব্যক্ত হল।

মহাযুদ্ধের ফলে দেশের সামাজিক আর অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন দেখা গেল, তার রূপ ফুটে উঠ্‌ল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মন্বন্তর" উপন্যাসে, "মহামন্বন্তর" গল্প-সংগ্রহে, গোপাল হালদারের মহাকায় উপন্যাস "পঞ্চাশের পথ" প্রভৃতিতে। দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসঙ্কট, মহামারী, কালোবাজার, নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষের অভাব, ওষুধের ভেজাল, রকমারী দুর্নীতি, অশ্লীলতম যৌনবিকার প্রভৃতির চিত্র গত কয়েক বছরের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে ১৯৪৫ সালের বাংলা কথাসাহিত্যে। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের জয়গান করে কিছু লেখা হয়েছে। যথোচিত পরিমাণে দাঙ্গাহাঙ্গামার বীভৎস চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যা, কংগ্রেসের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অপূর্ণতায় ক্ষোভ, ব্যক্তিস্বাধীনতার খর্বতায় অসন্তোষ, উৎকট যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি নিয়ে কাহিনী রচনায় যুগবাণীর সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। সে-সব কাহিনীর সার মর্ম এই যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। এই সমাজের অধোগতির চিত্র অঙ্কনে সহজবোধ্য কারণে মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সাহিত্যিকদের উৎকট উল্লাস দেখা গেছে। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক সমাজের কোন উদ্দীপনাপূর্ণ জীবনচিত্র এ পর্যন্ত কোন বাঙালি কমিউনিস্ট সাহিত্যিকের লেখনীতে গড়ে ওঠে নি!

এই শ্রেণীর রচনা প্রথম প্রকাশকালে যত সমাদর লাভ করুক না কেন, এদের আয়ু অতি অল্প দিনের; এরা রসের উৎকর্ষে মনোহরণ করে না। এরা মন কাড়ে অতি-ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার খোরাক দিয়ে এবং তারও আবেদন স্থূল অনুভূতিসম্পন্ন সংস্কৃতিবিহীন লোকদের কাছে। এই শ্রেণীর গল্পেরও প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু সে-প্রয়োজন ততটা সাহিত্যিক নয়, যতটা রাজনৈতিক বা সামাজিক। সাহিত্যে যদি কেবল এই শ্রেণীর রচনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে স্থায়ী রসের উপকরণ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। যদি কারো এই ধারণা থাকে যে, এই শ্রেণীর সাহিত্যিক-প্রয়াস রসাত্মক হয়েছে, তাহলে তিনি ভ্রান্ত। এই জাতের লেখার পেছনে কোনও সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা নেই, কেবল গাত্রদাহের বশেই এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য নানা দিক থেকে এদের বক্তব্য যাই হোক, সাহিত্যিক দিক থেকে তা বিষবৎ বর্জনীয়। ব্যক্তিগত চেতনার গণ্ডি যতটা অতিক্রম না করলে রসস্রষ্টার নৈর্ব্যক্তিক চেতনা-সঞ্জাত রসাবেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, এই সব রচনার লেখক লেখার সময় ব্যক্তিগত আবেষ্টনের প্রভাব ততটা অতিক্রম করতে পারেন নি।

সমসাময়িক যুগের কথাসাহিত্যে প্রকাশ করা অনুচিত, এমন কথা অবশ্যই ওঠে না। কিন্তু সমসাময়িক যুগেব কথা সাহিত্যে গৌণ স্থান লাভ কর[illegible] এবং তার মধ্যে [illegible] পড়লে চলবেনা। সাহিত্যে কে[illegible] ক্ষণসত্য প্রাধান্য লাভ কর[illegible] রসসৃষ্টি অসম্ভব। যুগবদ্ধতা সাহিত্যে অমার্জনীয় অ[illegible]

একটা ব্যাপার কথাসাহিত্যিকদের উ[illegible] হবে: যদি দেহ-প্রাণ-মনের অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে হয়, তবে কেবল নিস্তেজ প্রাণশক্তি আর মলিন বুদ্ধির প্রয়োগ যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রচুর প্রাণশক্তি ও প্রবুদ্ধ চেতনা অর্জন করতে হবে। সুবিধাবাদী বৈশ্যবুদ্ধিকে প্রকৃত ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা মনে করা ভুল হবে। আধুনিক সাহিত্যে ভারতীয় আত্মচৈতন্যের প্রসারের পরিবর্তে দিন দিন দেখা দিচ্ছে—বৈশ্যবুদ্ধিসম্পন্ন স্বার্থপর কাপুরুষের মনোভাব। মার্ক্‌সবাদী জড়বাদও আমাদের উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন জীবনচেতনা থেকে দূরে এক নৈরাশ্যময় শ্রেণীবদ্ধতার অন্ধকূপে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। আমাদের রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের মতবাদ অনুসারে জীবনপথে এবং বঙ্কিম-রমেশ-রবীন্দ্র-প্রভাত-শরৎ-বিভূতিভূষণের প্রদর্শিত সাহিত্যপথে নবীন সাধনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। জীবনে যদি প্রকৃত বাস্তবচেতনা আনতে হয়, তবে তা স্থূল বস্তুভিত্তিক হলে চলবে না, জড়বস্তুই একমাত্র সত্য নয়, তার পরিবর্তে আমাদের অধ্যাত্মবস্তু ও তার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। জীবনে আধ্যাত্মিক বাস্তব-বোধ না এলে সাহিত্যে প্রকৃত রসপ্রাণ বাস্তবচেতনা সঞ্চারিত হতে পারে না। জড়বস্তুর উপাসনায় স্বার্থ-সিদ্ধি হলেও প্রকৃত ও বিশুদ্ধ রসসিদ্ধি অসম্ভব; কারণ, প্রকৃত সাহিত্যরস ভগ্নাবরণ চিৎস্বরূপেরই কাব্যময় অভিব্যক্তি। আধ্যাত্মিক চেতনাদীপ্ত বাস্তববোধই বস্তুর রসস্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সমর্থ।

যে দু-একজন আধুনিক কথাসাহিত্যিক ঐ আত্মানন্দময় রসস্বরূপের সন্ধান পেয়ে সাহিত্যে তার বিকাশ সম্ভব করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা প্রস্তাবিত দ্বিতীয় যুগের আলোচনার সময় করা হবে। অন্য যাঁরা পরশ পাথরের সন্ধান না পেলেও একাগ্র নিষ্ঠায় তার খোঁজ করছেন, তাঁদের শক্তিমত্তা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করা হবে। কিন্তু কোন দলীয় সাধুবাদের লোভে উর্দ্ধবাহু হয়ে তাঁদের প্রশস্তিকীর্তন করা সঙ্গত হবে না। বাঙালি কথাসাহিত্যিককে সাময়িক সুখস্বার্থের প্রলোভন উপেক্ষা করে দৃঢ়পদে এগোতে হবে মহত্তর সাহিত্যচেতনার বিকাশ-অভিমুখে। কবির অভয়বাণী আমাদের সাথী :—

শৈল তাহার দুর্গম
কালোয় আলোক মুখ ঝাঁপে :
তবু, সবি নয় ছায়া-ভ্রম
অপরি-বাঁশরী প্রাণে কাঁপে।

—দিলীপকুমার

বাংলা উপন্যাসের নভেল শাখায় বর্ণনীয় বিষয়ের বস্তুরূপ চমৎকারভাবে বর্ণিত হলেও রসরূপ একেবারে অবিকশিত; তার কারণ, বাস্তববাদী সাহিত্যিকেরা বস্তুর অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন নি, খালি বাহ্য রূপটাকেই একান্তভাবে জেনেছেন। আত্মচৈতন্যের দিব্য-দৃষ্টিতে তাঁরা গভীরতর বাস্তববোধের অধিকারী হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য লেখকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের লেখকদের উপলব্ধি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বমডিলা

সুভাষ চক্রবর্তী

(একাঙ্কিকা)

[বমডিলা শত্রু-কবলিত। স্থানীয় অধিবাসীরা—যারা পেরেছে পালিয়েছে। যারা পারেনি, সর্বদা ভয়ে সশঙ্কিত। দোকান-পাট বন্ধ। হাট-বাজারও নেই। অসম্ভব খাদ্যাভাব—চীনা দস্যুরা যা কিছু খাদ্য সব লুটে নিচ্ছে। এমনি এক সন্ধ্যায় একটি সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে স্তিমিত আলো জ্বলতে দেখা গেল। ঘরে, প্রায়-বৃদ্ধ একজন পুরুষ—চেয়ারে বসে। তার স্ত্রী চা তৈরী করবার চেষ্টা করছে। আর তাদের তরুণী কন্যা চুপচাপ বসে একটি বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। তাকে দেখে বোঝা যায়—বই পড়াতে তার মন নেই। কোন মানসিক অস্থিরতা দমন করবার জন্যেই যেন সে বইয়ের পাতা উলটিয়ে যাচ্ছে। ঘরে অসম্ভব নিস্তব্ধতা।]

মা। (চায়ের পেয়ালা স্বামীর হাতে দিয়ে) নাও। দুধ-চিনি নেই। কড়া চা।

বাবা। (চায়ের পেয়ালার দিকে একবার তাকিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) আর কতদিন এভাবে চলবে,—হা ভগবান!

মা। (পেয়ালা হাতে কন্যার নিকটে গিয়ে) তানকা, নে ধর। এটুকু খেয়ে নে। তিনদিন ধরে তো একরকম খাওয়াই নেই। আজ এই চা-টুকু ছাড়া আর কিছুই নেই।

তান্‌কা। মা, একবার আমি বের হব—অনুমতি দাও। এভাবে অনাহারে পিঞ্জরাবদ্ধ ইঁদুরের মত তোমাদের মরতে দেব না।

মা। না-না-না। মরব, তবুও তোকে ঘরের বাইরে যেতে দেব না। চারদিকে শত্রু।

তান্‌কা। কিন্তু ঘরে বসে থেকেও কি বিপদ এড়াতে পারবে মা? তা ছাড়া, আমার চোখের সামনে তোমরা না খেয়ে মরবে—আমি তা নিশ্চেষ্ট হয়ে দেখতে পারব না।

বাবা। তান্‌কা—বাইরে গিয়ে তুমি তো কোন

উপায় করতে পারবে না। তুমি বাইরে গেলে, আমাদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়বে।

তান্‌কা। কিন্তু এভাবে না-খেয়ে, ক'দিন আমরা বাঁচব বাবা!

বাবা। না, এভাবে চলবেনা—তা ঠিক। আমি বের হব। আর এখনি যাব। রাতের অন্ধকারে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি, কিছু যোগাড় করতে পারি কি না! (স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) খচরো টাকা যা পার আমাকে দাও।

মা। কোথায় যাবে তুমি? দোকান-হাট তো সব বন্ধ।

বাবা। যাব দোকানদারের বাড়ী। হয়ত সেখানে কিছু তাদের নিজেদের জন্যেও আছে।

তান্‌কা। বাবা, এই অন্ধকারে তুমি নাই বা বের হলে। আমি পুরুষ সেজে বের হব।

বাবা। তাতেও বিপদ আছে তান্‌কা। কোন সমর্থ যুবককে দেখতে পেলে তারা খুন করছে।

তান্‌কা। শুনছি কাউকেই তো রেহাই দিচ্ছে না। আমাদের বাড়ীতে কবে যে হানা দেয় কে জানে! দাদা সীমান্তে গিয়ে দস্যুদের সঙ্গে লড়ছে।- আর আমি দস্যু ভয়ে তোমাদের না খাইয়ে মরতে দেব—ভেবেছ? কোন চিন্তা করো না বাবা—আমি ঠিক ফিরে আসব। দাদার ট্রাউজার আর সার্ট পরে আমি বেরুচ্ছি।

(ভেতরের দিকে চলে গেল তান্‌কা)

মা। আমি ওকে বাধা দিতে পারছি না—ও যাবেই। আর তা ছাড়া, খাবার আনতে না পারলেও তো—ওকেও না-খেয়ে মরতে হবে।

বাবা। (দাঁতে দাঁত চেপে) যদি একটা রাইফেল পেতাম—

তান্‌কা। (পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে ঘরে এসে বলল) মা, টাকা দাও,—যা পারো।

মা। তুই সত্যিই যাবি তান্‌কা?

তান্‌কা। ভয় করো না মা। যাও টাকা নিয়ে এস।

(মা ভেতরে চলে গেল।)

বাবা। তান্‌কা!

তান্‌কা। কিন্তু ভেব না বাবা। আমি ঠিক ফিরে আসব।

(মায়ের মঞ্চে প্রবেশ)

মা। এই নে যা সামান্য টাকা ছিল, সবই দিলাম।

(ছোট্ট একটি টাকার থলি তানকার হাতে দিল।)

তান্‌কা। দাও। আমি চল্লাম।

মা। সাবধানে যাস্ মা।

তানকা। আচ্ছা।

(তান্‌কা টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল)

বাবা। হা ঈশ্বর! (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

মা। আমি আগেই বলেছিলাম—চীনারা এগিয়ে আসছে,—চল আমরা বমডিলা ছেড়ে যাই। সে কথা তোমার মেয়ে শুনল না। তুমিও তার সঙ্গে যোগ দিলে। তপচু গৌহাটিতে নিরাপদে ছিল। কিন্তু কি পাগল ছেলে—ছুটে এল এখানে। ভাবলাম, আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু ভুল আমার ভাঙ্গল—সে কলেজের চাকরি ছেড়ে যুদ্ধে যাচ্ছে। দেখা করতে এসেছে। তুমি তাকে বাধা দিলে না।

বাবা। কি করে বাধা দেব? ওরা যে স্বাধীন ভারতের নাগরিক। তপচু বলল,—চীনারা ভারত আক্রমণ করেছে। তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যুত্তর দেব তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। আমার অনুমতি চাইল। আমি 'না' করতে পারলাম না।

মা। আমার সারা জীবনের গর্ব,—ছেলেমেয়েকে মানুষ করে তুলেছি। তপচু প্রফেসারী পেয়েছে। তান্‌কাও উচ্চশিক্ষা পেয়েছে,—এবার বীরাঙের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। সুখে থাকবে তারা। বীরাঙ কত ভাল ছেলে। কিন্তু কি হল?

বাবা। দুঃখ করো না। তোমার গর্ব তো ক্ষুণ্ণ হয়নি। অধ্যাপক তপচু—আজ স্বাধীন ভারতের বীর সৈনিক। তার শিক্ষার অপমান তো সে করেনি। তোমার ভাবী জামাতা বীরাঙ—সেও যুদ্ধে গেছে। এমন সব বীর ছেলে ভারতমাতার,—মায়ের অপমান তারা সইবে কেন? আমার শুধু দুঃখ, আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। চীনারা সেই সুযোগে আক্রমণ করে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। যদি একটা রাইফেল পেতাম্—

মা। তুমি রাইফেল নিয়ে কি করবে? যুদ্ধে যাবে?

বাবা। এখন তো যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন নেই। হানাদাররা বীভৎস উল্লাসে মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করছে—, খাদ্য লুঠে নিচ্ছে,—যে ক'টাকে পারতাম—শেষ করতাম।

(এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তান্‌কা এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে দু'খানা পাউরুটি।)

তানকা। নাও মা।

(ধপ করে সে চেয়ারে বসে পড়ল।)

মা। (এগিয়ে এল তার কাছে) অত হাঁপাচ্ছিস কেন?

তান্‌কা। দোকানদারের বাড়ীতেও চাল নেই। সব লুঠে নিয়ে গেছে চীনারা। দোকানদারের স্ত্রী নিজেদের জন্যে সামান্য ক'খানা রুটি যোগাড় করেছিল। তাই থেকে দু'খানা আমাকে দিল। দাম নেয়নি। আসবার সময় দু' ব্যাটা চীনে দূর থেকে দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়েছিল। অন্ধকারে নিশানা ঠিক করতে পারেনি। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, তাই বেঁচে গেছি। হয়ত তারা পিছু নিয়েছে। খুঁজছে আমাকে।

মা। তাড়াতাড়ি ওঘরে গিয়ে পুরুষের বেশ ছেড়ে ফেল। এখানে এলেও তোকে চিনতে পারবে না।

(তান্‌কা পাশের ঘরে গেল)

মা। একখানা পাউরুটি আজ রাত্রে আমরা ভাগ করে খাব। একখানা থাক।

বাবা। সামান্য দু'খানা রুটি—তাও আজ আমাদের কাছে মহামূল্য। অথচ ক'দিন আগেও—

মা। তান্‌কা আসছে—ওর সামনে ওসব আর বলনা। আমার যে কি হচ্ছে বুকের ভেতরটা, আমি কাকে বলব? একটি মাত্র ছেলে,—যুদ্ধে গেছে। আর আমার তান্‌কা—না-খেয়ে মরণের পথে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি!—ভগবান, আমার মৃত্যু দাও—আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

(ক্রন্দনের আবেগে গলা বুঁজে এল। তাড়াতাড়ি রুটি কাটতে লাগল ছুরি দিয়ে। তানকা সে সময়ে ঘরে ঢুকে দেখল, মা রুটি কাটছে, কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়ছে।)

তান্‌কা। একি, মা—তুমি কাঁদছ?

মা। না, না, কাঁদব কেন। এই তো চোখ মুছছি। তুই পোষাক বদলিয়ে এসেছিস,—বস। রুটি কেটেছি—তুই ক' স্লাইজ নে।—খা।

(দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ)

তান্‌কা। (চাপাস্বরে) বাবা, ওই বুঝি এসেছে।

(আবার দরজায় ঠক ঠক শব্দ)

মা। (চাপা স্বরে) ওরা কি জোর করে ঢুকে না কি?

বাবা। আমি দেখছি।

(উঠে দেখতে গেল বাইরে)

(একটু পরে সঙ্গে দু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিয়ে ঘরে ঢুকল বাবা।)

বাবা। আপনারা বসুন।

(সোফায় বসল সন্ন্যাসীরা)

ইনি আমার স্ত্রী, আর ও মেয়ে। তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

১ম সন্ন্যাসী। আমরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পথ হারিয়েছি ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। আপনার ঘরে আলো জলতে দেখে, এখানে এলাম।

বাবা। কোথায় যাবেন আপনারা?

১ম সন্ন্যাসী। মুন্না মঠে যাব।

তান্‌কা। (স্বগতঃ) মুন্নায় তো কোন মঠ নেই এরা কি সত্যিই সন্ন্যাসী।

২য় সন্ন্যাসী। আমরা তোমাদের অতিথি।

মা। কিন্তু অতিথি সৎকার করবার মত কিছুই যে আজ আমাদের নেই। আজ তিনদিন পরে সামান্য একটু রুটি যোগাড় করতে পেরেছি—আমার স্বামী-কন্যা আজ তিন দিন উপবাসী।

২য় সন্ন্যাসী। তোমার সামনে রয়েছে রুটি—আর বলছ কিছু নেই। আশ্চর্য তোমাদের আতিথেয়তা!

তান্‌কা। (স্বগতঃ) আমরা উপবাসী জেনেও সামান্য খাদ্যটুকুই দাবী করছে। আশ্চর্য! কে এরা?

বাবা। তান্‌কা, আমরা ভারতবাসী। নিজেরা উপবাসী থেকেও অতিথি সৎকার করা আমাদের ধর্ম আমাদের কষ্ট হবে ভেবে, তোমার মা ইতস্ততঃ করছেন।

তান্‌কা। বেশ বাবা, আমিই রুটি দু'খানা এঁদের দিচ্ছি।

(তানকা উঠে গিয়ে সব রুটি সন্ন্যাসী দু'জনকে পরিবেশন করল।)

১ম সন্ন্যাসী। শুধু রুটি দিলে তো চলবে না। বড় ঠাণ্ডা,—গরম চা চাই।

তান্‌কা। চা নেই আমাদের ঘরে।

২য় সন্ন্যাসী। (হাঃ হাঃ হাস্য) কিছুই যে তোমাদের নেই। ঠিক আছে,—সব পাবে! মুক্তি ফৌজ এসে গেছে,—তোমাদের কোন দুঃখ তারা রাখবে না।

তানকা। মুক্তি ফৌজ!

২য় সন্ন্যাসী। হ্যাঁ,—চাইনিজ লিবারেশন্ আর্মি।

তানকা। আজ আমাদের এ দুর্দশা কেন, জান? চীনা-দস্যুদের লুণ্ঠনে—আজ এক কণা খাদ্যও আমাদের নেই।

২য় সন্ন্যাসী। ভুল বলছ। চীনারা লুণ্ঠন করে না। তারা অন্যায় করে না। তবে খাদ্য তাদের যোগানো তোমাদের কর্তব্য।

তানকা। কেন আমরা তাদের খাদ্য যোগাবো?

২য় সন্ন্যাসী। তারা তোমাদের মুক্তি দেবে।

তানকা। হ্যাঁ, অনাহারে—রেখে একবারেই মুক্তি পাচ্ছি আমরা। আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আমার চোখের সামনে না-খেয়ে মরছে,—আর যারা এর জন্যে দায়ী,—তাদের বলছ—মুক্তি ফৌজ? তারা দস্যু, বিশ্বাসঘাতক।

২য় সন্ন্যাসী। যারা বৃদ্ধ—তারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ। তারা মরলে ক্ষতি কি? যারা সক্ষম,—তাদেরই বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

তানকা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতই তোমার কথা বটে! কে তোমরা? আমার সন্দেহ হয়েছে বহুক্ষণ আগেই,—তোমরা সন্ন্যাসী নও।

২য় সন্ন্যাসী। ঠিকই ধরেছ সুন্দরী—সন্ন্যাসী আমরা নই। এ আমাদের ছদ্মবেশ। আমরা দুজনে চাইনীজ জেনারেল। তেজপুরের পথে এগিয়ে ক্যাম্প করবার জন্যে গিয়েছিলাম। ফিরে যাচ্ছি মুন্না ক্যাম্পে। তবে পথ আমরা হারিয়েছি ঠিকই।

বাবা। আপনারা তবে সন্ন্যাসী নন। তবে কেন সন্ন্যাসীদের ছদ্মবেশ?

২য় সন্ন্যাসী। চারিদিকে শত্রুর অভাব নেই, তাই এই ছদ্মবেশের সাবধানতা।

তানকা। তোমরা শঠ, প্রবঞ্চক। ভারত তোমাদের বন্ধু ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল। সেই বন্ধুর বুকে অতর্কিতে ছুরিকাঘাত করেছ—তোমরা বিশ্বাসঘাতক।

২য় সন্ন্যাসী। তুমি ভুল বলছ, সুন্দরী। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি শিক্ষিতা। তোমার তো এমন ভুল করা উচিৎ নয়। চীন কত বড় জাতি—কি তার ঐতিহ্য—এসব তো জগৎসুদ্ধ লোকে জানে? ভারতও জানে। হিন্দী-চিনি ভাই ভাই। চীনারা অন্যায় করেনা। ভারত সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—। ভারতের বন্ধু চীন, ভারতকে এ ভুল করতে দিতে পারে না। আমরা শান্তির প্রস্তাব দিয়েছি। ভারতের উচিৎ তা মেনে নেওয়া।

তানকা। চমৎকার। বন্ধুর বুকে বসে ছুরিকাঘাত করে, মুখে আওড়াচ্ছে শান্তির বুলি। প্রতি পদক্ষেপে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলছ তোমরা। তোমরা ঘৃণ্য; বিশ্বাসঘাতক দস্যু ছাড়া আর কোন পরিচয় তোমাদের নেই। বিপন্ন গৃহস্থের ঘরে ঢুকে, তাদের ওপর জুলুম করতেও তোমাদের লজ্জা হয় না—এতই নির্লজ্জ তোমরা।

১ম সন্ন্যাসী। (রুটিতে কামড় দিতে দিতে) তুমি অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু বুদ্ধিমতী নও। তাই চীনকে বন্ধু বলে ভাবতে পারছ না।

তানকা। না পারছি না। এবার দয়া করে তোমরা যাও'।

১ম সন্ন্যাসী। হ্যাঁ যাব। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হল, বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আবার আসব। তুমি চল, আমাদের পথটা একটু দেখিয়ে দিয়ে আসবে।

বাবা। আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, চল।

১ম সন্ন্যাসী। তুমি বৃদ্ধ, এই শীতের মধ্যে তোমাকে কষ্ট দেব, এত নিষ্ঠুর আমরা নই। তুমি বসে আরাম কর। তুমি চল সুন্দরী (তানকার বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করল।)

তানকা। (জোরে ১ম সন্ন্যাসীর গালে চড় মেরে বলল) ইতর কোথাকার! আমার অঙ্গ স্পর্শ করছ—এত স্পর্ধা!

১ম সন্ন্যাসী। তোমার হাত ধরেছি তাতেই এত? আমি তো দেখছি, স্পর্ধা তোমার যে আমাকে আঘাত

করেছ। পার নিজেকে রক্ষা কর, জোর করেই তোমাকে নিয়ে যাব।

(বলেই তানকাকে পাজা কোলা করে তুলে নিল। হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল তান্‌কা।)

তানকা। আমাকে ছেড়ে দাও দস্যু। (হাত-পা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।)

বাবা। (তানকাকে রক্ষা করতে ছুটে আসছিল তার বাবা) আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও দস্যু।

[মাঝ পথে তাকে বাধা দিল ২য় সন্ন্যাসী। সজোরে তার মাথায় রিভলভারের বাট দিয়ে আঘাত করল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তানকার বাবা। তানকাকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল ১ম সন্ন্যাসী। সমস্ত ঘটনাটা চক্ষের পলকে ঘটে গেল।]

২য় সন্ন্যাসী। (ভয়-বিবর্ণ তানকার মায়ের দিকে তাকিয়ে) খবরদার। এক পাও এগোবে না।

(রিভলভারের নল তার দিকে উদ্যত করল)

আমরা তোমাদের বন্ধু। বন্ধুর মত আচরণ কর, খাদ্য পাবে,—অর্থ পাবে। যদি বাধা দাও,—মরবে। আমাদের কোন দোষ নেই।

(দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ল তানকার মা। জ্ঞান হারিয়ে তানকার বাবা মাটিতে পড়ে আছে। ২য় সন্ন্যাসী নির্লিপ্তমুখে বসে পড়ে দৃশ্যটা উপভোগ করে হাসতে লাগল।)

[কিছুক্ষণ পরে ১ম সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকল। তার মুখে আঁচড়ের দাগ। রক্ত ঝরছে। তানকা নিজেকে রক্ষা করতে তাকে সবশক্তি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেছে।]

২য় সন্ন্যাসী। এ কি, মুখে তোমার রক্তের দাগ।

১ম সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, শয়তানীটা আঁচড়িয়ে দিয়েছে। আমিও ছাড়িনি।

(হাঃ হাঃ করে বীভৎস উল্লাসে হেসে উঠল সে।)

ওহে বুড়ী, ওঘরে তোমার শয়তানী মেয়েটা শুয়ে আছে। আমাকে আঘাত না করলে, বাধা না দিলে, তাকে কষ্ট পেতে হত না। পোষাকটা তার ছিঁড়ে গেছে। হয়ত জ্ঞানও এখন নেই। জ্ঞান ফিরে আসবে—ভয় নেই। এই টাকা রইল,—পোষাক একটা কিনে দিও। এটা আমার বন্ধুত্বের উপহার। সে যে সুন্দরী! (হাঃ হাঃ করে হাসি।) চল কমরেড্।

(২য় সন্ন্যাসী উঠে চলে যাবার সময় বলল)

২য় সন্ন্যাসী। ওহে বুড়ী, ভয় নেই—আবার আমরা আসব। তোমরা যে আমাদের বন্ধু। 'হিন্দী চিনি ভাই ভাই।

(বীভৎস হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে তারা বেরিয়ে গেল। বাইরে হাসির শব্দ ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল, মঞ্চও সেই সঙ্গে অন্ধকার হ'তে লাগল। শেষে অন্ধকারে ভরে গেল মঞ্চ)

[আবার মঞ্চে আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল, সেই ঘর। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তানকার বাবা—চেয়ারে বসে। তানকা নির্লিপ্তমুখে বসে আছে সোফার এক কোণে। তানকার মা চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে বীরাঙ। সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক।]

বীরাঙ। (সান্ত্বনার সুরে) মা কেঁদনা। তপচ় শহীদ হয়েছে। তুমি শহীদ-জননী। বীর-মাতা। আমরা তোমার শত সন্তান;—আমাদের সাহস দাও।

তানকার বাবা। বীরাঙ, এই ঘরে বসে মাত্র ক'দিন আগে চীনাদস্যুর বর্বর নির্লজ্জতা, পাশবিকতা আমি দেখেছি। দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। তিনদিন উপবাসী আমরা। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢেকে, জীবন তুচ্ছ করে বাইরে থেকে দু'খানা পাউরুটি যোগাড় করে নিয়ে এসেছে তানকা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে চীনাদস্যু এসে অতিথি-সংকারের অজুহাতে ছিনিয়ে নিল সেই তুচ্ছ আহার্য। আমাদের চোখের সামনে গলাধঃকরণ করতে করতে চীনাদের বন্ধুত্বের কি নির্লজ্জ উক্তি তাদের মুখে। শুনতে শুনতে রাগে-ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তানকা সহ্য করতে পারে নি। দস্যু, বিশ্বাসঘাতক ব'লে তাদের সম্বোধন করেছিল। তাদের পাশবিক অভিসন্ধিতে আমি বাধা দিতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছি। আমার সমস্ত সংসার তছনছ করে দিয়ে হাসতে হাসতে তারা চলে গেছে। উঃ, কি নির্মম অভিজ্ঞতা!

বীরাঙ। আপনি জ্ঞানী, অধীর হবেন না। দস্যু আমাদের যত ক্ষতিই করুক—সে ক্ষতিতে আমরা মুহ্যমা-

…র না। বিশ্বাসঘাতককে যখন একবার চিনেছি,—তাদের রেহাই দেব না। তারা বাধ্য হয়ে বম্‌ডিলা ছেড়ে গেছে। তবে বেশীদূরে যায়নি। আবার হানা দেবার অজুহাত খুঁজছে। কিন্তু আমরাও তৈরী। সমস্ত বিশ্ব তাদের স্বরূপ চিনে ফেলেছে। ভারত শান্তিকামী, কিন্তু ভারত আক্রমণকারী দস্যুকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাবা। তুমি কি আবার যুদ্ধে যাবে?

বীরাঙ। যদি যুদ্ধ হয়, নিশ্চয়ই যাব। এখন বমডি-লার হাসপাতালেই আমার ডিউটি পড়েছে।

বাবা। বমডি-লাকে তারা ছিবড়ে করে দিয়ে গেছে। কিছু রেখে যায়নি। কাউকে রেহাই দেয়নি। কি অমানুষিক নৃশংসতা! অথচ এদেরই মুখে শান্তির বুলি, বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ!

বীরাঙ। চীন নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছে। সে ভীরু, তাই নিষ্ঠুর। নিজেদের দুর্বলতা জানে মনে মনে তাই বাইরের প্রচারে এত ঢক্কানিনাদ। কিন্তু মিথ্যের প্রলেপে সত্যকে বেশীদিন ঢেকে রাখা যায় না। চীন ধরা পড়ে গেছে।

মা। (তানকার মা উঠে চলে যেতে যেতে বলল) যেওনা বীরাঙ, আমি তোমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসছি।

বাবা। তুমি বস—আমি একটু ঘুরে দেখে আসি দস্যু-লুণ্ঠিত বমডিলাকে।

(বাবা বেরিয়ে গেল)

বীরাঙ। (আস্তে আস্তে তানকার কাছে গিয়ে) তুমি চুপ করে বসে কি ভাবছ তানকা?

তানকা। ভাবছি—ভাবছি—

বীরাঙ। কি তান্‌কা?

তানকা। উঃ,—কি ঘৃণা!

বীরাঙ। তান্‌কা!

তানকা। সেদিনের সেই নির্মম লাঞ্ছনা!—ঘৃণায় আমার সমস্ত দেহ কুঁকড়ে উঠছে। তুমি বুঝবে না বীরাঙ, —মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত ঘৃণা যেন আমাকেই বিদ্রূপ করছে। উঃ, এ কি অভিশাপ! আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব বীরাঙ।

(ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তানকা)

বীরাঙ। (ধীরে ধীরে তানকার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) শান্ত হও তান্‌কা। কিসের লজ্জা! কেন কুণ্ঠা? বহুমূল্য দিয়ে রক্ষা করতে হয় দেশের স্বাধীনতা। তুমি আমার ভাবী স্ত্রী, এস দু'জনে আজ আমরা এক সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি,—আমরা স্বাধীন ভারতের সন্তান, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার্থে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করব। আমাদের সংগ্রাম বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে,অসত্যের বিরুদ্ধে, —অধর্মের বিরুদ্ধে। জয় আমাদের হবেই। বল তান্‌কা, —জয়, ভারতের জয়। জয় হিন্দ!

তানকা ও বীরাঙ। (এক সঙ্গে) জয় হিন্দ!

যবনিকা

রিক্তা

মিতালী দেবী

তখন বিলাসপুর ছিল আধা-সহর আধা-পাড়াগাঁ। ক'লকাতা থেকে মাইল পঞ্চাশের মধ্যে একটা ধলা পরিপূর্ণ সড়ক নদীর ধার থেকে প্রায় সোজা ষ্টেসনে এসে ঠেকেছিল। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। বাগান বা উঠান ঘেরা ছোট ছোট বাড়ী। আশে পাশে মেঠো গলি চলে গেছে মাঝে মাঝে। সেখানেও ছোট পাকা বাড়ী আছে। দু'চারটে চৌ-মাথাও আছে, সেখানে উঁচু খুঁটির ওপর তেলের আলো কৃষ্ণপক্ষে জলে। ষ্টেসনের কাছে দোকান পসার বাজার ও গাড়ীর আড্ডা। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের বত্রিশ বছর পূর্বে এমনিই ছিল বিলাসপুর।

এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা দরিদ্রই বটে। তবে সাধারণ খাওয়া পরার অভাব কিছু ছিল না। রাখুর বাবাও তাদেরই একজন। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে হ'লে যেমন টানাটানি এসে পড়ে, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু কন্যাদায়ের বোঝা বইবার শক্তি ছিল না তাঁর, না ছিল তাঁর সঙ্গতির। কিন্তু এই বোঝার ভারেই তাঁকে ভেঙে পড়তে হল। উপায়ও ছিল না। তখনকার দিনে মেয়েরা লেখাপড়া শিখত না। তারা স্বাবলম্বী হতে পারতো না। কাউকে চাই, যার হাতে কন্যা সমর্পণ করে যেতে হবে। বিশেষ করে রাখুর বাবা সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত লোকের। রাখু তার পঞ্চম সন্তানের একটি। গ্রাম থেকে তিনি সওদাগরী আপিসে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করেন। অভাবের সঙ্গে আপোষ করে তাকে মানিয়ে সংসার চালাতে হয়। তিনি আর বিয়েতে দেবেনই বা কি, আর আশাই বা কি করবেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যেটি সুবিধের রাখুর বাবা তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে পাকা করে ফেললেন। ছেলেটি ভাল। বি-এ পাস। স্কুল মাষ্টার। স্বাস্থ্য সবল। অবস্থা মন্দ নয়। এর বেশী মধ্যবিত্তের আর কি কাম্য থাকতে পারে। বিয়ে করতে বর এল। কুৎসিত নয়। প্রভাত মুখোপাধ্যায় সুরসিক বর। হাসিখুশি মুখ। বিবাহ পর্ব সমাধা হল। রাখু কাঁদতে কাঁদতে ও সকলকে কাঁদিয়ে পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীগৃহে চলল। নিজে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলল—'তুমি যেন আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে ও ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করো না।' সকলেই জামাই দেখে খুশী হয়েছিল। বিয়ের পরও মুখে মুখে আলোচনায় যে কথাগুলি শোনা যাচ্ছিল তা ভালই। বড় একটা এমন হয় না বিলাসপুরে, অর্থাৎ নিন্দনীয় নয়। সবাই যখন তুষ্ট—এমন কি রাখুর বাবা, ভাই বোনেরা, তখন জননীর মনে কেমন যেন আসন্ন বিষাদের একটা ছায়া পড়েছিল। সে মুখে যেন হাসি আসে না। বারবার কন্যার মুখখানি মনে আসছিল। শুধু যে বিচ্ছেদের বিরহ তা নয়। কি একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুক দুর দুর করছিল। না জানি কি হবে। সকাল সন্ধ্যা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছিলেন মেয়ের সর্বপ্রকার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

বোধ হয় কুড়ি দিন। সে আর কদিনই বা। সেদিনও সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রণাম করবার সময় অন্তরের জমাট দুঃখ দু'ফোঁটা অশ্রুজল হয়ে ঝরে পড়ল। যাক নলিনী সামলে নিলেন ও চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ফিরে দেখলেন শুষ্ক মুখে রাখু পিছনে। সে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে টেরও পান নি। ভেঙে পড়ল রাখু মার বুকে। মা সবলে তাকে চেপে ধরলেন।

সবাই স্বামীর ঘর করতে পারে না। রাখুও পারে নি। তবে এত শীঘ্র এ যে ঘটবে এ যেন স্বপ্নেরও অতীত। মার চোখের জল মেয়ের মাথায় ঝরছিল। তিনি সবলে মেয়েকে বুকে চেপে ধরলেন। মেয়ে মার বুকে ফুঁপিয়ে

পিয়ে কাঁদতে লাগল। ঘটনা এই—শাশুড়ী ননদের মেয়ে পছন্দ হয় নি। দেওয়াথোওয়া উপযুক্ত নয়। তাদের সোনার চাঁদ ছেলে, ঢের বেশী তার প্রাপ্য। তারপর ছেলে-বৌকে দিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করানো ও নির্যাতন। মুখে সকাল থেকে জল ওঠে না। কাজ কাজ গঞ্জনা। মুখ বুঁজে হুকুম পালন করেও নিস্তার নেই। পুকুর থেকে জল আনা, কাপড় কাচা, রান্না—ঘর ঝাঁট—বাসন মাজা—কোন কিছু বাদ নেই। তবু গঞ্জনা। সব কাজই যেন ঠিকমত হয় না—কিছু না কিছু খুঁত বার হয়। আর তাই, কি গালাগাল। স্বামী নির্বাক পুতুল। মুখে কথাটি নেই। শ্বশুর প্রথমে চুপ করে থাকতেন, তারপর উগ্র হতে আরম্ভ করলেন। রাখুর দেহ ভেঙে পড়ছে, মন তার ভেঙেই গিয়েছিল। হতভাগিনী আর পারল না। একদিন শাশুড়ীকে বল্লে, 'মা একদিন ওখানে পাঠিয়ে দেবেন আমায়।'

'আহা ছিনালির জায়গা পাস নি। পাঠিদে দেব কি, যা না চলে—দূর হয়ে যা না।' সপ্তমে চড়ে উঠলেন শাশুড়ী। ননদ যোগ দিলে—'তাহলে তো বাঁচি'। শ্বশুর পাকা লোক, অত সহজে বাঁচেন না। নগ্ন গায় যতদূর বড় সম্ভব উপবীত ঝলছে। বললেন—'যাও, কিন্তু লিখে যাও বাপু। পরে বলবে তাড়িয়ে দিলে।' লিখে দিতে হল। 'স্ব-ইচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করলাম—দাবীদাওয়া রইল না।' গহনাগুলি খুলে দিয়ে বুড়ো এক প্রজার সঙ্গে পিতৃগৃহে ফিরে এল রাখু।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এমন বাঙালী সমাজে তো অনেকই হয়েছে। আজও কি নির্যাতনের আগুনে পোড়া শেষ হয়েছে? রেহাই পেয়েছে কি সে সব মেয়েরা—জ্যান্ত আগুনে না পুড়ে মরে? ফিরিয়ে দেওয়া মেয়ে ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু আগের মত করে পাওয়া যায় না। কুমারী রাখু আর বিবাহিতা রাখুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। কদিনই বা বিয়ে হয়েছে। কদিন! কিন্তু এর মধ্যে কি পরিবর্তন! কদিনই বা শ্বশুর ঘর করেছে। মাত্র দিন কুড়ি। স্বামীর সঙ্গে পনেরো রাত্রি বার সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে এমন কি হল তার। একটা গভীর দুঃখ ক্ষত, কিছুতেই সে ঘা যেন শুকোতে চায় না। স্বামী-বিচ্ছেদ যেন কিছুতেই ভোলা যায় না। হয় নি কিছুই। কিন্তু যা ছিল সব গিয়েছে যেন রাখুর। রাখু যেন বাপ মার কাছ থেকেও দূরে রয়েছে। বাপমা মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। কেবলই মনে হয় যেন তাঁরা অপরাধী। এতদিন মনে করতেন কি করে মেয়ে পার করবেন। আজ মনে হয় এর চেয়ে আইবুড়ো মেয়ে ছিল ভাল। মা সকলের অসাক্ষাতে বুক-ভরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতেই যেন বিছানায় দেহ এলিয়ে দেন। রাত্তিরে ঘুমের মাঝে চমকে জেগে ওঠেন। রাখু পাশ ফিরলে চকিত হয়ে অন্ধকারে তার মুখ নিরীক্ষণ করেন। বাপ মুখে কিছু প্রকাশ করেন না—বরং সান্ত্বনা দেন, মনে দগ্ধে মরেন। আর রাখু, সে যেন সধবার সাজে বিধবা হয়ে রইল। ছোট ছোট ভাই বোনেরাও বোঝে না ভাল। তবু তারাও ম্লান হয়ে গেছে দিদির দুঃখে। রাখুর বড় লজ্জা করে।

তারপর আট বছর পার হয়ে গেল। এতটুকু সুযোগ দেখা দিল না। উল্টো খবর এল। দু'বছর আগে ছেলে গেছে জব্বলপুরে, ভাল চাকরী করছে, বে-থা করে সুখেই আছে। রাখু গোপনে দেবতাকে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে প্রণাম করে বলে—'ঠাকুর মরণ হলেই বাঁচি।'

মার আবার শুকনো চোখে দু'চার ফোঁটা জল এল। মুছে ফেললেন তাড়াতাড়ি—মেয়ে না দেখতে পায়। মা মুখে বল্লেন—আমরা ও আশা আর রাখি না। বাপ দু'বছর ধরে ভাবলেন, কূল কিনারা পেলেন না। বুড়ো হচ্ছেন, কি হবে ভবিষ্যতে মেয়েটার। ভেবেই চলেছেন। ওর আর শেষ নেই। শেষ স্থির করে ফেললেন। মাও সায় দিলেন। মেয়েও রাজী হল। সর্বশেষ চেষ্টা।

যাবার সময় মা অনেক বুঝিয়ে দিলেন। 'সতীনের ঘর, মুখ বুজে পড়ে থেকে সহ্য করো মা। তবেই স্বামী আপন হবে।' মেয়ের লজ্জা হল, পূর্বে সহ্য করেনি কেন! দুজনেরই চোখে জল। মাকে প্রণাম করল। শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রার পর্ব শেষ করে রাখু বাপের সঙ্গে জব্বলপুর চলল। প্রভাত জব্বলপুরে আর স্কুল মাষ্টার নয়—বড় চাকুরে। শ্বশুর ও স্ত্রীকে সমাদরে গম্ভীরভাবে গ্রহণ করলে। এখানে কিছু জানাজানি হলে সম্মানের হানি। কাজেই তাড়িয়ে দেওয়া চলে না। সীতা ত্যাগে রাম-চন্দ্রেরও কলঙ্ক লাগে। কাজেই তাকে কেউ রেহাই দেবে না। বাঙালী যারা এখানে থাকে, তারা সব এক পরিবারের

মত। বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাদের। এ-অবস্থায় ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করে স্বী-শ্বশুরকে ঘরে তোলাই ভাল। শ্বশুর কয়েকদিন থেকে বিদায় নিলেন। জামাইকে বললেন, "বাবা দু'সংসার অনেকেই পূর্বে করেছে। এখনও যে করে না তা নয়। দয়া করে হতভাগিনীকে পায়ে স্থান দিও। তাহলে বুড়ো বুড়ী আমরা সুখে মরতে পারি।"

"বিলক্ষণ—কি যে বলেন—সে আর বলতে—আমার নিজের জ্ঞান বা দায়িত্ব নেই।"

মেয়েকে আশীর্বাদ করে বাপ খুশী হয়ে বাড়ী চললেন।

রাখু স্বামী ও সতীনের ঘরে আশ্রয় পেয়ে বর্তে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এর ছেলে মেয়ে মানুষ করে দুমুঠো খেয়ে নিঃঝঞ্চাটে থাকতে পেলেই যথেষ্ট। সতীনকে গৃহকার্যে সাহায্য করতে সে সর্বদা এগিয়ে যেত। বরং সেই বলত, 'না দিদি থাক।' কিছু কিছু যে একেবারে করতে না দিত তাও নয়। তবে রাখু বুঝেছিল যে সে চায় না—রাখু স্বামীর কোন কাজে হাত দেয়। তাই স্বামীর কাজ বা স্বামীর সেবাযত্ন তার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে কিছুই রাখু করতে চেষ্টা করতো না। স্বামীর কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকত। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে চোখ নত করে মাথার ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াত। তাদের বাক্যালাপ তো হতই না। আগে রাখু ছিল শাশুড়ী ননদের ভয়ে, আজ রইল সতীনের ভয়ে। কিন্তু আজ সে স্বামী চাইছিল না, চাইছিল একটি আশ্রয়, যা পেলে তার বাপমা দায়মুক্ত হতে পারে। এদিকে দেখা যেত প্রভাতের বরং তাকে দেখবার স্পৃহা, কথা কওয়ার স্পৃহা। বুঝতে দেরী হত না যে দ্বিতীয় পক্ষের ভয়ে সে সে চেষ্টা করত না।

একদিন প্রভাতের সে সুযোগ ঘটল। সেদিন কি একটা নিমন্ত্রণে অনিলাকে বাইরে যেতে হল। সেটা মেয়েদের সাধের নিমন্ত্রণ। সতীনকে নিয়ে সখীদের কাছে যাওয়া ভাল দেখায় না—যত জানাজানি না হয় ততই ভাল। কাজেই অনিলা ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলল নিমন্ত্রণে। প্রভাত বুঝেসুঝে আগে থেকেই শুনিয়ে দিয়েছিল তার আজ ফিরতে রাত হবে। কাজেই দিদি ও ঝি থাকবে বাড়ীতে—ভালই হল। অনিলা বেশ খুশী হল।

কিন্তু সাতটা নাগাদ প্রভাত বাড়ী ঢুকল। বুঝল বাড়ীতে কেউ নেই রাখু ছাড়া। ঝিটা কাজের অভাবে নাক ডাকাচ্ছে সন্ধ্যা থেকে। রাখু রান্নাঘরে কি একটা রাঁধছিল। প্রভাত দূর হতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অলক্ষ্যে তার পেছনে এসে বললে, 'এত যত্ন করে কি রাঁধছ।' রাখু প্রথমে চমকে উঠল। তারপর স্মিত হেসে জড়সড় হয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল, রাখুর বুক দুরু দুরু করছিল। রক্ত চলাচল খুব দ্রুত, আনন্দ শিহরণ—সব মিলে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রভাত তাকে কাছে টেনে আনলে। কানের কাছে বললে, 'কাছে তো পাই না। সর্বদা ভয়ে ভয়ে তফাতে থাক। তোমার কিছু মনে হয় না রাখু।' আবেশে আচ্ছন্ন রাখু কথা বলতে পারছিল না। স্বামী আজও তার নাম মনে রেখেছে এতদিন বাদে! চুম্বনে আদরে আলিঙ্গনে রাখু অস্থির হয়ে উঠল। আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে স্বামীর হাতে। প্রভাতের কতকালের তৃষ্ণা মিটতে চায় না। রান্না পুড়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই রাখুর।

সংবিৎ ফিরে পেলে তারা—যখন অনিলা ছেলে-মেয়ে নিয়ে একেবারে বাড়ীর উঠোনে এসে পড়েছে। তাদের আসার হৈ হুল্লোড় কানে এসেছিল কিন্তু মরমে পশেনি। তাড়াতাড়ি রাখু উঠে পড়ল। অবিন্যস্ত চুল কাপড়-চোপড় দ্রুত গুছিয়ে রান্নায় মন দিলে। ততক্ষণে প্রভাত রান্নাঘর থেকে বার হয়েছে।

অনিলা তাকে দেখে ফেললে। বুঝতে তার কিছুই বাকি রইল না। প্রভাত একটা কি বলে বোঝাতে যাচ্ছিল তার রান্নাঘরে ঢোকার কারণটা, কিন্তু থেমে গেল অনিলার মুখের দিকে চেয়ে। গভীর রাতে অনিলা কেঁদে কেঁদে চুল ছিঁড়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে একটা অপরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করলে। সেটা নিশুতি রাত না হলে মানায় না, আর বোধ হয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীই তার স্বামীর সামনে এ অপরূপ লীলা করতে পারে। প্রভাত নানাপ্রকার চেষ্টায় অনিলাকে থামাতে চেষ্টা করে সফল হল না। অবশেষে কালই পূর্ব স্ত্রী বর্জন প্রতিজ্ঞা করে তাকে ধীরে ধীরে শান্ত করে ফেলল। সে রাত্রে এই পর্যন্তই হয়ে রইল। পরদিন রাত্রে আবার বর্ষণের সবে সুরুতেই দু'জনে মিটমাট হয়ে গেল। তারপর আরম্ভ হল সলাপরামর্শ ও আলোচনা, কি করে কেলেঙ্কারী এড়িয়ে স্ত্রী বর্জন পালা সাঙ্গ করা যায়
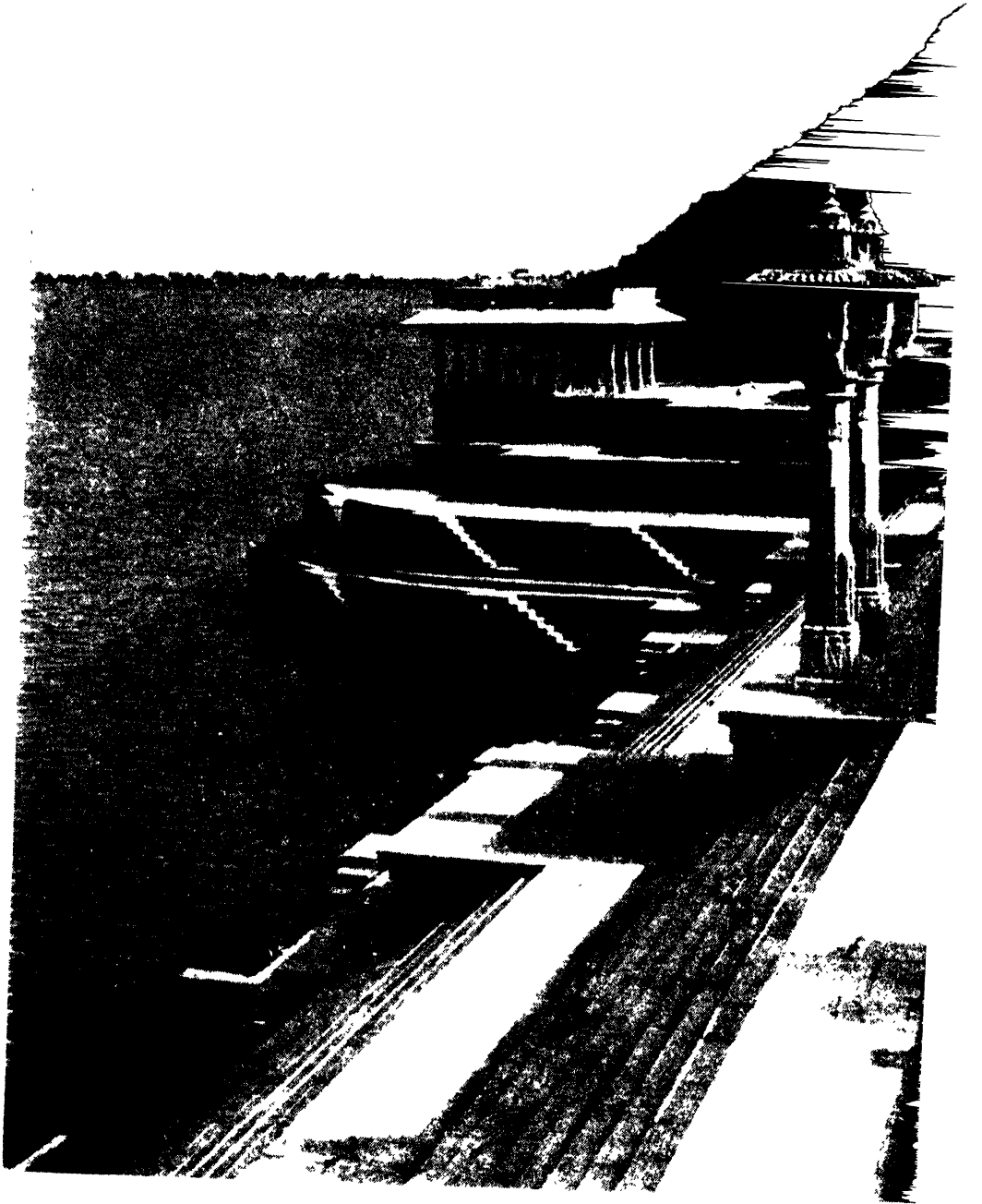
ঘাট

(কাকরলী—রাজস্থান)

ফটো ঃ রণজিৎকুমার বন্দ্যোপ

ঝুলন্ত সেতু
(হরিদ্বার)

ফটো : রণেন ঘোষ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
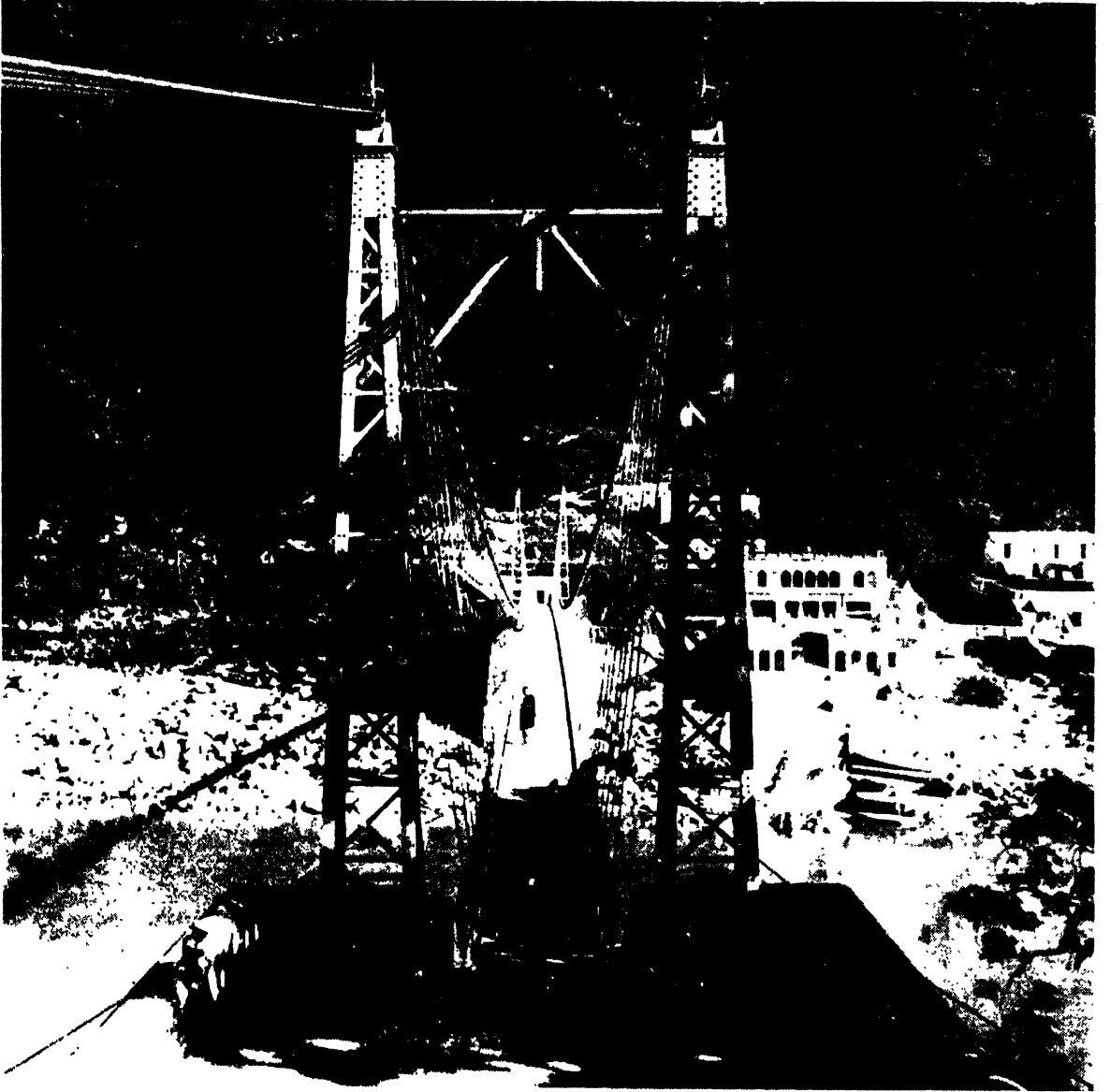
অনেক রকম জল্পনা-কল্পনার পর একটা মনের মত মতলব স্থির হল। দুজনেই পন্থাটির চমৎকারিত্ব ও সিদ্ধিলাভের সহজ উপায় পেয়ে বেশ খুসি হয়ে উঠল। সে রাত্রিতে প্রভাতের কণ্ঠলগ্না হয়ে অনিলা বেশ আরামে নিদ্রা গেল। প্রভাতেরও ঘুমের কোন ব্যাঘাত হল না।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে সেদিন যে সুখ ও হারানো নীড় পেয়ে রাখু ধন্য হয়েছিল, সে ঘোর সে রাত্রেই কিছুটা কেটে গিয়েছিল। তবে মনে হয়েছিল বোধ হয় একেবারে আশ্রয় চ্যুত হবে না। কোন্‌টা কি হবে না হবে, তা যেন আগে থেকেই বোঝা হয়ে যায় রাখুর। কে যে বুঝিয়ে দেন জানি না। তবে তার ভাবনার অনেকখানিটা মিলে যায় এমন দেখা গেছে অনেকবার। এবারে কতখানি মিলবে সেই কথা। প্রভাত ও অনিলার ঝগড়া-বিবাদ রাতের অন্ধকারে পর্দার আড়ালেই হয়েছিল। রাখুর কাছে কিছু ধরা পড়ে নি। তবে আন্দাজে সে বুঝেছিল যে মনোমালিন্য হয়েছে দুজনের। সেও অস্বস্তি ভোগ করছিল। কদিন বাদে একজন ছোকরা ডাক্তার এলেন বাড়ীতে। তারপর রাখুর ডাক পড়ল।

প্রভাত বল্লে, "তোমার বাবা বলেছিলেন একবার তোমাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে।" রাখু ভেবেই পেলে না, কি পরীক্ষা করানো হবে তার। তবে বাবা বলেছেন, স্বামী বলছেন, যেতে হল তাকে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার সযত্নে পরীক্ষা করলেন তাকে ও নানান প্রশ্ন করলেন। পরে বললেন—'কিছু তো পাই না। তবে মনে হয় she may be pregnant। অর্থাৎ হলেও হতে পারে। সেই কারণে শরীর খারাপ হতে পারে।' যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়ে গেল। প্রভাত কোন রকমে সামলে নিলে। ডাক্তারকে বিদায় করে ভাবলে—একদম বাজে কথা। এত অল্প দিনে কিছু কখনও বলা সম্ভব। ডাক্তার ঐ রাখুর কথা শুনেই আন্দাজ করেছে···যাক্ এখন শীঘ্র বিদায় করতে পারলে হয়।

রাখুকে অনিলা দুপুরে বললে, "দিদি, ডাক্তার ওঁকে বলে গেলেন আপনার বুকের অসুখ করেছে। আপনাকে ছেলে পিলের বাড়ীতে রাখা ঠিক নয়। তাই উনি বলছিলেন—বাবামার কাছে দিনকতক থেকে সেরে ফিরে আসুন।"

এই অতর্কিত আঘাতে রাখুর চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা দুলে উঠে অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। সে আপনাকে সামলে নিয়ে করুণ কণ্ঠে বললে, "কেন এমন হল বোন্। মরণ তো এমনি হলেই পারত। ছোঁয়াচে রোগ এনে সকলকে জ্বালিয়ে মারলাম কেন।" বলে উদ্গত অশ্রু সে রোধ করতে লাগল। তারপর চোখ মুছে বললে, "যাব বৈকি বোন। আমার ছেলেমেয়েদের অনিষ্ট আমি করবো। তারা আমার বেঁচে থাক, সুখে থাক।"

সেদিন গাড়ী থেকে রাখুকে একটি অপরিচিত ছেলের সঙ্গে নামতে দেখে মার মনে হল—মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। দরজা আঁকড়ে কোন প্রকারে নিজেকে সামলে নিলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকাবার আগেই রাখু বললে, 'মা এ আমার দূর সম্পর্কের দেওর। আমাকে পৌছে দিতে এসেছে।'

ছেলেটি সপ্রতিভ, মাকে প্রণাম করে বললে, 'বৌদিকে রেখে গেলাম। আর বসব না মা, আমায় আবার গাড়ী ধরতে হবে। দেরী করলে চলবে না।'

অনুরোধ করতে রাখু বারণ করলে। মার অবস্থা ছিল না অতশত ভাববার। অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা কেঁদে উঠছিল। মনে হচ্ছিল—হতভাগিনীটা আবার ফিরে এল, একটু ঠাঁই পেল না। মা সব শুনলেন। মেয়েকে প্রাণপণে বুকে চাপলেন। যেন ভগবানের কাছে কামনা করলেন—ওর বুকের রোগ আমার বুকে দাও ঠাকুর! অশ্রুর প্রস্রবণ বইল। রাখু একে একে সবই মাকে বললে। ভীষণ রোগের কথা থেকে সব। পারলে না শুধু একটি সন্দেহের কথা প্রকাশ করতে। সঠিক কিছু জানা নেই—তা ছাড়া লজ্জাও করে। আর না হলেই ভাল। রাখুর বাবা কিন্তু রোগ যে তার হয়েছে এ-কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাড়াবার ছল এই তাঁর মনে সন্দেহ হল। অবশেষে একটি ছুটির দিনে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে নিরসন হল সন্দেহ। "সব ভুয়ো, জানলে। বুকে কিছু নেই। নেবেনা বলেই এমন একটা পন্থা বের করে তাড়িয়ে দিলে। লোকজনের সামনে তো এমনি দূর করে দেওয়া চলে না।" রাখুর মা জানলেন সব। তবে মুখে কোন উত্তর জোগাল না। চুপচাপ মানুষ, চুপচাপই রইলেন। খালি জানেন চোখ মুছতে ও ভগবানের

দরবারে নালিশ জানাতে। অন্তর্যামী শোনেন কি না জানি না। যাক বেশী দিন তাঁর এ ভাব রইল না। দুঃখের ভারে নিমজ্জিত হয়ে হয়েও অনেক দিন তাঁর জীবনতরী ভেসেছিল্। এইবার মরবার ফুরসৎ ও ডাক বুঝি তাঁর এল।

কিছুদিন পরে রাখু বমি করতে লাগল। মা নিজে জননী, এত ঘন ঘন বমি ও অন্য উপসর্গ দেখে সন্দেহাকুল হলেন। শেষে বুঝলেন সত্যি। শুনে তাঁর হৃদরোগ বেড়ে গেল। হৃদরোগ ছিলই তাঁর। হৃদয় তো অনেক দিন আগেই মরেছিল—সে আবার মরবে কি? মরবে দেহটা, চোখের দৃষ্টি, অনুভব শক্তি।

ডাক্তার বিধান দিল 'রেষ্ট'।

মা বললেন—যমের বাড়ী গিয়ে।

মেয়ে প্রাণ ঢেলে কাজ ও সেবায় লেগে গেল। মা বকেন, বাপ চুপ করে থাকেন। কিন্তু গৃহস্থ ঘরের যথা-সাধ্য চিকিৎসায় ও যথাসাধ্য পথ্যিতে এবং বিকট বীভৎস দুর্ভাবনায় হৃদরোগী সারে না। মরবার আগে কয়েকদিন অঝোরে মা খালি কাঁদছিলেন। রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে, এনিমিয়া। দেহ অবশ। দৃষ্টি ক্ষীণ। হার্ট ধুক্ ধুক্ করছে। কিন্তু কান্না—সে যেন চোখের জলের প্রস্রবণ—অশ্রুর কুণ্ড, ছাপিয়ে যায়, আবার ভরে উঠে। সব শেষ হয়ে গেল। রাখু যেন তার মার মত বুড়ো হয়ে গেছে এ ক'দিনে। কলের মানুষের মত কাজ করতে লাগল। হাত-পাগুলো নড়ে চড়ে। কাজ যথা কালে করে যায়। দৃষ্টি যেন কোথায় থাকে তার ঠিকানা নেই।

বাপকে মরবার আগে কথাটা মা বলে গিয়েছিলেন। সন্তানের জন্য এত মায়া! এতও তাঁর মনে ছিল! বাপ শুনে প্রথমে অকারণে রেগে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আ মর আবাগী'। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে-ছিলেন। অনেক ভেবে জামাইকে চিঠি লিখলেন······

'বাবা, তোমার স্ত্রীর পুত্রসম্ভাবনা। একবার যদি আস। তোমার শাশুড়ী মারা গিয়েছেন, বড়ই দুঃখে আছি।'

জবাব বেশ শীঘ্রই এল—'আপনার কথা শুনে অবাক হচ্ছি। আমার পুত্র কি প্রকারে হতে পারে তা বুঝতে পারি না।

পত্রখানা পড়ে বাবার মুখের ভাব এমন আকস্মিক বদলে গেল যে অলক্ষ্যে থেকে রাখু তা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। চিঠিখানা পকেটে রেখে তিনি স্নানে গেলে সে সেটা পড়ে ফেললে। নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে সে কাজ করতে লাগল। বাপের সামনে আর বার হল না। ভাতের থালা ধরে দিয়ে জল গড়িয়ে দিয়ে ভাইকে তাঁকে ডেকে দিতে বলল। অন্য দিনের মত যত্ন করে খাওয়াতে গেল না। বাপের আজ মাথার ঠিক নেই। নাকে মুখে গুঁজে ছুটলেন আফিস। যন্ত্রচালিত ব্যক্তি। ঠিক চলে গেলেন। ভাইবোনেরা খেয়ে স্কুলে গেল।

অবশিষ্ট ভাত হাঁড়িতে পড়ে আছে। থাক পড়ে। রাখু রান্নাঘরে শিকল তুলে দিল। চারিদিকে নিস্তব্ধ। ঘরের মধ্যে মার একখানা পদচিহ্ন পিজবোর্ডে মারা ছিল। সেখানায় সে মাথা ছুঁয়োল—'মা মা, আমায় কোলে তুলে নিও।' তারপর বাপমার একখানা পূর্বকালের ফটো ছিল। তাদের পায় মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে—'ঠাকুর বাবাকে আর আমার ছোট ভাই বোনগুলিকে তুমি দেখো, মাও যে নেই।' পাশেই একটা ছোট আরশি ছিল। সেখানায় তার মুখের ছায়া পড়ল। মাথায় সিঁদুর। পিছিয়ে এল সে। সঙ্কুচিত হয়ে উঠল ঘৃণায়। তুলতে চেষ্টা করলে কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে সিঁদুর। তারপর তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গি থেকে একটা ছোট পেন্সিল্ নিয়ে লিখলে—'বাবা ক্ষমা করো। মার কাছে চললাম!' আর একটা কাগজে লিখলে—"আমি আত্মহত্যা করছি, কেহ দায়ী নয়।'

তারপর একটানে বিছানার চাদরখানা তুলে নিয়ে ভাঙা খাটখানার ওপর উঠে চাদরখানা পাকিয়ে তার একটা প্রান্ত চালি ঝোলাবার জন্যে যে আংটাটা ছিল সেটার মধ্যে গলিয়ে দিলে। আর একপ্রান্ত খাটের খুরোয় বাঁধলে। শেষে গলানো চাদরটা গলায় শক্ত করে বেঁধে খাট থেকে লাফ দিলে।

যুগাবতার রামকৃষ্ণ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দেশে যখন পরাধীনতার ঘোর অন্ধকার, সমস্ত পৃথিবী জড়বাদে অন্ধ, সেই দুর্যোগময় দিনেই 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্' অবতারবরিষ্ঠ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হল বাঙলার এক পল্লী-প্রাঙ্গণে। অবতার যখন আসেন তখন একা আসেন না। তাঁর জন্যে ভূমি প্রস্তুত করতে আসেন অনেকে। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই—রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, গান্ধী, তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আবির্ভাব। আর তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা-সহচর হয়ে এসেছিলেন—

১। ডঃ রামচন্দ্র দত্ত
২। মনোমোহন দত্ত
৩। লাটু মহারাজ (অদ্ভুতানন্দ)
৪। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র
৫। রাখালচন্দ্র ঘোষ (ব্রহ্মানন্দ)
৬। গোপাল (বড়) (অদ্বৈতানন্দ)
৭। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)
৮। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)
৯। তারকনাথ ঘোষাল (শিবানন্দ)
১০। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (যোগানন্দ)
১১। শশিভূষণ (রামকৃষ্ণানন্দ)
১২। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (সারদানন্দ)
১৩। কালীপ্রসাদ চন্দ্র (অভেদানন্দ)
১৪। হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (তুরীয়ানন্দ)
১৫। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞানানন্দ)
১৬। গঙ্গাধর ঘটক (অখণ্ডানন্দ)
১৭। গিরীশচন্দ্র ঘোষ
১৮। সুবোধ ঘোষ (সুবোধানন্দ)
১৯। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
২০। বলরাম বোস
২১। নিত্যনিরঞ্জন সেন (নিরঞ্জনানন্দ)
২২। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনেতিহাস হচ্ছে অনুশীলিত ধর্মের ইতিহাস। তাঁর জীবন আমাদিগকে ভগবানের চোখের সামনে দেখতে সাহায্য করে। ভগবানই সত্য, আর সবই ভ্রম—এ-সত্য অনুভব না করে কেউই তাঁর জীবন কাহিনী পড়তে পারেন না। রামকৃষ্ণ ছিলেন দেবত্বের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর বাণী শুধু কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির কথা নয়, তারা তাঁর জীবন-গ্রন্থের পত্রস্বরূপ। তাঁরই অভিজ্ঞতার প্রকাশ তাদের মধ্যে। তাই তারা পাঠকের উপর এমন দাগ রেখে যায়, যা তাঁরা সামলাতে পারেন না। সন্দেহবাদের যুগে রামকৃষ্ণ উজ্জ্বল প্রেমদৃপ্ত বিশ্বাসের ছবি, যা হাজার হাজার নর-নারীর অন্তরে এনেছে শান্তি, অন্যথা যাঁরা অধ্যাত্মজ্ঞানের আলো হতে বঞ্চিত থাকতেন। রামকৃষ্ণের জীবনটা ছিল অহিংসা মন্ত্রের একটি জীবন্ত বাণী। তাঁর প্রেম ভৌগলিক বা অন্য কোন সীমা মেনে চলে নি" -বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

রোঁমা রোঁলা রামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে পাশ্চাত্যের মানুষদের বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে তাঁর জীবনী তুলে ধরছি—কিন্তু এ কোন নূতন জীবনী নয়, এ অতি পুরাতন জীবনচরিত, যা তোমরা সকলে আবৃত্তি করেছ (যদিও কেউ কেউ করতে গিয়ে বর্ণ-পরিচয়েই থেমে গেছ)। ফলত একই সেই বই। যদিও লেখায় পার্থক্য আছে। চক্ষু সাধারণত মলাটেই নিবদ্ধ থাকে, ভেতরে পৌছে না।...

সেই একই বই। সেই একই মানুষ,মানুষের পুত্র,অমৃতের পুত্র, আমাদের মধ্যে পুনরাবির্ভূত ভগবান্। প্রত্যেক-বার আবির্ভাবে তিনি নিজেকে আরো একটু বেশী পূর্ণভাবে বিকশিত করেন, বিশ্বের দ্বারা আরও অধিক সমৃদ্ধ হয়ে তিনি আসেন।

দেশ ও কালের নিমিত্ত পার্থক্যের কথা বাদ দিলে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের যীশুখ্রীষ্টের অনুজ ভ্রাতা।

কেথলিক খৃষ্টান রোমাঁ রোঁলাও রামকৃষ্ণকে অবতার বলে অনুভব ও স্বীকার করতে পেরেছিলেন।

২৩। বাবুরাম ঘোষ (প্রেমানন্দ)

২৪। তুলসীচরণ দত্ত (নির্মলানন্দ)

২৫। দুর্গাচরণ নাগ

২৬। সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীত)

২৭। সারদা দেবী

সকলের শেষে সারদা দেবীর নাম করা হল বটে, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্ম প্রচারে সারদা দেবীর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন শিব, সারদা দেবী ছিলেন শক্তি। সকল ভক্ত তাঁদের সন্তান। আর সকল সন্তানের শীর্ষমণি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই রামকৃষ্ণের প্রবর্তিত সমন্বয়ের ধর্ম সারা পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন বুকে পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়ে—তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "যদিও লক্ষ লক্ষ লোক আপনাকে ভগবান বলে বিশ্বাস করেন, আমি নিজে প্রমাণ না পেলে কখনও সে বিশ্বাস করব না।"

রামকৃষ্ণ উৎসাহ দিলেন শিষ্যকে, "ঠিক। আমি কিছু বলেছি বলেই বিশ্বাস করবে না। প্রত্যেকটি জিনিস নিজে পরীক্ষা করে নেবে।'

বিবেকানন্দ বললেন, "আমি ভগবান্‌কেও চাই নে। আমি চাই শান্তি। পরম সত্য, পরম জ্ঞান, পূর্ণ ও অপার অনন্তকে বুঝতে।"

ঠাকুর আশ্বাস দিলেন হবে। তারপর একদিন মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন, "মা, ওকে কিছু আলো দেখা।" শেষে একদিন কৃপা করলেন মা। বিবেকানন্দ আবেগে চীৎকার করে উঠলেন, "আমি দেখেছি, আমি জেনেছি, আমি বিশ্বাস করি, আমি ঠকিনি।"

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। বিবেকানন্দ বলেছেন "তিনি আমাকে আমার মা ও ভাই-এর চেয়ে বেশী ভালবাসতেন।" ভালবাসতেন বলেই তিনি একদিন তাঁকে বললেন, "আমি জানি তুমি সংসারে থাকবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্যে সংসারে থাক।"

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরেই বিবেকানন্দ পরিব্রাজক রূপে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সারা ভারতে, সারা বিশ্বে, প্রচার করেছিলেন, তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ সত্যকে।

—"যে ভগবানে আমি বিশ্বাস করি, তিনি হচ্ছেন সকল আত্মার সমন্বয়, আর সকলের উপরে আমি বিশ্বাস করি পতিত ভগবানকে, দুর্গত ভগবানকে, দরিদ্রতম ভগবান্‌কে।"

তারপর বিশ্বজনকে জানালেন রামকৃষ্ণের ধর্ম ঃ—

(১) প্রত্যেক ধর্মমতই সত্য। প্রত্যেক সাধনারই গন্তব্যস্থল এক।

(২) সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভুলে তরুণ বয়সেই ধর্মের পথে চল।

(৩) তোমার পবিত্র চিন্তাও স্বপ্নের সীমানায় যে কর্তব্য রয়েছে তা পালন কর, বৃহৎ কিছু করব বলে অযথা সময় ও শক্তির অপব্যয় করো না।

(৪) ধর্মের পথে চলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি করো না। নিশ্চয় তুমি লক্ষ্যে পৌছবে।

(৫) কাম ও লোভে মত্ত হয়ো না।

(৬) সকল মানুষের সকল জীবের সেবক নিজের জীবনকে সার্থক কর।

অবতার রামকৃষ্ণের জয়ধ্বজা তাঁকেই উড়াতে হল দেশে দেশে।

ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত তিথি

শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ

১। ১৩৬৯ সালের বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীবাণী চক্রবর্ত্তী এম্-এ লিখিত 'ধর্মশাস্ত্রবিহিত তিথি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষে স্বীকারোক্তি আছে—তাঁহার অধ্যাপক ভট্টপল্লীনিবাসী অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ লইয়া ইহা লিখিত। এই প্রবন্ধের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—ইহাতে সেই পুরাতনী কথা 'বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ে'র চর্ব্বিতচর্ব্বণ ও শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ১৩৬৫ সালের পৌষ সংখ্যা দেবযান পত্রিকায় 'ধর্ম্মকৃত্যে তিথিবিশেষের গ্রাহ্যতা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীচক্রবর্ত্তীর অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শ্রীচক্রবর্ত্তী লিখিত প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে কারণ দর্শান হইয়াছে—অনেকে ধর্মশাস্ত্রসম্মত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণনাসিদ্ধমতকে স্বীকার না করিয়া দৃগ্‌গণনাসিদ্ধ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার তিথি গ্রহণ করিতেছেন; তাই দৃগ্‌গণনা ধর্মশাস্ত্রসম্মত কিনা আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

২। বিস্ময়ের কথা ১৩৫৭ সালের ৬ই আশ্বিন ২৭নং শান্তিরাম ঘোষ স্ট্রীটে কলিকাতা পণ্ডিতসভার সম্পাদক শ্রীকালীপদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় ও তৎকালজীবী মহামহোপাধ্যায় শ্রীরমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গদেশের সমস্ত পঞ্জিকার প্রতিনিধি পণ্ডিতমণ্ডলীর ও নিরপেক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতিতে পঞ্জিকা সংস্কারের যে সর্বশেষ সভা আহূত হইয়াছিল সেই সভায় আলোচনাবাসরে উক্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'সূর্য্যসিদ্ধান্তের অভিপ্রায় ও মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্য গণনাশতিমির 'বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়' সীমা অতিক্রান্ত হইলেও কোন আপত্তির কারণ নাই।' এখন দেখা যাইতেছে স্বয়ং স্মৃতিতীর্থ মহাশয় পুনরায় সেই পুরাতন আপত্তি তুলিয়া ১৩২২ সালে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার সিদ্ধান্ত যাহা ১৩২৫ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমগ্র বাংলার পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল তাহারই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। এমনকি সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—'পঞ্জিকা সংস্কারের আর কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহারা গণনায় বুঝিয়াছেন সব ঠিক আছে।' এই অযথা ভাষণ দ্বারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায় গৃহীত সর্ব্বসম্মত পঞ্জিকা সংস্কার বিষয়ক সিদ্ধান্তকে যে প্রত্যক্ষভাবে অমান্য করা হইল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

৩। শ্রীচক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে 'সারা ভারতের হেমাদ্রি প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ বলিতেছেন—তিথির চরম বৃদ্ধি আড়াই মুহূর্ত্ত এবং চরম ক্ষয় তিন মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হয়, অতএব ইহাই ধর্মকৃত্যে ব্যবহার্য্য; দৃগ্‌গণনাসিদ্ধ তিথি ধর্মকর্ম্মে ব্যবহার্য্য নহে।' এখানে সংস্কারবাদীর বক্তব্য এই যে দুই-একজন নিবন্ধকারের বাক্য ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতি ১৯ জন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকের শাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহার অপর নাম স্মৃতি। নিবন্ধকারগণ কেহই ঋষি নহেন বলিয়া তাঁহাদের বাক্য আর্ষ বা আপ্ত বলা চলে না। আপ্ত পুরুষের লক্ষণে বলা আছে যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই আপ্ত। মনুস্মৃতিমতে ধর্ম্মের লক্ষণ শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি।

৪। তিথি বা গ্রহণ গণনার পদ্ধতি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে বা নিবন্ধকারের বাক্যে নাই। আছে সাক্ষাৎ শ্রুতির অঙ্গ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে—যাহাকে 'আগম' বলা হয়। আগম শ্রুতির নামান্তর। এই আগমশাস্ত্র সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে দেখা যায়—যুগে যুগে এমন কি যুগমধ্যে গ্রহগণিতের উপকরণাদির পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া বীজসংস্কার দ্বারা তাহাও বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া লইবার উপদেশ রহিয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের যন্ত্রাধ্যায়ে নানাপ্রকার যন্ত্র

নির্ম্মাণের উপায় বর্ণিত আছে এবং তদনুসারে সম্যক্ কাল সাধনের উপদেশ দেওয়া আছে। সর্বজনমান্য সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখান আছে ধর্ম্মকৃত্যোপযোগী তিথ্যাদির কাল নির্ণয়ে দৃগ্‌গণিতৈক্য গণনাই গ্রাহ্য। গণনা দ্বিবিধপ্রকারের হয়—ভূকেন্দ্র হইতে দৃশ্য এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে দৃশ্য। ভূকেন্দ্রীয় গণিতে আক্ষ-আয়নাদি দৃক্‌কর্ম্ম সংস্কার প্রয়োগে ভূপৃষ্ঠে দৃগ্‌গণিতৈক্য হয়। তিথি গণনার মূল উপকরণ ভচক্রনাভিদৃশ্য রবি ও চন্দ্রের স্ফুট। গ্রহণ গণনার মূল উপকরণ ঐ প্রকার ভচক্রনাভিদৃশ্য রবি চন্দ্র রাহু বা কেতুর স্ফুট। সুতরাং বুঝা যাইতেছে--তিথি ও গ্রহণ গণনার মূল ভিত্তি একই। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে চন্দ্রগ্রহণ গণনার জন্য একপ্রকার স্ফুট তিথি ও ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদনার্থ অন্যপ্রকার তিথি গণনার নির্দ্দেশ নাই। রবি ও চন্দ্রের পরম মন্দফল কালবশে পরিবর্ত্তনশীল। ইহার তারতম্য অনুসারে তিথির হ্রাসবৃদ্ধির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। গ্রহণ যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তিথিও সেরূপ যন্ত্রসাহায্যে দৃক্‌সিদ্ধ। সিদ্ধান্তগ্রন্থের মূলসূত্র চিরস্থির, কেবল কালবশে গণনার উপযোগী উপকরণের পরিবর্ত্তন ঘটে। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত ঐ আগমশাস্ত্রমতের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া চলে। তদনুসারে তিথিগ্রহণাদির গণনা ফল প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। উন্নত গণিত বিজ্ঞানের সহিত যে ধর্ম্মের একতা সর্ব্বকালে আছে, ইহা যাঁহারা জানেন না বা জানিবার চেষ্টা করেন না তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মের সন্ধান পাইতে পারেন না।

৫। শ্রীচক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে—গ্রহণ-গণনা মাত্র দৃক্‌সিদ্ধমতে সাধন করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে—

চক্ষুষা দর্শনং রাহো র্যত্তদ্ গ্রহণমুচ্যতে।
তত্রকর্ম্মানি কুর্ব্বীত গণনা মাত্রতো নতু॥

এই ধরণের যে বিকৃত ব্যাখ্যা দেখান হইয়াছে তাহা রঘুনন্দনকৃত ব্যাখ্যা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। তিথিতত্ত্ব বলিতেছেন 'রাহৌ দৃষ্টে ইত্যভিধানাৎ রাহুং দৃষ্টাহক্ষয়ং নর ইত্যুক্তত্বাৎ যাবদ্দর্শনগৌরব ইতি।' ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই গণনাদ্বারা দৃশ্যাদৃশ্য উভয়দৃশ্য উভয়-বিধ গ্রহণই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু অদৃশ্য গ্রহণে কোন কার্য্য করণীয় নহে। গ্রহণ যেখানে যতটুকু চক্ষুগোচর হইবে, ততটুকুই কর্ম্মযোগকাল। এজন্য ভূপৃষ্ঠোপরিস্থ দেশের একাংশে গ্রহণ দৃশ্য, অন্যাংশে অদৃশ্য—এরূপস্থলে কিম্বা গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় গ্রহণ স্থলে যেখানে যতটুকু সময় রবি বা চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত দেখা যাইবে, সেইখানে ততটুকু কাল বৈধকর্ম্মের যোগ্য হইবে, ইহাই 'তত্র কর্ম্মানি কুর্ব্বীত' এই বচনাংশ দ্বারা বিহিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তশাস্ত্রে-চন্দ্রগ্রহণে আক্ষ-আয়নাদি দৃক্‌কর্ম্ম সংস্কারের উল্লেখই নাই—ছাদ্য চন্দ্র ও ছাদক ভূচ্ছায়া নিয়ত এক সমতলে থাকে বলিয়া উহার প্রয়োজনও হয় না। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের 'নক্ষত্র-যোগেষু' ইত্যাদি বচনে নক্ষত্র গ্রহের যোগ, গ্রহের অস্তোদয়, চন্দ্রের শৃঙ্গোন্নতিস্থলে দৃক্‌কর্ম্মসংস্কারের কথা বলা আছে। ঐ বচনে গ্রহণের উল্লেখও নাই। 'ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা' বলিয়া গ্রহণ দৃক্‌সিদ্ধ আর তিথি অদৃক্-সিদ্ধ—এবম্প্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদর্শন-দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করা হইতেছে।

৬। ১৪০০শকে মকরন্দ সারণীমতে তিথ্যাদি গণিত হইত। পরে অয়নাংশাদির পরিবর্ত্তন হেতু ১৫২১শকে রাঘবনন্দী দিনচন্দ্রিকা সারনীমতে এবং পরে ১৫৬৬ শকে রামচন্দ্রী সারণী দিনকৌমুদীমতে তিথিগণনা চলিতে থাকে। ঐ সারণী সম্বন্ধে উপদেশ আছে 'এষা সারণী সপ্তদশায়নাংশে রচিতা অতো হ্যয়নাংশান্তরে এতৎ সর্ব্বমন্যথা ভবতি'। আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বাচার্য্যের এই বাস্তব নির্দ্দেশের পরেও গুপ্তপ্রেশাদি পঞ্জিকা ঐ সমস্ত সারণীর অঙ্কপাতুলি তিন শত বৎসর পরেও কোনও সংস্কার না করিয়া ব্যবহার করিয়া যাইতেছেন এবং বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে। কোন সময়ে হয়ত রবি চন্দ্রের পরম মন্দফলানুসারে তিথির হ্রাসবৃদ্ধি বাণবৃদ্ধি-রসক্ষয় যুক্ত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে মন্দফলের কিঞ্চিৎ পরি-বর্ত্তন হওয়ায় তিথির হ্রাসবৃদ্ধি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিথিরহ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন কোন নিবন্ধকারের মতের সহিত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অভিপ্রায়ের বিরোধ হইতে পারে। এরূপ স্থলে 'শ্রুতিস্মৃতিবিরোধেতু শ্রুতি-রেব গরীয়সী' এই মীমাংসক সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতির প্রমাণই বলবান হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে

পারে। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ যে আগমশাস্ত্র তাহা বুঝিয়াই আচার্য্য বলিয়াছেন দৃক্‌কর্ম্মকরনৈক্যবিহীনাঃ খেটাঃ স্থুলা নকর্ম্মনা মহাঃ।

৭। 'অপরাহ্লেতু সংপ্রাপ্তে অভিজিদ্রৌহিণোদয়ে। যদত্র দীয়তে জন্তো স্তদক্ষয়মুদাহৃতম্' এই মৎস্যপুরাণ বচনের 'সম্প্রাপ্তে' পদের যে 'সম্পৃক্ত' বা খণ্ড অর্থ করা হইয়াছে তাহা স্মার্ত্তসম্মত ব্যাখ্যা বলা চলেনা। 'মহাতীর্থের সম্প্রাপ্তে' এই বচনস্থ সংপ্রাপ্তের ব্যাখ্যায় স্মার্ত্ত বলিয়াছেন 'তত্তৎ ক্ষেত্রবাসাদিনা সম্যক্‌প্রাপ্তে নতু প্রথমপ্রাপ্তি মাত্রে সংশব্দানর্থক্যাপত্তেঃ। অর্থাৎ শ্রাদ্ধযোগ্য কাল নির্ণয়স্থলে সামান্যতঃ মুহূর্ত্তের বিধান করা আছে, মুহূর্ত্তে নূতনকাল শ্রাদ্ধবেলার অযোগ্য। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে' এই মীমাংসক সিদ্ধান্তমতে 'ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘাটকৈকা যদা ভবেৎ। সা তিথিঃ সকলাজ্ঞেয়া পিত্র্যর্থে চাপরাহ্লিকী'—এই বচনের সহিত একবাক্যতায় 'সংপ্রাপ্তের' অর্থ সম্যক অখণ্ডমুহূর্ত্ত প্রাপ্তি বুঝায়। ইহা স্বীকার না করিলে বাক্যভেদদোষ অনিবার্য্য হয়। অতএব শ্রীচক্রবর্ত্তী লিখিত বিকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য কি না সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

৮। 'ঊর্দ্ধং মুহূর্ত্তাৎ কুতপাৎ' এবং অপরাহ্লেতু সম্প্রাপ্তে ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাবসরে যে বিধ্যনুবাদ দোষের আশঙ্কা তুলিয়া উদয়াচল সম্বন্ধে অষ্টম ও নবমমুহূর্ত্তের সম্পূর্ণ প্রাপ্তি অপেক্ষিত হইতেছে না বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বাচার্য্য-ব্যাখ্যা সম্মত হইতেছে না। সুধী কাশীরাম বাচস্পতি বলিতেছেন 'বস্তুতস্তু কুতপাদূর্দ্ধং মুহূর্ত্ত চতুষ্টয়ং ইত্যেকপক্ষঃ, কুতপাদূর্দ্ধং মুহূর্ত্তপঞ্চকস্ত্বিপরপক্ষঃ, অতএব বচনে বা কারোহপি সঙ্গচ্ছতে। তথা চ মতভেদাৎ ন বিধ্যনুবাদ বৈষম্য মিত্যবধেয়ম্।' পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যেখানে বিধ্যনুবাদ দোষের সম্ভাবনাই নাই, সেইখানে বিধ্যনুবাদ দোষাশঙ্কায় যেভাবে বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করা হইয়াছে তাহা অচিন্তিতপূর্ব্ব। এখানেও সুধীগণ বিরুদ্ধ পক্ষের বিকৃত রুচির বিষয় অনুধাবন করুন।

৯। ধর্ম্মকৃত্যে বিহিতকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় তিথিতত্ত্বে পাঁচ প্রকারের কালের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—অতঃপর্য্যুদস্তে কাল-স্থাপি পরিগ্রহঃ। যদা তু পূর্ব্বাপরখণ্ডায়ারন্ততরস্তৈব পরিগ্রহস্তদা যথাযোগ্যং তত্রৈব··· যথাক্রমমাপৎ-সামান্য প্রশস্ত-প্রশস্ততর-প্রশস্ততমত্বেন জ্ঞেয়াঃ" এখানে স্মার্ত্তপাদ আপৎ সামান্যকালে শ্রাদ্ধ বিধানদ্বারা বানবৃদ্ধিরসক্ষয় বাদের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন তাহা নিঃস-ন্দেহে বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ মনুবচন অনুসারে রাত্র উভয় সন্ধ্যা ও অচিরোদিত কাল পর্য্যুদস্তকাল। তদন্তর আপৎও সামান্য কালত্ব ৫ম, ৬ষ্ঠ মুহূর্ত্তেও থাকে। আর শ্রাদ্ধতত্ত্বে আপরাহ্লিক শ্রাদ্ধকালপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'রাত্র্যাদি পর্য্যুদস্তেতর কাল-কুতপাদিমুহূর্ত্তপঞ্চক রোহি-ণাদিমুহূর্ত্তচতুষ্টয়-দশমাদি মুহূর্ত্তত্রয়রূপ-কালচতুষ্টয়ং আপ-রাহ্লিকশ্রাদ্ধে, বিহিত-প্রশস্ত-প্রশস্ততর-প্রশস্ততমত্বেন-বোধ্যমক্ষয়াদি ফলশ্রুতেঃ।' এই স্মার্ত্ত লিখনদ্বারা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—অস্তাচল সম্বন্ধহেতু 'যয়াস্তং সবিতা যাতি' ইত্যাদি হেতু প্রযুক্ত তিথির হ্রাস বৃদ্ধি যাহাই হউক না কেন তাহাতে শ্রাদ্ধের কাল নিরূপণ ব্যবস্থায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনা। তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম। শাস্ত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য দিনের অংশ বিশেষে পূজা ও শ্রাদ্ধাদির প্রশস্তাদি কাল নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মকর্ত্তার সৌভাগ্যে যদি প্রশস্তাদিকালে তিথির যোগ ঘটে তাহা হইলে উত্তম। যদি না ঘটে, তিথির অনুরোধে পর্য্যুদস্ততর সামান্য কালেই অবশ্যকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠেয় হইবে, কর্ম্মের লোপ হইবে না ইহাই স্মার্ত্তা-ভিপ্রেত সনাতন বিধি। সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি প্রাচীন ও প্রামাণিক আগমশাস্ত্রে কুত্রাপি বাণবৃদ্ধির সক্ষয়ের নামগন্ধ নাই। বাচস্পতি মিশ্র, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য এবং শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত-বর্গের অভিপ্রায়ের প্রকৃত ব্যাখ্যানুসারেও উহার ইঙ্গিত নাই। বিশিষ্ট স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনায় সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াছেন বলিয়াই সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে কালোপযোগী দৃগ্‌গণিতমত সিদ্ধ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অনুমোদন ও অনুসরণ করিতেছেন। আমরা আশাবাদী। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার ১৮৭৯ শক হইতে ১০টি আঞ্চলিক ভাষায় এবং ১৮৮১ শক হইতে ১২টি আঞ্চলিক ভাষায় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম্ম-কৃত্যোপযোগী বাস্তব তিথ্যাদি প্রকাশিত করিয়া ধার্ম্মিক-গণের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই পঞ্জিকার

নিরয়ণআদিবিন্দু এবং দৃগ্‌গণিতমতসিদ্ধ গ্রহস্ফুট, গ্রহণ, গ্রহের উদয়াস্তাদি গণনা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ রহিয়াছে। এই আদর্শে জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হইলে শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। সুধীগণ বিচার-বিবেচনা করিয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার বাস্তবতিথি বিষয়ে সিদ্ধান্তশাস্ত্রে অনভিজ্ঞের অযথাবাদে কর্ণপাত করা উচিত কি না সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন।

ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন এম-বি

ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করা মানবের মনের উন্নতি সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন মনকে একটি উচ্চস্তরে রাখে। মানুষের মনের বৃত্তিগুলির মধ্যে ভক্তিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। ইহা মানুষকে নৈতিক কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। আমাদের ঈশ্বরে ভক্তি হ্রাস হওয়ায় ভক্তিবৃত্তির সম্যক অনুশীলন হয় না। "ভক্তি পরানুরক্তি ঈশ্বরে।" ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

"ভক্তি আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তি-গুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয় সেই অবস্থাই ভক্তি। ভক্তি ঈশ্বরার্পিত হইলে আর সকল বৃত্তিগুলি যথা—প্রীতি, দয়া প্রভৃতি উহার অধীন হইবে এবং উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে। বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলে মনুষ্যত্ব নাই।" একথা বুঝা দুরূহ কিন্তু বুঝিবার বা আচরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "বর্ত্তমানে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তির পাত্রের উপর ভক্তি হ্রাস হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া তাহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, সকল মনুষ্যই সর্ব্ববিষয়ে সমান। কাহার কাহাকেও ভক্তি করিবার প্রয়োজন করেনা। ভক্তি যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি তাহা হীনতার পরি-চায়ক বলিয়া তাহাদের মনে হইয়াছে। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানে না।" দেশের বর্তমান যুগে এই অবস্থা। কিন্তু ভারতবাসী চিরকাল গুরু ও শ্রদ্ধার পাত্রকে ভক্তি করিয়া আসিয়াছে। ভারত ঋষি ও ভক্তের আবাসস্থল। নৈতিকবৃত্তিগুলির মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি। ভক্তি, প্রীতি, দয়া একসূত্রে গ্রথিত। মানুষের ভিতর ভক্তি না থাকিলে তাহার ভিতর সম্যক প্রীতি ও দয়া হইবার সম্ভাবনা কম।

মানবের ভক্তির পাত্রকে, আদর্শ মহাপুরুষদিগকে ও ঈশ্বরকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের, সকল গুণের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া একাগ্রমনে আদর্শ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। উপাস্য যতো বিরাট হইবেন তাঁহার প্রতি ভক্তি ততো বেশী আসিবে ও নৈতিক উন্নতি, আত্মোন্নতি হইবে।

ঈশ্বরে ভক্তি প্রদর্শন না করিয়াও নৈতিক সাধনার কয়েকটি পথ পৃথিবীর মনস্বীরা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১। হিউম্যানিষ্টরা বলেন যে, হিউম্যানিজ্‌ম ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে। মানবের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু দুঃস্থের প্রতি দয়া সহানুভূতি মানুষের আছে। সেইসঙ্গে মানবের প্রতি মানবের প্রগাঢ় প্রেম আছে কি? হিউম্যানিজ্‌ম লোককে তাহার সর্ব্ব-প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারে, কিন্তু সংসার শান্তিময় করিবার ব্যবস্থা তাহাতে হয় কি? সে কার্য্যের অবসর সময়ে নিজেকে উন্নত করিবার জন্য কি করিবে? হিউম্যানিষ্টরা বলেন যে, সমাজের লোকের আগ্রহের সহিত গ্রহণের ও মান্য করিবার উপযুক্ত কতক-গুলি আইন কানুনের অধীনে লোককে রাখিতে হইবে তাহা হইলে লোক সমাজ রক্ষা পাইবে। কিন্তু সমাজের লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নীতি অনুসরণ করা দরকার

সেজন্য নীতির একটী ভিত্তি চাই। ঈশ্বরের ন্যায় একটী দৃঢ়ভিত্তির উপর নীতি স্থাপিত না হইলে উহা বালির উপর নির্ম্মিত গৃহের ন্যায় দুর্ব্বল ও অস্থায়ী হইবে। হিউ-ম্যানিষ্ট ওয়েল্স্ বলেন যে, মানুষ বিশ্বাস ব্যতীত বাঁচিয়া থাকা কল্পনা করিতে পারে না। তিনি আশা করেন যে নূতন এক ধরণের লোক আসিবে। ক্রমোন্নতির ফলে পৃথিবীতে একদল মহত্তর মানব জন্মিবে। ঈশ্বরের উপাসক যেমন তাহার উপাস্যের ভিতর নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলেন, তেমনি হিউম্যানিষ্ট এই বৃহত্তর মহত্তর মানবের ভিতর নিজেকে নিমগ্ন করিবেন। কিন্তু ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পৃথিবীবাসী বুদ্ধির বলে বিজ্ঞানের বহুল উন্নতি করিলেও নৈতিক উন্নতির দিকে যাইতেছে না—বরং অবনতির দিকে যাইতেছে। এই অবস্থায় মহত্তর মানব জন্মিবার কি আশা আছে? মানবকে কেন্দ্র করিয়া যে নীতিতত্ত্ব গঠিত হয়—তাহা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া যে নীতিতত্ত্ব গঠিত হয় তাহা অপেক্ষা দুর্ব্বল।

২। বুদ্ধদেবকে কেহ ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নির্ব্বাক থাকিতেন। মনের উন্নতির দিকে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধদেব নিম্নলিখিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিয়া নৈতিক উন্নতির কথা প্রচার করিয়াছেন।

(১) সত্য ও লক্ষ্যে সজাগ দৃষ্টি।

(২) উচ্চাভিলাষ, ত্যাগ ও সর্ব্বজীবে হিতৈষণা ও প্রেম।

(৩) যথার্থ বাক্য প্রয়োগ, মিথ্যা না বলা, কাহারও প্রতি রূঢ় ভাষা প্রয়োগ না করা।

(৪) সৎকর্ম্ম করা, জীবহিংসা না করা, ইন্দ্রিয়-সংযম করা।

(৫) সৎ উপজীবিকা অবলম্বন।

(৬) ঠিক চেষ্টা করা, উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা মনের উন্নতি সাধন, লক্ষ্য করিয়া নিজের মনের দোষগুলি সংশোধন, নিজেকে প্রতারিত না করা।

(৭) ঠিকরূপ মনোযোগ, নিজের মনের উপর অধিকার লাভ, লালসা ও অবসাদকে দমন।

(৮) ঠিকরূপ জ্ঞান ও সত্যরূপের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, উৎসাহ, একাগ্রতা, বিশ্বাস, বাসনার নিবৃত্তি, স্বাধীনতা, সুখ দুঃখের হাত হইতে স্বাধীন হওয়া ও চিত্তের নির্ম্মলতা।

বুদ্ধদেবের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম না থাকিলেও মানবে এবং সর্ব্বজীবে তাঁহার অগাধ ও আত্যন্তিক প্রেম ছিল। জীবে-প্রেমকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার ঈশ্বরে অনুরক্তির স্থান অধিকার করিয়াছিল। বুদ্ধদেব বলেন, "মনের দ্বারা সুখভোগে শান্তি লাভ করিতে চাহিলে—নিজ অপেক্ষা বড় একটী কিছুর চিন্তায় তাহাকে নিমগ্ন থাকিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "যেমন বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই—তেমনি বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী, না হইলে মনুষ্যত্ব নাই, সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মোন্নতি নাই।" কোন বৃত্তির অনুশীলনের সময় ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে, ঈশ্বরে ভক্তি আনিবে। গীতা বলিয়াছেন—'ঈশ্বরে তুমি মনস্থির কর, ঈশ্বরে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, কর্ত্তা ঈশ্বর—তুমি ভৃত্য-স্বরূপ তাঁহার কর্ম্ম করিতেছ এইরূপ জ্ঞানে কর্ম্ম কর তাহা হইলে ভক্তির সাধন হইবে।' মানুষের ভিতর ভালমন্দ এই দুই প্রকারের বৃত্তি আছে। মন্দ বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া রাখিতে হইবে ও ভাল বৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিতে হইবে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের সর্ব্বোচ্চ স্থান ছিল বলা যায়। আমরা সাধনার অভাবে সেই উন্নতস্থানের অধিকারিত্ব হইতে ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়াছি।

বিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদ নিরীশ্বর হইবার পথের সহায়ক হইয়াছে। বিজ্ঞান দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু তাহার মাপজোকের গণ্ডীর ভিতর যাহা না আসে, তাহাকে সে আমল দেয় না। সে শিখাইতেছে যে, এক-মাত্র ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহই সত্য, আত্মা, পরমাত্মা অসত্য। শরীরের ভোগেই মানবজন্মের সার্থকতা।

জীবদেহে থাকে এইরূপ কয়েকটা জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়া বিজ্ঞান বলিতেছে যে জড়প্রকৃতি হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি হইতেছে। মার্ক্সবাদ ও বিজ্ঞানের প্রদত্ত এই শিক্ষার পরিণামে ঈশ্বরে ভক্তির চর্চ্চা হইতেছে না। বিজ্ঞান নানা ভোগ্য ও বিলাসিতার বস্তু প্রস্তুত করিয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত করিতেছে, তাহা পাইবার জন্য আমরা ব্যস্ত। ভোগের

দিকে যত বেশী নজর যাইবে—ধ্যান ও পরহিতের দিকে, নৈতিক উন্নতির দিকে নজর তত কম হইবে।

বিজ্ঞান অপেক্ষা নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন অধিক, নৈতিক উন্নতিতে ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় না বটে—কিন্তু ইহাতে নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়। মানুষের হৃদয়ে শান্তি আনিতে হইলে ইহার আবশ্যক। বিজ্ঞান মানবের যে সুখের ব্যবস্থা করিতেছে তাহা সামান্য এবং বাহ্যিক; নৈতিক উন্নতিতে তীব্র ও আভ্যন্তরিক সুখ লাভ করা যায় এবং ইহার ফলে অল্প ভোগ্যবস্তুতেই মন সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু ইহা সাধন করিতে হইলে মহৎ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করা চাই এবং নিজের সংযত হইবার প্রবৃত্তি ও উন্নতি সাধনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প থাকা চাই।

ইংরাজেরা এদেশ শাসন করিতে আসিয়াই দেশে প্রচলিত নীতিশিক্ষা প্রদানকারী অসংখ্য স্কুল তুলিয়া দিয়া তাহাদের পছন্দমত ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষাহীন স্কুল স্থাপন করে। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের স্কুলে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহার ফলে দেশে নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন —"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যাহারা বিধি বিধান করিয়া সমাজকে শিক্ষা দিতেন তাঁহারা আদর্শানুযায়ী জ্ঞান অর্জ্জন, ধ্যান, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যথাবিধি অবলম্বন না করায় অবনত হইয়া গেলেও নবাব বাদশাহদের আমলেও দেশের সমাজ ব্রাহ্মণ-শাসনে শাসিত ছিল। লোক-ব্যবহার শিথিল হয় নাই। লোকে সাধারণ ধর্ম্মের ও নীতির বিধানগুলিকে সরল বিশ্বাসে সম্মান করিত এবং গৃহস্থিত বালকদিগকে তাহা শিক্ষা দিত। তখন দেশের লোকের আদর্শ হইতে স্খলন ও নৈতিক অবনতি হয় নাই।" কিন্তু ইংরাজ আমলে ব্রাহ্মণেরা অধিকতর অবনত হইবার ফলে শিক্ষাদানে অনুপযুক্ত হওয়ায় এবং সমাজস্থ শিক্ষার্থীরা ধ্যান ও কষ্টকর ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় অনভ্যস্ত হইবার ফলে অবনত ও শ্রেয়-শিক্ষা লাভে অনিচ্ছুক হওয়ায় ব্রাহ্মণ এই সমাজের শিক্ষাদান কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। পরিণামে শিক্ষার অভাবে এবং ইংরাজের দোষগুলি অনুকরণ করিয়াও বিকৃত শিক্ষালাভ করিয়া বিকৃত পথে চলিয়া বর্ত্তমানে আমরা নীতিহীন হইতেছি, কেবলমাত্র অর্থলাভ ও ভোগেই জীবনের সার্থকতা—আমরা এইরূপ বিশ্বাস করিতেছি, পরহিতের কথা আমাদের মনে থাকে না। আমরা ঈশ্বরে ভক্তিহীন হইতেছি। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে অবহেলা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন; "আর্য্যসমাজের শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যকে ত্যাগ করিয়াও ভূমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।"

ভক্তি—যাহা মানুষের নীতিবিষয়ক শ্রেষ্ঠবৃত্তি—তাহার অনুশীলনের অভাবে, নৈতিক গুণের অভাবে আমাদের নৈতিক কার্য্যে প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে। আমাদের ছেলে-বয়সে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে ও পরিণত বয়সে অনেকের ভিতর চরিত্রহীনতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ অভাব দেখা যায়। দেশের লোকের প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই। স্বদেশজাতদ্রব্য ক্রয় করিবার দিকে আমাদের বিশেষ আগ্রহ নাই। লোকের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে, লোককে ঠকাইতে আমরা ইতস্ততঃ করি না। গভর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মচারীদের অনেকের ভিতর দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে দেশের লোকের প্রভু বলিয়া মনে করে। দেশের মঙ্গল অপেক্ষা তাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি বড় করিয়া দেখে। তাহারা উৎকোচ গ্রহণ, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইতেছে। বড় বড় মজুতদার middleman ও চোরাকারবারীদের কঠোর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করে না। এদিকে ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যের চাপে দেশবাসীর ওষ্ঠাগতপ্রাণ। রাজ্য পুনর্গঠন যদি ঠিক ভাষানুযায়ী করা হইত তাহা হইলে এক প্রদেশের লোকের অন্য প্রদেশের লোকের প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকিত না। স্বার্থান্ধ প্রদেশের সংকীর্ণ মনের সংশোধন হইত। ইহার পরিণামে জাতীয় একতা আসিত। দেশের লোকের নীতিহীনতার ফলে দেশের অধঃপতন হইতেছে।

পূর্ব্বকালে অন্যান্য দেশের লোক ধর্ম্ম যাজকের দ্বারা বা ধর্ম্ম পুস্তক হইতে ধর্ম্মের ও নীতির বিধান এবং লোক ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিত। অর্থের পূজা, মার্ক্স-বাদ, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল দেশের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের লোকেরই নৈতিক অবনতি হইতেছে ইহা অতীব দুর্লক্ষণ। নৈতিক উন্নতি পরের দুঃখ দূর করিবার প্রবৃত্তি আনে। নৈতিক

উন্নতি সাধনের জন্য সকল দেশের কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। যেমন বিজ্ঞানে উন্নতি করিতে হইবে, তেমনি হৃদয়বৃত্তির উন্নতি করিয়া হৃদয়ে প্রকৃত শান্তি আনিতে হইবে। পরহিতে রত থাকিবে। আপনার সুখ যেমন খুঁজিবে পরের সুখও তেমনি খুঁজিবে। এক পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন জীবাত্মার জন্ম, একজনের আত্মা অপরের আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্যের কষ্টে আপনার কষ্ট এবং অন্য দেশের লোকের কষ্টে আপনার দেশের লোকের কষ্ট অনুভব করিতে হইবে। এক দেশ অন্য দেশের লোককে কদাপি দুঃখ দিবে না। নৈতিক উন্নতি লাভের সহিত সকল দেশের নির্ভীক হইতেহইবে। নির্ভীকতা নৈতিক শিক্ষার অঙ্গ।

বর্ত্তমানে নৈতিক অবনতির ফলে, মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেমের অভাবে পৃথিবীর এক দেশ আর এক দেশকে ভয়ের চক্ষে দেখে, বন্ধুর চক্ষে দেখে না। তাহার পরিণামে প্রত্যেক দেশ আত্মরক্ষার জন্য পর্ব্বপ্রমাণ অর্থব্যয় করিতেছে। সব দেশের বিশেষ চেষ্টা করিয়া, নৈতিক উন্নতিলাভ করিয়া—কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না—এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও নিরস্ত্রীকরণ অবলম্বন করিয়া এই ভয় দূর করিতে হইবে এবং কোন দেশ অপর দেশের উপর অত্যাচারে উদ্যত হইলে সে দেশকে সংশোধন করিতে হইবে। এমার্সন বলিয়াছেন, "বুদ্ধি অপেক্ষা চরিত্রের স্থান উচ্চে।" নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত এলেক্সিস ক্যারেল বলেন, "বুদ্ধি অপেক্ষা নৈতিকশক্তির প্রয়োজন অধিক। বিজ্ঞান অপেক্ষা নৈতিক সৌন্দর্য্যই সভ্যতার ভিত্তি। যে জাতির ভিতর হইতে নৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হয় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।"

নতুন বোধন

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত এই ভারতের পুণ্যভূমি হতে
জ্ঞানের কুসুমরাজি করিতে চয়ন
উল্লঙ্ঘিয়া শৈল শৃঙ্গ, সেথা হতে
এল কত জ্ঞানী, কত গুণীজন
দিতে আর নিতে মিলিতে মিলাতে
বিশ্বের সুপ্রাচীন দুই সভ্যতারে।

এল দুই মহাজাতি কাছে অতি কাছে,
সংস্কৃতি ও সভ্যতার দানে প্রতিদানে ;
পুষ্পিত জীবনের স্নিগ্ধ উত্তরণে
সুনিবিড় মৈত্রীর বন্ধনে।
দু'হাজার বছরের (এই) অতীত কাহিনী
আজ নিক্ষিপ্ত তমসা গর্ভে। রণোন্মাদ পীত বাহিনী
আরণ্যক জিঘাংসার নগ্ন আক্রমণে—
হিমাদ্রির শুভ্রশুচি
অপবিত্র দিল করি
রক্তে আঁকা চিহ্নের বিকারে।

অভাবিত কৃতঘ্নতার কদর্য্যমূর্ত্তিতে
স্তম্ভিত বিস্মিত বিশ্ব বন্ধুত্বের এই প্রতিদানে।
রুদ্র তেজ দীপ্তশিখার উন্মোচিত অবগুণ্ঠন আজ,
প্রদীপ্ত নয়নে তাই দিকে দিকে উদ্ভাসিত বহ্নির প্রকাশ
শান্তিবাদী ভারতে পৌরুষের নবজাগরণ
সংকল্পে দুর্জ্জয়, তবু শান্ত, ধীর ধৈর্য্যে অবিচল।
কোটি কণ্ঠে ক্রোধ ঝরে, চিত্তে জাগে প্রতিজ্ঞা কঠিন।
সুসংহত ঐক্যবোধে বিভেদের কলঙ্ক বিলীন।
নির্বিবেক তস্করের অতর্কিত ঘৃণ্য অভিযান
জেলে দিল লক্ষ বক্ষে প্রতিরোধের অগ্নি অনির্ব্বাণ।
বর্ব্বর, কপট, ধূর্ত্ত দস্যু বিতাড়নে
কঠিন শপথে বদ্ধ দুর্গত এক নতুন বোধনে।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমি এলোমেলোভাবে বলা এই বিবৃতি পর পর সাজিয়ে ডাইরীর পাতায় লিখে ফেলছিলাম। এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে সদলবলে সহকারী কনকবাবু অফিস ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে তল্লাসপত্রের সঙ্গে একটা ভিরোলের প্যাকেটও ছিল। এ ছাড়া তিনি ঐ বড় ম্যানেজারের লেখা একটা চিরকুট পত্রও পকেট হতে বার করে দিলেন। এই ভিরোলের বাক্সোতে চারটে করে ভিরোলের শিশি থাকার কথা। কিন্তু সেখানে মাত্র তিনটি খোপে তিনটী ভিরোলের শিশি ছিল। আমি ঐ প্যাকেটের খালি খোপের দিকে একটু চেয়ে দেখে পত্রটা মনে মনে পড়তে স্বরু করে দিলাম। এই পত্রটীতে নিম্নোলিখিতরূপ কয়েকটী ছত্র ঐ বড়-ম্যানেজারের হস্তাক্ষরেও জবানীতে লেখা ছিল।

"আজই সকালের মধ্যে ভিরোলের অন্ততঃ একটা শিশি দরকার। হারু গোঁসাইএর হাত দিয়ে গুপ্ত তাজমহল হোটেলে আমার কক্ষে পাঠিয়ে দেবে। এদিকে তোমার একটা সুসংবাদও আছে। আমাদের বৌরাণী এবার পূজায় তোমাকেও দামী কাপড়-চোপড়—প্রয়োজনীয় অর্থাদি বকশিস্ দেবেন বলেছেন। আমি পরশু সন্ধ্যায় তোমার বাসায় গিয়ে একবার দেখা করবো।"

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম—এই ছোট ম্যানেজারের জীবনের বিষয়। যারা কোন এক এব্‌নরম্যাল পেশা বা প্রফেসন নেয়, তাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ এব্‌নর-ম্যালাটীকেই আঁকড়ে ধরে চলে। তাই এই ভদ্রলোকের শয়নে বসনে পত্নীসংগ্রহে ভাষায় ও ব্যবহারে কেবল মানসিক অসুস্থতাই আমরা দেখতে পেলাম। একে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁবে রাখতে পারলে ও আমাদের এই মামলায় একজন প্রধান সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করাতে পারবে। এই ধরণের মামলাতে প্রত্যেকটী বদ্ লোককেই আসামী করলে সাক্ষীর অভাবে মামলা টেঁকানো দায় হয়ে উঠে। তাই বেছে এদের কয়েকজনকে আসামী এবং কয়েকজন লোককে সাক্ষী করা ছাড়া উপায়ই বা কি? আমি এই ছোট ম্যানেজারকে আশ্বস্ত করে আমি সহকারীদের দিকে এত-ক্ষণে মুখ তুলে চাইলাম।

'আপনার কথাই ঠিক হলো স্যার'—প্রমাণ্য দ্রব্যগুলি টেবিল হতে তুলে নিতে নিতে সহকারী কনকবাবু বললে ওদের বাড়ী হতে এই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো পেলেও ছোট ম্যানেজারকে আমরা সেখানে পাই নি। সত্যিই যদি সে ফেরার হয় তো তাকে আর কখনই পাওয়া যাবে না। এখন মনে হচ্ছে—সুবোধবাবুও বোধ হয় বড়ো ম্যানেজারকে [গোঁফওয়ালা] না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতেন। ওদের পাকড়াও না করে ওদের বাড়ী তল্লাস করা বোধ হয় আমাদের উচিৎ হলো না।

এই যে তোমার সেই ছোট ম্যানেজার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবে বড়ো ম্যানেজারকে আর পাবে বলে মনে হয় না। আমি একটু চিন্তিত সহকারী সুবোধ-বাবুকে উত্তর করলাম—ভাগ্যগুণে এঁকে আমরা এখানেই পেয়ে গেছি বটে কিন্তু গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে কিছু কালের মধ্যে পাকড়াও করতে পারবো বলে মনে হয় না। এখন দেখ, সহকারী সুবোধ রায় তো এখনও সেখানে খানাতল্লাস করছেন। ইচ্ছে করেই আমি আর ওদের সেই হোটেলে এই দুঃসংবাদের জন্য ফোন করলাম না। উনি এখানে ফিরে এলেই সকল সমাচার অবগত হওয়া যাবে। তবে এখন আর একটা ভয়ঙ্কর মহাদায়িত্ব আমাদের উপরে বর্ত্তে গেল। আমাদের

এই অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা যদি সত্য বেচারামের পিতা হয়, তা'হলে এখুনি তাকে দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পারলে ঐ পলাতক বড় ম্যানেজারের আদেশে তার নিহত হবার সম্ভাবনা আছে। এখন আমাদের সকল কাজ কর্ম্ম ফেলে সকলে মিলে দিন রাত খেটে আমাদের এই মামলার ঐ অপহৃত প্রাথমিক সংবাদদাতাটীকে উদ্ধার করতেই হবে। এই ভদ্রলোকের বর্তমান অবস্থানের কিছুটা সংবাদ আমাদের এই অন্যতম আসামী বা সাক্ষী ছোট-ম্যানেজারের কাছ হতে সংগ্রহ করতেও পারা গেছে। এই বেচারামের পিতার জন্য অপহৃত ব্যক্তিটির জীবন রক্ষা করার জন্যই আমি এতো দিন এই ম্যানেজারদ্বয় এবং ঐ মহিলাদ্বয়কে গ্রেপ্তার করতে পারি নি। এতো কথা তোমাদের ও বড় সাহেবকে প্রাণ খুলে এতদিনে বলতে পারলাম কৈ!

'না স্যার! গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে পাওয়া গেল না'—আমার অপর সহকারী সুবোধবাবু অবসন্ন ভাবে আমার কক্ষে ঢুকে বললেন, তবে তাঁর হোটেলের কক্ষটি আমি তন্ন তন্ন করেই তল্লাস করেছি। কিন্তু তার সারা কক্ষটির মধ্যে একটি মাত্র ছোট চিরকুট ছাড়া আমাদের প্রয়োজন লাগতে পারে এমন আর কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য পাওয়া গেল না। এদিকে মালিককে না পাওয়ায় তার ঘরের তালা ভেঙে সেখানে ঢুকতে আমাদের আর এক বিপদ হয়েছিল। ঐ ঘরের যতো দ্রব্য খোলা ঘরে তো রেখে আসতে পারি না। তাই সেখানকার প্রতিটি দ্রব্যের একটা তালিকা বা ইনভেনটরী সাক্ষীদের সম্মুখে তৈরী করে ওগুলো ঐ হোটেলের ম্যানেজার ঘটিরামবাবুর হেপাজতে রেখে আসতে হলো। এই জন্যই না আমাদের থানায় ফিরতে এতো দেরী হয়ে গিয়েছে। এই চিরকুট পত্রটিতে তো লেখা রয়েছে যে—'আপনার ইচ্ছানুযায়ী এক শিশি ভিরল পাঠালাম—ইতি সুরেশ।' এখন ওখানে তদন্ত করে জেনেছি যে এই ছোট ম্যানেজারেরই নাম সুরেশ। এখন এই চিটি চাপাটির সাহায্যে এই ছোট ও বড় দুই ম্যানেজারকে জড়িয়ে ভালো একটা ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করা যেতে পারবে।

এতক্ষণ এই একই ঘরে বসে আমাদের ঐ ছোট ম্যানেজার মহাশয় ধীর ভাবে অথচ শঙ্কিত চিত্তে পর পর আমার দুইজন সহকারীরই প্রতিবেদন শুনে গেলেন। আমি আমার স্বস্থানে বসেই তার উদ্বেগপূর্ণ হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে পারছিলাম। এমন সময় এখানে আমাদের মহা-আকাঙ্খিত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ঠিক এই সময়েই আমি ভাবছিলাম যে ওঁকে একবার পেলে আগেভাগে ওঁর একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিতে পারলে সুবিধে হতো। আমি তাঁর হাতে তাঁর ভিজিটিং কার্ডটি গ্রহণ করে সসম্মানে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে আসন পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করলাম।

'আজ্ঞে! বোধ হয় আমার নাম আপনারা শুনে থাকবেন। আমি হচ্ছি কাশীপুরের বড় তরফের রাও বাহাদুর অমুক রায় 'ও-বি-ই'। এই কোটপ্যাণ্টুলেন পরা সুবেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভদ্রলোকটি আসন পরিগ্রহ করে আমাকে বললেন, 'আজ এই মাত্র আমি চার্টার্ড প্লেনে দিল্লী থেকে ফিরেছি। এখানে এসেই আমাদের ম্যানেজারকে তাজমহল হোটেল থেকে ডেকে পাঠাবার জন্য সরকারবাবুকে হুকুম দিই। কিন্তু শুনতে পেলাম যে এই থানা থেকে পুলিস এসে তাঁর ঘর সার্চ্চ করে একটু আগেই চলে গিয়েছেন। আমাদের ম্যানেজারবাবু সকাল থেকেই তাঁর ঘরে গর-হাজির—তা'হলে কি ছোট তরফের সুরজিতের কোনও অভিযোগে তাঁকে আপনারা গ্রেপ্তার করলেন। 'ওঃ! ঐ যে আমাদের পূর্ব্বতন ছোট-ম্যানেজারও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তা হ'লে এই শয়তানটাকে দিয়েই ওর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করানো হয়েছে।

নিজের পুত্রকন্যার, পোষ্যবর্গের ও কর্ম্মচারীদের দোষ সম্বন্ধে মানীগুণী মানুষরা স্বভাবতঃ অন্ধ থাকেন। নিজেদের স্ত্রীর দোষ অবশ্য কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। সে কথা এখন মুলতবী রাখাই ভালো। তবে এখানকার এই সব কুৎসিৎ কাণ্ডকারখানার মধ্যে অন্ততঃ এঁর যে কোনও সংস্রব নেই তাতে আমরা নিঃসন্দেহই ছিলাম। এখনকার মানুষ নিজেদের পুত্রকন্যাদেরই কুসঙ্গ থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু অনুরূপভাবে নিজেদের আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরও যে সম্ভাব্য কুসঙ্গ থেকে রক্ষা

করা দরকার সে' কথা এখন এঁকে কে বলে দেবে। বহু সাংঘাতিক 'ক্রিয়া-কর্ম্মই তলে তলে এঁর অগোচরে যে তাঁর এই ম্যানেজারের মধ্যমে এঁরই প্রিয়জনদের অনুরোধে সম্ঘটিত হয়েছে তা এখন এঁকে কে বিশ্বাস করাবে।

'আজ্ঞে! আমাদের এই বর্ষীয়ান বুড়ো ম্যানেজারকে আপনারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রাণ করছেন। এই কাশীপুর রাজষ্টেটের প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের নিরুত্তর থাকতে দেখে পুনরায় বলে চললেন, 'এই লোকটি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সত্তের টাকা মাসিক বেতনে আমাদের ষ্টেটের কাযে বহাল হন। এর পর কর্ম্মোদ্যোগ দেখিয়ে শনৈঃশনৈঃ বুড়ো ম্যানেজারের পদ পেলেন। আমাদের সাবেকী আমলের বিস্তীর্ণ জমিদারী থাকলে ওঁকেই দেওয়ান করা হতো। এখন একজন কর্ম্মদক্ষ মানুষ কি পুলিশ-গ্রাহ্য অন্যায় করতে পারে। আমাদের দেশের প্রাসাদে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি এলে উনিই তাদের তদারক করেছেন। ওঁর গুণে ও বুদ্ধিমত্তায় এই প্রদেশের বহু সাহেব সুবো ও বড়ো অফিসাররা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

এই মেজাজী নিরপরাধী অভিজাতবংশীয় ভদ্র-লোকটির বিষয় ভেবে আমাদের দুঃখই হচ্ছিল। উনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, আর দুইদিন বাদে হয়তো তাঁর পারিবারিক সম্মান ও মান ইজ্জতের অচিন্তনীয়-ভাবে মূল হতে টান পড়বে। আমি অতি কষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্থানত্যাগ করতে সম্মত করলাম। এই নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটির সংলাপে এমন মূল্যবান সময় আমরা নষ্ট করতে রাজী ছিলাম না। এই সময়কার প্রতিটি মুহূর্ত্তই আমাদের যথেষ্ট মূল্যবান ছিল।

এই জমীদার ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে আমি ভাব-ছিলাম যে এই ছোট তরফের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করবো কি না! একে একবার গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দিলেও এর সাক্ষী হিসাবে মূল্য কমে যাবারই কথা। অথচ মামলায় সাফল্যের জন্য একে সাক্ষী আমাদের করে নিতেই হবে। এদিকে বড়ো ম্যানেজার বাইরে মুক্ত থাকা কালীন একে ছেড়ে দিলে এই ছোট তার ঐ বড়োর খপ্পরে পড়ে তার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। কিন্তু এই আসামীর সাহায্য ব্যতিরেকে বেচারামের পিতা-মন্ত ভদ্রলোকটিকে এখুনি উদ্ধার করাও যাবে না। এইরূপে প্রতিটি কর্ত্তব্যের বিষয় ভেবে এঁকে আপাততঃ গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখাই আমরা উচিত মনে করলাম।

এই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল বেচারামের বিষয়। আমি ভাবছিলাম তাকে এইবার ডেকে পাঠালে হয়। এমন সময় মুখ তুলে দেখি—বেচারাম সসঙ্কোচ পদ-ক্ষেপে গুটি গুটি করে এই দিকেই আসছে। তার ছোট্ট মুখটা কাঁচুমাচু করে সে নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ভাষা-ভাষা চোখ দুটো তুলে সে নীরব ভাষাতেই বোধ হয় তার বিগত কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ তার পিতার সংবাদই আমাদের কাছ হতে জানতে চাইলে।

'খুব ভালো সময়ে তুমি এসে গেছো বেচারাম।' আমি একটু খুশী হয়েই বেচারামকে বললাম, 'তোমার পিতাকে খুঁজে বার করতে হ'লে তোমার সাহায্য আমাদের অপরিহার্য্য। ইনি হচ্ছেন কাশীপুরের ছোট তরফের ম্যানেজার। ইনি এই বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করবেন। এখন এঁকে একটু তুমি এ'জন্যে ধরে পড়ো।

অতি বড় চিকিৎসকরাও বোধ হয় কোনও দিন নিজেদের চিকিৎসা নিজেরা করতে পারে নি। সামান্য অসুস্থ হলেও তারা রোগ মুক্তির কারণে অসহায়ের মত পরের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠে। তাই বেচারামেরও আজ রহস্য সিরিজের ডিটেক্‌টিভ্ হওয়ায় সখ মিটে গিয়েছে। সে একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে ধুতিপরা ছোট ম্যানেজারের পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কেঁদে উঠলো। এই সময় ছোট ম্যানেজারকে দেখে মনে হলো যে পাথরও তা'হলে মধ্যে মধ্যে ঘেমে ভিজে উঠে। ভদ্রলোক আদর করে বেচারামকে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো! তার এই ভাবের অভিব্যক্তি আমার সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

'এই বালকের পিতাকে তা'হলে ওরা ওখানে আটকে রেখেছে, আমাদের আসামী ঐ ছোট ম্যানেজার হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠে এইবার বলে উঠলো, 'আজ্ঞে! সেই বন্দীকৃত মানুষটাকে একবার আমিও দেখেছি। এই সময় তাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে ধরাধরি করে ওরা বস্তীর মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। এই ছেলের মুখটারই একটা পাকা

ছাঁচ যেন তাঁর মুখের উপর বসানো। সেই লোকটা এই বালকেরই পিতা হওয়া অসম্ভব নয়। সাক্ষী দেবার ভয়ে আগে এইটুকুই মাত্র আপনাদের কাছে আমি গোপন করে গিয়েছি। আমি শুনেছি যে ওখানে রহমনিয়া ও হারু গোঁসাই পালা করে পাহারা দেয়। ওদের সঙ্গে আমারও ভালো রূপেই আলাপ আছে। আমার জামিনের ব্যবস্থা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে রহমনিয়া ও হারু গোসাই-এর কাছে এর মারফৎ একটা পত্র আমি পাঠাতে পারি। এই বেচারাম শুধু লুঙ্গি ও লাল ছেঁড়া গেঞ্জী পরে লকআপে খাবার দেওয়ার কনট্রাক্টরের নোকর সেজে ওদের কাছে গিয়ে বলতে পারে যে—পুরস্কারের লোভে গোপনে সে তাদের এই পত্রটী দিতে এসেছে। ওরাও থানাতে ধরা পড়লে এই হাজত ঘরের কয়েদীদের খাবারের কনট্রাক্টরের চাকরদের মারফৎ প্রায়ই এইরূপে খবর তাদের মরুব্বী ও উকিলবাবুদের কাছে পাঠিয়ে থাকে। এই ভাবে গুছিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে তারা একে একটুও সন্দেহ করবে না। তবে সাবধানে একে বস্তীর মধ্য দিয়ে এগুতে হবে। হঠাৎ বড় ম্যানেজারের সামনে পড়ে গেলে তার নির্দ্দেশে ওইখানেই তাকে তারা মেরে ওইখানেই ওকে পুতে ফেলবে। এইসব দেখেশুনেও ওখানকার কেউই ভয়ে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য মুখ খুলবে না।

এই ছোট-ম্যানেজারের এই বক্তৃতা থামলে বেচারাম দেহটাকে শক্ত করে চোখ রাঙা করে আমার দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে—সে এই বারে এখুনিই প্রস্তুত। এর পর অনুরূপ একটা পত্র ছোট ম্যানেজারকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে সে ত্বরিত গতিতে থানা থেকে বার হয়ে গেল। একবার আমরা ভাবলাম যে এই দুঃসাহসিক কায হতে বেচারামকে আমরা নিবৃত্ত করে আমরা নিজেরাই বহু লোক জন নিয়ে সেই বস্তীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু তাতে যে সেই সঠিক স্থানটী খুঁজে বার করবার পূর্ব্বেই সেখানে মহা মারাত্মক একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।

আমরা প্রায় কম্পিতকলরবে এই থানায় বেচারামের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় কতক্ষণ বসে রয়েছি। থানার বাইরে রাস্তার উপর সশস্ত্র সিপাই বোঝাই দুইখানি ট্রাক বাইরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘড়ীর কাঁটায় ফুটে ওঠা প্রতিটী মিনিটই আমাদের কাছে মনে হয় অতীব মূল্যবান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে কিন্তু বেচারামের দেখা নেই। আমাদের অনুতাপ হচ্ছিল এই ভেবে যে—বেচারামকে বোধ হয় আমরা বৃথাই এই কাযে ব্যবহার করে বিপদে ফেললাম। তাকে তার পিতার বিষয় না বললে হয়তো সে এই দুরূহ কাযে এমনিভাবে আত্মোৎসর্গ করতে রাজী হতো না। পরে হয়তো প্রকাশ পাবে যে, ঐ অপহৃত বন্দীকৃত ব্যক্তিটি আদপে বেচারামের পিতাই নয়। আমাদের কাউরই আর উপরে উঠে স্নানাহারের জন্য বিলম্ব ঘটাতে ইচ্ছা করছিল না। আমরা নিকটের একটা পরিষ্কার হোটেল থেকে প্রচুর রুটী ও সব্জি আনিয়ে উদর পূর্ত্তি করছিলাম। এমন সময় একজন উকীল সঙ্গে করে বেচারাম থানায় এসে সাবধানে আমাকে চোখের একটা ইসারা করলো। আমি অনুমানে বুঝলাম যে সে দস্যুদলের সেই বেসরকারী কারাগারটীর অবস্থানের সন্ধান পেয়েছে।

আরে মশাই, আমি হচ্ছি এখানকার আদালতের একজন উকীল, ময়লা পেণ্টুলেন ও ছেঁড়া কালো কোট-পরা উকীল ভদ্রলোকটী এগিয়ে এসে বললেন, আমার এক ক্লায়েণ্ট কাশীপুরের ছোট ম্যানেজারকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন। তা আমি জামীনদারদের সঙ্গে নিয়েই এসেছি। যদি বলেন তো তাদের ডেকে নিয়ে আসি। ওদের দুজনারই কাছে বাড়ী ভাড়ার রসীদ আছে। তাহলে স্যার এখন আমি ওদের এখানে ডেকে আনি।

তাড়াতাড়ী কথা কয়টী ব'লে এই উকীলবাবু অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখলেন যে তার নিয়োগকারী দুই ব্যক্তিই ইতিমধ্যেই সরে পড়েছে। আমি অনুমানে বুঝলাম যে এই রেণ্ট রিসিপ্টের অধিকারীরা হয়তো খোদ হারু গোঁসাই এবং রহমানিয়া খানই হবেন। খুব সম্ভবতঃ সিপাহী শান্ত্রী বোঝাই ট্রাক দুখানি থানায় দেখে সন্দেহ হওয়ায় তারা এতক্ষণে রাস্তার ওপারে গিয়ে বাসে করে সরে না পড়লেও সরে পড়বারই তালে আছেন। কিন্তু রাস্তার ওপারের চলমান মনুষ্য স্রোত ও অপেক্ষমান ভীড়ের মধ্যে এই আগন্তুকদ্বয়কে চিনেই বা বার করা যায় কি করে! হঠাৎ এই সময় রাস্তার ধারের জানালার ভিতর দিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম যে আমাদের বেচারামও

কখন সরে পড়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে তুইটী বিকট আকার লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে থানার দিকেই চেয়ে রয়েছে।

আমি উকীলবাবুকে আশ্বস্ত করে সমাদরে সেখানে বসিয়ে ত্বরিত গতিতে কয়েকজন ধুতি কোর্ত্তা পরা সিপাইকে চুপি চুপি বললাম—এক এক করকে ধীরে ধীরে তুম্ লোক বেচারামকে সামনে ওয়ালা দো আদমীকে ঘির লেও। যাও, পুয়লা যাও মতিহারী, উসকো বাদ যাও রামহরী। এইসেল ফরাক ফরাক এক এক আদমী যাও। সবকই এক সাথে যাবে তো উলোক স্ববা করবে আউর তুরল ভাগ ভি যাবে। এই ভাবে এইখানকার সিপাহী-গুলিকে প্রযোজনীয় উপদেশ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে আমি অফিসে এসে বসা মাত্র ঐ বেয়াড়া চেহারার লোক তুটো একটী চলমান ট্যাক্সী থামিয়ে তাতে উঠে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগেই আমাদের সেখানে ভীড় করা স্থশিক্ষিত সিপাহীরা সকলে মিলে তাদের পাকড়াও করে তাদের কাপড়ের খুঁট দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললে। এই তুই দস্যু সর্দ্দার 'ধৃতিকৃত' অবস্থায় থানায় আসা মাত্র তাদের মাসিক মাহিনায় বাঁধা এই উকীলবাবু হুঁ হাঁ করে বলে উঠলেন—আরে। এ আপনারা কি করেন মশাই ? ওরা হচ্ছে আমার খানদানী ঘরদোরওয়ালা ক্লায়েন্ট। ওদের চরিত্র সম্বন্ধে আমি নিজে আপনাদের এখানে সারটিফাই করে দিতে পারবো, এই উকীলবাবু তাঁর ক্লায়েন্টদের সপক্ষে যাই বলুন কেন আমরা ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলে-ছিলাম যে এই উকীলবাবুটীকে পর্য্যন্ত আপাততঃ এই থানা ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে দেওয়া আমাদের পক্ষে নিরাপদ হবে না। এদিকে আমরা এই ধৃতিকৃত ব্যক্তি-দ্বয়ের হেপাজতে প্রাপ্ত 'বাড়ী ভাড়ার রসীদ' পরীক্ষা করে বুঝলাম যে আমাদের অনুমান মিথ্যে হয় নি। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় আসামীদ্বয় দস্যু সর্দ্দার হারু গোঁসাই ও রহমান খাঁ—এইদিন অতর্কিতে আমাদের হাতে ধরা পড়ে গেল। এর পর আমরা এই নূতন আসামীদেরও হাজতে পুরে এবং এই উকীলবাবুকে থানায় নজরবন্দী করে বসিয়ে রেখে বিচকেকে নিয়ে শাস্ত্রী বোঝাই পুলিশ ট্রাকে উঠে কাশীপুরের সেই নামকরা বিস্তীর্ণ বস্তী গ্রামটীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

এই হারু গোঁসাই ও রহমান খাঁনের অবর্ত্তমানে অন্ততঃ কলিকাতায় কাশীপুর ষ্টেটের ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারবাবুটী যে একান্তরূপে অসহায় তা আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে নি। আমরা এ'ও বুঝেছিলাম যে এই প্রৌঢ় গোঁফওয়ালাবাবুর প্রেরণা ও বুদ্ধি ব্যতিরেকে এই তুইজনও এখন তাঁরই মতন অসহায়। তাই অকুস্থলে পৌছিয়ে আমরা কোনও এক প্রকাণ্ড বাধার সম্মুখীন না হওয়া সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম। এদিকে এই যান্ত্রিক যুগে কালীঘাট-শ্যামবাজার এখন ওপাড়ার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এইবার ইচ্ছে করেই ঐ বেনিয়াপুকুরের গুণ্ডা বদমাস অধ্যুষিত বস্তীটা বেশ একটু দূরেই আমাদের পুলিশের ট্রাকগুলি থামিয়ে দিলাম।

তোমাকে এইবার একটা কায করতে হবে বেচারাম। তুমি এখন এই মুফতি-পোষাকপরা রঙরুট সিপাই নিয়ে ঐ বস্তীর মধ্যে ঢুকে পড়ো। আমি বেচারামকেও আমাদের সঙ্গে আনা একমাত্র বে-উর্দ্দী সিপাইকে গাড়ী হতে নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি এই বেউর্দ্দী সিপাইকে কৌশলে দূর হতে সেই ঘরটী দেখিয়ে দিয়ে তুমি নিজে ছুতায় নাতায় সেখানে অপেক্ষা করবে। এর পর এই বে-উর্দ্দী সিপাই ফিরে এলে আমরা তুই দিক থেকে সাঁড়াসী অভিযান করে বস্তীর সেই কুঠরীটা অকস্মাৎ ভাবে ঘিরে ফেলবো।

বহুক্ষণ হোলো এই বে-উর্দ্দী সিপাহীটীকে সঙ্গে করে বেচারাম অদূরের ঐ বস্তীর গহন-অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এদিকে প্রায় এক ঘণ্টার ওপর হতে গেলেও তারা তখনও পর্য্যন্ত ফিরলো না। আমরা প্রতিটিক্ষণ ও পল আমাদের বুকের ঢুকঢুকানীর সঙ্গে তাল রেখে গুণে চলছি। বেচারাম জনসাধারণের একজন হওয়ায় তার জন্যে আমাদের কোনও অফিসিয়াল দায়িত্ব ছিল না। তবে তাতে নৈতিক দায়িত্ব থাকলে এজন্য আমাদের কাছ হতে ওপরওয়ালাদের নিকট হতে কৈফিয়ৎ চাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আমাদের হঠকারিতার জন্যে কোনও এক সরকারী মানুষের বিপদ ঘটলে তো এই জন্য আমাদের চাকুরী নিয়েই যে টানাটানি হতে পারে। বলা বাহুল্য পদ নির্ব্বিশেষে উপস্থিত প্রত্যেকটি সিপাহী শাস্ত্রী ও অফিসাররা এজন্য খুব বেশীরূপেই চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। আমি কনক, স্থবোধ ও ভক্তিবাবুকে নিয়ে ট্রাক হতে রাস্তায় নেমে পড়ে পায়চারী করতে লাগলাম।

'তাহলে এখন কি করা যায় ভাই—আমি পায়চারী করতে করতে উদ্বেগপূর্ণস্বরে সহকারীদের উদ্দেশ করে বললাম, 'আরও খানিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবে—না ওদের খোঁজে এক্ষুণি ঐ বিস্তীর্ণ বস্তীগ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়বে? কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত বস্তীর মধ্যে খেই-হারা হয়ে আমরা সহজে কি ওদের খুঁজে বার করতে পারবো?

আমার এই কথা আমি শেষ করেছি মাত্র। এমন সময় এক হৈ চৈ শব্দ শুনে আমরা একটু এগিয়ে গেলাম। এর একটু পরেই দেখা গেল যে, আমাদের সেই বে-উর্দ্দী সিপাহী ক্ষতবিক্ষত দেহে ও ছিন্ন-ভিন্ন বস্ত্রে প্রাণভয়ে এই দিকে দৌড়িয়ে আসছে। আর তার পিছন পিছন বহু বস্তীবাসী তাকে প্রহার করতে করতে ছুটে আসছে। আমাদের এখানে দেখে লাঠি-সোঁটা ও ইট-পাটকেল ফেলে এই উন্মত্ত জনতা আবার পরিত্রাহী ছুটে ঐ বস্তীর দিকে দৌড়িয়ে পালালো। বেচারামকে এই সিপাহীর সঙ্গে না দেখে আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে এই হতভাগা সিপাহী ওদের বন্দীশালাটা দেখে আসতে পারলেও বেরুবার সময় বিচকের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মগোপন করে উঠতে পারে নি।

এই আহত সিপাহীটীকে ফার্ষ্ট এড্ দিয়ে চিকিৎসা করা বা শুশ্রূষা করা আর হয়ে উঠলো না! এর কারণ—একমাত্র সেই আমাদের অকুস্থলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে এই আহত সিপাহীটিরও উৎসাহ কম ছিল না। আমরা তখুনি হুড়মুড় করে লরী থেকে নেমে সেই সাংঘাতিক বস্তীটি উদ্দেশ করে দৌড়তে স্বরু করলাম। যুদ্ধরত সৈনিকের ন্যায় ঐ আহত সিপাহীটীই আমাদের আগে আগে ছুটে পথ দেখাচ্ছিল। আঁকা-বাঁকা গলির পথে বস্তীর এ বাড়ী ও বাড়ীর পাশ ঘেঁসে আবর্জ্জনা স্তূপ, কর্দ্দমাক্ত নালা ও উপনালা এড়িয়ে আমরা একটা ঝুঁকে-পড়া বস্তী বাড়ীর সামনে এসে দেখলাম যে—কয় ব্যক্তি প্রাণ-পণে এই কক্ষটির দরজা বাইরে থেকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে। এই জরাজীর্ণ দরজাটি তারা ভেঙেও ঠিক ফেলে-ছিল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ভিতর থেকে কেউ না কেউ এই দরজাটা ঠেলে ধরে প্রাণপণে প্রতিরোধ করে চলেছে, আমাদের সবুট পদশব্দ ও হৈ হল্লা শুনে ঐ ঘরের ভিতর থেকে কে একজন চীৎকার করে বলে উঠলো—'স্যার! ঐ লোক দুটোকে ধরে ফেলুন।' ওদের একটাকেও আপনারা ছাড়বেন না।' এই মনুষ্য কণ্ঠটী অনুধাবন করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে—ঘরের ভিতরে এই প্রতিরোধ-কারী সৈনিকটি আমাদের বিচকে ওরফে বেচারাম ছাড়া অপর আর কেউই নয়।

আমরা এই গুণ্ডা দুটোকে পাকড়াও করে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলবার পূর্ব্বেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বেচারাম সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে চোখে তার এক অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমরা ঐ ঘরের মধ্যে ঢুকবার উপক্রম করা মাত্র সেখানে আর এক অনাসৃষ্টি কাণ্ড স্বরু হয়ে গেল। ইতি-মধ্যেই চারিদিক হতে সেখানে বেপরোয়া ভাবে ইষ্টক বৃষ্টি স্বরু হয়ে গিয়েছে। এখনও আমার মনে পড়ে—তাদের অফিসারদের দেহ অক্ষত রাখার জন্য উপস্থিত সাধারণ সিপাহী শাস্ত্রীর সে কি ব্যাকুলতা ও আকুলতা। নিজেরা আহত হয়েও তারা খোলার নীচু ছাউনির তলায় আমাদের জোর করে ঠেলে দিয়ে আমাদের মাথা বাঁচাচ্ছিল। এর পর আমরা নাচার হয়ে কয় রাউণ্ড ফাঁকা বন্দুকের গুলি ছোঁড়া মাত্র নিমিষে এই ইষ্টক বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি এই বিরাট বস্তীর এই বিশেষ অংশটীর আশে পাশে কোথাও জনপ্রাণী আর দেখা গেল না। যে দিকে ছুটে যাওয়া যায়, যে বাড়ীতেই ঢুকা যায়, সেইখানেই দেখা যায় একেবারে সর্ব্বত্রই ফাঁকা। আমার কিন্তু এই সময় সকল ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ঐ ধৃতিকৃত গুণ্ডা দুজনার উপরই এসে পড়লো। আমি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে এইখানে একটি নীতি ও রীতি বিগর্হিত অন্যায় কায করে বসেছিলাম।

'উল্লুক বদমায়েস কাঁহাকো। তোমলোককো এৎনা জুলুম', দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণপণে তাকে কীল ঘুসী চড় ও লাথি মারতে মারতে আমি বললাম, 'তুমলোক ক্যা সোচা? তুমসে হাম কোহী কমতি গুণ্ডা হ্যায়।

এইভাবে আমার ক্রোধের উপশম ঘটানো মাত্র আমি অবশ্য বিশেষরূপে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম। সিপাহী জমাদারদের সামনে এইরূপ এক অন্যায় ও বে-আইনি দৃষ্টান্ত স্থাপন আমার সহকারীরাও কেউ পছন্দ করে নি। কিন্তু ওদিকে এই আসামীদের এই অঘটন সম্পর্কে একেবারে নির্ব্বিকার বললেই চলে। এইরূপ এক

শাস্তি তারা তাদের পাওনারূপেই বোধ হয় মেনে নিয়েছিল। এমন কি আত্মরক্ষার জন্য সামান্য মাত্র চেষ্টা না করে তারা নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করছিল। এরা ছিল মধ্যযুগীয় মারসিনারী বা [পরদেশী] ভাড়াটে সৈন্যের মত। ধরা-পড়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তারা আপন কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে। কিন্তু ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ববিহীন হয়ে এখন এরা একান্তরূপে নিরপেক্ষ। এদের কোনও বিশেষ আঘাত না লাগলেও আমার ডান হাতটি ব্যথায় টনটনিয়ে উঠছিল, এই সময় আমার নজর পড়লো যে আমার হাতের হাতঘড়িটা এই ডামাডোলে কখন খুলে পড়ে গিয়েছে। আমার পায়ের নীচে ঘড়ীটা পাওয়া গেলেও এই ঘড়ীর কাঁচ ও রিমটা সেখানে দেখা গেল না। হঠাৎ অবাক হয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে—এই আসামীদেরই একজন খুঁজে পেতে ঐ দুটো সামগ্রী কুড়িয়ে নিয়ে সশ্রদ্ধ সম্মানের সঙ্গে আমার হাতে তুলে দিলে। এদের সেই উদারতার কারণ সেই দিন আমার পুলিশি মনে বুঝতে না পারলেও আজ আমি আমার বিজ্ঞানী মনে তা ভালো করেই বুঝতে পারি।

স্যার! ওদের ব্যবস্থা আপনি পরে করলেও পারতেন, আমাদের বেচারাম ব্যস্ত হয়ে এইবার আমাদিগকে অনুযোগ করে বললো, সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত এক ব্যক্তি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এক্ষুণি ওঁর চিকীৎসার ব্যবস্থা না করলে ওঁকে বাঁচানো শক্ত হবে।

এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে পড়ে আমরা সকলেই দিশে-হারা হয়ে গিয়েছিলাম। এইবার তাড়াতাড়ি ঐ ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখি যে একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর একটা ছেঁড়া চটে মরণাপন্ন অবস্থায় এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। তার মাথায় একটা ময়লা নেকড়ার মামুলী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকলেও তার তলায় একটা বালিশও দেওয়া নেই। আমি প্রথম দৃষ্টেই ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছিলাম।

আরে! একি আপনাকে ওরা এখানে এনে আটকে রেখেছে? আমি তাড়াতাড়ি তাঁর মাথার শিয়রের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে সেই যে একদিন থানায় ওপরে প্রমীলা দেবীর বাড়ীতে দেখলাম; তারপর থেকে এই তদন্ত সম্পর্কে আপনাকে কতো খুঁজলাম। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কোথায়ও আমরা আপনাকে পাই নি। যাক, আর ভয় নেই—আমরা ঠিক সময়েই এসে গিয়েছি।

'ঠিক সময়ে আপনারা আসেন নি। বরং বড্ড দেরী করেই এখানে এলেন,' ভদ্রলোক কাতরভাবে কাতরাতে কাতরাতে বললেন, 'আমার জীবন তো শেষ হয়ে এলো। এখন কোনও বিষয়ই আর আপনাদের কাছে গোপন করবো না। আপনি সেই মামলাটীর আসামীর খোঁজ নিশ্চয়ই এখনও পান নি। এখন সেই আসামী যে কে তা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি আপনাদের বলে দিতে চাই। আমি শীঘ্রই বোধ হয় বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে যাবো। এখুনি কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে বসুন এখানে।

আমি বেচারামকে বার করে দেবার অজুহাতে উপস্থিত সকলকেই এই ঘর হতে বার হয়ে যেতে বললাম। এর কারণ তখনও পর্য্যন্ত এঁকে বেচারামের পিতা বলে আমার সন্দেহ হচ্ছিল। এঁকে এমন সব কথা বলতে হতে পারে যা কোনও সন্তানের পক্ষে শুনা উচিৎ হবে না। এর কারণ ইনি গত হলেও তাঁর যুবক সন্তান বেঁচে থাকবে।

'কিন্তু একে এখুনি কি এম্বুলেন্স ডাকিয়ে হাঁসপাতালে পাঠানো উচিৎ হবে—আমার উদ্দেশ্য বুঝে জনৈক সহকারী আমাকে বললেন, 'এ ছাড়া একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে এনে এঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীও লিপিবদ্ধ করানো দরকার।'

এই সহকারীর উপদেশের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। আমি তাকে এই দুইটি কার্য্যেরই আশু ব্যবস্থা করতে বলে চৌকির এক কোণে গ্যাট হয়ে বসে পড়লাম। এরপর সত্বর কাগজপত্র বার করে এঁর একটি পুলিশী জবান-বন্দী লিখতে সুরু করে দিলাম। এই মুমূর্ষু রোগীর দীর্ঘ বিবৃতির মাত্র প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমার প্রথম জীবন হতেই আমি আমার কাহিনী সুরু করবো। আমি এই প্রমীলা দেবীরই স্বগ্রামবাসী। এক সময় আমি তাঁকে বিবাহ করতে উন্মুখ হয়ে উঠে-ছিলাম। কিন্তু আমরা প্রায় সমবয়সী ব'লে আমার পিতা এই বিবাহে সম্মতি দেন নি। উপরন্তু তিনি অন্যত্র আমার

বিবাহ দিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার চিন্তাও আমরা করতে পারতাম না। অগত্যা আমাকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র বিবাহ করে বাড়ী ফিরতে হলো। কিন্তু মনের প্রথম কাটা দাগ যে সহজে উঠে না—এই নির্ম্মম সত্যটি আমি বহু পরে বুঝেছি। যাই হোক প্রথম বিবাহে আমি সুখাই হয়েছিলাম। কিন্তু পর পর দুইটি সন্তানের জন্মের পরেই মৃত্যু ঘটায় আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আমাদের তৃতীয় সন্তান হওয়ার পর আমার এক দুঃসম্পর্কীয় বোনকে এক কানাকড়ি দিয়ে আমার নবজাত শিশুটিকে বিক্রয় করে পরের ছেলে করে রাখি। তখনকার লোকেদের বিশ্বাস মতে এইরূপ ব্যবস্থায় আমাদের এই সন্তানটি জীবিত থাকবে। এই সূত্রেই আমার ঐ একমাত্র সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল বেচারাম। ইতিমধ্যে আমরা পদ্মার ভাঙনে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে কলকাতায় চলে আসি। এইখানেই আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। আমার পক্ষে বেচারামকে নিয়ে আমি মুস্কিলে পড়ি। যে আত্মীয়ার কাছে তাকে একদিন আমরা নিয়মরক্ষার মত বেচেছিলাম, সেই সময় তাঁরা কলকাতাতে শাণ্ডিডাঙ্গা লেনের একটা বাড়ীতে থাকতেন। আমি তাদের কাছে ছেলেটিকে রেখে কানপুরে ও পরে এলাহাবাদে চলে আসি। এই সময় আবার আমি নিঃসঙ্গ অনুভব করছিলাম। এইটেই বরাবর ছিল আমার জীবনের জঘন্য দুর্বলতা। এই শহরে আমি আমার আশ্রয়দাতারই এক কন্যাকে বিবাহ করে তাদের ঘরজামাই হই। এই সময় আমি একজন অবিবাহিত বলে তাদের পরিচয় দিই। শ্বশুরের সাহায্যে ঠিকাদারী করে এইখানে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেছি। এর পর আমার এই নিঃসন্তান দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু হওয়া মাত্র বেচারামের জন্য আমার মন কেঁদে উঠে। বহু দিনের জোর করে চেপে রাখা বাসনা হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমি সোজা কলকাতায় এসে শান্তিডাঙা লেনে সেই বাড়ীর চিহ্নও পাই না। অগত্যা সেইখানেই একটি ঘর ভাড়া করে থেকে এখানে ওখানে বেচারামের সন্ধান করেছি। পরে একটি সংবাদ অনুযায়ী ঐ শহরতলী অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুনরায় প্রমীলা দেবীর খপ্পরে পড়ে যাই। প্রথমে তিনি আমাকে প্রত্যাখানই করেছিলেন। পরে দত্ত বলে এক ভদ্রলোকের মারফৎ একটি পত্র পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি এক সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলেন। কিন্তু সেটা যে তাঁর একটা অভিনয় ছিল তা আমি বুঝি নি। তাঁর সেই এক কথা যে—তিনি কোনও এক যুবকের উপর প্রতিশোধ নিতে চান। এই কার্য্যে আমি তাঁর সহায়ক হলে তবে তিনি আমাকে বিবাহ করবেন। এইবার বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে আমিই ঐ নির্দোষ অসহায় যুবকের চক্ষু দুটিতে ভিরল বিষ ঢেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর হতে প্রমীলার এই যুবকের প্রতি ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে যাই। প্রথমে আমাকে বুঝানো হয়েছিল যে পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্যেই তিনি ইচ্ছা করেই এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। আমার দ্বারা এই ভাবে কার্য্যোদ্ধার করানোর পর একদিন সকালে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে ঢুকতেই দিতে চাইলেন না। আমি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পূর্ব্বোক্ত পত্রটি প্রমাণস্বরূপ পুলিশে দাখিল করবো বলে তাকে শাসিয়েছিলাম মাত্র। প্রমীলা দেবী তখন ভয় পেয়ে ঘণ্টা দুই পরে আমাকে তাঁর বাড়ী আসতে বললেন। ইতিমধ্যে আমার মোহ কেটে যাওয়ায় আমি সুস্থ হয়ে আমার স্বাভাবিক সত্তা ফিরে পেয়েছি। এই জন্যে আমি আর তাঁর ঐ বাড়ীতে ফিরে যেতে পারি নি। এর পর হতে আমি যেখানেই যাই সেখানেই কয়েকজন সন্দেহমান ব্যক্তি আমার পিছু নিতে থাকে। কয়েকবার তারা আমাকে আক্রমণ করবারও চেষ্টা করেছে। এরপর একদিন আমার অবর্ত্তমানে আমার বাড়ীতে চুরী হয়ে যায়। এই চুরীর ধরন দেখে আমি বুঝতে পারি যে—ঐ পত্রটি হস্তগত করবার জন্যই এই চুরির অবতারণা করা হয়েছে। রিষড়া শ্রমিক ইউনিয়নের এক সম্পাদক আমার বিশেষ বন্ধু হতেন। একদিন তাঁর হাওড়ার বাড়ীতে যাবার সময় সহসা একদল লোক আমাকে আক্রমণ করলো। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য বুঝার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঐ পত্রটি পকেট হতে বার করে ঐ বন্ধুর হাতে তুলে দেওয়ামাত্র মস্তকে প্রচণ্ড একটি আঘাত পেলাম। এর পর জ্ঞান হওয়ার পর আমি দেখি যে এখানে বন্দী অবস্থায় শুয়ে আছি। আমি এ যাবৎ যা উপার্জ্জন করেছি, তা থেকে জমিয়ে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে বত্রিশ হাজার ছয়শত টাকা গচ্ছিত

রেখেছি। এ'ছাড়া বেচারামের পক্ষে আমি এই টাকা ও অন্যান্য সম্পত্তির একটা রেজিষ্টারী উইলও তৈরী করেছি। এই উইলও ব্যাঙ্কের পাশ বুক আমার পকেটেই রয়েছে। এখন এরা আমাকে জামা-কাপড় না ছাড়ানোর জন্যে ওগুলো এখানেই রয়েছে। দয়া করে বেচারামকে খুঁজে তাকে এইগুলো আপনাকে দিয়ে আসতে হবে। শান্তিডাঙ্গার বাসার.. বাক্সে বেচারামের মায়ের একটা ফটোও তার জন্যে আমি রেখে এসেছি। তাকে আপনি বলবেন যে, এ জীবনে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হলো না। কিন্তু সে যেন আমার এই সব কুকীর্ত্তির কথা কোনও দিনই না জানতে পারে।"

'কেন তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না,'—আমি এই-বার দয়াপরবশ হয়ে আমাদের প্রাথমিক সংবাদ-দাতা এই খগেন সরকার তথা বেচারাম ওরফে বিচকের পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আপনার ঐ পুত্রই আপনাকে খুঁজে বার করেছে। সে এখানেই আছে, এখুনি তাকে ডাকছি।'

এইখানেই বোধ হয় আমি না বুঝে একটি মস্ত ভুল করে ফেললাম। এই মুমূর্ষু রোগীর উত্তেজিত মানসিক অবস্থায় তার সামনে হঠাৎ এই ভাবে বেচারামকে এগিয়ে দেওয়া আমাদের উচিৎ হয় নি। বেচারাম 'বাবা' ব'লে দৌড়ে তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করা মাত্র ভদ্রলোক একবার মাত্র আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিমাতে তার ডান হাতখানি উপরে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হাত-খানি নীচে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে তিনিও নেতিয়ে পড়ে জ্ঞান-হারা হয়ে পড়লেন। ঠিক সময়েই একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও জনৈক ডাক্তারকে সঙ্গে করে আমাদের সহকারী অফিসাররা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে আমাদের অপর এক সহকারী একটি এ্যাম্বুলেন্স কারও অদূরে এনে হাজির করেছেন। এই রোগীর পরীক্ষান্তে সূচীযন্ত্রে ঔষধ প্রয়োগ করে ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ তাকে ষ্ট্রেচারে করে বস্তীর বাইরে এনে তাকে এম্বুলেন্স সহযোগে হাঁসপাতালে পাঠাবার উপদেশ দিলেন। এইরূপ অবস্থায় এই ডাক্তারবাবু এবং হাকিম বাহাদুরের এই রোগী সম্পর্কে করবার কিছুই ছিল না। আমি বেচারাম ও একজন সহকারীকে সঙ্গে দিয়ে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে সদলবলে এই বস্তীর বাইরে চলে এলাম। এরপর হাকিম ও ডাক্তারকে তাঁদের বাড়ী পৌছিয়ে ওখানকার ধৃতিকৃত আসামীদের সঙ্গে নিয়ে থানায় এসে উপস্থিত হলাম। বলা বাহুল্য যে, ঐ মুমূর্ষু রোগীটিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই জন্য হাঁসপাতালে পাহারা রাখার ব্যবস্থাও আমি করে-ছিলাম।

থানায় ফিরে'আমার প্রথম কায হলো—এই সব গুণ্ডা আসামী ও তাদের নেতা হারু ও রহমানের বিবৃতি গ্রহণ করা। এদের এই নেতৃদ্বয় ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে যে আমরা তাদের কয়েদ-করা বন্দীকে জীবিত উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি। থানার লক-আপে বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের যাওয়া-আসার বিরাম নেই। এইরূপ এক নূতন-আনা অপরাধীর মুখে বেনিয়াপুকুরের সেই বস্তীতে আজিকার ধরপাকড় সম্পর্কীয় সমাচার তারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছে। এরপর এই অপরাধ সম্পর্কে কোনও বিষয় অস্বীকার করায় লাভ নেই। তারা মনে মনে ঠিক করেছিল—পুলিশের কাছে স্বীকার করে হাকিমের কাছে এসব অস্বীকার করলেই চলবে। এদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বিবৃতি আমি লিপিবদ্ধ করে ফেলি। এরা সকলেই মূলতঃ একই প্রকারের বিবৃতি দিয়েছিল। এদের সকলের বিবৃতির সারমর্ম্ম একত্রিত করে উহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম—

'আজ্ঞে। আমরা যা কিছু করেছি তা এই বস্তীর মালিকের বড়ো ম্যানেজার অমুকবাবু মহাশয়ের নির্দ্দেশেই করেছি। ঐ দুটি বাড়ীতে পর পর চুরী করবার জন্যে ম্যানেজারবাবুর অনুরোধে এই বস্তীবাসী কয়েকজন তালা-তোড় সেয়ানাদের আমরা নিযুক্ত করি। এই চোরেদের তাঁবে রাখবার জন্যে চুরীর সময় আমাদেরও ঐ গৃহ দুটির আশে পাশে মজুত থাকতে হয়েছে। এই গোঁপওয়ালা ম্যানেজারবাবুও আমাদের সঙ্গে বাইরের খোলা জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। এই সিঁদেল চোরদের ওপর শুধু কাগজ পত্রসহ ড্রয়ার বাক্সো ও বাণ্ডিল বার করে আনার নির্দ্দেশ ছিল। এরা এগুলো বাইরের প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত স্থানে ও গলির পথে ব'য়ে আনলে ম্যানেজারবাবু স্বয়ং সেগুলো পরীক্ষা করে করে বাছতে থাকেন। কিন্তু এই দুই স্থানের কোনও স্থান হতেই ঐ প্রয়োজনীয় দলীল বা পত্রটি আমরা উদ্ধার করতে পারি নি। [ক্রমশঃ

বেদের পরিচয় ও হিন্দুধর্মে স্থান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম জগতের সর্বপুরাতন ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা বেদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বেদের মধ্যে যে বাক্যগুলি সর্বাপেক্ষা পুরাতন, সেগুলি পৃথিবীতে প্রকাশিত সকল পুরাতন বাক্যগুলির মধ্যে অন্যতম। আমরা হিন্দুরা এই বেদ-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া অনুশীলন করিয়া আসিতেছি। তথাপি, আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি, নীতি ও ধর্ম বিষয়ে অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীবন যাপন করিতেছি এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বিষয়ে, আমরা অনেক পরিমাণে হিংস্র বন্যপশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি।

আমরা এই প্রকার শ্রেষ্ঠধর্মের অধিকারী হইয়াও, কেন এই প্রকার শোচনীয় জীবন যাপন করিতেছি, তাহা চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ হইতেছে, আমাদের হিন্দুধর্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট এবং ভুল ধারণা।

আমাদের ধর্মশাস্ত্র অসংখ্য। তন্মধ্যে বহু শাস্ত্র লোপ পাইয়াছে। যাহা নানাস্থলে নানাভাষায় লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির পাঠ করা অথবা তাহার প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা একপ্রকার অসম্ভব। যাঁহারা আমাদিগকে ধর্মশাস্ত্র বুঝাইয়া দেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি সামান্যসংখ্যক ব্যক্তি হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে হৃদয় মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, অথবা প্রকৃত অনুভূতি ব্যতীত ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব নহে। সেই প্রকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বাদ দিলে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ, তাঁহারা নিজেরা শাস্ত্রপাঠ করিয়া তাহার মোটামুটি সারতত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ। তাঁহারা হয়তো মনে মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য না লইয়া আমাদিগকে শাস্ত্র বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাঁহারা নিজেরা শাস্ত্র সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং আমাদিগকে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা শুনাইয়া থাকেন। অন্য কেহ কেহ অত্যন্ত বিদ্বান, শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক বিষয় অবগত আছেন। কিন্তু, বহুদিনের পারিবারিক সংস্কার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিজ শিক্ষার ফলে, শাস্ত্র সম্বন্ধে, বিশেষতঃ শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ সম্বন্ধে, কতকগুলি ভুল ধারণা পোষণ করেন। তাঁহাদের নিকট আমরা শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া যথেষ্ট উপকার লাভ করি সত্য, কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে কতকগুলি ভুল অথবা গোঁড়ামীপূর্ণ ধারণা আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে। অন্য কেহ কেহ, নিজের অথবা নিজের দলের স্বার্থসিদ্ধির অথবা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, জানিয়া শুনিয়া, আমাদিগকে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা শুনাইয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ, জাগতিক স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণোদিত না হইয়াও, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য, ধর্মশাস্ত্রের অস্বাভাবিক এবং ভুল ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে ধর্মশাস্ত্র বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা সাধারণতঃ অতি উত্তম, কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক ও ভুল ব্যাখ্যা করেন। তদুপরি, আমাদের মনে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি অহৈতুকী ভীতি আছে, এবং আমরা শাস্ত্রের গতানুগতিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতে সাহস করি না। আমরা মনে ভাবি যে, সকল সময়ে রচিত, সকল ধর্মশাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা অভ্রান্ত এবং আমাদের প্রতি বাধ্যকর, এবং শাস্ত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিলে, আমরা পাপ অনুষ্ঠান করিব।

এই সকল কারণে, আমরা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং অনেক প্রকার ভুল পথে ধর্মঅনুশীলন করিয়া আসিতেছি। এই

সকল কারণের জন্যই, আমরা আমাদের "বেদ" শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা বহন করিয়া আসিতেছি।

আমরা "বেদ" বলিতে যে শাস্ত্রবাক্যগুলি বুঝি, তাহা অন্যান্য প্রাচীন হিন্দুধর্মশাস্ত্রের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই বাংলা দেশে সেই সংস্কৃত "বেদ" যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা অধিকাংশ বাঙ্গালীরা সংস্কৃত বেদ পড়িতে বা বুঝিতে অক্ষম। তদুপরি, বাংলা দেশে জাতি-সংমিশ্রণের ফলে অধিকাংশ ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত নিজেদের শূদ্র বলিয়া মনে করিতেন, এবং তাঁহারা ও স্ত্রীলোকেরা বেদ পাঠে অনধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। বেদের কিছু পরিমাণ বাংলা সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে এবং তাহারও যথেষ্ট পাঠক দেখা যায় না। বেদের যে অংশের নাম "উপনিষদ" কেবল সেই অংশের বাংলা সংস্করণ যথেষ্ট প্রচার লাভ করিয়াছে।

"বেদ" বলিতে আমরা চারিপ্রকার শাস্ত্রবাক্য বুঝি,—

(১) বেদসংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক, (৪) উপনিষদ। পূর্বে, বেদসংহিতা তিনখানি ছিল— (১) ঋক্‌বেদসংহিতা, (২) সামবেদসংহিতা, ও (৩) যজুর্ব্বেদসংহিতা। পরে, আর একখানি সংহিতা—(৪) অথর্ব বেদ সংহিতা-সংকলিত হইয়া, বর্ত্তমানে চারিখানি বেদ সংহিতা আছে।

এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান সময়ের মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে ধারণা সাময়িকভাবে ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমাদের ধর্মের ইতিহাস পড়িলে নিম্নলিখিত অবস্থা দেখা যায়।

উপরোক্ত বেদসংহিতাগুলি এক্ষণে পৃথক পৃথক ভাবে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উহারা যখন রচিত হয়, তখন পুস্তকাকারে রচিত হয় নাই। তাহা ছাপা হয় নাই, কারণ তখন ছাপাখানা আবিষ্কার হয় নাই। এমন কি, তাহা হস্তলিখিত পুস্তক হিসাবেও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, বহু হিন্দু ঋষি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, সিন্ধু নদীর কাছাকাছি স্থানে বাস করিতেন, এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তন্মধ্যে অনেক ঋষি ধর্মসম্বন্ধীয় বাক্য রচনা করিয়া তাঁহাদের শিষ্য ও বংশধরগণকে উহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, এবং সেই শিষ্য ও বংশধরগণ ঐ সকল বাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। এই ভাবে সেই উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে, শিষ্য ও বংশধর পরম্পরায় ধর্মবাক্য বহুস্থানে রক্ষিত ও প্রচারিত হইত। পরে, ক্রমে ক্রমে, ঐ সকল ঋষিবাক্য উত্তর-ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে, ঐ সকল জ্ঞানপূর্ণ বাক্য লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। বিভিন্ন ঋষির বাক্যগুলি বিভিন্ন দেশে লিপিবদ্ধ হইল। একই ঋষির বাক্য বিভিন্ন শিষ্যের ও বিভিন্ন বংশধরের দ্বারা বিভিন্ন দেশে, অল্পবিস্তর পার্থক্য সহ, প্রচারিত ও পরে লিপিবদ্ধ হইল।

এইভাবে বহু বৎসর কাটিয়া গেল। ঐ সকল বিভিন্ন বাক্য একত্র করা হইল না। মুদ্রাযন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায়, ঐ সকল মহাবাক্যগুলির মধ্যে কোন বাক্যই ছাপা হইল না।

তারপর, অতীতের কোন এক যুগে, কেহ বা কাহারা, ঐ সকল মঙ্গলকর বাক্যগুলি একত্র করিয়া প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা ঐ সকল হস্তলিখিত বাক্যগুলি নানা দেশ হইতে আনিয়া একত্র করিলেন, এবং সেই বাক্যগুলি কয়েক ভাগে বিভক্ত করিলেন। কথিত আছে যে, মহামুনি বেদ-ব্যাস ঐ ভাবে সেই বাক্যগুলি ভাগ করিয়াছিলেন। ঐ বাক্যগুলি জ্ঞানের সমষ্টি বলিয়া উহার নাম হইল "বেদ"। যিনি বেদ নামক জ্ঞানকে "ব্যাস" অর্থাৎ ভাগ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম বেদব্যাস। ঐ নাম সত্য কি কল্পিত, এ বিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ঐ "বেদ" বা জ্ঞানরাশির মধ্যে তিন প্রকার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথম বিষয়, যজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা ও তাহার নিয়মাবলী। দ্বিতীয় বিষয়, যজ্ঞ সম্বন্ধে দেবতার স্তুতি বাক্য। তৃতীয় বিষয়, ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চস্তরের আলোচনা।

এই বিষয়গুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, আমাদের ঋষিগণ আমাদের মঙ্গল বিধানের জন্য নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিলে এবং সেই সঙ্গে সেই সকল দেবতাদের স্তুতি করিলে স্বর্গ লাভ হয়। এই ব্যবস্থার দুটি উদ্দেশ্য বুঝা যায়। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবশ্যক, মনকে অসৎ বিষয় হইতে ফিরাইয়া সৎ বিষয়ে নিযুক্ত করা। যজ্ঞ করিলে অসৎ বৃত্তি প্রশমিত হইতে পারে, এবং মন পবিত্র হইতে পারে। সেজন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। তবে মানুষ স্বার্থের দাস। বিনা প্রলোভনে, যজ্ঞে মন ধাবিত না হইতে পারে জানিয়া, তাঁহারা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখাইলেন।

এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের, ও সেই সঙ্গে দেবতাগণের স্তুতির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু যজ্ঞই যে শেষ কথা নহে, স্বর্গই যে পরম লক্ষ্য নহে, তাহা ঋষিরা জানিতেন। সেইজন্য, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, ঈশ্বরে মন সমাধিস্থ করিয়া, জানিতে পারিলেন এবং সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানও বেদের মধ্যে সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও দেবতার স্তুতি সম্বন্ধীয় বাক্যগুলির নাম হইল বেদসংহিতা। তখন তিন ভাগে সংহিতা ভাগ করা হইয়াছিল—ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ। উপরোক্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ক অংশগুলির নাম হইল উপনিষদ। আজি এ পৃথিবীতে আমাদের প্রধান উপনিষদগুলির তুল্য উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক পুস্তক কোথাও রচিত হয় নাই।

উপনিষদগুলির মধ্যে কেবলমাত্র একখানি—"ঈশ" উপনিষদ যজুর্বেদ সংহিতায় সংযুক্ত দেখা যায়। ঋগ্‌বেদে বা সামবেদে সংহিতায় কোন উপনিষদ সংলগ্ন নাই। তবে ঐ বেদ সংহিতার যাগযজ্ঞের নিয়মাবলী সম্বলিত এক প্রকার জ্ঞান সংকলিত হইয়াছিল। উহাদের নাম "ব্রাহ্মণ"। প্রত্যেক বেদসংহিতার অন্তর্গত "ব্রাহ্মণ" আছে। ঐ "ব্রাহ্মণ" গুলির মধ্যে যে অংশ অরণ্যে ঋষিদের নিকট পাঠ হইত, তাহার নাম ছিল "আরণ্যক।" এই "ব্রাহ্মণ" ও "আরণ্যকের" সংলগ্ন কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপনিষদ আছে। ঋগ্বেদের "ব্রাহ্মণে" কৌষিতকী উপনিষদ ও ঐতরেয় উপনিষদ আছে। সামবেদের "ব্রাহ্মণে" ছান্দোগ্য উপনিষদ ও কেন উপনিষদ আছে। যজুর্বেদের "ব্রাহ্মণে—তৈত্তিরেয় উপনিষদ, কঠ উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ আছে।

পরে পুনরায় জ্ঞান সংকলন করিয়া আর একখানি বেদ-সংহিতা সংকলিত হয়। তাহার নাম "অথর্ববেদসংহিতা। তাহার "ব্রাহ্মণ" অংশে তিনখানি প্রধান উপনিষদ ও অন্য অনেকগুলি নিম্নস্তরের উপনিষদ আছে। ঐ তিন খানির নাম—প্রশ্ন উপনিষদ, মুণ্ডক্য উপনিষদ ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ।

উপরোল্লিখিত দ্বাদশ খানি উপনিষদ ভারতের তথা জগতের অমূল্য ধন। যিনি বা যাহারা আমাদের "বেদ" সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট জগত ঋণী।

এক্ষণে বেদ সংহিতাগুলির সম্বন্ধে বিশ্লেষণ আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে ঋক, সাম, ও যজুর স্থান অথর্বসংহিতা অপেক্ষা অনেক উপরে, কারণ, অথর্ব বেদে শত্রু-হিংসা প্রভৃতি বহু নিম্নস্তরের বাক্য আছে। ঋকবেদে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বাক্য ও দেবতার স্তুতি সম্বন্ধীয় বাক্য আছে। ঐ স্তুতিবাচক বাক্য ও অন্য বাক্য লইয়া সামবেদ-সংহিতা। যজুর্বেদ নানা যজ্ঞের বিষয়ে পরিপূর্ণ।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে,ঐ বেদসংহিতা-গুলি আমাদের বর্তমান সময়ে মুদ্রিত গ্রন্থের ন্যায় নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঋষির দ্বারা রচিত জ্ঞানের বাক্যগুলি একত্র সংকলন করিয়া যে জ্ঞানের সমষ্টি পাওয়া গিয়াছিল, তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বেদ'। সেই 'বেদ' বাক্যগুলি ভাগ করিয়া "বেদ-সংহিতা"গুলির পৃথক পৃথক রূপ দান করা হয়।

তিনখানি বেদ-সংহিতার মধ্যে সামবেদ সংহিতাকে ঋগ্‌বেদের অংশ বলা যায়। যজুর্বেদের বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদে যজ্ঞের কথা এবং যজ্ঞ উপলক্ষে দেবতাগণের স্তুতি সন্নিবেশিত আছে।

ঋগ্‌বেদে দশটী মণ্ডল আছে। প্রথম ও দশম মণ্ডলে বহুঋষির বাক্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে অঙ্গিরা, কন্ব, অগস্ত, গৌতম, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ প্রভৃতি মুনির বাক্য আছে। দ্বিতীয় হইতে নবম মণ্ডলের মধ্যে কোন একটী মণ্ডলে বিভিন্ন ঋষির বাক্য নাই। প্রত্যেকটিতে একই ঋষি বা তাহার বংশধরদিগের বাক্য আছে। এই মণ্ডল-গুলিতে ভৃগু, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষির বাক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কেবল নবম মণ্ডলে একমাত্র সোমদেবতার বিষয়ক বাক্য আছে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম মণ্ডলের প্রত্যেকটাতে দুই বা ততোধিক দেবতার সম্বন্ধে স্তুতি প্রভৃতি আছে।

এইভাবে ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ সংহিতায় দেবতার উদ্দেশ্য যজ্ঞ এবং স্তবস্তুতিপূর্ণ বাক্য আছে। তদ্ভিন্ন ঈশ্বর-বিষয়ক বাক্যও কিছু কিছু আছে। কিন্তু যজুর্বেদে সংযুক্ত "ঈশ" উপনিষদ ব্যতীত, অন্য কোন উপনিষদ এই তিনখানি বেদসংহিতায় কিংবা অথর্ববেদ সংহিতায় সংযুক্ত নাই। উপনিষদ্‌গুলি 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক' অংশে সন্নি-বেশিত আছে।

উপনিষদগুলির মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি ঋষিগণ ঈশ্বরে মন সমাধিস্থ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই তত্ত্বগুলি আমাদের প্রত্যেক হিন্দুর প্রতি বাধ্যকর। অর্থাৎ, যিনি নিজেকে হিন্দু বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহার ঐ তত্ত্ব-গুলির সত্যতা স্বীকার করিরা ধর্ম অনুশীলন করিতে হইবে।

কিন্তু, ঐ বেদ-সংহিতাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ হইলেও এবং আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার বিষয় হইলেও, তাহাদের মধ্যে সংকলিত যজ্ঞ ও স্তবস্তুতিগুলি আমাদের প্রতি, উপনিষদের বাক্যগুলির ন্যায়, বাধ্যকর নহে। বেদসংহিতার বাক্যগুলি বিবেচনা করিয়া আমরা আবশ্যকমত কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারি, এবং কোন অংশ বর্জন করিতে পারি। গীতায় বেদ সংহিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—

১। স্বর্গলাভ কামনায় যাগযজ্ঞ করা অনুচিত। নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করা আবশ্যক।

২। সকল প্রকার যাগযজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হইতেছে জপ-যজ্ঞ। অর্থাৎ, বাহ্যিক যজ্ঞ অপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধে মানসিক চিন্তাই মঙ্গলকর।

৩। ঋক্, সাম, যজুর্বেদসংহিতায় গীতায় উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের কোন উল্লেখ নাই। ঐ ঋক্ ও যজুর্বেদে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বাক্য আছে। সামবেদে দেবতার স্তুতি সম্বন্ধীয় বাক্য আছে। গীতায় বেদসংহিতাগুলির মধ্যে সামবেদকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

তদুপরি, বেদের সমস্ত প্রকার যজ্ঞের মধ্যে ২।১টী যজ্ঞ ব্যতীত অন্য সকল যজ্ঞ বহুদিন লোপ হইয়াছে।

এই অবস্থায়, বেদের প্রত্যেক অংশ অভ্রান্ত এবং আমাদের প্রত্যেক হিন্দুর প্রতি বাধ্যকর, এই ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূত। বেদের মধ্যে প্রধান উপনিষদগুলিই আমাদের প্রতি বাধ্যকর, বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বাধ্যকর নহে। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকগুলির মধ্যে যে অংশে উপনিষদ নাই, সেই সকল অংশ বেদ-সংহিতার অনুগামী, এবং সে গুলিকে বেদ সংহিতার অংশ বলা চলে। তদ্ভিন্ন অনেক উপনিষদ আছে যাহার প্রত্যেকখানি সামান্য গ্রন্থ বলিয়া বুঝা যায় না, এবং যাহার উক্তিগুলি ঐ প্রধান উপনিষদগুলির উক্তির বিরুদ্ধ হইলে আমাদের প্রতি বাধ্যকর নহে।

প্রধান উপনিষদগুলি বুঝিতে হইলে তাহাদের উপাখ্যান বা রূপক অংশ ত্যাগ করিয়া তাহার সারমর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কঠ উপনিষদে আত্মা প্রভৃতি গভীর তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে উপাখ্যান অংশ আছে। নচিকেতা যম রাজার বাড়ী গেলেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিন দিন উপবাস করিয়া অপেক্ষা করিলেন, এবং পরে যম রাজার নিকট আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বাক্য শুনিলেন। আমাদের ঐ উপাখ্যান অংশ ত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্বগুলি জানিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যমালয় বলিয়া কোন স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, এবং সেই রাজ্যের কর্ত্তা যমরাজেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। স্বর্গ-নরক প্রভৃতি স্থান বা দেশ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, এবং স্বর্গবাসী দেবতাদের সহিত এ পর্য্যন্ত কাহারও দেখাশুনা হয় নাই। অবশ্য, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের অমর আত্মা কোথাও অবস্থান করে। কিন্তু সেই স্থান আমাদের কলিতে স্বর্গ, নরক নহে। আমরা বহু সহস্র বৎসর, আমাদের মহান ধর্মশাস্ত্রের আক্ষরিক সত্যের উপর তথা-কথিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াও, অতি নিম্নস্তরের জীবন যাপন করিতেছি। একবার মনে সাহস ও বল সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের সারমর্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, তাহাতে আমরা আরও অবনত অবস্থা প্রাপ্ত হই, কিংবা ধর্ম অনুশীলনে উন্নতি লাভ করি। অন্ততঃ কয়েকজন বলিষ্ঠ মনযুক্ত নরনারী এই চেষ্টা করিয়া দেখিলে ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়।

আমাদের ধর্মের সারতত্ত্ব উপনিষদগুলিতে আছে। গীতায় উপনিষদের সারতত্ত্বগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে। আমরা সাধারণ ব্যক্তি ধর্মের নিম্নলিখিত বিষয় গুলি আপাততঃ মনে রাখিলে কতক পরিমাণে ধর্ম পথে উন্নতি করিতে পারি। তার পর, আন্তরিকভাবে ধর্ম অনুশীলন করিলে ঈশ্বরের কৃপায় উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়া উচ্চতর ধর্ম অনুশীলন করিতে পারিব।

১। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্য তত্ত্ব হইতেছেন ঈশ্বর। অন্য সমস্ত জীব ও বস্তু—চেতন অচেতন উদ্ভিদ স্থাবর জঙ্গম—ঈশ্বরের ভিতর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার ভিতরেই প্রবেশ করিবে।

২। ঈশ্বর সকল জীব ও বস্তুর মধ্যে আছেন এবং তাহাদের বাহিরে ও উপরে আছেন।

৩। ঈশ্বর নিরাকার এবং সাকার। তিনি সাকার-রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন পালন ও ধ্বংস করিতেছেন।

৪। ঈশ্বর পবিত্রতা স্বরূপ, সত্য স্বরূপ ও প্রেম স্বরূপ। তাঁহাকে পাইতে হইলে আমাদিগকে পবিত্র জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, সত্যপথে চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে ও সকলকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সকলের জন্য যথাসাধ্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে।

৫। আমাদের আত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার অংশ স্বরূপ, সুতরাং ঈশ্বরের ন্যায় অবয়ব। আমাদের দেহ নশ্বর, উহা পঞ্চভূতে মিলিয়া যায়, আবার পঞ্চভূত হইতে ফিরিয়া আসে।

৬। মনের দ্বারাই ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে। মনকে ইন্দ্রিয়গণ হইতে গুটাইয়া আনিয়া একান্ত করিয়া পরে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভাবে নিযুক্ত করিতে হইবে।

৭। কর্মফল সাধারণতঃ ভুগিতেই হইবে, কিন্তু পুরুষাকারের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করিলে কর্মফল ভুগিতে হয় না।

৮। আমাদের অনন্তজীবন। ঈশ্বরে মন স্থাপন করিয়া এই জন্মে বা পরের কোন জন্মে ঈশ্বর লাভ করাই আমাদের জীবনের সার্থকতা।

৯। সকল ধর্মপথ দিয়াই ঈশ্বর লাভ করা যায়। তবে তজ্জন্য আন্তরিক চেষ্টা আবশ্যক।

ভারতের তরুণ বীরেন্দ্রকেশরী

উপানন্দ

তোমরা যারা ইতিহাসের ছাত্র ও ছাত্রী, বোধহয় লক্ষ্য করেছ, ভারতবর্ষ চিরকালই আদর্শের পূজারী, মহান্ আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে ভারত বহুবার বিপন্ন হয়েছে। তার সারল্য, আতিথেয়তা, চারিত্রিক নিষ্ঠা ও আশ্রয়দানের সুযোগ নিয়ে বৈদেশিক বর্ব্বর দস্যুরা ভারতে প্রবেশ করেছে, সোনার ভারতকে অক্ষমতার পৈশাচিক ক্ষেত্র করে তুলেছে, আর ভারতবাসীকে অধঃপতন ও নীচতার অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়ে তার শ্বাসরোধ করেছে। জীবনে নিরাশা ও দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা করে ভারত বিশাল জগতের অমঙ্গল ও দুঃখদুর্দ্দশা দূর করবার জন্যে যুগ যুগ ব্যাপী তপস্যা করেছে, মানবাত্মার স্বাগত সম্ভাষণ করেছে বিশ্বমন্দিরে শক্তি ও আশার সঙ্গীতে, ভগবান নেমে এসেছেন ভারতেই মর্ত্ত্যলীলার জন্যে। ভারত চিত্ত ভগবদ্-মুখী—ভারতবর্ষের ভাগবতী তনু, এ যুগেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য স্বার্থগৃধ্নু জাতির মত ভারতের মন ও মুখ পৃথক নয়, শত্রুতায়ও ভারত আদর্শবাদী ও সত্যাশ্রয়ী। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর-সাধক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"দুই-চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়? প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বর জ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান। আমি বিদ্বান্ বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাহি না। ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি।···আমরা বৃথা 'ধন' 'ধন' বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবিনা প্রকৃত ধনী কে? যাঁহার ভগবৎপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাঁহার তুলনায় মহারাজাধিরাজরাও দীন ভিখারী। এরূপ অমূল্য ধন হারাইয়াও আমরা যে জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।"

সত্যের জয় হয়। সত্যব্রতী ভারতের পক্ষে সহস্র প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই স্বাধীনতাকে হনন করবার জন্য এক শ্রেণীর গৃহদাহী বিভীষণ পর্য্যায়ভুক্ত মানুষ, যারা ভারতের স্তন্য পান করে পুষ্ট হয়েছে, বৈদেশিক শত্রুকে ডেকে আন্‌তে উদ্যত। তারা জেনেও জান্‌তে চায় না পরাধীনতার কি সাংঘাতিক ভয়াবহ পরিণতি! তার কারণ শত্রুর দ্বারা তারা প্রলুব্ধ, শত্রুর অর্থে স্ফীত।

তোমরা নিশ্চয়ই ভারতের ইতিহাসে পড়েছ—ইংরাজ ছলে বলে কৌশলে ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কি ভাবেই না নৃশংসতা ও কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়ে গেছে। যে টিকেন্দ্রজিত একদিন অপরিসীম বীরত্ব ও অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য দেখিয়ে অসংখ্য ইংরেজ নরনারী ও শিশুর প্রাণরক্ষা করেছিলেন, কৃতঘ্ন ইংরাজ অবশেষে তাঁকেই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে বর্ব্বরতায় চরম নিদর্শন রেখে গেছে, কলঙ্কিত করেছে মানব সভ্যতার মহান্ আদর্শকে।

আজ সেই কথাই তোমাদের শোনাচ্ছি—মানুষ দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে। আমাদের দুভাবেই শিক্ষা হয়েছে বিদেশীর শাসনাধীনে থেকে। তবু আমাদের চেতনা হয় না। শত্রুকে উঁচু পিঁড়ি দিয়ে বসাতে চাই!

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা। নিস্তব্ধ রাত্রি। হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্র গর্জ্জে উঠলো আসাম সীমান্তের পার্ব্বত্যভূমি কম্পিত করে। নাগাদের শায়েস্তা করবার জন্যে অভিযান সুরু করলেন মণিপুরের বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল জনষ্টন। ইংরাজের কামানের বজ্রনিনাদ তুচ্ছ করে অরণ্যচারী

নাগারা তীর ধনুক আর বর্শা বল্লমে সজ্জিত হয়ে পিঁপড়ের সারির মত বেরিয়ে পড়লো। নাগাভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, তারা রুখে দাঁড়ালো, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। নাগারা চারিদিকের পথ রুদ্ধ করলো, টেলিগ্রাফ লাইন ছিন্ন করে সমস্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা পণ্ড করে দিল। অবস্থা গুরুতর। জনষ্টন সাহেব কিংকর্তব্য বিমূঢ়। বাধ্য হয়ে ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি কোহিমা দুর্গে বহু ইংরাজ নরনারী আশ্রয় নিল। নাগারা কোহিমা দুর্গ অবরোধ করলো। দুর্গম অরণ্য ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে কোন ইংরেজ বাহিনীর পক্ষেই দ্রুত সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসা সম্ভবপর নয়, সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই অবরুদ্ধ ইংরাজ নর-নারী ও শিশুদের হয় অনশনে, না হয় শত্রুর হাতে প্রাণ হারাতে হবে। এই বিপদের সময় জনষ্টন সাহেব মণিপুর রাজা চন্দ্রকীর্ত্তির শরণাপন্ন হোলেন। মর্ম্মন্তুদ বার্ত্তা শুনে চন্দ্রকীর্ত্তি বললেন—'যে বীর সবচেয়ে কম সৈন্য নিয়ে এ অভিযানে সাহস করবে, তার ওপরেই ভার দেবো সৈন্য পরিচালনার ভার।' রাজপুত্র ও সেনাপতিদের সাহসিকতায় সন্তুষ্ট হোলেও ঠিকমত আশ্বস্ত হোতে পারলেন না। ছুটে এলো কৈরং—এই কৈরংই মহারাজের চতুর্থ পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ। ছোটবেলা থেকে বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ায়, বনে বনে তাঁবু খাটিয়ে বাঘ ভালুক মেরে আনন্দ পায়, থাকেও প্রাসাদ ছেড়ে জঙ্গলে। তাই ওর নাম কৈরং অর্থাৎ জঙ্গলবাসী। শক্তি, সাহস তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা ও উদারতার জন্যে এ অরণ্যচারী তরুণ রাজপুত্র সর্ব্বজনপ্রিয়। ওর ওপর মহারাজার পূর্ণ আস্থা। অবিলম্বে টিকেন্দ্রজিতের ওপর কোহিমা অভিযানের ভার দিলেন মহারাজা। মাত্র দুহাজার সৈন্য নিয়ে টিকেন্দ্রজিৎ দেড় মাস ধরে কঠোর যুদ্ধ করলেন, কোহিমা দুর্গ দখল করে অবরুদ্ধ ইংরাজ নরনারী ও শিশুর প্রাণরক্ষা করলেন। অবিলম্বে টিকেন্দ্রজিতের বীরত্ব কাহিনী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ভারত গভর্ণমেণ্ট মহারাজ চন্দ্র-কীর্ত্তিকে কে-সি-এস-আই উপাধি, আর টিকেন্দ্রজিৎকে তাঁর বীরত্বের জন্য একটি স্বর্ণপদক দিলেন। অভিযানকারী দু'হাজার সৈনিকের প্রত্যেককে একটি করে উৎকৃষ্ট রাইফেল ও দশটি করে টাকা পুরস্কার দেওয়া হোলো।

পঁচিশ বৎসর বয়সে টিকেন্দ্রজিৎ গুরুদত্ত বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিরামিষভোজী হোলেন। এই বয়সে এক সঙ্গে এক শত বাঘ তরবারি নিয়ে শিকার করেছিলেন আর বিস্মিত করেছিলেন সকলকে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যু হয়। মণিপুরের রাজকুলপ্রথানুসারে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরাচন্দ্র রাজা হন। দ্বিতীয় পুত্র কুলচন্দ্র যুবরাজ পদে আর টিকেন্দ্রজিৎ প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হন। এসময়ে মণিপুরে বিদ্রোহ দেখা দিল। মণিপুরের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ভুবনসিংহের পুত্র বঙ্কোরোপা সিংহাসন অধিকারের জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে তুললেন, আর সদলবলে রাজধানী আক্রমণ করলেন। বিদ্রোহীদল বিপুল সংখ্যক। টিকেন্দ্রজিৎ সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্য চাইলেন। মণিপুরের পলিটি-ক্যাল এজেণ্ট প্রিমরোজ প্রত্যাখান করলেন। ইংরাজের ইতিহাসে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ বহুল পরিমাণে দেখা গেছে, এটিও নতুন কিছু নয়।

শেষে টিকেন্দ্রজিতের অপূর্ব্ব রণকৌশলে বিদ্রোহী নায়ক বঙ্কোরোপা সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হোলেন। এরপর আবার একটি বিদ্রোহ দেখা দিল। এর নেতা কুকী দলপতি তমহু। অবশেষে টিকেন্দ্রজিৎ বিদ্রোহী নায়ককে পরাজিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে মণিপুর রাজদরবারে উপস্থিত করলেন। টিকেন্দ্রজিতের শৌর্য্যবীর্য্য, তাঁর শক্তি সাহস, রণদক্ষতা ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা বৃটিশ পলিটি-ক্যাল এজেণ্টকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। মহারাজ সুরাচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ উভয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন। মহারাজ সুরাচন্দ্রের সহোদর ভ্রাতা ভৈরবজিৎ সিংহ ওরফে পাকাসেনার চেষ্টায় ভ্রাতৃবিদ্বেষ চরমে উঠলো। একদিন গভীর রাত্রিতে যুবরাজ কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ একযোগে মণিপুর কেল্লা আক্রমণ করলেন। মহারাজ সুরাচন্দ্র ও পাকাসেনা রেসিডেন্সিতে পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকে দুজনের কেউ নড়তে রাজি হোলেন না। বিনাযুদ্ধে এবং রক্তপাতে দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও বারুদাগার আক্রমণকারীদের দখলে এলো। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী আসামের চীফ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব গভর্ণর জেনারেলের আদেশপত্রানুসারে মহারাজ সুরাচন্দ্র সিংহাসন-চ্যুত হোলেন, আর সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ বিদ্রোহী হয়ে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করেছেন এই অপরাধে তাঁকে মণিপুর থেকে নির্ব্বাসিত করা হবে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হোলো।

টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে চীফ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। জানতেন এ ব্যাঘ্রকে সহজে পিঞ্জরাবদ্ধ করা যাবে না। তাঁর মণিপুরে আগমনের কারণ কি হোতে পারে টিকেন্দ্রজিতের পক্ষে বুঝতে বিলম্ব হোলো না। কুইণ্টন সাহেব মণিপুরে এসে সেই দিনই বেলা বারোটার সময় মহারাজ কুলাচন্দ্র ও টিকেন্দ্র-জিৎকে বিশেষগুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্যে রেসিডেন্সির দরবারে আমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে মহারাজ কুলচন্দ্র সদলবলে রেসিডেন্সির দরবারে উপস্থিত হোলেন। কিন্তু রেসিডেন্সিতে কোন সৈন্য প্রবেশের অনুমতি নেই জেনে টিকেন্দ্রজিৎ আর সেখানে গেলেন না।

কুইণ্টন সাহেব বুঝলেন—টিকেন্দ্রজিৎ সোজা লোক নন। মহারাজ কুলচন্দ্রের ওপর আদেশ হোলো সেনাপতিকে বৃটিশের হস্তে অর্পণ না করলে তিনি গদিচ্যুত

হবেন। নির্ভীক কুলচন্দ্র জানিয়ে দিলেন—অসম্ভব। টিকেন্দ্রজিতের গৃহে বৃটিশ সৈন্য অতর্কিতে হানা দিল, নিদ্রিত অবস্থায় টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করে আনাই উদ্দেশ্য। পূর্ব থেকেই গৃহরক্ষীরা প্রস্তুত ছিল। উভয় পক্ষে প্রচণ্ডভাবে গুলি বিনিময় হোলো। লেফটেনাণ্ট ব্রাকেনবেরী প্রাণ হারালেন। শেষে ইংরাজ সৈন্য প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যে টিকেন্দ্রজিতের গৃহে প্রবেশ করে দেখলো গৃহ একদম ফাঁকা। তারপর ক্রুদ্ধ সৈন্যবাহিনী রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলো। এই আক্রমণকালে ইংরাজেরা যে অমানুষিক অত্যাচার ও লোমহর্ষণ কাণ্ড করেছে তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ইংরাজের যথেচ্ছাচারিতার কবলে বহু নরনারী ও শিশু প্রাণ হারালো। টিকেন্দ্রজিৎ আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না, অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে স্বয়ং যুদ্ধ সুরু করলেন।

মণিপুরের বিদ্রোহবহ্নি বিষুবিয়সের অগ্ন্যুদ্গীরণের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, পুরোভাগে দাঁড়ালেন বীরকেশরী টিকেন্দ্রজিৎ। প্রচণ্ডযুদ্ধে ইংরাজেরা পলায়ন সুরু করলো। রেসিডেন্সিতে আশ্রয় নিল। কিন্তু টিকেন্দ্রজিতের গোলাবর্ষণে রেসিডেন্সির ঘর বাড়ী অফিস কাছারি সব ভগ্নস্তূপে পরিণত হোলো। শোচনীয়ভাবে পরাজিত ইংরাজ বাহিনী আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখলো না। রাত্রি সাতটার সময় চীফ-কমিশনর মহারাজ কুলচন্দ্রের কাছে সন্ধি প্রস্তাব করে পাঠালেন।

মণিপুর দূত এসে জানিয়ে গেল—নিরস্ত্র অবস্থায় চীফ কমিশনরকে সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। বাধ্য হয়ে তাই করতে হোলো। কুইণ্টন সাহেব মেসার্স স্কেন, গ্রিমউড, কাসিনস ও সিমসনকে নিয়ে টিকেন্দ্রজিতের শিবিরে গেলেন। টিকেন্দ্রজিতের আদেশে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হোলো কেল্লার ভেতর।

সন্ধির সর্ত হোলো Quit manipur নিরস্ত্র অবস্থায় ইংরাজদের মণিপুর ছাড়তে হবে। মণিপুরে ইংরাজরা শিশুহত্যা, নারীহত্যা ও মন্দির অপবিত্র করায় মণিপুরীরা ক্ষিপ্ত। বৃদ্ধমন্ত্রী টঙ্গল্ জেনারেলের উস্কানিতে জনতা রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে এসে দাঁড়ালো। টিকেন্দ্রজিৎ সাহেবদের বারণ করলেন প্রাসাদ ত্যাগ করতে। কুইণ্টন সাহেব তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে সদল বলে বাইরে আসা মাত্র উত্তেজিত মণিপুরী সেনাদের হাতে সকলেই নিহত হোলেন। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের কোন সংস্রব ছিলনা। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে শেষে তাঁকেই এর সঙ্গে জড়িত করে ফাঁসির আসামী রূপে দাঁড় করান হয়।

পরাজিত ইংরাজেরা প্রাণভয়ে কাছাড়ের দিকে ছুটল। পলায়মান ইংরাজদের অধিকাংশই মণিপুরী সৈন্যের হাতে নিহত বা বন্দী। পূর্বেই বলেছি ভারতবাসীরা চিরকালই উদার ও সহৃদয়, তাই টিকেন্দ্রজিৎ বন্দী ইংরাজদের প্রতি যথোচিত সদয় ব্যবহার করে কিছুদিন বাদেই তাদের মুক্ত করে দিলেন। মণিপুরে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ব্রিটিশ মসনদ কেঁপে উঠলো। জেনারেল গ্রেহামের অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল মণিপুরে প্রেরিত হোলো। শিলচর হোতে আর একদল ইংরেজবাহিনী এসে গ্রেহামের দলের পুষ্টিসাধন করলো।

নির্ভীক টিকেন্দ্রজিৎ দেশের স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্যে বীরপুরুষের মত সংগ্রামে লিপ্ত হোলেন। কিছুদিন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চললো। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠলো। শেষে অনর্থক লোকক্ষয় না করে টিকেন্দ্রজিৎ ও কুলচন্দ্র মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করলেন। বুঝে দেখলেন,এযুদ্ধে তাঁদের জয়ের আশা তিরোহিত। ইংরাজরা মণিপুর কেল্লা ও রাজপ্রাসাদ দখল করে অমানুষিক অত্যাচার সুরু করলো, কোন সন্ধানই পেলোনা কোথায় টিকেন্দ্রজিৎ আর কুলচন্দ্র লুকিয়ে আছেন।

বহুদিন ধরে অনুসন্ধানী কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে শেষে ইংরাজরা টিকেন্দ্রজিৎ ও কুলচন্দ্রকে ধরে ফেললো। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই সুরু হোলো কুলচন্দ্র টিকেন্দ্রজিৎ ও বৃদ্ধ টঙ্গল জেনারেলের বিচার। মহারাজ কুলচন্দ্রের প্রতি নির্বাসন আর টিকেন্দ্রজিৎ ও টঙ্গল জেনারেলের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হোলো। টিকেন্দ্রজিতের কৌন্সিলি ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। তিনি প্রমাণ করলেন—মণিপুর স্বাধীন রাজ্য সেখানে ভারতীয় দণ্ড বিধি আইন প্রযোজ্য নয়, সুতরাং বর্ত্তমান মামলায়ও তা প্রয়োগ করবার অধিকার ব্রিটিশের নেই। বৃটিশ পার্লামেণ্টেও টিকেন্দ্রজিতের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে লর্ডরিপণ প্রভৃতি ইংরেজগণ তর্কবিতর্ক করেন শেষ পর্য্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়ে গেল।

টঙ্গল জেনারেল বৃদ্ধ, ৮৫ বছর বয়সে চলচ্ছক্তি রহিত। তাঁকে ইংরাজেরা গাড়ী করে ফাঁসি মঞ্চে নিয়ে গিয়ে ধরাধরি করে তুলে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। এরূপ একটি স্থবির দুর্ব্বল ও পরপারে যাওয়ার প্রতীক্ষায় রত মানুষকে ফাঁসি কাষ্ঠে লটকে দিয়ে প্রতিশোধ পরায়ন ইংরাজ সভ্যতাকে বিষাক্ত করে তুললো। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ইংরাজদের পোলো খেলার মাঠে টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর। মৃত্যু তাঁর নশ্বর দেহকে গ্রাস করলো বটে; ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন।

আজ ভারতবর্ষে টিকেন্দ্রজিতের মত বীর সন্তানের বিশেষ প্রয়োজন। তোমরা তাঁর আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ

করে জাতীয় পতাকা তলে এসে দাঁড়াও—বিশ্বাস আছে, পৃথিবীর কোন শক্তি আর ভারতের কোন শত্রুই তোমাদের কেশস্পর্শ করতে পারবেনা। তোমরা অজেয়, তোমরা রণদুর্বার, তোমরা জন্মভূমির বীর সন্তান।

—

ফ্রাঁস্কোয়া কোপ্যে

রচিত

সোনার মোহর

সৌম্য গুপ্ত

[ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী-সাহিত্যে যে সব প্রতিভাশালী কথাশিল্পীদের আবির্ভাব হয়েছিল—ফ্রাঁস্কোয়া কোপ্যে তাঁদের অন্যতম। তদানীন্তন সাহিত্য-জগতে ফ্রাঁস্কোয়া কোপ্যে ছিলেন বিশেষ-জনপ্রিয় কীর্তিমান লেখক…গদ্য এবং পদ্য রচনাতে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। তাঁর বিবিধ রচনাবলীর মধ্যে সেকালের ফরাসী-সমাজের মধ্যবিত্ত আর দীন দরিদ্র মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর অভাব-অভিযোগে ভরা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিবিধ বর্ণোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবির সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। কোপ্যের অসাধারণ লেখনীর স্পর্শে সমাজের নিপীড়িত-জনগণের এ সব চিত্র শুধু যে মূর্ত সজীব আর নিখুঁত-বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে তাই নয়, তাদের প্রতি লেখকের দরদী-মনের দরাজ-সহানুভূতি ঐকান্তিক সমবেদনা আর দুঃখদুর্দশা-মোচনের পথ-নির্দ্দেশের পরিচয় মেলে এগুলি থেকে। সহজ-সরল অনবদ্য-ভাষায় লেখা ফ্রাঁস্কোয়ার অপরূপ-প্রাণবন্ত গদ্য ও পদ্য রচনাবলী আজো তাই সারা দুনিয়ার সাহিত্যরসিকদের কাছে অমর-সম্পদ হয়ে রয়েছে। ফ্রাঁস্কোয়া কোপ্যের জন্ম—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে…সুদীর্ঘকাল সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি করে, ১৯০৪ সালে প্রৌঢ়-বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন। এবারে তাঁরই রচিত একটি সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী তোমাদের বলছি।]

শীতকাল…কন্‌কনে-ঠাণ্ডা বাতাসের দাপটে সারা সহর কাঁপিয়ে তুলেছে! পথ-ঘাট সব শাদা হয়ে রয়েছে বরফের স্তূপে…তবু লোক-চলাচল বন্ধ নেই—এমন হাড়-কাঁপানো হিমের রাতেও!

বড়দিনের সন্ধ্যা (Christmas Eve)…সহরের লোকজন সবাই মেতে উঠেছে উৎসবের আনন্দে।

সদর রাস্তার মোড়েই সুসজ্জিত জুয়ার আড্ডা… জুয়াড়ীদের ভীড়ে আসর রীতিমত জমজমাট…ভাগ্যের জোয়ার-ভাঁটায়, কত লোক রাশি-রাশি টাকা জিতছে, কত লোক হারছে! সে আসরে 'রুলে' (Roulette) খেলার টেবিলের কিনারে বসে স্তব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ল্যুসিয়েঁ দ্য হেম্‌ যখন দেখলেন যে তাঁর শেষ-কপর্দ্দক হাজার-ফ্রাঁর (a thousand Franc Note) কর্‌করে নোটখানাও বরাতের ফেরে চলে গেল অপরের জিম্মায়, তখন তিনি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন! পকেট তাঁর একেবারেই শূন্য…আজকের এই উৎসব-সন্ধ্যায় জুয়ার বাজী জিতে রাতারাতি বরাত-ফেরানোর নেশায় এতকাল ধরে তিলেতিলে বহুকষ্টে তিনি যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, এ আসরে বসে কিছুক্ষণের মধ্যে সে সবই হারালেন…এখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব, রিক্ত…একটি কানা-কড়িমাত্রও সম্বল নেই তাঁর।

ল্যুসিয়েঁর মাথার মধ্যে কি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা… চোখের সামনে সারা দুনিয়াটা যেন ঝাপসা-অন্ধকার হয়ে গেল…কোনোমতে টলতে টলতে গিয়ে ক্লান্ত দেহভার এলিয়ে দিয়ে তিনি বসলেন—লোকে লোকারণ্য জুয়ার আড্ডার এক কোণে চামড়া-মোড়া বিরাট কৌচের উপর! মোহাচ্ছন্নভাবে কয়েক মিনিট নিঃশব্দে তাকিয়ে জনাকীর্ণ-আসরের চারিদিকে দেখলেন আশেপাশে জুয়াড়ীরা সবাই তখন মহা-উল্লাসে মেতে রয়েছে র‍্যালে খেলার নেশায়… দুনিয়ার দিকে এতটুকু নজর দেবার ফুরশৎ নেই কারো। ল্যুসিয়েঁর মনে গভীর অনুশোচনা জাগলো!…জুয়ার

আড্ডায় এসে অসার-আনন্দে মেতে তিনি তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় এমন অযথা অপব্যয় করেছেন এতদিন··· জলের মতো অনর্থক উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর যথাসর্ব্বস্ব—টাকাকড়ি-মোহর···জুয়াখেলার এই অলীক-মোহের ফলেই আজ তিনি এমন কপর্দ্দকহীন···ফতুর! কাল কি খাবেন··· তার সংস্থান পর্যন্ত নেই···এমনই চরম দুরবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর! ল্যুসিয়ের মনে পড়লো—বাড়ীতে টেবিলের টানার ভিতরে রাখা তাঁর পরলোকগত পিতার পিস্তল-গুলির কথা···এ সব পিস্তল দিয়েই তাঁর পিতা সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সেনানায়ক জেনারেল দ্য হেম্ একদিন 'জ্যাৎচা'র (Zaatcha) রণাঙ্গনে অসাধারণ-বিক্রমে শত্রু-সৈন্যদের দেশের মাটি থেকে দূরে হটিয়ে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক সেই বীর-পিতার পুত্র হয়ে ল্যুসিয়েঁ শেষ পর্য্যন্ত কিনা এই জুয়ার আড্ডায় এসে···

ল্যুসিয়েঁর মনে ধিক্কার জাগলো···তিনি ভাবলেন—পরলোকগত-পিতার সেই পিস্তলের গুলিতেই এমন অসার-জীবনের দুর্ভোগ শেষ করে দেবেন!

কিন্তু নড়বার আর শক্তি নেই তাঁর—ক্লান্তি অবসাদে ল্যুসিয়েঁর দেহ-মন মুশ্ড়ে পড়েছে···দু' চোখ জড়িয়ে আসছে গাঢ় ঘুমে···চারিদিক ক্রমশঃ যেন ছেয়ে আসছে নিবিড়-অন্ধকারে·· নিমেষের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ল্যুসিয়েঁ এলিয়ে পড়লেন জুয়ার আড্ডার কৌচের কিনারায়।

কতক্ষণ যে এমনি অচৈতন্য-অবস্থায় পড়ে ছিলেন তা ঠিক খেয়াল নেই···তবে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেয়ালের ঘড়ির পানে তাকিয়ে ল্যুসিয়েঁ দেখেন—প্রায় আধঘণ্টারও বেশী সময় কেটে গেছে এমন আচ্ছন্নভাবে পড়ে থেকে! অনেকক্ষণ এভাবে অচৈতন্য-থাকার ফলে, ল্যুসিয়েঁর মুখের ভিতরটা পর্য্যন্ত তিক্ত-বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল···তাছাড়া লোকে লোকারণ্য জুয়ার আসরের বদ্ধ আবহাওয়া কেমন যেন অসহ্য বোধ হতে লাগলো! ল্যুসিয়েঁ ভাবলেন—আরো কিছুক্ষণ সর্ব্বনাশা এই বিষের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে হয় তো দমবন্ধ হয়ে মরবো শেষ পর্য্যন্ত!···তার চেয়ে বরং আসর ছেড়ে বাইরের খোলা-বাতাসে বেরিয়ে গিয়ে দু'দণ্ড পথে পথে ঘুরে বেড়ানো যাক—কতকটা আরাম মিলবে হয়তো!

তাই বৃথা সময় নষ্ট না করে, জুয়ার আসর ছেড়ে ল্যুসিয়েঁ বেরিয়ে এলেন আড্ডাখানার সদর-দরজায়। বাইরে তখন শাদা-বরফে আচ্ছন্ন সহরের পথ · শীতের এলোমেলো-কন্কনে বাতাস বইছে চারিদিকে! নিশুতি রাত···পথে লোকজনের ভীড় নেই তেমন···উৎসবের রাত হলেও হিমের ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে ফিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে যে যার নিজের ঘরে!

আড্ডাখানার খোলা-জানলার ফাঁক দিয়ে দূরে পথের মোড়ে লম্বা চূড়োওয়ালা গির্জ্জার জল্জলে-ঘড়ির পানে তাকিয়ে ল্যুসিয়েঁ দেখলেন—রাত প্রায় পৌনে-বারোটা বেজেছে।

ল্যুসিয়েঁর মনে পড়লো—আজ ক্রীষ্ট্মাস্-সন্ধ্যা!···মনে পড়লো—তাঁর অনেকদিন আগেকার সেই হারানো-শৈশবের রঙীণ স্মৃতি! ছোট-বেলায় এমনি ক্রীষ্ট্মাস-উৎসবের রাতে ঘুমোবার আগে ঘরের কোণে জলন্ত চিমনির সামনে নিজের ছোট জুতোজোড়াটিকে পরিপাটিভাবে সাজিয়ে রেখে বিছানায় শুতে যাবার কথা!

নিরালা পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ল্যুসিয়েঁ যখন তাঁর শৈশবের হারানো-দিনগুলির চিন্তায় বিভোর, এমন সময় জুয়ার আড্ডার আব্ছা-অন্ধকার দেউড়ীর অন্তরাল থেকে কাছে এসে দাঁড়ালো—মুখে একরাশ কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফওয়ালা কিম্ভূত-চেহারার এক প্রবীণ-জুয়াড়ী ড্রোন্স্কী·· গায়ে তার তেল-কালির ছোপ-ধরা শতছিন্ন মলিন কোট! ল্যুসিয়েঁর কাছে এগিয়ে বুড়ো ড্রোন্স্কী অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললে,—দয়া করে আমাকে পাঁচটি ফ্র্যাঙ্ক দিন, মশাই! আজ দু'দিন ধরে এই আড্ডায় পড়ে রয়েছি···খেলার নেশায় মেতে যা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব খুইয়েছি—তবু জুয়ার বাজী জিততে পারিনি একটি বারও··· যত বারই খেলেছি ··প্রত্যেকটি দানই হেরেছি! এমনই বরাত!···কিন্তু আমি জানি—বরাত আমার ফিরবেই!··· কথাটা শুনে হয়তো আপনি হাসবেন···কিন্তু জেনে রাখুন—আজ এই রাত্তিরেই, দূরে গির্জ্জার ঐ ঘড়িতে রাত বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবেন—আমার পোড়া-বরাত ফিরেছে···ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে!···দৈব-কৃপায় জুৎসই দান-পড়ার দৌলতে জুয়ার বাজী এবারে আমি···বিশ্বাস

হচ্ছে না?···বেশ···গোটাকতক ফ্রাঁ ধার দিন আমাকে আপাততঃ···তারপর শেষ পর্য্যন্ত! জিতেছি···কথাটা সত্যিই ফলে কিনা—দেখবেন তখন!

ড্রোন্স্কীর এ সব কথা ল্যুসিয়েঁর কাছে নতুন নয়··· জুয়ার আসরে যাদেরই যাতায়াত আছে, নিত্যই তারা এমন নানান্ কাহিনী শোনে এবং দয়া করে মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা ভিক্ষা-বখশিস্ও দিয়ে থাকে ড্রোন্স্কীর মতো এমনি সব অভাগাদের হাতে। কিন্তু সে রাতে ল্যুসিয়েঁর নিজের আর্থিক-অবস্থাই এমন কাহিল যে মনে বাসনা জাগলেও ড্রোন্স্কীকে তিনি সামান্য একটি কপর্দ্দকও দান করতে পারলেন না···নিশ্বাস ফেলে আড্ডাখানার দেয়ালের গায়ে-আঁটা আলনা থেকে নিজের টুপি আর গরম ওভার-কোট তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন বাইরের তুষারাচ্ছন্ন নিরালা-পথে!

প্রায় ঘণ্টা চারেকেরও বেশী সময় ল্যুসিয়েঁ কাটিয়েছেন জুয়ার আসরে খেলার নেশায় মেতে···এই চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই অবিশ্রান্ত বরফ-পড়ার ফলে, সারা প্যারিস সহরের পথঘাট, বাড়ী-ঘর সব ছেয়ে গেছে মিহি-তুলোর মতো শাদা-রঙের তুষার-কণায়···হিমের হাল্কা-কুয়াশায় ভরে উঠেছে চারিদিক···তারই মাঝে মাঝে অস্পষ্ট রাতের আকাশের বুকে ফুটে রয়েছে একরাশ জ্বলজ্বলে নক্ষত্র!

নিশুতি রাতে কন্‌কনে-বাতাসের দাপট আর অবিরাম তুষারপাত তুচ্ছ করে পশমের ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ল্যুসিয়েঁ আন্‌মনে পথে এগিয়ে চললেন···মন তাঁর ভারী হয়ে রয়েছে দুশ্চিন্তার গ্লানিতে··· কেবলই ভাবছেন—কতক্ষণে বাড়ীতে পৌছে টেবিলের টানা থেকে পিস্তলটি বার করে নিয়ে···

এমন সময় জনহীন পথে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো মর্ম্মান্তিক-করুণ একটি দৃশ্য···ল্যুসিয়েঁ থমকে দাঁড়ালেন।

[ক্রমশঃ]
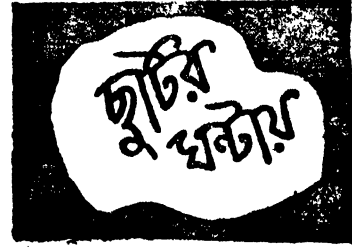
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের হাঁস কিম্বা মুর্গীর ডিম নিয়ে বিচিত্র কারসাজি-দেখানোর আরেকটি মজার খেলার কথা বলি। এ খেলাটি থেকে তোমরা 'ভার-সাম্যের' (Balancing বা Equilibrium) অভিনব-রহস্যময় বৈজ্ঞানিক-তথ্যের পরিচয় পাবে। তবে এ খেলার কলা-কৌশলের ব্যাপার, শুনতে যতটা সোজা মনে হয়, আসল-কাজে হাত দিলেই বুঝতে পারবে যে কারসাজি দেখানো পর্ব্বটি খুব সহজসাধ্য নয়···এর কায়দা-কানুন কয়েকবার নিজের হাতে-কলমে বেশ একটু অভ্যাস করে নেওয়া প্রয়োজন। এ অভ্যাসটুকু অবশ্য খুব যে দুঃসাধ্য-কঠিন কাজ, তা নয়···সামান্য চেষ্টা করলেই তোমরা অনায়াসেই এ খেলার কলা-কৌশলগুলি রপ্ত করে নিয়ে তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের ডিমের এই বিচিত্র কারসাজি দেখিয়ে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

এ খেলাটি দেখানোর জন্য নিতান্ত-ঘরোয়া সামান্য যে দু'চারটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, খেলাটি দেখাতে হলে চাই—বড় একটি কাঁচের বোতল, সমান-মাপের একজোড়া খানা-টেবিলের কাঁটা (**Forks**), একটি শোলা বা **'কর্কের'** (Cork) তৈরী বোতলের-ছিপি, ধারালো একটি পেন্সিল-কাটবার ছুরি আর হাঁস কিম্বা মুর্গীর একটি ডিম।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, খেলা-দেখানোর পালা। তবে সে পালা সুরু করবার আগে, আরো কয়েকটি জরুরী কাজ সেরে রাখা দরকার। এ কাজগুলি খেলার

আয়োজন-পর্বেই সেরে নিও, নাহলে দর্শকদের সামনে খেলা-দেখানোর সময় নানান্ অসুবিধা ভোগ করতে হবে···এমন কি, সুষ্ঠুভাবে মজার এই কারসাজিটুকুও দেখাতে পারবে না। সুতরাং এদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

খেলার আয়োজন-পর্বের গোড়াতেই, ধারালো পেন্সিল-কাটবার ছুরি দিয়ে 'শোলা' বা 'কর্কের' তৈরী ছিপির ভিতরের অংশ 'টুপির-অন্দরের, (Hollow inside of a hat) মতো ছাঁদে আগাগোড়া গোল-ধরণে (Round shape) কুরে (Scraping) করে নাও। এবারে নীচের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, হুবহু
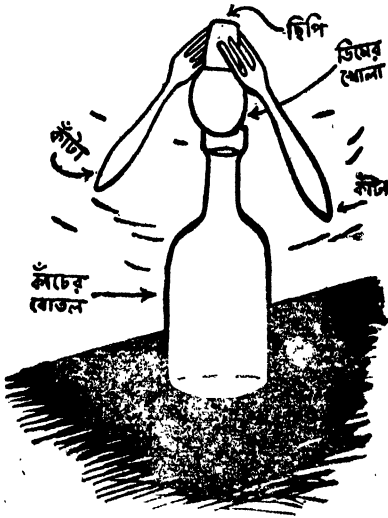
তেমনিভাবে ঐ ছিপির দু'পাশে খানা-টেবিলের কাঁটা দুটিকে পাকাপোক্ত-ধরণে গেঁথে দিয়ে, ভিতর-ফোঁপ্‌রা টুপির মতো ছিপিটিকে এঁটে বসিয়ে দাও ডিমের সরু-প্রান্তের মাথায়। এ কাজটুকু সারা হলে, দু'পাশে খানা-টেবিলের কাঁটা আটা 'শোলা' বা 'কর্কের' ছিপির-টুপি-পরানো ডিমটিকে সাবধানে বসিয়ে দাও—ঘরের সমতল মেঝে বা টেবিলের উপরে-রাখা কাঁচের বোতলের মাথায়। এভাবে বসানোর সময়, নজর রেখো—অযথা তাড়াহুড়ো কিম্বা অসাবধানতার ফলে, ডিমটি যেন কাৎ হয়ে কাঁচের বোতলের মাথা থেকে মাটিতে গড়িয়ে না পড়ে যায়। কারণ, বোতলের মাথায় খানা-টেবিলের কাঁটা-ঝোলানো ছিপির টুপি-আটা ডিমটিকে যথাযথভাবে বসানোর এ কাজটি, শুনতে যতটা সোজা মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু ততটা সহজসাধ্য নয়। তবে ধৈর্য্য ধরে দু'চারবার চেষ্টা করলেই দেখবে—কাজটা শেষ পর্য্যন্ত হাসিল হবে। এমনটি হবার কারন হলো—বোতলের মুখে বসানো ডিমের মাথায় ছিপির-টুপির গায়ে দু'পাশে দুটি সমান-মাপের খানা-টেবিলের কাঁটা এঁটে রাখার ফলে, বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মানুসারে 'ভার-সাম্য' বজায় থাকে আগা-গোড়া। তাই ডিমটি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে বোতলের চূড়োয়···হেলেদুলে আশেপাশে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যায় না কোনোমতেই। এই হলো—এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য!

রহস্যের সন্ধান তো পেলে···এবার নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে ত্থাখো, বোতলের মাথায় এমনি উপায়ে খাড়াভাবে হাঁস কিম্বা মুর্গীর ডিম বসিয়ে রাখতে পারো কিনা!

পরের মাসে এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা জানাবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। বাগানে গাছ-সাজানোর সমস্যা॥

রমেশবাবু খুবই সৌখিন লোক···সহরের প্রান্তে তাঁর বিরাট বাগান···নিত্য নূতন-নূতন নানা ধরণের গাছ সাজিয়ে বাগানখানি আরো মনোরম করে সাজিয়ে তোলার দিকে তাঁর রীতিমত ঝোঁক! সেদিন বহু অর্থব্যয়ে বিদেশের এক নামজাদা নার্শারী থেকে তিনি তেরোটি সৌখিন ফুল-গাছের চারা আনিয়ে নিজের বাগানে সাজালেন—পরপৃষ্ঠার ছবিতে যেমন দেখছো, অবিকল তেমনি-ছাঁদে। কিন্তু বিদেশ থেকে আনানো সৌখিন গাছের চারাগুলিকে
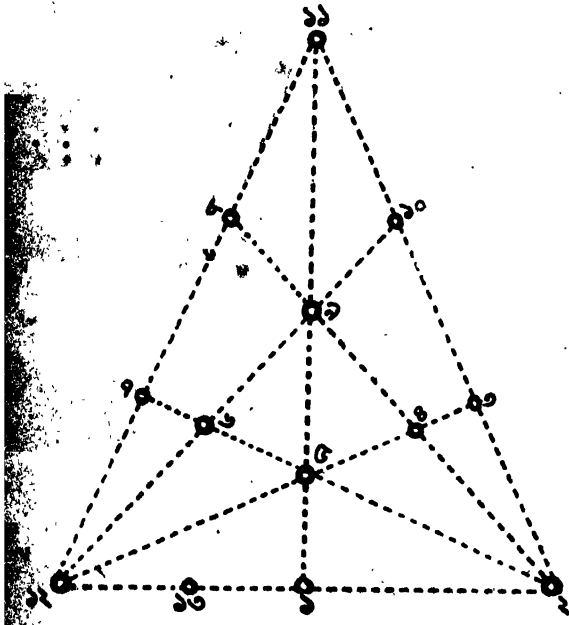
এমনি-ছাঁদে সারি দিয়ে সাজানোর পর, রমেশবাবুর মন খুঁত্খুত্ করতে লাগলো! কারণ, তিনি লক্ষ্য করলেন—সবচেয়ে নীচের সারিতে ১২ নম্বর চারাটি বসানো হয়েছে খাপছাড়া-ধরণে—অর্থাৎ, সেটির সঙ্গে অন্য সব দিকে সারি-দিয়ে-সাজানো চারাগাছগুলি নিতান্তই বেমানান দেখাচ্ছে। তাই তিনি আবার ঐ তেরোটি চারাগাছকে নতুন-ছাঁদে সারি দিয়ে সাজিয়ে বসালেন। নতুন-ছাঁদে সারি-দিয়ে-সাজানোর ফলে, ১২ নম্বর চারা গাছটি এবারে আর আগের মতো খাপছাড়া-বেমানান ঠেকলো না—বরং অন্য সব চারাগাছের সঙ্গে দিব্যি সুন্দর ও মানানসই দেখতে হলো। এখন তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে পেন্সিল দিয়ে এক টুকরো কাগজে এঁকে দেখাও দেখি—রমেশবাবু কি উপায়ে নতুন-ছাঁদে উপরের ছবিতে দেখানো ঐ তেরোটি চারাগাছকে সুষ্ঠুভাবে সারি দিয়ে সাজিয়ে বসিয়েছিলেন। তোমাদের মধ্যে যারাই সুষ্ঠুভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে, তাদের নাম-ধামের পরিচয় আমরা আগামী সংখ্যায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবো।

২। 'কিশোর-জগতের'

সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। দুই দলে সমান সমান ছেলে ছিল। একদল হইতে একজন অপরদলকে বলিল,—"তোমাদের মধ্য হইতে একজন আমাদের দলে আসিলে, আমরা তোমাদের দ্বিগুণ হইব। আর, দুইজন আসিলে পাঁচগুণ হইব। প্রত্যেক দলে কয়টি করিয়া ছেলে ছিল?

রচনা ঃ সুভাষ দত্ত (আসানসোল)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির'
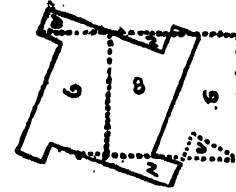
উত্তর ঃ

১। উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে ঠিক তেমনি-ছাঁদে ফুটকি-চিহ্নিত দাগে নক্সাটিকে চারিটি ছোট-বড় টুকরোয় বিভক্ত করে ছেঁটে নাও। তার'পর ঐ ১, ২, ৩, ৪, নম্বর দেওয়া টুকরো চারটিকে উপরের ছবিতে ডান-দিকের নক্সায় যেমন ফুটকি-চিহ্নিত চৌকোণা ঘরটি দেখানো রয়েছে, হুবহু সেই ছাঁদে সাজিয়ে রাখো ··তাহলেই দিব্যি পরিপাটি-ধরণের চৌকোণা-আসন তৈরী করতে পারবে।

২। বেল বা Bell

৩। আকাশ

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (আলিপুর), কুলু মিত্র (কলিকাতা), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা),

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক দিয়েছে উত্তর ঃ

সুনন্দা ও সুচিত্রা বন্দোপাধ্যায়, দেবল ও উৎপল দত্তগুপ্ত এবং স্বাতী সরকার (জলপাইগুড়ি), প্রদ্যোৎ, গোকুল ও অনিমেশ মিত্র (?), ধর্ম্মদাস রায়, ধর্ম্মদাস লাহা, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, ও শ্যামাপদ পাল (বিদ্যাধরপুর, বাঁকুড়া), মদনমোহন ও নারায়ণচন্দ্র মিশ্র (রাগপুর, মেদিনীপুর), অরূপকুমার চৌধুরী (ফুটিগোদা), সন্তু, রাণু, জলি ও ভাস্কর বাগচী (দলমোর চা বাগান, জলপাইগুড়ি), শ্যামলী, শিপ্রা, ও বুলান্ (ফুটিগোদা), রেখা ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (যশপুরনগর, রায়গড়), বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা)

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা)। মিংকু ও রিংকু ঘোষ (কাটিহার), বাণী, শুভ্রা ও শুভ্র হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া, বর্দ্ধমান), প্রশান্ত চন্দ্র ও অজিত আঢ্য (কলিকাতা), অশোক অলোক, রেখা কুণ্ডু ও পার্থ হাজরা (আড়ুই, বর্দ্ধমান),

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত্র

লম্বা-সরু এমনি বিচিত্র-ছাঁদের শালতি-ডিঙির মতো চেহারার জলযান ব্যবহার হয় ইতালী-রাজ্যের ভেনিস্ শহরে। এ সব অভিনব জলযানের নাম-'গণ্ডোলা' (GONDOLA) ... খাল-নালায় ভরা ভেনিস শহরের জলপথে ওদেশী লোকজন যাতায়াত করে এমনি সব নানা সৌখিন-ছাঁদের 'গণ্ডোলা' নৌকায় চড়ে। এমন নৌকার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে

খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ২০০০ বছর আগে প্রাচীন মিশরের সুসভ্য অধিবাসীরা বিশ্বাস করতেন যে মৃত্যুর পর, তাঁদের দেশের মানুষের আত্মা নশ্বর-দেহ ত্যাগ করে, নীল-নদীর অপর তীরে পরলোকে যাত্রা করে ..তাই প্রাচীনকালের মিশর-অধিবাসীরা এমনি ধরণের নৌকার আকারে শবাধার রচনা করে নদীর জলে মৃতদেহ ভাসিয়ে দিতেন।

মেরু-অঞ্চলের 'এস্কিমো' (ESKIMO) আদিবাসীরা হিম-শীতল সাগরের বুকে অবলীলাক্রমে দল বেঁধে পাড়ি জমায় কাঠের তৈরী বিরাট-আকারের এমনি বিচিত্র ছাঁদের 'উমীয়্যাক্' (OomiaK) জলযানের সহায়তায়। এ সব নৌকা বানানো হয় —লম্বা-লম্বা কাঠের তক্তার উপরে 'সিল্মাছের চামড়া' (SEALSKIN) মুড়ে বেশ মজবুত আস্তরণ রচনা করে। এ নৌকা খুব হাল্কা ও দৃঢ় হয়
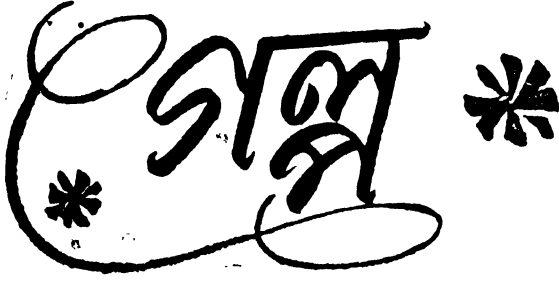
পরবাস

সমীর চট্টোপাধ্যায়

একে-একে সবাই চলে গেল। এতক্ষণের একটানা ব্যস্ততা আর কোলাহলের পর সব কিছুই এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখন সারা বাড়ীটাকে যেন কোন এক অবসন্ন প্রাণীর মত মনে হয়।

বাকী যে ক'টা মানুষ রইল, তারাও এখন যে-যার বিশ্রামের জায়গা বেছে নিতে ব্যস্ত। মুঠো-মুঠো হয়ে তারা বসে গেছে এখানে-সেখানে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, অ-গোছালো হয়ে পড়ে থাকা জিনিস-পত্তর আর উচ্ছিষ্টের মত।

শেষ ক'জন বন্ধুকে ঘর থেকে বাইরের পথ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল সুরঞ্জন। এতক্ষণে যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল সে। এ'বার আর কোন দিকে লক্ষ্য নয়, একেবারে সটাং এসে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। এই ঘরেই আজ ফুলশয্যা হয়েছে সুরঞ্জনের।

ঘরে ঢুকে গা-থেকে সিল্কের পাঞ্জাবীটা একটানে খুলে ফেলল। স্যাঁতসেঁতে গরমে খোলসের মত হয়ে গায়ে এঁটে বসেছিল সেটা। খাটের একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাঞ্জাবীটাকে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা নিয়ে খোলা জানালার সামনে পাতা চেয়ারটাতে গা-এলিয়ে দিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে বৈশাখের অস্থির বাতাস আছড়ে এসে পড়ল সুরঞ্জনের ঘর্মাক্ত আর পোড়া দেহটার ওপর। অল্পক্ষণ পরে যেন কিছু শীতলতা অনুভব করল সে।

সিগারেটের প্যাকেটের প্রতি মন দিল সুরঞ্জন। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বার করে দেশলাই জেলে ধরাল সেটাকে, তারপর মৃদু টান দিতে লাগল সেটাতে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো ওপরে উঠে ফেটে-ফেটে যাচ্ছে বাতাসে। সরু সরু সুতোর মত হয়ে খুব দ্রুত ঢেউ খেলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

চোখ দুটো বন্ধ ক'রে চেয়ারের পেছনে মাথাটা হেলাতে গিয়ে তার মনে পড়ল, আর একজন মানুষ আছে আজ এ ঘরে।

এতক্ষণ সেও এই চেয়ারটাতেই বসেছিল—যেটাতে এখন বসে আছে সুরঞ্জন। চেয়ারের হাতলে অনেক ফুলের মালা জড়ানো হয়েছিল, সেগুলি তেমনই আছে। কেবল সামান্য বিপর্যস্ত। এই চেয়ারের পূর্ব-অধিকারিণীর মত ক্লান্ত এবং বিরক্ত।

অনেক ফুল আর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল সুধাকণার সিংহাসন। এটাতে বসেই কিছুক্ষণ আগে সাম্রাজ্ঞীর মত সকলকে দেখা দিয়েছে সুধাকণা। তাদের কাছ থেকে প্রীতি উপহার গ্রহণ করেছে। শুভেচ্ছা গ্রহণ করেছে। অনেক জিনিস পেয়েছে সুধাকণা। ঘরের মেঝেয় থরে থরে সাজানো আছে সেগুলো। মণিহারী দোকানের মত। ওপাশের জানালার সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে সুধাকণা—লোহার গরাদের ওপর দু'হাত রেখে। দু'চোখের খোলা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে—বোধ হয় তারা-ভরা আকাশের দিকে। এক একটা করে তারা গুণছে সে। এ সময়, ঠিক এই মুহূর্তে যখন মানুষ এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় এবং তার মনের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মীমাংসা করার জন্য, তার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য পথ অন্বেষণ করে, আর ঠিক ওই ভাবেই তখন সে দাঁড়ায়। সীমাহীন মুক্ত আকাশ আর সেই আকাশের অসংখ্য তারার ভীড়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। কারণ শূন্য বাধাহীন মন আর দৃষ্টি ছাড়া যেমন চিন্তা হয় না—ঘরের এই চার দেয়ালের বাধা কাটিয়ে তাই হয়ত

সুধাকণা বেছে নিয়েছে ওই খোলা জানালাটাকে, জানালার বাইরে অসংখ্য তারাভরা কালো আকাশকে।

সুধাকণার পরণের আজ সব কিছুই নতুন। সাজ এবং সজ্জা দুই-ই। সব কিছুই সতেজ এবং উজ্জ্বল। সারা দেহে সোনা আর ফুলের ভার। বর্ণ আর সৌরভের সংমিশ্রণ। একটা ব্যবহারের জন্য, অন্যটা আজ রাতের আকর্ষণ।

সারাদিন ধরে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেছে আজ সুধাকণার ওপর দিয়ে। তাকে লোভনীয় করে তুলতে যে যেমন খুশী তাই করেছে। হাত ধরে টেনে বসিয়েছে। দাঁড় করিয়েছে, চিবুক ধরে ঘুরিয়েছে-ফিরিয়েছে। সুধাকণার গোলাপী গাল দুটোকে রাঙা করে দিয়েছে আদরের চোটে। ওদের হাতের মুঠোয় আজ আপনাকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছিল সুধাকণা। এই একটা দিন যেন আর অত্যাচারের শেষ থাকে না। তাই এখন সবাই চলে যেতে যেন ও স্বস্তি বোধ করছে।

সহজে যেতে চায়নি কেউ অবশ্য। সুরঞ্জনই ওদের তাড়িয়েছে ঘর থেকে। একটা মানুষের ওপর হাজার জনের এই প্রেমপরশও অনেক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত ব্যবহারে মিষ্ট ও তিক্ততায় পরিণত হয়।

সুরঞ্জনের এই আত্মপক্ষসমর্থনে একটা তীক্ষ্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছে কেউ কেউ। তাদের সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা এমন সুখাদ্যটি কি না সুরঞ্জন একাই ভোগ করতে চায়। এমনই অকৃতজ্ঞ! এমনই স্বার্থপর!

—হুঁ! মনে-মনে ভাবল সুরঞ্জন। মাত্র কিছুক্ষণের কৃতজ্ঞতা, তারপর কোথায় থাকবে সব! ওদের হাতের সাজানো ওই ফুলের মালাগুলোর মত, রাত শেষের সঙ্গেই শুকিয়ে গন্ধহীন হবে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বাকি অংশটুকু জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিল সুরঞ্জন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত দুটো ওপর দিকে সোজা করে একটা আড়ামোড়া ভাঙ্গল। সুধাকণার দিকে তাকাল।

তেমনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুধাকণা। এ পাশ থেকে ওর পশ্চাদভাগ দেখতে পাচ্ছে সুরঞ্জন। মাথার ফুলের মুকুটটা বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হতে খুলে রেখেছে সুধাকণা। খাটের ওপর পড়ে আছে সেটা।

সুধাকণার দিকে দেখছে সুরঞ্জন। সুধাকণা সুন্দরী। পেছন দিক থেকে ওর যতটুকু দেখতে পাচ্ছে সুরঞ্জন তাতে বেশ ভালই লাগল ওকে। শরীরের গঠনও বেশ সুন্দর! মাথায় চুলের পরিমাণও অল্প নয়। বৃহৎ-খোঁপায় একটা বেলফুলের মালা জড়ানো। খোঁপার নীচ থেকে ঘাড়ের অংশটুকু অনাবৃত। তার ওপর সোনার নেকলেশটা চিক্-চিক্ করছে। গলার মোটা গোড়ে-মালাটা বোধ হয় খুলে রেখেছে সে। সেটাও পড়ে আছে খাটের ওপর।

এখনও দেখছে সুধাকণা আকাশ আর আকাশের নক্ষত্র। এই নক্ষত্র দেখা বা তাকে গোনার চেষ্টাটা হয়ত সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ মনের কোন চিন্তা ভাবনা বা তার সমস্যার সমাধান আকাশের নক্ষত্রগণিতের অঙ্ক কষে সম্ভব হয় না কোনদিন। তবু সেই অসংখ্য নক্ষত্রের ভীড়ে আপনার চোখ দুটোকে নিবদ্ধ রেখে ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সুধাকণা। হয়ত সে কিছুই দেখছে না। আকাশ, নক্ষত্র কিছুই না। কারণ মানুষের দেখা বা ভাবার মধ্যে যে পার্থক্য, সেটাই মানুষের চোখ এবং মনকে সময়ে সময়ে পৃথক করে ফেলে। তখন মানুষের মনটাই কাজ করে বেশী। চোখ দুটো থাকে সাজানো।

সুধাকণার পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবার সুরঞ্জন। নিমেষে সরে দাঁড়াল সুধাকণা। মাথার আঁচল টেনে লজ্জায় জড়-সড় হল। আকাশের নক্ষত্রগুলো সব একসঙ্গে জমাট বেঁধে গিয়ে একটা বড় নক্ষত্র হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সুধাকণার পাশে।

ঠিক এই সময়ে আর আকাশ দেখছে না সুধাকণা। নক্ষত্রগুলোকেও না। কারণ তার এখনকার সব দেখাগুলোই অর্থহীন শূন্যতায় ভরা।

—তোমার ঘুম পায়নি? সারাদিন ত অনেক ধকল গেছে? সুধাকণার পাশে দাঁড়িয়ে নরম স্বরে বলল সুরঞ্জন।

কোন উত্তর দিল না সুধাকণা। আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। নক্ষত্র দেখার চেষ্টা করল।

ফিরে গেল সুরঞ্জন বিছানার কাছে। খাটের ওপর অনেক ফুল ছড়ানো হয়েছিল। বালিশ দু'টো নিভাঁজ। পাশাপাশি পাতা আছে। আজ থেকে সুধাকণা বুঝি শোবে ওর একটাতে মাথা রেখে। আর মাত্র এক হাত ব্যবধানে সুরঞ্জন।

ঘরের মধ্যে-দু'একবার পাক মেরে আবার এগিয়ে এল সুরঞ্জন। সুধাকণার পেছনে তার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখার চেষ্টা করল।

সাবধানে নিজেকে সরিয়ে নিল সুধাকণা।

—চল, আর রাত করে কাজ নেই, আর কেউ আসবে না তোমাকে জ্বালাতন করতে। এবার শুয়ে পড়া যাক। আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—কথাটা বলার সঙ্গে একটা বড় হাই তুলল সুরঞ্জন এবং সেই হাই তোলার ফাঁকে-ফাঁকে কথাটা এঁকে-বেঁকে ভেঙ্গে-চুরে ছড়িয়ে পড়ল।

জানালার গরাদে হাত রেখেছে সুধাকণা। গরাদের ওপর তার আঙ্গুলগুলো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। আঙ্গটীগুলো জোনাকী হয়ে জ্বলছে-নিবছে।

—কই চলো? হাত দিয়ে সুধাকণাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করতে গেল সুরঞ্জন।

আগের মত সুরঞ্জনের হাতটা নামিয়ে দিল সুধাকণা এবং এতক্ষণ পরে বলল—আপনি যান—আমার এখনও ঘুম পায়নি, আমি পরে শোব।

বিস্ময়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সুরঞ্জন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে সুধাকণাকে।

বোধ হয় ভাবল সুরঞ্জন—যে মাত্র কদিন আগেই এই মেয়েটিকেই নিজের স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করেছে সে। অগ্নি-সাক্ষী করে মন্ত্র পাঠ করেছে—যদেতৎ হৃদয়ং মম, তদেতৎ হৃদয়ং তব—অর্থাৎ তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয় মিলিত হোক!—তুমি আমার হও। এরপর তুমি এবং আমি অভিন্ন—অখণ্ড।

কথাটা ভাবল সুরঞ্জন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসল সে। আর একটা কথা উচ্চারণ করল সুধাকণা সম্পর্কে।—ছেলেমানুষ! একদম ছেলেমানুষ!

সুরঞ্জনের কাছে সুধাকণা ছেলেমানুষ বৈকি। বহু বিষয়ে—বয়েসে তো নিশ্চয়। এবার সুরঞ্জনের দ্বিতীয় বিয়ে।

সেবারেও এই ঘরেই ফুলশয্যা হয়েছিল সুরঞ্জনের। ঠিক এমনই একটা রাত। নিমন্ত্রিতেরা সবাই চলে গেলে ক্লান্ত সুরঞ্জন ফিরে এসেছিল এই ঘরে। আজ যেমন এসেছে। সে রাতে কিন্তু অনুপমা অমনভাবে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়নি বা আকাশের নক্ষত্র গোণার চেষ্টা করে নি। ওই খাটের ওপর বসেছিল, বুঝি সুরঞ্জনের কথাই ভাবছিল।

ঘরে ঢুকে অনুপমার পাশে বসেছিল সুরঞ্জন। অনুপমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে নাড়াচাড়া করছিল। অনুপমা বলেছিল,—তোমার ঘুম পায় নি?

খু—ব—বলেছিল সুরঞ্জন। আমি আর বসতে পারছি না।

—আমার কিন্তু একদম ঘুমোতে ইচ্ছে হয় না—বলেছিল অনুপমা। এক কাজ করো, তুমি আমার কোলে মাথা রেখে শোও, দুজনে গল্প করি—

—সেই ভাল! দাঁড়াও, তার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিই।

উঠে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে খাটের ওপর উঠে এল সুরঞ্জন। অনুপমার কোলে মাথা রাখল। সুরঞ্জনের নরম চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে অল্প অল্প নাড়ছিল অনুপমা। আরামে দু'চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল সুরঞ্জন।

—এই ভাল! অল্পক্ষণ পরে বলেছিল সুরঞ্জন।

—কি? জিজ্ঞাসা করেছিল অনুপমা।

—দু'জনে আমরা কেবল এই ঘরে? আলতোভাবে কথাটা বলেছিল সুরঞ্জন।

—আর কেউ আসবে না আমাদের বিরক্ত করতে। কথাটা বলেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হল সুরঞ্জনের। অনুপমার দুটো গাল দুহাতে ধরে তার মুখটা টেনে নামিয়ে আনল, এবং তার মুখে চুমা খেল। বাধা দিল না অনুপমা। কেবল অল্প হাঁসল, আর সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার অনুপমার কোলে মাথা রাখল সুরঞ্জন। বলল,—আমাদের বাড়ীটা তোমার পছন্দ হয়েছে অনু?

—এই বুঝি তোমার গল্প করা—দুষ্ট—কোথাকার?

—এই তো গল্প? আজকের রাতের গল্প!

—যদি বলি লাগেনি?

—হুঁ, বললেই হল অমনি? আর আমাকে?

—সেত তুমিই ভাল জানো? যত সব পুরোনো কথা?

—আর আমাদের বাড়ীর মানুষগুলো ?

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অনুপমা বলল,—আমার কিন্তু সব থেকে ভাল লেগেছে ওই মেয়েটিকে।

—কোন মেয়েটি ?

—যে আমাকে সাজিয়ে দিল ? অনেকক্ষণ বসেছিল আমার কাছে, ওকি তোমাদের কেউ হয় নাকি ? জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাল অনুপমা স্থরঞ্জনের দিকে।

—হবে। তোমার ছোট—জা ! মা ওকে আমার ভাই নিরঞ্জনের জন্য মনে মনে স্থির করে রেখেছেন।

—তাই নাকি ? তাহলে তো বেশ ভালই হয় ! আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগল মেয়েটাকে। দেখতে বেশ !

—কে সুধা ?

—ওর নাম বুঝি ও—ই ?

—হ্যাঁ !

—কোথায় বাড়ী ওদের ?

—অ-নে-ক-দূর—আমাদের বাড়ীর ছাদের পাশেই সে ছাদটা ? ওটাই ওদের বাড়ীর ছাদ ! ও বাড়ীর ভাড়াটে ! লাফ দিয়ে কিন্তু যাওয়া যায় না, প্রায় হাত দশেক তফাৎ।

—যাবার চেষ্টা করেছিলে নাকি ?

—সে উপায় ছিল না, কারণ তখন বালিগঞ্জের আর একটা ছাদে আমি পৌঁছে গেছি। অতদূরে লাফ দেওয়ার পর আর কাছের ছাদে যেতে মন চাইল না।

—ইস্, কি আমার বীর পুরুষ !

—তবে ওদের ছাদে পাঠানোর চেষ্টা আমাকে করেছিলেন একজন।

—কে ?

—আমার মা। সুধাকে কোনমতেই ছাড়তে পারবেন না তিনি। কি চোখে যে দেখেছেন ওকে—

—তাই বুঝি তোমাকে ছেড়ে ঠাকুরপোকে ধরেছেন।

—কি আর করেন বলো ? সুধাকে যেমন করে হোক তিনি কাছে পেতে চান এবং তা পাকাপাকি ভাবেই।

—যাই বলো, আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগল ওকে—বলল অনুপমা, আর কথাটা বলেই স্থরঞ্জনের দিকে দেখল।

—আরো অনেকের লাগে !

—কার—মার ?

—শুধ্ মার কেন ? আমার ছোট ভাই নিরঞ্জনেরও।

—তুমি ভারি অসভ্য !

স্থরঞ্জন বলল,—এই বুঝি তোমার গল্প করা, এবার কিন্তু আমি ঘুমোব ?

—কেন ? এই তো বেশ ? সুধাকণার গল্প—

—না, আজ অনুপমার গল্প হোক—

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল অনুপমা,—আচ্ছা ওতো তোমাদের বাড়ীতে আসত, তোমার সঙ্গে কথা বলতো ?

—বলতো—

—তোমার ভাল লাগেনি ওকে ?

—আমরা কি এমনই নিমকহারাম ?

—সত্যি ? না—ঢেকে-ঢুকে বলছ ?

—তোমার কাছে মিথ্যা বলে আমার লাভ ?

—আমার প্রিয় হবার জন্য ?

—সে তো সুধাকে দেখার আগেও হয়েছিলাম এবং পরেও—

স্থরঞ্জনের বুকের ওপর আপনার মুখটা নামিয়ে এনেছিল অনুপমা। ওর চুলের সুগন্ধ বুক ভরে গ্রহণ করতে করতে ওকে নিবিড় ভাবে ধরে ছিল স্থরঞ্জন।

পরদিন সকালে সুধাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এলেন মনোরমা।—একে দেখেছ বৌমা ? একে আমার নিরুর বৌ করবো আমি।

—কোন কথা না বলে অল্প হেসে শুধ্ সম্মতিসূচক মাথাটা হেলিয়েছিল অনুপমা।

সুধাকণাকে বললেন মনোরমা—যা তো মা, নিরুটা এখনো পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে দি গে, সকাল সকাল চান করে খেয়ে নিক, কাল রাতে কিছুই ছোঁয় নি।

বাইরে থেকে মুখ-হাত ধুয়ে ঘরের দিকে আসছিল স্থরঞ্জন। বারান্দায় সামনা-সামনি হল সুধার সঙ্গে। স্থরঞ্জনকে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল সুধা একেবারে দেয়াল সেঁটে।

স্থরঞ্জন বলল—ওঘরে গেছলে ? কাল থেকে তোমাকে খুঁজছে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সুধাকণা। সুরঞ্জনের পাশ কাটিয়ে পালাল।

এ বাড়ীর অন্যান্যদের কাছে যেমন স্বাভাবিক হতে পারে সুধাকণা, তেমন ভাবে পারে না সে সুরঞ্জনের সামনে।

• •

এ বাড়ীতে সুধাকণার আসা যাওয়া অনেকদিনের। পাশের বাড়ীতে ওদের ভাড়াটে হয়ে আসার দিন দুই পরে একদিন মনোরমা গঙ্গাস্নান করে ফিরলেন ওকে সঙ্গে করে। এসো মা! এসো! লজ্জা কি? এতো তোমারই বাড়ী? মাসীমার বাড়ী আসতে বুঝি লজ্জা করতে হয়?

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে বসেছিল সুরঞ্জন। মার ডাকে-হাঁকে বুঝল যে, কাউকে নিশ্চয় আবার আদর অভ্যর্থনা করে বাড়ীতে আনছেন মনোরমা। এমনি করেন মনোরমা প্রায়ই। চেনা-অচেনা যেমন মানুষই হোক, কোন কারণে তাকে প্রীতির নজরে দেখলে একেবারে সরাসরি এনে তোলেন বাড়ীতে। এটা তো তোমারই ঘরবাড়ী মা! যখনই ইচ্ছে হবে আসবে! আজও বোধ হয় তেমনই কোন প্রিয়জনকে সঙ্গে এনেছেন মনোরমা। বাইরে বেরিয়ে স্নানের ঘরে যাবার মুখে মায়ের সেই প্রিয়জনটিকে আবিষ্কার করেছিল সুরঞ্জন। পাশের বাড়ীর ছাদে দু'একদিন এর আবির্ভাব লক্ষ্য করেছে সে। কোন না কোন কাজে এসেছে সে ছাদে। কখনও ভীজে কাপড় নিয়ে, কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে।

ইনি আজ মনোরমার মহাসত্য অতিথি।

মেয়েটি সুন্দরী একথা সুরঞ্জন অস্বীকার করে না। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি মনোরমার এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই নিজের পুত্রবধূ করার ইচ্ছা জাগে তাঁর।

এরপর এ'বাড়ীর সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল সুধাকণার। সারাদিনের মধ্যে অনেকটা সময় সে ব্যয় করত মনোরমার কাছে। ওকে দিয়ে অনেক কাজ-কর্ম করাতেন তার আপনজনের মত। একদিন মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন মনোরমা। আমার খুব ইচ্ছে হয় সুধার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। ওকে বড় ভাল লাগে আমার। বেশ মেয়ে! তুই যদি মত দিস সুরু,—

সুরঞ্জন বলেছিল, আমি এখন বিয়ে করব না মা। তুমি বরং নিরুর সঙ্গেই দাও—

—এ আবার কি কথা তোর! বিস্মিত দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মনোরমা।

—তুই বসে থাকবি, আর—তা ছাড়া নিরুর বিয়ের এখন কোথায় কি? আগে চাকরী-বাকরী করুক—আর কোন কথা বলেনি সেদিন সুরঞ্জন। সে ভেবেছিল, আজ যেখানে সুধাকে বসাবেন স্থির করেছেন মনোরমা, সে স্থানটি অনেক দিন আগেই দখল করেছে আর একজন। সে হল অনুপমা। অনুপমাকে ভালবেসেছে সুরঞ্জন। হাঁা, এবাড়ীতে সুধার অনেক আগে থেকেই তার সঙ্গে পরিচয়। শুধু পরিচয় নয়, অনুপমাকে সে গ্রহণ করতে চায় আপনার স্ত্রী-রূপে। এই তার সঙ্কল্প। আজ মায়ের কথায় তার সেই সঙ্কল্পকে সে চূর্ণ করতে পারে না। পারে না তার বিবেককে গলা টিপে মারতে।

দেয়ালে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা প্রাণহীন ছবির মত সুধাকণার মূর্তিটা কল্পনা করল সুরঞ্জন। সেদিনের মনোরমার কথাটা চিন্তা করে একবার অনুপমার জায়গায় সুধাকণাকে বসালো। অনুপমা নেই। তা'হলে সুধাকণা বসতো ওই ঘরে, ওই খাটে। তারপর—ওই রাত কাটানো। সুধাকণার কোলেই তাহলে মাথা রাখতো সুরঞ্জন। তার গলা জড়িয়ে ধরতো।

মনোরমার গলার শব্দে সংবিৎ ফিরে এসেছিল সুরঞ্জনের। মনোরমা বললেন—এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? মুখ-হাত ধোয়া হয়েছে? ঘরে যা—আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—

অনুপমা আর সুধাকণা আলাদা হল আবার। এ বাড়ীর ছোট বউ হবে সুধা। নিরঞ্জনের বউ।

নিরঞ্জনের ঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে। যেতে-যেতে আচমকা একবার নজর পড়ল সুরঞ্জনের। নিরঞ্জনের পিঠে ঠেলা দিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসছে সুধাকণা। সুধাকণা বলছে—এই খোকা, ওঠো, মা ডাকছেন! না হলে এখুনি নিজে এসে দু ঘা বসিয়ে দেবেন।

নিরঞ্জন বলছে,—তা মা নিজে না এসে কোলের খুকিটিকে পাঠালেন কেন? মায়ের মতলব কিন্তু সুবিধার নয়।

—যা অসভ্য কোথাকার! কেবল ওই সব কথা!

—এই—হাত ছাড়ো! কেউ দেখে ফেলবে—এই—

—উঃ—লাগছে—যে—এই—

—কেমন মজা—এইবার—হোঃ—হোঃ--হোঃ—কথা বলার ফাঁকে হাসছে নিরঞ্জন।

দ্রুত চলে গেল সুরঞ্জন। নিজের ঘরে যেতে--যেতে তার মনে হল যে, অল্পক্ষণ পূর্বের দেখা সেই দেয়াল-ছবিটা এখন হঠাৎ অমন ভীষণ জীবন্ত হয়ে উঠল কেমন করে।

সুধাকণার প্রতি সুরঞ্জনের ওই অনাসক্তি প্রকাশের পর আর বিশেষ কোন অনুরোধ করেন নি মনোরমা। কিন্তু সুধাকণাকে সত্বর নিজের কাছে পাবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর একদিন তিনি বড় ছেলের অভিলাষ জানলেন। অনুপমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেনা সুরঞ্জন। এরপর থেকে সুরঞ্জনের সঙ্গে সুধাকণার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল অনেক দ্বিধা আর সঙ্কোচের পথ ধরে।

সুরঞ্জন লক্ষ্য করত যে, নিরঞ্জনের কাছে সুধা যেমন সহজ হতে পারতো, সরল হতে পারতো, তার কাছে তেমন পারত না।

মনোরমা নিরঞ্জনের জন্য চা খাবার পাঠাতেন সুধাকে দিয়ে, কিন্তু সুরঞ্জনকে তিনি নিজে দিতে আসতেন। সুরঞ্জন জিজ্ঞাসা করত,—তুমি কেন মা? তোমার এসিস্ট্যাণ্ট্‌টি কোথায়?

মনোরমা বলতেন,—তুই যেমন মুখ-গোমড়া করে থাকিস ওর সামনে, তোর কাছে আসতে ও ভয় পায়। —ও তাই নাকি? কথাটা বলে খুব জোরে হেসে উঠত সুরঞ্জন। আবার বলত,—তা, যে সম্পর্ক তুমি করে রেখেছো আমার সঙ্গে।

সুরঞ্জনের বিয়ের পর এক বছর কেটে গেছে। এক-দিন মনোরমা বললেন,—বৌমাকে কি বাড়ীতেই রাখবি?

সুরঞ্জন বলল—ভাবছি হাঁসপাতালেই হোক! এখানে দেখাশোনার অসুবিধা। তা ছাড়া প্রথমবার কখন কি দরকার হয়—

কদিন হল অনুপমা বাড়ী ছাড়া হয়েছে। আপিস ফেরৎ রোজ একবার করে সুরঞ্জন হাঁসপাতালে যায় অনুপমাকে দেখতে। বাড়ীতে ফাঁকা ফাঁকা লাগে তার।

সুধাকণা আসে সুরঞ্জনের ঘরে। অত্যন্ত সঙ্কোচ আর দ্বিধার সঙ্গে ঘরের জিনিস-পত্র গোছ-গাছ করে দেয়। ঘর পরিষ্কার করে। চা রেখে যায়। বিছানা পেতে দেয়, যেমন অনুপমা নিত্য করতো আপন হাতে। কিন্তু সুধা-কণা অনুপমা নয়। সুরঞ্জনকে দেখলেই সে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যায়, তারপর কখন একফাঁকে পালায় ঘর ছেড়ে।

সুরঞ্জন বলে,—বসো!

কিন্তু সুধাকণা বসে না। মাটীর দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই এক ফাঁকে পালায় ঘর ছেড়ে।

হাঁসপাতাল থেকে কিন্তু আর ফিরল না অনুপমা। সেফ্‌টিক্‌-ফিভার হয়ে মারা গেল। সব ব্যবস্থাই হয়েছিল, কিন্তু অনুপমাকে বাঁচানো গেল না কোন প্রকারেই। শেষ সময়ে সুরঞ্জনের কোলেই মাথা রেখেছিল অনুপমা।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়ানো নক্ষত্র-গোণা-পুতুলের মত নিষ্পন্দ সুধাকণার দেহটার দিকে একবার দেখল সুরঞ্জন। সুধাকণা আজ অনুপমা হয়েছে। শেষে ওর সঙ্গে বিয়ে হল সুরঞ্জনের।

প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় নি সুরঞ্জন। মনোরমাও ভয়ানক রকম জেদ ধরেছিলেন। আমি বললেই সুধা রাজি হবে, সে মেয়েই নয় সুধা।

—কিন্তু নিরু—জিজ্ঞাসা করল সুরঞ্জন।

তুই কি পাগল হলি সুরু? ওর বিয়ের এখন কোথায় কি? আগে চাকরী করুক! না বাপু, তুই বল—আমি ওদের কথা দিই—তা ছাড়া ওরা আর বেশীদিন মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখতে চায় না!

—তা আর কি হবে?

—তুই কি বলিস খোকা? সময়ে সময়ে সুরঞ্জনকে এই নামে সম্বোধন করেন মনোরমা, বিশেষ করে শাসনের সময়ে। বোধ হয় তিনি যে সুরঞ্জনের মা এবং সুরঞ্জন আজ যত বড় লায়েকই হোক, মনোরমার কাছে তা সে নয়—তাই বোঝাবার জন্যে এই সম্বোধন করে থাকেন।

মনোরমা বলেন,—না, আমি তা সইতে পারব না।

সুধাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমাকে তুই এতটা বেইমানী করতে বলিস?—আমার পেটের মেয়ে নেই, ওকে যে আমি সেই ভাবেই—

বোধ হয় মনোরমার চোখ বেয়ে দু ফোঁটা জল বেরিয়ে আসে। গলাটা ভারী হয়ে যায়।

এরপর সুরঞ্জন অনেক চিন্তা করেছে। যতখানি অবসর পেয়েছে সে, কাজের ফাঁকে। আপিসে বসে, তার মধ্যে অনেকটা সময় সে ওই কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে।

—আর প্রতি মুহূর্তেই তাগিদ এসেছে মনোরমার কাছ থেকে।—তুই বল সুরু! ওরা আমাকে একেবারে ধরে-করে পড়েছে। আর দেরী করতে চায় না। আমার পোড়া বরাতে যে এল, তাকে নিয়েই বা কদিন ঘর করতে পেলুম! এই শূন্যতা যে আমি কিছুতেই সইতে পারি না। তুই সুধাকে নে সুরু? আমাকে একটু শান্তি দে? আমার খালি বুকটা পূর্ণ হোক।

—কিন্তু আমি কি করে বিয়ে করতে পারি মা সুধাকে?

—কেন?

—এতদিন ধরে তুমি ওকে যেমন করে গড়েছো, যেমন করে এ বাড়ীর সব কিছু চিনিয়েছো?

—কবে কি বলেছি, না বলেছি, সেই কথাটাকেই তুই জীবনের চরম বলে ধরে নিলি?

—না—মা! ছি! ছি! নিরুর কথাটা তুমি মোটেই—

—অকস্মাৎ যেন এক অদ্ভুত আচরণ করলেন মনোরমা। আর সে কথা শুনে সুরঞ্জন হতভম্ব হয়ে গেল। মনোরমা বললেন—একান্ত দ্বিধাহীন স্বরেই। যেন অত্যন্ত সহজ ভাবে, বললেন—নিরু সে ছেলেই নয়, আর ওকে আমি বললেই সব ঠিক হবে'খন!

—মায়ের এইরূপ কথায় নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল সুরঞ্জন। সে ভাবল, কি ভীষণ নেশাগ্রস্ত হলে তবে মানুষ এমন চিন্তা করতে পারে, এমন কথা বলতে পারে, এমন কি নিজের পেটের ছেলের সামনেও।

সুধাকণাকে যেন এক নেশাগ্রস্ত মন দিয়ে দেখেছিলেন মনোরমা। এক মোহের অজ্ঞানে তিনি তার দু'চক্ষু পূর্ণ করেছিলেন।

প্রায় ধমকে উঠল সুরঞ্জন মাকে, ছেলেমানুষী করো না মা। সুধাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ভাল করে কথাটা ভেবে দেখো!

কান্নাভরা গলায় বললেন মনোরমা, তাহলে ওদের আমি কি বলবো?

—বলবে আমি বিয়ে করব না। প্রায় জজের রায় দান করার মত দৃঢ় কণ্ঠে বলল সুরঞ্জন।

ছেলেমানুষীর আরও বুঝি বাকি ছিল মনোরমার। হঠাৎ নিজেকে বড় রূঢ় করে তুললেন তিনি এ সংসারের কাছে। নিজের শরীর সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন হয়ে উঠলেন। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ত্যাগ করলেন।

একদিন তিনি স্পষ্টই বললেন সুরঞ্জনকে যে, এ বাড়ীর অন্নে তার আর রুচি নেই! নিজের অস্তিত্বহীন সংসারে কেবলমাত্র জড় দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে বয়ে বেড়াতে তার আর ইচ্ছা নেই! এ যেন তাঁর আত্মহত্যার সঙ্কল্প।

হঠাৎ একদিন বিনা কারণেই সুধাকণাকে সরাসরি বলে বসলেন মনোরমা—তুমি আর এ বাড়ীতে এসো না, এখন এ বাড়ী আর আমার নয়! সুরঞ্জনকেও স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, এই বুড়ো হাড়ে তিনি এই সংসারের জোয়াল টান্‌তে পারছেন না। সুরঞ্জন যেন কোন লোক-জন স্থির করে।

সংসারের শান্তি-নদীতে ভাঁটা পড়ছে। নিত্য সাবলীল গতিতে সেটা প্রবাহিত হ'ত। ক্রমে ক্রমে তার সেই গতি রুদ্ধ হয়ে আসছে। হয়ত হঠাৎ একদিন সেটা একেবারে মজে যাবে অযত্ন আর অবহেলার পলি পড়ে পড়ে।

কেউ ভাবে—যাক একেবারে রুদ্ধ হয়ে। পুরণো নদীর মজা পাঁক না ঘেঁটে, নতুন করে সৃষ্টি করো কোন এক ভিন্ন জলধারা। নিজের নিজের পথ কেটে বয়ে যাক সেই স্রোতধারা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে।

কিন্তু সুরঞ্জন বুঝি একটু ভুল করেছিল হিসেবে। সে ওই মজা নদীর পঙ্কোদ্ধার করতেই চেয়েছিল। আর তার মৃত-স্রোত-প্রবাহকে আগের মত সাবলীল গতিতে বইয়ে দিতে চেয়েছিল। তাই মনোরমার মনের জমাট-বাঁধা পাঁককে দূর করতে গিয়ে তার সমস্ত বিষ-বাষ্পটুকু দিয়ে নিজের জীবনের বাকি দিনগুলোকে আরও জটিল করে তুলল সে।

সুধাকণার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সুরঞ্জন। আলতো করে তার মাথার ওপর নিজের একটা হাত রাখল, বলল—অনেক রাত হল, এসো শুয়ে পড়বে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে খাটের এক পাশে দাঁড়াল সুধাকণা। মুখ নীচ করে, এতক্ষণ আগের নক্ষত্র গোনা চোখ দুটো এখন পায়ের দশটা আঙ্গুলে স্থাপন করল। আনত-মুখ সুধাকণার কপালে ও নাকের ডগায় ঘাম জমেছে মুক্তোর মত।

আবার বলল, সুরঞ্জন—চলো, শোবে না?

সুধাকণা নীরব, নিস্পন্দ।

সুরঞ্জন বলল—তবে কি গল্প করবে? এসো না হয় তাই করেই রাতটুকু কাটিয়ে দিই?

—এবারও কোন কথা বলল না সুধাকণা। তার দেহটা অল্প কাঁপছে সুরঞ্জন দেখল। কানের দুল দুটো থির থির করে দুল্‌ছে সুধার।

সুরঞ্জন বলল—তোমার কোন কথা বলার নেই আজ? যেন একটা পুতুলকে দম দিয়ে সজীব করার চেষ্টা করছে সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, এ বিয়েতে কি তুমি খুসী হওনি সুধা?

সচকিত হয়ে তাকাল সুধাকণা। সুরঞ্জন দেখল, কেবল কাঁপছে না সুধা, অল্প কান্নার আভাস তার মুখে চোখে।

হঠাৎ যেন কেমন মায়া হল সুরঞ্জনের। আর একটা কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—কি করবো সুধা, আমি কত অসহায় তা কি তুমি বোঝ না?

এই কথা বলে সে সস্নেহে সুধাকণার মুখটা দু হাতে তুলে ধরে—ঠিক সে রাত্রে অনুপমাকে চুমু খাওয়ার মত।

—সুধাকণার মুখও চুমুতে ভরিয়ে দিতে গেল।

—ছিট্‌কে সরে গেল সুধাকণা। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লোহার গরাদগুলো শক্ত হাতে চেপে ধরল সে।

এখান থেকে দেখল সুরঞ্জন, জানালার সামনে দাঁড়ানো সুধাকণার দেহটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। বোধ হয় কাঁদছে সে।

...অল্পক্ষণ পরে ঘরের দুটি প্রাণীর একজন তেমনই দাঁড়িয়ে রইল একই ভাবে জানালার ধারে। কান্নাটা তার এখন থেমেছে, কিন্তু আবার তার দৃষ্টি স্থির হয়েছে কালো আকাশের গায়ে—যেখানে জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। সেই নক্ষত্র গণিতের মধ্যে আপনার—জীবনের—যোগফল সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করছে বোধ হয় সুধাকণা।

আর একজন সে রাত্রে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথাই চিন্তা করছিল, মনোরমার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে গিয়ে কি ভয়ানক ভুল করেছে সে। একটা মেয়ের কোমল মনকে নিয়ে যে সর্বনেশে খেলায় মেতে উঠেছিলেন মনোরমা। আর সে খেলায় ভুলে সুধাকণা তার মনের কক্ষটিতে একজনকে আশ্রয় দিয়ে ফেলেছিল, আজ সেই কক্ষে বুঝি অনধিকার প্রবেশ করে বসেছে সুরঞ্জন।

পরিচয়

অমিতাভ বসু

আকাশের মত উদার আমাদের মন
শান্তির পারাবত বলাকার পাখায় পাখায়
মৈত্রীর বাণী, নিয়ে ফেরে,
নয় শুধু এই পরিচয়।
বজ্র বহ্নি নিয়ে এ শান্ত আকাশ
অশান্ত হতে পারে প্রয়োজন বোধে।
চৈতন্যের আলিঙ্গন ও আমার অভ্যাসে আপন
তাই বলে তৈমুরের তরবারি ঝলসে প্রয়োজনে
এই হাতে—
যেই হাতে মুদ্রা ধরে বুদ্ধ,
গৌর, রামকৃষ্ণ প্রেমের
হিমালয় সাক্ষী তার।
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আজ
জোয়ানের বক্ষরক্ত দানে॥
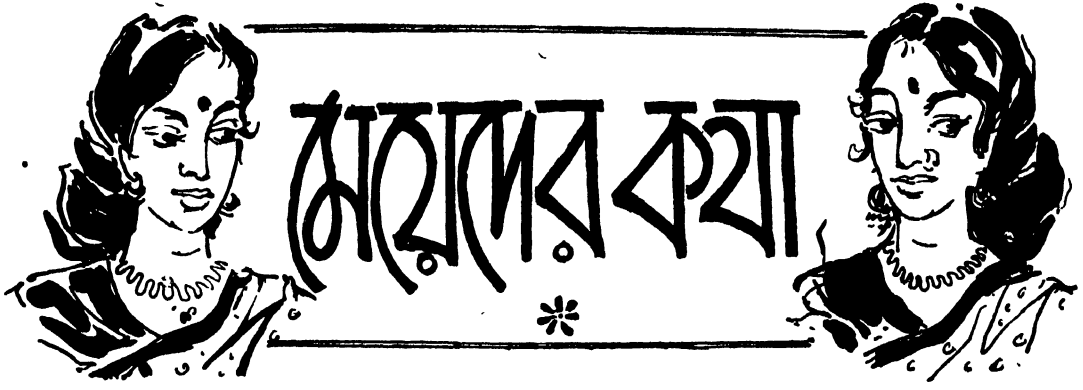
নারী-বিচিত্রা

সু-নন্দা

"O, Woman ! in our hours of ease,
Uncertain, Coy, and hard to please,
And Variable as the shade
By the light quivering as pen made ;
When pain and anguish wring the brow
A ministering angel thou !
(Sir Walter Scott)

অবশ্য সার্ ওয়ালটার স্কট্ যে কথা লিখেছিলেন তার তাৎপর্য হচ্ছে যে—অতি ধীর স্থির, অচঞ্চলা নারীও অগণিত মানসিক ভাবান্তরের বশীভূত,—যে ভাবান্তর হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। যারা চঞ্চলা, যারা খাম-খেয়ালী, প্রতিকূল ভাবান্তর তাদের মজ্জাগত। কিন্তু এই সব অন্তরের বিরোধী ভাব, তাদের শারীরিক দুর্বলতা এবং তাদের মানসিক নির্জীবতাই যে তাদের চারিত্রিক বিশেষ এ মনে ক'রলে ভুল হবে ; কারণ প্রিয়জনের অসুস্থতায়, তাদের বিপদে, দুর্যোগে, এই নারীই নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, চপলতা—সব ত্যাগ করে সকলের ঊর্দ্ধে উঠে। সকলের অন্তর দিয়ে প্রিয়জনের সেবা-শুশ্রূষা করে, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, একান্তমনে তার পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করে। মায়া, স্নেহ ও প্রেম দিয়ে সমস্ত অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে এনে সামলে নেবার চেষ্টা করে। এ তার আবাল্য শিক্ষা, অনবদ্য চিন্তা, জন্মগত অভ্যাস। নারীর এই রূপকেই স্কট্ বলেছেন : "Ministering angel thou."

নারীর গুণ উচ্চস্তরে প্রকাশ পায় প্রিয়জনের দুঃখের সময়, পীড়ার সময়, অভাবের সময়। তখন তার আর নিজস্ব সত্তা থাকে না, কোন স্বার্থ বোধ থাকে না, কোন অসামঞ্জস্য, অসংগত চপলতা থাকে না। মুহূর্তে তার রূপ বদলে যায়। তখন সে অনন্যমনা হয়ে প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করে,—সেই চিন্তাতেই সে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে যায়। নারীর আত্মশক্তিতে এতই বিশ্বাস যে—সে ভাবে সে তার প্রিয়জনের নিকট থাকলে তার কোন অশুভ, কোন বিপদ ঘট্‌তে পারবে না। এ তার অন্তর্নিহিত ধারণা—তার অটল বিশ্বাস।

অনেক নারী যে এক ঘেয়ে জীবনের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে, তা পুরুষ সমস্তদিন কাজের মধ্যে লিপ্ত থেকে সম্যক উপলব্ধি ক'রতে পারে না। কিন্তু সেই আবার যখন দেখে সংসারে তার প্রধান স্থান, সেখানে তার প্রয়োজন আছে, তখন সে এ সব ভুলে গিয়ে নিজস্ব সত্তা উপলব্ধি করে। এই অবস্থায় তার গুণাবলী সম্যক প্রকাশ পায়—যে গুণাবলী অযথা শুকিয়ে যায় এক ঘেয়ে নিষ্ফল

জীবনের মধ্যে। এই সেবায় কি সে আনন্দ পায়? না-অন্তরস্তলে দয়িতের প্রতি অনুকম্পায় মেতে ওঠে? এর সত্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে, সে প্রিয়জনকে সজীবভাবে সাহায্য করতে পারলে অন্তরের অন্তস্তলে মূলত গভীর আনন্দ উপভোগ করে।

বেশির ভাগ নারীই মনে করে যে পুরুষ চিরকালই বালক থাকে, তারা উপায়হীন, অকর্মণ্য! নারীর সাহায্য ভিন্ন তারা চলতে পারে না। তাই তারা যখন বিপদে পড়ে নারীর কাছে আসে, তখন সে ছোট ছেলেদের মত .তাদের সহজ-সরলভাবে সান্ত্বনা দেয়। এখানে তার কোন কার্পণ্য থাকে না, এতে তার আনন্দ আছে, তার সুখ আছে। স্বামী যদি নিজ দোষেও সম্পূর্ণ নিঃস্ব হ'য়ে স্ত্রীর কাছে হতাশ হয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন তার প্রথম উদ্বেগ হয় কি ক'রে তাকে সান্ত্বনা দেবে, কি ক'রে তাকে বোঝাবে যে—যত বড় দুর্ভাগ্যই হোক না কেন সে তার সমান ভাগ নেবে,সে তার সাথী, সে তার সহধর্মিণী—শেষ পর্যন্ত সে তার সাথে তার দুর্ভাগ্যের সমস্ত কষ্ট মাথা পেতে নেবে।

মাতৃত্ব প্রত্যেক নারীরই সহজাতপ্রবৃত্তি। সে শুধু ভার্যা নয়, সে মাতা, এবং মাতৃত্বের দরদ দিয়েই সে তখন পুরুষকে দেখে। সেইখানেই তার সহজলব্ধ প্রকৃতির মহিমা। পুরুষ যত বড়ই হোক, মাতৃ-হৃদয় দিয়ে নারী তাকে সান্ত্বনা দেয়,—তাকে রক্ষা করে, স্নেহ দেয়, তাকে আদর করে। "One of the surest means of touching a Woman's heart is to sound that mysterious chord—viz. "maternal instinct" (Romain Rolland—"jean Christophor) 'আমি নারী আমি মহীয়সী"র চরম সার্থকতা তার এই ভূমিকায়।

নারী মাতা, নারী কন্যা, নারী ভগ্নী, নারী ভার্যা; আবার নারীই বারবণিতা, নারী উপপত্নী! এই সব ভূমিকার বৈশিষ্ট্যই নারীর মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু মাতৃত্বেই তার স্ত্রীত্বের সর্বশক্তিমান সহজ স্বতঃস্ফূর্ত নারীত্ব। এইটাই তার সব থেকে সরল, সহজ প্রবৃত্তি ও অধিককাল স্থায়ী—চিরস্থায়ী বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই স্বাভাবিক মাতৃত্বের কাছে আবেদন করলে তাকে সে ফিরিয়ে দিতে পারে না। "Motherhood is the most Conquering emotion in the world...... Maternal instinct, being an instinct of protection, out-lasts child-bearing age, and Women are never truer to their feminity than when confiding somebody close to them, however elderly, in their compassion and tenderness" (Richard Curle)

যে নারী স্বামীকে ভালবাসে না, কিংবা তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়—যার নিকট সে কোনদিনও ভাল ব্যবহার পায় নাই—তারও স্বভাব এই যে, স্বামী বিপদে প'ড়লে তারই পাশে এসে দাঁড়ায়। যখন সবাই তাকে ত্যাগ করে—সবাই তাকে খল, প্রতারক বলে মনে করে, তখনও তার প্রতি স্ত্রীর আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। স্বভাবতঃ চঞ্চল, অসমঞ্জস, অসংলগ্ন নারীও প্রিয়জনের বিপদে অচঞ্চল, ধীর, অনন্যমনা, সেবাপরায়ণা হয়ে ওঠে। দয়িতের বিপদে সে তাকে—সিংহী যেমন শাবককে রক্ষা করে, সেইভাবে সমস্ত মন ও শক্তি দিয়ে প্রিয়কে রক্ষা ক'রতে আত্মনিয়োগ করে। এ কর্তব্যে ভ্রষ্টা হয় শুধু সেই নারীই—যারা ভ্রষ্টা।

যে কোন কাজেই নারী একনিষ্ঠ! পুরুষের অপেক্ষা নারীর মন একমুখী। সামাজিক রীতি-নীতি, নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মের অনুশাসন সে মাথা পেতে নিলেও সমূহ বিপদের মুখে সে লোক নিন্দাকে তুচ্ছ করে—যদি তা প্রিয়ের স্বার্থের প্রতিকুল হয়। নারী স্বভাবত কল্পনা থেকে মানুষের প্রতি অধিকতর মনোযোগী। নারী যদি ভালোবাসে তা হ'লে সে যে কোন বিজাতীয়কে বিবাহ ক'রে তার নিজস্ব নাম পরিবর্তন করে তার সংসার ক'রতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না,—যেখানে পুরুষ হয়তো একটু ইতস্ততঃ করতে পারে। তা ছাড়া পুরুষকে এরূপ পরিস্থিতিতে তার আবাল্য সংস্কার, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হয় না,—যেমনটি হয় নারীকে। এই জন্যই স্বামী-পুত্রের প্রতি তার একটা মায়া, অন্ধ সম্মোহন ও প্রগাঢ় আসক্তি থাকে—যা—যে কোন মতবাদের ঊর্ধ্বে।

"What not a woman, gentle woman dare,
When strong affection stirs her spirit up"
(Sheridan)

এ নারী চরিত্রের বিশেষত্ব অতি সত্য!

একথা অবিসংবাদী সত্য যে নারী তার স্বামীর সমূহ বিপদে, অন্তিম দারিদ্র্যে, অসহ্য অপমানেও অচল, অটল ভাবে তার সাহচর্য্য করে তখুনি—যখন সে বোঝে যে স্বামী তার উপর নির্ভরশীল, তাকে তার প্রয়োজন আছে। তার সমস্ত অপরাধ নির্বিশেষে ক্ষমা ক'রে নিতে দ্বিধা বোধ করে না। এতে তার একটুকুও সময় লাগে না। নারীর গৌরব অনাদরে ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু যখনই সে উপলব্ধি করে যে তার উপস্থিতি প্রয়োজন, তখুনি সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে তার সাহায্যে লেগে যায়, তার পরিচর্য্যা করে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

নরনারীর মধ্যে নারী অধিকতর আদিম বলে অনেকের ধারণা। সৃষ্টির প্রারম্ভে রমণীর জন্মলাভ হয় নাই—একথা বলাও হয়তো সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে একথা ঠিক যে বয়স হিসাবে নারী অধিক পরিণতবুদ্ধির অধিকারিণী। যে জিনিষ তার নিকট সহজে বোধগম্য, পুরুষের কাছে তা নয়। সে যেটা সহজজ্ঞানে উপলব্ধি করে সেটা পুরুষের হয় তর্কের মীমাংসা। তাই নারী তার সহজবুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝতে পারে অবস্থার পরিস্থিতি। হয়তো সে শুধু একটা দিকই দেখতে পায়, কিন্তু তার কোন সংশয় থাকে না।

সন্তানের প্রতি মাতার সহজ-জাত স্নেহ-ভালোবাসা মনুষ্যজগতের বিশিষ্টতা নয়। জীব জগতে কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাই মাতৃ-স্নেহের গৌরব একমাত্র নারীর মহত্বের লক্ষণ নয়,—ওটা স্বতঃস্ফুরিত জীবজগতের ধারা। কিন্তু মা তো সন্তানকে শুধু স্তন দিয়ে লালন পালন ক'রে—তাকে বড় ক'রে তোলে তা নয়। নিরালা নির্জনে গৃহাভ্যন্তরে যখন দেখি সে অনন্য-মনে সন্তানের উপর উবুড় হ'য়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে উপভোগ করছে; স্নেহ ভালোবাসার আনন্দে তার সমস্ত মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত হয়ে উঠেছে, তাকে হাসিয়ে তার সাথে কলনাদে কত কথা ব'লে, তার আধো আধো কথা শুনে আনন্দাপ্লুত নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তখুনি বুঝি মাতৃত্ব সমস্ত প্রকার মানসিক উন্মাদনার সর্ব্বোচ্চস্তরে। এ দিয়ে বিশ্বজগৎ জয় করা যায়। মাতৃ হৃদয় পরাজয় মানে না।

নারী পুরুষের সম্বন্ধ কি শুধুই প্রেমসম্পর্কীয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। কিন্তু নারী সহকর্মিণী, নারী বন্ধু, নারী সহচরী হ'তে পারে সেখানেই—যেখানে প্রেম কিংবা কামের কোন সম্পর্ক নেই। এমন বন্ধুত্ব ও নিষ্প্রেম সম্পর্ক বিরল নহে। প্রেমবর্জিত নারী সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু তার মধ্যে মন-চাঞ্চল্যের কোন ছায়া পড়লে মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে সে বন্ধুত্ব দূষিত হয়ে ওঠে। এরূপ প্রেমহীন নারী-পুরুষের বন্ধুত্বে আনন্দ আছে। এতে কার্য্যে শক্তি দেয়, উৎসাহ দেয়, প্রেরণা যোগায়,—উভয়ের পরস্পর পরামর্শে শান্তি দেয়। নারী যেমন তার গোপন তথ্য অন্য নারীকে না ব'লে যে পুরুষের উপর তার বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে—তাকে ব'লে তৃপ্তি ও শান্তি বোধ করে, পুরুষও তেমনি অনেক গোপনবার্তা নারী-বন্ধুকে বিশ্বাস ক'রে বলতে পারে। কারণ সেখানে তার বিশ্বাসের পূর্ণ মূল্য সে পায়। অবশ্য নীতিবিদ্‌রা, এবং যাঁরা "সিনিক্" তাঁরা বলবেন—এ সম্ভব নয়। প্রেম ও কাম বর্জিত নারী-পুরুষ সম্পর্ক যে সম্ভবপর, এ ধারণা তাঁদের চিন্তার বহির্ভূত। এ মতামতের সাথে তর্ক করা চলে না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে বন্ধুত্বের মধুর সম্পর্ক নিষ্কলঙ্ক রাখতে উভয় পক্ষে প্রচুর সহিষ্ণুতা ও অনুভবশক্তি থাকা প্রয়োজন। কারণ তা না থাকলে বিভিন্ন মনোবৃত্তির আঘাতে এর বিনাশ হ'তে পারে। এ বন্ধুত্ব সহজজাত নহে সত্য! চারিত্রিক সমন্বয় না থাকলে এর বৈকল্য ঘটে; অধিকার-সূচক মনোবৃত্তি এর অন্তরায়, স্বার্থপরতা এর পরিপন্থী। বিশ্বাসী নারীবন্ধু কখনও অপকার করে না। পুরুষ যাই করুক না, সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে তার পক্ষ সমর্থন ক'রবে। এর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকে না। সে বন্ধু, সেই যথেষ্ট! এরূপ স্থলে পুরুষ যদিও নারীবন্ধুকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে ও তার পক্ষ অবলম্বন করে, তবু তার মধ্যে তর্কের স্থান থাকে, ভালমন্দ বিবেচনা থাকে, চিন্তার কারণ থাকে। এই-খানেই দু'য়ের পার্থক্য! নারী একনিষ্ঠ, পুরুষ বহুদর্শী!

নারী পুরুষবন্ধুর উপর নির্ভর ক'রতে পারে ; কিন্তু পুরুষকে নারী দেয় শুধু বিশ্বাস নয়, দেয় তার সাথে উৎসাহ ও আনন্দ।

কতক কতক পুরুষ আছে,যারা প্রেম ও কামের বাইরে নারীর কল্পনা ক'রতে পারে না। তারা পদে পদে অপদস্ত হয়। কারণ এই প্রকার 'মনোবিকার',—এই প্রবণতা তাদের বিচার শক্তিকে প্রভাবিত করে। তারা জীবনের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। আর এক প্রকার লোক আছে যারা নারীকে ঘৃণা করে। তারা কখনও নারীর বন্ধুত্ব ভাবতে পারে না। প্রেম ও কামের ঊর্ধ্বে নারী-পুরুষের বন্ধুত্বে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ত্যাগের প্রয়োজন। অবশ্য এ বন্ধুত্ব খুব সহজ নয় ও সচরাচর হয় না। সামাজিক রীতিনীতি, মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির চঞ্চলতা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সংশয় ও অবিশ্বাস, এ প্রকার বন্ধুত্বে প্রতিকুল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এ ছাড়া পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্বে, কিংবা নারীতে নারীতে বন্ধুত্বের চেয়ে নারী পুরুষের বন্ধুত্বে কিছু পার্থক্য থাকে। বিশেষ পরিচিতা হ'লেও নারীর সাথে কথা-বার্তায় পুরুষকে বেশ সংযমিত হয়ে তার ভাষা, তার প্রকাশভঙ্গীর উপর দৃষ্টি রাখতে হয়। বেফাঁস্ কিছু ব'লে না ফেলে—যেটা পুরুষে পুরুষে ভ্রমাত্মক নাও হতে পারে।

সামাজিক জীবনে নারী কল্পনা-প্রবণ, এবং সে সময়োচিত আচার-ব্যবহার, নিষ্ঠা, পূজা-পার্বণ সব খুঁটিনাটি মনে রাখে। কখনো কখনো তার এই খুঁটিনাটি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা বিদ্রূপে পরিণত হয়। কিন্তু এতে তার আন্তরিক মানবতাই প্রকাশ পায়। তার কাছে এই প্রকার খুঁটিনাটি মনোযোগ অনেক পরিমাণে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক।

ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধেও তার স্বার্থহীন প্রশান্ত স্নেহ-ভালোবাসার পরিচয় দেয়। ভ্রাতার প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধা-অসুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাল-মন্দ সমস্ত ভগ্নী সহজাত দরদ দিয়ে দেখতে পায়,—যা পারে না পুরুষ।

পিতামাতা সম্বন্ধেও নারী কল্যাণময়ী। মার সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ মেয়ে যে ভাবে উপলব্ধি করে—সংসারে তার যাবতীয় কাজে সাহায্য করে, ছেলে তা করে না। পিতার খুঁটিনাটি, আরাম-বিরাম, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কন্যাই দেখে—তার সেবা করে আনন্দ পায়, পিতাকেও তৃপ্তি দেয়।

স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নী, পিতা-কন্যা—যে কোন সম্পর্কেই নারী একনিষ্ঠ,--সেবা-পরায়ণা,—স্নেহ ও প্রেমের আদর্শ, —জীবনে আনন্দদায়ক!

এমন কি পতিতা নারীও অন্তরের অন্তস্থলে কারো প্রতি প্রেম ও আসক্তি পোষণ করে ;—সেখানে সে নিঃসন্দেহে আত্মত্যাগী, একনিষ্ঠ! বারবণিতা হয়েও মন তার কলুষিত নয়। দেহ আর মন সম্পূর্ণ পৃথক, বিশেষ ক'রে এদের। মন একনিষ্ঠ, দেহ পাপিষ্ঠ! সেটা অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, সমাজের নৃশংসতা, ঘটনাচক্রের অনিশ্চয়তা!

কত সন্তানহীনা বিধবা ও অবিবাহিতা নারী নিঃস্বার্থভাবে সংসারের কিংবা সামাজিক কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে জীবনযাপন করে। নিজের সুখ-দুঃখে উদাসীন, নির্জন জীবনযাত্রা বহন করে ; কোন নালিশ নাই কারো কাছে। অনূঢ়াবস্থা তাদের কাজে ইন্ধন যোগায়। তারা স্বাভাবিক স্নেহ-প্রেম দিয়ে কর্তব্যে লিপ্ত হয়ে যায়, মন তাতেই মগ্ন! এই ত্যাগেই তাদের গৌরব! সংসারের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ ক'রে তারা প্রকৃত আনন্দ পায় —জীবনের একটা উদ্দেশ্য দেখতে পায়। ধর্মোন্মত্ত নারীর প্রগাঢ়তা বিস্ময়কর! তবে নারীর প্রকৃত প্রশংসা হ'বে তার যৌবন গতে, যৌবনে নয় ; কারণ তা হবে নিরপেক্ষ —ইন্দ্রিয়াকৃষ্ট নয়।

"জীর্ণ সন্নং প্রশংসীয়াদ
ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাম্
রণা প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ
গৃহমাগতম।"

জীর্ণ হওয়ার পরই আহার্য্যের প্রশংসা করা উচিৎ। অতিক্রান্তযৌবনা স্ত্রীই প্রশংসার যোগ্য, বীর যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরলেই প্রশংসা লাভের উপযুক্ত হয়, এবং শস্য ঘরে উঠ্‌লেই তবে তাকে প্রশংসা করা উচিত।

শারীরিক বেদনা এবং মানসিক পীড়া নারী সমানভাবে গোপনে সহ্য ক'রতে পারে। আত্মসুখে ঔদাসীন্য তার চরিত্রের মহৎ গুণ। সংসারে তাদের ঔদার্য্য সত্যই

প্রীতিকর ; নিজেকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত ক'রে স্বামী-পুত্রের প্রতি তার কর্তব্য প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচায়ক।

এ নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, তবে সেটা স্বাভাবিক নয়—অস্বাভাবিক! কিছু কিছু নারী আছে যারা স্বার্থান্বেষী, ভোগবিলাসী, আত্মসুখী, পরবিদ্বেষী, স্নেহ-মায়া-মমতাবিবর্জিতা! এ নিয়ম ছাড়া। তারা শুধু নিজেদের ভালবাসে। তারা নারী নয়—নারীর অপবিত্র ছায়া, তার বিকৃত কঙ্কাল! এদের পরিচয়ে নারী জাতির পরিচয় নয়।

সংসারে তাই নারীর স্থান সবার উপরে। "Although a man can buy a house and pay for it, only a woman can contribute the graces and charms that make the house into a home."

(Hector Bolitha)

এর যথার্থ সকলেই জানেন। আমাদের শাস্ত্রেও কথিত আছে :—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী, গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষোঽর্থান্ সমশ্নুতে॥"

কেবল গৃহকেই গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলে, যেহেতু গৃহিণীর সহিত একত্র হয়েই পুরুস যাবতীয় পুরুষার্থ উপভোগ করে।

শুধু এক দোষে নারীর এ সমস্ত গুণ দুষ্ট হয়ে তাকে সমাজে ঘৃণিত করে। "কিং কিং করোতি ন নির্গলতাং গতা স্ত্রী।" অর্থাৎ স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হ'লে সে কি না ক'রতে পারে? অবশ্য তারা সমাজ-বহির্ভূতা।

নারীর যা প্রকৃত গুণ, তাতে সে সত্যই গুণবতী। স্বার্থহীন মহত্ব, সমাজ-সংসারের কল্যাণ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে সে তার প্রয়োজন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে রয়েছে। সেখানে সে মহীয়ান :—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যা তারা ওঠা,
মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।"

বিশ্বকবির মুখে নারীর এই প্রশংসা তাদের কত বড় গৌরবের বিষয় তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

সেলাইয়ের টুকিটাকি সাজ-সরঞ্জাম কিম্বা অন্য পাঁচ-রকম দরকারী-জিনিষপত্র রাখবার জন্য কাপড়ের তৈরী ছোট-বড় নানা ধরণের সৌখিন 'ব্যাগ' (Bag) বা 'বটুয়া-থলি' প্রত্যেক সুগৃহিণীরই বিশেষ কাজে লাগে…তাই আজ সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় অভিনব-সুন্দর ছাঁদের এমনি একটি কাপড়ের কারুশিল্প সামগ্রী রচনার কথা বলছি। রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে এ-ধরণের সৌখিন 'বটুয়া-থলি' বা 'ব্যাগ' তৈরী করা এমন কিছু হাঙ্গামার কাজ নয়। একটু চেষ্টা করলেই নিতান্ত ঘরোয়া কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে যে কোনো সুগৃহিণীই সংসারের কাজকর্ম্মের অবসরে অনায়াসেই নিজের হাতে কাপড়ের কারু-শিল্পের এ সব বিচিত্র-সুন্দর সামগ্রী বানাতে পারবেন।

১
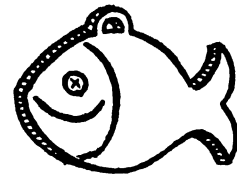
উপরের ছবিতে যে নমুনাটি দেওয়া হলো, সেই ছাঁদে রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'মাছের' আকারের 'বটুয়া-থলি' বা টুকিটাকি-জিনিষপত্র রাখার 'ব্যাগ' তৈরী করবার জন্য সাজ-সরঞ্জাম দরকার—প্রয়োজনমতো-মাপের ও

বেশ পুরু এবং খাপি ধরণের বড় এক টুকরো 'ফেল্ট' (Felt), 'ভেলভেট' (Velvet), 'ক্যাম্বিশ্' (Canvas), 'লিনেন' (Linen), 'খদ্দর' অথবা 'দো-সুতী' জাতীয় রঙীণ কাপড়, সেই কাপড়ের সঙ্গে বেশ সুন্দর ও মানানসই দেখায় এমনি রঙের কয়েকটি মোটা-সুতোর বাণ্ডিল, গোটা-কয়েক কার্পেট-সেলাইয়ের উপযোগী ভালো ছুঁচ, একখানি ধারালো কাঁচি, নক্সা-আঁকার উপযোগী শাদা-কাগজ ও পেন্সিল, কাপড়ের উপর নক্সা-প্রতিলিপি-আঁকার জন্য একখানা 'কার্ব্বন-কাগজ' (Carbon-paper) এবং পছন্দ-মতো রঙের কয়েকটি ছোট-বড় সৌখিন বোতাম।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, শিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে হাত দিতে হবে।
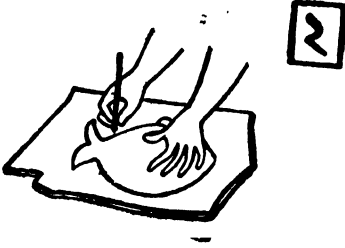
উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, প্রথমেই প্রয়োজনমতো-মাপে ও পরিপাটি-ছাঁদে পেন্সিলের সাহায্যে শাদা-কাগজের উপর মাছের নক্সাটিকে এঁকে নিন। তারপর সেই নক্সা-আঁকা কাগজটির নীচে সুষ্ঠুভাবে 'কার্ব্বন-পেপার' বিছিয়ে রেখে, রঙীণ-কাপড়ের উপরে মাছের প্রতিলিপিটিকে আগাগোড়া নিখুঁত-ছাদে 'ট্রেসিং' (Tracing) করে ফেলুন। প্রতিলিপি-চিত্রণের সময় রঙীন-কাপড়ের উপর অবিকল একই-ধরণে মাছের দেহের এপিঠ আর ওপিঠ, দু'দিকেরই আলাদা-আলাদা দুটি প্রতিলিপি 'ট্রেসিং' করে নেবেন। তবে খেয়াল রাখবেন—সেলাইয়ের সময়, এ দুটি আলাদা-আলাদা দেহাংশকে সমানভাবে মিলিয়ে রেখে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে একত্রে জোড়া দিতে হবে। সুতরাং কাপড়ের উপর প্রতিলিপি 'ট্রেসিংএর' সময়, মাছের দেহাংশের মাপ দুটি যেন হুবহু এক হয়, সেদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এ কাজে এতটুকু ত্রুটি ঘটলেই, শিল্প-সামগ্রী রচনার সময় প্রচুর অসুবিধা দেখা দেবে···'বটুয়া-থলি' বা 'ব্যাগটিও' নিখুঁত-ছাঁদে বানানো যাবে না।
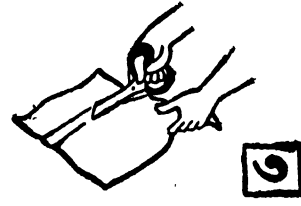
রঙীণ-কাপড়ের উপর মাছের দেহাংশের প্রতিলিপি দুটি একই মাপে আলাদা-আলাদা 'ট্রেসিং' করে নেবার পর, কাঁচির সাহায্যে সে দুটিকে সুষ্ঠুভাবে 'ছাটাই' করে ফেলতে হবে—উপরের ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে।

এবারে উপরের ৪নং ছবির নমুনানুসারে মাছের পিঠের, পেটের, ল্যাজের ও মুখের দিকে 'পটি' সেলাইয়ের জন্য প্রয়োজনমতো মাপে রঙীন-কাপড়ের টুকরো থেকে লম্বা-লম্বিভাবে ১½" ইঞ্চি বা ২" ইঞ্চি চওড়া খানিকটা 'সরু-ফিতা, (Lining Tape) ছাঁটাই করে নিন।

'বটুয়া-থলি' বা 'ব্যাগ' সেলাইয়ের জন্য কাপড়ের বিভিন্ন অংশ ছাঁটাই করে নেবার পর।

উপরের ৫নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মাছের দেহাংশের 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির অন্দরভাগে এপিঠ ও ওপিঠের মধ্যে লম্বা-ছাঁদের সরু-ফিতার 'পটি' বসিয়ে, ছাঁটাই-করা কাপড়ের টুকরোগুলিকে পরস্পর সমানভাবে মিলিয়ে রেখে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে 'টাঁকা-সেলাই' (Basting বা Blanket Stitch) দিয়ে পাকাপোক্ত-পরিপাটি-ধরণে একত্রে জোড়া লাগান। এ কাজের সময়, ছাঁটাই-করা

কাপড়ের বিভিন্ন টুকরোগুলিকে সমানভাবে মিলিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি 'সেফ্‌টি-পিন্' (Safety-Pin) দিয়ে একত্রে গেঁথে নেবেন…তাহলে সেলাইয়ের সময় ঐ আলাদা-আলাদা-টুকরোগুলি আদৌ সরে যাবার আশঙ্কা থাকবে না—বরাবর যথাস্থানেই রইবে—এতটুকু নড়েচড়ে যাবে না।

এমনিভাবে মাছের-ছাঁদে তৈরী 'বটুয়া-থলি' বা 'ব্যাগের' তিনদিক সেলাই করে জুড়ে নিয়ে, মাছের পিঠের প্রান্তে 'টেপা-বোতাম' (Safety-button) অথবা 'জিপ্-ফাষ্ট্‌নার্' (Zip Fastner) বসিয়ে দেবেন—তাহলেই জিনিষপত্র ভরবার বা বার করবার সুবিধার জন্য 'বটুয়া-থলি' বা 'ব্যাগটির' মুখটিকে ইচ্ছামতো খোলা বা বন্ধ করা চলবে। এ কাজটুকু সেরে নেবার পর মানানসই-রঙের দুটি ছোট বা বড় বোতাম সেলাই করে দিয়ে মাছের চোখ দুটিকে বানিয়ে ফেলুন। তাহলেই কাপড়ের কারু-শিল্পের এই অভিনব-সামগ্রী রচনার কাজ শেষ হবে।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু শিল্পের আরো একটি অভিনব সৌখিন বিচিত্র-সামগ্রী রচনার বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

'ক্রশ্-ষ্টিচ্' আর 'কার্পেট' সূচী-শিল্পের বিচিত্র নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সুগৃহিণীমাত্রেই নিজের ঘর-সংসার সর্ব্বদাই নানা ধরণের সুশ্রী-সৌখিন সামগ্রী দিয়ে পরিপাটি-ছাঁদে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসেন। মনোরমভাবে গৃহসজ্জার উদ্দেশ্যে অনেকেই প্রচুর অর্থব্যয় করে বাজার থেকে নিত্য নানা রকমের সুদৃশ্য-সামগ্রী কিনে আনেন, এমন কি, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মের অবসরে নিজের হাতে বিভিন্ন ধরণের সৌখীন সূচী-শিল্পের কাজ করে সংসারের শ্রীসৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলেন তাঁরা বহু পরিশ্রমে এবং বিচিত্র উপায়ে। তাই এই সব সুগৃহিণীদের সুবিধার জন্য এবারে 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' (Cross-stitch) ও 'কার্পেট' (Carpet) সূচী-শিল্পের কাজ করে সৌখিন-ছাঁদে গৃহ-সজ্জার উপযোগী বিচিত্র-সুন্দর 'মাদুর' (Mat) বা 'আসন' রচনার অভিনব একটি নক্সার নমুনা উপহার দিচ্ছি—নীচের ছবিটি দেখলে সে নমুনাটির সুস্পষ্ট-পরিচয় মিলবে।

রঙীণ-পশমের সুতো দিয়ে 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' বা 'কার্পেট' সূচী-শিল্পের কাজ করে উপরের নমুনামতো বিচিত্র-ছাঁদের বিড়ালের প্রতিলিপিটি ফুটিয়ে তুলে গৃহসজ্জার উপযোগী সৌখিন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় 'মাদুর' বা 'আসন' রচনা—খুব একটা কঠিন ও ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়। সূচী-শিল্পের অতিসাধারণ অল্প কয়েকটি ঘরোয়া-সাজসরঞ্জাম আর সামান্য একটু পরিশ্রম করলেই অনায়াসেই সল্পব্যয়ে নিজের হাতে এমনি ধরণের নানা রকম সুন্দর-সুন্দর সামগ্রী বানিয়ে তুলতে পারবেন।

উপরে যে বিড়ালের 'প্যাটার্ন' বা 'নমুনা' দেওয়া হলো, ক্রশ্-ষ্টিচ্ বা 'কার্পেট' সেলাইয়ের কাজ করে, সেটিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। এ নক্সাটি রচনার জন্য দরকার—১৫″ ইঞ্চি + ২৯″ ইঞ্চি বহরের একগজ লম্বা মাপের 'কার্পেট-সেলাইয়ের কাপড়' (Carpet-cloth) কিম্বা 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' সূচী-শিল্পের উপযোগী ঐ মাপেরই পুরু ও থাপি ধরণের 'লিনেন' (Linen), 'খদ্দর' 'দো-সুতী' বা 'চট' কিম্বা 'ক্যান্‌ভাস্' (canvas) জাতীয় কাপড়, ৪ আউন্স কালো-রঙের পশমী-সুতো (Woolen Strands), ১৪ আউন্স লাল-রঙের পশমী-সুতো, ১৮ আউন্স গাঢ়-বাদামী রঙের পশমী-সুতো, এক হালি পাতি-লেবুর মতো ফিকে-হলুদ রঙের (Lemon) পশমী-সুতো, এক হালি ফিকে-ছাই রঙের (Light Grey) পশমী-সুতো, এক হালি শাদা-রঙের পশমী সুতো এবং এক হালি গাঢ়-সবুজ (Jade Green) রঙের পশমী-সুতো আর এক হালি ফিকে-গোলাপী রঙের পশমী-সুতো। এছাড়া আরো চাই—'কার্পেট' অথবা 'ক্রশ্-ষ্টিচ্'

সূচী-শিল্পের উপযোগী প্রয়োজনমতো কয়েকটি সরু-মোটা মজবুত ছুঁচ, আর ভালো একখানি কাঁচি।

এ সব সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, উপরের ছবিতে দেখানো ‘প্যাটার্ণ’ (Pattern) বা ‘নমুনা’ অনুসারে কালো-রঙের পশমী-সুতো দিয়ে কালো-লাইনের ঘরগুলি আগা-গোড়া ভরাট করে বিড়ালের দেহের (Body) রেখাচিত্র বুনে ফেলুন। রেখাচিত্রের ভিতরকার শাদা-ঘরগুলি ভরাট করে তুলুন ফিকে-ছাই রঙের পশমী-সুতোয়। বিড়ালের চোখ দুটি অর্থাৎ উপরের নক্সায় দেখানো ‘ফুট্‌কি’-চিহ্নিত অংশ ভরে তুলুন ফিকে হলুদ রঙের পশমী-সুতো দিয়ে এবং চোখের মণি অর্থাৎ উপরের নক্সায় দেখানো ‘+’ চিহ্নিত ঘরগুলি ভরাট করুন গাঢ়-সবুজ রঙের পশমী-সুতোয়। এবারে বিড়ালের নাক-মুখ রচনা করুন উপরের নক্সায় ‘V’-চিহ্নিত ঘরগুলিকে ফিকে গোলাপী-রঙের পশমী-সুতো দিয়ে ভরে তুলে। বিড়ালের গোঁফের রেখাগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে—শাদা রঙের পশমী-সুতোর সাহায্যে ‘ব্যাক্-ষ্টিচ্’ (Back-Stitch) সেলাই দিয়ে। তবে বিড়ালের গোঁফ-রচনার সময়, শাদা রঙের পশমী-সুতোটিকে আগাগোড়া দু'ভাগে চিরে সরু করে নিতে হবে (Split the strond in half)।
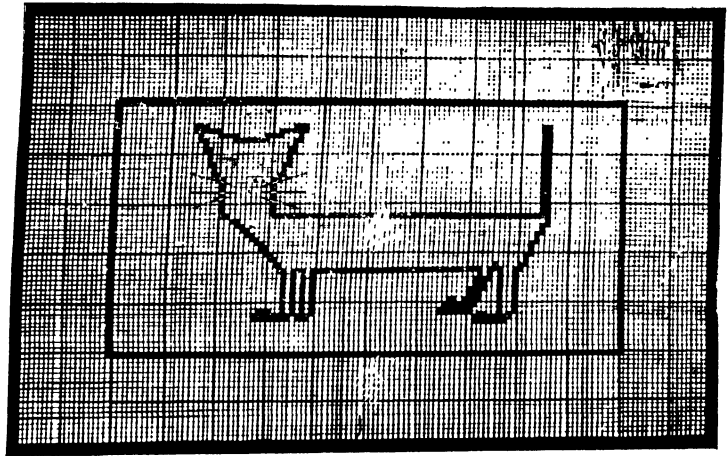
বিড়ালের দেহের ‘পশ্চাদ্‌পট’ অর্থাৎ, চারিপাশের ফাঁকা-ঘরগুলিকে আগাগোড়া ভরে তুলতে হবে—লাল-রঙের পশমী-সুতো দিয়ে। এ কাজের পর, ‘মাদুর’ বা ‘আসনের’ চারিদিকের ‘কিনারা’ (Border) বা ‘পাড়’ অর্থাৎ, উপরের নক্সায় দেখানো কালো-রঙের লাইনের ঘরগুলি ভরাট করে তুলবেন—কালো কিম্বা ফিকে-হলুদ রঙের পশমী-সুতোয় এবং শাদা-জমী ভরাট করে দেবেন—গাঢ়-বাদামী রঙের পশমী সুতোয়। তাহলেই রঙবেরঙের পশমী-সুতো দিয়ে সৌখিন-সূচীশিল্পের কাজ করা গৃহ-সজ্জার উপযোগী অপরূপ-সুন্দর একটি ‘কার্পেট’ বা ‘ক্রশ্-ষ্টিচের ‘মাদুর’ বা ‘আসন’ তৈরী হয়ে যাবে…সেটি দেখে সবাই আপনার নিপুণ কারু-সৃষ্টির তারিফ করবে।

বারান্তরে, সূচী-শিল্পের এমনি আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব ‘নক্সা-নমুনার’ পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

সিল্কের কাপড়ের উপর সূচী-শিল্প

(Embroidery)

শিল্পী—হেমপ্রভা মল্লিক

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি, ভারতের গুজরাট-অঞ্চলের দুটি মুখরোচক খাবার রান্নার কথা।

প্রথমেই যে রান্নার হদিশ দিচ্ছি, সেটি বেশ সুস্বাদু বিচিত্র এক-ধরণের মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবার। গুজরাটবাসী-দের ভাষায় অভিনব এই মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবারটির নাম—'গোল-পাপ্ড়ি'।

'গোল পাপ্ড়ি' মিষ্টান্ন রান্নার জন্য উপকরণ চাই—সিকিখানা (¼) ভালো নারিকেল, চায়ের কাপের এক-কাপ পরিমাণ ভালো গুড়, চায়ের কাপের আধ-কাপ পরিমাণ ঘি। উপরের ফর্দ্দ-অনুযায়ী উপকরণে, প্রায় দেড়-পোয়া পরিমাণ 'গোল-পাপড়ি' রান্না করা যাবে।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই 'কুরুনীর' সাহায্যে নারিকেলের শাঁসটুকু বেশ মিহি করে কুরে নেবেন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে; সেই পাত্রে ঘি গরম করে কাঁচা-আটাটুকু আগাগোড়া ভালো-ভাবে ভেজে নিন। এইভাবে কিছুক্ষণ ভাজবার ফলে আটাটুকুর রঙ যখন বেশ বাদামী হয়ে উঠবে, তখন উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে মিহি-ধরণে কুরে-রাখা নারিকেল মিশিয়ে অল্পক্ষণ হাতা বা খুন্তী কিম্বা বড়-হাতলওয়ালা চামচের সাহায্যে মিশ্রণটিকে নেড়ে পাক করুন। মিশ্রণটুকু আগাগোড়া ভালোভাবে পাক করে নেবার পর, চায়ের কাপে-রাখা গুড়টুকু গলিয়ে নিয়ে রন্ধন-পাত্রে ঢেলে দিন এবং রান্নাটিকে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে গুড়ের রসে ফুটিয়ে নিন। এমনি-ভাবে নারিকেল-কুরো আর আটার মিশ্রণটুকু ভালোভাবে গুড়ের রসে পাক করে নেবার পর, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রেখে, পরিষ্কার একটি থালায় সদ্য-পাক-করা খাবারটি জুড়োতে দিন। কিছুক্ষণ জুড়োনোর ফলে, খাবারটি অল্প-জমাট-ধরণের হলে, পরিচ্ছন্ন একটি ছুরি কিম্বা খুন্তীর সাহায্যে থালায়-রাখা রান্নাটিকে প্রয়োজনমতো ছোট-ছোট বরফির আকারে টুকরো করে কেটে নিন। তাহলেই গুজরাটী-প্রথায় 'গোল-পাপ্ড়ি' খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে। এবারে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের পালা!

গুজরাট-অঞ্চলের আরেকটি অভিনব-সুস্বাদু জনপ্রিয় খাবারের নাম—'বেঙ্গন-না-রবৈয়াঁ'। এটি বিচিত্র-মুখ-রোচক নিরামিষ-জাতীয় এক-ধরণের তরকারী…শব্জী দিয়ে রান্না করা খাবার। এ খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ দরকার—ছয়টি ছোট-ছোট গোল-আকারের টাটকা বেগুন, একটি বড় বা মাঝারি ধরণের আলু, সিকিখানা (¼) ভালো নারিকেল, দুটি কাঁচা লঙ্কা, তিন কোয়া রসুন, এক টুকরো আদা, বড় চামচের এক-চামচ ব্যাসন, আন্দাজ-মতো পরিমাণে ঘি, চায়ের চামচের এক-চামচ ধনে-গুঁড়ো আর অল্প একটু নুন। উপরে যে সব উপকরণের ফর্দ্দ দেওয়া হলো, তাই দিয়ে তিন-চারজনের উপযোগী খাবার রান্না করা যাবে। এর চেয়ে বেশী লোকের জন্য 'বেঙ্গন-না-রবৈয়াঁ' খাবার রান্না করতে হলে, উপকরণের পরিমাণও যে উপরোক্ত হিসাব-অনুসারে বাড়িয়ে দিতে হবে—সে কথা বলাই বাহুল্য!

উপকরণগুলি জোগাড় করে নিয়ে, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, বেগুনগুলিকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে সাফ করে নিয়ে, বঁটি বা ছুরির সাহায্যে সেগুলির প্রত্যেকটিকে চার-ফালি করে চিরে নেবেন। তারপর বঁটি বা ছুরি দিয়ে আলুটিকেও বেশ মিহি-ধরণে কুটে রাখুন এবং কুরুণীর সাহায্যে নারিকেলটিকেও মিহি করে কুরে নিন। এবারে রান্নার বাকী উপকরণগুলিকেও একত্রে আগাগোড়া বেশ মিহি করে বেটে নিয়ে, পাতলা-লেইয়ের মতো সেই বাটাপদার্থটির সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি মিশিয়ে দিন।

অতঃপর, লেইয়ের মতো থক্থকে-পাতলা এই পদার্থ

ভরে দিন—প্রত্যেকটি বেগুনের চেরাই-করা অংশের ফাঁকে ফাঁকে। এ কাজটুকু সারা হলে, উনানের আগুনে ডেক্‌চি বা কড়া চাপিয়ে, সেই পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য ঘি ছেড়ে ঈষৎ-তপ্ত করে নিয়ে, লেইয়ের মতো-পদার্থ বা 'তরল-পুর' ভরা বেগুনগুলিকে কিছুক্ষণ নরম-আঁচে রান্না করুন। এভাবে রান্নার সময়, মাঝে মাঝে খুন্তী বা বড়-হাতলওয়ালা চামচের সাহায্যে রন্ধন-পাত্রের বেগুনগুলিকে নেড়েচেড়ে দেবেন...তাহলেই সেগুলি আগাগোড়া বেশ সুষ্ঠুভাবে গরম-ঘিয়ে পাক হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে রান্নার ফলে, বেগুনগুলি আগাগোড়া পরিপাটিভাবে রান্না হয়ে যাবার পর, ডেক্‌চি বা কড়াটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে সদ্য-পাক-করা বেগুনগুলিকে রন্ধন পাত্র থেকে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই গুজরাটী-পদ্ধতিতে 'বেঙ্গন-না-রবৈয়া' খাবার রান্নার পালা চুকবে। এবারে প্রিয়জন-দের পাতে সযত্নে পরিবেষণের আগে, পরিপাটিভাবে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে চাকার মতো গোলাকার এবং মিহি-ছাঁদে কয়েকটি পাতি-লেবুর টুকরো কুটে নিয়ে খাবারের উপর ছড়িয়ে দিলেই গুজরাটী-কেতায় রান্না-করা 'বেঙ্গন-না-রবৈয়াঁ' তরকারীর স্বাদ আরো অপরূপ ও মুখরোচক হয়ে উঠবে।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের বিচিত্র-অভিনব আরো কয়েকটি মুখরোচক ভারতীয় খাবার রান্নার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।
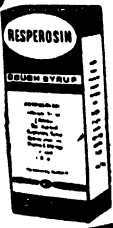
কলিকাতায় মহোৎসব—

গত ৯ই মার্চ শনিবার হইতে ৪ দিন ধরিয়া উত্তর কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্ম দিন উপলক্ষে বিরাট মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এবারের উৎসবের বিশেষত্ব বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা উৎসবের প্রধান দিন দোলোৎসবে বিরাট জনসভায় সভাপতিরূপে আসিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের-ধর্মের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অন্যতম মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলেই প্রতি বৎসর কলিকাতায় এই উৎসব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রধান সভায় এবার লক্ষাধিক লোক সমাগম হইয়াছিল এবং সারা দিন পথে পথে নামকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়া ৪ দিন ধরিয়া পত্রিকা ভবনে ও দেশবন্ধু পার্কে ধর্ম-সভা, বক্তৃতা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। দেশে একদিকে দারুণ অনাচার ও দুর্নীতি এবং আর এক দিকে সর্বত্র ধর্মালোচনা ও ধর্মসভা—মানুষের মন কোন দিকে যায়, বুঝা কঠিন। বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে দোলের দিন শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নবদ্বীপে—বর্তমান শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর ও নবাবিষ্কৃত মহাপ্রভুর জন্মস্থান বর্তমান নবদ্বীপের উত্তরস্থ মাঠ—সর্বত্র কয়েক দিন ধরিয়া মহোৎসব চলিয়াছে। কত লক্ষ লোক যে এই সকল উৎসবে যোগদান করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে কতজন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহাই সমস্যার বিষয়। কলিযুগের মানুষ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ও কৃপা লাভ করিয়া অধর্মাচরণে বিরত হউক—সকলে কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছে। কবে তিনি কৃপা করিবেন, কে বলিয়া দিবে ?

দরিদ্রের দুঃখ—

চীন-ভারত যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত-সরকার নানা নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর নূতন কর বসাইয়া বা পুরাতন কর বাড়াইয়া অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে সে জন্য কর বৃদ্ধির বাহুল্য দেখা যায়। যুদ্ধ চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন, সে জন্য নূতন করের ও আবশ্যকতা আছে—কাজেই নূতন কর ধার্য্য বা পুরাতন কর বৃদ্ধিতে কাহারও আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার যদি ব্যয়-হ্রাসের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে দরিদ্র জনগণের দুঃখের কারণ হইত না। একদিকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে যাইয়া ভারত সরকার তাহার সকল বিভাগের ব্যয় অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়াছেন। আর এক দিকে দেশের দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের শাস্তি বিধান দূরের কথা, বরং তাহাদের উৎসাহ দানের চেষ্টার ফলে মানুষের উপর তাহাদের অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান কংগ্রেসী শাসকের দলের শক্তির অভাবের ফলে দুর্নীতি-পরায়ণ দলের শক্তি ও সাহস দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ১লা এপ্রিল হইতে নূতন কর ধার্য্য হইবে এবং তাহার ফলে জিনিষের দাম বাড়িবে। কিন্তু তাহার পূর্বেই বাজেট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজার হইতে কেরোসিন, বনস্পতি, সাবান, কাগজ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উধাও হইয়াছে বা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থা এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে পারিতেছে না। ইহাই সাধারণ জনগণের অভিযোগ ও দুঃখ। দেশের মুনাফাখোরদিগকে শাস্তির কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণ আইনে অনায়াসে তাহাদের শাস্তি দেওয়া যায়—কিন্তু সমস্ত শাসনযন্ত্র প্রায় বিকল—কোথাও কোন কাজ হয় না—দেশে অনাচার বাড়িয়া চলিয়াছে—ইহা দেখিবার কেহ নাই। এ অবস্থায় কংগ্রেস দল ভবিষ্যতে কিরূপে তাহার জনপ্রিয়তা রক্ষা

করিবে—ইহাই আজ সাধারণ নাগরিকদের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পাটনা সদাকত আশ্রমে তাঁহার বাসভবনে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে অসুস্থ ছিলেন। তিনি ৪০ বৎসরেরও অধিককাল ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে উচ্চ সম্মানের সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া তিনি ১২ বৎসর কাল সে পদে কাজ করিয়াছেন। অতি সাধারণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি শিক্ষা, শরিশ্রম, ত্যাগ, সেবা ও নিষ্ঠার ফলে দেশে সর্বজনমান্য হইয়াছিলেন। সারাজীবন কঠোর দারিদ্র্যভোগ ও সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁহার জীবন সুখ ও শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক দিক্‌পালের অভাব হইল।

পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

গত ৪ঠা মার্চ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে কংগ্রেসী সদস্য নৈহাটীনিবাসী শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় পশ্চিম বঙ্গের পুলিসের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন—সে জন্য তিনি দেশবাসী সকলের ধন্যবাদের পাত্র। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র—বিশেষত সহর ও সহরতলী অঞ্চলের পুলিস যে সর্বদা যথেচ্ছাচারের দ্বারা জনগণের স্বার্থ নষ্ট করিয়া থাকেন—সে কথা কাহারও অজ্ঞাত নহে। ভয়ে লোক ও বিষয়ে প্রকাশ্যে বেশী কথা বলে না। পুলিসের উর্দ্ধতন কর্মীরা স্বাধীনতা লাভের পর কিছু ভাল হইলেও নিচুস্তরের কর্মীদের কার্য্যে জনসাধারণ সন্তুষ্ট নহেন। সেই কথাই সুরেশবাবু পরিষ্কারভাবে বলার ফলে সে দিন পরিষদে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস—ইহার পর পুলিস কর্তৃপক্ষের চেতনা ফিরিবে এবং দরিদ্র জনগণের অসুবিধা ও কষ্ট দূরীভূত হইবে।

নেপাল ভারত মৈত্রী—

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কয় দিনের জন্য নেপালে যাইয়া নেপালের রাষ্ট্রনায়কগণের সহিত নেপাল-ভারত মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর উভয় দেশের যুক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে উভয় দেশের বন্ধন অচ্ছেদ্য হইবে এবং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উভয় দেশ ভবিষ্যতে অধিকতর সমৃদ্ধ ও লাভবান হইবে। এই মৈত্রী বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারতকে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ—

বর্তমান চীন ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য নিম্নলিখিত দেশগুলি ভারতকে বিনামূল্যে বা ধারে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে অগ্রসর হইয়াছে—আমেরিকা, বৃটেন, রোডেশিয়া, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালী ও পশ্চিম জার্মানী। ইহার ফলে ভারতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ বন্ধ হইবে না।

সুভাষচন্দ্রের নির্বাচিত বক্তৃতাবলী—

দিল্লীর কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রকাশন বিভাগ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নির্বাচিত বক্তৃতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯২৮ সালের মে মাস হইতে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রদত্ত নেতাজীর বক্তৃতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকটি ২ খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীএস-এ-আয়ার আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম সদস্য হিসাবে এই গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন—তিনি ২৯ পৃষ্ঠায় নেতাজীর এক জীবনী এই গ্রন্থে লিখিয়া দিয়াছেন। নেতাজীর কথা প্রকাশ করিয়া ভারত সরকার বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইলেন।

কলিকাতায় সার্কুলার রেল—

সি-এম-পি-ও, রেল, কলিকাতা বন্দর, রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা, ট্রাম কোম্পানী প্রভৃতির প্রতিনিধিদের এক মিলিত সভায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারী স্থির হইয়াছে যে—দৈনিক-যাত্রীদের দুর্গতি লাঘবের জন্য কলিকাতাকে ঘিরিয়া সাকুলার রেল চালু করা একান্ত দরকার। এ জন্য অবিলম্বে পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। ঐ রেল হইলে প্রতিদিন আড়াইলক্ষ রেলযাত্রীর দুর্ভোগ কমিবে। ইহার জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। শিয়ালদহ নর্থ ডিভিসনের বৈদ্যুতিকীকরণ শেষ

হইলে বেলগাছিয়া হইতে ইডেন গার্ডেন পর্য্যন্ত পোর্ট কমিশনার্সের লাইন বৈদ্যুতিকীকরণ করিয়া সার্কুলার রেল চালু আরম্ভ হইবে। ট্রেণগুলিকে শিয়ালদহে না আনিয়া দমদম হইতে বেলগাছিয়া দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। এদিকে শীঘ্রই হাওড়া শালিমারে নূতন ষ্টেশন করিয়া দক্ষিণপূর্ব রেলের গাড়ীগুলি সে পর্য্যন্ত আনা হইবে ও সেখান হইতে নূতন পথে রেলগাড়ী গঙ্গার নূতন পুলের উপর দিয়া ফোর্টের দক্ষিণ দিক দিয়া সহরে প্রবেশ করিবে ও উত্তর দিক দিয়া সেই পুল দিয়াই আবার শালিমারে ফিরিয়া যাইবে।

চীন পাকিস্তান চুক্তি—

গত ২রা মার্চ্চ পিকিংয়ে চীনের সহিত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে—তাহার ফলে চীন পাকিস্তানের নিকট ২০৫০ বর্গমাইল এলাকা যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়াছে। প্রথমে চীনের দাবী ছিল ৩৪০০ বর্গ মাইল পরিমিত জমী—তাহার পর চুক্তির সর্তে চীন আরও নূতন ১৩৫০ বর্গ মাইল জমী পাইয়াছে—ইহার মধ্যে ৭০০ বর্গ মাইল চীনের দখলে আছে। পাকিস্তান চীনকে যে জমী দিল—তাহা ভারতের জমী—কতকটা চীন জোর করিয়া দখল করিয়া আছে। সে জমী পাকিস্তান চীনকে দান করিল। বর্তমানে চীন ও পাকিস্তানের সহিত ভারত যদি যুদ্ধ না করে, তবে ঐ জমী ফেরত পাওয়ার আর কোন উপায় নাই।

শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন—

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন অন্যতম ডেপুটি চিফ হুইপ নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্তমানে ২ জন ডেপুটী চিপ হুইপ রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআশুতোষ ঘোষ ছাড়া তিনিও ঐ কাজ করিবেন। উপমন্ত্রী শ্রীমায়া বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা দপ্তর দাড়াও সমাজ উন্নয়ন দপ্তর, উপমন্ত্রী শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষাদপ্তর ছাড়াও মৎস্য ও পশুপালন দপ্তর এবং শ্রীজয়নাল আবেদীন—স্বাস্থ্য দপ্তর ছাড়াও কৃষি দপ্তরের কাজ করিবেন। নূতন ব্যবস্থায় কি সরকারী কাজ দ্রুত সম্পাদিত হইবে?

৫টি পরিকল্পনার ব্যয়—

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় ১৯৬৩—৬৪ সালের আয় ব্যয়ের খসড়া হিসাব উপস্থিত করার সময় অর্থসচিব শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—বর্তমান বৎসরে ২০কোটি টাকা ব্যয়ে নিম্নলিখিত ৫টি পরিকল্পনার কাজ করা হইবে—রাজ্য সরকার এ জন্য ১০ কোটি টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকার ১০ কোটি টাকা দিবেন। পরিকল্পনাগুলি এই—(১) বৃহত্তর কলিকাতার পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি (২) কলিকাতার পাশে নূতন সহর নির্মাণ (৩) বস্তী অপসারণ ব্যবস্থা (৪) হুগলী নদীর পলি ও লবণাক্ততা দূরীকরণ (৫) যান বাহন ও যোগাযোগের উন্নতি বিধান। এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত না করিলে ভবিষতে লোক আর পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থাগুলি যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই ভাল।

হরিকুমার চক্রবর্ত্তী—

খ্যাতিমান দেশসেবক, বিপ্লবী নেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য হরিকুমার চক্রবর্তী কিছুকাল কর্কট রোগে ভুগিয়া গত ১২ই মার্চ মঙ্গলবার সকালে ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতা এন-আর-সরকার হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে ২ কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ ভাগে কোদালিয়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল—সারাজীবন তিনি গ্রামে বাস করিয়া গ্রামবাসীদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। যৌবনে বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি বহু বৎসর জেলে ছিলেন—মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সহকর্মীরূপে তিনি বহুদিন কাজ করেন এবং শেষে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া বিধান পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি আদর্শবাদী ছিলেন এবং বহু দুঃখ কষ্ট সত্বেও কোন দিন আদর্শ ত্যাগ করেন নাই। পুরাতন হইয়া তিনি নবীনদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেন এবং তাঁহার মত পরহিতব্রতীর সংখ্যা খুব কম। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-প্রণাম জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি, দশের যুবকগণ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হউক।

উত্তরবঙ্গে নূতন বিভাগ—

পশ্চিম বঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের ৫টি জেলা লইয়া উত্তরবঙ্গে একটি নূতন বিভাগ খোলা হইবে স্থির হইয়াছে—জলপাইগুড়ী, কুচবিহার, দার্জিলিং, মালদহ ও পশ্চিম

দিনাজপুর জেলা নূতন বিভাগে যাইবে ও জলপাইগুড়ীতে তাহার প্রধান সহর স্থাপিত হইবে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের বর্তমান ৩টি জেলা—২৪পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ ছাড়াও হাওড়া জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগে আসিবে। হাওড়া বর্তমানে বর্দ্ধমান বিভাগে আছে। প্রশাসানিক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য নূতন বিভাগ খোলার প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়—

খ্যাতনামা লেখক ও প্রাক্তন আই-সি-এস শান্তি-নিকেতনবাসী শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এ বৎসর দিল্লীর সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ঐ পুরস্কারের মূল্য ৫ হাজার টাকা। জাপান ভ্রমণ সম্বন্ধে বই-এর জন্য তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইল। তিনি ভারতবর্ষের লেখক। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ডিহিরী অন সোনে নূতন পুল—

সোন নদীর উপর এসিয়ার দীর্ঘতম—২ মাইল দীর্ঘ যে নূতন সেতু হইবে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাহার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ সেতু নির্মাণে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ঐ সেতু হইলে কয়লা চালান দিবার অসুবিধা দূরীভূত হইবে। কলিকাতা দিল্লীর মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সাহায্যে সরাসরি সংযোগের জন্য এই সেতু নির্মাণ প্রয়োজন।

নূতন ব্রডগেজ লাইন—

ভারত সরকার একটি ব্রডগেজ রেল লাইনের সাহায্যে আসামকে ভারতের অবশিষ্ট অংশের সহিত যুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। নূতন লাইন পশ্চিম বাংলার শিলিগুড়িকে আসামের ধুবড়ী সহরের প্রায় ১ শত মাইল পশ্চিমে অবস্থিত যোগীথানার সহিত যুক্ত করিবে। ইহা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে সংযোগকারী দ্বিতীয় রেল সড়ক হইবে।

বিধান স্মৃতি শিশু হাসপাতাল—

আগামী ১লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কলিকাতায় বিধানস্মৃতি শিশু হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। নারিকেলডাঙ্গায় সে জন্য ১৮ বিঘা জমী সংগৃহীত হইয়াছে। তথায় ২ শত শয্যার হাসপাতাল হইবে—এ পর্য্যন্ত এ জন্য ৪৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। স্মৃ রক্ষাকমিটি ডাক্তার রায়ের একটি জীবনী প্রকাশ করিবে সে জন্য ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইতেছে। ও কার্য্য সত্বর করা প্রয়োজন।

বি-এন-দাতার—

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী বি-এন দাতা গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর নার্সিং হোমে ৬৮ বৎসর বয়ে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৫২ সাল হইতে তি কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় তাসগা নামক স্থানে ১৮৯৪ সালে তাঁহার জন্ম—নাম বলবন্ত নাগে দাতার। ১৯২০ সালে তিনি ধারওয়ার কলেজে ইংরা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন—পরে উকীল হইয়াছিলেন- ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত তিনি আইন কলেজে অধ্যাপ করিতেন।

জাতীয় অধ্যাপক সম্মানিত—

কলিকাতা ইনিষ্টিটিউত অব ইলেকট্রিসিটি ও ইলেক ট্রনিক্সের জাতীয় গবেষণা অধ্যাপক ডাক্তার শিশিরকুমা মিত্র ইণ্টার ন্যাশানাল একাডেমী অব্ এস্ট্রোনটিক্সে মৌলিক বিজ্ঞান শাখার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বাংলার বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ব ও তিনি জাতীয় অধ্যাপক। তাঁহার এই সম্মান বাঙ্গালী গৌরবের বিষয়।

মহানন্দার নূতন পুল—

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মহানন্দা নদীর উপর একটি নূতন পুলের উদ্বোধন হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারে মধ্যে ১২ মাস গাড়ী করিয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা হইল জাতীয় রাজপথের (৩১ নং) পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ বিভাগে— পূর্ণিয়া হইতে ২২ মাইল উত্তরপূর্বে ডিংরাঘাটে ঐ পু হইল। পূর্বে নদীর জল বৃদ্ধির ফলে বৎসরে ৬ মাস পথে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকিত। পশ্চিম বঙ্গে সোনাপু মহানন্দার উপর আর একটি পুল নির্মিত হইতেছে। ঐ পথে ১২ মাস আসামে যাতায়াত করা চলিবে। মালদহে মহানন্দা নদীর উপর আর একটি পুল নির্মিত হইবে— তাহাতে কলিকাতা যাতায়াতের সুবিধা বাড়িবে। ডিংরা ঘাটে পুল হওয়ায় পাটনা হইতে দার্জ্জিলিং যাওয়া সহজ হইল।

পরলোকে তরুণ চিত্র-শিল্পী পঞ্চানন রায়—

গত ৯ই পৌষ মঙ্গলবার প্রত্যুষে কলিকাতা ভাঙ্গর হাসপাতালে চিত্র-শিল্পী পঞ্চানন রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩৪ বৎসর। তিনি চেতলা নিবাসী স্বনামধন্য জমিদার ও ব্যবসায়ী ৺পিয়ারী মোহন রায়ের পৌত্র ও আর্ট কলেজের শিল্পী ৺রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় পুত্র। পঞ্চানন রায় চেতলা রয়েল হাই স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর শিল্প সাধনা স্বরু করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর শিল্প সাধনার প্রভূত পরিচয় দেন। আট কলেজের প্রফেসার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত চিত্র-শিল্পী ৺হীরালাল দুগারের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ৺হীরালাল দুগারের পুত্র শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগার ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট চিত্র-শিল্পীদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর অঙ্কিত বহু ছবি 'ভারতবর্ষ' 'বসুমতী' 'প্রবাসী' 'তরুণের স্বপ্ন' ও 'মডার্ণ রিভিউ' প্রভৃতি বাংলার বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কয়েক বার তাঁর ছবির প্রদর্শনীও হইয়াছে। তার মধ্যে গত কয়েক বৎসর পূর্বে ১নং, চৌরঙ্গী টেরেসে অনুষ্ঠিত তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, ও দেশ পত্রিকা কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল। আমরা স্বর্গত শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করি।
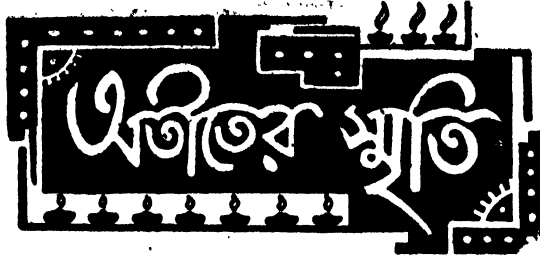
সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে এদেশী লোকজনের মনে কবি-গান, পাঁচালী, আখড়াই-গান, বুলবুলির লড়াই, ঘুড়ি-ওড়ানোর বাজী প্রভৃতি আমোদ-অনুষ্ঠানের নেশা যে কতখানি প্রবল ছিল, সে বিষয়ে আরো অনেক পরিচয় মেলে সেকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-কেতাবে···একালের কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য সে সব কাহিনীর কিছু-কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * *

(শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত গ্রন্থ
'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ')

"···কবি, পাঁচালি ও বুলবুলির লড়াই-এর একটু বর্ণনা আবশ্যক। কবির গান সচরাচর দুইদলে হইত। কোনও একটা পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দুই দল দুই পক্ষ লইত। মনে করুন, একদল হইল যেন কৃষ্ণপক্ষ—আর একদল হইল যেন গোপীপক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর-প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সহরে হরু ঠাকুর ও তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রুতকবি থাকিত; তাহাদিগকে সরকার বা বাঁধনদার বলিত। বাঁধনদারেরা উপস্থিতমত তখনি তখনি গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন কোনও কবির দলে বাঁধনদারের কাজ করিয়াছিলেন। দ্রুতকবিত্বের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সে সময়ে আণ্টুনী ফিরিঙ্গী নামে একজন কবিওয়ালা ছিল। আণ্টুনী ফরাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান। বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়ালা হইয়া উঠে। আণ্টুনী নিজে একজন দ্রুতকবি ছিল। আণ্টুনী একবার গান বাঁধিল;

"ও মা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি—জেতে আমি
ফিরিঙ্গী।'

তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দীদলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল;—

"যিশুখ্রীষ্ট ভজ গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে;
জাতফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক তরাতে।"
ইত্যাদি।

এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সর্ব্বদাই হইত। হাপ আখড়াইগুলি অধিকাংশ স্থলে সখের দল ছিল। তাহাতে ভদ্র-পরিবারের যুবকদল দলবদ্ধ হইয়া নানা বাদ্যযন্ত্রসহ গান করিত।

পাঁচালির ব্যাপার অন্য প্রকার। ইহার কিঞ্চিৎ, পরবর্ত্তী সময়ে তাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল-গায়ক স্বরূপ হইয়া সুর ও তান

সহকারে, পদ্যে কোনও পৌরাণিক বর্ণনা করিত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবসূচক এক একটি গান করিত। ইহাও লোকে অতিশয় পছন্দ করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন পাঁচালিওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচালি গায়কদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নামই প্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলাস্থ বাদমূড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি প্রথমে কোনও কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। একবার বিরোধী দলের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঁচালি গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পাঁচালি এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাকিত যে, এখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয় —কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। কিন্তু তখন লোকে পাঁচালি গান শুনিবার জন্য পাগল হইত।

বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ি উড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া বহুসংখ্যক বুলবুলি পক্ষী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। ঢাউস-ঘুড়ি, মানুষ-ঘুড়ি প্রভৃতি ঘুড়ির প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল এবং সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ির খেলা দেখিতেন।

* * * *

(দুর্গাচরণ রায় রচিত 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' গ্রন্থ হইতে)

দেবগণ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় সঙ্গীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে আসিল। দেবরাজ কহিলেন, "নিকটে কোথায় গান হইতেছে?"

বরুণ। বোধ হয় বারইয়ারিতলায় বারইয়ারি পূজা আরম্ভ হওয়ায় পাঁচালি হইতেছে।

নারা। বারইয়ারিতলা এখান হইতে কত দূর?

বরুণ। কেন, সেই যে, সেদিন কথকতা শুনে এসেছে।

ব্রহ্মা। সে স্থান ত নিকট। বরুণ—আমি কখনও পাঁচালি শুনি নাই—নিয়ে চল না।

* * * *

সকলকে লইয়া বরুণ বারইয়ারিতলায় অভিমুখে চলিলেন। দেবগণ উপস্থিত হইয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য! একখানি গৃহে বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। আটচালাখানিকে ঝাড়লণ্ঠন দিয়া চমৎকার করিয়া সাজাইয়াছে। ঝাড়লণ্ঠনের উপর শোলার সালিক ও বুলবুলি পাখীগুলি বসিয়া আছে। থামগুলিতে নানাপ্রকার আয়না ও দেয়ালগিরি দেওয়ায় অতি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে! আটচালাখানির ভিতরটা রেল দিয়া বেষ্টন করা। রেলিঙের মধ্যে শ্রোতৃবর্গ গায় গায় হইয়া বসিয়া আছে। আটচালার চতুষ্পার্শ্বে লোকগুলো কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে। দেবগণ এক স্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখেন, কয়েকটী লোক ঢোল তবলা লইয়া বসিয়া আছে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছড়া কাটাইতেছে:—

"পুলকে গোলোকেশ্বর, নিক্ষেপ করিবেন শর,
লঙ্কেশ্বর দেখে প্রাণ যায়।
বসন গলে নয়ন জলে, পতিত হইয়া বলে,
পতিতপাবন রামের পায়॥
ওহে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন, করি নাই, ওপদ সাধন,
জ্ঞানধন মোর লয়েছিলে হরি।"
তোমাকে ভেবে বৈরঙ্গ, হলো দুঃখের তরঙ্গ,
আজি নিদ্রাভঙ্গ হ'ল হরি॥

এত ব'লে দশানন কিলিতেছেন;—

এই সময় দোয়ারেরা যন্ত্রের তার ঠিক করিয়া বসিয়াছিল—ই-ই শব্দে সুর দিয়া গান ধরিল:—

"দিন গত কিন্তু নয় হে রাম, তোমার চরণে
এ দীন গত
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে
দেও হে চরণ
হ'লাম চরণে শরণাগত॥
সৎসঙ্গে হয়ে স্বতন্ত্র, করি অসৎ ক্রিয়া সতত,
তোমায় শত শত
মন্দ বল্লাম রামচন্দ্র না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ॥
ওহে গুণধাম স্বগুণ প্রকাশ, গুণহীন
জ্ঞানহীন দোষ নাশ

স্বগুণে তরিলে কি পৌরুষ, সে ত স্বগুণে পাবে সুপথ।
জননী-জঠোরে কঠিন যন্ত্রণা আর দিবে রাম কত,
ওহে দশরথাত্মজ দাশরথি, ঘুচাও দাশরথির গতাগত॥

দেবগণ পাঁচালী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।...

*   *   *   *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৩ই এপ্রিল, ১৮২৬)

Native Papers : *Akhara Gan.*—Rival Musicians. On Saturday, the 20th Chaitra (1st April), at ten o'clock in the evening, Govindachandra Bandopadhyaya with his party from Guranhatta, and Moharchand Bosu, with his associates from Bagh-Bazar, held a trial of musical skill at the house of Baboo Gooroopresad Bose's, which was fitted up with great elegance and attended by a large and respectable assembly. Each party performed three pieces, one relating to the goddeus Bhsvani, another of the ludicrosas class, and the third called Prabhati or the morning song. This musical competition lasted, till 7 the next morning, when the goddess of the arts cast a favourable glance upon the Guranhatta band. They accordingly returned home in a kind of procession with the Dhole or drum before them.

After this the spectators, who were numerous, both invited and uninvited returned to their respective residences, well satisfied with the night's entertainment.

*   *   *   *

[ক্রমশঃ

বসন্তোৎসব

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রৌদ্র-ঝরা প্রভাতের উপকূলে ফুলভরা বীথি,
দক্ষিণের সমীরণে দোলা লাগা আশাবরী গীতি
গেয়ে ওঠে আনন্দের অভিসারে। পত্রকোর কেরে
বক্ষে লয়ে নুয়ে পড়ে, তৃণপুটে, জীর্ণবাস ছেড়ে
পথিক সন্ততি শত। কুহু রবে সচকিত যবে,
কিংশুক পলাশ দোলে যৌবনের বিমল বৈভবে।
ধরার অঙ্গন দ্বারে বসন্তের পদধ্বনি শুনে,
মধু মাধুকরী তরে মত্ত অলি পুষ্পিত ফাল্গুনে।
ধেনুচরা বালুচরে বিহঙ্গেরা দূর হোতে আসে,
নূতন প্রেমের মত জাগে মন বকুল সুবাসে।
আবীর কুঙ্কুম মেখে মদনের রতি মহোৎসব,
নিখিল রাধার সাথে চিরশ্যাম সুন্দর বল্লভ
রঙ্ গুলে করে হোলি খেলা, কল্লোলিত সিন্ধুসম
অনন্ত প্রেমের লীলা।—যৌবনের যত ঋণ মম
জীবন মরণ মাঝে জমে আছে, তারে শুধিবার
তরে দিয়েছিলে তুমি কথা, সময়েরে রুধিবার
নাহি অবকাশ। তুমি ছিলে যেন রক্তিম গোলাপ,
প্রথম প্রণয় পথে, তাই মোর এত অনুতাপ
তোমারি বিহনে—এখনো বকুলতলা ফুলে-ছাওয়া
শ্যামল দীঘির পারে, হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া
নিমেষে হয়েছে যেথা রঙ্ গুলে আর রঙ্ ঢেলে
নানা জনতার কোলাহল ঢাকা জোছনাতে এলে
মোর কাছে অভিসারে সেই স্মৃতি ভুলিবার নয়,
গোপন বেপথু হিয়া, ঘুমের সঙ্গীত সম রয়
পুলকে কণ্টকি ওঠে সেই দিন সে সুযোগ ক্ষণ
এক হয়ে গেল এক সুরে তোমার আমার মন।
ছিনু সাধ আশা লয়ে বাহুর বন্ধনে দুজনায়
সান্ত্বনার ভাষা তব দিলে মোর অনুশোচনায়
কত দিন কত রাত্রি। তুমি নাই, চোখে আসে জল
বর্ষে বর্ষে বসন্তের সমারোহে আমি যে চঞ্চল
তব স্পর্শ প্রত্যাশায়। দুর্দ্দিনের ক্রন্দন কল্লোলে
মগ্নপ্রায় মোর ভগ্নপোত বেদনার রোলে রোলে
নৈরাশ্যের বুকে। বিধবার প্রেমসম অনিবার
কুণ্ঠার গুণ্ঠনে ঢাকা মহৈশ্বর্য্য হেরি রিক্ততার
দারিদ্র্যের আভিজাত্য মাঝে। ছেলেবেলাকার তুমি
প্রণয়িনী মোর, আজ যদি এসে চিত্ততল চুমি
দাঁড়াতে বারেক, অর্দ্ধমৃত বসন্তের আর্ত্তনাদে
জীর্ণ জীবনের বাতায়নে ক্ষীণ বর্ত্তিকার সাথে
হেরিতাম বারেক তোমারে, সিঁথির-সিঁদুরে তব
রেখা টানিবার ক্ষণে হোলো মোর জন্মান্তর নব।
সভ্যতার শবযাত্রা চলে সমাজ সমাধি ক্ষেত্রে,
অপ্রমেয় প্রাণের প্রবাহ শুষ্ক হেরি অশ্রুনেত্রে।
আজ নাহি তব মিলনের আঁখি অধরের খেলা,
বাহির ভুবনে মোর দীর্ঘশ্বাসে পড়ে আসে বেলা।

মেষ লগ্ন

(দ্বাদশভাবে শনির অবস্থান হেতু ফলাফল ভৃগুসংহিতানুসারে)

উপাধ্যায়

শনি লগ্নে থাকলে জাতকের আকৃতি সুন্দর হয়না, দেহ খর্ব ও পিতৃস্থান দুর্ব্বল হয়, অর্থ সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী, উন্নতির পথে অগ্রসর হোতে বাধা পায়, দৈনন্দিন জীবনের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, ভ্রাতাভগ্নী লাভ হয়, গুপ্ত চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় মগ্ন, সম্মান প্রাপ্তির জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রমী ও উৎসাহী, ঈষৎ অলস এবং স্ত্রীর অনুগত। গুপ্ত উপায়ে এবং অতি পরিশ্রমে অর্থপ্রাপ্তি। বিবাহের ব্যাপারে অথবা স্ত্রীর জন্যে অশান্তি। অর্থাভাবে উন্নতির বাধা। জাতককে অনেক বাধা বিঘ্নের ও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। শনি বৃষে দ্বিতীয় স্থানে থাকলে প্রচুর অর্থলাভ। লাভজনক কার্য্যে জাতক নিযুক্ত হয়। স্থায়ীভাবে প্রচুর আয় ও সম্মান লাভ। পিতৃক্ষেত্র শক্তিশালী হয়। পরিবারবর্গের ওপর আধিপত্য বিস্তার। মায়ের সঙ্গে ভালো বনিবনাও হয় না। অর্থের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে বিচ্ছেদ। একটু কৃপণ স্বভাব। শ্রমসাধ্য কর্ম, চাকরি প্রভৃতি দ্বারা আয়। শনি মিথুনে তৃতীয় স্থানে থাকলে উদ্যম ও উৎসাহের আধিক্য, পরাক্রম বৃদ্ধি, বিদ্যার্জ্জন ক্ষমতা, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহপ্রাপ্তি, রাজকীয় সম্মান, সমাজে প্রতিষ্ঠা, ব্যয় বাহুল্য, সন্তান সম্পর্কে দুশ্চিন্তা, গর্ব্বিত, ধর্ম্ম সম্পর্কে প্রাণহীন। শনি কর্কটে চতুর্থ স্থানে থাকলে পিতৃক্ষেত্র থেকে আনন্দ পায়, স্থানীয় ব্যবসায়ও লাভ হয়, সমাজে সুখ পায়, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ, মাতৃস্থানের মর্য্যাদা, বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূলতা দূর করার ক্ষমতা, দৈহিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নয়, মনশ্চাঞ্চল্য, কঠোর পরিশ্রমী। স্থায়ী পীড়ার জন্য উদ্বেগ, বন্ধুর জন্য ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি, আহার বিহার ও সাজসজ্জায় বিলাসের অভাব। পিতামাতার জন্য উন্নতির বাধা। বাসগৃহ ও বাসভূমির মধ্যে স্বচ্ছন্দতার অভাব। শনি পঞ্চম স্থানে সিংহে থাকলে পিতৃক্ষেত্র কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হয়, পিতার কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তিযোগ, বিদ্যাবুদ্ধিলাভ, পেশায় উন্নতি করার দিকে ঝোঁক, কঠোর পরিশ্রমী, অর্থবৃদ্ধির জন্য বিশেষ সচেষ্ট, সন্তানদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কন্যা-রাশিতে ষষ্ঠ স্থানে শনি থাকলে পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য, সীমাবদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে কষ্ট-ভোগ, শত্রুজয়ী, ব্যয় প্রবণতা। স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে মন সাড়া দেয় না। প্রণয়ের ব্যাপারে আশা ভঙ্গ। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অশুভ, তিক্তরস প্রিয়। সপ্তমে তুলায় শনি পিতার সাহায্যপ্রদাতা, বড় দরের ব্যবসা, কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সাফল্য। কর্ম্মে প্রচুর লাভ। নিজের ক্রোধপ্রবণতামূলক কার্য্যের জন্য মায়ের অশান্তি ভোগ। স্ত্রীর মধ্যে প্রণয়িনী ভাবের চেয়ে, গৃহিনীর ভাবই প্রবল। শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা। অষ্টম স্থানে বৃশ্চিকে শনি থাকলে পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়, দীর্ঘ জীবন, লাভের জন্যে কঠোর পরিশ্রম, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ, ঔদ্ধত্য ও কর্ম্মদক্ষতা, বৈদেশিক সুত্রে ভাগ্যলাভ। বিদ্যার্জ্জন ও সন্তান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা। জলে ডুবে মৃত্যুর ভয়। স্ত্রীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। তেজারতি কারবারে লাভ, উত্তরাধিকারসুত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তিতে বাধা। নবমে ধনুরাশিতে শনি থাকলে ভাগ্য ও কর্মগুণে অপরিমিত লাভ, নিয়মিত ভাবে স্থায়ী আয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, পিতৃক্ষেত্র থেকে লাভ, সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তি দূর করবার ক্ষমতা, মহৎ কার্য্যেরতি, অহংমন্য ও উন্নতিশীল। দেবদেবীর কৃপালাভ। মামলা মোকর্দ্দমার ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট। মকরে শনি দশমস্থ হোলে বড়দরের কারবার পরিচালনা করে প্রচুর আয়, পিতৃক্ষেত্র

থেকে লাভ, সমাজে ও রাষ্ট্রে সম্মান প্রতিপত্তি, মাতার প্রতি বিশেষ অন্তরের টান থাকেনা, নবাবীচালে চলা ও ব্যয় করার অভ্যাস, একাদশে কুম্ভে শনি থাকলে আয় বৃদ্ধি, সম্মানজনক কার্য্যে ব্যাপৃত ও তজ্জনিত লাভ। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অর্থোপার্জ্জন, সন্তান সুখের অভাব। দ্বাদশে মীনে শনি থাকলে পিতৃক্ষেত্রের ক্ষতি, নানা ভাবে ব্যয়শীল, সম্মান প্রতিপত্তির অভাব, শত্রুজিৎ হয়।

১৯৬৩ সাল

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনী বা কৃত্তিকা জাতগণের অপেক্ষা ভরণীর কিছু ভালো হোলেও, কারো পক্ষে গত বৎসরের মত শুভফলের সম্ভাবনা নেই। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে না। তবে বৎসরের শেষ তিন মাস শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ বিবাদ। সেপ্টেম্বর অক্টোবর বিশেষ খারাপ হবে। প্রথম দুটি মাসে আয় হ্রাস কিঞ্চিৎ দেখা যায়। তারপর আয়ের অনুপাতে ব্যয়াধিক্য। জুলাই ও আগষ্ট মাস আর্থিকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, শেষ পর্য্যন্ত ঋণ। বৎসরের মধ্যে সব চেয়ে ভালো হবে আগষ্ট মাস। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে গত বৎসরের চেয়ে ভালো। প্রথম তিন মাস চাকুরিজীবীর পক্ষে অনুকূল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী, মে ও জুন বিশেষ অনুকূল। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি ভাল। বিবাহ যোগ্যা বা বাগদত্তাদের বিবাহের যোগ জুন জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ, কৃত্তিকা ও মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অনেকটা ভালো। সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উচ্চপদমর্য্যাদা লাভ, আয়বৃদ্ধিযোগ। স্বজন-বিয়োগ, শত্রুবৃদ্ধি, কিছু ক্ষতি ও স্বাস্থ্যের অবনতির আশঙ্কা আছে। মার্চ্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসগুলি সবচেয়ে ভালো। মে মাসের মধ্য সময় থেকে জুনমাসের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত পীড়াদি সূচনা করে। বিশেষতঃ উদরঘটিত পীড়া। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও ডিসেম্বর মাস ভিন্ন অন্যান্য মাস আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগ থেকে এপ্রিলের মধ্যভাগ, আগষ্টের মধ্যভাগ ও সেপ্টেম্বর সর্ব্বোত্তম। এইসব সময়ে পদোন্নতি, উচ্চ পদমর্যাদা ও সম্মান লাভ, নানাপ্রকার সাফল্য, প্রতি-যোগিতায় জয় প্রভৃতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। বৎসরের মধ্যভাগ অতীব উত্তম। অক্টোবর ও নভেম্বর ভিন্ন মাসগুলি বেশ ভালো যাবে। নানাপ্রকারে লাভ, প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিপত্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পুনর্ব্বসু মধ্যম এবং মৃগশিরার পক্ষে নিকৃষ্ট। সকলের পক্ষে বৎসরটী মিশ্রফল-দাতা। পারিবারিক কলহ, মামলা মোকর্দ্দমা, শারীরিক অবস্থার অবনতি, দুষ্ট সংসর্গ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। পারিবারিক কলহ ও দুশ্চিন্তা। ডিসেম্বর মাসটি সবচেয়ে খারাপ। পারিবারিক অশান্তি। নানা রকম কষ্টভোগ। স্বজন বিয়োগ। প্রথম দুই মাস বাদে অবশিষ্ট মাসগুলি আর্থিক ব্যাপারে মধ্যম বলা যায়। এপ্রিল, মে এবং জুনমাসে আর্থিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিকোন্নতি অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আশা করা যায়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ বলা যায়। খনির মালিকদের পক্ষে শুভ বলা যায় না। চাকুরিজীবীর পক্ষে ভালোই যাবে। বৎসরের প্রথমার্দ্ধ শেষার্দ্ধ অপেক্ষা উত্তম, সর্ব্বোত্তম হবে ডিসেম্বর মাসটি। পদোন্নতি, কর্ম্মে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার যোগ আলোচ্যবর্ষে আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে ও আশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বৎসরটী অনুকূল নয়, এজন্যে কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত না হওয়াই ভালো। প্রণয়ে বিপত্তি ঘটাতে পারে। দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজ ও পরপুরুষের সান্নিধ্যে আসা বা যোগাযোগ করা বর্জ্জনীয়। বিলাস ব্যসন ও ব্যয় সম্পর্ক সংযত হওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে উত্তম। পুষ্যার পক্ষে মধ্যম। প্রচেষ্টায় সাফল্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ, লাভের আধিক্য, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, নূতন পদ-মর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠা; স্বাস্থ্যোন্নতি, লাভ, বিলাস ব্যসন ও উত্তম বন্ধুত্ব লাভ হবে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য হোতে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। মামলা মোকর্দ্দমা, কিছু ক্ষতি ও পরিবারবর্গের পীড়াদি সম্ভাবনা আছে। বৎসরের প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য সম্পর্কে দৃষ্টি নেওয়া দরকার। বন্ধু-বিচ্ছেদ ও পারিবারিক কলহ। আর্থিক অবস্থা অনুকূল, ব্যবসায়ের প্রসারতা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরিক্ষেত্রে মিশ্রফল। উপর-

ওয়ালার অপ্রীতিভাজন হবার সম্ভাবনা। এ বর্ষে সকলেরই ভাগ্যবৃদ্ধির পক্ষে নানা যোগ আসবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। চিত্র, মঞ্চ ও বেতার শিল্পীর পক্ষে বিশেষ শুভ। শিল্পকলায় উন্নতি। অবিবাহিতাদের বিবাহ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম। মঘার পক্ষে মধ্যম। উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে অধম। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের মত ভালো আশা করা যায় না। স্বাস্থ্য হানি। পিত্তপ্রকোপ-জনিত পীড়া। পারিবারিক শাস্তি। আত্মীয়কুটুম্বের সঙ্গে মনোমালিন্য। আর্থিক ব্যাপারে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র আশাপ্রদ নয়। জুন ও জুলাই মাস খুব খারাপ যাবে। বেকার ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মপ্রাপ্তি যোগ এ বর্ষে আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অনুকূল। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সর্ব্বপ্রকার উন্নতি যোগ। ছাত্রীদের পক্ষে উত্তম। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ছাত্রীর বিশেষ সুফল। নৃত্য শিল্পকলায় সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কন্যা রাশি

হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তরফল্গুনী ও চিত্রার পক্ষে মধ্যম। উত্তম স্বাস্থ্য, তবে মধ্যে মধ্যে চক্ষুপীড়া, পিত্তপ্রকোপ ও রক্তঘটিত পীড়া দেখা দিতে পারে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা। বৎসরের প্রথম দুইটি মাসই খারাপ। আর্থিক উন্নতি। নানা দিক থেকে আয়ত্ত লাভ। প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি। বৎসরের শেষ তিন মাস বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। জুন মাসের শেষ থেকে বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম লাভ। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস চাকুরিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। জুন, অক্টোবর ও নবেম্বর মাস ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম। জানুয়ারী, জুলাই, আগষ্ট ও ডিসেম্বর নৈরাশ্য-জনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি মন্দ নয়। হাতে টাকা আসবে। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। চাকুরিজীবী স্ত্রীলোকের উন্নতি। সন্তানের জন্য অশান্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম। স্বাতীর পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। বৎসরের প্রথমার্দ্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটামুটি ভালো যাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভালো নয়। নানা প্রকার পীড়া। সন্তানদের পক্ষে শুভ নয়, রিকেট রোগ অনেকের মধ্যে হবে, স্বজন বিরোধ, পারিবারিক অশান্তি। বৎসরের প্রথমার্দ্ধে আর্থিক উন্নতি ও লাভ। মে মাসের মধ্যভাগ থেকে জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কিছুটা অনুকূল, তার পর থেকে বাধাবিঘ্ন, ব্যয়, ক্ষতি ও নানা অশান্তি। ডিসেম্বর মাসটী ভালো বলা যায়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে বৎসরটী আশাপ্রদ নয়। মামলা-মোকর্দ্দমা, কর্ম্মস্থল সাধারণভাবে চলবে। মাতার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, সমাজনেত্রীদের বিশেষ শুভ, চিত্র ও মঞ্চশিল্পী, গায়িকা ও কলাচর্চ্চাকারীদের পক্ষে নৈরাশ্যজনক, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠার পক্ষে উত্তম, অনুরাধার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, শরীর মোটের ওপর মন্দ যাবে না, শেষ দিকে তিন মাস খারাপ, শরীর ভেঙে পড়বে, পারিবারিক শান্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা, আর্থিকক্ষেত্রে শুভ, ধনবৃদ্ধি, জুলাই মাসের মধ্য ভাগ থেকে আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ অর্থাগম। অনাদায়ী অর্থ হাতে আসবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম, চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ, উওর-ওয়ালার প্রীতিভাজন হবে, পদোন্নতিযোগ, চাকুরিজীবীর পক্ষে আগষ্ট মাস সর্ব্বোত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম বৎসর। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। অবিবাহিতাদের বিবাহ, প্রণয়ী লাভ, বিলাস ব্যসন, আমোদ প্রমোদ, মঞ্চ ও চিত্র শিল্পীদের অত্যন্ত উন্নতি ও জনপ্রিয়তা, বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতীব উত্তম।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম। মূলা ও উত্তরা-ষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম। নিজের স্বাস্থ্য ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো বলা যায় না। বন্ধু দ্বারা কর্মোন্নতি। বিবাহ বিষয়ে শুভ নয়। বাধা প্রাপ্তি। বৎসরের প্রথমার্দ্ধ ভালো নয় শেষার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত ভালো। শারীরিক দুর্ব্বলতা সারা বৎসর। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষতি। স্ত্রীলোকের জন্য অপরিমিত ব্যয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন। জুলাই মাসের মধ্য ভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চাকুরিজীবির উত্তম সময়, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে বৎসরটী ভালো ও নয়, মন্দও নয়, একভাবে চলে যাবে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আনন্দ লাভ। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ আছে। জুন থেকে আগষ্ট মাস উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মকর রাশি

শ্রবণাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়া

পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। তবে মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর শারীরিক কষ্টের সম্ভাবনা। অজীর্ণ, জ্বর চক্ষু পীড়া, দুর্বলতা প্রভৃতি ঘটতে পারে। ঘরে বাইরে মনোমালিন্য ও অশান্তির যোগ। আর্থিক অবস্থার উন্নতি যোগ গত বৎসরের মত নেই। তবে আর্থিক অবস্থার নিম্নগতি হবে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্র একভাবেই যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। জুলাই, আগষ্ট ও অক্টোবর ভালো যাবে না। আশা আকাঙ্খা বৃথা। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও ধনক্ষয়। পারিবারিক অশান্তি। সামাজিক মর্য্যাদা হানি। কেবল মাত্র শিল্প কলা নৃত্যগীত, মঞ্চ ও চিত্রের মধ্যে যে সব নারী আছে তাদের সম্পর্কেই ভালো বলা যায়। এরা মানমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অর্থের প্রাচুর্য্য লাভ করবে। স্বামীর পীড়া। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ বলা যায় না, কতকটা বাধার সৃষ্টি হোতে পারে।

কুম্ভ রাশি

শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্র পদ জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। শারীরিক অবস্থা ভালো গেলেও দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাবে। হজমের গোলমাল। পারিবারিক ঐক্য ও শান্তি। গুরুতর মনোমালিন্যের অভাব। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো বলা চলেনা। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের আধিক্য। শেষের তিনটি মাস আর্থিক ব্যাপারে খুব ভালো হবে। পিতার উন্নতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে শুভ। চাকুরি জীবির পক্ষে সারা বছরটি উত্তম। উন্নতি যোগ। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য। শেষের তিনমাস বাদে সারা বৎসরটা ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে বর্ষটা উত্তম। চাকুরি জীবি ও বৃত্তি জীবি বা ব্যবসায়ী নারীর বিশেষ ভালো। গৃহিণীরা পারিবারিক জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আনন্দ ও প্রতিষ্ঠা লাভ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ ও কৃতকার্য্য লাভ।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী জাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তর ভাদ্রপদ জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্টফল। পিতৃমার্তৃ রিষ্টি। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভালো। তবে জুলাই মাসের মধ্য ভাগ থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত স্ত্রীর শরীরের দিকে দৃষ্টি নেওয়া দরকার। রক্তের চাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা। পারিবারিক ঐক্য ও শান্তি। ঘরে বাইরে প্রীতি সম্বন্ধ। আয়ের অঙ্কবৃদ্ধি ধীরে ধীরে হবে। মে ও জুন মাসে অর্থক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম! ভূসম্পত্তি প্রভৃতি ক্রয় যোগ। বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধটী এদের ভালো যাবে না। ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। চাকুরিজীবির পক্ষে সারা বছরটী ভালো। বেকার ব্যক্তির চাকরি, অস্থায়ী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পদে স্থিতি স্থাপকতা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, প্রসারতা ও অর্থ সঙ্গতি লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। জন প্রিয়তা। সামাজিক উচ্চস্তরে অধিষ্ঠান। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। উত্তম প্রণয়ীলাভ। মঞ্চ ওচিত্রাভিনেত্রী, সঙ্গীত শিল্প কলাভিজ্ঞা প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ ভালো যাবে। বৎসরের প্রথমার্দ্ধে স্ত্রী ঘটিত পীড়াদিতে কষ্ট। গর্ভবতী নারীর সতর্কতা আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উন্নতি ও সাফল্য লাভ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন—

স্বাস্থ্য ভালোমন্দ মিশ্রিত। পিতা মাতার শারীরিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়। বিবাহ যোগ। বন্ধু দ্বারা ক্ষতি, কর্ম্মোন্নতি। শত্রুবৃদ্ধি। পিতার আকস্মিক বিপদ। মাতৃহানি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

বৃষলগ্ন—

ভ্রাতৃ পীড়া। আথিক উন্নতি। কর্ম্মোন্নতি, পুত্র কন্যার বিবাহ, আকস্মিক অর্থলাভ। শারীরিক অবস্থা মধ্যম। মানসিক অবস্থা উত্তম। পারিবারিক অবস্থা শুভ, ব্যবসায়ে উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সিদ্ধিলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

মিথুন লগ্ন—

স্বাস্থ্যের অবণতি। কর্মস্থল স্বাভাবিক। বুদ্ধিভ্রংশ ও তজ্জনিত অশান্তি। অযথা ব্যয় ও অর্থহানি। নানা প্রকার বাধা বিপত্তি। বৎসরেব শেষ দিকে কর্ম্মোন্নতি। আত্মীয় বিরোধ। বিদ্যার্থী ও পরিক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়, বাধা প্রাপ্তি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি।

কর্কট লগ্ন—

মোটের উপর ভালো। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি। ভাগ্য বৃদ্ধির যোগ। সন্তানের পীড়া, সম্মান ও খ্যাতি, বিবাহ, বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ কর্ম্মোন্নতি, সন্তানের ভাগ্যোন্নতি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

সিংহ লগ্ন—

ভালোই যাবে। গুরুজন বিয়োগ, ব্যবসায়ে উন্নতি। আকস্মিক ধনলাভ। স্ত্রীর পীড়া। মোকদ্দমা। চাকুরিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক। মানসিক উদ্বেগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ।

কন্যা লগ্ন—

পিতার স্বাস্থ্য হানি। সম্মান বৃদ্ধি। আশানুরূপ কর্ম সাফল্য। সন্তানের জন্য উদ্বেগ ও অশান্তি, সন্তানের পীড়া। বিবাহ, কর্ম্মোন্নতি, কর্মস্থলে কাজের চাপ বৃদ্ধি, দেশ ভ্রমণ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন—

বর্ষটী ভালো নয়। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও ধনক্ষয়। কর্ম্মস্থল একপ্রকার। মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ। বন্ধু বান্ধবের জন্য অশান্তি। কর্ম্মস্থলে অশান্তি। গুরুজন বিয়োগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ।

বৃশ্চিক লগ্ন—

স্বাস্থ্যহানি। বুদ্ধির প্রভাবে কর্ম্মোন্নতি ও সাফল্য। সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। কর্ম্মস্থলে যশ ও খ্যাতি লাভ। পুত্রসন্তান। সন্তানের উন্নতি। গৃহ নির্ম্মাণ যোগ। বিবাহ যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

ধনু লগ্ন—

বৎসরটি মিশ্রফল দাতা। নিজের ও স্ত্রীর পীড়া ও স্বাস্থ্যের অবনতি। কর্ম্মস্থলে শত্রুবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনের যোগ। পারিবারিক অবস্থা শুভ। আর্থিকক্ষেত্রে বাধা। গৃহ নির্ম্মাণ। স্ত্রীলোকের পক্ষে দুর্নাম রটনা। ভাগ্য লাভে বাধা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ।

মকর লগ্ন—

বৎসরটি বাধা বিপত্তি ব্যঞ্জক। কর্ম্মস্থলে শত্রু বৃদ্ধি ও অশান্তি ভোগ। সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি। বিবাহে বাধা। স্ত্রীর জীবনসংশয় পীড়া। ভ্রমণ। ভাগ্য লাভে বাধা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা প্রকার কষ্টভোগ, দাম্পত্য কলহ, স্বামীর জীবন সংশয় পীড়া।

কুম্ভ লগ্ন—

বৎসরটি আশাপ্রদ। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ও উদ্বেগ। সৌভাগ্যোদয়। স্ত্রীর ও নিজের স্বাস্থ্যোন্নতি। পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা ভালো। কর্ম্মোন্নাত। আকস্মিক অর্থ লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

মীন লগ্ন—

ভালো যাবে। নিজের ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো। সন্তানাদির রোগ ভোগ। পিতৃরিষ্টি। কর্ম্মস্থল শুভ। কর্ম্মোন্নতি। আকস্মিক অর্থ লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

উন্নত কর শির

অমিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জওয়ান, তুমি উন্নত কর শির ;
বাহু বলে তব মুছে দাও যত অপমান পৃথিবীর।
উদ্যত ঐ হিংস্রুক হাতে লক্‌লকে তলোয়ার ;
দুর্জনেরে রোধ করিবারে হয়ে ওঠো দুর্বার।

সাবাস্ নওজওয়ান !
কদম্ কদম্ পদক্ষেপে হও তুমি আগুয়ান।
সুকঠোর হাতে প্রস্তুত করো নবতর ইতিহাস ;
ধর্মের জয় হবে নির্ঘাৎ—দাও
এই আশ্বাস।
ভয় নাই ওরে বীর !
উন্নত কর, উন্নত কর, উন্নত কর শির।

শ্রী'শ'—

॥ হও আগুয়ান ॥

ভারতীয় তথা বাংলা চলচ্চিত্র যে কলাকুশলতার দিক দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এখনও অনেক বাকী—এগুতে হবে আরও অনেক দূর, আঙ্গিকের দিক থেকেই শুধু নয়—টেক্‌নিক্যালিও। যেমন, ফটোগ্রাফি, আলোকসম্পাত প্রভৃতি বিষয়ে, বিশেষ করে বাংলা চিত্রের, অনেক ত্রুটি রয়েছে। এ দিকে চোখ বুজে থাকলে চলবে না—কলা কৌশলের উন্নতি না হলে চিত্রের উন্নতি হয় না এ কথা মনে রাখতেই হবে। শুধু ভাল গল্প ও সু-অভিনয়ে বাজার মাৎ করার দিন চলে যাচ্ছে। হয়ত দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাহবা কুড়ান এখনও চলবে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে নিকৃষ্ট টেক্‌নিকের চিত্র দেশের লোকের কাছেও কিছুমাত্র আকর্ষণীয় বলে মনে হবে না। কারণ, অন্য দেশের চিত্র কলাকৌশলের দিক থেকে এতদূর অগ্রসর হয়ে গেছে যে বাংলা চিত্রের পক্ষে তাদের ধারে কাছে পৌছানো এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি—সমান তালে চলা তো সুদূরপরাহত। এমন কি এ দেশের হিন্দী চিত্রও বাংলা চিত্রের চেয়ে টেক্‌নিকের দিক থেকে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। অবশ্য অনেকেই বলবেন যে কলাকৌশলের উন্নতি নির্ভর করে অর্থ ব্যয়ের ওপর এবং বাংলা চলচ্চিত্র নির্ম্মাতাদের আর্থিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল হয়ে ওঠেনি যে ঢালাও খরচ করে উন্নত যন্ত্র-কৌশলের সাহায্যে উৎকৃষ্ট চিত্র নির্ম্মাণ করে চলবেন। এ কথা অবশ্যই অবান্তর নয়; কিন্তু তবুও যেখানে তারকাদের বেশ মোট অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব সেখানে উন্নত যন্ত্রপাতির জন্য খরচ করাও অসম্ভব নয়। তবে সদিচ্ছা, চেষ্টা ও যত্ন থাকা চাই, আর থাকা চাই দূরদৃষ্টি, একাগ্রতা ও এগিয়ে চলার অভিপ্রায়। আশা করি সে সদ্‌-অভিপ্রায় বাংলার চিত্র-নির্ম্মাতাদের আছে। এখন ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নের সমন্বয় সাধন করে কাজে নামলেই সাফল্য আসবে—বাংলা চিত্রও এগিয়ে চলবে সগৌরবে।

খবরাখবর ঃ

'সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান' স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" নামে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করছেন। চিত্রটি পরিচালনা করছেন মধু বসু এবং সঙ্গীত দিচ্ছেন অনিল বাগচী। অভিনয়ে বিবেকানন্দের ভূমিকায় অমরেশ দাস, শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় গুরুদাস, গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বরীর ভূমিকায় মলিনা দেবীপ্রভৃতি আছেন।

* * * *

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অবলম্বনে "ভাবধারা" নামে পাঁচ হাজার ফুট দৈর্ঘের একটি চিত্র নির্ম্মিত হয়েছে। স্বামীজীর কর্ম্মধারা ও আদর্শের ব্যাখ্যাই এই চিত্রটিতে করা হয়েছে।

* * *

"স্বামীজির ডাক" নামে একটি এক রীলের প্রামাণ্য (ডকুমেণ্টারী) চিত্র নির্ম্মাণ করেছেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের "ডিফেন্স ফিল্ম কমিটি"। পরিচালনা করেছেন ও চিত্রনাট্য লিখেছেন সমীর ঘোষ। স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধক বক্তৃতাবলী যা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে শক্তসামর্থ দেহে ও মনে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তাই প্রধানতঃ এই চিত্রের প্রধান উপজীব্য। চিত্রটি শীঘ্রই প্রেক্ষাগৃহগুলিতে প্রদর্শিত হবে।

* * *

"বর্ণালী" নামের একটি নূতন ছবির শুভ-সূচনা টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবগঠিত 'ডি, আর, প্রডাক্‌সন্স'-এর এই ছবিটির পরিচালনা করবেন

চিত্রাভিনেত্রী রাজশ্রী

তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালয়লাম্ ভাষায় নির্ম্মিত দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রগুলির আরও উন্নতি বিধানের জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্র, শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের পুরস্কার প্রদান করে চিত্রনির্ম্মাতাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করবার একটি প্রস্তাবের বিষয় মাদ্রাজ সরকার বিবেচনা করছেন।

* * *

অজয় কর। শ্রীকর চিত্রগ্রহণের দায়িত্বও নিয়েছেন। প্রধান ভূমিকায় আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্ম্মিলা ঠাকুর।

* * *

"অয়নান্ত" নামে সমরেশ বসুর একটি গল্পের চিত্ররূপ দিচ্ছেন 'সন্ধানী প্রডাক্‌সন্স'। প্রধান ভূমিকা দুটিতে দেখা যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে।

* * *

অভিনেতা-প্রযোজক কিশোরকুমার তাঁর দ্বিতীয় বাংলা চিত্র নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। চিত্রটির নাম হবে "ছদ্মবেশী"। অভিনয়াংশে কিশোরকুমার নিজে তো থাকবেনই, তা ছাড়া অশোক কুমার, সুমিত্রা দেবী, মালা সিন্‌হা প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীরাও থাকবেন। কিশোর কুমারের প্রথম বাংলা চিত্র "লুকোচুরী"র পরিচালক কমল মজুমদার এই চিত্রটিরও পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা ভি, শান্তারামের ইষ্টম্যান্ রং-এ তোলা চিত্র "শেরা" মুক্তিলাভের প্রতিক্ষায় রয়েছে। চিত্রটি একটু ভিন্ন ধরণের। রাজস্থানের সীমান্ত প্রদেশেই ছবিটির বেশির ভাগ অংশ চিত্রায়িত হয়েছে। দুই বিবাদমান পক্ষের যুদ্ধদৃশ্য দেখাবার সময় শান্তারাম নিজে এবং নায়িকা সন্ধ্যা ও নুতন নায়ক প্রশান্ত প্রভৃতি অনেকেই আহত হন, কিন্তু তাতে না দমে তাঁরা সুটিং চালিয়ে যান। চিত্রটির অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে আছেন— ললিতা পাওয়ার, এম, রাজন্, মমতাজ, উল্লাস প্রভৃতি।

দেশে বিদেশে ঃ

মার্ক রবসন্-এর মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু অবলম্বনে নির্ম্মিত চিত্র "Nine Hours to Rama" ইতিমধ্যে লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়েছে এবং ভারতীয় অভিনেতা জে, এস, কাশ্যপ গান্ধীজীর ভূমিকায় তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের জন্য বিশেষ করে প্রশংসিত হয়েছেন। লণ্ডনের সংবাপত্রের সমালোচকরা কিন্তু কাশ্যপের প্রশংসা করলেও চিত্রটির মিশ্র সমালচনা করেছেন। 'The Times', 'Evening News', 'Evening Standard' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে যতটুকু দেখান হয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করলেও গান্ধীজীর হত্যাকারী গড্‌সের সম্বন্ধে যা দেখান হয়েছে, বিশেষ করে তার অসংযত যৌন-জীবনের দৃশ্যগুলির বিরূপ সমালোচনাই করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারত সরকার এই চিত্রটির ভারতে প্রদর্শনের অনুমতি দেন নি।

* *

"নাইন্ আওয়ারস্ টু রাম"-খ্যাত ভারতীয় অভিনেতা জে, এস, কাশ্যপ এখন তাঁর নিজ প্রডাক্‌সন্সের ইংরাজী ও হিন্দী চিত্র তোলবার জন্যে একটি বিশিষ্ট ব্রিটিশ ফিল্ম প্রযোজকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন। তাঁর এই চিত্রটির বিষয়বস্তু হবে ভারতীয় ইতিহাসের কোনও এক বিশিষ্ট চরিত্রকে নিয়ে কিংবা ভারতীয় পরিবারিক জীবন অবলম্বনে। খুব সম্ভব শ্রীকাশ্যপ শীঘ্রই ইউরোপ রওনা হবেন তাঁর কয়েকটি চিত্র ওদেশে প্রদর্শনের জন্য।

* * *

"সাতপাকে বাঁধা" চিত্রের একটি অবেগময় মুহূর্তে—
সৌমিত্র ও সুমিত্রা

জাপানী চলচ্চিত্র "Godzilla", "Rodan", "Mothra" প্রভৃতি এখানেও দর্শিত হয়েছে। এই চিত্রগুলির নির্মাতা হচ্ছে জাপানের Toho Films. এঁদের অধুনাতমচিত্র "The Last War" বোম্বেতে প্রদর্শিত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই Toha Films-এর একজন প্রতিনিধি সম্প্রতি এখানে এসেছেন ভারতীয় প্রযোজকদের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁর কোম্পানীর চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব কিনা এবং ভারতীয় চিত্র জাপানে প্রদর্শনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানবার জন্য। তোহো ফিল্মস্ ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও হংকং-এর প্রযোজকদের সহযোগিতায় চিত্র নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তোহো ফিল্মস্ নিউইয়র্কে একটি থিয়েটার লিজ্ নিয়েছেন তাঁদের চিত্র সেখানে নিয়মিত প্রদর্শনের জন্য এবং হনলুলুতে তাঁরা একটী বিলাসবহুল থিয়েটারও নির্মাণ করছেন। তোহোর প্রতিনিধি জানিয়েছেন ভারতেও শুধু জাপানী চিত্র প্রদর্শনের জন্য একটি থিয়েটার নির্মাণের সম্ভাবনা নির্ভর করছে ভারত সরকারের বিদেশী ফিল্ম আমদানী ব্যবস্থার শিথিলতা ও ভারতীয় দর্শকদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাওয়ার ওপর।

* * *

গত ১১ই মার্চ্চ পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ-তে একটি ভারতীয় চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পোল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী তাদেজ গ্যালিনস্কি, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীশর্ম্মা সিং, কূট-নৈতিক সদস্যবৃন্দ, পোল্যাণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ এবং ইন্দো-পোলিশ মৈত্রী সংঘের সদস্যবৃন্দ। চিত্র-উৎসবটির উদ্বোধন হয় বিমল রায়ের "সুজাতা" চিত্রটি প্রদর্শন করে।

* * *

বিদেশী খবর ঃ

গত ৫ই মার্চ্চ হলিউডের জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা রক্ হাড্‌সন্ ও অভিনেত্রী ডোরিস্ ডে-কে Hollywood Foreign Press Association তাঁদের বিংশতিতম Golden Globe পুরস্কার বিতরণ উৎসবে বিশ্বের সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় চিত্রতারকারূপে স্বর্ণ ভূ-গোলক পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেছেন।

এই সংস্থা "Lawrence of Arabia"চিত্রটিকে শ্রেষ্ঠ নাট্যগুণসম্পন্ন চলচ্চিত্ররূপে উল্লেখ করেছেন। হাস্য-রসিক অভিনেতা বব্ হোপ্ পেয়েছেন 'Cecil B. De, Mille' পুরস্কার।

বৈদেশিক চলচ্চিত্র বিভাগে প্রথম পুরস্কার Golden Globe বা স্বর্ণ ভূ-গোলক পেয়েছে ইতালীয় চিত্র "Divo-rce—Italian Style"। দ্বিতীয় পুরস্কার Silver Globe

বা রৌপ্য ভূ-গোলক পেয়েছে ইতালী-ইজ্‌রাইলের চিত্র "Best of Enemies" এবং ফরাসী চিত্র "Sundays and Cybele" পেয়েছে Samuel Goldwyn পুরস্কার।

* * *

পরলোকগতা জনপ্রিয় চিত্রতারকা Marilyn Monroe-র জীবনী অবলম্বনে একটি ডকুমেণ্টারী চিত্র নির্ম্মিত হচ্ছে। এই চিত্রটির থেকে যা আয় হবে তার সমস্ত অর্থ ষ্টুডিওর একটি অর্থ ভাণ্ডারে জমা হবে। এবং এর থেকে সাহায্যকামী তরুণ অভিনেতারা সাহায্য লাভ করে মেরিলিনের স্মৃতি রক্ষায় সাহায্য করবে। জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা Rock Hudson মেরিলিন-এর এই জীবনী চিত্রটিতে বর্ণনা-কারক রূপে (narrator) কাজ করতে রাজী হয়ে তাঁর পারিশ্রমিকও এই অর্থভাণ্ডারে দান করেছেন।

* * *

পশ্চিম জার্ম্মানীর চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ এখন অধোমুখী। গত বৎসর ৭০টিও চিত্র নির্ম্মিত হয় নি। কিন্তু গত তিন চার বৎসর প্রতি বছর একশটিরও বেশী চিত্র নির্ম্মিত হয়ে এসেছে। হামবুর্গের একজন নামকরা চিত্র-সমালোচক বলেছেন যে তাঁদের দেশের চলচ্চিত্র-শিল্প এখন বিশেষ বিপদের মধ্যে পড়েছে।

একটি কাহিনী........

পল্লীপরিবেশের স্নিগ্ধতার মাঝে অর্চ্চনা যেন নিজেকে নূতনরূপে আবিস্কার করে। তার বেদনা, তার মানসিক গ্লানি বাইরের জগৎ জানেনা। কাউকে সে বলতে পারেনা তার অন্তরের দুঃসহ জ্বালা।

শিক্ষয়িত্রী অর্চ্চনা যেন রহস্যময়ী। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে সে যেন কোন রহস্যলোকে চলে যায়। কখনও শিশুদের নিয়ে খেলার মাঠে আবার কখনওবা গঙ্গার ধারে সে ঘুরে বেড়ায়। নিখিলেশকে প্রায়ই তার কাছে যেতে দেখা যায়। স্কুল-সম্পাদকের আত্মীয় হিসেবে সর্বত্রই তার অবাধ গতি। প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে অর্চ্চনার প্রতি নিখিলেশের একটা আকর্ষণ গড়ে ওঠে। অর্চ্চনার সৌন্দর্য্য—তার শান্ত ও সংযত ব্যবহার নিখিলেশকে বিচলিত করে তুলেছিল। সে অর্চ্চনাকে একান্তে পেতে চায়। কিন্তু অর্চ্চনা সযত্নে নিজেকে যেন দূরে সরিয়ে রাখে। সহজ ভাবেই নিখিলেশের সাথে তার আলাপ হয়। এদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের মাঝে একটা মৃদুগুঞ্জন সৃষ্টি করে। অর্চ্চনা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। একদিন সে স্পষ্টভাবে নিখিলেশকে জানিয়ে দেয়, "আপনি এমন কিছু করবেন না যাতে আমার সম্ভ্রমে আঘাত লাগতে পারে। আপনার গতিবিধি সংযত রাখবেন।" বেদনাহত নিখিলেশ জবাব দেয়, "আপনাকে ভালবাসা কি আমার অপরাধ?" "আপনি আর অগ্রসর না হলেই আমি সুখী হব"—দৃঢ়কণ্ঠে অর্চ্চনা জবাব দেয়। নিখিলেশ আর অগ্রসর হয়নি,—ধীর পদক্ষেপে ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে সে বেরিয়ে যায়।

অর্চ্চনা আবার ফিরে যায় তার রহস্যলোকে। রাত্রির অন্ধকারে নিস্তব্ধ শয়নকক্ষে বসে সে তার অতীত ইতিহাসের মাঝে ডুবে যায়। এতো সেদিনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে জনাকীর্ণ বাসের মাঝে সুখেন্দুর সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ। তরুণ অধ্যাপকের বলিষ্ঠ ও সতেজ ব্যবহার ক্ষণিকের মধ্যেই অর্চ্চনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর পরেও তাদের দেখা হয়। সংকোচের আবরণ কেটে গিয়ে উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়। অর্চ্চনার পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মিঃ বসু এদের খবর শুনতে পান। পরিতৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে ওঠে—মেয়েকে তিনি নীরবে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু বাধা আসে মায়ের দিক থেকে। সামান্য বেতনের কলেজ মাষ্টারের সঙ্গে তিনি অর্চ্চনার বিবাহ দিতে রাজী নন। তাঁর মনোনীত পাত্র ননীমাধব কুলে-মানে-সম্পদে সুখেন্দুর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। বনেদী বংশতো বটেই তার উপর সম্প্রতি তাঁর পুত্রের সঙ্গে সাইকেল-রিক্সা ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত।

কিন্তু অর্চ্চনা সুখেন্দুর গভীর ভালবাসা উভয়ের মিলনের সেতু রচনা করে দেয়। পিতার প্রাণভরা আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অর্চ্চনা সুখেন্দুর সাথে সাত পাকে বাঁধার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়।...এখনও যেন তার কানে এসে বাজছে পবিত্র বেদমন্ত্রের ধ্বনি—চোখের সামনে

যেন ভাসছে হোমাগ্নির উর্দ্ধগামী শিখা ও মঙ্গল শঙ্খধ্বনির মধ্যে মহাসত্যের পরম বন্ধনে তারা আবদ্ধ হচ্ছে !

…শুক্লাচতুর্দ্দশীর শুভ সন্ধ্যায় সাত পাকে বাঁধার সে মহালগ্ন উভয়ের জীবনে আনন্দের বন্যা এনে দিল।

…স্বামী গর্বে আত্মহারা অর্চ্চনা,জীবনের শ্রেষ্ঠ উপচারে দয়িতের পূজাবেদী তৈরী করে, পরম আগ্রহে তার শান্তির নীড় রচনায় মেতে ওঠে।

কিন্তু ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকা অর্চ্চনার মায়ের মাঝে প্রতিনিয়তই ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুখেন্দু যেন তাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের কেউ নয়। তার আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি সর্বদাই অযাচিত উপদেশ দিতে সুরু করেন। মায়ের ব্যবহারে অর্চ্চনা ক্ষুণ্ণ হয়,—তাকে বোঝাতে যায়। সুখেন্দুর আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। নীরব প্রতিবাদে সে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সংঘাত বিরাট ভাবে দেখা দেয় যখন অর্চ্চনার মা সুখেন্দুকে সমশ্রেণীতে তুলবার জন্য এ বাড়ীতে টেলিফোন বসাবার ব্যবস্থা করেন।

…স্বামী এবং মায়ের পরস্পরবিরোধী আদর্শ অর্চ্চনাকে দিশেহারা করে তোলে। স্বামীর আত্মমর্য্যাদাকে যেমন সে অসম্মান ক'রতে পারেনা তেমনি মায়ের অযাচিত স্নেহের অনুশাসনও সে উপেক্ষা করতে পারেনা। তার অন্তরের গভীর ভালবাসার বিনিময়ে স্বামীকে সে শান্ত হতে অনুরোধ জানায়। সুখেন্দু স্ত্রীকে ভুল বোঝে। উভয়ের মাঝে নেমে আসে ব্যবধানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পৃথক ঘরে বাস করতে সুরু করে সুখেন্দু। অর্চ্চনা অভিমানে ভেঙ্গে পড়ে। তার সহজাত আত্মমর্য্যাদা সজাগ হয়ে ওঠে। প্রেম, ভালবাসা এর কি কোন মূল্য নেই ? মিলনের শাশ্বত বন্ধনের কি কোনও মর্য্যাদা নেই ?

দুঃসহ জীবনভারে উভয়েই যেন মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চায়। মুক্তি,—বিবাহ বন্ধন যেন তুচ্ছ সামাজিক প্রক্রিয়া, শাস্ত্রের অনুশাসন,—বৈদিক মন্ত্রের নিগুড় তত্ত্ব সবই যেন আজ হাস্যকর ! অর্থহীন জীবন বন্ধন ! বিরাট ঘুর্ণিবাত্যায় তলিয়ে যায় দুটি জীবন। মহামিলনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। সুখেন্দু অর্চ্চনা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। পারস্পরিক অনুমোদিত বিচ্ছেদ পত্রে তারা স্বাক্ষর করে। নেমে আসে তাদের জীবন-নাট্যের ওপর অন্ধকার যবনিকা।

* * * * * *

ছোট বোন বরুণার বিবাহ উৎসব। নিজের হাতে সাজিয়ে দেয় অর্চ্চনা। মঙ্গলশঙ্খ বেজে ওঠে। আবার ভেসে আসে সেই পবিত্র বেদমন্ত্র। হোমাগ্নির পূতঃ শিখা মহামিলনের সাক্ষ্য হয়। স্থানুর মত দাড়িয়ে থাকে অর্চ্চনা। সব কিছু লক্ষ্য করে। মনের পর্দায় জেগে ওঠে শুক্লাচতুর্দশীর সেই মহালগ্ন।

…"চিরনিত্য যেমন বিশ্বময় জগৎ তেমনি চিরনিত্য তুমি আমার স্ত্রী"—পুনরায় সে শুনতে পায় সেই মহামন্ত্র। দাম্পত্য জীবনের মহান অনুশাসন। বিচলিত হয় অর্চ্চনা। তবে কি এ বিচ্ছেদ মিথ্যা ? সাময়িক ? নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করে অর্চ্চনা। বাহ্যিক বিচ্ছেদের আবরণে একটি মূহুর্তের জন্যও সে সুখেন্দুকে ভুলতে পারেনি। কিন্তু কোথায় সুখেন্দু ?…ছুটতে থাকে অর্চ্চনা। উৎসব মুখর গৃহ থেকে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যায় ঐ শাশ্বত মিলন মন্ত্র "বধ্নামি সত্য গ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে।"

'আর, ডি, বি-র "সাত পাকে বাঁধা" চিত্রের এই কাহিনী শীঘ্রই চিত্রগৃহের পর্দায় প্রতিফলিত হবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই কাহিনীর চিত্র-নাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করেছেন অজয় কর। প্রধান চরিত্র দুটিতে আছেন সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—ছায়া দেবী, মলিনা দেবী, গীতা দে, তপতী ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার প্রভৃতি। আর সুর পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আরও উল্লেখযোগ্য যে চিত্রটি আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদেশের চিত্রোৎসবে প্রদর্শনের জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

চিঁড়ে-চ্যাপ্টা

?

টিকা নিষ্প্রয়োজন!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

সেমি-ফাইনাল

দিল্লী ঃ ২০৪ রান (ওয়াটসন ৫০ রান। সি জি যোশী ৬৩ রানে ৪ উইকেট পান) ও **১৪৬ রান** (জ্ঞানেশ্বর ৪২ রান। সুন্দরম ৫১ রানে ৫ এবং রাজ সিং ৭০ রানে ৪ উইকেট পান)।

রাজস্থান ঃ ২২০ রান (কিষণ রুংটা ১০২ এবং মঞ্জরেকার ৪৯ রান। ওয়াটনন ৭৫ রানে ৪ এবং সীতারাম ৫৬ রানে ৪ উইকেট পান) ও **১৩৩ রান** (৫ উইকেটে। মঞ্জরেকার ৪১ নট আউট। সীতারাম ৩৯ রানে ৪ উইকেট পান)।

রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার (১৯৬২-৬৩) প্রথম সেমি-ফাইনালে রাজস্থান ৫ উইকেটে জয়লাভ করে। বৃষ্টির দরুণ চার দিনের খেলা শেষ পর্য্যন্ত দু'দিনের খেলাতে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে খেলা একেবারে হয়নি। খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে দিল্লীর দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৬ রানে শেষ হ'লে জয়লাভের জন্যে রাজস্থানের ১৩১ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে খেলার সময় ছিল ১১৫ মিনিট। রাজস্থান ১১০ মিনিটের খেলায় ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৩৩ রান তুলে দিয়ে ৫ উইকেটে দিল্লীকে পরাজিত করে।

বাংলা ঃ ৩২২ রান (পঙ্কজ রায় ৮১ রান। বালু গুপ্তে ১১৫ রানে ৪, রমাকান্ত দেশাই ৩১ রানে ৩ এবং বাপু নাদকার্নী ৪২ রানে ৩ উইকেট পান) ও **১৯৯ রান** (চুণী গোস্বামী ৬৫ রান। বালু গুপ্তে ৩২ রানে ৩, দেশাই ৩৪ রানে ৩ এবং স্টেয়ার্স ২০ রানে ২ উইকেট পান)।

বোম্বাই ঃ ৫৫২ রান (ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ১৬২, সুধাকর অধিকারী ১৩৩, জি এস রামচাঁদ ১০৭ এবং স্টেয়ার্স ৫৩ রান। অনিল ভট্টাচার্য ১২৫ রানে ৩ উইকেট পান)।

রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার (১৯৬২-৬৩) দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে বোম্বাই এক ইনিংস ও ৩১ রানে বাংলাকে পরাজিত করে ফাইনালে গত দু'বছরের রানার্স-আপ রাজস্থানের সঙ্গে খেলবার অধিকার লাভ করে।

বাংলা দল কোন বিষয়েই বোম্বাই দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। বোম্বাই ক্রিকেট খেলার সর্ব্ব বিষয়েই বাংলাকে পিছনে ফেলে রেখেছিল। তবুও বোম্বাই দল তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে দল গঠন করতে পারেনি। প্রথম দিনের খেলায় বাংলার ৫টা উইকেট পড়ে ২৩৪ রান দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় বাংলার রান ছিল ৩০১, ৮টা উইকেট পড়ে। লাঞ্চের পরের আধ-ঘণ্টার খেলায় বাকি দু' উইকেটে বাংলা আরও ২১ রান তুলেছিল। ৩২২ রানে বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

বোম্বাই এই দিনের বাকি খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ২০২ রান তুলে দেয়। তৃতীয় দিনে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৫৫২ রানে শেষ হয়। প্রথম উইকেটের জুটিতে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং সুধাকর অধিকারী ২৬৯ রান তুলেছিলেন। মাত্র ৫ রানের জন্যে তাঁরা রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রান (২৭৩ রান) অতিক্রম করতে পারেন নি। প্রথম উইকেট জুটির এই রেকর্ড রান (২৭৩ রান) করেন ১৯৪১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিপক্ষে, উত্তর ভারত দলের প্রথম উইকেটের জুটি নাজার মহম্মদ এবং জগদীশ লাল। তৃতীয় দিনে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মুখে মুখে শেষ হয়; ফলে এই দিনে বাংলা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেনি। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে বাংলা দল ২৩০ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। চা-পানের বিরতির সাত মিনিট আগে বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৯ রানে শেষ হলে বোম্বাই এক ইনিংস ও ৩১ রানে জয়লাভ করে।

ইংল্যাণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ঃ

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ১৯৪ রান (বব্ ব্লেয়ার ৬৪ নট আউট। ট্রুম্যান ৪৬ রানে ৪ এবং নাইট ৩২ রানে ৩ উইকেট পান) ও ১৮৭ রান (প্লেলি ৬৫ এবং ডিক ৩৮ নটআউট। টিটমাস ৫০ রানে ৪ এবং ব্যারিংটন ৩২ রানে ৩ উইকেট পান)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৪২৮ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ। কাউড্রে ১২৮ নট আউট, ব্যারিংটন ৭৬ এবং এ্যালান স্মিথ ৬৯ নটআউট। ব্লেয়ার ৮২ রানে ২, ক্যামেরন ৯৮ রানে ২ এবং মরিসন ১২৯ রানে ২ উইকেট পান)।

ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ডের একাদশ টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৪৭ রানে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত খেলা গড়ায়নি, তৃতীয় দিনেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ৪২৮ রানের মাথায় (৮ উইকেটে (প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। নবম উইকেটের জুটি কাউড্রে (১২৮ রান) এবং এ্যালান স্মিথ (৬৯ রান) নট আউট থেকে যান। এঁরা এই ৯ম উইকেটের জুটিতে ১৬৩ রান তুলে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ৯ম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড (১৫৪ রান) ভঙ্গ করেন। ১৮৯৪-৯৫ সালে জে ব্ল্যাকহাম এবং এস গ্রেগরী (অষ্ট্রেলিয়া) সিডনী মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৯ম উইকেট জুটির এই বিশ্ব রেকর্ড রান (১৫৪ রান) তুলেছিলেন।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় কাউড্রের সেঞ্চুরী (১২৮ নট আউট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনিই সর্ব্ব প্রথম ৬টি দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করলেন। তৃতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে তখন ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তাদের ২৩৪ রানের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু নিউজিল্যাণ্ড ১৮৭ রানের বেশী তুলতে পারেনি। ৪৭ রান কম পড়ায় তাদের ইনিংস পরাজয় বরণ করতে হয়।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "সুধা হালদার ও সম্প্রদায়"—৩.৭৫
শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "সিরাজদ্দৌলা" (১৯শ সং)—২.৫০
রমেশ গোস্বামী প্রণীত নাটক "কেদার রায়" (১৪শ সং)—২.৭৫
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটিকা "পুনর্জন্ম"—১.০০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "এক জীবন অনেক জন্ম"—৬.৫০
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পৃথ্বীরাজ"—২.৭৫
শ্রীবার্ণিক প্রণীত উপন্যাস "চন্দ্রিমা"—২.০০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৯।২।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
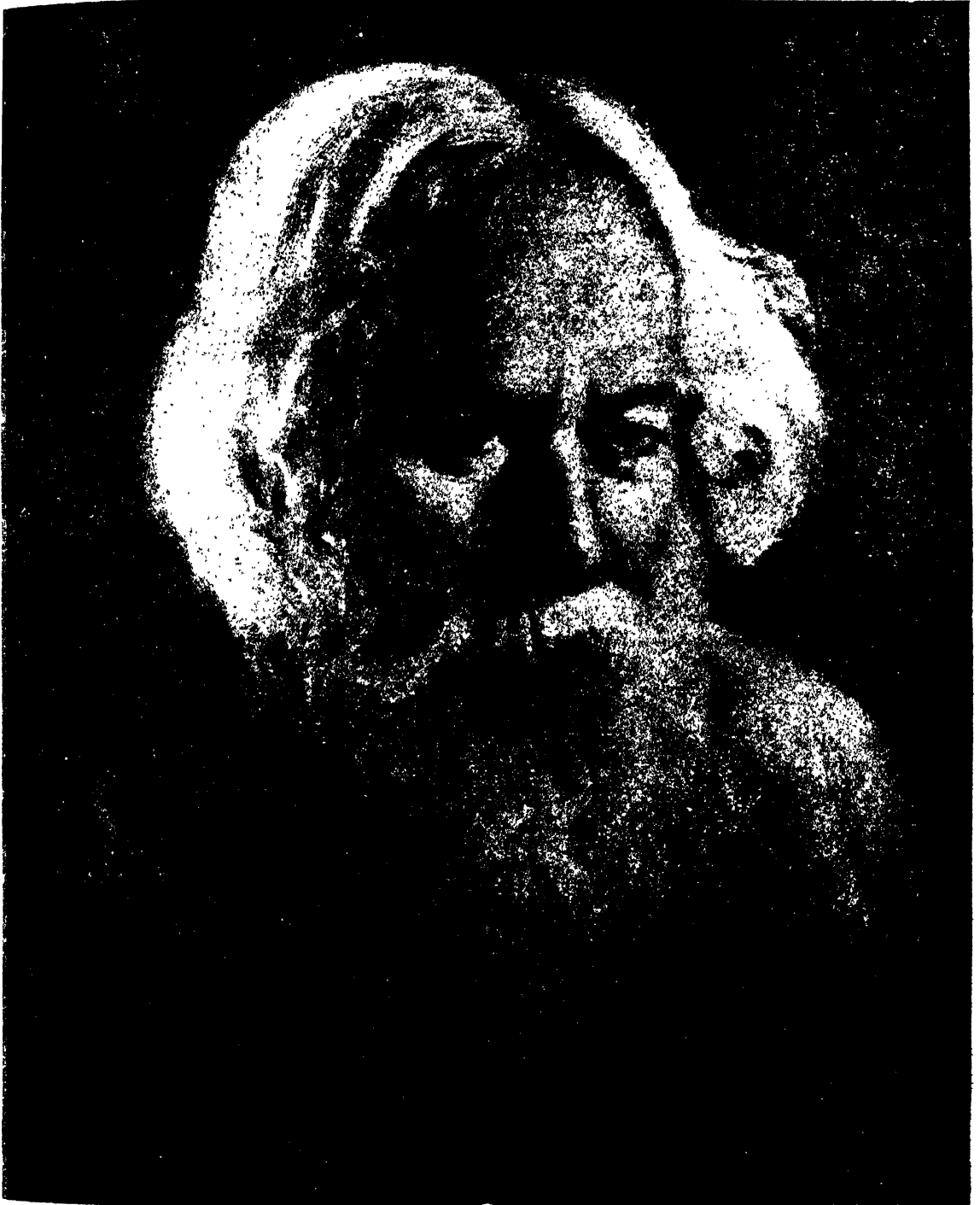
'চির নূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ'—

শিল্পী : শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে;
গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও
বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউণ্ট খোলা হয়।

ALL INDIA MAGIC CIRCLE

(নিখিল ভারত জাদু সম্মিলনী)

বিলাত আমেরিকার মত ভারতবর্ষেও যাদুকরদের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান—প্রত্যেক মাসের শেষ শনিবার সন্ধ্যায় সমবেত যাদুকরদের সভায় ম্যাজিক দেখানো, ম্যাজিক শেখানো এবং ম্যাজিক সম্বন্ধে আলোচনা। আপনি ম্যাজিক ভালবাসেন কাজেই আপনিও সভ্য হতে পারেন। এক বৎসরে মাত্র ছয় টাকা চাঁদা দিতে হয়। পত্র লিখিলেই ভর্তির ফর্ম ও ছাপানো মাসিক পত্রিকায় নমুনা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

সভাপতি :

'যাদুসম্রাট' পি. সি. সরকার

২৭৬/১, রাসবিহারী এভিনিউ বালীগঞ্জ,
কলিকাতা-১৯

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

রূপসী না সজীব বোমা? ২৲
লণ্ডনে শত্রুচর ২৲
মরণের রণ-ভেরী ২৲
কিনীর ফাঁদ ২৲
প্রচ্ছন্ন আততায়ী ২৲
চীনের ড্রাগন ৩·৭৫

যামিনীকান্ত সেন প্রণীত

আর্ট ও আহিতাগ্নি

সম্পাদনা : শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনের সুস্থ সমগ্রতা হ'তেই সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি—আর সুন্দরের অন্বেষণে মানুষের সাধনার ফল হ'লো শিল্প।

এই গ্রন্থে পাবেন—

কাব্য—চিত্রকলা—ভাস্কর্য ইত্যাদির ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব আর তারই সঙ্গে সেগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাব-বিশ্লেষণ। সুন্দর—সুরঞ্জিত—বহুমূল্যবানচিত্রশোভিত সুসজ্জিতসংস্করণ। দাম ১২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বৈশাখ—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

"বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস সে অহেতুক" ১—রবীন্দ্র সৌন্দর্য দর্শনের এ একটি মূল-সূত্র। জৈবিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজন সাধনে লিপ্ত যে মন সে মন শিল্পস্রষ্টা নয়, শিল্পসৃষ্টির জন্যে চাই অবকাশ, ছুটি এবং নিরাসক্তি। নিরাসক্ত, শান্ত, শুদ্ধ মনেই সৌন্দর্য আপনাকে ধরা দেয়। "সৌন্দর্যসৃষ্টি দুর্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা।" ২

সৌন্দর্য কি? সৌন্দর্যের একটি পরিচ্ছিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া বড় কঠিন। বলা চলে যে জিনিস মনে আনন্দানুভূতি আনে তাই সুন্দর, কিন্তু সে আনন্দ সর্ব্বপ্রকার স্বার্থসংশ্রব শূন্য হওয়া চাই। "That is beautiful which pleases without interest" লিখেছেন কাণ্ট (Critique of Judgement). এভাবে মানুষের মনে তার ক্রিয়া দেখেই সুন্দরকে বুঝার ও বোঝাবার চেষ্টা অনেকে করেছেন। রবীন্দ্রনাথও মুখ্যত এই নীতিই অনুসরণ করেছেন। "বস্তুতঃ বলা চলে, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেইটেই সাহিত্যের সামগ্রী।" ৩ আবার সৌন্দর্যের একটা বাহ্য পরিচয় (specific objective structure, formal property)

—পরিমিতি, অনুপাত, বৈচিত্র্যের-মধ্যে-ঐক্য ইত্যাদি নির্ধারণের দ্বারা তাকে বুঝার চেষ্টা হয়ে থাকে। এ চেষ্টা পশ্চিম দেশেই হয়েছে বেশি; প্লাটো এ্যারিষ্টটল সুরু করে গেছেন, সুষ্ঠু পরিণতি দেখতে পাই আধুনিক কালের প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক Roger Fry ও Clibe Bell এ। রবীন্দ্রনাথ এদিকে বড় একটা যান নি, কারণ বোধ হয় এই যে—শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যের মানস-ক্রিয়া-নিরপেক্ষ বাহ্য পরিচয় নির্ধারণ সন্দেহাতীতভাবে করা যায় না। তবে একটি জায়গায় কবির এ চেষ্টারও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, "গোলাপের আকার আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এক কে, সেইজন্য গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।" ৪ এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই রূপগত ব্যাপার (Formal property) কে সৌন্দর্যের পরিচায়ক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচিত দুটো পদ্ধতি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আর এক ভাবে সৌন্দর্যকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন, এবং সেটি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। আমাদের আত্মা আর পাঁচজনের আত্মাকে খুঁজে বেড়ায়, প্রাণী ও প্রকৃতি-জগতের সঙ্গেও আমরা নৈকট্য ও আত্মীয়তা আবিষ্কার করি· এই আবিষ্কৃতিই সৌন্দর্যের সাক্ষাৎকার। কবির নিজের কথায়, "আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা—ইহা হইতেই সৌন্দর্যসৃষ্টি হইল।" ৫ আত্মার এই আত্মীয়তা একান্তই নিঃস্বার্থ, এবং আমরা পরে দেখব যে এ তত্ত্ব কবির দার্শনিক-বিশ্বাসের সঙ্গে সুসঙ্গত ও উপনিষদের আত্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যাই হোক, মনে যা বিশুদ্ধ আনন্দানুভূতি জাগায় তাই যদি মাত্র সুন্দর হয় তবে ত সংসারের বহুজিনিসই সৌন্দর্যের এক্তিয়ার-বহির্ভূত হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও! দুঃখ, দারিদ্র্য, নীচতা, ক্রূরতা এগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলবেন এগুলোর মধ্যেও সৌন্দর্য ও আনন্দের সাক্ষাৎ পান বলেই কবিশিল্পী এ সমস্তকে কাব্যশিল্পের উপাদান করে থাকেন। শান্ত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে দেখতে পারলে,—যেমন দেখেছেন ব্যাসদেব, সেক্সপীয়র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা,—এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ মেলে। কবি লিখছেন, "আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও বিকারের কিছু অভাব নেই; কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা কিছু তুচ্ছ—যা কিছু ব্যর্থ—যা কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিত ভাবে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য যে কাটাছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডীকাটা জিনিস নয়, বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ছেন।" ৬ দুঃখ-দৈন্য-বিকৃতি সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে না কারণ, কবির মতে, ওগুলো বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিলীলার অঙ্গীভূত। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সংসার আনন্দের পূর্ণ অধিকারের দিকেই এগিয়ে চলেছে, এবং এই দুঃখও তত্ত্বতঃ আনন্দেরই প্রকাশ, সুন্দরেরই রূপ। "যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর।" ৭

(২)

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে সত্যের সঙ্গে এক করে দেখেছেন; বস্তুর সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া মানে তার অন্তর্নিহিত সত্যের ও সাক্ষাৎ পাওয়া। এই প্রসঙ্গে কবি 'সাধারণ সত্য' ও 'সার্থক সত্যে' পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কবি-দৃষ্টিতে প্রকাশিত যে পরিচয় তা বস্তুর সার্থক সত্য, তার বাহ্য সাধারণ পরিচয় নয়। তথ্য ও সত্যের পার্থক্যও লক্ষণীয়। যা ঘটে তাই তথ্য, কিন্তু যা কোন দেশে বা কালে ঘটুক বা না ঘটুক সমস্ত ঘটনার মূল বা বীজ তাই সত্য। এ সত্য বুদ্ধিগত জ্ঞান নয়, বোধিলব্ধ অপরোক্ষ অনুভূতি—poetic intuitive knowledge, তার ফলশ্রুতি আনন্দ। এভাবে সৌন্দর্য ও সত্যকে এক করে দেখা আমরা ইংরাজী রোমান্টিক কবিদের মধ্যেও পাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখছেন, "Poetry is the breath and finer spirit of knowledge," শেলি—"A poem is the very image of life in its eternal truth." কীটস—"Beauty is Truth,

Truth Beauty." রোমান্টিক কবিদের প্রভাব হয়ত পড়েছে রবীন্দ্রনাথের উপর, গভীরতর প্রভাব এসেছে উপনিষদ থেকে, তার চেয়েও বড় কথা কবির নিজস্ব অনুভূতি।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের রসবাদের একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। রসবাদীদের মত রবীন্দ্রনাথেরও চরম কথা আনন্দ। কিন্তু এই রস বা সৌন্দর্যানুভূতি সত্যোপলব্ধিতে নিয়ে যায়—একথা রসবাদীরা মানেন না। রসবাদের আধুনিক ব্যাখ্যাতা অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখছেন, "কাব্যের কাজ যে সত্যকে সুন্দরের মূর্তি দেওয়া—এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার, এবং ঐ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একটা গৌণ ফল।" (কাব্য-জিজ্ঞাসা)। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ কাব্যে সত্যের প্রকাশ কী গভীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। সে সত্য তথ্যগত সাধারণ সত্য নয়, তা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানও নয়, তা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য—বোদ্ধিলব্ধ, কবির আনন্দদৃষ্টিতে প্রকাশিত। বিজ্ঞানীর মত কবিকেও জৈবিক নৈতিক প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে যেতে হয়, কিন্তু কবির দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের মত নির্ব্যক্তিক নয়, তা একান্তভাবেই প্রেমের।

এখানে আর একটা বিষয়ে আলংকারিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে। কাব্যপাঠে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে প্রেমের বা আনন্দের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এজাতীয় কথা অলংকারশাস্ত্রে একদম নেই, অথচ রবীন্দ্র-সৌন্দর্য দর্শনের এ একটি মৌলিক তত্ত্ব। মূলকথা বেদান্তের প্রভাবে রসবাদীরা সংসারের মধ্যে যে সত্য আছে তা বিশ্বাস করতে পারেন নি, এবং তার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ককেও তারা সুনজরে দেখেন নি। আলংকারিকেরা সমস্ত ব্যাপারটাকেই বুঝার চেষ্টা করেছেন পাঠক বা দর্শকের দিক থেকে। যদি শিল্পীর দিক থেকে দেখতেন তাহলে বুঝতে অসুবিধা হত না যে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি আন্তরিক প্রীতিবোধ ব্যতিরেকে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ বা বাল্মীকির রামায়ণ—অন্ততঃ সুন্দরকাণ্ড—রচনা সম্ভব হত না এবং এই সমস্ত কাব্যপাঠে পাঠকের মধ্যে সেই অনুরাগ সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক।

(৩)

মনুষ্য, প্রাণী বা প্রকৃতিজগতের প্রতি এই যে প্রীতি, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্র সৌন্দর্য দর্শনের আর একটি দিক—যাকে বলা যায় প্রকাশতত্ত্ব। পরমসত্তা আমাদের দেশে সচ্চিদানন্দ বলে আখ্যাত হয়েছেন। এর তাৎপর্য হল কবির মতে, 'আমি আছি', 'আমি জানি' ও 'আমি প্রকাশ করি'। প্রকাশটিই সব চেয়ে বড় কথা—কারণ প্রকাশের মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে থাকা ও জানা। আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশ এই জগৎ। কবির কথায়,—"যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাহার আনন্দরূপ, অমৃত-রূপ।"৮ আনন্দ ছাড়া লীলা ছাড়া এই সৃষ্টির অন্য তাৎপর্য নেই। ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপত এক যে মানুষ, তারও সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্বীয় আনন্দরূপের প্রকাশ। শিল্পীর নির্বিষয়ী শান্ত শুদ্ধ মনে নর-নারী-পশু-পাখী-বৃক্ষ-লতা সাগর-গিরির প্রতি যে প্রীতি তার মূলে রয়েছে ও সকলের মধ্যে নিজেরই সত্তার আবিষ্কার এবং এই আবিষ্কারের আনন্দের প্রকাশই হল সাহিত্য। কবি বলছেন, "গোলাপ ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে···অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।"৯—কাজেই দেখা যাচ্ছে শিল্পী তার শিল্পকর্মে নিজের আনন্দরূপকেই প্রকাশ করে। এই আনন্দরূপই তার শিল্পীসত্তা, তা মূলতঃ বিশ্বসত্তা তথা বিশ্বমানবের (Universal men) সঙ্গে এক। এজন্যেই কবির কাব্যে ব্যক্তির কথা বিশ্বের হয়ে উঠে, একজনের মধ্যে দিয়ে চিরন্তন মানুষের পরিচয় ফুটে উঠে। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে কাব্যশিল্পে মানুষের এই যে নিগূঢ় সত্তার প্রকাশ তা নিজলা আত্মা নয়, তার সঙ্গে শিল্পীর দেহ-প্রাণ-মনের নিবিড় গ্রন্থিবন্ধন রয়েছে। এই দেহ-প্রাণ-মন সংযুক্ত বিশিষ্ট আনন্দরূপকেই কবি প্রসঙ্গান্তরে personality বলেছেন। এই personality-রই প্রকাশ সাহিত্য।

(৪)

শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে প্রেরণা, কল্পনা, বুদ্ধি—এ তিনের ক্রিয়াই অপরিহার্য। তিনটির ভেদ-রেখা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় খুব স্পষ্টই হয়ে উঠেনি। প্রেরণা আসে দৈববাণীর মত যেন আকস্মিক আলোবোদ্ভাস (Revelation, Illumination) কবির মন আনন্দে ফেটে পড়ে, আবার

সেই সঙ্গে অনুভূত হয় কখনও বেদনা, কখনও অস্বস্তি, এমন কি কখনও বা শারীরিক অসুস্থতা। কোন কোন কবি এই অবস্থায়ই লিখতে বসে যান—যেমন শেলী,হাউসম্যান, ব্লেক প্রভৃতি। অনেকেই কিন্তু সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হন এই অবস্থাটা কেটে গিয়ে মন শান্ত হয়ে আসলে—যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। অবশ্য মন স্থির হলেও সৃষ্টি-প্রেরণাটি হারিয়ে যায় না, সে শিল্পীর মনকে অধিকার করে থাকে; শিল্পী তখন যে শক্তির সাহায্যে মূল অনুভূতিতে ফিরে গিয়ে তাকে প্রকাশ দেবার চেষ্টা করেন তাকেই বলে কল্পনা—Imagination. কল্পনা কাজেই প্রেরণার সঙ্গে অভিন্ন নয়। সে প্রেরণার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম agent। কোলরিজ তাঁর Biagraphia literaria গ্রন্থে কল্পনা সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনায় এই মাধ্যমত্বের (agency) উপরই জোর দিয়াছেন। বুদ্ধির কাজ অনেকটা বিনীত সেবকের। সে মালমসলা জুগিয়ে দেয়; ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ, আঙ্গিক বিন্যাস ইত্যাদি ব্যাপারে বুদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য; সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে সমালোচনের কাজ চলে, তাতেও বুদ্ধির অংশ রয়েছে।

"সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী ॥১০—সাহিত্যের উৎস যে অপৌরুষেয় প্রেরণা (Inspiration, poetic illumination) তা এখানে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হল। কিন্তু এমন স্পষ্ট করে প্রেরণার কথা কবি বেশি বলেন নি; 'কল্পনা' শব্দটির ব্যবহারই করেছেন বেশি যেমন, "মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা"।১১ এই কবিকল্পনা কি প্রেরণারই নামান্তর নয়? এ'টি কবির কম বয়সের উক্তি, পরবর্তী লেখা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করা যাক্: "সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনাগুলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাই নে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্য স্থাপন করে।"১২ কল্পনার দৃষ্টি বলতে প্রেরণাকে বুঝিয়েছেন, না কল্পনাকে—তা খুব স্পষ্ট নয়। একই প্রবন্ধের আর একস্থানে লিখছেন, "মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্য আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোন একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তাহলে আর্টিষ্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই।......আর্টিষ্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমত, তার কোনটাকে বাড়াতে হবে, কোনটাকে কমাতে, কোনটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনটাকে পিছনে।"১৩ কল্পনার নির্দেশে গ্রহণ বর্জন, আগে পিছু বসানো—এ সমস্ত কাজ যে করবে মুখ্যত বুদ্ধি, এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা হল না। অধিকন্তু প্রসঙ্গান্তরে কবি লিখছেন, "কবি যেমন কাব্যগঠন করে···রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে।···তাহাকে বলে শ্রী। ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ; মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি।"১৪ কাব্যগঠন জীবনরচনা—এক কথায় প্রকাশের (expression) ব্যাপারে বুদ্ধির যে দান আছে তা স্বীকৃতি পেল না। কাজেই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি কল্পনা ও প্রেরণার ব্যাপারে কবির বক্তব্যের অস্বচ্ছতা মেনে নিতে হয়।

(৫)

সাহিত্যে যখন ঘটমান বাস্তবতার জয়জয়কার চলছে দেশে বিদেশে, তখন রবীন্দ্রনাথ অন্তরের অনুভূতি ও আদর্শে অটুট থেকে শাশ্বত সাহিত্যের কথা বলে গেছেন। যে জিনিস একান্তভাবেই স্থানকালে সীমাবদ্ধ, যার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা সর্বকালের মানুষ সানন্দে গ্রহণ করবে সে জিনিস কাব্যের বিষয় হতে পারে না। আমরা দেখেছি দুঃখ দৈন্য বিকার এগুলোর মধ্যেও কবি সুন্দরের অবস্থিতি স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ কবির আপত্তি বিশেষ বিশেষ বিষয়কে নিয়ে ততটা নয়, যতটা ঐ সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করার দৃষ্টি নিয়ে। যেখানে সৌন্দর্য দৃষ্টি নেই, আছে কেবল জৈবিক বা নৈতিক বোধ, বুদ্ধির বিচার, বৈজ্ঞানিক কৌতুহল সেখানে সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। "মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিস, বুদ্ধি বিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নতুন হয়েই দেখা দিক, দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়।"১৫

অন্যত্র কালিদাসের কাল সম্পর্কে লিখছেন, "তুমি কি মনে কর লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না। লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই। কিন্তু সে কি সাহিত্য।"১৬

অপর পক্ষে কবি একথাও জোর করে বলেছেন যে আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের রচনায় যা পাওয়া যায় তা যথার্থ বাস্তব নয়, কারণ সংসারের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে যে শুদ্ধ শান্ত দৃষ্টি দরকার, তা ওসমস্ত লেখকের নেই। "বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।"১৭

শ্রীঅরবিন্দ এই জিনিসটিকেই ঘুরিয়ে বলেছেন, 'Illusion of Realism.'

৬

যত বেশি লোকে যাতে আনন্দ পায় তাই তত বড় সাহিত্য—এজাতীয় কথায় রবীন্দ্রনাথ আদৌ বিচলিত হন নি। তিনি সাহিত্য সম্ভোগে অধিকারী-ভেদের কথা পুনঃ পুনঃ বলেছেন। কোন কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে, কোন বিষয়ে শিক্ষালাভের নিমিত্ত অথবা অন্য কোন উপকারের আশায় যারা সাহিত্য পাঠ করতে আসেন তাদের কিছুতেই তিনি রসিক লোক বলে গণ্য করবেন না। এই সমস্ত অরসিকের নিন্দাবাদে বিচলিত না হয়ে সাহিত্যিকরা যেন নিজেদের অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তার উপর নির্ভর করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—এ উপদেশই তিনি রেখে গেছেন। "রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না।"১৮ বস্তুতঃ অপ্রয়োজনের আনন্দের তৃষ্ণা, উদ্দেশ্যবিহীন সৌন্দর্যপ্রীতি সব লোকের মধ্যে স্বভাবতঃই আসে না। তাই কবি বলেছেন, "যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে—রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষকের ছেলেকেও।"১৯

এ প্রসঙ্গে লোকশিল্প ও বিদগ্ধ শিল্পের পার্থক্যের কথা বিবেচনা করা দরকার। লোকশিল্প সমাজের শৈশব অবস্থার সৃষ্টি, তা সহজ অনাড়ম্বর; নির্বাধে সব সামাজিক তার ভাগ নিয়ে থাকে। কিন্তু বিদগ্ধ সাহিত্য জটিল তত্ত্বতন্ত্রীবিশিষ্ট, তার স্বাদ শিক্ষার অপেক্ষা রাখে। কবি এ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন, "এক সময়ে যাহা সাধারণের ছিল, ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া আসে…কাজেই সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক, এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকে।"২০

অধুনা বিদগ্ধ শিল্পের ব্যাপারে অধিকার ভেদ সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করছে।

৭

ভারতের প্রাচীন আলংকারিকেরা রসবিচারে উপকারের প্রশ্নকে বড় একটা আমল দেন নি। রসাস্বাদ ব্রহ্মস্বাদ তুল্য; ব্রহ্ম বা আত্মলাভের চেয়ে বড় কিছু নেই। নিতান্তই যদি কিছু উপকার থাকে, সে হল পূর্ব থেকে ব্রহ্মানন্দের স্বাদ দিয়ে ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষাকে বলবতী করে তোলা ও সংসার সুখের মায়িকতা সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া। আজকের দিনে প্রবলভাবে সমাজ-সচেতন মানুষ কাব্য সাহিত্যের উপকারের দিক সম্পর্কে খুবই সজাগ। নীতি প্রচারে, দুর্নীতি দমনে, শিক্ষা প্রসারে সাহিত্য শিল্পের নিয়োগ হলে অনেকেই খুশি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, কোনপ্রকার উপকার সাধনের জন্যে সাহিত্য নয়। আনন্দ প্রকাশ ও আনন্দ লাভই সাহিত্য-শিল্প ব্যাপারের একমাত্র লক্ষ্য।

তবে কি সাহিত্য চর্চায় কোন উপকার নেই? কোন স্থূল উপকার সাহিত্যের লক্ষ্য নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু বিশেষ অর্থে গভীরতম দৃষ্টিতে সাহিত্যচর্চায় মহৎ উপকার সাধিত হয়।

আমরা পূর্বেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের সহিত সত্যের ঐক্য আবিষ্কার করেছেন; সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে আনন্দের দৃষ্টিতে বিষয়ের সার্থক রূপ সত্য পরিচয় ফুটে উঠে। তেমনি আবার এই সত্যসুন্দরের সঙ্গে ছড়িয়ে আছে কল্যাণের আদর্শ। 'মানুষের আইন ভগবৎ-বিধানের নিকটবর্তী হতে চায়'—অন্যত্র কবি বলেছেন। সত্যসুন্দরের মধ্যেই রয়েছে ভগবৎবিধান তথা শাশ্বত কল্যাণাদর্শ। তার উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবন নীতি—কি ব্যক্তিগত কি সমাজগত তাই মঙ্গলকর। এতেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, সমাজে ব্যক্তিতে বিরোধ দূর হয়ে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নিমজ্জমান একটি শিশুকে বাঁচাবার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে কোন

যুবক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল—এ দৃশ্য আমরা সুন্দর বলে অনুভব করি কেন? কারণ এর সঙ্গে "সমস্ত জগতের একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে; সকল মানুষের মনের সঙ্গে নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না।"২১ বাস্তবে যা যথার্থ কল্যাণকর তাকেই আমরা সুন্দর বলে অনুভব করি না কি? অপর-পক্ষে যা সুন্দর, পরিণামে তা শুভ হয়েই থাকে।

এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব সত্য ও মঙ্গলকে আলিঙ্গন করে নিয়ে ব্যাপ্তি ও অখণ্ডতা লাভ করেছে। আলংকারিকদের মত তিনি সত্যকে অস্বীকার করেন নি, মঙ্গলকে এড়িয়ে যান নি, আবার আধুনিক সমাজবাদীদের ন্যায় ব্যবহারিক সত্য ও স্থূল উপকারের সেবায় সাহিত্যকে লাগাবার নির্দেশ দেন নি। সমস্ত জীবনের লক্ষ্য যে আত্ম-আবিষ্কার ও পরম আনন্দানুভূতি তারই পক্ষে সাহিত্য পরম সহায়।

নির্দেশিকা:—

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত বইগুলো থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে:—

১। সাহিত্যের পথে ১, ৩, ৪, ৯, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯।

২। সাহিত্য ২, ৮, ১০, ২১।

৩। পঞ্চভূত ৫, ১৪, ২০।

৪। শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড ৬, ৭।

৫। সাহিত্যের স্বরূপ ১৫।

৬। 'চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ ১১।

জানালার পাশের গাছ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

মোর বাতায়ন পাশে যে গাছ আছে
বাতায়ন-পাদপ সে।
রাত্রি যখন নামে
শার্সি নেমে আসে
কিন্তু যেন সেই গাছ আর মোর মাঝে
পর্দা কভু ঝুলানো না থাকে।
ঝাপ্সা স্বপ্ন মাটী থেকে উর্দ্ধে উঠে শির তুলে
তারপর যায় মিশে মেঘে

লঘু জিহ্বা যত উচ্চনাদে কথা কয়
সুসম্পূর্ণ তারা সবে নয়।
কিন্তু হে পাদপ, তোমারে দেখেছি আমি
বাত্যাহত আন্দোলিত।
আর তুমি যদি দেখে থাক মোরে
নিদ্রায় অবশ,
দেখেছ কেমন
পরাভূত, বিজড়িত, নিঃশেষিত আমি।

(রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার অনুসৃতি)
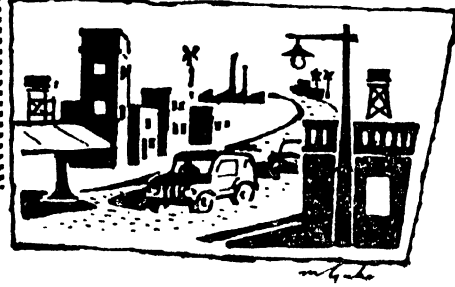
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

…আবছা রাত্রি নেমেছে। কি তিথি জানে না, বাঁশ বনের ঘন আঁধারে হারিয়ে গেছে চাঁদের আবছা আলো কেমন জোনাকির ঝিকিমিকি।

…হ্যারিকেন জ্বালবার সামর্থ্য সতীশ ভটচাযের নেই। …ওদিক থেকে ভটচাযগিন্নী গজ গজ করছে—জ্যানা নাই ফ্যানা আছে। যা না এইবার ভাত রাঁধার কায করগা ঠেঙ্গো বড় ঠাকুরের মতন। আর কি করবি?

…সতীশ ভটচায ভাবছে। সত্যিই এবার যেন ওমনি জমাট আঁধার ঘেরা দুর্দিন আসছে। এককালে জরিবুটি তাবিজ কবজের কারবার ছিল, গ্রহশান্তি—ঠিকুজী কুষ্ঠীর বিচারও করতো।

কিন্তু সে সব ছেড়ে দিয়েছিল, তেমন পয়সাও পায়নি। গুনিয়ে গাঁথিয়ে কেউই বা পয়সা দেবে, তাছাড়া ওসব গ্রহাচার্যের কাষ, শ্রাদ্ধের অগ্রদানী বামুন হতে সে পারবে।

…তারকবাবুর দেবসেবা—ওপাড়ার যজমানিই করে দিন চলেছে। এখন।

…হঠাৎ কার ডাক শুনে সোজা হয়ে বসল সতীশ। তাড়াতাড়ি পিদীমের সলতেটা উসকে দিয়ে কলুঙ্গী থেকে ময়লা কাপড় জড়ানো জীর্ণ বই পুথি-পত্তর খুলে তৈরী হয়ে বসে সাড়া দেয় ভারি গলায়। এস! বেশ ভব্যিযুক্ত হয়ে কর্মরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতই গুরু-গম্ভীর ঠাটে বসে সতীশ ভটচায।

হ্যারিকেনের আভা পড়েছে সবুজ বাঁশবন আর ডাঙ্গা মাটির প্রাচীরের উপর, গোয়াল ঘর এককালে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে ছাউনি অভাবে বৃষ্টির জলে গলে গলে পড়ে মাটির ঢিবিতে পরিণত হতে চলেছে। ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিচিত্র একটি জীবের মত বসে আছে সতীশ ভটচায।

…এগিয়ে আসে আলোর আভাষ।

—পানু!

পানুদাস এগিয়ে এসে ভক্তি ভরে প্রণাম করল। সতীশ ভটচায একবার ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

কি দেখছে ওর মুখ-চোখে, মরীয়া সর্বস্বহৃত ব্রাহ্মণ আজ বাঁচবার দুর্বার প্রচেষ্টায় যেন সত্যদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ওঠবার ভাণ করে।

পানুদাস তার কাছে আসবে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য তা যেন জানতো সে।

নির্বিকার পরম ঔদাসীন্যভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে। —তারপর?

পানু আত্মসমর্পন করার ভঙ্গীতে বলে ওঠে।—আজ্ঞে সেই যে গ্রহশান্তির কথা বলছিলেন আর সেই সঙ্গে ধনদাকবচ নাকি তারই একটা ব্যবস্থা করে দেছন।

—সে তো অনেক কর্মপ্রক্রিয়া। ব্যয়সাপেক্ষ! রৌপ্য-কাঞ্চন—

—খরচের জন্য ভাবনা করবেন না কাকামশাই, আপনি ফর্দ করে দিন বরং!

আমতা আমতা করে রাজী হয় সতীশ ভট্টাচার্য। নব রাজসূয় যজ্ঞের ঋত্বিকের পদই গ্রহণ করে অতীতের পূজারী ব্রাহ্মণ।

পান্নুদাস বলে চলেছে—যদি সুফল পাই কাকামশায়, মানসিক আমি পূরণ করবো। খুশী করবো আপনাকে।

পরম বিজ্ঞের মত সতীশ ভট্টাচার্য ফর্দ করতে করতে অন্যমনস্কের মত জবাব দেয়—সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে বাবা। দেখা যাক তিনি কি করেন!

করজোড়ে পান্নুদাস বসে আছে।

দেবতাকে কত ঘুস দিলে তা ক'গুণ ওয়াশীল হয়ে আসবে এবং খরচ খরচা বাদ দিয়ে কি পরিমাণ লাভ তাতে থাকবে—তারই হিসাব করে মনে মনে।

বেজা বসে আছে। গরমকালের রাত্রি। ঘুপসি ঘরের ভিতর টেকা যায় না। বাইরের মাঠে তারা পড়ে আছে মেয়ে-মদ্দ সবাই। বাউরীপাড়ায় রাত্রি নেমেছে। মাথার উপর বটগাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে একফালি আকাশ দেখা যায়, নিকানো তকতকে আকাশে ঝিকিমিকি তোলে অজস্র তারাফুল।

বেজা কমাসের পরিশ্রমে নোতুন ঘর তুলেছে। সেই গলায় দড়ি দেবার সময়কার গ্লানি আর হতাশা তারে যেন নোতুন করে বাঁচবার সামর্থ্য এনেছে।

আবার নোতুন উদ্যমে লেগেছে সে কাজে—মনের জোর ফিরে আসে নিতের কথা।

নিতে বাউরীই বলেছিল তাকে—মরদের মত বাঁচ-খাট দেখ সব আবার ফিরে আসবেক। মরতে যাবি কুন দুঃখে শালো মাদী কুথাকার? তু মাদী না মরদ!

মরদের মতই খেটেছে আবার! ঘর তুলেছে।

কিন্তু এক জায়গায় সে হেরেই গেছে বারবার। ওই ভাবির কাছে। তার মনে নিত্যি নোতুন চাওয়ার মতন, সেই ক্ষুধা মেটাবার সামর্থ্য বেজার নেই।

—ঘর করলাম, নোতুন ঘর। খরচ পাতি হয়ে গেল।

—হাসে ভাবি—ঘর! মাগো মা—ওই এইটুন মাটির দেওয়াল আর ঝুপড়ির চাল, এই তুর ঘর না শূয়োর খুপরী! ইথানে মানুষ থাকে হারে?

ভাবির দুচোখে কোঠাবালাখানার নেশা, বাবুদের চকমিলান দালানের বাসিন্দা সে, দামী বিছানায় শোবার স্বপ্ন তার মনে। পয়সা—নোতুন শাড়ী—গহনা তার সাধ। বলে—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে গতর জল হয়ে গেল ইথানে—তবে করবি কি? ইথানে সব্বাই যে খাটে।

—খাটুক উরো।

ভাবি অজ্ঞাতেই তার যৌবন-মদির দেহের দিকে চেয়ে থাকে। কথার জবাব দেয় না বেজা।

...তাই ভাবি বেশ স্বাধীন। নিজের মতেই চলাফেরা করে। নোতুন ওই কলবাড়ী তৈরী হবার সময় থেকেই কেমন বদলে গেছে। ওই বড় মিস্ত্রী ছোকরার সঙ্গে দিন-রাত ফুসফাস!

...বেজা গর্জন করে আড়ালে—ইকি তুর ব্যাভার?

হাসে ভাবি দুচোখে মাদকতার ঢেউ তুলে—কেনে রে? না খেটে দুটাকা রোজ দিছে একটু হাসলামই বা?

—না, দুটাকা চাই না। বেজার মনে পুরুষকার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

—উরে মরদ। তু তো পাস বারো আনা।

জোঁকের মুখে যেন চুন পড়েছে, চুপ করে যায় বেজা।

মনে মনে গজগজ করে—মুখে কড়া কথা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। রাত হয়েছে। এখনও ফেরেনি বৌটা।

ভাসুরের মার। ডেকে হেঁকে বলবার উপায় নেই। ঘরের বৌকে শাসন করতে পারে না—সে আবার কুন মরদ। বাউরীপাড়ার মর্দদের কাছে নিজেরই লজ্জা করে বেজার।

চুপ করেই থাকে।

বুড়ো পশুবাউরী হুকো টানছে, আর কাশছে খক খক করে।

তার গজগজানি শোনা যায়।

—শালো মাগের উপ দেখে টলে গেইছে, কেঁৎ কেঁৎ করে লাথি মার মাজায়—দেখ মাগী ঠিক থাকবেক। তা-লয় হাঁ করে চেয়ে থাকবি তো সে মাগী ঘরে থাকবেক কেনে রে?

...রাত নামে। বৌটা আর ফেরে না।

...শূন্য প্রান্তরে হু হু হাওয়া বইছে। রাতের হাওয়া—তারাগুলো কেমন নিভে আসে। ঝরাপাতা উড়ে আসে বন থেকে। থমথমে নীরবতা। কেউ ফিরল না আর।

…বেজার অনুমান সত্যিই।

পাড়ায় সারা গাঁয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। নোতুন কলবাড়ীর ছোকরা রাজমিস্ত্রী ভূষণ মাহাতো উধাও হয়েছে কাল ভোরেই। সঙ্গে মজুরদের মেটাবার জন্য কিছু টাকা ছিল—সেও নিয়ে গেছে, আর ফাউ হিসেবে নিয়ে গেছে বেঙ্গার ডব্‌কা বৌ-টাকে।

বুড়ী মা খবরটা পেয়েই চীৎকার করতে থাকে, আর সেই সঙ্গে সুরু করে গালাগাল। বেজার উদ্দেশ্যেই। এতদিন আর যাই হোক বুড়ী এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল—দুমুঠো ভালমন্দ খেতে পেয়েছে এবং তা জুটিয়েছিল ওই ডাবিই। আজ তার উধাও হয়ে যাওয়ায় বুড়ী ভাবনায় পড়েছে, খাবার ভাবনা। বাঁচার ভাবনা। তাই বিষিয়ে উঠেছে সারা মন।

চীৎকার করছে—মরদ! সব আমার মরদ রে! ঘরের বৌ আখতে পারিস না, ঘরের লক্ষ্মী বাইরে যায়, ছি আবার মরদ! জুমড়ো কাঠ গুঁজি অমন মরদের মুয়ে।

বেজা চুপ করে সরে আসে।

সকালের রোদ উঠেছে বটগাছের মাথায়—গ্রামের খড়োবাড়ীর চাল ছুঁয়েছে সেই রোদ বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে, হাঁসগুলো পুকুরের জলে জটলা করছে।

তার নোতুন ঘরের দরজাও বসান হয় নি এখনও, কেমন হাঁ হাঁ করছে ওই দরজা-বিহীন আবছা অন্ধকার ঘরখানা; এত আলো ওর মধ্যে ঢোকেনি।

ডাবি পালাল। এ আর এ পাড়ায় এমন নোতুন ঘটনা কিছু নয়। ঘটে। তবে এবার যেন অন্য রকম। এতকাল ওরা বনিবনত হয় নি ছোড় ছাড় করে নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছে অন্য গাঁয়ে গিয়ে। জাত জ্ঞিয়াতের মধ্যেই ঘটেছে নিকে-সাঙ্গার ব্যাপারটা। তাদের সাঙ্গানী সমাজের মধ্যেই রয়ে গেছে তারা।

এবার যেন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ঘটেছে।

নিতে বাউরী তখনও কাযে বের হয় নি। জামবাটিতে করে পান্তা নিয়ে বসেছে—খেয়ে-দেয়ে বেরুবে কাযে।

কথাটা সেও ভাবছিল—বেজাকে দেখে মুখ তুলে চাইল। কেমন যেন মিইয়ে গেছে লোকটা একরাতেই। নিতেও নিজে কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করে, সেদিন বেজাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, এই জগতের সব জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার হাতথেকে নিস্কৃতি পাবার পথটুকু সেইই রোধ করে দাঁড়িয়েছিল কাই-জোড়ের ধারে।

…কোথায় নীরব প্রতিশ্রুতি সে দিয়াছিল বেজাকে —এ সমাজে তার বাস করবার একটু দাবীর জন্য সেও লড়বে। সেই কর্ত্তব্য হয়তো ঠিক পালন করতে পারে নি।

খাবি জগাল? নিতে আমন্ত্রন জানায় তাকে।

মাথা নাড়ে বেজা—না। তামুক টানি বরং।

নিতের ছোট জলবিহীন হুকো নিয়ে কড়া ঝনঝনে দা-কাটা তামাক টানতে থাকে।

কুন খপর পেলি বৌটার? নিতে জিজ্ঞাসা করে।

উহুঁ। মাথা নাড়ে বেজা।

—মারধোর করেছিলি?

—না তো! বেজা জবাব দেয়।

কি ভাবছে নিতাই। দেখেছে এতদিন ডাবিকে। কেমন বেসরম-ইতর। মিষ্টিকেও দেখেছে আগে। আজকের মিষ্টি লোহারকে চেনা যায় না। আর আজকের ডাবি কেমন পথ খুজছিল—ওরা ঘরে থাকেনা। সেই পথ ও পেয়ে গেছে—তাই সরেছে।

বলে ওঠে নিতে—না মারলেও উ যেতো।

তা যাক্ তবু কোথাও সাঙ্গাকরে ঘর বসত করলে পারতো।

তা না, গেল একটা মাতাল বজ্জাত লুকের সাথে, সী তো এঠো পাতা করে চেটে ফেলাবে।

নিতে কি ভাবছে।

সহরে—দুর্গাপুরের হালফিল নোতুন বসতের আশে-পাশে ওদের অনেককেই দেখেছি,যারা একদিন কোন সবুজ গাঁয়ের কোন অজানা ঘরের এমনি বৌ-ঝিই ছিল, তারপর কোন দুর্বার টানে—কোন বিরাট জ্বালেপড়ে ওই পাড়ায় গিয়ে উঠেছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে নর্দমার পোকার মত।

কোথায় একটা বাইরের লোভী হাত এসে পড়েছে তাদের ঘরের মধ্যে, কিছুই নেই তাদের। দিন আনে দিন খায়—না হলে উপোস দেয়। তাদের শেষ সম্বল ওই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে ঘরের এতটুকু আশ্বাস তাও আজ যেন নিঃশেষে বিলীন হতে বসেছে।

বেজা যেন সেই লুণ্ঠনপর্বের ধ্বংসাবশেষ।

কুথাকে চলে যাবো ভাবছি।

বেজা কথাটা বলে অনেক দুঃখে। নিতে বাধা দিয়ে ওঠে।

—যাবি মানে? যে মাটিতে পড়ে নুক ওঠে তাই ধরে।

যাবি মানে? পালাবি ল্যাজ গুটিয়ে খেঁকি কুকুরের মতন!

কথার জবাব দিল না বেজা, নিতের বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে থাকে, ওর চোখমুখে কেমন একটা দৃঢ়তা।

ছোট ছেলে মেয়ে দুটো বাবার পান্তার দিকে চেয়েছিল। নিতে তাদের দিকে বাটিটা ঠেলেদেয়, আধপেটাও বোধ হয় জোটেনি। তবু মুখে কেমন যেন একটা তৃপ্তি, হাত ধুয়ে হুকোটা টানতে থাকে।

...কি যেন দুর্বার তেজ আর জ্বালা ওর মনের অতলে ঠেলে উঠছে। নিতের কথাগুলো ভাবছে বেজা।

দুঃখটাকে নিতে কেমন সইয়ে নিতে পেরেছে—সহজ করতে পেরেছে। না হলে একবেলা খেয়েও এই জোর কোথাথেকে পায়।

মাথাঠুকছে গঙ্গাঠাকরুণ।

আর চীৎকার করছে নারাণ ঠাকুর—অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকার। কদিন পরেই ওরা বুঝতে পেরেছে—বড়রাস্তার ধারে একলপ্তে তিন বিঘে জমি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে আমিনের এক কলমের আঁচড়ে।

এতদিনের সব দাবী—অধিকার থেকে উৎখাত হয়ে গেল।

ছানু দাস সেদিন তেড়ঙ্গা শরীর নিয়ে তুড়িলাফ দিতে থাকে পলাশতলার জমির মাথায়, বাকুড়ির উচু পগার ভেঙ্গে সমান করছে—ধানকলের উঠোন তৈরী হবে। নারাণ ঠাকুর বাধাদিতে যায়।...কিন্তু দলবল দেখে পিছিয়ে আসে।

অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকারে পথচলতি লোকজন জমে যায়—কৌতুহলী জনতা। ছানুদাসই সবিস্তারে বর্ণনা করে হাতপা নেড়ে।

—একবার বামুন কচু খেয়ে,
আবার এলো কোদাল নিয়ে॥

এদ্দিন বন্ধকী ছিল, ছাড়াবার নাম নাই। বাকীকর করে লিয়ে লিইছি হে। ন্যায্য ভাবেই লিয়েছি। দাসরা এমন হরে হম্মে কারুর লেয় না—সে জিনিষে পেস্বাব করি।

হবেও বা! নারাণ ঠাকুর অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করে আকাশের দিকে চেয়ে।...ভাষাহীন অব্যক্ত চীৎকার।

কাঁদে গঙ্গামণি ঠাকরুণ। কিন্তু পানুদাস তখন সদরে, সে এসবের কিছু জানে না বোধ হয়। ফেরবার নামও নাই। শেড এর টিন-কাঠ ইট খোয়া পড়ছে।

.. কয়েকদিনেই সেই সবুজ পলাশতলির বাকুড়ীকে আর চেনা যায় না, ওর সবুজ শস্যদাত্রী বুককে ইটের আবরণে মুড়ে দিয়েছে। শেড উঠেছে—রোদে চোখ ধাঁধানো তারজালা—সবুজের স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেছে।

ঢাক বাজছে।

নিরব আকাশ—বোদাপাড়া তাম্রাভ ডাঙ্গার ওদিকে নীল শালবন ঘেরা শস্যরিক্ত চড়াই—এর মাথায় ঢাক বাজছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে শব্দটা।

...পানু দাস গ্রহশান্তি যোগ করছে মহা আড়ম্বরে।

শুভকায। ব্রাহ্মণভোজন করবার ব্যাপারও রয়েছে। নোতুন কলবাড়ীর প্রতিষ্ঠা উৎসব। সতীশ ভট্টাচার্য জানতো—বাতাসে শূন্যতা থাকেনা, একদিক না হয় অন্যদিক থেকে বাতাস এসে তার শূন্যতাকে পূর্ণ করবে।

সমাজে একশ্রেণী বিলুপ্তপ্রায়, তাদের রসে সমৃদ্ধ হয়ে পরগাছার মত বেঁচেছিল ওই সতীশ ভট্টাচার্য সম্প্রদায়। সেই জমিদাররা উৎখাত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক শ্রেণীর নবজন্ম ঘটেছে।

এই গ্রামেই তা দেখেছে।

তাই পানুদাসকে ফেরাতে পারেনি সতীশ ভট্টাচার্য, এগিয়ে এসেছে তার কাছে। ভবিষ্যতে এদেরই হাতে রাখতে হবে—এটা ও বুঝেছে। নোতুন পট্যবস্ত্র পরে—শিখায় ফুলবেঁধে সতীশ আজ ব্যস্ত। পানু দাসের আশপাশে এসে জুটেছে অবনী মুখুয্যে—হলধর—ইউনিয়ন বোর্ডের ভক্তি চাটুয্যে, মায় হরিনারাণ মুহুরী অবধি।

...নোতুন কলবাড়ীর সিমেণ্ট করা হলঘরের ওদিকে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে, পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণদের আহ্বান করেছে পানু। দিকজোড়া জার্জিমের উপর চন্দ্রভূষণ পাতা আসরে সমবেত হয়েছে তারা। নোতুন

হুঁকোয় তামাক আসছে, বিষ্ণুপুরী বালাখানার তামাক। সৌরভে বাতাস ভরে উঠেছে।

পানুদাসও অবাক হয়েছে—তার যে এত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল চারিদিকে ছড়ানো তা কল্পনাও করেনি। মনেমনে বেশ গৌরব অনুভব করে।

…ওদিকে ভটচায মশায় দুজন তন্ত্র ধারককে নিয়ে সমারোহে মন্ত্রপাঠ করে চলেছে হোমকুণ্ডের সামনে, ঘি পড়ছে—খাঁটি গব্য ঘৃত।

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের নীলাভ শিখা। এর পর আছে শ্মশান কালীর পূজা এবং বলিদান। সব দেবতাকেই সন্তুষ্ট করতে চায় পানুদাস।

…জীর্ণ খোয়াঢাকা রাস্তা এগিয়ে গিয়ে মিশেছে দামোদরের বালিতে, এখনও তার রূপ বদল হয়নি। শাল বন থেকে বের হয়ে এসে ঝড়ঝড়ে বাসটা দাঁড়াল রাস্তার মোড়ে কালী লায়েকের নুইয়ে-পড়া তেলেভাজা ফুলুরির দোকানের সামনে।

ফিরছে অশোক। কদিন হয়ে গেছে গ্রামে নেই। সদর থেকে সেই রাত্রি ভোরে প্রীতিদের বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে কেমন যেন গ্রামে ফিরতে পারেনি। বিশ্রী লাগে এই পরিবেশ, নীলকণ্ঠবাবুর কথাগুলো সারামনে ঝড় তোলে। কি যেন কঠিন একটি কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত ছিল সেখানে, প্রীতির সঙ্গে অশোকের ওই ঘনিষ্ঠতাকেও ভাল চোখে দেখেন নি তিনি।

অশোক ওখান থেকে চলে গেছল দিনকতক পাটনায় বাবার ওখানে।

…তবু না ফিরে পারেনি আবার।

কদিন পরই মন উতরোল হয়ে ওঠে। কি এক কঠিন দায়িত্বকে এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে সে ভীরু কাপুরুষের মত।

ওদের মুখগুলো মনে পড়ে—সেই অবহেলিত কত মুখ—নীরব গ্রাম, ছায়াঘন পথ, লাল কাঁকুরে ডাঙ্গার মাঝে দাঁড়ানো সেই ঝাঁকড়া কেদ গাছটা—আরও কত ছবি। কি যেন দুর্বার আকর্ষণে টানে তাকে বারবার।

…বাসটা কোন রকমে ধুকতে ধুকতে এসে দাঁড়াল চারা বটগাছের নীচে। যেমন জীর্ণ রাস্তা, তেমনি দিনান্তে দুখানা বাস যাত্রীদলকে নিয়ে গিয়ে দামোদরের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির এ ধারে ছেড়ে দেয়, ওপারে দূরে দেখা যায় ধাবমান দু'একটা রেলগাড়ি, বার্ণ কোম্পানীর পরিত্যক্ত চিনকুঠির চিমনী—আর মামড়ার শালজঙ্গল। কেমন ম্লান অপরাহ্ণে কোথায় সব হারিয়ে গেছে সব মানুষ। জেগে আছে কোন মূক ধরিত্রী।

আজ সেখানে জনসমাগম ঘটেছে—যন্ত্রপাতি নেমেছে নদীর বুকে। পিলার বসছে। কাটা হচ্ছে শালজঙ্গল।

…এখানেও তার সূচনা সুরু হয়েছে।

…বাসটা থেকে নেমে দাঁড়াল অশোক। গ্রামের রাস্তার উপর লোকজনের ভিড় দেখে একটু অবাক হয়। ঢাক বাজছে ওপাশে, ঝকঝক করছে পানুদাসের টিনের শেড। ফুল-আম্রপল্লব, রঙ্গীণ কাগজের পতাকা দিয়ে সাজানো।

…শ্মশান কালীর বলিদান হচ্ছে রাস্তার ধারেই, ভিড় জমছে সেখানেও। সতীশ ভটচায ছাগলটাকে হাড়িকাঠে পুরেছে। চীৎকার করছে সে—অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকার।

পানুদাস হাত যোড় করে চোখবুজে পরম ভক্তের মত চীৎকার করছে—মা। মাগো।

…ধূপ-ধুনো আর ঢাক-ঢোলের শব্দে—ওই রক্ত উপচারে জাগ্রত শ্মশান কালীকে পূজো দিচ্ছে প্রাণবল্লব দাস নোতুন কলমালিক।

ছাগলের আর্তকান্নার শব্দ ডুবে গেছে ওদের কলরব আর জয়ধ্বনিতে।

হঠাৎ কিসের চীৎকার কানে যেতে অশোক ফিরে চাইল। চীৎকার করছে আকাশের দিকে হাত তুলে নারাণ ঠাকুর। বোকা ছাগলটাকে ওরা হাড়িকাঠে পুরে স্তব্ধ করে দিয়েছে চিরতরে।—ঢাক বাজিয়ে কলবাড়ির দিকে ফিরে চলেছে পানুদাস রক্ততিলক পরে বিজয় গৌরবে শ্মশানকালীর পূজো সেরে;

তখনও চীৎকার করছে—নীরব অভিযোগ জানাচ্ছে নারায়ণ ঠাকুর আসমানের দিকে। তার পলাশতলীর বাকুড়ি গেছে—লুঠ করে নিয়েছে শক্তিমান ওই পানুদাস।

…অশোককে দেখে এগিয়ে আসে নারাণ। অব্যক্ত কান্নায় ফেটে পড়ে।

কি জবাব দেবে অশোক।

··ভিড়ের মধ্যে বের হয়ে আসে নিতে বাউরী। প্রণাম করে।—ফিরে এলে ছুটবাবু।

এমোকালীও ভিড়ের মধ্যে থেকে এসে ওর হাতের ব্যাগটা তুলে নেয়।

—না এসো যাবে কোথায় বল!

এমোকালী বলে ওঠে—তা জানি ছুটবাবু।

···গোকুল বাস থেকে নেমেছিল আগেই। পরণে ছেঁড়া মলিন কাপড়—একটা হাফসার্ট। পায়ে জুতো নেই। কেমন শ্রীহীন উস্কোখুস্কো চেহারা। তাকে বলে ওঠে অশোক।

—চল রে।

···গোকুল কি ভাবছে। এদিকে গ্রামের খড়োবাড়ীর মাঝ দিয়ে বালিঢাকা পথটা চলে গেছে ওই পুরোনো বাড়ীগুলোর দিকে, মাথা তুলে আছে দূরে বাবুদের পলেস্তারা খসা বাড়ীগুলো—কেমন স্তব্ধ নিঝ্ঝুম।

···ওদিকে রোদে মুক্ত প্রান্তরের উপর ঝকঝক করছে পাসুদাসের নোতুন শেডটা। ঢাক বাজছে—কলরব। বাতাসে কেমন ঘি-এর মিষ্টি গন্ধ।

···সদর থেকে থানকয়েক ঝকঝকে গাড়ী ধুলো উড়িয়ে এসে কলবাড়ীর সামনে দাঁড়াল—অশোক চেয়ে থাকে।

প্রশান্তবাবু—মিঃ রাঠী নামছে গাড়ী থেকে, আরও কারা সব।

একটু অবাক হয় তারা।

গোকুলও কেমন যেন অন্যমনস্কের মত ওই কলবাড়ীর দিকেই চলছে। তাকে আর ডাকল না অশোক।

—ছুটবাবু। চলুন গো।

কালীর ডাকে ওর দিকে চাইল। স্তব্ধ গ্রামখানা কেমন একটা কঠিন প্রতিদ্বন্দীর সামনে দাঁড়িয়েছে। নারাণ ঠাকুরকে কিই বা বলবে আর।

কালীর সঙ্গে অশোক গ্রামের দিকে এগিয়ে চলে।

দুপুরের রোদে যেন বৃদ্ধ স্থবিরের মত জীর্ণ গ্রামখানা অন্তহীন জপ-মালার সুমেরুর দিকে এগিয়ে চলেছে—জপের পরিক্রমা শেষ করবার দুর্বার প্রচেষ্টায়।

কামারপাড়ার লোকরা ওপথে এসে দাঁড়িয়েছে—ওরা যেন অধীর আগ্রহে অশোকেরই পথ চেয়ে ছিল।

পথ চেয়েছিল আর একজনও।

···স্নানকরে ঘরের দিকে ফিরছিল কদম—হঠাৎ কাকে দেখে পথের ধারে ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল।

···কাছে আসতেই চমকে ওঠে—ছুটবাবু!

···চকিতের মধ্যে কেমন কলসীর জল আর সারা মন একসুরের মিষ্টি অনুরণনে চল্‌কে ওঠে কদমের, নিজের মনের অবাধ খুশী যেন চাপতে পারেনি—দুচোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে।

কেমন ভাল লাগে তার।

—হ্যাঁ! ভালো তো?

কোন জবাব দিল না কদম। সরে গেল বাড়ীর দিকে। তবু মনের খুশী যেন কলসীর কাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে।

তারকবাবুর বড় জনহীন বাড়ীর পাশ দিয়ে আবছা আলো-আঁধারির ঢাকা পথে ফিরছে অশোক—বাতাসে কোথায় গোলকচাঁপা ফুলের উদগ্র সুবাস—মাটির গন্ধে মিশে আরও মনোরম হয়ে উঠেছে।

অনেকদিন পর অশোক ফিরছে গ্রামে—কেমন ভালো লাগে।

দিঘীর ধারে থেকে পুরোনো বাড়ীখানা দেখা যায়—কয়েকদিনেই অনেক ঠাই ঘুরছে সে। লক্ষ্যভ্রষ্টের মত ঠিকানাবিহীন ভাবে। আজ আবার নিজের স্থানেই ফিরে এসেছে। তাই বোধ হয় মন আবার সেই যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে কাযের কথা ভেবেছে—দুচোখমেলে চেয়ে দেখেছে এখানের সবকিছু। শুধু মাটি—ওই সবুজ দিগন্ত শস্যরিক্ত প্রান্তরই নয়—এখানের মানুষের, তাদের সুখদুঃখ হাসি-কান্না সব কিছুই দেখেছে।

···গঙ্গামণি ঠাকরুণের চীৎকার কানে আসে—সব হারিয়ে গেল তার, দেখেছে বেজা বাউরীকে—নিতেকে—ওদের মনের অতলে গুমরে ওঠে অসহায় জ্বালা; বিজয় গর্বে উন্মত্ত পাসুদাসের সগৌরব ঘোষণা আর সতীশ ভট্‌চাযের শুধু বাঁচবার জন্যই এই প্রবল আকুতি—এত অতৃপ্তি আর জ্বালাময় এই গ্রামসীমাতে কদম-বৌ-এর ওই একটি অস্তিত্ব—সবকিছু মিলিয়ে আবার অশোক নিজের হারানো দিনগুলো নানা স্মৃতির রং এ জালবুনে ভরাট করে।

···বাড়ীটার কাছে এসে মনে হয় সে যেন অনেক বড়; অনেকদিন বাইরে থেকে—মনটা তেমনি হয়ে উঠেছে।

এইটুকু দূরের পরিবেশে তাকে যেন ধরে রাখা যাবে না, ঠেসেঠুসে চেপে ধরবে তাকে, কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়ে ওই-টুকুর মধ্যেই আবার খাপখাইয়ে নেয়—ছোট বাড়ীটা ক্রমশঃ বৃহৎ হয়ে ওঠে—তারই মাঝে সেই উধাও ডানা-মেলা মন আবার নিজের ঠাঁই খুঁজে পায়।

…ছানুদাস ও দাদার বাহন হিসাবে বেশ একটু বদলেছে, সেই নেহাৎ মেঠো ভাবটা আর নেই, পঞ্চাশ ইঞ্চি ধোয়া ধুতি পরে আজ এই কাযের দিনে ভদ্রলোক হয়েছে—অবশ্য জুতো পায়ে দিতে পারে নি ; ফোস্কা পড়ে যাবে—তাই একটা হাতখানেক মাপের চটি পায়ে দিয়ে এসে হাঁকডাক করছে ছোট ঝুপড়িটার সামনে।

…অবা—এই অবা!…

হাঁক ডাকে ডোমপাড়ার আরও দুচারজন এসে জোটে।

—ছানুবাবু।

ছানু নোতুন ওই ডাকে একটু খুশীই হয়।

উৎসবের জের চলেছে এখনও—সদর থেকে বাবুরা অনেকেই এসেছেন। দুর্গাপুর থেকেও এসেছে কারা জিপে করে। বড় জাল ফেলেছে ছানু দাস। একবার গুটিয়ে তুলতে পারলে হয়। তাদের আপ্যায়নের জন্যই ছানু এসেছে অবিনাশকে ডাকতে।

একটু গানবাজনা হবে। বাবুরাও কেউ কেউ গাইতে পারে—তাদের গান গাইবার মত মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি করেছে পানু।

ছানু তাই এসেছে অবিনাশের কাছে।

অবিনাশ চুপ করে বসেছিল। কেমন যেন একলা বোধ হয়—কদিন সহরে বাজিয়ে এসেছে ; কলকাতায়ও নামডাক হয়েছে তার গুণী মহলে, পয়সাও দেয় তারা।

· রেডিওতে বাজাবার সুযোগও পেয়েছে।…আরও শিখেছে—রেওয়াজ করছে অবিনাশ।

…শুনেছে বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের সানাই। কত লোকজন সমারোহ—কি এক আলোকময় বিচিত্র একটি জগৎ, তারই মাঝে সুরটা উঠছে। শুদ্ধ রাগিণীর বিশুদ্ধ স্বরগ্রাম—তানকর্তব, তোড়া-গৎ।

·· অবিনাশের মন ভরে উঠেছে। বিষ্ণুপুরের ঘরাণার সঙ্গে দীর্ঘ দিন পরিচিত হয়েছে সে, রেওয়াজ করেছে। ওটা তার খানিকটা আসে। কিন্তু শুদ্ধ রাগরাগিণীর বিলম্বিত—মধ্যলয় থেকে আলাপ, তারপরে তানকর্তব-তোড়া সব কিছু যে এমনি খেয়াল ঠাটেই নিবদ্ধ করা যায় ঠিক ভাবেনি।

…বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের সানাই বেশ কয়েকবার শুনেছে। নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।…যেচে গিয়ে শোনায় খাঁ সাহেবকে তার বাঁশী। কেমন যেন সেই স্মৃতিটা ভুলতে পারে না।

কোন ছোট্ট নদী গিয়ে উন্মাদ কলরবে সমুদ্রে মিশেছে—কল কল খল খল ওঠে বাতাসে তার আনন্দ-ধ্বনি। মুক্তির—সার্থকতার আস্বাদ। তেমনি উতরোল হয়ে উঠেছিল সেই রাত্রে অবিনাশের সারা মন।

…সেও যেন নির্ভর খুঁজে পায়। পেয়েছে নিবিড় সাধনা করার অদ্বয় অমিতশক্তি। গ্রাম সবুজে আবার ফিরে এসেছে নোতুন একটি মানুষ। তন্ময় হয়ে ডুবে গেছে তার সাধনার মধ্যে। ওই আকাশ বাতাস রৌদ্রছায়া-ভরা উদাস বৈকালের দিগন্তে বিলীন কোন দিনান্তের মূলতানের সুর বেজে ওঠে তার বাঁশীতে।

বেণুবন কাঁপে—দূরে বাজে কোন রাখালিয়া বাঁশী—গরুর গাড়ী চলে পথ দিয়ে। অথণ্ড জীবনের একটি স্তব্ধ-মহামুহূর্ত। ওর সুর সেই জীবনকে চিহ্নিত করেছে প্রহরে প্রহরে।

—এ্যাই অবা। ব্যাটা কানে কি তুলো দিইছিস? বলি কথা যে কানেই যেছে না? অ্যাঁ।

অবিনাশ বিরক্ত হয়ে বাঁশী থামিয়ে বাইরে এল। বিনীতকণ্ঠেই বলে—ডাকছেন!

ছানু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাটা ডোম কলকাতা চিনেছে।

কথার জবাব দিল না অবিনাশ। বিরক্ত হয়ে মুখ তুলে চাইল মাত্র। আদিম বন্য রক্ত যেন চনমন করে ওঠে ওই গালাগাল আর কথাবার্তায়।

—একবার চল দিকি, সানাই বাজাতে হবে কল-বাড়িতে।

—স্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে জবাব দেয় অবিনাশ—যেতে পারবো না এখন?

—কেনে হে? টাকা দিব। দশ টাকা। আগাম—

পকেট থেকে একখানা নোট বের করে এগিয়ে দেয়। অবিনাশ কথা বলে না, কেমন বিশ্রী লাগে লোকটাকে। শুনেছে—দেখেছে ওখানে সমবেত ওদের। কলকাতার বাবুদেরও দেখেছে—দেখেছে সেখানের শ্রোতা-সমাজকে। এরা পাড়াগেঁয়ে মফঃস্বল সহর থেকে এসে যেন পাড়াগাঁকে ক্ষণিকের জন্য স্বীকৃতি দিয়ে ধন্য করেছে। মন বিষিয়ে ওঠে তার।

—যাবো না বলে দিইছি ছানুবাবু।

—যাবি না তালে? ছানু গর্জে ওঠে। ঘোষণা করে ওঠে—ঘাড় ধরে নিয়ে যেতে পারি জানিস ব্যাটা ডোম।

কৌতুহলী জনতা অনেকেই জমে যায়। অবিনাশ কিন্তু অচল অটল স্থির।

ছানু ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে ওই ঘোষণাটা কাযে পরিণত করতে সাহস করে না। পা পা করে পিছিয়ে যায়।

স্থির নির্বাক অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত!

—আচ্ছা!

ছানু যাবার সময় শাসিয়ে যেতে ভোলে না।

তখনও নির্বাক অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মত।

[ক্রমশঃ

মন ও শিক্ষা

অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাসমূহ আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের পত্তন করিয়াছে। শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি প্রধান কথা হইতেছে যে—যাহাকে শিক্ষা দিব, তাহার 'মন'টি জানিতে হইবে। সেই জন্য আধুনিক মনোবিদ্যা মন সম্বন্ধে যে বিভিন্ন তথ্যাদি উদ্ঘাটন করিয়াছে, সেই সব আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যাহাতে শিক্ষা-কার্য অব্যাহত ও সাবলীলভাবে ছাত্রমানসে ক্রিয়াশীল হইতে পারে।

শিক্ষার মূল কথা হইল ভিতরের শক্তি সমূহকে বাহিরে প্রকাশ করা। অন্তরবাসীকে প্রকাশ্যে প্রস্ফুটিত করা। স্বামী বিবেকানন্দ একথা আরো গভীরভাবে বলিয়াছেন। শিক্ষার মাধ্যমে বাহিরে যে পরিস্ফুটন হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই অন্তরে রহিয়াছে। সেই পূর্ণ রূপটিকে বাহিরে প্রকাশ করাই শিক্ষার কাজ। অপরপক্ষে, মনোবিদ্যার কাজ হইল মন সংক্রান্ত সমস্ত কিছুর আলোচনা। মনের বৃত্তিসমূহের সম্যক জ্ঞান। মনের প্রত্যেকটি বৃত্তির স্বরূপ ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় মনোবিদ্যার পৃষ্ঠাসমূহে।

এখন, শিক্ষার কাজ যদি হয় মনের শক্তিসমূহের বিকশে সাধন করা, আর মনোবিদ্যার কাজ হয় মনের সেই শক্তিসমূহের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, তাহা হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, মনোবিদ্যার প্রাথমিক সাহায্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যে শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন চাহিতেছি, তাহাদের স্বরূপ ও ক্রিয়াকলাশ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু জানা আবশ্যক। শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হওয়া চাই।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। বংশগতি বা Heredityর কথা ধরা যাউক। ছাত্রের বংশগতি যদি আমাদের জানা থাকে, তাহা হইলে তাহার শিক্ষার বনিয়াদ সম্বন্ধে আমাদের কিছু সম্বল হয়। আর সেই অনুযায়ী আমরা অগ্রসর হইতে পারি। যদি একজনের বংশগতি উত্তম হয়, শিক্ষারম্ভে সেই তথ্যটি একটি প্রয়োজনীয় সূত্র হয়। আবার যদি জানা যায় যে বংশগতি আশানুরূপ নয়, তাহার শিক্ষায় সেটিও একটি অতিরিক্ত ইঙ্গিত হইয়া থাকে। বংশগতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি আমরা মনোবিদ্যা হইতে পাইতে পারি। তেমনি পরিবেশ প্রসঙ্গ বা Environm:nt। শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। পরিবেশের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ—পিতামাতা, পরিবার, গৃহ, সমাজ, স্কুল, সঙ্গী, জাতি, শ্রেণী ইত্যাদি—কীভাবে মনের উপর ক্রিয়া

করিতেছে, তাহার সন্ধান এই মনোবিদ্যার মধ্যেই রহিয়াছে!

বুদ্ধিবৃত্তি বা Intelligence শিক্ষার একটি বড় কথা। ছাত্রের বুদ্ধির পরিমাণ কত, তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ছাত্র যদি কমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহার অন্য ব্যবস্থা চাই। বুদ্ধির এই পরিমাপ নির্ণয়ে আমাদের মনোবিদ্যার আধুনিক পরীক্ষাপদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তিই একমাত্র কথা নয়। ছাত্রের বিশেষ বৃত্তি বা শক্তি বা Special Ability ও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কারিগরি কাজের জন্য বিশেষ বৃত্তি দরকার। সঙ্গীতের একটি বিশেষ বৃত্তি আছে। অঙ্কন বিদ্যায় একটি বিশেষ বৃত্তি থাকা প্রয়োজন। কাহার মধ্যে কী বিশেষ বৃত্তি আছে, শিক্ষাক্রম নির্ধারণে সেই প্রারম্ভিক তথ্যটি জানা প্রয়োজন। বৃত্তিটি জানা না থাকিলে সেই বিদ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া পণ্ডশ্রম হইবে। কাহার মধ্যে কী বিশেষ বৃত্তি কত পরিমাণে আছে, তাহা আমরা মনোবিদ্যার পরীক্ষা প্রয়োগে জানিতে পারি।

তেমনি সাধারণ মানসের বা Personality র কথা। শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রের মানসপ্রকৃতি সম্বন্ধেও আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। যে ছাত্র রক্ত দেখিলে ভয় পায়, তাহার তো ডাক্তারি পড়া চলে না। যে লাজুক প্রকৃতির, সে সেল্‌স্‌ম্যান্‌ হইতে পারিবে না। যাহার মানস-প্রকৃতিতে ভয়-উদ্বেগ বেশী, প্রচলিত পরীক্ষাসমূহে তাহার সম্যক সাফল্য লাভ কঠিন হয়। মনোবিদ্যার বিভিন্ন টেষ্ট্‌ প্রয়োগ করিয়া ছাত্রের মানসপ্রকৃতির গুণাগুণ সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে আমরা একটি ধারণা লাভ করিতে পারি।

শিক্ষায় বিদ্যাভ্যাস বা Learning একটি আসল ব্যাপার। সার্থক বিদ্যাভ্যাসের জন্য কী কী আনুষঙ্গিক পন্থা আছে, সে সবের ইঙ্গিত আমরা মনোবিদ্যার আলোচনাতেই পাইয়া থাকি। এই সব সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্রও মনোবিদ্যার পরীক্ষানিরীক্ষায় নির্ণীত হইয়া রহিয়াছে। সেই সব সূত্রগুলি স্মরণে রাখিলে শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় যে বিদ্যাভ্যাস, তাহা সহজ ও আনন্দ-দায়ক হইয়া উঠে।

শিক্ষায় একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হইল পরীক্ষাগ্রহণ বা মূল্যায়ন বা Evaluation। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি কোথায় তাহা মনোবিদ্যা আমাদের বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিয়াছে। প্রচলিত প্রশ্নপত্র রচনা ও উত্তরপত্র পরীক্ষান্তে নম্বর দেওয়ার মধ্যে ছাত্রের জ্ঞানের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঠিক ঠিক হইতেছে কিনা সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। মনোবিদ্যার সাহায্যে এমন একটি পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন হইয়াছে, যাহার মধ্যে প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটিসমূহ অনেকাংশে অপসারিত হইবে।

ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বা Discipline কার্যকরী করার ব্যাপারেও মনোবিদ্যার সহায়তা রহিয়াছে। বিশৃঙ্খলা আসে বেশীর ভাগ সেই ছাত্রদের কাছ হইতে—যাহাদের বয়ঃসন্ধি চলিতেছে। মনোবিদ্যাই আমাদের জানাইয়া দেয় বয়ঃসন্ধি ছাত্রদের মধ্যে কী কী তাগিদ ও সমস্যা সৃষ্টি করে এবং কী ভাবে সে সবের সমাধান করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারে তাই মনোবিদ্যার সহায়তা রহিয়াছে।

ছাত্রদের মধ্যে আবার কিছু থাকে যাহাদের বলা যায় সমস্যাশিশু বা Problen Children। যাহারা অল্পবুদ্ধি, যাহারা লেখা পড়ায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে, যাহারা স্কুল পালায়, যাহারা অবাধ্য বা দুরন্ত, যাহারা মিথ্যা কথা বলে বা চুরি করে—এ সবাইকে সমস্যাশিশু বলা যায়। বলা বাহুল্য ইহারা কেহই বাহিরের লোক নয় এবং শিক্ষালয়কে ইহাদের লইয়াও চলিতে হইবে, ইহাদের বাদ দিয়া নহে। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী যে শাস্ত্র, সে শাস্ত্রটিও মনোবিদ্যা। তাই শিক্ষার এই দিকেও মনোবিদ্যার সাহায্য চাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত মতবাদ ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহার শেষ মূল্যায়ন হইবে মনের কষ্টি-পাথরে। অর্থাৎ মতবাদ বা পদ্ধতিগুলি মনের সাধারণ মানসসূত্রগুলি কতখানি মানিয়া চলিয়াছে বা কতখানি পরিপন্থী, তাহার বিশ্লেষণ। শিক্ষার সহিত মনের এই সংযোগ আজ বিভিন্ন-মুখী। 'মনটিকে আজ শিক্ষার কেন্দ্রভূমি করিতে হইবে। সেইজন্যই শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠক্রমে, শিক্ষক শিক্ষণে, মনোবিদ্যা আজ প্রধান বিষয় হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক ও যথার্থ। কারন মনের দিগন্ত উন্মীলনের মধ্যেই শিক্ষার অনন্ত সম্ভাবনা।

একটি রাত্রি, একটি মানুষ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুযুগের ওপার হতে হাতছানি দিচ্ছে একটি নিকষকৃষ্ণ রাত্রির বিরল ছবি, শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্রবেলায় চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা। সেদিন ইতিহাস উল্টেযাওয়ার দিন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পড়েছে ভেঙে, সমাজ চেতনা হয়েছে ক্ষীণ, রাজা নেই, রাজকর্মচারী নেই, অন্ন নেই, আশ্রয় নেই, অরাজকতার বিভীষিকা, আইন পুলিশ ত দূরের কথা। দুর্দণ্ড চণ্ড বেগে প্রচণ্ড দর্পে এগিয়ে আসছে শত্রুর দল। স্বামী ছেড়ে গেছে স্ত্রীকে ফেলে, ভাই দেয়না ভাইকে আশ্রয়, রাস্তায় মায়েরা কাঁদে, শিশুরা ভেসে বেড়ায়। হাসপাতালে রোগীকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে ডাক্তার নার্সের দল। বন্দীরা জেল ভেঙে বেরিয়েছে। উন্মাদেরা দিশাহারা ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। আছে কুকুর শিয়াল শিবা শকুনেরা আর নরমাংসলোভী নারীমাংস গৃধ্নু শ্বাপদ মানুষের দল তাদের করাল দ্রংষ্টা ব্যাদন করে। অত্যাচার অনাচার অবিচারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎঝঞ্ঝাঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে বজ্র শাসনে মৃত্যুবাহন "ফোর হর্সমেন অফ্ দি এপোক্যালিপ্স" (Four horsemen of the Apocalypse,)

১৯৪২ সালের মার্চ মাস, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুণ সহর। মেদিনী করেছেন রথচক্র গ্রাস। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অক্ষ বেয়ে মদায়ত্ত পৌরুষের ছেঁড়া স্বপ্ন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ভবনে ভবনে রব উঠেছে— পালাও, পালাও। দুর্গমগিরি কান্তার মরু পার হয়ে— চল্‌রে, চল্‌। বীরের বেশে কদম্‌ কদম্‌ পা বাড়িয়ে নয়, কেঁদে ককিয়ে জীবনে হতাশ্বাস হয়ে অর্থসামর্থ্য হারিয়ে। এতো পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আসা তলোয়ার হাতে রাজার ছেলের রঙীণ রূপকথা নয়, সওদাগর পুত্রের মনবন বিহারিণী, কমলে কামিনীও এখানে নেই, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীদের প্রেমের গল্প ফাঁদতেও বসিনি।

সহরের বাহিরে কোকাইন্ লেকের শান্ত জলের ধারে আমার বাসা। আকাশে বিদ্যুৎগর্জনের মত উড়োজাহাজের গতিবিধি ও নিকটবর্তী বড় রাস্তায় মিংলাডন্ বিমান-ঘাঁটিতে যাতায়াতরত লরীর শব্দ ছাড়া সেই ভূখণ্ডে একটা অখণ্ড শান্তির পরিবেশ ছিল। শুধু যখন 'এয়ার রেড' হতো, তখন মাটির অভ্যন্তরে গুহায়িত গহ্বরেষ্ঠ হয়ে ব্যোমবিহারী রণদেবতাদের হুঙ্কার শুনে জীবনের নিত্যতার ঐকান্তিক মর্মান্তিক বৈদান্তিক রূপে দেখতাম আর বিদেশে বিভূঁয়ে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটি এই বুঝি খাঁচা ছাড়া হয় তারই বিভোর স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতুম।

আকাশে তখনো ভরা ভোরের প্রসন্নতার আমেজ লেগে। একটা নতুন দিন জাগছে, মাথায় তার আলোর শিরোপা। গলায় গান এসে গেলো—অন্ধজনে দেহ আলো। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য দেব তাঁর অরুণ রথে রাজ্য ভাঙাগড়া তুচ্ছ করে জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া তুচ্ছ করে তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক পরিক্রমায় বেরিয়েছেন।

ওরে মন খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে

চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসেছি আমি ও আমার বন্ধু সন্তোষ দাস। হাওয়াই আফিসের বড় পাণ্ডাদের একজন। যুদ্ধের সময় এই সব আবহাওয়াবিৎ বিলেত-ফেরত বিশেষজ্ঞদের কদর বেশী। চীনা সমুদ্রে টাইফুন উঠলে উড়োজাহাজ কি রকম ধাক্কা খাবে, বারি ঝরবে ঝরঝর কোথায়, তার অলিখিত গণনা অঙ্ক কষে বার করবে কে, সুন্দরী ধরিত্রীর আণবিক যৌবন হৃদয়ের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে কোথায় দোলা দেবে তাকে দুবাহু বাড়ায়ে—সিস্‌মোগ্রাফে ধরবার তোড়-জোর করবে কারা। হঠাৎ একটা জীপ এসে থামলো—বেরিয়ে এলো আমারি

সহকারী একটি ইঙ্গ-ব্রহ্ম তরুণ, বললে—স্যার, এইমাত্র রেঙ্গুন এভাকুয়েশনের হুকুম হয়েছে, সমস্ত অসামরিক লোককে পালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাথায় বজ্রাঘাত হলো, যদিও অবস্থাটী আয়ত্তের বাইরে যাচ্চে জানা ছিল। হয়তো অবচেতনে আশা ছিল যে, যদি হোমরা-চোমরাদের ধরে বিশুদ্ধ তৈলাদিমর্দনে সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায় শেষ মূহূর্তে প্লেনে বা জাহাজে পালিয়ে যাবার। দাশ সাহেব কিন্তু নির্বিকার, বললেন্—অতো ঘাবড়াচ্ছো কেন বন্ধু, যেতে ত হবেই, ব্যবস্থা করছি সব, আজ রাত্রিশেষেই দেব লম্বা—এখন নয়, রাস্তায় পিঁপড়ের মত লোক চলেছে—এগুতেই পারব না, তাছাড়া দুখানা গাড়ী রয়েছে, পেট্রোল রয়েছে, কিছু আয়রণ রেশন অর্থাৎ শুকনো মেওয়া, বিস্কুট মাখম ইত্যাদি তারপর—

আমি যোগ করে দিলাম—তারপর—

ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে
মরণং গোমতীতীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি

একটা দিক দিয়ে আমরা কিন্তু ঝাড়া হাত পা, নিশ্চিন্ত—সুবিধে এই যে কণ্ঠলগ্নারা কেউ নেই। সৎলোকদের ছেড়ে সতীরা ছেলে মেয়েদের নিয়ে পূর্ব্বেই পগার পার হয়েছেন। কানে কানে বলবার সময়ও হয়নি—সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ। বেশ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণেক তিষ্ঠ যাবৎ মধু পিবাম্যহম্—বন্দরের কাল কিন্তু পূর্ণ—মহাকাল ভয়াল বেগে আস্ছেন—এখন শুধু অযাত্রাতে নৌকা ভাসানো।

মৃত্যু যেদিন বলবে জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি—

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লক্ষ লক্ষ লোক স্ত্রী-পুরুষ শিশু, অন্ধ বৃদ্ধ খঞ্জ ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে, শুধু জাহাজে প্লেনে নয়—দশটাকার টিকিট হাজার টাকা মুনাফা দিয়ে কিনে যারা পালাতে পারে তারা নয়—আরাকান ইয়োমার দুর্গম পথ দিয়ে, আকিয়াবের কূলে কূলে ফুটো নৌকা সাম্পানে চড়ে, ইরাবতী পেরিয়ে চিণ্ডউইন পার হয়ে টামু প্যালেল মণিপুরের অরণ্য বন্দন মর্মর পথ বেয়ে—ভামো মিচিনাফে পিছনে ফেলে, নাগা পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিরে আসামের বনেজঙ্গলে চলেছে কারা উদ্বাস্তু হয়ে, কোন শরণার্থী আশ্রয়প্রার্থী।

মনে পড়ছে যেদিন প্রথম ব্রহ্মদেশে আসি। রেঙ্গুন নদী বেয়ে আসতে আসতে চোখে পড়েছিল অধঃমূল ঊর্দ্ধশাখ দেবতাত্মা একটি মন্দিরের স্বর্ণাভ চূড়া, পড়ন্ত রোদের অরুণ কিরণে হিরণ্ময়। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারার অজ্ঞাত-নামা পথিক আকাশের দিকে চেয়ে শিউরে উঠে বলে-ছিল—আকাশে ওটা কি গড়ে তুলেছে—সেটা ছিল ভয়ের, কিন্তু আমার মনে ছিল সম্ভ্রমের জিজ্ঞাসা চিহ্ন। বন্ধুরা বললেন—রেঙ্গুনের বিখ্যাত শোয়ে ডাগন্। মনে পড়ে গেলো Scott O'Connorএর The Silken East। লোকে বলে তথাগতের মাথার চুল প্রোথিত আছে এখানে—ভারত থেকে যা এনেছিলেন তাপস ও পালিক নামে দুই সওদাগর। ভগবান বুদ্ধ নাকি নির্দেশ দিয়ে-ছিলেন যে সুবর্ণ ভূমিতে ত্রিঙ্গুত্তর পর্বতে এই স্মৃতিচিহ্নকে রক্ষা করতে। কোথায় সেই পুণ্যপর্বত খুঁজেই পান না এই দুইজন ভক্ত। শেষ পর্য্যন্ত প্রবীণ 'সুলে' নাটই (বিদেহী আত্মা) পথ পরিচায়ক হন। অশোক প্রেরিত শোণ ও উত্তর এইখানে সাধনা করেন। আর এক যে ছিল রাজার মেয়ে, নাম তার শিন্ শ বু। মহারাজ রাজ-দয়িতের কন্যা—রাজ্য পরিচালনা করেছেন নিজের জোরে, রাজ্য ছেড়ে দিয়ে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন তাও স্বেচ্ছায় এই বৌদ্ধ বিহারেই। পরিণত বয়সে যেদিন তাঁর পরিনির্বাণের দিন এলো, সেদিন তিনি অনুচরদের ডেকে বলেছিলেন—আজ আর আমাকে ঘরের ভিতর রেখো না—আমায় বাইরের আকাশের নীচে শুইয়ে দাও—মহাশূন্যের নীচে। ত্রিশরণের মন্ত্র ভেসে এলো, বিনয়ের ছন্দ, অভিধর্মের অনুশাসন, দুঃখ, অনিত্য, অনর্থ—শরণ লও, শরণ লও, বুদ্ধে যো খলিতো দোষো,—বুদ্ধো খমতু তং মম। যাবার বেলায় পিছু ডাকে—মনে পড়ছে বৎসরের প্রথমেই জল-খেলার সমারোহ, নববর্ষের আবাহন বা থিন্ জান্। দেবরাজ ত্যাগামিনের আসন টলেছে—তিনি আসছেন। তিনদিন ধরে আবালবৃদ্ধবনিতা জল ছুড়ে জলে ভিজে আনন্দের হিল্লোলে ডুব দেবে। বৈশাখী পূর্ণিমায় আসবে "কাসোন" উৎসব। লুঙ্গী গেঞ্জিপরা নিখুঁত তানাথা মাখা ব্রহ্ম সুন্দরীর দল ফুল হাতে দীপ হাতে জলের কলস কাঁকে চলেছে 'ফয়ায়' বা প্যাগোডায়। তরঙ্গায়িত জীবনের সব দুঃখ নিবেদন করে দিয়ে আসবে সেইখানে। তারপরে

আসবে ত্রৈমাসিক ব্রত আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা 'ওয়াজো'। ভিক্ষু সঙ্ঘকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে যে এই বর্ষার দিনেই তথাগত নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা সংযত হবে—বিনয় ও অভিধর্মের মূলসূত্র অনুসারে জীবনযাপন করবে ধ্যানে ধারণায় উপাসনায়। ত্রৈমাসিক ব্রত শেষ হবে কার্তিকী পূর্ণিমায়—থাডিন্ জুটে। বুদ্ধ সন্দর্শনে যাবেন দেবতারা—তাদের পথ আলোকিত করতে নগর প্রান্তর পল্লী পরবে আলোকমালা। এ ছাড়া আছে ফুঙ্গীরিয়ান্—অর্থাৎ যদি কোন সুপ্রসিদ্ধ ফুঙ্গী মারা যান তাঁর শবদেহে, অগ্নিসংস্কার 'দেহদেহান্তর প্রাপ্তি নব নব মহোৎসবে' পরিণত হয়। 'পোয়ে' নাচের কথা বলিনি—তার ছন্দ, সুষমা, লালিত্য এক সুকুমারশিল্পের স্বপ্নরাজ্য। ১৮২৬ সালে শুনি কলকাতার তখনকার বিখ্যাত ধনী গোপী-মোহন দেবের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে ৮জন সুন্দরী নর্তকী এসেছিল ব্রহ্মদেশ থেকে নৃত্যগীতের আসরে। এ ছাড়াও ছিল 'ওবি' 'ইয়েন' 'টোংবিয়াং' 'গালংনাগা' জোবাট্, বিলু, জাট্ প্রভৃতি নাচ।

রেঙ্গুনের স্মৃতি পিছনে পড়ে থাক—নাই নাই সময় নাই—ভারতের যে মহিমা ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন সঙ্গম সীমা—তাকে অর্ঘ্য দেওয়া থাক্—সময়ের হৃদয় হরণ করেছে পেছনে ধাওয়া করা সৈন্যের দল। অতএব চল্ রে চল্। ভোর রাতের সুন্দরী শুকতারা তখনো জ্বলচে—বিদায়—বিদায়—রেঙ্গুন বিদায়—শোয়ে ডাগন প্রণাম—

পদ্মাসন আছে স্থির, ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন
মৌন যার শান্তি অন্তহারা, বাণী যার সকরুণ
সান্ত্বনার ধারা

শম্বুকগতিতে চলেছি আমরা—পথে অগণিত জনতা, নানা ধরণের যান—সব ধরণের মানুষ—পঙ্গযাত্রা ত আছেই—সবাই একটি চেতনায় উদ্বুদ্ধ—পালাও, পালাও। পেগু ও প্রোম রোডের জংশনে এসে খবর পাওয়া গেলো যে পেগু রোডে জাপানী স্নাইপারদের অগ্রগামী দলকে তৎপর হতে দেখা গেছে। অতএব সেই বিরাট জনতা সে পথ ছেড়ে কিঞ্চিৎ বামে ঘুরলো প্রোমের দিকে। এ পথ গেছে—কোন খানে গো কোনখানে—কোন পাহাড়ের পারে কোন সাগরের ধারে কোন দুরাশার দিক পানে। তবু নিয়মমত সন্ধ্যা নামে—আকাশ কালো হয়ে আসে—যেমন নেমেছিল তার আগের দিন, যেমন আসবে অবগুণ্ঠিত হয়ে তার পরের সন্ধ্যায়। মহাপ্রকৃতির নিয়মে কোথাও একচুলও যতি-ভঙ্গ নেই—মহাকালের নৃত্যে তালভঙ্গও হয় না। প্রোম সহরে পৌঁছে গেলুম সন্ধ্যার কিছু পরেই—কৃষ্ণায়িত সহর—কালোর বোরখা পরা রাত। আশ্রয়হীন আমরা, ঘুরছি—স্টেশন থেকে ডাকবাংলো, ডাকবাংলো থেকে বাজার—স্থান নাই স্থান নাই ছোট এ তরী। সবাই আগন্তুক রৈফুউজী'তে ভর্ত্তি। এসেছি ত মোটে একশো তিরিশ মাইল—তবু ত আমরা সৌভাগ্যবান—চারিচক্র যানে এসে পৌচেছি—বাকী পথের আরো ৫০০ মাইল অন্ততঃ এই ভাবেই যাওয়া যাবে—মাণ্ড্যালেমেমিয়ো পর্য্যন্ত। তারপর বাকী দেড় হাজার মাইল—ওঁ নমো নারায়ণায় বলেই পাড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় কী?

এমন সময় মনে পড়লো—ঠিক যেন অকুল সমুদ্রে দিশাহারা নাবিকের 'লাইট্ হাউস' দেখার মত, যে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পুণ্যানন্দ (এখন রহড়ার অধ্যক্ষ) এখানেই সহরের সংলগ্ন কোন স্থানে একটি সেবা শিবির খুলেছেন। গত দুমাস ধরেই আরাকান-থাকিয়ারের পথে পাহাড় সমুদ্র পেরিয়ে বহু ভারতীয় ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করতে চেষ্টা করেছেন। সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রোগে শোকে, কেউ স্বামী, কেউ পুত্র, কেউ স্ত্রী হারিয়ে বহু-লোক এ পথ দিয়ে পার হয়েছিলেন। রোগ, মারী, পথের কষ্ট, জলাভাব, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, চোর ডাকাতের ভয় কিছুই আটকাতে পারেনি এই ভীত ত্রস্ত মানবযূথদের। ইরাবতীর ওপারে শুনলাম কলেরায় ছারখার হয়ে গেছে কয়েকটি ভারতীয় বসতি। নেই সেবা পথ্য ওষুধ, নেই ডাক্তার নার্স অর্থ, নেই মাস্ইন্অকুলেশনের ব্যবস্থা।

যাই হোক নিষ্প্রদীপ সহরে খুজে পেতে ধুঁকতে ধুঁকতে রাত দশটা নাগাদ প্রোমের সহরতলীতে স্বামী পুণ্যানন্দের আস্তানা খুঁজে পাওয়া গেলো। বেরিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে নিবেদিত সৌম্য সহাস বিকচনয়ান দুটি মানুষ—স্বামী পুণ্যানন্দ ও তাঁরই সেদিনকার সহকারী রঙ্গনাথানন্দজী (এখন রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ্ কালচারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ)। অত্যন্ত সহজভাবেই আমাদের

গ্রহণ করলেন, যেন আমাদের আসার সবই স্থির ছিল—অত্যন্ত প্রিয় অভ্যাগত অতিথি—আজও কানে বাজচে—আসুন, আসুন,। অসহায় মানুষের কাছে সে কী পরম আশ্বাসময় অভ্যর্থনা। সে রাত্রির সাধারণ হৃদ্যতা অসাধারণ হয়েই আমার মনে বেজেছিল। সেই বলিষ্ঠ আশ্বাস হৃদয়কে ভরে দিয়েছিল—স্মৃতির অক্ষরে সোনার স্বাক্ষরে মনের মণিকোঠায় গাথা হয়ে আছে।

সব খবর শোনবার আগেই পুণ্যানন্দজী বললেন—এখন কথা থাক্, আগে গরমজলের বন্দোবস্ত করি. কারণ এখানে ভীষণ কলেরা হচ্চে, আপনাদের ত টীকা নেবার সময় হয় নি। নিজের হাতে কাঠ জ্বেলে জল গরম করলেন আমাদের জন্য, সামান্য কিছু আহারেরও ব্যবস্থা হোল সেই গভীর রাত্রে—তারপর পাশাপাশি শুয়ে পড়া গেলো কম্বল মুড়ী দিয়ে—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে। পুণ্যানন্দজী আমাকে বললেন—আপনার শরীর দেখছি সুস্থ নয়—আমার এখানে বিশ্রাম করুন—আমার অবশ্য ভারতে ফিরে যেতে দেরী আছে—তার পর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—না, কলেরার রাজ্যে আপনাদের থাকতে বলতে পারি না—মান্দালয়ে যান যেখানে যদি ভাল ব্যবস্থা কিছু না করতে পারেন, আমি আছি সঙ্গে নেবো, কিছু ভাবনা নেই।

রঙ্গনাথানন্দজীও আমাকে বললেন—আমি আরাকান পথে শীঘ্রই বেরুচ্চি—আপনি চলুন আমার সঙ্গে—আমি আপনার ভার নেবো—

স্বামী পুণ্যানন্দের সঙ্গে তারপর কতো কথা হলো—অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন—দাবানলের মতো জ্বলচে কলেরার আগুন, কিছুই করতে পারছি না, না আছে ওষুধ, না আছে পথ্য। মনে হোল সেই বরিষ্ঠ প্রবিষ্ঠ কর্মকুশলী ত্যাগীর চোখে যেন দুফোঁটা জল দেখলাম। ভাবলাম—আমিও ত ভদ্র শিক্ষিত যুবক, প্রগতির কথা বলি, সভায় সমিতিতে শিক্ষাদীক্ষার, কালচার কুলচুরের বড়াই করি, কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীব-শিবের সেবার কী মন্ত্র এঁদের চেতনায়, মননে ধ্যানে নিধিধ্যাসনে কানে দিয়ে গেছেন যে এঁরা স্ত্রী পুত্র সংসার করলে না, বৃথা অর্থ আভিজাত্য মান সম্মানের তোয়াক্কা রাখলেনা "ব্যাঙ্কব্যালেন্স নিল" হলেও কাজের কমতি হোল না।

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে, আর পেলে—যে পাওয়া সব চেয়ে বড়ো পাওয়া শ্রদ্ধা-প্রীতি ভালবাসা শুধু নয়—নরের মধ্যে নারায়ণকে—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ

শেষ রাত্রে ঘুমটা একটু মৌজ করেই এসেছিল আমিরী মেজাজে। উঠে দেখি স্বামী পুণ্যানন্দজী লেগে গেছেন আমাদেরই তদ্বিরে। মাটির উঠোনের একদিকে লম্বা করে কাটা উনুন-কাঠ জ্বলচে, একদিকে গরমজল, আর একদিকে গরম খিচুড়ী। সাতটায় আমরা বেরুবো—দুশো মাইল পাকা পাড়ি দিতে হবে—পার্বত্য বন্ধুর পথ কিছুটা।

গরম জলে স্নান করিয়ে উষ্ণ অন্নব্যঞ্জনে উদর দেবতাকে পরিতৃপ্ত করিয়ে আশ্বাস দিয়ে ভরসা দিয়ে সেদিন আমাদের বেলা ৭টায় সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান থেকে যিনি আমাদের সহাস্য বিদায় দিলেন তিনিই পুণ্যশ্লোক পুণ্যানন্দ—সূর্য সবে আকাশপটে মাথা তুলেছেন—তারি এক ঝলক্ আলোক মুখে পড়লো তাঁর—সামনে এক অজানা পথ ডাকছে—

পথের সাথী, নমি বারংবার
পথিক জনের লহ নমস্কার।

ব্যাপারটাকে ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন বলব, কি, নিছক প্রকৃতি-দেবীর খামখেয়ালিপনা—তা বুঝে উঠতে পারছি না, তবে ঘটে গেল।

সেই সুদূর মফঃস্বলের নগণ্য রেল স্টেশনটি, প্ল্যাটফরম পর্যন্ত নেই। গাড়ি ফেল করে ঝাঁকড়া দেবদারু গাছের তলাটিতে সতরঞ্জি বিছিয়ে বসে আছি আমি পরবর্ত্তী গাড়ির প্রতীক্ষায়। প্রায় এক বৎসর পুর্বের একটি অভিজ্ঞতা।

মেঠো জায়গা। রেলের দুদিকেই উন্মুক্ত প্রান্তর। বসতি নেই বললেই হয়। কোথাও দুতিনটি ক'রে ঘর, গুটিকতক গাছের ছায়ার মধ্যে। তাও অনেক দূরে দূরে। একেবারে দিকচক্রের কোলে, দু'দিকেই, সবুজের রেখা লোকালয়ের আভাস দেয় একটু। গাছের মধ্যে তাল-গাছটাই বেশি। এখানে ওখানে ছড়ানো। তাদের ছায়াহীন নিঃসঙ্গতা সমস্ত অঞ্চলটার রুক্ষতাটুকু যেন আরও বাড়িয়েই তুলেছে।

ফাল্গুনের অপরাহ্ণ, রোদে একটু একটু রং ধরে আসছে। শব্দের মধ্যে আমার দেবদারু গাছে মাঝে মাঝে দুটি শালিক পাখির কিচিমিচি। আর শব্দ, কাছেই কোথাও একটি চিলের করুণ ডাক, শোনায় যেন সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে কাতর আহ্বান; বেলা তো পড়ে আসছে।

আমার গাড়ির এখনও প্রায় ঘণ্টা দুই দেরী। শুধু তালগাছ দেখে আর চিলের ডাক শুনে এতখানি সময় কি করে কাটবে ভাবছি,এমন সময় সামনের দিকে নজর পড়ায় দেখি, অনেক দূরে 'লাইনটা' যেখানে ঘুরে দিকচক্রের মধ্যে মিলিয়ে গেছে, সেখানে গাছপালার নীল রেখার ওপর খানিকটা ধুঁয়ার কুণ্ডলী। আমার গাড়িটা এদিক থেকেই আসবে।

নৈরাশ্য বেহায়া। সে যতই গভীর—ততই যেন ঘুরে-ফিরে আশার সূত্র খোঁজে, জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। গাড়ির কোন সম্ভাবনা নেই, তবু আমার কেমন যেন মনে হোল—এসেই পড়ছে একটা। হয়তো আমার গাড়িটাই। আমি সেটাকে আমার চোখের সামনে বেরিয়ে যেতে দেখিনি, এখানে পৌঁছে শুনলাম ঠিক সময়ে এসে ছেড়ে গেছে। এইখানেই কোন ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, বলতে বা শুনতে। এই ক্ষীণসূত্রটুকু অবলম্বন ক'রে আমি আর কালহরণ না করে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে এগুলাম, ষ্টেশনের ঘরটা বেশ খানিকটা দূরে। গিয়ে জানতে পারলাম, যে সম্ভাবনাটাকে জোর ক'রে মন থেকে ঠেলে রেখেছিলাম, তাই। গাড়িই, তবে কোন প্যাসেঞ্জার নয়, একটা মালগাড়ি।

ষ্টেশনমাষ্টার একজন প্রবীণ ভদ্রলোক। বললেন—"কেন, আপনাকে তো বললাম তখন যে—ঘণ্টা আড়াইয়ের আগে আর কোন গাড়ি নেই।"

দেয়াল ঘড়িটার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"এখনও একঘণ্টা বাহান্ন মিনিট; যদি টাইমে আসে। যাবেন কোথায়?"

বাঁচলাম শেষ প্রশ্নটা করায়। আশার ছলনার কথা তো বলা যায় না মুখ ফুটে; এত হন্তদন্ত হয়ে এসেছি যে, কিছু একটা ভেবেও রাখা হয়নি, ওঁর বলা সত্ত্বেও কেন আবার জিজ্ঞেস করতে আসা। শেষের প্রশ্নটারই উত্তর দিয়ে গন্তব্য স্থানটার নাম বললাম।

"তাড়াতাড়ি আছে কোন?"

প্রশ্নটা একটু অদ্ভুতই ঠেকল। তবে কেমন যেন মনে হোল, অদ্ভুত অবান্তর প্রশ্ন করবার মতোই মানুষটিও। ঢিলা-ঢালা কাপড়-জামা, রূপার ফ্রেমের চশমার একটা দিকের ডাঁটি কানের কাছটায় সুতা-বাঁধা। একরাশ গোঁফ গোল হয়ে এসে চিবুকের অর্ধেকটা পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে। দাড়িতেও ক'দিন ক্ষুর পড়েনি। সবমিলিয়ে কেমন যেন খাপছাড়া গোছের। উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, উনিই বললেন—"এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি যে যদি থাকে তাড়া—তো তার ব্যবস্থা হতে পারে।"

আমি আরও একটু বিমূঢ় হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—"কী ব্যবস্থা হ'তে পারে?"

"আছে হাতে কিছু।...তবে থাক্, সেও খুব সিওর (Sure) নয়। তেপান্তরের মধ্যে পড়ে উতলা হয়ে পড়েছেন—এও তো এক ধরণের মরীচিকাই—মাল-গাড়িকেই প্যাসেঞ্জার ভ্রম, যখন কোন সম্ভাবনা নেই প্যাসেঞ্জারের। নয় কি? বলুন না।"

—হেসেই উঠলেন একটু।

খানিকটা এই আবার বেশ বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে আমার বিমূঢ়ভাবটুকু বেড়েই গেছে। উত্তর করলাম—"কতকটা তাই বৈকি।"

"কতকটা নয়, সম্পূর্ণ।"—আবার একটু হাসলেন। বললেন—"উপায় আছে পরিত্রাণের। মানে, এই তেপান্তর থেকে পরিত্রাণের আর কি। ড্রাইভার গার্ড দু'জনেই জানা, গাড়ি থামিয়ে গার্ডের গাড়িতে তুলে দিতে পারা যায়। কিন্তু সে শুধু এখানে থেকেই নিষ্কৃতি; ধিকুতে ধিকুতে যাবেন, তারপর হয়তো কোন ষ্টেশনে গিয়ে দেখলেন সাইডিঙে ফেলে প্যাসেঞ্জারটা হুস হুস ক'রে বেরিয়ে গেল। এটা আবার সব ষ্টেশনে দাঁড়ায় না। তার চেয়ে এক কাজ করুন বরং। আপত্তি আছে?"

সেই আবার একটু খাপ-ছাড়া প্রশ্ন। ব্যাপারটা না জেনে আপত্তি আছে কি নেই কি করে বলব?

বললাম—"বলুন; দেখি আপত্তির কিছু আছে কিনা।"

"চলে আসুন এখানে। অন্তত অতটা এবঘেয়ে লাগবে না।"

"সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু আপনার কাজে ব্যাঘাত হবে তো?"

"ব্যাঘাত হওয়ার মতো কাজের ভিড় দেখছেন?" আবার একটু হাসলেন। "তাহলে ওগুনো নিয়ে আসি"—বলে আমি ঘুরতে বললেন—"আপনি বসুন, আনিয়ে দিচ্ছি আমি।"

খালাসীটাকে ডেকে বলে দিলেন। মালগাড়িটা এসে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে যতক্ষণে বেরিয়ে গেল, ততক্ষণে আমার বেডিং আর সুটকেশটাও এসে পড়ল। একটা স্টুল নিয়ে বসেছিলাম, ষ্টেশনমাষ্টারও টেলিফোনে সাঙ্কেতিক ভাষায় বোধহয় মালগাড়ি পাস করে যাওয়ার কথাটা কনট্রোলারকে জানিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বললেন—"ওকি! আপনি এই চেয়ারটায় বসুন।"

নিজেই এগিয়ে দিলেন কোন আপত্তি না শুনে। টুলও এই একটি মাত্র সম্বল, উঠে বাড়িয়ে দিয়ে টেনে নিলাম চেয়ারটা।

দু'জনে সামনাসামনি হয়ে বসলে প্রশ্ন করলেন—"মশাইরা?" বললাম—"ব্রাহ্মণ।" নামটাও বললাম।

"প্রণাম হই।"—করজোড়ে প্রণাম ক'রে বললেন—"অনেক দিন পরে ব্রাহ্মণের দর্শন হোল, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম যে আজ! আমি জাতিতে কায়স্থ, নাম দ্বিজপদ ঘোষ।···মশাইয়ের কৌলিক বৃত্তি?···"

আমি বাইরের দিকেই মুখ ক'রে বসেছিলাম, দৃষ্টিটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সেইখানেই নিবদ্ধ হয়ে গেল! তখন যেমন মনে হয়েছিল ওঁর ছন্নছাড়া আকৃতির সঙ্গে প্রশ্নগুলার একটা মিল আছে, তেমনি এখন মনে হোল এখানকার এই পরিবর্ত্তনহীন রুক্ষ সমাবেশের সঙ্গে এই কথাগুলারও আছে সাদৃশ; এই যে পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বের মতো ব্রাহ্মণ দেখে কৃতকৃতার্থ ভাব, তারপর কৌলিক বৃত্তি নিয়ে প্রশ্ন। অন্যমনস্কতার জন্য একটু অপ্রতিভ ভাবেই ঘুরে বললাম—"হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস করলেন যেন?···ও! কৌলিক বৃত্তি?"

আবার একটু চুপ করে যেতে হোল। বাটা কোম্পানীতে একটা চাকরির চেষ্টা ক'রে বিফল-মনোরথ হয়ে চিৎপুরের মাঝখানে একটা কয়লার ডিপো খুলেছি, তারই জন্য এ অঞ্চলে এই দুবার আসতে হোল। তাড়াতাড়ি আর কিছু না পেয়ে বললাম—'কুলবৃত্তি বিবাহ সংঘটন; তাই ধরে আছি।"

ঘটকালি বৃত্তিটা আমার পিতৃকুলেরও নয়, মাতৃকুলেরও নয়, একেবারে আমার পিতামহীর পিতৃকুলের: এক শতাব্দীরও ওদিকের কথা। কেন যে আর সবকে বাদ দিয়ে এইটেকেই অত দূর থেকে টেনে আনলাম, ঠিক বলতে পারি না, হয়তো প্রায়-লুপ্ত বৃত্তিটার ভদ্রলোকের প্রায় লুপ্ত প্রশ্নটার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য পেয়ে গিয়ে থাকব, তাড়াতাড়ি একটা কিছু বলে দেওয়ার তাগিদের মাথায়।

ভদ্রলোক একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। চোখদুটি আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে আসছে, গোঁফের রাশি উঠছে ফুলে। যা স্বাভাবিক—সেইটাই প্রথমটা মনে হোল আমার, এযুগে কৌলিক বৃত্তিহিসাবে ঘটকালি, ভদ্রলোক নিশ্চয় কৌতুক অনুভব করছেন ভেতরে ভেতরে। তখনই কিন্তু ভুলটা ভেঙে গেল; দেখলাম ওটা একটা খুব বড় আবিষ্কারের অনাবিল হর্ষই। বললেন—"মিছে বলিনি তাহলে যে কার মুখ দেখে উঠলাম আজ। এ যে মেঘ 'না চাইতেই জল।' মশাই, আজ একটানা সাত বছর এই আঘাটায় পড়ে আছি।' সঙ্গী-সাথী বলতে ঐ এক খালাসী। যারা গাড়ি ধরতে এল, কিম্বা নামল গাড়ি থেকে—দু'জন, তিনজন ব্যস—তা তাদের তো ধরে রাখবার জো নেই—কচিৎ কখনও কেউ এই আপনার মতো ফেল করল তো একটু আশা। ডেকে বসাই—তাও সবাইতো ডেকে বসবার মতনও নয়; ভদ্র বসতি একেবারেই কম এদিকে, দেশের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন। নেহাৎ ছিটকে ছাটকে আমাদের এক আধ জন কায়েৎ-বৈদ্য যদি পাওয়া গেল কখনও, ব্রাহ্মণ তো ন' মাসে ছ' মাসে—যদি নেহাৎ বরাৎ জোর হোল, আর ঘটক।"

—মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, যেন এ সৌভাগ্য প্রকাশ করবার আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

এ এক নূতন ধরণের অস্বস্তি। একে ঘটক নই, তার ওপর আবার এতবড় দুর্লভ বস্তু হয়ে পড়া। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম—"সাতবছর একটানা রয়েছেন এই নির্বান্ধব জায়গায় "ট্রান্স্‌ফার ডিউ হয়নি? বা, চেষ্টা করেন নি?"

একটু চুপ করে রইলেন, তারপর আবার সেইরকম অল্প একটু হেসে বললেন—"ডিউ হয়েছে বৈকি, চেষ্টাও করেছি···তবে থেকে যাওয়ার জন্যেই। আশ্চর্য লাগছে নিশ্চয়?"

"তা একটু লাগছে বৈকি।"—উত্তর করলাম আমি। দৃষ্টিটা আর একবার বাইরে থেকে ঘুরেও এল। এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গাতেও লোকে চেষ্টা করে পড়ে থাকতে চায়!

"মেয়েটার কথা ভেবে, যার জন্যেই মশাই ঘটক শুনে মনে হোল ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তো বিদেয় না করলেই নয় মাকে আমার; কিন্তু ঐ যে কথা তুললেই মেয়ে দেখতে চাওয়া, বাপ হয়ে আর ওতে রাজি হতে প্রাণ চায় না। মা আমার কুচ্ছিৎ, কিন্তু সে বোধহয় শুধু আমার নজরেই—বাপই তো···আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বলব

বৈকি—নৈলে, কে, আর কারুর নজরেই লাগল না কেন? আপনি ব্রাহ্মণ, তায় শুভকাজ-সংঘটনের এই কৌলিক বৃত্তিটা ধরে রেখেছেন, আপনাকে বলতে বাধা নেই, দিব্যি করেছি মনে মনে মাকে আমার নিজের নাক-মুখ-চুল-গড়ন পরখ করাবার জন্যে আর পাঁচজনের সামনে এনে বসাব না। অথচ একটু সদর জায়গায় গিয়ে বসলেই লোভে পড়ে যেতেই হয়, বয়স হয়ে এল, চাওয়াও যায় না মুখের পানে। কিন্তু ঐ তো বললাম—সে যে কী ভীষণ পরীক্ষা! বয়স হয়েছে বলেই আরও—কী-সে বলে…"

চোখদুটি ছলছল করে এল।

বললাম—"চুপ করুন, বুঝেছি। কী যে এক নিষ্ঠুর প্রথা দাঁড়িয়েছে!"

চোখ মুছতে গিয়ে যেন আরও সামলাতে পারছেন না। আমি প্রথাটার স্বপক্ষেও একটু বলবার চেষ্টা করলাম, যদি তাতেই সান্ত্বনা পান। নিজের কাল্পনিক বৃত্তির কথা তুলেই বললাম—"হয়তো আজকাল আমাদের পেশাটা একরকম উঠে গিয়েই এই রকমটা দাঁড়িয়েছে; মাঝখানে বিশ্বাসযোগ্য কেউ থাকে না, কাজেই নিজে হ'তে একটু দেখে শুনে না নিলে…"

"তাই বলে ঐ রকম সপ্তরথীতে ঘিরে?…"

আমার মুখের ওপর করুণ অনুযোগের দৃষ্টি তুলে ধরে বললেন—"একবার ঐ অগ্নিপরীক্ষার পর ভেতরে উঠে এসেই আমার পায়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ল।…"বাবা, তোমার তো আমি মেয়েই।" শুধু ঐ একটি কথা, তার-পরে সে যে কী কান্না মার আমার পায়ে মাথা রেখে, …আজ্ঞে না, তাদেরও পছন্দ হয়নি, তাহলেও তো একটা সান্ত্বনা থাকত। অথচ, দুঃখের কথা দেখুন,—যা নিয়ে অপছন্দ, অন্তত যা বললে তারা, মেয়ের রং ময়লা, সেটা তো এক নজরেই চোখে পড়ে যাওয়ার কথা। সেখানে মেয়েদের স্কুল আছে, পড়ছে স্কুলে, এই ধরণের প্রত্যা-খ্যানে তো আরও লজ্জায় পড়তে হয় ওদের। আমি তুলে বুকে চেপে বললাম—মা চুপ কর, আমি তোকে এরকম করে বেনের দোকানের জিনিসের মতন যাচাই করিয়ে আর বিয়ের কথা কইব না। যার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছিস, সে নিজে এসে নিয়ে যায় তো…"

এই সময় হঠাৎ বাইরে খানিকটা দূরে আওয়াজ উঠল —"বোসজা মশাই। এ বলছে গাড়িটা আজ টাইমে এসেই বেরিয়ে গেছে। আবার সেই সাড়ে সাতটা।"

"ঐ! এসে গেল!"—থেমে গিয়ে কথাটা বলে আমার দিকে চাইলেন দ্বিজপদবাবু, এবার দৃষ্টিতে হাসি আর বেদনার সে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আমি একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"কারা? চেনা নাকি আপনার?"

একটু দূরে আরও একটা আওয়াজ উঠতে দ্বিজপদবাবু হাতটা একটু তুলে আমায় থামতে ইংগিত করলেন। এবার স্টেশনের বাইরে একটু তফাৎ থেকেই নিশ্চয় বোস্‌জাই কেউ বলছেন একটু গলাতুলে—"তা হবে জানি। যা…শুভ যাত্রা! কিন্তু বাজনদারেরা ঠাণ্ডা কেন? শুরু করুক না—অষ্টম-ফষ্টম কাটিয়ে তো এসেছি ফিরে ভালোয় ভালোয়।……"

তীক্ষ্ণ প্রত্যাশায় কান খাড়া করে শুনছিলেন দ্বিজপদবাবু, বললেন—"ঐ নিন, ছেলের বিয়ে দিয়ে এলেন ভদ্দরলোক! শুধু আমার মারই আর যোগাযোগ হচ্ছে না। অথচ কত যে গুণের—তারপর এখানে বসে বসেই ম্যাট্রিকটা পাস করিয়ে দিলাম—বি-এর কোর্সেও এক বছর এগিয়ে গেছে—আর এ দিকে হাতের কাজ বলুন, রান্না বলুন—কাগজ পড়ে পড়ে রং-বেরঙের খাবার।…এই দেখুন! মনের যা অবস্থা হচ্ছে দিন দিন!…আপনাকে বসিয়ে রাখলাম—অথচ একটু যে চায়ের কথা বলে দোব…"

দরকার ছিল, তবু বললাম—"থাক্ এখন আবার কষ্ট করে…"

কথায় কান না দিয়ে একবার ঘড়িটার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"সময় আছে এখনও; গেছে লেট, ফিরতেও লেট হবেই।"

খালাসীটাকে ডেকে বললেন—"তোর দিদিমণিকে গিয়ে বল্‌গে, দু'কাপ চা, আর তাড়াতাড়ি যা একটু করে দিতে পারে।… আর…"

হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু কুণ্ঠিতভাবে আমার দিকে চাইলেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে ভদ্রতার আপত্তিটুকু ধরেই বললাম—"থাকনা, অযথা ছেলে মানুষকে…"

"সে কথা নয়। বলছিলাম—একবার যদি দেখেই রাখতেন একটু—একেবারে সাদামাটা, যেমন আছে…"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রে খালাসীটাকে বললেন —"আর বলবি, নিজেই যেন নিয়ে আসে। পরিচিত মানুষ আমার, ওর কাকাই সে-হিসেবে। যেমন আমায় দিয়ে যায় আর কি ; লজ্জার কিছু নেই।

চলে গেলে আমার দিকে চেয়ে একটু বাপের নিরীহ ধূর্ত্তামির হাসি হেসে বললেন—"চটবে বেটি হয়তো একটু—তা চটুক্। সে যখন পরে টের পাবে তখন তো।"

বোসজা মশাই প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁচেছেন, আর একবার তাগাদা দিলেন—"কৈরে, তোদের যে বললে শুনিস না। পয়সা নিবি তো, না, নিবিনে ?"

প্যাক—প্যাক করে শানাইয়ের আওয়াজ উঠতেই যাচ্ছিল, সঙ্গতের সঙ্গে সুর উঠতেই দ্বিজপদবাবু মুখে সেই আনন্দ বেদনার হাসি নিয়ে উঠে পড়ে বললেন— "আসুন, যাবেন ? বিয়ে হয়ে এল, দেখেও আনন্দ তো। আর বোসজা মশাইও চমৎকার লোক, যাওয়ার সময় পরিচয় হোল কিনা, আপনার সঙ্গেও দেখা করিয়ে দিই।"

আমিও উঠেছি, এমন সময় দরজার সামনে এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন, দ্বিজপদবাবুকে নমস্কার করে বললেন—"গাড়িটা বেরিয়ে গেছে তো ?"

"আজ সময়েই এসেছিল।"—দ্বিজপদবাবু কথাটা বলেই একটু ব্যস্ত হয়েই চারিদিকে চাইলেন। বুঝে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"দরকার নেই, বসব না—চলবে না বসলে জিজ্ঞেস করতে এলাম, পরেরটা ঠিক সময়ে আসছে তো ?……এটা তো ফেল করিয়ে দিলেন।"

শেষের কথাটা বড় রকমের রসিকতা হোল মনে করে বেশ ভালো ভাবেই হেসে উঠলেন। দ্বিজপদবাবু কতকটা অপরাধীর মতোই উত্তর করলেন—"কি করি, আজই ঠিক সময়ে এসে বেরিয়ে গেল যে !"

"হতেই হবে যে! মাষ্টারমশাই যেন দৈবের হাত রুখতে পারতেন !"

আমার দিকে চেয়ে—যেন সাক্ষী মেনেই কথাগুলো বলতে বলতে নিজেই সামনের টেবিলটার খাতাপত্রগুলো ঠেলে একধারে বসে পড়লেন। দু'খানা যে পড়ে গেল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। দ্বিজপদবাবু তুলে আবার একপাশে রেখে দিয়ে আমার কাছে পরিচিত করলেন—"ইনিই হচ্ছেন বোসজা মশাই, যাঁর কথা বলছিলাম আপনাকে।… তা বিয়ে কেমন হোল ?"

"বিয়ে !"—বোস্জামশাই মোটা ভ্রুদুটো কপালে ঠেলে তুললেন, যেন এত আজগুবি কথা কল্পনাও করতে পারেন নি। কালো কোটের ওপর পাক দিয়ে জড়ানো সাদা চাদরের প্রান্তদুটো বুকের দুদিকে মুঠিয়ে ধরে বললেন— "বিয়ে কোথায় মশাই ? বিয়ে দিলে সব সেরেসুরে এত শীগগির কখনও ফিরতে পারি ?"

"তবে ! বিয়ে দিতেই তো গেলেন না ?" নিজের শোনার ওপর, নিজের চোখেই দেখার ওপর যেন বিশ্বাস হারিয়ে চেয়ে রইলেন দ্বিজপদবাবু।

"আলবং গিয়েছিলাম, একশবার গিয়েছিলাম, অস্বীকার তো করছি না……"

"তাহলে, মেয়ে কুৎসিৎ ? কিন্তু আপনি তো কাল বললেন—"অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে—হাজারে একটা মেলে না।"

"আলবং বলেছিলাম, একশবার বলেছিলাম, অস্বীকার তো করছি না। কিন্তু…"

একটু দ্বিধাগ্রস্থভাবে থেমে গিয়ে বললেন—"কৈ, এর পরিচয়টা তো দিলেন না।"

"ইনিও আপনার মত গাড়ি ফেল ক'রে দেবদারুর তলাটিতে বসেছিলেন, ডেকে নিয়েছি। ব্রাহ্মণ, আর সবচেয়ে যা বড় কথা, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—কৌলিক বৃত্তিটুকু পর্য্যন্ত ধরে রেখেছেন, একজন নামকরা ঘটক।"

ওরও যেন একটা বিরাট আবিষ্কার। আমার মুখের দিকে বিস্ময়-প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন—ঘটক ! তাহলে তো ওঁর চেয়ে এ বিষয়ে বড় অথরিটি কেউই নেই।……দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনিই বিচার করুন— বিয়ে দিতেই তো নিয়ে গেছি—ছেলেই আমার, মধ্যম সন্তান ঐ সাতজন বরযাত্রী, পাঁচজন বাজনদার, শুনতেই পাচ্ছেন তান ধরেছে। বিয়ে দিতেই নিয়ে গেছি। ছেলেকে আশীর্বাদ করেই গিয়েছিলেন ওরা, দুপুরে মেয়ে-আশীর্বাদ হবে, গিয়ে বসেছি, সব ঠিকঠাক, মেয়েও এসে বসল, এইবার ধানদুর্ব্বো হাতে নিয়ে বসব—ঠিক তালের মাথায়—'চি-ই-ই-ই !'

"হাঁচি ?"—উদ্বিগ্নভাবেই শুনছি দুজনে—দ্বিজপদবাবু প্রশ্নটা করলেন।

"হাঁচি টিকটিকির তো কাটান্ আছে মশাই। শব্দ শুনেই বুকটা ধক্ করে উঠেছে, চোখ তুলে দেখি—সামনে একটা নেড়া তালগাছের ওপর সাক্ষাৎ অযাত্রা—একটা চিল !!"

চক্ষু বিস্ফারিত করে ওঁর দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে এনে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আপনিই বলুন, আর পারা যায় ?"

অবাক হয়ে গেছি; এই রকম একটা মূঢ় অন্ধ-সংস্কারের ওপর গোটা বিবাহটাই ভেঙে দিয়ে গৃহস্থকে বিপাকে ফেলে এল! বরপক্ষের অত্যাচারের অন্য এক নমুনার সদ্য আলোচনায় মনটা খিচড়েই ছিল, নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেও একটু মন্তব্য না করে যেন পারা গেল না; বললাম—"চিল যে এমন অশুভ, কৈ তাতো জানা ছিল না এর আগে।"

"সে কি মশাই! আপনি একজন প্রবীণ কুলাচার্য হ'য়ে কি করে বলছেন এ কথা! আগাগোড়া খয়ের রঙের একটা গোদা চিল চোখের সামনে বসে, তা দেখেও মেয়ে আশীর্বাদ করে আসতে হবে আমায়।"

—বেশ ভালো করে ঘুরে বসে কয়েক সেকেণ্ড এমন-ভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে যেন এই দারুণ অজ্ঞতায় আমি কত নিরীহ নিঃসন্দিগ্ধ, জীবনের ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট করে চলেছি। আমার কাল্পনিক বৃত্তির এই অমার্জনীয় অপব্যবহারে নিরতিশয় লজ্জায় পড়ে গিয়ে বললাম—"ও। আপনি গোদা চিলের কথা বলছেন ? তাহলে সত্যিই তো···"

"গোদা চিল! তাও চুপ করে বসে থাক্ যেমন আছিস, তাতো নয়, সর্ব্বনাশের গোড়াপত্তন হতে চলেছে দেখে খুশিতে গলা ছেড়ে তান ধরেছেন। শঙ্খচিল নয়, নীলকণ্ঠ নয়, জলজ্যান্ত গোদা চিল একটা!"

"সেই কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম—"কাঁচুমাচু হয়ে বললাম আমি। একবার দৃষ্টিটা আপনা হতেই দ্বিজপদবাবুর মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। যেন কীরকম হয়ে গেছেন একটু। সেটা এমন দৈবযোগে-পাওয়া ঘটক সম্বন্ধে নৈরাশ্যের জন্য, কি, ওঁর এমন অহেতুকভাবে বিবাহটা ভেঙে দেওয়ার জন্য—ঠিক বুঝতে না পেরে আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে ফেলার জন্য বোস্‌জা মশাইয়ের দিকে চেয়েই বললাম—"তাহলে আর অন্যায়টা কি করেছেন ? তা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, তারা কথা ভেঙে চলে আসতে দিলে এই সামান্য···মানে, তারা তো না জেনে শুনে সামান্য বলেই মনে করবে—তা কিছু গোলমাল······"

"আপনি ছোট-পাথুরিয়ার নাম শোনেন নি বোধ হয়"—আমায় থামিয়ে প্রশ্ন করলেন।

বললাম—"আজ্ঞে না, এদিকে আমার কিছু জানাশোনা নেই।"

"বুঝেছি; জানলে একথাটা আর জিজ্ঞেস করতেন না। ডাকসাইটে বদমাইসদের আড্ডা, মাষ্টারমশাই জানেন। ছোট পাথুরিয়া থেকে বিয়ে ভেঙে দিয়ে ছেলে ফিরিয়ে আনবে, সারা অঙ্গে কালসিটের দাগ না নিয়ে—এমন মদ্দ জন্মায়নি এখনও। না বিশ্বাস হয় মাষ্টার মশাইকেই জিজ্ঞেস করুন।"

আমি দ্বিজপদবাবুর দিকে না চেয়ে কিছু কালসিটের দাগ আবিষ্কার করবার আশায় ওঁর মুখের ওপরই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে দৃষ্টি বোলাচ্ছিলাম, বললেন—"বুঝেছি কি খুঁজছেন।···আজ্ঞে না, অত কাঁচা ছেলে মনে করবেন না। ভজহরি মোক্তারের নাম শুনেছেন ?"

বললাম—"আজ্ঞে না, সৌভাগ্য হয়নি শোনবার। বললাম তো, এ-অঞ্চলে আসা-যাওয়া নেই একেবারে।"

অসীম করুণার দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন—"পায়রাডাঙার ভজহরি মোক্তারের নাম শোনবার জন্যে কি ট্রেণভাড়া দিয়ে যাওয়াআসা করতে হবে, নৈলে হবে না ? তাহলে মাষ্টার মশাইকেই জিজ্ঞেস করুন, নিজের বাপের কথা, হয়তো বাড়িয়ে বলছি মনে হবে।"

নস্য নেওয়ার অভ্যাস আছে। ওঁকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পকেট থেকে একটি হরিণের সিঙের ডিবে বের করে হাতে ঢেলে নিলেন। দ্বিজপদবাবু চুপ করেই আছেন; হয়তো আমার মতোই অজ্ঞ, কিম্বা ঘটনাটায় অভিভূত হয়ে খুবই অন্যমনস্ক। দ্বিজপদবাবু টেবিলের ওপর আঙুল চালাতে চালাতে একটু হাসলেন—স্বনামখ্যাত ভজহরি

মোক্তার সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার জন্য, কি, নিজেও আমারই মত অজ্ঞ হওয়ার জন্য, ঠিক বোঝা গেল না। বোস্‌জা, সেদিকে খেয়াল না করে বেশ বড় একটিপ নস্য নিয়ে দুই নাকে চালান ক'রে দিয়ে হাত ঝেড়ে বললেন—"পায়রাডাঙার ভজহরি মোক্তার, ফৌজদারি মামলায় বর্ধমান আদালতের তা-বড় তা-বড় উকিল-ব্যারিষ্টারের যার সামনে দাঁড়ালে পা কেঁপে যেত, তারই সন্তান আপনাদের এই নিতাইহরি বোস—ক্যায়সা দাঁও ক'ষে কি ক'রে মামলা হাসিল ক'রে বেরিয়ে আসবে তার হদিশ যদি কেউ টের পেয়েই গেল তো বাপের কু-সন্তানই বলব না নিজেকে ?"

কথাটা অনুমোদনের জন্য মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, বললাম—"তা অতবড় মোক্তারের ছেলে যখন···"

হদিসটা কি জানবার জন্যে স্বভাবতই একটা কৌতূহল ঠেলে উঠছে মনে। জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কিনা ভাবছি, উনিই বেশ অনুমান ক'রে নিয়ে বললেন—"ছোট্ট একটি কথা কৌশলে এর মুখ দিয়ে তার মুখ দিয়ে খাস জায়গাটিতে পৌঁছে দেওয়া—একেবারে খোদ গিন্নির কানে। গিন্নি অনশনব্রত নিয়ে বিছানা নিলেন, এ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না—জোর করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যা···কর্তার ডাক পড়েছে······কাকের মুখে বকের মুখে একটা বাজে কথা শুনে ভদ্দরলোকের সঙ্গে কথা ভেঙে দেওয়া, ফাঁফরেই পড়েছেন একটু। গিন্নি সেই এক কোট ধরে বসে আছেন···বাড়ীতে গুজগুজ ফুসফুস আরম্ভ হ'য়ে গেছে—চর লাগানো রয়েছে আমার, প্রত্যেকটি কথা কানে আসছে······"

"যদি আপত্তি না থাকে, ব্যবস্থাটুকু কি করলেন···"

দ্বিজপদবাবু আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে প্রশ্নটা করে বসলেন। বোস্‌জা এবার মোটা জ্ঞ-দুটো নামিয়ে চোখের ওপর চেপে ডান হাতটা চিতিয়ে দিলেন, বললেন—"ছেলে এক নম্বরের বকাটে, বাপ তাই দেনা-পাওনার দিকে একেবারে না গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে ছেলের—সব কথা চাপা দিয়ে······"

বলতে বলতেই চতুর হাসিতে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আসছিল, চাপড়টা আমার কাঁধে বসিয়ে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে সামনে-পেছনে দোল খেতে লাগলেন।

ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় এ ধরণের মূঢ় হাসিতে যোগ দিতে হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না দ্বিজপদবাবু আর আমি দুজনে স্তম্ভিত হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, তারপর আমিই একটু কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করলাম—"কিন্তু ছেলে নিশ্চয় আপনার সে রকম নয় ?··· তাহলে মিছিমিছি তার একটা অপবাদ দিয়ে···"

"ছেলে ? বাপের মুখে প্রশংসার দাম নেই, শুধু এই-টুকুই বলতে পারি বখামির ধার দিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ত্যাজ্যপুত্র করব না ? ইস্কুল-কলেজে আজকাল কী না হচ্ছে ? কিন্তু কেউ বলুক ত—নিতাইহরি বোসের ছেলের হাতে একটা বিড়ি-সিগারেট কখনও দেখেছে !

একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছেন। কিছু একটা বলবার জন্যেই বললাম—"তা'হলে তো—বিশেষ করে এ যুগে···"

"কেন ?"

—চেয়ার থেকে নেমে পড়ে দরজা ডিঙ্গিয়ে বাইরে গিয়ে হাঁক দিলেন—"জয়হরি ! একবার এদিকে আসবে শীগ্‌গির !"

ফিরে আসতে আসতে বললেন—"দেখুন মিলিয়ে—বখা ছেলের এই চেহারা ? সে রকম বাপ পায় নি। ভয়ে কাঁটা। এই নিয়ে তিনবার তো ফিরিয়ে আনলাম—এক-রকম বিয়ের আসর থেকেই—দুবার এই গোদা চিল, একবার—আপনার গিয়ে···"

এই সময় একটি সুবেশ যুবক নিতান্তই সঙ্কুচিত পদক্ষেপে দরজার সামনে এসে প্রবেশ করল। সুশ্রী, বিশেষ করে সংযত জীবনের একটি লাবণ্য সারা অঙ্গে রয়েছে ছড়িয়ে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, সে হিসাবে সঙ্কোচের ভাবটা বেশ একটু বেশিই। বোস্‌জা মশাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"কিছু বলছেন আমায় ?"

"ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, প্রণাম করো।"

দ্বিধামাত্র না করে যুবক সেই চালে এগিয়ে এসে আমার "থাক্, থাক্"—বলার মধ্যেই পায়ের-ধুলা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ঠিক এই সময় একটি মেয়েও দু'হাতে দু'টি প্লেটে খাবার নিয়ে দরজার বাইরে এলে হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছুনে খালাসীটার হাতে পিরিচের ওপর বসানো দু'কাপ চা।

দ্বিজপদবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—"এই আমার মেয়ে অরুণা, যার কথা বলছিলাম।…প্লেট দুটো রেখে ওঁকে প্রণাম করো মা। এঁকেও, পায়রাডাঙার নাম-করা ঘরের মানুষ…"

পিতামহীর ঘটক-শোণিতটা হঠাৎ আমার ধমনীতে কি ক'রে যেন বান ডেকে নেমে এসেছে। এত সুন্দর, এত অনুকূল সমাবেশ একটা অমনিই চলে যাবে? কিন্তু কি ক'রে হয়?

ঠিক এই সময় আবার সেই চিলের করুণ ডাক—"চিঁ-ই-ই-ই…"

প্রসঙ্গ-গত ব'লে, সবাই-ই চকিত হ'য়ে উঠেছি, এমন সময় যে-ভাবে সবাই বসেছিলাম তাতে আমার নজরেই পড়ে গেল আগে। একটি শঙ্খচিল, হালকা খয়েরী রঙের—মাঝখানে গলাটা ধবধব করছে সাদা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে সামনেই একটা খেজুর গাছের ওপর এসে বসল।

গোদা চিল নয় বলে ভয় ভাঙ্গাতেই যাচ্ছিলাম বোসজা মশাইয়ের, সঙ্গে সঙ্গেই, হয়তো এই ষ্টেশনেই গত বছর একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে গেছি বলে, বিদ্যুৎ-ঝলকে একটা কথা মনে পড়ে গেল। লেগে তো যাই চোখ কান বুজে।

বললাম—"ও বোসজামশাই, এযে আশ্চর্য সংঘটন। ঘটকালি ক'রে সারা জীবনটা কাটালাম, কিন্তু আজ অবধি দেখিনি তো এমনটি!"

আমার হঠাৎ উচ্ছ্বাসে দু'জনেই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন, ছেলেমেয়ে দুটিও কতক কতক, আমি উঠে হাত ধরে বোসজামশাইকে একটু টেনে নিলাম, বললাম—"শঙ্খচিল! হাজারে একটা পাওয়া যায় না!!"

ছেড়ে দিয়ে হাতটা ঘুরিয়ে আনতে আনতে বললাম—"এই ছেলে, এই মেয়ে, এই দুই বেহাই। প্রজাপতি যেন ওখানকার আসর ভেঙে এখানে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন। আমি বেঁচে থাকতে তো এ আসর ভাঙতে দোব না!"

একটু দুষ্টু-বুদ্ধিও যে ছিল না তা কি ক'রে বলি?—ওঁরই ওষুধে ওঁরই রোগ সারানো তো!

লাখ কথার একটিরও দরকার হোল না। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন দুজনে। উল্লেখ না ক'রে আসর থেকে জয়হরি আর অরুণাকে বাদ দেওয়ার উপায়ই ছিল না আমার, তাদের অবস্থা এমন যে, পায়ের কাছে ধরণী দ্বিধা হ'লে তারা যেন লুকিয়ে বাঁচে।

ঘোরটা কাটিয়ে উঠলেন আগে বোসজামশাই, বললেন—"ওঁকেও প্রণাম করতে হবে জয়ী। সেরে নাও।—তাহলে বেহাইমশাই—সবই তোয়ের, সময় পাওয়া যাবে না একটু? তাহ'লে ডাকি পুরুতমশাইকে—আশীর্বাদটা হ'য়ে থাক না।"

মেয়েটির অবস্থা আরও কাহিল ক'রে তুলেছি, বললাম—"তুমি যেতে পার মা এবার, খাবার দেওয়া তো হয়ে গেছে।"

পালিয়ে বাঁচছিল, দ্বিজপদবাবু গলাটা বাড়িয়ে বললেন—"অমনি তাড়াতাড়ি দুটি ধানদুব্বো…"

—আশায়-আহ্লাদে অভিভূত হয়ে গিয়েই এমন উদ্ভট আদেশ করতে যাওয়া; সম্বিত হ'তে থেমে গেলেন। আমাদের দিকে চেয়ে অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসলেন, বললেন—"তা কি পারে কখনও? আমিই দেখি।"

উঠে পড়ে ঘড়িটার দিকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন—"আছে সময় এখনও বিয়াল্লিশ মিনিট।"
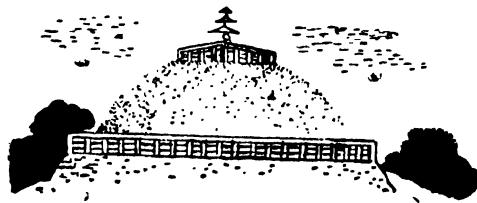
ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও তাঁর মানবিকতা

লীলা বিদ্যান্ত

একবার নিখিলভারত বংগ সাহিত্য সম্মেলনে একজন রুশ ভদ্রলোক বাংলায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যদিও রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা বুঝি না, তবুও তাঁর মানবিকতা আমাদের মনে গভীর সাড়া জাগায়।

রাশিয়ানরা রবীন্দ্রনাথকে যেখানে বোঝে না সে হ'ল তাঁর অধ্যাত্মবাদ। রাশিয়া অনাত্মবাদী। বস্তুতে তার বিশ্বাস। বস্তুর অতিরিক্ত আত্মাকে সে মানে না। কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও কোন মানুষ যদি মানুষের কল্যাণে বিশ্বাস করে, তবে তার সংগে রবীন্দ্রনাথের কোন অনৈক্য নেই—সে মানুষ চাই যে জাতের, যে দেশের বা যে ধর্মেরই হোক্ না কেন।

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দেখ্‌তে চেয়েছেন মুক্ত রূপে। অভাব থেকে মুক্ত, অপমান থেকে মুক্ত, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য থেকে মুক্ত মানুষকে তিনি শুধুই দেখ্‌তে চান নি, এই মুক্তি আনবার জন্য এই নিভৃত-নির্জন-বিলাসী কবি-কর্মের মুখর সজ্জনতার মধ্যেও তাঁর জীবনের অনেকখানি সময় দান ক'রেছেন। এ দান যে কত বড় দান, তা ধারণা কর্‌বার শক্তিই কি আমাদের আছে? কিন্তু কবি থাক্‌তে পারেন নি তাঁর নিভৃত কাব্যসাধনা নিয়ে। মানুষের আর্তনাদ তাঁকে বারে বারে টেনে এনেছে কর্মক্ষেত্রের ধুলোর মধ্যে। কবির ধর্মসাধনাও তাঁর নিভৃত একক সাধনা হ'য়ে থাকে নি। কবির কাছে ধর্ম আর মানুষের কল্যাণ এক হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

কবির কাছে থিয়োরী হিসাবে যা ছিল পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস, কর্মে তাই হ'য়েছে সর্বজীবের প্রতি ভালবাসা। উপনিষদের অধ্যাত্মবাদের এই ব্যাখ্যাই কবি দিয়েছেন—যে ব্রহ্মকে জানে, সে সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে জানে। সোজা কথায় এই জানার অর্থ হ'ল পরের দুঃখ বেদনাকে নিজের দুঃখ বেদনার মত ক'রে জানা, নিজে যে সুখ চাই, পরের জন্যও সেই একই রকম সুখ কামনা করা।

মানুষ যখন জানে যে সে তার চারপাশের প্রাণের চেয়ে আলাদা, তখন তার স্বার্থপরতার আর কোন সীমা থাকে না। কিন্তু মানুষ যখন জানে যে—সে অন্য পাঁচজনের মধ্যে একজন, তখন তার স্বার্থপরতা এমন উগ্র হ'য়ে ওঠে না। সাম্যবাদের যে অর্থ তার চরম বিকাশ হ'য়েছে আমাদের উপনিষদে। শুধু প্রাণী নয়, অপ্রাণীকেও উপনিষদ প্রাণবান, চৈতন্যবান ব'লে দেখেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যা প্রাণহীন, উপনিষদ তাকেও প্রাণ-সমাজের সামাজিক ক'রে দেখেছেন। উপনিষদের দৃষ্টিতে এই প্রাণ-সমাজের সমাজচ্যুত, কোনখানে, কোন কিছুই নেই।

মানুষ নিজেকে সমাজ থেকে আলাদা, একক ব'লে দেখ্‌বে না, সে সমাজের অন্য সবার সংগে ভাগ ক'রে ভোগ করবে, আধুনিক সাম্যবাদের এই বাণী, আমাদের উপনিষদেরই সেই পুরাণো বাণীর পুনরাবৃত্তি।

মানুষের মধ্যেই কবি দেবতাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন। মানুষকে দিলেই দেবতাকে দেওয়া হয়। মানুষের হাত দিয়েই দেবতা মানুষের দান গ্রহণ করেন, এই তাঁর মত। কবি লিখেছেন—

> "ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু
> তাদের পানে তাকাই না যে তবু
> ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
> তোমার মুঠো কেন ভরিনে।
> ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
> দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে
> সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
> প্রাণ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে।"

—গীতাঞ্জলি।

আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও এমন একটা প্রচলিত ধারণা আছে যেন মানব-বিমুখতা ধর্মেরই একটা অংগ। কিন্তু কবি ধর্ম বল্‌তে মানববিমুখতা বোঝেন নি। জীবনের আনন্দ এবং জীবনের কর্তব্যকে বর্জন ক'রে চলাকে কবি ধর্ম বলেন নি। তিনি লিখেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

মানুষের সংগে মানুষের যত রকমের প্রণয় বন্ধন—তারই মধ্য দিয়েই আস্‌বে মানুষের মুক্তি, কবির এই বিশ্বাস। স্বার্থেই মানুষের বন্ধন, প্রেমেই মুক্তি, এই হ'ল কবির মুক্তি-তত্ত্ব। কবির মতে—মা মুক্তি পায় সন্তানের মধ্যে, বন্ধু মুক্তি পায় বন্ধুর প্রেমে। যেখানে মানুষ আপনাকে ত্যাগ কর্‌তে পারে, স্বার্থকে ভুলে যেতে পারে, সেখানেই তার মুক্তি। প্রেমেই তো মানুষ আপনাকে ভোলে। প্রণয়াস্পদের জন্যেই তো মানুষ প্রাণ দিতে পারে। তাই প্রেমই মানুষের মুক্তির উপায়। তাই কবি লিখেছেন—

"মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জলিয়া—
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।"

যে মানুষ ভগবানের সন্ধানে আপনার প্রিয় পরিজন, আপনার কর্তব্যকে ত্যাগ ক'রে দূরে চ'লে যায়, কবির মতে সে ভগবানকেই পিছনে ফেলে দূরে চ'লে যায়। এ জীবন এবং এ জীবনের আনন্দ ও কর্তব্য—এ তো ভগবানেরই বিশ্বরচনার অন্তর্গত। এর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মানে তাঁকেই পিছনে ফেলে যাওয়া। কবি লিখেছেন—

"কহিল গভীর রাত্রে সংসার বিরাগী
গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে
দেবতা কহিল "আমি" শুনিল সে কানে।"

মায়ের বুক আঁকড়ে ঘুমিয়ে ছিল তার শিশু। অমংগল আশংকায় সেই পিতৃ-পরিত্যক্ত শিশু স্বপ্নে কেঁদে উঠ্‌ল। তখন—

"দেবতা নিঃশ্বাস ফেলি কহিলেন হায়—
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

কবি এই সংসারের মধ্যেই ভগবানকে উপলব্ধি ক'রেছেন। কবির মতে এই সৃষ্টি স্রষ্টার থেকে আলাদা নয়। স্রষ্টা আপনি ধরা দিয়েছেন এই সৃষ্টির মধ্যে। সীমার মধ্যেই অসীম আপনাকে প্রকাশ ক'রেছেন।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

কবি লিখেছেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম যে হ'ত মিছে।"

কবির মত যে স্রষ্টা এই সৃষ্টি রচনা করেছেন, তাঁর নিজের প্রেমকে উপলব্ধি কর্‌বার জন্যে, তার আপন প্রণয়-পিপাসা, সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে চরিতার্থ কর্‌বার জন্যে। তাই যে বিবাগী বিশ্বের প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, সে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চলে।

কবি লিখেছেন—তাঁর চিত্তে ভগবানের জন্যে যতটুকু জায়গা, তার চেয়ে বেশী জায়গা জুড়ে রয়েছে এই সংসার। তিনি লিখেছেন—

"এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ ভুবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে ক'রেছ পূর্ণ।"

কবি লিখেছেন—সংসার তাঁর মনে এমন করে জায়গা জুড়ে ব'সে আছে যে তিনি যে প্রতিদিন ভগবানকে অঞ্জলি দেবার জন্যে নূতন গান রচনা করছেন—তখনও সংগে সংগে এই কথাটা তার মনে জেগে থাকে যে, ভগবানের পূজা হয়ে গেলে সংসারের মানুষ এসে এই গানগুলোকে ভালোবেসে গ্রহণ করবে।

"তব পূজা শেষে—
নেবে সবে তোমা সাথে—
মোরে ভালোবেসে।"

ভগবানের পূজার মধ্যেও কবি মানুষের প্রেম থেকে বিচ্ছেদ বোধ করেন নি। তাঁর পূজা নিবেদনের সংগে সংগে লেগে আছে মানুষের প্রেমের জন্যে আশা।

কবির তীর্থ সংসার থেকে দূরে, দুর্গম নির্জনে নয়। সে আছে এই সংসারেরই কবির চলার পথের দুই ধারে।

"পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।"

কবির চলার পথের দুধারে রয়েছে যে ছোট ছোট ঘর-সংসারগুলো সেই হ'ল তার মন্দির। জীবন ও আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন যে তীর্থস্থান সেই দূর দুর্গম নিঃসংগ নির্জন মন্দির কবির জন্যে নয়। কবির চোখে ভালোবাসারই নাম পূজা। কবি বলেন মানুষ আপনার জীবন দিয়ে সহজেই এই কথাটা বোঝে যে—

"যারে বলে ভালোবাসা
তারে বলে পূজা।"

প্রেমের প্রকাশ যেখানেই হ'ক না কেন, যেমন ক'রেই হ'ক না কেন, কবির চোখে তা পবিত্র। ধর্মের প্রচলিত ধারণা হিসাবে নারীর প্রতি প্রেমকে আত্মার অবনতির উপায় বলে মনে করা হয়। কিন্তু কবির মতে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি প্রেম পবিত্র। এমন কি যে নারী ভ্রষ্ট সমাজচ্যুত, সমাজের বিচারে যে ঘৃণ্য অপরাধী, সেও যে বিশ্বাসঘাতী পুরুষের প্রেমে একদিন সব কিছু ত্যাগ ক'রে, কলংকের পংক মাথায় তুলে নিয়েছে। কবি বলেছেন সংসারের বিচারে সে যতই ঘৃণ্য হ'ক না কেন, স্বর্গে তার এই সর্বত্যাগী প্রেমের পুরস্কার পাবে। এই নারীর কথা কবি লিখেছেন—"মর্ত্যে কলংকিনী, স্বর্গে সতী-শিরোমণি।" এমন কি যে মেয়েরা—প্রচলিত বাঁধা পথে গৃহধর্ম পালন ক'রে গেছে তাদের চেয়েও এই কলংকিনী নারী কবির চোখে বেশী পবিত্র ব'লে দেখা দিয়েছে। প্রেমের জন্যে তার এই সর্বস্ব ক্ষতি স্বীকার করা কবির মনকে স্নেহে,শ্রদ্ধায় ও করুণায় ব্যথিত করেছে।

কবি বলেছেন ধর্মাচরণ মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ নয়। প্রকৃতির অনুকূলেই মানুষের ধর্ম। প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য ক'রে ধর্মাচরণ করতে গেলে প্রকৃতি মানুষের প্রতি প্রতিশোধ নেয়। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" কাহিনীতে কবি দেখিয়েছেন—সন্ন্যাসী-মায়ার-বন্ধন কাটিয়ে চ'লে গেলেন দূরে তপস্যার জন্যে। তার ঘরে যে পালিত মেয়েটি ছিল তাকে তিনি ত্যাগ ক'রে গেলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন শুষ্ক তার সাধনায় মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে। সেদিন তিনি ফিরে এসে দেখ্‌লেন, তার সেই মেয়েটি আর বেঁচে নেই। প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা প্রতিশোধ নিয়ে চ'লে গেছে।

"লিপিকার" একটি কাহিনীতে কবি লিখেছেন—সন্ন্যাসী তপস্যা করেন বনে। সেই বনের কাঠকুড়ানি তার জল এনে দেয়, ফল এনে দেয়, তার সেবা করে। অবশেষে একদিন তপস্যার এই বিঘ্ন,এই মেয়েটির সংস্রব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী চলে গেলেন দূরে নিরাসক্ত সাধনার জন্যে। যেদিন তার সাধনায় সিদ্ধি লাভ হ'ল, সেদিন দেবতা বর দিতে চাইলেন। বল্‌লেন—তোমার জন্যে স্বর্গ মঞ্জুর। সন্ন্যাসী বললেন—তা হ'লে স্বর্গে আমার কাজ নেই—আমি চাই সেই বনের সেই কাঠকুড়ানীকে। কবির চোখে প্রেম তপস্যার ধন, সাধনার সিদ্ধি। প্রেমেই মানবাত্মার চরম ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, তার পরম মুক্তি।

নারী-প্রেমে কবি ভগবানের প্রণয়-রহস্যের আভাস পেয়ে ধন্য হ'য়েছেন। কবি লিখেছেন—

"যে ভাবে রমণী-রূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ ক'রেছেন চুরি—
সে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে
* * * *
হে রমণী ক্ষণ কাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে।"

বিশ্বের যিনি নাথ, তিনি আপন মাধুর্য্যের প্রতি গোপন কটাক্ষপাত ক'রবেন বলেই আপনার মাধুরী দিয়ে নারীকে সৃষ্টি করেছেন। নরনারীর প্রেমে সেই বিশ্বনাথেরই আনন্দের প্রকাশ। নরনারীর প্রেমের যে মধুর রহস্য, সে রহস্য বিশ্বনাথের নিজেরই লীলা। নারীর প্রেমে কবি ভগবানের সেই রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাতে তাঁর মন-প্রাণ আনন্দে ভ'রে উঠেছে।

এই কথাই কবি ব'লেছেন "বৈষ্ণব কবির প্রতি" কবিতায়। বৈষ্ণব কবির গানে যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনা, সে শুধুই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তার অর্থ সহজ অর্থে প্রেম নয়, পণ্ডিতদের এই মতবাদকে লক্ষ্য করে কবি লিখেছেন—বৈষ্ণব কবি এত যে বিরহ মিলন, রাগ অনুরাগ, মান অভিমানের বর্ণনা করেছেন, এ সব কথা তিনি পেয়েছেন

কোথায়? প্রেমের এই বিচিত্র মধুর রহস্য তিনি পেলেন কার কাছ থেকে? এ সব কথা কবি চুরি করেছেন কার মুখ থেকে? ঘনবর্ষণ শ্রাবণ রজনীর নিবিড়তার মধ্যে কবি যাকে কাছে পেয়েছিলেন এই প্রণয় রহস্যের পাঠ সেই তো তাঁকে শিখিয়েছে। আর নরনারীর এই প্রেম, প্রেমময়ের আপনারই লীলা, তারই প্রেম-স্বরূপের বিকাশ। তাই নরনারীর প্রণয়-দৃশ্য দেখে সাধু পণ্ডিতেরা যখন রাগ করেন, তখন যিনি প্রেমময় তিনি অপার স্নেহে, অসীম সন্তোষে হাসেন।—

"যার ধন তিনি ঐ অসীম সন্তোষে
অপার স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।"

স্রষ্টার প্রেমই সৃষ্টির মধ্যে তরংগিত হ'য়ে ব'য়ে চ'লেছে। মানুষের হাতে ভালোবাসাই তো দেবতার দেওয়া পরম সম্পদ। মানুষের ভালোবাসা ছাড়া শ্রেষ্ঠ ধন—আর তো কিছুই নেই। তাই সে তার প্রাণের এই সম্পদ কখনো বা দেবতাকে ফিরিয়ে দেয়, কখনো বা মানুষকে দেয়। তাই তার কাছে প্রিয়জন আর দেবতা দুই-ই সমান। কবি লিখছেন—

"যাহা আছে তাই দিই—
আর পাব কোথা—
দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা—।"

তিনি লিখেছেন—

"দেবী নেমে আসে—,
যারে ভালোবাসি, তার মুখে।"

প্রিয়ার মুখচ্ছবির মধ্যেই কবি দেখেছেন দেবীকে।

প্রেমকেই কবি ধর্ম ব'লে মেনেছেন, এই জন্যে বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্ম কবির মনে গভীর আবেদন জাগিয়েছে। বুদ্ধের কথা বল্‌তে গিয়ে কবি বলেছেন—"আমি তাঁকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব বলে জানি।" বুদ্ধের ধর্মের কবি যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমরা-তাঁর অনেক প্রবন্ধে পাই। সেই সব রচনায় কবি এই কথাই বারে বারে প্রমাণ করুতে চেয়েছেন যে বৌদ্ধধর্মের নিহিতার্থ জীবনের নিঃশেষ বিনাশ নয়। কবি বলেছেন এই অর্থই যদি হ'ত, তা হলে নিছক আত্মহত্যা করবার জন্যেই এত নরনারী বুদ্ধের চারদিকে ভীড় ক'রে আস্‌ত না। নিশ্চয়ই নির্বাণের অর্থ আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু। বুদ্ধের ধর্মে কবি জীবন ও সংসারের নিঃশেষ অবসানের বাণীকে স্বীকার কারন নি। তিনি স্বীকার করেছেন সীমাহীন প্রেমের বাণীকে।

নির্বাণ কথাটারই ব্যাখ্যা কবি ক'রেছেন যে নির্বাণ হ'ল মনের সেই অবস্থা যখন সে স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কবি ব'লেছেন নির্বাণ কথার যে এই অর্থ তা বুদ্ধের জীবন থেকেই প্রমাণিত হ'য়েছে। বুদ্ধত্ব লাভের পরে তিনি তো কর্ম পরিত্যাগ না ক'রে সংসারের কল্যাণে কাজই আরম্ভ করলেন। এই কর্ম পবিত্র, কারণ এর মধ্যে ভয়, লোভ, আসক্তি বা অকল্যাণ নেই। এই সমস্ত স্বার্থ-বন্ধনের অতীত। এই কর্মের প্রেরণা হল করুণা এবং প্রেম। তাই আসক্তির সমাপ্তির অর্থ এই নয় যে—সব কিছুই নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়া। নির্বাণের অবস্থায় আসক্তি এবং স্বার্থপরতা শেষ হ'য়ে যায় বলেই দয়া, আনন্দ এবং প্রেম সম্পূর্ণতা লাভ করে। এর অর্থ বাসনা পরিত্যাগের শূন্যতা নয়, এ হ'ল প্রেমের পুর্ণতা।

কবি বলেছেন একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে বৌদ্ধধর্মের চরম আদর্শ সমস্ত বাসনা এবং সমস্ত কর্মের অবসান ঘটিয়ে জীবনকে নিঃশেষ ক'রে দেওয়া নয়। সর্বভূতে প্রেম একটা নেতিবাচক জিনিষ নয়। অন্য কোন ধর্মে-প্রেমের এমন সর্বব্যাপী-রূপ দেখতে পাওয়া যায় না। প্রেমই তো সমস্ত সম্বন্ধকে সত্য এবং পূর্ণ করে তোলে। প্রেম কোন সম্বন্ধকেই ছিন্ন করে না। তাই একথা কোন মতেই বলা চলে না যে প্রেমের লক্ষ্য চরম বিনাশ। কবি ব'লেছেন—যে ধর্মে একদিকে স্বার্থপর আসক্তির সমাপ্তির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে সমস্ত সংকীর্ণ সীমার পরপারে স্বার্থশূন্য প্রেম বিস্তার করবার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে, তার লক্ষ্য শূন্যতা হ'তেই পারে না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের গ্রন্থ-বিশেষে যদি এই শূন্যতাবাদের সমর্থন থাকেও তবু এটাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের সমগ্র সত্য ব'লে গ্রহণ করতে পারি না। একথা মনে করা অসম্ভব যে জমি চাষ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য—আর বীজ বপন করাটা গৌণ। ফসলের আশাতেই মানুষের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হ'য়েছে এবং এই আশাতেই মানুষ কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনাকে স্বীকার ক'রেছে।

যারা শূন্যতা বা অস্তিত্বের একান্ত বিনাশকেই বৌদ্ধ-ধর্মের উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেন তাদের বিষয়ে বল্‌তে গিয়ে কবি বলেছেন—যে কোন কোন লোক এ রকম তর্ক করে, ঠিক যে রকম কেউ যদি বলে যে যেহেতু ক্ষেতে লাংগল দিতে হবে অতএব ফসল উপড়ে ফেলাই হ'ল আসল উদ্দেশ্য। যখন আমরা শুনি যে দিকে দিকে মুঠো মুঠো প্রেমের বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে, তখন মনে সন্দেহ থাকে না যে—আগাছা উপড়ে ফেলাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। একথা বলাই বাহুল্য যে এই প্রেমের ফসল বিনাশের শূন্যতা নয়, এ হ'ল হিংসা দ্বেষের কাঁটা উপড়ে ফেলে প্রেমের পূর্ণতা।

কবি বলেছেন যে যদি বৌদ্ধধর্মে সর্বব্যাপী প্রেমকেই চরম সত্য ব'লে ঘোষণা করা হ'য়ে থাকে, তা হ'লে এ ধর্মে সংসার ও জীবনকে অস্বীকার করা হ'য়েছে, এ কথা কী ক'রে বলা চলে? দয়াই বল আর প্রেমই বল—সে তো আপনার মধ্যে আপনি পরিতৃপ্ত হ'তে পারে না। প্রেমের পাত্রকে অস্বীকার করলে তো প্রেম সত্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। কবি বল্‌তে চান বৌদ্ধধর্মের নির্ব্বাণের অর্থ জীবন-বিমুখতা, মানর-বিমুখতা বা প্রণয়-বিমুখতা নয়। তা জীবন, মানুষ এবং প্রেমেরই অভিমুখী—'যাকে বিনাশ করতে হবে সে হ'ল স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ও লোভের কাঁটা-গাছ গুলোকে,যা প্রেমের ফসল ফলাতে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। বৌদ্ধধর্ম যদি প্রেমকে স্বীকার ক'রে থাকে, তা হ'লে একথা বল্‌তেই হবে যে সে মানুষকে ও জীবনকেই স্বীকার ক'রেছে। জীবন না হলে, মানুষ না হ'লে, প্রেম চরিতার্থ হবে কাকে নিয়ে?

বৌদ্ধ ধর্মের এই রকম ব্যাখ্যা থেকে যেমন আমরা বুদ্ধের ধর্মের অর্থ বুঝতে পারি, ঠিক তেমনি এর থেকেই আমরা কবির নিজের যে কী ধর্ম তা বুঝতে পারি। এর থেকে আমরা এই বুঝি যে জীবন-বিমুখতা কবির চোখে ধর্ম নয়। মানব-বিমুখতাও কবির চোখে ধর্ম নয়। কবির কাছে ধর্মের অর্থই হ'ল—মানুষের প্রতি ভালবাসা। এই প্রেমের পরিণতিই হ'ল মানুষের কল্যাণ, মানুষের সেবা, সেই হ'ল রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। আর কবি শুধু এই প্রেমের উপলব্ধি নিয়ে বাক্য রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, প্রেমের প্রেরণায় তিনি কাজ ক'রেছেন। কবির বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনের অর্থ কী? এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সর্বমানবের প্রতি কবির প্রেম, শিশুর প্রতি তাঁর দরদ, অশিক্ষিত, দুর্দশাগ্রস্ত, অত্যাচারপীড়িত পল্লীর মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমতা।

আর যদি কবির প্রেম এমন সত্য, এমন প্রবলভাবে আন্তরিক না হ'ত যে তা নিজেকে কাজে প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারে নি, তা হ'লে তাঁর কাব্যের আবেদন ও এমন গভীর কী ক'রে হ'ত? প্রেমের এই একান্ত প্রবল আন্তরিকতাই কবির রচনায় এক গভীর আবেদন ও শক্তি সঞ্চার ক'রেছে। যে আইডিয়া দেখেছি তাঁর সাহিত্যে, সেই আইডিয়া দেখেছি তাঁর কাজে। "কাবুলী-আলার" বিশ্বমানবতা রূপ নিয়েছে বিশ্বভারতীতে। পল্লীবাসীর প্রতি যে গভীর দরদ নিয়ে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো লিখেছেন সেই গভীর দরদই প্রকাশ পেয়েছে শ্রীনিকেতনের পল্লী-মংগল কেন্দ্রে। শিশুর আনন্দিত কচি মনের উপরে যে উৎপীড়ন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেখে কবির মন ব্যথিত হয়েছে, সেই ব্যথার প্রকাশ হয়েছে শান্তিনিকেতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। এই সমস্ত বড় বড় কাজ ছাড়াও প্রতিদিনের জীবনে কবি আপন মনের মানবপ্রীতি কতদিন কত ভাবে প্রকাশ করেছেন তার দুটো একটা কাহিনী আমরা জান্‌তে পাই তার বিভিন্ন রচনার মধ্য থেকে।

মানুষ যে প্রেমের মধ্যেই সত্য, ভালোবাসার মধ্যেই যে তার সত্য পরিচয়, তার সত্য মূল্য, এই কথা বল্‌তে গিয়ে কবি লিখেছেন—তার জমিদারীর কোন এক কর্ম-চারীকে কেমন ক'রে তিনি সারারাত জেগে কলেরা রোগে শুশ্রূষা করেছেন। রোগের কষ্টে সে যখন পিসীমা-পিসীমা ব'লে কাতরোক্তি করছিল তখন কবি জান্‌তে পারলেন যে তার কলেরা হয়েছে। তখন আর তাকে একজন সামান্য কর্মচারী ব'লে কবির মনে হ'ল না। কবি তখন দেখ্‌লেন—কোন এক দূরপল্লীবাসিনী পিসীমার স্নেহের ধনকে। কবির মনে ছবি জেগে উঠ্‌ল সেই স্নেহ-ব্যাকুল পিসীমার দীন পল্লীকুটীরের, যেখানে সে প্রদীপ জেলে ব'সে আছে প্রবাসী ভাইপোটির মংগল কামনা ক'রে, তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। কবি আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন, সারারাত জেগে শুশ্রূষা করেও পিসীমার ধন পিসীমাকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।

কবির মত এমন একটা মূল্যবান জীবন কোন এক মূল্যহীন কর্মচারীর জন্যে বিপন্ন করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। বিপদজনক সংক্রামক রোগের মধ্যে তিনি গেছেন শুশ্রূষা করতে, এর থেকেই বোঝা যায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি কবির মনে কতখানি গভীর, কতখানি আন্তরিক ছিল।

অনুভূতির এই নিবিড় আন্তরিকতাই একদিকে তাঁর কাব্যের অনুপ্রেরণা এবং অন্যদিকে তাঁর কর্মের অনুপ্রেরণা জোগান দিয়েছে। একাধারে এতবড় কবি ও কর্মী পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। অনুভূতির এত সত্য আবেগ, এত গভীর আবেদনও আর কোন সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে ব'লে মনে হয় না। সাহিত্য জগতে একমাত্র টলষ্টয়ই বোধহয় কবির উপমা। টলষ্টয় যে মানবপ্রীতি নিয়ে তাঁর অতুলনীয় সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই অসীম মানব প্রীতির জন্যেই তিনি আপনার সমস্ত জমিদারী প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অনুভূতির এই নিবিড় আন্তরিকার জন্যেই পৃথিবীর সাহিত্যে টলষ্টয়ের লেখা এমন অদ্বিতীয়। যেখানে লেখকের মনের দরদ এতখানি সত্য নয়, সেখানে তার সাহিত্যের আবেদনও এতখানি সত্য হ'য়ে উঠতে পারে না।

প্রায় সব দেশেই ধর্মচর্চা—আর সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা যেন পরস্পর বিরোধী ব'লে মনে করা হয়। ধার্মিক মানুষকে যেন সৌন্দর্য্য-বিমুখ হ'তে হবে। কিন্তু এ মত কবির নয়। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যেই ভগবানের মুখ দেখতে পেয়েছেন, তার আপন হাতের স্পর্শ পেয়েছেন। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে কবি লিখেছেন—

"এই তো তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ
এই যে পাতায় আলো নাবচে
সোনার বরণ
এই তো তোমার মুখ নুয়েছে
মুখে আমার মুখ থুয়েছে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ
এই তো তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ।"

কবি লিখেছেন—

"যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

এ জগতে যা কিছু সুন্দর, সুরভিত আনন্দিত—তার মধ্যে কবি দেখেছেন সেই পরম সুন্দরকে, আনন্দস্বরূপকে। আনন্দপ্রিয়তা আর ধর্মচর্চার মধ্যে যে একটা বিরোধ আছে ব'লে অনেকে মনে করে, কবির মত তা নয়।

গীতাতে বিরিক্তিসেবী মানুষের কথা বলা হ'য়েছে। মানুষের মনের পরিণতির জন্যে নির্জন ধ্যানের মূল্য কবিও জানতেন। তিনি নিজে এই নির্জন উপাসনার আব-হাওয়াতেই মানুষ। এমনি উপাসনারত দেবেন্দ্রনাথের কথা তিনি লিখেছেন। কবি নিজে নির্জন উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু কবির কাছে দিনের আরম্ভে এই যে উপাসনা, এর অর্থ সারাদিনের কর্মের জন্যে আপনার মনকে প্রস্তুত ক'রে নেওয়া। আমাদের প্রতিদিনের কর্ম এমন হওয়া চাই, যেন দিনের শেষে ভগবানের সংগে আমরা একাসনে ব'সতে পারি। কবি লিখেছেন—

"দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে
ভেবে রাখি মনে মনে
কর্ম অন্তে সন্ধ্যা বেলায়
বসিব তোমার সনে।"

কিন্তু যে নির্জন ধ্যান দিনের কর্মে আপনাকে প্রকাশ করে না। যা আপনার মধ্যেই আপনি সমাপ্ত, তেমন নির্জন ধর্মচর্চাকে কবি শ্রদ্ধা করেন না। আসংগপ্রিয়তাকে কবি অধর্ম ব'লে মানেন নি। এমন কি বন্ধুদের সভায় ব'সে ধর্ম-সংগীত গাইবার অনুরোধে কবি তা গাইতে পারেন নি। কবি বলেছেন বন্ধুসভার যে গান, যে হাস্যালাপ—সেও ভগবানের সস্নেহ দৃষ্টিপাতে ধন্য। বন্ধুদের মেলা, তাদের খেলা, সে ভগবানেরই বিরাট প্রাংগণের একধারে চলছে। সে খেলা ভগবানের স্নেহ-দৃষ্টির বাইরেকার জিনিষ নয়। কবি লিখেছেন—

"কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্ধ রাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন সনে।

* * *

খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাংগণে।'

ধর্ম অর্থে কবি মানুষের স্পর্শ মানুষের সংগ পরিহার ক'রে চলাকে বোঝেন নি। সংসারের সংগে ব্যবহারেই মানুষের ধর্ম এবং অধর্ম। যে মানুষ সংসারকে পরিহার ক'রে চলে, তার অধর্ম যদি না থাকে তো তার ধর্মও নেই। সংসারের ভালো এবং মন্দ, পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে থেকেই মানুষ ক্ষণে ক্ষণে ধর্মের স্বরূপকে, ভগবানের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে। সংসারের পাপপুণ্য আলোছায়ার মধ্যেই কোন কোন শুভ মুহূর্তে ভগবানের আবির্ভাব মানুষের জীবনে ঘটে থাকে। এই সমস্ত পাপপুণ্যের মাঝেই কোনো দিন মানুষ এমন ত্যাগ, এমন বীর্য্য,—এমন মহত্ত্বের পরিচয় দেয় যে—তখন তার কাজে, তার জীবনে ভগবানের আবির্ভাব স্পষ্ট হ'য়ে, প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। যে মানুষ সংসারের পাপপুণ্য পিছনে ফেলে নির্জন ধ্যানাসনে ব'সে নাম জপ করে—তার জীবনে কোন ত্যাগ, কোন বীর্য্য, কোন মহত্ত্বের অবকাশই ঘটে না। তাই কর্মহীন, সংগহীন পাপপুণ্যবিহীন নির্জন ধর্ম-বিলাসীর জীবনে ভগবান প্রবেশের পথ পান না। কবি লিখিয়াছেন—

"চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়া-লোক
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক
যত ভালোমন্দ যত গীত গান লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে—
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি
দ্বার রুধি জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়া তোর চিত্তে পশিতাম।"

কবির মতে দেবতার আরাধনার জন্যে কোন মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন দরকারই হয় না। বরং যখন অহংকার, বিদ্বেষ, অবমাননা দিয়ে আমরা মানুষকে দূরে সরিয়ে দিই, তখন সেই সংগে ভগবানও আমাদের থেকে দূরে চলে যান। ভগবান তো ক্ষুদ্র রাজার মতন নন। তিনি যে রাজাধিরাজ। তাঁকে আনবার জন্য পথ থেকে লোক সরাবার দরকার হয় না। বরং যে পথ দিয়ে তিনি আসেন, সেই পথেই তাঁরই পিছে পিছে সমস্ত সংসার আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করে। ভগবানের প্রতি সত্যিকারের প্রেম যার আছে সমস্ত বিশ্বের মানুষ সেই মানুষের ঘরে প্রেমের আতিথ্য পায়। কবি লিখেছেন—

"ক্ষুদ্র রাজা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে—
হাঁকি কহে, 'স'রে যাও, দূরে যাও সবে।'
মহারাজ তুমি যবে এস সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে।"

কবি বলেছেন—সংসারকে বঞ্চিত ক'রে ভগবানের পূজো নয়। সমস্ত সংসারকে চরিতার্থ ক'রে তার পরেই ভগবানের পূজায় মানুষের আত্মনিবেদন সত্য হ'য়ে ওঠে। কবি লিখেছেন—

"কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়,
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।"

কবি প্রেমের মধ্যেই দেখেছেন অসীমের পরম শান্তি। জীবনের আর সব কিছুই মানুষকে ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়ে মারে। খ্যাতি, কীর্তি, ধন, সম্পদ সবকিছু মানুষের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। একমাত্র প্রেমই মানুষের আত্মাকে সংহত সমাহিত ক'রে আনে। ঠিক যেমন পরমাত্মার পায়ে এসে মানুষের চিত্তের বিক্ষেপ শান্ত হ'য়ে যায়, তার সমস্ত চিত্ত এক কেন্দ্রে স্থির হ'য়ে থাকে, তেমনি স্থিরতা, তেমনি শান্তি কবি দেখেছেন প্রেমের মধ্যে। কবি লিখেছেন—

"হে প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর—
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ—
ঘূর্ণার পাকে খরতর।
দ্বীপগুলি তব গীত মুখরিত
ঝরে নির্ঝর কলভাষে
অসীমের চির চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।"

কবি বলেন—যিনি ভগবান, যিনি দেবতা, তিনি মানুষের থেকে দূরে পাষাণ মন্দিরে একা হ'য়ে, আলাদা হ'য়ে থাকতে চান না, তিনি মানুষের মধ্যেই ছাড়া পেতে চান। লোভী মানুষ দেবতা নাম দিয়ে পাষাণ মন্দিরের মধ্যে ভগবানকে বেঁধে রাখতে চায়। আর সেই ভগবানের পূজার নাম ক'রে সরল ভক্তদের কাছ থেকে পূজারি আপনারই কৃপার মূল্য আদায় করে। কবি বলছেন সেই

পাষাণ মন্দিরের যে দেবতা তার প্রাণ কিন্তু সেই সরল মানুষগুলির মধ্যেই ছাড়া পেতে চায়, তাদের সংগই লোভী পূজারীর পূজার চেয়ে ভগবানের কাছে অনেক বেশী প্রিয়। কবি লিখেছেন—

"ভক্তেরা মন্দিরে
পূজারির কৃপা বহুদামে কিনে
পূজা দিয়ে যায় ফিরে,
ঝিল্লী-মুখর বেণু বীথিকার ছায়ে
আপন নিভৃত গাঁয়ে।
তখন একাকী, বৃথা, বিচিত্র
পাষাণ ভিত্তি মাঝে,
দেবতার বুকে জান সেকি ব্যথা বাজে
বেদির বাঁধন করিয়া ধুলিসাৎ
অচলেরে দিয়ে নাড়া—
মানুষের মাঝে সে যে পেতে চায় ছাড়া।"

কবি সংসারকে মায়া ব'লে, মোহ ব'লে দেখেন নি। তার কাছে জীবন এবং সংসার পরম সত্য। স্রষ্টার প্রেম এই সৃষ্টির মধ্যেই তরংগিত। তাই মুক্তিও যত সত্য, বন্ধনও ততই সত্য। কবির চোখে বন্ধন আর মুক্তি, একই সৃষ্টি-রহস্যের দুই দিক। তাই মুক্তিতে কবির যে আনন্দ বন্ধনেও তাই। বিশ্বলীলার মধ্যে কবি দেখেছেন কেবলি বন্ধন আর মুক্তির যুগল মিলন। বন্ধন চাইছে মুক্তি, আর মুক্ত চাইছেন বন্ধন। মানুষ চায় অসীমের মধ্যে মুক্তি, অসীম চান মানুষের মধ্যে একান্ত বন্ধন।

"অসীম যে চায়
সীমার নিবিড় সংগ
সীমা হ'তে চায়
অসীমের মাঝে হারা—।"

কবি এই জীবনকে পরম সত্য ব'লে জেনেছেন। এই সৃষ্টির মধ্যে কবি আপন অস্তিত্বের মহিমাকে উপলব্ধি করেছেন। কবি জানেন, শুধু নিরাকার নির্বিকার একই নেই। তিনিও যেমন আছেন 'আমি'ও তেমনি আছি। এই দুয়ে মিলেই চিরদিনের সৃষ্টি-রহস্য রচনা ক'রে চলেছে। তত্ত্ববিদ্ না জেনে ব'লে—সংসারে শুধু একই আছেন, আর কিছু নেই। আর সব মিথ্যা, সব মায়া। এমনি ক'রে এই যে জীবনের এতরূপ, এত বিকাশ, এত বর্ণ, এত গন্ধ, অস্তিত্বের এই রহস্য-রাশিকে তত্ত্ববিদ্ অস্বীকার করে। কিন্তু কবি অস্তিত্বের এই বিচিত্ররূপকে পরম সত্য ব'লে স্বীকার করেন। কবির চোখ এই বহুরূপের মধ্যে বিস্ময়ে আনন্দে মগ্ন হ'য়ে আছে। তত্ত্বজ্ঞানী যেখানে সব কিছু একাকার ব'লে দেখেছেন—কবি সেখানে সবিনয়ে বহুকে, বিচিত্রকে স্বীকার ক'রে আনন্দিত হয়েছেন। তাই তো কবির গান শুধুই ধর্ম-সংগীত, ভগবদ্ সংগীত নয়। তার মধ্যে রয়েছে সংসারের আনন্দ-বেদনা বিরহ-মিলনের বিচিত্র সুর। এই নিয়ে নালিশ ক'রে তত্ত্বজ্ঞানী বৃদ্ধ বলে—সংসারে একি চপলতার কথা কবি সবাইকে শোনাচ্ছে। যারা অলস মানুষ—তারা কবির গান শুনে ভগবৎচিন্তা ছেড়ে এই সমস্ত অলস কথা নিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আছে। এমনি ক'রে কবি সংসারের মানুষকে পথভ্রান্ত করছেন। এর জবাবে কবি বলেন—যে সুর সেই সুরকার মানুষের প্রাণে দান ক'রেছেন সেই একই সুর তো বাজে আমার বীণায়। কবি লিখেছেন—

"যে আনন্দে যে অনন্ত চিত্ত বেদনায়
ধ্বনিত মানব প্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর, সে তাঁহারি দান
সাধ্য নাই নষ্ট করি, সে বিচিত্র গান।"

সবার থেকে আলাদা ক'রে ভগবানকে পূজা করা কবির সাধ্যাতীত। ভগবান যদি দয়া ক'রে সবার সাথে ধরা দেন, তবেই কবি তাঁকে আদর ক'রে বরণ করতে পারেন। কবি যে ভগবানকে মান দেবেন, এমন মানী তো কবি নন, এত মান তিনি পাবেন কোথায়? তিনি যে ভগবানের পূজো করবেন, এত পূজোর আয়োজন তার কি আছে? তিনি শুধু ভালোবাসতে পারেন। কবির আশা এই ভালোবাসাতেই বিশ্ব জুড়ে বাঁশি বেজে উঠবে—আর বাগান ভ'রে ফুল ফুটে উঠবে। কবি তাই লিখেছেন—

'সবা হ'তে রাখ্‌ব তোমায় আড়াল ক'রে
হেন পূজার ঘর কোথা পাই, আমার ঘরে।
যদি আমার দিনে রাতে
যদি আমার সবার সাথে
দয়া ক'রে দাও ধরা তো
রাখ্‌ব ধ'রে।

মান দেব যে তেমন মানী
নই তো আমি।
পূজা করি সে আয়োজন
নাই তো স্বামী।
যদি তোমায় ভালোবাসি
আপনি বেজে উঠবে বাঁশি
আপনি ফুটে উঠ্‌বে কুসুম
কানন ভ'রে।"

কবির সংগে ভগবানের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভয় বা ভক্তির নয়। আপন মনের দৈন্য নিয়ে কবি আক্ষেপ ক'রে বলেছেন—

"পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে
বন্ধু ব'লে দু হাত-ধরিনে।"

সংসারকে দূরে সরিয়ে রেখে ভগবানের নির্জন আরাধনায় কবির আস্থা নেই। ভগবানের প্রতি সত্য প্রেম মানুষকে সংসারের সেবায় উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তোলে এই কবির মত। যে ধার্মিক আপনার শুচিতা বাঁচিয়ে আপন স্বর্গ-লোকের মধ্যে বাস করে, সে আপনার গড়া দেয়ালের মধ্যে আপনাকে বন্দী ক'রে রেখে আপনাকে ব্যর্থই করে। কবি বলেন, মানসিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যাই মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়, তাতেই বিফলতা নিয়ে আসে। পুণ্যাত্মা যখন পাপীর স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে চ'লে যায়, তখন সেই পুণ্য অর্থহীন হ'য়ে পড়ে এবং নিজের কাছে নিজেই একটা ভার স্বরূপ হ'য়ে ওঠে। স্বর্গ নিজেকে একান্ত পবিত্র ক'রে রাখ্‌বার চেষ্টায় নিজেকে পবিত্রতার উঁচু দেয়ালের মধ্যে বন্দী ক'রে রাখে। এই উঁচু দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে স্বর্গ যখন পংকিল মর্ত্যের দিকে প্রবাহিত হবে তখনই স্বর্গের মুক্তি। পুণ্য এবং পবিত্রতা তখনই অর্থলাভ করে, যখন সে অপুণ্য এবং অপবিত্রতাকে সংশোধন কর্‌বার ভার নেয়। কবির মতে শুধুই পুণ্যলাভের জন্যে ধর্ম-চর্চা অর্থহীন। ধর্ম আপনাকে কল্যাণ কাজেই সার্থক কর্‌তে পারে। সংসার থেকে, কল্যাণ কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে মুক্তি কবির চোখে সে মুক্তি অর্থহীন। তাতে সত্যিকারের মুক্তি নেই। তাতে মানবাত্মা আপনাকে দিয়ে আপনি সংকীর্ণতার দেয়াল রচনা ক'রে তার মধ্যে বাস কর্‌তে থাকে। সে নিজেকেও ব্যর্থ করে, সংসারকেও চরিতার্থ করে না। সবার সংগে যোগেই কবির মুক্তি। কবি লিখেছেন—

"যুক্ত করে হে সবার সংগে
মুক্ত করো হে বন্ধ।"

কবি ব'লেছেন—

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো—
সেইখানে যে প্রেম জাগিবে আমারো—
নয় বিজনে, নয় গোপনে
নয় কো আমার আপন মনে
সবার যেথা আনন্দ সেই
আনন্দ আমারো—"

কবি ব'লেছেন—

"অন্ধকারে একা একা
যে দেখা সে স্বপ্নে দেখা।"

সংসার থেকে দূরে স'রে থাক্‌লে মানুষ ভগবানকে তাঁর স্বরূপে উপলব্ধি কর্‌তে পারে না। তাকে নিয়ে আপন মনগড়া স্বপ্ন রচনা ক'রে মিথ্যা দিন কাটায়। মানুষ যেখানে সংসারযাত্রা নির্বাহ কর্‌বার কাজে মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌ছে, পরস্পরকে সাহায্য কর্‌ছে, সেইখানেই সে ভগবানকে পেয়েছে। এই জীবনযাত্রা থেকে দূরে স'রে থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। কবি ব'লেছেন—

"অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে—
কাহারে তুই পূজিস্‌ সংগোপনে
দেখ দেখি তুই দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন
যেথায় মাটি ভেঙ্গে
কর্‌ছে চাষা চাষ,
পাথর কেটে গড়্‌ছে পথ
খাট্‌ছে বার মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধুলো তাহার লেগেছে দুই হাতে।
তারি মতন, শুচি বসন ছেড়ে
আয় রে ধূলার পরে।"

ধর্মকে কবি প্রাণধর্মের বিপরীত ব'লে জানেন নি। প্রাণের যে ধর্ম, সত্যিকারের ধর্ম তাই। প্রাণধর্মের বিকৃতিতেই অধর্ম। মানুষ যেখানে সম্প্রদায় গ'ড়ে, দল বেঁধে

শাস্ত্রবচন রচনা ক'রে স্বভাবধর্মকে চেপে মারতে চেয়েছে, সেখানেই সে অধর্মকে, ধর্মের বিকারকে ডেকে এনেছে। সত্যিকারের ধর্ম নিহিত আছে মানুষের স্বভাবধর্মেরই মধ্যে। পাপ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক নয়, সেটা স্বভাবের বিকার,—কবি এই বিশ্বাসই করেছেন। শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা, দুর্বলের প্রতি সবলের দয়া, এ সবই প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষ যেখানে এর বিপরীত আচরণ করে, সেখানে সে স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করে ব'লেই পাপ করে। কবির মতে স্বভাবকে লংঘন করাই পাপ। তা না হ'য়ে প্রাণের পক্ষে পাপই যদি স্বাভাবিক হ'ত, তা হ'লে এই সৃষ্টি এতকাল ধ'রে বেঁচে থাকতেই পারত না। মা হ'য়ে সে সন্তানকে হত্যাও করে, কিন্তু এটাই যদি মাতৃত্বের স্বভাব হ'ত তা হ'লে এই সৃষ্টি রক্ষা পেত কী করে? কাজেই পাপ কখনই স্বভাব হ'তে পারে না। পাপ সর্বদাই স্বভাবের বিকৃতি। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ-প্রচলিত ধর্মমত হিসাবে যেন স্বভাবধর্মকেই পাপ বলে মনে করা হ'য়েছে। যেন প্রাণ-ধর্মকে চেপে রাখার নামই ব্রত পালন। কিন্তু স্বভাবই যে মানুষের ধর্ম, সে ধর্ম যে দেবতারই দান। তাই মানুষের এই ব্রত ভংগ হবেই, এ নিয়ম সে ভাংবেই। 'চিরকুমার সভা' নাটকে দেশের হিতের জন্যে বিয়ে করবেনা এই ছিল সভার সভ্যদের ব্রত। অক্ষয় তাদের এই ব্রত ভংগ করবার চক্রান্ত করছে, তখন পুরবালা বল্ল—'প্রজাপতির সংগে তাদের যে লড়াই। অক্ষয় জবাব দিল, দেবতার সংগে লড়াই ক'রে পারবে কেন? তাকে কেবল আরো চটিয়ে দেয় মাত্র।' স্বভাবকে চেপে মারতে গেলেই সে আরও দ্বিগুণতর প্রবল হয়ে ওঠে। সে স্বাভাবিক ভাবে আপনাকে চরিতার্থ করতে না পেলে অন্যায়ভাবে আপনাকে চরিতার্থ করতে চায়। তাই স্বভাবকে চেপে মারতে চাওয়ার অর্থ—অধর্মকে ডেকে আনা। এই জন্যেই যখন প্রস্তাব হ'ল যে সভা থেকে চির-কৌমার্য্য ব্রত উঠিয়ে দেওয়া হবে, তখন রসিক বল্লেন,—"উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোনদিন আপনি উঠে যাবে।" চন্দ্রবাবু বল্লেন—"যে জিনিষ আসবেই তাকে জোর প্রকাশ করতে না দিয়ে, আসতে দেওয়াই ভালো।"

[ক্রমশঃ

শপথ

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কোন কথা নয়, সব ফেলে দিয়ে এসো ভাই-বোন
সহাস অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমরাও করি শপথ,—
প্রবল বিক্রমে দাঁড়াবো হীন দস্যুর মুখোমুখি
সমস্ত শক্তি দিয়ে করবো শত্রুর পথ অবরোধ।

একদিন পাশাপাশি চলেছিলাম হাতে হাত রেখে
বুকের সকল প্রেম ঢেলে দিয়ে বলেছিলাম—ভাই,
আজ প্রেমের বদলে নিদারুণ ঘৃণা ঝ'রে পড়ে
চিৎকার ক'রে বলি—বিশ্বাসঘাতকের রক্ত চাই।

'হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই'—ও কেবল বুজরুকি চাল
মানুষের মুখোস প'রে শয়তান ওদের হৃদয়,
ওদের হিংস্র চোখে জলে আদিম জান্তব উল্লাস
মানুষ ওরা তো নয়—নরকের কীট কতিপয়।

পিশাচের লাল রক্তে রাঙা হোক আমাদের পথ
আমরা রক্ত দেবো, রুখে দাঁড়াবো—কঠিন শপথ।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পচিশ

বন্দনাকে প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীর শুধু ভালো লেগে গেল বললে কিছুই বলা হবে না। বন্দনার কাছ থেকে ওদের লাভও হ'ল প্রচুর। "সত্যিই প্রচুর"—সাবিত্রী বারবার বলত জোর দিয়ে—আরো এই জন্যে যে, প্রহ্লাদের প্রথম দিকে বন্দনাকে তেমন ভালো লাগে নি। মেয়েদের বেশি প্রসাধন ও সাজসজ্জা সে কোনোদিনই সইতে পারত না, বিশেষ লিপ্-ষ্টিক। পুনায় সাবিত্রীর এক সখী বিলেত থেকে ফিরে এসে নতুন ধুয়ো আনল চুলে ঢেউ খেলানোর, ফেস-লিফ্টিং-এর—আরো কত কী—শেষে মুখের উপর কি এক শাদা পালিশ চাপালো প্রায় হাতীর দাঁতের রঙ! এতটা সাবিত্রীরও ভালো লাগত না, কিন্তু মেয়েরা একটু-আধটু রুজ মাখলে তার চোখে দৃষ্টিকটু লাগত না। বলতঃ "কেন, পান খেয়েও কি সতীলক্ষ্মীরা ঠোট রাঙান না? শুধু ঠোঁটে একটু আলতা দিলেই ভাগবত অশুদ্ধ?" প্রহ্লাদ বলতঃ "আমার আপত্তি ঠোঁট রাঙানোয় নয়—'ঠোঁট কেমন লাল টুকটুকে করেছি দেখ গো দেখ'—এই ভাব ঠোঁটের আলতায় প্রকট হ'য়ে ওঠে ব'লেই আমি সইতে পারি না। তাছাড়া তোমার বন্দনাদির ঠোঁট তো স্বভাবতই লালচে—কেন মিথ্যে এ-রংকে উস্কে দিয়ে আরো জাহির করা শুনি।"

সাবিত্রীরও রোখ চেপে যেত, বলত: "মেয়েরা ছেলে নয়, মেয়ে—এই শাদা কথাটা ছেলেরা ভুলে যায় ব'লেই তারা বুঝতে পারে না—কেন মেয়েরা রঙিণ হ'তে ভালোবাসে। জীবনে তোমরা বড় বেশি ঝোঁকো—ছাইরঙা কেজোমির দিকে—মেয়েরা টাল সামলায় একটু টুকটুকে হ'য়ে উঠে। নইলে ব্যালান্স থাকে না।

প্রহ্লাদ সাবিত্রীর যুক্তিতে না হোক—ঝোঁকের প্রভাবে একটু একটু ক'রে নিজের রুচিকে শাসন করতে সুরু করেছিল বিবাহের পর থেকেই। বন্দনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে রুচি বদল করা তার পক্ষে একটু সহজ হ'য়ে উঠল, কেন না দেখল যে বন্দনা একটু-আধটু মুখে পাউডার, ঠোঁটে রং কি চোখে কাজল দিলেও—স্বভাবে যেমন সংযত, রুচিতেও তেম্নি অনিন্দনীয়। সঙ্গে সঙ্গে ও প্রথম যেন খানিকটা বুঝতে পারবার কিনারায় এল—কেন মেয়েরা সুশীলা হ'য়েও প্রসাধন পটীয়সী হ'তে চায়—এবং পরে এ-শীলতার সঙ্গে সাজসজ্জার সামঞ্জস্য করতে। বন্দনাকে গান শেখাতে নানা সময়ে নানা আলোচনায় সে যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করল যে, যেমন ঘরটি শুধু পরিষ্কার রাখাই সব নয়—ঘরের আসবাবপত্রের রূপ রং ও যথাবিন্যাসও চোখ বা মনকে কম তৃপ্তি দেয় না, তেম্নি গৃহিণীরা তাদের বেশভূষা রং প্রসাধনের যথাযথ বিন্যাস করলে তাতে গৃহীদের লাভ বৈ লোকসান নেই। এই বিন্যাস প্রসাধন এসেছে বিদেশ থেকে মানতেই হবে। কিন্তু বিদেশ থেকে তো অনেক কিছুই এসেছে—যার ফলে আমাদের রুচি বুদ্ধি ও জীবনযাত্রা সমৃদ্ধ হয়েছে। কাজেই করলই বা মেয়েরা একটু সাজসজ্জা। একটু রং দিলই বা ঠোঁটে গালে—বেশি উগ্র না হ'লেই হ'ল। সব কিছুই র'য়ে স'য়ে—বলত বন্দনা। প্রহ্লাদ হেসে জবাব দিত: "সাধু, সাধ্বী!"

বন্দনা সাবিত্রীকে একান্তে আরো অনেক কথা ব'লে শেষে বলত: "এত ক'রে তোমায় এসব বলি কেন জানো বৌদি? যাতে প্রহ্লাদদা বোঝে—বুঝলে?" প্রহ্লাদ এতে একটু আত্মপ্রসাদ বোধ না ক'রে পারে নি। শুধু সাবিত্রীকে "বৌদি বলে আপন ক'রে নেওয়াই তো নয়—এহেন নব্যা শ্রীমন্তিনী, তার মতন সেকেলে উদাসী জাতের ছেলের দরদ চায়—এতে মহাপুরুষদের মন নির্বিকার থাকলেও শিল্পী পুরুষের প্রাণে মনে একটু দোলা লাগেই। তাছাড়া বন্দনার একটি কথা ওকে ভাবিয়ে দিয়েছিল। সে একদিন বলেছিল: "গুরুমার কাছে দীক্ষা নিয়ে আমার আর কিছু লাভ হোক বা না হোক প্রহ্লাদদা, একটু বুঝতে পেরেছি যে আমরা মানুষকে তার নানা কাজ ও আচরণের জন্যে যত দায়ী করি সে তত দায়ী নয়। গুরুমা আমাকে একটি কথা প্রায়ই বলেন, জানো? বলেন: কোনো মেয়ের চালচলনের জন্যে তাকে অযথা দোষ দেই। কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র—তাই অনেক মেয়ে যেমন ফ্যাশনেবল্ হ'য়েও পতিব্রতা হ'তে পারে, তেম্নি অন্য দিকে অনেক মেয়ে লজ্জাবতী-লতা হ'য়েও এমন সব চিন্তাকে নিয়ে ঘর করতে পারে যে সব চিন্তায় মেমসাহেবেরাও লজ্জা পান।

প্রহ্লাদের খুব ভালো লাগত এই ভাবে নানা সূত্রে গুরুমার কথা শুনতে—শুধু তাঁর উক্তি না, তাঁর মতিগতি চালচলনের কাহিনী। বন্দনা তার নিজের জীবনের একটি কাহিনী বলতে বলতে একদিন অশ্রুলা হ'য়ে উঠেছিল:

"আমি আত সাধারণ মেয়ে প্রহ্লাদদা। আমার মধ্যে ভালো যদি কিছু থাকে তো সে গুরুমার সৃষ্টি। জানেন? আমি একসময়ে দুঃখ পেয়ে প্রায় সিনিক হ'য়ে উঠেছিলাম—মানুষে বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম। আমার বাবা মা দিদি সবাইয়ের মধ্যেই এত গলদ দেখেছি যে শ্রদ্ধা জিনিষটাকেই অশ্রদ্ধা করতাম জাঁক করে। কেউ কারুর কোনো তল্পি বইলে কি উপকার করলে বলতাম বাঁকা হেসে—কোনো মৎলব আছে। এমন কি গুরুমা আর গুরুদেবকে দেখেও আমার প্রথম বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু মা মারা যেতে গুরুমা আমাকে পোষ্য নেবার পরে প্রথম চৈতন্য হ'ল—দিনের পর দিন স্বচক্ষে দেখে—ওরা পরের জন্যে কত ভাবনা করেন—তাদের দুঃখের ভাগ পর্যন্ত নেন অহেতুক কৃপায়। মনে তখন সত্যি কী যে গ্লানি এল: ছি ছি, কাকে সন্দেহের চোখে দেখেছি! শুনবেন একটি কাহিনী? আমার নিজের জীবনে ঘটেছিল—শোনা কথা নয়।

"গুরুমা তখন আমাকে সবে পোষ্য নিয়েছেন—অনাথিনী দেখে। আমার নাম ছিল রমলা, গুরুমা দীক্ষা দিয়ে নামকরণ করেছিলেন বন্দনা। ধ্রুব তখন চার বছরের টুকটুকে শিশু—আমার বয়স তেরো। হঠাৎ আমার টাইফয়েড হয়। একশো চার পাঁচ ডিগ্রি জ্বর—ছাড়ে না কিছুতেই। গুরুমা তবু নার্স রাখতে দিলেন না। একটি পুরানো দাই প্রসন্নার উপর ধ্রুবকে দেখবার ভার দিয়ে আমাকে শুশ্রূষা করতেন রাতদিন অক্লান্তভাবে। সে কী শুশ্রূষা প্রহ্লাদদা, ব'লে বোঝাতে পারব না। আর কাকে বলুন তো? শুধু এক কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে নয়—এমন মেয়ে—যার মন বিষিয়ে উঠেছে সংসারের হালচাল দেখে দেখে—যে প্রথম দিকে গুরুমার স্নেহকেও বিশ্বাস করতে চায় নি। এমন মেয়ের শুধু ভার নেওয়াই নয়, তার শিয়রে রাতের পর রাত জাগা নিজের ছেলের কাছ ছাড়া হ'য়ে! কিন্তু শুধু এইই নয়, আরো আছে।

"কাশীতে নানা বাজে-মার্কা সাধু সন্ন্যাসী দেখে দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন একটা বিস্বাদ ভাব জেগে উঠেছিল। একবার হৃষীকেশে গিয়েছিলাম গুরুমার সঙ্গে। সেখানে দেখলাম কালী কমলিওয়ালীর ছত্রে—আর একটি পাঞ্জাবী ছত্রেও—হাজার হাজার সাধু এক খণ্ড রুটি ও জলবৎতরলং ডালের জন্যে ঠিক কুকুরের মতন লালায়িত। দেখতাম ছত্রের কর্তারা সাধুদের শুধু মুখেই 'মহাত্মা' বলেন—কাজের বেলায় যা ব্যবহার করেন—গুরুমা কুকুর বেড়ালের সঙ্গেও সে রকম ব্যবহার করেন না। একবার দেখলাম—এক মন্দিরের সংলগ্ন নিচের তলায় কয়েকটা আস্তাবলে এই সব 'মহাত্মারা' থাকতেন—স্বচক্ষে দেখতাম একটুকরো কাঁথা-কাপড় বা একমুঠো চালকলার জন্যে তাঁরা কী কাড়াকাড়িই না করতেন! মন আমার ধিক ধিক ক'রে উঠত প্রহ্লাদদা! বলতাম: 'মহাত্মাদেরই যখন এই আচরণ, তখন আর আশা কোথায়? গুরুমা সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন শিষ্যদের ভাঙিয়ে খেয়ে, তাই এত মুখ-

মিষ্টি। যদি অভাবে পড়তেন তো ব্যবহার করতেন ঠিক ঐ মহাত্মাদের মতনই'…এম্‌নি সে যে কী নোংরা সব চিন্তা, সন্দেহ, অভিযোগ!

"টাইফয়েডের সময়ে—বন্দনা ব'লে চলে—"আমার মনে সন্দেহ হ'ল গুরুমা চাইছেন কোনোমতে আমাকে পরপারে চালান দিয়ে অব্যাহতি পেতে। কথায় কথায় তাঁকে গাল দিতাম। খাওয়াতে এলে সাগু বার্লির বাটি টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিতাম। বলতাম—ওতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন গুরুমা। তিনি চোখ মুছতেন, কিন্তু কখনো ভুলেও ধমকাতেন না, অপেক্ষা করতেন শান্তমুখে। পরে আমার মাথা ঠাণ্ডা হ'লে আমার যখন অনুতাপ আসত, তখন তাঁকে বলতাম প্রলাপের ঘোরে কী কী বলেছি—চাইতাম ক্ষমা। তিনি আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতো বলতেন: 'আমি কিছু মনে করি নি মা। তুমি কত দুঃখ পেয়েছ আমি তো জানি। বলে না—অভাবে স্বভাব নষ্ট। তুমি সেরে ওঠো ভালোয় ভালোয়। ঠাকুরের করুণায় তোমাকে পেয়েছি মা—আমার অনেক-দিন থেকে ছিল একটি মেয়ের কামনা, কিন্তু দয়াময় ধ্রুবের পর আর সন্তান চান নি। বলতেন—পিতৃঋণ শোধ হ'য়ে গেছে এখন ঋষিঋণ ও দেবঋণ শোধার পালা। আরো বলতেন—নিজের সন্তানকে কে না ভালোবাসে? পরের মেয়েকে ঠাকুর এনে দিয়েছেন তোমার কোলে তোমাকে পরীক্ষা করবে—দেখবে ধ্রুবকে যে-চোখে দেখ বন্দনাকেও সে চোখে দেখতে পারো কি না।'

"কিন্তু এমনিই আমার মন বিগড়ে গিয়েছিল। যে একটুআধটু অনুতাপের পরেই ফের নিজেকে বলতাম। এ সব পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে-বলা-কথা সাধু সাজতে। পোষ্য মেয়ের 'পরে কোনো মা-র না কি আবার সে-স্নেহ হয়, যে-স্নেহ আসে নিজের ছেলেমেয়ের 'পরে? যা নয় তা!

"কিন্তু এসবও বেশি ভাবতে পারতাম না। মাথার যন্ত্রণায় কেবল চেঁচাতাম।··এম্‌নি ক'রে কাটল প্রায় দুসপ্তাহ। একদিন ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময়ে হঠাৎ একটা গঙ্গা ফড়িং গালের উপর বসতে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম পাশের ঘরে চাপা সুরে কথা কইছেন গুরুমা ধ্রুবর দাই প্রসন্নার সঙ্গে, যার কথা এইমাত্র বলেছি।

"প্রসন্না ধ্রুবকে মানুষ করেছিল ব'লে সত্যিই তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত। শুনলাম সে গুরুমাকে বলছে—আমাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিতে। বলছে: 'আমার মাথা খান মা, আর না করবেন না। এ খাস টাইফয়েড—ধ্রুবও রোগা ছেলে, টাইফয়েড হ'লে ও বাঁচবে না। ডাক্তারও বলেছেন—সেদিন শুনলেনই তো—যে চারিদিকেই টাইফয়েড হচ্ছে—ছোঁয়াচ কাটানোই ভালো। তাছাড়া পরের মেয়ের জন্যে ঢের তো করেছেন। আমাদের পাশের বাড়ির লেডী ডাক্তারও সেদিন আমাকে স্পষ্ট বলেছেন—এ-মেয়ে বাঁচবে না। কাজেই কেন আর মিথ্যে ওকে নিয়ে ভোগা—বিশেষ যখন পাশের ঘরেই থাকে ধ্রুব—রোগা ছেলে।"

"শুনলাম—গুরুমার সুর চ'ড়ে গেল। বললেন বিরক্ত হ'য়ে: 'তুই চুপ কর্‌ প্রসন্না। আমি দয়াময়ের কাছে মন্ত্র নিয়েছি কিসের? শুধু—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—জপের? না, সবাইকে সমান চোখে দেখবার? তিনি বলেন না: যতদিন নিজের ছেলেকে বেশি আপন ভাববে পরের ছেলেকে পর—ততদিন শুধু মিথ্যে সাধনায় ম'জে থাকবে। আজ সংকট সময়ে যদি নিজের ছেলের কথা ভেবে পরের মেয়েকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিই; তবে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। তাছাড়া ও বড় দুঃখিনী প্রসন্না, কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। আহা! তাই তো ঠাকুর ওকে এনে দিয়েছেন আমার কোলে রে। শুধু ভালোবাসতেই তো নয়—তাঁর আলোয় ওর মনের কালি ঘুচিয়ে ওকে তাঁর দিকে ফেরাতে। আমরা গৃহী বটে, কিন্তু তাই ব'লে সংসারী তো নই—দয়াময় বলেন না কি উঠতে বসতে? বলেন না কি—প্রতি পদেই ঠাকুর আমাদের পরখ করছেন—সাবধান! আমাদের সর্বদাই জলে থেকেও পদ্মের মতন নির্লিপ্ত থাকতে হবে—মানে, যদি আমরা সত্যি যোগী হ'তে চাই গৃহস্থাশ্রমে থেকে। এত শত হয়ত তুই বুঝবি না, ভাববি বড় বড় কথা। তবে এটুকু তোরও বোঝার কথা যে—ধর্‌ যদি বন্দনা আমার পেটের মেয়ে হ'ত তাহ'লে কি ওকে পাঠাতে পারতাম হাঁসপাতালে মরতে? মরা বাঁচা ঠাকুরের হাতে প্রসন্না। আমাদের 'পরে ঠাকুর কেবল একটি ভার চাপিয়েছেন—ডি, এল, রায়ের সেই বাউল গান আছে না দয়াময় প্রায়ই গান:

আমার আমার ব'লে ডাকি—আমার এ ও আমার তা,
তোমার নিয়ে তুমি থাকো, নিও না কো আমার যা।
আমার বাড়ি আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি আমার নিয়ে ভাবনা।

তিনি উঠতে বসতে বলেন আমাদের—মনে রেখো, সংসার এই "আমার-আমার" ভাবের নৈমিষারণ্য ব'লেই নির্মম হ'য়ে এই আমি-র জঙ্গল নির্মূল ক'রে ডেকে আনতে হবে তুমি-র আলো। তাই যা বলেছিস—আর কখনো অমন কথা মুখেও আনিস নি যে, ধ্রুবর কথা ভেবে সোহাগে গ'লে দুঃখিনী মেয়েকে পাঠিয়ে দেব হাঁসপাতালে। আমাকে ঠাকুর বহু লজ্জা দিয়েছেন প্রসন্না, কিন্তু সত্যি বলছি তোকে যে, আমি বন্দনার অসুখের সময়ে তাঁকে কেঁদে কেঁদে বলেছি: দেখো ঠাকুর, ভাবের ঘরে চুরি করার লজ্জা দিও না। বন্দনাকে আজো ধ্রুবর মতন অতটা স্নেহ করতে পারি না এই লজ্জায়ই কাঁটা হয়ে আছি। তাই প্রার্থনা করি কেবলই—দাও সেই স্নেহ—যে সব শিশুকেই নিজের সন্তানের মতন স্নেহ করতে পারে। এ আমি আজও পারি নি। কিন্তু তাই ব'লে এই না-পারাটাই যে আমার সব চেয়ে বড় লজ্জা একথা যেন না ভুলি। বন্দনার ছোঁয়াচে ধ্রুব যদি টাইফয়েডে মারা যায়, তা হ'লেও যেন অন্ততঃ এটুকু বলতে পারি যে মুখে এক মনে আর এ-আচরণ করি নি—ধ্রুব টাইফয়েডে পড়লে তাকে যেভাবে সেবা করতাম প্রাণ ঢেলে—বন্দনাকে যেন তার চেয়েও বেশি সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি—আরো এই জন্যে যে, তোমার পোষাকী নাম রাজরাজ, মধুসূদন কি চক্রধর হ'লেও তোমার ডাক নাম পতিতপাবন, দীনবন্ধু, অধমতারণ—যার কেউ নাই তুমি তারই সব আগে।"

"বলতে বলতে গুরুমার কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল প্রহ্লাদ-দা—সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম প্রসন্নার কান্না: 'আমাকে মাপ করো মা, আর আমি বলব না অমন কথা। আমার মন যে পাপী মা, তাই সে এ-পাপ চিন্তাকে আমল দিয়েছে…"

বন্দনার কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হ'য়ে এল অশ্রু আভাষে।

ছাব্বিশ

বন্দনাকে দিনের পর দিন নানা হিন্দি ভজন ও মারাঠী অভঙ্গ শেখাতে এসে প্রহ্লাদের আর একট লাভ হ'ল গৌণভাবে। বন্দনা গান গাইতে পারত শাদামাটা। মারাঠী মেয়েদের মতন শুধু যে তানালাপ করতে পারত না তাই নয়—গানে তার মারাঠীদের মতন নিষ্ঠাও ছিল না। অর্থাৎ গান ভালোবাসলেও খাটতে চাইতো না আদৌ। প্রহ্লাদের মনে পড়ত প্রায়ই গৌরীর কথা—কী সাধনাই না সে করত তানের মিড়ের মূর্ছনার! তুলসীদাসের কি কবীরের কি মীরার কোনো ভজন শেখাবার পরে প্রহ্লাদ গৌরীর সুরের কারুকাজের তথা সাধনার কথা তুলে শাসিয়ে বলতঃ—"মনে থাকে যেন—কাল অন্তত একঘণ্টা সাধবে এই এই মিড়, এই এই তান, আশ, খোঁচ, গমক।" ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখিয়ে দিত সুরের নানা মোচড়, গতিবিধি, বন্দেশ, কিন্তু পরের দিন চা ঢালতে ঢালতে বন্দনা প্রায়ই বলতঃ "রাগ করবেন না প্রহ্লাদদা, আপনার গানটা তোলা হয় নি—সুরটুরও সাধা হয় নি আজ সকালে। একদম সময় পাই নি। বাড়িতে হুড়মুড় ক'রে দুজন অতিথি এসে হাজির—ওঁর বন্ধু। কী করি বলুন?"

প্রহ্লাদ (অপ্রসন্ন সুরে): দুপুরে—খাওয়া দাওয়ার পরে?

বন্দনা: ওমা! দুপুরে কেউ গান সাধে নাকি? আপনাদের পুণা ঠাণ্ডা শহর সেখানে হয়ত সাধে। এখানে গরমে প্রাণ আইঢাই করে—গান গাইব বা তান সাধব কি? তা ছাড়া বাড়িতে অতিথি—বৌ মানুষ গান সাধতে পারে ঠিকে দুপুরে?

প্রহ্লাদ (রাগ ক'রে): তোমার রোজ এক না একটা নতুন ওজর। বেশ! আমি কাল থেকে আর আসছি নি। আমার সময়ের দাম আছে।"

বন্দনার তখন কাঁদো-কাঁদো সুরে সে কত কাকুতি-মিনতি, মাথার দিব্যি—প্রহ্লাদ কী আর করে? বারবার আসব না ব'লেও ফের আসতে হয়।

প্রহ্লাদ যে অসন্তুষ্ট হ'য়ে বন্দনাকে বারবার শাসিয়েও ওর দুটো মিষ্টি কথায় ভুলে যেত তার আরো একটা কারণ ছিল। সেটা এই যে, বন্দনার গান বা প্রসাধন তার ভাল না লাগলেও সঙ্গ সত্যিই ভালো লাগত। এমন সুকুমারী মেয়ে ও এর আগে দেখে নি। কত রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোভাবের আলোছায়া যে ওর মনকে চিত্র-বিচিত্র ক'রে তুলত ক্ষণে ক্ষণে! নানা আলোচনায় গাল

গল্পে বন্দনা যে কত রকম সরস উদ্ধৃতি দিত নানা ইংরাজি ও বাংলা নাটক নভেল বা কাব্য থেকে যে, প্রহ্লাদ অবাক্ হ'য়ে যেত। প্রহ্লাদ বাংলা বলতে পারত বাঙালীরই মতন সহজে, কিন্তু বন্দনা বাংলায় কত সহজে ছড়া কাটত মুখে মুখে, কবিতা আবৃত্তি করত সুর ক'রে যে—ও সময়ে সময়ে মুগ্ধ হয়ে বলত: "থেমো না বন্দনা, আরো শোনাও।" অমনি বন্দনা ওর স্নিগ্ধ কণ্ঠে—কখনো বা মুখে মুখে, কখনো বা বই খুলে—আবৃত্তি ক'রে চলত, হয় মধুসূদনের:

নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলীরে, রাধিকার মন!
চল্ সখী ত্বরা করি' হেরি লো প্রাণের হরি ব্রজের রতন।

কি রবীন্দ্রনাথের:

কিছুই চাব না মাগো, আপনার তরে
পেয়েছি যা শুধিব সে-ঋণ—
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয় ভিতরে
ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন।
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ—
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

কিম্বা প্রহ্লাদের প্রিয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের—

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়,
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
সত্যের জন্য দৃঢ়ব্রত, পরের জন্য দেওয়া প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থি দান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্তব্যজ্ঞান,
সীতার সে-স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস—
সেই রাজ্যে নিয়ে যা রে, কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে—
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে।

এইভাবে নানা বাংলা কবিতাই বন্দনা প'ড়ে প'ড়ে শোনাত প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীকে। কোনো মেয়ে যে কাব্যকে এমন সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসতে পারে প্রহ্লাদ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। তাই ও আরো বন্দনার কাছে আসত রোজ একবার ক'রে—গান শেখাতে তত নয়—যত ওর মুখে বাংলা কবিতার আবৃত্তি শুনতে।

* * *

একদিন বন্দনাকে প্রহ্লাদ বিমনা হ'য়ে একটি পূরবী-রাগের ভজন শেখাচ্ছিল:

কাহে মান করে মন মেরে? দুনিয়া রৈন বসেরা,
না ঘর তেরা, না ঘর মেরা, চার দিনোঁ কা ডেরা।
পল পল অওসর বীত গয়ো মন, অন্ত কালনে ঘেরা,
'য়ে তো লৌ হয় সাঁঝকি, ভোলে! তু সমঝা
হৈ সবেরা।

বন্দনা সুরটা আয়ত্ত করেছিল বটে, কিন্তু গাইছিল কেমন যেন প্রাণহীন ভঙ্গিতে। প্রহ্লাদ খানিকক্ষণ যথা নির্দেশের চেষ্টা ক'রে শেষে বলল ঈষৎ অতিষ্ঠ হ'য়ে: "তুমি কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ শ্লোকটি আওড়াও:
হোক না সুন্দর স্বরের ভঙ্গি, হোক না শুদ্ধ তাল ও লয়,
গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার, তাহার সেই গান গানই নয়।
তোমার গান শুনতে না শুনতে মনে হয় এ-চরণ দুটি। এ গানই নয়—হ'লই বা পূরবী ঢিমাতেতালা সুর তান তাল লয় শুদ্ধ।"

বন্দনার মুখ লাল হ'য়ে উঠল। প্রহ্লাদ ওকে মাঝে মাঝে ধম্‌কাত বটে কিন্তু এভাবে কখনো ধমকায় নি এর আগে—বিশেষতঃ সাবিত্রীর সামনে। তাই রুখে উঠে বলল: "তাহ'লে সত্যি কথা বলেই ফেলি প্রহ্লাদদা, রাগ করতে পারবেন না কিন্তু। হয় কি জানেন? আপনারা মারাঠী—হিন্দুস্থানীদের খানিকটা স্বমরই বলব—এমন কি হরফেও। কিন্তু আমরা বাঙালী, তাই না পারি ঐ গাল-ফোলা দেবনাগরীর সঙ্গে ঘর করতে, না মেরা, তেরা, সবেরা অওসর এই সব শব্দে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। আপনারা 'পিয়া' বলতে উজিয়ে ওঠেন, কিন্তু আমাদের বড় জোর পাপিয়ার কথা মনে হয়, বঁধুয়ার নয়। আমাদের মন রসিয়ে ওঠে 'বঁধু কী আর কহিব আমি' গাইতে। তাই ব'লে আমি হিন্দিগানের দুর্নাম রটাচ্ছি ভেবে বসবেন না যেন। মীরা ভজন যখন আপনি গান, সত্যিই আমার কী যে ভালো লাগে ব'লে বোঝাতে পারি নে। নৈলে কি

আপনার কাছে এত কাকুতি-মিনতি করতাম শিখতে চেয়ে? কেবল আমি কেন মাসখানেক ধ'রে এসব ভজন শিখছি জানেন? যে-গানগুলি আপনার কাছ থেকে তুলছি সেই সুরে তানে বসাচ্ছি তাদের বাংলা তর্জমা। কারণ, ঐ যে বললাম, আমরা বাঙালী, বাংলা গানেই প্রাণসঞ্চার করতে পারি, হিন্দুস্থানী তেরা মেরা তুমহারা হামারা এসব গাইতে আড়ষ্ট লাগে—বিশেষ ভক্তিভাবের পদাবলীতে। আপনি গান ঐ চারটি লাইন, তারপর আমি গাই ঐ সুরে তালেই আমার বাংলা তর্জমা—দেখবেন প্রাণ ভর ভর করছে।" প্রহ্লাদ একটু হকচকিয়ে গিয়ে ঐ চারটি চরণ গাইতে না গাইতে বন্দনা অকুতোভয়ে ধরে দিল:

মন রে! এত গরব কিসের—পান্থশালা বিশ্ব যখন?
নয় ঘর তোর—নয় আমারো—দুদিনের এ-মায়া ভুবন।
পলে পলে যায় বেলা, চারদিকেই আছে ঘিরে মরণ,
সাঁঝের অস্তশিখা ভোলা, উষা ব'লে করলি বরণ!

প্রহ্লাদ অবাক হ'য়ে গেল: "এ তর্জমা তুমি করেছ?"

বন্দনা (মুখ টিপে হেসে): নৈলে কি আপনার ধনুর্ধর ডাক্তার ভগ্নীপতি? তিনি রুগীদের ধন্বন্তরি হ'তে পারেন, কিন্তু কলুর ঘানিগাছে জুড়ে তাঁকে দশঘণ্টা ধ'রে পিষলেও একটি ফোঁটা কবিত্বের তেল পাবেন না, জানবেন। বিশ্বাস না হয় একটিবার পরখ ক'রেই দেখুন না ছাই।"

প্রহ্লাদের তবু যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। কারণ হিন্দি গানের শুধু সুর তাল নয়—ভঙ্গিটিও বন্দনার তর্জমায় বজায় রাখা হয়েছে—এ কী ব্যাপার! মারাঠী ভাষায়ও কাব্য আছে, কবিপ্রতিভার খবরও সে কিছু রাখত বৈ কি, কিন্তু এযে এক নতুন পথে নতুন আনন্দ সৃষ্টি ক'রে চলা! সে থ হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবে। সাবিত্রী হেসে ওঠে, বলে: "বাংলাদেশে কবিতার চর্চা বেশি—এ কি জানো না যে এত অবাক হ'চ্ছ বন্দনাদির কীর্তিতে?"

প্রহ্লাদ উত্তর দেবার আগেই বন্দনা বলল: "অবাক্ যখন হয়েছেন প্রহ্লাদদা, তখন আরো একটু অবাক করলামই বা। গান তো ঐ মীরাভজনটি—যেটি গত সপ্তাহে শেখাচ্ছিলেন আমাকে—ঐ 'ঐসা দিন কব আয়েগা'।"

প্রহ্লাদ গাইল বৃন্দাবনী সারং রাগে:

"ঐসা দিন কব আয়েগা প্রভু, কব ঐসা দিন আয়েগা—
প্রেমের ঐসা বল আয়েগা তুমসে রহা ন জায়েগা?

জাউগী না তীরথ মন্দির, জাউগী না বন বন,
জিত বৈঠুঁগী তেরী হো কর আ জাওগে মোহন!
ঐসী ব্যাকুল হো জাউগী—ব্যাকুল তুম্ হো জাওগে,
ময় ভী তুম বিন রহ ন সকুঁগী, তুম ভী রহ নহিঁ পাওগে।
কহতী মীরা: ও গিরধারী! কব ঐসা দিন আয়েগা—
চপল চরণ আ কৃষ্ণ কন্‌হৈয়া মীরা আন বুলায়েগা?"

বন্দনা সঙ্গে সঙ্গে ধরে দিল ঐ সুরে তালে:

সেদিন আমার আসবে কবে?—বন্ধু, সেদিন
আসবে কবে—
টানব প্রেমের এম্‌নি টানে—কেমন ক'রে দূরে রবে?
যাব না মন্দিরে তীর্থে মরতে ঘুরে বনে বনে,
যেথাই থাকি—তোমার হ'য়ে জপব তোমায় মনে মনে।
আমি হ'লে ব্যাকুল—হবে তুমিও ব্যাকুল, হে
শ্যামরায়!
চাইব আমি যেমন তোমায়—চাইবে তুমিও তেম্‌নি
আমায়।
শুধায় মীরা: কান্ত বলো, সেদিন ফিরে আসবে কবে?
নেচে চপল চরণে নাথ, মীরায় তুমি ডাকবে যবে।"

প্রহ্লাদ অবাক্ হ'য়ে গেল। সত্যিই তো বন্দনার নিষ্প্রভ কণ্ঠেও এ-বাংলা পদাবলীতে যেন এক নতুন প্রাণের স্পন্দন ফুটে উঠল! এ অসম্ভব কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

বন্দনা হেসে বলল: মেয়েরা অন্তর্যামী প্রহ্লাদদা, তাই আমি জানি আপনি কী ভাবছেন—যে, আমার জোলো কণ্ঠে কেমন ক'রে দুগ্ধের স্বাদ ফুটল। হয় কি জানেন? আমি বলছি না আমার এ অনুবাদ রসের বিচারে আপনার মূল অনুবাদের তুল্যমূল্য। কিন্তু কোনো গানকে আমি রসোত্তীর্ণ বলব—যেম্‌নি শুনে মনে

হবে সে-গান অনুবাদ নয়, নিজের পায়ে ভর ক'রেই চলেছে। এ আমি পারি কেবল মাতৃভাষায়—হিন্দিতে নয়। আমার বক্তব্য—আমার অনুবাদগুলি যখন শ্রোতারা শুনবে.তখন তারা কিছু মূলের সঙ্গে তুলনা ক'রে এদের রসের বিচার করবে না—গানগুলির প্রত্যেকটি সব জড়িয়ে মনকে আর্দ্র করল কি না সেই নিকষেই আমার গানটিকে পরখ করবে। অন্ততঃ আমি এই ভাব থেকেই অনুবাদ করি। তাই বাংলা অনুবাদে মূলের রসের অর্ধেক এলেও আমি খুসি—কেন না এর মধ্যে দিয়ে আমি অন্ততঃ কিছুটা রস তো পরিবেষণ করছি। অনেক উন্নাসিক ক্রিটিক আছেন, যাঁরা চশমা নাকে ক'রে গম্ভীর মুখে মূলের সঙ্গে অনুবাদের তুলনা ক'রে অনুবাদককে ফাঁশি দেন—মূলের সমকক্ষ নয় ব'লে। আমি তাঁদের টুকি এই ব'লে: নাই বা হ'ল সমকক্ষ! যারা হিন্দী গান বোঝে না তারা এ-গানে রস পায় কি না—মীরার ব্যথা এ-অনুবাদে কিছুটাও অন্ততঃ ফুটল কি না—এই নিরিখেই এর দাম ধরব। বুঝলেন এবার কেন আমি করি এসব অনুবাদ?"

*   *   *

এর পরে প্রহ্লাদের মনে বন্দনার প্রতি অবজ্ঞা উবে গেল—উপচিত হ'ল তার কবি-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা। ক্রিটিকদেরই স্বীকার করতে মাথা কাটা যায়। প্রতিভা সহজেই প্রতিভাকে মেনে নিতে পারে স্বীকারের আনন্দে। প্রহ্লাদ ছিল গানে প্রতিভাধর, তাই এর পর থেকে বন্দনাকে মন দিয়েই শেখাতে লাগল রোজ নানা ভজন। শুধু শেখানোর আনন্দেই নয়, এতে ওর নিজেরো স্বার্থ ছিল ব'লেও বটে, কারণ বন্দনার অনেকগুলি তর্জমাও সে মূল হিন্দীর সুরে বসিয়ে এখানে ওখানে গাওয়া সুরু করল। ফলে কাশীর বাঙালী মহলে প্রহ্লাদের প্রতিপত্তি দেখতে দেখতে বানের জলের মতন হু হু ক'রে ফুলে উঠল। বন্দনা একদিন হঠাৎ অন্তরটিপ্পনি কাটল কুটুস করে: "কেমন ওস্তাদজি? গানে আমার নিষ্ঠা নেই, হিন্দি ভজনে আমার প্রাণ নেই ব'লে আমাকে ত্যজ্য বোন করলে দাদার একটু পদবৃদ্ধি হ'ত হয়ত—কিন্তু পদাবলীর সমৃদ্ধি কি একটু কমত না বলবেন?"

সাতাশ

সাত আট দিন বাদে হঠাৎ প্রহ্লাদ মেঘলামুখে একটি চিঠি নিয়ে সাবিত্রীর হাতে দিল।

সাবিত্রীর বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল, সভয়ে বলল: "কী হয়েছে?"

প্রহ্লাদ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): যা হবার। সব ভেস্তে গেছে।

সাবিত্রী: ভেস্তে গেছে? দিদি লিখেছে?

প্রহ্লাদ: হ্যাঁ। পড়ো না—তাহ'লেই বুঝতে পারবে। মানুষ ভাবে এক—হয় আর!

সাবিত্রী পড়ল মৃদুস্বরে:

ভাই প্রহ্লাদ,

খবর ভালো নয়। ভূমিকা রেখে বলি সোজাসুজিই।

তোর চিঠি যেদিন পেলাম তার ঠিক দুদিন পরেই—অর্থাৎ গত কাল—হঠাৎ মামাবাবু প্লেনে ক'রে সোজা চ'লে এসেছেন। কাল বিকেলেই পুনায় ফিরেছেন—কিন্তু আমি জানতাম না তো তিনি আসবেন, তাই পুনায় গিয়েছিলাম গীতা প্রচারিণী সভায় হরিদ্বারের এক সাধুর বক্তৃতা শুনতে। সাধুটি গীতার কর্মবাদকে আক্রমণ ক'রে বললেন যে এসবই নিম্নাধিকারীর জন্যে। আচার ধর্ম কর্ম এসব নয়, আসল কথা জ্ঞান। বললেন তৈত্তিরীয় উপনিষদে লিখেছে বটে "ধর্মং চর"। কিন্তু তার টীকা করেছেন শঙ্করাচার্য যে, স্মৃতি শ্রুতির এসব ধর্মকর্ম আচারনিয়ম শুধু তাদের জন্যে যাদের ব্রহ্মলাভ হয় নি—"প্রাগ্ ব্রহ্মাত্ম প্রতিবোধান্ নিয়মেনানুষ্ঠেয়ানি শ্রৌত স্মার্তকর্মাণি"। আমার গুরুদেবের কথা মনে প'ড়ে আমার হাসি এল—তাই শ্লোকটি টুকে নিলাম, তুই তাঁকে জানিয়ে দিস, আর তিনি মৃদু হেসে কী মন্তব্য করেন আমাকে বলিস, কেমন? আমার কী যে খেদ হয় সময়ে সময়ে—তোকে কী বলব ভাই? এই সব শুকনো পণ্ডিতেরা যদি তাঁকে চর্মচক্ষে একটি বারও দেখত, তা হ'লে বুঝত ব্রহ্মলাভের পরেও মহাপুরুষেরা কী ভাবে পরার্থনিষ্ঠ হ'য়ে অশ্রান্ত কর্মী হ'তে পারে—গৃহে থেকেও কৃষ্ণৈকান্ত পরমভাগবত হয়ে। কিন্তু যাক সে-কথা। দুঃসংবাদের প্রসঙ্গটাই পাড়ি। Let us face the music—বলতেন না গুরুদেব প্রায়ই ব্যঙ্গ হেসে?

বম্বে থেকে মোটরে ফিরতে আমার রাত দুটো হ'য়ে

গেল। কাজেই কাল রাতে মামাবাবুর সঙ্গে দেখাও হয় নি, খবরও পাই নি যে তিনি ফিরে এসেছেন।

আজ সকালে সবে স্নান ও পূজা সেরে রমাকে দুধ খাওয়াতে বসেছি এমন সময়ে দেখি—ওমা! মামাবাবু ঢুকছেন—সেই সদাপ্রফুল্ল দিব্যকান্তি! আমি রমাকে পাশে তার দাইয়ের কোলে ফেলে দিয়েই "এ কী! মামাবাবু!" ব'লেই প্রণাম।

মামাবাবু হেসে বললেনঃ "আমি খবর না দিয়েই এলাম কারণ আমার বন্ধুটি প্রায় সেরে উঠেছেন। তাই আর দেরি না ক'রে ফিরে এলাম পুনায়—আরো খবর নিতে প্রহ্লাদ আর বৌমা দার্জিলিঙে কি না। কারণ তোরা তো কেউই লিখিস নি ওরা এখন ঠিক কোথায়। কেন লিখিস নি বল্ তো? বিয়ে করলে কি বুড়ো মামাবাবুকে এমনিই ভুলে যেতে হয় রে? তা ছাড়া কোলকাতা থেকে প্রহ্লাদ মাসখানেক আগে গানের খবর দিয়ে যে-চিঠি লিখেছিল তার পরে আর সাড়াশব্দ নেই। একটু ভাবনাও হ'ল বৈ কি—কী ব্যাপার বল তো? ওরা দার্জিলিঙে গেছে তো?"

আমি বিব্রত হ'য়ে বললামঃ "বসুন মামাবাবু। এত ব্যস্ত হ'লে চলে? আগে চা খান একটু—"

তিনি ব'সে বললেনঃ "না, এইমাত্র চা খেয়ে আসছি। আমার মনে কেমন যেন একটা আবছা উদ্বেগ এসেছে। আগে বল্ ওদের খবর। কাল বাড়ি ফিরেই তোর খোঁজ নিলাম, কিন্তু তোরা তো গিয়েছিলি পুণায়—"

আমি বললামঃ "জানতাম না তো যে আপনি আসছেন। একটা তার করতে কী হয়েছিল?"

মামাবাবু হেসে বললেনঃ "জানিস তো তোর ঝোঁকালো মামাটিকে। ঝোঁক চাপলে আর রক্ষে নেই। তাছাড়া কাল তার করবার জো ছিল না—রবিবার। কিন্তু সে যাক্, বল্ এবার—কোথায় ওরা?"

আমি অগত্যা বললাম সত্যকে বাঁচিয়েঃ "ওরা কলকাতা থেকে দুচার জায়গায় ঘুরবে লিখেছে—"

"দার্জিলিং?"

"না, দার্জিলিং যায় নি। বৌয়ের সাধ হ'ল তীর্থ করতে—"

এম্নি সময়ে সামনের বারান্দায় রমা কেঁদে উঠল। দাইয়ের কোলে ব'সে ও একটা ঝুনঝুনি নিয়ে খেলতে খেলতে পাশে মাটিতে একটা মৌমাছিকে চেপে ধরতেই এই ফ্যাসাদ। দাই চেঁচিয়ে উঠল মৌমাছি মৌমাছি ব'লে। আমি মামাবাবুকে "একটু বসুন মামাবাবু" ব'লেই ছুটে বারান্দায় গিয়ে রমাকে কোলে নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে আইওডিন লাগিয়ে দিলাম। কচি আঙুল তো—তার উপর শ্বেতপদ্মের মতন শাদা—দেখতে দেখতে রাঙা হ'য়ে উঠল। আর মেয়ের সে কী কান্না··যেন বাজই পড়েছে ওর আঙুলে। আমি ওকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গান গেয়ে—এ ও তা দেখিয়ে অনেক কষ্টে শান্ত করতে না পেরে মোটরে ক'রে চ'লে গেলাম মিলিটারি সার্জনের কাছে। তিনি হেসে বললেনঃ ছোট মৌমাছির হুল, ভয়ের কোনো কারণ নেই, সেখানে হবি তো হ—দেখা আমার এক ছেলেবেলার সখীর সঙ্গে। সে আমাকে ধ'রে নিয়ে গেল তাদের ওখানে। তার সঙ্গে ইচ্ছে করেই অনেকক্ষণ গালগল্প ক'রে কাটিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়ি ফিরলাম—"অশুভস্য কালহরণম্" নীতি মেনে। ভাবলাম মামাবাবু যদি আমার দেরি দেখে ঘরে ফিরে যান তো ভালোই—তোদের ট্রাংক কলে ডেকে পরামর্শ ক'রে ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে কী করা যায়।

কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙে। ফিরে যা দেখলাম তাতে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। তোর মস্ত চিঠিটা আমার টেবিলেই ছিল। তোর হাতের লেখা দেখে মামাবাবুর আর তর সয় নি, খুলে পড়তে সুরু করেছিলেন—ছেলের চিঠি তো, দোষ কি? যখন আমি ফিরলাম দেখি শেষ পাতাটা পড়ছেন মেঘলা মুখে। আমার পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে উঠে চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে একটি কথাও না ব'লে সিঁড়ি দিয়ে দুম্ দুম্ ক'রে নেমে চ'লে গেলেন।

তারপর থেকে মামাবাবু খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বললেই হয়। কেউ গেলে দেখা পর্যন্ত করেন না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তোকে এ-সব লিখব না—কেন মিথ্যে তোর আনন্দের আলোয় মেঘ হ'য়ে আসি? কিন্তু তা হয় না। কেন—বলি।

তোকে দুবার ট্রাংক কল দিয়েও পাই নি—তুই বাড়ি ছিলি না। ইতিমধ্যে—ওখানে গিয়ে শুনলাম—

যে, মামাবাবুর না কি জ্বর হয়েছে—তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। অগত্যা, সিভিল সার্জনের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলাম। তিনি নাছোড়বন্দ হ'য়ে দেখা ক'রে এসে আমাকে বললেন—জ্বরটার মতিগতি ভালো না। টাই-ফয়েড হয়ত নয়; তবু রক্ত নিয়ে তিনি পুনায় কয়াজির নার্সিং হোমে আজ সকালে পাঠিয়েছেন সেক্রেটারির হাতে। রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে ব্যাপার কি। তবে সে পরের কথা। এখন উপস্থিত কী করা যায় ভেবে পাচ্ছি নে ব'লেই বাধ্য হ'য়ে তোকে লিখতে হ'ল এই অপয়া চিঠি। আমার মনে হয় এবার তোদের ফিরে আসা দরকার। মামাবাবু কী বিষম অভিমানী জানিসই তো। তার উপর তুই শেষের দিকে খৃষ্টের কথা তুলে যা লিখেছিলি তাতে কোনো বাপেরই মন উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠার কথা নয়। কিন্তু মামাবাবু যতই দুঃখ পান না কেন, প্রাণ গেলেও আর কারুর কাছে তোর কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি দু তিনবার চেষ্টা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দোরে টোকা মারি, তিনি বলেন: "কে?" আমি বলি: "গৌরী।" অম্‌নি বলেন: "আমার সময় নেই।" ব্যস্।

কী করি বল্ ভাই? এখন থেকে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে তিনি যা বলবেন সেই অনুসারেই চলতে হবে—শুধু তোকে নয়, আমাকেও। জানি তিনি বলবেন: সাধনা নিতে না নিতে নানা পরীক্ষা আসে—বাধাবিঘ্নরা এসে ছেঁকে ধরে। একটি শ্লোক তিনি প্রায়ই আওড়াতেন মনে আছে যে, সাধকের সাধনা সুরু হয় শ্রদ্ধা থেকে, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন, তারপর অনর্থ নিবৃত্তি—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনাক্রিয়া ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ'—রূপ গোস্বামীর এ শ্লোকটি তোর মত বিদ্বানের অজানা নেই। আমার মনে হয় এবার তোর দোরে এসেছে অনর্থদের হানা দেওয়ার পালা। এর পরের স্টেজে হবে—অনর্থ নিবৃত্তি, যদিও কী ভাবে আমরা জানি না কেউই। জানবার উপায়ও নেই। কারণ মনে আছে গুরুদেব প্রায়ই বলতেন একটি কথা—যা হবেই তাকে ভবিতব্য বলা হয়—কিন্তু কোনো কিছুই হবেই হবে এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। ব্যাপারটা বড় জটিল, ভবিতব্যও সত্য, তার কাটান আছে এ-ও সত্য। তাই ভবিতব্য মেনেও সাধককে চেষ্টা করতে হবে সেই পথে চলতে—যে পথে গেলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়। এই পথেরই নির্দেশ এবার তোকে নিতে হবে ভাই, মন খারাপ না ক'রে। আমার সম্বন্ধেও এই কথা, তাই গুরুদেবকে আমার কথাও জিজ্ঞাসা করিস। মামাবাবুর কাছে এত স্নেহ পেয়েছি যে—আমার ভুলের জন্যেই তিনি শয্যা নিয়েছেন ভাবতেও একটুও ভালো লাগে না। কেবলই আক্ষেপ হয়—যদি তোর চিঠিটা প'ড়ে বাইরে না রেখে বাক্স বন্ধ ক'রে রাখতাম! কিন্তু সাহেবরা বলে না—wise after the event হ'তে সবাই পারে—সত্যিকার জ্ঞানী সে-ই যার আছে দূরদৃষ্টি—foresight—তাই আগে থাকতে সাবধান হয়। কিন্তু কে জানত বল্ মামাবাবু হঠাৎ এসে পড়বেন—আর আমার ঘরে এসে হানা দেবেন যখন রমাকে দুধ খাওয়াচ্ছি—তারপর রমার আঙুলে মৌমাছি হুল ফুটিয়ে দেবে—আর আমার হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে যেতে হবে খোলা চিঠিটা তাঁর চোখের সাম্‌নেই রেখে? ভবিতব্য কথাটার উদ্ভব তো অকারণ হয় নি ভাই? তাই তো পদে পদে ঘটে—যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না—জীবনের কোন্ ছন্দটা অভাবনীয় নয় বল্?

যাহোক এবার ফিরে আয়। মামাবাবুকে এখন তুই ছাড়া আর কেউ শান্ত করতে পারবে না। আমার প্রাণ-ভরা ভালোবাসা নে তোরা। গুরুদেব ও গুরুমাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিস। ধ্রুবকে আমার স্নেহাশীষ ও বন্দনাকে আমার ভালোবাসা দিতে ভুলিস নি।

ইতি।

তোর নিত্যশুভার্থিনী দিদি

আটাশ

সাবিত্রী প্রহ্লাদের কোলে মুখ রেখে ভেঙে পড়ে চাপা কান্নায়। প্রহ্লাদ এক হাতে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আর এক হাতে চোখ মোছে।

খানিক বাদে সাবিত্রী মুখ তুলে অশ্রুগাঢ়কণ্ঠে বলে: "কে শেষের দিকে খৃষ্টদেবের কথা লিখতে গেলে? বাবা ব্যথা পেয়েছেন কি সাধে?"

প্রহ্লাদ (বিষণ্ণ): আমি কি জানতাম দিদিকে-লেখা চিঠি বাবার কাছে পড়বে এ ভাবে? তাছাড়া শুধু খৃষ্ট-

দেবের কথাতেই যে তিনি এত দুঃখ পেয়েছেন তা তো নয়। আমি তাঁকে জানি তো। তাঁর মতন বাপ কজন পায়? কিন্তু তাঁর ঐ এক মহা দোষ—আমাকে এত আঁকড়ে ধরেন যে আমি নড়তে চড়তে পারি না! নৈলে কি এমন দেবকল্প গুরু ও করুণাময়ী গুরুমার কাছে দীক্ষা নিতেও এত লুকোচুরি করতে হ'ত আমাকে? আমি দীক্ষা নিলে তিনি দুঃখ পেতেনই পেতেন—আর কেন পেতেন—তুমি জানো খুব ভালো ক'রেই।

সাবিত্রীঃ জানি। তাঁর ভয়—তুমি সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাবে। সে-ভয় তো আমারও ছিল গো। কিন্তু বাবা তোমার চিঠি প'ড়ে এটুকু তো অন্ততঃ বুঝেছেন যে গুরুদেব সন্ন্যাসীদের গভীর শ্রদ্ধা করলেও বেশির ভাগ শিষ্যকে চান গৃহস্থাশ্রমেই যোগের দীক্ষা দিতে।

প্রহ্লাদ (করুণ হেসে): তুমি এবার মাষ্টারণীর ঢঙে কথা বলা সুরু করেছ বৌ! বাবা কি এক্ষেত্রে গৃহী যোগীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর ঘরছাড়া সাধনার তফাৎ আছে ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারেন কখনো? বাবার মূল আপত্তি—যোগে, গুরুবরণে। তাছাড়া একটা কথা আমাদের মানতেই হবে—বাবা ঠিকই ধরেছেন—যে, গৃহী যোগী হবার পরে আর ঐহিক সংসারী থাকা চলে না। বাবা চান আমরা চলব ঠিক তাঁর সংসারী ছন্দে—মামুলি, সাবধানী—যার মন্ত্র হ'ল 'আমার আমার ব'লে ডাকি, আমার এ-ও আমার তা'—গুরুদেব বারবারই কি বলেন না একথা? মতভেদ যখন এই মূল চলার ছন্দ নিয়ে, তখন কোথাকার কে এক গুরু উড়ে এসে জুড়ে ব'সে আমাদের দীক্ষা দেবে এক নতুন ছন্দে চলতে—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারেন কখনো? তিনি কি প্রায়ই বলেন না—"কেন? গুরুর ঘটকালি দরকার? ভগবানকে কি সোজাসুজি ডাকা যায় না? তিনি গুরুকে তাঁর আরদালি ক'রে পাঠিয়েছেন শমন জারি করতে?" তিনি উঠতে বসতে গুরুবাদকে যা মুখে আসে তাই ব'লে গাল দেন—এ কি জানো না তুমি? কাজেই তিনি ঘা খেয়েছেন আসলে খৃষ্টদেবের কথায় নয় ঘা খেয়েছেন আমার দীক্ষা নেওয়ায়—আরো বেশি লুকিয়ে দীক্ষা নেওয়ায়।

সাবিত্রী (মুখ নিচু ক'রে): তা বটে। তবে বড় কষ্ট হয় তাঁর কথা ভাবতে (ফের চোখে আঁচল)

প্রহ্লাদঃ মিথ্যে কান্নাকাটি ক'রে কী হবে বৌ? মীরার গান স্মরণ করো: "হোনী থী সো হোঈ"—যা হবার হ'ল—ভবিতব্য। এ হ'তই হ'ত; অন্ততঃ আমাকে যেতেই হ'ত এ-পথে—স্বধর্মকে অঙ্গীকার ক'রে। উপায় কী বলো? পূর্ণ দীক্ষা যে চায় তাকে তো মানতেই হবে যে সংসারে গুরুর চেয়ে বড় কেউ নেই। গুরুকে ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি ব'লে চিনেও যে মানতে নারাজ যে, গুরুজনের চেয়েও গুরু বড় তার উপাধি কী দেবে—"ভণ্ড চেলা" ছাড়া? তোমার মনে নেই সেদিন গুরুমা কী বললেন?—যখন তিনি গুরুবরণ ক'রে তাঁর পায়ে ঠাঁই নিলেন তখন তাঁর শাশুড়ী ঠাকরুণ কান্নাকাটি ক'রে কী কুরুক্ষেত্রই না করালেন কী শাপমন্যিই না দিলেন সেই পূজ্যপাদ সাধুকে যাঁকে শুধু যে পাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা ভক্তি করত তাই নয়—তিনি নিজেও দুবেলা প্রণাম ক'রে চরণামৃত সেবন করেছেন উঠতে বসতে! (দীর্ঘনিশ্বাস) গুরুদেব তাইতো প্রায়ই উদ্ধৃত করেন খৃষ্টদেবের উক্তিঃ "আমি শান্তি দিতে আসি নি, এসেছি—মানুষকে সংসারের মায়া থেকে মুক্তির দীক্ষা দিতে—মার কাছ থেকে মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে বাপের কাছ থেকে ছেলেকে, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে।" সবাই ভগবানকে ভুলে সংসারের মোহ-নেশায় ম'জে কী ভাবে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে তার সুব্যবস্থা দিতে তো আসেন না মুনি ঋষি গুরু অবতারের দল।

সাবিত্রী (ক্লিষ্ট কণ্ঠে): কিন্তু গুরুদেব তো সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন যে গৃহস্থাশ্রমেই সবচেয়ে বড় সাধনা হয়—হার্মনির—সমন্বয়ের।

প্রহ্লাদঃ কিন্তু সে-সাধনা করে কে? বৈষয়িক সংসারী, না গৃহী যোগী? গৃহস্থাশ্রমকে বড় বলার মানে নয় গৃহস্থের আসক্তির ছন্দকেও মঞ্জুর করা। তুমি কী এত বৈষ্ণবপদাবলী শুনলে গত দু'সপ্তাহ ধরে? বারবারই কি আমাদের হিয়া রাধার কাছে বাঁশির টান সংসারের টানের চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে না? এটুকুও যদি না ধরতে পেরে থাকো তা হ'লে চণ্ডীদাসের গানে সেদিন এক গঙ্গা চোখের জল ফেললে কেন শুনি যখন গুরুদেব গাইছিলেনঃ

কলঙ্কিনী বলি' ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ,
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।

সাবিত্রী (ব্যথিত কণ্ঠে): অমন ক'রে ধমকায় না। আমি এটুকুও কি আর বুঝি নি যে, গৃহী যোগী আর সংসারী বিষয়ীর মধ্যে তফাৎ আকাশপাতাল ? কিন্তু বাবা দুঃখ পাচ্ছেন আমাদের জন্যে, আর সে এমন দুঃখ যে তাঁকে শয্যা নিতে হ'ল—এ ভাবতেও বুকের মধ্যে আমার মোচড় দিয়ে ওঠে—কী করব ? তোমার আমার কাছে গুরুদেব গুরুমা সবার বড় জানি। কিন্তু একথায় বাবার সান্ত্বনা পাবার পথ কোথায় বলো তো ? তুমি যে তাঁর শিরার রক্ত চোখের তারা, বুকের নিশ্বাস—জানো না কি নিজেই ?

প্রহ্লাদ (মুখ নিচু ক'রে খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে): সব জানি বৌ, বাবার দুঃখও আমি বুঝি। কিন্তু কি জানো ? আমার কোনোদিনই ভালো লাগে নি এই সব দাবিদাওয়া আঁকড়ে ধরা কাড়াকাড়ি—উপায় কী ? বাবা আমাকে গভীর স্নেহ করেন জানি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও তুমি জানো না যে, সংসারী বাবামার স্নেহমমতা যে ছন্দে চলে তিনি ঠিক্ সেই ছন্দে চলতে চান—তাই না তিনি এত দুঃখ পান ভেবে যে তিনি যা যা ঠিক মনে করেন আমার কাছে ঠিক মনে না হ'লে আমি তাঁর ভালোবাসার অমর্যদা করলাম ? (দীর্ঘনিশ্বাস) তবে এর পরা কী বলো—যখন সংসারীরা চলবেই চলবে তাদের মনের প্রাণের কামনা বাসনা রীতি নীতির নির্দেশে ? তাই যতই সংসারকে চিনি ততই পড়ি আমি অথই জলে, বিষাদে মন ছেয়ে যায় ভাবতে—যাকে ভালোবাসি তাকে নিজের তাঁবে রেখে নিজের মনের মতনটি ক'রে গড়তে না পারলে কেন এত রুখে উঠি ? যত ভুল বোঝাবুঝি মনকসাকষির মূল ত এই আত্মম্ভরী গোঁ যে, আমি যা চাই বা ভালো মনে করি ভগবান্ গুরু সাধুসন্তকেও তাতে ষোলো আনা সায় দিতেই হবে—যে-মুহূর্তে না দেবেন, সে-মুহূর্তে তাঁরা বাতিল—নামঞ্জুর। আমি আমি আমিই সংসারের কেন্দ্র—স্বামী কর্তা বাপ মা—কাজেই "আমার আমার" ব'লে যাদের লালন করি তাদেরও সবাইকে আমাকে ঘিরেই জয়ধ্বনি করতে হবে—ভগবান্‌কে মেনে নয় আমার, মধ্যেকার ঝাঁঝালো রোখালো হর্তাকর্তা অহং হাকিমের হুকুম মেনে। অন্ততঃ চল্‌তি গৃহকেন্দ্র জীবনের এইই ছন্দ। গুরুদেব গৃহে আসীন হ'য়েও চাইছেন এই ছন্দটির মোড় ফিরিয়ে দিতে। অর্থাৎ সাধকদের গৃহস্থাশ্রমের কেন্দ্র হবে মা বাপ স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে নয়—এমন কি দেশও নয়—শুধু ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়ম্—যাঁকে প্রিয়বরণ করেছি ব'লেই সংসারের আর সবাই প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সর্বাধীশকে সবার আগে সবার উপর বসিয়ে তবে আর সকলকে যাজনা দেওয়া, মেনে চলা, খুসি করা। এ যদি আমাদের গৃহী যোগদীক্ষার মন্ত্র ব'লে মেনে নেও তাহ'লে যেখানেই আর সকলের ইচ্ছার সঙ্গে ভগবানের ইচ্ছার বিরোধ সেখানেই তোমাকে নির্মম হ'তে হবে—হবেই হবে, যদি সত্যি সাধনা করতে চাই। আর, এ-নির্মমতাকে যদি বরণ করতে না পারি তাহ'লে আমরা শুধু যে গুরুদেবের গৃহযোগের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করতে পারব না তাই নয়—মুখে এক মনে আর হ'য়ে না পাব সংসারী ঋদ্ধি, না ঈশ্বরী সিদ্ধি। এখন বেছে নিতে হবে তোমাকে আমাকে—কী চাই আমরা ? (পায়ের শব্দে চম্‌কে) কে ? ধ্রুব ? কী রে ?

ধ্রুব: বাবা আপনাদের তৈরি হ'তে বলছেন। আজ বেলা সাড়ে নটায় কাশী নরেশের শিবালা মন্দিরে ভজন, মনে আছে তো, না ভুলে ব'সে আছেন ? আপনি যে ভুলো !

প্রহ্লাদ (চম্‌কে): ভজন ! তাই তো ? একি ? ন-টা !

ধ্রুব (খিল খিল ক'রে হেসে): আপনি কী যে প্রহ্লাদদা ! আজই ভোর বেলায় মা বলেছেন—এরি মধ্যে সব ভেস্তে গেল ! হ্যাঁ, বাবা আরো বললেন মনে করিয়ে দিতে যে, আজ আপনারই নামে কাশী নরেশ নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়েছেন। কাজেই মূল গায়েন আজ তিনি নন, আপনি। আর—আর—হ্যাঁ, কাশী নরেশ মোটরও পাঠিয়েছেন দুটো। একটাতে বাবা মা ও গম্ভীরানন্দজি বেরিয়ে গেলেন। অন্যটিতে আপনাদের নিয়ে আমাকেই যেতে হবে।

সাবিত্রী (হেসে): তাহ'লে আর আমাদের ভয় কি ভাই ? তুমি সেখানে নায়ক !

ধ্রুব (পিঠ পিঠ): আর দাদা যেখানে গায়ক !

সবাই হেসে ওঠে।

[ক্রমশঃ

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশন

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১লা, ২রা ও ৩রা চৈত্র, কৃষ্ণনগর সহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ২৬ তম বার্ষিক অধিবেশন যথোচিত মর্যাদা ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন বঙ্গসাহিত্যসেবকদের অতি প্রিয় সংস্থা। বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার, বিশেষ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ সম্প্রসারণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে বঙ্গভাষাভাষী বিভিন্ন স্থানে সম্মিলন কর্তৃপক্ষ মাসিক সভার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে স্মরণীয় বঙ্গসাহিত্য-রথীদের স্মৃতিবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন। সাধারণ মানুষের সহিত যোগাযোগ নিবিড়তর হইবে বলিয়াই সম্মিলনের মাসিক অধিবেশন অধিকাংশক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয় মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে ১৩১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক এবং ইহাতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতপর ক্রমেই সম্মিলনের প্রসার হইতে থাকে এবং পরবর্তী বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে মূল সভাপতি বা শাখা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য যদুনাথ সরকার, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার মৈত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শশাঙ্কমোহন সেন, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, জগদানন্দ রায়, অমৃতলাল বসু, জলধর সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, মানকুমারী বসু, অনুরূপা দেবী, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডঃ কুদরত-এ-খুদা, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বরেণ্য সাহিত্যরথীবৃন্দ। দুর্ভাগ্যক্রমে ২৩টি বার্ষিক অধিবেশনের পর বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের কার্যধারা নানা কারণে স্তিমিত হইয়া পড়ে। দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে বঙ্গসাহিত্য-অনুরাগীদের আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৩৬৭ সনে বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠে এবং এই বৎসর ২৬শে ও ২৭শে চৈত্র ইহার ২৪তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের নিকটবর্তী বৈষ্ণবচক গ্রামে। এই অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কথাসাহিত্য, কাব্যশাখা, প্রবন্ধ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা এবং শিল্পসাহিত্য শাখায় যথাক্রমে শ্রীমনোজ বসু, শ্রীনরেন্দ্র দেব, ডঃ যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরী, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রভাতকিরণ বসু সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন পুনরুজ্জীবনের জন্য বঙ্গসাহিত্য অনুরাগীরা কতখানি আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণবচক অধিবেশনের সর্বাঙ্গীণ বিপুল সাফল্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির ও বৈষ্ণবচকের জনসাধারণের আদর-আপ্যায়ন উপস্থিত সকলকেই অভিভূত করিয়াছিল।

গত বৎসর অর্থাৎ ১৩৬৮ সালের ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই অগ্রহায়ণ বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরি গ্রামে বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পঞ্চানন্দ) পিতৃভূমিতে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ২৫তম বা রজতজয়ন্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে মূল

সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ এবং কথাসাহিত্য শাখায় শ্রীসরোজ-কুমার রায়চৌধুরী, কাব্য শাখায় শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রবন্ধ সাহিত্য শাখায় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শিল্প ও সংস্কৃতি শাখায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, নাট্য সাহিত্য শাখায় শ্রীমন্মথ রায়, সংবাদসাহিত্য শাখায় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এবং শিশু সাহিত্য শাখায় শ্রীইন্দিরা দেবী সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম, পি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালি অধি-বেশনের উদ্বোধন করেন।

এ বৎসর কৃষ্ণনগরে বার্ষিক সম্মেলনের স্থান নির্ধারণের পশ্চাতে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। কৃষ্ণনগর কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভূমি, বর্তমান বৎসরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনও এবার কৃষ্ণনগরে বার্ষিক সম্মিলন অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য ইতিপূর্বে বর্তমান বৎসরের ভাদ্র মাসে কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলালের এক মহতী স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়।

তিনদিন ব্যাপী কৃষ্ণনগর বার্ষিক সম্মেলনে মূল অধি-বেশন ব্যতীত আটটি শাখার অধিবেশন হয়। বিগত বৎসরের গঙ্গাটিকুরী বার্ষিক সম্মিলনের শিল্প ও সংস্কৃতি শাখা ছাড়া অন্য সব শাখার অধিবেশনই কৃষ্ণনগর সম্মেলনে হয়, তদুপরি স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দুইটি পৃথক অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়।

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে প্রায় একশত প্রতি-নিধি বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে যোগদানের জন্য ১৫ই মার্চ শুক্রবার সকাল ৮টায় শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। মূল অধিবেশনের ও বিভিন্ন শাখার কয়েকজন সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকও এই দলের সঙ্গে ছিলেন। বিখ্যাত চারণ-গায়ক শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় সারা পথ তাঁহার সঙ্গীত লহরীতে মাতাইয়া রাখেন। কৃষ্ণনগরে প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক স্ফীত হয়। প্রতিনিধিদের প্রধানত স্থান দেওয়া হয় কৃষ্ণনগরের দেবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে।

কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনের সুরম্য প্রশস্ত হলে সম্মিলনের মূল অধিবেশন বসে ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। ইহার কিছু পূর্বে কৃষ্ণনগর বার্ষিক অধিবেশনের অঙ্গ হিসাবে এই রবীন্দ্র ভবনেই বাংলা সাময়িকপত্র ও চিত্রাদির একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ইহাতে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। অধিবেশনটির উদ্বোধন করেন শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবং ইউ এস আই এস-এর প্রতি-নিধি মিঃ ষ্টালিন বি ষ্টীল সভায় ভাষণ দেন। উদ্বোধক, প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের ভাষণে বাংলা সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের কথা আলোচনা করিয়া বর্তমান যুগসঙ্কটের প্রতিক্রিয়া এবং সাহিত্যিকদের কর্তব্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাপতি ডাঃ মজুমদার বিশেষভাবে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সর্বতোভাবে স্বাধীনতা রক্ষার উপর জোর দেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত মতপ্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব নহে, ভারতমাতার পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য রচনা বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। যে বাঙ্গালী প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও ভারতমাতার সুসন্তান তাহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এই অবসাদগ্রস্ত বাঙ্গালী জীবনে নূতন প্রাণশক্তি আনয়নের চেষ্টা করা'। সভাপতির ভাষণের পর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহরায় ও বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় রিপোর্ট পাঠ করেন। মূল অধিবেশনের শেষে শ্রীতরুণ রায়ের প্রয়োজনায় কলিকাতার 'মুখোস' নাট্যসংস্থা ভারতের উপর চীনাদের বর্বর আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত পূর্ণাঙ্গ 'সৈনিক' নাটকখানি অসামান্য সাফল্যের সহিত অভিনয় করেন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনের

সাফল্য কামনা করিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল প্রমুখ অনেকে বাণী প্রেরণ করেন,মূল অধিবেশনে উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তিসঙ্গীত গান করেন যথাক্রমে সঙ্গীতসুধানিধি শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও বিখ্যাত লোক-সঙ্গীতশিল্পী শ্রীতারাপদ লাহিড়ী।

১৬ই মার্চ শনিবার সকাল ৮টায় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ হইতে বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে সুচিন্তিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পর ঐদিন বেলা ১০টায় সুরু হয় কাব্যশাখার অধিবেশন। এই সভার উদ্বোধন করেন দেশপ্রেমিক কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং ইহাতে সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। উভয়েই কবিদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সত্যানুভূতির উপর জোর দিয়া জাতীয় জীবনে কবিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে, রসগ্রাহী আলোচনা করেন। তাঁহাদের ভাষণান্তে কবি সম্মেলনে শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণ-রত্ন, শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন মিলাইয়া মোট ২৮জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

এইদিন বৈকাল ৪টায় শিশুসাহিত্য শাখার অধিবেশন বসে। শ্রীমতী সাধনা রায়ের পরিচালনায় কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক শ্রীননী-গোপাল চক্রবর্তী। শিশুসাহিত্যের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ ও শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ এবং শিশুসাহিত্যের প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষকুমার দে। সভায় শ্রীমতী সুনীতি গুপ্তা এবং শ্রীষষ্ঠীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে একটি প্রবন্ধ ও একটি কবিতা পাঠ করিয়া-ছিলেন। সভাপতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনায়ণ ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে বাংলা শিশুসাহিত্যের বিগত অর্ধশতাব্দীর বিপুল অগ্রগতির কথা দরদের সহিত আলোচনা করিয়া আমাদের দেশের সাহিত্যের আসরে শিশু সাহিত্যিকেরা এখনও অনেকটা অপাংক্তেয় হইয়া আছেন বলিয়া ক্ষোভপ্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, হান্স এ্যাণ্ডারসন, গ্রীম ভ্রাতৃযুগল, ড্যানিয়েল ডিফো, ষ্টো প্রভৃতি ও দেশের শিশুসাহিত্যিকদের সাহিত্যিক মহলে অন্যান্য সাহিত্যিকদের সহিত সমান মর্যাদার কথা। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন যে শিশু সাহিত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান না করিয়া সমান মর্যাদায় বার্ষিক অধিবেশনে স্থান দিয়াছেন এজন্য তিনি সম্মিলনকে ধন্যবাদ জানান।

শিশুসাহিত্য শাখার অধিবেশন অন্তে শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সাহিত্যশাখার অধিবেশন বসে। শ্রীমতী রেখা চক্রবর্ত্তীর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর এই সভায় উদ্বোধক, প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জরাসন্ধ)। সভায় শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত সভ্যতার সঙ্কট ও সাহিত্যেকের কর্ত্তব্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী প্রথমেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর নির্ভরতার স্থলে এক নূতন কালচেতনা এবং ভাবালুতামুক্ত কঠিন বাস্তববোধ দেখা দেওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি মতপ্রকাশ করেন যে, গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের পথে যে সব সাহিত্যিক পদচারণা করিতেছেন তাঁহাদের যাত্রা জয়যাত্রার গৌরব-বাহী। এই প্রসঙ্গে বর্তমানের নানা জটিল ও বিচিত্র সমাজ সমস্যার মাত্র স্থূল কুৎসিত অংশ ও কলুষ রস সম্বল করিয়া তথাকথিত বাস্তবধর্মী গ্রন্থরচনাকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

সাহিত্য শাখার পর রাত্রি সাড়ে সাতটায় বসে নাট্য-শাখার অধিবেশন। এই শাখার উদ্বোধন করেন শ্রীদেব-নারায়ণ গুপ্ত এবং ইহাতে প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ও বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বাংলা নাটকের ইতিহাসে নদীয়া জেলার সার্থক অবদান সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় বলেন যে, নাটক লোকশিক্ষার বাহন এবং তিনি বর্তমান জাতীয় সঙ্কটের দিনে নাট্যকারদের কর্তব্যানুরক্তির উপর

বিশেষ জোর দেন। অতঃপর ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে বাংলা নাটকের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সমাজ কিংবা জীবনের প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া কোন দিনই বাংলা নাটক জীবনবিমুখী হয় নাই। চলচ্চিত্রের যুগে বর্তমানে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগরীতির উপর অতিনির্ভরতার ফলে প্রথম শ্রেণীর নাটক সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে,একথা স্বীকার করিয়াও তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে, এখনকার শৌখীন নাট্যসংস্থাগুলি ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে বলিয়া ইহাদের মাধ্যমেই প্রথম শ্রেণীর নাটক সৃষ্টি হইবে। ভাষণের শেষদিকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া ডাঃ ভটাচার্য বলেন যে, মন্দাকিনীর ধারা যেমন মহাদেবের জটাজাল আশ্রয় করিয়া মর্তের ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, বাংলা নাট্যসাহিত্যধারাও আদি এবং মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকেই আশ্রয় করিয়া আধুনিক যুগের মনোভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

পরদিন রবিবার ১৭ই মার্চ সকাল ৮টায় প্রখ্যাত মনীষী অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর সভাপতিত্বে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম-শতবার্ষিকী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্রলালের মাতৃভূমি, এইজন্যই বিশেষ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সভাটিতে বিশেষ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে দ্বিজেন্দ্রলালকে বন্দনা করার পর দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীকুমারেশ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণনগরের নাগরিক শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায়, অধ্যাপক শ্রীস্মরণ আচার্য এবং অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ভাষণে এবং ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীসন্তোষকুমার দে কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন। সভাপতি অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রসসমৃদ্ধ অভিভাষণে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব ও নাট্যরচনাশক্তির সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া সভাস্থ সকলকে বিমুগ্ধ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল একদা সম্ভবতঃ রাজদ্রোহের অভিযোগের সম্ভাবনায় মূল "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ" পংক্তিটি "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহিতো মেষ" রূপে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন, বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতে পংক্তিটির মূলরূপই পুনরায় প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রবিবার বৈকাল ৪ টায় প্রবন্ধশাখার অধিবেশন বসে। এই সভায় উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগরের কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সুবোধরঞ্জন রায় এবং সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার কাজি আবদুল ওদুদ। শ্রীতিনকড়ি দত্ত, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীরণেশ পোদ্দার ও শ্রীমঞ্জু গুহরায় সভায় বাংলা সাহিত্যের চিন্তাশ্রয়ী সমালোচনা ও প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি এবং সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের মূল্যবান ভাষণে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বহুমুখী অগ্রগতিতে সন্তোষপ্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রবন্ধের মননশীল জগৎ রসসাহিত্যের জগৎকেও স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। জাতীয় সমৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশের সহিত প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বর্তমান।

প্রবন্ধ শাখার অধিবেশন সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বসে সঙ্গীত শাখার অধিবেশন। এই শাখার উদ্বোধন করেন মার্গসঙ্গীতশিল্পী শ্রীসুধাময় গোস্বামী এবং সভাপতিত্ব করেন সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীযুক্ত গোস্বামী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাহায্যে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করায় সমাগত রসিকমণ্ডলী পরম প্রীতিলাভ করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁহার সুললিত ভাষণে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত ধারার ঐতিহ্য সংরক্ষণের দিকে সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন।

রবিবার রাত্রি ৮টায় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনের সমাপ্তি সভা বসে সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে। এই সভায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাবসমূহ উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাতীয় নেতা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বঙ্গগৌরব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অবনী রায়, বলাই দেবশর্মা, রমেশ সেন, হরিকুমার চক্রবর্তী, ডাঃ হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, নির্ঝরিণী সরকার, ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী, সুবোধ রায় প্রমুখ যে সব সাহিত্যিক ১৩৬৯ সালের মধ্যে পরলোকগমন করিয়াছেন সভায় তাঁহাদের অমর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারী প্রস্তাবে সভায় সন্তোষ জানানো হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, নদীয়া জেলাতেই চৈতন্য মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত হইয়া এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষা কল্পে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃষ্ণনগরস্থ জীর্ণ বাস্তভিটায় একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নামে ডাকটিকিট প্রবর্তনের দাবী জানাইয়া সভায় একটি প্রস্তাব লওয়া হয়। সভায় গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষার বাহন হিসাবে এবং সরকারী ও বেসরকারী কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবী জানানো হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলনের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেন।

অতঃপর বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক, বক্তা, শ্রোতা, এবং অভ্যর্থনা সমিতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বার্ষিক অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিভিন্ন অধিবেশনে সঙ্গীতসুধানিধি শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গম্ভীরাপরিষদের প্রবর্তক লোকসঙ্গীত-শিল্পী শ্রীতারাপদ লাহিড়ী তাঁহাদের সঙ্গীত লহরী পরিবেশন করেন।

সুসজ্জিত সুরম্য বিশালায়তন রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী অধিবেশনটি সবদিক দিয়াই সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই সাফল্য সম্ভব হইয়াছে প্রধানতঃ অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহরায় ও শ্রীনির্মল দত্ত এবং বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সাধারণ সচিব শ্রীসুরেন নিয়োগী, শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পুরাণ-রত্ন শ্রীসন্তোষ রায়, শ্রীরাধারমণ মিত্র, ডাঃ শম্ভু পাল প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য।

ব্রজের রাখাল

বিষ্ণু সরস্বতী

ক করিতে আর মথুরায় যাব? নগরের লোভ নাই।
জ-পশু-পাখি-তরুলতা-সাথে
মিতালি করেছি তাই।
ওই যে দেখিছ যমুনার জল,
ওরি মত হেথা হিয়া নির্মল,
সদা শিহরিত চারু নীপ দল
প্রেম-বরষণে পাই।
রাজার সভায় কি করিব বল পল্লী-বালক মোরা
রাজভোগে ভাগ চাইনা বসাতে,
বেঁচে থাক ননীচোরা।
হেথা মধুময় মৃণালের দল
মধুময় হেথা বনজাত ফল
দেয় পিপাসায় সুশীতল জল
গোবর্ধনের ঝোরা।

হয়েছে কৃষ্ণ মথুরায় রাজা! রাজারে চিনি না কই।
চিনি না জীবনে, জানিনা জীবনে রাখালের রাজা বই।
রাজার দণ্ড ধরে না সে হাতে,
রত্নমুকুট পরে না সে মাথে,
বেড়ায় না কভু অমাত্য সাথে,
মোরা তার সাথী হই।

কে বলে কৃষ্ণ গেছে মথুরায়? আছে সে
মোদেরি সা
আজো সে বাজায় বাঁশির বাঁশরী মধুর অর্ধ-রাতে,
আজো হেরি হাসি বন-আলো-করা
শুনি তার কথা সদা-মধু-ঝরা
কে বলে অধর? দিয়েছে সে ধরা
গেঁয়ো রাখালের হাতে।

ঠাকুরঝি'র বিয়ে
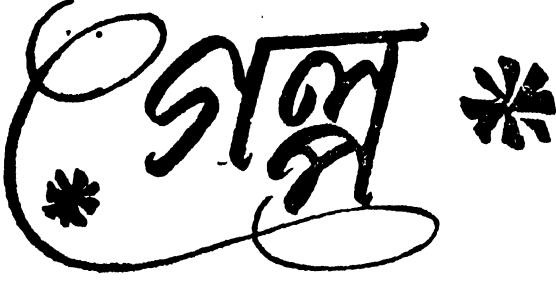
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

২২

লীলা রান্নাঘরে ছিল। বাহিরের ঘরে সুরেশ ও গুণেনের গলা শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই কড়াইটা উনান হইতে নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে আসিয়া উহাদের কাছে আসিয়া বসিল। সুরেশ বলিল, গুণেন বিলেত যাচ্ছে। লীলা সাগ্রহে বলিল, তাই নাকি? কবে?

গুণেন বলিল, শিগ্‌গিরই।

লীলা বলিল, এ তো খুব সুখবর। আচ্ছা, একটু বস তোমরা। আমি এখুনি আসছি। রান্নাটা প্রায় শেষ হয়েছে।

একটু পরে লীলা ফিরিয়া আসিল। সুরেশ বলিল, আমার তো অফিসের সময় হ'ল। তোমরা ব'স।

সুরেশ স্নান করিতে গেল!

লীলা বলিল, তা হ'লে চল্লেন আমাদের দেশ ছেড়ে?

গুণেন। হ্যাঁ, একটা সুযোগ জুটে গেল। আসি একটু ঘুরে। ফিরে এলে চাকরিবাকরির একটু সুবিধে হ'তে পারে।

লীলা। কতদিন থাকবেন?

গুণেন। বছর দুয়েক।

লীলা। দু—বছর!

গুণেন। দু'বছর আর এমন বেশি দিন কি? দেখতে দেখতে কেটে যাবে?

লীলা। হ্যাঁ। ওদেশে গেলে দু'বছর আর কি? কত কাজ, কত পড়াশোনা, কত দেশ দেখা, কত লোকের সঙ্গে আলাপ—দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। এখানকার সময় কিন্তু অত সহজে কাটে না।—একটু বসুন, দাদার ভাতটা দিয়ে আসি। আপনি পালাবেন না।

গুণেন। আমি এখন যাই। এই খবরটা দিতে এলুম।

লীলা। আচ্ছা, একটু বসুন না, আমি এখুনি আসছি।

লীলা ভিতরে গেল। সুরেশ বলিল, সব একবারেই বেড়ে দাও। তোমাকে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। গুণেন একা বসে আছে। ওর কাছে গিয়ে ব'সগে।

লীলা আসিয়া গুণেনের কাছে বসিল। সুরেশ খাওয়া শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি অফিসে চলিয়া গেল।

লীলা বলিল—ওখানে গিয়ে আমাদের কথা কি আর মনে থাকবে?

গুণেন। কেন থাকবে না? সব মনে থাকবে।

লীলা। বলা যায় না।

গুণেন। আমি কি এতই—

লীলা। শুধু আপনার কথা বলছি নে। ওখানে গেলেই দেখি—সবারই মাথা ঘুরে যায়।

গুণেন। আমার মাথা ঠিক থাকবে। আর যদি মাথা ঘুরেই যায়, তাতে আপনার কি?

লীলা। কিচ্ছু না, আমার আবার কি?

গুণেন। আচ্ছা, আজ কি রেঁধেছেন?

লীলা। ইস্, একটু আগেও যদি বলতেন—

গুণেন। কেন?

লীলা। কিছুই যে রাঁধিনে আজ।

গুণেন। তবু—

লীলা। সিম ভাতে দিয়েছি। আর বেগুন ভাজা, ছোলার ডাল। আর পার্শে মাছের ঝাল।

গুণেন। পার্শে মাছের ঝাল? বাস, আর কিছু চাই নে। আপনার হাতের মাছের ঝালের কথা স্বাতীর কাছে কতবার শুনেছি। একটু না চেখে যাচ্ছি নে। বিলেতে তো মাছের ঝাল খেতে পাব না। চলুন, আমার খিদে পেয়ে গেছে।

লীলা বলিল, একটু বসুন। ভাত বেড়ে আপনাকে ডাকছি।

লীলা রান্নাঘরের দিকে চলিল। গুণেনও পিছনে পিছনে চলিল। লীলা এক থালা ভাত ভাল করিয়া বাড়িয়া ভাজা, ঝাল, ইত্যাদি সাজাইয়া আনিয়া গুণেনের সামনে টেবিলের উপর রাখিল। বলিল, বসুন।

গুণেন। আমি একা বসব নাকি?

লীলা। হ্যাঁ।

গুণেন। সে হবে না। নিয়ে আসুন আপনার থালা বেড়ে।

লীলা। আমি পরে খাব, আপনি বসুন।

গুণেন। ভাত বুঝি বাড়ন্ত! আচ্ছা, যা কিছু আছে সব নিয়ে আসুন। ভাগ করে খাওয়া যাবে।

লীলা। আপনি বসুন না।

গুণেন। তা হবে না। আসুন আপনার থালা। নইলে আমিই রান্নাঘরে গিয়ে নিয়ে আসব।

লীলা। যেতে হবে না আপনাকে রান্নাঘরে। আপনি যখন বলছেন, নিয়ে আসছি আমার থালা।

দুইজনের থালা টেবিলে সাজাইয়া উহারা খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে গুণেন বলিল, কি চমৎকার রাঁধেন আপনি। আমি আবার পেটুক কি না। ভাল রান্না পেলে আর আমার জ্ঞান থাকে না।

লীলা একটু একটু করিয়া তাহার নিজের ভাগের খাবারগুলি ক্রমে ক্রমে গুণেনের দিকে আগাইয়া দিতে লাগিল। গুণেনও খাইয়া যাইতে থাকিল। একটু পরে গুণেন বলিল, কই আপনি খাচ্ছেন না?

কি করে আর খাব? আপনিই তো সব খেয়ে ফেল্লেন।

গুণেন বলিল, তাই তো! কি আশ্চর্য! আমি অত লক্ষ্যই করিনি। চমৎকার হয়েছে মাছের ঝালটা। শুধু ঝাল দিয়েই সব খাওয়া হয়ে যেত। তা যেন হ'ল। আপনি কি খাবেন?

আমি খাব'খন। সেজন্য ভাববেন না। গৃহস্থের বাড়ীতে একজন বেশি লোক এলেই কি খাবার ভাবনা হয়?

গুণেন বলিল, না, এখনই আপনাকে খেতে হবে।

লীলা। আচ্ছা, এই আমি খাচ্ছি।

লীলা তাহার নিজের থালার অবশিষ্ট ডাল প্রভৃতি যা ছিল, তাহাই ধীরে ধীরে খাইতে লাগিল। বলিল, আমার রান্না খেয়ে আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমার ভারি তৃপ্তি হচ্ছে। ওতেই আমার পেট-ভরে গেছে। রেঁধে খাওয়ান মেয়েদের একটা রোগ, জানেন?

গুণেন। তাই দেখছি। আপনার এ রান্নার কথা আমি কখনো ভুলব না।

লীলা। আমার রান্নার কথাটাই শুধু মনে থাকবে, আর কিছু না?

গুণেন। সবই মনে থাকবে।

লীলা। থাকবে?

গুণেন। নিশ্চয়ই থাকবে।

লীলা। ও কথা বলে সবাই। আবার ওদেশে গিয়া সাদা সাদা গায়ে-পড়া মেয়ে দেখে সব ভুলতেও দেরি লাগে না।

গুণেন। আমি যে বল্লাম, আপনার তাতে কি, তার কোন উত্তর দিলেন না?

লীলা চুপ করিয়া রইল।

গুণেনও হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। একটু পরে বলিল—এতখানি আমি এর আগে ভাবিনি। আচ্ছা লীলা, আজ আমি উঠি। বেলা হয়ে গেছে। বাড়ী গিয়ে স্বাতীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

লীলা। তাই নাকি?

গুণেন। হ্যাঁ, আমার ওই বোনটা—ওর সব ভাল, কিন্তু ভীষণ—

লীলা। ভীষণ কি?

গুণেন। ভীষণ হিংসুটে।

লীলা। আর আপনি? খুব উদার, না?

গুণেন। আচ্ছা, আজ আমি আসি, কেমন?

লীলা। আসুন। দেখা যাবে, বিলেতে গিয়ে আমাদের কথা কেমন মনে থাকে।

গুণেন। দেখবেন, নিশ্চয়ই দেখবেন।

গুণেন বাহির হইয়া গেল। লীলা অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

২৩

দুপুর বেলায় লীলা একটু গড়াইতেছে। অপর্ণা দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, ভাল লাগছিল না। তাই একটু এলাম তোমার কাছে।

লীলা বলিল, এসো, শুয়ে পড় এখানে।

পাশাপাশি শুইয়া তাহারা গল্প করিতে লাগিল। অপর্ণা বলিল, একটা গল্প শুনবে?

লীলা। শুনবো।

অপর্ণা। অজিতবাবু কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন!

লীলা। তার মানে?

অপর্ণা। দাদার কাছে বলেছেন, তুমি নাকি তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছ।

লীলা। তা হ'লে বিয়ে হচ্ছে না কেন?

অপর্ণা। তোমার দাদা আর বৌদির ভয়ে।

লীলা। তাই নাকি?

দরজায় শব্দ শুনিয়া লীলা বলিয়া উঠিল, কে?

সুনন্দা। আমি সুনন্দা।

লীলা। এস, ভিতরে এস।

ভিতরে গিয়া সুনন্দা বলিল, এই যে অপর্ণাও এখানে এসেছিস?

সুনন্দা একখানি চেয়ারে বসিতেই—লীলা ও অপর্ণা উঠিয়া বসিল। লীলা বলিল, কি আমার ভাগ্য! তুমিও এসেছ?

সুনন্দা। বৌদি বাড়ী নেই। তুমি একলা রয়েছ। তাই একটু এলাম।

লীলা। তা, বেশ করেছ। ব'স।

সুনন্দা। একটা খবর জান?

লীলা। কি খবর?

সুনন্দা। আমি আজকাল ঘটকালি করছি।

লীলা। তাই নাকি? তা হ'লে ননদটির ব্যবস্থা করছ না কেন?

সুনন্দা। তা কি আর করছি নে?

অপর্ণা বলিয়া উঠিয়া, যাও, বৌদি?

সুনন্দা। তোমার একটা সম্বন্ধ এনেছি, খুব ভাল

লীলা। রাজপুত্রটি কে? কোন দেশের রাজা

সুনন্দা। হ্যাঁ, সে আমাদের কাছে রাজাই বটে

লীলা। রাজার নাম?

সুনন্দা। রাজার নাম অজিত।

লীলা গম্ভীর হইয়া গেল। পরক্ষণেই বলিল, ও-রাজার উপযুক্ত রাণী আমি নই।

সুনন্দা। কি করে জানলে?

লীলা। ছোট বেলা থেকেই তাঁকে চিনি। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পার? এমন রাজার এতদিন একটি রাণী কেন ঘরে আসে নি?

সুনন্দা। বোধ হয়, তোমারই জন্য।

লীলা। আমার রাণী হবার ইচ্ছে নেই।

সুনন্দা। সত্যি বলছো?

লীলা। হ্যাঁ, ভাই, সত্যি বলছি।

অবলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এই যে দিদিমণিরা—তোমরা খাবে কিছু?

সুনন্দা। এই অসময়ে আবার কি খাবো?

লীলা। ওর এটা একটা অভ্যাস। লোক বাড়ীতে আসতে দেখলেই খোঁজ করে, কিছু খাবার-টাবার আনতে হবে কি না।

সুনন্দা। খুব ভাল অভ্যাস, কি বল?

লীলা। (অবলাকে) এখন কিছু আনতে হবে না, যা।

সুনন্দা। ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার বৌদি এখানে নেই। নইলে তাঁর সঙ্গেও একটু পরামর্শ করতুম।

লীলা। ঘটকীমশায় কত টাকা পাবেন?

সুনন্দা। শুধু টাকা? একছড়া হারের কমে আমি খুসী হ'ব না। আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি নে, অমতটা কোন দিকে। একটু মন খুলে বলই না, তুমি অজিতবাবুর জন্য—

লীলা। না, আমি অজিতবাবুর জন্য পাগল হইনি।

তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, এ নিয়ে আর আলোচনা করো না। আমার ভাল লাগে না। এসব কথা কানে গেলে সবাই মজা করবে, হাসবে, রঙ্গ করবে। তাতে আমার বা তোমার কারোই কোন লাভ হবে না। তোমার হারের আশা ছাড়। তুমি বরঞ্চ তোমার এই ননদিনীর কথাটা চিন্তা করে দেখো।

অপর্ণা ফোঁস করিয়া উঠিল, আমি বিয়েই করব না কোনদিন।

লীলা, সে দেখা যাবে'খন। যখন সময় হবে—

সুনন্দা লীলাকে বলিল, তোমার এখনও মন ঠিক হয়নি, দেখছি।

লীলা। মন আমার ঠিক হয়ে গেছে। যাক, ওসব কথা এখন থাক। কদিন পরে দেখা হ'ল। তোমরা সব কেমন আছ ?

সুনন্দা। ভালই আছি। আচ্ছা, এখন আসি।

লীলা। এস।

অপর্ণা বলিল, চল বৌদি, আমিও উঠি।

২৪

লীলা ডাকিল, দাদা !

সুরেশ। কি ?

লীলা। বউদি কবে আসবে ?

সুরেশ। কালই আসবার কথা।

লীলা। কালই ? আমি পরশু ওখানে গিয়েছিলাম। কিছু বললো না তো আমাকে ?

সুরেশ। কাল আমাকে বলেছে।

লীলা। বেশ। খোকাটি কি সুন্দর হয়েছে, দেখেছো ? প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, যেন রোগা রোগা। কিন্তু এই কয়দিন পরেই দেখলুম, খাসা হয়েছে।

সুরেশ। এবার একটা লোক না রাখলে কিন্তু হবে না।

লীলা। হ্যাঁ। আমি খোকাকে নিয়েই থাকব। সংসারের কাজ করবার জন্য একটা লোক দরকার কিন্তু।

সুরেশ। সে হবে'খন।

লীলা। আর একটা প্যারামবুলেটর।

সুরেশ। আচ্ছা, আচ্ছা, অত নবাবী না করলেও চলবে।

খোকা আসিবে শুনিয়া লীলা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। পরদিন খোকাকে কোলে করিয়া স্বাতী বাড়ী ফিরিল। লীলা শাঁখ বাজাইল, খোকাকে কোলে করিয়া চুমু খাইল ? তারপর খোকাকে কোলে করিয়া বারান্দায় বেড়াইতে লাগিল।

স্বাতী সহসা লীলার কোল হইতে খোকাকে লইয়া আসিয়া বলিল, বেলা হচ্ছে। এবার হেঁসেলের দিকে একটু যাও। আর একটু জল গরম করে পাঠিয়ে দিও অবলাকে দিয়ে।

লীলা খোকাকে স্বাতীর কোলে দিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সুরেশ বলিল, একটা লোক না রাখলে চলছে না। লীলা একা কত পারবে ?

স্বাতী। আর লোক বাড়াতে হবে না, এখুনি। খোকাকে আমিই দেখবো। ঠাকুরঝি আর কি করবে, শুনি ?

সুরেশ। বুঝবে না তুমি। চব্বিশ ঘণ্টা কি তুমি খোকাকে আগলে নিয়ে বেড়াবে নাকি ?

স্বাতী। তা, ঠাকুরঝিও না হয় একটু দেখবে। এখুনি লোকজনের বায়না ক'র না। খোকার জন্যই কত খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

সুরেশ। যা বোঝ, কর।

সমস্ত দিন লীলা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া খোকাকে কোলে লইতেছে, আদর করিতেছে। লীলা স্বাতীকে বলিল, দাদাকে বলো একটু উল কিনে দিতে। খোকার একটা জামা বুনে দেব।

স্বাতী। বেশ, দিও। দেখ ঠাকুরঝি, একটা কথা তোমায় বলি। উনি বলছিলেন একটা লোকের কথা। তুমিই বুঝে দেখ, ঠাকুরঝি, এখনই এমন করে বাজে খরচ করাটা কি ভাল ? তুমিই বল।

লীলা বলিল, বাজে খরচপত্র করা কখনই ভাল নয়।

স্বাতী। আমিও তাই বলি। সংসারে কি খরচের শেষ আছে ? কিই বা কাজ আমাদের ? আমরাই করে নিতে পারব, কি বল ?

লীলা। হাঁ, তা—দুজনে মিলে করলে কেন করে নেওয়া যাবে না ? এখন ওসব কথা থাক বৌদি। আজ

খোকা এল এ বাড়ীতে। চল, একটু রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা যাক। কতদিন নিজে হাতে করে তোমাদের খাওয়াতে পারি নি। বল না, কি রাঁধবো? দাদাকে জিজ্ঞেস কর না। তুমিও বল না, কি খাবে? দাদাকে বল না, একটু মিষ্টি-টিষ্টি কিনে আনতে। অবলা হাঁ করে রয়েছে, মিষ্টি খাবে বলে।

স্বাতী। রান্নাবান্নার হাঙ্গামা আমার ভাল লাগে না। তুমিই যা হয় কর। আমি ভাবছি, ওঁর সঙ্গে একটু সিনেমায় যাব। তুমি খোকাকে একটু দেখো।

লীলা কোন কথা বলিল না।

ঘরে গিয়া লীলা কিছুক্ষণ খোকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যেন আপন মনেই ধীরে ধীরে বলিল, ঠিক দাদার মতই হয়েছে।

২৫

লীলার কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ঘরকন্নার সব কাজ তো আছেই। তার পর খোকার কাজ। ক্রমে ক্রমে খোকার সব কাজই লীলার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। উদয়াস্ত খাটুনি ছাড়া লীলার জীবনে আর কিছু রহিল না।

লীলা একদিন দাদাকে একান্তে পাইয়া বলিল, একখানা সাড়ী না কিনলে চলছে না।

সুরেশ সেইদিনই অফিস হইতে ফিরিবার সময়ে একখানা শাড়ী কিনিয়া আনিয়া লীলার হাতে দিল। স্বাতী নিজের হাতে নিয়া শাড়ীখানা একটু খুলিয়া দেখিয়া বলিল, কোন দোকান থেকে এনেছ এ শাড়ী? এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে অন্য কম দামের শাড়ী নিয়ে এস। এত দামী শাড়ীর কি দরকার?

সুরেশ বলিল, এ আর দামী শাড়ী কোথায়। আজকাল এ দামের কমে একটু ভাল শাড়ী কি পাওয়া যায়? আর একেবারে যা-তাই-বা ওকে পরতে দেবো কেন?

স্বাতী বলিল, অত আদিখ্যেতা আমার ভাল লাগে না।

সুরেশ বলিল, আচ্ছা, ও শাড়ীখানা হাতে করে ওকে দিয়েছি, ওখানা আর ফিরিয়ে দিয়ে কাজ নেই। আবার যখন কেনা হবে, তখন দেখা যাবে।

স্বাতী বলিল, এই তো কাছেই দোকান। কতক্ষণ লাগবে যেতে আসতে? দাও ক্যাশমেমো, আমিই যাচ্ছি।

এই কথা বলিয়া ক্যাশমেমো ও শাড়ী হাতে করিয়া স্বাতী বাহির হইয়া গেল, এবং একটু পরে একখানা কম দামের শাড়ী আনিয়া ঘরে খাটের উপর রাখিয়া আসিল।

সুরেশ ক্রোধে ও অভিমানে চুপ করিয়া রহিল। এতদিন পরে স্বাতী বাড়ী আসিয়াছে। আজই এমন ব্যাপার ঘটিবে, লীলা বা সুরেশ কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার পর সাজিয়া গুজিয়া স্বাতী সুরেশকে বলিল, কটা বাজল?

সুরেশ। কেন?

স্বাতী। মনে নেই?

সুরেশ। ও, সিনেমা? আজ থাক। আমার ইচ্ছে করছে না।

স্বাতী। টিকিট করেছ না?

সুরেশ। ও হ্যাঁ, টিকিট করা হয়েছে বটে।

স্বাতী। তবে?

সুরেশ। টাকাটা খরচ হয়েই গেছে। না গেলেই বা কি? এখন গিয়ে টিকিট ফেরত দেবার চেষ্টা করতে আমার ইচ্ছে করছে না।

স্বাতী। খরচ যখন হয়েই গেছে, তখন না গিয়েই বা লাভ কি? ওঠ, চল।

সুরেশ। আমার ইচ্ছে করছে না যেতে।

স্বাতী। তা' যাবে কেন? এতদিন দূরে ছিলাম, বেশ ছিলে। এখন কাছে আসতেই আর ভাল লাগছে না। যদি আর কেউ বলত, তাহলে এখুনি ছুটে বেরুতে।

সুরেশ। ছিঃ, কি যা তা বলতে আরম্ভ করেছ?

স্বাতী। তুমি সিনেমায় যাবে কিনা, বল?

সুরেশ মনে মনে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাতীর সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য যেন তাহার ছিল না।

লীলা আসিয়া বলিল, দাদা, এ তোমারই অন্যায়। এতদিন পরে বৌদি বাড়ী এল। সখ করে একটু সিনেমায় যেতে চাইছে। টিকিটও করেছ। এখন 'না' বলাটা ভারি অন্যায়। যাও, ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো। খোকাকে আমি দেখব'খন। ওঠ।

লীলার কথা শুনিয়া সুরেশ একটু শান্ত হইয়াছে। লীলা তাহা হইলে রাগ করে নাই। কি আশ্চর্য মেয়ে।

সুরেশ ধীরে ধীরে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া স্বাতীর সহিত সিনেমা দেখিতে চলিয়া গেল।

২৬

বছর দুই পরে। লীলা গিয়াছে স্বাতীদের বাড়ী বেড়াইতে। বিভাবতী একদিন অনুযোগ করিয়াছিলেন, লীলা মোটেই আমাদের বাড়ী আসে না।

লীলা বিভাবতীকে প্রণাম করিয়া বলিল, এলুম একবার আপনাদের দেখতে। কাজের ঝঞ্ঝাটে আমার বেরুনো হয় না। আপনি নাকি স্বাতীর কাছে বলেছেন, আমি বুঝি রাগ করেই এখানে আসি না। আমি কি আপনার 'পরে রাগ করতে পারি? আপনি যে আমার মায়ের মত।

বিভাবতী। বস, মা, বস। কেমন আছ সব?

লীলা। সবাই ভাল আছি। খোকাটা কি দুষ্টুই হয়েছে। দিনরাত দুষ্টুমি করে।

বিভাবতী। তা তো করবেই। অমনি করেই ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়। স্বাতী কেমন আছে?

লীলা। আপনার কাছে বলছি। ওর শরীর বেশ নরম হয়ে পড়েছে। বোধ হয় আপনার কাছে এখন থাকলে ভাল হয়। আমি একা মানুষ। তাছাড়া আপনার কাছে যে যত্ন পাবে, তা কি আর আমাদের বাড়ীতে সম্ভব?

বিভাবতী। তা বেশ তো। এখানে এসে থাকবে। আমারও একা একা কি ভাল লাগে? বাড়ীতে একটি লোক নেই। গুণেনের বিলেত যাবার পর থেকে ওই রণেনই হয়েছে সম্বল। সারাদিন একটু কথা বলবার লোক পাইনে। স্বাতী কাছে থাকলে ঘর যেন ভরা থাকে।

লীলা। একা খোকাই পারবে আপনার ঘর ভরে রাখতে। তবে ওর জন্য একটা ঝি না রাখলে চলবে না।

বিভাবতী। নিশ্চয়ই। একটা ভাল ঝি'র খোঁজ আছে আমার কাছে। আজই খবর দেবো। বিলেত থেকে গুণেন লিখেছে, তার নাকি ফিরতে আরো দু'বছর দেরি আছে। কি গেরো! ভাল লাগে না আমার এতদিন ছেলেদের বিলেতে থাকা।

লীলা বলিল। গুণেনদা সর্বদা চিঠি লেখেন?

বিভাবতী। লেখে, কিন্তু তেমন ঘন ঘন লেখে না। বোঝে না, ওর জন্য আমাদের কত ভাবনা।

লীলা। আরো দু'বছর থাকবেন। সত্যি, আপনার কষ্ট হবারই কথা। কখনও কি ওদের ছেড়ে আপনি থেকেছেন?

বিভাবতী। কি করব বাছা। পুরুষ ছেলে। ওদের কি আর ঘরে পুরে রাখা যায়?

লীলা। চিঠিতে কি লেখেন তিনি? ও দেশের সব নানা রকম খবর, না?

বিভবতী। তা লেখে। কত নূতন দেশের কত খবর!

লীলা। এখানকার কথা, মানে, আপনাদের সব কথা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেন না?

বিভাবতী। হ্যাঁ। ধরে ধরে সবার কথাই জিজ্ঞেস করে। কে কেমন আছে, কোথায় আছে, সব তার জানা চাই।

লীলা। আমাদের বাড়ীর কথা, স্বাতীর কথা, খোকার কথা লেখেন?

বিভাবতী। লেখে না ত কি? প্রত্যেক চিঠিতে আগেই লেখা চাই—ও বাড়ীর খবর কি? লীলা কেমন আছে? তবে হ্যাঁ, গত পাঁচ ছয় মাস থেকে দেখছি, চিঠিগুলো খুব ছোট ছোট। কারো খোঁজ খবর বড় একটা করে না।

লীলা। বেশি দিন বিদেশে থাকলে বোধ হয়, অমন হয়।

বিভাবতী। চিঠি লিখুক আর নাই লিখুক, ভাল আছে, সেটা জানতে পারলেই হ'ল।

লীলা। আরো দু'বছর! আপনার খুব কষ্ট হবে।

বিভা। কি আর করব, বল?

এমন সময় রণেন দৌড়িয়া আসিয়া একখানা চিঠি বিভাবতীর কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, দাদার চিঠি। চিঠি দিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বিভাবতী। খোল না চিঠিখানা। আমি দেখতে পাই নে।

লীলা চিঠি পড়িল। ওখানকার কিছু কিছু খবর আছে। আর এদেশ সম্বন্ধে শুধু লিখিয়াছে, তোমরা সব কেমন আছ, জানাবে। কারো সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর জানার আগ্রহ নেই।

চিঠি শুনিয়া বিভাবতী বলিলেন, কিছুদিন ধরে ঠিক

এই রকম চিঠি লিখছে—তোমরা সব কেমন আছ? ওখানে নানা কাজ, নানা ঝঞ্ঝাট—কিই বা লিখবে। যাক, ভগবান করুন, আর দু'টো বছর ভালয় ভালয় কেটে যায়; তাহলেই রক্ষে।

বিভাবতী ডাকিলেন, রণু!

রণেন আসিলে, বিভাবতী বলিলেন, ওই মোড়ের দোকান থেকে কখানা শিঙাড়া নিয়ে আয় তোর দিদির জন্য। যা, এখুনি যা।

শিঙাড়া খাইয়া ও একটু জল খাইয়া লীলা বলিল, উঠি আজ। কাল পরশুই বৌদি এখানে এসে যাবে।

লীলা বিদায় লইল।

বিভাবতী তাঁহার নাতির অভ্যর্থনা ও বাসস্থানের ব্যবস্থায় মন দিলেন।

২৭

স্বাতী ও খোকা চলিয়া গিয়াছে। লীলার অবসর বাড়িয়াছে। বহুদিন লীলা কোন থিয়েটারে যায় নাই একদিন দাদাকে বলিল, দাদা, অনেকদিন কোন থিয়েটারে যাই নি। নানা কাজের চাপে সময়ও হয় না, উৎসাহও হয় না। যাবে একদিন?

সুরেশ। আচ্ছা, দেখ্ না কবে কোথায় কি থিয়েটার আছে।

লীলা। আমি কাগজ দেখেছি। কাল একটা ভাল নাটক আছে।

সুরেশ। আচ্ছা, আজই টিকিট কিনে নিয়ে আসব।

লীলা। কখানা টিকিট কিনবে?

সুরেশ। কেন, দুখানা?

লীলা। বৌদির জন্য একখানা কিনবে না?

সুরেশ। না, থাক। আর একদিন ওদের বাড়ীর কাউকে নিয়ে গেলেই হবে।

সুরেশ ও লীলা থিয়েটার দেখিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

থিয়েটারের ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ে সম্মুখের উঠানে অজিতের সঙ্গে দেখা। অজিত বলিল, এই যে, আপনারাও এসেছেন?

সুরেশ। হ্যাঁ, অনেকদিন কোন থিয়েটার দেখি নি।

অজিত। এ নাটকটা মন্দ নয়, কি বলেন?

সুরেশ। বেশ ভালই লাগল আমাদের। আপনার সঙ্গে উনি কে?

অজিত। উনি আমার এক বন্ধু। ক'দিন হ'ল বিলেত থেকে এসেছেন। উনি আপনাদের আত্মীয় গুণেনবাবুকে চেনেন?

সুরেশ। নমস্কার! আপনি গুণেনবাবুকে চেনেন?

বন্ধু। হ্যাঁ, আমরা কাছাকাছিই ছিলাম।

সুরেশ। শুনলাম, ওঁর ফিরতে দেরি হবে।

বন্ধু। হ্যাঁ, মানে, বাধ্য হয়েই দেরি হবে।

সুরেশ। কেন, কোন বিপদ আপদ নয় তো?

বন্ধু। বিপদ আপদ বলা যায় না। তবে—মানে- একটু গোলমাল আর কি?

সুরেশ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম গোলমাল?

ভদ্রলোক বলিলেন, সেসব আর আপনারা এখন নাই শুনলেন।

সুরেশ। কি ব্যাপার? একটু খুলেই বলুন না। বুঝতেই পারেন, আত্মীয় স্বজনের মনে কেমন ভয় ভাবনা হয়।

ভদ্রলোক অজিতকে দেখাইয়া বলিলেন, এঁর কাছেই আপনারা সব শুনতে পাবেন। ইনি আপনাদের বাড়ীর কাছেই থাকেন। শুনেছি এক সময়ে আপনাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

এই কথা বলিয়া ভদ্রলোক এবং অজিত চলিয়া গেলেন।

লীলা বলিল, দাদা, আমার একটা কথাও বিশ্বাস হয়না। কোন খারাপ কিছু হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি নে। তবে হ্যাঁ, কাজ কর্ম নিয়ে কোন গোলযোগ হতে পারে। যাক গে। চল, রাত হয়ে যাচ্ছে।

সুরেশ বলিল, কিন্তু—ভদ্রলোক কি একেবারেই সব কথা বানিয়ে বললেন।

লীলা। অসম্ভব নয়। এখন বাড়ী চল।

ট্রামে বাসে খুব ভিড় দেখিয়া উহারা একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া উঠিয়া বসিল। পথে ভাই বোনের বিশেষ কোন কথা হইল না।

২৮

সেদিন সুরেশ অফিস হইতে ফিরিলে, লীলা সংবাদ দিল, বৌদির মেয়ে হয়েছে। রণেন এসে বলে গেছে।

সুরেশ বলিল, ও।

লীলা। দেখ দাদা, ওদের শিগগিরই নিয়ে এস এখানে। স্বাতীর মার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বেশিদিন ওখানে না রাখাই ভাল।

সুরেশ। সামনের রবিবারেই নিয়ে আসব।

স্বাতী ছেলেমেয়ে লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। লীলার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। প্রথম কিছুদিন মেয়েটাকে স্বাতীই দেখিত। খোকা থাকিত পিসিমার কাছে। কিছু-দিন পরেই দুইজনেই পিসিমার ভক্ত হইয়া উঠিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পিসিমার কাছেই থাকে। লীলাই তাহাদিগকে খাওয়ায়, জামা কাপড় পরায়, সঙ্গে খেলা করে।

সংসারের খরচ বাড়িয়াছে। একদিন স্বাতী বলিয়াই ফেলিল, সংসারে পুষ্যি বাড়ছে, কিন্তু আয় তো তেমন বাড়ছে না। এতগুলি লোকের সব রকম খরচ চালান কি সোজা কথা। লীলা নীরবে সব শুনিল। কি উত্তর সে দিবে!

২৯

সুনন্দা বেড়াইতে আসিয়াছে। নূতন খুকীকে কোলে করিয়া কত আদর করিল। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে—বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল।

স্বাতী বলিল, আমাদের ছেলে-মেয়ে তো নয়, এক একটা শত্তুর।

সুনন্দা। বালাই ষাট। শত্তুর হতে যাবে কেন?

স্বাতী। আজকালকার দিনে ছেলেপুলে না হওয়াই ভাল।

সুনন্দা। মোটে দুটি, এর জন্য এত ভাবনা কিসের?

স্বাতী। তুমি তার বুঝবে কি বাপু। ঘাড়ের উপর এক আইবুড়ো মেয়ে। তার কাপড় চাই, জামা চাই। জুতা চাই।

সুনন্দা। তা বাপু, সে কাজও কম করে না। দিন-রাত খাটছে। তোমার ছেলেমেয়ে দুটি তো তার কাছেই মানুষ হচ্ছে।

স্বাতী। ওদের জন্যে একটা ঠিকে ঝি রাখলেই আমার চলে যায়। দাদার ঘাড়ে এমনি করে বসে থাকতে ভালও লাগে। কেন? অজিতবাবু এমন কি কুপাত্র? তিনি নাকি রাজিও আছেন। ঠাকুরঝি মত দিলেই হয়। জানিনে কোন রাজপুত্তুরের আশায় উনি আছেন।

সুনন্দা। অজিতবাবুর কথা আমাদের উনিও বোধ হয় সুরেশবাবুকে বলেছিলেন। কিন্তু লীলা নাকি একেবারেই রাজি নয়।

স্বাতী। কেন?

সুনন্দা। তা কিছু বলে না। বলে, অত বড়লোক, ওদের চালচলন আলাদা।

স্বাতী। তুমিই বল, সুনন্দা। এ কত বড় অন্যায়। লেখাপড়া জানা মেয়ে। এমন মতিগতি কেন? আর যদি বিয়েই না করিস, বাপু একটা চাকরি-বাকরি করলেই হয়। আজকাল সব মেয়েরাই করছে।

লীলা ছিল রান্নাঘরে। খোকার কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে করিয়া স্বাতীর কাছে দিবার জন্য ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, সুনন্দার সঙ্গে স্বাতী কথা বলিতেছে। স্বাতীর শেষের কথা কয়টি কানে গিয়াছে। লীলা খোকাকে স্বাতীর কাছে দিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

স্বাতী সুনন্দাকে বলিল, শোনে নি ত আমাদের কথা! আবার দাদার কাছে লাগান হবে'খন।

সুনন্দা বলিল, ওকি কিছু বোঝে না? সব বোঝে। কত সময় আমাকে বলেছে তার এই লজ্জার কথা। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, যে জন্য সে অজিতবাবুর সঙ্গে বিয়েতে মত দিচ্ছে না।

স্বাতী বলিল, কিন্তু আমার সংসারটার কথাটাও ভাবা দরকার।

সুনন্দা। দেখ স্বাতী, ওকে তোমাদের কিছু বলতে হবে না। ওর মত বুদ্ধি, ওর মত মায়া মমতা—খুব কম মেয়েরই আছে। তুমি আসবার আগে ও নিজের সর্বস্ব দিয়ে দাদাকে সেবা যত্ন করেছে। ওর দাদার জন্যই ও পড়া ছেড়েছে।

স্বাতী। মা বাপ না থাকলে সবাই ভাই-বোনের জন্য অমন করে থাকে। তাই বলে সারাজীবন পরের সংসারে বসে—

সুনন্দা। সারাজীবন ও থাক্‌বে না। ও সে রকম মেয়েই নয়।

স্বাতী। যা হয়, শিগ্‌গির হয়ে গেলেই ভাল হয়। আমি কিন্তু অজিতবাবুর কোন দোষের কথা শুনিনি।

সুনন্দা। অত দূরে আর এক বাড়ীতে থাকেন। কলকাতায় কার খবর কে পায় বল।

স্বাতী। তোমরা একটু দেখ না খোঁজ-খবর নিয়ে। বড় লোকের ছেলের অমন একটু আধটু থাকলই বা। ওতে চণ্ডী অশুদ্ধ হবে না।

সুনন্দা। আচ্ছা আমি দেখব ওঁকে বলে। এখন যাই আমি। এই নাও, এই ডলটা দিও খুকীকে।

স্বাতী। ওকি এখন কিছু বোঝে ?

সুনন্দা। ক্রমে ক্রমে বুঝবে। রেখে দিও ওর বিছানার পাশে। এই কথা বলিয়া সুনন্দা খুকীকে একটু আদর করিয়া বিদায় লইল।

৩০

পরদিন স্বাতী বেড়াইতে গিয়াছে তার মার কাছে। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, ওদের একটু দেখো ঠাকুরঝি। আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। মার শরীরটা ভাল ছিল না। একটু দেখে আসি।

স্বাতী বাহির হইয়া গেলে লীলা দাদার কাছে গিয়া বলিল, দাদা !

সুরেশ বলিল, কি লীলা ?

লীলা। একটা দরকারী কথা আছে।

সুরেশ। দরকারী কথা মানে ?

লীলা। ঠাট্টা নয়, সত্যি খুব দরকারি কথা।

লীলা একটু চোখ মুছিয়া বলিল, আমি চাকরি করব।

সুরেশ। সেকি! চাকরি করবে কেন ? আমাদের এমন কি অচল অবস্থা হ'ল ? আর মাস দুই পরে একটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট পাব, জানো ?

লীলা। আমি কিছু জানতে চাইনে। তোমার সংসারের আর কোন খবরই আমি জানতে চাই নে। জানবার আমার অধিকারও নেই।

সুরেশ। এ সব কি বলছ তুমি ?

লীলা। আমি ঠিকই বলছি। তুমি কোন অফিসে একটা চাকরির যোগাড় করে দাও। আমি চাকরি করব ঠিক করেছি। তোমার অফিসে না হলেই ভাল হয়। লজ্জা করবে। অন্য কোন অফিসে একটা চাকরি যোগাড় করে দাও।

সুরেশ। নিতান্ত দরকার না হ'লে মেয়েদের চাকরি করা কি ভাল ?

লীলা। ভাল মন্দর কথা হচ্ছে না। আমার চাকরি করা দরকার, তাই চাকরি করব।

সুরেশ। হঠাৎ এমন কি দরকার হয়ে পড়ল ?

লীলা। হঠাৎ নয় দাদা। একটু চোখ কান খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে, তোমার সংসারে আমার স্থান কোথায়।

সুরেশ। তুমিই এ বাড়ীর সব ছিলে, এখনও আছ। তুমি আমার অভিভাবক, সে কথা তুমিই আমাকে বলেছিলে। তুমিই সাধ করে তোমার বৌদিকে ঘরে এনেছ।

লীলা। সে সব দিন ফুরিয়ে গেছে। (আঁচলে চোখ মুছিয়া) দাদা। আমি শুধু শুধু তোমাকে এ অনুরোধ করছি নে। সত্যিই আমার দরকার।

সুরেশ। একটু ভেবে দেখো। চাকরি করা বড় সুখের জিনিস নয়, বিশেষত মেয়েদের।

লীলা। কিন্তু উপায় নেই। সত্যি বলছি, যদি চাকরি একটা না জোটে, তাহলে আমার এ বাড়ীতে থাকা হবে না।

সুরেশ। এমন কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে ?

লীলা। আমি কি আর সখ করে বলছি। অদৃষ্টে বলাচ্ছে।

সুরেশ এবার একটু বেশি গম্ভীর হইল। বলিল, হুঁ।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তারপর সুরেশ বলিল, আমি যে কিছু না বুঝি, তা নয়। আমারও মনে হয়েছে, তোমার মন আর তোমার বৌদির মন কত তফাৎ। কিন্তু উপায় নেই। তুমি বোধ হয় ভাব, স্বাতীর সব কথা, সব ব্যবহার আমিও সমর্থন করি। তা তুমি মনে ক'র না লীলা। তোমাকে চিনি শৈশব থেকে। ওকেই চিনেছি এই কয় বছরে। কিন্তু উপায় নেই। স্বভাব, সংস্কার বদলান যায় না।

লীলা। তা হোক, তোমার সংসারে তোমার নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন অশান্তি হবে না, এই আমি আশা করি। আমার কথা ছেড়ে দাও। একটা পথ আমি করে নিতে পারব। তুমি আমাকে যে কোন একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও।

সুরেশ অতি বিষণ্ণ মুখে বলিল, দেখব।

খুকী কাঁদিয়া উঠিয়াছে শুনিয়া লীলা তাড়াতাড়ি গিয়া খুকীকে কোলে লইল। অবলাকে ডাকিয়া লীলা বলিল, দেখ তো ডালের কড়ায় জল আছে কিনা। জল যদি কমে গিয়ে থাকে, তবে আরো একটু জল ঢেলে দিও।

অবলা চিৎকার করিয়া বলিল, ডাল ধরে গেছে।

লীলা। যা হয়েছে, তা হয়েছে, কড়াইটা নামিয়ে রাখ। খুকীকে শান্ত করে আমি আসছি।

অবলা। আচ্ছা, এস।

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্র কাব্যে গতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটা সামান্য কবিতা পড়তে গেলেই ক্ষুদ্র ও বৃহতের ব্যবধান কেমন যেন আপনা থেকেই সরে যায় এবং সেই সঙ্গে একটা সুন্দর লোকের রস-ঘন ছবি ফুটে উঠে। এই ভাবানুভূতিটা কেবলমাত্র সাধারণ পাঠকের ক্ষেত্রেই নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর জীবন স্মৃতিতে অতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন—"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই জন্যই এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই······বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু সেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেই প্রত্যক্ষ বোধের কাছে কোন তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল। ··আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহা একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে "সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"

এই যে সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগের মধ্যে একটি সুনিবিড় নিগূঢ় সম্বন্ধের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত সত্য এবং এই অনুভূতিও রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিশেষ মতবাদের রূপ-অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ইহা যে কেবলমাত্র কবিগুরুরই নিজস্ব তা নয়; আমাদের দেশের প্রাচীন মনন-ধারার মধ্যে হয়তো এরকম একটা বিশ্বাস আছে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা বিশেষ রূপ লাভ করেছে—এ সম্বন্ধে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এই বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তন লীলা প্রবহমান—এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, ইহাই আনন্দ! এই সৌন্দর্য্য, এই আনন্দ, ইহার পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করেছেন, ভোগ করেছেন, একটি অপূর্ব্ব সুগভীর রহস্যরূপে অনুভবও করেছেন।

তাই রবীন্দ্র কাব্য পড়তে গিয়ে, কোন বিশেষ তত্ত্ব বা বিশেষ কোন মতবাদ বা ধর্ম্মের কথা প্রকাশ পায় না, তবে উপনিষদের কোন তত্ত্ব কথা যতটা না আছে উপনিষদের আপ্তবাক্যকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ নিজের মর্ম্মের উপলব্ধির কথা অতি সহজে প্রকাশ করেছেন। তাই উপনিষদের ঋষিবাক্য তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভাবে রূপান্তরিত হয়ে অনুভূতির দ্বারা প্রাণবন্ত হয়ে অপূর্ব্ব কাব্য হয়ে উঠে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভিতরেই একটি আকুলতার সুর বেজে উঠে, সে সুর হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের, বিশেষের মধ্যে অবিশেষের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্য অধীরতার সুর। এই অনন্তের সুর সান্তের মধ্যে বাজে বলেই আমরা অনুভব করতে পারি যে, আমরা বদ্ধ জীব নই, আমাদেরও মুক্তি আছে, আমরা অমৃতের পুত্র।

এই ভূমার আনন্দ যাঁর জীবনে যত প্রতিভাত হয়েছে তাঁর মানব জন্ম তত বেশী সার্থক হয়েছে। তাঁর উৎসর্গ কাব্যে "আবর্ত্তন" কবিতায় তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে—

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চায় সীমার নিবিড় অঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

এই যে, বাধাকে অতিক্রম করবার একটা প্রবল তাড়না—তা তাঁর এই কবিতার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই তিনি কোন পাওয়া বস্তুতে সন্তুষ্ট থেকে কোন তৃপ্তি পেতে চান না, যা নিজের অধিকারে নেই তাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা, অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা—এই তো হলো রবীন্দ্রনাথের বাণী, এই তো হচ্ছে তাঁর আসল মনের কথা।

যেখানে গতি আছে, সেখানে ব্যাপ্তিও আছে। জলে-স্থলে-আকাশে, লোক-লোকান্তরে, সর্ব্ব-দেশ-কালে ও সর্ব্ব-মানব-সমাজে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করে কবি নিজেকে মেলে দিতে নিরন্তর উৎসুক। এই দেশ-কালকে অতিক্রম করে শাশ্বত সত্যকে যত বেশী প্রকাশ করতে পারা যায় ততই কাব্য প্রতিভার মাহাত্ম্য ফুটে উঠে। তাই সর্ব্বানুভূতি বা বিশ্বপ্রেম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এত বেশী প্রকাশ পেয়েছিল যে, অতি সামান্যতম বস্তুও সেই বিরাটেরই একটি অংশ—এই নিভৃত সত্যটিই তো তাঁর প্রতিটি কবিতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে সুমধুর হয়ে উঠেছে। তাই তো তিনি শিশুর কল-হাস্যে, কুসুমের রূপসুষমায়, নদী-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ ছায়া লোকের স্পন্দনে, নক্ষত্রপুঞ্জের মায়ালোকে যে প্রাণ শক্তি মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে—তাকে তিনি নব নব রূপে, নব নব ছন্দে অপূর্ব্ব শ্রী ও মহিমা দান করেছেন।

এই গতির কথা বর্ত্তমান যুগের য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত বের্গসঁ প্রকাশ করেছেন—এই প্রাণ-শক্তি গতিতে—স্থিতিতে নয়। যার গতি নেই—সে মৃত, সে জড়। অবশ্য এই কথা আমাদের তৈত্তীরিয় উপনিষদে বহু পূর্ব্বেই বৈদিক ঋষির বাণী প্রকাশ পেয়েছে—"চরৈবেতি, চরৈবেতি" অর্থাৎ আগে চল্ আগে চল্। এই গতি বা চলা যখনই থামতে চাইবে তখনই সেই বলাকা কাব্য গ্রন্থের "চঞ্চলা" কবিতায়,—

"উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে।"

কিন্তু কবি এইখানেই তাঁর কথা শেষ করেন নি। উদ্দেশ্যহীন কেবল গতি আমাদের কোন লক্ষ্যপথে নিয়ে যায় না, সে চলাতে ক্লান্তি আনে, প্রাণে অতৃপ্তি জাগে। এই জন্যে কবি "তাজমহল" কবিতায়—গতির মধ্যে আনন্দের রূপ দর্শন করেছেন,—

"সে স্মৃতি তোমায় ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্ব্ব লোকে।
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গ স্মৃতি।
বিশ্বের প্রীতি-মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।"

এইখানেই রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক বের্গসঁকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছেন। বের্গসঁর গতি কেবল অফুরন্ত চলা; সে চলা কোন লক্ষ্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নয়—বা কোনো আনন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিতও নয়। বের্গসঁ জীবনের মধ্যে কেবল গতি দেখেছেন, কিন্তু অসীমের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ দেখতে পাননি; সত্য তাঁর নিকট ভালোমন্দের অতীত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এজন্যে তিনি জীবনের উদ্দেশ্য, গতির লক্ষ্য নির্দ্দেশ করতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল গতিতে মানবের মুক্তি নয়,—

"মৃত্যুর অন্তরে পশি, অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে।"

এই সত্যের সন্ধানের জন্যেই তো মানবের এই চিরন্তন ব্যাকুলতা, এই অবিরাম ধ্যান ধারণা—মহামানবের জয়-যাত্রা।

* মগ্না *

*

তিন মুখ

*

ফটো :
ভূপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

এই বেগমান চলার মধ্যে তাই কবি শুনতে পাচ্ছেন—

"হে হংস বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাক
শুনিতেছি আমি নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণ-দল
মাটির আকাশ' পরে ঝাপটিছে ডানা
মাটির আঁধার-নিচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই গতির মাহাত্ম্য প্রচার করে এসেছেন। পরিণত বয়সে আরও গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর বলাকা কাব্যগ্রন্থে। উপরের উদ্ধৃতাংশ থেকেই তা কিছু উপলব্ধি করা যাবে। তবে, এর স্বরূপটি অনুভব করতে গেলে বলাকা শব্দটির অর্থ অনুভব করতে হবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বলাকা নামটি সুপরিচিত। এই অজানা পথিকের পথ চলার আনন্দ এক সুমহান ঈপ্সিতকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করা বা পাওয়াই হল তার বৃহৎ জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়াস। তাই যখন বাস্তব-চিত্রে দেখতে পাই—বলাকা-পংক্তি সন্ধ্যার ঘন-কালো-কেশ-কুঞ্চিত মেঘ-মেদুর নভ-তল দিয়ে তোরণহীন লম্বিত শ্বেত পুষ্পিত মালার ন্যায় দুলতে দুলতে দূর-দূরান্তের পানে উড়ে চলে, তখন তাদের প্রত্যেকের পৃথক ও স্বতন্ত্র মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না, যত করে তাদের সম্মিলিত মালিকাবদ্ধ সমগ্র পংক্তির গতিচ্ছন্দ ও গতিভঙ্গিমা। এই দোদুল্যমান বলাকা-পংক্তি যখন আকাশ-পথে চলমান প্রত্যেকটি বক বা হংসের যে স্থান-সন্নিবেশের বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে তা আমাদের চোখে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু এই স্থান সন্নিবেশের বৈচিত্র্যের ফলে বলাকা-মালাটি যে বিচিত্ররূপে নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে—সেই ছবিটিই তো বলাকার আসল রূপ।

আকাশে ঘন-কালো মেঘ। ঝড় বইছে। মাঝে মাঝে বলাকার মালাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই দুর্দ্দম বিপদের মধ্যে, মেঘগর্জ্জনের মধ্যে, বিদ্যুৎ-ঝলকের মধ্যে, তাদের কোন ভয় নেই। তাদের মালা যেমন এক একবার ছিঁড়ে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই তারা তাদের মালা গেঁথে তুলছে। এই বিপদ-সঙ্কুল যাত্রা-পথের সম্মুখীন হয়ে তারা বরং নব-জীবনেরই সন্ধান পায়। তাই বলাকা-কথাটি উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে সর্ব্ব-বিপজ্জয়ী একটা অজানার উদ্দেশ্যে অন্তহীন অকারণ চলা ও গতিছন্দের কথা মনে পড়ে।

সমগ্র বলাকা কাব্যগ্রন্থেও এক একটি কবিতার দৃষ্টি-কোণ লক্ষ্য করলে যেমন বিশেষ ছবি ফুটে উঠে না, কিন্তু সামগ্রিক রূপ দেখলে তার দুর্বার গতিছন্দের লীলাভঙ্গী পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এই চলার আবেগ—যেমন অন্ধকার রাত্রিতে রজনীগন্ধার গন্ধের ন্যায় মানুষকে আকুল করে তোলে, তেমনি অনন্তের অজানা-গন্ধও মানব-যাত্রীকে আবিষ্ট করে রাখে। এই অনন্তের অভিমুখে যাত্রা, এই গতি, এই অকারণ চলা মুহূর্ত্তের জন্য যদি বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে বিশ্ব মৃত জড়পুঞ্জের সমাবেশে মহাকলুষতার সৃষ্টি করতো। কিন্তু গতিশক্তির নিত্য মন্দাকিনী মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নিরন্তর শুচিশুভ্র করে তুলছে। মৃত্যুকে যখনই জীবনের মধ্যে স্থান দিয়েছে, তখনই মৃত্যুকে মৃত্যুর মধ্যে আমরা পাই না; চির-নবীনতার মধ্যেই আমরা মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করি। তাই গীতিমাল্য কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাই,—

মরতে মরতে মরণ টারে
শেষ করে দে বারে বারে
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

কোন অভীষ্টকে পেতে গেলে মৃত্যুকে ভয় না করে মৃত্যুর কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে" এই বলে ক্রমাগত চলতে হবে; কবি এই কথাই বিভিন্ন কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এখন কবির প্রথম

কৈশোর জীবন থেকে পর পর কয়েকটি কবিতা লক্ষ্য করলেই কাব্যের গতিপ্রবাহের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। তাঁর কিশোর বয়সের লেখা "পথিক" কবিতায় বলেছেন—

"ছুটে আয় তবে ছুটে আয় সবে
অতি দূর দূর যাব ;
কোথায় যাইবে ?—কোথায় যাইব।
জানি না আমরা কোথায় যাইব ;—
সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়—

তারপর সমুদ্রের অস্থিরতা লক্ষ্য করে বলছেন—

"কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে।
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন।"

সোনার তরীর "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতায় বলছেন,—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে,
হে সুন্দরী ?
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।"

কবি আবার "মানসসুন্দরী" কবিতায় মানস-সুন্দরীকে প্রশ্ন করছেন—

কোন বিশ্ব পার
আছে তব জন্মভূমি ? সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে কোন কল্প লোকে—
আমারে করিবে বন্দী গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গ সম ?"

তারপর কবি যখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ দেখতে পেলেন, তখনও সেই গতির আবেগে "ঝুলন" কবিতায় প্রকাশ করলেন—

"তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রি বেলা।
মরণ দোলায় ধরি রশি গাছি
বসিব দু'জনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা॥
দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।
এ মহা সাগরে তুফান তোল্।"

আবার সোনার তরীর "বসুন্ধরা" কবিতায় তাঁর মনের ইচ্ছার মধ্যেও সুনিবিড় গতির আবেগ ফুটে উঠেছে—

"ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেথানে যা কিছু আছে ; নদীস্রোতো নীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয় সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধু-পানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গ গিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি ;
কঠিন পাষাণ ক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি।"

বিশ্ব-বিমুখ-স্বার্থপর ক্ষুদ্রতার বেদনাও কবিকণ্ঠে করুণ হয়ে চিত্রার "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় প্রকাশ পাচ্ছে—

"দুর্দ্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে।
চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে…"

কল্পনা কাব্য গ্রন্থে "দুঃসময়" কবিতায় জীবন-সন্ধ্যার দুঃসময় সত্যই যখন এসে পড়লো তখন কবি তাঁর চিত্ত-বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ করতে নিষেধ করছেন—

"যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা ;
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা॥"

কোথায়ও যদি কোন আশ্রয় না থাকে, তবু নভ-অঙ্গন তো আছে—এইটুকু মাত্র ভরসা!

আবার কল্পনার "বর্ষশেষ" কবিতায় বন্ধনমুক্ত হয়ে অনন্তের পানে কবি উন্মুখ হয়ে উঠেছেন—

"চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।

* * *

যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের।"

এমনি ভাবে কবি আরও যেন বন্ধন মুক্ত হবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—উৎসর্গ কাব্য গ্রন্থে—তাই ফুটে উঠেছে—

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।

* * *

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসি।
রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়
তরু মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো
আভাসি
হে সুদূর, আমি উদাসি।
সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও
ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে
যাই পাসরি॥"

তারপর কবি যখন যাত্রার প্রাক্কালে খেয়া-ঘাটে এসে হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন বুঝি তাঁর আর যাওয়া হয়ে উঠলো না। অমনি সঙ্গে সঙ্গে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে কবি বলে উঠলেন—

"আমার নাই বা হোলো পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চলতো তরী অঙ্গেতে সেই
লাগাই হাওয়া॥"
(গীত-বিতান, ২য় খণ্ড, ৫৪৮ পৃঃ)

কিন্তু কবি যখন সত্য সত্যই যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব শেষ করে ঠিক প্রস্তুত হলেন তখনও কিন্তু পারানীর দেখা নেই গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থে কবি তখন বলছেন—

"কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন দেশে॥"

এমনি ভাবে বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থে প্রায় কবিতার মধ্যেই গতির আবেগ, অবিরাম এগিয়ে চলার একটা উদ্দাম ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার মধ্যে কোন ক্লান্তি নেই। চলার মধ্যে আছে চিরন্তন আনন্দের একটা সুমধুর স্পর্শ! কত ভঙ্গীতে, কত বিচিত্র রূপে, কত সুমধুর রসে কবিতাগুলি অপূর্ব অপরূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে তা লিখে শেষ করা যায় না। কবি তাঁর সকল অচলায়তন ভেঙে চুরমার করে চলার নিমন্ত্রণ ঘোষণাই করেছেন। ফাল্গুনী নাটকেও সেই আগাগোড়াই চলার মহিমা কীর্ত্তন! কবির জীবন-সন্ধ্যায় পূরবীর রাগিনী বেজে উঠেছে—তখনও তাঁর চলার বিরতি নেই—তাঁর পূরবী গ্রন্থে—যাত্রা কবিতায়—

"আশ্বিনের রাত্রি-শেষে ঝরে-পড়া শিউলী ফুলের
আগ্রহে আকুল বন তল; তারা মরণ কুলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে। শুধু বলে "চলো চলো।

* * *

ওরা ডেকে বলে, কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে…?

কবি বললেন,—

"যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে—।"

শেষ পরে মহুয়া কাব্যগ্রন্থে যৌবন-প্রেমের মদিরা বিলিয়ে দিয়ে কবি বললেন—

"যাবার দিকের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকের স্নেহ খানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি!"

তারপর সকলকে আহ্বান করে কবি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন—

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?"

এমনি করে কবি সকলের মোহকে ভেঙে দিচ্ছেন। যা অচল, যা অনড়—তা মৃত। তাই সকল জড়তা ভেঙে দিয়ে এগিয়ে যাবার প্রেরণা প্রতি মুহূর্ত্তেই দিচ্ছেন। সকল ক্ষুদ্র মহতের ব্যবধান আর থাকবে না। বিরাট বিশ্বের নিগূঢ় বিস্ময় উচ্ছল হয়ে আনন্দ ধারায় বিগলিত হয়ে উঠবে। তাই যুগে যুগে কবিরা এই আনন্দের প্রেরণা প্রত্যেক মানব হৃদয়ে জুগিয়ে থাকেন। কবিরাই অমৃত লোকের পথযাত্রী। তাই তাঁরা চির অমর।

সীবনরতা

—জসীম-উদ্‌দীন

সেলাই করিছে মেয়ে
জাম-রাঙা শাড়ী রেখায় হাসিছে সোনার অঙ্গ ছেয়ে।
একপাশ হতে দেখিতেছি তারে, বাঁকা ধনু নাসিকায়,
ভুরু-তীর দু'টি সদা উদ্যত বধিতে কে অজানায়।
আঁখি-সরোবর স্তব্ধ নিঝুম মৃদু পলকের ঘায়ে,
ঢেউ হংসীরা বিরাম লভিছে কাজল রেখার গাঁয়ে।
অধরখানিতে যুগল ঠোঁটের রঙিণ বাঁধন খুলি,
মাঝে মাঝে মৃদু হাসি ফুটিছে মধুর সুখেতে দুলি।

খোপার ফিতার কুসুম-বাঁধনে গোলাপ মেলিছে দল,
বেণীর ভ্রমর সেথা জড় হ'য়ে র'য়েছে অচঞ্চল।
এক হাতে ধরি সরু সুইটি সে সেলাই করিছে ব'সে,
আকাশ হইতে তারা-ফুলগুলি পড়িছে
সেথায় খ'সে।
রঙের রঙের আলপনা যত তার ভালবাসা হ'য়ে,
জনমের মত বন্দী হইছে কাঁথার ইন্দ্রালয়ে।

কে মাখিয়া দেছে হলুদের গুঁড়ো তাহার সারাটি গায়,
রঙিণ শাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে তাহা আকাশ
ধরণী বায়।
অনাহত কোন গান বাজে তার দেহের বীণার তারে,
কালের সারথী থামায়েছে চলা সেই সুর শুনিবারে।
সে সুর শুধুই হৃদয়-গহনে কিছু অনুভব হয়,
কাহারো নিকট ভাষার বসন কভু সে পরিল নয়।

তাহারই একটু রেশ মেখে বুকে বাঁশী যে আত্ম-হারা,
শূন্য বুকের শূন্য ভরিতে কাঁদে তার সুর-ধারা।
মোহের মতন স্বপনের মত আবছা রঙিণ মেঘে
যেমনি ছড়ায় মধুর সুষমা সিঁদুরিয়া রোদ লেগে।
কোন সে মহান ভাস্কর যেন তাজমহলের থেকে,
পাথর কাটিয়া অতি ধীরে ধীরে লইতেছে তারে এঁকে

বার বার ক'রে ভেঙে যায় ছবি হয় না মনের মত
আবার তাহারে গড়িবার লাগি হয় তপস্যা রত।
ওই বাহু দুটি মমতা হইয়া মেলিবে শাড়ীর মেঘে,
ও অধরখানি ভালবাসা ক'রে পাষাণে লইবে এঁকে।
নাসিকার ওই স্বর্ণ দেউলে স্থাপি মন্মথ-ছবি,
যুগ যুগান্ত রূপ-হোমানলে ঢলিবে জীবন ছবি।

বসিয়া রয়েছে সীবন-রতা সে মেয়ে,
রঙিণ ফুলটি ভাসিয়া এসেছে রামধনু নদী বেয়ে।
চরণ দু'খানি যুগল-হংসী শাড়ীর সাগর পাটে,
সাঁতারি এখন আসিয়া ব'সেছে পাড়ের রঙিণ ঘাটে।
রাঙা টুকটুকে আলতা রেখায় রঙিণ তটের পানি,
ভালবাসা ফুল ফুটিছে টুটিছে ভরিয়া ধবনী থানি।
সাবধান হাতে সরু সুই লয়ে নক্সা আঁকে সে ধরে,
কাঁথার উপরে আরেক ধবনী হাসিতেছে খুশীভরে।
আরেক শিল্পী তাহারে লইয়া কালের খাতার পরে,
আর এক কাঁথা বুনট করিছে তাহার মাধুরী ধরে।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম রবিয়ল মাসের ৯ই তারিখ রবিবার বেগ মহম্মদ তালাকৃচি ফিরে এলো। তাকে গত বছর সম্মানসূচক পোষাক ও ঘোড়াসহ হুমায়ুনের কাছে পাঠাই।

এই মাসের ১০ই তারিখ, হুমায়ুনের নিকট থেকে ওয়াইস লাথারির পুত্র বেগ গিনা এবং বিয়ান সেখ নামে হুমায়ুনের একজন ভৃত্য এই শুভ সংবাদ নিয়ে আসে যে হুমায়ুনের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে এবং তার নাম রাখা হয়েছে আলি আমান।

বেগ গিনা রওনা হওয়ার অনেক পরে বিয়ান সেখ হুমায়ুনের কাছ থেকে রওনা হয়। সফর মাসের ৯ই তারিখ (২৩শে অক্টোবর) সে রওনা হয় এবং প্রথম রবির ১০ই তারিখ আগ্রায় পৌঁছে যায়। সে খুব দ্রুত চলে আসে। আর একবার সে কিলা-ই-জাফর থেকে কান্দাহারে ঠিক এগারো দিনে পৌঁছে যায়।

বিয়ান সেখ সাহাজাদা তামাসের ইরাক থেকে সৈন্যচালনা এবং উজবেগদের পরাস্ত করার সংবাদ আনে। এইখানে তার বিবরণ দিচ্ছি। সাহাজাদা তামাস ইরাক থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রুমির রীতি অনুযায়ী কামান সজ্জিত করে দ্রুত অগ্রসর হন। তিনি বাস্তাম জয় করেন। রিনিশ উজবেগ ও তার দলবলকে দামঘানে নিহত করেন। তারপর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান। কামবার-ই-আলি বেগ কিজিলবাসের অনুচরদের হাতে পরাস্ত হয়ে কিছু লোকজন নিয়ে উস্তাদ খাঁয়ের কাছে যায়। উস্তাদ খাঁ হেরির কাছাকাছি থাকা উচিত নয় মনে করে তাড়াতাতি ঘোড়-সোয়ার পাঠিয়ে বাল্‌খ, হিসার, সমরকন্দ এবং তাসখেন্দের সুলতানদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে নিজে মার্ভে চলে যায়। তাসখন্দ থেকে বারাক সুলতানের ছোট ছেলে সিনুজ্জক সুলতান, সমরকন্দ থেকে কুচুম খাঁ ও তাঁর পুত্রদ্বয় আবু সৈয়দ সুলতান এবং পুলাদ সুলতান, হিসার থেকে মিয়াকাল, মাধি সুলতান এবং হামজা সুলতানের পুত্রগণ—বাল্‌খ্ থেকে কাটিন কারা সুলতান—সবাই অত্যন্ত দ্রুত মার্ভে এসে সমবেত হন।

তাঁদের কাছে সংবাদ সরবরাহকারীরা এই সংবাদ নিয়ে আসে যে—'উবেদ খাঁ হেরির কাছে অল্প কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে'—সাহাজাদা এই কথা বলে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনতে পান যে সুলতানরা মার্ভে সমবেত হয়েছেন তখন তিনি রদজানে পরিখা খনন করে সেখানেই অবস্থান করছেন। সংবাদবাহীদের কাছে এই কথা শুনে উজবেগরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতার কথা একেবারে গ্রাহ্য না করে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন—'আমরা সুলতান ও খাঁরা মাসাদে অবস্থান করবো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে কিজিলবাসের কাছাকাছি এগিয়ে যাব এবং শত্রুপক্ষকে গর্ত থেকে মাথা তুলতে দেব না। যাদুকরদের এই আদেশ দেওয়া হবে যে তারা যেন বৃশ্চিক লগ্নে তাদের যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে ফেলে। সেই সময়েই আমরা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে পারবো।' এই রকম কথাবার্ত্তা হওয়ার পরই তারা মার্ভে থেকে বেরিয়ে আসে। সাহাজাদা মাসাদ থেকে এগিয়ে এসে জাম্ ও খিরগাদের কাছাকাছি জায়গায় উজুবেগদের মুখোমুখি হন। উজবেগ পক্ষ পরাজিত হয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে বহু সুলতান নিহত হয়।—

একটি চিঠিতে লেখা ছিল—"এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি যে কুচুম খাঁ ছাড়া আর কোনও সুলতান বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছে কিনা এ পর্য্যন্ত এ পক্ষের একজন লোকও ফিরে আসেনি।" যে সব সুলতান হিসারে ছিল তারা সেখান থেকে সরে পড়ে। ইব্রাহিম জানির পুত্র চাতমা—যার প্রকৃত নাম ইসমার্কফ সে—নিশ্চয়ই এই দুর্গে আছে।

বিয়ান সেখকেই হুমায়ুন ও কামরাণের নামে চিঠি দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করি। এই চিঠি এবং আরও

অনেকগুলি এই মাসের ১৪ই তারিখ, শুক্রবার (ইংরাজী ২৭শে নভেম্বর) শেষ করে তার হাতে ন্যস্ত করে তাকে বিদায় দেওয়া হয়। সে ১৫ই তারিখ শনিবার আগ্রা ত্যাগ করে চলে যায়।

হুমায়ুনের নিকট লিখিত পত্রের নকল

যাকে আমি সুস্থ দেহে পুনর্ব্বার দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি—সেই হুমায়ুনের প্রতি—

প্রথম রবিয়ল মাসের ১লা তারিখ শনিবার (পূর্ব্বে উল্লেখিত হয়েছে রবিয়ল মাসের ১০ই তারিখ এবং ঐ তারিখই সঠিক) বিয়ান সেখ বেগ বিনাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে পৌচেছে এবং যে চিঠিপত্র সে নিয়ে এসেছে তাতেই ওদিককার সমস্ত খবরাখবর জানতে পারলাম। আল্লাকে ধন্যবাদ! তিনি তোমাকে একটি শিশুপুত্র দান করেছেন—যে শিশু আমার কাছে একটি আশ্বাসের বস্তু এবং পরম স্নেহের পাত্র। সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এইরূপ আনন্দদায়ক বস্তু দান করে চরিতার্থ করুন—এই প্রার্থনা। হে দুই জগতের অধীশ্বর তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

তুমি শিশুটির নাম রেখেছ—অল আমান। তুমি যে নাম রেখেছ আল্লার আশীর্ব্বাদ যেন তার ওপর থাকে। তুমি রাজতক্তে বসেছ। সুতরাং তোমার এ কথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে জনসাধারণের অনেকেই এই কথাটা উচ্চারণ করে সাধারণতঃ অল-আমান (ঈশ্বর রক্ষিত) বলে, আবার কেউ কেউ উচ্চারণ করে—ইল-আমান (মনুষ্য রক্ষিত)। এ ছাড়া আরও কতকগুলি শব্দ আছে যার আগে 'অল' এই কথাটা যোগ করা হয়। তোমার এই শিশুপুত্রটি যেন তার নামে ও দৈহিক গঠনে সেই মহান সৃষ্টিকর্ত্তার আশীর্ব্বাদ লাভ করে সুখী ও ভাগ্যবান হয় এবং সেই সর্ব্বশক্তিমানের করুণা তোমার উপর এমন ভাবে বর্ষিত হয় যাতে অল-আমানের সৌভাগ্যশালী এবং কৃতিত্বপূর্ণ জীবন অনেক বছর ধরে দেখে আমরা সুখী হতে পারি। অবশ্য, সেই সর্ব্বশক্তিমান তাঁর করুণা ও বদান্যতা দ্বারা এমন ভাবে আমাদের ইচ্ছা পূরণ করেছেন যে তার তুলনা কোনও কালেই হয় না।

এই মাসের ১১ই তারিখ মঙ্গলবার আমার কাছে সংবাদ আসে যে বাল্খের জনসাধারণ কুরবানকে আমন্ত্রণ করে সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি তখনই পুত্র কামরাণকে এবং কাবুলের বেগদের এই আদেশ পাঠিয়েছি যে তারা যেন তোমার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে (হুমায়ুন তখন বাদাকসানে ছিলেন) যাতে তুমি অবস্থানুযায়ী এবং প্রয়োজন মত হিসার, সমরখন্দ অথবা মার্ভের দিকে অগ্রসর হতে পার। আমি এই আশা করছি যে ভগবানের দয়ায় তুমি শত্রুদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে ও তাদের দেশগুলি দখল করে নিয়ে তোমার বন্ধুদের আনন্দের এবং শত্রুদের প্রবল আতঙ্কের কারণ হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার এমন সময় এসেছে যখন দুঃখকষ্ট, বিপদের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধে তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করতে পারবে। যে অবস্থাই আসুক না প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের শক্তি কঠোরভাবে চালনা করতে ভুলো না। কারণ, আলস্য ও আরাম-প্রিয়তা রাজপুরুষদের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়।

(ফারশিতে)—

"উচ্চাসা, আলস্যেরে কভু
দেয় না প্রশ্রয়।
এ জগৎ তারই, অবিরাম চেষ্টা
যাকে করেছে আশ্রয়।
জ্ঞানী জানে।
সবাই পারে করিতে আরাম
রাজার কাছে শুধু,
আরাম হারাম।"

যদি তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে শত্রুকে পরাস্ত করে বাল্খ ও হিসার দখল করতে পার, তাহলে তোমার লোক হিসারের ভার নেবে এবং কামরাণের লোক বাল্খে থাকবে। যদি সর্ব্বশক্তিমান আল্লার দয়ায় সমরকন্দ আমাদের হাতে আসে। তুমি তাহলে ঐ রাজ্যের শাসন-ভার নিজে গ্রহণ করবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি ঐ দেশে সাম্রাজ্য গড়ে তুলবো। যদি কামরাণ মনে করে যে বাল্খ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তাহলে আমাকে জানাইও। আমি আল্লার দয়ায় নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি থেকে কিছু যোগ করে দিয়ে তার আর আপত্তি দূর করবো। তুমি

জান যে তুমি সব সময় ছয় ভাগ পাও এবং কামরাণ পায় পাচ ভাগ। তুমি সর্ব্বদাই এই নিয়ম মনে রেখো এবং সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলো। এ কথাও তুমি মনে রেখো যে সর্ব্বদা তুমি তার সঙ্গে মানিয়ে চলবে। যে বড় হয় তাকে মহানুভবও হতে হয়। আমি আশা করি যে তুমি তার সঙ্গে ভাল সম্বন্ধ রক্ষা করে চলবে। তোমার ভাইয়ের সম্বন্ধে বলা যায় যে সে একজন সৎ যুবক। তোমার প্রাপ্য সম্মান সে তোমাকে দেবে এবং তোমার অনুগত হয়ে থাকবে। এ কথা তাকে সব সময়ই মনে রেখে সতর্ক হয়ে চলতে হবে।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে। প্রায় দুই তিন বছর তোমার কাছ থেকে কোনও লোকই আমার কাছে আসেনি। পত্রবাহকরূপে যে লোক-টিকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম—সে বারো মাসের মধ্যেও আমার কাছে—ফিরে আসেনি। মনে রেখো—এই রকম ব্যাপার অবাঞ্ছনীয়!

তুমি অনেক চিঠিতেই অনুযোগ জানিয়েছ যে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছ। এ রকম অনুযোগ একজন রাজপুরুষের পক্ষে অন্যায়। কারণ, কথায় আছে—

(ফারশিতে) 'কাজের শৃঙ্খলে যদি বদ্ধ তুমি
সেই অবস্থার দাস হয়ে থাক।
মনে ভাব, যদি তুমি নহে পরাধীন,
তবে চল নিজের খেয়াল মত।'

রাজার অবস্থার মত গুরুতর বন্দীদশা আর নাই। সুতরাং তার পক্ষে অপরিহার্য্য বন্ধু-বিচ্ছেদ নিয়ে অনুযোগ করা অনুচিত।

আমার ইচ্ছানুযায়ী তুমি আমাকে চিঠি লিখে থাক, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি চিঠি লেখার পর একবার পড়েও দেখ না। যদি তা করতে তাহলে তোমার নিজের ভুলগুলি তুমি দেখতে পেতে ও সেগুলি শোধরাবার চেষ্টা করতে। তোমার শেষ চিঠির অর্থ উদ্ধার করতে এবং তার মানে বুঝতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। চিঠি এলোমেলো ভাবে লেখা ও দুর্বোধ্য। গদ্যে কে হেঁয়ালি দেখেছে? তোমার বানান মন্দ নয় কিন্তু একেবারে শুদ্ধও নয়। তোমার চিঠি অবশ্য বোঝা যায় কিন্তু দুরূহ শব্দ ব্যবহারের জন্য কোনও মতেই সহজবোধ্য হয় না। চিঠি লেখায় তোমার উৎকর্ষতার অভাব আছে নিশ্চয়ই। তোমার বিফলতার প্রধান কারণ এই যে, তুমি নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠো। ভবিষ্যতে কৃত্রিমতা বর্জন করে স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় চিঠি লিখবে। তাতে লেখক ও পাঠক দুয়েরই কষ্ট লাঘব হবে।

তুমি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যাত্রা করছো। সেইজন্য সর্বদাই এখন যে সব জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, মহান ব্যক্তিরা তোমার কাছে আছেন, তাঁদের উপদেশ নিয়ে সেই ভাবে নিজেকে চালিত করবে।

যদি তুমি আমার প্রশংসা অর্জন করতে চাও, তাহলে তুমি বাজে লোকের সঙ্গে মিশে সময় নষ্ট করো না, বরং সেই সময়টা যারা তোমার শুভানুধ্যায়ী তাদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনায় ও মেলামেশায় কাটিও। প্রত্যেকদিন দুইবার তোমার ভাই এবং বেগদের তোমার কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিও, তাদের মরজিমত তোমার কাছে হাজির হওয়ার সুযোগ দিও না। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার পর যে কোনও ব্যাপারেই হোক তুমি যেটা সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করবে সেই ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত কাজ করার সিদ্ধান্ত করবে।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে খাজা কালানের সঙ্গে তুমি বিশেষ বিশ্বস্ত আচরণ করবে। তাঁর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে আমাকে যেমন কাজ করতে দেখেছো সেই ভাবে তুমিও কাজ করে যাবে। আল্লার দয়ায় তোমার চার পাশের দেশগুলি নিয়ে কাজের পীড়াদায়ক দুরূহতা যখন কমে আসবে, তখন আর কামরাণকে তোমার প্রয়োজন হবে না। সে রকম অবস্থা এলে তোমার ভাই বাল্‌খে তার বিশ্বস্ত অনুচরদের রেখে আমার কাছে চলে আসতে পারবে।

যখন কাবুলে ছিলাম তখন অনেক বড় বড় কাজ করেছি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভও আমার হয়েছে। সেই জন্য ঐ স্থানটিকে আমার সৌভাগ্যের দ্যোতক মনে করে আমার সাম্রাজ্যের অংশ বলে নিরূপণ করেছি। তোমরা কেউ যেন এই দেশটি নিজের দখলে রাখবার জন্য মতলব করো না।

সুলতান উইসের হৃদয় জয় করবার জন্য তুমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ ভদ্রব্যবহার করার চেষ্টা করবে। তিনি জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁকে তোমার কাছে কাছে রাখবে ও তাঁর উপদেশ মত কাজ করবে।

সৈন্যদলের শৃঙ্খলা ও তাদের কার্য্যাক্ষমতা যাতে সব সময় বজায় থাকে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

বিয়ান সব বিষয়ই আমার কাছে থেকে জেনে গেল। তোমার যদি কিছু জানবার থাকে তার কাছ থেকে মৌখিক জেনে নিতে পারবে।

আমি আবার তোমার সুস্বাস্থ্য আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

(প্রথম রবি মাসের ১৩ই তারিখ বৃহস্পতিবার লিখিত)।

এই ভাবেই কামরান ও গাজা কালানকে আমি নিজের হাতে চিঠি লিখি।

১৯শে তারিখ বুধবার আমি মির্জ্জা ও সুলতানদের, তুর্কি ও হিন্দুস্থানি বেগদের ডেকে পাঠাই। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, আমি এই বৎসর কোনও না কোনও দিকে সৈন্য চালনা করবো। আমার যাত্রার পূর্ব্বে আসকারি (বাবরের একজন পুত্র) পূর্ব্বপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে এবং গঙ্গার ওপারের আমির ও সুলতানরা তাদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেবে। তারপর আমি যেরূপ ভাবে অভিযান আরম্ভ করা উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবো সেইভাবেই অভিযান সুরু হবে। আমার এই সমস্ত অভিপ্রায় লিখিতভাবে জানিয়ে ২২শে তারিখ শনিবার গিয়াসউদ্দিন কাচিকে সুলতান জানিদ বিরলাস ও পূর্ব্বপ্রদেশের আমিরদের কাছে পাঠাই ও নির্দ্দেশ দিই যেন তারা একুশদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি গিয়াসউদ্দিন কাচিকে মৌখিক উপদেশ দিই যেন সে তাদের জানিয়ে দিই যেন সে তাদের জানিয়ে দেয় যে আমি আসকারির নিকট অস্ত্রশস্ত্র, কামান এবং যুদ্ধবিশারদ সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র পাঠাবো এবং সেগুলি যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগেই ঠিক করা হয়ে যাবে। গঙ্গার অপর পারের সমস্ত আমির ও সুলতানদের আসকারির সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আল্লার অনুগ্রহে যেদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে হবে সেই দিকেই অভিযান করার আদেশ দেওয়া হলো। তাদের আরও জানিয়ে দেওয়া হলো যে ঐ দিকে আমার পক্ষভুক্ত যে সব লোক আছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে যে ঐ দিকে এমন কিছু কাজ আছে কিনা—যার জন্য আমার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। যদি সত্যই প্রয়োজন থাকে তাহলে আমার যে কর্ম্মচারীকে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আমার সঙ্গে পরামর্শ সভায় মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে পাঠানো হয়েছে সে ফিরে এলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে কালবিলম্ব না করে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহন করে সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেব। তবে বাঙ্গালীরা যদি শান্ত থাকে ও বিদ্রোহের মনোভাব না দেখায় আর যদি সেদিকে এমন কোনও গুরুত্ব-পূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় যাতে আমার উপস্থিতির নিতান্ত প্রয়োজন হতে পারে তা হলে সে কথা আমাকে যেন তারা জানিয়ে দেয়। তাহলে আমি এখানেই অপেক্ষা করবো এবং আমার সৈন্যদের অন্য কোনও দিকে চালনা করবো। আমার অনুরাগী ও বন্ধুরা আসকারির সঙ্গে যেন অবশ্য অবশ্য পরামর্শ করেন এবং দৈব আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে ঐ দিকে কি ধরণের কাজ সাধারণ ভাবে অনুসরণ করা উচিত তা যেন ঠিক করেন।—

(ক্রমশঃ)

মর্মান্তিক

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

গল্প ও ইতিহাস উভয়েরই ভিত্তি বাস্তবের ওপর। তবে একটু পার্থক্য আছে। ইতিহাসের নায়করা অসাধারণ, আর গল্পের নায়করা সাধারণ। বিখ্যাতদের জীবনকথা হয় ইতিহাস, আর অখ্যাতদের জীবনকথা হয় গল্প।

অনেকদিন আগেকার ঘটনা। বর্ধমান রাজকলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে এসেছি। গল্প লেখার বাতিক আছে। প্রতি বছর পূজাসংখ্যার জন্য লেখা পাঠাই। কিন্তু একটিও মনোনীত হয় না। সব একে একে ফিরে আসে টিকিটের বাক্সে খরচ আর ব্যর্থতার বোঝা বহন ক'রে। আঘাত পেলেও আশা ছাড়িনি। এবারেও চেষ্টা করছি।

বর্ষার দিন। কখনও আলো, কখনও অন্ধকার। আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের প্রেমের কলহ। বৈচিত্র্যে ভরা দুপুর। কবি হলে হয়তো ছোটখাটো 'মেঘদূত' রচনা করতে পারতাম। কিন্তু কবিতা আমার আসে না। লিখতে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা ঘামাচ্ছি। তবু পছন্দসই 'প্লট' পাচ্ছিনে। শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ি। মনে পড়ে—সন্ধ্যার পর মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি চায়ের নেমন্তন্ন আছে।

মহেন্দ্রবাবু প্রবীণ উকিল। কলেজের 'গভর্নিং বডি'-র মেম্বর। চমৎকার লোক—যেমন সৌম্যমূর্তি, তেমনি মধুর ব্যবহার। আমার বড়দার সহপাঠী ও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। আমাকে ছোট-ভাইয়ের মতোই দেখেন। আজ নাতির জন্মদিন উপলক্ষে জলযোগের আয়োজন করেছেন।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি। 'অধ্যাপক ভবন' থেকে 'লক্ষ্মীধাম' মাইল খানেক পথ। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চলেছি হন হন ক'রে। ঘন ঘন মেঘ গুড় গুড় করে, আর বিদ্যুৎ চমকায়। বীরহাটা ব্রিজের কাছে আসতেই কে যেন পিছন থেকে ডাকে—বাবুমশায়, ও বাবুমশায়, চার আনা পয়সা দেবেন? সারাদিন নেশা করা হয় নি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

থমকে দাঁড়াই। চেয়ে দেখি একটা লুংগিপরা রোগা লোক—হাড়গিলের মতো চেহারা। মাথার চুল উস্কখুস্ক। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল। মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কাছে এসে লিকলিকে ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে আবার বলে—দেন চার আনা পয়সা। হাতে কিছু এলেই দেনা শোধ করব। আপনার ঠিকানাটা বলুন। নিজে গিয়ে পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আসব।

আমার পকেট শূন্য। বলি—কাছে পয়সা নেই। থাকলে দিতাম।

লোকটা একদম নাছোড়বান্দা। আমি জোরে জোরে চলতে শুরু করলে কি হবে, সে আমার সংগে হাঁটে আর ঘ্যান ঘ্যান করে—আমি পয়সা নিয়ে পালাব না। আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি বড় ঘরের ছেলে। ভাগ্যদোষে ছেলেবেলায় কুসংগে মিশে বদ অভ্যেস ক'রে ফেলেছিলাম। তাই এই দশা।

লোকটাকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিনে। তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নরম স্বরে বলি—কেন মিছে কষ্ট ক'রে আমার সংগে আসছ ভাই। কাছে কাণাকড়িও নেই। থাকলে এত সাধতে হ'ত না। আজকের মতো মাপ কর, বরাতে থাকে আর একদিন পাবে। অন্য চেষ্টা দেখ। আমার জরুরী কাজ রয়েছে।

লোকটা হতাশ হয়ে ফেরে। আমিও পা চালিয়ে 'লক্ষ্মীধাম'-এ পৌঁছে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। উৎসবময় আবহাওয়া। প্রচুর আয়োজন। চা—জলযোগের নামে ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা। আহারান্তে শুভকামনা জানিয়ে

বৃদ্ধের দল বিদায় নেন। আমি পরিবারের সকলের সংগে খেতে বসি। খাওয়া শেষ হতে দেরি হ'য়ে যায়। আঁচিয়ে পান মুখে দিয়ে বেরোবার উদ্‌যোগ করছি এমন সময় বৃষ্টি নামে। জোর বৃষ্টি। থামবার লক্ষণ নেই। মহেন্দ্রবাবু বলেন—তাইতো এই দুর্যোগে এতখানি পথ যাবে কেমন ক'রে! রাস্তায় নিশ্চয়ই জল দাঁড়িয়েছে। ঘোড়ার গাড়ি মিলবে না। আজ এখানে থেকে যাও। এ তোমার নিজের বাড়ি।

বৈঠকখানার পাশের ঘরে আমার বিছানা হয়। মহেন্দ্র-বাবু মজলিসী মানুষ। গড়গড়া খেতে খেতে নানা গল্প শুরু ক'রে দেন। হঠাৎ আমার মনে পড়ে সেই নেশাখোর ভিক্ষুকের ব্যাপারটা। সায়াহ্নিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি মহেন্দ্রবাবুর কাছে। একটু শুনেই তিনি বলেন—বুঝেছি। আর বলতে হবে না। তুমি মাধা-মাতালের পাল্লায় পড়ে-ছিলে আর কি। ছোকরার কাহিনী বড় করুণ হে। ভাবলে চোখে জল আসে। ঠাকুরদা ছিলেন বিশিষ্ট-বিজ্ঞানী, বাবা ছিলেন রসজ্ঞ শিল্পী, আর ও হয়েছে পাঁড় মাতাল। পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখা খুব কঠিন। সংযমের একটু অভাব হলেই ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। যেন কতকটা সংগীতের লয়—সুরের মাত্রা। ছন্দ ও তালের সংগে সুসংগতি।

মহেন্দ্রবাবু গড়গড়ায় টান দেন, আর ধোঁয়া ছাড়েন। কিছুক্ষণ ধ'রে আরামে তামাক খেয়ে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে রেখে কাহিনী আরম্ভ করেন:—

* * * *

কর্জনার মুখুজ্যে বংশে জন্ম হয় সত্যানন্দবাবুর। মুখুজ্যেদের সামাজিক প্রতিপত্তি থাকলেও আর্থিক অবস্থা তখন প'ড়ে এসেছে। তার ওপর বাপ অকালে মারা যান। তাই সত্যানন্দকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয় দারিদ্র্যের সংগে। তীক্ষ্ণ মেধা ও অসীম অধ্যবসায়ের গুণে ছাত্রাবস্থায় তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উচ্চস্থান ও বৃত্তি লাভ ক'রে শেষে 'ন্যাচার্যাল এণ্ড ফিজিকাল সায়েন্স'-এ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন'-এর আনুকূল্যে বিলাত যান। সেখানে রসায়ণ গবেষণা ক'রে 'ডক্টরেট' পান। দেশে ফিরে এসে সত্যানন্দ অধ্যাপকের কাজ নিলেন কলকাতার কলেজে। কয়েক বছরে সুনাম অর্জন ক'রে অধ্যাপনা ছাড়লেন। প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'এমারেল্ড কেমিকাল ওয়ার্কস।' এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর অর্থ আসতে লাগল। বছর দশেকের মধ্যে বর্ধমান শহরে মস্ত বাড়ি হ'ল। সত্যানন্দের প্রাণের টান ছিল দেশের ওপর। স্কুল জীবন কেটেছিল এই জেলা শহরে। গৃহ প্রবেশের সময় লোকজন খাওয়ানোর কী ঘটা! জেলার কৃতী সন্তান। তাঁর সমৃদ্ধিতে শহর-বাসী আনন্দ ও গৌরব বোধ করলে। সত্যানন্দ শনিবার এসে সোমবার চলে যেতেন। কাজের মানুষ—সর্বদাই ব্যস্ত। আমার আজও বেশ মনে আছে তাঁকে। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথা-ভরতি কাঁচা-পাকা চুল, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, সদালাপী মিষ্টভাষী। মানুষের কখন যে কি বিপদ ঘটে কিছুই বলা যায় না। রসশালায় কাজ করবার সময় হঠাৎ একদিন 'অ্যাসিড' ছিটকে পড়ল তাঁর চোখে। ফলে দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেল। কত চিকিৎসা করালেন! জলের মতো টাকা খরচ করলেন। কোন ফল হ'ল না—দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন না। দুর্দৈবের পর দুর্দৈব। আকস্মিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী পরলোকগমন করলেন বছর না ঘুরতেই। কলকাতায় টিকতে পারলেন না সত্যানন্দ। অস্বস্তিকর আবেষ্টনী ছেড়ে বিপত্নিক বৃদ্ধ বর্ধমানে এসে বাস করতে লাগলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর বাইরের ঘরে নিয়মিত বৈঠক বসত শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। তাঁকে সংগদান ক'রে সকলেই আনন্দ পেতেন। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে মানসিক সজীবতা বজায় রেখে বহুদিন বেঁচে ছিলেন তিনি।

সত্যানন্দের তিন ছেলে। বড়ছেলে দুর্গাশরণ এম-এস সি পাস করেছিলেন রসায়নে। তিনি কলকাতায় থেকে 'এমারেল্ড কেমিকাল ওয়ার্কস' পরিচালনা করতেন। বাপের প্রতিভা ও প্রযত্ন তাঁর ছিল না—কারবারটি টুমটাম ক'রে চালাতেন। মেজ ছেলে হরিশরণ বি-এল পাস ক'রে বর্ধমানে ওকালতি আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়ে-ছিল এলাহাবাদে। শ্বশুর নামকরা 'অ্যাড্‌ভোকেট'। ভদ্রলোকের একটিমাত্র মেয়ে। অন্য কোন সন্তান ছিল না। বয়স বাড়ছে, কর্মক্ষমতা কমে আসছে। স্থির করলেন তাঁর 'প্র্যাক্‌টিস' তুলে দেবেন আস্তে আস্তে জামাইয়ের হাতে। বেয়াইমশায়কে লিখলেন হরিশরণ এলাহাবাদ

হাইকোর্টে যোগদান করলে সব দিক দিয়েই ভালো হবে এবং তিনিও সুখী হবেন। খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ ছাড়তে নেই। সত্যানন্দ মত দিলেন। হরিশরণ চলে গেলেন শ্বশুরের কাছে। ছোটছেলে কালীশরণ ভাগ্যদোষে লেখাপড়া তেমন করতে পারেন নি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় তাঁর বিয়ে হয়। কিছুদিন পরে বাঁ-পায়ে হাঁটুর নিচে ফোড়া 'সেপ্‌টিক' হয়ে 'গ্যাংগ্রিন'-এ দাঁড়ায়। বাঁ-পাটা অপারেশন ক'রে অনেকখানি বাদ দিতে হয়। একে ছেলেবেলা থেকে স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তার ওপর অংগহানির 'শক্'। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কালীশরণের ছিল একটি বড় গুণ। গান বাজনায় অদ্ভুত অনুরাগ। সুরজ্ঞান অসাধারণ, আর তারের যন্ত্রে অসম্ভব মিষ্টি হাত। একদিন সত্যানন্দ বললেন—কালী, তোর অদৃষ্ট মন্দ। লেখাপড়ায় বিঘ্ন এল। দুঃখ করিসনে। ঘরে ব'সে সুর সাধনা কর, তাতেই তোর সিদ্ধিলাভ হবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় খাওয়া-পরার জন্য তোকে কোন দিনই ভাবতে হবেনা। তোর চর্চা চলবে আর আমারও সময় কাটবে। চোখ থাকলে পড়াশুনা নিয়ে জীবনের শেষ অংকটা শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারতাম। সে সৌভাগ্য থেকে তো বঞ্চিত হয়েছি। মনে হয় তুই আমাকে শান্তি দিতে পারবি।

স্থানীয় ওস্তাদদের ডাকা হ'ল। সেতার এসরাজ বেহালা শিখতে লাগলেন কালীশরণ। বেহালায় তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখে ওস্তাদরা মুগ্ধ। সংস্কার ছাড়া এমন অধিকার এত অল্প দিনে হয় না। দেখতে-দেখতে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বেহালাদার হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়ল কালীশরণের। বাড়িতে ভিড়। যে আবহাওয়ায় মিশিয়ে ছিল অন্ধের দুঃখ ও খঞ্জের ক্ষোভ, সেখানে এখন আনন্দের কলরব। প্রতিবেশী তো আসেই। দূর থেকে আসতে থাকে রসজ্ঞরা। বেশ কয়েকজন ভক্তশিষ্য জোটে। শহরের উৎসবে-অনুষ্ঠানে কালীশরণের বেহালা অন্যতম আকর্ষণ। লোকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় সভা সমিতিতে পূজা প্যাণ্ডেলে। আপত্তি করলেও ছাড়েনা। এমন কি অনেক সময় সত্যানন্দকেও আসরে টেনে নিয়ে যেতে কসুর করে না।

সত্যানন্দের মৃত্যুর পর মুখুজ্যে পরিবারে পরিবর্তন এল। সত্যানন্দ জ্ঞানী লোক ছিলেন। দিন শেষ হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে উইল ক'রে সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন—যাতে ছেলেদের মধ্যে মনোমালিন্য বা বিবাদ উপস্থিত না হয়। কালীশরণের শক্তিহীনতার কথা বিবেচনা ক'রে বর্তমানের বাড়ি ও কর্জনার জমি-জমা তাঁকে দিয়েছিলেন। কালীশরণের জীবন স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হওয়ারই কথা—সংসারে টানাটানির কোন কারণই ছিল না। কিন্তু মাধবনাথ নিয়ে এল যত ভাবনা-বেদনা—যত অবমাননা লাঞ্ছনা। এই মাধবনাথই 'মাধা মাতাল'—যার খপ্পরে পড়তে পড়তে তুমি বেঁচে গিয়েছ আজ।

মাধবনাথ কালীশরণের একমাত্র বংশধর ও মুখুজ্যে-কুলের কলংক। সত্যানন্দের চোখ ছিল না—নাতিকে চোখে চোখে রাখতে পারতেন না। কালীশরণের পা ছিল না—ছেলের পেছনে পেছনে ঘুরতে পারতেন না। মাধবের মা দয়াময়ী যথাসাধ্য পরিশ্রম করতেন অসহায় শ্বশুর ও অসমর্থ স্বামীর সুখ সুবিধার জন্যে। ছেলের দিকে তেমন নজর দিতে পারতেন না। তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন—সদ্‌বংশের ছেলে আপনা থেকেই মানুষ হয়ে উঠবে। দুঃখের বিষয় মাধব উচ্চ আদর্শ বেছে নেয় নি। ঠাকুরদা, বাবা ও মা'র অক্ষমতার সুযোগ নিয়েছিল পুরোপুরি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত, যার তার সংগে মিশত, মন দিয়ে পড়াশুনা করত না! পরীক্ষায় ফেল ক'রে ক্লাসে উঠতে না পারায় তার কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। গুরুজনের কাছে অনর্গল নির্জলা মিথ্যা কথা ব'লে যা খুশি ক'রে বেড়াত। শ্বশুরের স্বর্গলাভের পর মাধবের মা যখন খানিকটা ফুরসৎ পেলেন ছেলের দিকে তাকাবার, তখন করণীয় বেশী কিছু ছিল না। মাধব ইতিমধ্যেই অধঃপাতে গিয়েছে। সত্যানন্দের একখানি 'ব্রুহাম' গাড়ি ছিল। রোজ সকালে বিকেলে কিছুক্ষণ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে বেড়িয়ে আসতেন গাড়িতে। কোন কোন দিন কালীশরণও তাঁর সংগী হতেন। গাড়ির কোচওয়ান ছিল কফুর আলি। তার ছেলে মেহের আলি সুন্দর বাঁশি বাজাত। বাঁশি শেখার অজুহাতে মেহের আলির কাছে যাতায়াত করত মাধব। গানবাজনা সম্বন্ধে প্রকৃতিগত দুর্বলতা কালীশরণের, কাজেই তিনি কিছু মনে করতেন না। মেহের আলির সংঙ্গে মিশে মাধব কুপথে যেতে শুরু করল

সত্যানন্দের মৃত্যুর পর কালীশরণ গাড়ি ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন। তবু মেহের আলির প্রতি অনুরাগ অটুট রইল। বার কয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে মাধব লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। মদে চুর হয়ে শরীর নষ্ট করতে লাগল। রাত্রে বাড়ি ফিরত না। যাকে বলে একেবারে চরিত্রহীন। কালীশরণ ও তাঁর স্ত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। মেহের আলি মদ খেলেও বেসামাল বা অকেজো হয়ে পড়েনি। সে ভাড়াটে গাড়ি চালিয়ে রীতিমতো রোজগার করত, বাপের পয়সা ওড়াত না। মেহের আলি সেয়ানা মাতাল। মাধব বেহদ্দ বোকা। মায়ের বাক্স ভেঙে মদ খেয়ে মেহের আলির অনুকরণে রঙিণ লুংগি প'রে কোচ বক্সে ব'সে থাকত তার পাশে। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তানের দুর্দশা দেখে শহর সুদ্ধ লোক ছি ছি ক'রত। লজ্জায় ঘৃণায় আধমরা হয়ে দিন কাটাতেন কালীশরণ ও তাঁর স্ত্রী। সমাজে মুখ দেখাতেন না যত দিন বেঁচে ছিলেন। নির্বাসিতের মতো বিজন ঘরে একটার পর একটা করুণ স্বর বাজিয়ে যেতেন বেহালায় কালীশরণ। আর পাশে ব'সে অবিরল চোখের জল ফেলতেন দয়াময়ী। ছেলের বদ-খেয়ালের দেনা শুধতে শুধতে দেশের জমিজমা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সম্বল বর্দ্ধমানের বসত বাড়ি। সেই বাড়ির এক তলাটা ভাড়া দিয়ে তারই সামান্য আয় থেকে কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলত। কালীশরণ ও দয়াময়ীর গুণের কি তুলনা আছে! তাঁদের চরিত্রে অপূর্ব সমন্বয়—বিনয়, সম্মানবোধ ও আত্মনিষ্ঠার। তাঁদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁদের অশান্তিতে আমরাও বেদনা অনুভব করতাম। এমন মানুষদের সংসার-কারায় রেখে ভগবান কখনও বেশী দিন দুঃখ দেন না। ইহকালের পুরস্কার পরকালে মেলে। হ'লও তাই। কয়েক বছর আগে বেরি বেরি 'এপিডেমিক'এ মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে স্বামী-স্ত্রী চোখ বুঁজলেন। তাঁদের এক সংগে এক চিতায় দাহ করা হ'ল। অবাক-কাণ্ড। ইতিহাসে সহমরণের কথা পড়েছি—বটে। কিন্তু সে মানুষের সৃষ্টি, সমাজের ষড়যন্ত্র। আর এ যে স্বাভাবিক সহমরণ—ঈশ্বরের ইংগিত, অজানার আহ্বান। বহু পুণ্য ফলে এমন সৌভাগ্য দেখা দেয়। আমরা অনেকে আশা করেছিলাম এই পবিত্র মরণোৎসব মাধবের চরিত্রে পরিবর্তন আনবে। হয়তো ধীরে ধীরে সে ফিরে আসবে ভদ্রজনোচিত জীবন যাত্রায়। ফল হ'ল সম্পূর্ণ বিপরীত। মা বাবা মাথার ওপর থেকে সরে গেলেন। তবে আর কি! মাধব এখন বেপরোয়া। একেবারে চ'লতি হাওয়ার পন্থী' হয়ে চলে গেল কলকাতায়। সেখানে রংগমঞ্চের এক সুন্দরীর সংস্পর্শে এসে মাস কয়েকের মধ্যে অনেক টাকা নষ্ট ক'রে নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে এল বর্ধমানে। বছর দুই যেতে না যেতে দেনার দায়ে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। বাড়ির নতুন মালিক লোক ভাল। বংশ-মর্যাদা ও শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে বাড়ির পিছনের এক অংশে থাকতে দিলেন মাধবকে। ঐ খানে ছিল সত্যানন্দের অশ্বশালা। বিধির বিধান বিস্ময়কর নয় কি? মেহের আলির দোস্তকে আস্তাবলে আস্তানা গাড়তে হ'ল। ঠাকুরদার আমলের আসবাব পত্র বেচে বেচে কিছু দিন চালিয়ে ছিল—এখন একান্ত কপর্দকহীন। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; কোন দিন খেতে পায়, কোন দিন পায়না। নির্লজ্জের মতো ভিক্ষে ক'রে যা সংগ্রহ করে তাই দিয়ে যত দূর পারে মদের তৃষ্ণা মেটায়। কোন্ দিন শুনতে পাব অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। দুর্জন সংসর্গের কী কদর্য পরিণাম!

* * *

মাধবের ইতিহাস শেষ ক'রে মহেন্দ্রবাবু উঠে যান। রাত গভীর হলেও ঘুম আসে না। বার বার ভাবি অবিবেক মাধবের কথা। পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি 'অধ্যাপক ভবন'-এ ফিরি। বেলা দশটায় ক্লাস। গিয়ে দেখি কলেজ বন্ধ। একজন গণ্যমান্য দেশনেতা পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। দুপুরে বিশ্রামের পর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। আচ্ছা, মাধবের বৃত্তান্ত হুবহু লিখে ফেললে কেমন হয়? বেশ ভালো জমবে গল্পটা। সেই দিন থেকে শুরু ক'রে একসপ্তাহ ধ'রে লিখে যাই মহেন্দ্রবাবুর কাছে যা শুনেছি অবিকল তাই। সাতদিন বাদে কিছু রদবদলের পর আবার নতুন ক'রে লিখি। ঠিক করি সামনের শনিবার বিকেলে কলকাতা যাব। সোমবার

কিসের একটা ছুটি। কপাল ঠুকে গল্পটা দিয়ে আসব 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক মশায়ের হাতে। মনে কত আশা—গল্পও ছাপা হবে আর পকেটে কিঞ্চিৎ আসবেও।

সন্ধ্যার 'লোকাল'-এ যাবার কথা। কিন্তু কেন জানিনে মনটা অত্যন্ত ছটফট করে। চারটে বাজতেই স্টেশনে হাজির হই। ট্রেন 'ইন' করতে বহু দেরি। একান্তে বেঞ্চিতে ব'সে কত কি কল্পনা করি। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে ভিড় কেন? কৌতূহল হয়। ওদিক থেকে একজন ভদ্রলোক আসছেন। জিজ্ঞাসা করি—কি হয়েছে মশাই?

—লাইনের ওপর একটা লোক প'ড়ে গিয়েছে।

—খুব লেগেছে?

—হ্যাঁ, অজ্ঞান অবস্থা। এখুনি হাঁসপাতালে পাঠানো দরকার। নইলে বিপদের সম্ভাবনা।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কানে আসে একজন আর একজনকে বলছেন—ভালো ঘরের ছেলে। কোথায় ভদ্রভাবে জীবনযাপন করবে, তা না যত সব বিশ্রী ব্যাপার—মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

মনটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। কে এই মাতাল! 'অ্যাম্বুলেন্স' গাড়ির 'হর্ণ' শুনতে পাই। বেঞ্চি ছেড়ে উঠতেই নজরে পড়ে দুর্ঘটনার নায়ককে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হচ্ছে। ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি। মাধব মুখুজ্যে!—হ্যাঁ, মাধব মুখুজ্যে। হতভাগ্য পক্ষকাল ধ'রে কী আলোড়নই না এনেছে আমার মনোজগতে!

'অ্যাম্বুলেন্স' গাড়ি ছোটে মাধবকে নিয়ে। আমিও আস্তে আস্তে হাঁটি 'ফ্রেসার হস্‌পিটাল'-এর পথে। খোঁজ ক'রে যখন 'এমার্জেন্সি ওয়ার্ড'-এ উপস্থিত হই তখন মাধবকে সাদা চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে।

রবীন্দ্র-সৌন্দর্যবোধে অতীত চারণা ও 'কল্পনা' কাব্য

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবীন্দ্র কবিমানস 'মানসী' থেকে 'চিত্রা' পর্যন্ত একটি প্রেমমধুর সৌন্দর্যোপলব্ধির মধ্যে অবগাহন ক'রে একটি অপরূপা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানমাধুর্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হ'য়ে থেকেছে। বস্তুজগতের বহুব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন সেই রূপলক্ষ্মীর স্বচ্ছসুন্দর রূপমহিমাকে, তেমনি অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী সুগভীর সৌন্দর্যধ্যানের পথ ধ'রে কবির অন্তরবাসিনী হ'য়ে বসেছেন। তাই তার সঙ্গে যেন কোনদিনই বিচ্ছেদ হওয়ার নয়। সে অন্তরবাসিনী, সে অন্তরের বৃন্ত থেকে কোনদিনই বিচ্যুত হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনেও হয় নি।

প্রথম যৌবনের অরুণালোকে হৃদয় যখন নূতন প্রেমরাগে রঙীণ হয়ে উঠেছে, তখন কবিপ্রাণের নবজাগরিত প্রেমচেতনা দেহরূপের পরিমণ্ডলে এসে ভোগের কামনা দিয়ে ঘিরে দেহের সব রচনা করেছে। 'কড়ি ও কোমলের যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা যখন বাস্তবনিষ্ঠার ভোগ লোলুপতায় ছন্দমুখর হ'য়ে উঠেছে, তখনও তাঁর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যের ইহজন্মের প্রেয়সী-নারীর দেহসৌন্দর্যের দিকে চেয়ে তাঁর পূর্বজন্মের সুমধুর প্রেমস্মৃতি জেগে উঠেছে এবং উচ্ছ্বসিত কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

> ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
> যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
> সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
> জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।

সেই প্রিয়ার মধ্যেই যেমন তিনি আত্মবিস্মরণের সুখলোককে প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি ওই দেহময় প্রেমানুভূতিকে অবলম্বন ক'রেই কবি রূপ ও দেহ-কামনার অন্য এক প্রান্তে পদক্ষেপ করতে চেয়েছেন; একটি আবেগী পরিপূর্ণ সৌন্দর্যোপলব্ধির রূপচ্ছায়ায় [illegible]

বিছিয়ে দিয়ে প্রেম-মাধুর্যের অপরূপা মানসী-নারীকে ধ্যান করতে চেয়েছেন। প্রেম-কামনায় অন্তরের এই ধ্যানময়তা ছিল বলেই পূর্বজন্মের স্মৃতিময় প্রেমলোক কবির কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। 'কল্পনা'-কাব্যে কবির ঠিক তাই হয়েছে। সৌন্দর্যভাবনার কল্পলোক থেকে সাময়িকভাবে বিদায় নিয়ে যখন তিনি জীবনের এক বৃহত্তর কর্মপথে পদক্ষেপ করেছেন, তখন তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে অতীত ভারতের বহু গৌরবময় 'কথা' ও 'কাহিনী'। সেদিন এক অপরিসীম আনন্দবেগে অনন্তরাতের অনাদি অতীতকে 'তরঙ্গহীন ভীষণ মৌনতার মধ্য থেকে কথা বলার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছেন তিনি, এবং জীবনের পাতায় অদৃশ্যলিপিতে পিতামহদের কাহিনী লিখে অতীত তাঁর কাছে যেন মুনির ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, তাঁর কাব্যগ্রন্থের কাহিনীগুলি যখন ঝর্ণার অবিশ্রান্ত ধারার মতো তাঁর মানসভূমিতে নেমে আসছে, তখন তারই ফাঁকে ফাঁকে লেখা হচ্ছিল—'কল্পনার কবিতাগুলিও। আমাদের মনে হয়, বৃহত্তর কর্তব্যের ডাকে যখন কবি ক্ষীণ-শশাঙ্কের মৃদু আলোককে সম্বল ক'রে নিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন তিনি যেন দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের দিকে এক একবার ফিরে চাইছেন, আর সেই দিকে চেয়েই তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছে অতীতাশ্রয়ী এক অপরূপ সৌন্দর্যবোধ—অতীতের প্রেক্ষাপটে দেখতে পেয়েছেন তাঁর পূর্বজন্মের অপরূপা প্রেয়সীকে। এই প্রেক্ষাপট রচনা করে দিয়েছেন প্রধানতঃ মহাকবি কালিদাস।

প্রেম-মাধুর্যের স্মৃতিকে নিয়ে এই যে কবির অতীত চারণা—এর একটি বিশেস তাৎপর্য আছে। রোমান্টিক কবিমনের কল্পনা শুধু কেবল বাস্তবের মধ্যে থেকে শান্তি পায় না, অতীতের স্বপ্নরাজ্য পরিক্রমার মধ্য দিয়ে, স্বপ্নলোকের স্মৃতিচারণার আনন্দস্বাদের গভীরতাকে বুকে নিয়ে একটি পরিপূর্ণতাকে অনুভব করতে চায়। সৌন্দর্য চিরদিনই অসীম, এই অনন্তস্বরূপ সৌন্দর্যকে বস্তুপৃথিবীর সীমান্তশায়ী দেহরূপের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আবদ্ধ করে তাঁর অতীন্দ্রিয় প্রেম-কামনাকে কবি চরিতার্থ করতে চান। সেকালের সে-প্রেম সে-প্রেম ছিল দর্শনের মতো জন্ম জন্মান্তরের অদৃশ্য সেতুবাহী। সে-প্রেম দেহ-কামনা করে না, ইন্দ্রিয় ভোগের মধ্য দিয়ে চরিতার্থতাও চায় না; সে-প্রেম অনন্ত বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই সে-প্রেমের অফুরন্ত সৌন্দর্য-কামনা; তাই তার স্থিতি কামনা-বাসনার বহু উর্ধে। চিরকালীন সৌন্দর্যের মাধুর্য্যস্রোতে সে-প্রেমের অভিযাত্রা। খণ্ড সৌন্দর্যের সীমাবন্ধনকে ত্যাগ করে, অখণ্ড সৌন্দর্যের পরিশুদ্ধ অমৃতধারা যে-লোকে প্রবাহিত, সেই লোকে ক্ষণকালীন স্থিতি দিয়েও তিনি দেখতে চান তাঁর 'পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।' সেই সৌন্দর্যলোকের পানেই তিনি আজ অভিসারী।

এই প্রেমাভিসার তাঁর সার্থক হয়েছে 'কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায়। এই কবিতায় কবি তাঁর বহু-বাঞ্ছিতা লোধ্ররেণু-প্রসাধিতা অপরূপা মালবিকা প্রিয়ার কাছে স্বপ্নলোকে যেয়ে পৌছেছেন। এই মালবিকা তাঁর পূর্বজন্মের প্রথমা নায়িকা; সে তার রূপসৌন্দর্য দিয়ে, অতলান্ত প্রেমের অমৃত পান করিয়ে কবিকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল,—কবি তাকে তাই কোনদিন ভুলতে পারেন না। সেই অপরূপার জন্য এক অপরিসীম সৌন্দর্য-পিপাসা কবিমনকে আকুল ক'রে তোলে প্রতিদিন। বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে যখনই কবি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই মনে পড়ে তাঁর পূর্বজন্মের সেই অপরূপা প্রেয়সী নারীকে, যাকে ধ্যান করেছেন তিনি 'মানসসুন্দরী'-রূপে, আর অন্তরের নিভৃত আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন যাকে 'চিত্রা'রূপে। কবির হৃদয়বৃন্তে একটি পদ্ম হ'য়ে সে ফুটেছিল, কবির সজল নয়নে সেই অপরূপাই যেন একটি মুগ্ধ স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন-রূপিণী মালবিকাকে লাভ করার জন্যই স্বপ্নলোকে কবির অভিসার করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ বহু সমস্যাপীড়িত বাস্তবতার পরিবেষ্টনীতে কবির এই সৌন্দর্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত হ'তে পারে না। তাই তিনি বাস্তব লোকের কঠিন স্পর্শ থেকে নিজের কবিচিত্তকে মুক্ত করে নিয়ে কবি কালিদাসের যুগের শিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনীর স্বপ্নলোকে প্রবেশ করেছেন। তা' ছাড়া প্রাচীন ভারতের স্বপ্নসুন্দর পরিবেশ চিরদিনই কবিমনকে আকর্ষণ করেছে, এবং সেই সময়কার স্থান এবং মানব-মানবীর নামগুলি পর্যন্ত কবির রোমান্টিক মনের দ্বারপ্রান্তে এক চির-নূতন

সে আবেদন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কল্পনা' কাব্যে সেই আবেদনেরই একটি উজ্জল স্বাক্ষর পড়েছে। কবি তাঁর নিজ অন্তরের ধ্যানসুন্দর স্বপ্নময় পরিবেশে তাঁর ভাবলোকের শাশ্বত-যৌবনা নায়িকাকে এনে সৌন্দর্যানুভূতির পথ ধ'রে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। দুজনের মাঝখানে একটি জন্মান্তরের সুদূর ব্যাপ্ত মহাসমুদ্র দুলতে থাকলেও কবি তাকে দেখবা-মাত্রই চিনতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন এই তাঁর পূর্বজন্মের প্রেয়সী নারী মানবিকা। রোমান্টিক কবিমনের এক সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছে এই পরিচয়ের মধ্যে। বহু অতীতের অগণ্য দিনগুলিকে পার হ'য়ে এসে কবির স্বপ্ননায়িকা কবিহৃদয়ের দিগন্তদেশকে উজ্জ্বল ক'রে দাঁড়িয়েছে। কবি প্রত্যক্ষ করলেন সেই প্রেয়সী নারীর অপরূপ যৌবন কুসুমকে, সৌন্দর্য চেতনার দীপশিখাটিকে জ্বালিয়ে নিয়ে তার স্পর্শনিবিড় ঘন সান্নিধ্যকে অনুভব করলেন। তাই এমন উজ্জ্বল সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাঁর স্বপ্নলোকের বহু-আকাঙ্খিতা প্রেয়সী নারীর অপরূপ রূপচিত্র।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য স্বপ্নে একজন মানসী বা মানস-সঙ্গিনীর চিরদিনকার প্রতিষ্ঠা আছে, এটুকু আমরা দেখেছি। তার সৌন্দর্য-ধ্যানের এই দেবীকে একান্তভাবে ধরা ছোঁওয়ার মাঝখানে কোনদিন পাওয়া যায় না, অ-ধরা স্বপ্নরাজ্যে তার চিরকালীন অধিষ্ঠান। তাই তার সঙ্গে একটি বিরহবোধও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাকে না-পাওয়ার বেদনা চিরদিন কবিমনকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। অনির্দেশ্যের জন্য এক তীব্র বিরহ-আর্তি কবিমনেরগভীরতর স্তর থেকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে এইভাবে—

> সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
> মানস সরসীতীরে বিরহ-শয়ানে,
> রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
> জগতের নদীগিরি সকলের শেষে!
>
> [মানসী—মেঘদূত]

সশরীরে কোনো মানুষ সেই ধ্যান কল্পনার সৌন্দর্যস্বর্গের দেবীর কাছে কোনদিন যেতে পারে না। তাই কালি-দাসের যুগের কাব্যসৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবি তার চিরবাঞ্ছিতা প্রেয়সী নারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বর্তমান কালের **বহুদূরে এক অন্ধকারময়ী রজনীর স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে** মিলনস্বপ্ন তাঁর সেইখানেই সার্থক হয়েছে। এ যেন কবির ধ্যানজগতের প্রেয়সী নারীর সঙ্গে ভাবসম্মেলন। কবির রোমান্টিক মন অতীতের সৌন্দর্যরাজ্যের পানে বহুদিন বহুভাবে ধাবিত হয়েছে। 'মানসী'র 'সেকাল ও একাল 'কুহুধ্বনি' কবিতায় এমনি এক সৌন্দর্যচেতনাতেই কবির অতীত চারণা ঘটেছে। 'কল্পনা' কাব্যে তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা দেখি। কবি তাঁর মানসীকে কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান অতিক্রম ক'রে মিলন-মধুর স্বপ্নের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মধ্যে পেয়েছেন বটে, কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসভরা চিরন্তন বিরহ আবার রজনীর অন্ধকার রূপেই কবির কাছে নেমে এসেছে। এইখানেই সৌন্দর্যধ্যানী কবি-হৃদয়ের চিরদিনকার ট্র্যাজেডি।

সৌন্দর্যবোধে এই অতীত চারণা সম্বন্ধীয় দুটি কবি-তাতেও অপরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি এই কবিতা দু'টির রসবস্তু আহরণ করেছেন ভারতীয় পুরাণের প্রণয়-দেবতা মদন সম্বন্ধীয় কাহিনী থেকে, কিন্তু রবীন্দ্র-কবিকল্পনার বিশিষ্ট সৃষ্টি পর্যায়ে এই কবিতা দু'টি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিস্ময়কর মৌলিকতার স্বাক্ষর নিয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। ভাবানুভূতির মৌল প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভাব-রূপায়নের একটি বৃন্তে এই দুটি কবিতাপুষ্প কবি হৃদয়ের অতলদেশ থেকে পর পর দুটি দিনে বিকশিত হ'য়ে উঠে একটি পূর্ণায়ত অমর-রূপ লাভ করেছে।

পুষ্পধন্বা প্রেমদেবতা মদনের পরিচয় ভারতীয় পুরাণের মাধ্যমে সকলেরই জানা আছে। তার প্রেরণা বিশ্বের মানবমানবীর অন্তরের গভীরতম লোকে। প্রথম কবিতায় কবি মঙ্গলের অতীতকালের নরনারীর সঙ্গে কৌতুককর লীলার দিকটাই দেখিয়েছেন; কিন্তু মদনভস্মের পরবর্তী ভূমিকায় প্রণয় দেবতা মদনকে যেভাবে অঙ্কিত করেছেন, তাতে কোন বিশেষ নায়কের একক বৈশিষ্ট্যে তাঁর পদ-চারণা নেই। সারাটি পৃথিবীময় অনির্দিষ্ট এক বেদনা-ব্যাকুলতা ফল্গুধারার মতো রাত্রিদিন বয়ে যাচ্ছে, রতি-বিলাপের সংগীত-কারুণ্যে কেঁদে উঠছে দিগদিগন্ত। বকুল-বীথির পল্লব-মর্মরে, ভ্রমরের গুঞ্জরণে, সূর্যমুখীর ঊর্ধ্বমুখী প্রেমকামনায়, নির্ঝরিণীর গতিধারায় কি যেন এক আনন্দ-ভরা যন্ত্রণার ব্যাকুল স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠছে। অনির্দিষ্ট এক পূণ্যতার বেদনায় ধরণীর সব কিছুকে যেন ভ'রে দিয়ে

গিয়েছেন সেই ভস্মীভূত দেবতা এবং তার অদৃশ্য বিভূতি বেশ কিছুটা দৃশ্য হ'য়ে উঠেছে প্রকৃতির বেদনাধূসর পট-ভূমিকায়। কবি সেই অরূপ বেদনাকে ছন্দের রূপলোকে এনে দিয়েছেন এইভাবে—

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণ শয়নে। [মদন ভস্মের পর]

বিশ্বব্যাপী এই সীমাবিহীন ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়লেও দগ্ধ দেবতার অদৃশ্য বিভূতিকে এ-ভাবে রূপময় না ক'রে কবির উপায় ছিল না; কারণ তাঁর প্রেমানুভূতির সমুচ্চ ভাবাদর্শ প্রেমের সার্থকতার পথকে এভাবেই চিরদিন রূপ নিয়ে এসেছে। অন্তরের সেই সমুচ্চ ভাববিন্দুটিকে প্রেমদেবতা মদনকে সর্বপ্রথম অভিষিক্ত ক'রে নিয়ে ধরণীর আদিযুগের মানব-মানবীর দেহগত আকর্ষণকে রূপ দিতে চেয়েছেন কবি-দেহের মিলনেই হতো তাদের গভীরতর আনন্দ, আর দৈহিক বিচ্ছিন্নতায় তাদের বেদনাবোধ হতো অপরিসীম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সেই ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী প্রেম চিরকাল কামনার দ্বারা কলংকিত ও পংকিলতায় অস্বচ্ছ। সুতরাং এই প্রেম কখনো মানুষকে শাশ্বত পবিত্র সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না—রবীন্দ্র প্রেম কল্পনার জগতে একটি ত্যাগসুন্দর ও নিষ্কলুষ জ্যোতির্ময় আনন্দসত্তা চিরদিন বিরাজ করেছে, তাই তাঁর ভোগ-কামনার মধ্যে এনেছে অতীন্দ্রিয় প্রেমের এক উজ্জ্বলতম প্রেরণা। সেইজন্যই তার সৌন্দর্যধ্যানে নারীর দেহগত রূপ প্রকৃতির বিপুলব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে। দেহের কামনা দেহসীমা উত্তীর্ণ হয়ে অপূর্ব সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার উদ্বোধন ক'রে অন্তরের গভীরে এনে দিয়েছে রসঘন সৌন্দর্য-লোকের এক শাশ্বত বার্তা। সেই বার্তাটিই এই 'মদন ভস্মের পর' কবিতার একমাত্র উপজীব্য। আনন্দঘন অরূপ প্রেমসত্তা এইভাবেই অপরূপ এক রূপসৃষ্টির শতদলে স্তবকে স্তবকে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসভূমিতে দেহজ প্রেম দেহাতীত হ'তে পারে বলেই তাঁর প্রেমভাবনার মধ্যে এসেছে এক অসীমতা-বোধ। তাই মানব-মানবীর মিলনলগ্নেও অন্তরের তারে অনুরণিত হ'য়ে ওঠে অনির্দিষ্ট এক ব্যাকুলতা ও চিরদিন-কার বিরহের সুর। তাই এই কটি কবিতায় একদিকে যেমন রক্তমাংসের দেহগত ছলনা, অন্যদিকে তেমনি কল্প-লোকের অসীমতার ব্যঞ্জনাভরা স্বপ্নমাধুরী। একটিকে সৌন্দর্য-বিলাসিতার সঙ্গে তীব্রতর দেহপিপাসা, অন্যটিতে দেহহীন প্রেমের অন্তবিহীন বিরহ-ব্যাকুলতার সুরধ্বনি। সমুন্নত এক ভাবাদর্শের পথ বেয়ে অতীতের পটভূমিকায় স্থিতিলাভ ক'রে রস-প্রকাশের বিভিন্নতায় দুটি কবিতাই অপরূপত্ব লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমবোধের সঙ্গে একটি নিসর্গচেতনার নিরবচ্ছিন্ন যোগ আছে। এই যোগটি এই দুটি কবিতায়ই অপরূপ ভাবে ঘটেছে। এই কবিতাযুগলে প্রকৃতির বিচিত্র স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গে মানব-মানবীর হৃদয়গুলি যেমন এক হয়ে মিশে প্রেমানুভূতির আনন্দবেদনা রসে ভরে উঠেছে, তেমনি প্রেমদেবতা কন্দর্পের লীলাচাতুর্যের প্রকাশও ঘটেছে এই বিচিত্রসুন্দর প্রকৃতির পটভূমিকায়। 'মদন ভস্মের পর' কবিতায় এই নিসর্গ চেতনার রসসংযোগেই কবির প্রেম-কল্পনা আদর্শায়িত হ'য়ে উঠেছে; অসীমের ব্যঞ্জনায় অপরূ-পত্ব লাভ করেছে কবির অখণ্ড প্রেমানুভূতি।

অতীত চারণার মধ্যে প্রকৃতিপ্রীতি এমনি এক উজ্জ্বল পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে 'বর্ষামঙ্গল' ও 'প্রকাশ' কবিতায়। কালিদাসের যুগের বর্ষার এক আনন্দচেতনা কবি রবীন্দ্রনাথকে যেন 'তমালকুঞ্জতিমিরে' এসে দাঁড় করিয়ে অতীত ভারতের মিলনোৎসবকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ক'রে দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের বর্ষার আকাশে কবি দেখতে পাচ্ছেন শতেক যুগের কবিদলকে; মেঘমল্লার রাগিণীতে ভূর্জপাতায় নবগীত রচনার স্বপ্ন দেখেছেন কবি। বর্ষাপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ অতীত যুগের বর্ষাকে গীতময় ক'রে তুলেছেন এই 'কল্পনা' কাব্যে। প্রাচীন ভারতের বর্ষা উৎসব যেন রূপময় হ'য়ে উঠেছে এখানে।

সুদূর অতীতের স্বপ্নোজ্জ্বল মঞ্চে সৌন্দর্যের যে-মিলন লীলা প্রকৃতির বুকে অভিনীত হয়ে যাচ্ছিল, তারই রস-সুন্দর প্রকাশ ঘটল কবির ছন্দসংগীতে। এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ল প্রকৃতি ও মানুষের যে-শাশ্বত বন্ধন রয়েছে তারই মর্মসূত্র। প্রকৃতির বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে-বহুযুগ সঞ্চিত রহস্য গোপনে লালিত হচ্ছিল, তার প্রকাশ যখন কবি ক'রে দিলেন তখন—

শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হ'তে উপবনে ;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী
ভাব ভরা—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই
পড়ে না ধরা।
[প্রকাশ]

এই প্রকাশের মধ্যেই আবার অপ্রকাশের বেদনা এনে বিশ্ব-প্রকৃতির একটি অনির্দেশ বিষণ্ণতার সুর মাখিয়ে দিয়েছে।

'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটির বক্তব্য ও প্রকৃতির তিনটি লগ্নকে উপজীব্য ক'রে অতীত রসকেই স্বপ্নমাধুর্যে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। নায়িকার প্রণয়-বেদনা শাশ্বতকালের বটে, কিন্তু সুদূর অতীতের স্বপ্নকামনাময় বেদনা-উচ্ছলতা তার প্রতিটি কথার উচ্চারণে। যে-গভীর প্রেমানুভূতি কবি-মানসকে সুদূর অতীতের বহু বিস্তারের মধ্য দিয়ে পূর্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে আকুল ক'রে তুলেছিল, সেই প্রেমানুভবই প্রেমিকা নারীর বহু-আকাঙ্খিত প্রণয়াস্পদকে কাছে পেয়েও স্বাভাবিক দ্বিধাসংকোচের বশবর্তী হ'য়ে লগ্নকে ভ্রষ্ট ক'রে দিয়েছে। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র মধ্যেও ঠিক এমনি একটি প্রেম-গভীরতা অতীত রসের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ ক'রে কালাতিশায়ী মাধুর্যলাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা'র মধ্যে একটি রাত্রির দিক আছে। আকাশে সন্ধ্যা ঘনিয়ে-আসা লগ্নটিতে যাত্রা ক'রে রাত্রির সভাকবি হওয়ার জন্য কবি আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। সৌন্দর্যচেতনা যেমন তাঁর কবিমানসকে অতীতমুখী করেছে, তেমনি রাত্রি নিশীথের অন্ধকার প্রহরে তাঁর মনকে অতীতের ঋষিগণের স্মরণে মহত্তর সাধনার জন্য অতন্দ্র ক'রে রেখেছে। 'দুঃসময়' কবিতায় আভাসিত বৃহত্তর কর্মপথে পদক্ষেপ ক'রে রাত্রির এই সভাকবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যেন একটি গভীর সম্পর্ক আছে। অতীত ঋষিগণের সঙ্গে বসে' অতন্দ্র সাধনায় জীবনের সুগভীর অর্থ যেন উন্মোচিত হবে। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই এই বস্তু-বিশ্বের সুগভীর রহস্যকে উন্মোচিত করতে তাঁর অন্তরের ধ্যানকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। এই রাত্রি কবিতাতেও তিনি তিমির স্তব্ধতার ধ্যানাসনে বসে ধরিত্রীর মর্মতলে যে-সৃষ্টি রহস্য আদিযুগ হ'তে সঞ্চিত রয়েছে, সেই মর্ম সত্যকেই জেনে নেওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। বহু যুগযুগান্তর থেকে যে-ধ্যানী-তপস্বীরা বিনিদ্র নয়নে রাত্রির অন্ধকারে বসে' অন্তরের বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন, কবি এই কবিতায় তাঁদেরই নীরব সাধনার অংশভাগী হতে চেয়েছেন। বহুদূরকালের অন্তর-ভাবনার সঙ্গে নিজের সাধনা ও মননকে যুক্ত ক'রে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারকে তিনি এই কবিতায় পরম অর্থময় ক'রে তুলেছেন। জীবনের সাধনার মধ্যে যেমন একটি গভীরতা আছে, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও ঠিক তেমনি গভীরতা ও রহস্যময়তা।

এই কাব্যে সৌন্দর্যময় অতীত চারণায় বসন্ত-সৌন্দর্যেরও বহুদূরবিসারী একটি ভূমিকা আছে। অসমাপ্ত কর্মের দিকে যখন যাত্রা, তখন রাত্রির ভূমিকা প্রসারতর, আর সৌন্দর্যোপলব্ধির অতীত-চারণায় যে-ভূমিকা, তা বসন্তের। 'সোনার তরী'র শেষ কবিতায় কবি চলেছেন নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অসীমতার অভিমুখে, আর 'কল্পনা'য় কবি পদ-ক্ষেপ করেছেন অতীত ভারতের সৌন্দর্যলোকে। এই সৌন্দর্যলোকেই কবি বসন্তের দিনে দেখতে পান—

নাম হারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা কাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।

শুধু তাই নয়, এই বসন্ত দিনের—

সযত্ন সেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

কবির দৃষ্টিতে এই বসন্তের পুষ্পে লেখা রয়েছে প্রাচীন দিনের বিস্মৃত বার্তা, আর সেই পুষ্পের সৌরভে ভেসে আসে 'ক্লান্ত লুপ্ত লোক-লোকান্তের কান্ত মধুরতা।' এমনি করেই বসন্ত সৌন্দর্যের মধ্যেও কবি এক অপরূপ সৌন্দর্য-কামনার অতীতরস পান করেছেন। 'বর্ষামঙ্গল' ও 'বসন্ত' দুটি কবিতায়ই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমের একটি রসোজ্জ্বল স্বাক্ষর পড়েছে। একটিতে কালিদাসের যুগের নারীচরিত্রগুলিকে নিয়ে পটভূমি সৃষ্টি করেছেন কবি, আর একটিতে অতীতের কবি-প্রেয়সীর প্রেমানুরাগ এ-যুগের বসন্ত-পুষ্পে রক্তিম স্বাক্ষর রেখেছে।

যেহেতু 'কল্পনা'-কাব্যের মুখ্য নির্ভর স্থান বিশেষ ক'রে অতীত, ঠিক সেইজন্যই এর কবিতাগুলিতে চিত্রসম্পদ অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠবে—এ নিঃসন্দেহ। কারণ অতীতকে রূপময় করতে গেলে অন্তরের ভাব কল্পনাকে চিত্ররসে রসায়িত করতেই হ'বে! 'কল্পনা' কাব্যে ঠিক তাই হয়েছে। অতীতরসে রসায়িত প্রায় সবগুলি কবিতাই অপূর্ব চিত্রসম্পদে ভাস্বর।

রবীন্দ্র-সৌন্দর্যবোধের এই অতীত চারণার দিক 'কল্পনা'র পরবর্তী কাব্য ক্ষণিকা পর্বেও একটি রস-মণ্ডল সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কালিদাসের যুগের সেই 'রেবাতটের চাঁপার তলে' সন্ধ্যাবেলার সভায় যেয়ে কবি তাঁর নিজের আসনটি নিতে চেয়েছেন, এবং সেই যুগে জন্ম নিলে সে-স্বপ্নসৌন্দর্যের মাদকতা কবিকে ঘিরে থাকতো, তারি স্বপ্ন দেখেছেন কবি; তারই স্বপ্নচেতনার কামনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি তাঁর এই কবিতায়—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্ মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত মহোৎসবে বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে,
কোন্ ফাগুনের শুক্লনিশায় যৌবনেরই নবীন নেশা'য়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।
(সেকাল—ক্ষণিকা)

সেই বসন্তের স্বপ্নসৌন্দর্যই এখানেও কবিমনকে অতীতের তটভূমিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, কবিহৃদয়কে ভ'রে দিয়েছে নূতন সুধার অনির্বচনীয় আস্বাদে।

'আবির্ভাব' কবিতাটির আরম্ভও এই অতীত রসেরই স্বপ্নধ্যান নিয়ে, এবং সেই স্বপ্নধ্যানে বসন্তেরই প্রাথমিক ভূমিকা। বহুদিন কোন্ ফাল্গুনে কবি যার ভরসায় ছিলেন, সে কবির কাছে এসেছে ঘনবর্ষার মেঘমেদুর দিনে। তাকে দেখেই কবির মনে পড়ে,—

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব চম্পক আভরণ।

আরও বলেন—

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিণিরিণি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিনী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।
[আবির্ভাব—ক্ষণিকা]

এই অতীত রসের প্রেমমাধুর্যেই এই যুগে তিনি বরণ ক'রে নিয়েছেন তাঁর স্বপ্নসঙ্গিনীকে, সৌন্দর্যসাধনার ধ্যানময়ীকে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ' ঘটে। এই ধ্যানের কল্পমাধুরী নিয়েই রবীন্দ্র-কাব্যজগতে 'কল্পনা'-কাব্যখানির জন্য একটি অমর আসন নির্দিষ্ট আছে।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

এখন একটু বিস্তারিত ভাবেই আপনাদের আমরা প্রতিটী ঘটনা পর পর বলে যাবো। প্রথমে আমরা ঐ পত্রটী উদ্ধার করার জন্যে খগেন্দ্র সরকারের বাড়ীতে হানা দিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে ঐ পত্রটী না পাওয়ায় আমাদের ধারণা হয় যে উহা খগেন্দ্র সরকার তাঁর পকেটে পকেটে নিয়েই ঘুরাফিরা করেন। এই জন্যে কয়েকদিন আমরা খগেন সরকারকে যত্রতত্র অনুসরণ করতে থাকি। তিনি এই সময় মধ্যে মধ্যে তাঁর এক শ্রমিক-নেতা বন্ধুর সঙ্গে হাওড়ায় ও রিষড়া অঞ্চলে আসা-যাওয়া করছিলেন। আমাদের এই বস্তীর পূর্ব্বতন রেওয়ত কয়েকজন শ্রমিক ঐ রিষড়া মিলে রুজী রোজগার করতো। আমাদের বড়ো ম্যানেজার স্বয়ং তাদের ওখানে গিয়ে তাদের কাছ হতে তাদের শ্রমিক নেতাটীর ও তাঁর এই বন্ধুটীর আনাগোনার পথ ও সময় সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আসেন। এরপর আমরা একদিন পথে তাদের পাকড়াও করে ঐ পত্রটীর অধিকাংশ উদ্ধার করতে পারি। এই সময় নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে আমরা এই খগেন সরকারকেও আমাদের প্ল্যান মাফিক্ অপহরণ করে নিয়ে আসি। আমাদের বড় ম্যানেজার প্রমীলা দেবীর মৃত্যুবাণস্বরূপ এই পত্রটী প্রমীলা দেবীকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই বাবদে ওদের কাছ হয়ে আমরা আমাদের নিকট কবুল মত আড়াই হাজার টাকা বকশিস অমুক দিন পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এর দু'দিন পরেই এই পত্রসহ প্রমীলা দেবীর ভ্যানিটী ব্যাগটী পর্য্যন্ত প্রমীলা দেবীর বাটী হতেই পুনরায় অপহৃত হলো। যেদিন ডাঃ সুরজিৎ রায় প্রমীলা দেবীর বাড়ীতে ঐ আহত যুবকের কৃত্তিম চক্ষুর মাপ নিতে যান, সেই দিনই তার প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাড়ী থেকে ঐ পত্রসহ প্রমীলা দেবীর ভ্যানিটী ব্যাগটীও খোয়া যায়। এই সময় বৌ-রাণীর বিশ্বস্ত বেচারামের বিবরণ অনুযায়ী সকলের এই সুরজিৎ ডাক্তারের ওপরই সন্দেহ হচ্ছিল। এর কারণ এই বহু-পুরাতন সখের ভ্যানিটী ব্যাগটি ডাঃ সুরজিত রায়ের সুপরিচিত ছিল। এই সময় ডাঃ সুরজিত রায় ও বেচারাম ছাড়া ঐ কক্ষে আর কেউই উপস্থিত ছিল না। পরে আমরা শুনেছি যে ও'র পূর্ব্ব-প্রেমাস্পদ ঐ ডাঃ সুরজিতের নামের আদ্য অক্ষরটি তখনও পর্য্যন্ত ঐ ভ্যানিটী ব্যাগের উপর আঁকা বা লেখা ছিল। ওটাকে উঠিয়ে ফেলবো ফেলবো করেও ওটা তখন পর্য্যন্ত মুছে ফেলা হয় নি। এই সময় আমরা আরও আড়াই হাজার টাকা প্রমীলা দেবীর কাছে ভিক্ষা করে নিই। এই টাকাটার জন্য অবশ্য তিনি হারু গোঁসাই-এর নামে একটা অমুক ব্যাঙ্কের ওপর চেক কেটে দিয়েছিলেন। এর কারণ এই সময় তাঁর কাছে অতো নগদ টাকা মজুত ছিল না। আমরা ঐ টাকা ভাঙিয়ে নেওয়ার পর ঐ একরাত্রে ডাঃ সুরজিত রায়ের আস্তানাতেও হানা দিই। কিন্তু সেখানে ঐ প্রয়োজনীয় পত্রসহ ভ্যানিটী ব্যাগটি না পেয়ে আমাদের আবার ধারণা হয় যে ওটা সুরজিত রায়েরই এখন হাতে হাতে ঘুরে। কিন্তু তাঁর একান্ত বিশ্বাসী ছোট ম্যানেজারের কাছে আমরা শুনি যে ইহা একটুমাত্রও সত্য নয়। এর পর আমরা এই ব্যাগ উদ্ধারের জন্য ঐ অপহৃত, আহত ও বন্দীকৃত খগেন সরকারকেই বারে বারে পীড়াপীড়ি করছিলাম। তা'ছাড়া এই খগেন সরকারকে নিয়ে যে আমরা কি করবো তা'ও ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। এমন সময় আপনারা আমাদের এই বস্তীতে হানা দিয়ে আমাদের এই অপরাধী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। এখন আমাদের ঐ গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজার কোথায়

গিয়েছেন তা আমাদের কারই জানা নেই। এখন আমাদের সম্বন্ধে হুজুরদের যা অভিপ্রেত হয় তা করুন।"

আমি এদের উপরোক্তরূপ বিবৃতিসমূহ লিপিবদ্ধ করে ভাবছিলাম যে কালকেই কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের নিকট আইনসম্মত হুকুমনামা নিয়ে প্রমীলা দেবীর লেখা ও হারু গোঁসাইকে দেওয়া চেকটী ব্যাঙ্কের পুরাণো ফাইল থেকে উদ্ধার করে আনতে' হবে। এই চেকটী আদালতে পেশ করে আমরা একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে যে প্রমীলা দেবী হারু গোঁসাইকে অমুক দিন এই চেক প্রদান করেছিলেন, তা সহজেই প্রমাণ করতে পারবো। এইরূপ একটী প্রামাণ্য রেকর্ডের সন্ধান পাওয়ায় আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এমন সময় আমার টেবিলের উপরকার টেলিফোন যন্ত্রটী সশব্দে বেজে উঠলো। আমি টেলিফোনের হ্যাণ্ডেলটী তুলে কানে রাখা মাত্র যন্ত্রের ওপার থেকে আমার এক সহকারীর প্রকম্পিত গলার স্বর শুনতে পেলাম।

'আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি স্যার। আমাদের প্রধান আসামীকে আর পাওয়া যাবে না,' খুব দুঃখের সঙ্গেই আমার সহকারী জানালো, হাঁসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। এদের বড় ডাক্তার নিজে একে দেখে বেডের কার্ডে লিখে গেলেন—'সিল্ ডেড্'। এখন আমাদের প্রমীলা দেবীকেই তাহলে এই মামলায় ১নং আসামী করতে হবে। আমি এখুনি এর বডি পুলিশ মর্গে অপসৃত করে পোষ্টমর্টমের জন্য পুলিশ সার্জ্জনকে সংবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এখানে বেচারামকে নিয়ে বড়ো মুস্কিল হলো। এ বারে বারে কাতর হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ছে। একে এর মেশমশাইদের বাড়ীতে কিম্বা তার সেই এজমালী ঠানদির হেপাজতে রেখে থানায় ফিরবো।

আমাদের বেচারামের এই দুঃসময়ে একমাত্র তার সেই নিঃসম্পর্কীয় এজমালী ঠানদিদিই সান্ত্বনা দিতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু সংবাদটী সত্যই দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের এই মামলার পক্ষে এটা একটা দুঃসংবাদ হলেও বেচারাম সম্পর্কীয় চক্ষুলজ্জা হতে আমরা রেহাই পেলাম। এই বেচারামকেও সাক্ষী করে বেচারামের পিতাকে আদালতে সোপর্দ্দ করার চিন্তাও যে আমাদের পক্ষে কষ্টকর। এই মামলায় এইবার আমরা বেচারামকে একজন অত্যুৎসাহী অপরিহার্য্য সাক্ষী রূপেই তাহলে ফিরে পেলাম।

আমার হাতের কলম আর স্বাভাবিকভাবে সরতে চাইচে না। এখন থেকে আমার অজ্ঞাতেই আঙুলের ফাঁকগুলো নীচে পড়ে যেতে চায়। এদিকে রাত্রিও হয়ে আসছে। এখুনি প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবীর বাড়িতে হানা দিলে কথা উঠবে। সারাদিন কাটিয়ে দুইজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে রাত্রে তাদের বাড়ী হানা দেওয়া অনুচিত। এদিকে এই সুযোগে তদের বাড়ী ছেড়ে পালানও অসম্ভব নয়! এদিকে সারা রাত্র ধরে এই তদন্তে মেতে থাকলে ভোরের পর বড় সাহেবের কাছে ডাইরী পাঠাতে না পারলে আমাদের আর এক বিপদ হবে। ঘরে-বাইরের হামলা সামলে কাজ করা যে কত শক্ত তা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অবোধগম্য। আমি ধীরভাবে সকল দিক চিন্তা করে এই প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবী বৌরাণীর বাড়ীর চতুর্দ্দিক ওয়াচও পাহারা রাখারই ব্যবস্থা করে দিলাম। আমাদের এই সব ঝানু লোকেদের উপর ওই বাটীদ্বয় থেকে কোনও গাড়ী বা নারী বার হওয়া মাত্র তাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল। যতই আমি এদের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয় ভাবছিলাম, ততই আমার মন এক অব্যক্ত বেদনায় ভরে উঠছিল। কিন্তু এত ভাবপ্রবণ হলে আমাদের পদের লোকেদের চলবে কেন? এখনও যে এই মামলা সম্পর্কে আমাদের অনেক করণীয় কাযই বাকী রয়েছে।

অতি প্রত্যুষে আমি ও আমার প্রত্যেক সহকারী স্ব স্ব কোয়ার্টার হতে নেমে থানার অফিসে এসে বসেছি। আজকে আমাদের অনেকগুলি করণীয় কায একসঙ্গে হাতে নিতে হবে। আমাদের এই তদন্তরূপ মহাপটে দক্ষ হস্তে সাবধানে তুলির শেষ আঁচড় দিতে হবে। আমরা সকলে মিলে এই পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে প্রথমে আমাদের আশু কর্ত্তব্য কাযের কয়েকটী ছক তৈরী করে নিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একই সময়ে প্রমীলা দেবীরও বৌরাণীদের বাটী ঘেরোয়া করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই বাড়ী দুইটীতে খানা-তল্লাস করবো। ইতিমধ্যে এই মাননীয়া বরণীয়া মহিলা দুইটীকে গ্রেপ্তার করার মতও যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ

আমরা সংগ্রহ করেছি। এইজন্য এতে এখন আর আমাদের ভয় পাবার বা দ্বিধা করবার কোনও কারণই ছিল না। আমরা ঠিক করলাম যে আমি প্রমীলা দেবীর বাড়ীতে এবং ভক্তিবাবু বউরাণীদের বাড়ীতে পরিকল্পনা মত হানা দেবেন। এদিকে কনকবাবু এই সকালে খগেন সরকারের দেহের চেরাই কার্য্যের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় সুবোধবাবু অন্যান্য ধৃতিক্বত আসামীদের আদালতে নিয়ে গিয়ে পুলিশ হেপাজতীতে তাদের ফিরিয়ে আনবেন। আমরা এইবার আর দেরী না করে প্রয়োজনীয় লোকজন সহ থানা থেকে বার হয়েই পড়ছিলাম। এমন সময় আমার টেবিলের উপরে ন্যস্ত টেলিফোন যন্ত্রটী আবার একবার সশব্দে বেজে উঠলো। আমি বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে এই যন্ত্রের হ্যাণ্ডেলটি তুলে নিয়ে কানে দেওয়া মাত্র যন্ত্রের ওপারে আমাদের বড় সাহেবের বাজখাঁই গলা শুনতে পেলাম।

আরে। তোমাদের প্রেরিত প্রতিবেদন পড়ে তো আমি তাজ্জব বনে গিয়েছি। আমাদের পুলিশ বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষকেও টেলিফোনে সব কথা জানালাম। তিনি তোমাদের এইরূপ এক ভালো কাযে খুব খুশী হলেন। এ তো এক সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর দস্যুদল গড়ে উঠেছে। তোমরা কি তাহলে এতদিন সব নাকে কানে তুলা দিয়ে ঘুমাচ্ছিলে'? বড় সাহেব তার খকখকে কাসি চেপে নরম গরম স্বরে আমাকে বললেন, 'এতো বড় একটা গ্যাঙ্গ এতো দিন শহরের উপর নির্ব্বিবাদে মাতুনি করলো, তোমার তার বিন্দুবিসর্গও খবর রাখলে না। না!' এই জন্যে বাপু তোমাদের সব্বাইকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমাদের সর্ব্বাধ্যক্ষ বেনিয়াপুরের স্থানীয় অফিসারদের কৈফিয়ৎ বোধ হয় আজকেই চাইতেন। কিন্তু তোমরা এখনও সব থানায় বসে রয়েছো কেন? রাত্রেই ঐ মহিলা দুজনকে তোমাদের গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। এ কিন্তু তোমাদের ভেরী ভেরী ব্যাড্ এই—

বড়সাহেবের মুখে এই অসন্তোষের বাণী শুনে ভাবলাম 'যাঃ! এতে উল্টো বুঝে হিতে বিপরীত হলো। আমাদের এই মামলা কিনারা করায় আর পাঁচজন সহযোগী না মারা পড়ে। আমার সহকারী অফিসাররা বড় সাহেবের এই মধুমাখা বাণীটুকু আমার নিকট শুনতে চাইলেও আমি তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এতো কথা আর তাদের জানালাম না। এখুনি তাদের এই সব কাযের সময় এই সব বারতা শুনিয়ে তাদের নিরুৎসাহ করে তোলা আমি উচিত মনে করি নি। এইসব তিরস্কার ও পুরস্কার দেওয়ার মালিকদের উচিত-অনুচিতের সম্বন্ধে ভাববার পর্য্যাপ্ত সময়ও নেই।

আমাদের গন্তব্য স্থানের নিকট এসে পৌছিয়ে একটা মোড়ের মাথায় স্বল্পক্ষণের জন্য গাড়ীগুলি থামিয়ে আমরা আপন কর্ত্তব্য ঠিক করে নিলাম। এর পর প্রয়োজনীয় উপদেশ সহ সহকারী অফিসারকে মোড় ঘুরে কাশীপুরের বউরাণীদের বাড়ীতে পাঠিয়ে আমি নিজের গাড়ীটা প্রমীলা দেবীর বাড়ীর সামনে এনে থামালাম। এই একাকিনী সাংঘাতিকা মহিলার বাড়ীতে শত্রুভাবে প্রবেশ করার পূর্ব্বে দুইজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাক্ষীকে সঙ্গে নেওয়াই উচিত মনে করেছিলাম। তা'না হলে ঐ মহিলাটী অভিযোগ-মুখর হয়ে পুলিশের নামে যে 'বিশ্রী নোঙরা অভিযোগ দায়ের করবেন না' তারই বা নিশ্চয়তা কি? আমি সাবধানের মার নেই—প্রবাদটী সত্যরূপে মেনে নিয়ে সামনের বাড়ীর সেই কেয়ারটেকার ভদ্রলোক ও তাঁর দাবা-খেলোয়াড় বন্ধুটিকে সাক্ষীরূপে সঙ্গে নিয়ে একেবারে প্রমীলা দেবীদের শয়নকক্ষের নিকট এসে উপস্থিত হলাম।

এইভাবে বিনা হুকুমতে ও এত্তালায় কয়জন বাহিরের লোকসহ পুলিশ চমূ নিয়ে তাঁর বাড়ীর মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে আমকে প্রবেশ করতে দেখে প্রমীলা দেবীর বুঝতে আর কিছু বাকী থাকে নি। তাঁর সর্ব্বশরীর কাঠের মতন শক্ত হয়ে উঠে থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। এর একটু পরেই মনস্থির করে তিনি চীৎকার করে উঠে বললেন—কোন প্রমাণে আপনারা আমাকে এ'ভাবে অপমান করছেন? যদি প্রয়োজন হয় তো এজন্য আমি সুপ্রিম-কোর্ট পর্য্যন্ত লড়বো। আমি কিন্তু এঁর এই অহেতুক অভিব্যক্তির কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে এখানে তাঁর ঘর কয়টী তল্লাস করতে সুরু করে দিলাম।

এই খানা-তল্লাসীর প্রথম চোটেই ওঁর এই রাস্তার ধারের শয়ন ঘরটির জানালার চত্বরের ওপর খালি নীল রঙের 'ডিবোল' উৎকীর্ণ একটি শিশি পড়ে রয়েছে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সাক্ষীদ্বয়ের সামনে এই খালি শিশিটি প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে আপন

হেপাজতে নেওয়া মাত্র প্রমীলা দেবী মুষ্টিবদ্ধ করে এগিয়ে এসে আমাকে একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়ে একেবারে স্তম্ভিত করে দিলেন।

"ওটা আপনি ওখানে পান কি করে? 'স্থির ধীর স্বরে আমাকে উদ্দেশ করে এইবার প্রমীলা দেবী বললেন, 'আপনার এই সাক্ষীদের সম্মুখেই আমি এখুনিই বলে রাখছি। এই দ্রব্যটী নিশ্চই বাইরে থেকে জানালা গলিয়ে এখানে কেউ প্ল্যান করে রেখে গিয়েছে, আর এটা নিশ্চয় আপনাদের ইনফরমার বেচারামেরই কায। এই প্রামাণ্য দ্রব্যটী এখানে এইভাবে পাওয়া মাত্র আমি এই অভিযোগ করে রাখলাম। আশা করি আপনাদের ঐ ধর্ম্মভীরু সাক্ষীদ্বয় হলপ করে এ' কথা আদালতকে জানাতে ভুলবেন না।

আমি প্রমীলাদেবীর এই উপস্থিতবুদ্ধির বহর দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কি সাংঘাতিক অব্যর্থ ডিফেন্স না ইনি সঙ্গে সঙ্গে এখানেই করে রাখলেন। ইনি একত্রে ম্যানেজারী ও দস্যুগিরি করার মত উপযুক্ত একজন নারী নেতাই বটে। এ'ছাড়া ঐ ধুরন্ধর পলাতক গোঁফ-ওয়ালা ম্যানেজার যে এখনও এদের প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়ে কলকাঠি নেড়ে চলেছেন তাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। ঐ লোকটীকে সর্ব্বপ্রথম গ্রেপ্তার না করে বোধ হয় এই তদন্তে আমাদের একটী পদও অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল না।

'আরও একটা অভিযোগ আপনাদের সামনে আমি এখুনি রাখবো, প্রমীলা দেবী আমার সাক্ষীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আবার বললেন, 'ডাঃ সুরজিৎ রায় হচ্ছে আমার একজন মহাশত্রু। একবার সে আমাকে প্রলুব্ধ করে তার নামের আদ্যক্ষর যুক্ত একটী ব্যাগ আমাকে উপহার দিতে আসে। কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিই। ইতিমধ্যেই আমার কানে এসেছে যে সেই ব্যাগটার মধ্যে একটা জাল পত্র পুরে ঐ দুশ্চরিত্র ডাক্তার বৈজ্ঞানিক সেটা বেচারামের মারফৎ আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। খুব সম্ভবতঃ আপনারা বেচারামকে ঐ ডাক্তারেরই সাজানো লোক না বুঝে তাকে এইভাবে বিশ্বাস করে চলেছেন।

'আপনি শেষ দিকে একটু ভুলই করলেন, প্রমীলা দেবী, আমি এইবার খুব বিনয় সহকারেই তাঁকে বললাম, আপনার ঐ ভ্যানিটী ব্যাগটী যে বহুদিন হতে আপনার কাছে আছে; তা আর সকলের মত আপনার নিজের অফিসের লোকেরাই প্রমাণ করতে পারবে। তা' ছাড়া ঐ তথাকথিত জাল পত্রটি যে আপনার হস্তাক্ষরে লেখা, তা আপনার লেখা অন্যান্য পত্র ও অফিসে লেখা কাগজপত্রের সহিত ঐ পত্রটীর হস্তলিপি সরকারী হস্তরেখা-বিশেষজ্ঞরা তুলনা করে সহজেই প্রমাণ করে দিতে পারবে। আপনাকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা' তো বুঝতেই পারছেন। এখন এই রোগীর ঘরে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে কি লাভ আছে? যাতে এর একটুও ক্ষতি হতে পারে তা আপনার নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আপনি এখন সব কথা খুলে না বললে আমরা এখুনি এই রোগীকে সব কথাই বলে দেবো। আমাদের কাছে প্রতিটি সত্য বলে গেলে আমি অযথা আর এই যুবকটীকে উত্যক্ত করবো না।

আমার এই শেষ কথাটীর মধ্যে কি শক্তি ছিল জানি না। এই একটী কথা শুনা মাত্র প্রমীলা দেবী ভেঙে মুষড়ে পড়লেন। এমন কি তাঁর পূর্ব্ব ইচ্ছা হাইকোর্টের জনৈক ব্যারিষ্টার বন্ধুকে ফোন করবার জন্যও আর এগিয়ে গেলেন না। এই সময় আমার হাতে খগেন সরকারের বিবৃতির একটা নকল ছিল। আমি খগেন সরকারের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে জানিয়ে তার ঐ মৃত্যুকালীন জবানবন্দীটার একটী নকল তার চোখের সামনে মেলে ধরবামাত্র প্রমীলা দেবী একেবারে বাকশক্তি বিরহিত হয়ে গেলেন। এর পর এই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখে এই মামলা সম্পর্কে একটী বিবৃতি আদায় করে নিতে আমাদের আর একটুকুও অসুবিধে হলো না প্রমীলা দেবীর অনুরোধ মত এই রোগীর ঘর থেকে বহু দূরে এসে আমি তাঁর এই বিবৃতিটী লিপিবদ্ধ করতে সুরু করে দিই। এই অদ্ভুদ মামলার প্রধানতম নায়িকা প্রমীলা দেবীর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটী নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আশা করি আপনার প্রতিজ্ঞা মত আমার এই বিবৃতি কোনও দিনই ঐ আহত যুবকটীকে শুনাবেন না। এতো কষ্টের পর এই কষ্ট পেলে সে তাহলে আর বাঁচবেই না। আমি স্বগতঃ খগেন সরকারের করুণ বিবৃতিটীর নকল পড়ে দেখলাম। এই অসহায় ভদ্রলোক একটু মাত্র সত্য তার এই বিবৃতিতে গোপন করে নি। এখানে পাওয়া এই ভিরোলের ব্যবহৃত শিশিটা এই বাড়ীরই এক জায়গাতে ছিল। আমি যে কারণেই হোক ওটাকে ফেলে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নি। ইতিমধ্যে কাল রাত্রে বড়ম্যানেজারবাবু আপনাদের সতর্ক ওয়াচারদের নজর এড়িয়ে ছদ্মবেশে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। আপনারা যে কোনও মুহূর্ত্তে আমাদের এখানে আসতে পারেন তা আমরা তাঁর কাছ হতেই জেনে ছিলাম। কিন্তু বউরাণী এ সব কথা বউরাণীর স্বামীকে বা অন্য কাউকে জানাতে সাহস করে নি! ঐ বড় ম্যানেজারের পরামর্শ মত ঐ ভিরোলের শিশিটা আদালতের সন্দেহ উৎপাদনের জন্য আমি ঐ রাস্তার ধারে জানালার চত্বরে রেখে গিয়েছিলাম।

তবে এ'কথাও ঠিক যে আপনাদের কাছে সব দোষ স্বীকার করলেও আমি এই সব বিষয় আদালতে অস্বীকার করবো। এর কারণ নিজেকে এই মামলার দায় থেকে মুক্ত করতে না পারলে এই অসহায় হৃতচক্ষু যুবকটীর বাকী জীবনটুকু দুর্ব্বহ হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া সকলেই ওকে গলগ্রহ মনে করবেই। এখন এই মূল ঘটনাটির বিষয় বিবৃতি করছি, শুনুন। জীবনে আমার বহু স্বাদ-আহ্লাদ আমি আমার নিজের দোষেই সময় থাকতে পুরণ করি নি। এই গুলি যে পরে অবচেতন মনে জমা হয়ে আমার মনকে অসুস্থ করে তুলবে তা তখন আমি বুঝি নি। এই সত্যটুকু এতোদিন বুঝিনি ব'লেই আজ আমি নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশের কারণ হলাম। একের পর এক লোক আমাকে আশান্বিত করে জীবনের পথ থেকে সরে গিয়েছে। আমার এক মাত্র দোষ—বয়েস থাকতে সব ভাবলেও এই প্রয়োজনের বিষয় ভাবি নি। এর পর আমার জীবনে হঠাৎ ওই আহত যুবকটী এসে পড়লো। এর আরও দশ বছর বয়েস বাড়লেও যে বিবাহ-যোগ্য পুরুষই থাকবে। কিন্তু সেই সময়টুকু অতিবাহনের পর আমি কি হবো, তা ভেবে প্রায়ই আমি বিমর্ষ হয়ে উঠেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ'ও আর আমাকে পূর্ব্বের মতন ভালবাসবেনা ব'লেই আমার বিশ্বাস হতো। অথচ আমি আমার এই শেষ বেশ অবলম্বনটীকে আর হারাতে রাজী ছিলাম না। আমার এই হেতুপূর্ণ সন্দেহের কথা আমি একমাত্র আমার বান্ধবী বউরাণীকেই বলেছিলাম। আমাদের এই বউরাণী আমার এই আশঙ্কার বিষয় জেনে পরিহাস করে বলেছিল, তুই ভাই তাহলে এক কায করিস। কোনও প্রকারে তুই ওর চোখ দুটো নষ্ট করে দে'না! তা'হলে তোর বয়েস বাড়ছে বা কমছে তা সে বুঝতেই পারবে না, এই—নির্দ্দোষ পরিহাসটুকুও পরিশেষে আমাদের মহাকাল হয়ে দেখা দিল। আমার অবচেতন মনে এই নির্মম পরিহাসটুকু ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতেই আমার অবচেতন মনের মধ্যে দানা বেঁধে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এমন কি একদিন আমার এই কদর্য্য ইচ্ছা মহাশক্তিশালী হয়ে উপরে উঠে এসে আমার চেতন-মনের ও আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ঠিক এই সময়েই আমার প্রথম প্রেমাস্পদ প্রায়-প্রৌঢ় খগেন সরকারের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। একদিন কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে তার পুরানো প্রেম ঝালিয়ে নিতে চাওয়া মাত্র আমার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। এই সময় আমাদের আচার ব্যবহারের বিষয় শুনে সন্দেহ হওয়ায় ঐ এখন অন্ধ সুশীলের পিতা তাকে কাশীতে ডাকিয়ে নিয়ে বিবাহের চেষ্টা করেছিলেন। আমি বারে বারে পত্র লিখে আমার এই শেষ প্রেমাস্পদটিকে কল-কাতায় আনিয়ে নিতে পেরেছিলাম। এর পর আমি খগেন সরকারকে ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ করে তুলতে থাকি। বহু বার বঞ্চিত হয়ে অন্যকে বঞ্চিত করার রীতিনীতিও আমার করায়ত্ত হয়েছিল। আমার পুনঃ পুনঃ বাক্ প্রয়োগে হত-বিহ্বল হয়ে খগেন সরকার একদিন সত্য সত্যই ঐ যুবকটীকে আমাদের সহযোগিতায় হৃতচক্ষু করে দিলে।

আমি প্রমীলা দেবীর এইটুকু মাত্র বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে প্রমীলা দেবীর জলভরা চোখের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। হটাৎ এই সময় আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট এই বাড়ীর কেয়ার-টেকার ভদ্রলোক বলে উঠলেন —'হরিনারায়ণ হরিনারায়ণ। নারায়ণ গতির্মম। লৌহ-তপ্ত থাকতেই তাতে ঘা' দেওয়া উচিত হয়ে থাকে। আমি আর দেরী না করে প্রমীলা দেবীকে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটী প্রশ্ন করলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আমি স্বীকার করি যে আপনি অকপটে প্রতিটী বিষয় স্বীকার করেছেন। এই সব বিষয়ে আপনার ওপর আমরা খুবই সহানুভূতিশীল। কিন্তু এই সব ভিরোলের শিশিটিশি আপনি যোগাড় করলেন কোথা থেকে? আর ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার সংযোগ হলো কি করে?

উঃ—বউরাণীদের ষ্টেটের ঐ বড় ম্যানেজারের সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। আমি পূর্ব্বে প্রায়ই বউ-রাণীদের কাশীপুরের প্রাসাদে থেকে এসেছি। এই সূত্রে নব কাশীপুর গ্রামেতেই ওনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমাদের মিলে ও বাগানে শ্রমিক বিভ্রাটের দমনের সময় গাঁয়ে ও শহরে ইনি বহু লড়ায়ে লোক যোগাড় করে দিতেন। এই জন্যে বউরাণীদের না জানিয়েই ইনি আমার মারফত আমাদের কাছ হতে বহু অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমি বউরাণীর অজ্ঞাতে এর কাছেই আমার মনের বাসনা খুলে বলি। আমি এও তাকে বলি যে এই বিষয়ে সফল হলে সে বহু অর্থ পুরস্কার পাবে। আমি তাকে কি কি করতে হবে তাই শুধু বলেছিলাম; কিন্তু কি ভাবে তা করতে হবে তা ছিল একান্তরূপে তারই বিবেচ্য বিষয়। এই বড় ম্যানেজারই এই ভিরোলের শিশিটি আমাদের এনে দিয়েছিলেন। এর পর একটা অপরাধ হতে আমাদের বাঁচাতে গিয়ে তাকে আরও বহু বহু অপরাধ করতে হয়েছিল। আমাদের বউরাণী শেষের দিকে এই সব জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভয়ে এই সব তাঁর অতি-বড়ো আপনার জনকেও বলতে পারেন নি।

প্রঃ—আচ্ছা। সেই দিন খগেন সরকারকে তার বেয়াদবীর জন্য শিক্ষা দেবার জন্যে নিউ রাজমহল হোটেলে

বড় ম্যানেজারকে আপনিই তাহলে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন। এছাড়া খগেন সরকারের প্রতি আপনার বিরূপতা এবং ডাঃ সুরজিত রায়ের উপর আপনার ক্রোধেরই বা কারণ কি—তা আমার জানতে ইচ্ছে হয়।

•উঃ—আজ্ঞে। আমার কাছ হতে টেলিফোন পেয়ে বড় ম্যানেজার হারু ও রহমানের দলকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ভুল করে হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করেছিল। আমি তখুনি তা বুঝতে পেরে আমার বন্ধ জানালার গায়ে টোকা দিয়ে তাদের নিরস্ত করি। তা' না হলে তাদের হাতে আপনার প্রাণ হারানো-অসম্ভব ছিল না। আমার ইসারা পেয়েই এরা আর ছুরী ছোরা ব্যবহার না করে সেখান হতে সরে পড়েছিল। শ্রমিক বিভ্রাটের সময় নিয়োজিত হয়ে বহু বার আমার পদধূলি নিয়ে আমাকে এরা প্রণাম করে গিয়েছে। এই জন্য এদের আমি ভালো করে চিনি।

এর পর এইখানে আমাদের আর কোনও কথা ছিল না। বউরাণী নিজেই এখানে উপস্থিত, দু'জনা নার্সকে প্রচুর অর্থ দিয়ে তাকে ঐ আহত যুবকটির দেখা শুনার ভার দিলেন। অতি নিপুণ গৃহিণীর মত এই রোগীর শুশ্রূষা সম্পর্কীয় করণীয় কার্য্য তিনি এই নার্সদ্বয়কে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তার পর নিজেই তাঁর এক রাত দিনের ঝিকে দিয়ে একটি ট্যাক্সী আনিয়ে নিলেন। এই সময় এতো ঝি চাকর বামুনী এই বাড়ীতে দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। আমি থানার ট্রাকের সিপাহীদের থানায় যাবার হুকুম দিয়ে প্রমীলা দেবীর আনা ট্যাক্সীতে তাঁকে তুলে থানায় ফিরে এলাম। এই সময় থানাতে পুলিশ হেপাজতীতে প্রাপ্ত হারুগোঁসাই, রহমন খান ও এদের অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ আসামীরাও মজুত ছিল। ধীর পদ-বিক্ষেপে একজন মহীয়সী নারীর ন্যায় প্রমীলা দেবী থানায় ঢুকামাত্র এরা সকলেই সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে দূর হতেই তাঁকে সেলাম করতে সুরু করে দিলে।

আমি প্রমীলা দেবীকে আমার আফিসে বসানো মাত্র সেখানে আমার সহকারী অফিসার বউরাণীকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে থানায় ঢুকলেন। বউরাণীর সঙ্গে প্রমীলা-দেবীর চোখাচোখি হওয়া মাত্র কিন্তু বউরাণী ক্রোধে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সম্ভবতঃ বউরাণীর ধারণা হয়েছিল যে তার এই শ্বশুর ও পিতৃ কুলের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে এই প্রথম অবমাননার জন্যে প্রত্যাক্ষ্য-ভাবে প্রমীলা দেবীই দায়ী। আমি বুঝলাম যে এই উভয় বান্ধবীর মধ্যে এতো দিন পরে চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেল। এই জন্য আমি সহকারীকে বউরাণীকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে পাশের একটা ঘরে বসাবার জন্য নির্দেশ দিলাম। আপাততঃ এই মামলার প্রয়োজনেও উভয়কে পৃথকীকৃত করে রাখা ভালো। এদিকে দেখতে দেখতে এই থানা উকীল-ব্যারিষ্টার ও মহামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষণিকের মধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে গেল। থানার গেটের কাছে প্রাইভেট মোটরের হুস হাস শব্দে আনা গোনার আর বিরাম নেই। তাঁদের সকলেরই সেই একই কথা—গোঁফ-য়ালা সেই বড় ম্যানেজারের নিকট হতে টেলিফোনে তাঁরা এদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে খবর পেয়েছেন। আমরা বুঝলাম যে এই বড়ো ম্যানেজার তাহলে এখনও কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও পালাতে পারেন নি। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর গোঁফের ও চেহারার বিবরণ সহ কলকাতার ও জিলা-সমূহের বিভিন্ন থানাতে ও রেলপুলিশের ঘাঁটি সমূহে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনে নির্দেশ পাঠাতে সুরু করে দিলাম। এমন সময় সহকারী বউরাণীর বাড়ীতে খানাতল্লাসীতে পাওয়া একটি মাত্র প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্য আমার সামনে মেলে ধরলেন। এই পত্রটি ছিল ঐ পলাতক বড় ম্যানেজারের লেখা বউরাণীর নামে পাঠানো একটি পত্র। এই পত্রটি আজই জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের দরয়ানের হাতে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই পত্রটির সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"শ্রীমতী বউরাণী মহাশয়া অধীনের প্রণাম গ্রহণ করুন। এখুনি কিছু কালের জন্য অজ্ঞাতবাসের জন্য রওনা হলাম। এখন বুঝছি যে প্রমীলা দেবীর জন্য এতোটা না করলেও চলতো। আমরা সোজা পথে গেলে এই একই ফল লাভ করতে পারতাম। কিন্তু বাঁকা পথ ধরায় আপনিও বোধ হয় বিপদে পড়লেন। এখন আপ-নার মত নির্দ্দোষ মহীয়ান মাও দোষী হয়ে মহান। প্রমীলা-মা'কে আইনের হাত হতে বাঁচাতে হলে আমাকে বহুকাল ফেরার থাকতে হবে। এই মামলার বিচারের সময় আপনারা যত কিছু দোষ মৃত খগেন সরকার এবং এই পলাতক অধীনের উপর চাপিয়ে দেবেন। এ অবস্থায় আইন আপনাদের গাত্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমি বাইরে থেকে ক্রমাগত এদের সাক্ষীসাবুত ভাঙ্গাতে ও সরাতে চেষ্টা করবো। আমাকে পাকড়াও করবার ক্ষমতা কোনও দেশের পুলিশেরই নেই। না বুঝে না জেনে বেচারাম নামে বালককে গৃহে স্থান দিয়ে ভুল করেছিলেন। প্রমীলা-মা'র সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে আমি সম্প্রতি জেনেছি যে এই বেচারাম হচ্ছে মৃত খগেন সরকারেরই একমাত্র পুত্র। আমি এই বেচারামের বর্ত্তমান বাস-স্থানটি এখন খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি। এই পত্রটি পাঠমাত্র ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলবেন।

[ক্রমশঃ

বিদেশীর চোখে সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা

উপানন্দ

তোমরা যদি বৈদেশিক পর্য্যটকদের ভ্রমণ বৃতান্ত পড়ো, তা হোলে জানতে পারবে প্রত্যেকেই বাঙ্গলার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের কথা বলে গেছেন। আজকের মত শোচনীয় অবস্থা কোন দিন ছিলনা, ছিল যেন স্বর্গভূমি। তাঁরা দেখেছেন বাংলা সর্ব্বপ্রকারে উন্নত দেশ। ইতিপূর্ব্বে তোমাদের কাছে বলেছি' পর্য্যটক ইবন বতুতার বঙ্গভ্রমণের কথা। এবার তোমাদের কাছে উপস্থিত করছি পর্যটক বর্ণিয়র ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তাঁর সময়ের বাংলা আজ নেই, আছে শ্মশানে ফেলে দেওয়া তার কঙ্কাল।

বর্ণিয়র ফরাসী ডাক্তার। এঁর জন্ম ১৬২০ খৃষ্টাব্দে একটি কৃষক পরিবারে। এঁরও ছিল নানা দেশ ভ্রমণের নেশা। ১৬৫২ সালে ডাক্তারী পাস করেন। এর দু'বছর পরেই দেশ থেকে বেরিয়ে পড়লেন ভ্রমণের নেশায়। এই সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ মোগল সম্রাটদের শাসনাধীনে। বনিয়র মিশর ও সুয়েজের তীরবর্ত্তী দেশ গুলি বেড়িয়ে জাহাজে উঠলেন। বাইশদিন পরে ভারতের মাটি ছুঁয়ে ধন্য হোলেন। তখন এঁর বয়স আটত্রিশ বছর। ১৬৫৮ সালের শেষের দিকে অথবা ১৬৫৯ সালের প্রারম্ভে তিনি নামলেন সুরাট বন্দরে। ক্রমে আগ্রার দিকে অগ্রসর হোতে থাকেন। পথে দেখা হোলো সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার সঙ্গে। দারা তাঁকে নিজের চিকিৎসক-রূপে নিযুক্ত করলেন। সে সময়ে চলেছে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে সম্রাট পরিবারের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ। দারার পরাজয় ও শোচনীয় পরিণতি ঘটলো। পালিয়ে গেলেন দারা। বর্ণিয়র যাত্রা সুরু করলেন দিল্লীর পথে। কিন্তু পথ চলার সময় পড়লেন দস্যুর কবলে। প্রাণে বাঁচলেন বটে, হারালেন শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত। নিরুপায় বর্ণিয়র সব হারিয়ে দিল্লী এসে চিন্তাভারাতুর। পেলেন অবলম্বন-রূপে একজন দিল্লীবাসী ওমরাহকে। তাঁরই আশ্রয়ে এসে বর্ণিয়রের মনের মেঘ কেটে গেল। আর তাঁরই আনুকূল্যে দিল্লীর দরবারে পেলেন স্থান।

১৬৫৪ সাল। ঔরঙ্গজেবের দল চলেছে কাশ্মীরে। উনিও তাদের সাথী হোলেন। সে সময়ে ইউরোপীয়ান পর্য্যটক টাভার্নিয়ারও ভারত ভ্রমণে এসেছেন। কাশ্মীর থেকে ফিরে এঁর সঙ্গে বাংলার দিকে অগ্রসর হোলেন। রাজমহল থেকে টাভার্নিয়ার অন্যদিকে গেলেন। কাজেই এঁকে একা আসতে হোলো বাংলায়। বাংলায় তখন কাশিমবাজার উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধিপূর্ণ স্থান। বাংলার ভ্রমণ শেষ করে মশলিপট্টম ঘুরে সুরাট ও পারস্যের পথ ধরে দেশে ফিরে গেলেন। তারপর লিখলেন ভ্রমণকাহিনী। সে কাহিনী পৃথিবীর নানা ভাষায় হয়েছে অনূদিত। এঁর ভ্রমণ কাহিনী খ্যাতি অর্জ্জন করেছে বিশ্বের মাঝে। ৬৮ বয়সে ১৬৮৮ সালে বর্ণিয়র দেহত্যাগ করেন। বাংলার সেই অতীত গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা, তিনি যা

লিখে গেছেন, তা তোমাদের কাছে আজকের সঙ্কট-দুর্য্যোগপূর্ণ দুর্দ্দিনে তুলে ধরছি, জননী জন্মভূমি কি ছিলেন আর কি হয়েছেন—উপলব্ধি করতে পারবে এরই মাধ্যমে। বর্নিয়র লিখেছেন, ইউরোপের লোকের মিশরকেই সব চেয়ে সুন্দর শস্যশ্যামল ও প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ দেশ বলে জানে। কিন্তু দুবার বাংলা দেশ ভ্রমণ করে আমার সে ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এখন আমি নিঃসন্দেহ যে, বাংলা মিশরের চেয়েও খুব সুন্দর, সমৃদ্ধ ও শস্যশ্যামল। এ কথা ঠিক যে, এদেশের তুলনায় মিশরেই বেশী গম উৎপন্ন হয়, তবু এ কথা মানতে হবে যে এদেশের গমের ফলন বড় কম যায় না, বরং অপর্য্যাপ্তই বলা যায়। বাংলাদেশের গমের ব্যবহার খুবই কম। এ দেশের লোক রুটি খায় না বললেই চলে। তাই বোধহয় এরা গমের চাষ বেশী করে না। এদেশের উৎপন্ন গম দিয়ে খুব সুন্দর ও বড় বড় বিস্কুট তৈরী হয়, আর সেগুলি বিক্রী করা হয় ইউরোপীয়ান জাহাজে। বাংলায় বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। এসব ক্ষেত্রে প্রচুরভাবে ধান, আখ, গম প্রভৃতি শস্য, নানা রকমের তরিতরকারী, তেলের জন্যে সরিষা ও তিলের চাষ হয়। রেশম কীটের খাদ্য হিসাবে রোপণ করা হয় তুঁতের চারা। উপাদেয় ফলও এখানে অজস্র। এরই মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য আম, আনারস, নারিকেল আর লেবু। এদেশের লোক সুন্দর লেবুর আচার তৈরী করে। অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের শুকনো ফলমূলাদি ভৈষজ্য দ্রব্য প্রস্তুতের জন্যে বিদেশে চালান যায়।

অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান হয়, বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে শুধু প্রতিবেশী দেশগুলিতেই নয়, দূর বিদেশেও চাউল রপ্তানী হয়। বিক্রয়ের জন্যে বাংলার চাউল প্রেরিত হয় সমুদ্রপথে মসলিপট্টমে, কারোমণ্ডলের উপকূলস্থ দেশগুলিতে, সিংহল ও মালয় দ্বীপে।

চাউলের মত চিনিও অপর্য্যাপ্ত। চালান যায় সমুদ্রপথে গোলকুণ্ডায়, কর্ণাটকে, আরবে, মেসোপটেমিয়ায়, মোকায়, বসোরায়, পারস্যে। শুধু কি খাদ্যদ্রব্য? এদেশের মত এত অজস্র রকমের আকর্ষণীয় আর মূল্যবান পণ্যদ্রব্য আমি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখিনি। বাংলার সূতী ও রেশমী কাপড়-চোপড় লাহোর ও কাবুল পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষে, প্রতিবেশী দেশগুলিতে জাহাজে রপ্তানী হয়। আর ইউরোপে রপ্তানী করা হয়। এক কথায় বাংলা দেশকেই—পৃথিবীর বস্ত্রভাণ্ডার বলা চলে। বাংলায় তৈরী নানারকম সূক্ষ্ম ও মোটা, সাদা ও রঙীণ সূতী আর রেশমী বস্ত্র দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এই সব বস্ত্রের চালানি কারবার কেবল এ-দেশীয় বণিকেরাই করে না, নানা ইউরোপীয় বণিকও করে।

একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের রেশম সিরিয়া, পারস্য আর বেরুতের রেশমের মতন অত মিহি বা সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু ঐ সব দেশের রেশমের চেয়ে বাঙলার রেশম অনেক সুলভ। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি বাংলার রেশম যদি ঠিক মত সুনির্ব্বাচিত ও অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়—তাহোলে এই রেশম আরো উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। কাশিমবাজারে ডাচদের রেশমের কারখানায় সাত আট হাজার বাঙালী কারিগর আছে। এ ছাড়া সারা বাংলা দেশ জুড়ে ইংরাজ ও দেশীয় বণিকদের বহুসংখ্যক রেশমের কারখানায় শত শত বাঙালী কারিগর কাজ করে। বাংলায় আছে শোরার বিখ্যাত আড়ং। এখান থেকে সারা ভারতে আর দেশ বিদেশে ইউরোপ পর্য্যন্ত, শোরা, উৎকৃষ্ট লাক্ষা, আফিম, মোম, গন্ধগোকুল, পিপুল আরও নানা রকম ঔষধ চালান যায়। বাংলা দেশে এত বেশী ঘি তৈরী হয় যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘিও সমুদ্রপথে বিদেশে রপ্তানী হয়।

বাংলার মিষ্টান্ন বিখ্যাত। এদেশে পর্ত্তুগীজ বাসিন্দারা নিপুণ ময়রা। তারা মিষ্টান্নের ব্যবসা করে। বাংলাদেশ জনবহুল। অধিকাংশই হিন্দু। বাঙালীদের প্রধান খাদ্য ভাত, তিন চার রকম তরকারি আর প্রচুর পরিমাণে ঘি। এই খাদ্য অতি অনায়াসলভ্য। অন্যান্য সব রকম খাদ্য ও অতি সুলভ। মাত্র এক টাকায় এক কুড়ি বা ততোধিক মুরগী পাওয়া যায়। হাঁস ও রাজহাঁস আরো সস্তা। ছাগল আর ভেড়াও প্রচুর। এদেশের নদী, খাল, বিল, পুকুর যেমন, তেম্নি সমুদ্রও নানা রকম সুস্বাদু মাছে পূর্ণ। শূকর মাংস খুব সুলভ। পর্ত্তুগীজ বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্যই হয়েছে শূকর মাংস। লবণাক্ত করে তাদের জাহাজে চালান দেয়। জীবনধারণের উপযোগী প্রত্যেক দ্রব্যই বাংলাদেশে অপরিমিত ও অনায়াসলভ্য। সোনার বাংলা

তাই বিভিন্ন ডাচ উপনিবেশ থেকে নানা ইউরোপীয়ান ক্রিশ্চিয়ানরা শস্তশ্যামল বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁরা বড় বড় গির্জ্জা তৈরী করে নিশ্চিন্ত মনে স্বধর্ম্ম পালন করছে। কেবলমাত্র হুগলীতেই আট নয় হাজার ক্রিশ্চিয়ান বাস করে। সারা দেশের ক্রিশ্চিয়ানের সংখ্যা আরো বেশী।

শ্যামল বঙ্গভূমির মতই বাঙালী মেয়েদের সৌন্দর্য্য আর অমায়িক ব্যবহার বিদেশীদের এতই মুগ্ধ করে যে, তারা আর স্বদেশে ফিরে যেতে চায় না। এদেশেই থেকে যায়। এই জন্যই ইউরোপীয়ানদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, বাংলা দেশে প্রবেশের পথ শতশত, কিন্তু সেখান থেকে বর্হিগমনের পথ একটিও নেই। বাংলাদেশের—বিশেষ করে এর সমুদ্র কূলের জলবায়ু ইউরোপীয়ানরা সহ্য করতে পারেনা। সেজন্যে তাদের খুব সাবধানে বাস করতে হয়।

রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর উভয় কূলে বাংলা দেশ প্রায় দেড় শতাধিক ক্রোশ বিস্তৃত। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য খাল। অতীত যুগে এ দেশবাসী চাষ-বাসের জন্যে বহু পরিশ্রমে এই সব খাল খনন করেছিল। সব নগর আর গ্রামের দুই প্রান্ত দিয়ে এই খালগুলি প্রবাহিত। এদেশবাসীরা বলে এই সব খালের জল পৃথিবীর যে কোন নদীর জলের চেয়ে বেশী উপাদেয়।

বাংলা দেশ নদীমাতৃক। এর অসংখ্য নদনদী ও শাখানদী। প্রত্যেকটিই প্রাকৃতিক,—খালগুলি যে আসলে প্রাকৃতিক নদনদী ও শাখানদী, পরবর্ত্তী কালে বর্ণিয়রের সে বোধ হয়েছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁকে অভিভূত করেছিল। বাংলাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন।

তিনি লিখেছেন—সবচেয়ে সুন্দর গঙ্গা নদীর দ্বীপ বা চরগুলি। সময়ে সময়ে এক চর থেকে আরেকটি চরে যেতে ছয় সাত দিন সময় লাগে। দ্বীপগুলি নানা আকারের। অতিশয় উর্ব্বর, বন্য জঙ্গলে সবুজ। ঐ সব চরের মধ্য দিয়ে যে ছায়াপথ প্রবাহিত, সেগুলিকে দেখলে হঠাৎ তরুবীথিবেষ্টিত ভ্রমণ পথ বলে মনে হয়। আরাকান দস্যুদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে সমুদ্রকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলি বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত ও জনহীন। এসব জায়গায় থাকে কুমীর, বাঘ ও অন্যান্য বন্য জন্তুরা। বাঘেরা সাঁতার কেটে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে গিয়ে ওঠে, সেই জন্যে এই সব দ্বীপের পাশ দিয়ে নৌকায় যাতায়াত কালে যাত্রীরা খুব সাবধানে থাকে। কোন দ্বীপে নামতে হোলে খুব সাবধানে চারিদিক চেয়ে তবে নামতে হয়।

দ্বীপের কাছে রাতে নৌকা বাঁধবার দরকার হোলে তীরের গাছের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে নৌকা মাঝ নদীতে রাখতে হয়। তা না হোলে নৌকারোহীদের কেউ না কেউ বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারাতে পারে। মাঝিরা বলে, বাঘেরা নৌকায় এসে সব চেয়ে মোটা মোটা লোককেই শিকার করে নিয়ে যায়। নৌকারোহীরা রাত্রে যখন ঘুমোয়, তখন বাঘ নদীতে সাঁতার দিয়ে নৌকার কাছে এসে তার পছন্দ মতন লোকটিকে নিয়ে সরে পড়ে।

বর্ণিয়রের চোখে বাংলাদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি পূর্ব্বপশ্চিম ভূখণ্ডের নানা দেশ ঘুরেছেন, নানা মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, আর দেখেছেনও নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে ফুটে উঠেছে বাংলার প্রশস্তি। ব্যবসা বাণিজ্যে, কৃষি সম্পদে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, আচার ও আচরণে বাঙালী জাতি সে সময়ে সর্ব্বোন্নত দৈহিক ও মানসিক সম্পদে বলিষ্ঠ। বাঙালী মেয়েদের সৌন্দর্য্য দেখে ও তাদের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাংলার নারীর শ্রী ও হ্রীর অনুরূপ শ্রী ও হ্রী অন্য কোথাও তিনি দেখেন নি। এজন্য বাঙালী নারীর অজস্র প্রশংসা করেছেন তিনি। আজ অবশ্য আমরা নানাভাবে জীবন যাত্রার পথে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাই জাতীয় চরিত্রের পতন ঘটতে বসেছে অভাবের তাড়নায়। আশা আছে, তোমরা আবার এই বাংলাকে সোনার বাংলা করে তুলবে। সে সময়ে যারা বাংলাদেশ ভ্রমণে আসবে, তারা বর্ণিয়রের মত ভূয়সী প্রশংসা করে যাবে, আর লিখে যাবে তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এমনিভাবে। প্রশস্তি করবে তোমাদের, আর বাঙালী জাতির ইতিহাসকে করবে অর্চ্চনা।

ফ্রাঁস্কোয়া ক্যোপে

রচিত
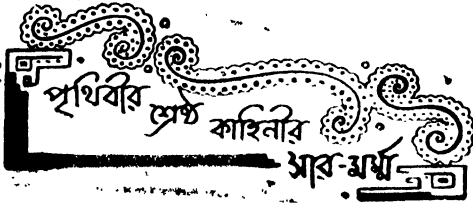
সোনার মোহর

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২

পথের পাশেই বিরাট এক প্রাসাদ···প্রাসাদের দেউড়ীর সামনে পাথর-বাঁধানো রোয়াকের উপর শুয়ে রয়েছে—কালো-রঙের শতছিন্ন-জীর্ণ পোষাক-পরা বছর ছয়-সাত বয়সের ছোট্ট একটি ঘুমন্ত-অসহায়া মেয়ে! দেখে মনে হয় মেয়েটি নিতান্তই দীন-দুঃখী···হয়তো কেউ কোথাও নেই তার সংসারে···তাই সারাটা দিন সম্ভবতঃ পথে-পথে ঘুরে খুবই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে সহরের কোনো জায়গায় কোথাও আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত হাড়-কাঁপানো এই প্রচণ্ড শীতের রাতে নিরালা-পথের প্রান্তে কন্‌কনে-ঠাণ্ডা পাথর-বাঁধানো রোয়াকের উপর নিজের শীর্ণ-একরত্তি দেহ এলিয়ে দিয়ে বেচারী গভীর ঘুমে লুটিয়ে পড়েছে। একরাশ ঘন-সুন্দর সোনালী-রঙের কোঁকড়া-চুলে-ভরা ঘুমন্ত-মেয়েটির মাথা···ছেঁড়া-পোষাকের ফাঁকে ফুটে-থাকা ছোট্ট সুডৌল তুল্‌তুলে-নরম ঘাড়টিকে সে এলিয়ে দিয়েছে শাদা তুষার-কণায় ঢাকা কঠিন-পাথরের ঐ রোয়াকের কিনারায়! মেয়েটির এক পায়ে ঝুলছে একপাটি ছেঁড়া-জুতো···আরেক পাটি জুতো ঘুমের ঘোরে কখন যে তার অন্য পা থেকে খশে পড়েছে, খেয়ালই নেই···এমনই অঘোরে ঘুমুচ্ছে সে!

পথের পাশে এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখে ল্যুসিয়েঁর মনে করুণা হলো···কোন শব্দ না করে তিনি সটান্ এগিয়ে এলেন সেই অসহায়া ঘুমন্ত-মেয়েটির কাছে। দুঃখী-মেয়েটিকে সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করবেন ভেবে আন্‌মনে নিজের জামার পকেটে হাত দিতেই, ল্যুসিয়েঁর হুঁশ হলো যে, একটি কানাকড়িও তো নেই তাঁর কাছে···এমনই দুরাবস্থা তাঁর যে জুয়ার আড্ডা থেকে বেরুনোর সময় অন্য দিনের মতো সামান্য কুড়িটা 'সৌসও' (Sous—ফরাসী দেশের অল্প-দামী মুদ্রা) বখশিস্ দিয়ে আসতে পারেন নি তিনি সেখানকার 'খিৎমত্‌গারকে'!

তাহলেও···নিরালা-পথের ধারে দুঃখী-অসহায়া ঘুমন্ত-মেয়েটিকে শীতের রাতে এমন একা পড়ে থাকতে দেখে ল্যুসিয়েঁর মন রীতিমত কাতর হয়ে উঠলো! তিনি ভাবলেন—আহা, ছোট্ট একরত্তি মেয়ে···বাইরে পথে পড়ে এই দারুণ-হিমে এমন কষ্টভোগ করছে···বেচারীকে বরং তুলে নিয়ে যাই কাছাকাছি কোনো নিরাপদ-আশ্রয়ে!···আজকের এই রাত্তিরটার মতোও তো অন্ততঃ একটু যা হোক আরাম পাবে!

এই ভেবে ঘুমন্ত-মেয়েটির দিকে এগুতেই ল্যুসিয়েঁর হঠাৎ নজর পড়লো—পথের প্রান্তে পড়ে-থাকা মেয়েটির সেই ছেঁড়া-জুতোর পানে! ভালো করে তাকাতেই ল্যুসিয়েঁ দেখলেন—সোনার মতো জল্‌জলে কি যেন একটা ছোট্ট-চাকতি পড়ে রয়েছে সেই জুতোর পাটির ভিতরে! ল্যুসিয়েঁর মনে কৌতূহল জাগলো···নিঃশব্দে আরো কাছে এগিয়ে এসে সাগ্রহে ঠাওর করে তিনি দেখলেন—পথের প্রান্তে পড়ে-থাকা ছেঁড়া-জুতোর পাটির ভিতরকার সেই জল্‌জলে-চাক্‌তিটিকে!

···সোনার মোহর!···কর্‌করে কুড়ি 'ফ্র্যাঙ্ক' (Franc) দামের একটি সোনার মোহর!···

ল্যুসিয়েঁ রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন!···এমন দামী সোনার মোহর···একরত্তি এই পথের ভিখারী মেয়েটি জোগাড় করলে কোথা থেকে?···অবাক কাণ্ড!

ল্যুসিয়েঁর মনে হলো—বড়দিনের উৎসবের রাত···হয় তো পথ-চল্‌তি কোনো বড়লোকের গৃহিণী ঘুমন্ত-মেয়েটির

দুরাবস্থা দেখে দুঃখে কাতর হয়ে করুণাভরে দামী এই সোনার মোহরটি দান করে গেছেন বেচারীকে! পুণ্য-তিথিতে দুঃস্থ-অনাথা ভিখারী-মেয়েটিকে দেখে অজানা সেই বড়লোকের গৃহিণীর হয় তো মনে পড়েছিল—বাইবেলে-লিখিত দয়ালু যীশুখৃষ্টের দুঃখী-আতুরদের উপহার-দানের কাহিনী···তাই আর্ত্ত-সেবায় তিনিও পথের এই অসহায়া ঘুমন্ত-মেয়েটিকে দিয়ে গেছেন জল্-জলে এই সোনার মোহরটি!

ল্যাসিয়েঁ চিন্তা করলেন—এই সোনার মোহরের বিনিময়ে দীন-দুঃখী ঐ অসহায়া-মেয়েটির বরাতে কয়েকদিন অন্ততঃ একটু শাস্তি, আরাম, আশ্রয় আর ভালো খাবারদাবার জুটবে! কিন্তু মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে এমনই গাঢ়-ঘুমে অচেতন—যে তার পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে এত দামী সোনার মোহর, সে খেয়ালটুকুও নেই তার! এমন নিশুতি রাত···তাছাড়া সহরের পথে চোর-বাটপাড়ও ঘোরাঘুরি করে···তাদের কেউ যদি এই সোনার মোহরের সন্ধান পায়···

এই ভেবে ঘুমন্ত-মেয়েটিকে ডেকে তোলার জন্য ল্যাসিয়েঁ সবেমাত্র প্রাসাদের রোয়াকের দিকে এগিয়েছেন, এমন সময় মায়া-মন্ত্রের মতো হঠাৎ যেন তাঁর কানে ভেসে এলো কিছুক্ষণ আগে জুয়ার আড্ডার দেউড়ীতে দেখা সেই ঝানু-জুয়াড়ী বুড়ো ড্রোনস্কীর কণ্ঠস্বর···অস্ফুট-কাতরকণ্ঠে ড্রোনস্কী যেন অনুনয় জানাচ্ছে—জুয়ার নেশায় মেতে সর্ব্বস্ব খুইয়েছি বটে! তবু···আরেক বাজী জুয়া-খেলার পয়সা যদি মেলে তো দৈব-বলে ঘড়ীতে রাত বারটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ বরাতটা আবার ফিরিয়ে ফেলতে পারবো!···

জুয়াড়ী-বুড়ো ড্রোনস্কীর কথা মনে হতেই, ল্যাসিয়েঁর মাথার ভিতরে হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো শয়তানের ফন্দীবাজীর আগুন···চকিতে তাঁর মন থেকে মিলিয়ে গেল —পথের ভিখারী সেই অসহায়া-ঘুমন্ত ছোট্ট মেয়েটির উপর অতখানি মায়া-মমতা-করুণার আগ্রহ···নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য-সংস্কার, বংশের কৌলীন্য-মর্য্যাদা সব কিছু ভুলে ল্যাসিয়েঁ পাগলের মতো মেতে উঠলেন—পথের প্রান্তে ছেঁড়া-জুতোর পাটির মধ্যে পড়ে-থাকা সেই সোনার মোহরটি কুড়িয়ে নেবার দুর্নিবার-লোভে!

নিরালা-পথের চারিদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ল্যাসিয়েঁ দেখলেন—নিশুতি রাত···কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই! এমন সুযোগ···সহজে মেলে না! এ সুযোগ হারালে···

নিঃশব্দে অতি-সন্তর্পণে ল্যাসিয়েঁ এগিয়ে চললেন পথের প্রান্তে পড়ে-থাকা ঘুমন্ত-মেয়েটির সেই ছেঁড়া-জুতোর পাটির দিকে···এমন হীন-কাজ করতে এগুনোর ব্যাপারে মনে তাঁর এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই!

চোরের মতো এমনি চুপি চুপি ঘুমন্ত-মেয়েটির পা থেকে খশে-পড়া ছেঁড়া-জুতোর পাটির কাছে এগিয়ে গিয়ে ল্যাসিয়েঁ এতটুকু শব্দ না করে কম্পিত-হাতে সেই জলজলে সোনার মোহরটিকে কুড়িয়ে নিলেন। মোহরটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়ালেন না··· সটান্ ছুটে চললেন দূরে পথের মোড়ে সেই জুয়ার আড্ডার দিকে।

এক দৌড়ে হাঁফাতে হাঁপাতে লোকে লোকারণ্য জুয়ার আড্ডায় হাজির হয়েই কোনো মতে লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে উঠে ল্যাসিয়েঁ সটান এলেন 'রুলে'-খেলার আসরে···জুয়াড়ীদের মজলিশে! অত রাত্তিরে জুয়ার আসর তখনও রীতিমত সরগরম···সবাই মেতে রয়েছে খেলার নেশায়! হঠাৎ ল্যাসিয়েঁর কানে ভেসে এলো—দূরে আসর-ঘরের দেয়ালে-টাঙানো ঘড়িতে টং টং করে রাত বারোটা বাজবার শব্দ!

···রাত বারোটা!

তাহলে···

ল্যাসিয়েঁ সচকিত হয়ে উঠলেন···চকিত-দৃষ্টিতে আসর-ঘরের দেয়ালে-টাঙানো ঘড়ির পানে তাকিয়েই তিনি পাগলের মতো ছুটে গেলেন 'রুলে'-খেলার টেবিলের কাছে ···একমুহূর্ত্ত দেরী না করে কম্পিত-হাতে সদ্য-পথ-থেকে-কুড়িয়ে-আনা জলজলে সেই সোনার মোহরটিকে সবুজ-রঙের দামী বনাত-কাপড়ে-মোড়া জুয়াখেলার-টেবিলের উপর রেখে জোরে হাঁক দিয়ে বললেন,—এই রইলো, আমার বাজী···সতেরো নম্বরের উপর!

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের বুকে-আঁটা 'রুলে'-খেলার ছোট-বড় একরাশ নম্বর-লেখা বিরাট চাকাখানা বোঁ-বোঁ করে কয়েকটা চক্কর ঘুরে থামলো শেষে সতেরো নম্বরে এসে

াসরের জুয়াড়ীদের মধ্যে অনেকেই মহা-উল্লাসে চীৎকার রে উঠলো,—সাবাস্! বাজী মাৎ!···সতেরো নম্বর!··· তেরো নম্বর জিতেছে!

ল্যুশিয়েঁর মুখে আনন্দের হাসি···জুয়ার বাজী জিতে ক মুঠো কর্‌করে সোনার মোহর হাতে নিয়ে তিনি ভাবলেন—শেষ পর্য্যন্ত বরাতটা তাহলে ফিরলো এতক্ষণে!··· ড়ো ড্রোন্‌স্কীর কথা তো দেখছি যথার্থই ফললো!·· ড়িতে রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই!

মহা-উৎসাহে ল্যুসিয়েঁ নতুন করে আবার বাজী ধরলেন···এবারে লাল-রঙের ঘরে সদ্য-জেতা কর্‌করে ছত্রিশটি সোনার মোহর সাজিয়ে রেখে দিলেন!

সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হলো—'রুল্যে' খেলার আসরের টেবিলের বুকে-আঁটা একরাশ নম্বরওয়ালা সেই বিরাট চাকতিখানার ঘূর্নী! অপলক-দৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে ল্যুসিয়েঁ তাকিয়ে রইলেন 'রুল্যে'-টেবিলের সেই বিরাট ধুরন্ত-চাকাখানার দিকে।···জানি না, এবারে বরাতে কি দান পড়ে?···হার না জিৎ?···

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় আরেকটি মজার খেলার কথা বলি। এ খেলাটিও বেশ অভিনব-ধরণের এবং এর কলা কৌশল আয়ত্ত করাও খুব শক্ত কাজ নয়। তাছাড়া এ খেলা দেখানোর জন্য সামান্য যে কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন—সেগুলিও নিতান্তই সব সাজ-সরঞ্জাম তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের বাড়ীতে বসে জোগাড় করে ফেলতে পারবে। আপাততঃ শোনো—বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-মজার খেলাটি দেখাতে হলে যে সব ঘরোয়া সাজ-সরঞ্জাম দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের অভিনব-রহস্যময় এই খেলাটি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিতে হলে, চাই মাত্র দুটি জিনিষ—বেশ মোটা-ভারী ধরণের একখানা বাঁধানো বই, আর তিন-চার হাত লম্বা একটুকরো সরু সুতো বা দড়ি।
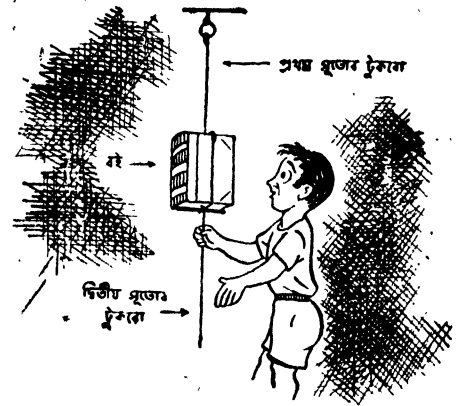
এ জিনিষ দুটি জোগাড় হবার পর, দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর আগে, নিখুঁতভাবে উদ্যোগ-আয়োজনের পর্ব্বটুকু সেরে ফেলতে হবে। আয়োজন-পর্ব্বের গোড়াতেই লম্বা-সরু সুতো বা দড়িটিকে সমান-মাপে দু'টুকরো করে কেটে নিয়ে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ভঙ্গীতে ঐ দড়ি বা সুতোর প্রথম-টুকরোটি দিয়ে ভারী-মোটা বাঁধানো-বইখানিকে পরিপাটিভাবে বেঁধে ঘরের দরজা কিম্বা জানলায় খাটানো পর্দ্দার ডাণ্ডা কিম্বা খাটের-ছত্রির গায়ে বেশ মজবুত করে ফাঁশ্ এঁটে ঝুলিয়ে দাও। এবারে ঐ ডাণ্ডায়-টাঙানো সুতো বা দড়ির টুকরোর ফাঁশ্-আঁটা বইখানির তলার-দিকের 'বাঁধনের' (underside of the book) সঙ্গে শক্ত করে গিঁট বেঁধে ঝুলিয়ে রাখো লম্বা-সরু সুতো বা দড়ির দ্বিতীয়-টুকরোটিকে—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি-ছাঁদে। এমনিভাবে খেলার উদ্যোগ-পর্ব্বের কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সেরে নেবার পর, সুস্পষ্ট-ভাষায় দর্শকদের বুঝিয়ে দাও তোমাদের কলা-

কৌশলের মর্ম্মটুকু সুউচ্চ খাটের ছতরি বা পর্দ্দার ডাণ্ডায় আঁটা ঐ সরুসুতো কিম্বা দড়িতে ঝোলানো ভারী-মোটা বাঁধানো-বইখানির তলায় অপর সুতোর অথবা দড়ির যে লম্বা ফালিটিকে ফাঁশ্ দিয়ে এঁটেছো, উপরের ছবির ভঙ্গীতে সেটিকে ঘন-ঘন কয়েকবার নীচের দিকে টান্ দিলেই, প্রথম দড়ি বা সুতোর টুকরোটি দিব্যি-সহজেই ছিঁড়ে যাবে। তবে তুমি যদি শূন্যে-ঝোলানো বাঁধানো-বইয়ের তলায়-আঁটা দ্বিতীয় সুতোর বা দড়ির টুকরোটিকে ছিঁড়ে ফেলতে চাও, তাহলে উপরের ছবির ভঙ্গীতে নীচের দিক থেকে সজোরে সেটিতে হ্যাঁচ্কা টান দাও···তাহলেই দেখবে—সরু সুতো বা দড়িতে বাঁধা এবং খাটের-ছত্রি কিম্বা পর্দ্দার-ডাণ্ডায় ঝোলানো অমন ভারী-মোটা বইখানি দিব্যি-অটুট বজায় রয়েছে শূন্যে, আর ঐ বইয়ের তলায় মজবুত গিঁট-আঁটা দ্বিতীয় সুতো বা দড়ির লম্বা-টুকরোটি ছিঁড়ে গিয়েছে বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে!

এমন আজব কাণ্ড কেন ঘটে, জানো?

বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে, শূন্যে উঁচুতে-ঝোলানো ভারী-মোটা বাঁধানো-বইখানির তলায়-আঁটা দ্বিতীয় দড়ি বা সুতোর ঐ টুকরোটিতে সজোরে টান্ দেবার ফলে, বইখানির উপরদিকে-বাঁধা দড়ি বা সুতোর প্রথম-টুকরোতে 'আকর্ষণ-শক্তির' (inertia of the book) তেমন বিশেষ কোনো জোর-চাপ পড়ে না···তাই সুতো বা দড়ির প্রথম-টুকরোটি খুব সহজে ছেঁড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। হ্যাঁচ্কা-টানের 'আকর্ষণ-শক্তির' সবটুকু জোর-চাপই পড়ে গিয়ে বাঁধানো-বইয়ের তলায়-আঁটা ঐ দ্বিতীয়-সুতো বা দড়ির উপর ··তারই ফলে, দ্বিতীয় সুতো বা দড়ির লম্বা-ফালিটি অত সহজেই ছিঁড়ে যায়···আর উপরের প্রথম সুতো বা দড়ির টুকরোতে ঝোলানো অমন ভারী-মোটা বাঁধানো-বইখানি বাঁধন ছিঁড়ে মাটিতে খশে না পড়ে দিব্যি-অটুট শূন্যে ঝুলতে থাকে। এই হলো—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় মজার খেলাটির আসল মর্ম্ম। এবারের মজার খেলাটি থেকে শুধু তোমরা নয়, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুরাও সহজেই বিজ্ঞানের এই অভিনব-তথ্যের সুস্পষ্ট-পরিচয় জানতে পারবেন।

আগামী সংখ্যায় এই ধরণের বিচিত্র-মজার আরেকটি বিজ্ঞানের খেলার বিষয় আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। লুকোনো-ছবির হেঁয়ালি ঃ
— বোম্বাই অঞ্চলে।
জলযান সচরাচর যাত্রী আর
পত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত
য়। এই ধরণের নৌকাগুলি কাঠের
তরী — বেশ সুদৃঢ়-মজবুত গড়নের,
ঝড়ে-জলে সহজে কাবু হয় না।
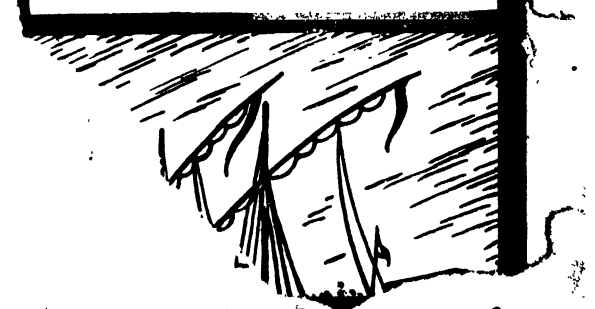
এবারে নতুন বছরে তোমাদের উপহার দেবার জন্য চিত্রকর-মশাইকে বেশ মজার একটি 'হেঁয়ালি-ছবি' এঁকে আনতে বলেছিলুম। আমাদের অনুরোধমতো খামখেয়ালী চিত্রকর-মশাই সেদিন এলোমেলো-হিজিবিজি রেখা টেনে অদ্ভুত-ছাঁদে আঁকা যে ছবিটি এনে সম্পাদক-মশাইয়ের হাতে দিলেন, সেটি দেখে দপ্তরের লোকজনেরা কেউই তার কোনো মর্ম্ম বুঝতে পারলেন না। অথচ চিত্রকর-মশাই বললেন যে সে ছবিটির মধ্যে এলোমেলো-হিজিবিজি রেখা টেনে তিনি নাকি এঁকে রেখেছেন, তিন-রকমের তিনটি পাখীর চেহারা। অনেক চেষ্টা করেও তাঁর আঁকা সেই 'হেঁয়ালি-ছবিটি' দেখে আমরা কিন্তু চিত্রকর-মশাইয়ে কথামতো সে তিনটি পাখীর চেহারার কোনো হদিশই খুঁজে পেলুম না। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা হেঁয়ালি-ছবিটি দেখে তাঁর কথামতো সে তিনটি পাখীর চেহারা খুঁজে বার করতে পারো, এই অবস্থায় আমরা

ছবিটি উপরে ছেপে দিলুম। বলতে পারো তোমরা, খাম-খেয়ালী চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা উপরের ঐ 'হেঁয়ালি-ছবিটির' মধ্যে লুকোনো রয়েছে কোন তিনটি পাখী ?

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা আর হেঁয়ালি ঃ

১। এক পেক্সয়া পরিমাণ আরক ভর্ত্তি করা যায়, এমন মাপের একটি কাঁচের বোতলে ছুটি বীজাণু রেখে দেওয়া হলো—ঘড়ির কাঁটায় বেলা ঠিক ছুটোর সময়। এ ছুটি বীজাণু থেকে প্রতি সেকেণ্ডে দ্বিগুণ সংখ্যায় একই

এমনিভাবে ছত্রিশটি সোনার মোহর সাজিয়ে রেখে দিলেন !

বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হলো—'র‍্যালে 'গোড়া আসরের টেবিলের বুকে-আঁটা একরাশ নম্বরওয়াল কষে বিরাট চাকতিখানার ঘূর্ণী! অপলক-দৃষ্টিতে স্তব্ধ ল্যাসিয়ে তাকিয়ে রইলেন 'র‍্যালে'-টেবিলের সেই বিরা ঘুরন্ত-চাকাখানার দিকে।...জানি না, এবারে বরাতে কি দান পড়ে ?...হার না জিৎ ?...

(ইছাপুর)

[আগামী সংখ্য

'লির'

উত্তর ঃ
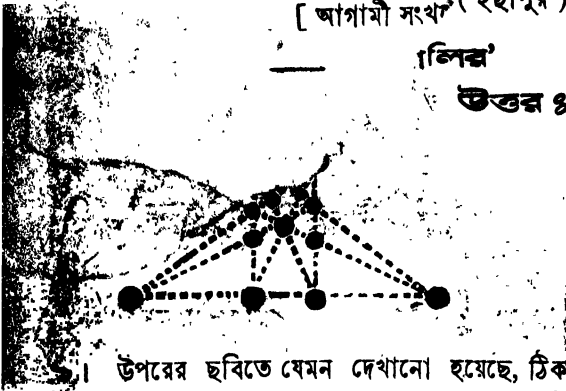
২। উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি-ছাঁদে রমেশবাবু তার বাগানে সুন্দর ও মানানসই ধরণে তেরোটি চারাগাছকে সারি দিয়ে সাজিয়ে বসিয়ে-ছিলেন। এমনি উপায়ে সুষ্ঠু ভাবে তেরোটি চারাগাছকে সাজানোর ফলে, রমেশবাবু দেখলেন যে মোট নয়টি সারি, এবং সেই নয়টির প্রত্যেকটি সারিতেই দিব্যি মানানসই-ধরণে চারটি করে চারাগাছ সাজানো হয়েছে। এই উপায়েই রমেশবাবু খুব সহজে তাঁর বাগানে নিখুঁত ও পরিপাটি ছাঁদে বিদেশ থেকে কিনে আনা তেরোটি সৌখিন ফুলগাছের চারা সাজানোর সমস্যাটি সমাধান করেছিলেন। উপরের ছবিতে দেখানো বড়-ফুটকি চিহ্ন হলো চারাগাছের নিশানা, আর ছোট-ফুটকি চিহ্নের লাইন এঁকে বোঝানো হয়েছে গাছের সারিগুলো কি ধরণে সাজানো প্রয়োজন। এছাড়া আরো অন্য ধরণেও চারাগাছগুলিকে সারি দিয়ে সাজানো যেতে পারে।

২। প্রত্যেকটি দলে তিনজন করে ছেলে ছিল।

গত মাসের ছুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

ধর্ম্মদাস রায়, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, খান্দু পাল, নেপাল পাল, ধর্ম্মদাস লাহা ও বুলু (বিষ্ণুধরপুর, বাঁকুড়া), কমলেশ, অরবিন্দ, হীরালাল, চঞ্চলকুমারী ও নিশীথরঞ্জন মাহাতো (কুলিয়ানা, সিংভূম), প্রদ্যোৎ ও বিদ্যুৎ মিত্র (মিত্রপাড়া, জয়নগর) চৈতালী বসু ও সুবীর রায় (?), শৈলেন সাধু, ধীরেন, সত্যেন, সোমেন, চাঁপা, বেলা, উষা, ও নিশা (আসানসোল), রেখা ও দুর্গাপ্রদাস ঘোষ (যশপুরনগর, রায়গড়)।

গত মাসের প্রথম ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া) কুলু মিত্র (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা); রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), পিণ্টু হালদার (বালী)।

গত মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), অদ্বৈত চরণ দাস (মানবাজার, পুরুলিয়া), নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (রঘুনাথগঞ্জ), দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল ও দেবল দত্তগুপ্ত, সুচিত্রা ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং স্বাতী সরকার (জলপাইগুড়ি), কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), মিংকু ও রিংকু ঘোষ (কাটিহার), শুভ্রা, শুভ্র, বাণী ও পার্থ হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া, বর্দ্ধমান), গৌতম ও স্বপ্না কোনার (আরামবাগ, হুগলী), মদনমোহন, নারায়ণচন্দ্র ও দুর্গাপদ মিশ্র (রাগপুর, মেদিনীপুর), ইলাবতী সেন (কিরকী, পুনা), ভারতকিশোর মণ্ডল (ঘাটবেরা, পুরুলিয়া), শঙ্করপ্রসাদ পুইতুণ্ডি (এথোড়া, বর্দ্ধমান);

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

অনেকটা আরব-দেশের বিরাটাকার 'ঢাও' নৌকার মতো চেহারার এই কাঠের তৈরী মালপত্রবাহী জলযানের নাম — 'পাটামার (PAT TAMAR)'। এই ধরণের সমুদ্রগামী-জলযানের প্রচলন আছে ভারতবর্ষের পশ্চিম-উপকূলে — বোম্বাই অঞ্চলে। এ সব জলযান সচরাচর যাত্রী আর মালপত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের নৌকাগুলি কাঠের তৈরী — বেশ সুদৃঢ়-মজবুত গড়নের, ঝড়ে-জলে সহজে কাবু হয় না।
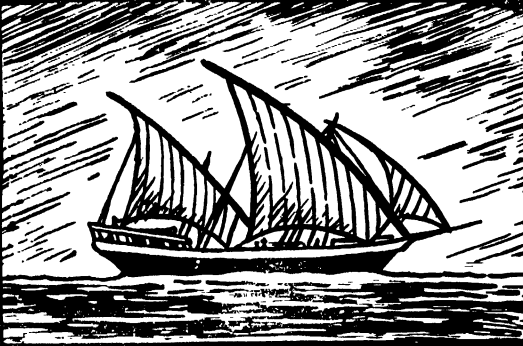
একদা অতীতে গ্রীসরাজ্যের সমৃদ্ধি-শক্তি যখন সুউচ্চ-শিখরে, সেই সুপ্রাচীন-যুগে কোরিন্থ-অধিবাসীরা দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য আর সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য এই ধরণের কাঠের তৈরী বিরাটকায় 'গ্যালি' (GALLEY) নামের বিচিত্র জলযানে চড়ে সাগরে পাড়ি দিতেন। এ সব অতিকায় জলযান চালনার জন্য ব্যবহার হতো, সারি দিয়ে সাজানো অনেকগুলি দাঁড় আর বড়-বড় কাপড়ের তৈরী পাল। সেকালে যুদ্ধ-বন্দী ক্রীতদাসদের 'গ্যালি' নৌকায় দাঁড়ির কাজ করতে হতো। ২৫০০ বছর আগে এ নৌকা দেখা যেতো

পাশের ছবিতে যে বিচিত্র-ছাঁদের পাল-তোলা নৌকাটি সাবলীল-গতিতে সাগরের বুকে পাড়ি দিয়ে চলেছে দেখতে পাচ্ছো, সে নৌকার নাম — 'ফেলুক্কা' (FELUCCA)। এ ধরণের নৌকা দেখতে পাওয়া যায় ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে — স্পেনদেশের উপকূলে। 'ফেলুক্কা' নৌকার পালগুলি তৈরী করা হয় ত্রিকোণ-আকারে … দুটি পাল আকারে বড় হয়, নৌকার দুই সীমান্তে থাকে ছোট দুটি পাল।

শুঙ্গকুষান ভাস্কর্য্যশিল্পে কাল্পনিক জীবজন্তু

সিপ্রা নন্দী

রূপকথায় আমরা, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প পড়েছি, পড়েছি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমার সাতসমুদ্র তের নদীর পার অতিক্রম করছে অবলীলাক্রমে। এইসব কথা ও কাহিনীর মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে তা আমাদের অজ্ঞাত, যদিও আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি মানুষের রঙ্গিণ কল্পনা শুধু যে সাহিত্যেই স্থান পেয়েছিল তা

এই অদ্ভুত কল্পনার অভিব্যক্তি প্রাচীন শিল্প সাধনায়ও অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যার উদাহরণ আমরা শুঙ্গ কুষাণ যুগের তক্ষণশিল্পে দেখতে পাই।

খৃষ্টপূর্ব তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে শিল্পধারার প্রসার লাভ করেছিল তা ছিল মোটামুটিভাবে বৌদ্ধ ভাবধারা ও সাধারণ লোকমানসের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারহুত, সাঁচীস্তূপ এবং বুদ্ধগয়ার বেষ্ঠনীগাত্রে ক্ষোদিত অর্দ্ধচিত্রসমূহ (Relief)। এ যুগের উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শনে এ যুগের শিল্পীরা যক্ষযক্ষিনী এবং বুদ্ধজীবনের চিত্রাবলী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে এক কাল্পনিক জীবজগতের বর্ণাঢ্যতা এনে দিয়েছেন। শিল্পীর এই অন্তর্নিহিত রঙ্গিণ কল্পনার অদ্ভুত অভিব্যক্তি আমরা ভারহুত, সাঁচী এবং বুদ্ধগয়ার বেদিকাগাত্রে ও সমসাময়িক পোড়ামাটির মূর্ত্তিতে দেখতে পাই। যথা মানুষ এবং পশুর সন্মিলিত প্রতিমূর্ত্তি, অথবা বিভিন্ন পশুপাখীর সংমিশ্রণ, যেমন অর্দ্ধমনের পশুমূর্ত্তি, একমুণ্ডযুক্ত দুইটি পশুমূর্ত্তি এবং ডানাবিশিষ্ট বিভিন্ন মানুষ, সিংহ এবং অন্যান্য। এসব জীব ভারহুত, সাঁচী এবং বুদ্ধগয়ার বেদিকাগাত্রের মণ্ডনশিল্পে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। ভারহুতের কয়েকটি নিদর্শন এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন পূর্ব্বদিকের তোরণ দ্বারের চূড়ায় (Capital) মনুষ্য-মুখাকৃতি সিংহের রূপায়ণ দেখতে পাই, তেমনি আবার দেখি বেদিকাগাত্রের অর্দ্ধগোলাকৃতি রেখায় আবদ্ধ (Half medallion) কুমীরের পুচ্ছযুক্ত বৃষ, পক্ষীচঞ্চু-যুক্ত সিংহ বা গ্রিফিন, যা সত্যিই অবাস্তব।

কিন্তু যে কাল্পনিক প্রাণী ভারহুতের ভাস্কর্য্যে বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে সে হোল মকর—মাছ এবং কুমীরের এক আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ। তোরণদ্বারের শীর্ষভাগে এবং বেদিকাগাত্রে এই মকর বিভিন্নভাবে রূপায়িত করা হয়েছে। পূর্ব্বদিকের তোরণদ্বারের শীর্ষভাগের (Architrave) দুইদিকে পুচ্ছগুটান মুখব্যা-দানকারী মকরের রূপায়ণ দেখতে পাই। ভারহুত স্তূপের বেদিকাগাত্রেও মকরের অলংকরণ দিয়ে সুশোভিত
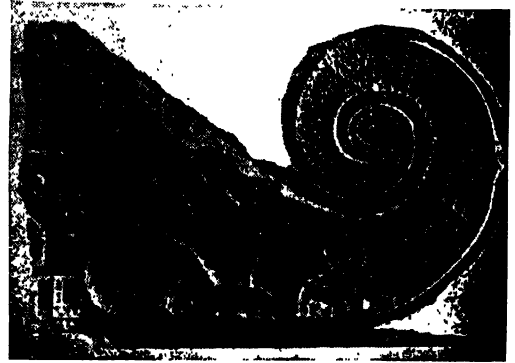
ভরহুত। শুঙ্গ শৈলী

মীন পুচ্ছযুক্ত মকর

করা হয়েছে। এইগুলি প্রধানত বেদিকাগাত্রের চক্রাকার ও অর্দ্ধচক্রাকার (Medallion and Half medallion) খোদাইয়ে দেখান হয়েছে। আবার বাহনরূপেও মকরের কল্পনা করা হয়েছে, যেমন যক্ষী সুদর্শনার বাহনরূপে আমরা মকর দেখতে পাই। কিন্তু তার চেয়েও চমকপ্রদ রূপায়ণ ঘটেছে যখন দেখতে পাই যক্ষী চন্দ্রা তার অপরূপ দেহমাধুর্য্য নিয়ে সর্পিল বেণী

স্কন্ধে অশ্বমুখাকৃতি মকরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে ভারতীয় ভাস্কর্য্যশিল্পে মকরের প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকের রাজত্বকালে খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত লোমষঋষিগুহার সম্মুখভাগের কারুকার্য্যে দেখতে পাওয়া যায়। শুঙ্গযুগের বিদেশাগত যবনশিল্পের অপরিহার্য প্রভাবে সাঁচীর শিল্পীদের মুখর খোদাই কাজে এই মকর আরও চিত্তাকর্ষক ভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া আরও বহু কাল্পনিক জীবজন্তু ভারহুতের ভাস্কর্য্যশিল্পে স্থানলাভ করেছে। যেমন মৎস্যপুচ্ছযুক্ত হস্তী, মানুষের মুখওয়ালা উড়ন্ত সিংহ, পঞ্চফণাসর্প (মণিকণ্ঠ জাতক) এবং শ্মশ্রুযুক্ত মানুষের মুখবিশিষ্ট অশ্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। কলকাতার ভারতীয় চিত্রশালায় ভারহুত স্তূপের যে বিপুল প্রস্তর বেষ্টনী রক্ষিত রয়েছে তাতে এই সমস্ত কাল্পনিক জন্তুর পরিচয় পাওয়া যায়।

এই কাল্পনিক জীবজন্তু সাঁচী এবং বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্য্য-শিল্পে অধিকতর প্রাণবন্তভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। সাঁচীস্তূপের পূর্ব্বদিকের তোরণের মধ্যভাগে এই ধরণের জীবজন্তুর মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে স্বজাতির আভ্যন্তরিক বিবাদে বিরক্ত হয়ে বুদ্ধ কৌশাম্বী ত্যাগ করে নির্জ্জনে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং হস্তীযুথ তাঁর জন্যে শ্রদ্ধাভরে অপেক্ষা করছিল। বুদ্ধ জীবনের এই বিখ্যাত কাহিনী খুব সম্ভব সাঁচী-তোরণের অলঙ্কৃত জীবজন্তুকে এক বিচিত্র অনুভূতি দান করেছে। তোরণগাত্রের অশ্বত্থ বৃক্ষ 'অবিদূরে নিদানে' বর্ণিত বুদ্ধের উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং চারপাশে অতিপ্রাকৃতিক জন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে— এ যেন স্বর্গ ও স্বপ্নের এক অপরূপ মিশ্রণ। শিল্পীরা অতিশয় চিত্তাকর্ষকভাবে রূপায়িত করেছে এই সমস্ত কাল্পনিক জীবজন্তুকে। এদের মধ্যে দেখতে পাই "গ্রিফিন" এবং এক শৃঙ্গযুক্ত সিংহ, বহুফণাযুক্ত নাগ। কিন্তু আমাদের মন বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে যায় যখন অর্দ্ধমনের সিংহের কেশরসহ এবং ভেড়ার শৃঙ্গযুক্ত বৃষকে দেখা যায়। বিভিন্ন জন্তুর সম্মিলনে এই বিচিত্ররূপ ভারতবর্ষে ইজিয়ান সাগর ও পশ্চিম এশিয়ার শিল্পধারার রহস্যময় স্পর্শ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কাল্পনিক জীবজন্তুর রূপায়ণে সাঁচীর শিল্পীরা ভারহুতের শিল্পীগণ থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। মকরের রূপায়ণে শিল্পীরা কখনও সিংহ এবং কখনও বা হাতী অথবা মৃগ-মুণ্ডের সংযোজন করেছে। কিন্তু শিল্পীর কল্পনা শুধু জলবিহারী মকরেই তৃপ্তি হয় নি, তাই সাঁচীর অলঙ্করণ শিল্পে তাকে এক নূতন পর্য্যায়ে দেখতে পাই। সাঁচী-স্তূপের বেদিকাগাত্র এবং স্তম্ভগাত্র যে পুষ্প এবং বল্লরীর আলেখ্য দিয়ে শোভিত করা হয়েছে অনেক সময়ই তা যেন মকরের জলোচ্ছ্বাসে নির্গত।

ভরহুত বেষ্টনী। তুঙ্গ যুগ
পক্ষী চঞ্চুযুক্ত সিংহ

মকর ভিন্ন সিংহের কাল্পনিক রূপায়ণেও অধিকতর মনোনিবেশ করা হয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, উড্ডীয়মান সিংহের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাশ্চাত্যশিল্পে রূপায়িত

ভারহুত। শুঙ্গ শৈলী
পক্ষযুক্ত সিংহ

"গ্রিফিন" নামক সিংহের আর এক বিচিত্ররূপ দেখতে পাই। এ হোল ঈগলের ঠোঁটযুক্ত সিংহ, কখনও ডানা থাকে—কখনও বা পক্ষবিহীন। বালুচিস্থানে অবস্থিত নলেএর প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত বহুবর্ণ-চিত্রিত মৃৎপাত্রের গায়ে এই "গ্রিফিনের" পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক Koldeway কর্ত্তৃক ব্যাবিলন খনন কার্য্যের ফলে ইস্তার দেবীর প্রতি নিবেদিত তোরণ-গাত্রেও কতকটা এই ধরণের কল্পিত জীব দেখা যায়—যার নাম দেয়া হয়েছে "সিরুস্"। সাঁচী স্তূপ সম্বন্ধে একটী উদাহরণই আমাদের কল্পনাকে রসসঞ্জীবিত করতে সক্ষম। বেদিকাগাত্রের অর্দ্ধগোলাকৃতি চিত্রে (Half medallion) দেখতে পাওয়া যায় একটি "গ্রিফিন" তার দুইদিকের পক্ষ বিস্তার করে বসে আছে। সাঁচিস্তূপের উত্তরপূর্ব্বদিকের তোরণশীর্ষে অশ্বত্থমৃগের শৃঙ্গযুক্ত বল্লালাগান উড্ডীয়মান সিংহের সঙ্গে দুই কুব্জযুক্ত কেশরওয়ালা উটেরও সাক্ষাত পাওয়া যায়। উটের এই রূপায়ণ যে অতীতকালের ব্যাকট্রীয় ও ভারতের বিস্মৃত সম্পর্কের দ্বারা অনুপ্রাণিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেমন করে ভারতীয় শিল্পীরা তাদের পছন্দমত ব্যাকট্রীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য আহরণ করেছে ও বৈদেশিক স্বার্থবাহদেরও হয়ত লক্ষ্য করেছে। এবার মনে হবে সুদূর আসিরীয়ার কথা—যখন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মনুষ্যমুখযুক্ত সিংহের মূর্ত্তি দেখতে পাই। শিল্পীর কল্পনার আর এক অদ্ভুত সৃষ্টি মূর্ত্ত হয়েছে কখনও বা বহুশাখাবিশিষ্ট হরিণের শৃঙ্গসহ হাতীর মস্তকে, আবার কখনও এক শৃঙ্গযুক্ত অশ্ব অথবা হাতীর মুণ্ডযুক্ত পক্ষসহ মৃগের সৃজনে। তেমনি নাগ ও নাগিনীর নানারূপ সাঁচী এবং ভারহুতের স্তম্ভগাত্রে আমরা দেখতে পাই আকর্ষণীয় ও রূপকধর্ম্মী লাবণ্য ও অঙ্কুরেখায়। শিল্পীর প্রেরণায় নানা ঢঙ্গে, নানা বর্ণে এই জীবজন্তুর রূপায়ণ ঘটেছে। সেইজন্যই আমরা যখন কোন বৌদ্ধ-স্তূপের বেদিকাগাত্রে "সেণ্টর" অথবা কিম্পুরুষের সাক্ষাৎ পাই তখন একেবারেই বিস্মিত হই না। সাঁচীর "মেডা-লিয়নে" আমরা পুরুষ এবং নারী উভয় কিম্পুরুষেরই সাক্ষাৎ পাই। এতে মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা মানুষ এবং অশ্বের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত জীবের পরিকল্পনা—সম্ভাব্য সকল দিক থেকেই রূপায়ণের চেষ্টা করেছিল সাধারণ পশ্চিম এশিয়ার শিল্পকল্পনার সমান্তরালে। যেমন আমরা বলতে পারি সাঁচীর বেদিকাগাত্রের মেডালিয়নে যক্ষিনী অশ্বমুখী বোধিসত্ত্বকে প্রীতিভরে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনি আবার মনুষ্যমুখযুক্ত ঘোড়া সওয়ার পিঠে নিয়ে যাচ্ছে—এই ছবিরও সাক্ষাৎ পাই। বৌদ্ধজাতকে বর্ণিত যক্ষিনী অশ্বমুখী সম্ভবত ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ শিল্পসম্ভূত। অপরপক্ষে মনুষ্যমুখযুক্ত ঘোড়ায় দেখা যায় যেন অ্যাসিরীয় এবং ইরাণীয় কল্পনার প্রতিফলন। এই ভাস্কর্য্যটি একদিকে স্পেনে হারকিউলিস উপাখ্যানে বর্ণিত সেণ্টরদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনি হয়ত বা স্মরণ করিয়ে দেয় পুরাণকাহিনীর উর্ব্বশী-পুরূরবার অবিচ্ছেদ্য ও আশ্চর্য্য প্রণয়কাহিনী, কারণ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে 'কিন্নর' নামে এক বিচিত্রদেহধারী জাতির উল্লেখ রয়েছে যারা সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ ছিল।

এই প্রসঙ্গে মৌর্য্যযুগের (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী) ভারতীয় চিত্রশালার ভারহুত প্রকোষ্ঠের প্রাচীরে সংযোজিত দুইটি "গ্রিফিণ" বা ডানাওয়ালা সিংহ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাটনা জেলার কুমরাহার থেকে প্রাপ্ত এই দুইটি কাল্পনিক সিংহ পেছনের দুইপায়ের ওপর ভর দিয়ে এত সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে এতে দেহের সুন্দর গঠন, ভীষণ মুখাকৃতি এবং শরীরের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মৌর্য্য অথবা মৌর্য্যপূর্ব্বযুগের মথুরায় প্রাপ্ত গোলাকৃতি প্রস্তর

কবচে (Ring stone) আমরা পুচ্ছযুক্ত সিংহের সঙ্গে সঙ্গে দুই কুব্জযুক্ত ব্যাকটীয় উটেরও সাক্ষাৎ পাই। ঐ একই প্রাপ্ত প্রকোষ্ঠে কুমরাহারে প্রাপ্ত শুঙ্গযুগের (খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী) একটি প্রস্তর বেষ্টনীর মেডালিয়নে জাতকে বর্ণিত যক্ষিনী অশ্বমুখীর রূপায়ণ দেখতে পাই।

বুদ্ধগয়ার স্তূপবেষ্টনীগাত্রে যে কাল্পনিক জন্তুর সম্মেলন ও রূপায়ণ ঘটেছে—গঠন-চাতুর্য্যে সাঁচীর ভাস্কর্য্যের ন্যায় বাস্তবতর নয় একথা সত্য, কিন্তু বৈচিত্র্যসাধনে যে সক্ষম হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই কাল্পনিক জন্তুখোদিত কড়িকাঠের ন্যায় প্রস্তর ঝালর (frieze)র কতকাংশ ভারতীয় চিত্রশালার প্রদর্শনীতে রক্ষিত আছে। এখানেও সিংহ, হরিণ এবং হাতী বেষ্টনীগাত্রের "মেডালিয়নে" স্থান পেয়েছে। অনেক সময়ই কাল্পনিক জন্তুগুলি এখানে সারিবদ্ধভাবে দৃশ্যমান আছে। যেমন একটি প্রস্তর ঝালরে দেখতে পাই মনুষ্যদেহ এবং মাছের পুচ্ছযুক্ত এক অপরূপ জীবের সংমিশ্রণ সারিবদ্ধভাবে পুষ্প স্তবকের সামনে অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আবার আর এক জায়গায় দেখতে পাই উড্ডীয়মান ঘোড়া এবং সেই সঙ্গে

গন্ধার শৈলী

গ্রীক পুরাণে বর্ণিত Minotaur-এর ন্যায় মনুষ্যমুখযুক্ত উড্ডীয়মান বৃষ। কখনও বা ছুটন্ত অবস্থায় উড়ন্ত "সেণ্টরেরও" রূপায়ণ হয়েছে।

তাছাড়া এক বা দুই মৎস্যের পুচ্ছযুক্ত সিংহ, হাতী, ঘোড়া, ভেড়া, ইত্যাদি জীবও বুদ্ধগয়ার শিল্পীর খামখেয়ালী মনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু শিল্পীর এই রঙ্গিণ কল্পনার সবচেয়ে চমকপ্রদ রূপায়ণ ঘটেছে "Mamaid" অথবা মৎস্যকন্যার মধ্যে। অমিতলাবণ্যা অর্দ্ধমানবী এই মৎস্যকন্যারা অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে এক রূপকথার অনুভূতি সৃষ্টি করে আসছে। প্রাচীন গ্রীস, পারস্য এবং আসিরীয়ার স্থাপত্যকলায়ও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। অতীত আসিরীয় ভাস্কর্য্যকলায় দেবতা 'Syria'র (Des Syria) যে নিদর্শন রয়েছে তা উর্দ্ধাঙ্গ নারী এবং নিম্নাঙ্গ মৎস্যের ন্যায় রয়েছে। মথুরা চিত্রশালায় রক্ষিত কুষানকালের একটি মৃন্ময় মৎস্যকন্যার (নং ৫০ : ৩৮৮৪) রূপায়ণেও যেন সাগরতলের কাল্পনিক রহস্যের সম্বন্ধে প্রাচীন শিল্পীদের অনুভূতি ও রোমাঞ্চকর মোহ প্রতিফলিত করে। এখানে কুষানশৈলীর বাস্তব সৌন্দর্য্যের উৎকৃতায় রেখায়িত অঞ্জলিবদ্ধ সমুদ্রকন্যা যেন এক মহৎ আবেগের পরিচয় দেয়। আবার অশ্বমুখসংযুক্ত যক্ষী একটি মানুষের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে—এও স্তম্ভগাত্রে দেখতে পাই। 'বোধিসত্ত্বদান কল্পলতায়' ভগবান বুদ্ধ তাঁর পূর্ব্বজীবনে কিন্নরীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই কাহিনী বর্ণিত আছে। খুব সম্ভব এই দৃশ্যটি সেই কাহিনীটিরই প্রতিচ্ছবি।

মনুষ্যমুখযুক্ত ঘোড়া অথবা কিম্পুরুষও স্তম্ভগাত্রে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া মানুষের দেহ এবং ময়ূরের পুচ্ছ এবং পাসহ কিন্নরের সাক্ষাৎও আমরা এখানে পাই। আবার দুইদিকে পক্ষবিস্তার করে বিষ্ণুর বাহনরূপে পরিচিত গরুড়ও স্তম্ভগাত্রে রয়েছে। মনুষ্য মস্তকের পরিবর্ত্তে অনেক সময় অশ্বমস্তক সংযোজন করেও ময়ূর রূপায়িত হয়েছে। আর একটি কাল্পনিক জন্তু বুদ্ধগয়ার শিল্পীরা খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে দৃষ্টিগোচর করেছে, সে হোল মকর জাতীয় প্রাণী। মুখব্যাদনকারী এই জলচরের সারি ভারতীয় চিত্রশালায় বুদ্ধ গয়ার স্তূপবেষ্টনীর প্রস্তরঝালরে দেখা যায়। এতে যেন পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বুদ্ধগয়ার শিল্পীরা, ভারহুত এবং সাঁচীর শিল্পীগণ থেকে, কাল্পনিক জীব-জন্তুর রূপায়ণে এত বেশী তাদের কল্পনাকে বিভিন্নভাবে নিয়োজিত করতে পেরেছে বলেই, এত বৈচিত্র্য এসেছে ওদের অলঙ্করণে। প্রায় দুহাজার বছর আগেকার পশ্চিম ভারতের চৈত্যগুহাগুলিতে এই সমস্ত কাল্পনিক উড্ডীয়মান জীব জন্তু গুহার অলঙ্করণে ব্যবহার করা হোত। পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত ভাজা গুহায় একদিকে

যেমন দেখা যায় প্রস্তর-খোদিত অপরূপ নৃসিংহ মূর্ত্তি (Sphinx) ; অপর পক্ষে পিতাল খোরার চৈত্যগুহাগাত্রে দেখা যায় উড়ন্ত অশ্ব এক স্বর্গীয় পরিবেশে। ফলে এখানে দেখা গেল যেন অ্যাসিরীয় অথবা পারসীক স্থাপত্যের অপার্থিব গাম্ভীর্য্য।

কুষাণ রাজত্বকালের সমসাময়িক যুগে সাতবাহন পর্ব্বে অমরাবতীর ভাস্কর্য্যশিল্পেও এই সমস্ত জীবজন্তু যে স্থান লাভ করেছিল তা দু-একটি উদাহরণ উল্লেখেই হয়ত যথেষ্ট অনুধাবন করা যাবে। বেদিকাগাত্রের এক জায়গায় দেখতে পাই একটি মানুষ ও পক্ষযুক্ত সিংহ। তাছাড়া পঞ্চফণাযুক্ত সর্প এবং উড্ডীয়মান ঘোড়ারও নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অমরাবতীর স্তূপে আমরা ভারহুতের ন্যায় মুখে পদ্মফুলসহ মকরের সাক্ষাতও পাই। আবার অনেক সময় এই মকরের ভেড়ার শিং-এরও কল্পনা করা হয়েছে।

মথুরা এবং গান্ধারের ভাস্কর্য্যশিল্পীরা এই একই জীব-জন্তুর রূপায়ণে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এখানেও আমরা "সেণ্টর" এবং মাছের পুচ্ছসহ ডানামেলা সাগর অশ্ব (Sea-horse) দেখতে পাই। ত্রিকোণাকার প্রস্তর

কুষান শৈলী। মথুরা

চতুঃসিংহ ডানাওয়ালা

ফলকে রূপায়িত এই অপরূপ অশ্বটির একটি সুন্দর নিদর্শন ভারতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত রয়েছে। পশ্চিমবাঙ্গলার প্রাচীন তাম্রলিপ্ত (তমলুক) ও চন্দ্রকেতুগড়ের বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকেও সমুদ্র-অশ্ব, সমুদ্র-হস্তী, ডানাওয়ালা সিংহ, কুমীরমুখো মানুষ ইত্যাদি কাল্পনিক জীব-জন্তু দেখা যায়। এইগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

কিন্তু যে কাল্পনিক জন্তু গান্ধার শিল্পে বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছিল সে হোল একপ্রকার সামুদ্রিক দানব যাকে Ichthy centaur বা fish centaur রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্দ্ধাংশ মানুষ এবং অপর অংশ ড্রাগনের লেজ এবং সিংহের পা সহ ডানা মেলা এক বিচিত্র রূপের জন্তু। তাছাড়া আছে অশ্বদেহ এবং কাল্পনিক সমুদ্রচর ড্রাগনের পুচ্ছসহ আর এক অলৌকিক জীব। একপ্রকার

গন্ধার শৈলী। কুষান যুগ

ড্রাগনের পুচ্ছসহ অলৌকিক জীব

সামুদ্রিক বৃষও গান্ধার ভাস্কর্যো দেখতে পাওয়া যায়। ভাবতীয় চিত্রশালার গান্ধার প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত আর একটি ত্রিকোণাকার ফলক, আমরা অর্দ্ধাঙ্গ মনের এবং কটিদেহ থেকে পদযুগল দুইটি সর্পিল কুণ্ডলীতে পরিবর্ত্তিত হয়েছে—এ ধরণের এক নূতন জীবের সাক্ষাত পাই, যার প্রান্তদেশ ধরে রয়েছে একটি মানুষ general irinigham এই ভাস্কর্য্যনিদর্শনটিকে "হেরাক্লিসের সর্পদেহধারী দানবের সঙ্গে যুদ্ধ" (Herakles fighting with a snake legged giant") এই বলে আখাত করেছেন অপরপক্ষে গ্রীক উপকথায় বর্ণিত সিন্ধুআত্মা টাইফোনের (Tiphon) সঙ্গেও এই জীবের তুলনা করা চলে। কিন্তু যে মকর সুদূর ভারহুতেয় শিল্পকারুকার্য্যে স্থান পেয়েছিল, গান্ধার শিল্পের অলঙ্করণে তার অভাব ঘটেনি। শুধু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর কল্পনারও প্রসার লাভ করেছে বলে পূর্ব্বেকার জীবজন্তুই আরও নূতন রূপে নব

কলেবরে রূপায়িত হয়েছে। ফলে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়েছে ব্যাপকভাবে। এবার আমরা দেখতে পাই উড্ডীয়মান মকর। আবার তক্ষশীলার সিরকপে প্রাপ্ত একটি কোমল প্রস্তরে খোদিত ট্রেতে পুচ্ছগুটান একটি মকরের উপর নারীও দেখতে পাওয়া যায়। ইনিই কি তবে সেই মকরবাহিনী গঙ্গা? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দিল্লীতে জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত দুইটি গান্ধার শিল্পের প্রসাধন-থালী যা পক্ষীচঞ্চুযুক্ত ডানামেলা গ্রিফিন এবং উড্ডীয়মান অশ্ব এবং সিংহ দ্বারা সুশোভিত। কিন্তু তার চেয়েও চমকপ্রদ হল—সিরকপে প্রাপ্ত একটি তামার ধূপদানি যার হাতলটি নির্ম্মাণ করা হয়েছে একটি শৃঙ্গ-শোভিত উড্ডীয়মান সিংহের আকারে। সর্ব্বশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে সমস্ত সামুদ্রিক দানবের চিত্র গান্ধার ভাস্কর্য্যের মণ্ডনশিল্পে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে প্রকৃতপক্ষে হেলেনীয় শিল্পের Pergamon শৈলীর লিখন সুস্পষ্ট।

মথুরাতেও আমরা মীনপুচ্ছসহ হাতী দেখতে পাই, দেখতে পাই ঈহামৃগ বা সিংহমস্তক এবং মকরের পুচ্ছসহ ডানামেলা এক অতি আশ্চর্য কাল্পনিক জন্তু। এই কাল্পনিক জন্তুটি ভারতীয় চিত্রশালার "Mathura bay"তে প্রদর্শিত রয়েছে। আবার মথুরায় যে সংগ্রহশালা রয়েছে তাতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর জৈন "আয়াগপটে" অমরাবতীর ন্যায় মুখে পদ্মফুলসহ মকরেরও সাক্ষাত পাই। দিল্লীতে জাতীয় চিত্রশালায় মথুরায় প্রাপ্ত একটি architrave"এ (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) এইসব কাল্পনিক জন্তুর একটি সুন্দর নিদর্শন রয়েছে। এখানে বৌদ্ধ উপাসকদের শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এক কাল্পনিক জন্তুর সারি দেখতে পাই, যাতে রয়েছে মৎস্যপুচ্ছযুক্ত সিংহ, হংস এবং মকর। কিন্তু মথুরা শিল্পের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক নিদর্শন হল মনুষ্যমুখসহ চারটি জন্তুর সম্মিলনে একটি স্তম্ভশীর্ষ। হরিদ্রাবিন্দু ছড়ান লাল পাথরে তৈরী এই জন্তুগুলির চুল ভেড়ার শিংএর আকারে গুটান রয়েছে। গোজাতীয় বিভিন্ন জন্তু এবং সিংহের সম্মিলনে ডানামেলা এই অদ্ভুতাকৃতি জীবের কল্পনা করা হয়েছে। মথুরার এই ভাস্কর্য্যের নিদর্শন প্রাচীন মিশরীয় দেবতা পক্ষযুক্ত অর্দ্ধ-মানবী ও অর্দ্ধসিংহ স্ফিংক্সের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর সারনাথে আবিষ্কৃত একটি লিপিখোদিত ছত্রের (সম্ভবত ভগবান বুদ্ধের প্রতি নিবেদিত) নিম্নভাগের কারুকার্য্যে দেখা যায় একাধিক আশ্চর্য্যদর্শন জীবমূর্ত্তি, ডানাওয়ালা হাতী, হংসকণ্ঠ অশ্ব, পক্ষবিশিষ্ট বৃষ ও শৃঙ্গ ও পক্ষযুক্ত অন্যান্য বিচিত্র প্রাণী, এই অলৌকিক প্রাণীরা যেন এক মহান মুহূর্ত্তের যথা ভগবান বুদ্ধের বোধিপ্রাপ্তির অথবা সারনাথে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের স্থির সাক্ষী। এ যেন এক নিশ্চল স্বর্গীয় নাটকের একটি অনন্ত দৃশ্য।

শুঙ্গ কুষান যুগের ভাস্কর্য্যকলায় সে যুগের শিল্পীরা যে কাল্পনিক জীবজন্তুর রূপায়ণে খুবই মনোজ্ঞভাবে রস-সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এখন একথা আমাদের মনে স্বভাবতই জাগতে পারে এই যে অদ্ভুত জীবজন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-কলায় স্থান লাভ করেছিল তা কি সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম-এশিয়া এবং গ্রীক শিল্পধারায় অনুপ্রাণিত, না প্রাচীন ভারতীয় গল্প গাঁথায় যা বর্ণিত হয়েছে তাই শিল্পীর কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করেছিল? এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে "শুঙ্গকুষাণ ভাস্কর্য্যের বহুকাল পূর্ব্বে তাম্র-প্রস্তর যুগে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ শতাব্দীতে সিন্ধু নদীর কোলে মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেখান থেকে প্রাপ্ত সীলএ আমরা কাল্পনিক ও মিশ্রিত দেহ জন্তুর ছবি দেখতে পাই। যেমন একটি সীলএ একশৃঙ্গ অশ্বের দেহযুক্ত পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই একশৃঙ্গ অশ্বের কল্পিত রূপ আবার আর একটি সীলএ ধূপদানির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাও দেখা যায়। তাছাড়া Chimera বা বিভিন্ন জন্তুর সংমিশ্রণে এক চিত্তাকর্ষক কাল্পনিক জন্তুও মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সীলএ স্থান পেয়েছে। মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত "Steatite" সীলএ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ কাল্পনিক জীবের সমাবেশ ঘটেছে যে তাতে চমককৃত হতে হয়। একটি চারকোণা সীলএ দেখতে পাই একটি শৃঙ্গযুক্ত ব্যাঘ্র থাবায় ভর দিয়ে এক শৃঙ্গধারী সর্পিল লেজসহ এবং অশ্বক্ষুরসংযুক্ত এক অদ্ভুত নারীর পানে তাকিয়ে আছে। আবার একটিতে রয়েছে দুই বৃষমুণ্ডযুক্ত এক কাল্পনিক জন্তু—যার একটিতে শৃঙ্গ রয়েছে।

ঐতিহাসিক যুগের শিল্পপ্রসঙ্গে Vincent Smith বলেছেন কাল্পনিক জীবজন্তুর রূপায়ণে ভারতীয় শিল্পীরা হেলেনীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার ভাস্কর্যশিল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলেই তাদের অনুকরণ সম্ভব হয়েছিল। শিল্পীর এই কাল্পনিক রস পরিবেশন খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সংযোগের ফলে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কারণ মৌর্য্য এবং শুঙ্গ শিল্পকলা ইরাণ এবং পশ্চিমের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং ইন্দোগ্রীক ও ব্যাকট্রিয়ানগণের দ্বারা ভারতে বসতি স্থাপন করার পর যথাযথভাবে গড়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বুদ্ধগয়া' পুস্তকে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রয়োগ করেছেন তা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। কারণ তাঁর মন্তব্য সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় মৌলিকতার সপক্ষে। তিনি বলেছেন যে "Centaur" প্রধানত গ্রীক ভাবধারা থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভারতীয় শিল্পকলায় প্রবেশ করেছে একথা ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ মনুষ্যমুণ্ডযুক্ত অশ্বদেহধারী জীব অশ্বমুণ্ডযুক্ত মনুষ্য দেহেরই আর একটি রূপ এবং শেষোক্ত উদাহরণ কিন্নর-রূপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয় শিল্পীরা যখন কিন্নরের রূপদানে সক্ষম হয়েছে তখন তাদের পক্ষে "সেণ্টর" বা মনুষ্যমুণ্ডযুক্ত অশ্ব, বৃষভ, পক্ষী, অথবা পক্ষযুক্ত সিংহ, অশ্ব, মৃগ প্রভৃতি সৃষ্টিতে অক্ষম হবে একথা ভাবা স্বভাবতই যুক্তিযুক্ত নয়। আর বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার-রূপে নৃসিংহের কল্পনা যখন সেকালের মানুষ করতে পেরেছে, তখন মনুষ্যমুণ্ডযুক্ত সিংহের বিচিত্ররূপ সৃষ্টি করতে কোনরূপ অসুবিধা হবার কথা নয়। অবশ্য এখানে একথাও মনে রাখা দরকার যে একদা বহু শতাব্দী পূর্বে ব্যাবিলন ও নিনেভের যুগে এই সমস্ত কাল্পনিক জীবজন্তু অশোকের রাজত্বকালের বহুপূর্বে অ্যাসিরীয়দের নিকট সুপরিচিত ছিল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই কাল্পনিক জীব-জন্তুর রূপায়ণে শিল্পীরা প্রাচীন ভারতীয় উপকথা থেকেই নানা উপাদান আহরণ করেছে যা যুগযুগান্তরের সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও মোহ সৃষ্টি করেছে রূপদর্শীর মনে। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে বৈদেশিক শিল্পধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে বলেই মাঝে মাঝে হয়ত দেখা যায় বহু যোজন দূরবর্তী দেশগুলির ভাবধারা ও শৈলীর বর্ণাঢ্য লিখন।

এই সব আশ্চর্য্য জীবজন্তুর সমাবেশের মূলে যে কি নিগূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে তা বলা কঠিন। যদিও আমরা হয়ত অনুমান করতে পারি সেই সুপ্রাচীন যুগে হয়ত বা হিন্দু বৌদ্ধরা তাঁদের পরম আরাধ্য দেবতা, অথবা পূজনীয় এবং অচিন্ত্য মহাপুরুষের অনন্ত রূপটিকে প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। নিখিল বিশ্বের স্তরে স্তরে কতই না দেবলোকের ও নিম্নতর জগতের কল্পনা তাঁরা করেছিলেন! সেই সব স্তর থেকে যেন দলে দলে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, কিন্নরী ও তাঁদের নিত্য-ধর্ম্মসহচর ও অধ্যাত্ম প্রতীক নানা অলৌকিক জীব-জন্তু। তাঁদের আগমন কেবল সেই পরম আরাধ্যকে পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য।
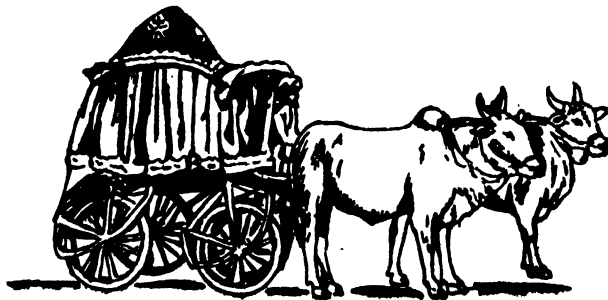
২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৩, ২৪ ও ২৫শে মার্চ শনি, রবি, ও সোমবার কাঁচরাপাড়া সহরে রেল-কোয়াটার মধ্যস্থ বিরাট হলে ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। জেলা সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী হয় এবং স্বনামখ্যাতা লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় তাহার উদ্বোধন করেন। বলা বাহুল্য তিনি বসিরহাট নিবাসী স্যার রাজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ ও স্যার বীরেন্দ্রনাথের পত্নী। প্রদর্শনীতে জেলার সকল স্বর্গত কৃতী সন্তানের চিত্র ছাড়াও দেশের সামাজিক,অর্থনৈতিক প্রকৃতি বিষয়ে বহু তথ্য ছিল। জেলা সাহিত্য সম্মিলনের পরিচায়ক মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ভাষণের পর শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এক সুলিখিত ভাষণে শিক্ষা সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া সম্মেলন উদ্বোধন করেন, তাহার পর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সম্পাদক তরুণ এম-এল-এ শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এক মুদ্রিত ভাষণে জেলার সাহিত্য আলোচনার ইতিহাস ও বর্তমান সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাহার পর সম্মিলনের পরিচালন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসঞ্জীব-কুমার বসু তাঁহার সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করিলে বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান উজ্জ্বলতম রত্ন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় এক ঘণ্টার অধিক কাল এক ভাষণে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার কথায় তাহার দোষগুণ বিচার করেন। সে ভাষণে তিনি বর্তমান যুগের লেখক-দের ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগের অভাব ও বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ স্পৃহার কথা বলিয়া সকল তরুণ সাহিত্যিককে সাবধান করিয়া দেন। তাঁহার ভাষণের পর ঐদিনের অধিবেশনের সভাপতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য কোবিদ শ্রীহিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় তাঁহার সুলিখিত ভাষণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা বিবৃত করিলেও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দাসের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য বসন্ত-উৎসব অভিনীত হইলে অধিক রাত্রিতে সে দিনের সম্মিলন শেষ হয়। ২৪শে মার্চ রবিবার বিকাল ৫টায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সর্বপ্রথম খ্যাতিমান সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর উদ্বোধন ভাষণের পর প্রবীণ অধ্যাপক ও বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায় এক ঘণ্টা কাল প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলা ভাষার ইতিহাস ও তাহার বর্তমান অবস্থার কথা বিবৃত করেন। তাঁহার সুমধুর, হৃদয়গ্রাহী ও তথ্য-পূর্ণ অভিভাষণ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে দিন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু ও স্থানীয় বহু কবির কবিতা পাঠের পর সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে জেলা সাহিত্য সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থ-কতার কথা বলেন। শ্রীঅতুল্যচরণ দের প্রস্তাবে ২৪ পরগণা জেলা সংস্কৃতিক সংঘ গঠিত হয় এবং শ্রীসঞ্জীব-কুমার বসু ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় কাঁচরাপাড়ার এই অধিবেশন সর্ববিষয়ে সাফল্য মণ্ডিত হওয়ায় সম্মিলনের পক্ষ হইতে ও জেলাবাসীদের তরফ হইতে তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তৃতীয় দিন সোমবার সন্ধ্যায় নটসূর্য্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর উপস্থিতিতে শ্রীশশধর দত্ত ও সুবল সেনগুপ্তের পরিচালনায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত অনুষ্ঠান এবং শ্রীসুনীল সরখেলের পরিচালনায় আনন্দমঠ নাটক অভিনীত হয়। স্থানীয় কর্মী শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, শ্রীঅমিয় নাথ মিশ্র, শ্রীরাসবিহারী শাস্ত্রী, শ্রীবিজয়বসন্ত নন্দী, শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমিয়ভূষণ সরকার, শ্রীবিমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅলোক গোস্বামী, শ্রীশ্যামাধন সেনগুপ্ত, শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রভৃতির এ বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা নানাকারণে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ-সম্ভাবনা ও দেশবাসীর কর্তব্য—

গত অক্টোবর মাসে চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার পর কয় মাস অতিবাহিত হইলেও ভারত হইতে যুদ্ধ-সম্ভাবনা আজও চলিয়া যায় নাই। ভারত সীমান্তে চীনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং সেজন্য নানা স্থানে পথ নির্মাণ ও সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে; অন্যায়ভাবে চীন ভারতের যে সকল অংশ হঠাৎ আসিয়া দখল করিয়াছিল, তাহার সবগুলি স্থান সে আজও ভারতকে ফিরাইয়া দেয় নাই। বহুপূর্ব হইতে চীন-ভারতের উত্তর সীমান্তে কয়েক শত বর্গ মাইল স্থান জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়া আছে। গত ২রা মার্চ পাকিস্তানের সহিত চীনের যে সন্ধি হইয়াছে—তাহাকে পাকিস্তান চীনকে ২ হাজার বর্গ মাইল জমী উপহার দিয়াছে। ঐ জমী পাকিস্তানের নহে—ভারতের। তন্মধ্যে ৭ শত বর্গ মাইল পূর্বেই চীন দখল করিয়া আছে। ইহা ত সামান্য কথা! চীন কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ করিবার জন্য এত অধিক আগ্রহান্বিত যে তাহারা কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। চীন-ভারত সমস্যার সমাধানের জন্য একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠী যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, ভারত তাহা মানিয়া লইলেও চীন কর্তৃপক্ষ তাহা মানিয়া লয় নাই। পৃথিবীর বহু সভ্য দেশই চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের নিন্দা করিয়াছে-এমন কি চীনের একমাত্র বন্ধু সোভিয়েট রুশিয়াও চীনের এই কার্য্য পূর্ণভাবে সমর্থন করে নাই। যদি আবার চীন ভারতকে আক্রমণ করে তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বে নূতন আগুন জ্বলিবে ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিবে। ভারত অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য কম প্রস্তুত হয় নাই। ভারতবর্ষ তাহার সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ করিয়াছে, বিমান বাহিনী সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করিয়াছে এবং নূতন ৬টি অর্ডিনান্স কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছে। ভারত প্রস্তুত ছিল না, প্রস্তুত হইতেছে—ইহা ভাল কথা। কিন্তু যুদ্ধ যদি সারা বিশ্বের ধ্বংস আনয়ন করে, সে জন্য কি কেহ তাহা প্রার্থনা করিবে? কে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ভার গ্রহন করিবে—তাহাই চিন্তার বিষয়।

নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

সভায় নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত। নির্বাচনে তাঁহারা উভয়েই ৫১টি করিয়া ভোট পান এবং তাঁহাদের বিপক্ষের প্রার্থী শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপার্বতীচরণ বসু প্রত্যেকে ৯টি করিয়া ভোট পান। নূতন মেয়র শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে এম-এ ও ১৯২৮ সালে বি এল পাশ করিয়া তিনি কিছুকাল সাংবাদিকের কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। এখন তিনি হাইকোর্টের খ্যাতনামা এডভোকেট। ১৯৫২ সাল হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার আছেন। ডেপুটি মেয়র কলিকাতা কলুটোলা দত্ত পরিবারে ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া তদবধি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। তিনিও ১৯৫২ সালে প্রথম কাউন্সিলার হন। আমরা উভয়কেই অভিনন্দিত করি।

পরলোকে জগমোহন বসু—

উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রাক্তন সভাপতি, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিলার, বিশিষ্ট সমাজসেবী জগমোহন বসু ৭ই এপ্রিল রাত্রিতে তাহার বাগবাজার নিবেদিতা লেনের বাসভবনে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান কর্মী বলিয়া সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তিনি ভ্রাতা, পুত্র কন্যা, প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-সাফল্য—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ৫টি আসন শূন্য হইয়াছিল—গত ৭ই জুলাই ৫টি স্থানেই নির্বাচন হয় এবং ৮ই এপ্রিল ভোটগণনার পর জানা যায় যে ৫টি স্থানেই কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন (১) কলিকাতা চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শূন্য স্থানে আসিলেন—শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়—বয়স ৬৩ বৎসর। ২বার কলিকাতার ডেপুটী মেয়র ও ৩ বার মেয়র ছিলেন। ধনী ব্যবসায়ী—১৯৩৭ হইতে ১৯৪৬ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

তিনি আজীবন কংগ্রেস সেবক এবং কলিকাতার বহু সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। আবার এম-এল-এ হইলেন। (২) বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া কেন্দ্র হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) কম্যুনিষ্ট প্রার্থীকে হারাইয়াছেন। তিনি ছান্দার গ্রামের শ্রীশশাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র—তাহার বয়স ৪০। তিনি ১৯৪২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন—বর্ত্তমানে জেলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা। (৩) বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর কেন্দ্রে এম-এল-এ মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিকের পরলোকগমনে তাঁহার শূন্য স্থানে তাঁহার পুত্র শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক এবার নির্বাচিত হহলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর। পেশা মোক্তারী। বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও জেলার তপসীলি কমিটির সম্পাদক। (৪) স্বর্গত মন্ত্রী ডাক্তার জীবনরতন ধরের স্থানে ২৪ পরগণা বনগাঁ কেন্দ্র হইতে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী চারুশীল ধর নূতন এম-এল-এ হইলেন। তিনিও আজীবন কংগ্রেসকর্মী ও সমাজ-সেবায় বহু কাজ করিয়াছেন। (৫) পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট রাজপরিবারের এম এল-এ অজিতপ্রসাদ সিং দেও পরলোকগমন করায় তাঁহার ৩১ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীরাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ সিং দেও নূতন এম-এল-এ হইলেন। তিনি স্থানীয় খ্যাতনামা সমাজ-সেবক। আমরা সকলের জয়লাভে তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষের কথা—

গত ১৫ই মার্চ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় দুর্ভিক্ষ সাহায্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের সময় বিরোধী সদস্যরা পশ্চিম-বঙ্গে খাদ্যসংকটের ও কোন কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করিলে উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন—নানা অভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নাই—হইতে দিব না। একটি লোককেও অনাহারে মরিতে দিব না—সই প্রতিশ্রুতি দিলাম। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যাহাই বলুন না কেন, বহু দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার চাউলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছেন না। গম খাওয়া এখনও বাঙ্গালীর অভ্যস্ত হয় নাই—তথাপি লোক গম খাইতে বাধ্য হইতেছে ও সেজন্য উদরাময়ে কষ্ট পায়। কেন আজও দেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না—সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করিয়া কর্তব্যে অবহিত হইবেন কি?

পরোলোকে শ্রীমতী প্রভাবতী দত্ত

গত ১০ই মাঘ বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও হরিপদ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র ৺কার্ত্তিকচরণ দত্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রভাবতী মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যু-

প্রভাবতী দত্ত

কালে তিনি একমাত্র পুত্র ও ছয় কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আজাদ হিন্দ বাগ মহিলা সমিতির বিশিষ্টা পৃষ্ঠ-পোষক ও সভ্যা ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের দুই দিকে বিপদ—

এক দিকে চীন আক্রমণ সম্ভাবনায় পশ্চিমবঙ্গ বিপন্ন, তাহার উপর আবার পশ্চিমবঙ্গের ১৩০০ মাইল পাকিস্তান সীমান্তে পাক-সৈন্য সমাবেশের ফলে নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। গত ৪ঠা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নূতন বিপদের কথা ঘোষণা করিয়া দেশবাসীকে বলেন—শুধু নীরব দর্শক হইয়া থাকিলে চলিবে না—সকলকে এ বিষয়ে নিজ কর্তব্য পালন করিতে হইবে। পাকিস্তান সীমান্তরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়া যেমন অর্থ ও লোক সংগ্রহ দ্বারা চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে বলা হইতেছে—তেমনই পাক-সীমান্ত রক্ষায় প্রত্যেক

পশ্চিমবঙ্গবাসীর কর্তব্য স্থির করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন। সীমান্তের নিকট স্কুল, কলেজ প্রভৃতি সরাইয়া লইয়া গেলে তরুণের দল এন-সি-সি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেশরক্ষাও করিতে পারিবে। এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন।

ভিভিয়ান রিপোর্টে দেশবাসী স্তম্ভিত—

গত ১৬ই মার্চ দিল্লীতে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি সংঘের ৩৬ তম বার্ষিক সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এক চাঞ্চল্যকর কথা বলিয়াছেন। ডালমিয়া জৈন শিল্পগোষ্ঠীর কার্য্য সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে ভিভিয়ান বস্থ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট দেশবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছে—এ কথা শ্রীনেহরু প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে দেশের বাণিজ্য ও শিল্প মহল যে ক্রটী মুক্ত নয়—ভিভিয়ান রিপোর্টে তাহা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে সরকার যাহা ভাল মনে করিবেন, তাহা করিবেন। কিন্তু ধনী ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে কর্তব্য পালন প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি সকল শিল্পপতি ও ধনী ব্যবসায়ীকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা বলিব—সরকার অবিলম্বে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন—নচেৎ দেশের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হইবে না।

রবীন্দ্র অধ্যাপক নিয়োগ—

বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশন রবীন্দ্র অধ্যাপক পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ দান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মোট ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নূতন ৫টি—যাদবপুর, বর্দ্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ ও রবীন্দ্রভারতী টাকা পান নাই। পুরাতন বলিয়া কলিকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় টাকা পাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশিকে ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। উভয়েই যোগ্য ব্যক্তি—কাজেই তাহাদের নিয়োগে দেশবাসী অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। আমরা উভয়কে এই গৌরব লাভে অভিনন্দিত করি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কোন্দল—

গত ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরস্পর পরস্পরের উপর দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ করিয়া কোন্দল করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ, কৃষি মন্ত্রী শ্রীরামসুভগ সিং, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী শ্রীএস-কে পাতিল, প্রভৃতি ১৫ জন সদস্য ৪ ঘণ্টা কাল পরস্পর অপরকে নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীজহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া সকল কথাই শুনিয়াছিলেন। ঘটনাটি যেমন মর্মন্তুদ, তেমনই উহার ব্যাপকতা যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। শ্রীনেহরু কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করিবেন, তাহাই চিন্তার বিষয়। প্রবীণ ও খ্যাতিমান কংগ্রেস-নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কি মন্ত্রিসভা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়? তাহা করিয়া তরুণের দলকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ না করিলে কোন দিন এ সমস্যার সমাধান হইবে না।

পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ চিন্তার কারণ—

গত ১২ই মার্চ হইতে তিন দিন কলিকাতায় ভারত-পাক বৈঠকের চতুর্থ পর্ব হইয়া গিয়াছে। বৈঠকের শেষ হওয়ার পর দিন ১৫ই মার্চ ভারতীয় দলের নেতা সর্দার স্বর্ণ সিং সাংবাদিকদের বলেন—পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ ভারত সরকারের চিন্তার কারণ। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে মন্ত্রী পর্য্যায়ের পৃথক বৈঠক ডাকিতে উভয় রাষ্ট্র (ভারত ও পাকিস্তান) রাজি হওয়ায় তিনি আনন্দিত। কলিকাতায় পাক-দলের নেতারূপে আসিয়াছিলেন জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো। এই বৈঠকে কোন সমস্যার সমাধান হয় নাই—উভয় পক্ষ একত্র বসিয়াছিলেন মাত্র। পাকিস্তান পক্ষ কোন কথাতেই সম্মত হন না—কাজেই এই সকল বৈঠকের কোন সার্থকতা নাই। পাকিস্তান—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—নীতি অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছে। ভারত শেষ পর্য্যন্ত কি করিবে? হয় যুদ্ধ, না হয় আত্মসমর্পণ—ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

শ্রীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—

হুগলী, উত্তরপাড়া জমীদার বংশের সন্তান, আজীবন কংগ্রেসকর্মী ও জনসেবক, হুগলী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বহু ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা, দীর্ঘকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও
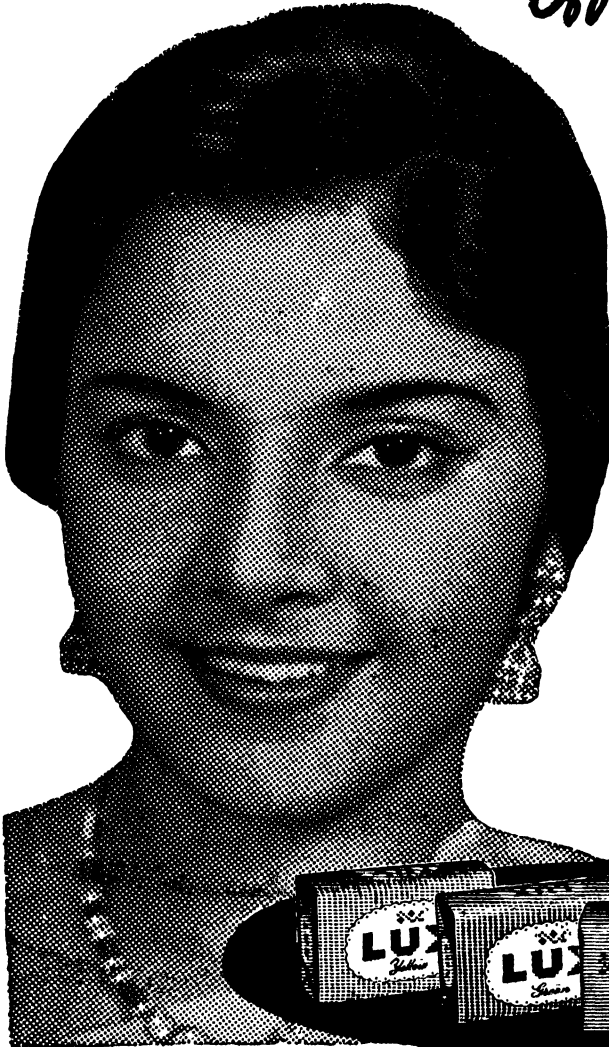
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি গত কয় বৎসর নানা রোগে শয্যাগত ছিলেন। ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন ও গান্ধীজির নেতৃত্বে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রভৃতির আজীবন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। তাঁহার মত পরোপকারী ও দুঃখীর দরদী বন্ধু খুব কম দেখা যায়। ব্যবসার দ্বারা তিনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়া দান করিতেন। প্রথম জীবনে লক্ষাধিক টাকা পিতৃ ঋণ শোধ করিয়া তিনি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার, বিশেষ করিয়া হুগলী জেলায় একজন আদর্শ মানুষের অভাব হইল।

আন্দুল হইতে ডানকুনি নূতন রেল—

গত ২৫শে মার্চ দক্ষিণ পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে আন্দুল হইতে ডানকুনি একটি নূতন ১০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হইবে। তাহাতে ৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ঐ পথে টাটানগর, রাউলকেল্লা প্রভৃতি স্থানে মাল আদান প্রদানের সুবিধা বাড়িবে। দৈনিক যাত্রীদের সুবিধার জন্য হাওড়া হইতে পাশকুড়া পর্য্যন্ত একটি তৃতীয় রেল লাইন এই বৎসরেই তৈয়ার করা হইবে—তাহার ফলে যাত্রী গাড়ীর সংখ্যা বাড়িলে যাত্রীদের সুবিধা বাড়িবে। হাওড়া জেলা নানা অসুবিধার মধ্যে ছিল—ক্রমে ক্রমে সে সকল অসুবিধা দূর করা হইতেছে। হাওড়া ষ্টেশনের পুনর্বিন্যাস তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হইবে।

লোকহিতে আত্মদান—

গত ২৪শে মার্চ কলিকাতা লালবাজারে বিকানির বিল্ডিং নামক গৃহে অগ্নিকাণ্ড হইলে দমকল বিভাগের অফিসার এণ্টনি জেম্‌স আগুন নিবাইতে গিয়া ভীষণ ভাবে আহত হন ও গত ২৮শে মার্চ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে জেম্‌সের মৃত্যু হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে হাওড়ায় ঐ ভাবে দমকল বিভাগের কর্মী শচীন বসু মারা গিয়াছিলেন। জেম্‌স তরুণ কর্মী ছিলেন—পরের জন্য তিনি জীবন দান করিয়া কর্তব্য-নিষ্ঠার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। এই সকল কর্মীর আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা জেম্‌সের পরিবারবর্গকে তাহাদের এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তির মিলন—

গত ৭ই এপ্রিল জার্মানীর এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—চীন সোভিয়েট বিরোধের ফলে রাশিয়া পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠির সহিত মিলনে উৎসাহী হইয়াছে। তত্ত্বগত মতবিরোধের ফলে রাশিয়া চীনের সহিত মৈত্রী ছাড়িয়া দিয়াছে। ভারতকে চীন-ভারত বিরোধ সত্ত্বেও সোভিয়েট সাহায্য বন্ধ না হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। তবে চীন আক্রমণ সত্ত্বেও ভারত তাহার নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে নাই। মার্কিণ ও বৃটেনের সাহায্য গ্রহণ যেমন ভারতের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, রাশিয়ার বন্ধুত্ব ও সাহায্য তেমনই প্রয়োজনীয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ আজ ভারতের বিপদে ভারতকে সর্বপ্রকারে সাহায্য দান করিতে উৎসুক। দেখা যাক, শেষ পর্য্যন্ত বর্তমান চীন-ভারত বিরোধের পরিণতি কি হয়।

নব বারাকপুর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ—

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত ও বিজ্ঞান-গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমাউন কবির গত ১৭ই মার্চ রবিবার সকালে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামের নিকটস্থ নব বারাকপুরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের নূতন গৃহের উদ্বোধন করিয়াছেন। সভায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ডাক্তার ভবতোষ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের চেষ্টায় একটি বড় জলা ও জঙ্গলপূর্ণ স্থানে শুধু নব বারাকপুর সহর স্থাপিত হয় নাই, বহু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহিত শেষ পর্য্যন্ত এই সুবৃহৎ কলেজ স্থাপিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি প্রকৃত অভাব দূর হইল। কলেজটি সোদপুর-বারাসত রাস্তার পাশে মধ্যমগ্রাম হইতে ১ মাইল ও সোদপুর হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। আমরা হরিপদবাবুর এই সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

আইউব খানের আবদার—

পাকিস্তানের নেতা ও প্রেসিডেণ্ট জনাব আইউব খাঁ

আমেরিকাকে জানাইয়া ছিলেন বর্তমানে আমেরিকা ভারতকে যে পরিমাণে সাহায্য দান করিতেছে, পাকিস্তানকে আমেরিকা যেন সেই পরিমাণ সাহায্য দান করে। কিন্তু আমেরিকা প্রেসিডেণ্ট আইউবের সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। আমেরিকা বলিয়াছে—কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হউক আর না হউক, আমেরিকা ভারতকে প্রয়োজনীয় সাহায্য তাহার সাধ্যমত দান করিবে। পাকিস্তান সম্বন্ধে আমেরিকা কি পরিমাণ সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে, তাহা আমেরিকা বলিতে পারে না। এই ঘটনা ও উক্তি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ—কারণ রাশিয়া ও আমেরিকার সাহায্য ভিন্ন, শুধু চীনের সাহায্যে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সহিত বিবাদে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে।

বৎসর-আরম্ভে

হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী,—
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
শঙ্কর কহেন,—দেবি, কোন মুখে বলি?
দূরবীণে নয়ন রাখো, জানিবে সকলি!

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

১২

সেকালের সৌখিন-জনগণের মনে কবির গান, পাঁচালি, আখড়াই-গান, হাফ-আখড়াই, নেড়ীর গান প্রভৃতি প্রমোদ-অনুষ্ঠানের নেশা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, খ্রীষ্টীয় উনবিংশ-শতকের প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তার বহু বিচিত্র-কৌতুহলোদ্দীপক পরিচয় পাওয়া যায়। পুরোণো-প্রথামতো এ সব আমোদ-অনুষ্ঠানের বৈঠক গ্রামে বা সহরে কোথাও আজকাল সচরাচর বড় একটা নজরে পড়ে না, তাই বিগত-দিনের এমনি নানা বিস্মৃত-কীর্ত্তিকলাপের কাহিনী জানবার জন্য একালে অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক-যুগের এমনি সব অনুসন্ধিৎসু-রসিকজনের কৌতুহল-নিবারণের উদ্দেশ্যে এবারে প্রাচীন সংবাদ-পত্রের তাড়া থেকে সেকালের কিছু কিছু তথ্য-বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। উনবিংশ-শতকে প্রকাশিত প্রাচীন সংবাদ-পত্রের এ সব বিচিত্র তথ্য-বিবরণ থেকে, তৎকালীন-সমাজে প্রতিভাবান কবিওয়ালা, পাচালীকার, আখড়াই ও হাফ-আখড়াই গায়ক, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেড়া-নেড়ীর নৃত্য গীত-বাদ্যশিল্পীরা যে সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করেছিলেন, তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এই সব কুশলী সঙ্গীতশিল্পীদের সেকালে রীতিমত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল—সমাজের ধনী-দরিদ্র সর্ব্ব-স্তরের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে…এমন কি, সে-যুগের সংবাদ-পত্রেও নিত্য নানা আলোচনাদি প্রকাশিত হতো এঁদের বিবিধ কীর্ত্তি-কলাপের বিচিত্র কাহিনী অবলম্বন করে। এক কথায় সেকালের বাঙালীর সমাজ-জীবনে এই সব কৃতী কবিওয়ালাদের অনেকেই সুদীর্ঘকালযাবৎ বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করেই সসম্মানে জীবন কাটিয়েছেন।

* * * * *

(সমাচার দর্পণ, ১১ই মার্চ্চ, ১৮২৬)

…ঐ [কৈকালা] গ্রামনিবাসি শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত দত্তনামক এক ব্যক্তির বাটীতে সরস্বতী পূজোপলক্ষে কলিকাতা হইতে গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণি প্রভৃতি তিন দল নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল।…

* * * ঘ *

ক্রমশঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত এই 'নেড়া-নেড়ী' কবি-ওয়ালা শিল্পীদের এবং একশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত-সৌখিন ও অপেশাদার 'সখের কবিওয়ালাদের' উদ্ভট, প্রতিযোগিতা এবং উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তার ফলে, সেকালের কিছুসংখ্যক পেশাদারী কবিওয়ালা তাঁদের অন্ন-সমস্যা সমাধানের বিষয়ে রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠে তৎ-কালীন সংবাদ-পত্রে লিখিতভাবে অনুযোগ জানিয়েছিলেন।

* * * * *

(সমাচার দর্পণ, ২২শে নভেম্বর, ১৮২৮)

সকের কবিবিষয়ক।—মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকা-প্রকাশক মহাশয়েষু নিবেদনমিদং কতক দিবস গত হইল শুনিয়াছি আপনকার চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে বিলাতি সূতার আমদানি হইয়া এতদ্দেশীয় দুঃখি বিধবা স্ত্রীলোকদিগের অন্ন গিয়াছে এবং বাষ্পের নৌকা হইয়া দাড়ি মাজি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং মৎস্য ধরার এক কারখানা স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক অতএব এইরূপ কত ২ নূতন ব্যাপার হইয়া কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে কিন্তু সংপ্রতি আমারদের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মরিয়াছেন যেহেতুক ইহারা সকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক্ত কবির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন। সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না, আমা-দিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা করিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা প্রায় সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত—কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায় হইতে প্রায় রক্ষা পাই-য়াছি কিন্তু চন্দ্রিকাকর মহাশয় এক্ষণে এই সৌকিন নেড়ারদিগের দায় হইতে কিসে রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকে তো আমারদিগকে কহিয়া দিবেন নতুবা পেটের দায়ে মারা যাই অধিক দুঃখ আর কি জানাইব।—ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।

*   *   *   *   *

শুধু যে পেটের দায়েই রেশারেশি দেখা দিয়েছিল তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনের আকাঙ্খা মেটানো আর ইজ্জত-সামলানোর তাগিদেও তুমুল বাক-বিতণ্ডা, হাতাহাতি-মারামারি, এমন কি, রক্তপাত-দাঙ্গা হাঙ্গামাও ঘটেছে সেকালের এমনি সব কবি-গানের আসরে—প্রাচীন সংবাদ-পত্রে অজ্ঞাতকুলশীল-উদ্বিগ্ন পত্র প্রেরকের চিঠি-মারফৎ সে ঘটনারও অভিনব দপ্তরে নজীর মেলে সম্পাদকের।

*   *   *   *   *

(সমাচার দর্পণ, ২৬শে মে, ১৮২১)

চৈতন্যমঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতি সুমধুর কথা।—কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেইস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী-লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটী টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে ২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিকবাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ-ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে—ইহাতে ঐ গুণ-বতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে। যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর। যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠি আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না। যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে২ কহিয়াছেন এবং আট ট্যাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী

তাহা কি দেখিস নাই। পরে স্বরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি—আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষয় হইয়া অঙ্গভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল—যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পূরাইতে পারে—দেখ সমাচারদর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব—শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভূজ পাবে সুখসিন্ধু তরি।

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।

* * * * *

পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে কবি-গানের আসরের মতোই, সেকালে আখড়া সঙ্গীতের জমজমাট-বৈঠকেও নিত্য বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী-দলের মধ্যে গানের কথা আর সুরের উত্তর-প্রত্যুত্তরদানের। তীব্র রেশারেশি আর তুমুল সংগ্রাম বেধে যেতো সেকালের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কবিয়াল-গীতকারদের এমনি সব অভিনব সঙ্গীত-সংগ্রাম গোড়াতে শান্ত-সংযতভাবে সুরু হলেও, দুই দলের মধ্যে তীব্র রেশা-রেশি বিতর্ক-উত্তেজনার উত্তরোত্তর মাত্রাবৃদ্ধির ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছুতো—নিতান্ত অশ্লীল, [illegible]

পর্য্যায়ে। সেকালের প্রমোদ-রসিক শ্রোতা-দর্শকদের কাছে কিন্তু এ সব গালিগালাজ, খেউড় আর অশ্লীল-ব্যঙ্গোক্তিই ছিল পরম-উপভোগ্য বিলাস··প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালদের উত্তেজনা-আক্রোশ, রেশারেশি বাক-বিতণ্ডা, গালিগালাজ-অশ্লীল-ব্যঙ্গোক্তি ক্রমশঃ যত চড়া-পর্দ্দায় আর চরমে উঠতো, সেকালের শ্রোতা-দর্শকদের উৎসাহ-আনন্দও বৃদ্ধি পেতো তেমনি পরিমাণে! শালীনতা-ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিয়ে মদোন্মত্ত কবিয়াল ও আখড়া-সঙ্গীত প্রতিদ্বন্দ্বী যত বেশী অশ্লীলতা ও অভদ্রতা প্রকাশ করতেন, সেকালের রসিক শ্রোতা-দর্শকেরা ততই উল্লসিত ও মুগ্ধ হতেন সেই উৎকট-আনন্দ-মদিরা পান করে···কুশলী-কবিওয়ালা-দের গুণপণার তারিফ করে তাঁরা অকাতরে মুঠোমুঠো অর্থ-অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ উপঢৌকন 'প্যালা' দিতেন এই সব বিচিত্র প্রমোদানুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকরূপে এমনি ছিল তখনকার আমলের লোকজনের রুচি এবং সামাজিক রীতি!

* * * * *

(সমাচার দর্পণ, ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩২)

আখড়া সংগ্রামবিষয়ক।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয় আমারদিগকে লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তররামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্রা করিয়াছিলেন সে সম্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে গত ৩ মাঘ রবিবার বুল্ বুল্ লড়াই হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি। সে যাহা হউক গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের বাটীতে বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহনচাঁদ বসু এবং যোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন কি না—যদি প্রকাশ করেন তবে জয় পরাজয় লিখিয়া দিবেন।

আমরা ঠাকুরবাবুর কৃত যাত্রার সম্বাদ যে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ ঐ বিষয় এদেশে নূতন [illegible]

গরে বহুকালাবধি হইতেছে—অতএব তাহার বৃত্তান্তশ্রবণে কাহার তুষ্টি আছে ঐ বিষয় যে ব্যক্তি চক্ষে দেখেন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করেন তাঁহারি সুখানুভব হয়। যাহা হউক চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের অনুরোধে আখড়ার বিষয়ে আমরা যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক আপন বাটীতে তাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিতা ত্রিলোকজননী পতিতপাবনী শ্রীশ্রী৺ সিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান দিনে মহাঘটা করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন। শুনিলাম নিমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাকা আর রবাহূতদিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি ঐ সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ সুরসিক গায়কদিগকে আহ্বান করিবাতে তাঁহারা উভয় দলে সসজ্জ হইয়া আসিয়াছিলেন, আপন ২ ক্ষমতানুসারে বিবিধ যন্ত্রের বাদ্যকরত অপূর্ব্ব সুস্বরে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্তু ইহা প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না। এজন্য অনেকেই কহেন নিম-আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ-আখড়ার লড়াই হইয়াছিল। যাহা হউক তাহারদিগের গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিদিগের গানের ও সুস্বরের প্রশংসা অনেকে করিয়াছেন; যোড়াশাঁকোনিবাসিদিগের সুরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের প্রশংসাও হইয়াছে—ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনচাঁদ বসু প্রথমে গলায় ঢোল বান্ধিয়া নিশান তুলিয়া রাজপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়াসাঁকোনিবাসিরা আর এক গীত অতিউচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ঢোল বান্ধিয়া বড় এক ধ্বজা তুলিয়া বড় রাস্তায়২ বেড়াইয়া স্বস্থানে গমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন—আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা লিখিলাম।—চন্দ্রিকা।

*   *   *

সেকালের অভিনব-সঙ্গীতানুরাগী রসিক-সমাজে কবিওয়ালাদের জনপ্রিয়তা যে কতখানি গভীর ও ঐকান্তিক ছিল, তারও প্রচুর নিদর্শন মেলে প্রাচীন সংবাদ পত্রে—তখনকার যুগের বিশিষ্ট-কলাকুশলী খ্যাতনামা-কবিয়াল হরু ঠাকুর, নীলু ঠাকুর ও দাশরথি রায় প্রভৃতির লোকান্তরিত হওয়ার শোক-সংবাদ প্রকাশে আর ঐ সব সাময়িক-পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে সন্তপ্ত-শোকাভিভূত অনুরাগী-ভক্তদের পত্র-প্রেরণের আগ্রহে!

*   *   *   *   *

(সমাচার দর্পণ, ২১শে আগষ্ট, ১৮২৪)

মরণ।—২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যানিবাসি হরুঠাকুর পরলোকগামী হইয়াছেন—এঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক ইনি [illegible] বাঙ্গালা কবিতাতে [illegible]র অগ্রগণ্য ছিলেন।

*   *   *

(সমাচার দর্পণ, ১৯শে নভেম্বর, ১৮২৫)

মৃত্যু॥—শুনা গেল যে গত ২৬ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যানিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুই ভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক—তাহার মধ্যে নীলুঠাকুরের ঐ দিবস ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদে অনেকের মহাদুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গানদ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন ইঁহারদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সংপ্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলুঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন। এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে সুখের ব্যাঘাত হইল সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে।—তিং নাং

*   *   *

(সমাচার দর্পণ, ২৬শে নভেম্বর, ১৮২৫)

গত সপ্তাহে আমরা নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি শুনা গেল যে লক্ষ্মীকান্ত

কবিতাওয়ালার পুত্র নীলমণি কবিতাওয়ালাও ৩০ কার্ত্তিক সোমবার জরবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

*　　*　　*

(সংবাদ প্রভাকর, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৫৭)

··সম্পাদক মহাশয়! আমি গভীর শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া মহাশয়ের পাঠকপুঞ্জের বিদিতার্থে প্রকাশ করিতেছি যে মোং বাঁদমুড়া নিবাসি গুণরাশি পরম ধর্ম্মপরায়ণ, কবিকুলাগ্রগণ্য, দ্বিজোত্তম, বিপ্রকুলদীপ দাশরথি রায় মহাশয় গত ১ কার্ত্তিক শুক্রবাসরে সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺ভাগীরথী তীরে এতন্মায়ামণ্ডিত ভৌতিক দেহ পরিহার পুরঃসর যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। আহা! সম্পাদক মহাশয়, এতদিনে বঙ্গভূমিকে শোকরূপ তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ দাশরথি রায়ের প্রকাশিত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অলঙ্কারযুক্ত কবিতা রূপ শশাঙ্ক অস্তাচলে গমন করিলেন।···

*　　*　　*

সিনেমা-হল প্রভৃতির কোনোরকম পাকাপাকি বন্দোবস্ত ছিল না। সেকালের লোকজন তাই নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রার পালাভিনয় দেখবার নেশায় রীতিমত আগ্রহান্বিত ছিলেন। সেকালের এই সব যাত্রাভিনয়ের পালা কি ধরণের হতো—প্রাচীন কেতাবে তারও বহু নিদর্শন মেলে।

*　　*　　*

(দুর্গাচরণ রায় রচিত ‘দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন’ গ্রন্থ হইতে)

“···ক্রমে বাজার লোকে লোকারণ্য। বার-ইয়ারিতলায় যাত্রা বসিয়াছে। খুলীরা “ঘা ঘিচা” “ঘা ঘিচা” শব্দে খোল বাজাইতেছে। পিতামহ “উপ! ওঠ্—যাত্রা শুন্তে যাই” বলিয়া উপকে তুলিলেন এবং সকলে আসরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

কালিঘাট হইতে ফিরিবার পথে—

(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি)

কবি-গান, পাঁচালি, আখড়া-গানের মতোই সেকালের লোকজনের যাত্রাভিনয়ের পালা দেখারও রীতিমত ঝোঁক ছিল। উনবিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত এদেশে তখনও পেশাদারী থিয়েটার-রঙ্গালয় বা একালের

তাঁহারা গিয়া বসিবার অব্যবহিত পরেই সাজানো কৃষ্ণ আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বরে পেটে প্লীহা ও যকৃৎ হওয়ায় পেটটা মোটা হইয়াছিল। গাত্রের বর্ণ প্রকৃতই কৃষ্ণ। পরিধানে ছেঁড়া নেকড়ার পীতধড়া।

বক্ষে খড়ি-মাটির ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন! মস্তকে শোলার চূড়া। হস্তে বাঁশীর স্থলে একগাছি লাল ছড়ি। ছোঁড়াটা আসিয়া দেবগণের সম্মুখে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া দেবগণ হাস্য করিতে লাগিলেন; নারায়ণ কিছু লজ্জিত হইলেন! এই সময় খুলীরা আবার বাদ্য আরম্ভ করিল—"তাক্ তাক্ তাক্তা ঘিনা—ঘিচাং ঘিনা তাক্তা ঘিনা"—অমনি কৃষ্ণ মুখে হাত দিয়া "আয় আবু আবু ধবলি! মা ননী দে!"—শব্দ করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পিতামহ নৃত্য দেখিয়া হাসিয়া লুটিয়া পড়িলেন। নারায়ণের কানে কানে কহিলেন, "ভাই, পেটের জ্বালা ধরলে তুমি কি ঐ বেশে ঐরূপ নৃত্য করে ননী চাহিতে?"

নারা। বাঃ! তা চাব কেন? বাঙ্গালীদের বড় অন্যায়! আমাকে তাহারা দেবতা ব'লে পূজো ক'র্‌তেও ছাড়ে না, আবার স্থল বিশেষে সং সাজিয়ে বানর-নাচও নাচিয়ে থাকে।

এই সময়ে আটচালার বাহিরে একপাল ছেলে গান ধরিল। ক্রমে দলটা গান করিতে করিতে আসরে আসিয়া দেখা দিল। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপ-কামান স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ দূতীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আসরে আসিয়া এইভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সাজান কৃষ্ণ উঠিয়া এক প্রান্ত হইতে কহিল, "বিন্দে ও বিন্দে! বলি কথা কও"—"দূতি, দূতি! বলি কথা কও; দুটো কথা কওয়ায় দোষ কি? বিন্দে ও বিন্দে—"

বিন্দে অমনি চক্ষু দুটী ঘুরাইয়া, ডাইনে বাঁয়ে সেই সমস্ত ললিতা বিশাখা প্রভৃতিকে লইয়া লণ্ঠনের দিকে চাহিয়া দুই হস্ত বিস্তার করত দেবগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি মৃদু স্বরে গান ধরিল—

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা;
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।

(পুনশ্চ ঘাড় হেঁট করিয়া হস্ত নাড়িয়া অতি সজোরে)

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা;
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।
ক'র্‌লে তোমার নাম, হয় হে দুর্নাম,
সে বদনামে শ্যাম, তোলা যায় না মাথা॥
কইলে কথা যদি কেহ দেখতে পায়,
কিম্বা লোকমুখে যদি শুনতে পায়,
যে প্রকারে হউক যদি প্রকাশ পায়,
হব নিরুপায়, সে বড় লজ্জার কথা॥

শ্রোতৃবর্গ এই সময় চতুর্দ্দিক হইতে "হরি হরি বল ভাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

* * * *

…প্রাতে দেবতারা গঙ্গাস্নান করিয়া মগরা অভিমুখে চলিলেন! তাঁহারা বারোয়ারি তলার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন—লোকে লোকারণ্য, সকলেই একবাক্যে কহিতেছে—গান বড্ডো জমেছে। তাঁহারা শুনিলেন—আটচালার মধ্যে বালকগণ নাচিতে নাচিতে এইগানটী ধরিয়াছে—

আর আমি যাবনা সখি! যমুনার জলে।
নিতান্ত লম্পট কৃষ্ণ কলসী দেয় ফেলে;
দূতি কাঁকের কলসী দেয় ফেলে॥
… … … …

* * * *

কথা কহিতে কহিতে দেবগণ বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন। তৎপর দিন উঠিতে তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইল। যখন সকলে উঠিয়া মুখ হাত ধৌত করিতেছেন। তখন পিতামহ কহিলেন, "বরুন! ঢোলকের বাদ্য বাজে কোথায়?

বরুণ। বারইয়ারিতলায় বোধ হয় যাত্রা হইতেছে, শুনিতে যাইবেন?

ব্রহ্মা। হানি কি? মর্ত্ত্যে আর কিছু থাক্ না থাক্ রং তামাসা বিলক্ষণ আছে। নারায়ণ চল, গান শুনে আসি।

নারা। আমি আর যাব না, আপনারা যান।

ইন্দ্র। তুমি যাবে না কেন?

নারা। গিয়ে কি ক'র্‌বো? হয়ত গিয়ে দেখ্‌বো

কতকগুলো ছেলেকে কৃষ্ণ-রাধিকা সাজিয়ে ননী মাখন চুরী করাইতেছে।

বরুণ। না—না—আধুনিক দলে ওসব নাই।

নারা। যে দলটার গান হ'চ্ছে, আধুনিক কি সাবেক—তুমি কেমন করে জান্‌লে?

বরুণ। সাবেক হইলে ঢোলের শব্দের পরিবর্তে খোল-করতালের খচামচ শব্দ হইত।

নারা। তবে চল!

সকলে যাত্রা শুনিতে যাইয়া দেখেন—আসরটা যাত্রার দলেই পরিপূর্ণ। সকলের সাজ পোষাকও চমৎকার। এই সময় বালক "অভিমন্যু" সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ ও তৎসহ খেদ উক্তি করিতেছিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ যাত্রার দলটী ত মন্দ নহে। ইহারা থিয়েটারের ন্যায় সুন্দর অভিনয় করিতেছে। তদ্ভিন্ন থিয়েটারে পয়সা খরচ ব্যতীত কেহ দেখিতে কিংবা শুনিতে পায় না, ইহাদের অবারিত দ্বার। ইহাদিগের দ্বারা বোধ হয় বঙ্গভাষারও সমূহ উন্নতি হইতেছে। কারণ,ইতর শ্রেণীর মধ্যেও ইহা দ্বারা ক্রমে সাধুভাষা প্রচলিত হওয়া সম্ভব।

যতক্ষণ না যাত্রা ভাঙিগল, দেবগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেন। অভিনেতাদিগের মূর্চ্ছা যাওয়া দেখিয়া সকলে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "ইহাদের আমি এই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, দাঁড়াইয়া সটাং মূর্চ্ছা যাইতেছে, অথচ আঘাত পাইতেছে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ প্রকার যাত্রার দল কতগুলি আছে এবং দলটির অধিকারী কে?

বরুণ। এ প্রকার যাত্রার দল সম্প্রতি অনেক হইয়াছে; অনেক ভদ্রলোক চাকরীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাত্রার দল করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রজমোহন রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র উকীল, মতিলাল রায়, বৌ-কুণ্ডু এবং যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি দল শ্রেষ্ঠ। যে দলটীর গান শুনিলেন, ইহার অধিকারীর নাম ৺ব্রজমোহন রায়। ইঁহার নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় থানার সন্নিকটস্থ চাদড়া নামক একটী পল্লীগ্রামে। ইঁহার প্রথমে একটী পাঁচালীর দল ছিল, কিন্তু অপর দলের সহিত লড়াই হইলে তাহারা অত্যন্ত পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দিত বলিয়া ব্রজ রায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপী রায়ের পরামর্শে এই দলটী করেন। ইঁহার নূতন সুরে গান বাঁধিবার ক্ষমতা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর অবধি গোপীমোহন রায় দল চালাইতেছেন।

* * * *

[ক্রমশঃ
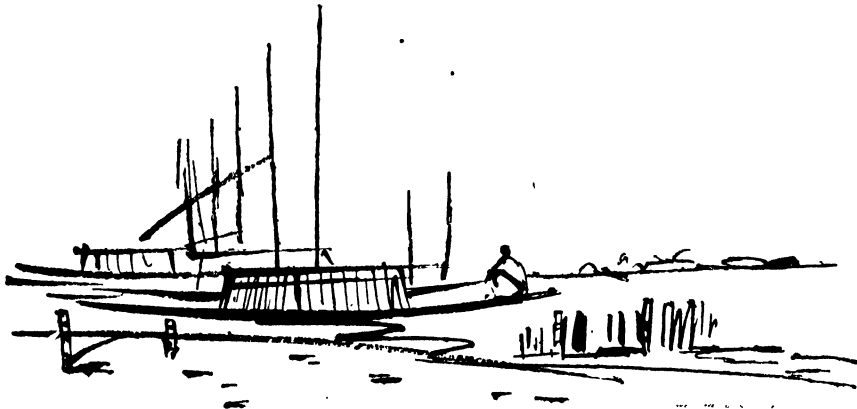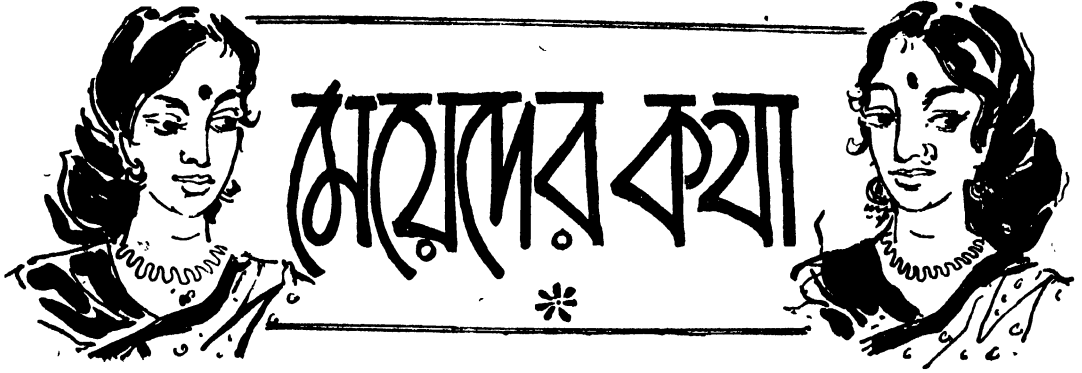
কথার কথা

শৈলদেবী চট্টোপাধ্যায়

অনেক বিবাহিতা মেয়েদের অভিযোগ করতে শোনা যায় যে তাঁদের স্বামীরা তাঁদের নাকি সব কথা সব সময় বলেন না। অনেক ক্ষেত্রেই এই অভিযোগ হয়ত সত্য, কিন্তু এর কারণও কিছু আছে আর সেটি হচ্ছে মেয়েরা নিজে-রাই সব সময় তাদের স্বামীদের কথা ভাল করে কান দিয়ে শোনে না, মন দিয়ে গ্রহণও করে না। পুরুষেরা খুব উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ অবস্থায় থেকেও তাঁদের স্ত্রীদের কাছে অনেক সময় মুখ বন্ধ করে থাকেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ ভালো করে স্বামীদের কথা শোনেন না। বিয়ের আগে মেয়েদের নানা রকম উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। কি ভাবে চলতে হবে, কি রকম ব্যবহার করতে হবে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে, ইত্যাদি নানা উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ কখনও সতর্ক করে দিয়ে বলেনা—কি ভাবে স্বামীর কথায় মনোযোগী হয়ে তাঁর সোহাগ লাভ করে সুন্দরভাবে জীবন গড়ে তুলতে পারা যায়। আজও পর্য্যন্ত কেউ লেখেনি একমাত্র স্বামীর কথা শোনার কৌশলটী কেমন করে আয়ত্ত করতে হয়।

বহু পুরুষই বাড়ীতে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলা পছন্দ করে থাকেন, আর স্ত্রীরাও খাঁটি সঙ্গিনী হোতে পারেন ঠিক মত স্বামীর কথা কান দিয়ে শুনে—পারেন স্বামীর মনো-ভাবের ধ্বনি-বাহিকা হোতে। তাঁর সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে সহানুভূতি-সম্পন্না হয়ে তিনি পরামর্শ দাত্রী হোতে পারেন আর তাঁর সহজ জ্ঞানের মাধ্যমে স্বামীর মনে আলোকসম্পাতও করতে পারেন। তবে যে স্ত্রী স্বামীকে সদাসর্ব্বদাই বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে তোলেন তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই এ সব কিছু আশা করা চলে না।

এই সমস্যার নিম্নে রয়েছে কতকগুলি মৌলিক যৌন-পার্থক্য। শিশু-চিকিৎসকরা বলেন যে, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কথা ফুটে ওঠে তাড়াতাড়ি—আর সেই যে ছেলেবেলা থেকে এদের কথা বলা সুরু হয় তা আর সহজে থামতে চায় না এবং তা থামাতে যাওয়াও মুর্খতার পরি-চায়ক। এই সত্যতা থেকে গড়পড়তা হিসাব ধরে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণতঃ মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত ধীরে কথা বলে এবং বলার আগে সতর্ক হয়ে ভেবে নেয় কি বল্‌তে হবে। এসব কিন্তু অধীর স্ত্রীলোকের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, যেন তার গায়ে বিছুটি বুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরূপ সে অনুভব করে।

আবার পুরুষেরা যখন বাড়ীতে তিক্ত মেজাজ নিয়ে ফিরে আসে, তাদের স্ত্রীরা, যারা সারাদিন ধরে বাড়ীতে থাকে সঙ্গীহীনা হয়ে, কারো সঙ্গে কথা বল্‌তে পায়না—এই সব নীরব নিঃসঙ্গ নারীরা প্রকৃত পক্ষে তখন স্বামীর কথার তালে তাল দিয়ে কান খাড়া করে বসে থাক্‌তে পারে না—পারে না স্বামীর কথা শুনবার জন্যে ধৈর্য্য ধারণ করতেও। স্বামী বাড়ী ফিরলেই বধূ ছুটে যায়

স্বামীর কাছে মুখের বাঁধন আলগা করে। কিন্তু স্বামীর হয়ত কোন কথা তখন 'ভালো লাগেনা, তিনি একটু চুপচাপ শান্তসংযত অবস্থায় থাকতে চান। হয়ত তিনি চান—কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলুক, কিন্তু মেয়েলি মার্কা কথা শুনে শুনে তিনি এরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন যে এসব মেয়েলি কথায় সায় না দিয়ে মুখবন্ধ করেই বসে থাকেন। ওদিকে এই নিস্তব্ধতা ও উত্তাপহীন সাহচার্য্যে বধূরাও জ্বলে ওঠেন আর হয় অশান্তির সৃষ্টি।

মেয়েদের কথাবার্ত্তা বলার ধরণও ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণতঃ দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে একজনের কথা শেষ না হোতে হোতে অপর একজন বাধা দিয়ে বসে। তাই দুটি স্ত্রীলোকের ভেতর যখন কথা চলে তখন মনে হয় যেন কথার উন্মত্ত ঘোড়দৌড় চলেছে,—উভয়ের মধ্যেই চেষ্টা চলে কে অপরের কথাটা বলের মত ছিনিয়ে নেবে। এ স্বভাব পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও মেয়েদের যায় না। "কি সুন্দর" হঠাৎ চেঁচিয়ে কেউ বলল। তারপরই 'আমার মনে পড়ছে, সুমিতাকে বলেছিলাম—' কিন্তু কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় রেখে আবার এ বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে আসা হল, সঙ্গে সঙ্গে এলো গয়লা, সিনেমার গল্প, আর একদল পাড়া-প্রতিবেশী। তারপর কথা চলতে থাকে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন 'হ্যালো, ট্রেণ কি আসতে দেরী করেছে?' 'খুব ভিড় ছিল? 'কখন পৌছুল' 'সঙ্গে কে ছিল?' ইত্যাদি···চলল।

পুরুষদের কাছে মেয়েদের এ ধরণের কথাবার্ত্তা মোটেই প্রীতিপ্রদ হয় না। তাই অনেক সময়েই তাঁরা চুপচাপই থাকেন, তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করেন না, পাছে অশান্তির সৃষ্টি হয় বলে। কিন্তু স্ত্রীরা অত সহজে সন্তুষ্ট হবার পাত্র নন। তাঁরা চান তাঁদের স্বামীরা যেন সব সময়েই তাঁদের সঙ্গে বক্‌বক্ করেন। এছাড়াও সব বিষয়েই মেয়েদের কৌতূহল আছে, গুপ্তবিষয় জানবার আগ্রহও খুব। অনেক পুরুষের চাকুরি গেছে, অনেকে বিপদে পড়েছে, বহু লোকের জীবনের সম্পূর্ণ কার্য্যগতি নষ্ট হয়ে গেছে, শুধু পেট্-পাতলা স্ত্রীর জন্যে। সুতরাং কথাবার্ত্তার ব্যাপারে মেয়েদের শিষ্ট, সংযত, ও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। স্বামীদের মনোভাবের প্রতি থাকা চাই দরদ। শুধু স্বার্থপরের মত নিজেদের কথা শোনানর অভ্যাস্ ত্যাগ করে স্বামীদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তার উত্তর দিতে হবে। শুধু হাউহাউ করে উল্টো পাল্টা বক্‌লেই বা বিরক্তিকর অনুযোগ, অভিযোগ করলেই চলবে না। তাতে শুধু স্বামীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়াই হবে—তিক্ততারও সৃষ্টি হবে। মনে রাখতে হবে স্বামীদের কাছ থেকে স্ত্রীরা যেমন সুন্দর, মিষ্ট কথার নির্ঝরিণী চান তেমনি স্বামীরাও চায় স্ত্রীদের কাছ থেকে শোভন, সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যালাপ। দেওয়া আর নেওয়া নিয়েই চলছে এ সংসার। ভাল কিছু পেতে হলে দিতেও হবে ভালই তার প্রতিদানে তবেই সংসারে আসবে সুখ, সামঞ্জস্য, শান্তি।

—

একটু খেয়াল

অঞ্জলি চক্রবর্ত্তী

সুঁচ ও সুতো সামান্য দুটি উপকরণ—অথচ এই সামান্য জিনিষ দু'টির ব্যবহারের অভাবে দেখা যায় অনেকের বাড়ীতেই বহুবিধ অসুন্দর ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। চোখ ও মনকে খোলা রেখে সামান্য কুড়েমী ত্যাগ করলেই কিন্তু এর প্রতিকার করা চলে।

অনেকেই আছেন যাঁদের ব্লাউজের বোতাম খুলে গেলে আবার পরে বোতাম শেলাই করতে কুড়েমী বোধ করেন। তাই দিনের পর দিন সেফ্‌টিপিন্ ব্যবহার করে কোন রকমে কাজ চালিয়ে যান। সেফটিপিন্ ব্যবহারে ব্লাউজটি ক্ষত বিক্ষত,—সময় বিশেষে সেফ্‌টিপিনের অভাবে তিন খানার প্রয়োজন একখানাতেই চালান, ফলে অসুন্দর ও অসুবিধার সৃষ্টি। একটু কষ্ট করলেই কিন্তু এটা আর হয় না।

এটা রেডিমেডের যুগ। কেনা ব্লাউজ ব্যবহারই আজকালকার রীতি। এ সব ব্লাউজের শেলাই অনেক সময় মজবুত হয় না—কয়েকদিন ব্যবহারেই নানা জায়গায় শেলাই খুলে যায়। সময় থাকতে একটু শেলাই করে নিলেই হয়। কিন্তু সে সময় সে ইচ্ছা অনেকেরই হয় না—তাই নির্বিকারচিত্তে শেলাই খোলা ব্লাউজই ব্যবহার করেন। অনেক কেনা ব্লাউজ লম্বায় ছোট হয়—প্রায়ই

দেখা যায় কোমর হতে ব্লাউজ উঠতে বসতে কাজ করতে উঠে যায়। কেউ কেউ ব্লাউজের কোন্ দু'টো ধরে গেরো দিয়ে ব্লাউজকে টাইট করার প্রয়াস করেন—দুটোই কদর্য হয়ে চোখে পড়ে। এক চিল্‌তে কাপড়, অভাবে শাড়ীর পাড় লাগিয়ে নিলেই কিন্তু এটা হয় না।

এতো গেল নিজেদের ব্যাপার। এদের বাড়ীর দিকে তাকালেও তাই দেখব। ছেলে মেয়ের জামা প্যান্টে বোতাম নেই, ইজেরে দড়ি নেই। বোতামের কাজ সেফ্‌টিপিন্ দিয়ে, আর দড়ির কাজ গেরো দিয়েই ছেলে-মেয়েরা চালাচ্ছে। সামান্য একটু সংস্কারের অভাবে দেখবেন অনেক বাড়ীর ছোট ছেলে বাঁ-হাতে প্যান্টখানা সদাই ধরে রয়েছে—নইলে যে ওকে দিগম্বর হয়ে থাকতে হবে। দু'টো বোতাম লাগিয়ে দেবার কুড়েমীর জন্য বাড়ীর ছেলেরা ফুল হাতা সার্ট হাত না গুটিয়ে পরতে পারে না (অবশ্য এ ব্যাপারে অনেক সময় শৌখীনতাও থাকে ; তাদের কথা বাদ)। যদিও বা কেউ বোতাম লাগিয়ে দিলেন তো দেখা যাবে শুধু একটু খেয়ালের অভাবে সে বোতামে সামঞ্জস্য বজায় থাকেনি। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলছি, বোধ হয় অবান্তর হবে না। একবার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ছিলাম। ভদ্রলোক হেডমাষ্টার—শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁর মেয়ে আমারই সমবয়সী—তখন কলেজে আই, এ পড়ে। ভদ্রলোক কোথাও যাবেন, মেয়েকে বল্‌লেন—তাঁর পাঞ্জাবীতে একটা বোতাম লাগিয়ে দিতে। মেয়ে তাই করল। গস্তব্যস্থল হতে ফিরে ভদ্রলোক পাঞ্জাবীখানা দেখালেন—দেখলাম তাঁর মেয়ে সাদা পাঞ্জাবীতে একটি প্যান্টের রঙ্গীণ ছোট বোতাম লাগিয়ে দিয়েছে। অবাক হলাম—একে সৌন্দর্য্য বোধের অভাব ছাড়া আর কি বলব ?

অনেক বাড়ীতে প্রায়ই সকালে মায়েদের বল্‌তে শুনবেন,—"তোরা কি বিছানায় যুদ্ধ করিস ?" অর্থাৎ বিছানা ঠিক করতে গিয়ে তিনি দেখেন, ছেড়া বালিশ বা তোষকের তুলো ঘরময়, বালিশের ওয়াড় অর্দ্ধেকটা লাগান বাকীটা ঝুলছে। কিছুই নয়—ছেড়া জায়গাগুলো একটু সেলাই করে দিলে কিংবা বালিশের ওয়াড়ে দু'টো বোতাম বা সরু ফিতে লাগান থাকলে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি

বাজার কোরতে যাবার সময় বাড়ীর কর্ত্তা রোজই রাগারাগি করেন। কি ব্যাপার ? বাজারের থলির ফিতে ছিঁড়ে গেছে—গিন্নীকে বলে বলে তার সংস্কার করাতে পারেননি। রোজই অসুবিধা হয়, বাজার বয়ে আন্‌তে আর তাই রাগ। একদিন একটু ধৈর্য্য ধরে ১০।১৫ মিনিট সময় ব্যয় করলেই কিন্তু এ রাগারাগির আর দরকার হয় না।

এ রকম ছোটখাট ঘটনাতো অহরহ আমাদের ঘরে ঘরে ঘটছে। অথচ এর মূলে রয়েছে কেবল সামান্য খেয়ালের অভাব। একটু খেয়াল করে সামান্য কুড়েমীকে ত্যাগ করতে পারলেই কিন্তু সংসারের অনেক জিনিষ কেবল সুবিধাজনকই নয়, সুন্দরও হয়ে উঠতে পারে।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে, রঙীণ-কাপড়ের তৈরী পর্দা, চাদর, শাড়ী প্রভৃতি পুরোনো ও জীর্ণ হয়ে গেলে, সংসারের নিতান্ত অনাবশ্যক-জঞ্জাল হিসাবে এগুলিকে সচরাচর বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু এমন অনেক সুগৃহিণী আছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে এ সব পুরোনো-অব্যবহার্য্য রঙীণ-কাপড়ের সামগ্রী-গুলিকে সযত্নে বাক্সে-আলমারীতে সঞ্চয় করে রাখেন। এই রীতি অনুসরণের দৌলতে তাঁরা শুধু যে অসময়ে সংসারের বহুবিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা অ... অনর্থক-

কর্মের অবসরে পুরোনো-অনাবশ্যক এমনি সব রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে নিপুণ-কৌশলে নানা ধরণের বিচিত্র-সুন্দর সৌখিন-অথচ-নিত্য-প্রয়োজনীয় কারুশিল্প-সামগ্রী বানিয়ে ঘরের শ্রী-সৌষ্টবও বাড়িয়ে তোলেন অনেকখানি। এমনিভাবে রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে নানা রকমের সৌখিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করেছি···এবারেও তেমনি-ধরণেরই আরেকটি কারুশিল্পের অভিনব সামগ্রী বানানোর হদিশ দিচ্ছি।
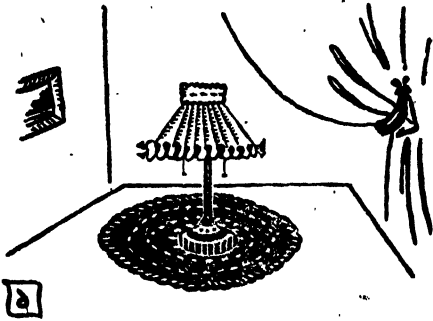
উপরের ছবিতে টেবিলের উপরে রাখা বিজলী-বাতি-দানের নীচে রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে বোনা সুদৃশ্য-ছাঁদের যে বিচিত্র-গোলাকার আসন বা 'টেবিল-ঢাকা' অথবা 'আচ্ছাদনী-মাদুরের' (Braided Table-mat) দেখছেন, সামান্য চেষ্টা করলেই নিতান্ত-ঘরোয়া অল্প কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে খুব সহজে নিজের হাতে এ ধরণের অভিনব কারুশিল্প-সামগ্রী বানিয়ে তুলতে পারবেন। সুষ্ঠুভাবে হাতের কাজ করে কি উপায়ে এই ধরণের 'বিচিত্র-ছাঁদের 'টেবিল-ঢাকা' বা 'আচ্ছাদনী-মাদুর' বানানো সম্ভব—আপাততঃ তারই কলা-কৌশলের পরিচয় দিই। তবে সে কলা-কৌশলের কথা আলোচনা করবার আগে, এ-ধরণের কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার জন্য সামান্য যে কয়েকটি উপকরণ দরকার, প্রথমেই তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। এ কাজের জন্য চাই—পছন্দমতো-রঙের ও লম্বা-আকারের কয়েকটি সুতী, রেশমী অথবা পশমী কাপড়ের টুকরো, একখানা ভালো কাঁচি, সরু, মোটা ও মাঝারি গড়নের গোটা দুই-তিন কাপড়-সেলাইয়ের ছুঁচ আর প্রয়োজনমতো রঙের কয়েক বাণ্ডিল সুতো।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে, কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে হাত দিতে হবে। প্রথমেই বিভিন্ন রঙের কাপড়ের টুকরোগুলির প্রত্যেকটিকে প্রয়োজনমতো মাপে, সমান-আকারে ও ফিতার মতো লম্বা-ছাঁদে আলাদা-আলাদাভাবে এবং সরু-সরু-ধরণে 'ফালি' (strips) করে ছিঁড়ে ফেলুন। এবারে নীচের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো
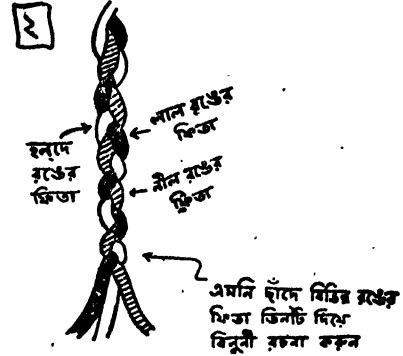
রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সদ্য-ছেঁড়া সমান-মাপের ও আলাদা-আলাদা তিন রঙের, অর্থাৎ লাল, নীল, হলদে—বিভিন্ন রঙীণ-কাপড়ের লম্বা-ফিতা তিনটিকে বিনুনীর-ছাঁদে নিখুঁত-ধরণে একত্রে বুনে ফেলুন তারপর ঐ সদ্য-বোনা কাপড়ের বিনুনীর দু'দিকের প্রান্তভাগ দুটিকে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় দিয়ে পাকাপোক্তভাবে সেলাই করে জোড়া দিন। প্রথম-বিনুনীটির দুইদিকে প্রান্তভাগ সেলাই হয়ে গেলে, সেটিকে সযত্নে আলাদা সরিয়ে রেখে, পুনরায় উপরোক্ত-প্রথায় অন্য রঙের আলাদা-আলাদা তিনটি কাপড়ের ফিতা নিয়ে ঐভাবেই বিনুনী বেঁধে ফেলুন এবং সেটির প্রান্তভাগ দুটি ছুঁচ-সুতো দিয়ে প্রথম-ফিতাটির মতোই পাকাপাকিভাবে সেলাই করে একত্রে জুড়ে নিন। এমনি পদ্ধতিতে বার-বার তিন-তিনটি করে অন্যান্য রঙের আলাদা-আলাদা লম্বা-সরু কাপড়ের ফিতা দিয়ে আরো কয়েকটি বিনুনী বেঁধে ফেলুন এবং সেগুলির প্রত্যেকটির উভয়-দিকের প্রান্তভাগ পূর্ব্বোক্ত-প্রথায় ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় দিয়ে মজবুতভাবে সেলাই করে নিন।

এইভাবে রঙীণ-কাপড়ের ফিতা দিয়ে বেশ অনেকগুলি 'বিনুনী' রচিত হবার পর নীচের ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি-ছাঁদে 'চক্রের' (Round

Disc) মতো গোলাকারে পাক দিয়ে জড়িয়ে ফেলুন। এমনি-ধরণের গোলাকারে জড়ানোর সময়, আলাদা-আলাদা রঙের কাপড়ের ফিতা দিয়ে বানানো প্রত্যেকটি 'বিনুনীকেই লম্বালম্বিভাবে একের 'শেষ-প্রান্ত' অর্থাৎ 'ল্যাজের' দিকের (Tail-end) সঙ্গে অপরটির 'গোড়ার-প্রান্ত' অর্থাৎ 'মুখের' দিকটি (Top-end) ছুঁচ-সুতোর 'টাঁকা-সেলাই' (Basting) দিয়ে পাকাপোক্তভাবে একত্রে গেঁথে দিন—তাহলে ব্যবহারকালে কোনো বিনুনীটিই সহজে খশে পড়বে না—দিব্যি অটুট থাকবে আগাগোড়া··· এবং কারুশিল্প-সামগ্রীটিও বেশ মজবুত আর দীর্ঘস্থায়ী হবে।
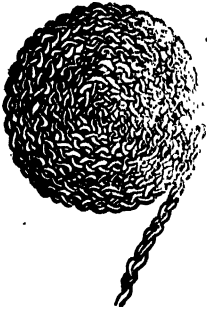
এমনি প্রথায় বিভিন্ন রঙীণ-কাপড়ের ফিতা দিয়ে রচিত বিনুনীগুলিকে একের পর এক পাক দিয়ে আগাগোড়া পরিপাটি-ছাঁদে এবং গোলাকারে জড়ানো হলে, প্রত্যেক সারির বিনুনীর-কিনারায় ছুঁচ-সুতোর সেলাই দিয়ে টেঁকে, সেগুলিকে পাকাপোক্তভাবে একত্রে জোড়া লাগিয়ে দেবেন—তাহলে কারুশিল্প-সামগ্রীটি আর দৈনন্দিন-ব্যবহারের ফলে, সহজে খশে বা ছিঁড়ে যাবে না· দিব্যি সুন্দর-মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। এবারের অভিনব কারুশিল্প-সামগ্রীটি রচনার এই হলো মোটামুটি নিয়ম। এ নিয়মে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে, শুধু যে ছোটখাট আসন, টেবিল-ঢাকা প্রভৃতি বানানো সম্ভবতাই নয়, সামান্য ধৈর্য্য ধরে আরো বেশী চেষ্টা করলে অনায়াসেই এবং সল্প ব্যয়ে ঘরের মেঝেতে বা সোফা, কৌচ, 'ডিভান' (Divan) ও তক্তাপোষে সাজিয়ে রাখার উপযোগী বড়-সাইজের সুদৃশ্য-সৌখিন কার্পেট, সতরঞ্চি, গালিচার মতো নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর রচনা করা যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে, রঙীণ-কাপড়ের টুকরো গেঁথে রচিত এ সব সৌখীন-সামগ্রী ধুলো-ময়লা লেগে অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে, সে মলিনতা সাফ্ করবার জন্য সরাসরি ধোবিখানায় ধোলাই করতে না পাঠানোই ভালো··· তাতে এ সব সামগ্রীর জীবন ও জৌলুষ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে সবিশেষ। সুতরাং বিশেষ কোনো অসুবিধা না ঘটলে সামান্য কষ্ট স্বীকার করে এ সব সৌখিন-সুন্দর শিল্প-সামগ্রী মাঝে মাঝে বাড়ীতে নিজেদের হাতে গুঁড়ো বা কুচো (Soap-Flakes or Powder) সাবান বা 'রীঠের' জলে কেচে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত···তাহলে এ সব জিনিষ আরো বেশী টেঁকসই হবে এবং কাপড়ের ফিতার রঙও বেশ উজ্জ্বল থাকবে অনেক দিন।

আগামী সংখ্যায় কাপড়ের কারুশিল্পের আরেকটি বিচিত্র-অভিনব সামগ্রী রচনার বিষয় আলোচনা করার বাসনা রইলো।

সূচী-শিল্পের নক্সা

সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়

ঘরকন্নার কাজের অবসরে অনেক সুগৃহিণীই নানা রকমের সৌখিন-নক্সাদারসূচী-শিল্পের অনুশীলন করেন, তাই এবারে নববর্ষের সওগাৎ হিসাবে তাঁদের সৌখিন-সেলাইয়েয় উপযোগী সহজ-সরল দুটি পাখীর 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative Motifs) নমুনা উপহার দিলুম। সামান্য চেষ্টাতেই রঙীণ-সুতো দিয়ে নিখুঁত-ছাঁদে 'এম্ব্রয়ডারী, (Embroidery) সেলাই অথবা রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো জুড়ে 'এ্যাপ্লিকের' (Apdlique) কাজ করে মিহি কিম্বা মোটা একরঙা কোনো সুতী, রেশমী বা পশমী উপর এবারের এই বিচিত্র 'নক্সার' নমুনা দুটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে। তবে শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য জানিয়ে রাখি যে, গাঢ়-রঙের কাপড়ের উপর মানানসই-ধরণের কোনো হাল্কা-রঙের এম্ব্রয়ডারী-

সুতো দিয়ে সূচীকার্য্য কিম্বা ঐ ধরণের হাল্‌কা-রঙের কাপড়ের টুকরোর সাহায্যে 'এ্যাপ্লিকের' কাজ করবেই এ দুটি 'নক্সাকে মনোরম ছাঁদে ফুটিয়ে তোলা যাবে। তবে, সূচী-শিল্পীর পছন্দমতো কাপড়ের রঙ যদি হালকা-ধরণের হয়, তাহলে সেলাইয়ের কাজের জন্য বেছে নেবেন—মানানসই কোনো গাঢ়-রঙের 'এম্‌ব্রয়ডারী-সুতো' অথবা কাপড়ের টুকরো।
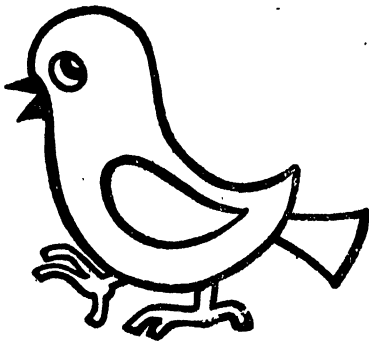
উপরে 'আলঙ্কারিক-ছাঁদে' রচিত চলন্ত-পাখীর যে বিচিত্র নক্সার 'নমুনাটি' (Pattern) দেখানো হয়েছে, সূচী-শিল্পের কাজ করে সেটিকে ঘরের দরজা-জানলার পর্দা, সোফা-কৌচের ঢাকা (Couch-Covers), বিছানার বালিশের বা 'কুশ্যনের' ওয়াড় (Pillow or Cushion Covers), টেবিল-ক্লথ (Table-Cloth), 'ট্রে'-ঢাকবার কাপড় (Tray-Cloth), 'টি-কোজিরং' (Tea-Cosy) গেলাব, গৃহ-সজ্জার উপযোগী কারুকার্য্যময় 'দেয়াল-চিত্রের পাটা' (Wall-decoration-scroll), এমন কি, মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়েদের ব্লাউশ, চোলী, ফ্রক, স্কার্ট, রম্পার, নিকারবোকার, হাওয়াই জ্যাকেট প্রভৃতি সৌখিন জামা-কাপড়ের উপর অপরূপ-ছাঁদে ফুটিয়ে তোলা যাবে। পছন্দমতো কোন গাঢ় কিম্বা হালকা রঙের কাপড়ের উপর মানানসই-ধরণের অন্য কোনো হালকা বা গাঢ় রঙীণ কাপড়ের টুকরো বসিয়ে 'এ্যাপ্লিক' (Applique) সূচী-শিল্পের কাজ করে চলন্ত-পাখীর' এই 'আলঙ্কারিক-নক্সাটিকে'ফুটিয়ে তোলার জন্য, গোড়াতেই প্রয়োজনমতো-আকারে একখানি শাদা-কাগজের বুকে কলম, পেন্সিল বা তুলির রেখা টেনে নিখুঁতভাবে 'নক্সার' প্রতিলিপি এঁকে নেবেন। বলা বাহুল্য 'এম্‌ব্রয়ডারী' সূচী-কার্য্যের সময়েও এমনি-ধরণের কাপড়ের উপর 'নক্সার' প্রতিলিপি এঁকে নেওয়া প্রয়োজন। যাই হোক যে প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলুম, সেই কথায় ফিরে যাই আবার!···'এ্যাপ্লিক' সূচী-শিল্পের কাজ করবার সময়, পছন্দমতো-রঙের কাপড়ের টুকরোর উপর নক্সার প্রতিলিপি আঁকা ঐ কাগজখানি বসিয়ে, সেই কাগজের নীচে রিপাটিভাবে একখানি 'কার্ব্বণ-কাগজ' (Carbon Paper) পেতে রেখে, পেন্সিলের মৃদু চাপ দিয়ে 'নক্সাটিকে' আগাগোড়া নিখুঁত-ছাঁদে 'ট্রেসিং' (Tracing) বা 'রেখাঙ্কিত' করে নেবেন। তাহলেই রঙীণ-কাপড়ের উপর সুষ্টুভাবে 'চলন্ত-পাখীর' নক্সাটির ছাপ এঁকে নেবার কাজ শেষ হবে। এমনিভাবে 'প্রতিলিপির খশড়া' এঁকে নেবার পর, প্রত্যেকটি রেখার দাগে দাগে নিপুণ-হাতে কাঁচি চালিয়ে রঙীণ-কাপড়টিকে আগাগোড়া ছাঁটাই করে নিতে হবে। এবারে সদ্য-ছাঁটাই-করা 'চলন্ত-পাখীর' ছাঁদে রচিত হালকা বা গাঢ় রঙের এই কাপড়ের টুকরোটিকে বিপরীত রঙের অর্থাৎ, গাঢ় বা হালকা রঙের অন্য কাপড়ের 'জমীর' (Gronnd) উপর যথাস্থানে বসিয়ে ছুঁচ সুতোর সাহায্যে পরিপাটি ধরণে সূচী-শিল্পের কাজ করে পাকাপোক্তভাবে একত্রে গেঁথে নেবেন। তাহলেই উপরের ছবিতে দেখানো 'চলন্ত-পাখার' ঐ 'আলঙ্কারিক-নক্সা' রচনার কাজ চুকবে।

রঙীণ কাপড়ের বুকে 'এম্‌ব্রয়ডারী' সূচী-শিল্পের কাজ করে উপরের ১নং 'নক্সাটিকে' ফুটিয়ে তুলতে হলে, পছন্দমতো এবং মানানসই ধরণের গাঢ় কিম্বা হালকা রঙের সুতো দিয়ে 'চলন্ত-পাখীর' প্রতিলিপির প্রত্যেকটি রেখা সুষ্টুভাবে সেলাই করবেন। তাহলেই রঙীণ কাপড়ের উপর এ নক্সাটির রূপ ফুটে উঠবে অপরূপ ছাঁদে।

এমনি-ধরণের সৌখিন-সূচীশিল্পচর্চ্চার সুবিধার জন্য, নীচে বিশ্রামরত-ভঙ্গীতে বসে-থাকা একটি পারাবতের বিচিত্র 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative-motif) নমুনাও প্রকাশিত হলো। এ 'নক্সাটিকেও' উপরোক্ত পদ্ধতিতে 'এমব্রয়ডারী' অথবা 'এ্যাপ্লিক' সূচী-শিল্পের

কাজ করে অনায়াসেই রঙীণ-কাপড়ের বুকে ফুটিয়ে তোলা যাবে। উপরের ২নং 'নক্সার' (Pattern) ছাঁদে রঙীণকাপড়ের বুকে 'এ্যাপ্লিক'-স্বচীকার্য্য করে সুন্দর ও পরিপাটি-ধরণে 'বিশ্রামরত-পারাবতের' প্রতিলিপিটি ফুটিয়ে তোলার জন্য শাদা, ফিকে-নীল, গাঢ়-নীল, ফিকে-বাদামী, কিম্বা ফিকে-ছাই রঙের কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। পারাবতের দেহের চারিদিকের 'সীমা-রেখা' (Outline of the body) সেলাই করবেন—'জমীর' (Ground) কাপড়ের সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমন কোনো রঙের স্বতোর সেলাই দিয়ে···এবং পারাবতের দেহে পালখের গায়ে যে সব 'আলঙ্কারিক-রেখা' (Decorative-Lines) চিত্রিত রয়েছে, সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলবেন—শাদা, ফিকে-ছাই, ফিকে অথবা গাঢ়-নীল, গোলাপী, গাঢ় অথবা ফিকে সবুজ, গাঢ়-বাদামী রঙের স্বতোর সেলাই দিয়ে। তবে খেয়াল রাখবেন—'জমীর' (Ground) কাপড়ের রঙ যদি গাঢ় হয়, তাহলে পারাবতের 'দেহ' (Figure) রচনার জন্য ব্যবহার করবেন—মানানসই-ধরণের কোনো হালকা-রঙের স্বতো বা রঙীণ কাপড়ের টুকরো···এবং পারাবতের দেহে পালখের গায়ে যে সব 'আলঙ্কারিক-রেখা' চিহ্নিত রয়েছে, সেগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে—হালকা অথবা গাঢ় মানানসই-রঙের স্বতো দিয়ে স্বচীকার্য্য করে। 'জমীর' (Ground) কাপড়ের রঙ যদি হালকা-ধরণের হয়, তাহলে পারাবতের দেহটিকেও যে সেই অনুসারে মানানসই-ধরণের কোনো হালকা-রঙের স্বতো বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে রচনা করতে হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে পালখের গায়ের 'আলঙ্কারিক-রেখাগুলি' রচনা করতে হবে পাখীর 'দেহাংশের' (Figure) বা 'জমীর' (Ground) কাপড়ের রঙ-অনুসারে মানানসই কোনো রঙীণ-স্বতোর সাহায্যে এবারে যে ছুটি বিচিত্র 'নক্সার' (Pattern) নমুনা দেওয়া হলো, 'এম্‌ব্রয়ডারী' বা 'এ্যাপ্লিক' স্বচী-শিল্পের কাজ করে সেগুলিকে যথাযথরূপে ফুটিয়ে তোলার এই হলো মোটামুটি কলা-কৌশল।

বারান্তরে, সৌখিন-স্বচীশিল্পের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব 'নক্সার' নমুনা ও রচনা-পদ্ধতির হদিশ জানাবার ইচ্ছা রইলো।

সুধীরা হালদার

এবারে দক্ষিণ-ভারতের ছুটি অভিনব সুস্বাদু খাবার-রান্নার কথা বলছি।

দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় রান্না করা প্রথম খাবারটির নাম—'পুলিশেরি'। এটি নিরামিষ-জাতীয় খাবার···খেতেও বেশ মুখরোচক। পাঁচ-ছয়জনের আহারের উপযোগী 'পুলিশেরি' খাবার রান্না করতে হলে, উপকরণ চাই—চায়ের পেয়ালার তিন্ পেয়ালা টক-দই, আধখানা নারিকেল, চার কোয়া রসুন, ছুটি মাঝারি-সাইজের পেঁয়াজ, গোটা চার-পাঁচ শুকনো-লঙ্কা, বড়-চামচের ছ'চামচ ধনে, চায়ের চামচের ছয়-চামচ জীরা, চায়ের চামচের আধ-চামচ হলুদ, চায়ের চামচের এক-চামচ সরষে, চায়ের চামচের চার-চামচ ঘি, গোটা কয়েক তেজপাতা, আর আন্দাজ মতো-পরিমাণে অল্প একটু নুন।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে—কুরুণীর সাহায্যে নারিকেলটিকে আগাগোড়া মিহি-ছাঁদে কুরে নিন। তারপর পরিষ্কার একটি পাত্রে রেখে দইয়ের সঙ্গে চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা জল

মিশিয়ে, দইটুকু বেশ ভালো করে ফেটিয়ে রাখুন। এবারে জল-দিয়ে-ফেটানো ঐ দইয়ের সঙ্গে নারিকেল-কোরো মিশিয়ে দিন। অতঃপর পরিষ্কার একটি শিল-নোড়ার সাহায্যে আন্দাজমতো অল্প জল দিয়ে রান্নার মশলা, অর্থাৎ জীরা, লঙ্কা, পেঁয়াজ আর রসুন বেটে থকথকে লেইয়ের মতো 'মণ্ড' (Pulp) বানিয়ে নিন।

উদ্যোগ-পর্ব্বের কাজগুলি সেরে নেবার পর, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে ঘি গলিয়ে নিয়ে, তপ্ত-ঘিয়ে রান্নার-মশলার 'মণ্ডটুকুকে' ছেড়ে প্রায় মিনিট-পাঁচেককাল খুন্তী দিয়ে নাড়াচাড়া করে সেটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভেজে ফেলুন। রান্নার-মশলা ভাজা হলে রন্ধন-পাত্রে নারিকেল-কুরো-মেশানো দইটুকু মিশিয়ে কিছুক্ষণ নরম-আগুনের আঁচে রেখে ফুটিয়ে নিন। এভাবে ফোটানোর সময়, রান্নাটিতে ঘন-ঘন বুদ্‌বুদ্ জাগতে দেখলেই, উনানের উপর থেকে-রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে নিয়ে সেটিকে রান্না-ঘরের একদিকে রেখে জুড়োতে দিন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'পুলিশেরি' খাবার রান্নার পালা শেষ হবে। এবারে সযত্নে প্রিয়জনদের পাতে এ খাবারটি পরিবেশন করুন...আপনার হাতের রান্না নিরামিষ-জাতীয় এই অভিনব-সুস্বাদু খাবারটি খেয়ে তাঁরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় রান্না-করা দ্বিতীয়-খাবারটির নাম—'সোথী'। এটি মাছ দিয়ে রান্না-করা পরম-উপাদেয় বিচিত্র এক-ধরণের আমিষ-জাতীয় খাবার। চার-পাঁচজনের আহারের উপযোগী, এ খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ দরকার—আধসের মাছ, একটি নারিকেল, ছটি পেঁয়াজ, চারটি কাঁচা-লঙ্কা, গোটা কয়েক তেজপাতা, চায়ের চামচের এক-চামচ ঘি, চায়ের চামচের আধ-চামচ হলুদ এবং আন্দাজমতো-পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো-নুন। এ সব উপকরণ জোগাড় করে নিয়ে, প্রথমেই বঁটি বা ছুরির সাহায্যে প্রত্যেকটি কাঁচা-লঙ্কাকে দু'ভাগ করে চিরে নিন। তারপর একটি পেঁয়াজ মিহি করে এবং বাকী পেঁয়াজগুলিকে চারফালি করে কুটে ফেলুন। এবারে কুরুণীর সাহায্যে নারিকেলটিকে মিহিভাবে কুরে নিয়ে, একটুকরো ধোয়া-পরিষ্কার কাপড়ে মুড়ে নারিকেল-কুরো ভালোভাবে নিঙড়ে নিয়ে, সেগুলি থেকে অন্ততঃপক্ষে চায়ের পেয়ালার প্রায় আড়াই-পেয়ালা পরিমাণ 'দুধ' (Cocoanut-milk) করে রাখুন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে জল দিয়ে আঁশ-ছাড়ানো মাছের কাটা-টুকরো-গুলিকে আধ-সিদ্ধ করে ফুটিয়ে নিন। মাছের টুকরোগুলি আধ-সিদ্ধ হলেই, সেগুলিকে উনানের আঁচে-রাখা রন্ধন-পাত্র থেকে নামিয়ে নিয়ে, অন্য একটি পরিষ্কার থালায় তুলে প্রত্যেকটি টুকরোকে হাত বা রান্নার হাতা অথবা বড় চামচের সাহায্যে ভালোভাবে চটকে 'মণ্ডের' (Pulp) মতো থকথকে করে ফেলুন।

এ কাজের পর, পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে ঘি গরম করে, তপ্ত-ঘিয়েতে পেঁয়াজের কুচোগুলিকে আগাগোড়া ভালোভাবে ভেজে নিন। এ-ভাবে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুচোগুলি বেশ বাদামী-রঙের হলে, সেগুলিকে রন্ধন-পাত্র থেকে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। এবারে উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে, সদ্য-ভাজা পেঁয়াজ-কুচো আর আধ-পেয়ালা পরিমাণ নারিকেলের 'দুধ' বাকী রেখে, রান্নার অন্য সব উপকরণ ছেড়ে দিয়ে, 'মিশ্রণটুকু' (Mixture) কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। উনানের আঁচে রেখে এই 'মিশ্রণ-টুকু' কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে বাকী নারিকেলের 'দুধটুকু' ঢেলে দিয়ে, রান্নাটি আরো কিছুক্ষণ আগুনে রেখে ফোটান। এমনিভাবে খানিকক্ষণ ফোটানোর ফলে, রান্নাটি বেশ ঘন-থকথকে ধরণের হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটি নামিয়ে নিয়ে, সদ্য-রান্না-করা খাবারের উপর বাদামী-রঙে-ভাজা পেঁয়াজ-কুচো ছড়িয়ে দিন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'সোথী' খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে।

আগামী সংখ্যায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এমনি আরো কয়েকটি অভিনব-খাবার রান্নার কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

মেষলগ্ন

(দ্বাদশভাবে রাহুর অবস্থান হেতু ফলাফল ভৃগুসংহিতানুসারে)

উপাধ্যায়

মেষলগ্নে রাহু থাকলে শারীরিক কষ্ট, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা বা কোন রকম যন্ত্রণা এবং দৈহিক সৌন্দর্যের অভাব। জাতকের অদম্য সাহস প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে নিজের যশ ও প্রতিষ্ঠা স্থায়ীভাবে রাখবার দিকে ঝোঁক। সম্মান লাভ হয়। মনে প্রাণে বিশৃঙ্খলতা ও কিংকর্ত্তব্য-মূঢ়তা। নানা দুঃখকষ্টভোগ।

বৃষ রাশিতে দ্বিতীয় স্থানে রাহু থাকলে অর্থক্ষতি, পারিবারিক বিচ্ছেদ, ধনবৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা, কিন্তু আশানুরূপ হবে না। পরের আনুকূল্যে অর্থবৃদ্ধি। উৎসাহের সহিত কর্ম্ম। চিত্তে উদ্বিগ্নতা। সঞ্চয়ের জন্য নানারকম পদ্ধতি অবলম্বন।

মিথুন রাশিতে তৃতীয় স্থানে অত্যন্ত সাহসী হয়। সাহস দেখায়, দুঃখকষ্ট বোধ করে, ভ্রাতাভগ্নীদের উপর কর্তৃত্বপরায়ণ, নির্ভীক, আত্মকেন্দ্রিক ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী।

কর্কটে চতুর্থ স্থানে রাহু থাকলে পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দের অভাব ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। মাতৃভাব অশুভ হয়। মানসিক শান্তির অভাব এবং আশাভঙ্গ। ভূমি ও গৃহ সম্বন্ধে আশাপ্রদ নয়।

সিংহে পঞ্চমস্থানে রাহু থাকলে বিদ্যায় বাধা, সন্তান হানি, সন্তানবর্গের সম্পর্কে অশুভ। বদমেজাজি, অপরের কথা সহজে অনুধাবন করতে পারে না। বুদ্ধির দৌর্ব্বল্য।

কন্যাতে ষষ্ঠস্থানে রাহু থাকলে শত্রুজয় হয়—সকল বাধা বিপত্তি দূর করে মানুষ জয়লাভ করে, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে সক্ষম, সতর্কের সঙ্গে নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনায় রত হয়। মাতুল পক্ষ থেকে নানাপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার পায়।

তুলাতে সপ্তমস্থানে রাহু থাকলে স্ত্রীভাব ভালো হয় না, স্ত্রীর জন্য বহুপ্রকার কষ্টভোগ, প্রণয়ভঙ্গ ও বিচ্ছেদ ঘটে। পেশায় বাধাবিপত্তির পর সাফল্য লাভ। জাতক কামভাবাপন্ন হয়।

বৃশ্চিকে অষ্টম স্থানে রাহু থাকলে দৈনন্দিন জীবনে নানা লাঞ্ছনা ভোগ। জীবনযাত্রার পথে অভাব অনটন, উদরাভ্যন্তরে পীড়া, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য।

ধনুতে ভাগ্যস্থানে রাহু থাকলে ভাগ্য উত্তম হয় না। ভাগ্যের ওপর নানাপ্রকার বিপর্য্যয় আসে, কোন রকমেই ভাগ্য বা ধর্ম্মের উন্নতি হয় না। জাতক নিম্নস্তরের ধর্ম্ম সাধনা করে।

মকরে কর্ম্মস্থানে রাহু থাকলে পিতার জন্য দুশ্চিন্তা ও নানা লাঞ্ছনা ভোগ। একাধিক স্থানে কর্ম্ম। ব্যবসায়ে পেশায় উন্নতির যোগের অভাব। জাতক মন্ত্রগুপ্তির সাহায্যে কর্ম্মোন্নতির চেষ্টা করে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির দ্বারা রোজগার। মান সম্মান প্রতিপত্তি বা পসারের অভাব ঘটে।

কুম্ভে একাদশ স্থানে রাহু থাকলে প্রচুর আয়, অর্থোপার্জ্জন বিশেষভাবে দেখা যায়, নানাপ্রকার কৌশলের দ্বারা জাতক অপরের অর্থ পোষণ করে, আয়ের প্রতিযোগিতায় যতপ্রকার কৌশল অবলম্বন দরকার তা করে। অসদুপায়েও অর্থাগম হয়।

মীনে ব্যয় স্থানে রাহু থাকলে অপরিমিত ব্যয়ের জন্য দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ ভোগ। বহিঃশত্রুর জন্য অসুবিধা ভোগ, নিজের মানমর্য্যাদা রক্ষার জন্য অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে উত্তম। ভরণী ও কৃত্তিকার পক্ষে মধ্যম। মাসটী মিশ্রফলদাতা। মানসিক শান্তি, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, লাভ, ভাগ্যোন্নতি, বিলাসব্যসন সুখ, উত্তম বন্ধুলাভ, খ্যাতিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি যোগ আছে। অর্থক্ষতি, ব্যয়াধিক্য, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, নীচসংসর্গ, কলহ বিবাদ প্রভৃতিও সূচিত হয়।

উদরশূল, চক্ষু, ফুসফুস, রক্তের চাপবৃদ্ধি ও বক্ষশূল মাসের প্রথমার্দ্ধে, আর্থিক স্বচ্ছন্দতার প্রাবল্য নেই, লাভ হোলেও ক্ষতির প্রাধান্য। প্রতারকের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম. সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ, নানাপ্রকার আমোদ ও প্রমোদ, উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান, শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো যাবে না, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা ও রোহিণী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মৃগশিরার পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকবে, সর্দ্দি, জ্বর, শারীরিক যন্ত্রণা প্রভৃতি হোলেও সাংঘাতিক রকমের কিছু ঘটবে না। পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, বিলাসিতা দেখা দেবে, গৃহে বিবাহোৎসব, নবজাতকের আর্বিভাব, কোন আত্মীয় বিয়োগের দুঃসংবাদ লাভ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সম্মান, স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক অবস্থা উত্তম, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর কর্ম্মোন্নতি, নূতন পদমর্য্যাদা লাভ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, যশ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। গৃহিণীরা বিশেষ পারিবারিক সুখলাভ করবেন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুনক্ষত্র জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। আর্দ্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরা জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট, স্বাস্থ্যহানি যোগ, পারিবারিক কলহ, ঘরে বাইরে মতভেদ ও মনোমালিন্য, আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ অনুকূল নয়। নগদ টাকার টান পড়তে পারে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ, কর্ম্মোন্নতি ও পদমর্য্যাদা লাভ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টী এক ভাবেই যাবে, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। এ মাসে যাদের সন্তান হবে, তারা সন্তান নিয়ে সুখলাভ করবে, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। সামান্য পরিমাণে স্বাস্থ্যহানি, রক্তদুষ্টি, পিত্তপ্রকোপ, শ্লেষা প্রকোপ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি উদরঘটিত পীড়ার জন্য সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রী ও সন্তানাদির পীড়া, পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভ ও ক্ষতি সমান ভাবে হবে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী এক ভাবেই যাবে। কোন প্রকার আশাপ্রদ পরিস্থিতির সম্ভাবনা নেই। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ। শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা, অবিবাহিতাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির উচ্চ পরিবারে বিবাহ সম্ভব। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ রাশি

মঘাজাতগণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বফাল্গুনী আর উত্তর ফাল্গুনী জাতগণের পক্ষে একই প্রকার। স্বাস্থ্য ভালো

বলা যায় না। পিত্তপ্রকোপ ও চক্ষু পীড়া, সন্তানদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি আবশ্যক, আর্থিক উন্নতিযোগ, অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম, চাকুরিজীবীর পক্ষে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন যোগ নেই। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে শরীরের অভ্যন্তরে কোন পীড়ার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যা রাশি

উত্তরফাল্গুনী ও হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম। চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি, উদর ঘটিত পীড়া, গুহ্যদেশে ও মূত্রাশয়ে পীড়া, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক অনৈক্য, অর্থোন্নতি সম্পর্কে মাসটী কিছু ভালো। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষ শুভ আশা করা যায়। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। উপরওয়ালার অপ্রিয়ভাজন হবার সম্ভাবনা, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মতভেদ, জন্য অশান্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ অনুকূল নয়। নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মাসটি যাবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

তুলা রাশি

বিশাখাজাতগণের পক্ষে উত্তম। স্বাতীজাতগণের পক্ষে মধ্যম, চিত্রার পক্ষে অধম। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালো যাবে। শেষার্দ্ধে স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক অবস্থা অনুকূল। কনট্রাক্টের কাজে বিশেষ লাভ। অস্থাবর সম্পত্তির আশা নেই। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে অনুকূল, উন্নতির আশা আছে, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, জনপ্রিয়তা ও বিলাসব্যসন দ্রব্য লাভ। প্রসূতির পক্ষে শেষার্দ্ধে বিপত্তির কারণ আছে এবং স্ত্রীলোকের আভ্যন্তরীণ পীড়ার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। অনুরাধার পক্ষে অধম। শারীরিক দুর্ব্বলতা। ধারালো অস্ত্রে আঘাতের সম্ভাবনা। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। বিভিন্ন দিক থেকে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অতীব উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু রাশি

মূলাজাতগণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্যের অবনতি। শারীরিক দৌর্ব্বল্য। সন্তানাদির পীড়া। শরীরে আঘাতপ্রাপ্তিজনিত দুর্ঘটনা। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব। আর্থিকক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। অন্যদিক দিয়ে অর্থাগম হোলেও ব্যয়াধিক্য ও ক্ষতির সম্ভাবনা। নগদ টাকার টান ধরবে। প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী শুভ নয়, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। উদরঘটিত পীড়া। চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক কলহ ও স্বজন বিরোধ। স্বজন বিয়োগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক কষ্ট। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। প্রথমার্দ্ধ স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, শেষার্দ্ধটী আশাপ্রদ নয়। মঞ্চ ও চিত্রশিল্পীর পক্ষে উত্তম মাস। জনপ্রিয়তা যোগ আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে উত্তম। শতভিষাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে অধম।

শারীরিক দুর্ব্বলতা। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। প্রথমার্দ্ধে কিছু ক্ষতি ও উদ্বেগের সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকরিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। সন্তান সুখ। শিল্পীদের পক্ষে অনুকূল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ও রেবতীজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তরভাদ্রপদগণের পক্ষে অধম। রক্ত চাপ বৃদ্ধি। শারীরিক দুর্ব্বলতা। নানাপ্রকার পারিবারিক অশান্তি। প্রচেষ্টায় ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবী ও ভূমাধিকারীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। চাকুরীজীবীর পক্ষে শুভ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। ভ্রমণ ও আমোদ প্রমোদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন—

শারীরিক কষ্ট। ধনাগম ও সুখ্যাতির আশা। সহোদর ভাব অশুভ। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। মাতার স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

বৃষলগ্ন—

দৈহিক অবস্থা শুভ। ধনাগম। ব্যয় বাহুল্য। ভাগ্য বিপর্য্যয়। অত্যধিক ব্যয় হেতু মনশ্চাঞ্চল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

মিথুন লগ্ন—

স্বাস্থ্যহানি। কর্ম্মফল স্বাভাবিক। বেদনাজনিত পীড়া। অর্থ হানি। বন্ধু বিয়োগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কর্কট লগ্ন—

অম্লপিত্তজনিত পীড়া, হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা। ধনাগম। সদ্বন্ধু লাভ। ভাগ্যোন্নতি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

সিংহ লগ্ন—

গুরুজনবিয়োগ, আর্থিক উন্নতি, সন্তানের পীড়া, মানসিক উদ্বেগ, ব্যবসাবাণিজ্যে কিছু লাভের আশা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কন্যা লগ্ন—

পিতার স্বাস্থ্যহানি। কর্ম্মোন্নতি। কর্ম্মস্থলে বিরুদ্ধ দলের প্রভাব। কাজের চাপ বৃদ্ধি। ভাগ্যোন্নতি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন—

ভাগ্য লাভে বাধা, কর্ম্মস্থলে অশান্তি, শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না। নানারকমে অর্থব্যয়। সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্যহানি। দাম্পত্য প্রণয় যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মিশ্র ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

বৃশ্চিক লগ্ন—

স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। স্ত্রীর ও সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কর্ম্মস্থল শুভ। ধনাগম যোগ। গৃহ নির্ম্মাণ। ভাগ্য লাভে আংশিক বাধা। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু লগ্ন—

নিজের স্বাস্থ্য ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। কর্ম্মস্থল স্বাভাবিক। আর্থিক অশান্তি। বিবাহ বিষয়ে নানা বাধা। মাতার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বন্ধু দ্বারা কর্ম্মোন্নতি। আর্থিক উন্নতিতে বাধা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মকর লগ্ন—

স্বাস্থ্যের অবনতি। স্ত্রীর পীড়া। কর্ম্মস্থলে শত্রু বৃদ্ধি। ছাত্রছাত্রীগণের বিদ্যায় বাধা। দাম্পত্য কলহ, কর্ম্মোন্নতি। দেশ ভ্রমণ, মনস্তাপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

কুম্ভ লগ্ন—

আংশিক অশান্তি। সন্তানের পীড়া। অযথা অর্থব্যয়। কর্ম্মস্থল শুভ। পারিবারিক অবস্থা শুভ। পিতার উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

সন্তানের জীবন সংশয় পীড়া। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। মাতৃ পীড়া। পিতার পক্ষে শুভ নয়। পুত্রকন্যার বিবাহে বাধা। বৃথা ভ্রমণ। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা। কর্ম্মস্থলে অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

পাট ও পীঠ
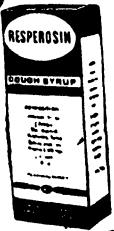
শ্রী'শ'—

॥ শ্রেষ্ঠ চিত্র ॥

বাংলা সাহিত্যের মতন বাংলা চলচ্চিত্রও যে ভারতের মধ্যে এখনও শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারে তার প্রমাণ পুনরায় পাওয়া গেল ভারত সরকার প্রদত্ত পুরস্কারের মধ্যে দিয়ে। ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ও এস, এল, জালান প্রযোজিত এবং ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দীপ্ত বাংলা চিত্র "দাদাঠাকুর"। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক সহ ২০,০০০৲ টাকা পেয়েছেন এই চিত্রের প্রযোজক এবং ৫০০০৲ টাকা পেয়েছেন পরিচালক। শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় চিত্রের পুরস্কার সর্ব্ব-ভারতীয় সার্টিফিকেট্ পেয়েছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ও অভিযাত্রিক প্রযোজিত "অভিযান" নামের আর একটি বাংলা চিত্র। এই চিত্রের প্রযোজক পেয়েছেন ১০,০০০৲ টাকা এবং পরিচাক পেয়েছেন ২৫০০৲ টাকা পুরস্কার রূপে। তাছাড়া বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক পেয়েছে যাত্রিক পরিচালিত ও চিত্রযুগ প্রযোজিত "কাঁচের স্বর্গ" চিত্রটি। হিন্দী ভাষায় "সাহেব বিবি ঔর গোলাম" চিত্রটি এবং তামিল, তেলেগু ও মারাঠি ভাষার চিত্রও এই রৌপ্য পদক পুরস্কার লাভ করেছে। অগ্রগামী পরিচালিত ও প্রযোজিত বাংলা চিত্র "নিশীথে"ও মারাঠি, ওড়িয়া, মালয়ালাম্, তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও আসামী চিত্রের সহিত আঞ্চলিক সার্টিফিকেট্ লাভ করেছে।

আমরা 'দাদাঠাকুর', 'অভিযান', 'কাঁচের স্বর্গ' ও "নিশীথে"র পরিচালক, প্রযোজক ও শিল্পীগণকে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আশা রাখছি ভবিষ্যতেও এঁরা বাংলা চিত্রের সর্ব্বোন্নতি কল্পে সচেষ্ট থেকে বাংলার চলচ্চিত্রকে আরও অগ্রসর করে বিশ্বের দরবারেও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

* * *

বাংলার বিচার ঃ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন্ (বি-এফ-জে-এ) ১৯৬২ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালক, শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নাম ঘোষণা করেছেন। গত ৯ই এপ্রিল্ ব্যালট্ প্রথায় এই নির্বাচন সম্পাদিত হয় এবং নির্ব্বাচনের ফল নিম্নরূপ হয়েছে ঃ

চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের নির্বাচনে বছরের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবির সম্মান লাভ করেছে 'অভিযান'। এই চিত্রের পরিচালক সত্যজিৎ রায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে (বাংলা ছবির ক্ষেত্রে) অভিহিত হয়েছেন। হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে সম্মানিত হয়েছেন আবরার আলভি ('সাহেব বিবি ঔর গোলাম')। বিদেশী চিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে অভিহিত হয়েছেন কেনেটো শিণ্ডো ('দি আইল্যাণ্ড'—জাপানী)।

বছরের শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় চিত্র হিসেবে নির্ব্বাচিত হয়েছে (গুণানুক্রমে ঃ 'অভিযান', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'কাঁচের স্বর্গ', 'দাদাঠাকুর', 'সাহেব বিবি ঔর গোলাম' 'ভগিনী নিবেদিতা', 'সৌতেলা ভাই', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'আরতি' ও 'বেনারসী'।

বছরের দশটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্ররূপে (কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত) নির্ব্বাচিত হয়েছে ঃ 'টু উইমেন্', 'দি আইল্যাণ্ড', 'ব্যালাড অব্ এ সোল্জার', 'কাম্ সেপ্টেম্বর', 'গান্স্ অব্ নাভারোন্', 'দি লংগেষ্ট ডে', 'স্পার্টাকাস্', 'লা ডল্সে ভিটা', স্লিপিং বিউটি' এবং 'সাইকো'।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন ঃ বাংলা—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিযান) ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (ভগিনী নিবেদিতা); হিন্দী ও অন্যান্য—গুরু দত্ত (সাহেব বিবি ঔর গোলাম) ও মীনাকুমারী (আরতি), বিদেশী—গ্রেগরি পেক্ (গান্স্ অব্ নাভারোন্) ও সোফিয়া লোরেন্ (টু উইমেন্)।

কথা কও —

রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী নিবেদিত ও অধ্যাপক সুনীল চন্দ্র সরকার রচিত 'কথা কও' নাটকটি ইদানীন্তন নাট্যজগতের এক বিশেষ আকর্ষণ এখানে ঐ নাটকের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে সবিতাব্রত দত্ত, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় ও অসিত বরণকে দেখা যাচ্ছে।

পরিচালক তপন সিংহের 'জতুগৃহ' নামের নির্মীয়মান চিত্রে চিত্রামোদীদের অভি-বাদন জানাবে নবাগতা শ্রীমতী সন্দীপা ভৌমিক।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ও সহ-অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন: বাংলা—চারুপ্রকাশ ঘোষ (অভিযান) ও অনুভা গুপ্ত (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা); হিন্দী ও অন্যান্য—রেহমান্ (সাহেব বিবি ঔর গোলাম) ও শশি-কলা (আরতি); বিদেশী—চার্লস্ লটন্ (স্পার্টাকাস্) ও স্যানড্রা ডী (কাম্ সেপ্টেম্বর)।

বছরের শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালকরূপে অভিহিত হয়েছেন: বাংলা—রবীন চট্টোপাধ্যায় (মায়ার সংসার); হিন্দী ও অন্যান্য—হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (বিশ সাল বাদ)।

গীতি রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছেন: বাংলা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা); হিন্দী ও অন্যান্য—হসরৎ ও শৈলেন্দ্র (প্রফেসর)।

সংলাপ রচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন: বাংলা—সত্যজিৎ রায় (কাঞ্চনজঙ্ঘা); হিন্দী ও অন্যান্য—আবরার আলভি (সাহেব বিবি ঔর গোলাম)।

আলোকচিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন: বাংলা—দিলীপ মুখোপাধ্যায় (কুমারী মন); হিন্দী ও অন্যান্য—ভি কে মূর্তি (সাহেব বিবি ঔর গোলাম)।

বছরের শ্রেষ্ঠ শব্দ-গ্রাহকরূপে ধরা হয়েছে: বাংলায়—সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (দাদাঠাকুর) এবং হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায়—আর, জি, কুশলকর (আরতি)।

* * *

অস্কার পুরস্কার ঃ

গত ৮ই এপ্রিলের রাত্রে হলিউডে ১৯৬২ সালের 'অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড' বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গত বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে 'অস্কার' পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে গ্রেগরি পেক্ (টু কিল্ এ মকিং বার্ড্) এবং অ্যানী ব্যান্ ক্রক্ট্ (দি মিরাক্‌ল্ ওয়ার্কার)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ও সহ-অভিনেত্রীরূপে অভিহিত হয়েছেন প্রবীণ শিল্পী এড্ বেগলে (সুইট বার্ড অব ইয়ুথ) ও শিশু-শিল্পী প্যাটি ডিউক্ (দি মিরাক্‌ল্ ওয়ার্কার)। শিশু-শিল্পীর 'অস্কার' পুরস্কার লাভ এই প্রথম।

এই ৩৫তম বার্ষিক 'অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে এবারে ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান 'লরেন্স অব্ অ্যারেবিয়া' নামক চিত্রটিকে দেওয়া হইয়াছে। জর্ডনে চিত্রায়িত এই 'লরেন্স অব অ্যারেবিয়া' ছবিটি মোট ৭টা পুরস্কার লাভ করেছে। তারমধ্যে একটী পুরস্কার পেয়েছেন ছবিটির পরিচালক ডেভিড্ লীন।

শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য (সাদা-কালো) 'অস্কার' লাভ করেছে 'দি লংগেষ্ট ডে' ছবিটি। স্পেশাল এফেক্ট-এর জন্য এই চিত্রটি আরও একটি 'অস্কার' লাভ করেছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনার জন্য 'অস্কার' পুরস্কার লাভ করেছেন এনিও দ্য কঞ্চিনি, আলফ্রেদো জিয়ানেতি ও পিয়াত্রা জের্মি (ডাইভোর্স—ইতালিয়ান্ ষ্টাইল্)।

ক্যামেরার কৌশল

রবীন সরকার

[খেলাধুলা বিশারদ, বাংলার ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ন্ মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীরবীন সরকার কলিকাতার অনেক ছবিতে সহকারী পরিচালক ও নৃত্য পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। হলিউডে ৮ মাস জ্যাক্সন্ রোজের সঙ্গে থেকে ক্যামেরার কাজ শেখেন। পরে হলিউডে জেমস ভি কারনের কাছেও পরিচালনার কাজ শেখেন। বহুদিন হল শ্রীসরকার লণ্ডনে রয়েছেন এবং সেখানেও তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন নানা ভাবে।]

চলচ্চিত্র প্রযোজনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করে ছবির ভিতর প্রাণ সৃজন করতে চান তাঁদের কয়েকটী কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে যাঁরা চিত্র-পরিচালক হয়ে দর্শকদের আনন্দ দিতে এগিয়ে আসবেন তাঁদের এই সব বিষয়ে বুঝবার ক্ষমতাও থাকা চাই।

এখানে চলচ্চিত্রের ক্যামেরার টেক্‌নিক্ বা কলাকৌশল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। টেক্‌নিক্ অনেক আছে। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে 'কাট্' সম্বন্ধে। চিত্রের ধারা-রক্ষার জন্য এই কাট্ করতে হয়। কাট্ হচ্ছে ফিল্মের একটি বিশেষ অঙ্গ। এরই যথাযোগ্য ও পূর্ণ প্রয়োগে ছবি দর্শনীয় হয় এবং ত্রুটি পূর্ণ প্রয়োগে দর্শনযোগ্য হতে পারে না।

এখন লেখক লেখে কাহিনী। সেই কাহিনী ছায়া-ছবির জন্য হয় লেখক স্বয়ং সাজাতে পারে বা অন্য কোন এই বিষয়ে বিজ্ঞ লেখক এই কাহিনী ছায়াছবির জন্য বিশেষ ভাবে লিখতে পারে যাতে ছবি প্রাণবন্ত হয়। এই বিষয়ে শিক্ষিত লেখকরা ছায়াছবির টেক্‌নিক্ জানে, তাই ছায়া ছবির কাহিনী বা সিনারিয়ো তারাই লিখে থাকে।

যেমন কাহিনী লেখক ও পরিচালককে জানতে হয় কাট সম্বন্ধে—তেমনি ক্যামেরাম্যানকেও জানতে হয় কাটের অর্থ প্রকাশ সম্বন্ধে। কাটের দ্বারা অর্থ ব্যক্ত হয়, কিন্তু ঠিক মত কাট না হলে অর্থ ব্যক্ত হবে না বা প্রাণ সৃজন হবে না।

কাটিংয়ের ভিতর সমস্যা আছে। কেবল কেটে গেলেই হয় না। ছবি ভাল হলে কি হবে, ছবির

কম্পোজিসন্ মনোমুগ্ধকর হলে কি হবে, যতক্ষণ না ঠিক মত কাটিং হবে ততক্ষণ ছবি প্রাণ পেতে পারেনা। সেইজন্য পরিচালককে সাহায্য করবার জন্য ক্যামেরা-ম্যানের এই দিকে প্রচুর জ্ঞান অবশ্যই থাকা দরকার।

তবে আসল কাজ বা ফিল্ম সম্পাদনার কাজ নির্ভর করে এডিটর বা সম্পাদকের উপর। সেইজন্য তাকেই কাট সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখতে হয়। পরিচালক নিজের সুবিধার জন্য ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে নানা ভাবে ছবির ভিতর কাটিং দিয়ে ছবি তুলে চলে। সেই সব ছবি যখন শেষে এসে হাজির হয় সম্পাদকের কাছে তখনই আরম্ভ হয় সমস্যা।

কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যখন পরিচালক সম্পাদককে তার মনের কথা অর্থাৎ ঠিক কি দেখাতে যাওয়া হচ্ছে তা বুঝিয়ে দিতে থাকেন। পরিচালক যখন ছবি কাট করতে যায় তখন তার মনে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে যে কি করতে সে যাচ্ছে বা কি দেখাতে সে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে সব কৌশল সংযোজনায় ছবির প্রাণ সৃজন করতে যাচ্ছে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হয় সম্পাদকের মত।

পরিচালককে বুঝতে হয় যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি নিলে দর্শনীয় হবে। কোথায় কাটিং করলে অর্থ বোধগম্য হবে। কেবল নিজে বুঝলে হয় না, যাতে তার কথা সকলে বুঝতে পারে তা দেখতে হবে। অথবা এমন জিনিষ তাকে প্রয়োগ করতে হবে যার প্রাথমিক টেকনিক্ প্রায় সকলেরই জানা আছে।

মনে রাখতে হবে যে ছবির কাহিনীর ভিতর রাখতে হবে ধারা। আচ্ছা এটা দেখ, ওটা দেখ, করলেই ধারা রক্ষা হয় না। ঠিকমত ধারা রক্ষা যাতে হয় তার জন্য পরিচালককে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। নইলে ছায়াছবি পরিচালনা করতে আসা কোন মতেই উচিত নয়।

এই দিকে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র-পরিচালকদের বিশেষ দৃষ্টি নেই বললেই চলে। প্রায়ই ছবির মধ্যে এমন ভাবে কাটিং দেওয়া হয় যা শিক্ষানবিসরাই করে থাকে। এই দিকে ত্রুটি থাকলে যে পরে কতখানি ভাবিয়ে তোলে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন পরিচালক ও সম্পাদক দুজনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মাথা ঘামাতে থাকে। অথচ আগে থেকে এই দিকে প্ল্যান্ করে নিয়ে এগোলে অযথা সময় নষ্ট হয় না।

এই প্ল্যান্ না করে বা মতলব না এঁটে কাজ করার জন্য ক্যামেরাম্যান্কে হতে হয় অপরাধী। কেননা যেখানে পরিচালক বুঝিয়ে দেয় না যে কোনখানে কোন আলোক সম্পাত করে কোন কম্পোজিসন্ জাগিয়ে তুলতে হবে—সেখানে ক্যামেরাম্যান্ না বুঝতে পেরে এমন সব কাজ করে চলে যে শেষে সম্পাদককে বুদ্ধি হারাতে হয়। এই সব কলা-কৌশল না জানার জন্যই কত ছবি যে সাফল্য লাভ করতে পারে নি তা অনুসন্ধান করলেই জানতে পারা যাবে।

যারা বোঝে ছবির কি ভাবে প্রাণ সৃজন করতে হয়—তারা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে কাটিং কৌশল না জানলে ছবিতে প্রাণ সৃজন করা যায় না। যে কোন কাজ শিখতে হলে যেমন প্রাথমিক কাজ আগে ভাল করে শিখতে হয়, তেমনি ছবির কাজে যারা পরিচালক হতে যাবে তাদের কাটিং সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা সব চাইতে আগে চাইই। কাটিং দ্বারা ছবি চলন্ত হয়। অভিনেতা নড়লেই ছবি চলন্ত হয় না—কাহিনীর গতি নড়লেই ছবি চলন্ত হয় অভিনেতাদের সঙ্গে।

রঙ্গমঞ্চে যা আমরা দেখি তা সীমানার ভিতরই দেখে থাকি। তার বাইরে দেখতে পাই না। একই জিনিষ অনবরত দেখতে থাকি। আবার একই দূরত্বেও দেখতে পাই। কিন্তু চলচ্চিত্রে তা হয় না। দূরে ও কাছে আছে বোঝাবার জন্য ক্যামেরা এগিয়ে পেছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ধরা যাক—'লং সট'-এ দেখলাম যে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। তারপরেই দেখলাম 'ক্লোজ্ সট্'-এ কে খেলছে। অন্যদিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখালাম কে যেন দৌড়ে আসছে বল দিতে। কাছে আসতেই দেখা গেল কে বল দিচ্ছে। আবার লং-সটে দেখলাম যে ফিল্ডাররা বল ধরতে ছুটছে যাতে বুঝতে পারা যায় যে এই ফিল্ডারদের সঙ্গে খেলার সম্বন্ধ আছে।

নানা দৃষ্টি-কোণ ও দৃশ্যের আকার পরিবর্তন করার অর্থ হচ্ছে একঘেয়েমী দূর করা, দর্শকদের দৃষ্টির গতি পরিবর্তন করা আর যা দেখাতে চাইছি তা দেখতে দেওয়া।

ক্লোজ্‌সটে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাটস্‌ম্যানের চোখে মুখে ভয়। কেন ভয়—তার কারণ দেখাতে গিয়ে দেখালাম লংসটে যে বোলার তীব্রবেগে বল নিয়ে ছুটে আসছে। প্রতিটি দৃশ্য পরস্পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে তা এই কাটের দ্বারা বোঝান নিশ্চয় সম্ভব হচ্ছে বলতে পারি। পরিচালক যদি এরজন্য ঠিক মত মতলব করে চলতে পারে তবে ছবিও ঠিক মতই চলবে।

এই সব সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য, একঘেঁয়েমী দূর করবার জন্য, ছবির প্রাণ সৃজন করবার জন্য পরিচালককে কাটের নিয়মগুলি জানতে হয়। যেখানে সেখানে কাট্ করলেই চলে না। কাটের একটা অর্থ থাকা চাইই। তা না হলে দর্শকদের বোঝানো যাবে না যা কাহিনী মারফৎ বলতে চাইছি। দর্শকদের মনে ছবি দেখার আনন্দ এনে দিতে হবে, নাটকীয় মূল্য এনে দিতে হবে। তা না হলে ছবি পরিচালনা করায় অনর্থক অর্থ ক্ষতি হয়ে যাবে। সত্যি কি না—একটু ভেবে দেখতে বলি।

এখন ধরা গেল যে কাট্ দ্বারা ছবি প্রাণবন্ত হয়। এখন এটা জানতে হবে যে কতরকম কাট্ আছে। জেনে রাখা কি ভাল নয়?

সাধারণতঃ 'লং সট্' 'মিডিয়াম সট্' 'ক্লোজ্ আপ্' ও 'ইন্‌সার্ট' ব্যবহার করা হয়। তবে এর ভেতরেও কিছু রকম ফের আছে। এখন দেখা যাক কাকে কি বলে।

লং সট্—বিষয় বস্তুকে প্রতিষ্ঠা করে দূর থেকে দেখাবার জন্য ক্যামেরা দূরে বসিয়ে ছবি নিতে হয়। এতে সব কিছুই দেখা যাবে। তবে বিশেষ করে কাউকে দেখা যাবে না যাতে চিনতে পারা যায়।

ক্লোজ্ আপ্—যাকে দেখাতে হবে তার জন্য ক্যামেরা কাছে থাকবে। এখন ক্যামেরা এগিয়ে যেতে পারে বা অভিনেতা ক্যামেরার কাছে আসতে পারে। মানুষ হলে সাধারণতঃ তার কাঁধ থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছবি নেওয়া হয়।

মিডিয়ম্ সট্—লংসট্ ও ক্লোজ্ আপের মাঝ বরাবর ছবি নিতে হয়। অবশ্য অর্থ অনুযায়ী ও ঘটনা অনুযায়ী ভেবে দেখতে হয় যে কতখানি অংশ ছবিতে দেখালে অর্থ প্রকাশ পাবে।

ইন্‌সার্ট—বড় ক্লোজ্ আপের কাছাকাছি ধরণের ছবি নিতে হয়। যেমন হাত, বা ছুরি বা চাবি,ইত্যাদি। অর্থাৎ অনেক সময় যা দেখা যায়না বা নজরে পড়ে না, তা বিশেষ করে দেখাবার জন্য ইন্‌সার্ট দিয়ে দর্শকদের বোঝাতে হয়।

তবে কোন্ অবস্থায় কোন্ রকম সট্ প্রয়োগ করতে হবে সেই সম্বন্ধে এমন ধারনা থাকা উচিত যাতে অন্য রকম বা বেঠিক কিছু না দেখায়। মনে রাখতে হবে যে কারণ ছাড়া কাট্ হয় না, আর সব কাটের পিছনেই একটা দৃষ্টিভঙ্গী ও অর্থ থাকবে।

আবার দূরত্ব অনুযায়ী অনেক নাম করণ করা যেতে পারে। যেমন 'মিডিয়াম্ লংসট্' 'মিডিয়াম্ ক্লোজ্ আপ্', 'ফুল্ সট্', 'টু শটস্', 'ক্লোজ্ সট্‌স', ইত্যাদি। যদিও দূরত্বে পৃথক তবুও এই সব সটের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থ বোঝাবার জন্য দূরত্ব নির্দ্ধারণ করাই হচ্ছে সটের রকম ফের। এই দিকে জ্ঞান থাকলে যে অনেক উপকার হবে তা বলাই বাহুল্য।

যখন ছবি তোলা হয় নানা রকম কাটের সমন্বয়ে—তখন ঐ সব সট্ লাগাতে হয়। যখন ছবি তোলা হয় তখন পর পর সব ছবি তোলা হয় না। হয় আগে লংসট, পরে ক্লোজ সট্, ইনসার্ট, ইত্যাদি নেওয়া হয়। তবে সেই সব কাটের একটা ধারা আছে। ধরা যাক দুইরকম কাটের রকম ফের বা কৌশল আছেঃ

'ম্যাচ্ কাট্' এবং 'কাট্ এওয়ে' বা 'কাট্ ব্যাক্'।

ম্যাচ কাট্ তাকেই বলে যার সঙ্গে পূর্ব দৃশ্যের সম্বন্ধ আছে। আর যদি না থাকে তবেই হয় কাট্ এওয়ে বা কাট্ ব্যাক্। একটু নমুনা দিলেই বোধ হয় বুঝতে সুবিধা হবেঃ

বহির্দৃশ্য। লং সট। খেলার মাঠ। রহিম আসছে দূর থেকে ক্যামেরার দিকে। ম্যাচ কাট্ করে দেখালাম রহিমকে ক্লোজ্ আপে ক্যামেরা এগিয়ে নিয়ে যে সে কে?

ম্যাচ্ কাট্-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধারা যে ঠিক আছে তা বোঝান। এতে দৃশ্য বদল হয় তবে তা যেন দর্শকদের মনে স্থান না পায় তা দেখতে হবে। একটা দৃশ্যের ভিতর কত রকম ভাবে ক্যামেরা বদল হয় তা সাধারনে জানে না। কেননা পরিচালক চায় এ্যাক্‌সন্ বা কাজ দেখাতে আর কল্পনা ব্যক্ত করতে। তারজন্য নানা ভাবে ক্যামেরার গতি ও স্থান পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে।

এই ম্যাচ্ কাট্ দ্বারা দৃশ্যের রকম ফের দেখানো যায়। চেহারার আকার ছোটবড় হতে পারে। তবে বেশভূষার কোন পরিবর্ত্তন হবে না, ভাবের কোন রূপ বদল হবেনা, স্থান ও স্থিতির কোন কিছু আদল বদল হবে না।

মনে রাখতে হবে যে প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় দৃশ্যের যেন মিল থাকে। এইদিকে অনেক ভুল হয়ে থাকে। এর জন্য হতে হবে সতর্ক। তবে দেখতে হবে যে মিল ঠিক আছে কি না। বিশেষ করে স্থিতি, গতি, ও দৃষ্টি ঠিক আছে কিনা।

'কাট্ এওয়ে' বা 'কাট্ ব্যাক্' অনেক সময় মিলানো যায় না। 'জাম্প' বা হঠাৎ ছবির দ্রুত গতি প্রায় চোখে পড়ে যখন একসঙ্গে কাট্ দ্বারা মিলানো যায় না। সেই জন্য অনেক সময় এমন একটী অযাচিত দৃশ্য দুটি কাটের মধ্যে এনে সংযোগ করা হয়, যার ফলে অনেক ছোট খাটো ভুল ধরা পড়ে না অনেক ক্ষেত্রে।

ছবিতে দেখছি ব্যাটস্ম্যান তাকিয়ে আছে। কিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তখন কাট্ এওয়ে করে দেখালাম অন্য একটী দৃশ্য যেখানে বোলার বল নিয়ে ছুটে আসছে।

ছবিতে ক্লোজ আপে দেখা গেল নায়ককে। সে হাসছে কার দিকে যেন তাকিয়ে। তখন কাট্ এওয়ে করে দেখালাম নায়িকাকে ক্লোজ আপে—যখন সে একটী ছবির দিকে তাকিয়ে দেখছে পরে নায়কের দিকে মুখ ফেরালো। পরিচালক কাট্ এওয়ে দ্বারা কখনও কখনও দর্শকদের দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়েই দেখাতে চায়, আবার কোন কোন সময় নায়ক-নায়িকা বা অন্য কোন চরিত্রের দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখাতে চায় যা তারা দেখছে।

ছবিতে দেখলাম নায়ক মোটরে চড়ল। গাড়ী ছাড়ল। কাট্ এওয়ে করে দেখালাম ফটকের সামনে নায়িকা পায়-চারী করছে। নায়কের গাড়ী সেখানে এসে থামল। এখানে নায়কের গাড়ী চালানোর সারা পথের ছবি দেখালাম না। তাতে সময় নষ্ট হত। এই সময় বাঁচানোর জন্য কাট এওয়ে করে নায়িকাকে এনে দেখালাম। ফলে ফিল্ম বাঁচল। এমন কি সময়ও বাঁচলো। দর্শকরা হাঁপিয়ে উঠল না। মনে রাখতে হবে যে ফিল্মের ভিতর এমন ভাবে সময় দেখাতে হয় যা সাধারণ সময়ের চাইতে খুবই কম।

আর একটী উদাহরণ দিলে আমার মনের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধরা যাক একজনকে ১০ বছর দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছে। এখন ১০ বছরের সব ঘটনা তোমার ছবি তুলে দেখান সম্ভব নয়, তাই দশ বছরের ছবি কয়েক সেকেণ্ডে বুঝিয়ে দেওয়া যায় কাট্ এওয়ে দ্বারা। নায়ক দ্বীপান্তরে গেল, কাট এওয়ে করে দেখালাম দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার বা মাসপঞ্জী ঝুলছে। দশবার দশটি ক্যালেণ্ডার দেখালাম। বুঝিয়ে দিলাম যে দশ বছর শেষ হল।

কেবল এই ভাবেই যে দেখাতে হবে তার কোন অর্থ নেই। অন্য যে কোন ভাবে দশ বছর যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল তা দেখানো যেতে পারে।

তবে ম্যাচ্ কাট্ বা কাট্ এওয়ের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পোষাক পরিচ্ছদ, স্থিতি, হাবভাব, প্রভৃতি যেন না টপ্ করে বদলে যায়। প্রথম দৃশ্যে ক্রিকেট ব্যাট হাতে নায়ককে দেখা গেল। দ্বিতীয় দৃশ্যে নায়ককে চায়ের কাপ্ হাতে বা অন্য কোন ভাবে দেখা যাবে না। হাতে ব্যাট থাকলে—দ্বিতীয় দৃশ্যেও ব্যাট থাকবে। প্যান্ট পরে থাকলে দ্বিতীয় দৃশ্যেও প্যান্ট পরেই থাকবে।

স্থিতিতে যেন ভুল না হয়। হাতে বই থাকলে—পরের দৃশ্যেও হাতে বই থাকবে। যখনই কাট্ হবে—তখনই ভুলে যেন অন্য কিছু করা না হয়।

তবে কাট এওয়ে করে গতি বা স্থিতি বদল করা যেতে পারে। দেখালাম নায়ক ফুটবল্ খেলছে। কাট এওয়ে করে দেখালাম এক জায়গায় থিয়েটার হচ্ছে, নায়ক সেখানে এসে থিয়েটার দেখছে। বুঝে নিতে হবে যে থিয়েটার হয়ত অনেকক্ষন ধরে চলছিল। তার ভিতরে নায়ক চলে আসতে পারে।

গতির ভিতর মিল রাখতে হয়। পর্দার বাম পাশ থেকে নায়ক আসছে। চলে গেল পর্দার ডান পাশে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পাশ থেকে নায়ক বাম পাশে যাচ্ছে। এতে গোলমাল লাগতে পারে। হয়ত কোন কারণ থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে তার প্রমাণ দিতে হবে যে কেন ফিরলো। তবে দর্শকরা ভুল ধরবে না। অন্যথায় ভুল ধরবে।

গতি বদল করতে হলে ক্যামেরার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে

করতে হবে। ভালই হয় যদি ক্যামেরার মুভ্‌মেন্টের সময় কোন কাট্‌ না হয়। প্যান বা ডলি সটের সময় কাট্‌ হবে না কোনও মতেই। দৃষ্টি চাহনি যাতে ঠিক হয় তা দেখতে হবে। যাতে দর্শকদের মনে কোন গোলমালের আশঙ্কা না থাকে তাও পরিচালককে দেখতে হবে।

যদি দৃশ্যে দুইজনের অধিক অভিনেতা থাকে আর তারা যদি যাতায়াত দ্বারা গতির সৃষ্টি করে, জায়গা বদল করে, তখন দৃশ্য মিলানো খুব কঠিন হয়ে থাকে। তবে প্ল্যান ঠিক করতে পারলে কোন গোলমাল হবে না বলতে পারি। এর জন্য দরকার হয় আন্দাজ জ্ঞান।

তবে ক্যামেরা ভিউ পয়েন্ট আর ক্যামেরার ভিতর অনেক পার্থক্য। ক্যামেরা এগিয়ে পেছিয়ে যাতায়াত করান সম্ভব। তাতে স্থান পরিবর্ত্তন হবে, কিন্তু ভিউ পয়েন্ট পরিবর্ত্তন হবে না। যে কোন সময় দৃশ্যের ভিতর একটা আন্দাজ মত রেখা ঠিক করে নিতে হবেই। তবে দেখতে হবে যে অন্য দৃশ্য তার ভিতর তুলতে হলে যেন আন্দাজের রেখা ছাড়িয়ে না যাওয়া হয়।

এরপর কম্পোজিসন্‌ চাই ছবির ভিতর, আর তাতেই আসবে সমতা—তাতেই আসবে স্থিতি। ছবির বিষয় বস্তুও ঠিক মত স্থাপন করতে হবে যাতে কাট্‌ করলে বিসদৃশ না দেখায়। এর জন্য নায়ককে একই ফ্রেমের ভিতর ঠিক থাকতে হবে যখন দুটি সট্‌ কাট্‌ করা হবে। তাতে আবার কম্পোজিশন্‌ বদল করে দেখানো সম্ভব হয়। লং সট্‌ থেকে মিডিয়াম্‌—আবার ক্লোজ্‌ সট্‌ থেকে লং সট ইত্যাদি ভাবেও নেওয়া যেতে পারে। ক্লোজ্‌ আপ্‌ থেকে লং সটেও যাওয়া যেতে পারে, তাতে ভুল ধরা যাবে না। আবার দৃশ্যের মধ্যে দৃষ্টিকোণ বদল করতেও পারা যায়। একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে ছবি তুললে ভুল ধরা যেতে পারে, কিন্তু পৃথক দৃষ্টিকোণে দোষ ধরা পড়বে না।

নান্য-পন্থা

শান্তশীল দাশ

তবু এই অন্ধকার পার হ'য়ে যেতে হবে—
পার হ'য়ে যেতে হবে অপমৃত্যু ভয়ঃ
জীবনের কাছে এসে মানবেই তারা পরাজয়
দূরে দূরে থাকে যারা, অশরীরী ভীরুতার ছায়া,
ছুঁড়ে দেয় অসংখ্য সংশয়।

এ জীবন অমৃতের অংশ এক, অপমৃত্যু নেইঃ
ভুলে গেছি একেবারে; ভুলিয়েছে এই
বিংশ শতাব্দীর দম্ভ—আড়ম্বর শুধু আড়ম্বর
সংখ্যাতীত; তবু হায়, সেই মৃত্যুকেই—
মেনেছি সমাপ্তি বলে; হেরে গেছি মৃত্যুর কাছেই।

বারে বারে মৃত্যু তাই আসে আর হানা দিয়ে যায়,
ভরে দেয় এ-জীবন চরম গ্লানির ব্যর্থতায়।
খোঁজেনাকো কেউ তবু সেই পথ,
স্থির অচঞ্চল,
জ্যোতির্ময়। দিকে দিকে ওঠে তাই বেদনার
দীর্ঘশ্বাস, ঝরে অশ্রুজল।

সেই পথে যেতে হবে, নেই আর অন্য কোন পথ;
শুনতেই হবে সেই ডাক,
আর নিতে হবে নতুন শপথ।
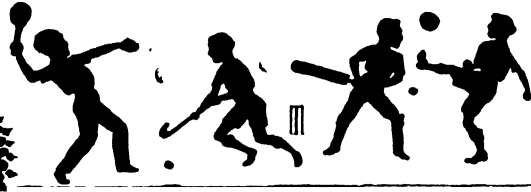
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেষ্ট :

ইংল্যাণ্ড : ৩২১ রান (ব্যারিংটন ১০১ রান। ডেভিডসন ৪৩ রানে ৩ উইকেট পান) ও **২৬৮ রান** (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন ৯৪, শেফার্ড ৬৮ এবং কাউড্রে ৫৩ রান। বেনো ৭১ রানে ৪ এবং ডেভিডসন ৮০ রানে ৩ উইকেট পান)

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৪৯ রান (বার্জ ১০৩, ও' নীল ৭৩ এবং বেনো ৫৭ রান। টিটমাস ১০৩ রানে ৫ উইকেট পান) ও **১৫২ রান** (৪ উইকেটে। বার্জ ৫২ নট আউট এবং লরী ৪৫ নট আউট। এ্যালেন ২৬ রানে ৩ উইকেট পান)

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৫ম অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে ১৯৬২-৬৩ সালের ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই নিয়ে ৪৬টি টেস্ট সিরিজ খেলা হল এবং এ পর্য্যন্ত মোট ৪টি টেস্ট সিরিজ ড্র গেল। ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেলেও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ার হাতেই এই দুই দেশের টেস্ট খেলায় জয়লাভের স কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' পুরস্কার থেকে গেল। কারণ দুটি টেস্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়ার হাতে ইংল্যাণ্ডকে পর বরণ করতে হয়েছিল।

আলোচ্য পঞ্চম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড টসে জয় করে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্য ১৯৫ রান ওঠে ৫টা উইকেট পড়ে।

দ্বিতীয় দিনে ৩২১ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। তখন চা-পানের জন্যে খেলা ভা আধ-ঘণ্টা বাকি ছিল। এই দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংসের খেলায় ৩টে উইকেট পড়ে গিয়ে ৭৪ দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ড এই দিনের খেলায় নিজেদের প্র বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ২৮৫ রান দাঁড়ায় ৬টা উই পড়ে। ওনীল এবং বার্জের ৪র্থ উইকেটের জুটি ১০৯ যোগ ক'রে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বৃষ্টির এই দিনে ৭০ মিনিটের খেলা বিফলে যায়। এই অষ্ট্রেলিয়া ৩টে উইকেট খুইয়ে পূর্ব্ব দিনের ৭৪ র (৩ উইকেটে) সঙ্গে মূল্যবান ২১১ রান করে।

খেলার চতুর্থ দিনে ৩৪৯ রানের মাথায় অষ্ট্রে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ২৮ রানের ি পড়ে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে উইকেট খুইয়ে এই দিনে ১৬৫ রান করে। এই

গেল ইংল্যাণ্ড ১৩৭ রানে অগ্রগামী হয়েছে এবং হাতে আছে ৭টা উইকেট।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় দেখা গেল, ইংল্যাণ্ডের রান হয়েছে ২৬৮ (৮উইকেটে)। এই রানের মাথায় ইংল্যাণ্ড য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা যখন হাতে পেল, খেলা শেষ হ'তে আর ২৪০ মিনিট বাকি। এই র মধ্যে খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪১ রান সহজ কথা নয়—বিশেষ করে পঞ্চম দিনের ক্ষত-তে উইকেটে। অষ্ট্রেলিয়া কোন রকম ঝুঁকি নিতে পায়নি। তার এ ঝুঁকি নেওয়ার কোন প্রয়োজন না। কারণ এ খেলা ড্র গেলেও 'এ্যাসেজ' সম্মান র হাতেই থেকে যাবে। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট দেখা গেল অষ্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়িয়েছে ১৫২, ৪টে কেট পড়ে।

রিচি বেনোর নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয়া টেস্ট ক্রিকেট খেলার হাসে এক উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করলো। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া রিচি বেনোর ত্ব ইংল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান চারটি দেশের বিপক্ষে মোট ৬টি টেস্ট সিরিজ ল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩টি) খেলে উপর্য্যুপরি পাচটি টেস্ট জে জয় লাভ ক'রে শেষ ১৯৬২-৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের ক্ষ টেস্ট সিরিজ ড্র করলো।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

(টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

১৮৭৭—১৯৬৩

	টেস্ট খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	খেলা ড্র
ল্যাণ্ড	৮৬	২৫	২৩	৩৮
ট্রেলিয়া	১০২	৩৯	৫৪	৯
টঃ	১৮৮	৬৪	৭৭	৪৭

জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীর জিমখানা কোর্টে অনুষ্ঠিত জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস ঃ রমানাথন কৃষ্ণান ৬-৪, ৬-০ ও ৬ ২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশ কুমার বনাম জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালের খেলা ৭-৫, ৬-৪, ৫-৭, ৬-৮ ৩-৪ গেমে অসমাপ্ত থাকে।

মহিলাদের সিঙ্গলস ঃ রতন থাডানি ৬-২ ও ৬-২ গেমে চেরী চিনুয়ানাকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ঃ রতন থাডানি এবং লীলা পাঞ্জাবী ৬-২ ও ৬-৩ গেমে চেরি চিনুয়ানা এবং শশীকলাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ঃ রতন থাডানি এবং বিনয় দেওয়ান ৬-২, ৪-৬ ও ৬-২ গেমে এল উডব্রীজ এবং ইশিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল ঃ

বোম্বাই ঃ ৫৫১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বাপু নাদকার্নী ২১৯, রমাকান্ত দেশাই ১০৭, জি এস রামচাদ ১০২ নট আউট এবং পলি উমরীগড় ৬৩ রান। জি আর সুন্দরম ৭৩ রানে ৩ উইকেট পান)

রাজস্থান ঃ ১৯৬ রান (কিষণ রুংটা ৬৪ এবং হনুমন্ত সিং ৬২ রান। সেয়ার্স ৩৬ রানে ৬ উইকেট পান) ও **৩৩৬** রান (বিজয় মঞ্জরেকার ১০৮, কিষণ রুংটা ৮০, হনুমন্ত সিং ৫০ এবং জি আর সুন্দরম ৫২ রান। সেয়ার্স ৮৫ রানে ৩, রামচাদ ৩৫ রানে ২ এবং নাদকার্নী ৬০ রানে ২ উইকেট পান)

জয়পুরে মহারাজা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৬২-৬৩ সালের জাতীয় ক্রিকেট রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই এক ইনিংস এবং ১৯ রানে গত দু'বছরের রানার্স-আপ রাজস্থানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি পাচবার এবং মোট ১৪ বার রঞ্জিট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

রাজস্থান টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেনি। বোম্বাই দলের খেলার সূচনা ভাল হয়নি; দলের ৪৯ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ে যায়। খেলার এই অবস্থায় নাদকার্নীর সঙ্গে খেলতে নামেন দলের অধিনায়ক উমরীগড় এবং ৪র্থ উইকেটের জুটিতে তাঁরা দলের ১১৫ রান যোগ করেন। প্রথম দিনের

খেলায় রান দাঁড়ায় ১৬৪—৪টে উইকেট পড়ে। উইকেটে অপরাজেয় থাকেন নাদকার্নী (৫৮ রান) এবং দেশাই (০)।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, বোম্বাই দলের ৫৫১ রান, ৬টা উইকেট পড়ে। বোম্বাই দ্বিতীয় দিনের খেলায় দুটো উইকেট খুইয়ে ৩৮৭ রান যোগ করে। এই দিনে নাদকার্নী এবং দেশাই ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৭৮ এবং ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে নাদকার্নী এবং রামচাঁদ ২০৩ রান যোগ করেন। নাদকার্নী ৬০০ মিনিট খেলে তাঁর ২১৯ রান তুলেছিলেন—বাউণ্ডারী ছিল ২৩টা। রাম চাঁদ ১০২ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে বোম্বাই ব্যাট করেনি, পূর্ব্ব দিনের ৫৫১ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিনে চা-পানের পরবর্ত্তী খেলার ২৫ মিনিটের মাথায় রাজস্থান দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার স্টেয়ার্সের বলে রাজস্থানের ৬টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৩৬ রানে। ৩৫৫ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়ে রাজস্থান দ্বিতীয় ইনিংশের খেলা আরম্ভ করে। এই দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসে রান দাঁড়িয়েছে ৫০, ৩টে উইকেট পড়ে।

চতুর্থ দিনে ইনিংস পরাজয় থেকে রেহাই পেতে রাজস্থান আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই দিনের খেলার শেষে দেখা গেল রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতে ৩১৬ দাঁড়িয়েছে, ৮টা উইকেট পড়ে। ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পেতে তখনও ৩৯ রান করতে বাকি ছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে রাজস্থান বাকি দুটো উইকেটে ২০ রানের বেশী তুলতে পারেনি। ফলে তাদের এক ইনিংস এবং ১৯ রানে পরাজয় বরণ করতে হয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে ৫ ঘণ্টা আগেই এই ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ১৯৩৫ সালে আরম্ভ হয়েছে। দীর্ঘ ২৯ বছরের ইতিহাসে এই ৯টি প্রদেশ রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছেঃ বোম্বাই (১৪ বার), বরোদা (৪ বার), হোলকার (৪ বার), মহারাষ্ট্র (২ বার) এবং একবার ক'রে রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে নওনগর, হায়দরাবাদ, বাংলা, পশ্চিম ভারত এবং মাদ্রাজ। উপর্য্যুপরি সর্ব্বাধিক বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের রেকর্ড করেছে বোম্বাই—পাচবার (১৯৫৯—১৯৬৩)।

অর্জ্জুন পুরস্কার ঃ

খেলাধুলায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের ১৯৬২ সালের রাষ্ট্রীয় 'অর্জ্জুন পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

উইলসন্ জোন্স (বিলিয়ার্ডস); নরেশকুমার (টেনিস); তারলোক সিং (এ্যাথলেটিক্স), টি বলরাম (ফুটবল) মীনা সাহ (ব্যাডমিণ্টন); পদম বাহাদুর মল (মুষ্টিযুদ্ধ) নৃপজিৎ সিং (ভলিবল); মালওয়া (কুস্তি) এবং লক্ষ্মী কান্ত দাস (ভারোত্তোলন)।

মহম্মদ নিশার ঃ

ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্ম নিশার তাঁর ৫২ বছর বয়সে লাহোর রেল স্টেশনে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মহম্মদ নিশার ভারতবর্ষের পক্ষে মোট ৬টি সরকার টেস্ট খেলেন। টেস্টে তাঁর বোলিং সাফল্য : খেলা ওভার ২০৯.৫, মেডেন ৩৪, রান ৭০৭ এবং উইকেট ২৫।

টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ২০০ উইকেট ঃ

১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবো মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার যে খেলাটি সুরু হ ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে সেই খেলাটিই প্রথম সরকা টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ থে ১৯৬৩ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় মাত্র ৬জন বোলার ২ অথবা তার বেশী উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয় বিশ্ব রেকর্ড করেছেন ইংল্যাণ্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যান—উইকে পাওয়ার সংখ্যা ২৫০। যারা সরকারী টেস্ট ক্রিকে খেলায় ২০০ অথবা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন তাঁ বোলিং সাফল্য নীচের তালিকায় দেওয়া হ'ল ঃ

	টেস্ট	রান	উইকেট	গ
ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড)	৫৬	৫৩৯৫	২৫০	২১
ব্রায়ান স্ট্যাথাম (ইংল্যাণ্ড)	৬৭	৫৮৬৯	২৪২	২৪
এ্যালেক বেডসার (ইংল্যাণ্ড)	৫১	৫৮৭৬	২৩৬	২৪.
রিচি বেনো (অষ্ট্রেলিয়া)	৫৯	৬২৫৫	২৩৬	২৬.
রে লিণ্ডওয়াল (ঐ)	৬১	৫২৫৭	২২৮	২৩.
ক্লারি গ্রিমেট (ঐ)	৩৭	৫২৩১	২১৬	২৪.

উপরের ৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র ফ্রে ট্রুম্যান ছাড়া বাকি পাচজন খেলোয়াড় তাঁদের ২০০ টেস্ট উইকেট পান দশ হাজার বল দিয়ে। ট্রুম্যান তঁ ২০০তম উইকেট পান ৯,৮৭৫ বলের মাথায়।

ইংল্যাণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ঃ

নিউজিল্যাণ্ড : ২৬৬ রান (জন রীড ৭৪ রা ট্রুম্যান ৭৫ রানে ৭ উইকেট পান)।

ও **১৫৯** রান (জন রীড ১০০ রান। টিটমাস রানে ৪, লার্টার ৩২ রানে ৩ এবং ট্রুম্যান ১৬ রানে উইকেট পান)।

ইংল্যাণ্ড : ২৫৩ রান (ব্যারিংটন ৪৭ এবং ডেক্সা ৪৬ রান। মোজ ৬৮ রানে ৩ উইকেট পান)।

ও ১৭৩ রান (৩ উইকেটে। ব্যারিংটন ৪৫, কলিন কাউড্রে ৩৫ নট আউট)

নিউজিল্যাণ্ডের ক্রায়েষ্টচার্চে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করলে ইংল্যাণ্ড ৩—০ টেষ্ট খেলায় ১৯৬৩ সালের টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' লাভের গৌরব লাভ করে।

খেলার প্রথম দিনে নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের ৩ রানের মাথায়, ইংল্যাণ্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যান তাঁর ২৪২তম উইকেট পেলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ডের সমান করেন এবং এই প্রথম ইনিংসেই তিনি বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট খেলার শেষে দেখা গেল, টেস্ট ক্রিকেটে ট্রুম্যানের উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫০টি, ৫৬টি টেস্ট খেলায়।

বর্তমানে ইংল্যাণ্ড-নিউজিল্যাণ্ডের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ফলাফল দাঁড়িয়েছে, মোট খেলা ৩১ ইংল্যাণ্ডের জয় ১৪, নিউজিল্যাণ্ডের জয় ০ এবং খেলা ড্র ১৭।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা :

১৯৬৩ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার (মাদ্রাজের কর্পোরেশন ষ্টেডিয়াম) ফাইনালে ভারতীয় রেলদল ০—১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে 'রঙ্গস্বামী কাপ' জয় করেছে। ইতিপূর্ব্বে রেলদল পাঁচ বার এই কাপ পেয়েছে। রেলদলের প্রতিদ্বন্দী সার্ভিসেস দল এই নিয়ে ৮ বার ফাইনাল খেলে কাপ জয় করেছে ৪ বার (১৯৫৩, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০)।

বাংলা দল প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে তৃতীয় দিনের খেলায় ০—১ গোলে মাদ্রাজের কাছে পরাজিত হয়। প্রথম দিন ০—০ ও দ্বিতীয় দিন ১—১ গোলে খেলাটি ড্র ছিল।

সেমি-ফাইনাল খেলার ফলাফল :

সার্ভিসেস	২, ০, ১	:	পাঞ্জাব ২, ০, ০
রেলওয়ে	১	:	মাদ্রাজ ০

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস :

অক্সফোর্ড—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯তম বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ড পাঁচ লেংথ দূরত্বে গত দু'বছরের বিজয়ী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে। বর্তমানে উভয় দলের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : কেম্ব্রিজের জয় ৬০ বার, অক্সফোর্ডের জয় ৪৮ বার এবং একবার ডেড্ হিট (১৮৭৭)।

শোচনীয় দুর্ঘটনা ঃ

অষ্টাদশ জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতার শেষ দিনে যখন দিল্লীর কিচনার রোডের উপর ১৮০ কিলোমিটার রোড রেস শেষ হ'তে আর মাত্র তিন মাইল পথ বাকি ছিল, সেই সময় আকস্মিকভাবে একটী মিলিটারী মোটর গাড়ী সম্মুখভাগের প্রতিযোগিদের মধ্যে ঢুকে পড়ে শোচনীয় দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলেই রেলওয়ে দলের প্রকাশ সিং (বয়স ৩৫) মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং রেলওয়ে দলেরই কানিয়াপ্পান (বয়স ৩০) হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।

ক্রীড়াঙ্গনে অপর একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে আমেরিকার লস্ এ্যাঞ্জেল্স শহরে। গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে বিশ্বফেদারওয়েট চ্যাম্পিয়ান ডেভী মূর (আমেরিকা) তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দী কিউবার স্থগার রামোসের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে দশম রাউণ্ডের লড়াইয়ে রিংয়ের দড়ির উপর ছিটকে পড়েন। এরপর তিনি আর লড়াইয়ে যোগদান করতে পারেননি। ফলে তাঁকে বিশ্ব খেতাব হারাতে হয়। লড়াইয়ের পর ডেভী মূর ড্রেসিং রুমে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এই অবস্থাতেই তিনি ২৫শে মার্চ্চ তারিখে দেহত্যাগ করেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৩য়) (৪র্থ সং)—৫·০০
শশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "পথের শেষে ও ধর্ষিতা" (একত্রে)—৫·৫০
ডাঃ গুরুদাস পাল প্রণীত উপন্যাস "দেওয়ালী রাত"—৩্
শ্রীমধুসূদন মজুমদার প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "রাজেন্দ্রপ্রসাদ" —০·৫০
দৃষ্টিহীন প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "যেও না চলে"—৩্
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত "কথাসরিৎ-সাগরের গল্প"—০ ৭০
শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "পাতালপুরীর যাত্রী"—১্
শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায় প্রণীত স্বরলিপি-গ্রন্থ "যুগ-সঙ্গীত" (১ম)—২

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বলরামের দেহত্যা

শিল্পী—
অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধু

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে;
গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও
বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ। কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যান্টল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

 বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্

আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্র

ডক্টর রমা চৌধুরী

বর্তমান যুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। আজকাল "সোশ্যালিজম্" এই কথাটী সকলেরই মুখে মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং একটী সাধারণ ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে, একমাত্র এই "সোশ্যালিজমের" সাহায্যেই পৃথিবীর সকল দুঃখকষ্ট নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে এবং জগতে একটী আদর্শ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষ নিয়েই যখন সমাজ, তখন সমাজের সাধ্যসাধন, অথবা মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য লাভের উপায় সম্বন্ধে একটী সুষ্ঠু সুন্দর, উপযুক্ত মতবাদ সকল সামাজিক জীবের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। এই কারণে, সমাজতন্ত্র নিশ্চয়ই অতি-প্রয়োজনীয়। কিন্তু কেবলমাত্র না মোহে না ভুলে, প্রকৃত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি ফেরানই আমাদের প্রধান কর্তব্য। "সমাজতন্ত্র" বলতে আ সত্যই কি বুঝি তার আদর্শ এবং প্রণালীই বা কি বর্তমান্ "সমাজতন্ত্র"সমূহ সত্যই সমাজের, তথা মান প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়েছে কিনা এই সকল বি গভীরতর চিন্তার দিন আজ এসেছে।

সেই দিক্ থেকে, আমরা মানবপ্রেমিক ও মা সেবক স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ ও বাণী আলো করতে পারি। সকলেই জানেন যে, স্বামীজীর

নের মূলমন্ত্র ছিল "আধ্যাত্মিকতা" বা "ধর্ম"।" নি নিজেই বলে গিয়েছেন—

"My mission is to show that Religion is erything, and, in everything."

"ধর্মই যে সব, এবং সবের মধ্যেই যে ধর্মই নিহিত আছে—তাই দেখানই আমার জীবনব্রত।"

সেজন্য স্বামীজী তাঁর সকল মতবাদই এই ধর্মের ত্তিতেই প্রপঞ্চিত করেছিলেন—এমন কি, তাঁর াজতন্ত্রপর্যন্ত। বস্তুতঃ, "আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্র" এই নাম বর্ণনাকে যেন মনে হয় স্ববিরোধ-দোষদুষ্ট। কারণ, সমাজন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হল সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলের অন্ন-বস্ত্র-শ্রয়-শিক্ষা প্রমুখ মূলীভূত অধিকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। রূপে সমাজতন্ত্রের বিষয়বস্তু হল, সাধারণ, দৈনন্দিন, বহারিক জীবন এবং এরূপ জীবনের মধ্যে ধর্মের, ধ্যাত্মিকতার, পারমার্থিক তত্ত্বের স্থান কোথায়?

কিন্তু স্বামীজী ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক জীবনের ধ্য এরূপ স্বরূপগত ভেদ কোনোদিনই স্বীকার করতেন । জীবন একই এবং তার বিভিন্ন অংশ অথবা প্রকার াই একই জীবনের অংশ অথবা প্রকার বলে, সে সবের ধ্যে এরূপ মূলীভূত পার্থক্য কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। ই কারণে, ধর্ম অথবা আধ্যাত্মিকতা যদি জীবনের কেন্দ্রীত তত্ত্বই হয়, তাহ'লে তা' যে কেবল পারমার্থিক ীবনেরই তাই হবে, ব্যবহারিক জীবনের একেবারেই য়—তা হতে পারে না। সেজন্য স্বামীজীর মতে, ধর্ম থেবা আধ্যাত্মিকতা সমগ্র জীবনেরই একমাত্র ভিত্তি বলে, মাজতন্ত্রেরও ঠিক তাই। এতে স্ববিরোধ কিছুই নেই; াছে কেবল যা অতি স্বাভাবিক, এবং সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ।

এরূপ, "আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্রের" প্রকৃত অর্থ কি? র প্রকৃত অর্থ দুটী:—(১) মানুষ কেবলমাত্র দেহমনোারী জীবমাত্রই নয়; কিন্তু তা ছাড়াও আরো অনেক কছু, তার চেয়েও আরো অনেক বেশী; তার উপরেও ারো অনেক উচ্চ। তবে সে কি? সে অমর আত্মা, স পূর্ণ পবিত্র আত্মা, সে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা। জাগতিক ক্ থেকে তার দেহ ও মন থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে, াত্মাই তার স্বরূপ। সুতরাং, মানুষের কথা ভাবতে গলে, আত্মার কথা বাদ দেওয়া চলে না কোনোক্রমেই।

(২) মানুষ দীনহীন, ক্ষুদ্র ক্ষীণ, পাপী তাপী, দুর্বল অসহায় নয় একেবারেই। কারণ, মানবই স্বয়ং ব্রহ্ম এবং সেজন্য নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দঘন।

প্রথম অর্থটীর কথাই প্রথমে ধরা যাক। এই মতবাদ কি সত্যই গ্রহণযোগ্য? দর্শনশাস্ত্রের দিক্ থেকে এর মূল্য যতই থাকুক না কেন, অন্ততঃ, সমাজতন্ত্রের দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা কিছুই নেই—নিশ্চয়ই এই কথাই সাধারণ সমাজতন্ত্রবাদীরা বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, সমাজতন্ত্র একটী দুরূহ ব্যাপার, তার নিজের সমস্যাও অল্প নয়। কারণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে, দেহ-মনের সমাহার মানবে—দেহ ও মন উভয়কেই দিতে হবে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা। আধুনিক সমাজতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই গঠিত ব'লে, সমাজতন্ত্রেও দেহ ও মনকে দিতে হবে সমান মূল্য ও মর্যাদা। এটীই একটী অল্প গুরুতর সমস্যা নয়। তার উপরে, অপর একটী নবতত্ত্ব "আত্মাকে" সমাজতন্ত্রে অকারণে ঢুকিয়ে সমস্যাসমূহকে দুর্বোধ্যতর ও দুর্লঙ্ঘ্যতর করার অত্যাবশ্যকতাটা কি?

এর উত্তরে, স্বামীজীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বল্‌ব যে, অত্যাবশ্যকতাটা এইখানেই যে, আত্মাকে সমাজতন্ত্রে ঢোকান, বা না ঢোকান কোনোক্রমেই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আত্মা মানবে চিরবিরাজমান আমরা তা জানি বা না জানি—মানি বা না মানি, তাতে ত কিছুই এসে যায় না, আত্মা মানবে চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। সুতরাং আত্মাকে বর্জন করে মানব-সম্বন্ধীয় কোনো তত্ত্ব বা মতবাদ প্রপঞ্চিত করার প্রচেষ্টা করলে তা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল হতে বাধ্য। এই কারণে, পাশ্চাত্য সমাজসেবকগণের অন্যদিক থেকে অতি সুষ্ঠু, শোভন, ন্যায়ানুমোদিত, বিজ্ঞানসম্মত, কৃপাপরবশ জনসেবামূলক মতবাদও আজ পর্যন্ত সমাজের, দেশ ও দশের কোনো সমস্যারই প্রকৃত ও সুন্দর সমাধান করতে সমর্থ হয় নি। সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, এটী অতি সত্য কথা; অপ্রিয় কথা নিশ্চয়ই; তা সত্ত্বেও অতি সত্য কথা সমভাবে। কারণ, শেষ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, আধুনিক জগৎ একেবারেই সুখী-জগৎ নয়—সাধারণ মাপকাঠির দিক্ থেকে হয়ত তা'

সাফল্যমণ্ডিত জগৎ হতে পারে, কিন্তু সুখী জগৎ নয় নিশ্চয়ই। বস্তুতঃ, প্রকৃত মাপকাঠির দিক্ থেকে, জগৎ এমন কি, সাফল্যমণ্ডিতও নয়। যেহেতু প্রকৃত সাফল্যের একমাত্র লক্ষণ হল আনন্দ।

তাহলে আমরা কি এস্থলে নীতিশাস্ত্রের ভোগবাদমাত্রই গ্রহণীয় বলে' স্বীকার করছি? না, তা' নয়। কারণ, ভোগবাদ বা Hedonism কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু এই মতবাদ মানুষকে পশু-স্তরে অবনমিত করে, কেবল দৈহিক ভোগকেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে ঘোষণা করে। সুতরাং আমাদের এই মতবাদ সাধারণ ভোগবাদ নয়, আনন্দবাদ। "ভোগ" ও "আনন্দ" সমার্থক নয়। যথা, ব্রহ্মে ভোগ নেই; কিন্তু আনন্দ আছে। বস্তুতঃ, বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেজন্য, জগৎও ঠিক তাই, যেহেতু জগৎও ব্রহ্মস্বরূপ। এই কারণেই, উপনিষদ্ সগৌরবে বলছেন :—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ)

"আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয়।"

স্বামীজীও একইভাবে বলছেন : —

"দর্শন-শাস্ত্র জোরের সঙ্গে বলে থাকে যে, এরূপ একপ্রকার আনন্দ আছে যা নিত্য ও অবিচারী। এই আনন্দ সাংসারিক ভোগসুখ নয়; অথচ, বেদান্ত প্রমাণিত করে যে, সাংসারিক সকলপ্রকার সুখ সেই একই শাশ্বত, প্রকৃত আনন্দেরই কণামাত্র। যেহেতু এই আনন্দ ব্যতীত অপর আর কিছুই নেই। প্রত্যেক মুহূর্তেই আমরা এই নিত্য-নির্বিকার-নিঃসর্ত—কেবল আনন্দই উপভোগ করি মাত্র—যদিও তা' তখন আমাদের নিকট আবৃত হয়েই থাকে, আমরা তার প্রকৃত স্বরূপও বুঝতে পারি না, এবং তাকে বিকৃত করে' ফেলি। কিন্তু যেখানেই বিন্দুমাত্রও আশীষলাভ আছে, আনন্দ লাভ আছে, উল্লাসোপভোগ আছে—এমন কি, তস্করের সুখভোগও আছে—সেখানেই সেই নিত্য-নির্বিকার কেবল আনন্দের প্রকাশও আছে। কেবল, তা' বাহ্যিক প্রভাব এবং পরিবেশের জন্য যেন আবৃত, বিপর্যস্ত হয়ে থাকে এবং সেজন্যই তার প্র[illegible] স্বরূপও জ্ঞাত হতে পারে না।" (৩—১৬৭)

এই কারণে, এরূপ প্রকৃত আনন্দকেই উপল[illegible] করতে হবে, কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমেই নয়, স[illegible] শাস্ত্রেরই মাধ্যমে—বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজতন্ত্র, রাজনী[illegible] অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই মাধ্যমে। বস্তুত[illegible] বর্তমান পাণ্ডিত্যাভিমানী জনদের গুরুতর ভ্রম হ[illegible] "ভোগকে" "আনন্দের" সঙ্গে সমার্থক বলে' গ্রহণ কর[illegible] ভোগস্বার্থসম্পন্ন ও সঙ্কীর্ণ আনন্দ নিঃস্বার্থ ও সর্বব্যাপী[illegible] ভোগ অভাবাত্মক, আনন্দ ভাবাত্মক, ভোগ স্বপ্নংসকা[illegible] আনন্দ স্বপূর্ণকারী। সেজন্যই, ভোগ কোনোক্রমেই আ[illegible] নয়। এবং তাত্ত্বিক দিক্ থেকে, স্বামীজীর মৌলিক[illegible] হল এই যে, তিনি সমাজতন্ত্রেও আত্মতত্ত্বকেই কেন্দ্রী[illegible] স্থান দান করেছিলেন এবং এই আত্মতত্ত্বই আনন্দত[illegible] অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও, আমাদের অন্তর্নি[illegible] দেবত্বকে, এবং সেই সঙ্গে, দেবসুলভ আনন্দকেও, উপল[illegible] করতে হবে। এইটাই হওয়া কর্তব্য ও আমাদের একম[illegible] উদ্দেশ্য। সেজন্য, সমাজের মাধ্যমেও, সাধারণ সামাজি[illegible] দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেও, আমাদের ব্রহ্মা[illegible] উপলব্ধি করে' পরমধন্য হতে হবে—এই হল ভারত[illegible] মতবাদ। অতএব, আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্রবাদ নিতা[illegible] প্রয়োজনীয়, যেহেতু এই আনন্দ দেহ-মনের আনন্দ [illegible] একমাত্র আত্মারই আনন্দ। সুতরাং, দর্শনে যেরূপ, [illegible] যেরূপ, নীতিতত্ত্বে যেরূপ, আত্মাই মূলগততত্ত্ব, সমা[illegible] তন্ত্রেও ঠিক সেরূপই হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সেহ[illegible] আত্মাকে বর্জন করে', কেবলমাত্র দেহ মনকে [illegible] কোনো সুষ্ঠু, সুন্দর, শুভঙ্কর সমাজতন্ত্র রচিত হ[illegible] পারেই না।

এই কারণে, স্বামীজী স্থির বিশ্বাস-ভরে বলছেন :—

"আমাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট পন্থাই আমা[illegible] অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সেই সকল আ[illegible] ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে[illegible] (৫—১৪৩)।

বস্তুতঃ, আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই আছে। ত[illegible] নূতন করে' আর সৃষ্টি করতে হয় না। কিন্তু তাকে বে[illegible] সকলের মধ্যে প্রচারিত করতে হয়। তারপরে? তারপ[illegible]

স্ত সাধারণ সামাজিক সমস্যা—অন্নবস্ত্র, আশ্রয়-জীবিকা, ধিকার-কর্তব্য, স্বাধীনতা—সুখসম্পর্কীয় সমস্ত দৈনন্দিন স্যারই সুষ্ঠু শোভন সমাধান স্বতঃই হয়ে' যাবে। কি ভাবেই না স্বামীজি বলছেন :—

"আমি ত একজন প্রতীকই মাত্র, আমি ত একজন গী সন্ন্যাসীই মাত্র। আমি কেবল একটীমাত্র জিনিষই ই। আমি এরূপ ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি যা বিধবার চোখের জল মোছাতে, অথবা অনাথের খে অন্ন জোগাতে পারে না।" (৫-৩৯)।

এরূপে, স্বামীজীর মতে, ধর্ম কেবলমাত্র তাত্ত্বিক শাস্ত্রই য়, ব্যবহারিক দিক থেকেও, দৈনন্দিন জীবনের দিক্ থেকেও, সাধারণ অন্নবস্ত্রাদি-সমস্যার দিক থেকেও, ধর্মের ল্য ও প্রয়োজনীয়তা সমধিক। কারণ, স্বামীজী স্থির-বিশ্বাসভরে বলেছেন যে, ধর্ম যে কেবল তাত্ত্বিক দিক্ থেকেই আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, তা' নয়; ব্যবহারিক দিক্ থেকেও তা' সমভাবে দেহ মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।

এটী একটী অবিশ্বাস্য উক্তি বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এ' তা' নয়। কারণ, সামান্যমাত্রও চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, একমাত্র ধর্মই মানুষের জীবনে প্রকৃত ও শাশ্বত পরিবর্তন আনতে পারে এবং এরূপ পরিবর্তনের ফলেই কেবল সমাজেরও সেরূপ পরি-বর্তন হতে পারে যাতে সকলের জন্যই সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাদি করা সম্ভবপর হয়।

প্রকৃতকল্পে, সমাজ কি? সমাজ মানুষের সমন্বয় ব্যতীত আর অন্য কিছুই নয়। সেজন্য, যদি মানুষ ধর্মের প্রভাবে উন্নত হয়, তাহলে সমাজও নিশ্চয়ই তাই হবে সঙ্গে সঙ্গে এবং এরূপ উন্নত সমাজে কি বিধবার চোখের জল পড়তে পারে, অথবা অনাথের মুখের অন্ন অপহৃত হতে পারে? নিশ্চয়ই না। সুতরাং, যদি সমাজে স্নেহ-প্রেম নিঃস্বার্থ-পরতা নির্লোভতা, ন্যায়বুদ্ধি পরোপকার-ইচ্ছা প্রভৃতি থাকে—যা একটী উন্নত, আদর্শ সমাজে থাকতে বাধ্য—তাহলে সেখানে দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অত্যাচার, অনাচার-কদাচার প্রভৃতি থাকতে পারে কিরূপে?

এইভাবে, স্বামীজীর আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হল এই যে, একটী আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাই যদি সমাজ-তন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা সিদ্ধ করা যায় একমাত্র ধর্মের সাহায্যেই। "আদর্শ সমাজ" কি? আদর্শ সমাজ হল সেই সমাজ—যেখানে সকলেরই সমান অধিকার, সমান সুযোগ সুবিধা, সমান অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় শিক্ষা-দীক্ষা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতাদির পরিপূর্ণ ব্যবস্থা আছে; যেখানে প্রেমই মূল মন্ত্র, ত্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধন, সেবাই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এরূপ "আদর্শ-সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হবে কি উপায়ে? বাহুবল দ্বারা নয়। মনের পরিবর্তন দ্বারা এবং মনের পরিবর্তন আসতে পারে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, একমাত্র ধর্মের সাহায্যে।

এরূপে, সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ধর্ম অথবা আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন প্রধানতঃ দু'দিক্ থেকে :—

প্রথমতঃ, একমাত্র ধর্মের দ্বারাই আদর্শ মানব, তথা, আদর্শ সমাজ গঠিত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ধর্মের দ্বারাই আনন্দলাভ হতে পারে, যা' প্রত্যেকেরই জীবন-লক্ষ্য।

কিন্তু, এ'কি বৃথা স্বপ্নমাত্রই নয়? স্বামীজী সজোরে বলেছেন—না, নিশ্চয়ই নয়। এ' আমাদের যুগযুগান্তের স্বপ্ন নিশ্চয়ই, কিন্তু বৃথা স্বপ্নমাত্রই নয়—এ' সেই স্বপ্ন, যা বাস্তবে পরিণত করা যায় সুনিশ্চিত। কি স্থির বিশ্বাস-ভরেই না স্বামীজী বলছেন—

"আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তোল, এবং তা'কে ভারতের সর্বত্র সিঞ্চিত করে দাও। তখন তোমাদের যা যা প্রয়োজন, তা' সবই স্বতঃই আসবে।"

"তোমার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশিত কর, এবং সব কিছুই তোমার চতুর্দিকে সুসমঞ্জস ভাবে ন্যস্ত হ'য়ে যাবে।" (৪-২৯৪)।

আধ্যাত্মিকতায় স্বামীজীর কি অটুট বিশ্বাসই না ছিল!

এবং তাঁর এও স্থির বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্যেকেই, নির্বাধভাবে প্রত্যেকেই, নিজের ও বিশ্বের উন্নতিসাধন করতে সক্ষম। তাঁর দৃপ্ত আশার বাণী শুনুন—

"আমরা অজ্ঞাত, অবহেলিত, অনাদৃত ভাবে, কিছু না করেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারি। কিন্তু আমাদের কোনো চিন্তাই একেবারে হারিয়ে যাবে না—আজ না হয় কাল, তার ফল হবেই হবে।" (৫-৪৫)।

মানবের শক্তিতে স্বামীজীর কি অগাধ বিশ্বাস!

তাঁর এই বিশ্বাসকে কি অজ্ঞানবশতঃ অবিশ্বাস করা চলে? না নিশ্চয়ই নয়। উপরন্তু, সেই বিশ্বাসকেই সার্থক করে তোলা আমাদের সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। মানুষের শক্তি অসীম কেন? কারণ, সে যে স্বয়ংই ব্রহ্ম। এইটীই হল স্বামীজীর সমস্ত মতবাদের মূলীভূত, মধুরতম তত্ত্ব—মানবে এই বিশ্বাস, মানবের অনন্ত ঈশ্বরত্বে এই বিশ্বাস, মানবের শাশ্বত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্যে এই বিশ্বাস। মানবের অতুলনীয় মহিমা, অনির্বচনীয় গরিমা, অকল্পনীয় মধুরিমা পৃথিবীর আর অন্য কোনো জ্ঞানী-গুণী, সাধু-ভক্তই এরূপ উদাত্ত, অকুণ্ঠ কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত করেন নি। এই মর্ত্যেরই মাটীর মানুষ, এই ধরণীরই ধূলির মানুষ, এই ভুবনেরই ভবনের মানুষ, এই সংসারেরই মরণার মানুষ তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে স্বয়ং ব্রহ্ম, স্বয়ং ঈশ্বর, স্বয়ং দেবতা! তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি কোথায়?

মহানগরী

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কণ্ঠে ধরিয়া সুধা ধবলিত
　　অমল সৌধহার
হে মহানগরী, নাগরীর সাজে
　　কতো ভুলাইবে আর!
　আলো-ঝলমল পণ্য-বিপণি
　তারি মাঝে তুমি ফিরিছ আপনি,—
　বিত্তে বিভবে ফুটায়ে চিত্তে
　　বিভ্রম অমরার!
রাজ্ঞীর মতো ঘুরিছ সতত
　　দৃপ্ত যন্ত্রযানে,
দলিত চূর্ণ কতো অসহায়—
　　কে তার খবর জানে!
　তব রাজপথ ঋজু ও বক্র,—
　কোটি কোটি তায় শকট-চক্র
　ঘর্ঘরি' ছোটে বিকট নিনাদে
　　কোন্ মরীচিকা-পানে!
হে পাষাণী, কহো পাষাণ-পুঞ্জে
　　কে গড়িল তব হিয়া?
তব চুম্বনে বহ্নির জ্বালা
　　আছে যেন লুকাইয়া।
　গগনচুম্বী প্রাসাদে তোমার
　উথলিয়া পড়ে ভোগ-উপচার;—
　ভুলাইতে চাও স্বর্ণের ছটা,
　　হীরকের ঘটা দিয়া!

তব বুক বহি' শত ক্লেশ সহি'
　　দলে দলে চলে যারা,
নাহি বিশ্রাম—নাহিক বিরতি—
　　পাখী যেন নীড়হারা;
　উদয়-অস্ত, সকাল ও সাঁঝ
　করে একটানা কাজ আর কাজ;—
　যারা অসংখ্য, যারা অগণিত
　　নদী তরঙ্গপারা—
তুমি কি শুনেছ তাদের ব্যথার
　　অশ্রু-তরল গাথা?
দেখেছ তাদের আলোহীন গৃহ,—
　　ছিন্ন মলিন কাঁথা?
　তোমার ললিত লাস্যবিলাস
　ভাগ্যবিহীনে করে পরিহাস!
　রূপসী, তোমার বৃথা এত রূপ,—
　　হৃদয় দিল না ধাতা!
তরু পল্লব-বল্লরীঘেরা
　　পল্লী-ভবন ছাড়ি'
তোমার অকূল জনতা-সাগরে
　　নিতি আসি দিতে পাড়ি।
　গণিকার মতো ক্ষণিক মাতাও
　প্রিয়াসম হিয়া উজাড়ি' না দাও;
　ধাঁধিয়াছ আঁখি—পারো নাই মোর
　　পরাণ লইতে কাড়ি'!

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আশ্চর্য্যের বিষয় এই পত্রটী কিন্তু বউরাণী সুবিধা সত্বেও বিনষ্ট করে ফেলেন নি। সহকারীর মুখে শুনলাম যে পুলিশ খানাতল্লাস করে প্রয়োজনীয় কিছু না পেলে তল্লাসী পত্রে 'কিছু পাই নাই' লিখে সাক্ষীদের দ্বারা সেটা সই করিয়ে সেখানকার যা কিছু পর্ব্ব তাতে 'ইতি' করে দিয়েছিল। কিন্তু থানায় নীত হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কি ভেবে ফিরে গিয়ে কোনও এক গোপন স্থান হতে এই পত্রটী বার করে সহকারীর হস্তে এটি তুলে দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ বেচারামের জীবন রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁর অনুতপ্ত মাতৃহৃদয় বেচারামের বিপদ আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠেছিল।

এই পত্রটি পাঠ করা মাত্র আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে জনৈক সহকারীকে পুলিশের রক্ষণাধীনে বেচারামকে তার ঠানদিদির চিলের কোঠা থেকে থানায় এনে রাখবার জন্যে নির্দ্দেশ দিয়ে মুখ ফিরাতেই দেখলাম যে সেখানে পরস্পরের সহিত মামলারত বিবাদমান দুই জ্ঞাতি-শত্রু ভ্রাতা একত্রে এক হয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বড় তরফের বউরাণীর স্বামী রাও বাহাদুর অমুকের ন্যায় তাঁর জ্ঞাতি শত্রুমন্য ভ্রাতা ডাঃ সুরজিত রায়ও তাদের বংশের বউরাণীর এই অবমাননায় ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। এঁদের সঙ্গে কয়েকজন ব্যারিষ্টার ও নামকরা উকীলও এসেছেন। এতো মন্দের মধ্যেও ভালো দিক এই যে বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে নিমিষেই এই উভয় ভ্রাতার যা কিছু বিরোধ সংশ্লিষ্ট উকীল মোক্তারকে নিরাশ করে তা বায়ু তড়ীত কর্পূরের মতই নিঃশেষে উবে গিয়েছে।

এখন বউরাণীকে অবশ্য জামীন দিতে আমাদের কাররই আপত্তি নেই। ওঁকে আসামী করার চেয়ে একজন সাক্ষী করারই আমি পক্ষপাতি, আমি এঁর জন্য উদ্বিগ্ন ভদ্রলোকদের উদ্দেশ করে বললাম, 'এঁর বিরুদ্ধে যে খুব বেশী সাক্ষী প্রমাণ আছে তা নয়। তবে এই সম্বন্ধে বড় সাহেবকে একবার জিজ্ঞেস না করে কিছু বলতে পারবো না। আপনারা বরং পাশের ঘরে ওঁর কাছে গিয়েই একটু বসুন। আমি আরও কিছুক্ষণ লেখালেখির কায শেষ করে প্রমীলা দেবীকে হেড্ কোয়াটারের মহিলা হাজতে পাঠিয়ে দিই আগে।

এদিকে প্রমীলা দেবীরও লোকবল ও অর্থবল কম ছিল না। আমার এই উপদেশ শেষ হতে না হতেই সেখানে প্রমীলা দেবীদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সেই বিরোধীপক্ষীয় প্রৌঢ় পুরুষ ডিরেকটরদ্বয় তাঁদের যাবতীয় অন্তর্বিরোধ ভুলে পুলিশ কোর্টের কয়েকজন প্রবীণ এ্যাড্ভোকেটসহ হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এদের সকলে এখন বিদ্বেষহীন ও একত্রিত দেখে আমি বুঝলাম যে তাহ'লে 'মোষের সিঙ সোজা, লড়বার সময় একা' এই বাঙলা প্রবাদটির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। এঁদের মুখেও শুনলাম যে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ তাঁরাও ঐ গোঁফওয়ালা বড় তরফের ম্যানেজারবাবুর নিকট হতেই টেলিফোনযোগে তাঁরা এই সবেমাত্র পেয়েছেন, আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম যে এই নেমকের চাকরীটি অন্ততঃ তাঁদের নিয়োগ কর্ত্তা মনিবদের সঙ্গে নেমকখারামী কোনও দিনই করবেন না। এই ভদ্রলোক তার পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য কায বাহিরে থেকে সুষ্ঠভাবেই করে চলেছেন। অথচ আমার সহযোগিরা সারা শহর তোলপাড় করেও এখনও পর্য্যন্ত তাঁর অবস্থান বা গতায়াত সম্বন্ধে কোনও সংবাদই পেলেন না। এদিকে আবার এতো ডামাডোলের মধ্যেও আমার টেবিলের

টেলিফোন যন্ত্রটী মুহুর্মুহু বেজে চলেছে। আমি কিছুক্ষণ পরে বাধ্য হয়েই এই টেলিফোনের হাণ্ডেলটী কানে দিলাম।

'স্যার, আমি বেচারামের সেই এজমালী ঠান্‌দির এখান থেকেই কথা বলছি,' আমার সহযোগী বেচারামকে না পেয়ে আমাকে জানাচ্ছিল, 'এই একটু আগে পর্য্যন্ত সে ঠান্‌দির ক্রোড়ে শুয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে পুলিশ মর্গ থেকে খবর পেয়ে পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা তাকে মর্গে নিয়ে গিয়েছে। এর পর আমি মর্গে ছুটে গিয়ে জানতে পারি যে, বেচারাম তার পিতার দেহ নিয়ে সৎকারের জন্যে গঙ্গার ঘাটে চলে গিয়েছে। এখানে আবার বেচারামের এজমালী ঠান্‌দির কাছ হতে শুনলাম যে কিছুক্ষণ আগে তেনার একটু দূরে রাজবাড়ীর ঐ বড় ম্যানেজারকে দেখেছিলেন। কিন্তু এই সময় ঐ বড়ো ম্যানেজারের ঐ অদ্ভুত গোঁফের কণামাত্র তাঁর ঠোঁটের উপর অবশিষ্ট নেই। ইনি তাঁর গোঁফটী কামিয়ে ঘুরাফিরা করায় আর কেউ তাঁকে না চিনলেও এই ঠান্‌দিদি তাঁকে ঠিক চিনেছিলেন। এই জন্য আমাদের বেচারাম আশু নিরাপত্তার জন্যে আমাকে এখুনি শ্মশান ঘাট অভিমুখে রওনা হতে হচ্ছে।

আমার এই সুযোগ্য সহকারীর সঙ্গে কথোপকথন শেষ করে আমি ভাবলাম যে এই বড় ম্যানেজারের গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া বার করবার সময় আমরা ফেলাও করে তাঁর এই গোঁফের বিবরণ দিয়ে কি ভুলই না করেছি। টিকটিকী জীবের ফেলে দেওয়া লেজের মত মহতী গোঁফ এর এখন কোথায়? আমি নূতন করে নূতন বিবরণ সহ সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে আমার অন্যান্য সহকারীরা এই মামলা সম্পর্কে বেনিয়াপুকুর বস্তীর একটা চণ্ডুখানা হতে কয়েক জন বিড়াল-চোরকে পাকড়াও করে এনেছে। এই তস্কর কয়জনকেই ডাঃ সুরজিত রায় ও ৺খগেন সরকারের গৃহদ্বয় হতে চুরী করবার জন্যে সাক্ষাৎভাবে লাগানো হয়েছিল। এ ছাড়া আমার অপর এক সহকারী কাশীপুরের পূর্ব্বতন ছোট ম্যানেজারের 'পরস্ত্রীটী'কেও ওখান থেকে সঙ্গে করে থানায় ডেকে এনেছে। থানার এই ভীষণ হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে পড়ে আমার মত ধীরস্থির লোকের পক্ষেও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই অসুবিধা অতিক্রম করে আমাদের কাযকর্ম্ম করা ভিন্ন আমাদের আর উপায়ই বা কি আছে। এই দিন বিভিন্ন আসামী ও সাক্ষীর বয়ান লেখলেখি শেষ করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনার্থে মামলা সম্পর্কীয় স্মারকলিপি ও সংক্ষিপ্তকার প্রতিবেদন বা রিপোর্ট লিখে উপরে উঠতে আমাদের ভোর ছয়টা বেজে গিয়েছিল।

বিগত কয়দিন ধরে এই মামলায় বহু সাক্ষী ও প্রামাণ্য দ্রব্য আমরা সাক্ষী করেছি। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিই ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐ গোঁফহীন বড় ম্যানেজারকে কচিৎ কদাচিৎ এখানে ওখানে কেউ কেউ দেখলেও তাকে খুঁজে পেতে ও গ্রেপ্তার করতে এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হলো না। আমাদের এই ব্যর্থতার গ্লানির জন্য উর্দ্ধতন অফিসারদের নিকট আমাদেয় মুখ দেখানো ভার। তবু মন্দের ভালো যে, এই শহরের গোয়েন্দা বিভাগের বাঘা বাঘা অফিসাররাও এখনও পর্য্যন্ত এর কোথাও হদীস বার করতে পারেন নি। বউরাণীকে উর্দ্ধতন অফিসারদের হস্তক্ষেপের ফলে ও নিম্নতম আদালতের আদেশে পরদিন বেলা দশটার মধ্যেই আমরা জামীন দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বস্তুতঃপক্ষে এই মহিলাটীর অন্ততঃ জামীন আটকানোর পর্য্যাপ্ত সাক্ষী প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না। এদিকে প্রমীলা দেবীর জামীন নিম্ন আদালত অগ্রাহ্য করলেও উচ্চ আদালতে আপীলের ফলে ইনি একজন মহিলা বিধায় এক লক্ষ টাকার জামীনে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তবে এই উভয় মহিলাকেই এই মামলা চলাকালীন স্ব স্ব বাটীর সীমানা অতিক্রম না করার জন্যে আদালতে মুচলেখা দিতে হয়েছিল। এমন কি তাঁরা তাঁদের বাড়ীর টেলিফোন দুইটীর সংযোগও আদালতের নির্দেশ মত সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়ে নিতে হয়েছে। এদিকে আদালতের হুকুম নিয়ে আমরাও এদের উভয় বাটীর সীমানায় ও পিছনে এবং সামনে দিবারাত্র পাহারা মোতায়েন রেখেছি। অপরদিকে নিরাপত্তার জন্য বেচারামকে থানাতে এনেই রাখা হয়েছে। কাল এই অদ্ভুত মামলা আদালতে উঠবে। তাই আজ আমি সরকারী উকীল অমুকবাবুর নিকট ফাইল ও ডাইরী পত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। কতো রাত্র পর্য্যন্ত যে সেখানে এই

মামলা সম্পর্কে এঁদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করতে হবে তা কে জানে।

'এখন সব তো ভালো করেই বুঝে নিলাম ভাই' একটী পৃথক কাগজে ডাইরী হতে প্রয়োজনীয় নোট্ টুকে নিতে নিতে সরকারী উকীল অমুকবাবু বললেন, 'এখন তো দেখছি বড়ো ম্যানেজার ঠিকই বলেছিল যে তাকে আসামী না করা পর্য্যন্ত এই মামলা ঠেঁকানো ভার হবে। অন্ততঃ আসামী খগেন সরকার বেঁচে থাকলে তার ও সেই সঙ্গে প্রমীলা দেবীও নির্ঘাত দোষী সাব্যস্ত হবার পর কঠিন সাজা হতো। এখন ঐ হৃতচক্ষু যুবকটীকে দিয়ে তোমরা বড় জোর বলাতে পারবে যে প্রমীলা দেবীর ঐ একটী মাত্র ভ্যানিটী ব্যাগ সে দেখেছে। আর এই ব্যাগের ওপর 'S' শব্দটী লেখা সে বরাবরই দেখেছে। অবশ্য এই 'S' অক্ষর লেখা ভ্যানিটী ব্যাগটীই তোমরা উদ্ধার করেছো। কিন্তু এর কাছে আর একটী 'S' আঁকা ব্যাগ যে ছিল না তা জোর করে কে বলবে। এদিকে এই আসামী ও সাক্ষী প্রতিদিন জোড়ে আদালতে এসে জোড়েই আবার তাঁদের মধুকুঞ্জে ফিরে যাবেন! ভয় হয় যে মধ্য থেকে প্রমীলা দেবীরূপ এই বড়ো মৎস্যটীই না আইনের জালের ফাঁকে বা তা ছিঁড়ে বার হয়ে যায়। এখানে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বা একই অপরাধ সমাধা করেছে। একটী মাত্র সংকল্প বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী এরা কেউই তো এই সব অপকার্য্য একক বা যৌথভাবে সমাধা করে নি। এদের সকলের বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের না করে এদের প্রত্যেক ব্যক্তির বা দলের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক স্থানে ও সময়ের অপরাধ করার জন্যে পৃথক পৃথক মামলা রুজু করাই ভালো হতো। এদিকে গ্যাং কেস চালানোর মত মাল মশলাও তো এদের বিরুদ্ধে নেই। আমার মতে তোমাদের ঐ বড়ো ম্যানেজারের গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিৎ ছিল। কিন্তু এই উপদেশ তো তোমাদের উর্দ্ধতন অফিসাররা কানেই নিলেন না। এদিকে তো আদালতও আর খুব বেশী সময় দিতে রাজী হচ্ছেন না। আচ্ছা! একটু চেয়ে চেয়ে দেখাই তো যাক। এদের যে ধারায় চালান দেওয়া হয়েছে সেই ধারা মতেই এখন আমাদের লড়ে যেতে হবে। এখন কাশীপুরের বৌরাণীকে সাক্ষী করে অবশ্য তোমরা ভালোই করেছো। তা' না হলে বর্ত্তমান অবস্থায় ডাঃ সুরজিত রায়ের পর্য্যন্ত সাক্ষী তোমরা এই মামলায় পেতে না। এর মধ্যে আবার সবগুলি বিবাদমান দল নিজেদের যা কিছু বিবাদ তা মিটিয়ে ফেললে হঠাৎ! ওদের বৌরাণীকে না গ্রেপ্তার করত যদি, তা' হলে এদের এই বিবাদটা জিইয়ে রেখে আমরা হয়তো কায হাসিল করতে পারতাম। কিন্তু এই বিষয়ে পূর্ব্ব হতে তোমরা আমাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে কৈ? তা যাই হোক, প্রমীলা দেবী ছাড়া পেলেও অন্য আসামীদের কোনও না কোনও ধারায় আমি সাজা করাবোই। আসলে কোথাও মামলা প্রমাণ করতে হলে তার পিছনে উদ্দেশ্য বা মোটীভ্ আগে প্রমাণ করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই সাঙ্ঘাতিক জখমী মামলায় এই মনস্তাত্ত্বিক মোটিভ্ বা উদ্দেশ্য দায়রা আদালতে জুরিমহোদয়দের কি বুঝানো যাবে। এটা মনগড়া একটা ভুতুড়ে কাণ্ড বা আজব ব্যাপার বলে হয়তো এটা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে এই আসামীকে নিদান পক্ষে সন্দেহের কারণেও মুক্তিই দিয়ে বসবে। একে এই আসামী একজন সম্ভ্রান্ত ধনীবংশের মহিলা; তার উপর সযতনে এখনও পর্য্যন্ত সেই তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এ'ছাড়া চিকিৎসা বাবদ তার জন্যে ইনি একটা মোটা অঙ্কের বিলও আদালতে নিশ্চয়ই পেশ করবেন। তবে বিচার সম্বন্ধে বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয় জোর করে বলা বড়ো শক্ত। এ তো আর পঞ্চায়েতের বিচার নয় যে সরজমীন তদন্ত করে তারা প্রকৃত বিষয় বুঝে নিতে চেষ্টা করবেন। এই পঞ্চায়েতে ভুল বিচার করলে তা তারা জেনে-শুনেই করে থাকে, নহে ত তারা সমধিক সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকা সত্বেও ঠিক বিচারই করে থাকেন। ইংরাজ পদ্ধতির বিচারের যে আইনের নাগপাশ থেকে একটুও নড়বার চড়বার উপায় নেই।

'এ্যা! এ আপনি কি আমাকে বলছেন মশাই। এই মহিলাটীই যদি ছাড়া পান তাহলে তো চমৎকার', আমি সরকারী উকীলবাবুর এবংবিধ মন্তব্যে চিন্তিত হয়ে বললাম, 'এইরূপ যদি আরও কিছুদিন চলে তা'হলে যে জনতা এদের বিচারের ভার নেবে। আদালত ছেড়ে দিলেও কোর্ট হতে বার হয়ে রাস্তায় আসলেই যে এই

প্রকৃতির লোকদের জনতার হাতে প্রাণ যাবে। এখন পরিস্থিতি এইরূপ হলে আমার মতে গ্রামের মত শহরে শহরেও এই পঞ্চায়েতের বিচার প্রথা প্রবর্তন করে স্থানীয় লোকদের দ্বারাই বিচার কার্য্যের ব্যবস্থা করা উচিত হবে। এতে অন্ততঃ সরকারী ও বেসরকারী দুর্নীতি ও জুলুম যে অনেক কমবে তাতে অবশ্য কোনও সন্দেহই নেই। এখন সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের প্রয়োজন বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও শিক্ষার ন্যায় বিনা পয়সায় বিচার লাভের প্রয়োজন হয়েছে। মান সম্মান প্রাণ নিয়ে বাস করতে হলে এটাও দরকার। যাক ফলাফলের কথা না ভেবে এখন নিজের নিজের কর্তব্য কার্য্য তো করে যাওয়া যাক্।

এমনি রাত্র দশটা পর্য্যন্ত সরকারী উকীলবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে এই মামলা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার পর থানায় ফিরে দেখি, আমাদের বেচারাম মুণ্ডিত-কেশে থান ও চাদর পরে থানায় বসে রয়েছে। এইদিন তার স্বর্গতঃ পিতার মৃত্যুর কারণে প্রথা অনুযায়ী পিণ্ডি-দান ও ঘাট-কামানোর দিন ছিল। আমি তার দিকে চেয়ে দেখলাম যে বর্ষার বারিধারার মত তার দুই চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। তবুও তাকে দেখলে সে যে শোকে ও দুঃখে কাঁদছে তা বলে মনে হয় না।

'স্যর! আমার ঐ দিনকার চুরি করা জনিত পাপের জন্যেই বোধ হয় আমি শেস বেশ আমার পিতাকে পেয়েও আবার তাঁকে আমি হারিয়ে ফেললাম'। আমার দিকে সজল চোখে তাকিয়ে বেচারাম বললো, 'এই পাপের ফল তো হাতে হাতেই ফললো দেখলাম। এখন আমি একটা বিষয় ভাবছিলাম, স্যর। আমার বাবা তো আমাকে বহু টাকাকড়িই দিয়ে গেলেন। আপনাদের কাছে পিসেমশাইদের সংসারের জন্য অনেক টাকা আমি নিয়েছি। এইবার ঐ সরকারী টাকাগুলো এখন আমি সরকার বাহাদুরকে আবার ফিরিয়ে দিতে চাই। আসলে এই টাকা কয়টা আপনারা আমাকে অপরের সঙ্গে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে তো দিয়েছেন। এখন এই পাপার্জ্জিত অর্থ সামান্য হলেও তা আমি আপনাদের ফিরিয়ে দিতে চাই।

আমাদের বেচারামের মুখে এইরূপ নূতন ধরণের তত্ত্ব কথা শুনে আমি প্রমাদ গণলাম। তবে এইটুকু আমাদের ভরসা যে বেচারাম আদালতে সাক্ষী দিতে উঠে এই একই কারণে একটীমাত্রও মিথ্যে কথা বলবে না। তখুনি আবার আমার মনে হলো যে, এই বেচারামকে আমি চিনি তাই আজ এই কথা আমি বলতে পারছি। কিন্তু জজ সাহেব ও জুরী মহোদয়গণ তো এর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত নন। ওখানে সবকিছু নিভর করে যে গুছিয়ে গাছিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিমাতে সুষ্ঠুরূপে সাক্ষ্য দিতে পারে তারই ওপর। কে বলতে পারে যে আমাদের এ হেন বেচারামই আদালতে জেরার মুখে ভীষণভাবে ভড়কে গিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী রূপে প্রতিপন্ন হবে না। লৌহ খাঁচার মধ্যে পোড়া বিচার ও উন্মুক্ত প্রান্তরের বিচারের মধ্যে তো তফাৎ থাকবেই। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিচারকগণ আইনের অজুহাতে নিজেরাই যে বহু বিষয়ে অসহায় অনুভব করে থাকেন।

আমার টেবিলের একপাশে কয়েকখানি হস্তলিপি বিশারদের প্রতিবেদন সাজান ছিল। বেচারামের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সেগুলি পাঠ করে বুঝলাম যে আসামীদের স্বহস্ত লিখিত পত্র ও চিরকুটগুলি তাদেরই হাতের লেখা বলে প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সকল আসামী পূর্ব্বতন হস্তলিপি জমিদারী সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র থেকে তুলনার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে নিতে পেরেছিলাম, এখন কোনও কোনও সাক্ষীকে বিবিধ কারণে আদালত অবিশ্বাস করলেও এই নির্জীব প্রমাণকে অবিশ্বাস করা তাদের পক্ষে কঠিনই হবে। এর কারণ, এই সব সাক্ষ্য নির্জীব বিধায় কথা বলতে না পারায় মিথ্যে বলতেও অক্ষম। আমি আমার পূর্ব্বতন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করছিলাম। এমন সময় আমার হাতের কাগজের বাণ্ডিলের মধ্য থেকে শিশু বেচারাম কোলে বেচারামের স্বর্গতঃ মায়ের ফটো চিত্রটীই উঠে এলো।

'তাহলে বেচারাম ভাই! তুমি আর এখানে বসে থেকে কি করবে। আমি তাড়াতাড়ি এই ফটোটী পিতৃ-মাতৃহারা বেচারামের চোখের আড়াল করে তাকে বললাম, 'এই মামলা শেষ হয়ে গেলে তোমাকে আমি

একটা শ্রেষ্ঠ উপহার দেবো। সেই উপহারটী হচ্ছে তোমার স্বর্গত মায়ের একটি সুস্পষ্ট সুন্দর ফটো। কিন্তু তোমাকে এইবার মানুষের মত মানুষ হতে হবে। এখন ভাই থাক ওসব কথা। এবার তুমি তোমার থানার ভিতরের শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আরও দিন কয় তোমাকে বাইরে না গিয়ে এখানেই থাকতে হবে। তোমার জন্য তোমার বাবা যে বহু অর্থ রেখে গিয়েছে এ'কথা কিন্তু তুমি এখুনি কাউকে বলো না। তুমি মেকানিক্যাল কাজটা শিখে পরে তুমি নিজেই ঐ অর্থের কিছু দিয়ে একটা নিজস্ব ওয়ার্কসপ খুলে ফেলো। আমি অভিভাবক হয়ে তোমাকে এই সব ব্যবস্থা করে দেবো, এখন'।

পরদিন সকালে একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা থানায় নেমে এলাম। দশটা প্রায় বেজে আসায় থানায় সাজ সাজ পড়ে গিয়েছে। আমাদের একজন অফিসারকে জেল হতে আসামী আনতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আর একজনকে লরী করে বিভিন্ন স্থান হতে সাক্ষীদের তুলে আনবে। আমি নিজে ডাইরীপত্র সহ একটু আগেই আদালতের উদ্দেশ্যে বার হয়ে গেলাম। প্রশস্ত আদালত কক্ষের বিরাট আসামীদের নির্দ্ধারিত ডকটী দেখতে দেখতে আসামীতে ভরে গেল। এক মাত্র প্রমীলা দেবীর জন্য এই আসামীদের রেলিং দেওয়া খাঁচার বাইরে একটী চেয়ার রাখা হয়েছে। এই চেয়ারটীর উপর তিনি আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিলেন, এদিকে একটা বেঞ্চেতে সাক্ষীনী বউরাণী এসে বসেছেন। অবশ্য তাঁকে ঘিরে তাঁর আত্মীয়েরাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই মহিলাদ্বয়ের কেউ কারুর দিকে আর চেয়েও দেখেন না। সামনের দুই খানি লম্বা টেবিলের পিছনের চেয়ারগুলি সরকারী তরফের ও আসামী তরফের আইনজীবীতে ভরে গিয়েছে।

উপরের এই তোড়জোড়ের ন্যায় আদালতের প্রাঙ্গণেও কম তোড়াজাড় করা হয় নি। এইখানে দুইটা ক্যাম্পে সাক্ষী ও সাক্ষীনীদের বসবার জায়গা করে রাখা হয়েছে। এ'ছাড়া এখানে এদের খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহুদূর হতে আসায় অনেক সাক্ষীরই মধ্যাহ্নে ভোজনের প্রয়োজন ছিল।

আমাদের সরকারী উকীলবাবু এইবার দাঁড়িয়ে উঠে এই মামলার বিষয়বস্তু আদালতকে জানাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঐ আহত যুবকের মাতুল ভদ্রলোক একজন এ্যাডভোকেট মারফৎ আদালতে একটী বিশেষ আবেদন জানালেন। তাঁদের বক্তব্য হলো যে ঐ আহত যুবকটীকে আসামী প্রমীলার হেপাজতী থেকে তার মাতুলের হেপাজতীতে দেওয়া হোক। এ বিষয়ে আমাদের সরকার তরফ হতে স্বভাবতঃই সময় দিয়েছিল। কিন্তু প্রমীলা দেবী তাঁর আইনজীবীর প্রতি চাওয়া মাত্র তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানালেন। এমনি কিছুক্ষণ বাদ-প্রতিবাদের পর এই যুবকটি ইতিমধ্যে সাবালক হওয়ায় ঐই বিষয়ে আদালত স্বভাবতঃই হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। কিন্তু ঐ আহত যুবকের মাতুল তার এই ভাগানেয়-টীকে নিজ গৃহে আনতে পারলে আমাদের এই মামলার ভবিষ্যত যে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতো তাতে আর সন্দেহের কিছু ছিল না।

এইবার গুরুগম্ভীর স্বরে আমাদের সরকারী উকীল বাহাদুর এই অদ্ভুত মামলার ভূমিকা সহ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে তার প্রাথমিক বক্তৃতা সুরু করে দিলেন। এইরূপ সুন্দর বক্তৃতা আমি বহুদিন শুনি নি। তাই তাজা ফুলের মত এই বক্তৃতা আজও আমার মনে আছে। এই প্রাথমিক বক্তৃতা বা ওপেনিং স্পিচের প্রয়োজনীয় অংশ চিত্তাকর্ষক বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'মহামান্য আদালত স্যার। এই মামলাটির আমরা নামকরণ করেছি—একটি অদ্ভুত মামলা। অদ্ভুত বিষয়-বস্তুর ন্যায় এর নায়কনায়িকারাও অদ্ভুত চরিত্রের ব্যক্তি। এই মামলার অপরাধের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ততোধিকই অদ্ভুত। [এই মনগড়া ভূতুড়ে ব্যাপার জনৈক ডিফেন্স উকীলের উক্তি] আমার মামলা সম্পর্কিত বক্তৃতা আগে শেষ হোক মশাই [সরকারী উকীলের জবাব]। এই মামলায় সঙ্ঘটিত অপরাধের মধ্যে হত্যার চেষ্টা, অপহরণ, বে-আইনি আটক, গুরুতর জখম, সিঁদেল চৌর্য্য, ইত্যাদি ভারতীয় দণ্ডবিধির বহু ধারা সংযুক্ত আছে। এই এতো-গুলি মামলা কলিকাতার খাস শহর ও শহরতলী এবং হাওড়া নগরীতে সঙ্ঘটিত হয়। এই জন্য এই অপরাধ-সমূহের জন্য ষড়যন্ত্র করার অপরাধ সহ এই সবকয়টি অপ-

রাধের একত্রে বিচারের জন্য হাইকোর্টের আদেশে আপনার এক্তিয়াধীন করা হয়েছে। এই মামলায় পরস্পরের সহিত সম্পর্ক শূন্য এবং অপরিচিত ধনী-নির্ধনী প্রসার ও পঙ্কিল বস্তীবাসী শিক্ষিত ও জঘন্য গুণ্ডা পৃ ক পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক সময়ে এদের একটি মাত্র নেতার নির্দ্দেশে ও উপদেশে বিবিধ স্থানে বিবিধ সাংখাতিক সাংঘাতিক অপরাধসমূহ নির্ব্বিবাদে করে চলছিল। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে এই আসামী প্রমীলা দেবীর যৌনজ-লালসা চরিতার্থের জন্যই এই অপরাধ মামলার প্রথম অপরাধের সূচনা হয়। প্রধানতঃ এই মূল অপরাধটি হতে আত্মরক্ষার কারণে পর পর অপর অপরাধ সঙ্ঘটিত হতে থাকে। এই অপরাধী দলের প্রধান তিন জন অপরাধীদের মধ্যে এক মাত্র প্রমীলা দেবীই এখানে উপস্থিত আছে। অপর দুজনার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অপর জন গুপ্তহীন হয়ে ফেরার হয়েছিল। [সম্প্রতি এই ফেরারী আসামী এই মামলার সাক্ষীদের ভীতি প্রদর্শন করছেন।] বলা বাহুল্য এই আসামীত্রয়ের মধ্যে এই ফেরার আসামীটিকেই সত্যকারের ক্রীমিন্যাল বলা চলে। এইরূপ এক নিয়ম লঙ্ঘনশীল অসৎ-হেতু-গভ লোকের দ্বেষভাজন, ক্ষুদ্রাশয় সৎ কার্য্যে দীর্ঘ সূত্রী ও উদ্যোগবিহীন লুব্ধ কৃতঘ্ন, ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, শঠ ক্ষুদ্রাশয় পাপাচারায়ন অকারণে শঙ্কিত চিত্ত কুটিল পরদার অপহারী বান্ধব ব্যসনা শক্ত দুরাত্মা নির্লজ্জ নাস্তিক অসত্যপরায়ণ ও কামাশক্ত ও মাত্র মনোগত কর্ম্ম প্রয়াসী, অতিবুদ্ধি, কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর সুরাপায়ী নির্দ্দয় দুঃশীল অধীর নৃশংস ও বঞ্চক [অনুপস্থিত আসামীকে গাল দেন কেন—জনৈক বিপক্ষ পক্ষীয় উকীলের মন্তব্য] ব্যক্তি সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয় না। এই হেন এক ব্যক্তিকেই কাশীপুরের জমীদার পরিবার তাঁদের ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত করেন। এই আসামী প্রমীলা দেবী এঁকে দিয়ে স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধি করতে গিয়ে এঁরই হাতে ক্রীড়নক হয় পড়লেন। ভারত যুদ্ধের যুধ্যমান ব্যক্তিদের ন্যায় এই মামলার প্রায় প্রত্যেকটি আসামী সাক্ষী ফরিয়াদী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কোনও না কোনও সূত্রে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কীত। এই কারণে এই সাক্ষীরা শেষ বেশ কতোটা সত্যি কথা বলবে তা জানি না। সেই জন্যে এই মামলায় প্রামান্য দ্রব্য সম্ভুত প্রমান ও পরিবৈশিক সাক্ষ্যের উপরই আমাদের অধিক নির্ভরশীল হতে হয়েছে মহাভারতের উপাখ্যানের মতই এই মামলার মূল ঘটন একটিই কিন্তু পরে অন্যান্য বহু ঘটনা অবস্থাগতিকে এ মামলায় সংযুক্ত হয়েছে। আমি সর্ব্বপ্রথমে এই মূল ব প্রধান ঘটনাটিই বিবৃতি করতে চাই।"

এইবার আমি এই মামলার ঘটনাসমূহ কারণ ও ঘটনারাজীর অন্তর্নিহিত হেতু সম্বন্ধে আমি আলোচন করবো। এইরূপ এক অত্যদ্ভুত ঘটনা কেমন করে ঘটতে পারলো তা বিষয়-বস্তুর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বার আপনাদের সম্যকরূপে বুঝিয়ে বলা দরকার। এই ঘটনা ঘটার কারণ ছিল এই যে বর্ত্তমানে মহাধনী এই প্রমীলা দেবী এককালে রূপসী হওয়া সত্বেও তার বয়স ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল। প্রথম জীবনের ভুলের কারণে তাঁর বয়স থাকতে সময় মত বিবাহ করেন নি। অথ আর পাচজন সাধারণ নারীর ন্যায় তিনিও কোনও এব স্বল্প বয়স্ক যুবককে বিবাহ করতে চাচ্ছেন। [এরূপ কমপ্লেক্স তো পুরুষদেরও আছে—জনৈক ডিফেন্স প্লিডারের উক্তি] তাঁর নিজ কর্ম্মক্ষমতা ও ধন দৌলতে দিশেহারা হয়ে তাঁর যে বিবাহের বয়ঃসীমা অতিক্রম হতে চলেছে তা তিনি ভাবতেও পারেন না। এই প্রমীল দেবী বহু যুবজন কর্ত্তৃক বহুবার প্রত্যাখাত হওয়ায় তাঁর মধ্যে একটী 'বয়েস-ভীতি' রূপ কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় তাঁর সকল সময়েই মনে হতো যে এই বুঝি তার অধিক বয়সের অজুহাতে পুনরায় তিনি তাঁর শেষ সম্বল ঐ যুবক [এক্ষণে হৃত চক্ষু] সুশীলবাবুর দ্বারাও প্রত্যাখাত হন। আমি সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করবো যে এই বয়েস ভীতি রোগ এঁকে প্রতিনিয়ত উত্যক্ত করতো। [ওর গলা ধরে তা উনি বলেছেন—জনৈক বিপক্ষীয় এ্যাডভোকেটের উক্তি] তার প্রায় মনে হতো যে আর বেশী দেরী করলে তাঁর যেটুকু এখনও আছে তাও তার থাকবে না। [এই তো সবে আরম্ভ—সরকারী উকীলের জবাব] তার জীবন গড়িয়ে আসার মূহূর্ত্ত বিলম্ব তার পক্ষে অসহনীয়। এই আশু বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার বহু [সম্ভাব্য] উপায় চিন্তা করেও তিনি এর কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যে সময় তিনি এইরূপ এক মানসিক তৃষ্ণায় আকুলি-

বকুলি করছিলেন, ঠিক সেই সময়ই তাঁর বান্ধবী বৌ-রাণী তাকে এক উত্তম অমৃতের সন্ধান দিলেন [ও আবার ওঁকেও জড়ালেন—এক বিপক্ষ পক্ষীয়ের উক্তি] হাঁ। ঠিক এই সময়েই প্রমীলা দেবীর মনের মধ্যে তাঁর ঐ বান্ধবী বউরাণী এর মনের মধ্যে পরিহাসচ্ছলে এই সমস্যা সমাধানের এক অদ্ভুত সূত্র ঢুকিয়ে দিলেন। আমরা জানি যে রায় প্রয়োগ বা সাজেস্‌সনের ক্ষমতা কিরূপ অসীম। আমরা এ'ও জানি যে এ জগতে হারায় না' কো কিছু। এই বাক্‌প্রয়োগটী নিভৃতে ও গোপনে এই প্রমীলা দেবীর অবচেতন মনে [প্রমীলা দেবী বস্থন—ডিফেন্স ব্যারেষ্টারের উক্তি] অন্তরতম প্রদেশে অঙ্কুর গেড়েছিল। [আমারও বয়েস হয়েছে—সরকারী উকীলের জবাব] এই অঙ্কুরটী প্রমীলা দেবীর অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে তাঁর অবচেতন মনে জেকে বসলো। এইখানে অপর একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আপনাদের বুঝিয়ে বলবো। মানুষের মনের অস্থিরতা অবনমতা [Deprenion] ও দিশেহারা অবস্থায় কোনও একটী অনুকূল বা প্রতিকূল বাক প্রয়োগ বা প্রয়োগ-নিদান [Stiruclas] কারুর মনে স্ববাক [Auto seggesion] প্রয়োগ বা পর বাক্‌ প্রয়োগ দ্বারা আবাধিতে ঢুকে গেলে মানুষ বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলে অপরাধ রোগীতে পরিণত হয়ে উঠে। এই মানসিক রোগ একাগ্রমুখী হয়ে তখন একটী মাত্র আকাঙ্খিত ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হতে চায়। অন্যথায় উহা পুনঃ পুনঃ সূচীমুখী যন্ত্রণার সৃষ্টি করে মানুষকে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলে। এইখানে মানুষের মনকে একটা পোক্‌ বা সিক্‌ যুক্ত চক্রের সহিত তুলনা করা চলে। এই চক্রের এখানে মাত্র একটী বা দুইটী সিক স্থানচ্যুত হয়ে পট্‌পট শব্দ করলেও স্বস্থানে অবস্থিত অন্যান্য সবগুলি পূর্ব্বের মতই স্ব স্ব কার্য্য করে চলে। এই জন্য এই মানসিক রোগ-গ্রস্থ মানুষরা এক প্রকারের উন্মাদ হলেও তাদের উন্মাদ বলে বাইর হতে বুঝা যায় না। [এ তো আসামীর পক্ষে যাচ্ছে—বিচারক জজ সাহেবের উক্তি] এইখানে সম্ভাব্য বিপদ হতে অব্যাহতি পাবার অন্য কোনও উপায় না থাকায় এই প্রমীলা দেবী এক অদম্য স্পৃহা দ্বারা আবিষ্ট হয়ে একজন অপরাধিনী রোগীনীতে পরিণত হয়ে গেলেন [বিচারককে সুবিচারে সাহায্য করছি—সরকারী উকীলের জবাব] মানুষ দৈহিক রোগের মানসিক রোগেও ভুগে থাকে। এইরূপ বহু মানসিক রোগ দৈহিক রোগ রূপে চালু হওয়ায় রোগী উপযুক্ত ও প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে নিরাময় হতে পারে নি। এই অভাবনীয় ও সাধারণের অবিশ্বাস্য রোগ রোগীও কাউকে লজ্জা ও ভয়ে চলতে না পারায় নিরাময় হওয়া তাদের কষ্টসাধ্য হয়েছে। আমাদের অন্যতম আসামী প্রমীলা দেবী তাঁর এক অশুভ মুহূর্ত্তে এই রূপ এক অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার অধিকারিনী হয়ে উঠলেন। অথচ এই সময় তাঁর অপরাধ-সম্পর্কীত প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটলেও তাঁর অন্যান্য বৃত্তি ও বুদ্ধি সম্পর্কীয় স্নায়ুক্ষেত্র এবং ক্রিয়াশীল মোটর নার্ভ সমূহ অটুটই থেকে গিয়েছে। এই জন্য ইনি তাঁর এই দুর্দ্দমনীয় স্বার্থ প্রণোদিত অপরাধ স্পৃহাকে আপন অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ভালোরূপেই পরিচালিত করতে পেরেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে ইনি তাঁর এই বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজে যে পন্থায় ও উপায়ে অপরাধ-রোগীনীতে পরিণত হচ্ছিলেন, সেই একই উপায়ে ও পন্থায় উনি তাঁর পূর্ব্বপ্রেমাস্পদ খগেন্দ্র [এখানে মৃত] সরকারকেও মুহুর্মুহু বাক-প্রয়োগে অভিষ্ট করে তাঁর অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার বহির্বিকাশ ঘটিয়ে এর এই পাপকার্য্যে সহায়তার জন্যে তাঁকেও নিজের মতনই [দুবন্ত] একজন অপরাধ-রোগীতে পরিণত করে তুললেন। এই দুইজন অপরাধ-রোগীকে সহায়তা করার জন্যে পূর্বাপর কালে একে একে বহু নিরোগ-অপরাধীরাই [Normal] যোগ দেয়। এই সব নিরোগ-অপরাধীদের মধ্যে 'স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম ও দৈব—এই চারি প্রকারের অপরাধীদের আপনারা দেখতে পাবেন। [যতো আজগুবী গল্প—জনৈক বিপক্ষীয়ের উক্তি] এদের সঙ্গে জন কয় পেশাদারী অপরাধীরাও যোগ দিয়েছিল। [একটা ইংরাজী বই দেখাবো—সরকারী উকীলের জবাব] এইসব অপরাধীদের মধ্যে এঁদের ঐ ছোট ম্যানেজার ছিলেন একান্তরূপে [আর ইংরেজরাই চলে গেল—পূর্ব্বোক্ত বিরোধীপক্ষীয়ের জবাব] একজন দৈব অপরাধী। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি নিজেকে কিছুটা শুধরে নিলেও দৈবক্রমে আবার তিনি যৎসামান্য অপরাধ

করতে উদ্যত হলেন। এঁর এই অপরাধের স্বল্পতার জন্যে এঁকে রাজসাক্ষী হবার আমরা সুযোগ দিয়েছি। [ঐটে' তোই পালের গোছা—জনৈক এ্যাডভোকেটের উক্তি] আমাদের মহামান্য সাক্ষীনী বউরাণীও আর একটু হলেও এই একই কারণে দৈব-অপরাধীর পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তেন। [এক যাত্রায় পৃথক ফল—বিপক্ষপক্ষীয় উকীলের টিপ্পনি] অপর আসামীদ্বয় হারুগোঁসাই এবং রহমনখানের জীবন বৃত্তান্ত অনুধাবন [আঃ! বাধা দেন কেন?—হাকিমের নির্দ্দেশ] করে ওদের আমি অভ্যাস অপরাধী বলে জেনেছি। এই আসামীদের মধ্যে নিরক্ষর সিঁদেল চোর ও তালাতোড় হুলুমানিয়া, কিষনিয়া, মদনিয়া ও রুথমানিয়াকে আমি স্বভাব অপরাধী বলে অবহিত করবো। তবে এরা হচ্ছে সাম্পতিক অপরাধী অর্থাৎ 'এরা মাত্র সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে। ইহা আমি এদের অঙ্গুলীর টিপ্‌পত্র ও পূর্ব্ব নথীপত্র হতে প্রমাণ করবো। ডকের ডানদিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সকলেই শোনিতাত্মক অপরাধী। অর্থাৎ এরা শুধু খুন জখম প্রভৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধেই অপরাধ করে। [বড্ড সময় নষ্ট হচ্ছে—বিপক্ষপক্ষীয়ের টিপ্পনী] এদের মধ্যে একমাত্র মধ্যম-অপরাধী ছিল ঐ পলাতক বড় ম্যানেজার। [প্রফেসার! কলেজের ছাত্র পড়াচ্ছেন! অপর এক উকীলের উক্তি] এর মধ্যে তাই একাধারে স্বভাব ও অভ্যাস অপরাধীদের গুণাগুণ ও স্বভাব চরিত্র বর্ত্তিয়েছিল। একদিক থেকে ইনি [দাঁড়ান! পরে বুঝবেন—সরকারী উকীলের জবাব] ক্রুর নিষ্ঠুর মহাপাপী ষড়যন্ত্রে বিশারদ হলেও অপর দিকে ইনি প্রভুভক্ত বুদ্ধিমান, আইনজ্ঞ ও করিৎকর্ম্মা ছিলেন। ইনি মধ্যমঅপরাধী বিধায় বহু অপরাধী, বহু নিরাপরাধী এবং তৎসহ বিভিন্ন মনোবৃত্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের একত্রিত করে একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই পাচমেশালী অপরাধী সংগ্রহের ক্ষমতার মূল হেতু বুঝাবার জন্যেই আমি এতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ও তথ্যের অবতারণা করতে বাধ্য হলাম।

এইখানে আরও একটি বিষয় আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই। প্রারম্ভে মহামান্য হাকিম বাহাদুর আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন যে আমি প্রমীলা দেবীকে অপরাধ-রোগী প্রমাণিত করে তাঁর স্বপক্ষেই ভাষণ দিচ্ছি। অজ্ঞান মাতাল কর্তৃক কোনও অপরাধ জ্ঞানতঃ অপরাধ নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ঐ অপরাধ করার উদ্দেশ্যেই মদ্যপান করে থাকে, তাহলে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও সমাজবিধি তাকে কখনও ক্ষমা করে রেহাই দিতে পারে না। এইস্থানে প্রমীলা দেবী নিজেকে ইচ্ছে করে শনৈঃ শনৈঃ নিজেকে অপরাধ-রোগীতে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদেরও যে যথেষ্ট অবকাশ আছে তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তিনি এই একই পন্থার অপর এক স্বাভাবিক মানুষ মৃত আসামী খগেন সরকারকে অস্বাভাবিকমনা করে তুলে তাঁকে দিয়ে এই সাংঘাতিক অপকর্ম্মটী সঙ্ঘটিত করালেন কেন? এইখানে আমরা প্রমীলা দেবীকে প্রত্যক্ষ অপরাধী খগেন সরকারের একাধারে নির্দ্দেশক ও প্ররোচক অপরাধী রূপে কি বুঝছি না?

এইবার উপরোক্ত মনস্তাত্বিক পটভূমিকায় আমি মূল ঘটনারাজী বিবৃত করতে চাই। এতদ্বারা এই সব অপকর্ম্মের উদ্দেশ্য বা মোটীভ্ পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। প্রমীলা দেবী ঠিক করেছিলেন যে তাঁর এই শেষবেশ প্রেমাস্পদ সুশীলের চক্ষুদ্বয় অন্ধ করে দেবেন। এই অবস্থায় প্রমীলা দেবীর বয়স বাড়লেও সে তাকে যুবতী মনে করে চিরজীবন তার প্রতি প্রণয়াসক্ত থাকবে। এইরূপ অসহায় অবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করে সে অন্য কোথায়ও চলে যেতে পারবে না। এইরূপ এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি তার পূর্ব্ব প্রেমাস্পদ খগেন্দ্র সরকারকে বুঝালেন যে ঐ সুশীলবাবু তাঁকে প্রবঞ্চনা করায় তার ওপর সে প্রতিশোধ নিতে চায়। এখন যদি খগেন সরকার [ইনি মরে বেঁচে গেলেন] তার এই ইচ্ছামত কায করে তাহলে তিনি মনেপ্রাণে ও দেহে একান্তরূপেই তাঁরই হবেন। এরপর প্রমীলা দেবী ঐ পলাতক আসামী বড় ম্যানেজারের মারফৎ এক ফাইল ভিরোল বিষ সংগ্রহ করলেন। এই কার্য্যের পর মৃত আসামী খগেন সরকারকে ইনি সাক্ষী এই বোস্ মারফৎ একটী পত্র পাঠিয়ে শান্তিডাঙ্গা লেনের বাসা হতে ডাকিয়া পাঠালেন। এইদিনই সন্ধ্যার সময় ঐ নির্ব্বোধ যুবক সুশীলকে প্রমীলা দেবী তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এই সময় পূর্ব্ব পরিকল্পনা

মত খগেন সরকার এই যুবকটীকে হৃতচক্ষু করে দিয়ে নিজেই থানায় গিয়ে একটী কল্পিত রাহাজানীর সংবাদ মিথ্যা করে জানিয়ে এলেন। এই ভাবে কার্য্যসিদ্ধি করে প্রমীলা দেবী তাঁর পূর্ব্ব প্রেমাস্পদ খগেন সরকারকে আর আমল দিলেন না। এমন কি একদিন প্রকাশ্যে তিনি বাড়ী হতে তাকে বিতাড়িত করে পরে আবার আশা দিয়ে তাকে প্রহার দ্বারা শেষ করে দেবার জন্য ঘটনা স্থলে আনাতে চেয়েছিলেন। এই জন্য তিনি তাজমহল হোটেলে ফোন করায় পলাতক আসামী বড়ো ম্যানেজার ওঁর বাড়ীর রাস্তায় গুণ্ডা আমদানীও করেছিলেন। কিন্তু খগেন সরকারের স্থলে সেখানে থানার অফিসাররা তদন্তে আমায় তাঁদেরই একজন বিনা দোষে প্রহৃত হয়েছিলেন। এদিকে যে কোনও কারণেই হোক প্রমীলা দেবী ও পলাতক বড ম্যানেজারের ধারণা হয়েছিল যে খগেন সরকার প্রমীলা দেবীর সেই পত্রটি থানায় দাখিল করে তদনুযায়ী একটি বিবৃতি দিয়ে তাদের বিপদ ঘটাবে। তবে যতদূর বুঝা যায় যে, এই ইচ্ছা খগেন সরকারের একটুও ছিল না। এই সম্পর্কে এঁরা অমাজ্জনীয়রূপে তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। সে তখন এই সব ভুলে তাঁর হারানো পুত্র বেচারামের খোঁজেই মহাব্যস্ত। এরপর এই প্রমাণ্য দ্রব্য পত্রটি খগেন সরকারের হেপাজত হতে উদ্ধার করার চেষ্টায় পরবর্ত্তী অপরাধ সমূহ সংঘটিত হয়। প্রথমে এঁরা সিঁদেল চোর পাঠিয়ে খগেন সরকারের বাড়ী থেকে ঐ পত্র চুরি করিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাতে অপারগ হয়ে তাঁরা এই জন্য যৌনিস্বাভয় অপরাধ সমূহের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের পথ বেচে নিলেন। ঐ পলাতক আসামী বড় ম্যানেজার লোকজন মারফৎ খগেন সরকারকে হাওড়া হতে অপহরণ করে ঐ পত্রটী উদ্ধারও করেছিলেন। কিন্তু ঐ পত্রের একাংশ অবশ্য খগেনের বন্ধু শ্রমিক নেতা সাক্ষী অমুকের মুঠীর মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বিধাতার নির্ম্মম পরিহাস এই যে ঐ পত্র চোরে চুরি করতে না পারলেও বেচারাম নামে এক বালক 'অ-চোর' পুলিশের নির্দ্দেশে প্রমীলা দেবীর বাড়ী হতে তার ভ্যানেটি ব্যাগসহ ঐ পত্রটি চুরি করে আনতে পেরেছিল। ঠিক এই দিনই বিরোধী পক্ষীয় ডাঃ সুরজিৎ রায়কে ধোঁকা দিয়ে এঁদের বাড়ী ঐ যুবকের চিকিৎসার জন্য আনানো হয়। এই ডাঃ সুরজিৎ রায়ের প্রত্যাগমনের সঙ্গে প্রমীলা দেবীর সেই পত্রসহ ভ্যানেটী ব্যাগটিও অন্তর্হিত হওয়ায় এঁদের এই অপহরণের জন্য অকারণে ডাঃ সুরজিত রায়ের উপরই সন্দেহ আসে। অবশ্য এইরূপ এক অহেতুক সন্দেহের অন্য অপর একটী চিত্তাকর্ষক হেতুও ছিল। সেই সব বিষয় সাক্ষীদের মুখে ভালোরূপেই প্রকাশ পাবে। এরপর ঐ পলাতক বড় ম্যানেজারের নির্দ্দেশে ঐ পত্রট উদ্ধার করার জন্যে ডাঃ সুরজিত রায়ের বাড়ীতেও সিঁদেল চোরদের পাঠানো হয়েছিল। এই প্রত্যেকটী সিঁদেল চুরির সময় ঐ প্রয়োজনীয় পত্রটি চেয়ে নেবার জন্য স্বয়ং বড়ে ম্যানেজার অকুস্থলের নিকটের এক স্থানে মজুত থাকতেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সংশ্লিষ্ট ভিরোলের শিশিটি ঐ পলাতক বড়ো ম্যানেজার ওঁদের ছোট ম্যানেজারের মারফৎ ডাঃ সুরজিৎ রায়ের ল্যাবরেটারী থেকেই চুরি করিয়ে আনিয়েছিলেন। উপরোক্ত বিবরণই হচ্ছে এই অদ্ভুত মামলার মোটামুটি কাহিনী। এখন বিবিধ সাক্ষীর মুখে এই মূল কাহিনী ও তৎসহ বহু চিত্তাকর্ষক ঘটনা-বহুল উপকাহিনীও আপনারা শুনতে পাবেন।

এই পর্য্যন্ত সওয়াল সরকারী উকীল বাহাদুর সমাপ্ত করা মাত্র মধ্যাহ্ন বিরামের কারণে আদালতের দুই ঘণ্টার জন্যে বিরতি হলো। জুতার ধস্ ধস্ শব্দ করে শুধু আসামী ও পাহারাদার পুলিশকে সেখানে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই কিছুক্ষণের জন্য আদালত কক্ষ ত্যাগ করে টিফিনের উদ্দেশে প্রস্থান করলেন। এই সুযোগে আমি নীচে নেমে দেখি প্রাঙ্গনের একট পুরা ক্যাম্প ভর্ত্তি করে বেচারামের সেই বুড়ী ঠানদিদি তাঁর বাড়ীর পরিবারবর্গ পাড়ার বহু নাতিনাতনীসহ গম্ভীর ভাবে বসে আছেন। আমাদের অন্যতম সাক্ষী বেচারাম তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এক ভাঁড় লসী এনে সেটা ভুলিয়ে ভুলিয়ে তাঁকে খাওয়াচ্ছে।

'আপনি এখন এদিকটায় আর আসবেন না,স্যার, আমার একজন সহকারী অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, 'ওখানে ওপাড়ার সেই এজমালী ঠাকুমা এখন আপনার ওপরে ক্ষেপে রয়েছেন। ওর ধারণা আপনার হুকুমেই ওঁকে মান সম্মান খুইয়ে অন্তঃপুর ছেড়ে আদালতে আসতে হয়েছে। ওঁকে যে কি কষ্ট করেই না এখানে আনতে পেয়েছি।

পরিশেষে পাড়ার লোকেরা ওর হয়ে একটা রায়ট বাঁধিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল। ওঁর সেই সেই একই কথা ওর পিতামহ বা নিজের বাড়ীতে দরবার বসিয়ে বিচার করে কতো কাটা মুণ্ড গড়া গড়ি দিইয়েছেন। আর এখন তাঁদের বংশের এক বধূকে বৃদ্ধ বয়সে এই শহরের বিদেশীদের আদালতে হাজির হতে হবে। অবশেষে বেচারামই মাত্র ওকে কতো বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখানে আনতে রাজী করালো। তবে তিনি তাঁর বাড়ি গাড়ি স্বরূপ ওখানকার পাড়া শুদ্ধ লোক এখানে এনেছেন। এর ফলে একটা ক্যাম্পে বাকী সাক্ষীদের স্থান করে করে দিয়ে পুরা এই ক্যাম্পটা এঁদেরই জন্য ছেড়ে দিতে হলো। এতো কাণ্ড করে এখানে আনা সত্বেও আজ যে এর সাক্ষী আদালত নেবেন তাতো মনে হয় না।

এই সহকারী অফিসারের উপদেশ মত ঐ ক্রুদ্ধা ঠানদিদির সম্মুখে উপস্থিত হতে আমি সাহসী হই নি। এর পর পুনরায় আদালত বসলে সরকারী উকীলবাবু বাকী বাকী সওয়াল টুকু শেষ করে ফেললেন।

এই ভাবে এই মামলা সম্পর্কে একটী সুন্দর পটভূমিকা স্থাপন করে আমাদের সরকারী উকীল এই মামলার প্রতিটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের হেতুগত বা ইনার মোটীভ্ ও কার্য্যকরণ সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে আদালত শুদ্ধ ব্যক্তিকে মোহিত করে দিতে পেরেছিলেন। এরপর এই দিন হতে পর পর বহুদিন ধরে বহু সাক্ষী ও প্রামাণ্য দ্রব্য আমরা আদালতে পেশ করি। পরিশেষে এই নিম্ন আদালত বাদ-বিচার না করে প্রত্যেকটি আসামীকেই দাররায় বিচারের জন্যে সেখানে সোপর্দ্দ করে দিলেন।

এই দায়রা আদালতে প্রায় এক মাস যাবৎ এই মামলার শুনানী চলেছিল। কিন্তু জুরী মহোদয়রা কিছুতেই এই মনস্তাত্বিক উদ্দেশ্য বা মোটিভ্‌টি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। যা কিছু পৃথিবীতে স্বাভাবিক তাতেই শুধু ওঁরা বিশ্বাসী। পৃথিবীর অস্বাভাবিকতা এঁরা স্বীকার করতেই রাজী নন উপরন্তু এই নিঃসম্পর্কীয় হৃতচক্ষু যুবকটির প্রতি প্রমীলা দেবীর সেবা-যত্নের প্রমাণ বরং তাদের বিমুগ্ধ করে তুললো। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই যতো কিছু দোষ ঐ মৃত খগেন্দ্র সরকার এবং ঐ পলাতক বড় ম্যানেজারের উপরই আরোপিত হলো। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ প্রতিটি আসামীর দীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড হলেও একমাত্র প্রমীলা দেবীই এই বিচারে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই সময়ে প্রমীলা দেবীর কয়েকটি বাক্য আজও আমার মনে আছে। মুক্তির পর আদালত হতে বার হয়ে এসে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আমি আবার এই প্রথম লক্ষ্য করলাম যে তাঁর মাথায় টকটকে লাল সিঁদুর। ইনি গত কয় দিনের ছুটীর মধ্যে ঐ অন্ধকৃত বালকের সঙ্গে রেজেষ্ট্রি করে বিবাহ কার্য্য শেষ করে নিয়েছেন।

'আপনারা কিছু মনে করবেন না স্যার।' আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে প্রমীলা দেবী বলে উঠলেন, এই মুক্তির আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার পাপে নির্দ্দোষ নিষ্পাপ একটী যুবক শাস্তি পাবে তা বোধ হয় ঈশ্বরেরও কাম্য নয়। তা না হলে এই সাংঘাতিক মামলা হতে আমি নিশ্চই মুক্তি পেতাম না। এখন আমার এক মাত্র প্রার্থনা যে আমার মৃত্যুর আগে যেন আমার ঐ হতভাগ্য যুবক স্বামীর মৃত্যু হয়। আমার আগে মৃত্যু ঘটলে তাকে আর দেখবার কেউ থাকবে না। এই জন্য একদিন না একদিন আমার বৈধব্য জীবনই আমি কামনা করি। ঈশ্বর যদি আমাকে কোনও শাস্তি দিতে চান তা হলে আমার স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুর পরই যেন তিনি তা আমাকে প্রদান করেন। এর পরও আমি বহুদিন বেঁচে থেকে ঈশ্বর বা মনুষ্যদত্ত যে কোনও শাস্তি হাসি মুখেই গ্রহণ করবো।

আজ্ঞে! হাসি মুখে যে শাস্তি গ্রহণ করা যায় সে শাস্তি কি রকম শাস্তি তা জানি না। যাক দেবী এখনও অবাস্তব কথা। এখন তা'হলে কি আপনি বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন। 'আমি মৃদু হেসে অন্য দিকে মুখ করে প্রত্যুত্তরে আমি প্রমীলা দেবীকে বললাম, আপনিও তাহলে আমাদের সম্পর্কে কিছু অন্যায় মনে করবেন না। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কর্মই মাত্র করেছি। আপনার ওপর ব্যক্তি ক্রোধের কারণ ঘটলেও তা আমরা দমনই করেছি। এক্ষণে আপনি আদালত হতে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হবার পর তো আর সে প্রশ্নই এখানে উঠে না। অবশ্য আমরা আপনাকে দোষী প্রমাণ করবার জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করি নি। 'আজ্ঞে না। এখন আমি বাড়ী ফিরে

যেতে পাচ্ছি আর কৈ,' আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রমীলা দেবী উত্তর করলেন, 'আমি একবার আমার এটর্নী বাড়ী হয়ে বাড়ী যাবো। যে করেই হোক ঐ হৃতচক্ষু যুবকের পিতার অন্যায় উইল আমাকে আদালতের সাহায্যে খারিজ করাতেই হবে। ওর পিতার প্রায় উন্মাদ অবস্থায় গৃহীত পুষ্য পুত্রের অধিকার আদালত হতে নাকচ হতে বাধ্য। এই সুযোগে আমি আরও একটি কথা আপনাদের বলে রাখতে ইচ্ছে করে। ঐ গুঁফ ওয়ালা বড় ম্যানেজারটীকে কিন্তু, জন সাধারণের পক্ষে আমি নিরাপদ মনে করি না। ওকে বেশী দিন জেলের বাইরে রাখা আপনাদের পক্ষে উচিত হবে না। আমাদের ভয় হয় এইবার সে ফিরে এসে আমাকে আবার ব্ল্যাক-মেইল করতে না চেষ্টা করে। লোকটার অর্থের বিনিময়ে এমন কোনও অসাধ্য কায নেই।

আমি এই সহকারীদের সমভিব্যাহারে থানায় ক্লান্ত দেহে ফিরে আপন সিটের ওপর দেহটি এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম ঐ নব বিবাহিত স্বামী স্ত্রী 'সুশীল-প্রমীলা কথা' ঐ অন্ধ যুবকের বিবাহ তাহ'লে অন্ধকারেই সমাধা হলো। আমি পরে শুনেছি যে বিবাহ সাক্ষীরূপে সেখানে দু'জন ডিফেন্স কাউন্সিলার ব্যতীত আর অন্য কেউই উপস্থিত ছিলেন না। হ্যাঁ। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে এই ম্যারেজ সার্টিফিকেট রায়দানের পূর্ব্বদিনে জুরীদের সামনে জজের নিকট উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দাখিল করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরপর জুরী মহোদয়দের মনে যা প্রতিক্রিয়া হবার তাই বোধ হয় হয়েছে। যাকে এই আসামী বিবাহ করবার জন্যে বহুদিন অধীর থেকে পরি-শেষে সে তাকে বিবাহ করলো সেই অদম্য প্রীতিপূর্ণ নারী কি তার ঈপ্সিত স্বামীকে এমন করে জন্মান্ধ করে দিতে পারে? আমার এখনও বিশ্বাস যে ঐ ম্যারেজ সার্টিফিকেটের উপস্থিতি এই মামলার মোড় সম্পূর্ণরূপে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ডিফেন্স কাউন্সিলারাও বারে বারে বলেছিলেন যে সম্পত্তির লাভে ও লোভের প্রশ্ন এখানে আদপেই উঠে না। এর কারণ এই ঘটনার বহু পূর্ব্বেই ঐ যুবক তার পিতা কর্তৃক আইন সম্মতভাবে ত্যাজ্যপুত্র হয়ে তার বিপুল সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়েছিল। এমনি বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে ক্রমশঃই আলোক উদ্ভাসিত হয়ে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে প্রমীলা দেবী প্রেমময়ী মহীয়সী দেবীরূপা নারীমূর্ত্তি হয়ে প্রকট হয়ে উঠছিলেন। আমাদের সোপাদ্দনের তরফ হতে এ'কথাও উঠানো হয়েছিল যে ঐ প্রবঞ্চিত যুবকের পক্ষে তার বিপুল বৈভব ত্যাগ করে ঐ বর্ষিয়সী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনও স্বাভাবিক কারণ ছিল না। কিন্তু এর উত্তরে বিপক্ষপক্ষীয় উকীলেরা একটী মাত্র উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তৃতাটীকে ম্লান করে দিলেন। তাঁদের মতে সম্রাট এডওয়ার্ড যদি সসাগরা পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্য একজন ঈপ্সিতা ভার্য্যার জন্যে পরিত্যাগ করতে পারেন তাহলে এই যুবকই সেই তুলনায় তার এই যৎসামান্য সম্পত্তিই বা এই একই কারণে পরিত্যাগ করবে না কেন? আমরা এদের বয়সের তারতম্য তুলে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত জুরী মহোদয়দের মনে এই মহিলাটির উপর বিতৃষ্ণা আনবারও কম চেষ্টা করিনি। কিন্তু বিপক্ষীয় উকীলগণ আধুনিক ভারতের এবং য়ুরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিবাহোপখ্যান হতে প্রমাণ করে দিলেন যে সত্তর বৎসর নারীর সহিত বিশ বৎসরের যুবকদেরও বিবাহের নজীর এই পৃথিবীতে কম নয়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচির মানুষের আইন সম্মত কার্য্যে বাঁধা দিলে বরং জুরী মহোদয়রা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হস্তক্ষেপের দায়ে দায়ী হয়ে উঠতেন। এই সকল পূর্ব্বাপর ভাষণগুলি এই সময় আমার মনে মূর্ত্ত হয়ে উঠে বেদনা দিচ্ছিল। আমি গুম হয়ে অফিস ঘরে বসে ভাবছিলাম যে এবার তাহ'লে কি করা যায়?

'প্রমীলা দেবী আদালতের বাইরে এসে আপনাকে কি বলছিল, স্যার', আমার জনৈক সহকারী অফিসার ঘরে ঢুকে আমাকে বললো', তবুও মন্দের ভালো অন্য আসামীরা কেউই এর সঙ্গে খালাস পাই নি। তা হলে আমাদের ওপর ওয়ালাদের কাছে মুখ দেখালেই ভার হতো। উপরন্তু এ ছাড়া পাওয়ায় কৈফিয়ৎ দিতে দিতে খাড়া হতে হতো। কিন্তু এখন আবার আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলেও তো চলবে না। ঐ পলাতক বড়ো ম্যানেজারকে পাকড়াও করে তাকে আদালতে চালান দিয়ে ঐ একই সাক্ষীর দলকে নিয়ে আবার নিম্ন হতে উচ্চ আদালতে পূর্ব্বের মতই তো টানা পোড়েন করতে হবে। এদিকে

সরকারী উকীল বলে পাঠিয়েছেন যে প্রমীলা দেবীকে ভুল বিচার করে জজ ও জুরী ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের আবার এই মামলায় হাইকোর্টে আপীল করবার জন্যে প্রস্তত হতে বললেন। এই প্রমীলা দেবীকে হাইকোর্টের দৌলতে পূর্ণ বিচারে এলে সাজা তিনি দেওয়াবেনই। পরের বার আমাদের চেষ্টা করে কয়জন মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতকে জুরীর দলে ঢোকাতে হবে, কিন্তু—

'আমিও এতক্ষণ ঠিক একই কথা ভাবছিলাম, ভাই, আমি ক্ষুন্নমনে একটু আড়মোড়া ভেঙে প্রত্যুত্তর করলাম, তা—একটা মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা করে আসতে পার ভাই। তোমার তো নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রী ও বাড়ীতে একজন সেই বৃদ্ধা ঠাকুমাও তো আছেন। একদিন চক্ষুমুদ্রিত করে ঐ বুড়ী ঠাকুমার শুষ্ক মুখখানিতে হাত রেখে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়ে তেমনি করেই চোখ বুজিয়ে তোমার আপন স্ত্রীর চন্দ্রানন ছুঁয়ে দেখ তো কোনও প্রভেদ বুঝা যায় কি না? এই কয়দিন এই উদ্দেশ্যে আমি ক্রমাগত বিভিন্ন বয়সী নরনারীর মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে বয়সের সঙ্গে প্রথমে ঘাড়ে ও কানের নীচে খাঁজ দেখা দেয়। এরও অনেক পরে কপালে ও চোখের নীচে কুঞ্চন ধরে। এই গুলি চর্ম্মচক্ষে দেখা গেলেও স্পর্শ দ্বারা বুঝা যায় না। এরও বহু বৎসর পরে গণ্ডদেশ একেবারে তুবড়ে গেলে তার তা হস্তস্পর্শ দ্বারা বোধগম্য হতে পারে। এই দিক হতে বিচার করলে প্রমীলা দেবী যে কোনও বিজ্ঞান সম্মত ভুল করেছিলেন তা আমাদের বোধ হলো না। কিন্তু সে যাই হোক মনে মনে আমরা ঠিক করলাম যে ওকে আমরা সহজে ছাড়ছি না। আপীল আমরা করবো এবং আমরা তাতে জিতবোও। এবারকার পুর্ণবিচারে আসামীর কাঠ গড়ায় প্রমীলা দেবীর সঙ্গে ঐ পলাতক বড় ম্যানেজারকেও দাঁড় করাতে পারবো।

আমি আর দেরী না করে প্রয়োজনীয় নথীপত্র গুছিয়ে সহকারীকে সঙ্গে করে দায়রা আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বোচ্চ আদালতে এই হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা করবার জন্যে সরকারী উকীলের গৃহের উদ্দেশ্যে এই সন্ধ্যাতেই রওনা হয়ে গেলাম।

এই মামলার আরম্ভ হয়ে গত কয়মাস আমরা বহু পাপ পুণ্যের লুকোচুরি দেখলাম। তবু আরও দুইটী বিষয় দেখা আমাদের এখনও বাকী রয়েছে। এর একটি হচ্ছে বিচক বেচারামের পিতৃ দত্ত ত্রিশহাজার টাকা বেচারামের প্রাপ্তির বিষয় শুনে তার সেই অথর্ব পিশেমশাইয়ের মুখের ভাব কিরূপ হলো তা দেখা এবং এর অপরটি হচ্ছে, সত্য সত্যই শেষ পর্য্যন্ত চক্ষু বিশারদ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সুরজিত রায়ের সহিত কাশীর সেই মহাকাল ভদ্রলোকের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ হলো কি না তা জানা? এ'ছাড়া ঐ পলাতক বড়ো ম্যানেজারের ভবিষ্যত পরিণতির বিষয়ও আমি ভেবেছি। এইসব কাহিনী পরবর্ত্তী এক পুস্তকে আমি বিবৃত করবো।

সমাপ্ত
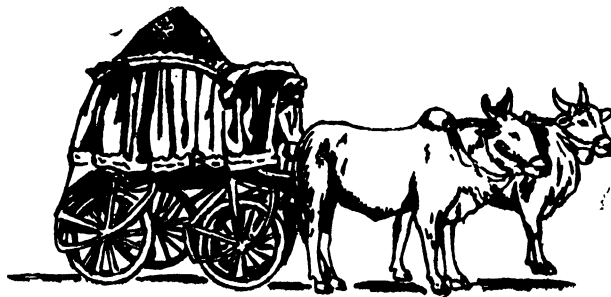
সাহিত্য-প্রেমচিন্তা ও রূপদক্ষ অন্নদাশঙ্কর রায়

অশোককুমার রায়

শুচিস্মিতা সুতনুকার জন্য রূপদক্ষ দেবদত্তের যে অসম নিষ্ঠার মমতা নির্ঝরের স্ফূর্ততা শিল্পদর্শনকে পলাশের বর্ণচ্ছটায় রাঙাতে পেরেছিল তাই আজকের আধুনিক পরিব্যাপ্তি আর প্রত্যয়ের সীমারেখায় কত বেশী গভীরতায় আল্পনা আঁকে ভাবে, বিভাবে আর তার উদ্দীপনায়—তা বিস্ময়ের বিচিত্রতায় রূপভূষিত চোখের মণিকুট্টিমে রমণীয় পরিতৃপ্তিতে আবেশযুক্ত করায়,—আরো বেশী কোরে ভাবায়—যা দেখেছি যা পেয়েছি যা বুঝেছির পাঠ পরিক্রমায়। তাই অজানিত অপ্রাপ্য রুশো—শেলীর কল্পনার ইউটোপিয়ার দর্শনাকাঙ্ক্ষী মানবজীবন—হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানের—পথনির্দেশে ঘুরে ফিরে দেখে শেষ মুহূর্তে নিশ্চয় প্রমিতিতে স্থিত-সফল হয় শিল্পমার্গের ঘরোয়া কথার রূপায়ণে ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সুভাষণ অনুসরণে—যার আর্ট হোল "Perfection of expressive form, discovery of beauty, revelation of the soul and essence of things and the powers of creative consciousness and Ananda of which they are the vehicles—তাই শিল্পের প্রধান কথাই রস-সঞ্জাত। ও রসায়ণ-কার। আনন্দ এখানে আলম্বন বিভাব,—তা না হোলে রূপদক্ষ দেবদত্তরা তাঁদের প্রিয়তরা সুবিনীতাদের অমন অমরতা দিতে পারতেন না। বিন্দুমাত্র সংশয়-হীনতার সাথে আনন্দধামে পরিক্রমণ অবস্থায় কল্পনার আর বাস্তবের অবিধালোকে যে অর্ণামেন্টাল ভাবে রূপ রসের কেমিক্যাল্ রিয়্যাকশন্ হয়ে যায়—তাই-ই সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বা শিল্প বা সঙ্গীত বা সর্বোপরি বিজ্ঞান—মহাদেশের শব্দ-লোক, থিওরী অফ্ দি ওয়ার্ল্ড্ অফ্ সাউণ্ড্। এটা অস্বীকারের কোন যৌক্তিকতা নেই। যেহেতু সব শেষে মনীষীরা অপেক্ষা করে আছেন সে যুগের জন্য যেখানে সাহিত্য—শিল্প—ধর্ম,—আমার ভাবনায় যার একমাত্র মানে হলো মঙ্গল সাধন—সবে মিলেমিশে যাবে বিরাটতম বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা অবশ্যম্ভাবী সুপ্রা-মেণ্টাল পরিবেশে।—সবই সম্ভব শিল্পের পরিব্যাপ্তিতে, যদি থাকে অপার নিষ্ঠা—যা দেবদত্তর ছিল। যা ছিল শেক্সপীয়র, গেটে, ব্রাউনিঙ্, ফ্রাঁস—রোঁলা—জিদ্, টলস্টয়, হুইটম্যান, আর মাইকেল—বঙ্কিমচন্দ্র—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—রবীন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ—শরৎচন্দ্রতে। তারপর? পরের কথা জাগতিক ঘটমান সালতামামিতে ভরাট। হাটে-বাজারের দুনিয়াদারির ভারে আর ধারে শিল্প অনেকটা পথ হারানোর না বোঝা জগতে হয়ে পড়েছিল স্থির। রূপ—রস—সৌরভ হয়েছিল এলোমেলো। ভুল কোরেও ভুলটাই বারে বারে এদেশে কি ওদেশে শিল্প-বেত্তারা পছন্দ কোরেছিলেন। স্ট্যাণ্ট্ নামক সাহিত্য পরিবেশনায় ও—ও যে একটা স্বীকৃত আর্ট, তা বলতে বাধা নেই। তবু বোধিসত্ত্বার ধ্যানের অভাব হয় নি ও দেশের ওঁদের আশে পাশেও—যাঁরা জীবনকে হতাশা—নিপীড়ন মায় সর্বগ্রাসী ধ্বংসের দানবলীলা থেকে বাঁচাবার সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শিল্পায়ণ কোরেছেন। ওঁরা আর্নেষ্টে হেমিংওয়ে, মম্, আলবেয়ার ক্যামু, ইভোআন্দ্রিচ্, পাস্তেরনাক, আলডুস হাক্সলি, শ্রীমতী রেমার্ক ও শ্রীমতী বাকের দল। তাই বলে বাংলার সাহিত্যের শিল্পী মনীষীরা অনেকেই নিশ্চুপ থাকেন নি। এ যে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধতের দেশ—সেটি ভুললে চলবে না। ভাষার শব্দরূপ যখন সাজায় শোনায় চরৈবেতি—তখনি সে ভাষায় ওজস্বিনী রূপকে নিয়ে শিল্পায়নের পথপরিক্রমাকে আজও অনেক রূপদক্ষ দেবদত্তপ্রতিম স্বনিষ্ঠ রসবেত্তাদের মনীষা ভাবনার গভীরতায় আরক্তিম কোরে রাখতে

সক্ষম। প্রকৃতির শিশুপ্রেমী বিভূতি ব্যানার্জীর মনীষালোকে তা উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। ওরই মত শিশুপ্রেমী বিভূতি মুখার্জীর আঁকা সলাজ মধুর যুগল প্রণয় বিলাসের সহাস কথায়,—মণীন্দ্রলাল বসুর যৌবনের চোখে বন্দনা-করা যুবতীর জন্য যুবকের তৈয়ার-করা রূপমঞ্জিলের সজীব সবুজ জীবন-মানসিকতার ব্যঞ্জনায়—জীবন সমালোচক বনফুলের সহৃদয় রস—রূপ—গন্ধে আমোদিত প্রাণধারার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষার রোমান্স, বাঙলার জমিদারী-এ্যারিষ্টোক্রেসির—রূপবেত্তা সহজ সরল পল্লী বিচিত্রার জীবনপ্রেমী তারাশঙ্করের শিল্পালয়ে তা ভাস্বর আর অনাবিলতায় জীবনকর্মরথচক্রের দলিল হয়ে উঠেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রে উছলে উঠেছে তার ছন্দ-ঘেরা কবিরূপ। শৈলজানন্দতে আদিবাসীর নৃতাত্ত্বিক রূপায়ণ ও যা অনন্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও গণবিলাসী মাণিক ব্যানার্জীতে সমাজের নীলকণ্ঠ পরিচয় সমেত মহৎ প্রয়াস। আধুনিক রোমান্টিকতার মাধুর্য্যতায় ভরপুর সুবোধ ঘোষের অনিন্দ্য রূপচেতনা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাস্তব রোমান্টিকতায় আর রামপদ চৌধুরী ও লীলা মজুমদারের আঁকা জীবনবিচিত্রায়।—কিন্তু এর পরেও যিনি নিজেকে সবার থেকে দূরে, এক আলাদা জগতে বিদিশার নিশার শেষে জাগা ভোরের সন্ধ্যাতারার মত জ্ঞানে—অনুজ্ঞানে প্রজ্ঞাপ্রমার মিতালিমধুর দ্বন্দ্ববিলাসে স্থির, ধীর আর নিছক কথার পিঠে কথা সাজানোর অলঙ্করণ থেকে সুদূরাগত কোন কিছুর অতৃপ্ত অভিধা জানাতে সচেষ্ট,—তিনি সকলেরই প্রিয় লেখক আর দেবদত্তের মতই কল্পনার—সুতনুকা রূপের সঙ্গে মানস পরিণয়ে প্রেম-নিষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়।

যিনি সাহিত্যের কারুকার,—আমরা জানি তাঁর পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও তা ছিল না। সম্ভব হয়েছিল রাজসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মিলিটারিয়ানিজমের জন্য। তাঁরই লেখন সঙ্গীণের ফলে সুবিস্তারিত সাহিত্য রাজপথের সুগমতার ওপর দিয়ে কবিসম্রাটের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বিশ্বের সারস্বত মন্দিরের দেউড়িতে নিজস্ব সাহিত্যের রোলস্ রয়েস্থানাকে ছুটিয়ে এনে দাঁড় করানো ও সেই সাথে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে আরেকবার—যুগগুরু বিবেকানন্দের পরে—দ্বিতীয়বারের মত চরম চমক লাগিয়েছিলেন।—তাই বলতে চাই সেদিন ভাষা সংক্রান্ত জড়তার প্রশ্ন আর বড় কারণ হয়ে বাধা দিতে পারে নি। আজ তা আরও বিজ্ঞানসম্মত ও সেই সাথে খুবই ক্রিয়াশীল।—তবু আজ লেখককে আধুনিক জটিলাবর্তের ঘূর্ণিপাকে প্রায়ই হতচকিত প্রায় হতে হয় ভাবের দ্বন্দ্বে, সমস্যার জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে কোন সুরাহা পায় না। আর সর্বোপরি আত্মাদর্শের সঙ্গে জাগতিক খেয়াল-খুশির সংঘর্ষের হানাহানিতে। কি লিখব, কেমন করে লিখব, কার জন্য লিখব, আর কেনই বা লিখব—এমন সব ভাসমান প্রশ্নের বেড়াজালে লেখককে হিমসিম খেতে হয় রীতিমত। তবে অনেকেই এ সবের ধার পাশ দিয়ে পরিক্রমা করেন না—কেন না তাঁদের পথ ছকে বাঁধা। ভাবনার বিষয়, দেশে-বিদেশে এঁদের সংখ্যাই গরিষ্ঠ। এঁদের রচনাও সময়ে সময়ে বেস্ট-সেলার হয়ে ওঠে। কিন্তু পস্টেরিটি এঁদের জন্য কালের কপোল তলে একবিন্দুও অশ্রুজল জমা রাখে না। ভুলে গেলে চলবে না, বেস্ট-সেলার মাত্রেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। যেমন রূপোলী পর্দায় বক্স অফিস্ পাওয়া ছায়াছবি।

লিখতে বসে বলব, আজকের দিনের সঙ্গে কতকগুলো শিল্প-লোকীয় কানুন মেনে চলতে প্রথম পর্য্যায়ে রাজী নন অন্নদাশঙ্কর রায়। ছকে বাঁধা পথ তো দূরের কথা, যে ঋতুবিচিত্রার অনুসরণে প্রেম জাগে নায়কের মনে নায়িকার জন্য—এই শিল্পী তাতেও সন্তুষ্ট নয়। কারণ আজকেরই মত ভাসা কৃত্রিমতায় মানুষের পবিত্র এই সংস্কারটি একটি নিছক সামাজিক কাজ হয়ে উঠেছে। সেখানে নেই আদর্শের কোন স্থান। এ যেন পথ চলতে চলতে দুটি বিপরীত Sexএর মাঝ রাস্তায় হল্ট্ নেওয়া শারীরী মিলনের একপেশে জীবন যাপন। প্রণয় বা বিবাহ যা আমাদের একটা খুব বড় Religious ritual, যা পবিত্র গ্রন্থিতে দুটি সবুজ যৌবনকে সলাজ মধুরতার মধ্যে টেনে এনে বসন্তের সুরেলা মুহূর্তে রীতির ঋতায়নে পরিপূর্ণ করায়,—আর যে মুহূর্তটির অভিধায় মহাকবি গ্যেটে প্রিয়া সুবর্ণিনীর লজ্জা জড়ানো একটি গীতি কবিতার মতো মঞ্জুলতায় নেচে যাওয়াকে বন্দনা করেছেন—"The eternal womanly draws us upward" বলে,—তাই অন্নদাশঙ্করের সাহিত্য শিল্পায়নে, প্রণয়জীবন সমালোচনার মুহূর্তে অনুরঞ্জিত করেছিলো। নারী কত মহৎ, কত

ব্যাপক তার সৃষ্টির কাজ তা বড় বিস্ময়ের উদ্রেক করে, সৃষ্টির উৎস পুরুষের অন্তর কোণে।—সত্যি, যে সোপেনহাওয়ার ঘোরতর স্ত্রীজাতির বিদ্বেষী ছিলেন তাঁরও মাথা সম্ভ্রমে অবনত হয়ে আসতো নারীর মা হওয়ার অকল্পনীয় দুঃসাধ্য প্রজাবতীর রূপের কাছে। টলষ্টয়—তাঁর জীবনে প্রিয়া স্ত্রী আলেকজান্দ্রার—সাহচর্য্য যদি না পেতেন এবং তিনি যদি এগারোবার দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের বলে "War And Peace"কে হরেকরকম সংস্করণের জন্য রদবদলহেতু কপি না করে দিতেন তা হলে পর ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে ও বইটির কি হতো! এর মূলে একটি শক্তির উৎস ছিল। আর তা সুবিনীতা প্রিয়ার হৃদয়ে সাজানো—কম্প্রমান সহযোগিতার অনুরণন। তাই বলতে বাধ্য, আজ ভালোবাসা যেখানে একটা নিছক ভাববিলাস ছাড়া আর কিছু নয় এবং সপ্তপদ পরিক্রমায়—যে মধুরে মধুর পরিণয় সম্পন্ন হয় তা একটা নিছক ঝকমারি বই আর কিছু নয়। কিন্তু আদম ও ইভের মতো আজকে এরাও ভুল কোরে মানুষ, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির সৃষ্টি কাজের প্রথম পদক্ষেপে। যে দরদ থেকে, যে আত্মনিষ্ঠ সুতৃপ্ত প্রেমচরণা থেকে সমস্ত কিছু সহজ সরল সুরে পূর্ণ হতে পারে তা আজ সম্ভব নয়। সমাজের যুগলরূপ আত্মদ্বন্দ্ব, সংশয় আর অবিশ্বাস—এই তিন অশুভযোগে দিশাহারা। রাশহীন। তাদের সৃষ্টিও তথৈবচ। অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যে এ সবই দেখা দিয়েছে এক মানবিক চাওয়া পাওয়ার ভুল বোঝার সঙ্কটে। ওঁর মতে বলতে পারি, আজকের সাহিত্যের সংকট সম্বন্ধে তিনি যেমন সচেতন, সহানুভূতিসম্পন্ন,—তেমনি বুঝেছেন মানুষের চিরন্তন প্রীতি স্নেহের জগতে আজ—সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাঁর কল্পনা আঘাত খেয়েছে, কোকিলের কুহুতান যখন শত আহ্বানেও কোকিলাকে কাছে টানতে পারঙ্গম নয়। মনে মনে মিতালি পাতানোর আগে যেখানে দেহ লভিছে দেহের সুখ, সেখানে প্রেম আসে না। আসে না কামনার স্বর্ণকান্তি স্নিগ্ধতা। দেহবাদ বা যৌন চেতনাই আসল নয়। প্রেমে তার আবশ্যিকতা খুবই আছে। দেহকে বাদ দিয়ে শুধু মন নিয়ে প্রীতিবিলাসে আসে এক-ঘেয়েমিতা। দু'য়ে যেখানে পরস্পরের বন্ধু—প্রেমের স্নিগ্ধতায় দেহজ তৃপ্তি যেখানে লজ্জার গরিমায় রাঙা হয়—সেখানেই ওর পূর্ণতা। অন্নদাশঙ্করের রূপদক্ষ দৃষ্টির কাছে নরনারীর মিলন মেলার গাথা প্রেম-গীতিহার অপরূপ বাক্-বিভূতির—মায়ালোকে নতুন কিছু হয়ে উঠেছে। খণ্ড বিক্ষিপ্ত জীবন-যৌবন সম্ভোগের ভেতরে যে ক্রন্দসী রূপ লুকিয়ে থাকে, তা তাঁর রচনায় কোথাও হয়ে উঠেছে "মনপবনে"র নাও-এর মত সুদূরাভিসারী;—কোথাও আউল—বাউলের মিঠে গলার সুরের লহরে ভেসে যাওয়া ক্ষমাসুন্দর মানসিকতা "যৌবনের জ্বালা"কে করেছে জীবনের সোয়ান্ সঙ্,—যার উদার পরিব্যাপ্তি ভুলের শেষে পুরুষকে নারীর দেউলে সুমন সমেত বন্ধুত মিনতি করাতে পেরেছে।—অন্য কোথাও দেখেছি যৌবনের অবুঝ চপলতা রসিকতা করেছে নর-নারীর আধুনিক মন নিয়ে লুকোচুরি খেলার অন্ধমুহূর্তে, পরিণামে যা শেষ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে হরেকরকমের "প্রকৃতির পরিহাস"। সত্যি তো ওরা প্রীতির সৌগন্ধকে হারিয়ে ফেলেছিল। যত ভাব আর যত চাহিদা সবই দেহকে ঘিরে। তাই "চুপি চুপি"র ইন্দুকে প্রজায়নের ম্যানুফ্যাকচারিং মেসিনে পরিণত করায় স্ত্রীর সিক্সথ্ কন্‌ফাইন্‌মেণ্ট পিরিয়ডে স্বামী বনোয়ারীলাল সিক্সথ্ সেন্সের সাধনায় সুদূর পণ্ডিচেরী পালিয়ে আত্ম-হননে তথাকথিত আত্মশুদ্ধিতে মনোযোগী হয়। আর "স্তনন্ধয়ে"র প্রকৃতির পরিহাস যে কত সুক্ষ্ম, তা অতি স্থূল বস্তুকেও রসনির্ঝর করে তুলে ছিল। নবনীর অতি দেহভোর আকৃতির ভ্রান্তি তাকে উপহাসের বিষয়ই করেছিল।—অনেকবার ভেবেছি, অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর এই রূপচেতন গল্পের পরিমিতিতে প্রেমের যুগল স্বভাবেতে রুচি ও নিষ্ঠার অভাব দেখে সমাজ সমালোচক না হোয়ে পারেন নি। তাঁর এই ভাব যেন আধুনিক মনের দুটি মিথুনরূপ সম্বন্ধে অনোরে বাল্‌জাকের কথারই অনুরণন করে বলতে চায়—"Many young husbands are so ignorant of women that they make him think of orang-outangs trying to play the violin." এ হেন বিদ্রূপই বোধ হয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পরিহাস।—কিন্তু কাঞ্চন লোভে যে কামিনী অর্জনে রূপমতী হেলেনের জন্য ট্রয় নগরীর ধ্বংস—তা আজও প্রবাহমান। "কামিনী কাঞ্চন"—এই নামাঙ্কিত তালিকায় অন্নদাশঙ্করের জীবন সমালোচক রূপটি এক অজানিত শান্ত গভীর—দীপ্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে সমাজ সমালো-

চনাকে অতিক্রম কোরে "রূপের দায়" পর্য্যন্ত। লেখকের কবিস্বরূপ গানের সুর তুলেছিল—

আমরা দুজনা দুই কাননের পাখী।
একটি রজনী একটি শাখার শাখী।

—পাখীর ছোট্ট নীড়ের ঘুপসুটির মধ্যে হয় একটি রাতের মিতালা। থেকে দেহালাপ অনেক কিছু। কিন্তু, মানুষের র‍্যাশান্যাল যুক্তি-বিযুক্তির সংঘর্ষে তা অনেক শত হাজার এক রাতের মধুক্ষর কাহিনী। পলে পলে প্রাণের সুধা চয়ন করার কাজে হাফেজের প্রেমদর্শনেতেই রেঙে ওঠে তা। তাই অন্নদাশঙ্করের লেখা "গেছে পথ হারিয়ে"র চন্দ্রকিরণ জীবনে সবই পেয়েছে। কাঞ্চনের অবস্থা অতি প্রাচুর্য্যের। কিন্তু কামিনীর মূল্যায়ন কোরতে দ্বিধাযুক্ত সে। স্ত্রী যশোধারার সাহচর্য্যে সে পূর্ণ হয়ে উঠতে সচেষ্ট নয়। বোধ হয় আপন সাধনার পথে তা হবে অন্তরায়। হলোও তাই। প্রিয়া নারী বর্তমানেও সে সত্যি আপন স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে যেয়ে দেখল, পথ গেছে হারিয়ে। দুইয়ের—কাঞ্চন আর মধুরা নারীর—যোগাযোগকে পারে নি এক কোরে তোলার কাজে। কিন্তু "ল্যাভেণ্ডারে"র নায়ক প্রৌঢ়ত্বে এসেও বন্দনা না করে থাকতে পারেন নি জীবনের প্রথম প্রেমের সুজনাকে। স্মৃতিচারণায় দ্বিতীয় যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে খুশীবিভোর হন প্রথমার জন্য মনে মনে গুনগুনানো সোয়ান্ সঙে। আজও তার গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থের মধ্যে ল্যাভেণ্ডারের সুবাসকে যত্নে রক্ষা কোরে রেখেছেন অভিজ্ঞান স্বরূপ। এর চাইতেও বেশী কিছু ব্যঞ্জিত হয়েছে "রূপের দায়ে"র কাহিনী পরম্পরায়। "কতকালের চেনা" হাজার হাজার বছরের পৃথিবীর ফেলে আসা পথে সমাজশাসিত প্রেমের কানুনে যে দুটি সবুজ প্রাণ আরতিতে বন্দিত হওয়ার আগেই অন্য অনেকেরই ডিক্‌টেটোরিয়াল অভিভাবকত্বের বৃথা জেদাজেদিতে হঠাৎ আঁধারে ছিটকে যায়, তারাই যখন বিদিশার নিশা শেষে হঠাৎ পথ চলতে সুরেলা হয়ে দেখা দেয়—তখন প্রেমিক জানাতে বাধ্য হয় মিনতিতে করুণ মধুর চাহনির জড়তার ভেতরেই মোকাবিলায়,—অ্যাঁ রিভোয়া! এর চাইতে আর বেশী খুশীর আমেজ দেওয়া যায় না। এও একদিক, প্রীতির ভুবনে। আরেক দিকে দেখি প্রেমের প্রতীক্ষা জীবনকে কত মহৎ কোরে তোলে বয়েসের মিথুন লগ্ন ফুরিয়ে যাবার শেষে ঝলকে দোদুল কোরে।—"এই যদি ছিল মনে" আর "বজ্র আঁটুনি"—দুটি গল্পই তুলে ধরেছে শেষ পর্য্যন্ত কোকিলের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অভিজ্ঞতা ভরা আহ্বানে কোকিলকে কাছে পাওয়ার আনন্দে। ওরা কাছে এসেছে। যুক্তি-বিযুক্তির শেষে পরিণয় সাত পাকের মিলিত ছন্দের যতিতে ভরিয়েছে। তবু এর পরেই জেগেছে দারুণ সংশয় ভরা সংকট। বয়েসের বালুবেলায় যৌবনের সর্বারম্ভ সৃষ্টি ক্ষমতার শেষ কারু কাজের বিলম্ব হেতু অচিরে তা সমাধা করার জন্য প্রজায়নে আহ্বান জানাল তীব্র ভাবে জয়দেব আর সুমন্তের পৌরুষের কাছে। কিন্তু কুল আর নূপুর আজ লজ্জার চরম মূর্তি—বয়েসের গাম্ভীর্য্যে। আলাদা থেকে থেকে এক আরেকের সঙ্গে মিলে দুই হয়েছে—এবার কি ওরা দুজনের প্রয়াসে ভবিষ্যতের তিনকে সৃষ্টি করাবে না? ও না হোলে যে পূর্ণতা নেই। কি করে বলা যাবে, পূর্ণমিদম্!—দেখেছি অন্নদাশঙ্কর সুন্দরভাবেই এ সম্পর্কে সহাস মধুর আলোচনার অবতারণা কোরেছিলেন একটি প্রবন্ধের চিন্তায়ণে—"আধুনিক যুগে আমরা যত উপন্যাস পড়ি তাদের অধিকাংশই মিলনান্ত। নায়ক নায়িকার মিলনের বাধা অপসারিত হলো, এইবার তাদের বিয়ে। অথবা নায়ক নায়িকা অবশেষে প্রেমে পড়ল। এইবার তাদের সুখনীড় রচিত হবে। বংশ রক্ষার ইঙ্গিত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাতে রসভঙ্গ হয়। উপন্যাসের জগতে সন্তান-সন্ততি নেই। আছে চিরন্তন নর আর চিরন্তন নারী।"

—ওপরের কথা অনুসারে আমি বলব, এই চিরন্তন নর আর চিরন্তনী নারীর চিরন্তন ঋতুবিচিত্রায় সাজান প্রণয়-প্রীতির চরম ও পরম সাহিত্যরূপ প্রকাশ পেয়েছে রূপবিদগ্ধ অন্নদাশঙ্কর রায়ের মনীষায়,—কোথাও যা এলোমেলো নয়। নয় সংশয় সমাকুল। একটি বড় আদর্শের রূপায়ণে নরনারীর মধুর সম্পর্ককে প্রকাশ কোরেছেন এই শিল্পী তাঁর উপন্যাসে, সবিশেষ বিশিষ্টতায়।

"অসমাপিকা"র সুচারু-সুরুচির প্রেম দর্শনে যা আলোক সম্পাত করেছিল তা চিরকালীন প্রণয়ের ইতিহাসের সবুজ ঘর। সমাজকানুন জোর কোরে যাকে সমবয়েসী

প্রিয়র বুকের আলিঙ্গন পেতে না দিয়ে করেছিল এক ধনী ও বয়েসীর ভাবী অঙ্কশায়িনী,—সেই সুরুচির সবলা রূপ মানতে পারেনি তা। মনে হয় সুরুচি আধুনিক রাধা। বীর্য্যে, শৌর্য্যে আর দেহ-সৌন্দর্য্যেও যে যৌবনের মণিমুক্তার জৌলুস,—যা সুন্দর যুবক সুচারুর সুমনই দাবী কোরতে পারে। ও যে রাধার ছোঁয়াচে বিদ্রোহিনী হওয়ায় মূর্তি ধরেছিল ফ্রী উওম্যানের। পরবর্তী "রত্ন ও শ্রীমতী"তে ঐ-ভাবেই ঝড় তুলেছেন আরো গভীর বোধি-রূপ থেকে। রত্ন আর গৌরী—আজকের দিনে ওরা মূর্ত করাতে চায় পূর্ণ বিকাশে, যে ফ্রী ম্যান আর ফ্রী উওম্যান হওয়া সম্ভব কি না। মনে হয় সম্ভব। আজ হোক. আর কাল হোক আমাদেরও ঐ অজানিত রূপের সম্মুখীন হাতে হবে, যার স্বপ্ন একদিন রূপায়িত কোরে-ছিলেন মহাকবি গ্যেটে। আবার ভাবতে হয় তাঁর Eternal woman কেমন! কোন সন্দেহ নেই প্রেমিক পুরুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠার চূড়ায় আরোহণ করবার এক-মাত্র উপায় আসে প্রিয়া স্ত্রীর প্রাচূর্য্য ভরা—সহযোগিতার অনলস শক্তির উৎস থেকে। প্রেমবিলাসী অন্নদাশঙ্করের আদর্শ তাঁর সাহিত্যে এমনি ব্যাপক ধারণার সাধনায় আত্মস্থ, একনিষ্ঠ। মনকে চিন্তায় রাঙায়, যখন ভাবি রত্ন ও শ্রীমতী গৌরীর সম্পর্ক পর্য্যালোচনায়—ফ্রী ম্যান আর ফ্রী উওমানের প্রেমের সার্থকতা নিহিত আছে স্বাধীন ভাবের সঙ্গে মিতালি ভরা বিবাহের সমাজ মধুর জগতে।

এই ফ্রী উওম্যানের আকর্ষণ আছে ফ্রী ম্যানের কাছে—এমন ভাবনায় সমাজ কি রূপ নেবে তা জানা নেই। কিন্তু সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের মানস-গঠনায় এরই একটা সত্যরূপের পরিচয় এনেছে "রত্ন ও শ্রীমতী"তে। সমাজের সাধারণী প্রীতির স্থূলতার জগতে নারীর যৌবন ম্লান হয়েই পড়ে,—আবেগ শূন্যতায় হয়ে থাকে দুর্বল। অচলা। নিয়তই ও যেন পুরুষের হাতের খেলনা। তাও আবার মোমে গড়া—কাজেই প্রিয় অপ্রিয়র শুধু দেহাচারের সঙ্গিনী হোতে হয় বলেই মৃদুমন্দ রতিলোকের তাপেই সে গলে যায়। দেহলী দিগন্তে আজকের রুচি যখন দেহের সাথে দেহেরই বন্ধুত্ব পাতায় শুধু—তখন ভাবি. মনের কোন স্থান নেই সেখানে। ভুলে যাই, মনকে ঘিরেই আসে প্রেম। দেহকে ঘিরে নয়। আধুনিক রঙ বেরঙের ঝিকিমিকিতে সাজানো কি দম্পতি রূপ, কি প্রেমিক যুগল, কেউই জীবনের একান্ত প্রয়োজন বলে দাম দেয় না মন-মহাদেশের বোঝাবুঝির মোকাবিলায় জাগা "mutual understanding"-এর। তবু এমনটা হোলেও শ্রীমতী গৌরীর জন্য রত্নর মানসিকতা বুঝতে পেরেছিল—"Where actions are rooted in love, nothing but goodness can flower there from."—ভাল আর মঙ্গল—সুন্দর মনের যুগল প্রেমিকেরই এটা আদর্শ। পরপূর্বা হোয়েও শ্রীমতী তার রূপঝরা বুকের আবীর রঙে ঝলকানো বজ্রশ্রীর শোভা দিয়ে বন্দনা কোরেছিল রত্নর স্বাধীন স্বভাবকে—যে বুঝেছিল তার যুবক পরিচয়ের যৌবন স্ফূর্ত্তিতায়—সুবিনীতা আনিন্দিতা নারী মাত্রেরই পরিচর্য্যায় জাগবে অনিবার্য্যভাবে আপন সত্তার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। নারী যে অপার-শক্তির আকর—এ কথা বৈষ্ণবও বুঝেছিল। শাক্তও বুঝেছিল। অন্নদাশঙ্করের শিল্প-চেতনাও তাই বুঝেছে। সর্বোপরি, রত্ন সমীপে গৌরীও তা বুঝেছে। শ্রীমতী যে সমর্থা নায়িকা। অন্যতরা হয়েও সবলার নিশ্চিন্ততায় প্রার্থনা কোরতে পেরেছিল রত্নর কাছ থেকে মধুরা রতিকে। রাধার মতই। ওর প্রেম দেখেছি নারী রূপে পুরুষের জন্য নিবেদিত রূপ—Passionate adoration. নিজের নয়, চিরন্তন পুরুষের পরিচয়ে রত্নই তার ভেতরে জাগিয়ে-ছিল এমন বিভাবের। আমি দেখেছি, অন্নদাশঙ্করের প্রেমদর্শন ভালোবাসার জগতে প্যাশনের প্রয়োজনীয়-তাকে দারুণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম কোরেছেন। এ জিদ না থাকলে—ভালোবাসা অচিরে ম্লান হয়ে যায়। কেন না—The passion called love.—এ হোল সেই আসক্তি। সেই জিদ। প্রেমিক রত্নও বুঝেছিল—"প্রেম, তোমার মত প্রিয় আমার কেউ নেই। তুমি আমার স্বকীয়া। আমি তোমার স্বকীয়। যে যার সে তার। কবে আমাদের দেখা হবে, আদৌ হবে কিনা, এ নিয়ে আমি ভাবিনে। হলে অভাবিত রূপ হবে। যেমন করে হল আমাদের চেনা। আমাদের ভাব, আমাদের ভালোবাসা।"—তার পরে রত্ন শ্রীমতীর স্বাধীনা রূপের চিরন্তনতাকে বন্দিত করে জ্যোৎস্নার ঝিলি-

মিলিকে বলেছে—"মধুর, তুমি অনেক দিয়েছ, অশেষ দিয়েছ। নাও, নাও, কী নেবে নাও। নারী রূপে। গৌরী রূপে"। এই মধুরা বরবর্ণিকার যেন উদ্দেশ্যেই কবি কীটস্ মুখর হোয়েছিলেন—

"No, yet stll steadfast, still unchangeable,
Pillowed upon my fair loves ripening breas,
To feel for ever its soft fall and swell.
Awake for ever in a sweet unrest,
Still, still, to hear her tender-taken breath,...

"রত্ন ও শ্রীমতী"র দুটো খণ্ডে প্রেমবিলাসী অন্নদাশঙ্কর এরই পরিপ্রেক্ষিতে যুবক যুবতীর প্রীতির সাত রঙা ভুবনকে অনিন্দ্য কোরে তুলেছেন।

একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক কথার রণন তুলে ধরায় এখানে "সত্যাসত্যে"র অশেষ বিচিত্রিতার ভাবযানে এগিয়ে আসা অনেক কিছুরই আলোচনা করার সুযোগ নেই স্থানাভাবে। ওর ব্যাপক লব্ধ স্বীকৃতিকে মনে জাগরূক রেখেই জানাতে পারি প্রেমাচারের একটি মহৎ আদর্শের কথাকে। এর প্রধানা নারী উজ্জয়িনী। প্রেমের এক নতুন রূপ ফুটেছে উজ্জয়িনীর মধ্যে। শিক্ষায়, রুচিতে অত্যাধুনিকা। পরিণীতা হয়েছে এক প্রখর জ্ঞানান্বষী যুবকের সঙ্গে—যে জীবনে প্রিয়া স্ত্রীর জন্য—"আর্ট অফ্ লাভিং" কে প্রয়োজনীয় মনে কোরতে পারে নি। যার সাধনা ছিল—quest of intellectualism এরই প্রতি অনুতে অনুতে।—তবু তার জন্য নারীর সুন্দর সুমনালয়ে বিন্দুমাত্র খেদ ছিল না। ভুলে গেলে চলবে না, অভিমান আর আবেগ নারীর যুবতী ধর্মের অশেষ অলঙ্কার। কিন্তু বুদ্ধিজীবির কাছে আবেগের কোন আবেদন নেই—তাই নায়ক বাদল তার এই মঞ্জুলা পত্নীকে রাঙাতে পারল না অভিমানের সলাজ সুধর জগতকে বুকের কাছে টেনে আনার মধ্যে। আমরা জানি—বাঙলা সাহিত্যে মধুরিম বরনারীদের নিলাজ সুন্দর অভিমানের পালাবদলকে শিল্পসমৃদ্ধ কোরে তুলেছেন আরেক প্রেমবিদগ্ধ কথাকার—বিভূতি মুখোপাধ্যায়। তবু অন্যলোকের বিচারে দেখি, পাশ্চাত্য মানসিকতা সঞ্জাত হোয়েও শিল্পীর চিরন্তনতা অন্নদাশঙ্করকে বাধ্য করিয়েছে আবেগের জগতে মান—অভিমানের সবুজ রঙে সাজানো উজ্জয়িনীর চরিত্রায়ণে। একটি ছোট চরিত্র—অশোকা তালুকদার—তার মধ্যেও দেখেছি যুবতীর সহাস সজল আবীর রাঙা অভিমানের নিলাজতা। নারীর দাম্পত্য জীবনে মান—অভিমান যে কত ব্যাপক, আর সুসামঞ্জস্যতাকে আহ্বান করে এক ছায়া সুনিবিড় শান্তির দুনিয়ায়, তাকেই শিল্পরূপে সাজিয়েছেন রূপবিদগ্ধ অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর আঁকা অনন্য চরিত্র এই উজ্জয়িনীর—ঘরোয়া কথায়। এই নারীর প্রেমে দেখেছি, একটা সুস্নিগ্ধ প্যাশানের পলাশ রঙ। আর তাই দুঃখের পথেও বহুত মিনতিতে নিজের বরপুরুষকে খুঁজে পেয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই প্রতি নায়ক কুমারকৃষ্ণের বুকের আশ্রয়ে। বাদল যদি একবার বুদ্ধিচেতনার মার্গ থেকে নেবে এসে বুকের বন্দিনী করাতে পারত আদরে, সোহাগে, চুম্বনের রভসতায় উজ্জয়িনীকে—তা হোলে প্রিয়া নিশ্চয়ই তার রাধা ভাবের উদ্দীপনায় বলতে পারত বাদল-কে রাধার মতই সুভাষণের আরতিতে

"সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে আনল রসবতী
রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী আপন কেশে তে
মোছাই॥
অঙ্গক ধুলি বসনহি ঝাড়ই অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহুঁ সনে মান করলুঁ বব মাধব
হাম তিতি অলপ পরাণ॥
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়ায়লি
অবহুঁ টুটায়ব কেহ॥
সব অপরাধ খেমহ বর মাধব তুঅা
পায়ে সোপলুঁ পরাণ।"—

—কিন্তু উজ্জয়িনী তা বলতে পারে নি। না পারার কারণ বাদলের নিষ্ক্রিয়তা। এতর পরেও দেখেছি, উজ্জয়িনীর চরিত্রায়ণে নারীরত্ন নৈষ্ঠিক প্রেমসাধনাকেই অন্নদাশঙ্কর অলঙ্কৃত কোরেছেন। যাই হোক না কেন—নারী তার জীবনে চায় সুন্দর মন পুরুষের ছায়া ভরা সুনিশ্চিত আশ্রয়কে। উজ্জয়িনী তাই বুঝিয়েছে তার জীবনায়নের শেষ মুহূর্তে

আর একটা দিক আছে প্রেমের জগতে নারীর জন্য আর পুরুষের জন্য। সে কথা অন্নদাশঙ্কর তাঁর "কন্যা" উপন্যাসে লিখেছেন। পুরুষের জীবনের ক্রমবিকাশে প্রেম অপরিহার্য্য। নারীর যুবতী স্ফূর্তিটাই তার শক্তির উৎস। এ ধারণাতেই কথাশিল্পী প্রেমের সবুজ ঘরের সুখকে মুখর কোরেছেন" "কন্যা"র ভাব-বিভাবে।—"পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। রমণীর রূপ। বিকশিত যৌবন। সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধ। তনুসুরভি। একি কখনো স্থির থাকতে পারে এক রজনীর বাহুবন্ধনে। এ চলবে।··· অনুসরণই অন্বেষণ।···রূপমতী নারী। চিরন্তনী নারী। এই নারীতে আছে সেই নারী। যদি একটি রাত ও থাকে, তার পরে না থাকে, তা হলেও চিরন্তনের চিহ্ন রেখে যাবে তন্ময়ের। পরশ পাথরের পরশ লেগে সোনা হয়ে যাবে তার অঙ্গ। সোনা হয়ে যাবে তার মন।···সে ধন্য, সে সার্থক, সে অসাধারণ ও অসামান্য। তন্ময় তার বিয়ের রাতটাকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে। এ জীবনে এমন রাত্রি দুবার আসে না। কাল বেঁচে থাকবে কিনা তাই বা কেমন করে জানবে।···বাসরের পরে মধুমাস। মধুমাস যেন ফুরোতে চায় না। দু'জনে দু'জনের মুখে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ে কখন এক সময়।···"সত্যি মানুষ যখন পুরুষ হয়ে জন্মেছে, তখন তাকে অস্বীকার করলে চলবে না নারীকে, প্রেমের তাগাদাকে, উভয়ের দম্পতি সুখকে।—যে সবের মূলে প্রেরণা নিয়ে আসে কন্যারাই —সে কন্যা কান্তিমতী, কি পদ্মাবতী ; কি রূপমতী এমন কি কলাবতীই হোক না কেন —তারা সবাই যুবতী নারী—আর প্রভাবে পুরুষের প্রতি চিরন্তনী নারীর রমণীয়তা নিয়েই তাদের সাজায়, গোছায়, সুখী করায় নিজেরা সে সুখের সৌরভে খুশী বলে। যৌবনের ভারে ক্লান্ত আর তপ্তকান্তি শেষে, স্বীকার করেছিল—"······কিন্তু নারীকে আমি পরিহার করি নি। করব না। তার রস আস্বাদন করেই আমি ক্ষান্ত। নারীর মধ্যে চিরন্তন হচ্ছে তার রস। তার রসকলি।"

"তাই কি" অনুযোগ করল অমুত্তম। "চিরন্তন হচ্ছে তার শক্তি। তার সিঁথির সিঁদুর।"

"চিরন্তন তার অন্তর্দীপ্তি। তার তুলসী তলার প্রদীপ।" নিবেদন করল সুজন"—এই হলো নারীর পরিচয়। এই তার প্রেমের দীপ্তি। আর আরতি—রতির স্বর্তৃপ্তি।—পরবর্তী পর্য্যায়ে রূপদক্ষ অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রেমাদর্শ আরো গভীরে অভিনিবেশ সহকারে বোধিলোকের শান্তশ্রীতে, রসনির্ঝরে সুরকল্লোলিত কোরেছেন "সুখ" উপন্যাসের মুঠো মুঠো মায়া সিঞ্চনে। এ এক নতুন রূপকথা। স্থান, আধুনিক পরিবেশ। অবলম্বন, আধুনিক যুবকের ধ্যানাশ্রিত বরবর্ণিনী প্রিয়ার জন্য করা অন্বেষণ। উদ্দীপন ভাব, দম্পতি রূপেতে অবগাহন কোরে স্বামী দেবপ্রিয়র জন্য প্রিয়া মালার সিঁথিতে রেঙে ওঠা লাল রেখার আঁক। জীবনে মিলন, আর মিলনে সুখ—জগতের তরুণ তরুণীর প্রতি এই নিবেদন যুগল জীবনের সুখকে না রাঙিয়ে থাকতে পারবে না! সত্যি খুশী বিভোরতার জগতে "সুখ" উপন্যাসে চিরকালীন একটা ভাববিভোর অভিধা তুলে ধরেছে। আরেকবার মনে পড়বে,—অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রেমচিন্তা কত বলিষ্ঠ। কত গরিমা সঞ্জাত। অশেষ রূপানুরক্ত আদর্শে ভরানো তাঁর প্রতি সাহিত্যিক পরিক্রমাটি।—সেই "সত্যাসত্য" থেকে "রত্ন ও শ্রীমতী" ও আরো অনেক জায়গায় দেখেছি অন্নদাশঙ্করের—বৈষ্ণবরস-সাহিত্যের প্রতি অশেষ প্রীতি। বিশেষভাবে শ্রীরাধার নির্ভীক জীবনাদর্শের ওপরে তাঁর অনুরাগ তাঁর নিজেরই প্রেমচিন্তাকে আপন স্বকীয়তায় অনুরঞ্জিত করাতে পেরেছে। আর সেখানেই নিহিত আছে তাঁর রূপদক্ষ শিল্পমানসের আড়ালে আড়ালে হঠাৎ প্রেমরূপ দীপ বর্তিকার ঝলকে ঝলকে ঝলসানো স্বর্ণালী আভায় রাঙানো ভালোবাসার হাজার এক ভাললাগার কথা। অন্নদাশঙ্করের অনিন্দ্য সাহিত্যালোকে রূপ—অরূপের মায়ারাগ প্রেমচিন্তার ধ্যানে ভগিনী নিবেদিতার কথাকেই যেন ভালোবেসে জানাতে পেরেছে—

"Love all transcendent,
Tenderness unspeakable,
Purity most awful,
Freedom absolute,
Light that lightest every man,
Sweetest of the sweet······"

(A Litany of Love)

ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও তাঁর মানবিকতা

লীলা বিশ্বাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"অচলায়তন" বইতে কবি লিখেছেন, অচলায়তনের আচার্য্য বল্ছেন পঞ্চককে "তোমাকে যখন দেখি, আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখ্তে পাই। এত চাপেও যখন দেখ্লাম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতে মর্তে চায় না, তখনই আমি প্রথম বুঝ্তে পার্লাম, মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র না।"

প্রচলিত ধর্মের ধারণার মধ্যে যেন মানুষের আত্মকর্তৃত্বের চেয়ে তার আত্মবিলোপের কথাটাকেই বড় ক'রে দেখানো হ'য়েছে। মানুষ যা কর্ছে তার দায়িত্ব যেন তার নিজের নয়, যেন দেবতা তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের পুরাণে, আমাদের পাঁচালি ও ব্রত-কথায়, মংগলকাব্যে, মানুষকে যেন দেবতার হাতে খেলার পুতুলের মত ক'রেই দেখানো হ'য়েছে। মানুষের যেন আত্মশক্তিতে কোন প্রতিষ্ঠা নেই, এমনি সব কাহিনী আমাদের ধর্মশাস্ত্রে, আমাদের কাব্য-ইতিহাসে রয়েছে।

গীতাতে বলা হ'য়েছে—

"যৎ করোষি যদশ্নোষি
সর্বং কুরু মদর্পণম্॥

ভগবানের পায়ে এইরকম আত্মসমর্পণের কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পাই। গীতাঞ্জলিতে কবি গেয়েছেন—

"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

কিন্তু কবির এই আত্মসমর্পণের অর্থ আপন শক্তিতে অবিশ্বাস নয়। ভগবানের প্রতি এই বিশ্বাসই মানুষকে তার আত্মকর্তৃত্বে অচল, অটল করে রাখে কবির এই মত। এই বিশ্বাসের বলেই মানুষ ভয়কে, লোভকে অতিক্রম ক'রে আত্মপ্রকাশ কর্তে পারে। কবি বিশ্বাস ক'রেছেন—ভগবানই মানুষকে সত্য এবং অসত্য, ন্যায় এবং অন্যায় নির্ণয় কর্বার ভার দিয়েছেন। ভগবানের যে বিচার দণ্ড, সে তিনি প্রত্যেক মানুষের হাতে দান ক'রেছেন। তাই তো প্রত্যেক মানুষ সত্য এবং অসত্য, ন্যায় এবং অন্যায় বুঝতে পারে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় বুঝেও কথায় বা কাজে তা প্রকাশ করে না। ভয় তাকে নিরস্ত করে, লোভ তাকে চুপ করিয়ে দেয়। কবি লিখেছেন—

"তোমার ন্যায়ের দণ্ড
প্রত্যেকের করে
অর্পণ ক'রেছ নিজে।"

যে মানুষ ভয়ে বা লোভে অন্যায়কে অন্যায় ব'লতে পারে না, তার প্রতি কবির নিবিড় ঘৃণা—। কবি লিখেছেন—

"যে নপুংস কোন দিন
চাহিয়া ধর্মের পানে
নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়—"

কবি লিখেছেন—

"অন্যায় যে করে আর
অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন
তৃণ সম দহে।"

ভগবানের চরণে মাথা নত করার অর্থই এই যে প্রবলের পায়ে, ক্ষতির ভয়ে বা লাভের লোভে যেন মাথা কখনো নত না হয়। যে মানুষ অন্তরে ভগবানকে উপলব্ধি ক'রেছে, তার লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় সমস্ত লুপ্ত হ'য়ে, যায়। মানুষের মনুষ্যত্ব ভগবানেরই দান। এই মহৎ দানের গৌরব কবি সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন এই তাঁর পণ। যদি কোন উদ্ধত মানুষ এই মনুষ্যত্বের অপমান ঘটাতে আসে তা হ'লে সে দেশদ্রোহী ব'লে কবি তাকে দণ্ড দেবেন। মানুষের নিজের গৌরব রক্ষা ক'রে, সে ভগবানেরই গৌরব রক্ষা করে।

কবি ব'লেছেন ধর্ম মানুষকে অভয় দান করে। কিন্তু লোকপ্রচলিত ধর্ম ধর্ম নয়, তা ধর্মের বিভীষিকা। এ রকম মিথ্যা ধর্ম মানুষকে কেবলি ভয় দেখায়। আচারের সামান্য ত্রুটিতে দেবতা ক্রুদ্ধ হবেন, মানুষকে শাস্তি দেবেন, এই ভাবটাই সমাজপ্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রবল। আমাদের দেশের পাঁচালি, মংগলকাব্য ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মগ্রন্থে আমরা দেখি কী রকম কথায় কথায় দেবতারা রেগে গিয়ে মানুষের সর্বনাশ করেন। প্রসাদ যদি মাটিতে পড়ে, পূজা দিতে যদি ভুল হয়, তা হ'লে আর রক্ষা নেই। কবির মতে এমনি ক'রে ধর্মের মধ্যে যারা বিভীষিকা দেখে, তারা ভগবানকেই অস্বীকার করে। এমনি ক'রে যারা ভয়ের বশে ধর্মকে মানে, তারাই ভয়ের বশে অধর্মকেও মানে। সেই সব সদাভীত, সংকুচিত মানুষ সর্বদাই প্রবলের পায়ে আপনার ন্যায্য অধিকার বিসর্জন দিয়ে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে আপনাকে ভ্রষ্ট করতে থাকে। এই রকম ধর্মভীরুতাকে নিন্দা ক'রে কবি লিখেছেন—

> "কুব্জ পৃষ্ঠে নতশিরে সহস্রের পিছে
> চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী সংকেতে।
> লইয়াছি শির পেতে,
> সহস্র শাসন শাস্ত্র। সংকুচিত কায়া—
> কাঁপিতেছি রচি নিজ কল্পনার ছায়া—
> সন্ধ্যার আঁধারে বসি নিরানন্দ ঘরে
> দীন আত্মা মরিতেছি শত লক্ষ ডরে।
> পদেপদে ত্রস্ত চিত্তে হ'য়ে লুণ্ঠ্যমান
> ধূলিতলে, তোমারে যে করি অপ্রমাণ।
> যেন মোরা পিতৃহারা ধাই পথে পথে—
> অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত জগতে।"

"অচলায়তন" বইতে কবি লিখেছেন—আপনাকে ছোট করতে গিয়ে আমরা দেবতাকেও বড়ো ক'রে পাইনি। আমাদের ভীরু মনের কাছে আমাদের দেবতা প্রতিহিংসা-পরায়ণ, খোসামোদ প্রিয় হ'য়ে ছোট হ'য়ে দেখা দেয়।

কবি বলেন, শাস্তির ভয়ে মানুষ ভগবানকে পূজো করবে, পূজা না করলে তাকে কষ্ট পেতে হবে, নরক-ভোগ করতে হবে—এমনি ক'রে যারা ভয়ের দোহাই দিয়ে ভক্তি করতে বলে, তারা ভগবানের অপমান করে। মানুষ আপনার প্রাণের আকাংখার জন্যই ভগবানকে খোঁজে—শাস্তির ভয়ে নয়। কবি লিখেছেন—

> "তব পূজা না আনিলে দন্দ দিবে তারে
> যমদূত নিয়ে যাবে নরকের দ্বারে
> ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
> তোমার নিন্দুক সে যে ভক্ত কভু নয়।"

ভগবান দণ্ডের ভয় দেখিয়ে বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে মানুষের কাছে পূজা চান না। ভগবানের পূজা মানুষ করে তার আপন আত্মার চরিতার্থতার জন্যে। এই পূজার ব্যাকুলতা তার আপন মনের জিনিষ। কবি লিখেছেন—

> "তুমি চাও নাই পূজা, সে চাহে পূজিতে—
> * * *
> বিনা আদেশের পূজা, হে গোপনচারী—
> বিনা আহ্বানের খোঁজ সেই গর্ব তারি।"

কিন্তু আমাদের প্রচলিত ধর্মমত, যে ধর্ম আমাদের দেশে মংগলকাব্য এবং পাঁচালি পুঁথিতে প্রচলিত হ'য়েছে, তাতে দেবতার যে রূপ আমরা দেখি তা তখনকার দিনের প্রবল প্রতাপান্বিত গ্রাম্য রাজা বা জমিদারদেরই প্রতিরূপ। গ্রাম্য জমিদার যেমন খামখেয়ালী, খোসামোদপ্রিয়, আমাদের মংগল কাব্যের দেবতাও তাই। সে খেয়ালের বশে যার প্রতি তুষ্ট হয় তাকে ধনেপুত্রে ধন্য করে—আর যে তার পূজা দিতে ভোলে তার সেই অপরাধেই সে সর্বনাশ করে। মানুষের যেমন সমাজব্যবস্থা তার দেবতার রূপও তেমনি হয়। সেদিনের রাজা জমিদারদের শাসনে উৎ-পীড়িত অসহায় মানুষ দেবতাকেও উৎপীড়নকারী খাম-

খেয়ালী ক্ষুদ্র রাজা ব'লেই কল্পনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের এই বিভীষিকা থেকে আমাদের মনকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—ধর্ম মনের জিনিষ, ভয়ের জিনিষ নয়।

পুরস্কার লাভের আশায় যে ধর্মাচরণ, ধর্মের সেই ধারণাকে কবি ধিক্কার দিয়েছেন। অনেক লোভী মানুষ ইহজীবনে, অন্ততঃ তা না হ'লে পরজীবনে বা পরলোকে পুরস্কার লাভের আশায় ধর্মাচরণ ক'রে থাকে। অবশ্য এ জাতের ধর্মাচরণ কতকগুলো আচার অনুষ্ঠানের পালন ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধর্মাচরণের কবি নাম দিয়েছেন—"পারলৌকিক বৈষয়িকতা"। কবি বলেছেন এই পারলৌকিক বৈষয়িকতা লৌকিক বৈষয়িকতারই তুল্য, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম ব'লে, এর বন্ধন আরও বেশি জটিল। এই জন্যেই এর থেকে মুক্তি পাওয়াও বেশি কঠিন। এমনি ক'রে যে ধর্ম মানবাত্মার মুক্তির জন্যে ছিল, তাই তার সব চেয়ে বড় বন্ধন হ'য়ে ওঠে। কবির মতে সত্যিকারের ধর্ম দণ্ড, পুরস্কারের অতীত।

"গান্ধারীর আবেদন" কবিতায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানালেন, ন্যায়ধর্মের অনুরোধে দুর্বৃত্ত দুর্যোধনকে নির্বাসন দণ্ড দেবার জন্যে। ধৃতরাষ্ট্র বল্‌লেন, পুত্রকে নির্বাসন দিলে ধর্মের হাতে আমরা তার চেয়ে প্রিয়তর আর-কী পাব ? গান্ধারী বল্‌লেন—

"মহারাজ, ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্মই ধর্মের শেষ।"

তিনি বল্‌লেন—ধর্ম প্রতিদিন নূতন নূতন দুঃখই এনে দেবে।

ধর্মের পথ আরামের পথ নয়। সে পথে পুরস্কারের প্রত্যাশা নেই। সে পথ দুঃখ দিয়ে দুর্গম, কঠিন। বীর্য্য দিয়ে সেই দুঃখকে জয় ক'রে—তবেই ধর্মকে লাভ করা যায়। তাই তো উপনিষদ বলেছেন—

"যে পথ ক্ষুরধারার ন্যায় নিশ্বিত,
সে পথ দুরত্যয়, দুর্গম।"

যে মানুষ আপনার অন্তরে ধর্মকে উপলব্ধি ক'রেছে, সেই পারে কঠিন দুঃখকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে যেতে। সংসারের পাঁচজন যাকে ধর্ম বলে, ধর্মের সেই বাঁধা পথে চল্‌তে আরাম আছে তাতে লোকের কাছে প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু যার অন্তরে ধর্মের উপলব্ধি সত্য, সে বাঁধা পথে চ'লে খুসি থাকতে পারে না। তার ধর্ম তার নিজের উপলব্ধি। পিতা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে 'চরিত্র পূজা' বইতে কবি এই কথাই বলেছেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন ঋণ-গ্রস্ত, বিপন্ন—তখন তিনি প্রচলিত ধর্ম ত্যাগ ক'রে আপন অন্তরের উপলব্ধি নিয়ে নূতন ধর্ম গ্রহণ করলেন। এমনি ক'রে তিনি নিজেকে সমাজের সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করলেন। যে দুর্দিনে তার কাছে বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য সহানুভূতি সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল, সেই দুর্দিনেই তিনি সব ছেড়ে একা পথে এসে দাঁড়ালেন। ধর্মের আন্তরিক উপলব্ধি মানুষকে এমনি বল দান করে। তখন সে ধর্মের জন্যে সমস্ত ক্ষতিকে স্বীকার করতে পারে।

কবির ধারণায় ধর্ম মানুষের চরিত্রকে বলদান করে। বিপদ, ক্ষতি, অপমান সব কিছুর মুখে আত্মত্যাগ ক'রে একমাত্র ধর্মকেই অবলম্বন ক'রে থাক্‌বার শক্তি দান করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবাল-সত্যকামের কাহিনী আছে। এই কাহিনী কবির মনে গভীর আবেদন জাগিয়েছে। তাই এই কাহিনী নিয়ে কবি "ব্রাহ্মণ" কবিতা লিখেছেন।

সত্যকাম গিয়েছে গুরু গৌতমের কাছে—ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আশায়। গুরু তাকে গোত্র, বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ শুধু ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মবিদ্যালাভে অধিকার আছে। সে বলল—মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কাল এসে বলব। ঘরে ফিরে গিয়ে যখন সে মাকে প্রশ্ন করল, মা যদিও সংকোচে ভরে গেলেন তবু সত্যের অপলাপ করতে পারলেন না। আপনার জীবনের কলংক তিনি ম্লানমুখে সসংকোচে আপনার সন্তানের কাছেও স্বীকার করলেন—

"শুনি কথা মৃদু কণ্ঠে, অবনত মুখে
কহিলা জননী—যৌবনে দারিদ্র্যদুঃখে
বহু পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে।
জন্মেছিস্ ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে
গোত্র তব নাহি জানি তাত।"

পরদিন সত্যকামের এই জন্মবৃত্তান্ত শুনে অন্যসব শিষ্যদের ধিক্কারের মৃদু গুঞ্জন যখন [illegible]তর হ'য়ে উঠল তখন—

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহুমেলি বালকেরে দিলা আলিংগন
কহিলেন,—অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুল জাত।"

ঋষির মতে ক্ষতির মুখে, অসম্মানের মুখে এই যে সত্য-পরতা, সত্যের খাতিরে এই যে কলংকের ডালি মাথায় তুলে নেওয়া, এই হ'ল সত্যিকারের ধর্ম। সত্যকে যে জীবনে আশ্রয় করেছে সে কোন ভয়ে কোন প্রলোভনেই অসত্যকে আশ্রয় করতে পারে না। সংকীর্ণ নৈতিকতার নিরাপদ বাঁধা-পথে চলা তো ঢের বেশি সহজ। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এমন দুঃসাহসী আত্মত্যাগ যে ঢের বেশি কঠিন। প্রাণবান মানুষ সব সময় নৈতিকতার বাঁধা পথে চলতে পারে না। কোন ভুল, নীতি-পথ থেকে বিচ্যুতি, যে কোন সময়ে তার জীবনে ঘট্‌তে পারে, এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় এই রকম ভুল, এই রকম বিচ্যুতির মধ্য থেকেই মানুষের সত্য মূল্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষের মহত্ব তার বিচ্যুতির মধ্য দিয়েই উজ্জলতর হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। হয়ত' তার সুনিয়ন্ত্রিত জীবনে তা এত উজ্জল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ত না।

"গল্পগুচ্ছে" কবির লেখা একটি গল্প এই রকম।—

এক জমিদার তাঁর প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার কর্‌তেন। তাঁর হাতে অনেক প্রজাই নিষ্কর সম্পত্তি ভোগ করত। এক মুসলমান রমণী ও তার ছেলেও অনেকটা সম্পত্তি নিষ্কর ভোগ কর্‌ছিল। বুড়ো বয়সে জমিদার সংসার ত্যাগ ক'রে কাশী বাস কর্‌তে গেলেন। তাঁর উচ্চশিক্ষিত যুবকপুত্র জমিদারির ভার নিলেন। তিনি জমিদারী হাতে নিয়েই সমস্ত সুশৃংখলভাবে গুছিয়ে নিতে তৎপর হ'য়ে উঠ্‌লেন। সমস্ত নিষ্কর সম্পত্তির ওপরে তিনি কর বসালেন। সেই মুসলমান রমণীর কাছেও কর চাইলেন, যখন সে দিলনা তখন তার নামে মামলা শুরু কর্‌লেন। তখন একদিন সেই বৃদ্ধা জমীদারের কাছারীতে এল। সে যেন তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে জমিদারের সর্বাংগে মাতৃস্নেহ বর্ষণ ক'রে বল্‌ল,—বাবা তোমার এত আছে যে অছিম তার যেটুকু ভোগ করছে সে তুমি জান্‌তেও পাবে না। তুমি মনে কর না কেন যে অছিম তোমার ভাই হয়।

কিন্তু জমিদার বৃদ্ধার [illegible] থেকে যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাকে বিদায় ক'রে দিল। একদিন অছিম বাজারে এসেছে তার শেষ সম্বল তাত খাবার থালাখানা বেচে কিছু চাল কিন্‌বে ব'লে। মামলার ফলে তার অবস্থা আজ এমনি হ'য়ে পড়েছে। সেদিন জমিদারও এসেছে তার বাজার দেখ্‌তে। অছিম যেই জমিদারকে দেখ্‌তে পেল, অমনি বাঘের মত তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। তার এত দুঃখের কারণ তো সেই। বাজারের লোকজনেরা চারিদিক থেকে ছুটে এসে তাকে ধ'রে ফেল্‌ল এবং তাকে পুলিশের হাতে দিয়ে দিল। এই অপরাধে তার নামে আবার নূতন ক'রে মামলা শুরু হ'ল। যেদিন মামলার শুনানী সেদিন জমিদার-কাছারীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশেই ব'সেছিল। তখন কে যেন এসে জমিদারের কানে কানে কী বল্‌ল। জমিদার ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বাইরে এসে দেখে তার কাশী-বাসী বৃদ্ধ পিতা কাছারীর প্রাংগণে একটা গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছেন। জমিদার তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তে চাইল কিন্তু তিনি বল্‌লেন—আমার যা বল্‌বার আমি এখানেই বল্‌ব। যে ঘর আমি ছেড়ে এসেছি, সে ঘরে আর যাব না। তিনি বল্‌লেন, আমার অনুরোধ অছিমের বিরুদ্ধে এই মামলা তুমি তুলে নাও। জমিদার বিস্মিত ও বিরক্ত হ'য়ে কারণ জান্‌তে চাইল। তখন বাপ বল্‌লেন, তা হ'লে কারণ না জান্‌লে তুমি মামলা তুলে নেবে না। তখন তিনি কম্পিত আংগুলে জপমালা নিয়ে তাকে বল্‌লেন, অছিম তোমার ভাই হয়। ছেলে বল্‌ল—জবনীর গর্ভে? বাপ বল্‌লেন, হাঁ, বাপু। মামলা তুলে নেওয়া হ'ল। লোকে ঠিক কারণটাই অনুমান কর্‌তে পারল। বৃদ্ধ জমিদার যে কাশী থেকে ছুটে এসেছিলেন, সে খবরও চাপা রইল না। একটি ছেলে ছিল, যাকে বৃদ্ধ জমিদার খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিলেন। সে এখন শহরে ওকালতি করে। সব চেয়ে বেশি ক'রে সেই সবাইকে ব'লে বেড়াতে লাগ্‌ল যে মানুষের আসল স্বরূপ কিছুতেই বোঝবার জো নেই। এই উপলক্ষে যেন সে নিজের কৃতজ্ঞতার দায় গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বাঁচল। উচ্চশিক্ষিত পুত্র ও নিজের উচ্চতর নীতিবোধের অহংকারে মনে মনে হেসে বল্‌ল—প্রাচীনদের ধার্মিকতা এই রকমই বটে।

এই গল্পে কবি দেখিয়েছেন, যে মানুষ চিরদিন সমাজে

শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। সংসার ত্যাগ করবার পরে বৃদ্ধ বয়সে তার পক্ষে এই সর্বস্ব ক্ষতি। এই অপমান স্বীকার যে কত কঠিন, পিতা হ'য়ে পুত্রের কাছে এই স্বীকৃতি যে কী নিদারুণ! কিন্তু এই মানুষ অন্য কোন পথ খুঁজে না পেয়ে এই নিদারুণ স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হ'য়েছে। এ স্বীকারোক্তি সহজ নয়। এতে মনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হ'য়েছে। কম্পিত আংগুলের মধ্যে কবি বৃদ্ধের হৃৎস্পন্দনের কথাই ব'লেছেন। তার জপমালা হাতে নেবার অর্থ, নিদারুণ পরীক্ষার মুখে আর সমস্ত ত্যাগ ক'রে, একমাত্র ধর্মকে—ঐ জপমালাকেই আশ্রয় করা। কবির মতে এমনি ক'রেই বৃদ্ধের কাশীবাস, তার সংসার-ত্যাগ সার্থক হ'ল। সমাজের কাছে, নিজের পুত্রের কাছে যেটুকু সম্মান, যেটুকু শ্রদ্ধা তার ছিল, আজ তাও তাকে ত্যাগ ক'রে যেতে হ'ল। অবিচারের পথ রোধ করবার জন্যে বৃদ্ধের এই আত্মবলিদান। কবির মতে এই তো হ'ল ধর্মের আদর্শ।

ধর্মকে যে মনে প্রাণে আশ্রয় করেছে একমাত্র সেই পারে এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে। সেই পারে সমাজ ও স্বজন সকলের ধিক্কার স্বীকার করবার পরম ক্ষতিকে স্বীকার করতে। ধর্ম একটা নেতি বাচক জিনিষ নয়। সে শুধু মানুষের কী করা উচিত নয়, এমনি কত-গুলো নিষেধ নিয়মের সমষ্টি নয়। ধর্ম একটা পজিটিভ জিনিষ যার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মহত্ব প্রকাশ পায়।

ধর্ম বলতে কবি লোকাচারকে বোঝেন নি। 'চরিত্র পূজা' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন যে আজকাল আমাদের সমাজে ধর্মের আদর্শ কৃত্রিম হ'য়ে গেছে। আমরা ধর্মের সত্য দিক—আর তার কৃত্রিম দিক—দুটোকেই সমান মূল্য দিয়ে থাকি। বরং অনেক সময়ে সত্যের চেয়ে কৃত্রিমকেই বেশি সম্মান করি। কবি উদাহরণ দিয়েছেন, আমরা নিত্য গংগা স্নান করাকে অচৌর্য্য এবং সত্যবাদিতার সমানই ধর্ম মনে করি। আবার পাপের বেলাতেও যবনের অন্ন খাওয়াকেও যত পাপ বলি—জাল মোকদ্দমা ক'রে কোন যবনের অন্নের উপায় কেড়ে নেওয়াকেও ততটাই পাপ বলি। বরং আমরা গংগা স্নানের পুণ্যটাকেই বেশি পুণ্য, আর যবনের অন্ন খাওয়াটাকেই বেশি পাপ বলে থাকি। আর অন্য রকম পুণ্য এবং অন্য রকম পাপটাকে তত প্রাধান্য দিই না।

কবি লিখেছেন যে যখন মানুষ এই অন্ধ বিশ্বাসের জংগলে পথ হারিয়েছিল যে কোন তীর্থবিশেষে গিয়ে, কোন মন্ত্রবিশেষ আবৃত্তি করে এবং বিশেষ কোন অনুষ্ঠান আচরণ করে, মুক্তি লাভ করা যেতে পারে, সেই সময়ে বুদ্ধ এসেছিলেন এই সহজ সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করতে যে আসক্তির বিনাশ করে আত্মত্যাগের দ্বারা এবং সর্ব-ব্যাপী প্রেমের দ্বারাই মুক্তি পাওয়া যায়। বুদ্ধ ব'লেছেন কোন স্থান বিশেষে গিয়ে, জলে স্নান করে বা আগুনে আহুতি দিয়ে বা মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে মুক্তি পাওয়া যায় না। কবি লিখেছেন—

এই সত্যটি শুনতে অত্যন্ত সহজ ব'লে মনে হয়, কিন্তু এরই জন্যে একজন রাজপুত্রকে তার রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনে বনে এবং পথে পথে বেড়াতে হয়েছিল।

"চরিত্র-পূজা" বইতে বিদ্যাসাগরের চরিত্র বর্ণনা এবং বিধবা বিবাহের প্রসংগে কবি লিখেছেন যে মানুষের এমন দুর্ভাগ্য যে—যা একান্ত সহজ এবং সরল, আমরা তাকেও এমন বিকৃত এমন জটিল ক'রে তুলি যে, সহজ সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্য, মানুষকে বোঝাবার জন্য, লোকোত্তর মহত্বের জন্যে আমাদের প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়। যার দেহ এবং মন দুইই অপরিণত—সেই শিশু মেয়ের বৈধব্যের বিধান, এমনি একটা সহজ সত্যের জটিল বিকৃতি। এ বিধান যে কতখানি অসংগত তা সহজবুদ্ধি দিয়েই যে কেউ বুঝতে পারে, কিন্তু এই কথাটা আমাদের বোঝাবার জন্যে বিদ্যাসাগরকে কী না করতে হয়েছিল।

আমাদের ধর্মে এবং বোধহয় অন্যান্য ধর্মেও একটা স্বর্গের কল্পনা আছে। আমাদের ধর্মে পুণ্যাত্মাদের স্বর্গ-ভোগের অনেক বর্ণনা আছে। এই স্বর্গের বর্ণনায় বলা হ'য়েছে যে স্বর্গে দুঃখের কোন অস্তিত্ব নেই, সেখানে সমস্তই সুখ। মানুষ পৃথিবীর জীবন যাপনের পরে আপনার পুণ্য বলে এই স্বর্গবাসের অধিকার পায়। কিন্তু মর্ত্যের প্রতি এই যে অবজ্ঞা, স্বর্গের সুখের জন্যে মানুষের যে লোভ কবি তার প্রতিবাদ করেছেন তাঁর—"স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতায়। কবি বলেছেন যদি স্বর্গ ব'লে এমন কোন জায়গা থাকে যেখানে দুঃখের অস্তিত্ব নেই, তবে কবির

দলে টান্‌তে পেলে ছাড়েন না। 'চতুরংগ' বইতে কবি দেখিয়েছেন—দামিনী কোনদিনই লীলানন্দ স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে নি। শচীশ, শ্রীবিলাস এবং দামিনী লীলানন্দ স্বামীর দলছেড়ে চ'লে আসার পরে যখন আবার দামিনী ও শ্রীবিলাস শচীশকে তার নির্জন সাধনার জায়গায় ছেড়ে চ'লে আস্‌তে বাধ্য হ'ল, তখন দামিনী ও শ্রীবিলাসকে নিয়ে কল্‌কাতার সমাজে নিন্দার ঝড় উঠল। তখন কোন আত্মীয় দামিনীকে আশ্রয় দিল না। তখন দামিনী নিরুপায় হ'য়ে বল্‌ল যে সে আবার লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে ফিরে যাবে। শ্রীবিলাস সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বল্‌ল "স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন? দামিনী বল্‌ল "খুসী হইয়া লইবেন।" এখানে কবি লিখেছেন—"দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত, মানুষকে পাইলে তারা সত্যকে পাওয়ার চেয়ে বেশি খুসী হয়। লীলানন্দ স্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক।" অথচ লীলানন্দ স্বামী জান্‌তেন যে তাঁর ধর্মে দামিনীর কোন অবস্থাই নেই।

"প্রাচীন সাহিত্য" বইতে ধর্ম্মপদ গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে লেখা প্রবন্ধে কবি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে—লিখেছেন—যে ধর্ম কথার অর্থই হ'ল আত্ম-অনাত্মের সম্বন্ধ নির্ণয়। কবির মতে ধর্ম-নীতির অর্থই হ'ল এই যে মানুষ আপনার ও পরের মধ্যেকার আচরণে কোন কোন নিয়ম মেনে চল্‌বে তাই নির্দেশ করে দেওয়া। তাই কবির মতে 'অনাত্ম' অর্থাৎ আপনার বাইরে অন্য কেউ যদি না থাকে তা হ'লে ধর্মের কোন অর্থই হয় না। একলা, নির্জনবাসী মানুষের ধর্মও নেই অধর্মও নেই।

এই জন্যেই সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস জিনিষটাতে কবি খুব বেশি শ্রদ্ধা করেন নি। অনেক সময় যারা সংসার ত্যাগ করে, তারা এইজন্যেই তা করে যে তারা সংসারের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক এবং অক্ষম।

"চতুরংগ" বইতে কবি লিখেছেন—"একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন—সংসার মানুষকে পোদ্দারের মত বাজাইয়া লয়। শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া; যাদের সুর দুর্বল, পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়। এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে, সংসার হইতে তার কোনমতে ফস্‌কাইবার জো নাই। শুক্‌নো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই। সে যে আবর্জনা।"

কবির মতে সংসারের দুঃখ ও ক্ষতির আঘাত যারা সহ্য করতে পারে না, অনেক সময় তারাই সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়।

যাদের প্রকৃতি নীরস, যারা জীবন থেকে রস গ্রহণ করতে অক্ষম অনেক সময় তারাই সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়।

[ক্রমশঃ
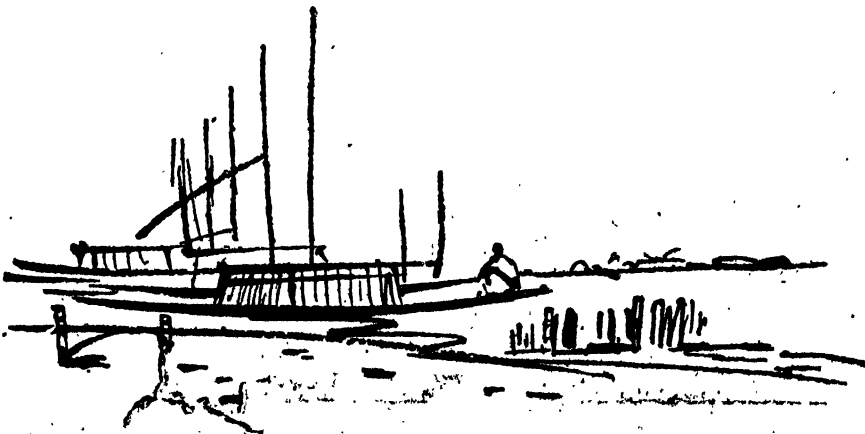
ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা চলছিল। অবশ্য শুরু হয়েছিল চীনাদের আক্রমণ দিয়ে, তারপর এলো নতুন ট্যাক্সের প্রসঙ্গ, তারপর কাশ্মীর সমস্যা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনিসের দর বৃদ্ধি। প্রসঙ্গগুলি সবই হৃদয়গ্রাহী।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভূতের প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। সামান্য একটি কথা থেকে এর সূত্রপাত। মানে, প্রকাশবাবু বলছিলেন, যা ট্যাক্সের বোঝা চাপল, তাতে তো দেখছি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মরে ভূত হয়ে যাব।

ধনঞ্জয়বাবু ব'লে উঠলেন—ভূত হওয়া কি সোজা? মশায়, বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিটা আমাদের এমনই সাংঘাতিক যে আমরা এতকাল যে-বঞ্চনা সহ্য ক'রে আসছি, তার চতুর্গুণ বঞ্চনাতেও বেঁচে থাকব, চট ক'রে ম'রে ভূত হব না। এতকাল ধ'রে তো দেখছি—যে সব মানুষ পথে ফেলে দেওয়া পাতা থেকে একটা একটা ক'রে ভাত খুঁটে খায়, তারাও বেঁচে থাকে। আমাদেরও যদি তেমন অবস্থা হয় তবু বেঁচে থাকব।

শুকলালবাবু বললেন, তা যা বলেছেন। মরণ হয় না সহজে। পথ থেকে ভাত খেতে দেখেছি গরিবদের। কিন্তু ধনঞ্জয়বাবু, এখন ভাতের কথা থাক, ভূতের কথাই বলুন। যাতে মন খারাপ হয় এমন কথা এখন আর তুলবেন না।

কিন্তু ধনঞ্জয়বাবু কিছু বলবার আগেই আড্ডার অন্যতম সভ্য সঞ্জয়বাবু এক অপরিচিত যুবককে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। প্রসঙ্গটা সাময়িকভাবে চাপা পড়ল। বললেন—এর নাম অমর, বাংলার বাইরে থাকে, হঠাৎ এসে পড়েছে। থাকবে দু এক দিন। নিতান্তই বন্ধুলোক, তাই বিনা নোটিসে নিয়ে এলাম এখানে।

তা বেশ করেছেন, এখানে আসতে আবার নোটিস কিসের? তা অমরবাবু, আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকলেও আপনি আমাদের বন্ধু, বিনা সঙ্কোচে ব'সে পড়ুন এখানে।—বললেন প্রকাশবাবু।

অমর বলল, আপনারা ভূতের বিষয় আলাপ করছিলেন, আমি বাধা দিলাম।

প্রকাশবাবু বললেন, কিছুমাত্র না। যদি ভূতের বিষয়ে কৌতূহল থাকে তবে আপনিও কিছু বলুন না?

অমর বলল, কৌতূহল কার না আছে?

ধনঞ্জয়বাবু বললেন, কৌতূহলের চেয়েও অভিজ্ঞতা থাকলে আরও ভাল হয়। থাকে তো দু চারটে জমাটি গল্প ছাড়ুন, সন্ধ্যাটা আরামে কাটবে।

সঞ্জয়বাবু বললেন, বেশ তো, ভাল গল্প থাকে তো এ আসরে তোমার মর্যাদা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ সুযোগ ছেড়ো না।

অমর বলল, অভিজ্ঞতাও কিছু আছে। কিন্তু যদি শুনে ভয় পান?

প্রকাশবাবু বললেন, ভূতের সঙ্গে বহুদিন কারবার করছি অমরবাবু, আমরা ছেলেমানুষও নই, স্ত্রীলোকও নই, যে মূর্ছা যাব একটা গল্প শুনে।

অমর বলল, তা হ'লে কয়েক দিন আগের একটি গল্প বলি, শুনুন।

ধনঞ্জয়বাবু উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠলেন, এই তো পুরুষের মতন কথা। একটি ভাল ভূতের গল্পের অভাবে আমাদের আড্ডা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল, এখন আপনি যদি এতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন।

অমর বলল, তা হ'লে বলতেই হয়। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবু বলছি। ছোট গল্পের মতো মনে হবে শুনলে। শুধু একটি অনুরোধ, গল্প শেষ হওয়ার আগে মাঝখানে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন না। বলার মাঝখানে ভেঙে দিলে খেই হারিয়ে ফেলি, ঐ আমার এক দোষ।

কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন না প্রতিশ্রুতি পেয়ে অমর বলতে আরম্ভ করল—কিন্তু তার আগে আরও একবার ব'লে নিল, কাহিনীটা ঠিক একটি ছোট গল্পের মতো মনে হবে—আগেই বলেছি। শুনুন তবে—

ভোর ৪টে। মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড। এক যুবক এক তরুণীকে অজ্ঞান অবস্থায় এনে ফেলল। রোগিণীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে ডাক্তার যুবককে প্রশ্ন করলেন পেশেণ্টের নাম?

ডাক্তার যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন পেসেণ্টের নাম?

জানি না।

আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তা হ'লে?

না।

তবে একে কোথায় পেলেন?

যুবক একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, রোগিণীকে আগে বাঁচিয়ে তুলুন, এ সব প্রশ্ন অবান্তর।—ব'লে উঠে পড়ল।

ডাক্তার বললেন, না, অবান্তর নয়, আপনি এখন যেতে পাবেন না। এ সব কথার উত্তর দিতে হবে, নইলে পুলিসের হাতে যেতে হবে।

যুবক কিন্তু এ সব কথা কানে না তুলে চলতে আরম্ভ করল গেটের দিকে।

দরোয়ানরা পিছু ধাওয়া করেও ধরতে পারল না তাকে। কোথায় যে সে মিলিয়ে গেল কেউ তা বুঝতে পারল না।

এইবার আগের একটি ঘটনা বলি। আর একটি গল্প।

রাত তখন প্রায় দশটা। একটি তরুণী একা এসে নামল একটা ছোট্ট রেল স্টেশনে। মাঠের মধ্যে স্টেশন। গাড়িখানা তিন ঘণ্টা দেরিতে এসে পৌঁচেছে। সাতটার কিছু আগে আসবার কথা, স্টেশনে লোক থাকবার কথা। অথচ—

তরুণী, অর্থাৎ শুভ্রা, স্টেশনে নেমে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে লাগল। এত রাত্রি, অথচ স্টেশনে কেউ নেই। তবে কি যথাসময়ে লোক এসে ফিরে গেল? না, নিশ্চয় তার চিঠি ঠিক সময়ে পৌঁছয়নি। এই সব সে ভাবতে লাগল। কিন্তু যাই হোক এখন কর্তব্য কি? পল্লীবাসী আত্মীয়ার নিমন্ত্রণে গুড-ফ্রাইডের ছুটি কাটাতে আসা। কি কাজ ছিল এ রকম দুঃসাহসিক অভিযানে? কেন মরতে এলাম এই নির্জন ভুঁয়ে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। যতদূর দেখা যায় শুধু মাঠ। বহুদূর মাঠের পারে দিগন্ত রেখায় গ্রামের চিহ্ন। রাত্রে ঠিক বোঝা যায় না। এ পথে একটি মানুষের দেখা মিলবে না।

তরুণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারছেন, কি মুশকিলে সে পড়েছে। তারপর তার খেয়াল হ'ল—ওয়েটিং রুমে রাত কাটালেই হবে। কিংবা ফিরতি গাড়িতে উঠে বসলেই হবে।

কিন্তু জানা গেল ছোট স্টেশনে ওয়েটিং রুমই নেই। বাইরে বসেই রাত কাটাতে হবে। এর উপর দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মে যে দুচারটে আলো ছিল তাও নিবিয়ে দেওয়া

হচ্ছে। অতএব অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে সে একা। শুধু চাঁদের আলোর মায়া। কি বীভৎস!

স্টেশন-মাস্টারকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মেয়েটিকে নিজের বাসায় নিতে রাজি হলেন না। প্রথমত তাঁদের পরিবারের কজনেরই স্থান হয় না সেখানে, দ্বিতীয়ত অজ্ঞাতকুলশীল একটি আধুনিক মেয়েকে তিনি সন্দেহজনক মনে করলেন। স্থান দিলে যদি শেষকালে পুলিসের নজরে পড়তে হয়? নির্ঘাত চাকরি যাবে। এ সবই চাকরিজীবীর মনস্তত্ত্ব, সবারই জানা।

এদিকে শুভ্রা আপন ভাগ্য স্মরণ করে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে। ভয় তার ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আর ঠিক এমনি সময় এক যুবকের আবির্ভাব। সেই রাত্রির অন্ধকারে শুধু তারার আলোতেও বোঝা গেল যুবকটি ভদ্র। সে খুব পরিমার্জিত ভঙ্গিতে এবং মধুর কণ্ঠে মেয়েটির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এই স্টেশনের বাইরে কোথাও যাবেন? এ রকম দৈব যোগাযোগ শুধু উপন্যাসেই হয়, আপনারা জানেন এ কথা।

আপনি কি এই স্টেশনের বাইরে কোথাও যাবেন?

তাই শুভ্রা এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্যলাভে উল্লসিত হয়ে উঠল। সে বলল—আমি বিপন্ন আমি এখানে নতুন আসছি, আপনি যদি দয়া ক'রে আমার পথটা একটুখানি দেখিয়ে দেন—আমি মহেন্দ্রপুরে সোমনাথ মুখুজ্জেদের বাড়ি যাব। গাড়ি দেরিতে এসেছে, রাত বেশি হয়ে গেছে। তবু একাই যেতে পারব।

যুবক বললে, যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন তা হলে আমার সঙ্গে চলুন, আমি পৌঁছে দেব আপনাকে।

শুভ্রার তখন আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না, সে সহজেই রাজি হয়ে গেল। যুবককে সে কোনো মতেই অসৎ মনে করতে পারে নি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে তার ধারণার কিছু বদল হল। কি ক'রে হল বলছি।

দুজনে স্টেশন থেকে বেরিয়ে চলেছে পথে। আকাশ নির্মেঘ, দিন তিনেক আগে পূর্ণিমা গেছে, তৃতীয়ার রাত্রি এটি। আকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন। কিন্তু জমিতে সবুজে আর লালে চাঁদের আলো মিশে এক অপরূপ রহস্য। অথচ মানুষের জীবনে কত বড় ট্রাজেডি এমন রাত্রেও ঘটতে পারে।

যুবক কিন্তু বেশি কথা বলছে না। মাঝে মাঝে দু একটি কথা। গ্রামের কথা, পথের কথা, মেয়েদের একা চলায় বিপদের কথা—এই জাতীয় সব কথা।

তারপর পড়াশোনার কথা। আপনি কি ছাত্র?

হাঁ, এম-এ পড়ি।

কোন্ বিষয়ে?

দর্শন শাস্ত্রে।

মেয়েরা শুনেছি দর্শনের খুব ভক্ত। হয় বাংলা, না হয় দর্শন।

ইতিহাসও নেয় অনেকে।

এর পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। দুজন এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। মিনিট দুই পরে অমর বলল, আচ্ছা দর্শন তো পড়েন, সৃষ্টি রহস্য কিছু বোঝেন?

আমি কি ক'রে বুঝব? বিজ্ঞানের দিকটা ভাল বুঝি না, আমরা শুধু টেলিওলজিক্যাল একটা ছবি মনে মনে ছকে রেখেছি। তার বেশি কিছু না।

যুবক হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, ভূত মানেন? মানুষের আত্মা শূন্যে ঘুরে বেড়ায়—চোখে পড়েছে কখনও?

এ প্রশ্ন শুনে শুভ্রার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠল। প্রসঙ্গের এ কি এলোমেলো চেহারা? দর্শন থেকে ভূত? কিন্তু কেন? সহজে উত্তর দিতে পারল না সে। প্রশ্ন

কঠিন নয়, কিন্তু প্রশ্নের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কিছু আছে ব'লে তার মনে সন্দেহ জাগল। একটা অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু কিসের।

শুভ্রা যুবকের দিকে কি রকম একটা ভয়-মেশানো দৃষ্টিতে তাকাল, যদিও সে চাহনির প্রকৃত চেযারাটা যুবক দেখতে পেলনা। তবে কি এ তার একটি চাতুরি? যুবককে যতটা ভদ্র এবং মার্জিত মনে হয়েছিল, আসলে সে তা নয়? রাত্রির মেঠো পথে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। বুঝতেই পারছেন. এ সন্দেহ তার অন্যায় নয়।

শুভ্রার মনে ভীষণ একটা ভয় জেগে উঠল। ভূতের প্রসঙ্গ তুলে যুবক তাকে অসহায় বানাতে চায়। সে ভাবতে লাগল: আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরব, বলব আমাকে রক্ষা কর, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না—ইত্যাদি। এই হচ্ছে ওঁর আসল মতলব। কিন্তু উনি ভুল করেছেন। হার মানা হবে না কোনো মতেই।

শুভ্রা নিজের মনটাকে শক্ত করে বলল. না আমি ভূত মানি না।

যুবক জিজ্ঞাসা করল, কেন মানেন না? যুক্তি আছে কিছু?

কেন মানি না বলতে পারব না। ম'রে গেলে তো সবাই স্বর্গে যায় শুনেছি।

এ কথা তো যুক্তি নয়। আমি যুক্তি চাইছিলাম। আচ্ছা এমনও তো হ'তে পারে ভূত মানুষের প্রেতাত্মা নয়, আলাদা এক জাতীয় প্রাণী?

শুভ্রা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। সে মনের কথা জোর ক'রে মনে চেপে রেখে চলতে লাগল।

যুবক জিজ্ঞাসা করল, বললেন না কিছু?

শুভ্রা সংক্ষেপে বলল, ও সব জানিনা আমি।

যুবকের যেন জেদ বেড়ে গেল। এই রাত্রেই শুভ্রাকে দিয়ে ভূত আছে মানাতেই হবে—এমন ভাবে সে কথা বলতে লাগল। তার অভিমান আহত হয়েছে কি না? এ রকম হ'লে জেদ বাড়া স্বাভাবিক।

কিন্তু শুভ্রা দমল না। কারণ তার মনে হ'ল, ভূত যদি থাকে থাক, আজ তাকে কিছুতেই আমল দেওয়া হবে না। ভদ্রলোক বার বার ভূতের কথা ব'লে আমাকে যতই ভয় দেখাবার চেষ্টা করুন, তিনি হার মানতে বাধ্য হবেন। ভূতের ভয়ে ওঁকে কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে ধরার মেয়ে আমি নই। পথ আর বেশি নেই। ভদ্রলোকের হাত থেকে এখন মুক্তি পেলে বাঁচি। সাধারণ আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা হয়, বন্ধুত্ব হয় সে আলাদা কথা। ওঁর বন্ধু হবার গুণ ছিল—কিন্তু—

শুভ্রা হঠাৎ চমকে উঠল এ কথা মনে হতেই। লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠল।—সে এসব কি ভাবছে? তার বিয়ের কথা চলছে একজনের সঙ্গে, এর মধ্যেই আর একজনকে বন্ধু কল্পনা করাও পাপ। শুভ্রা অন্ধকারেও লজ্জায় মুখ ঢাকল।

তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে যুবক জিজ্ঞাসা করল—ভয় পেলেন?

শুভ্রা হঠাৎ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, ভয় আমি পাই না। আজ আমাকে কোনো কথাতেই ভয় দেখাতে পারবেন না।

যুবক অবাক হয়ে বলল, আমি তো ভয় দেখানোর জন্য বলছি না। আপনাকে আমার জানা বিষয়ে কৌতূহল জাগাবার চেষ্টা করছি।

যুবকের কথার মধ্যে একটি বেদনার স্বর ছিল, এবং তা এমন জোরের সঙ্গে উচ্চারিত যে তা শুনে আর তাকে মতলববাজ ব'লে মনে হয় না। কিন্তু শুভ্রার মনে বহু আগেই ভূত ঢুকে মনটাকে এমন ওলটপালট ক'রে দিয়েছে যে, কথা যত ভদ্রই হোক, কি করা উচিত তা সে বুঝতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা প্রায় ঝগড়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌছাল।

যুবক বলল, এটা সাধারণ জ্ঞানের কথায় এমন চটে যাওয়া উচিত নয়।

শুভ্রা এ কথায় আরও একটুখানি উত্তেজনার সঙ্গে বলল, যার কোনো প্রমাণ নেই তার কথা তুলে আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেন? আপনি আমাকে বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার বিপন্ন অবস্থায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, এর উদ্দেশ্য কি তা আমি বুঝতে পারছি না।

যুবক খুবই আহত হ'ল একথায়। অপমানও বোধ করল কম না। বলল, আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আমার

হ'তে পারত। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। আর এসব কথা আমার বলবার ইচ্ছাও ছিল না। আপনাকে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। এর মধ্যে আর কোনো কথা নেই।

শুভ্রা এ কথার হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। ভাবতে চেষ্টা করল যুবক সম্পর্কের কথা তুললেন কেন। এ কথার অর্থ কি? সে তো জানে একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা মাত্র হয়েছে, অর্থাৎ প্রস্তাব মাত্র। সে বম্বেতে থাকে, আর কারো সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা তা তার জানা নেই।

শুভ্রাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে যুবক বলতে লাগল, আমি সত্যিই ভয় দেখাবার জন্য কিছু বলিনি, আমার মতলবও কিছু নেই। আপনি যদি সহজভাবে কথা বলতেন তা হ'লে এই তর্কটা আর হ'ত না। আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আপনাকে বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনার ব্যবহারে আর আমার বলবার প্রবৃত্তি নেই। আমি শুধু বলতেই চেয়েছিলাম, প্রমাণ দেখাবার ইচ্ছা ছিল না। আমি আবার বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—

এইবার আসল গল্প শুনুন আপনারা।

শুভ্রা হঠাৎ যুবকের দিকে চেয়ে দেখে সে আর নেই।

শুভ্রা হঠাৎ যুবকের দিকে চেয়ে দেখে সে আর নেই

নেই তো কোথাও নেই। প'ড়ে গেলেন কি হোঁচট খেয়ে? কিন্তু না।

ইতিমধ্যে তার গা ঘামতে আরম্ভ করেছিল। একটা বরফের ছুরি তার দেহের মধ্যে কে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাথাটা শূন্য হ'য়ে গেল। চোখে নেমে এলো অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে রাশিরাশি সরষে ফুল। পায়ের নিচে মাটি নেই—তারপর আর কিছুই নেই।

মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে রহস্যময়ী নারীর অজ্ঞান অবস্থায় আবির্ভাব। সঙ্গের লোক রহস্যজনকভাবে উধাও, জলজ্যান্ত ভূতের উপদ্রব—এসব কথা খবরের কাগজে পড়েছেন। কিন্তু শুনুন।

দু দিন পরে শুভ্রার জ্ঞান হ'ল।

সে কিছু সুস্থ হ'লে ডাক্তার এবং পুলিসের কাছে সব কথাই বলল। কিন্তু রহস্যের কোনো কিনারা হ'ল না।

সুস্থ হ'য়ে বাড়িতে এসেই শুভ্রা জানতে পারল—যে যুবকের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিল সে বম্বেতে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

তারিখ—ঐ একই তারিখ।

শুভ্রা আবার মূর্ছিত হ'ল। বুঝলেন? আবার মূর্ছিত হ'ল।

অমর গল্প শেষ ক'রে বলল, এইখানেই আমার কথা শেষ। আপনাদের বিশ্বাস হ'ল কিনা জানি না, তবে মতামত এবারে প্রকাশ করতে পারেন।

সবাই দম বন্ধ ক'রে কাহিনীটা শুনেছেন এতক্ষণ। শেষ হয়েছে শোনামাত্র---আগে ওঁরা প্রত্যেকেই সিগারেট ধরালেন। যেন একটা মহা পরিত্রাণ। গল্প শোনবার সময় থেকে থেকে এক একটা প্রশ্ন ওঁদের মনের গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠছিল কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি কেউ।

এতক্ষণে প্রকাশবাবু প্রথম কথা বলতে পারলেন। তাঁর মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল সেটি প্রথম সুযোগেই প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা অমরবাবু, সবই তো শুনলাম, গল্পটাও বেশ, কিন্তু এতটা বৃত্তান্ত জানা গেল কি ক'রে?

বলা বাহুল্য এ প্রশ্ন ওঁদের সবার মনেই জেগেছিল। ধনঞ্জয়বাবু বললেন, আপনি বোধ হয় গল্প লেখেন।

শুকলালবাবু বললেন, আগেই এ সব অনুমান না ক'রে অমরবাবু নিজে কি বলেন শোনা যাক।

সঞ্জয়বাবু বললেন, খুব ভাল প্রস্তাব। কারণ অমর তাঁর বন্ধুরূপেই এখানে এসেছে, অতএব তার মান বাঁচানোর সঙ্গে তাঁর নিজের সম্মান জড়িত।

অমর সবার দিকে একবার ক'রে তাকাল, তারপর চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিল। তারপর বলল, আমি আগেই বলেছি, শুনে ভয় পেতে পারেন।

প্রকাশবাবু বললেন, ভয় পাইনি।

অমর বলল, সবটা এখনও শোনেননি।

অ্যাঁ! আরও আছে না কি?

হ্যাঁ, সামান্য! আমি সবটা ঘটনা জেনেছি, কারণ আমিই এ কাহিনীর নায়ক।

মানে?—

কথাটা শেষ হ'ল না বক্তার। না তাও ঠিক নয়—কথা ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেকেই একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। কারণ তাঁদের চোখের সামনে অমর দপ ক'রে নিবে গেল, তার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

তাঁদের চোখের সামনে অমর দপ ক'রে নিবে গেল

সঞ্জয়বাবু নিজে সব চেয়ে বিব্রত হলেন, এবং তিনি জ্ঞানহারা হলেন সবার আগে। অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করলেন মাত্র।

রামকৃষ্ণের দর্শন

জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার আই-এ-এম

যাঁরা রামকৃষ্ণের কথার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা রামকৃষ্ণের সমগ্রবেলের উপমা লক্ষ্য করে থাকবেন। ঐ উপমাটির মধ্যে বিশ্বতত্ত্বের কথা রামকৃষ্ণ আমাদের দিয়ে গেছেন বললে অতিরঞ্জন দোষ হবে না।

(২) বেলের ওপর আছে শক্ত খোসা, যা তার ভিতরকার সুগন্ধ সুস্বাদু শাঁসকে লুক্কায়িত রাখে। ভিতরে আছে শাঁস, ছিবড়ে, বীচি ও আঠা। শাঁসে আছে সুস্বাদ সুগন্ধ সুবর্ণ, কোমলতা ও মসৃণতা; সমস্ত পদার্থটি একত্র-প্রাপ্ত হয়েছে আঠার মাধ্যমে। বীজে আছে অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। যেন পরমতত্ত্বের মধ্যে নিহিত সমস্ত বস্তু, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত ও সর্বপ্রকার সম্বন্ধ মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

(৩) ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রথমেই প্রশ্ন উদয় হয় ব্রহ্মই যদি সত্য হয় তবে মানুষী বোধে ব্রহ্ম ধরা পড়ে না কেন? মানুষী বুদ্ধিতে আমরা পাই বহুর আতিশয্য, যারা নানা-রকম সম্বন্ধে আবদ্ধ, যাদের নানাপ্রকার গুণ আছে ও যাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে দেশ কাল ও পারম্পর্যের মধ্যে। কেন এই আতিশয্য, এই বিক্ষেপ এই ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি? তার উত্তর বুদ্ধিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বাহুল্য স্বীকার ক'রে নিতে হয়। যেমন বেলের মধ্যস্থিত শাঁস, ছিবড়ে বীচি ও আঠার বাড়াবাড়ি। বাইরে একটা কঠিন আবরণ আছে। আবরণটি শক্ত ও সহজ-ভেদ্য নয়। এই আবরণের নাম মায়া।

(৪) বেলের খোসা যেমন তার অন্তর্নিহিত সত্তাকে লুক্কায়িত রাখে, তেমনি মায়া হচ্ছে আমাদের আদিম ও দুর্লঙ্ঘ্য অজ্ঞতা—যা আছে, কঠিন ভাবে আছে ও যা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। এই খোসার আর একটি কাজ হচ্ছে অন্তরের বস্তুকে ধারণা করা। খোসা ব্যতীত ভিতরের বস্তু ও সম্ভাবনা রক্ষিত হয় না। মায়ার দ্বিতীয় কাজ ব্রহ্মনিহিত বস্তুর ধারণা করা। তয়ৈব ধার্য্যতে সর্বম্। অগ্নির যেমন দাহিকা-শক্তি, শাঁসের ও বীচির যেমন খোসা, ব্রহ্মের তেমনি মায়া। বাহ্য রূপ, অথচ অতি-প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

(৫) খোসাহীন শাঁস যেমন বেলে অসম্ভব, মায়াহীন ব্রহ্মও তেমনি বিশ্বে অসম্ভব অচিন্তনীয়। ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্য নয়; ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রকাশিকা শক্তি, ও সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকাশিকা শক্তিই আমাদের বুদ্ধির নিকট অস্বচ্ছ। এই অর্থে, যে একে আমরা বুঝতে পারি না। এর কি ও কেন আমাদের জ্ঞানের অগোচর। এমন কোনও সময় ছিল না, বেলে যখন খোসা ছিল না, অথচ শাঁস ছিল। সেইরকম ব্রহ্মও যেমন নিত্য, মায়াও তেমন নিত্য। ব্রহ্ম থেকে মায়া হয়েছে একথা বলা চলে না।

(৬) আমরা যে শরীর ও মনের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে ব্যর্থ হই সে ব্যর্থতার প্রধান কারণ আমরা অসতর্ক মুহূর্ত্তে এই ধ'রে নিই যে শরীর এক পদার্থ—যার অস্তিত্ব মন থেকে পৃথক্ এবং মন এক পদার্থ—যার অস্তিত্ব শরীর থেকে পৃথক্। এই দুই পৃথক্ ও অসম্বদ্ধ ও অসম্ভব স্বাধীন দুই সত্তা কল্পনা ক'রে, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আমরা বুঝে উঠতে পারি না। শরীর যেন মায়ার প্রতীক। মন প্রতীক ব্রহ্মের। আসল সত্তার এই দুই দিকই আছে। যা কিছু ঘটে তার একসঙ্গে দুইদিকে ছাপ পড়ে, মানস ক্ষেত্রে ও কায়িক ক্ষেত্রে। মনকে এখানে চৈতন্য অর্থে ধরেছি, সাংখ্যদর্শনের মন হিসাবে নয়।

(৭) বিশ্বে জড় ও চৈতন্য দুইই আছে নিত্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে। জড়হীন শুদ্ধ চৈতন্য নেই, এবং চৈতন্য-হীন জড়ও নেই। পরমার্থিক বস্তুর দুই দিক। একদিক চৈতন্যময় ও আর একদিক জড়ময়। সুতরাং পারমার্থিক তত্ত্ব হিসাবে এই প্রশ্ন অবান্তর। চৈতন্য কি প্রকারে জড় হ'ল, কিংবা জড় কি ভাবে চৈতন্য হ'ল? জড় ও চৈতন্য দুইই অনুভবমূলক বা বোধাত্মক। অর্থাৎ দুইএরই সত্তা অন্ন ভবের উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন বেলে খোসা ও বেলের শাঁস। শক্ত ও নরম দুই পদার্থ ই এক উপাদানে গঠিত।

(৮) সংসারে বর্ণ আছে, রস আছে, গন্ধ প্রভৃতি গুণ আছে, সুখ দুঃখ অনুভব আছে, নানাবিধ সম্বন্ধ আছে যার দ্বারা এক বস্তু আর এক বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক রূপে ; গতি আছে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কাল আছে, দেশ ও স্থান আছে। এইসব ব্রহ্মে লীন হ'য়ে মারা পড়ে না। তারাও ব্রহ্মে আছে। বেলের ছিবড়ে, আঠা, বীচি ফেলে শুধু শাঁসকে বেল বলা যায় না এবং এরা সকল একাকার হ'য়ে অবস্থান করে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য আনন্দ, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, সমস্তই ব্রহ্মে স্থান পেয়েছে। আঠা যেন সম্বন্ধের রূপান্তরিত চেহারা। বীজ যেন কালের রূপান্তরিত চেহারা। ছিবড়ে যেন দেশের রূপান্তরিত চেহারা। শাঁস যেন সমস্ত রূপ রস আনন্দের চেহারা।

(৯) ছিবড়ে যেমন বেলের মধ্যে আছে, বেল ছিবড়ের মধ্যে নেই ; তেমনি দেশ ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্ম দেশাতীত। বীজ যেমন বেলের মধ্যে, বেল বীজের মধ্যে নয় ; তেমনি কালও ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্ম কালাতীত। আঠা যেমন বেলের মধ্যে,ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ যাবতীয় সম্বন্ধ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সমেত ; ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের অতীত।

(১০) বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন জড়পদার্থে বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি গুণ নেই। এসব গুণ মনের বিকার মন-সংযুক্ত একপ্রকার অনুভূতি। তেমনি সুখ, দুঃখ, ভাল মন্দ এসবও জড়বস্তুতে নেই। জড়বস্তু নির্বিকার। মানুষ বিশেষে জড়বস্তু সুখ বা দুঃখের উৎপাদক। সুতরাং যে জড়জগৎ বৈজ্ঞানিক কল্পনা করেন তা একপ্রকার নির্গুণ। বৈজ্ঞানিক যাই বলুন না কেন, পারমার্থিক বিচারের সময় এই প্রশ্ন থেকেই যায়। এই অপ্রধান (Secondary) গুণগুলো কি মিথ্যা ? রামধনুর সপ্তচ্ছটা কি মরীচিকা ? মরীচিকাই হক আর যাই হক রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, সুখ, দুঃখ এসব নেই, একথা বলা যায় না। তারা তবে কোথায় আছে ?

(১১) বিজ্ঞানী তথাকথিত অপ্রধান গুণগুলোকে তার জগৎ থেকে বহিষ্কৃত করলেও আমাদের জীবন থেকে তারা বহিষ্কৃত হয় না। তারা আছে, নিঃসন্দেহে আছে। সুতরাং বিজ্ঞান-কল্পিত সত্তার মধ্যে তাদের অবস্থান অসম্ভব হ'লেও পারমার্থিক সত্তার মধ্যে তাদের স্থান দিতে আমরা বাধ্য। মানুষের হাসি, কান্না, এই ধরার দ্যুতি সংগীত, সমারোহ, আনন্দ ও উচ্ছ্বাস সব কিছুই ব্রহ্মের মধ্যে নিহিত, যেমন বেলের শাঁসের মধ্যে আছে সুগন্ধ, সুস্বাদ, পেলবতা ও বর্ণের ছটা। তবে কি ভাবে মানুষী অনুভবসমষ্টি দৈবী অনুভবের সমন্বয়ের মধ্যে থাকে তা বলা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকতঃ সম্ভব নয়। দৈবী প্রজ্ঞা ছাড়া দৈবী অনুভব অসম্ভব। মানুষের স্বভাব নষ্ট না হ'লে ব্রহ্মের স্বভাব পাওয়া যায় না। সুতরাং চিন্তার অগোচর এই তত্ত্ব।

(১২) একটি বেল যেমন অনন্ত বেলের পরিণতি ও অনন্ত বেলের সম্ভাবনা, তেমনি ব্রহ্ম অনন্ত-সম্ভব ও অনন্ত-প্রকাশ। বেলের মধ্যে খোসা, শাঁস, বীজ ইত্যাদি সবই বেল, তবুও খোসার থেকে শাঁসে বেলের স্বরূপ অধিকতর প্রকাশিত, বীজে তার স্বরূপ অল্পতর প্রকাশিত, তেমনি ব্রহ্মেরও প্রকাশের তারতম্য আছে। একই বেল আঠা-রূপে তরল, শাঁসরূপে ঈষত্তরল ও খোসারূপে শক্ত— তেমনি এক ব্রহ্মই কখনও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, কখনও ব্যক্তি বা ঈশ্বর ও কখনও সাকার দেব ও দেবী। আঠার ধর্ম খোলা মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া। নির্গুণ ব্রহ্মও আমাদের করে নির্বাক। খোসাকে নিয়ে আমরা নাড়া-চাড়া করতে পারি। দরকার হলে পাশে রেখে খেলা করতে পারি। ইষ্ট দেবতার সঙ্গেও খেলা চলে। এই রামকৃষ্ণের বিশ্বাস। খোসা যেন শক্তি বা মায়া। একে কালী বলে চিন্তা করে মাতোয়ারা হ'তে পারি। বীজ অব্যক্তের আকার। শাঁস ইত্যাদি ব্যক্ত। একাধারে অব্যক্ত ও ব্যক্ত। এছাড়া সমগ্র বেলের গোলাকার রূপ পূর্ণতা সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের অপূর্ব প্রতীক। যেমন ব্রহ্ম সমস্ত সমন্বয়ের সেরা সমন্বয়।

(১৩) বেলের আঠা যে বেলের খোসাতে পরিণত হয় না, বেলের খোসা যে বেলের আঠাতে পরিণত হয় না একথা কে বলতে পারে ? বেলের খোসাতে যে বেলের আঠার ধর্ম নেই এ কথা কে বলতে পারে ? বেলের শাঁস যে বেলের আঠারই উচ্ছ্বসিত ঐশ্বর্য্যবান রূপ নয় এ কে বলবে ?

(১৪) সামাজিক দৃষ্টির অধিকারী রামকৃষ্ণ পরমতত্ত্বের অনন্ত রূপও অনন্ত প্রকাশে বিশ্বাসবান। তত্ত্বতঃ এই বিশ্বাস খণ্ডন করা সহজ কি না সে অন্য কথা। স্পিনোজা ও অনন্ত বিভাবের (Infinite modes) এর কথা বলতেন। রামকৃষ্ণের বিশ্বাস অনেকটা স্পিনোজার মত।
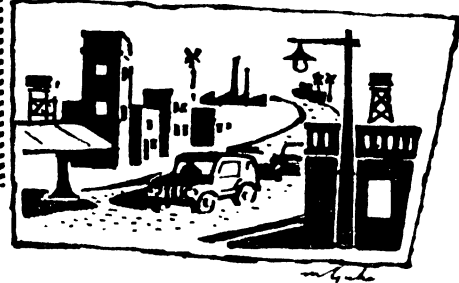
(পূর্বানুবৃত্তি)

সমবেত ডোমপাড়ার অনেকেই ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হয়। অবিনাশ সম্বন্ধে ওদের ধারণা কেমন অন্য রকমেরই।

এখন থেকেই ছোঁড়াটা কেমন মাথাসোজা! বসনা ডোম সারাদিন ঢোলঢাক পিটেও রোজকার করে বড়জোর ন-সিকে, না হয় দুটাকা। আর খোরাকী। গবা ডোমও সানাই বাজায়—সে বুকফাটিয়ে ফুঁ দিয়ে সারাদিনে নেচে-কুঁদে ঢোল এর সঙ্গে সানাই বাজিয়ে পায় ওই দেড় দুটাকা। ইদানিং অবিনাশের দলে জুটেছে। 'পোঁ ধরে মাত্র। দমটেনে শুধু সুর রাখা—একটু মাঝেমাঝে ছিদ্রি টিপে কায করতে গেলেই অবিনাশ চোখ পাকিয়ে তাকায়।

রেগে যায় গবা।

চোখের সামনে অবিনাশকে ওই ঘণ্টা দুয়েকের জন্য দশটাকা ফেরৎ দিতে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছে তারা। তারপর ওই ছান্দুদাশকে হাঁকিয়ে দেওয়া! কেমন যেন ঘোরতর অপরাধ করে ফেলেছে অবিনাশ।

—হ্যারে ফিরিয়ে দিলি ওকে।

গবার ডাকে ওর দিকে চাইল। তখনও মুখচোখ ওর থমথমে।

—যা তা বলবে।

—তা ট্যাক্স দিতে এয়েছিল।

উ টাকা তাই ফেরৎ দিলাম। টাকার জন্যে অন্য ডোম বাজায় না।

—তবে?

অবিনাশ উত্তর দিল না।

কেন বাজায় কিসের জন্য, তা ওদের বোঝাবে কি করে! নিজেও সবসময় ঠিক বোঝেনা। মাঝেমাঝে সবকিছু ঠেলে কোথায় একটা সাড়া জাগে মনের অতলে! কেমন বৈশাখী ঝড়ের মত দুর্নিবার বেগে আসে সেই মাতন, মুঠোমুঠো লালধুলো মেঘে বাতাস ওঠে মেতে।

বর্ষার কাজলকালো মেঘ জুড়ে শ্যামল দিগন্তকোলে শালবন সমাকীর্ণ প্রান্তরে নামে বৃষ্টির সাড়া। পাংশু আকাশ কোল—চড়াই উৎরাই ঘেরা নীলস্বপ্নমথর কোন পরিবেশ—

শরতের সোনালী আলোয় সবুজ মৃত্তিকার বুকে ঘাসফুল ফোটে হেমন্তের শিশির আর রোদে হীরক দ্যুতির আভাস।

সুর জাগে।

অবিনাশ বাঁশী বাজায়। সেখানে কেন বাজায়—কার জন্য তা কোন দিনই ভাবেনি। কি করে সে বোঝাবে ওদের।

লুক বড় বজ্জাতরে ওই ছেলেটা।

গবে ডোম এর কথার জবাব দিল না।

বের হয়ে গেল অবিনাশ পথের দিকে।

ডোমপাড়ার ওরা কেমন অবাক হয় অবিনাশের ব্যবহারে। শারি ডোম বলে—বিয়ে সাঙ্গা করেনি তাই অমনি বাউড়ে বাউণ্ডুলে।

মিষ্টি খুশীতে ভরে উঠেছে। জীবনের সব ক্ষয় ক্ষতি অপচয় আজ তার পূর্ণতার আনন্দে আনন্দময়। নোতুন খেতের ধান এসেছে ঘরে—ওদিকে ছোট্ট খামার করে তুলেছে সোনাধান। গোবর দিয়ে নিকিয়ে তকতকে করেছে ঘরের আঙ্গিনা, পিঠুলিগুলে আলপনা দিয়েছে।

জলটোপের অবকাশ নেই।

হাতের কাযের ফাঁকে তাকে পড়তে হয় জমিজারাত এর তদারক নিয়েও। ওই পূর্ণতার মাঝে মিষ্টি লোহার আজ সার্থক হয়েছে অন্তর বাইরে। মা হতে চলেছে সে।

সন্ধ্যা নামে।

পৌষ সন্ধ্যা। গ্রামের নিম্ন আকাশে কুয়াশার হালকা রেখা চাদরের মত মুড়ে রেখেছে, সবুজ আখের খেতের মাথায় সাদা ফুলকোগুলো যেন সারিবদ্ধ নিশান তুলে রয়েছে—পাখ-পাখালীর ডাকে ভরে ওঠে আকাশকোল।

ঘরে ঘরে বাজছে শঙ্খধ্বনির সুর।

দিনান্ত নামে—আলতো পায়ে খড়োঘরের পাশদিয়ে কোন বৌ চলে গেল সন্তর্পণে প্রদীপ শিখাটুকুকে আগলে সন্ধ্যা দিতে গ্রামদেবতার থানে।

কারিগর বসে আছে। কি যেন ভাবছে সে। অজানতেই কেমন জড়িয়ে পড়েছে নিবিড় ভাবে—মিষ্টি নয়, এ মাটি, এই পল্লীপ্রান্তর, ওই ছায়াঘন আঁধার নামা বটবৃক্ষের মত এ মাটির সঙ্গে।

—তুই!

প্রদীপটা নামিয়ে প্রণাম করে উঠে আসছে মিষ্টি।

গলায় তখনও শাড়ীর আঁচল জড়ানো, কি যেন অজানা আবেশে টিপ করে প্রণাম করে ওকে।

—ভাবলাম আর কেউ।

হাসছে মিষ্টি। নিজেকে নিবিড় ভাবে সঁপে দেয় ওর বাঁধনে।

—হ্যাঁরে, তুই দেখছি খুশী হোস্ নি?

মিষ্টি কেমন যেন কারিগরের মন বুঝেছে, কারিগর জানতো মিষ্টির জীবনের নির্মম অভিশাপ, কোথায় অতীতের সেই পাপ আজও রক্তের সঙ্গে হয়তো মিশে আছে—জড়িয়ে আছে নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধনে। তার থেকে নিষ্কৃতি নেই।

কোনদিন রুদ্র আগ্নেয়গিরির মত জেগে উঠবে সেই পাপের পুঞ্জীভূত উত্তাপরাশি, অসহ্য দহন জ্বালায় অতীতের সেই গরল ঠেলে উঠবে—চুরমার করে দেবে ওর সব স্বপ্ন-সাধনা।

সবুজ ধরণী—শান্ত গৃহকোণ জনপদ চূর্ণ বিচূর্ণ করে যেমন জাগে আগ্নেয়গিরির সর্বনাশা ধ্বংসপর্ব।

সেই সর্বনাশা দিন যেন না আসে। আতঙ্কে তাই শিউরে উঠেছে কারিগর। মিষ্টির কথার জবাব দিলনা। ওকে আরও কাছে টেনে নেয় কি নিবিড় প্রীতিতে।

—না রে, খুশী কেন হবো না।

…মিষ্টি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিবিড় প্রশান্তি আর তৃপ্তিতে। আজ সব ভুলেছে সে।

কিন্তু সব কিছু যেন ধ্বসে পড়ে—ছিটিয়ে পড়ে তার তাসের মিনার। এমনি কিছু একটা ঘটবে জানতো কারিগর।

সেদিন সামান্য একটা উপসর্গ থেকে ব্যাপারটা অনেক-দূর গড়ায়। কারিগর ছুটলো রমণ ডাক্তারের কাছে।

হাতের কাছে সেইই এখানকার সিভিল সার্জন।

মুখে সোজা বাঁকা কথা আর কপালে ইদানীং কোন তান্ত্রিক গুরুদেব পাকড়ানোর নজীর হিসাবে রক্তচন্দনের লালটিপ আঁকা।

সাইকেলে ওষুধ ইনজেকসনের বাক্সটা বাঁধাই থাকে, শুধু ডুগ্ ডুগ্ বলে বের হয়ে পড়ার ওয়াস্তা।

বাপুতি চালার দাওয়ায় একটু মাটির ঢিপি বেদী মত করা—সেইটাই নাকি তার বাপের আসন, আশপাশে পাতা মাদুর তালাই, রোগীরা এখানে ওখানে বসে রোদ-পিঠ করে। রমণ ডাক্তার এ-শিশি ও-শিশি থেকে এটা-সেটা আন্দাজমত ঢালে—তারপর ডাইলিউট করে গাড়ুস্থিত জল দিয়ে, ওই জলটুকুই নাকি তার পিতৃদেবের আবিষ্কৃত বাড়ীর পিছনদিককার খিড়কী পুকুর 'গ্যাড়ার গড়ের' জল সর্ব-রোগ-জ্বর-হর।

অবশ্য তার গুণেই হোক বা ওষুধের স্পর্শমাত্রেই হোক রোগ জ্বর সারে। আর সাহসটাও রমণ ডাক্তারের অপরিসীম। অপারেশনও করে—এমন কি সেবার পুরুণের তেলিদের বাড়ীতে ম্যানিঞ্জাইটিসের

রোগীর লাঙ্গার পাংচার করেছিল বস্তা সেলাই করা গুণসূঁচ দিয়ে—এবং ততোধিক বিস্ময়ের ব্যাপার মধো তিলি এখন সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে হালের মোষের মেরুদণ্ডে সজোরে পাচন হাঁকরে চাষবাস করছে।

রম রম পসার রমণের।

জগন্নাথপুরের সরকারী ডাক্তারবাবুও অবাক হয়ে যান।

—বিচিত্র ডাক্তারী মশায়, আর ধন্যি সাহস।

এই করেই রমণ ডাক্তার চালিয়ে যাচ্ছে; অনেক দেখেছে কিছুটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। দশ পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে একটা মান খাতিরের আসন তার কায়েম হয়ে গেছে।

কারিগরের ডাকে বের হয়ে আসে।

খবরটা আগে থেকেই জানতো। কিন্তু সেও বিশেষ আশা করেনি।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সে জানতো এমনি একটা কিছু হতে পারে। আজ তাই ঘটেছে। ব্যাগটা ওর হাতে তুলে দিয়ে পা য় হেঁটে হাজির হয়।

...মিষ্টির সুন্দর পুষ্ট চেহারা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছে। কালো হয়ে উঠেছে মুখ—চোখের কোলে তীব্র বেদনা। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় গর্ভজাত ভ্রূণের পরিসমাপ্তির নিদারুণ হতাশা ওর চোখে।

মা হবার দীর্ঘ দিনের বাসনা কামনা সব তার ব্যর্থ হয়ে গেল।

—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কারিগর।

—এই রাত্রে!

—না হলে সমূহ বিপদ।

এতেই বা বিপদ কম কি। দীর্ঘ আটক্রোশ রাস্তা গরুর গাড়ীতে করে যেতে হবে, অন্য কোন যানবাহন নেই। যে দুর্বল এবং মুমূর্ষু হয়ে উঠেছে রোগী, তাতে পথেই কোন বিপদ না ঘটে।

রমণ ইনজেকসন দেয় কয়েকটা—কিছু ওষুধপত্রও।

ইতিমধ্যে গাড়ী ঠিক করে এনেছে। রাতের অন্ধকারেই মিষ্টিকে নিয়ে চলে গেল ওরা। লোহার বাউরী পাড়ার অনেকেই এসে জুটেছে—কামার পাড়ার দুচার জনও।

দায়ে অদায়ে মিষ্টি লোকের উপকারই করেছে—অনেকেই ওর এই বিপদে আজ সমবেদনা জানায়।

...চুপ করে থাকে রমণ ডাক্তার।

...ওর মনেও আজ মিষ্টির জন্য দুঃখ বোধ হয়।

মা হতে পারবে না সে, সে পাপের বীজ তার রক্তের অতলে আত্মগোপন করে রয়েছে, দীর্ঘদিনের প্রায়শ্চিত্তের পরও তা নিঃশেষে নির্মূল হয় নি। মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠেছে।

ব্যর্থ করেছে তার কামনা—তার মাতৃত্বের সাধ।

রাত শেষ হয়ে আসছে। মিষ্টির সাজানো বাড়ীটা আবছা আঁধারে স্তব্ধতার অতলে ডুবে আছে। কোথায় পাখ-পাখালী ডাকছে—ভোর হয়ে আসে।

.. জীবন রত্নের সেদিন বাপের সঙ্গে একচোট হয়ে গেল বেশ। কালীপূজা উপলক্ষে থিয়েটার হবে, ইতিপূর্বে বরাবর তাই হয়ে এসেছে। ওই পূজোয় ধূমধামও বেশ করে তারা। এতাবৎ অন্য সব পূজোর চেয়ে ওই পূজোটাই করে এসেছে।

তারক রত্ন কেন—এ গ্রামের এদিক ওদিকে দুচারজন. ধ্বসে-পড়া জমিদার গোষ্ঠী—এখনও ওই এক অমাবস্যার রাতে বেশ জাকিয়ে ওঠে। সারা বছরের পরিত্যক্ত কালীবাড়ীর গায়ে চূন কলি ফেরান হয়; সামনের মাঠের আগাছা ঘাস কালকাসিন্দের জঙ্গল সাফ করে বড় হাড়ি-কাঠ পুতে তাতে তেল সিন্দুর মাখিয়ে জাঁকালো করে তোলে পুলিন কর্মকার। সেই এই পূজার হস্তারক, তারজন্য জমিরও বরাদ্দ আছে। একটা দুটো নয় এক কুড়ি পাঁঠা পড়তে থাকে:

...একধার থেকে কোপ বসায় আর পিছনে ছুঁড়ে গাদা লাগায় মুণ্ডুগুলো। সে আজ কয়েক বৎসর আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে।

...নামে মাত্র চারটা পাঁঠা পড়ে চার প্রহরে। আর প্রসাদ ভোগ, তাও ক্রমশঃ কমতে কমতে আসছে।

পরদিন থিয়েটার যাত্রা হতো। সমারোহ উৎসব। জম জম করতো গ্রাম।

এবারও তেমনি একটু সমারোহ হবে ভেবেছিল জীবন রত্ন। এই ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব খাটে—একটু অন্য দিকেরও কদিন সুবিধা হয়। কারণ বারি—ইত্যাদি ও

চলেটলে। জুয়ার আড্ডা বসে সারারাত। গোকুল তাই এবার কথাটা পাড়ে।

—কি হবেটবে আগে থেকে হুকুম ফরমাইস করুন দাদাবাবু, নালে সমসম কালে হেনা চাই তানা চাই বললে লারবো কিন্তু।

জীবন বাবাকে তাই বলতে গিয়েছিল কথাটা।

তারকবাবু কয়েক মাসের মধ্যেই বদলে গেছে একেবারে।

বিপদ দুর্ভোগ একা আসে না, আসে একসঙ্গে, না হয় একটার পর একটা। কোথায় যেন এ বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত অভিশাপ জমে আছে।

সাজান বাগান সবুজ শ্যামল গাছগুলো সেই অগ্নিকাণ্ডের পরই পুড়ে ঝলসে গেছে। চারিদিকের দেওয়ালে কেমন কালো বিবর্ণ ঝলসানো দাগ। মাটিও রুক্ষ কর্কশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে :

বর্ষার জলে সেই কালো রং লাল মাটিতে মিশে কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছে। আগুনের প্রচণ্ড তাপে বোঝা যায় বড় দালানের দোতলা থেকে নিচের দেওয়াল অবধি ফাট ধরে গেছে।

এক বর্ষার জলে সেই কার্ণিশের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, মেরামত করাবার সাধ্যটুকুও নেই। এটাও বেশ যেন বুঝতে পেরেছেন। এতবড় বাড়ী কেবল খসে খসে পড়তে সুরু হয়েছে।

…ফাঁকা বৈঠকখানা—বোর্ড অফিসের প্রবল শাসনেও আর মন নেই। নিজের পায়ের তলের মাটি সরে যাওয়া একটি মানুষ ত্রিশঙ্কুর মত যেন শূন্যে ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়বে। তাই অযথা লোককে শাসন করতে যেন শক্তি খুঁজে পায় না।

অবনী মুখুয্যেই খবরটা আনে—অশোকের ওই পাথরের ঠিকা দেওয়ার খবর।

—ল ল হয়ে গেল হে!

—কে?…তারকরত্ন মুখ তুলে চাইল।

—ওই অশোক, মালিয়াড়ার জঙ্গলে পাথরের ইজারা দিল, কাঠও বিক্রী করেছে। শুনলাম তা মবলক তিরিশ হাজার তো পাবেই। আর করিতকর্মা ছেলে।

চুপ করে থাকে তারকবাবু, কথার জবাব দিল না।

নিজের ছেলেকেও মানুষ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। ব্যর্থ হয়েছে। তবুও চলে যেত একটা ছেলের দিন কোনরকমে বিষয় সম্পত্তি নাড়াচাড়া করে।

কিন্তু এমনি দুর্যোগ আসবে স্বপ্নেও তা ভাবেনি। ওই মালিয়াড়ার জঙ্গল ওই বন্ধ্যা কাঁকুরেডাঙ্গা ছিল তাদেরই দখলে, বাটোয়ারার সময় তারকরত্ন ফিকির করে ওই উষর পার্বত্যভূমি সোল বলে চালিয়ে ওদের ভাগে ঠেলে দিয়ে নিজে দখল নিয়েছিল ভালো ধানি জমি। ছোট কর্তা পরে হেসেছিলেন জমির রকম দেখে।

—ওই সোলে যে শুধু পাথর আর পাথর; থানা অবধি হয় না। কি সোল জমি দিলে তারক?

…সোল বলতে প্রথম শ্রেণীর ধানিজমিই বোঝায়। কথাটা শুনে তারক সেদিন যেন আকাশ থেকে পড়েছিল।

—তাই নাকি কাকামশায়! আমিন কৈলাদের কাণ্ড। কিন্তু এখন আর কি করা যাবে?

ছোটকর্তার একটিমাত্র কন্যা সন্তান—ওই অশোকের মা। বৃদ্ধ হাসেন। যাক্‌গে, আমার নাতি না হয় পাথরই চুষবে।

আজ সেই ধানি জমি চলে গেছে চাষীর হাতে, ভিন প্রজা আজ সে; ওই অনুর্বর পাথুরে ডাঙ্গা এনে দিয়েছে ওই অভূতপূর্ব সম্পদ।

—কোত্থেকে শুনলে? তারক ফুরসী ফেলে প্রশ্ন করে।

—ওই পানুর কাছেই। তারই মহাজন নাকি নিয়েছে।

—ও! চুপ করে গেল তারকবাবু।

…কথাটা তা হলে মিথ্যা নয়।

দুচারজনকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কালীপূজোর ব্যাপারে আগে থেকেই কর্তারা ঢাকী, ঢুলি, পূজারী ব্রাহ্মণ, ওই হস্তারক সবাইকে জমির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তারাই সমবেত হয়ে যে যার কায করতো, তাছাড়াও তারকবাবু সমারোহ করতেন।

এবার তাদের কারোও দেখা নেই।

মূর্তি গড়তো ভূষণ ছুতোর—এবার জবাব দিয়ে গেছে, একে একে অনেকেই। আজ তারকবাবু চিন্তায় পড়েছে।

বন্ধ করে দেবে এতদিনের পূজো? পিতৃপুরুষের পুণ্যকর্ম!

ভূষণ ছুতোর বলে ওঠে—এতকাল বিনিখাজনায় জমি পেয়েছি, কায করেছি। এখন তো সরকারের ওয়াশীল-দারকে খাজনা মিটিয়ে দিতে হচ্ছে আজ্ঞে—বিনামজুরী আর বেগারিতে কেমন করে কাজ করি বলেন? ওদের সকলেরই এককথা। একবছরের মধ্যেই কেমন বেমালুম সব বদলে গেছে। আজ জমি তাদের নামে, খাজনারও রেয়াৎ নেই।

—তবে কি পূজো হবে না?

অসহায়কণ্ঠে তারকবাবু যেন আর্তনাদ করছে। অবনী মুখুয্যে ধমকে ওঠে—ইষ্টুপিড কোথাকার। বেলাডি—

হন্তারক নিতাই কামার বাধা দেয়—যা তা বলবা নাই বেলাডিবাবু। সতীশ ভট্চায তাদের সামলে নেয়।

—মায়ের পূজো হবেক নাই—হ্যাঁরে ভূষণো?

মাথা চুলকোচ্ছে ওরা। সতীশ ভট্চায পরম মাতৃভক্ত সন্তানের মত তখন বলে চলেছে—এতকালের পূজো!

কোন রকমে ওরা রাজী হ'ল।

—কিন্তু খোরাকী আর আধারোজ দিতে হবেক আজ্ঞে?

হন্তারক নিতাই দাবী করে আর ফি পাঠার মুড়ো।

হাসে তারকবাবু—এবার পাঠা দোব মাত্র একটা। তা নিতে চাস নিবি।

কোনরকমে ওদের দয়াতেই যেন পূজো সুরু হয়।

কমপেনসেশন এর টাকারও মুখ দেখেনি এখনও—তা বের করতেও নানা হাঙ্গামা; সেও এক কোর্ট কাছারি—মোক্তারের ব্যাপার।

কবে পাবে তার ঠিকঠিকানা নেই, এদিকে এ বছরের ফসলও একদানা ঘরে ঢোকে নি। ভাবনায় পড়েছে তারকবাবু।

বৈঠকখানা খালি হয়ে গেছে।

কোন রকমে গরীবের পিতৃদায় সারার মত পাঁচজনের অনুগ্রহে আজ কালীপূজো হতে চলেছে। বন্ধই করে দিত, কিন্তু পারেনি।

হঠাৎ জীবনকে ঢুকতে দেখে একটু চাইল ওরদিকে—কিছু বলবে?

জীবন বাবার সামনাসামনি বিশেষ হয় না। এড়িয়ে চলে পারতপক্ষে। বৈকালের আবছা আলো নেমেছে, কেমন মলিন বিবর্ণ সেই আলো, কোথায় পাখী ডাকছে, শূন্য অসীম ঠাণ্ডায় খাঁ খাঁ করছে নির্জনতা।

আচীল পাচীল ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে মূর্তিমান্ ধ্বংসের মত বসে আছে তারকবাবু।

—এবার গ্রামের জেলেরা ধরেছে কালাপাহাড় যাত্রা করবে কালীপূজোয়। বেশী নয় শ'তিনেক টাকা লাগবে। জুয়া আর ঝাণ্ডির ছকওয়ালারা একশো দেবে বলেছে। বাকী দুশো আমাদের দিতে হবে।

—দুশো টাকা! যাত্রা করবে?

—হঁ।

তারকবাবু সোজা হয়ে বসলেন। একটু অবাক হয়ে গেছে জীবন বাবার কথা বার্তায়। তারকবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকে।

আজই যেন মনে হয়, কি একটা অপদার্থ ওই জীবন—তারই সন্তান। চোখেমুখে এরই মধ্যে জমেছে কেমন বিশ্রী একটা কদর্যতার ছাপ। কোনদিনই বোঝবার চেষ্টা করলো না—কি করে দিন চলে। এতবড় পরিবর্তনও একবার চোখ চেয়ে দেখলনা।

বলে ওঠে তারকবাবু—জীবনে দুশো টাকা রোজকার করেছ কখনও?

—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ, দুশোটাকা নিজে রোজকার করোনি কখনও—অথচ খরচ করতে চাও কি বলে?

—কিন্তু পূজো—যাত্রা?

—ও সব আর হবে না। নিজেরা কি করে বেঁচে থাকতে পারো খেয়ে পরে—তাই ভাবো এইবার। এদিকে তোমারও সংসার হয়েছে।

জীবন চুপ করে থাকে। এসব কথা কোনদিনই ভাবেনি।

বাবা সখকরে কবে কোন বাল্যকালে বিয়ে দিয়েছিল জানেনা, ওটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সব নিয়েই এতদিন বাবার স্কন্ধে ভর করে এলাহি কারবার চালিয়েছে।

আজ যেন হঠাৎ আবিষ্কার করে কোথায় একটা

ফাঁক—একটা বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে, তার অতল গহ্বরে যেন সবকিছু সেঁধিয়ে যাবে।

—চাকরী বাকরীর চেষ্টা দেখ। রোজকার কর এইবার।

চুপকরে কথাটা শুনে বের হয়ে আসে জীবনরত্ন।

এই কথাটা মিষ্টি লোহারও কয়েকমাস আগে তাকে বলেছে, এমনি কঠিন কথা। আজ বাবাকেও তাই বলতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

—কি হল দাদাবাবু! এদিকে পানুর দোকানে বরাত দিয়ে এলাম—পাঁচসের সোরা পাঁচ ছটাক গন্ধক; বনে কুলগাছ কাটতে পাঠিয়েছি পুড়িয়ে আংরা করুক। গেটে যা হবে একেবারে গাদ্দাগুড়ুম! আর যাত্রা—

গোকুল বাইরের পথে অপেক্ষা করছিল। এতবড় পূজোর সবই যেন তার দায়িত্ব। জীবনকে চুপকরে থাকতে দেখে বলে ওঠে।

—তা মাইরী অমন টাউরী খেয়ে গেলেন কেনে? ওদিকে ঈশ্বরে ডোমও আজ এসেছিল, ঝণ্ডির ছক পাতবেকি—পঞ্চাশটাকা আমি বলে দিইছি ছোটবাবুর হুকুম।

চুপ করে থাকে জীবন। আজ বুঝতে পেরেছে হুকুম দেবার হক আর নেই, নেই সেই হুকুম তামিল করবার লোকও।

—তা চলেন আখড়ায়।

—শরীরটা ভাল নাই গোকুল।

জীবন চলে গেল বাড়ীর দিকে। গোকুল চুপকরে দাঁড়িয়ে থাকে। সারাপাড়াটা নিঝ্‌ঝুম, কেমন আব্‌ছা সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতোপুরীর মত দেখাচ্ছে।

অনেক প্যাঁচ পয়জার কসছিল গোকুল, পূজোর ব্যাপারে যদি কিছু হাতানো যায়, একেবারে মিইয়ে গেছে জেল ফেরৎ এসে। দলবলও নেই।

কিন্তু এখানে যে কিছু হবেনা, তা বেশ বুঝতে পেরেছে।

—ধ্যাত্তোর!

একরকম চটেমটেই হতাশ হয়ে চলে গেল সে। এবার সবযেন গোলমাল লেগেছে।

চুপ করে আঁধার পথ দিয়ে বাড়ীতে ঢুকল জীবন। আগে দেউড়িতে আলো জলতো—কেরাসিনের পুরোনো আলো, এখন তাও জলেনা। দ্বারোয়ানদের খুপরিগুলো ফাঁকা পড়ে আছে।

কেমন যেন একটা ধ্বংসপুরী।

আগাছায় ঢেকে আসছে পথটা বর্ষার জলের পর, জন্মেছে কালকাসিন্দে আর কুকসিমার জঙ্গল। কি একটা সড় সড় শব্দ;

আবছা অন্ধকারে দেখা গেলনা সাপই হবে বোধ হয়, গিয়ে ওই ফাটা পাচীলের মধ্যে বোধহয় সেঁধিয়ে গেল।

...থমকে দাঁড়াল জীবন।

কোথায় বাড়ীর পিছনের বিস্তীর্ণ আগাছার জঙ্গলে ঢাকা পুকুরের ধারে বোধহয় শিয়াল ডাকছে। কেমন একটা অমঙ্গলের চিহ্ন—আতঙ্কের কালোছায়া সারা মনে এসে বাসা বাঁধে।

...বাড়ীতে ঢুকতে মণিমালা একটু অবাক হয়ে স্বামীর দিকে চাইল। এত সকাল সকাল বাড়ী ঢোকেনা বড় একটা, ঢোকে অনেক রাত্রে। মুখে গায়ে ওঠে কেমন বিশ্রী একটা টকটক গন্ধ।

আজ জীবনকে দেখে একটু অবাক হয়েই চাইল মণিমালা! জীবনও স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে।

এতক্ষণ বোধ হয় হেঁসেলের আঁচে ছিল টকটকে ফর্সা রং, কেমন লালাভ হয়ে উঠেছে। আগে বাড়ীতে রান্নাবান্না করার কাযটা ছিল অপরের হাতেই। ঝি—চাকর—ঠাকুরের অভাব ছিলনা।

আজ সবকিছুই সীমিত হয়ে এসেছে।

—রাঁধছিলে?

—হ্যাঁ। শরীর খারাপ?

...ওর কণ্ঠে ব্যাকুলতা। জীবন জবাব দিলনা। উঠে গেল উপরের ঘরে।

...চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানলার বাইরে প্রায়ান্ধকার গ্রামের বসতিতে হেথা হোথা জলছে দুএকটা আলো। তার পরেই বনের জমাট অন্ধকার।

দূর আকাশের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। কোন দিন রাতনির্জনে ওদিকে চেয়ে ওকথা ভাববার অবকাশ হয়নি।

…আলো জলছে দূর চড়াই এর মাথায়। নৈশ অন্ধকার সম্মিলিত আলোকপুঞ্জ কেমন উজ্জ্বল আভায় রাঙিয়ে তুলেছে অন্ধকার দিগন্ত। বাতাসে ভেসে আসে লেডোজার ইঞ্জিনের গজন—কোথায় ব্লাষ্টিং এর শব্দ।

…দুর্গাপুরের ব্যারেজে ষ্টিল প্ল্যান্ট বসছে। প্রবল একটা ঢেউ যেন একটা আবর্তের উপর এসে ঝাপিয়ে পড়েছে।

—কে ?

…মণিমালা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। কেমন মলিন-বিবর্ণ চেহারা, চোখের কোলে জমেছে কালির দাগ। পরণে বিবর্ণ আধময়লা শাড়ী।

…আজ যেন স্ত্রীকে নোতুন করে দেখল জীবন। একটি মূর্তিমান্ আগত দৈন্য আর হতাশা-ঘেরা ভবিষ্যতের ছবি।

—বাবা কি বলছিলেন ?

কথাটা এখানেও এসে পৌঁচেছে। কি ভেবে জবাব দেয় জীবন।—কথাটা বোধহয় সত্যি, ঠিকই বলেছেন বাবা।

…চুপ করে থাকে মণিমালা, নীরব নিস্তব্ধ ঘরে বাচ্চাটা হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। ওকে বুকে তুলে নেয় মণি-মালা। নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারে কাঁদছে ছোট্ট খুকিটা—কি যেন করুণ অসহায় আর্তনাদে।

… জীবন এই প্রথম শুনল ওর অসহায় কান্না। .কদিন থেকে জর বাছার! মণিমালা বলে ওঠে।—জর! জীবন নিজেই লজ্জা পায়, সংসারের কোন খবরই সে রাখে না।

—রমণ ডাক্তার কাল এসেছিল।

—ও! তা কি বলছে ?

—বাবাকে কি বল্ল, ওষুধ দিয়ে গেছে। বাবা মাকে বলছিলেন—ঠিক সোজা অসুখ এ নয়, সাবধানে থাকতে হবে। চিকিৎসা আর পথ্যও দরকার।

…কথাটা এতদিন ভাবেনি জীবন। ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি। এইবার যেন করছে, বাবা যেন পরিষ্কার আজ জানিয়ে দিয়েছেন পাকে-প্রকারে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা।

জীবনকে নির্দেশও দিয়েছেন তার কর্তব্যের। কি এক নোতুন সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে আজ জীবন।

—কি ভাবছো ?

—কিছু না!

মণিমালার নিরাভরণ হাতের দিকে চেয়ে থাকে। কেমন একটি স্তব্ধ হতাশার প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে শীর্ণ শিশুকে কোলে নিয়ে।

গহনাপত্র সবই গেছে প্রায় সেবার লাটের কিস্তী মেটাতে। তীরে এসে বাকি করের দায়ে তরী ডুববে—কৌত হয়ে যাবে জমিদারী - এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ পাবেনা, তাই যেমন করে হোক তারক রত্ন সেবার হালসন অবধি কিস্তি মিটিয়েছেন।

…এই টানে শ্রীহরি কাঁদতে হয়েছে পান্নদাসের কাছেও কয়েক হাজার টাকার, বাড়ীর বৌমার গহনার বেশীর ভাগও গেছে।

…মাসে মাসে শতকরা বারো টাকা হিসাবে আছে প্রাণবল্লভ দাসের সুদ—ক্রমশঃ জেনেছে জীবন।

…রাত নামে।

কেমন চঞ্চল অধৈর্য হয়ে পায়চারী করছে আলসে—কার্ণিশভাঙ্গা জীর্ণ ছাদে।

দূর আকাশে উঠেছে রোশনী, দামোদরের মানাবন—মাকড়ার শাল জঙ্গলের সীমানা আকাশ-কোল আলোয় ভরে উঠেছে। ভরে উঠেছে বাতাস ওদের যন্ত্রদানবের ক্রুদ্ধ গজনে।

বিনিদ্র রাত্রি।

কথাটা গ্রামে চাউর করেছে গোকলই। পান্নদাসের ধানকলের আশে পাশে ঘোরে, মাঝে মাঝে লোকজন যোগাড় করে দেয় কলে। তাদের দালালি করে, পান্নু হেথাহোথা গেলে তার গাড়ীতে সঙ্গে যায়।

পান্নুও ওকে সঙ্গে নিলে খানিকটা নিরাপদ বোধ করে, ধানকলের মিস্ত্রী-ফিটার-ইলেকট্রিসিয়ান-ক্যাসবাবু—আরও ক'জন কর্মচারী মিলে একটা শেডের একধারে বেড়া দিয়ে মেসএর মত করেছে, সেইখানেই চাট্টি খেতে পায় আর পড়ে থাকে ওইখানেই। কামারপাড়ায় যাবার সাহস তার নেই।

সেদিন খবরটা সেইই চাউর করে পান্নদাসের বৈঠক-খানায়। পান্নু এখন সকালে একঘণ্টা ধানকলে আসে, বাইরে থেকে লোকজন মহাজন আসে, আসে দুর্গাপুর

আড়তের আড়তদার, আর নিজেকে দাঁড়ি পাল্লা ধরতে হয় না। ওসব কাগজ কলমেই হয়।

…সকালে অনেকেই প্রাণবল্লভকে দেখবার জন্যই আসে। চায়ের আড্ডা এখানেই জমে। তারকবাবুর ওখানের জবাব দেওয়া দ্বারোয়ানদের দু একজন এইখানেই আশ্রয় পেয়েছে। গোলাব সিং—প্রভু সিং আরও কয়েকজন। শুধু মনিব বদলেছে মাত্র। তারাই চায়ের জলও বানায়।

…সতীশ ভটচায এখন পানুর মাথার মণি।

তার যাগ-যজ্ঞ বৃথা হয়নি, একা পানু কেন—পানুর মহাজন সেই রামতন রাঠী, মায় দুর্গাপুরের আরও দুচারজন তেজীমন্দার কারবারীকেও সে হাত করেছে—কবচ দিয়ে সৌভাগ্যের শিখরপানে ঠেলা মেরেছে। দিন বদলেছে সতীশ ভটচাযের।

…গোকুল সেদিন কথাটা পাড়ে—এতকালের পূজো পড়ে যাবেক, জাগ্রত ঠাকুর।

—মানে ?

—ওই বড় কালীপূজো ?

বড়বাবুদের পূজো সেই থেকেই ওই নামটা হয়েছে। বড় কালীপূজো।

—তাই নাকি ? পানু দাস কথাটা শুনল মাত্র।

সতীশ ভটচায বলে ওঠে—সত্যিই গ্রামের এতবড় একটা পূজো পড়ে যাবে।

গোকুলও মাথা নাড়ে—সত্যি।

…ডেঙ্গো বড়ঠাকুর বুড়ো হয়ে গেছে। বাইরে আর কোথাও রসুইদারী কায করতে পারে না, শরীর ভেঙ্গে গেছে। আর সেদিনও নেই। সেই প্রাচুর্যের দিন। তখন খেয়েছে বিলিয়েছে ঘি-সন্দেশ কলকাতার বাজারে। আজ সেখানে ঠাঁই নিয়েছে দালডা, খাবারও নেই।

বয়সের ভারে জীর্ণ দেহ। সেবার কলকাতায় কোন কাজের বাড়ীতে ভারি কড়াই নামাতে গিয়ে কেমন করে বুকের একটা শির ছিঁড়ে যায়, সেই থেকে সুরু হয়েছে কাশি।

…অমন শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

পানুর ধান কলের মেসে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

কালীপূজো আর মাংস পোলাও এর কথা ভেবে সায় দেয় সেও—তাই দেখেন বাবু, মায়ের পূজো। তাছাড়া সদর থেকে দুচারজন বন্ধু-বান্ধবও আসবে, দুর্গাপুরের সাহেবরাও।

পানু দাস একবার ডেঙ্গে বড়ঠাকুরের দিকে চাইল। কথাটা কেমন মনে ধরেছে। তাছাড়া ধান কল প্রতিষ্ঠার সময় সতীশ ভটচাযের কথাতেই শ্মশান-কালীর পূজো করেছিল, প্রসাদ লাভ করেছে বৈকি।

তাছাড়া দুর্গাপুরে ও কিছু কাযকর্ম অর্ডার পত্র পেতে চায়; শুনছে এদিকে ইলেকট্রিক লাইন বসবে—কোন রকমে কলবাড়ীতে কনেকশন নিতে পারলে অর্ধেক খরচ কমে যাবে; অন্যান্য কিছু কারখানাও বানাতে পারবে।

সতীশ ভটচায, গোকুল, ওই ভুলু ভটচায ওরফে ডেঙ্গে বড়ঠাকুর—সকলেই যেন পানুকে নীরব অনুরোধ জানাচ্ছে—আরও অনেকে।

পানু জবাব দিল না।

আজকাল মতামত দিতে সে চিন্তা করে, চিন্তা করে কথা বলে।

চুপ করে বসে আছে কদম বৌ।

আজ সে খানিকটা থমকে দাঁড়িয়েছে—যেন জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে আজ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। মেজ বৌএর ছেলেটা কঁকিয়ে কাঁদছে।

…অন্য সময় তুলেনিত, বকাবকি করতো বৌকে।

—হ্যাঁলো, বলি এত কিসের কায যে ছেলেকে সময়ে মাই দিবিনা ?

আজ কেমন বিরক্তি এসে গেছে তার !

চুপ করে সরে গেল, যেন দেখেও দেখে না।

বৈকাল হয়ে আসছে, বাঁশ বনের মাথার উপর নীল আকাশে সাদা মেঘের পাশে ভেসে চলেছে একটা কালো ধোঁয়ার ছোট্ট মেঘএর মত কুণ্ডলী, পানুদাসের ধান কলের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে নিধুম নীল আকাশে। কেমন কালো একটা রেখা সাদা মেঘের পাশাপাশি চলেছে।

শালের হাতুড়ি পেটার শব্দ উঠছে ঠং ঠাং, নীরব আকাশ ওই শব্দ আর ধোয়ার স্পর্শে কেমন বদলে গেছে, নোতুন কারা এসেছে—কি এক অন্য জগতের ভাবনা নিয়ে।

—বলি কথা কানে যেছে না ?

ভুবন বাড়ীতে এসে ডাকাডাকি করছে, সারাদিন তেতে পুড়ে এসেছে শালে ! চান-ভাত করতে বেলা গড়িয়ে যায়।

কদমের মনে তখন অন্য জগতের সুর। ওই নীল আকাশে ভেসে যাওয়া ধোঁয়ার ক্ষীণ আভাস তার মনে অজানতেই কোন অন্য সুর এনেছে। তার হারিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলোর সুর। ছেলেবেলার সেই বঁইচি শেয়াকুল-বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অভিযান, তেমনি ঘর-পালানো কিশোরীর চোখে ট্রেণের ধোঁয়া কেমন আজ সেই দিনের কথা স্মরণ করায়।

ভুবনের ডাকে বিরক্ত হয়ে চাইল কদম।

—কেনে ঘরে আর লোক নাই, যে শরীর মন বেজুত হলেও কায করতে হবেক ?

—এত কি তুর বেজুত, বেশ তো আছিস ?

—চটে ওঠে কদম ভুবনের কথায়। বিচিত্র একটা মানুষ, কোন দিনই তার দিকে চেয়েও দেখল না, মানুষ নয়—আগুনের তাপে থেকে আর শালে হাতুড়ি পিটে ওর মানুষের সব ধর্মচিহ্ন মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। আজ রাগও হয়—কেমন অসহায় অভিমান আর রাগ।

—কোনদিন খপর নিয়েছো ?

সারাদিন খাটাখাটুনীর পর এমনিতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে ছিল। তার উপর ওই সব বাঁকা কথা শুনে দপ্ করে জ্বলে ওঠে ভুবন। খিদে আর তেষ্টাতেও জ্বলে ওঠে মন। জবাব দেয়—তুর খপর নেবার জন্য কত লোক রইছে ?

—চমকে ওঠে কদম, এতদিনের চাপাপড়া সেই অতীতের কলঙ্কময় কাহিনীটা যে ও ভোলেনি, তা কদম বুঝতে পারে। ঘৃণায় রাগে জ্বলে ওঠে কদম—কি বললে ?

—ঠিকই বলেছি। তাই যখন তখন যা তা কথা বলিস।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কদম ওর দিকে। আজ সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে তার, এ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা, এত পরিশ্রম করে এই সংসারকে দাঁড় করানো সব কিছু।

—সহ্য করতে না পারো দূর করে দিলেই তো পারো।

ভুবন গর্জে ওঠে—তাই দোব এইবার। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দোব।

বুড়ো অতুল বাড়ী ঢুকছিল, হঠাৎ ভুবনকে অগ্নিমূর্তি ধরে এগিয়ে যেতে দেখে সেইখান থেকেই চীৎকার করে ওঠে—

ভুবনা ?

…ভুবন বাপের ডাকে দাঁড়াল। বুড়ো কথাগুলো কিছু শুনে ছিল, কিন্তু ভুবনের ওই হেঁকে তেড়ে যাওয়াটা সমর্থন করতে পারে না। বকতে থাকে—এত বড় বাড় তোর, ঘরের লক্ষ্মীকে গলা ধাক্কা দিতে যাস।

—ঘরের লক্ষ্মী !

ভুবন আজ যেন প্রকাশ্যেই ফেটে পড়বে।

বাবাকে দেখে থামল, ওদিকে মেজবৌ ছোটবৌও এসে দাঁড়িয়েছে। চুপ করে গেছে সবাই।

কদম উঠে চলে গেল ঘরের ভিতর।

ভুবনও খেল না -ভাত রইল পড়ে, শালের দিকে চলে গেল।

—খেয়ে যা !

—ডাক পাড়ে বুড়ো অতুল। ভুবন যাবার মুখে জবাব দেয়।—ও ছাই আর খাবো না।

কেমন একটা অন্তহীন স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে —উঠানে। একটা কাক শুধু ডাকছে কর্কশ কঠিন সুরে।

—বৌমা !

ভুবন ডাকছে কদমকে।

সাড়া দিতে পারে না কদম, কি এক অসহায় বেদনা আর ব্যর্থতায় তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু নামে, গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে কি।

…কাঁদছে কদম—ব্যর্থতায় আর অপমানের তীব্র জ্বালায়।

ভুবন সরে গেল বাইরে।

…নিস্তব্ধ নীরব দিগন্তে—ঘণ্টা বাজে।

—বৈকাল পাঁচটা।

প্রাণবল্লভই বড়বাবুর দেউড়ির পরিত্যক্ত কাযটা তুলে নিয়েছে—ওই মহাকালের অখণ্ডকে কঠিন ঘণ্টার আঘাতে চিহ্নিত করেছে তার প্রহরগুলোকে।

সন্ধ্যা নামে গ্রামপ্রান্তে। কেমন করুণ বিষণ্ণ সুরে বাজছে ওই ঘণ্টাটা। কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর শব্দ।

[ক্রমশঃ

সঞ্জীবচন্দ্র ও বাংলা ছোট গল্প

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

"সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে, এক্ষণে আর উপায় নাই ; অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল, 'হে ঠাকুর, আমার দীপকে রক্ষা কর।"

সাত বছর বয়সের বালিকা দামিনী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দামিনী' নামে ছোট গল্পের নায়িকা। ঐ ক্ষুদ্র দীপটির মতই বালিকা দামিনী সংসার সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল, ঠাকুর তাকে রক্ষা করতে পারেন নি, তাই নিয়েই গল্প।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—তার মধ্যে ছোট গল্প একটি। এই পরীক্ষার প্রথম ফল 'ইন্দিরা', দ্বিতীয় 'যুগলাঙ্গুরীয়'। ইন্দিরা প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ (১২৭৯) চৈত্র সংখ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল পয়তাল্লিশ। 'যুগলাঙ্গুরীয়' একমাস পরে (বৈশাখ, ১২৮০) প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছত্রিশ। আকৃতিতে ছোট হলেও প্রকৃতিতে এ দুটির কোনটিই ছোট গল্প ছিল না। হয়তো সেকথা বুঝতে পেরেই বঙ্কিমচন্দ্র এ'দুটিকে পরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে ছোট উপন্যাসের আকৃতি দেন। 'রাধারাণী' গল্পটিও এই পর্য্যায়ভুক্ত। এটির কাহিনীও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উপন্যাসধর্মী। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এটিকেও পরে বর্দ্ধিত করে 'ক্ষুদ্র উপন্যাসের' অন্তর্ভুক্ত করেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে অজস্র দানে ভূষিত করেছে, কিন্তু বাংলা ছোট গল্পের জন্ম বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে হয়নি।

বাংলা ছোট গল্পকে সার্থক রূপে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে যে এত পরীক্ষা হ'ল, সে সময়ে কোন সাহিত্যিক কি ছোট গল্প লেখার চেষ্টা করেন নি ? এর জবাব খুঁজতে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে তিনটি গল্পের—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (১২৮০) এবং সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'। প্রথমজন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ, দ্বিতীয়জন অগ্রজ। এই তিনটি গল্পেরই বিষয়বস্তু অদৃষ্টের অমোঘ ও নিষ্ঠুর পরিহাস। সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (বৈশাখ, ১২৮১)। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যাতেই 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' এই দুটি গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পদুটি শুধু আকারেই ছোট নয়, এরা প্রকৃতিতেও ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এই দুটি গল্পের, বিশেষতঃ 'দামিনী'র একটি বিশেষ স্থান আছে। 'ইন্দিরা' 'যুগলাঙ্গুরীয়' বা 'রাধারাণী'র সঙ্গে তুলনা করলে, এদের পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়বে। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি গল্পের উপাদান ও ঘটনা সমাবেশ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এগুলি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস, আরও বিস্তৃত করে লিখলে তবেই এদের প্রতি সুবিচার করা হবে। এরা যেন জাপানী প্রথায় ক্ষুদ্রায়িত 'বামন বটগাছ', আকারে ক্ষুদ্র হলেও পাঠকের মনে বিশালতার অনুভূতিই এনে দেয়। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের গল্পদুটি, বিশেষ করে 'দামিনী' এ দোষ থেকে মুক্ত। ছোটগল্পে যে অখণ্ডতার অনুভূতি পাঠক আশা করেন তা 'দামিনী'তে সম্পূর্ণভাবেই উপস্থিত। অনাবশ্যক ঘটনার বাহুল্য কোথাও নেই, একটি ক্ষুদ্র বালিকার ছোট্ট জীবন কথা স্বল্পতম আয়োজনে লেখক প্রকাশ করেছেন ; গভীর দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে এক রসঘন চরম পরিণতির দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই বাহুল্যবর্জ্জিত নিরাভরণ রূপই 'দামিনী' গল্পটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সেই অলঙ্কার বাহুল্যের যুগে সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা শুধু অভিনব নয়, অভাবনীয়।

সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন তাঁর অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী 'পালামৌ' রচনার জন্য। পালামৌ' প্রবন্ধে লিখিত তাঁর অনেক কথা বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ-বাক্যের স্থানলাভ করেছে। মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করে, প্রকৃতির অপরূপ শোভা সকলেরই মন হরণ করে, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্য্যদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব—সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কোন নিয়ম মেনেই তা চলে না, তাই তিনি ছাগশিশুতে মানবশিশুর রূপ দেখে তাকে বুকে চেপে ধরতে পারেন। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গল্পটি বিশেষত্ববর্জিত একটি মিলনান্ত কাহিনী হলেও সঞ্জীবচন্দ্রের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী এবং সংবেদনশীল অন্তরের পরিচয় তাঁর এই প্রথম রচনাটিতেই পরিস্ফুট হয়েছে। মিথ্যা খুনের মামলায় রামেশ্বর সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে নির্বাসিত; শিশুসন্তান আনন্দদুলালের কথা তার সর্বদা মনে পড়ে। এই প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন:

"এখন দিবারাত্র এই নির্বাসিতের বাসদ্বীপে আনন্দদুলালের অকৃত্রিম, সরল, হাসিভরা মুখ মনে পড়িতে লাগিল। যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকে, রামেশ্বর ভাবেন আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে। যখন দূরে অস্পষ্ট-লক্ষ্য একটি তরঙ্গ উঁচু হইয়া নাচে, রামেশ্বর মনে করেন যে আনন্দদুলাল নাচিতেছে।"

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন:

'সঞ্জীববাবুর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কেবলমাত্র তত্ত্ব নয়, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার রীতি বা প্রণালীও বটে। এই জন্যই তিনি কোল—কামিনীদের দেহে 'কোলাহল' দেখিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই 'যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকিত' তখন তাঁহার রামেশ্বর ভাবিত, তাহার আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে'। সৌন্দর্য্যের এই সুবিস্তৃত সুপ্রসারিত জাতি-ভেদশূন্য সর্বসমন্বয়কারী ভাব বড়ই মধুর, বড়ই উদার।'

সঞ্জীবচন্দ্রের দ্বিতীয় গল্প 'দামিনীতে' তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কাহিনীর সুরুতেই দামিনীর ভাসানো ক্ষুদ্র প্রদীপটি এক মুহূর্তে আমাদের মনকে একটি অসহায় বালিকার প্রতি করুণায় কোমল করে তোলে। দামিনী বাড়ী ফিরে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলিদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল।' এমন করে ছোট্ট দামিনীর ক্ষুদ্রত্ব চোখের সামনে তুলে ধরা সঞ্জীবচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। এই সব চিত্রকল্প রচনায় সঞ্জীবচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। পালামৌ প্রবন্ধে কুলিদের একটি ছোট্ট শিশুকে দেখেছি যে বড়দের দেখাদেখি পয়সার জন্য হাত পাতে, কিন্তু হাতে পয়সা পাওয়া মাত্র ফেলে দিয়ে আবার হাত পাতে। হাত পাতাটাই তার কাছে আসল, পয়সাটা কিছু নয়। একটি ভোজনতৃপ্ত বাঘকে দেখেছি যে দর্পণের মত নিজের থাবাটা মুখের সামনে ধরে রেখেছে। গভীর রাত্রে দামিনী স্বপ্ন দেখছে, সেও তার প্রদীপটির মত ভেসে চলেছে, নদীর তরঙ্গের ওপর একটি বিড়াল গম্ভীরমুখে বসে আছে, ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নদর্শন সে যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তরঙ্গের চূড়ায় দামিনীর বিড়াল দর্শন!

দামিনীর তিনবছর বয়সে তার মা স্বামীশোকে পাগল হয়ে কোথায় চলে গেছেন, তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়ে, "যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখনও দেখে নাই, তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত।"

প্রতিবেশীপুত্র রমেশের সঙ্গে দামিনীর বিয়ে হ'ল। সে যুগের সাহিত্যে বহুলপ্রচলিত এই বাল্যপ্রণয়, কিন্তু 'দামিনী'তে তার সুন্দর সংযত প্রকাশ। দামিনী ও রমেশের সুখের সংসার, কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে এ সুখ স্থায়ী হ'ল না। দামিনীর অতুলনীয় রূপ একদিন ফৌজদার-পুত্রের চোখে পড়ে। রমেশের অনুপস্থিতির সুযোগে সে দামিনীকে অপহরণ করে। দামিনীর পাগলিনী মা গ্রামের প্রান্তে এক পোড়োবাড়ীতে ভৈরবী বেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বনের মধ্য দিয়ে দামিনীকে নিয়ে যাবার সময় তিনি ত্রিশূলের আঘাতে নারীহরণ-কারীকে হত্যা করলেন।

দামিনীর অপহরণের পরদিন প্রতিবেশীরা একে একে এসে তার শ্বশুর অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে জুটেছে।

আগের দিন রাত্রে অসহায় কুলবধূকে রক্ষা করতে কেউ এক পা বেরোয়নি। গণেশচন্দ্র নামে এক প্রতিবেশী বললেন—তিনিই দামিনীকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু— এই কিন্তুর পরে সঞ্জীবচন্দ্র সে যুগের ভীরু স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব, বাক্‌পটু বাঙালী চরিত্রের যে চিত্র এঁকেছেন তার তুলনা বিরল। তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে লঘু পরিহাসের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই বর্ণনাটিতে।

গণেশচন্দ্র বলছেন, "শয়ন করিলে সহজে উঠা যায় না, তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠিলাম, ভাল করে কাপড় পরিলাম, সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্যশম্বুক বাহির করিলাম। একটীপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলাম। এসকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি, আমি ঘর্মাক্ত কলেবর। এ সকল কার্য্যে ঘর্ম ভাল নহে। কি জানি যবনেরা যদি পিছনে পালায়, এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনীর দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম। সকল বিষয় এককালে স্মরণ হয় না, গাত্রমার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, 'পুতির তক্তা' [১] আন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'আমার কর্ম নহে।' শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটি ইঁট আনিয়া দিল, আমি সেই ইঁট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি দুর্বৃত্তেরা ফিরিয়া যাইতেছে, আমি অমনি সেই ইঁট ছুড়িলাম।

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হল, কিন্তু এই অপূর্ব বর্ণনার অঙ্গচ্ছেদ করা অরসিকের কর্ম।

ফৌজদার-পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে গণেশচন্দ্র আহ্লাদে নেচে উঠলেন, আস্ফালন করে বললেন, নিশ্চয় তাঁর দ্বারা নিক্ষিপ্ত ইঁটেই ফৌজদারপুত্র প্রাণ হারিয়েছে, কারণ তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ। অন্য একজন প্রতিবেশী ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ফৌজদার পুত্রের হত্যাকারীর শূলে যাওয়াই সম্ভব। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের বীরবপু কম্পান্বিত হতে লাগলো, "আমি উপহাস করিতেছিলাম, আমি তা বলি নাই, আমি কি বলিতেছি, কিছুই নহে, আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখন সম্ভব নহে"—ইত্যাদি অসংলগ্ন বাক্য উচ্চারণ করতে করতে সেই বীর বাঙালী সন্তান স্থান ত্যাগ করলেন।

ফৌজদার-পুত্রের মৃত্যুতে মুক্ত হ'য়ে দামিনী ফিরে এসেছে। যবনস্পৃষ্টা পুত্রবধূকে গ্রহণ করা উচিত কিনা, অদিতি ভট্টাচার্য্য প্রতিবেশীদের মত জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন, "মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত—ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই স্থির করুন।" "অদিতি বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।" 'অদ্বিতীয় পণ্ডিতের' উপযুক্ত কাজই বটে! গৃহিণীর পরামর্শে দামিনী শ্বশুরগৃহ থেকে বিতাড়িত হ'ল। কারণ শাস্ত্রবিশারদ এই বিচার করলেন— "আত্মরক্ষা মানুষের প্রধান ধর্ম্ম, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।" অতএব আত্মরক্ষার্থে কুলবধূকে ত্যাগ করলেই ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ—' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের কী জ্বলন্ত উদাহরণ!

নিরাশ্রয় অসহায় দামিনী আশ্রয় পেল সেই পোড়ো বাড়ীতে, তার মায়ের কোলে, সেখানেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। সন্তানকে কোলে পেয়ে বুঝি পাগলিনীর জ্ঞান ফিরে এসেছিল, আবার সে উন্মাদ হয়ে গেল। রমেশ দামিনীকে খুঁজতে খুঁজতে সেই পোড়ো বাড়ীতে এসে পড়ে, তাকেই কন্যার মৃত্যুর কারণ মনে করে উন্মাদিনী তাকে গলা টিপে হত্যা করলো। কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

অদৃষ্টের পরিহাস, রাজশক্তির অত্যাচার আর সমাজের অবিচারে দুটি নির্দোষ জীবনের যে করুণ পরিণতি লেখক এই ছোট গল্পটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে তাঁর কাহিনী বিন্যাসের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও দামিনী সর্বাঙ্গসুন্দর ছোটগল্প নয়। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার দোষ এবং গুণ সমভাবেই এই গল্পটিতে ফুটে উঠেছে, প্রথম দিকের সযত্ন বিন্যাস, শেষের দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাহিনীর গতি বিলম্বিত হয়ে এক অনিবার্য্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ তাতে সমাপ্তির রেখা টেনে দেওয়া হ'ল। শুধু রমেশকে নয়, গল্পটিকেও যেন গলা টিপে হত্যা করা হ'ল। এই আকস্মিক সমাপ্তি লেখকের ধৈর্য্যচ্যুতিই সূচিত করে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মণিমাণিক্যের

১. পুতির তক্তা=পুথির তক্তা; হাতে লেখা প্রাচীন পুথি রক্ষা করবার জন্য তার দুপাশে দুটি তক্তা লাগানো থাকে, এগুলি খুব শক্ত আর ভারি হয়।

অভাব নেই, কিন্তু তা দিয়ে রত্নমালা গাঁথা আর তাঁর হয়ে উঠলো না। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন, "তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণ সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন, তিনি প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও তা পারেন নাই। তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ছোটগল্প রচনার এখানেই সমাপ্তি। এরপর তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও এই 'গৃহিণীপনা'র অভাব, সেখানেও ঐশ্বর্য্য অবহেলিত, রচনার শৈথিল্যে প্রতিভা আচ্ছন্ন। এইজন্যই বোধহয় তাঁর রচনায় পাগলের এত প্রাদুর্ভাব। তিনি পাগল-পাগলী আঁকতে খুব ভালবাসতেন, কারণ তারা অনায়াসেই ঐশ্বর্য্যকে মাটির ঢেলার মত ছুঁড়ে ফেলতে পারে। গল্প বলবার শক্তি সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল, তিনি যদি ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ছোটগল্পের ধারাটিকেই অনুসরণ করতেন তা হ'লে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের আগেই হয়তো আমরা কয়েকটি সার্থক ছোটগল্প পেতাম।

সঞ্জীবচন্দ্র যে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত মর্য্যাদা পাননি একথা বঙ্কিমচন্দ্রও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করেছেন ; ভবিষ্যতের আশায় সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে লিখেছেন।

"আমি বা চন্দ্রনাথবাবু এক এক কলম লিখিয়া এক্ষণে সে স্থান দিতে পারি এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্ম্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান সহায় আছে। 'কাল' আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্যই ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর, তাই কাল সাপেক্ষ কার্য্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

কালের অনুচর আমরাও ; বঙ্কিমচন্দ্রের অসমাপ্ত কার্য্য আমাদেরই সম্পূর্ণ করা উচিত। আজকাল বাংলা সাহিত্যের বহু বিস্মৃত প্রতিভাকেও উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করা আমাদের কর্তব্য। বাংলা ছোটগল্পের সূচনাকারী এবং বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান্ শিল্পী হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে সঞ্জীবচন্দ্রের স্থানটি নিজস্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই সাহিত্যের সেবক হিসাবে আমাদের একটি কর্তব্য পালন করা হবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে আত্মচেতনা ও গ্লানিবোধ

সন্তোষকুমার অধিকারী

বাংলাসাহিত্যের "চারণ কবি" বলেই যিনি সমধিক বিখ্যাত সেই দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার আহ্বানে তাঁর হৃদয় উদ্দীপ্ত, অন্যদিকে আত্মধিক্কারে তিনি মুখর। এই আত্মধিক্কারের কারণ এই—দেশ ও দেশবাসীর ভীরুতা, কাপুরুষতা, লোভ ও সঙ্কীর্ণতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দর মত এইসব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠে এক শাশ্বত ভারতের ছবি আঁকবার চেষ্টা করা তাঁর উচিত ছিল কিনা—সে অন্য কথা। কিন্তু এ' কথা না তোলাই সঙ্গত যে দ্বিজেন্দ্রলাল বা পরবর্তী যুগে শরৎচন্দ্র যদি হিন্দু সমাজের ও বাঙ্গালী জীবনের অজস্র ক্ষুদ্রতা ও নীচতার প্রতি জনচিত্তকে আকৃষ্ট না করতেন, তবে হয়ত সমাজ ও জাতীয়-মানসের অগ্রগতির পথ দীর্ঘতর ও দুরূহতর হ'য়ে উঠ্‌তে পারতো।

দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান দিয়েই তাঁর সাহিত্য-সাধনা সুরু করেন। ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এই গান ও কবিতাগুলি রচিত হয়। আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিলাত থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে এসে সরকারী চাকুরীতে ঢুকলেন। সে সময় সমাজ-জীবনে এক প্রচণ্ড বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে। গোঁড়া ও

সঙ্কীর্ণচিত্ত বর্ণহিন্দুদের হাতে ধর্ম ও মানবতা চরম লাঞ্ছনার পথে চলতে চলতে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। কারণ একদিকে কেশবচন্দ্র ও অপরদিকে বিবেকানন্দের অভ্যুত্থান এক অভাবনীয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। ব্রিটিশ শিক্ষা ও শাসনকৌলিন্য তখনও জনচিত্তকে অভিভূত ক'রে রাখলেও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বাদেশিকতার যে ঢেউ প্রবাহিত হ'য়েছে তার শক্তি জনমানসকে প্রায় উদ্বেল ক'রে তুলেছে। অথচ সাধারণ জনসমাজ তখনও অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, স্বার্থান্বেষী ও পরপদলেহী। বলা বাহুল্য, সদ্য বিদেশাগত দ্বিজেন্দ্রলাল এই ভীরু, আত্মপর ও পরানুকরণে রত বাঙ্গালী সমাজকে ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি এদের হাতে নিগৃহীত হ'য়েছিলেন। সেই ক্ষোভ ও জালা প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো তাঁর হাসির কবিতার মধ্য দিয়ে।

বলাবাহুল্য কবির এই ব্যঙ্গ ও ধিক্কার কখনই তীব্র ও দীর্ঘজীবী হতে পারতোনা এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা ক্লাসিক্যাল মর্য্যাদা পেতনা, যদিনা কবির দেশপ্রেম গভীর হত। কবির জাতীয়তার অভিমানও অত্যন্ত তীব্র ছিল। তাই বিদেশ থেকে শিক্ষিত হ'য়ে এসেও বিদেশী অনুকরণকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এই পরানুকরণপ্রবৃত্তি কোন জাতিকে কখনও মর্য্যাদা দেয়নি। কবি ময়ূরপুচ্ছপরিহিত দাঁড়কাকের মত তাঁর দেশবাসীকে যে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ব্যঙ্গে মণ্ডিত করেছেন তার অভিব্যক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট।

আমরা বিলাত ফের্তা ক ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।...

* * *

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট্ কোট্ প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর ;

এই বক্তৃতাসর্বস্ব জাতির অপদার্থতাকে তিনি বিদ্রূপ করে গাইছেন।

আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি
কিন্তু কাজের বেলায় সব ঢুঁ ঢুঁ।

জাতির ক্লৈব্যভাব ও অন্তঃসারশূন্য আচার তাঁকে এত ব্যথিত করেছিল, কারণ তাঁর আদর্শের সঙ্গে যে এ'র কোন মিলই নেই! দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ রাণা প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, দিলীর খাঁ—যারা স্বাধীনতার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে, আদর্শের জন্য আত্মবলি দিতে পারে। কিন্তু এ, কোন্ বাঙ্গালী আজ ইতিহাস রচনা করছে?

সাহেব—তাড়াহত, থত মত অঞ্চলস্থ স্থির,
ভূত ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত স্থীর।

কবির এই বিদ্রূপ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে—'নন্দলাল" কবিতায়। এ যেন জাতীয় চরিত্রকে দর্পণে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাচ্ছেন। নির্মম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। হঠাৎ মনে হ'তে পারে এই সমাজের মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নেই। "খুসরোজ" কবিতায়

"জয় জয়, ব্রিটিশ সিংহ ব্রিটিশ সিংহ" বলে জোরে
ডঙ্কা বাজাই।
পাহারা ফিরছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই!
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো প্রাণের দায়ে
কি জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায়!
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

শুধু কি এই ভীরু নির্বীর্য্যতা? সমগ্র জাতির কি নিদারুণ ধর্মান্ধতা? অথচ—

সত্যকার ধর্মবোধ কোথায়? আচার ও অনুষ্ঠান-সর্বস্ব জাতির চিত্তে মানবতার বৃহত্তর অনুভূতি কই? জাতীয়তার বোধ কই? শুধু

আমি জীবনের সার করেছি আমার
ফোঁটা মালা আর টিকি গো।

অথচ এই অসার জাতি যে আবার উজ্জীবিত হবে তারই বা সম্ভাবনা কোথায়? এ জাতি শুধু মুখসর্বস্ব ও বক্তৃতা-বিলাসী—

...তন্মধ্যে মুখসর্বস্ব বঙালী হি পুরোহিত!
রেজলুসেন নির্মাণে—বক্তৃতায় মহারথী॥

কিন্তু এ লেখাগুলি বঙ্গভঙ্গের আগের যুগে রচিত। ১৯০৫-৬ সাল সারা বাংলা দেশে একটি নতুন চেতনার সঞ্চার ক'রে গেল। তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসক লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে ভাগ করবার চেষ্টা করায় সহসা সমস্ত দেশ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লো। সাহিত্য রাজনীতি সব দিকেই এ চেতনা দুর্বার হ'য়ে উঠ্‌লো। এই নতুন জাতীয়তার চেতনা ও পরদাসত্বের ক্ষোভ দ্বিজেন্দ্রলালকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করলো, তাই পরবর্তী যুগের রচনায় শুধু ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ নয় কঠিন আত্মধিক্কারের গ্লানি জেগে উঠ্‌লো। ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক কবির জাগরণ ঘট্‌লো।

পাঁচশো বছর এমনি করে স'য়ে আসছি সমুদায়ঃ
এইটি কি আর সইবেনাক—দুঘা বেশি জুতোর ঘায়?

* * *

পড়ে আছি চরণতলে নাকটি গুঁজে অনেক কাল।
সইবে সবই, নইত মানুষ, আমরা সবাই ভেড়ার পাল।
যে যা করিস দেখিস চাচা, মোদের পৈতৃক
প্রাণটা বাঁচা
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিসরে দুটো দুবেলায়।

একি নিছক ব্যঙ্গ কবিতা? শুধু কি ধিক্কার? অথবা আত্মগ্লানির অগ্নিজ্বালা ফেটে পড়ছে এ'র প্রতি ছত্রে। এ কবিতা পড়তে গিয়ে স্বতঃই কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে যায়—

দাস্যসুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুঠি' ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হ'য়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি ঘর।
"দুরন্ত আশা"

বস্তুতঃ আত্মধিক্কার রবীন্দ্রনাথেও প্রচণ্ডভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বিশ্বকবি এই অনুভূতিকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কল্পনার গতিবেগ ও দুর্নিবার আশার উজ্জলতায় ভেসে গিয়েছে জাতির অচিরজীবী কাপুরুষতার বেদনা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততার গ্লানি। এই আত্মধিক্কারের কশাঘাত দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় আরও প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো যখন তিনি নাটক রচনায় হাত দিলেন। মোগলশাসিত ভারতবর্ষের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি মনের অবরুদ্ধ যন্ত্রণাকে উন্মুক্ত করে দিলেন। রাণা প্রতাপ সিংহ যখন মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন, তখন বিকানীর, মারবার, অম্বর প্রভৃতি রাজপুত রাজাদের কাপুরুষতাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মনের এই তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। পৃথ্বীরাজ আকবরের সভাকবি। আকবরের গুণগান করাই তাঁর কাজ। এই ধর্মহীন ভীরু স্বামীর প্রতি পৃথ্বীরাজপত্নী যোশীর ভর্ৎসনা বাক্যগুলি স্মরণ ক'রে রাখবার মত। দুর্গাদাস নাটকে দুর্গাদাস শেষ পর্য্যন্ত আক্ষেপ করছেন "পারলাম না এ জাতকে টেনে তুলতে।"

তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারে হতাশ হননি। রবীন্দ্রনাথের দুরন্ত প্রত্যয় ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি তাঁর ছিল না, তবু শক্তির চেতনায় বারবার জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি।

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা,
কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"!

সর্বশেষে তাঁর সেই আহ্বান—

"কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ।"

আত্মধিক্কারের মধ্য দিয়েই কবি জাতিকে দেশাত্মবোধ ও পৌরুষের ধর্মে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঊনত্রিশ
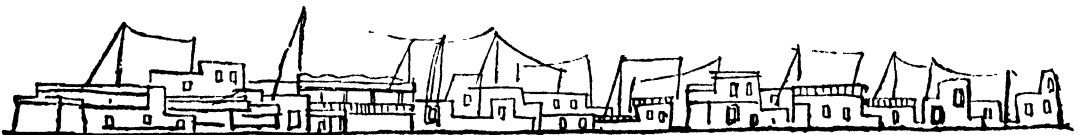
ধ্রুব ওদের মোটরে নিয়ে বেরুল বেশ ভারিক্কি চালে। শিবালা মন্দিরটি কাছে, হাতে সময় ছিল প্রায় কুড়ি মিনিট, তাই সে সারথিকে বলল একটু ঘুরে যেতে। মোটরে গল্প করতে ধ্রুবর খুব ভালো লাগত। কথাবার্তার সুবিধার জন্যে সাবিত্রী বসল মাঝখানে—এপাশে ধ্রুব, ওপাশে প্রহ্লাদ।

মোটর বড় রাস্তায় পড়তেই ধ্রুব বলল রহস্যঘন হাসি হেসে: "আচ্ছা প্রহ্লাদদা, বলুন তো আজ আপনার সঙ্গে কে সঙ্গত করবে?"

প্রহ্লাদ: কেন? মিসিরজি নেই?

ধ্রুব: না, তিনি পরশু সকালে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছেন, এখন হাঁসপাতালে শিবজির ধ্যান করছেন।

সাবিত্রী (হেসে) বলো কি?

ধ্রুব: আর বলি কি দিদি! এখানকার শৈবদের তো জানেন না। পরশু ছিল অঘোর চতুর্দ্দশী। পুরুতরা বলে ভুঙ্কার দিয়ে: "রাত্রৌ শ্রীশিবপূজা, অত্রোপবাসে শিবলোকপ্রাপ্তিঃ।" আর যাবে কোথায়? শিবলোকে পাড়ি দিতে মিসিরজিকে ঘন ঘন গাঁজায় দম দিতে হ'ল শিবঠাকুরী চালে—ভুলে গিয়ে যে শিবঠাকুর যা পারেন তা জীবতবল্‌চি পারে না।

প্রহ্লাদ (হাসি চেপে): সে কি? শেষটায় গাঁজা!

ধ্রুব: তাই তো শুনেছি, তবে হলপ ক'রে বলা মুস্কিল—কারণ চণ্ডুও হ'তে পারে, পঞ্চরংও। মোট কথা, তিনি কাজের বার। তাই জিজ্ঞাসা করছি—বলুন তো, তাঁর জায়গায় কিনি আসবেন আজ সংকট-তারণ হয়ে?

প্রহ্লাদ (হেসে): এ আর শক্ত কি? হিমালয়ানন্দ হংসাবতংস।

ধ্রুব (হাসি চেপে):—প্রায়—অর্থাৎ গাম্ভীর্যে। বুঝেছেন এই বার?

সাবিত্রী: কে? গম্ভীরানন্দজি?

ধ্রুব: অবিকল! আমাদের ইংরাজির মাষ্টারের ভাষায়: Bulls eye!

প্রহ্লাদ (আশ্চর্য): সে কি? গম্ভীরানন্দজি তবলা বাজাতে শিখেছেন না কি গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরে?

ধ্রুব: তবলা কী বলছেন? তবলা তরঙ্গের ডামাডোল। বলুন তো? এ কি ভাবা যায় যে, ঐ কালো পাথরের নিচে ঝর্ণা চাপা ছিল? নৈলে কি আর মন্ত্র নেওয়ার পরদিনই (হাততালি দিয়ে হেসে সুর ক'রে):

দাড়ি জটা সিন্দুল
নির্মূ'ল নির্মূ'ল

সাবিত্রী (মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চেপে): তুমি ভাই কম ছেলে নও। সন্নিসিকে নিয়ে ঠাট্টা?

ধ্রুব: আমার দোষ কি দিদি? কাল বন্দনাদি নিজে এই গানটি বেঁধেছেন। এটা হ'ল ঠুংরি, অন্তরাও আছে, শুনবেন?

(ফের গুণ গুণ ক'রে)

শাদা দাঁতের বিদ্যুৎ হাসিখানি
কালো দাড়ির ঘন মেঘের মাঝে
মাঠে মারা যাবে না আর—জানি,
গুরুদেবের মন্ত্রে জাদু আছে।

হা হা হা হা—

সাবিত্রী (খিল খিল ক'রে হেসে) : বন্দনাদির দেখছি তাহ'লে অনেক গুণ আছে। হাসির ছড়াও কাটেন ?

ধ্রুব : জানেন না—ওঁর ছদ্মনাম ফুলঝুরি। শিশু-সাহিত্যে তাঁর বেশ নামডাক আছে। পড়েন নি শ্রীমতী ফুলঝুরি দেবীর "আজব দেশের গুজব" ? রেডিওতেও বলেন। বেশ দু'পয়সা পানও তিনি ছড়া কেটে, আর শিশু সাহিত্য লিখে।

প্রহ্লাদ : বটে ? কিন্তু বন্দনাকে দেখলে তো মনে হয় ভালোমানুষ !

ধ্রুব : মা বন্দনাদিকে কী উপাধি দিয়েছেন শোনেন নি ?—বর্ণচোরা আম। আর একটা কথা বলব ? হাসির ছড়া লিখতেও তাঁকে মা-ই শিখিয়েছেন।

সাবিত্রী : বলো কি ?

ধ্রুব : আমি তো মাকে বলি : "মা, বন্দনাদির উপাধি যদি হয় বর্ণচোরা আম, তো তোমার উপাধি কাকপুচ্ছ ময়ূর—অর্থাৎ বাইরে সাদামাটা, কিন্তু ভিতরে—উঃ, সে আর বলে কাজ কি ? (হেসে সাবিত্রীকে) সত্যি দিদি, বলুন তো—মাকে দেখলে কি মনে হয় একবারও যে তিনি হাসিঠাট্টায়ও এমন ঝুনো ? অথচ বললে বিশ্বাস করবেন না—আমি মারই মুখে শুনেছি—যে তিনি দশ বৎসর বয়সে বিধবা হবার পর পাচ পাচটি বৎসর একটি-বারও হাসেন নি—তাঁর দজ্জাল শাশুড়ী-ঠাকরুণ মাকে এম্‌নিই যন্ত্রণা দিতেন উঠতে বসতে। বাবা তাঁকে পরে কিভাবে উদ্ধার ক'রে আনে বলেননি বন্দনাদি ?

সাবিত্রী : হ্যাঁ বলেছেন। একবার নাকি মাকে বিষ পর্যন্ত খেতে হয়েছিল !

ধ্রুব : শুধু তাই ? মার শাশুড়ী ঠাকরুণের এক ভাইপো একদিন তাঁকে এম্‌নি চড় মেরেছিলেন যে মা দুঘণ্টা অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।

প্রহ্লাদ : বলো কি ধ্রুব ? বন্দনা তো বলে নি একথা।

ধ্রুব : বোধ হয় বলতে তাঁর বেধেছিল—কারণ—মানে যাঁকে আমরা সবাই দেবীর মতন ভক্তি করি সেই মার গায়ে হাত তুলেছিল এক পাষণ্ড মাতাল—এ কি গল্প ক'রেও বলতে ইচ্ছে করে কারুর ?

সাবিত্রী : কিন্তু মাকে সে-পাষণ্ডটা এম্‌নি মারই মারল যে হাঁসপাতালে পাঠাতে হ'ল তাঁকে ? বলো কি ভাই ?

ধ্রুব : আর বলি কি দিদি ? শুধু কি এই ? আরো কত কী বলতে পারি—দেখেছি কি আমি কম ? কেবল মা মানা করেছেন ব'লেই চুপ ক'রে থাকি।

প্রহ্লাদ (হেসে তার পিঠে চাপড় মেরে) : ব্রাভো, মৌনব্রত ব্রহ্মচারী ! চুপ ক'রে থাকার আদর্শ দেখালে বটে চুটিয়ে।

সাবিত্রী (প্রহ্লাদকে) : কিন্তু গুরুমার মুখের প্রশান্তি দেখলে কি কারুর একটিবারও মনে হয়—তিনি এতশত দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিয়ে গেছেন ?

ধ্রুব : মা কিন্তু এসব দুঃখকে দুঃখ নাম দেন না দিদি। বলেন—দয়া। মা যখন তখন আমাকে বলেন : "বাবা ! সংসারে থেকে সাধনা করতে হ'লে দুঃখ আসবেই আসবে চারদিক থেকে ভিড় করে। এর একটিমাত্র কাটান্ আছে : যা আসে সব কিছুকেই ঠাকুরের দান ব'লে বরণ করা। এ যে পারে—সে দেখতে পায়ই পায় যে, সত্যি ঠাকুরের দয়াই আসে দুঃখের মুখোশ পরে।"

"মা কতবারই যে আমাকে বলেছেন প্রহ্লাদদা : জন্মদুঃখিনী না হলে কি আমি দয়াময়ের পায়ে আঠারো বছর বয়সেই ঠাই পেতাম রে ? তাই তো আমি উঠতে বসতে বলি বাবা, যে দুঃখই আমার জীবনে শাপে বর হ'য়ে এসেছে নানাভাবে পদেপদে। দুঃখ যারা পায় নি তারা করুণার কি জানে ? "মা—মানে—"

কিন্তু ধ্রুবর টিপ্পনী কাটা হ'ল না—এই সময়ে মোটর শিবালা মন্দিরের মাঠে এসে থামল।

কাশী নরেশের প্রকাণ্ড মোটরও প্রায় এক সঙ্গেই এসে হাজির। তিনি মোটর থেকে নেমেই প্রহ্লাদের

দিকে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন: "আইয়ে, ওস্তাদজি!"

ত্রিশ

বিরাট শামিয়ানার নিচে জমায়েৎ হয়েছে অজস্র শ্রোতা: শিক্ষক, অধ্যাপক, রাজপুরুষ, পণ্ডিত, শাস্ত্রী, গুণী, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, জটাধারী, ব্রহ্মচারী, অবধুত…ইত্যাদি। কাশী, নরেশ নিজের নামে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন লিপিতে লিখে যে, বিখ্যাত কলাবিৎ গায়ক প্রহ্লাদ পলুস্করের অভ্যর্থনা হবে শিবালা মন্দিরের প্রাঙ্গণে। তিনি গাইবেন হিন্দি ভজন ও বাংলা কীর্তন। এ ছাড়া রবাহূতও এসেছে বহু লোক। শামিয়ানার এক পাশে চিকের আড়ালে অন্তঃপুরিকারা বসেছেন। সভা গম্ গম্ করছে।

মন্দিরের সামনা-সামনি একটি উঁচু মঞ্চে বিষ্ণু ঠাকুর আসীন—দীপ্যমান্ অচঞ্চল পাবকের মতন। কাশী নরেশ তাঁর পাশেই গদিয়ান্। গুরুমা কিন্তু চিকের আড়ালে বসেন নি---সাম্‌নেই মাটিতে একটি শীতলপাটির উপর এক সার মেয়ের মাঝে বসেছিলেন। সাবিত্রী আসতেই ডেকে ডান পাশে বসালেন। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ বসল বিষ্ণু ঠাকুরের বাঁ পাশে। ওদিকে চোখ ফেরাতেই প্রহ্লাদ অবাক্! সত্যিই তো—বিষ্ণু ঠাকুরের ডান পাশে স্বয়ং গম্ভীরানন্দজি! কিন্তু কে যেন তাকে ঢেলে সাজিয়েছে—মাথা মুড়িয়ে দাড়িগোঁফ কামিয়ে তাঁকে চেনাই যায় না আর! গান শেষ হওয়ার পরে ফিরতি পথে ধ্রুব প্রহ্লাদকে বলেছিল মোটরে: "প্রহ্লাদদা, গম্ভীরানন্দজি হঠাৎ মহানির্বাণানন্দ অবধূতের কয়েকটি ভেল্কি দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। তাই গানবাজনা ছেড়ে দিয়ে হাসি চেপে জটাদাড়ি ব্রত হয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত বনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেমন বুনো ওল তেম্‌নি বাঘা তেঁতুল—বলে না? তাই তো বাবার গান শুনে তাঁর ফাজিল ফাঁড়া কেটে গেল। সেদিন আমাকে হেসে কী বললেন শুনবেন? বললেন: 'ভাই মানুষকে যখন পাগলামিতে পেয়ে বসে, তখন তার মন তিলকে তাল ক'রে গোঁফে চাড়া দেয়। কিন্তু কীর্তনের মতন কীর্তন মধ্যমনারায়ণ তেলের মতই গরম মাথাকে ঠাণ্ডা করে ক্ষুরের সাহায্য না নিয়েই। উঃ, বেঁচেছি রে ভাই, জটা আর দাড়ির জঙ্গলে সত্যিই উঠেছিলাম হাঁপিয়ে—সরস গান বাজনা ছেড়ে হয়েছিলাম শুকনো চেলাকাঠ—স্বামীজি বনবার ধনুর্ধর পণ নিয়ে। শুধু গুরুদেবের অঘটনী কৃপায়ই হারানো রসবোধ এলো ফিরে—তখন আয়নায় নিজের শ্রীমুখ দেখে হাসব না কাঁদব ভেবে না পেয়ে শেষটায় দুত্তোর ব'লে হাসিকান্নার পারে চ'লে এলাম দাড়ি গোঁফ কামিয়ে মাথা মুড়িয়ে। শুধু হাড়ই নয়, সেই সঙ্গে প্রাণও জুড়োলো।"

একত্রিশ

প্রহ্লাদকে দেখেই গম্ভীরানন্দ অগম্ভীর উচ্ছ্বাসে ডাকলেন: "আসুন দাদা, আসুন, এই যে—গুরুদেব এখানে আপনার জন্যে আসন ঠিক ক'রে রেখেছেন। এই সবার মাঝখানে—সেন্ট্রাল আসনে।"

বিষ্ণুঠাকুর গম্ভীরানন্দকে হাসিমুখে বললেন: "বাবা! এই তো চাই—দাদা পাতানো হাল্কা হ'তে। মহাভারতে উপদেশ আছে: "লঘু ভব মহারাজ!" সাহেব পুরাণের ভাষায় Travel light" ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে: "কিন্তু এখন গাল-গল্প নয়—তবলা মেলানো বাকি।" ব'লেই বাইরের দিকে হঠাৎ তাকিয়ে চম্‌কে উঠে প্রহ্লাদকে বললেন: "আমার একটি বন্ধু ভিড়ে ঢুকতে পারছে না—আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ তবলা বাঁধো" বাবা ব'লেই উঠে গেটের দিকে উধাও।

প্রহ্লাদ (গম্ভীরানন্দকে): তবলা কড়ি সা-তে বাঁধুন স্বামীজি।

গম্ভীরানন্দ: আর স্বামীজি ব'লে লজ্জা দেবেন না দাদা! আমাকে আমার নতুন নামেই ডাকবেন—উপশান্ত।

প্রহ্লাদ (সবিস্ময়ে): সেকি! গালভরা গম্ভীরানন্দ থেকে হাল্কা উপশান্তয় অবতরণ রাতারাতি!

উপশান্ত: হ্যাঁ, গুরুজি বললেন—তিনি প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করেন। হয়েছিল কি জানেন? (তবলার কানিতে হাতুড়ি মেরে) কড়ি সা বললেন না? (ঠং ঠং) হয়েছিল কি—আমি গম্ভীরানন্দ নাম নিয়েছিলাম ভড়ং ক'রে ভারিক্কি হ'তে কি না (ঠং ঠং ঠং) তাই গুরুদেব বললেন হাল্কা হ'তে হবে—(ঠং ঠং)—বললেন: আমাদের বঙ্কুবিহারী শুধু ছাপোষা হাসিখুসি মনিষ্যি নন, তার উপর বিষম লাজুক—দাড়িগোঁফের ঘনঘটা দেখলে আঁৎকে উঠে পর্দানশীন হন। তাই (ঠং ঠং) মাথা মুড়োতে হ'ল। শুধু

ঘোল ঢালা বাকি—টিপ্পনী কাটল ধ্রুব—হা হা হা! (ঠং ঠং)।

প্রহ্লাদ: হা হা হা। ধ্রুব বাপকা বেটা সিপাইকা-ঘোড়া যাকে বলে। কিন্তু আপনার ঐ ঠং ঠং একটু রাখুন, তানপুরোটা আগে বেঁধে নিই—আপনি হার্মোনিয়মে কড়ি সা-র স্বরটা একটু দেবেন?

বত্রিশ

কিন্তু প্রহ্লাদ তানপুরা বাঁধবে কী? কেবলই মনে পড়ে গম্ভীরানন্দের আগেকার জটাধারী শ্মশ্রুল মূর্তি—আর বিস্ময় জাগে এহেন হঠকারীর কী ক'রে এ-রূপান্তর হ'ল এমন আচম্বিতে? অঘটনের যুগ গত কে বলে? কেবলই মনে পড়ে সেদিনের কথা—গম্ভীরানন্দ তর্কে হেরে কী ভাবে গুরুদেবকে "উন্মার্গগামী' ব'লে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠে পড়েছিলেন স্থানত্যাগ করতে। তার এ-চমকপ্রদ রূপান্তর হ'ল কেমন করে? তাছাড়া উপশান্ত নামও তো কই কস্মিনকালেও শোনে নি! হবে। গুরুদেব বলেন না কি—"সহজ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা" হয়ত গম্ভীরানন্দজি জটা-দাড়ি-কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করেছিলেন অহঙ্কার থেকেই—কে জানে! সবাই যে অহঙ্কারের তাগিদে ভেখ নেয়, একথা বলা চলে না অবিশ্যি। গুরুদেব সেদিন প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকক্ষণ ধ'রে ব্যাখ্যা করেছিলেন—ভেখ ধারণ করলে সাধকের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লাভ হয়, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ক্ষতি। এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে প্রহ্লাদের তানপুরা বাঁধা শেষই হতে চায় না—এম্নি সময়ে বিষ্ণুঠাকুর ফিরে এলেন এক কৃশকায় ছিন্নবেশ পঙ্গুকে নিয়ে। প্রহ্লাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন: "আমার বাল্যবন্ধু শ্রীসুখেন্দুনারায়ণ রায়—একসময়ে চমৎকার পাখোয়াজ বাজাতেন—ধ্রুপদও গাইতেন।"

"গাইতেন?" ব'লেই প্রহ্লাদ তাঁর হাতে তানপুরা দিয়ে বলল: "দয়া ক'রে সুর বেঁধে দিন—ঐ ঐ যে সুর বাজাচ্ছেন উনি—গম্ভীরা—থুড়ি উপশান্তজি—ঐ সুরে। কড়ি সা।

সুখেন্দু (তানপুরা নিয়ে জমিয়ে ব'সে বিষ্ণুঠাকুরকে): ইনিই বিখ্যাত ওস্তাদ প্রহ্লাদ পলুস্কর?

প্রহ্লাদ (নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে): আমি গুরুদেবের শিষ্য এইটিই আমার একমাত্র উপাধি। আর সব উপাধি ঝ'রে গেছে।

সুখেন্দু দেখতে দেখতে তানপুরা বেঁধে প্রহ্লাদের হাতে দিতেই প্রহ্লাদ বিষ্ণুঠাকুরকে বলল: "আপনি আগে সুরু করুন।'

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): না, কলিযুগে শিষ্যই পুরোধা—গুরু ব্যাকনাম্বার। তাছাড়া আজকের সভা যে তোমারই সভা, বাবা! কাশী নরেশ সেদিন তোমার কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়েছিলেন তোমাকে একটি বাকায়দা অভিনন্দন দিতে। একেবারে ছাপানো—স্বর্ণাক্ষরে।

প্রহ্লাদ (বিস্মিত): আমাকে অভিনন্দন?

বিষ্ণুঠাকুর: হ্যাঁ। কিন্তু সে হবে পরে—যথাকালে। আগে গানের পালা তো শেষ হোক। লোকে জানুক তুমি কে ও কেন অভিনন্দনীয়। না না, লজ্জাবতী লতা হবার দরকার নেই। খ্রীষ্টদেবের উপদেশ মনে পড়ে: not to hide a light under a bushel.

উপশান্ত: গুরুদেব! আপনি হিন্দু হয়ে খ্রীষ্টের উক্তি—

বিষ্ণুঠাকুর: শান্ত হও বৎস। নৈষা তর্কেণ মতিরাপণীয়া। মনে রেখো সদ্গুরুর জাত নেই। আর খ্রীষ্ট ছিলেন একটি বিরাট পুরুষ—যুগাবতার। (প্রহ্লাদকে) কিন্তু এবার ধরো—শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে তোমার গান শুনতে।

প্রহ্লাদ: কী গাইব?

বিষ্ণুঠাকুর: একটি মীরা ভজন। (কাশী নরেশকে) কী বলেন মহারাজ?

কাশী নরেশ সাগ্রহে ঘাড় নাড়তে বিষ্ণুঠাকুর বললেন, ঐ মীরাভজনটি গাও না—বন্দনা যেটির বাংলা করেছে—সে-বাংলাটিও তো তুমি জানো—না?

প্রহ্লাদ: আজ্ঞে।

বিষ্ণুঠাকুর: তবে চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। হিন্দিটি গেয়ে বাংলা অনুবাদটিও গাও বাঙালীরাও খুসি হবেন। যেমন তুমি আজকাল ক'রে থাকো আর কি।

প্রহ্লাদ তানপুরা হাতে নিয়ে ধরে দিল:

বড়ী অনোখী রীত পিয়ারী, বড়ী অনোখী রীত।
বড়ী অনোখী রীত মিলনকী, বড়ী অনোখী রীত।

ইঁসনা সীখা হমনে রোকে,
সব কুছ জীতা সব কুছ খোকে
উনকো পায়া উনকে হোকে হারমে দেখী জীত।
অপনে যে সো হুয়ে পরায়ে,
জীবন সাথী কাম ন আয়ে,
মনতী মনকো যূঁ ভরমায়ে—কোই ন তেরা মীত।
লোকলাজ ভী ছোড় সহেলী,
পিয়া মিলনকো চলী অকেলী,
কোই ন সঙ্গী কোই ন বেলি (জব) উন
সঙ্গ লাগী প্রীত।

কোই ন তেরা মীত মীরা (জব) উন সঙ্গ লাগী প্রীত।

উপশান্ত সঙ্গত করতে করতে থেকে থেকে চোখ মুছছিল। গান শেষ হ'তে বলল: "আহা! কী গানই গান আপনি!" কাশী নরেশও উজিয়ে উঠলেন।

ধ্রুব (ফিশফিশিয়ে): কিন্তু বাংলা অনুবাদটা গাইতে ভুলবেন না প্রহ্লাদদা, বন্দনাদি ইশারা করছে। আপনি যে ভুলো—

প্রহ্লাদ ধ'রে দিল সেই সুরেই:

এ কেমন লীলা বন্ধু তোমার. কে পেয়েছে দিশা তার?
মিলনের পথে কাছে ডেকে এ কী দূরে ঠেলা বারবার?
আঁখি ঝরায়ে কে হাসিতে শেখালো?
সব পেতে প্রাণ সকলি হারালো!
যারে চাই তার স্বাদে কে মজালো—এলো জয় মেনে হার।
প্রিয় পরিজন হ'ল সবে পর!
পারি না চিনিতে চিরচেনা ঘর!

* * *

"কেহ নয় তোর আপন"—এ-স্বর অন্তরে বাজে কার?
নাই সখী, আর লোকলাজ ভয়,
নাই সাথী কেহ নাই আশ্রয়,
ভালোবাসি—যার নাই পরিচয়: অদেখার অভিসার!
হরি যার হয় আপন—স্বজন হয় পর হায়, তার।

গান জ'মে উঠল দেখতে দেখতে। গাইতে গাইতে প্রহ্লাদের মনে হতে থাকে—কত সত্য কথা! ভগবানকে যে আপন, স্বজন ব'লে বরণ করে তার স্বজন সবাই হয় পর, আত্মীয় বন্ধু দরদীরা সবাই তাকে বর্জন করে। "হরি যার হয় আপন—স্বজন হয় পর হায় তার"—এ-চরণটি বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়, আর প্রতিবারই যেন এর পুনরাবৃত্তিতে পায় এর নিহিতার্থের এক নব ভাষ্য—অর্থাৎ মানুষের স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা ততক্ষণই আমাদের অন্তরকে তাদের মানবিক প্রসাদ দেয় যতক্ষণ আমরা মানুষকে বসাই ভগবানের বেদীতে। কিন্তু যাঁর প্রেমের চকিত স্পর্শে আমাদের শুষ্ক হৃদয়মঞ্চ মধুর প্রেমের অসাঙ্গ ফলে-ফুলে ছেয়ে যায়, তাঁর প্রেমকে সর্বেসর্বা ক'রে ধরলে মানুষ রাগ করবেই তো—নিজে যে-নৈবেদ্য পাচ্ছিল ভগবান্ তাকে আত্মসাৎ ক'রে নিলেন ব'লে। তাই রাধার নাম রটল কলঙ্কিনী, মীরার নাম রটল লজ্জাহীনা, প্রহ্লাদকে স্বজনেরা দিল এত যন্ত্রণা, এ না হ'য়েই পারে না। ভগবানকে ভালোবাসলে বিষয়ী সংসারীরা তাকে ভুল বুঝবেই বুঝবে। তাই ভক্ত সাধু বৈষ্ণবের সত্যিকার দরদী হয় না বিষয়ীরা। শুধু ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবাশ্রিত ভাগবতেরাই বোঝে তাদের মর্ম। গান গাইতে গাইতে যেন হঠাৎ প্রহ্লাদের চোখের ঠুলি খ'সে পড়ল, সে দেখতে পেল কেন তার পিতা তার দীক্ষা নেওয়ার জন্যে এত বিমুখ হয়েছেন, কেন তিনি চান নি—পুত্র গুরুভক্তির দিকে ঝোঁকে। শুধু নির্ভেজাল পিতৃভক্তি—এইই তো বিধি—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ—এ মন্ত্র ছেড়ে গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ—এই উদ্ভট মন্ত্র জপ করবে কেন সে-পুত্র যে পিতার নয়নমণি। সংসারের ধন সংসারেই থাকবে ম'জে—এইই তো চাই। ভাবতে ভাবতে ওর চোখে ভেসে ওঠে গৃহচ্যুতা স্বজনবর্জিতা ছিন্নকন্থা মীরাবাঈ পথে পথে গেয়ে চলেছে সাশ্রুনেত্রে:

তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোঈ
ছাড় দঈ কুলকি লাজ ক্যা করেগা কোঈ!

তানের পর তান নিয়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রহ্লাদ গেয়ে চলল:

মেরে গিরধর গোপাল দূসরো ন কোঈ।
সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোঈ।
সন্ত দেখ দৌড় আই জগত দেখ রোঈ,
মীরা প্রভু লগন লগী হোনী থী সো হোঈ।

ওর মনে বেজে ওঠে মীরার বিষাদের ধুয়াতে আনন্দের গৌরবের বাণী: সংসার আমাকে বর্জন করেছে

করলই বা—ঠাকুর তো আমাকে ঠাঁই দিয়েছেন তাঁর রাঙা পায়। ধ'রে দেয় সঙ্গে সঙ্গে :

আজ সখী, মিল মঙ্গল গানা—"হম ঘর সাজন আয়ে হৈঁ।" ধনধন হো কর কহতী মীরা :

"সখী বি সদ্‌গুরু পায়ে হৈঁ।"

গেয়েই বন্দনার অনুবাদ ধরে—যেটি বন্দনাকে ও এই সুরেই গাইতে শিখিয়েছিল :

মঙ্গলগান গাই আয়, এলো নাথ যে গেহে আমার।
ধন্য ধন্য মীরা, সখী, পেল গুরুদেবে যে তাহার।

প্রহ্লাদের মনে প'ড়ে যায় ওর নিজের জীবনে গুরুদেবের পদার্পণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মীরার গান বেজে ওঠে ওর হৃদয়ের তারে নিজের উপলব্ধির প্রত্যক্ষ স্পন্দনে। ও যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করে গুরুবরণের পর মীরার আনন্দ, গৌরব—সর্বোপরি, অভয়। গেয়ে চলে :

"ঐসে সদ্‌গুরু দেখে রী সখী, সদ্‌গুরু দেখে ঐসে—
পথহারা পন্থী অঁধিয়ারে চন্দা দেখে জৈসে।
দীন জান কর দয়াল সদ্‌গুরু অপনী শরণ লগাঁয়ে হৈঁ!"

গাইতে গাইতে ভাবাবেগে যেন দেখতে পায় স্পষ্ট—মীরা বৃন্দাবনে গেয়ে চলেছে অভয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে :

"ডর ক্যা জো হয় অবলা মীরা, লাখ উঠে তূফান!
ইস, অবলাকে বল হৈ সদ্‌গুরু, নির্গুণকে ভগবান্।
নাচত গাবত চলী হয় মীরা 'জয় গুরু জয় গুরু' গায়ে হৈ। গেয়েই বন্দনার অনুবাদ ধরে দেয় :

গুরুমুখ চেয়ে রই সখী, চেয়ে রই লো পরমানন্দে,
পান্থ অন্ধকারে পথহারা যেমন নিরখে চন্দ্রে,
সে-দয়াল দীনা জেনে লো আমাকে শিখালো শরণ তার।
অসহায়া মীরা? হোক নাই ভয় উঠিলে কোটি তূফান।
অবলার বল মহাগুরু—গুণহীনার সে ভগবান্!
"জয় গুরু জয়" তানে নেচে গেয়ে তোলে মীরা ঝংকার।
ধন্য ধন্য মীরা সখী পেলো গুরুদেবে যে তাহার।

গানের শেষে সভায় নীরবতা থম্‌থম্ করে···শুধু চিকের আড়ালে মেয়েদের চাপা কান্নার মৃদু রেশ শোনা যায়। সবাই এগিয়ে আসে বিষ্ণুঠাকুরকে প্রণাম করতে। কিন্তু তিনি সমাধিস্থ··· অচল অটল। একের পর এক ভক্ত ও ভক্তিমতী তাঁর পায়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে—কেউ বা পায়ে ফুল ছড়িয়ে—চ'লে যায়। প্রহ্লাদ জলভরা চোখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে। সমাধির কথা অদ্যাবধি সে শুধু বইয়েই পড়ে এসেছে। তুকারামের একটি অভঙ্গ মনে পড়ে—কী ভাবে তাঁর সমাধিমুখী মন ধীরে ধীরে কামনা বাসনার পারে চ'লে যেত—তার পরে থিতিয়ে যেত এক অপরূপ নিথরতা—Stillness—সঙ্গে সঙ্গে দর্শন হ'ত। লোকে চেয়ে থাকত তাঁর মুখের দিকে—সমাধির সময়ে তাঁর মুখে একটা আভা জেগে উঠত। সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেও এমনি অলোক লোকের আলো পড়ল। এসব নিয়ে সে গৌরীর সঙ্গে কতবারই আলোচনা করেছে। কাশীতে এসে প্রথম চাক্ষুষ করল—শোনা-কথা উঠল দেখা অভিজ্ঞতার কোঠায়। কিন্তু আশ্চর্য—সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে জেগে ওঠে মহাদেবের রোষোক্তি: "এসব ভাববিলাসে কী হবে শুনি! ভগবানকে সমাধিতে চাক্ষুষ করা—এ হয় কখনো? আর যদি হয়ও তাতে মানুষের কী এসে গেল? সচ্চিদানন্দ ঠাকুর সুধাসমুদ্রে সুধা গিলতে গিলতে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে চিংসাঁতার কাটছেন—এ যদি মেনেও নিই তাতে আমার কী এসে গেল শুনি? আমি তো র'য়ে গেলাম যে পাঁকাল মাছ সেই পাঁকাল মাছ—শুধু পঙ্করসরসিক—অপ্রাপ্য সুধাসিন্ধুর গল্প শুনে আমার হবে কী শুনি? তাছাড়া সাধুসন্তরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর···ইত্যাদি ইত্যাদি—সেই মামুলি যুক্তি তর্ক আক্রোশ সংসারীদের। যারা বড় কিছু উপলব্ধি করার অনধিকারী তারা অধিকারীদের এজাহারকে বাতিল করতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠবেই উঠবে প্রাণ তথা মান বাঁচাতে—ভাবে প্রহ্লাদ। ওর দৃষ্টি কেমন যেন খুলে যায় গুরুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। মনে হয়: কে জানে—হয়ত সাধুসঙ্গে এই ভাবেই দিব্যচক্ষুলাভ হয়—যার কথা ভাগবতে লিখেছে কত দৃষ্টান্ত দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের অভিযোগের উত্তরও জোগায়—এরি নাম প্রাতিভজ্ঞান (Intuition) যার বিদ্যুৎপ্রভায় সে স্পষ্ট দেখতে পায় সাধুরা কত সাধনা ক'রে তবে আত্মজয়ী হন, কত বাধা ডিঙিয়ে প্রলোভন জয় ক'রে তবে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য-বর্গীয় হাজারো রিপু জয়

করে চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন। নিজেকে নিয়ে প্রথম দিকে ব্যস্ত থাকতে তাঁদের তো হবেই—আমাদের নিম্ন প্রকৃতির পিছুটান কাটিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে ওঠা কি সম্ভব প্রাণপণ সাধনা বিনা? আর সাধনার সময়ে ঐকান্তিক না হ'লে সিদ্ধি আসবেই বা কেমন ক'রে? কিন্তু তাই ব'লে কি বলা যায় যে সাধনার সময়ে একনিষ্ঠ হওয়ার নাম স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা? সাবাস যুক্তি! বড় বড় বৈজ্ঞানিককে বা শিল্পীকেও কি অনেক সময়েই নাওয়া খাওয়া ভুলে একমনে গবেষণা বা সৃষ্টির কাজে মন দিতে হয় না? স্বার্থপর? স্বার্থপর হ'লে কেউ পরমার্থকে পায় কখনো? বড় বড় মহাপুরুষদের জীবনীর প্রতি ছত্রে কি দেখতে পাই না তাঁদের পরার্থনিষ্ঠা? জীবন্মুক্ত মহাত্মারা কত দুঃখ যেচে বরণ করেন—বদ্ধ-জীবকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে? বুদ্ধ মহানির্বাণও প্রত্যাখ্যান করলেন বদ্ধ-জীবকে নির্বাণের বাণী শোনাতে! চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ সমাধি থেকে নেমে এসে কী করতেন? নামকীর্তন। হাজার হাজার লোক সে-কীর্তনের ফলে কিছুটা অন্ততঃ শুদ্ধ হত, খানিকক্ষণ অন্ততঃ পেত আভাষ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হ'লে মানুষ তার পার্থিব নীচতার কবল থেকে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও তো মুক্তি পেয়ে সংসারের ত্রিতাপকে ভোলে। তাহলে কেমন করে বলব—সমাধিলব্ধ অনুভূতি মানুষের কোনো কাজেই লাগে না? গুরুদেব কি বারবারই বলেন নি যে, সমাধিতে মহাপুরুষেরা যে-আলো পান—প্রেমের, জ্ঞানের মুক্তির—সেই আলোর ঊর্ধ্বটানেই তাঁরা বদ্ধ জীবকে তুলে আনেন ধীরে ধীরে হাজারো মানবিক ক্ষুদ্রতার জঘন্যতার নরককুণ্ড থেকে উদারতার, প্রেমের, অনাসক্তির আনন্দলোকে? সে কি স্বচক্ষে দেখে নি গুরুদেবের, গুরুমার এই দিব্য শক্তির ছোঁয়াচে কী আশ্চর্য ভাবে কত অনধিকারী অধিকার পেয়েছে ঊর্ধ্বতর আনন্দের, ধ্যানের, শান্তির? যে-দুরূহ সাধনায় মানুষ আসক্তি মোহ ক্ষুদ্রতা ও অহংকারের কবল থেকে মুক্তি পায় সে সাধনা হ'ল, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর আর যারা ধন মান যশ জরু-জমির জন্যে নিরন্তর দাপাদাপি ক'রে মরছে—বুদ্ধি দিয়ে এই মূঢ়তাকে পরার্থনিষ্ঠা নাম দিয়ে চালাকির বেসাতি করছে—তারাই হ'ল মহামানব, কর্মযোগী, দেশের সুসন্তান, সমাজের স্তম্ভ?

সমাধিস্থ বিষ্ণুঠাকুরকে লোকের পর লোক করজোড়ে প্রণাম ক'রে যায় নীরবে—কেউ সাশ্রুনেত্রে, কেউ বা ভক্তিনম্র সংযত উচ্ছ্বাসে। এদের মধ্যে কত অমৃতার্থী কী ভাবে তাঁর ভক্তিসুধার ছিটেফোঁটা স্বাদ পেয়েছে তার খবর কে রাখে? প্রহ্লাদের চোখে জল আসে, প্রশ্ন জাগে: জগতে আজ যে রেষারেষি হানাহানি কাড়াকাড়ি ক্রমশঃ মানুষকে শক্তিমদে মত্ত করে বিজ্ঞানের সারার্থ নিয়ে চলেছে আত্মঘাতের "অন্ধতমসাবৃত অসূর্য" রসাতলে—তার একমাত্র প্রতিষেধক কি সাধুদের বহুসাধনলব্ধ প্রেমভক্তি করুণার তারিণী দীক্ষা নয়?

[ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রবি দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের মাধুরিমা নিয়ে যে স্বতন্ত্র প্রতিভা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করে গেল বাংলার আকাশ ও মৃত্তিকা, সে প্রতিভা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। আকাশের সূর্য ও চন্দ্র সমভাবে লোকপ্রিয় হলেও, বৈজ্ঞানিকের মতে চন্দ্রের ওই স্নিগ্ধ আলো নাকি তার নিজের নয়, সূর্যের কাছে ধার-করা দীপ্তি, চন্দ্রের তুষারময় দেহদর্পণে প্রতিফলিত সূর্যালোক। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল! একই যুগে বাংলার সাহিত্যাকাশে পূর্ণাঙ্গ আর একটী জ্যোতিষ্ক, যা রবীন্দ্রনাথের সমকালীন হলেও আপন গরিমায় প্রদীপ্ত—অনন্যসাধারণ। স্বীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ। সে মাধুর্য বাঙালীর উচ্ছ্বাস-প্রবণ মানসিকতায় শুধুমাত্র অলীক বর্ণচ্ছটার স্পর্শ দিয়ে গেল না—দিয়ে গেল আনন্দের মন্দাকিনী ধারা। ঘুমন্ত মনে দিয়ে গেল জাগরণের যাদুমন্ত্র; দেশাত্মবোধের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে গেল পাখীর-গানে-ঘুমিয়ে-পড়া, পাখীর-গানে-জেগে-ওঠা এই জাতির কোমল প্রাণতন্ত্রীতে। জাগিয়ে দিয়ে গেল আত্মচেতনা, উদ্বুদ্ধ করে গেল প্রাণেপ্রাণে মুক্তি সাধনার মন্ত্র। বিদেশী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ পরাধীন জাতির মনের বাতায়নে বয়ে গেল দেশের মাটির আহ্বান:

‘ধন ধান্য পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা॥
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার!
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র
আকাশ তলে মেশে?
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে?
ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ,
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমি ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।’

অপূর্ব অনুভূতি ছড়িয়ে গেল বাঙালীর মনে প্রাণে। সে অনুভূতি বুদ্ধিসঞ্জাত নয়, হৃদয়াবেগসঞ্জাত। দেশাত্মবোধের গুন্‌গুন্ সুরে ভরে উঠলো বাংলার আকাশ বাতাস, জলভরা গাঙ্ আর সবুজ ধানক্ষেত।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার মুক্তিসাধকের কাণে যে ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, সে মন্ত্র ছিল পূজারিদের। শিক্ষিত ভারতবাসী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে দীক্ষিত ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সে মন্ত্রে। কিন্তু জাতির কানে কানে প্রাণে প্রাণে লাগেনি তার কোমল স্পর্শ। সে সঙ্গীত সীমাবদ্ধ রইল সম্প্রদায় বিশেষের কর্ম-সাধনার পথে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সুর ঝংকৃত হয়ে উঠলো শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে, বাংলার পথে ঘাটে মাঠে।

সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুগ। শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রাণে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবাহ, মনে সাহেবিয়ানার নেশা, চিন্তায় সাগরপারের ঢেউ। ইংরেজী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত ভারতবাসী স্বপ্ন দেখে ‘হোমের’-হাইডপার্কের-বাকিংহাম প্রাসাদের। স্নায়ুতে শ্বেতাঙ্গের মোহ। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সেই আমলের ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট। কিন্তু চোখে তাঁর ছিল সবুজের রঙ—শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির সিক্ত মাটির গন্ধে তাঁর কবিহৃদয় ছিল ভরপূর। তাই ‘মহাসিন্ধুর ওপার হতে’ তাঁর কানে ভেসে এলো মুক্ত মানুষের সঙ্গীত—ইংরেজ মহিলার হাতছানি নয়। ‘ওরে আয় ছুটে আয় আমার পাশে।’ তিনি আহ্বান জানালেন দেশবাসীকে তাঁর বুকের কাছে। বিশ্বমানবের

সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের ছুটে আসতে বললেন ভেদ-বিদ্বেষ ভুলে। ভারতমাতার পূজারী সন্তান দেশাত্মবোধের অনন্য চেতনায় গেয়ে উঠলেন ভারতের গৌরব গান :

'যে দিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিল জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কোলাহল,
সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ!

ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা শুনে যে আমলে বৃটিশ রাজপুরুষের কানে সঞ্চারিত হতো হলাহলের তীব্র জ্বালা, সে আমলের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়ে উঠলেন—

'মেবার পাহাড় হইতে যাহার নেমে গেছে এক
গরিমা হায়!'

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু গীতিকার কবিই ছিলেন না। গিরিশ-চন্দ্রের পরবর্তী যুগে নাট্যকার হিসাবে তাঁর অবদান অসামান্য ও অনতিক্রম্য। হাস্যরস পরিবেশনেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ডি, এল, রায়ের ভাষা। পুরাদস্তুর বাঙালী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই পাশ্চাত্ত্য রীতির নাম পরিচিতিটিও যেমন অদ্ভুত ছিল, তেমনি অদ্ভুত ছিল তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার আত্মপ্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা উচ্ছ্বাস-প্রবণ হলেও বাংলা ভাষার উপর অমন কুশলী অধিকার তাঁর পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তী খুব কম লেখকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। ভাব প্রকাশের অনুকূল শব্দ ও বর্ণবিন্যাসে তাঁর সমকক্ষ কুশলী ভাষা-শিল্পী শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। আবেগ অনুকূল ভাব প্রকাশের জন্য তিনি সুনির্বাচিত শব্দ বিন্যাস ও ঘোষবর্ণ বহুল ভাষার সাহায্যে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যাতে স্বতন্ত্র বর্ণনা ছাড়াও পরিবেশের ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নতুন করে বর্ণনার দরকার হয়নি।

যেমন,

'যখন সঘন গগনে গরজে বরিষে করকাধারা,
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন লুপ্ত চন্দ্র তারা।
দীপ্ত করি সে তিমিরে জাগিছে
কাহার আননখানি!
আমার কুটীর রাণী সে যে গো
আমার হৃদয় রাণী॥'

শুধু মাত্র সুনির্বাচিত শব্দ ও বর্ণবিন্যাসে বর্ষণমুখর মেঘাচ্ছন্ন রাতের ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে গানের দুটিমাত্র ছত্রে।

আবার বিপদ সংকুল দুর্যোগ রাত্রির কল্পনায় কবি মূর্ত করেছেন তাঁর ভাবানুকূল পরিবেশ -

'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,
গর্জে সিন্ধু চলিছে তরণী।
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
ওঠ মা, ওঠ মা, প্রদীপটি ধর।
* * *
জননীহীনা কন্যা দীনা
বহুদিন পরে ফিরেছে ঘর॥

প্রগতিবাদী হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন রক্ষণশীল ও আত্ম-ধর্ম বিশ্বাসী—ইংরাজি ও সভ্যতার প্রভাবে সমাজের নানা স্তরে যে পরিবর্তন ও বিদেশানুবর্তন দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র শ্লেষ কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। হাস্যরস পরিবেশনের ভিতর দিয়ে তিনি যে সব ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন, কাব্য ও সাহিত্য হিসাবে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ এবং রসোত্তীর্ণ।

সামাজিক জীবনে তখনো নারী প্রগতি ছিল প্রচ্ছন্ন। হিন্দু সমাজে প্রগতিশীলা নারীর সংখ্যা ছিল অতি বিরল, অথচ তরুণেরা হয়ে উঠেছিল ইংরাজী সভ্যতায় আলো-কিত। মন তাদের হয়ে উঠেছিল প্রগতিবাদী ও রোমান্টিক। কিন্তু সমাজ জীবনে ছিল না সে নব্য সভ্যতার উপযোগী রোমান্টিসিজমের সুযোগ। শুধু মাত্র ইঙ্গ-বঙ্গ, ক্রীস্চিয়ান ও ব্রাহ্ম সমাজেই ছিল আলোকপ্রাপ্তা নায়িকা-দের কথঞ্চিৎ সুগম-লভ্যতা। তাই বিলাত ফেরত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং উচ্চাভিলাষী কৃতী ছাত্রদের ভিড় জমেছিল তাদের দরজায়। ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাসের বন্ধন তাদের মনে শিথিল হয়ে এসেছিল। সাড়া পড়েছিল নতুন পথে এগিয়ে যাবার। তরুণদের মনের তাগিদ ক্রম-বর্ধমান হয়ে উঠেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল শ্লেষের সঙ্গে (স্যাটায়ার) গেয়ে উঠলেন :

*

জল মহল

(উদয়পুর)

*

ফটো :

ভিম-তাল লেক
(নৈনিতাল)

ফটো ঃ
পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

'প্রথমেতে ছিলেম কোনো ধর্মে অনাসক্ত,
খৃষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলেম অনুরক্ত।
বিশ্বাস হলো খৃষ্টান ধর্মে, ভজতে যাচ্ছি খৃষ্টে,
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে।
ছেড়ে দিলাম পথটা,
বদলে গেল মতটা।
এ অবস্থায় পড়লে পরে সবারই মত বদলায়।
নব্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ে দেখলাম চেয়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন অন্য নাই তো কোন কষ্ট।
কচিৎ ভগ্নী-সহ দীক্ষিত হতে যাচ্ছি ধর্মে,
এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু-কর্মে।
ছেড়ে দিলাম পথটা,
বদলে গেল মতটা।
এ অবস্থায় পড়লে পরে সবারই মত বদলায়।

ইংরাজীবিদ্ নব্যতান্ত্রিক তরুণদল যখন কথায় কথায় আওড়ায় সেক্সপীয়র-মিল্টন, পড়ে মিল্, বেন্, হারবার্ট-স্পেন্সর, জাতিগত সংস্কার শিথিল হয়ে আসে, পাইপ টিপে-ধরা বাদামি দাঁতের ফাঁকে ফুটে ওঠে নাস্তিকতার বাঁকা হাসি—'অল্ বস্ (bosh)! সুপারস্টিশান্!' তখন আবার জোয়ার আসে নতুন স্রোতে ভেসে যাবার। মন ভাসি-ভাসি করে। কিন্তু হঠাৎ অবস্থার বিপাকে আবার যেন সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মনের গতি পরিবর্তিত হয়। অলক্ষিতে রূঢ় বাস্তবতার আঘাত লাগে নব্যতন্ত্রের ভিত্তি প্রাচীরে। আবার চৈতন্য ফিরে আসে।

... ...

মিল্ বেন্ হারবার্ট স্পেনসর পড়তে লাগলাম রঙ্গে
যাবো যাচ্ছি করছি ভেসে ফাউল-বীফের বন্যায়,
এমন সময় দিলেন পিতা গুটি কত কন্যায়।
ছেড়ে দিলাম পথটা,
বদলে গেল মতটা।
এ অবস্থায় পড়লে পরে সবারই মত বদলায়।

* * *

তিনি যে শুধু নব-দীক্ষিত নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান ও নব্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রতিই কটাক্ষ করলেন, তাই নয়। হিন্দু সমাজে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির মূলে যে ঘুণ ধরলো, তার প্রতিও কম শ্লেষোক্তি করলেন না।

'আমরা ব্রাহ্মণ বলে নোয়ায় না মাথা,
কে আছে এমন হিন্দু?
আমাদেরই কোন পূর্বপুরুষ গিলে
ফেলেছিল সিন্ধু।
চুট্ করে ঢুকি চাচার হোটেলে,
খাই নিষিদ্ধ পক্ষী।
সকাল বেলায় গীতা নিয়ে বসি
বাবা বলে ছেলে লক্ষী।'

দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপ, সাজাহান, মেবারপতন ও চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি নাটকে লেখকের দেশাত্মবোধ ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। ভাষা আবেগপূর্ণ ও লিরিক্যাল হওয়ায় নাটকের বাস্তবধর্ম চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জন-মনে রেখাপাত করার দিক থেকে কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এবং গ্রাম ও নগরের সৌখিন রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকগুলি বহু-সহস্র রজনী অভিনীত হয়েছে, আজও হয়।

দৃঢ়মূল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তখন নিরস্ত্র জাতির হাত-পা কঠিন নিগড়ে বাঁধা। বাক্য-স্বাধীনতা অপহৃত। তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকীয় চরিত্র ও সংলাপের ভিতর দিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার যে প্রয়াস করেছেন, দেশ মাতৃকার গৌরবের যে উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন, তা অতুলনীয়।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার ভারতভূমি আক্রমণ করেছেন। রণ-কৌশলে পরাজিত করেছেন ভারতীয় রাজশক্তিকে। তবুও নাট্যকার শ্রদ্ধাবনত করেছেন সেই দিগ্বিজয়ী বিদেশী বীরের হৃদয়। আলেকজান্দারের চরিত্রে মহত্ত্ব আরোপ করবার সুযোগ নিয়ে, নাট্যকার তাঁর মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন—'কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ একে অনলতাপে

দগ্ধ করে দিয়ে যায়। রাত্রে চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না একে মাধুরিমায় স্নান করিয়ে দেয়।...এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করছে এ জাতি...যার অঙ্গে চন্দ্রের কান্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস! এ একটা জাতি বটে।'

'মেবার পতনের' দেশপ্রেমদৃপ্ত সংলাপ, গান ও মুক্তি-সংগ্রামের আহ্বান—'আবার তোরা মানুষ হ' নাটকখানিকে অগ্নিময় করে তুলেছে। তাই বিদেশী রাজশক্তি তার সুদূরপ্রসারী কুফল কল্পনা করে নাটকখানিকে 'নিষিদ্ধ' বলে ঘোষণা করলেন। 'রাণা প্রতাপ'ও নিষিদ্ধ হলো।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দু'বছরের ছোট। রবীন্দ্র প্রতিভার দীপ্ত সূর্য তখনও মধ্যাহ্নগগনে উদিত হয়নি। সঙ্গীত বলতে দেশে প্রচলিত ছিল উচ্চাঙ্গ ও তালমাত্রিক সঙ্গীত এবং কীর্তন, রামপ্রসাদী ভজন ও বাউল গান। কীর্তন ভিন্ন সম্প্রদায় বা সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতের সুর বাংলা গানে খুব কমই প্রচলিত ছিল। এই ধরণের সুর প্রথম প্রবর্তিত হলো ডি, এল, রায়ের গানে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে যে সব গান শোভাযাত্রা বা দলবদ্ধ নগর পরিক্রমায় লওয়া হলো, সেগুলি সাধারণতঃ ডি, এল, রায়ের সুর নামেই অভিহিত হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের সমন্বয়ে ডি, এল, রায়ের সুরগুলি ডি, এল, রায় নিজেই প্রবর্তন করেন।

এই গানগুলি প্রধানতঃ ছিল—

যে দিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।'

* * *

'বঙ্গ আমার জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর মলিন বসন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!'

* * *

'জননী বঙ্গ ভাষা এ জীবনে
চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান।
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
অমল কমল চরণে স্থান॥"

পরবর্তী যুগে 'রবীন্দ্র সঙ্গীতে' সারা বাংলা দেশ প্লাবিত হলো এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য লেখকের রচিত গল্প ও আধুনিক গান প্রচলিত হলো। রাগপ্রধান গানের প্রচলন কমে গেল।

কাব্যধর্মী ও মিস্টিক ভাবাশ্রিত গান রবীন্দ্রনাথই ব্যাপকভাবে প্রচলিত করলেন। আধুনিক সঙ্গীতে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' নামে স্বতন্ত্র পর্যায়ের সৃষ্টি হলো। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তার পূর্বে সেই ধরণের গান কিছু লিখেছিলেন। যদিও তার সংখ্যা খুব কম।

'ওই নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর
আবার কেন প্রদীপ জ্বালো!

* * *

আজকে আমি শ্রান্ত বড়,
ওমা আমায় কোলে তুলে নে মা,
যেখানে ওই অসীম সাদায়
মিশিয়ে গেছে অসীম কালো॥'

হয়তো কবির মনে শ্রান্তি ঘনিয়ে এসেছিল। হয়তো তাঁর গোপনতম অন্তরের নিভৃত কোণে বেজে উঠেছিল বিদায়ের সুর। তাই চেয়েছিলেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম।

রবীন্দ্রনাথ তখনো নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নি। রবিদীপ্তি সবে বাংলা ও ভারতের আকাশ-সীমা ছাপিয়ে পশ্চিমের চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছে, এমন সময় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল অস্তমিত হলেন বাংলার সাহিত্যাকাশ থেকে।

বঙ্গাব্দ ১২৭০ সালের আষাঢ় মাসে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সহরে। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন সে যুগের একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বাঙালী। দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রলাল। ১২৯১ সালে, একুশ বৎসর বয়সে, দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সসম্মানে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, স্টেট্ স্কলারশিপ নিয়ে কৃষি-

বিষয়ক উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে প্রথমে সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের একজন অধিকর্তা ও পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হন।

জ্ঞানেন্দ্রলাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। তদানীন্তন বাংলার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'বঙ্গবাসী'তে জ্ঞানেন্দ্রলালের অনেকগুলি সাময়িক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে জ্ঞানেন্দ্রলাল বঙ্গবাসীর সম্পাদক হন। দ্বিজেন্দ্রলাল দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত থেকেও নিয়মিত সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নব্যভারত, প্রভা, ভারতী ও প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধাদি লেখেন এবং ক্রমে বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক হয়ে ওঠেন। কবিতা, গান, নাটক ও প্রহসন লিখে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। হাসির গান ও নাটকেই দ্বিজেন্দ্রলাল সমধিক জনপ্রিয় হন। তাঁর হাসির গান, কল্কি অবতার, আষাঢ়ে, ত্র্যহস্পর্শ, আর্যগাথা, বিরহ, পাষাণী, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপ, সাজাহান, নূরজাহান, প্রায়শ্চিত্ত ও মেবারপতন প্রভৃতি বই বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় অবদান।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে শুধু লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেই জনপ্রিয় হয়েছিলেন, তা নয়। বাংলাদেশের লেখক গোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক প্রীতি ও ভাবের আদান প্রদান সুগম করবার উদ্দেশ্যে তিনি 'পূর্ণিমা মিলন' নামে একটী সাহিত্য-তীর্থ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হন। কবি ও সাহিত্যিকদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রতি পূর্ণিমায় এই 'পূর্ণিমা মিলনের' একটি সাহিত্যিক অধিবেশন হতো। সেই অধিবেশনে সাহিত্যসেবীদের সকলকেই তাঁরা আহ্বান করতেন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সালে বিখ্যাত গ্রন্থব্যবসায়ী ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন ও নিজে তার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুভাগ্যবশতঃ কবির সে প্রয়াস পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের প্রাক্কালেই নিয়তির নির্মম আঘাতে অবসিত হলো। অকালে কবি বিদায় নিলেন ইহলোক থেকে।

দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র সঙ্গীতাচার্য দিলীপকুমার একজন প্রথিতযশা কবি ও কথাশিল্পী। সংসারধর্ম না করে ইনি ঋষি অরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল পণ্ডিচেরি অরবিন্দাশ্রমে অতিবাহিত করে সম্প্রতি দিলীপকুমার নিজে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন পুনার সন্নিকটে।

শেষ সাধ

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

জীবন সন্ধ্যায় আজ, ওহে প্রিয়তম !
জানি না কি হেতু মনে জেগেছে বাসনা,
প্রকাশিতে লোক মাঝে কাব্য গাথা মম,
জীবনে যা কোনদিন করিনি কল্পনা।
যখন প্রতিভা ছিল—উদ্যম-যৌবন—
সাহিত্যে সমাজে নানা সুযোগ সহায়,
আপনাবে প্রকাশিতে ছিনু বিস্মরণ,
এখন কি হেতু জাগে দুরাশা হিয়ায় ?
এ মোর জীবনব্যাপি সাধনার ফল,—
নিঙাড়ী হৃদয়-রস—গেঁথেছি যে মালা,
মরণের সাথে সব হবে কি নিষ্ফল—
লুপ্ত হ'বে,—অশ্রুগড়া-কাব্য-শিল্পকলা ?
আমার মরণ পরে, বংশধর কেহ,—
সন্ধান লবে কি এই কাব্য মঞ্জুষার ?
সে চিন্তায় চিত্তে আজ জেগেছে সন্দেহ
প্রকাশিতে তাই এত আগ্রহ আমার !
পুরাইতে সেই সাধ, বিদায় বেলায়,
গন্ধহীন ফুলে গাঁথা মালাখানি মোর—
তুলে দিব ভক্তি-অর্ঘ্য বঙ্গবাণী পায়।
আনন্দে পড়িবে ঝরি' তৃপ্তি আঁখিলোর।

ঠাকুরঝি'র বিয়ে
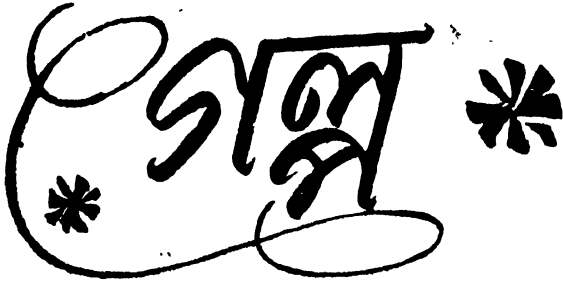
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩১

লীলার চাকরি হইয়াছে। দশটা পাচটা কাজ করিতে হয়। এখন একটা রাঁধার লোক রাখা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। লীলা অফিস করে। বৈকালে বাড়ী পৌছি-য়াই সংসারের কাজে লাগিয়া যায়। সেদিন আফিস হইতে ফিরিতেই খোকা দৌড়িয়া গিয়া 'পিসি, পিসি' বলিয়া লীলাকে জড়াইয়া ধরিল। লীলা তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিয়া তাহার ব্যাগটা খোকার হাতের মধ্যে দিয়া বলিল, বল তো এর মধ্যে কি ?

খোকা। কি, বল না ?

'দেখাচ্ছি, কি'—বলিয়া লীলা তাহার ব্যাগ খুলিয়া একখানি চকলেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। খোকা চকলেট লইয়া নাচিতে নাচিতে তাহার মা'র কাছে চলিয়া গেল।

লীলা স্বাতীর নিকট গিয়া বলিল, আজ মাইনে পেয়েছি, খুকুর জন্য একটা জামা কিনে এনেছি। দেখ তো গায়ে ঠিক হয় কি না। মাপ নিয়ে যাই নি। কাজেই-ঠিক আন্দাজ করতে পারি নি।

স্বাতী ফ্রকের প্যাকেট খুলিয়া দেখিয়া বলিল, হঁ্যা, ঠিক হবে।

সুরেশ ঘরেই ছিল। লীলা মাহিনার টাকাটা সবই দাদার হাতে দিয়া দিল। সুরেশ বলিল—এখন রাখ, পরে দিও। আর তোমার নিজের জামা-কাপড়, জুতা, ট্রাম, বাস, টিফিন, এ সবের জন্য অর্ধেকটা রেখে দাও। আর যা থাকে, তোমার কাছেই থাক। দরকার মত খরচ করো।

স্বাতী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তোমাকে বলছে রাখতে, রাখো না বাপু। সংসারে কখন কি লাগে, তার ঠাকুরঝি কি জানে ? তুমি বরং ট্রাম বাবদ কিছু দিয়ে দাও।

সুরেশ এখন কোন কথা বলিল না। বলিল, লীলা, যাও। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর। চাকরি করা মানে যে কি, তা যারা করে তারা বোঝে।

এই কথা বলিয়া সুরেশ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। লীলা তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

একটু পরে চায়ের টেবিলে বসিয়া লীলা তাহার অফিসের গল্প জুড়িয়া দিল এমন সহজ ভাবে এমন মজার সুরে, যে বাড়ীতে যে কোন মনান্তর বা মনোমালিন্য হইয়াছে, তাহা সকলেই ভুলিয়া গেল।

লীলা বলিল, দেখ বৌদি, ইচ্ছে করে একদিন নিয়ে যাই তোমাকে আমাদের অফিসে। সে যে কি মজা !

স্বাতী। কাজ নেই—আমার অফিসে গিয়ে। বাড়ীতে যে অফিস করছি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

অপর্ণা আসিয়া ডাকিল, কই লীলাদি, অফিস থেকে ফিরেছ ?

লীলা। একটু ব'স, আসছি।

লীলা ঘরে আসিতেই অপর্ণা উদ্ধত ভঙ্গীতে বলিল, তোমার সামনে একটি পথ অজিত কিংবা অফিস—বেছে নাও একটা। তার পরেই নিজেই উত্তর দিল, বেছে নিলাম—অফিস।

লীলা বলিল, তুমি ভারি ফাজিল হয়েছ, অপর্ণা।

অপর্ণা। ও কথা থাক। কেমন অফিস করছ ? ভাল লাগছে ?

লীলা। মাসের মধ্যে একদিন ভাল লাগে।

অপর্ণা। কোন দিন ?

লীলা। যেদিন মাইনে পাই।

অপর্ণা। শুধু সেই দিন? কেন, যেদিন অফিসের পুরুষ বন্ধুরা চা খেতে নেমতন্ন করে, যেদিন তারা সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়—

লীলা। অত সস্তা নয়। পয়সা খরচ করে যাকে তাকে চা খাওয়াবে, সিনেমা দেখাবে, এমন ধনীর দুলাল আমার অফিসের মত অফিসে কাজ করে না। ওই এই চোখ চাওয়া, একটু পাশ ঘেঁসে যাওয়া, ওই পর্যন্ত।

অপর্ণা। কেন, অফিসের কর্তাব্যক্তিরা কি সব সন্নেসী?

লীলা। জানিনে বাপু, তারা কি। কি দরকার আমার অত খবরে?

অপর্ণা। ক্রমে সবই জানবে। আমার বৌদির এক বোন আছে, অফিসে কাজ করে। কেমন করে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে সব আদায় করে নেয়। অথচ কারো বেশি কাছে ঘেঁসে না। কত মজার মজার গল্প করে।

লীলা। যাক ভাই, ওসব আমার ভাল লাগে না। উঃ জানিনে, কতকাল এ দুর্ভোগ বইতে হবে।

অপর্ণা। ইচ্ছে করে বইবে, তার কে কি করবে?

লীলা। থামো, অপর্ণা, থামো। আমাকে আর এমন করে জালিও না।

লীলা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। অপর্ণা অপ্রতিভ হইল। বলিল, আজ আসি ভাই। কত মন্দ কথা বলে ফেললুম। কিছু মনে ক'র না।

অপর্ণা বলিয়া গেল।

'পিসি, পিসি' করিয়া খোকা ঘরে ঢুকিল।

লীলা তাহাকে খাটের উপরে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিল।

৩২

লীলার অফিস। বৈকালে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। ছুটীর পরে একে একে সকলেই বাহির হইয়া যাইতেছে। কেহ ছাতা মাথায় দিয়া, কেহ ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল। কেহ দরজা হইতে দৌড়াইয়া গিয়া ভিজিতে ভিজিতেই বাস ধরিল।

অফিসের পাঁচ ছয়টি মেয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইতে ইতস্তত করিতেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এই মেয়ে কয়টি ছাড়া আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে। লীলা বলিল, কি করা যায় এখন?

একটি মেয়ে বলিল, আর একটু দেখি। তার পর ভিজতে ভিজতেই বেরিয়ে পড়ব।

আর একজন বলিল, আকাশের যা অবস্থা, তাতে বৃষ্টি শিগ্‌গির ছাড়বে বলে মনে হয় না। আর একজন বলিল, আর একটু দেখা যাক। এইরূপ কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহারা দেখিল, অফিসের চাকর-বাকরেরা সব দরজা জানলা বন্ধ করিতেছে।

লীলা বলিল, আর বোধ হয় এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। খালি অফিসে এমন করে থাকাটাও মোটেই ভাল হবে না। সকলেই বলিল, হ্যাঁ, আর এখানে এমন করে থাকাটা ঠিক হবে না। চল, বেরিয়ে পড়ি।

এইরূপ কথাবার্তার পর যখন তাহারা সিঁড়িতে নামিয়াছে, তখন উহারা দেখিল, একটি যুবক একখানি গাড়ী চালাইয়া ঠিক সেই পথেই যাইতেছে। লীলা অজিতকে চিনিল। অজিতও লীলাকে দেখিতে পাইয়াই গাড়ী থামাইয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। লীলা পড়িল মুস্কিলে। এতগুলি মেয়ের সামনে সে কেমন করিয়া বলে, ওকে চিনি না। তবু লীলা অজিতের দিকে না তাকাইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

একটি মেয়ে বলিল, লীলাদি, দেখ, তোমার চেনা কেউ হবে। তুমি যদি যাও, আমরাও যাব কিন্তু। লীলা তবু কোন কথা বলে না।

একটি মেয়ে বলিল, বুঝচিস না। আমাদের সঙ্গে যাবে কেন? একা একা যাবে। চল, আমরা সরে পড়ি।

লীলা বলিল, না, না, তোমরা যেও না।

মেয়েরা। তবে নিয়ে চল আমাদেরও।

লীলা। আমিও যাব না।

ওদিকে অজিত একটু একটু হর্ণ দিতেছে। আর লীলার দিকে হাত ইসারা করিতেছে।

লীলার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, কি মুস্কিল।

একটি মেয়ে বলিল, মুস্কিল আর কি, আমরা যাচ্ছি না তোমার গাড়ীতে।

লীলা ভীতস্বরে বলিল, না, না, না। তোমরা আমাকে

একা ফেলে যেও না। আমি গাড়ীতে যাব না। চল, তোমাদের সঙ্গেই যাব।

মেয়েরা বলিল, সে কি হয়! ওই যে বৃষ্টি একটু কমেছে মনে হচ্ছে। আমরা চল্লুম।

ওদিকে অজিত একটু একটু হর্ণ দিয়াই চলিয়াছে।

লীলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়া ফেলিল, তোমরাও চল।

মেয়েরা। না, ভাই, তোমাদের অসুবিধে হবে।

লীলা। যাও! কি যে বল! চল তোমরাও চল! একদিকেই যাব আমরা। বাড়ীর কাছে নেমে গেলেই হবে।

মেয়েরা সম্মত হইল। সকলেই হুড়মুড় করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, মেয়েরা কত অনুরোধ করিল, লীলাকে সামনে অজিতের পাশে বসিতে, কিন্তু লীলা কিছুতেই সম্মত হইল না। অপর দুইটি মেয়েকে সামনে বসাইয়া দিয়া নিজে আর তিনজনের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করিয়া পিছনে বসিল।

ঠিকানা শুনিয়া লইয়া অজিত এক একজনকে নামাইয়া দিতে লাগিল। শেষে থাকিল লীলা। শেষ মেয়েটি নামিবার সময় বলিল, এবার যাও, সামনের সীটে গিয়ে ব'স। লীলা কোন কথা বলিল না। বাড়ীর একটু দূরে যাইতেই লীলা বলিল, আমাকে এখানে নামিয়ে দিন।

অজিত। কেন?

লীলা। এমনি।

অজিত। বাড়ী পর্যন্ত গেলে দোষ কি?

লীলা। দোষ থাক বা না থাক, আমায় এখানে নামিয়ে দিন। বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি অমনিই যেতে পারব।

অজিত। কেন আপনার এত আপত্তি?

লীলা। আপনি আর দেরী করবেন না, নামিয়ে দিন আমাকে।

অজিত। যদি না নামিয়ে দিই?

লীলা। দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ব।

অজিত। কি আশ্চর্য!

লীলা। দিন আমাকে নামিয়ে।

অজিত। কিন্তু আপনি জানবেন, ওই মেয়েরা সবাই দেখেছে, আপনি আমার সঙ্গে একা মোটরে বেরিয়েছেন। অস্বীকার করতে পারবেন?

লীলা। উঃ, কি ভয়ানক লোক আপনি? কেন আপনি আমার এমন সর্বনাশ করবেন?

অজিত। কেন, তা কি আপনি বোঝেন না, না জানেন না।

লীলা। অজিতবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে নামিয়ে দিন। আমি হেঁটে বাড়ী যাব। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নি। কেন আপনি আমার জীবনটাকে—

অজিত। আচ্ছা, নামুন, কিন্তু কাজটা মোটেই ভাল করলেন না। গাড়ী থামিল। লীলা নামিয়া রুদ্ধশ্বাসে হাঁটিতে লাগিল বাড়ীর দিকে। অজিত গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

৩৩

দুই তিন দিন পরে। রাত্রে স্বাতী সুরেশকে বলিল, একটা দরকারী কথা আছে।

সুরেশ। আমার ঘুম পাচ্ছে।

স্বাতী। খালি ঘুমুলে সংসার চলে না?

সুরেশ। সারাদিন খালি ঘুমুচ্ছি, না।

স্বাতী। প্রায় তাই।

সুরেশ। মানে?

স্বাতী। সকালে খেয়ে দেয়ে অপিসে গিয়ে ব'স। আর বিকেলে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। এই তো কাজ?

সুরেশ। দেখ, এখন বক বক করো না।

স্বাতী। বক বক আমাকে করতেই হবে। আর তোমাকেও তা শুনতে হবে।

সুরেশ। যা বলবে, তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো।

স্বাতী। তোমার গুণের বোনের কথা বলছি।

সুরেশ। কি হয়েছে?

স্বাতী। কি আবার হবে, মাথা আর মুণ্ডু। উনি আজকাল অফিস থেকে ফেরবার সময়ে কার মোটর গাড়ীতে করে বেড়াতে যান।

সুরেশ। অসম্ভব!

স্বাতী। অসম্ভব বল্লেই হবে না। আমি সত্যি কথাই বলছি।

সুরেশ। কে বলেছে তোমাকে?

স্বাতী। যেই বলুক। যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তাদের কাছেই শোনা।

সুরেশ। আচ্ছা, আমি এখুনি জিজ্ঞেস করছি লীলাকে।

স্বাতী। বেশ, তাই কর।

সুরেশ। আচ্ছা, তুমি একটু ওঘরে যাও। সুরেশ ডাকিল, লীলা!

লীলা। কি দাদা, ডাকছ? এই কথা বলিয়া লীলা ঘরে ঢুকিল এবং বলিল, বৌদি কই।

সুরেশ। ওঘরে আছে!

লীলা। ওঘরে থাকবার দরকার কি? এখানে আসুন। বৌদি!

স্বাতী আসিল।

লীলা বলিল, আমাদের মধ্যে কোন গোপন কথা থাকা আমি ভাল মনে করিনে। বৌদি, ব'স।

সুরেশ বলিল, শুনলাম, তুমি নাকি কার গাড়ীতে করে একা একা বেড়াতে যাও। আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি নে।

লীলা বলিল, এই কথা, শোন তবে বলছি।—এই কথা বলিয়া সেদিন অফিস হইতে বাহির হইবার সময়ে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সব বলিল।

সুরেশ সব শুনিয়া বলিল, আমিও তাই বলি। লীলা কখনো কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না।

স্বাতী বলিল, কিন্তু রটে তো গেছে।

লীলা। তার আমি কি করব। আমি সেদিন গাড়ীতে না উঠলেও ওরা রটাত—আমাকে তুলে নেবার জন্য গাড়ী এসেছিল। ও একই কথা। অজিতবাবু লোকটি কেমন, তা এখন তোমরা বুঝেছ, বোধ হয়।

সুরেশ আর কোন কথা বলিল না। শুধু বলিল, যাও, শোও গে, রাত হয়েছে।

লীলা চলিয়া গেল।

স্বাতী সুরেশকে বলিল, যাই বল। এর একটা বিহিত করতে হচ্ছে। আচ্ছা, অজিতবাবুর সঙ্গে বিয়ে হলেই সব মিটে যায়। তুমি সেই চেষ্টা কর না কেন?

সুরেশ। লীলার যে মত নেই।

স্বাতী। মেয়েছেলের আবার মতামত কি? তোমরা ভাল বুঝে যা ব্যবস্থা করবে, তাইতে ওর মত করা উচিত। আমি বাপু সোজা মানুষ, সোজা বুঝি।

সুরেশ। আচ্ছা, দেখি একটু ভেবে।

৩৪

লীলা অফিস হইতে ফিরিয়াছে। ঘরে যাইতেই স্বাতী বলিল, ঠাকুরটা ছুটি নিয়ে চলে গেছে। চট্ করে কাপড়-চোপড় ছেড়ে একবার হেঁসেলের দিকে যাও।

লীলা। বৌদি, আজ আমার অনেক খাটুনি গেছে অফিসে। এখন আর হেঁসেলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

স্বাতী। অফিস করলে বুঝি আর একটু ঘরকন্নার কাজ করা যায় না? যে রাঁধে সে বুঝি আর চুল বাঁধে না?

লীলা। সত্যি, আজ আমি বড় ক্লান্ত। পেরে উঠব না। তুমি বরং যাও আজ। আমি খোকা খুকুকে দেখব।

স্বাতী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, পারবো না? আমি যে সারাদিন খাটছি, আমার কাজ আর কাজ নয়?

এই কথা বলিয়া স্বাতী রাগে গরগর করিতে করিতে রান্না ঘরের দিকে গেল। যাইবার সময়ে বলিতে লাগিল, এদিকে ভাল সম্বন্ধ পেলে বিয়েও করবেন না। আবার একটু গেরস্তর কাজ-কম্মও করবেন না। ভাইয়ের ঘাড়ে বসে থাকতে লজ্জাও করে না।

লীলা ঘরে গিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল এবং ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত রূঢ় কথা শুনিতে হইবে স্বাতীর মুখে, তাহা লীলা কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই।

৩৫

পরদিন সকালে সুরেশ দাড়ি কামাইতেছে। স্বাতী বোধ হয় বাথরুমে। লীলার চোখ মুখ লাল, ফোলা ফোলা।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, কি ব্যাপার! চোখ-মুখ অমন হয়েছে কেন?

লীলা কাঁদ কাঁদ স্বরেই বলিল, একটা কথা ছিল দাদা।

সুরেশ গাল মুছিয়া একখানি চেয়ারে বসিল এবং

লীলাকে বলিল, বস ওখানে।—বলিয়া ড্রেসিং টেবিলের টুল দেখাইয়া দিল।

লীলা মুখ নীচু করিয়া বলিল, দাদা, যেখানে হোক, আমার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেল। আমার আর এ বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়। অথচ আমার যা মাইনে, তাতে স্বাধীন ভাবে আর ভদ্রভাবে বাস করাও সম্ভব নয়। মেসে টেসে আমার থাকতে ইচ্ছে নেই। তবে বাধ্য হলে তাও করতে হবে।

সুরেশ। খোঁজ করছি অনেক দিন থেকেই। যোগাযোগ হচ্ছে না। কিন্তু তোমার এমন একটা কঠিন মনোভাব কেন হ'ল? এ বাড়ীতে আর থাকা যাচ্ছে না!' এর মানে কি?

লীলা নীরব।

সুরেশ বলিল, মানে আমি যে একেবারে না বুঝছি, তা নয়। তবে ঠিক এতখানি, তা ধারণা করতে পারি নি। এখন তো চাকরিও করছ, তবু—

লীলা। হ্যাঁ। তবু আমাকে এ বাড়ী ছাড়তে হবে।

সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, অজিতবাবুর সঙ্গে যদি হয়?

লীলা। যার সঙ্গে তোমাদের ইচ্ছে, তার সঙ্গেই ঠিক কর।

সুরেশ। তোমার মত হবে?

লীলা। আমার আর কোন মতামত নেই।

সুরেশ। তুমি ভাল করে ভেবে দেখ।

লীলা। আমার ভাবনা চিন্তা শেষ হয়ে গেছে। ভাববার শক্তিও আমার অবশিষ্ট নেই। আমাকে তোমরা রেহাই দাও।

এই কথা বলিয়া লীলা চলিয়া গেল। স্বাতী এই সময়ে ঘরে আসিল। ভিজা জামা কাপড় অবলার হাতে দিয়া বলিল, নে এগুলো শুকুতে দে। ভাল করে মেলে দিস। তারপর সুরেশকে বলিল, কি কথা হচ্ছিল, শুনি?

সুরেশ। লীলার সঙ্গে?

স্বাতী। হ্যাঁ গো, আর আবার কার সঙ্গে।

সুরেশ। কথা আর কি হবে? ওর মনটা খুব খারাপ হয়েছে। চঞ্চল হয়েছে।

স্বাতী। তা আর হবে না? অত বড় গ্রাজুয়েট মেয়ে, তারপর আবার অফিসের চাকরি। কত বন্ধু-বান্ধব!

সুরেশ। যাও, তোমার ওসব বাজে কথা রাখ।

স্বাতী। হ্যাঁ, বাজে কথাই তো। আমি আর মেয়েদের মনের কথা বুঝি নে কিনা!

সুরেশ। বোঝ, বেশ কর। আমার মনে হয়, অজিতবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ হ'লে ও বোধ হয় আর আপত্তি করবে না।

স্বাতী। আপত্তি করবে, না বর্তে যাবে? এতদিন পরে সুমতি হয়েছে তা'হলে?

সুরেশ। সুমতি কুমতি নয়। লীলা যেন কেমন উদাসীন হয়ে পড়েছে।

স্বাতী। ওগো, অমনি হয় বিয়ের ঠিক আগে।

সুরেশ। তাই নাকি? তুমিও হয়েছিলে বুঝি?

স্বাতী। আবার আমার কথা?

সুরেশ। আচ্ছা থাক। তাহলে তুমি বল, কথাটা পাড়ব?

স্বাতী। নিশ্চয়ই। কালই তুমি যাবে।

সুরেশ। এত তাড়াতাড়ি কি? আসছে রবিবারে যাব।

স্বাতী। তাই যেও। বেশি দেরি ক'র না কিন্তু। আবার ওঁর মত কখন বদলে যাবে।

সুরেশ। না, আর দেরি করা হবে না।

স্বাতী। যাও, চান কর গে। বেলা হ'ল।

সুরেশ। যাই—

[ক্রমশঃ

প্রথমে খুলে যায় না, ভূগর্ভে থাকে আত্মগোপন করে। হ্রদ ও জলাশয় পর্যন্ত থাকে গুহার মধ্যে। গুহামুখ থাকে তখনও বন্ধ। তারপর ধীরে ধীরে তুষার বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝার কবলে পড়ে উপরের মৃত্তিকাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অবশেষে ভেঙে পড়ে পাষাণ প্রাচীর প্রাকৃতিক আঘাতে সংঘাতে, গুহার মুখ যায় খুলে আর সূর্য্যালোকের পায় স্পর্শ, আলোকে ওঠে জেগে উদ্ভিদ জীবন আর প্রাণীদের হয় আবির্ভাব।

সংখ্যাবহুল .. গুহা দেখা যায় উত্তর আমেরিকায়। অনেকগুলি হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ানা, কেণ্টকি, মিসৌরী, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের গুহাগুলি বিশ্বের পরম বিস্ময়। উত্তর আমেরিকায় এমন গুহাও আছে যা দৈর্ঘ্যে দশমাইল। এর নাম ম্যামথ কেভ বা হস্তীগুহা। তারপর মনে পড়ে ফ্রান্স, স্পেন, করুনিযোলা ও অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গুহাগুলিকে। সেগুলি দেখেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

এই সব গুহার ভেতর ঘুমিয়ে আছে মানুষের প্রথম হারানো দিনের ইতিহাস। এসব জায়গায় নানা দেশ থেকে আসেন প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ববিদ ও কলাবিদরা। তাঁদের কাছে এরা তীর্থস্বরূপ আর প্রণম্য। গুহার ভেতর সাধারণতঃ আলোর অভাব। উত্তাপের সমতা এর বৈশিষ্ট্য। গুহার ভেতর সূর্য্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না, মুখের খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে সূর্য্যের আলো। গুহার ভেতর যতই প্রবেশ করা যায়, ততই অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এর ভেতর থাকে নানা প্রাণী। তারা পায়না চোখে দেখতে। গুহায় ঋতু পরিবর্ত্তন কালীন তাপের তারতম্য নেই।

ইণ্ডিয়ানায় একটি গুহা আছে। নাম শওনী। সারা বছরে মাত্র বাইশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পরিমাণ তাপের তারতম্য দেখা যায়। এই গুহায় উন্মুক্ত প্রান্তভাগ দিয়ে অবাধে বাতাস বয়ে যায়। আবার করান অঞ্চলের গুহাভ্যন্তরগুলি অন্যান্য গুহার মত পুরোপুরি অন্ধকার নয়। সমুদ্রবিধৌত গুহামুখের মধ্য দিয়ে জলকণার সাহায্যে আলোক রশ্মি বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সব স্থানে সব সময়ে সমান নয়।

জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে নদী ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী গুহামুখগুলি জলপূর্ণ অথবা জলহারা হয়ে থাকে, ফলে আর্দ্রতার মাত্রা বেশীকম দেখা যায়। আলো আর শুষ্কতার অভাবে গুহার ভেতরে সবুজ তৃণলতা জন্মাতে পারে না। গুহার অন্ধকারময় পরিবেশকে অনেকটা সমুদ্রগর্ভের পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

গুহাবাসীর বৈশিষ্ট্য বর্ণহীনতা। যেখানে আলো নেই, সেখানে রঙের অভাব। তাই রঙের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে আলোর সঙ্গে। আলোর ছোঁয়াচ না পেলে বর্ণ কোষগুলির ত্বকের নীচেকার গভীর অংশ ওঠে না জেগে। বর্ণহীন গুহাবাসী বাইরে এসে আলোর মধ্যে থাকলে, ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় তার বিবর্ণতা, ফুটতে থাকে তার অন্ধকার। গুহার অন্ধকারে চোখের কাজ চলেনা, তাই গুহাবাসী প্রাণীমাত্রেই অন্ধ। ফরাসী পণ্ডিত লেমার্ক বলেছেন, প্রয়োজন অনুসারে দেহযন্ত্রাদির ব্যবহার অথবা অপব্যবহারের ফলে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

গুহাবাসী মানুষকে বাইরে আসতে হয়েছে খাদ্যান্বেষণে। খাদ্য সংগ্রহ করে তাকে গুহার শান্ত আশ্রয়টিতে ফিরে আসতে হয়েছে শুধু থাক্‌বার জন্যে নীড়ে-ফিরে-আসা পাখীর মত। সেদিন মানুষ ঘর বাঁধতে শেখেনি, রান্না করে খেতেও জানতো না। ফ্রান্সের Langeric Basse নামক স্থানে মাটির নীচে পাথরের তলায় পাওয়া গিয়েছে অতিদূর অতীতের গুহাবাসীদের অনেক চিহ্ন। এই জায়গাটা ছিল প্রাচীনকালে একটি প্রকাণ্ড পাথরের তলায়, আর একটি স্রোতের পাশে। মাটির একটি স্তরে অদ্ভুত গড়নের নানা রকম পাত্র পাওয়া যায়। এমন কি উনানের ছাই পর্য্যন্ত দেখা গেছে। এই স্তরের পরের স্তরে কোন প্রকার কিছু পাওয়া যায় নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, সেই অতীতের গুহাবাসীদের এই আশ্রয়স্থল একদা পরিত্যক্ত হয়েছিল, আর গুহাবাসীরা বোধ হয় অন্য কোথাও ভালো শিকারের ও খাদ্যের সন্ধান পেয়ে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। তারপর তৃতীয় স্তরে যে সব চিহ্ন পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় যে এদিনের লোকেরা তাদের পূর্ব্বপুরুষদের চেয়ে কিছু পরিমাণে সভ্যতা লাভ করেছিল। হরিণের খোদাই মাথা, হাতের বালা আর পাথর খোদাই করবার যন্ত্রপাতিও সে স্তরে দেখা যায়। তার পরের স্তরে খুব সুতীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত মাছ মারবার বর্শা দেখা যায়। নানারকম জন্তুর হাড়ের ওপর নানা প্রকার সুদৃশ্য খোদাই চিত্রও দেখা যায়। এর পর তিনশো বছরের মধ্যে আর কোন রকমের মানুষের চিহ্ন এখানে দেখা যায় না। এই স্তরে নানা প্রকার স্বতঃ-সঞ্চিত আবর্জ্জনা মাটি পড়ে আছে। এই স্তরের পরেই নিওলিথিক মানুষদের চিহ্ন দেখা যায়। এই সময়ের মানুষদের কুড়াল, হাঁড়ি-কুড়ি ইত্যাদি তাদের পূর্ব্বপুরুষদের চেয়ে ঢের বেশী সভ্যতার পরিচয় দেয়। এম্নিভাবে পৃথিবীর নানা দিকে সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছি। বর্ত্তমান যুগ সভ্যতার যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, অগ্রগতির যুগ বলে গৌরব বোধ করি। এই যুগ আসলে চরম বর্ব্বরতার যুগ, হিংসা ও দ্বন্দ্বের যুগ, মনুষ্যত্বের অভূত-পূর্ব্ব অবনতির যুগ। এ যুগের মানুষ পাশবিক শক্তি প্রকাশে উদ্যত। বিংশ শতাব্দী সুরু থেকেই যুদ্ধ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এর প্রারম্ভে দেখা দিল বুয়রযুদ্ধ।

বুয়রযুদ্ধ থামতে না থামতেই স্থরু হোলো রুশজাপানযুদ্ধ। তারপর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দিল বলকান যুদ্ধ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধ।· তারপর উদ্ভব হোলো রুশিয়ার গণশক্তি, রুশ সম্রাটের রাজশক্তিকে ধ্বংস করে গড়ে উঠলো সোভিয়েট শক্তি, স্থরু হোলো ভারতে অসহযোগ আন্দোলন। তারপর চীন জাপানে যুদ্ধ স্থরু হোলো, আর দেখা দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতে প্রত্যক্ষ সংঘেদ হয়ে গেল যা বর্ব্বরতার চরম অভিব্যক্তি, তারপর কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে স্থরু করে ছোটখাটো যুদ্ধ নানাদিকে আজও চলেছে। চীনের ভারত আক্রমণ সেদিন হোলো, বর্ত্তমানে ঘোরালো রকমের যুদ্ধের জন্যে চীন প্রস্তুত হচ্ছে। ভারত আক্রমণই তার প্রধান লক্ষ্য। বিংশশতাব্দীতে চলেছে অবিচ্ছিন্ন নররক্তপাত তৃতীয় মহাযুদ্ধের অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের সর্বনাশ করা, আর জনশক্তিকে অনাহারে রেখে পঙ্গু করা পৃথিবীর রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের লক্ষ্য। আজ বিপর্য্যয়ের সম্মুখে আমরা নিঃশেষিত প্রায়। সভ্য মানুষের বর্বর মনোবৃত্তি এর প্রধান কারণ। এ সময়ে তোমাদের আত্মোপলব্ধি হোক। উঠে দাঁড়াও আত্মহত্যার অমর্যাদা হোতে অব্যাহতির জন্যে—মাতৃভূমির রক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে শপথ গ্রহণ করো। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস পড়ে উপলব্ধি করো—কি ছিলাম, ভেবে দেখো কি হয়েছি আর কি হবো। দুঃখময় অভিজ্ঞতা থেকে চিনে নাও শত্রু স্বজন।
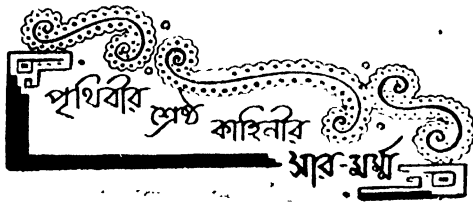
ফ্রাঙ্কোয়া কোপে

রচিত

সোনার মোহর

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৩

'ক্যলে' টেবিলের গোল-চাক্তিখানা বোঁ-বোঁ করে কয়েক পাক ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত থামলো এসে লাল-রঙের ঘরে··· অপ্রত্যাশিতভাবে এবারের বাজীতেও একরাশ সোনার মোহর জিতে ল্যুসিয়েঁর মন উল্লাসে ভরে উঠলো! বাস্তবিকই, বিধাতার কৃপায় সে রাতে ল্যুসিয়েঁর বরাত যেন খুলে গেল·জুয়ার আসরে বসে যতবারই তিনি মোটা-মোটা টাকার বাজী ধরেন, প্রত্যেক দানেই তাঁর জিৎ হয়!

এমনিভাবে বারংবার জুয়ার আসরে বসে মুঠো-মুঠো টাকা, পয়সা, মোহর আর নোটের বাণ্ডিল কুড়োতে কুড়োতে ল্যুসিয়েঁ আরো বেশী অর্থলাভের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন··দুনিয়ার কোনোদিকে নজর দেবার ফুরসৎ নেই! ভাগ্যের দৌলতে কি বাজীতেই তাঁর হাতে টাকা-কড়ি আসতে স্থরু করলো প্রবল-বন্যার বেগে···সারা সন্ধ্যা জুয়ার নেশায় মেতে একের পর এক বাজী হেরে ল্যুসিয়েঁ ইতিপূর্ব্বে কয়েক হাজার টাকা যা খুইয়ে বসেছিলেন, সে সবই যেন অজানা কোন যাদু-মন্ত্রের বিচিত্র-প্রভাবে দ্বিগুণ ··চতুর্গুণ হয়ে নিমেষের মধ্যে আবার ফিরে এলো তাঁর হাতে! শুধু তাই নয়, এতদিন ধরে নিত্য জুয়ার আসরে বসে বছরের পর বছর ল্যুসিয়েঁ তাঁর পৈতৃক-অর্থ যা কিছু অপব্যয় করে এসেছেন, বড়দিনের রাতে ভাগ্যবিধাতার কৃপা-দৃষ্টির ফলে, তার চেয়ে আরো অনেক অনেক বেশী টাকা, তিনি সহজেই ফিরে পেলেন। টাকার নেশায় ল্যুসিয়েঁ তখন এমনই মশগুল যে, গায়ের পুরু ওভার-কোটটিকে খুলে রেখে আসবার খেয়ালটুকুও হারিয়ে বসেছিলেন—নেশার ঝোঁকে মাতাল যেমন দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে বসে, ঠিক তেমনিভাবেই দু'হাতে রাশিরাশি টাকা, নোট আর মোহর কুড়িয়ে ল্যুসিয়েঁ তাঁর পোষাকের পকেটগুলি এমনই ঠেসে ভরে তুললেন যে শেষ পর্য্যন্ত রাখবার আর এতটুকু ঠাঁই রইলো না কোথাও! ল্যুসিয়েঁ ভাবলেন,—প্রচুর হয়েছে প্রয়োজন নেই এর বেশী রোজগারে!

এ কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই ল্যুসিয়েঁর মনে হঠাৎ জাগলো—বিবেকের তীব্র দংশন··আত্মগ্লানির জ্বালা!··· তার এতক্ষণে হুঁশ হলো··জুয়ার আড্ডার বাইরে কনকনে হিমের রাতে বরফ-ঢাকা নিরালা-পথের প্রান্তে একা অসহায়-অবস্থায় পড়ে রয়েছে দীন-দুঃখী সেই ঘুমন্ত-মেয়েটি, ঘুমন্ত-মেয়েটির দুর্দ্দশার করুণ-স্মৃতি মনে ভেসে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই ল্যুসিয়েঁর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষোভে-লজ্জায়-আত্মধিক্কারে জ্বালা করতে লাগলো! কি নিষ্ঠুর-অমানুষিক আচরণ করে এসেছেন তিনি, এমন নিশুতি-রাতে বাইরে হিমে নির্জ্জন-পথের প্রান্তে সম্পূর্ণ-নিঃসহায় অবস্থায় সেই ছোট্ট ঘুমন্ত-মেয়েটিকে একা বিপদের মুখে ফেলে রেখে!···সম্ভ্রান্ত-বোনেদী বংশের সন্তান হয়ে তিনি শেষে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার-আদর্শ সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে অসঙ্কোচে পথের ভিখারী সেই ঘুমন্ত মেয়েটির একমাত্র সম্বল সোনার

মোহর চুরি করে এনে ইতর-স্বার্থপরের মতো জুয়ার আসরে বাজীর পর বাজী জিতে রাশিরাশি টাকা, নোট আর মোহর কুড়িয়ে নিজের পকেট ভরে তুলেছেন… বরাত ফিরিয়েছেন…অথচ, একটিবার চিন্তাও করেননি সেই নিঃসহায়-মেয়েটির দুঃখ-দুর্দশার কথা—যার শেষ-কড়িটির বিনিময়ে তিনি আজ এতখানি দৌলত লাভ করেছেন !

ল্যামিয়ের অন্তরাত্মা বিদ্রোহে ফুঁশে উঠলো ! না… এ হতেই পারে না ! এমন অন্যায় …এতখানি অবিচার ! …বেচারী মেয়েটি নিশ্চয় এখনো অসহায়-অবস্থায় একা পড়ে রয়েছে বাইরে হিমে ঐ নিরালা-পথের প্রান্তে …এখনই …এখনই ঘড়িতে রাত একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজে সযত্নে ওকে তুলে নিয়ে যাবো আমার বাড়ীতে—নিরাপদ আশ্রয়ে…আমার নরম তুলতুলে বিছানায় আরামে শুইয়ে রেখে নিজের হাতে করবো ঐ ছোট্ট মেয়েটির সেবা-শুশ্রূষা…ওষুধ-পথ্য, খাবারদাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বইপত্র, খেলনা…সব কিছু দিয়ে নিজের মেয়ের মতো যত্নে-আদরে মানুষ করে তুলবো ওকে…প্রচুর টাকা পণ দিয়ে মনের মতো পাত্র খুঁজে এনে বিয়ে দেবো মেয়েটির…প্রাণ ভরে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আজীবন দেখাশোনা করবো ওকে !

কিন্তু জুয়ার মোহ এমনই মারাত্মক যে ল্যামিয়েরের এত ভাবনা-চিন্তা সব মনেই রয়ে গেল…কাজে ফললো না ! আড্ডাখানার দেয়ালের ঘড়িতে ওদিকে ক্রমেই বেজে চললো —রাত একটা…সওয়া একটা…দেড়টা…পৌনে দুটো ! …ল্যামিয়ে তখনো কিন্তু রয়েছেন আগের মতোই জুয়ার নেশায় মেতে…খেলার আসর ছেড়ে উঠে বাইরে পথে বেরিয়ে গিয়ে দুঃস্থ-মেয়েটিকে সযত্নে তাঁর বাড়ীতে নিরাপদ-আশ্রয়ে তুলে নিয়ে যাবার কোনো খেয়াল নেই !

এমনিভাবে রাত গড়িয়ে চলে শেষে দেয়ালের ঘড়িতে যখন দুটো বাজতে আর মাত্র এক মিনিট বাকী, তখন সবাইকে শুনিয়েই জুয়ার আসরের কর্তা কর্তা হাঁকলেন, রাত অনেক হলো…এবারে আপনারা পাততাড়ি গোটান, মশাই ! তাছাড়া আমাদের আড্ডার তহবিল বিলকুল সাবাড়…কাজেই আজকের মত এখানেই খেলা সাঙ্গ হলো !

আসর ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ল্যামিয়ে লাফিয়ে উঠলেন…তাঁর হঠাৎ হুঁশ হলো, নিশুতি-রাতে বাইরে হিমে নিরালা পথের মোড়ে দুঃস্থ ছোট্ট মেয়েটি তখনো একা অসহায়-অবস্থায় পড়ে রয়েছে ! খেয়াল হতেই আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, পাগলের মতো আসরের লোকজনের ভীড় ঠেলে ল্যামিয়ে জুয়ার আড্ডা ছেড়ে বাইরে পথে বেরিয়ে এলেন…কারো পানে তাকাবার বা দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড খোশ্‌গল্প করবার এতটুকু ফুরসৎ নেই তাঁর !

আড্ডা ছেড়ে বাইরে পথে বেরিয়েই উন্মত্তের মতো ছুটে ল্যামিয়েঁ এসে হাজির হলেন, মোড়ে বিরাট প্রাসাদের দেউড়ীর কিনারে পাথর-বাঁধানো রোয়াকের সামনে… কনকনে হিমের রাতে বরফে-আচ্ছন্ন রোয়াকের উপর তখনো গাঢ়-ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে নিঃসহায় সেই দীন দুঃখী ছোট্ট মেয়েটি !

মেয়েটিকে তখনো সেখানে একা ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে, ল্যামিয়ের করুণা হলো…আগ্রহভরে অসহায়-মেয়েটির কাছে ছুটে গিয়ে তিনি তার কচি-হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন। বরফের মতো কন্‌কনে-ঠাণ্ডা সেই ছোট্ট মেয়েটির হাত ! ল্যামিয়ে ভাবলেন,—আহা, এই দারুণ শীতে বাইরে হিমের মধ্যে পড়ে বেচারী কত কষ্টই না ভোগ করছে এতক্ষণ !

এই ভেবে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিরাপদ-আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে, ল্যামিয়ে সযত্নে সেই ঘুমন্ত মেয়েটিকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নিলেন। মেয়েটির দু'চোখ তখনো গভীর ঘুমে জড়িয়ে রয়েছে… ল্যামিয়ের বুকে আশ্রয় পেয়েও সে ঘুম আর ভাঙলো না…বরফে-ঢাকা পাথরের রোয়াকের উপর একরত্তি দেহভার লুটিয়ে সে যেমন অচেতন পড়েছিল, তেমনিই রইলো বরাবর ! ঘুমন্ত-মেয়েটির শান্ত-সুন্দর মুখের পানে তাকিয়ে ল্যামিয়ের মায়া হলো…ভাবলেন, আহা, বেচারী কত ক্লান্ত…এমন বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ! করুণাভরে ল্যামিয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটির নিদ্রাতুর আঁখি-পল্লবের উপর মৃদু চুম্বনের আদর-স্পর্শ দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। …মেয়েটির ঘুম কিন্তু ভাঙলো না…কনকনে-ঠাণ্ডা বরফে-আচ্ছন্ন রোয়াকের উপর দেহভার লুটিয়ে সে এতক্ষণ যেমন বেহুঁশ পড়েছিল, তেমনিই রইলো—প্রাণের সাড়া নেই এতটুকু !

ল্যামিয়ে সচকিত হয়ে উঠলেন…উদ্বেগভরে ঘুমন্ত মেয়েটির মুখের পানে তাকাতেই তিনি দেখলেন—তার চোখ দুটি অর্দ্ধনিমিলিত…দৃষ্টিও কেমন যেন ঘোলাটে ধরণের…আঁখিতারা দুটি নিশ্চল-স্থির…দেহের কোথাও নেই প্রাণ-স্পন্দন ! ল্যামিয়ে শিউরে উঠলেন !…তাহলে…? ছোট্ট এই মেয়েটি কি তবে…

উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে ল্যামিয়ে তাড়াতাড়ি গাঢ়-ঘুমে অচেতন মেয়েটির হিম-শীতল মুখের কাছে তাঁর নিজের উষ্ণ মুখখানি এগিয়ে আনলেন…কিন্তু বারবার পরখ করে দেখেও সে বেচারীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো সাড়া পেলেন না। ল্যামিয়ে চমকে উঠলেন…তাঁর গাফিলতীর ফলেই শীতের রাতে বাইরে কন্‌কনে হিম-তুষারের মাঝে এতক্ষণ দুঃস্থ পড়ে থাকার দরুণ, ছোট্ট মেয়েটি কি শেষে এমন বেঘোরে প্রাণ হারালো !…অসহায় মেয়েটির এই
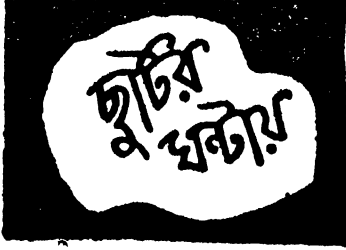
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের রহস্যময় বিজ্ঞানের আরেকটি আজব মজার খেলার কথা বলি। এ খেলার কেরামতী দেখিয়ে তোমরা শুধু যে লোকজনকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে তাই নয়, বরং দরকার পড়লে, সময়ে-অসময়ে বাড়ীর নানারকম নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং দামী-সৌখিন টুকিটাকি রূপোর সামগ্রী—অর্থাৎ, চামচ, কৌটো, থালা, বাটি, গেলাস, চিরুণীর হাতল, কেশ-সজ্জার কাঁটা, শাড়ী আঁটবার ব্রোচ, পকেট-ঘড়ির চেন, হাত-ঘড়ির 'রিষ্ট-ব্যাণ্ড' (Wrist-watchband), প্রভৃতি যে সব জিনিসের চেহারা দীর্ঘ-ব্যবহার অথবা বাক্স-আলমারীতে বহুদিন অব্যবহার্য অবস্থায় ফেলে রাখার ফলে, মলিন, অপরিচ্ছন্ন ও জৌলসহীন হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলিকে খুব সহজে এবং বিনা-মেহনতেই বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-পদ্ধতির সাহায্যে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে সাফ্ সুতরো করে নিয়ে পুনরায় দোকান থেকে সদ্য কেনা নতুন বস্তুর মতো দিব্যি ঝকঝকে-তক্‌তকে আর জলজলে-পালিশদার বানিয়ে তুলতে পারবে।

বিজ্ঞানের এই আজব-কৌশলটি রপ্ত করে নেওয়া এমন কিছু বায়বহুল-কঠিন কাজ নয়। তবে এ কেরামতী-দেখানোর জন্য দরকার—কয়েকটি ঘরোয়া সাজ-সরঞ্জাম...অর্থাৎ, একটি এ্যালুমিনিয়মের গামলা, হাঁড়ি কিম্বা ডেকচি, দু'এক মুঠো 'বেকিং-পাউডার' (Baking powder) অথবা কেক-বিস্কুট-বানানোর উপযোগী খুব মিহি ভাবে-গুঁড়োনো ময়দা, এক বালতি ফুটন্ত-গরম জল, খানিকটা গুঁড়ো-নুন, আর কয়েকটি রূপোর-তৈরী সামগ্রী। সহজে জোগাড় করার অসুবিধা ঘটলে, 'বেকিং-পাউডার' আর গুঁড়ো-নুনের বদলে একমুঠো কাপড়-কাচবার গুঁড়ো-সোডা (a handful of washing soda) ব্যবহার করেও সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞানের এই আজব-মজার খেলাটি দেখানো চলবে।

উপরের ফর্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, আসবে লোকজনের সামনে খেলার কেরামতী দেখানোর পালা। তবে সে পালা সুরু করবার আগে, দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে নেপথ্যে একটি দরকারী কাজ সেরে রাখতে হবে। অর্থাৎ, এ খেলার কারসাজি দেখানোর অল্পক্ষণ আগেই ফুটন্ত-গরম বালতির জলে 'বেকিং-পাউডার' আর গুঁড়ো-নুন মিশিয়ে নাও। এ কাজের নিয়ম—প্রতি পাইট ফুটন্ত-গরম জলের সঙ্গে চায়ের-চামচের এক এক চামচ হিসাবে 'বেকিং-পাউডার আর গুঁড়ো নুন মেশাতে হবে। তবে নজর রেখো—বালতির ফুটন্ত গরম জলের সঙ্গে 'বেকিং-পাউডার' আর গুঁড়ো-নুন, এ দুটি উপাদান যেন বেমালুম মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। এমনিভাবে ফুটন্ত গরম জলে 'বেকিং-পাউডার' আর গুঁড়ো-নুন মেশানোর ফলে, বালতির জলের রং ঈষৎ-ঘোলাটে দেখালেও, সামান্য এই পরিবর্তনটুকু অবশ্য খেলার আসরে দর্শকদের তেমন বিশেষ নজরে পড়বে না। কাজেই সামান্য সামান্য বুদ্ধি খাটিয়ে সে সময়ে তোমরা যদি পাকা ম্যাজিসিয়ানের মতো বাকচাতুরীতে তাদের ভুলিয়ে রাখতে পারো তো বালতির জলে তোমাদের এই কারচুপির সম্বন্ধে তাদের মনে বিশেষ কোনো সন্দেহ জাগবে না...সরল-বিশ্বাসেই তারা ঐ 'বেকিং-পাউডার' আর গুঁড়ো নুন অথবা কাপড় কাচার গুঁড়ো-সোডা মেশানো জলটুকুকে আসল বলেই ধারণা করবেন।
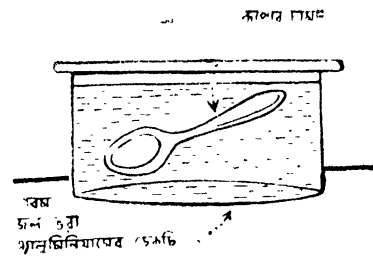
উদ্যোগ-পর্বের এ কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সেরে নেবার পর, দর্শকদের আসরে খেলা দেখানোর সময়, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে—অবিকল তেমনি-ধরণে একটি এ্যালুমিনিয়মের গামলা, হাঁড়ি বা ডেকচির মধ্যে রূপোর-তৈরী সামগ্রীটিকে রেখে, খুব সাবধানে তার উপর 'বেকিং-পাউডার' আর গুঁড়ো-নুন, অথবা কাপড়-কাচার গুঁড়ো-সোডা মেশানো বালতির ঐ ফুটন্ত-গরম জলটুকু ঢেলে পাত্রটি ভরে

তোলো। পাত্রে জল ভরার সময় সর্বদা নজর রাখতে হবে—রূপোর-তৈরী সামগ্রীর সবটুকুই যেন আগাগোড়া ঐ গরম-জলের মধ্যে ডুবে থাকে।

এমনিভাবে এ্যালুমিনিয়মের পাত্রের ঐ গরম জলে রূপোর-তৈরী সামগ্রীটিকে কয়েক মিনিট চুবিয়ে রাখার পর, সেটিকে ভালোভাবে জল ঝরিয়ে পাত্র থেকে তুলে, শুকনো-পরিষ্কার একটি নরম-কাপড়ে ঘষে পালিশ করে নাও। তাহলেই দেখবে—মলিন-অপরিচ্ছন্ন সেই রূপোর-তৈরী সামগ্রীটি পুনরায় সত্য-দোকান থেকে কিনে-আনা আনকোরা নতুন-জিনিসের মতোই দিব্যি ঝকঝকে-সুন্দর হয়ে উঠেছে। তোমাদের এই আজব-কেরামতী দেখে দর্শকদের তখন যে রীতিমত তাক লেগে যাবে, সে কথা বোধহয় বিশদভাবে বুঝিয়ে না বললেও চলে!

বিজ্ঞানের ভাষায়, রূপোর-তৈরী সামগ্রীতে এই ধরণে ঝকঝকে-উজ্জ্বল পালিশ-দেবার পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে—'Electrolytic Cleaning' অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক-শক্তি-সঞ্চারে শোধন-ক্রিয়া'। নামটা অবশ্য কানে শুনতে বেয়াড়া কটমট ঠেকলেও, কাজের দিক থেকে কিন্তু এই আজব পদ্ধতিটি যে খুবই উপযোগী—সেটা তোমরা নিজেরা পরখ করে দেখলেই বুঝতে পারবে। তবে একটা কথা মনে রেখো—এ পদ্ধতিতে রূপোর-সামগ্রী পালিশের জন্য সর্বদাই এ্যালুমিনিয়মের পাত্র ব্যবহার করতে হবে—অন্য কোনো ধাতুতে-গড়া পাত্র নিলে এমন সোজা উপায়ে 'Electrolytic Cleaning এর' কেরামতী দেখানো সম্ভব নয়। কারণ, বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়মানুসারে, এ্যালুমিনিয়ম-ধাতুর সঙ্গে 'বেকিং-পাউডার' ও গুঁড়ো নুন কিম্বা কাপড়-কাচার গুঁড়ো-সোডা মেশানো গরম জলে চুবিয়ে-রাখা রূপোর-সামগ্রীর সংস্পর্শে ও রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার (Chemical-reaction) ফলে, ঐ জলে জন্মায়—অতি সূক্ষ্ম বিশেষ এক ধরণের 'জীবকোষ' (Minute Living Cells)…এ সব আজব-জীবকোষের চেহারা এতই ছোট যে এদের সহজে চোখে দেখে ঠাওর করা যায় না…ভালো মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেই শুধু এ সব জীবকোষের অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। এ সব 'জীবকোষ' এমনই প্রাণবন্ত-চঞ্চল যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এরা নিজেদের আশেপাশে চারিদিকে অবিরাম বিদ্যুৎগতিতে বিচিত্র শক্তিসঞ্চার করে! সচঞ্চল এই সূক্ষ্ম জীবকোষগুলির দেহ থেকে অবিরাম বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারের ফলে, পারিপার্শ্বিক উপাদানের ক্রমশঃ রূপান্তর ঘটে…তারই ফলে রূপোর সামগ্রীর মালিন্য ঘুচে গিয়ে সেগুলি পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এবারের আজব-মজার খেলাটি থেকে তোমরা বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-অভিনব রহস্যময় তথ্যের সুস্পষ্ট-পরিচয় পাবে। পরের সংখ্যায় এমনি ধরণেরই আরো-মজাদার একটি বিজ্ঞানের খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

—

মনোহর মৈত্র

১। ছবির হেঁয়ালি ঃ
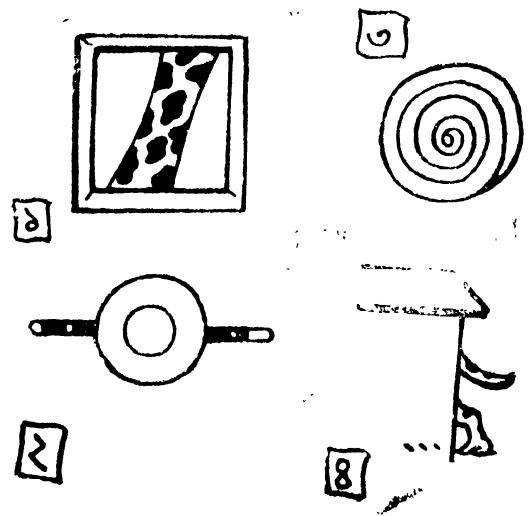
উপরে বিচিত্র-মজার কয়েকটি 'হেঁয়ালি-ছবির' নমুনা দেওয়া হলো। এ ছবিগুলি দেখে, সঠিক-আন্দাজ করে

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

রবীন্দ্র সাহিত্যে দুটি প্রিয় প্রসঙ্গ

জয়ন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের শিল্পশালায় সুধী পাঠক লক্ষ্য করবেন কতকগুলি প্রিয় প্রসঙ্গ, যা সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার আবর্তিত হয়েছে। এই প্রিয় প্রসঙ্গগুলি কবির বিশেষ প্রবণতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং কবির নিভৃতচারী আত্মভাবনাকে অথবা মনোভঙ্গিকে বুঝতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গগুলি হল :

এক ॥ পথ ও পথিকের প্রসঙ্গ

দুই ॥ গানের প্রসঙ্গ

এক

রবীন্দ্রনাথের বহুব্যবহৃত শব্দের মধ্যে 'পথ' ও 'পথিক' শব্দ দুটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাটকে, সংগীতে ও গদ্যে এই শব্দ দুটির বহুল ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যের দ্যোতক। চলিষ্ণুতাকেই রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন গতিহীন জীবন মৃত্যুপ্রতিম। জীবন সম্পর্কে কবির বক্তব্য হল সর্বপ্রকার বন্ধন হতে জীবনের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনাও হল বন্ধন উত্তরণের সাধনা। বস্তু বিশ্বের নানা বন্ধন মানব জীবনকে বদ্ধ জলাশয়ের মতই স্রোতোহীন করে তোলে। কখনও বন্ধন আসে রূপের মোহ ধরে। রূপজ প্রেমের মোহ জীবনে আনে বন্ধন। প্রেমের প্রসাধনকলা হতে জীবনকে মুক্তি দিতে হবে, তার জন্য চাই সাধন নৈপুণ্য। 'সুরদাসের প্রার্থনা'র মধ্যে এইভাব আভাসিত। রূপজ প্রেমের মোহে সাধক সুরদাসের চিত্তের বন্দীত্ব এবং আত্মপ্রত্যয়ের উন্মেষে সেই বন্দীদশা হতে মুক্তি—কবিতাটির বিষয়বস্তু নয় কি ? পুনশ্চের 'শাপমোচন' অথবা রাজা নাটকের মর্মবাণীও তাই।

বিচারহীন আচার-সর্বস্বতা—সেও তো প্রতি মুহূর্তে মানুষকে বন্দী করে জীবনে অচলায়তনিকতার সৃষ্টি করছে। যুক্তি নির্ভরহীন অন্ধধর্ম সৃষ্টি করছে, প্রতিবন্ধকতার। তাই অচলায়তন নাটকের মর্মবাণী প্রথাসর্বস্ব জীবনের প্রাচীর হতে—মুক্তি সন্ধানের অভিসার।

অর্থসঞ্চয়, ধনসঞ্চয়সর্বস্বতা জীবনের আর এক বন্ধন ! 'রক্তকরবী'র রাজা একটি বিকৃত জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র স্তূপীকৃত জঞ্জাল নিয়ে জীবনের সারল্যকে বন্দী করে সৃষ্টি করেছে অনর্থক জটিলতা।

'ডাকঘর' নাটক সেখানেও তো কবির বন্দী-জীবনের প্রতি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের শিল্পরূপ। বস্তুজগৎ অমলকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু বস্তুজগৎ জানে না যে অমলের প্রকৃত জগৎ বহিঃবিশ্বের মুক্ত প্রকৃতি। তার জগতের কথা বহন করে আনে দৈওয়ালা—কিন্তু তা ক্ষণেকের তরে। বস্তুজগতের জগদ্দল পাথরটা অমলের মুক্তিসন্ধানী দৃষ্টির সামনে, প্রাচীর সৃষ্টি করে। উল্লিখিত নাটকগুলির ব্যঞ্জিত অর্থ যাই হোক, একটি কথা স্বতই মনে হয় যে, জীবনে কোন কিছুর আধিক্য ঘটলেই জীবনটা সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হলে জীবনের সবদিকগুলিরই সমানভাবে অনুশীলনের প্রয়োজন। অর্থের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু রক্তকরবীর রাজার মত অর্থসর্বস্বতা তো বন্ধনের অন্য নাম। নিয়মের প্রয়োজন আছে, কিন্তু 'তাসের দেশ'এর নিয়মসর্বস্বতা তো বন্ধনের নামান্তর। সুতরাং সব বৃত্তির সার্থক সমন্বয়েই জীবনের সার্থকতা, আর এর অভাবই বন্ধন। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই বন্ধন হতে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে 'পথ' আর "পথিক'। পথ দেয় চলার প্রেরণা। জীবনের স্থবিরতা আর ক্লৈব্যকে দূর করে আহ্বান জানায় শাশ্বত সুন্দরের প্রতি, সত্যের প্রতি, রবীন্দ্র সাহিত্যে 'পথ' যেন মহাসত্যের দ্যোতক। পথের মধ্যে একটি পবিত্রতা

আছে একথা বোধ করি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন একাধিকবার। সেই সত্যের পথে যে যাত্রা করে সেই তো পথিক। একমাত্র পথিকবৃত্তির মধ্য দিয়েই সত্যানুসন্ধান আর জীবনকে গতিময় করে তোলা সম্ভব। জীবনকে সর্বপ্রকার বন্ধন হতে মুক্তি দিতে গেলে গতির পূজারী হতে হবে, আর গ্রহণ করতে হবে পথিক বৃত্তিকে। মহাজীবনের এক ঘাটে বোঝা নিয়ে অন্য হাটে তাকে আসক্তিহীন চিত্তে বিসর্জন দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, নইলে যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি / ততক্ষণ জমাইয়া রাখি / যতকিছু বস্তু ভার, ততক্ষণ নয়নে আমার / নিদ্রা নাই; / এতক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই / কীটের মতন; / ততক্ষণ / দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন / এ জীবন সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে / বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, /। তাই আসক্তিহীন চিত্তে পথের পথিক হয়ে সামনে চলতে হবে নইলে বন্ধন উত্তরণ ঘটবে কি করে—'যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে / বিশ্বের আঘাত লেগে / আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়, / বেদনার বিচিত্র সঞ্চয় হতে থাকে ক্ষয়। / পুণ্য হই সে চলার স্নানে, / চলার অমৃত পানে / নবীন যৌবন / বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।' তাই বোধ করি রবীন্দ্র কাব্যে পথ ও পথিকের এত প্রসঙ্গ। 'ডাকঘর' নাটকে দেখি পথচারী দেখে অমলের মন খুশীর নেশায় মেতে উঠেছে। সে তাদের সঙ্গে গল্প করে। বস্তুজগতের নির্জন বন্দীত্বের পীড়ার মধ্যে পথিকদের পথের বর্ণনা তার চিত্তে শোনায় খানিক মুক্তির সঙ্গীত। ডাকঘর নাটকের অর্থ নিয়ে আলোচনা করার সময়ে কবি এনড্রুজ সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন—সেখানেও পথের কথা একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে। বাহুল্যের ভয়ে ভীত হয়েও সেই পত্রটির খানিক অংশ উদ্ধৃত করতে বাধ্য হচ্ছি—"Amal represents the man whose soul has received the call of the open road—he seeks freedom from the enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinions built for him by the respectable." এখানে কবি-ব্যবহৃত 'open-road' কথাটি পথের প্রসঙ্গকে স্মরণ করিয়েছে।

'রক্তকরবী' নাটকটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে বন্ধনমুক্তিতে। সঞ্চয়সর্বস্বতার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ জীবন সীমায়িত হতে রাজার মুক্তি সত্যজীবনের প্রতি। এই মুক্তিও ঘটেছে পথের সাহায্যে। যক্ষপুরীর দেওয়াল ভেঙ্গে রাজা মুক্ত পৃথিবীর পথ ধরেছেন, যে পথের দুধারে প্রকৃতির সহজ দান সোনার ফসল আর পৌষ দিনের গান। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে যেখানে পথের ইঙ্গিত, সেখানেই মুক্তির বাণী বেজেছে। রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর জাতীয় চরিত্র এই পথের পথিক-তারাই জানেন পথের সন্ধান, কারণ তারা মুক্ত পুরুষ মানব সত্তার বিশুদ্ধরূপ। প্রসঙ্গক্রমে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটি উল্লেখ্য। প্রতাপাদিত্যের দম্ভ আ[illegible] শক্তির জগৎ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রত্যাশী উদয় বৈরাগী তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে। উদয়কে বৈরাগী বলেছে পথের মধ্যে দিয়েই আছে মুক্তি আর আনন্দ।

শুধু নাটক নয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতা হতেও এরূপ অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে যেখানে পথের প্রসঙ্গ বিশেষ অর্থের দ্যোতক হিসাবে কাজ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে পুনশ্চ কাব্যে 'মুক্তি' কবিতাটি উল্লেখ্য। বাজীরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে। আড়ম্বরের অন্ত নেই রাজপ্রাসাদে। মন্দিরে আলো, গন্ধবারির সমারোহ। কিন্তু আড়ম্বর আর উপকরণ বাহুল্যে বাজীরাওএর ঠাকুর পাথরের বন্দীশালায় বন্দী; কিন্তু এ কথা বুঝবে কে? কারণ তার ঠাকুর সেই বাজীরাওই এতদিন বন্দী ছিলে আড়ম্বরের বাহুল্যে আর ঐশ্বর্যের সঙ্গসম্ভাষণায়[illegible]। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার ঐশ্বর্যের আগল গেল খুলে, বাহুল্য হীন প্রাকৃত মানুষ কীর্তনিয়ার গান শুনে। একতারা বাজি[illegible] কেবল সে ফিরে ফিরে বলে—'ঠাকুর তোমায় কে বসালে কঠিন সোনার সিংহাসনে।' রাজবাড়ীতে তখন অ[illegible] ষেকের নিয়মহীন উত্তেজনা-"দূরে রাজবাড়ীর তোরা[ণে] বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প, জ্বলছে প্রদীপের মালা, [illegible] ওদিকে কীর্তনিয়া গাইছে:

"এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে? / তুমি স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধুলায় / তোমার পরশ আমার পরশ মি[লবে] বলে"/ সেই গান আর একজনের চিত্তে, আনে মুক্তি [illegible] বাজীরাও পেশোয়া। তাঁর এই মুক্তি ভোগের জগৎ [illegible] বাহুল্যের জগৎ হতে। শুনছিলেন তিনি একাগ্রমনে

তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল দেওয়া ঘরের থেকে/ আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে/ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা,/ছাড়া পাবে হৃদয় মাঝে/থাকগে ওরা পাথরখানা নিয়ে/পাথরের ঐ বন্দীশালায়/অহংকারের কাঁটার বেড়া ঘেরা।' গান শুনে উদ্ধত আড়ম্বরের নির্মোক হতে, বেরিয়ে এল বাজীরাও এর আসল সত্তাটি। ঐশ্বর্যের জগৎ হতে মুক্তি পেলেন বাজীরাও, আর তাঁর ঠাকুরও: "রাজ-বাড়ীর ঠাকুরঘর শূন্য।/জলছে দীপশিখা/পুজার উপচার পড়ে আছে,/বাজীরাও পেশোয়া চলে গেছে,/পথের পথিক হয়ে"/এখানে 'পথের পথিক' কথাটি তাৎপর্যবোধক। আড়ম্বরের জগৎ হতে, বাহুল্যের জগৎ হতে একটি বন্দী সত্তার মুক্তি ঘটেছে, তাই কবিতাটির নাম 'মুক্তি'। আর এই মুক্তির সম্পূর্ণতা ঘটেছে পথের সাহায্যে। প্রসঙ্গক্রমে 'পুনশ্চের' আত্মপ্রত্যয়ের রূপকধর্মী কবিতা 'শিশুতীর্থ'কে স্মরণ করি। কবিতাটির মূল কথা হল: শিশু সন্দর্শনে বেরিয়েছে একদল মানুষ যারা জৈবলালসাসম্পন্ন। শিশু সন্দর্শনে তাদের কিভাবে চিত্তের মুক্তি হল তাই কবিতাটীর মর্মবাণী! সুদীর্ঘ কবিতাটীর মধ্যে কবি যত প্রকার বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে পথের ভূমিকা কম নয়। অন্ধ-যুগের অশিক্ষিত জিঘাংসাজর্জরিত সমীভূত মানবাত্মার ঐ অভিসার মঙ্গলের প্রতীক শিশুতীর্থের প্রতি এবং তার ফলে যে চিত্তশুদ্ধি, তা যে সম্ভব হয়েছে অবিরাম পথ চলার ফলে একথা মিথ্যা নয়। অন্তহীন পথচলা যাত্রীদের শুনিয়েছে মুক্তির বারতা, আর তার ফলে তাদের দূর হয়েছে জৈবলালসা। রবীন্দ্রনাথ গানে ও কবিতার একাধিক স্থানে তাঁর পথ-প্রীতির কথা বলেছেন। যেমন:

এক ॥ অজানার স্রোতে চলিয়াছি দূর হতে
দূরে মেতেছি পথের প্রেমে

দুই ॥ পথ আমারে পথ দেখাবে সেই জেনেছি সার

তিন ॥ গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটীর পথ আমার মন
ভুলায় রে

চার ॥ যায় নিয়ে যায় আমার আপন গানের টানে / ঘর ছাড়া কোন পথের পানে। সত্যের পথ সন্ধানে চলে যে পথিক, তাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্গত 'পথ প্রান্তের' একস্থানে তিনি বলেছেন: "আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি, পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে বটে কিন্তু আমরা ভালবাসিয়া চলিতেছি।' পথ ও পথিকের প্রসঙ্গ উপনিষদের স্তন্যরস পুষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথের গতিশীল মনের প্রকাশ। পথিকের গন্তব্যস্থল অজানা, কিন্তু তাতেও সে আনন্দিত "আমি যে অজানার যাত্রী / সেই আমার আনন্দ।" চলার গানে সে ক্লান্তিকে জয় করেছে—"ওরে পথিক, ধর না চলার গান, / বাজারে একতারা / এই খুশিতে মেতে উঠুক প্রাণ / নাইকো কূল কিনারা / পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে / কান্না হাসির ফুল ফুটিয়ে যারে, / প্রাণ বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া গৃহ বাঁধন হারা।" রবীন্দ্র সাহিত্যে পথ ও পথিকের প্রসঙ্গ কবির একটী বিশিষ্ট মনোভঙ্গির উপরে আলোক-পাত করেছে।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্র-কাব্যে আর একটি প্রিয় প্রসঙ্গ সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনা—সে প্রসঙ্গটি হল গানের প্রসঙ্গ। শৈশবের সৃষ্টি হতে প্রৌঢ় জীবন পর্যন্ত যা কিছু কবির সঞ্চয়, তার মধ্যে গানের প্রসঙ্গ এত বেশি কেন? নানা ভাবেই কবি তাঁর বক্তব্যকে বুঝাবার জন্য এনেছেন গানের প্রসঙ্গ, রূপক অলংকারে গানের কথা বা তানপুরা, সেতার, বীণা অথবা বাঁশির কথা। যেমন: বনদেবীর দ্বারে দ্বারে / শুনি তোমার শঙ্খধ্বনি / আকাশবীণার তারে তারে / জাগে তোমার আগমনী।' গীতাঞ্জলির এই গানটিতে 'আকাশবীণা' রূপক অলঙ্কার প্রয়োগ কবির সচেতন প্রয়োগ এবং বিশেষ তাৎপর্যের বাহক। আলোচ্য প্রিয় প্রসঙ্গের বহুল প্রয়োগের সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি, তত বড় গায়ক। তাই তাঁর গদ্য রচনায় পেয়েছি কবিতার ছোঁয়াচ, আবার কবিতায় সংগীতধর্মিতার প্রাধান্য। আরও একটি কারণ সম্ভবত এই যে, গান হল প্রাণের সহজ আনন্দের সাবলীলতম প্রকাশ। গানে হৃদয় উন্মোচন যেমন সহজ, এমন আর কিছুতে নয়। কবিতা অপেক্ষা গান সহজেই বস্তুলোককে উত্তরণ করে সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করতে পারে। কবিতায় কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাণীতে বস্তু জগতের দাবী আছে অনেকখানি; কিন্তু গানের সুর সে দাবীকে অস্বীকার করতে পারে অনায়াসে। কারণ গানের সুর অবরা। তাই বুঝি

কবির প্রকাশ নায়ক হিসাবে রবীন্দ্রকাব্যে গানের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। গানের মধ্যে কবি পেয়েছেন পরমের আস্বাদ, পূর্ণের প্রকাশ। তাই গানকে কি কবি-আত্মা সহজে ভুলতে পারে? কবির আধচেতনায় সেখানেই সঙ্গীত, জীবনের সহজ স্ফূর্তি তো সেখানেই। যে জীবন সঙ্গীতের স্পর্শ হতে বঞ্চিত, জীবন সেখানে মৃত্যুপথের পথিক। রক্তকরবীর যক্ষপুরীর মানুষেরা জীবনের সেই সহজ প্রকাশ-সঙ্গীত হারিয়েছে, আর সেই সঙ্গে জীবনের স্বাভাবিকতাটুকু বিসর্জন দিয়ে জটিলতার নাগপাশে বন্দী হয়েছে। অন্য দিকে বিশু, নন্দিনীগণকে ভুলতে পারেনি, তাই প্রাণহীন যক্ষপুরীর মধ্যেও আনন্দকে তারা ভোলেনি। সঙ্গীতকে তারা ভোলেনি তাই জীবন তাদের কাছে সহজ। আর রাজার কাছে সহজটাই জটিল. কারণ গান তাঁর জগৎ হতে নির্বাসিত। অবশেষে যক্ষপুরীর মরাধনের রাজ্যে জাগল প্রাণের স্পন্দন। তাকে জাগালো কে? ঐ রঞ্জন। তাও গান দিয়ে! কোদাল বাজিয়ে যক্ষপুরীকে সে মাতিয়ে তুলল। কবি অনুভব করেছেন গানের মধ্য দিয়েই জীবনে আসে পূর্ণতা তাই নন্দিনী পূর্ণ, রঞ্জন পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে যে গানগুলি দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ গানগুলিই গেয়েছে ঠাকুর-দা বা দাদাঠাকুর জাতীয় চরিত্র, কারণ এরা মুক্ত পুরুষ। নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতিতে দেখি কবির সঙ্গীতপিপাসু মনের পরিচয়ঃ

এক॥ চিত্ত পিপাসিতরে/গীতসুধার তরে/ অন্তর বাহির আজি কাঁদে উদাস স্বরে/গীতিসুধার তরে॥ গীতবিতান

দুই॥ আমার মনের মাঝে যে গান বাজে/শুনতে কি পাওগো/আমার চোখের পরে আভাস দিয়ে/যখনি যাও গো॥ গীতবিতান

তিন॥ শুধু বাঁশি খানি হাতে দাও তুলি/বাজাই বসিয়া প্রাণ মন খুলি/পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি/ফুটাই আকাশ ভালে॥ সোনার তরী

মনে যখন খুশির জোয়ার আসে, মনের পেয়ালায় যখন আনন্দের রস পরিপূর্ণ তখনই তো হৃদয়ে গান জাগে। রবীন্দ্রনাথের সদা হাস্যচঞ্চল মনে গানের তাই এত বাহুল্য, আর রচনাতে ও তাই গানের এত সহজ অধিকার। কবি চিন্তায় ভগবানের প্রকাশ গানে। এই সত্য অনুভূতিকে রূপ দিতে তাই কবিকে আবার গানের প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলতে হয়ঃ

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে/এস গন্ধে বরণে এসো গানে॥ গীতাঞ্জলি। পুনশ্চ কাব্যের 'শাপ মোচন' কবিতায় তো গানের প্রসঙ্গ এসেছে বার বার। কমলিকার কাছে দেহাশ্রয়ী রূপের দাবী যতবারই বড় হয়ে উঠেছে, ততবারই তার পরাজয় হয়েছে। বিকৃতরূপা অরুণেশ্বর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দেখেছে জীবনের মহত্তর সৌন্দর্য্য। কমলিকা প্রথমে রূপহীন অরুণেশ্বরকে অবজ্ঞা করেছে, কিন্তু অরুণেশ্বরের সঙ্গীত নৈপুণ্যের কাছে দেহাশ্রয়ী রূপের দাবী হার স্বীকার করেছে। এখানেও কবি সঙ্গীতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যে কবি সুন্দরের নিষ্ঠাবান পূজারী আর অরূপের এষণায় মগ্ন, তাঁর কথায় তো গানের প্রসঙ্গ না থেকে পারে না। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের এত বাহুল্য, কাব্যে গানের এত প্রসঙ্গ আর সহজ অধিকার। রাজা নাটকের একটি গানে কবি বলেছিলেনঃ আমি রূপে তোমায় ভোলাবোনা/ভালবাসায় ভোলাবো/আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো নাকো/গান দিয়ে দ্বার খোলাবো। কবির এই কথা বোধ করি নিজের সাহিত্য জগতের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। গানের মধ্য দিয়েই তাঁর সাবলীলতম প্রকাশ, গানই তাঁর প্রকাশ নায়ক আর এত প্রিয়। তাই এসেছে গানের প্রসঙ্গ বা নানা বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গ সঙ্গীতের প্রতিনিধি রূপে। যেমনঃ

এক॥ আমার একটি কথা বাঁশি বাজে বাঁশিই বাজে/ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয়নি বলা,/কেবল বসে গেলেম বাঁশির কানে কানে গীতবিতান

দুই॥ এইখানে এক শিশির ভরা প্রাতে/মেলে ছিলেন প্রাণ/এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে/সেধেছিলেম তান।' বলাকা

উপনায়ক

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

"একি! সুগত না? তুমি এখানে?"

কারখানার গেটের বাইরে ঝাঁকড়া-মাথা তেঁতুল গাছটার তলা দিয়ে হন হন করে বাড়ি ফিরছিল সুগত, হঠাৎ মেয়েলি গলায় নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে রাত জাগা ক্লান্তিমাখা চোখ দুটি তুলে তাকায়। বেসিমার কনভার্টারের উগ্র অত্যুজ্জ্বল আলোয় আকাশের খণ্ড মেঘ লাল হয়ে জ্বলছে, সেই আলো প্রতিফলিত হয়েছে নিষ্কাশনপুরের পীচ বাঁধানো রাস্তায়, তারই লালিমা সহজেই প্রতিফলিত হয়েছে সুজাতার প্রসাধন-সুন্দর মুখে চোখে।

সুজাতার সঙ্গিনী দু জন একবার চোখ তুলে সুগতর কালি মাখা প্যাণ্টসার্ট, হাতের টিফিন বক্স, তার কালো কোঁকড়ানো অগোছাল চুল, আর দুচোখে ভেসে ওঠা বিস্ময়ের আনন্দ লক্ষ্য করে মুখ টিপে হাসে, তারপর মুখোমুখি দাঁড়ানো দুটি নরনারীর বুক থেকে উথলে ওঠা অনেক কথা উচ্চারণের পূর্ব মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে আছে লক্ষ্য করে হাঁসের মতো হেলতে দুলতে কয়েক পা এগিয়ে যায়, তার পর বাঁ পাশের বারি ময়দানের শ্যাম-সুষমা যেন দু চোখ ভরে দেখতে থাকে।

সুগতর দুই চোখে একটা আশ্চর্য আলো খেলা করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে,—"কী আশ্চর্য! সুজাতা? তুমি?"

মিষ্টি করে হাসে সুজাতা, লাল ঠোঁট দুটি সামান্য ফাঁক হয়, দেখা দেয় সামনের এক সার ঝকঝকে দাঁতের ঝলক, ডান হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক আছে কি না দেখতে দেখতে অন্তরঙ্গ স্বরে বলে,—আমি তো প্রায় মাস খানেক আগেই এখানে এসেছি, নিষ্কাশনপুর গার্লসস্কুলে চাকরী পেয়েছি, কিন্তু তোমার এ কী হাল হয়েছে সুগত?"

সুজাতা খোঁপায় হাত দেওয়ায় তার বুকের সুগোল বক্রতা ফুটে ওঠে, সে দিকে সুগতর চোখ যায়। না। যৌবনকে এখনও তার দেহদুর্গে বন্দী করে রেখেছে সুজাতা, এই ক' বছরে যেন আরও দুর্বার হয়েছে। চোখ নামিয়ে নেয় সুগত—সামান্য হেসে বলে,—আমারও তো এখানে পাঁচ ছ বছর কেটে গেল পোষাকটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে দি নিষ্কাশনপুর আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে কাজ করছি আমি—

তর্জনী দিয়ে গাল ছুঁয়ে অবাক হয়ে সুজাতা বলে— "এ্যাঁ বলো কি? তোমার মতো ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেও শেষ কালে কারখানায় এসে ঢুকলো সত্যি, আমি ভাবতেও পারি না—

মৃদু হেসে সুগত বলে,—"আমিই কি কোনোদিন ভাবতে পারতাম যে তুমি একটা কারখানা-সহরের মেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকা হয়ে আসবে—"

হাত নেড়ে সুজাতা বলে,—"বা, তা কেন? এই লাইনই তো মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, বলতে গেলে মর্য্যাদার—

সুগত বলে—কিন্তু স্কুল তো আরও কতই আছে বাংলা দেশে, সে সব ছেড়ে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কেন!

মুখ টিপে হেসে সুগতর মুখে তাকিয়ে সুজাতা বলে,— "যদি বলি—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে বলে।'

"ঠাট্টা রাখো, এখন যাচ্ছিলে কোথায়!

ওই ওদের সঙ্গে বেরিয়েছিলুম বেগুনিয়াতে একটু মার্কেটিং করতে, কিন্তু এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না, চলো না, কোথাও বসে একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে, তোমার কি ছুটি হয়নি এখনো?

সুগত বলে,—"হ্যাঁ, ছুটি অবশ্য হয়েছে, তবে এই কারখানার নোংরা পোষাকটা ছেড়ে স্নান টান করতে

অনেক দেরী হয়ে যাবে সুজাতা! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক,—কাল তো রবিবার, তোমার আমার ছুটির দিন, সকাল সকাল আমার বাসায় এসো না—অনেক দিন পরে তোমার হাতের রান্না খাওয়া যাবে,—কী বলো? কতো দিন যে ভালো মন্দ খাইনি—

খিলখিল করে হেসে ওঠে সুজাতা স্বগতর শেষ কথাটা শুনে, সেই হাসির শব্দে স্বগতর সারা শরীর আগের মতোই কেঁপে ওঠে, শিরশির করতে থাকে, সুজাতা বলে,—এখনো তেমনি পেটুক আছো দেখছি, কিন্তু তোমার বাসা চিনলে তো যাবো?"

অপ্রতিভ সুরে স্বগত বলে,—ও, তাও তো বটে! আচ্ছা চিনিয়ে দিচ্ছি, সন্ন্যাসী স্থান চেনো তো? তার পশ্চিমে জি, টি রোডের বড়ো চড়াইটা? সেখানে একটা তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে, নীচের তলায় দুটো ঘর নিয়ে আছি আমি—"

"যেতে যে বলছ, তোমার বৌ আবার রাগ করবে না তো?"

কারখানার প্রথম হুইসিল বেজে গেছে, অনেকক্ষণ নিষ্কাশন পুরের বেশীর ভাগ লোকজনই এখন কারখানার ভেতরে, কারখানায় যাবার প্রধান পথটি তাই নির্জন, সেই নিঃসঙ্গ নির্জনতা কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠে স্বগত, ঝাঁকড়া মাথা তেঁতুল গাছের ডালে বসা দুটো পাখি হঠাৎ ভয় পেয়ে উড়ে যায়, হাসি থামিয়ে স্বগত বলে —"বই আছে বিস্তর, কিন্তু বউ নেই—"

আড়ষ্ট হয়ে সুজাতা বলে—ও বাবা, ব্যাচিলার্স ডেন?

"আরে না—তাকে আশ্বস্ত করে স্বগত বলে,—তা মোটেই নয়, মা রয়েছেন না—"

তবু ভরসা পেলে না সুজাতা, বলে,—"না না, থাক, তোমার ওখানে গিয়ে কাজে নেই, তোমার মা আবার আমাকে দেখে কী ভাববেন, তিনি আমাকে ভুলে যাননি নিশ্চয়ই—

রাস্তায় চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে স্বগত, একটু পরে চোখ তুলে সুজাতার প্রত্যাশা-ব্যাকুল মুখে তাকিয়ে বলে—না, মা তোমাকে ভুলতে পারেন নি, মাঝে মাঝে তোমার কথা বলেন,—তোমাকে দেখে যে তিনি অখুশী হবেন না—এ নিশ্চয়তা তোমাকে আমি দিতে পারি—"

তবু সুজাতার সঙ্কোচ কাটে না, গলা নামিয়ে বলে, পুরোনো সব কথা যদি তোলেন তিনি?

তেঁতুল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কয়েক টুকরো হলদে রোদ স্বগতর মুখে এসে পড়ছে—সেই আলোয় হঠাৎ তার মুখটা বিবর্ণ দেখায়, আস্তে আস্তে বলে—সে সব কথা যদি তোমার মনে আজও কাঁটা হয়ে ফুটে থাকে, তবে কাজ নেই আমাদের মেলামেশায় এই ছোট্ট শহরে মাঝে মধ্যে যদি দেখা হয়েও যায়, তবে পরস্পরকে না চিনলেই হল—

সুজাতার মুখ করুণ হয়ে ওঠে,—গাঢ় ব্যাকুল গলায় বলে,—আমায় তুমি ভুল বুঝো না স্বগত। আমি তোমার জীবনে একটা অশুভ গ্রহের মতো এসে উদিত হয়েছিলাম তোমার জীবন একেবারে তছনছ করে দিয়েছিলাম, তার বেদনায় আমার মন আজও ভরে আছে—তাই বলছিলাম যে আজ তোমার মার কাছে এ মুখ কি করে দেখবো বলো?"

স্বগত বলে ওঠে,—"মাথা উঁচু করেই দেখাবে সুজাতা, পাঁচ বছর আগে যা ঘটে গেছে, তাকে সারা জীবনের অভিশাপ বলে মেনে নেওয়ার সত্যিই কোনো অর্থ হয় না—"

সুজাতার দু'চোখ চকচক করে ওঠে, হঠাৎ আসা আবেগের জোয়ারে তার বুক ফুলে ওঠে, আশা আর আনন্দে মেশা সুরে বলে,—"সত্যি বলছ স্বগত? তুমিও কি—"

দৃঢ় স্বরে স্বগত বলে,—"হ্যাঁ, আমিও ভুলে যেতে চাই, তখন বয়েস ছিল কম, ভাবাবেগে ভেসে যাও যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু আজ জীবনের অনেক ঘাটে ঠোক্কর খেয়ে জেনেছি যে জীবন নিত্য নতুন জাল বুনে চলে, তার দুর্বার প্রাণ-শক্তিকে আটকাতে যাবার চেষ্টা করাটা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়—"

সুজাতার সঙ্গিনী দু'জন বারি-ময়দানের শ্যাম শোভা থেকে চোখ তুলে বার বার তাদের ছোট্ট হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল,—মার্কেটিং যাবার পথে সুজাতার এমন দীর্ঘ বিলম্বিত আলাপন ওদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। ওদের দিকে

একবার তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে সুজাতা বলে,—"ওরা অধীর হয়ে পড়েছে, আজ চলি—"

সুগত বলে,—"কাল তোমার জন্য অপেক্ষা করব তো?"

কোরো,—আচ্ছা, এখন যাও, কেমন?

পিচ্-বাঁধানো রাস্তায় জুতোর খুট খুট শব্দ তুলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সুজাতা, তার মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ির ঝুলন্ত আঁচলে সূর্যের আলো পড়ে, ধূপছায়া রং ছড়ায়।

বরফ কলের বাঁকে তিনটি তরুণীর ছন্দোময় চলন্ত শরীর অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ সেদিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুগত। প্রায় ভুলে যাওয়া একটা গভীর আবেগে তার মন মথিত হয়।

দূর থেকে ভেসে আসে ব্লাষ্ট ফার্ণেসের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ, ক্রেণের ঘটঘট, ইঞ্জিনের শান্টিং। ওয়েল্ডিং মেশিনের দপ করে জ্বলে ওঠা সবুজ আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে মিশিয়ে যায়, শ্ল্যাগ পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো গায়ে গনগনে গরম শ্ল্যাগ ছড়িয়ে পড়ে, তার তীব্র আলো মেঘলোকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু রোলিং মিলের শিফট্ ফোরম্যান সুগত লাহিড়ি এ সব কিছুই শোনে না, দেখে না।

বছর পাঁচেক আগের কয়েকটি মাসের অবিস্মরণীয় স্মৃতি তার মনে ভীড় করে আসে।

সেবার বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে সুগত। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি। সীতারামপুর থেকে দা লিখলেন, এখানে এসে ছুটির দিন কটা কাটিয়ে যা—বৌদিও আমন্ত্রণ জানালেন। তাই একদিন তল্পীতল্পা নিয়ে সীতারামপুরে হাজির হ'ল সুগত।

দাদা সুব্রত কাজ করেন, তাঁর সুন্দর ছিমছাম রেল কোয়ার্টারটি রেল ষ্টেশনের কাছেই। সামনেই প্রকাণ্ড খেলার মাঠ, রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিট্যুট, দেখেশুনে ভারী ভালো লাগলো সুগতর।

অবকাশের দিন কটা প্রকৃতির যে নির্জনতায় কাটাতে চেয়েছিল সুগত, তা সে এই সীতারামপুরে পুরোপুরি ভাবেই পেয়ে গেল। কলকাতায় যন্ত্রণামুখর বিপুল কোলাহল এখানে একান্তভাবেই অনুপস্থিত নীরব নিশ্চিন্ত অলস দিনগুলো আকাশে ভাসা সাদা মেঘের মতোই লঘু পক্ষ। শাল অর্জুনের সরল ছায়া বীথি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে রেল লাইনটা পার হলেই দেখা দেয় দিগন্ত ছোঁয়া শ্যামল প্রান্তর! অন্য দিকে অনেক দূরে আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে ছোটো বড়ো অনেকগুলো ধূসর রংএর পাহাড়। গভীর রাতে বাইরে এসে দাঁড়ালে দেখা যায় অনেক দূরে বার্ণপুরের ফার্ণেসগুলোর আলোর মশালে আকাশের মেঘের দল অপরূপ হয়ে উঠেছে।

সে দিনটির কথা মনে পড়ে সুগতর।

সেদিন অনেকদূর বেড়িয়ে এসে সীতারামপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে রাখা একখানা কাঠের বেঞ্চিতে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল সে। মাথার ওপর কদম গাছের ছায়া, ফোটা কদমের নিবিড় গন্ধে জনবিরল লাল সুরকী ঢাকা প্ল্যাটফর্মটি যেন উদাস হয়ে গেছে।

দূর থেকে হুইশিল দিয়ে হুশ হুশ শব্দ করতে করতে ঝাঁ ঝাঁ এক্সপ্রেস এসে থামল, অল্পক্ষণের জন্য চারদিক সরগরম হয়ে উঠল। সুগতর অলস চোখ দুটো ট্রেণের কামরাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কামরার জানালায় একটি চেনা মুখ দেখে ছুটে গেল সে, বলল,—আরে আরে, কৃশানু যে। কোথায় যাচ্ছিস?

অন্যদিকে তাকিয়েছিল কৃশানু, সুগতর কথায় ভয়ানকভাবে চমকে উঠল সে, ঘাড় ফিরিয়ে সুগতকে দেখল—তারপর অনাগ্রহের সঙ্গে বলল—"তুই এখানে কি কচ্ছিস্ রে সুগত?"

আরে আমি তো দিন কুড়ি হল সীতারামপুরেই আছি। বড়দা যে চাকরী করেন এখানে, তুই যাচ্ছিস্ কোথায়?

"আমি?" বলে একটু যেন ইতস্ততঃ করল কৃশানু, কী যেন ভাবল, বলল—"আচ্ছা তোদের বাসাটা বেশ বড়ো?"

"হ্যাঁ, কেন বলতো?

"না, মানে—সীতারামপুরের নামডাক শুনেছি অনেক, দু'চারদিন এখানে থাকলে মন্দ হ'ত না—জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, না?

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল সুগত,—নিশ্চয় নিশ্চয়, মাও আছেন এখানে তোকে দেখে খুশীই হবেন

তা হলে আর দেরী করিস না, চটপট নেমে আয়, গাড়ি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না এখানে—

কৃশানুর সঙ্গে মালপত্র বেশী কিছু ছিল না, তাই নিয়ে সে নেমে আসতেই তার পেছনে পেছনে একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের মেয়েকে নামতে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল সুগত।

তার সেই অবাক-হওয়া মুখ দেখে হেসে ফেলল কৃশানু, বলল—"হাঁ করে দেখছিস কি—ওর নাম সুজাতা, কৃশানুর অঙ্কলক্ষ্মী, সু,—এরই নাম সুগত লাহিড়ি, আমার কলেজীয় বন্ধু,—গল্প কবিতা লেখে, যার কথা—"

মিষ্টি হেসে সুজাতা বলল,—ওঁর মুখে আপনার নাম অনেকবার শুনেছি, যদিও আমাদের বিয়ে মাত্র দু'সপ্তাহের—

সুজাতার কথার মিষ্টিসুর যেন প্ল্যাটফর্মের নিঃসঙ্গ কদমের ঘন সবুজ পাতায় একটু দোলা দিয়ে মিলিয়ে যায়। ওভার-ব্রিজ পার হবার সময়ে কৌতূহলী চোখে এদিকওদিকে তাকায় সুজাতা, নিরুদ্ধ প্রসন্ন হাসি ওর অধরপ্রান্ত ছুঁয়ে থাকে। পেছনে পেছনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল সুজাতা, কৃশানু।

বিদ্যাসাগর কলেজে একসঙ্গে পড়েছে দু'জন, কৃশানুও সামান্য সাহিত্যচর্চা করত, সেই সূত্রে আলাপ, সামান্য অন্তরঙ্গতাও হয়েছিল, দু'জনে, সুগতদের বাগবাজারের বাসায় দু'চারবার এসেও ছিল কৃশানু। আই-এস-সি পরীক্ষায় ফেল করল কৃশানু, তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি সুগতর, এখানে ওখানে ওর দু'চারটে গল্প চোখে পড়েছিল। কিন্তু সেই কৃশানু যে হঠাৎ তার বৌ নিয়ে এক কথায় সীতারামপুর স্টেশনে নেমে পড়েছে, এ কথাটা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিল না সুগত:

সুগতর দাদার কোয়ার্টারস্ স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল।

দোরগোড়ায় সুগতর হাঁকডাকে মা-বৌদি বেরিয়ে এলেন, নত হয়ে প্রণাম করল কৃশানু-সুজাতা, মা কাউকেই চিনতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, বৌদি শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এক গা গয়না পরা সুজাতাকে দেখতে লাগলেন।

সুগত বলল,—"মা, তুমি চিনতে পারলে না? ও কৃশানু, সেই যে আমাদের বাগবাজারের বাসায় আসত—"

"ওমা তাই নাকি। হ্যাঁ, তাই তো, কতো বড়ো হয়ে গেছ বাবা,—এটি কে, বউমা নাকি?"

সব কথা শুনে পরম সমাদরে কৃশানু সুজাতাকে ঘরে তুলে নিলেন মা আর বৌদি। বৌদি ছুটলেন রান্না-ঘরে চা করতে, মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওদের জন্য স্নানের ব্যবস্থা করতে।

কয়েকদিনের ভেতরেই সুজাতার সঙ্গে সুগতর আলাপ বেশ জমে উঠল। পরিহাসপ্রিয়া সুজাতার সুস্মিত ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন সুগতর মা ও বৌদি। কিন্তু এখানে আসবার পর থেকেই কৃশানু কেমন যেন আন-মনা, কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া ভাব তার মধ্যে, নতুন বিয়ে-করা বৌএর ওপর স্বামীর যতটা টান থাকা স্বাভাবিক তা যেন তার মধ্যে নেই, বলতে গেলে সুজাতাকে যেন একটু এড়িয়েই চলে দিনেরবেলা, বৌদির অমন সব ধারালো ঠাট্টাগুলোও একেবারে মাঠে মারা গেল। মনে মনে একটু আশ্চর্যই হয়েছিল সুগত, সদ্য বিয়ে করে এরই মধ্যে দাম্পত্য-ক্লান্তি কি করে এলো তা ভেবে পাচ্ছিল না সে।

কিন্তু সুন্দরী সুজাতা উচ্ছল, প্রাণবন্ত, সজীব, সুজাতার প্রতি একটা দুরন্ত আকর্ষণ অনুভব করেছিল সুগত, মনে মনে কৃশানুর ভাগ্যের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়েছিল, শেষটায় তার তরুণ বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম বলে মনে করেছিল।

সকাল-সন্ধ্যায় সুগতর ভ্রমণ-সঙ্গিনী হিসেবে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত সুজাতা, যাবার আগে অবশ্য কৃশানুকে ডাক দিয়ে যেত তারা, কিন্তু আলসেমি করে বাড়িতেই থেকে যেতো কৃশানু। তাদের এই ঘনিষ্ঠতাটা বৌদি সুনজরে দেখেন নি, মাও গম্ভীর হয়ে যেতেন, কিন্তু নেহাৎ দু'দিনের জন্য এসেছে বলেই মুখে কিছু বলতেন না। কিন্তু সুজাতা ওসব গ্রাহ্যই করত না। রেললাইন পার হয়ে ওপারের মস্ত মাঠের সরু পায়ে-চলা পথ দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কৃশানুর সঙ্গে তার প্রাক্-পরিণয় প্রণয়-কাহিনী বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ত। মুগ্ধ মনে শুনতো সুগত, শুনতে শুনতে তার মনও কাছে দূরের শিমুল

পলাশ ফুলের মতোই টকটকে লাল হয়ে উঠতো, মুখ তুলে তাকিয়ে সুজাতার চোখের ভেতর সেই মনের চেহারাটা দেখতে পেয়ে চমকে উঠত সে। কিন্তু সুজাতা কিছু বলত না, হঠাৎ খুব কাছে সরে আসত সে, আর তখন তার শরীরটাকে একটা অগ্নিবলয় বলে মনে হত সুগতর। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কখনো কখনো ওদের কাঁধ দুটো পরস্পরকে ছুঁয়ে যেতো, হাতে হাত ঠেকে যেতো, —সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে সরে যেত সুগত, কিন্তু উঁচু পর্দায় হেসে উঠতো সুজাতা, বলতো—"আচ্ছা ভীতু তো তুমি সুগত, আমার গায়ে গা লাগলে জাত যাবে নাকি তোমার? তোমার বন্ধুটি কিন্তু সন্ধ্যার এই নির্জনতায় আমাকে কাছে পেলে একেবারে—

সুগত বলত,—"আচ্ছা সুজাতা, তুমি যে অ মার সঙ্গে এমনিভাবে একা একা ঘুরে বেড়াও, এর জন্য কৃশানু কিছু মনে করে না?"

ঠোঁট উল্টে জবাব দিত সুজাতা—করলো তো ভারি বয়েই গেল—কেন? ঘরের কোণে চুপচাপ বসে না থেকে সঙ্গে এলেই পারে, বেশ করব, খুব করব—একা একা বেড়াবো—কাপুরুষ কোথাকার—

চমকে উঠে সুগত বলত,··"এ্যাঁ, আমি,—মানে, আমি কাপুরুষ কিসে?"

খিল খিল করে হেসে উঠে সুজাতা বলত,—"না না, তুমি নও,—কৃশানু—

"কেন?"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেত সুজাতা, বলত,—"সে তুমি এখন বুঝবে না—জানো, ওর প্রকৃতির এই দিকটাকে, আমি খুব ঘৃণা করি, আচ্ছা, ও কেন এমন নির্জীব আর অপদার্থ বলতো?"

সুজাতার এই হঠাৎ ভাব-পরিবর্তনের আর তার কথার কোনো মানে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকতো সুগত। সুজাতা-কৃশানুর সম্পর্কের মাঝখানে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিয়েছে বলে মনে হত তার।

সত্যি, বিদ্যাসাগর কলেজের সেই হৈ হৈ করা ছেলে কৃশানু এখানে এসে যেন একেবারে মিইয়ে গেছে। কোণের দিকে তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া ঘরটাতেই দিন রাত কাটায় আর সব সময়ে কী যেন ভাবে। বড়দার সঙ্গে দু'একটা কথা, কি মা-বৌদির সঙ্গে সামান্য গল্প করা ছাড়া সারাদিন একরকম মৌনব্রত পালন করেই চলেছে সে। এমন কি তার বন্ধু সুগতর সঙ্গেও মিশবার কোনো আগ্রহ দেখায় না সে। কাছেই নিয়ামতপুর, সেখান থেকে বাসে আসানসোল, বার্ণপুর বা কুল্‌টি ডিসেরগড়, মাইথন ঘুরে বেড়িয়ে আসা চলে, কিন্তু বার বার বললেও সে সব জায়গার দ্রষ্টব্যগুলো দেখবার জন্য বিশেষ গা করেনি কৃশানু।

সুগত ভাবত যে বৌ শুদ্ধ, এতদিন ধরে তাদের বাড়িতে আছে বলেই হয়তো মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে কৃশানু।

এমনি করেই দিন কুড়ি কেটে গেল। এর মধ্যে মৃদু ভাবে চলে যাবার প্রস্তাবটা তুলেছে কৃশানু, কিন্তু সুগতর মা আর বৌদির সামান্য আপত্তিতেই চুপ করে গেছে, সুজাতা যেন একান্ত আপন জনের মতোই মিশে গেল তাদের পরিবারে।

সেই সকালবেলার কথাটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সুগতর। জল খেতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল সুগত, লক্ষ্য করল যে উনানের কাছে বসে গম্ভীর মুখে তার মার সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব যেন বলছে তার বৌদি, সুগতকে ঢুকতে দেখেই চুপ করে গেল। মা-র মুখখানা যেন থমথম করছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না সুগত।

বিকেল বেলা, বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করছে, এমন সময়ে কাছে এসে বৌদি বলল,—"ঠাকুরপো, সুজাতাকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়ানো বন্ধ করতে হবে তোমায়—"

আশ্চর্য হয়ে সুগত বলল,—"কেন বৌদি?"

"অত 'কেন'র উত্তর আমি দিতে পারব না, তুমি আর ছেলেমানুষটি নও যে ঐ বেহায়া মেয়েটার সঙ্গে দিবারাত্র ঘুরে বেড়ালেও দোষের কিছু হবে না, এই সেদিন সুবিমল সরকারের বৌ এসে নানা কথা বলে গেল তোমাদের নামে—

সন্ত্রস্ত হয়ে সুগত বল্ল—এই বৌদি,—আস্তে, শুনতে পারে যে—"

"শুনুক, তোমাকে যা বলা হল তাই করবে কিন্তু, আমি এখন যাই, ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে—"

বিমূঢ় সুগতকে ঘরের ভেতর রেখে বেরিয়ে গেলো বৌদি, আর প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে বৌদির ব্যবহারের কোনো মানেই বুঝতে পারল না সুগত, গতকালও না এই বৌদিই সুজাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল! আজ তার হল কি?

ক্ষুণ্ণ মনে একাই বেরিয়ে পড়ল সুগত।

সন্ধ্যার দিকে ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। পশ্চিম আকাশের পুঞ্জিত মেঘ থেকে অদ্ভুত এক আশ্চর্য রং যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পৃথিবীতে এসে পড়ছিল, আর সেই আলো এই পৃথিবীর রূঢ়, নিষ্করুণ বাস্তব রূপটাকে যেন কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিচ্ছিল। আজ তার সঙ্গে বেড়াবার নিত্য সঙ্গিনী নেই, আর সেই জন্যই সুগতর বুকের ভেতরটা কেমন একটা অস্বস্তিকর দাহে পুড়ে যাচ্ছিল, বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সুজাতার যৌবনোদ্ধত শরীর, তার ঝরণা হাসি, তার হাত মুখ নাড়ার বিচিত্র সব ভঙ্গী। মনের গভীরে ডুব দিয়ে সুগত আবিষ্কার করল যে সে এ ক'দিনের মধ্যে সুজাতাকে ভালোবেসে ফেলেছে, ভয় আর বিস্ময়ের একটা শিহরণ খেলে গেল তার সারা শরীরে।

হঠাৎ অদূরের কালভার্টটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সুগত। আবছা অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেলেও কালভার্টের ওপর বসে থাকা স্তব্ধ নিশ্চল নারী মূর্তিটি চিনে নিতে এক মুহূর্তও দেরী হল না তার। একটা বিপুল পুলকের ঢেউ এসে তার সারা শরীরকে কাঁপিয়ে দিল। দ্রুতপদে এগিয়ে গেল সে, কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,—"একি, সুজাতা, তুমি এখানে?"

গভীর গম্ভীর বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে তাকালো সুজাতা, সুগতর বুকের ভেতর ধ্বক করে উঠল, বললে,—"তোমার চোখে জল!"

হাত বাড়িয়ে সুগতর হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল সুজাতা, কী বলবার জন্য তার ঠোঁট দুটো থর থর করে উঠল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

সূর্য ডুবে গেল। এখানে ওখানে জোনাকীরা আলো জ্বেলে তাদের প্রেয়সীদের ডাক দিতে লাগল, ঝিঁ ঝিঁ পোকার প্রণয়-সম্ভাষণে চারদিক মুখর হয়ে উঠল, কিন্তু মনের ভেতর অনেক কথা টগবগ্ করে ফুটতে থাকলেও সুগত-সুজাতা কোনো কথা বলতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে ফিসফিস করে সুজাতা বলল,—"আমি বড়ো দুঃখী সুগত—"

অভিভূতের মতো সুগত বলল,—"তবে কি তুমি কৃশানুকে বিয়ে করে ভুল করেছ সুজাতা?"

দূরের অন্ধকার ঝোপগুলোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সুজাতা বলল,—"হ্যাঁ সুগত, বড়ো ভুল করেছি, জানি না এ ভুল শোধরাবার সুযোগ জীবনে আর পাব কিনা। জানো, মানুষ চিনতে আমরা বড়ো ভুল করি, কৃশানুর কথাবার্তা, চালচলন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন জীবন ভরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—এখন শুধু ভাবি যে তার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে তোমার সঙ্গে কেন আমার দেখা হয়নি—"

সুজাতার এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে চমকে ওঠে সুগত, সমুদ্রের ঢেউএর মতো বিপুল আনন্দের দোলায় তার মন দুলতে থাকে, কিন্তু সে শুধু পলকের জন্য। পরক্ষণেই নিঃসীম রাত্রির মতোই হতাশার অন্ধকারে তার মন ভরে যায়! অমৃতের পাত্রখানি তার ঠোঁটের সামনে উঠে এসেছে, কিন্তু তার স্বাদগ্রহণ করবার ক্ষমতা যে তার নেই!

আত্মসংবরণ করে সুগত বলল, "কিন্তু মাত্র দেড় মাস হল তোমাদের বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে—"

আবেগ ভরে সুজাতা বলল—"এ বিয়ে বিয়েই নয়, সুগত, বিশ্বাস করো,—দেহের দিক থেকে আজও আমি কুমারী—"

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল সুজাতা, ধনুকের মতো বাঁকা তার পিঠ বার দুই কেঁপে উঠল, আর স্পন্দনহীন সুগত চুপ করে তাকিয়ে রইল।

এক এক করে অনেকগুলো তারা আকাশে ফুটে উঠল, আশে-পাশের গাছের পাতাগুলো দুলিয়ে দিল এক ঝলক হাওয়া, ঝিঁঝিঁর ডাক আর জোনাকীর নাচ উদ্দাম হয়ে উঠল।

মৃদুস্বরে সুগত বলল,—"বাড়ি চলো সুজাতা, রাত হল অনেক—"

যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সুজাতা বল্ল,—এ্যাঁ, বাড়ি? ও, হ্যাঁ, চলো—"

বাড়ির দিকে পা বাড়াল ওরা দু'জন।

সীতারামপুর ষ্টেশনে পা দেওয়া মাত্র দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসে কৃশানু। তার ছোটার মধ্যে কী যেন এক অশুভ ইঙ্গিত ছিল, অজানা আশঙ্কায় সুগতর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

কাছে এসে সুগতর উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাঁপাতে হাঁপাতে কৃশানু বলে উঠল,—"সুজাতা, সুজাতা, পুলিশ—"

কৃশানুর কথা শুনে সুজাতার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, বলল,—"কোথায় ?"

"ওই ওদের বাড়িতে—" বলে সুগতকে দেখিয়ে দিল কৃশানু,—"ওর বড়দা থানায় খবর দিয়েছিল,—বিশ্বাসঘাতক শয়তান—"

তাকে ধিক্কার দিয়ে সুজাতা বলল, "ছিঃ কৃশানু, এতদিন ওদের বাড়িতে কাটিয়ে এ সব কী বলছ তুমি ?"

সুগত কিছুই বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল,—"ব্যাপার কি ? পুলিশ কেন হঠাৎ ?"

দাঁতে দাঁত চেপে কৃশানু বলল,—"কেন আবার ? আমাকে ধরতে, ধরে জেলে পুরতে। আজ ছ'মাস ধরে তাড়া খাওয়া শেয়ালের মতো এ গর্ত থেকে ও গর্ত, ও গর্ত থেকে সে গর্ত করে বেড়িয়েছি, তবু ধরা পড়িনি। শেষটায় কিনা এখানে, ওঃ, বন্ধু-কৃত্য খুব ভালোভাবেই করলি সুগত,—সুজাতাকে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরেছিস, নানা ফষ্টিনষ্টি করছিস, সব মুখ বুজে সহ্য করে গেছি,—সুজাতা, আর সময় নেই, মাল পত্তর ওদের বাসাতেই পড়ে থাক, আমার সঙ্গে টাকা আছে, সব আবার কেনা যাবে, ঐ একটা ট্রেন আসছে—চলো আমরা ঐ ট্রেনেই পালাই—'

এগিয়ে এসে কৃশানুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুজাতা বলল —"না কৃশানু, আর আমরা পালাব না, আমরা ধরা দেব, সমাজ আর রাষ্ট্রের মুখোমুখি দাঁড়াবো নির্ভীক ভাবে—'

শ্লেষের সঙ্গে কৃশানু বলল—" ও, বুঝলাম। তা সুগতই কি তোমার এই নবতম আদর্শবাদের উদ্গাতা ? কিন্তু এ সব প্ল্যাটফর্ম-স্পীচের সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে, এখন আর সময় নেই, আমাকে যেতেই হবে, তুমি যাবে কি না বলো ?"

হুইশিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল, সেই সুরেসুর মিলিয়ে সুজাতা বলল,—"না আমি যাবো না—"

সুগত-সুজাতার দিকে একটা বিষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ট্রেনের দিকে ছুটে গেল কৃশানু, চলন্ত ট্রেনের পাদানীতে উঠে পড়ল।

চিবিয়ে চিবিয়ে সুজাতা বলল,—"কাপুরুষ—"

ওরা ফিরে এল।

পুলিশ, পুলিশের জেরা, স্টেটমেণ্ট নেওয়া সব শেষ হতে হতে রাত বারোটা বাজল, তারপর পুলিশ ভ্যানে করে সুজাতাকে নিয়ে দারোগাবাবু বিদায় নিলেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই শুনলো সুগত, জানতে পারল যে কালিঘাটের মন্দিরে মালা বদল করলেও সমাজ ও আইনের চোখে ওদের বিয়ে বিয়েই নয়।

অনেকদিন পরে কার মুখে যেন শুনেছিল যে ধরা পড়েছে কৃশানু, বিচারে তার দু' বছর জেল হয়ে গেছে।

ছ' বছর পরে আজ আবার সেই সুজাতার সঙ্গেই তার দেখা হয়ে গেল, আজকের সুজাতা অনেক পরিণত, অনেক গম্ভীর, অনেক গভীর, এই ছ'বছরে সুগতর মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক ভাঙ্গচুর হয়েছে, কিন্তু সুজাতার কথা সে ভুলতে পারেনি, ভুলতে পারেনি তার শেষ কথা, —"আবার আমাদের দেখা হবে সুগত, সেদিন হয়তো কৃশানুর কোনো পরিচয় আমি দেহে কিংবা মনে বহন করব না, তখন আমাকে চিনতে পারবে তো ?"

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যায়, সুগত মনে মনে ভাবে যে আসুক সুজাতা, আসুক তার ঘরে, আসুক তার হৃদয়ে। তার প্রণয়-গাঢ় মনের উষ্ণতা সুজাতার মনের শূন্যতার তুষার গলিয়ে দেবে।

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ

চিত্রিতা দেবী

খাদ্য এবং কাব্যে শুধু কি কথায় কথায় মিল ?
আর সব দিকে চিত্তে ও ভাবে,
বাকি শুধু গরমিল ?
কাব্য সূক্ষ্ম আত্মানুভূতি,—
খাদ্যটা স্থূল ভারী,
এ দুয়ের এই লম্বা তফাৎ
কি করে মিলাতে পারি ?
ভুলে গেছি আমি, দেহটা আমার
অন্নেই গড়া হয়েছে।
এই দেহময় মুক্ত বাতাস প্রাণ হয়ে
বেঁচে রয়েছে।
প্রাণের কাঁপনে অন্তরীক্ষে জলে বিদ্যুৎশিখা ;
প্রাণের কাঁপনে জলে ঢেউ দোলে,—
দিগন্তে রাঙা টিকা।
যে প্রাণ কাঁপছে অঙ্গে অঙ্গে, আমার শরীরময়।
অন্নর সেই গড়া তার দেহ, নেই তাতে সংশয় ॥
অন্নময়ের আড়ালে আছেন
চির প্রাণময় সত্তা
তাহার আড়ালে মনোময় দেহ,
অসীম মানস আত্মা ॥
বিশ্ব ভুবন, জয় ঝরে মন
তীব্র গতিতে ছোটে।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিচিত্র কাজে
সবল ভোগ্য লোটে।
পার হয়ে যায়, সপ্ত-সাগর
পাহাড় সমান বাধা।
যুগে যুগে গড়ে নূতন ধর্ম
ভাঙে মিথ্যার ধাঁধা।
নূতন জগৎ, নূতন সৃষ্টি, জাগে বিজ্ঞানে গড়া।
প্রকৃতির সব রহস্য যত একে একে পড়ে ধরা।
এ মনোময়ের আড়ালে কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে জ্ঞান।
সেই তো সবার অন্তরে লীন, আত্মার চিরধ্যান।

এ মনের মাঝে, গোপনে বিরাজে,
আলোঝরা চির সত্য।
প্রজ্ঞা শরীর মানসে মননে
প্রেরণা যোগায় নিত্য।
যত ভোগ-রাগ, যত মহা ত্যাগ,
যত কাব্যের ফুল।
প্রজ্ঞা সাজায় বিচিত্র মনে
থরে থরে, নির্ভুল ॥
অন্ন রসের পরিণাম দেহ
প্রাণ-মন বেয়ে বেয়ে।
জ্ঞানের আড়ালে অমৃতের আশে,
চিরকাল আছে চেয়ে।
আনন্দ রসে নিত্য তাহার সত্তা রয়েছে মগ্ন
তবু কি বলবে খাদ্যটা স্থূল,
ছন্দটা তার ভগ্ন ॥
না না,—তুমি নিন্দা কোর না !
অন্নকে স্থূল বোল না।
অন্নকে তুমি বাড়াও !
শ্রম শেষ করে, সুখাদ্য খাও !
স্বার্থ ও লোভ কমাও।
কিন্তু অন্নকে তুমি অনেক
অনেক বাড়াও ॥
অন্নং ন নিন্দ্যাৎ,—এই ব্রত তব ধর্ম।
অন্নং বহু কুর্ব্বীত,—এই হোক তব কর্ম ॥
দরিদ্র দেশ,—
ভিখারীর বেশ ;—অল্পে তুষ্ট যারা।
কৌপীন পরে, ভাগ্য ফিরাবে,
বলে বার বার তারা।
না না,—তুমি নিন্দা কোর না।
অন্নকে স্থূল বোল না !
স্থূল রসধারা প্রাণ-মন বেয়ে
ঝরায় কাব্য ঝরণা।

দেনা পাওনায় শরৎচন্দ্র

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র সাহিত্যে আর্টের উপরে Artificial এর স্থান দেন নাই। নীতির বুলি কপচিয়ে অহেতুক উপন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি করেন নাই। প্রত্যক্ষদর্শীর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের স্খলন, পতন, ত্রুটি তাঁর চোখের উপরে যা ঘটত, তা তিনি সযত্নে কুড়িয়ে নিতেন মনের খাতায়। প্রতিটি রচনার মধ্যে তাঁর দরদী মনের ছাপ থাকত। আর থাকত পেলব পলি মাটির ছাপ। জমিদারী প্রথার নিপীড়নে বাংলার কৃষক সমাজ যখন আর্তনাদ করছিল, কর্ণওয়ালিসি বন্দোবস্তের স্তাবকগণ যখন বাংলার বুকে জগদ্দল পাষাণের মত চেপে বসা এই জমিদারী প্রথাকে দূর হতে নমস্কার করে সরে যাচ্ছিল, অথবা নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ন্যায় ইহার ভয়ংকর সৌন্দর্য্য দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলে শুধু ভয়েই সরে যাচ্ছিল, শরৎচন্দ্র তখন বীজগাঁয়ের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার জীবানন্দের উচ্ছৃখল জীবনের ধূম্রজাল উন্মোচন করে তাঁর নিজের দ্যুতিকে সাহিত্যের আকাশে পরিদৃশ্যমান করে তুলেছেন।

স্বামী পরিত্যক্তা ষোড়শী ভৈরবীর জীবনে, আর অলকার জীবনের দুই সমান্তরাল রেখা টেনে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন দুয়ের মিল ঘটতে পারেনা। উত্তরোত্তর এ-দুটি রেখা যতই বাড়ান যাকনা কেন, এদের জীবন সংগম স্থলে উপস্থিত হতে পারেনা। মহাকবি কালিদাস তাই তাঁর শকুন্তলা এবং কুমারসম্ভব কাব্যে শকুন্তলা ও পার্বতীর জীবনকে দুটি কাণ্ডে বিভক্ত করেছেন, একটি পূর্ব্বকাণ্ড অপরটি উত্তরকাণ্ড। পূর্ব্বকাণ্ডে ফুলের সৌরভ, উত্তরকাণ্ডে ফলের শোভা। এই পূর্বকাণ্ডে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় পীড়ন সম্ভব নয়। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস। সভ্যতা যত দূরই অগ্রসর হোক না কেন, মানুষ সব সময় Reason দ্বারা চালিত হয়না—সে চালিত হয় Instinct দ্বারা।

ষোড়শী ব্রত নিয়ম এবং কঠোর কৃচ্ছ সাধন দ্বারা নিজের জীবনকে বন্ধ্যা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল অলকানাম্নী একটি নারী প্রকৃতি তার হৃদয়ে গভীর কন্দরে অলক্ষ্যে জাল বুনে চলেছে। অলকার জাল-বোনা অনেকটা পেনিলোপির জাল বোনার মত। অলকার মধ্যে আছে রোমান্স, আর ষোড়শীর মধ্যে আছে "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার লাভের দুর্বার প্রেরণা।"

জীবানন্দ ষোড়শীকে কাছে পেয়ে তার সতী-পণার পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ষোড়শী তার ব্যক্তিত্বের জোরে জীবানন্দের লেলিহান কামনাবাসনার দুর্বার আকর্ষণ হতে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। এখানে তার চরিত্রের দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে এরূপ দৃঢ়তা প্রায়শঃ চোখে পড়ে।

তারপর জীবানন্দকে ঔষধ প্রদানের সময় আমরা ষোড়শীর নারী হৃদয়ের আর একটি পরিচয় পাই। এ-যেন আমাদিগকে অন্নদাদিদির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শাহজীর অত্যাচারের প্রতিটি মুহূর্তে অন্নদাদিদির যে রূপ দেখেছি, তা শিশিরসিক্ত শেফালী ফুলের সৌন্দর্য ছাড়া আর কি? শত অত্যাচারেও এই নারী হৃদয় কলুষিত হয়না। ষোড়শীর চরম পরীক্ষা এ সময় হয়ে গেল। এর পর পশুবৎ আচরণ-কারী জীবানন্দকে সে আর এক-দফা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কে-সাহেবের হাত থেকে রক্ষা করল। প্রতি পদক্ষেপে এরূপ আচরণ বিচারকের চোখে কোন প্রকার উদ্দেশ্য আরোপ করতে পারে, কিন্তু ভক্ত সমালোচকের কাছে ষোড়শীর চরিত্রের মহান দিক উন্মোচিত হয়ে যায়। আমরা বিস্ময়ে অবাক হই—যেমন ভাবে অবাক হয়েছিল জীবানন্দ। তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় এ নারীর মহত্বের স্পর্শে।

(২)

পূর্বেই বলেছি ষোড়শী ও অলকার জীবন সমান্তরাল সরল রেখার মত। দুটি বিভিন্ন সত্তা একই ক্ষেত্রের উপর

বেয়ে চলেছে। ক্ষেত্রটি নারীহৃদয়। মাতৃত্বের পেলব পলিমাটির স্তর জমে প্রতিটি খণ্ড "বাঙ্গালী-মা" শরৎ-সাহিত্যের আসরে এসে হাজির হয়েছে। রাজলক্ষ্মীর জীবনে বাইজীর সত্তা, আর শ্রীকান্তের প্রতি অনুরক্তা রাজলক্ষ্মীর সত্তা যেমন করে মিলেছে—তেমনি করে মিলেছে ষোড়শীর ভৈরবীর সত্তা আর অলকার গৃহাভিমুখী সত্তা। ষোড়শীর প্রতিটি কর্মের মধ্যেই আছে মুন্সিয়ানা, আর আছে নারীত্বের ছাপ। চণ্ডীগড়ের ভৈরবী হওয়ার পর তার উপর অসংখ্য লোকের প্রতিপালনের ভার পড়েছে। সাগর তার অনুরক্ত, তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।

ষোড়শীর বাবা তারাদাস যখন বীজগাঁয়ের জমিদারের ক্ষতি করতে পারল না তখন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল—কেমন করে ষোড়শীকে বদল করে অন্য ভৈরবীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা যায়। শিরোমণি মশাই, গ্রামের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ জনার্দন রায় এবং আরও অনেকে মিলে চক্রান্তের জাল ফেলে ষোড়শীকে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল। ষোড়শীর ফকির সাহেবের কাছে যে শিক্ষা লাভ হয়েছিল তাতে তাকে আরও অধিক পরিমাণে সহিষ্ণু করে তুলেছিল।

কিন্তু নির্মল ও হেমের দাম্পত্য জীবন দেখে তার মনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে অনুরূপ একটি গৃহ কোণের স্বপ্ন দেখল। ধন নয়, মান নয়—একটা বাসা রচনার জন্য সে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল। ক্ষণ-মিলনের কত গোধূলিলগ্ন তার জীবনে এসেছে আর গেছে। কোন লগ্নই তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় নাই। একদিন সন্ধ্যায় নির্মলকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এসে সে তার হাতের উপর ভর দিয়ে নির্মলকে একটা জায়গা পার হতে যখন সাহায্য করল, তখন কি পুষ্পধনু মুহূর্তের জন্যই তার তূণ হতে একটা শর নিক্ষেপ করে নাই? এরপর শুরু হল তার জীবনে নতুন প্রেমিকের আনাগোনা। যে আকাশ জুড়ে এতদিন কেবলমাত্র জীবানন্দই বিরাজ করছিল, আজ সেখানে দ্বিতীয় গ্রহের আবির্ভাব। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু নির্মল এবং হেম যে তার জীবনের একটা আবদ্ধ জলাশয়ের উপর ঢেউএর সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। জীবানন্দ অলকার জন্য কিছুই করে নাই। বরং প্রতিটি নতুন অবস্থার চাপে অলকার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করেছে। কিন্তু নারীর দেহগত যৌবনের দিকটা ছাড়া যে আর একটা দিক আছে তা আবিষ্কার করে সে নিজেকে আবিষ্কার করছে। নাস্তিক, উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির যুবক জীবানন্দ আজ বাঁচতে চায়। যেমন ভাবে বাঁচতে চায় আর সকল মানুষ। বাঁচাটাই তো জীবন ধর্ম।

জীবানন্দর কাছে দেবীর সম্পত্তির সমস্ত হিসাবপত্র গুছিয়ে দিয়ে ষোড়শী জন্মের মত সেখান হতে চলে যেতে চায়। কিন্তু শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে যেমন সমস্ত তপোবন-প্রকৃতি একসঙ্গে "যেতে নাহি দিব" বলে চীৎকার করে উঠেছিল, তেমনি সে-স্থানের আকাশে বাতাসে করুণ আর্তনাদ যেন মমতাময়ী ষোড়শীর নবীন পথযাত্রার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জীবানন্দ তার গতি-রোধ করতে চায়। শুধু তাই নয় তাকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে চায়। নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে তার অনুকম্পার উদ্রেক করতে চায়। অবস্থার গতিকে ফকির সাহেব ষোড়শীর জন্য কুষ্ঠাশ্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা সফল রূপ দেবার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ষোড়শী উন্মুখ। ক্রমশঃ ঘটনার চাপে শিরোমণি মশাই, এককড়ি গোমস্তা এবং জনার্দন রায় মশাই যখন অতিশয় কাতর, জীবানন্দ নিজের জীবনের কুকীর্তিগুলির সাক্ষী দিতে যখন প্রস্তুত, গ্রামের বিদ্রোহী আত্মা যখন জেগে উঠেছে, তখন আবার জীবানন্দর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য জনার্দন রায়, নির্মল ও হেমের সহায়তায় ষোড়শীর কৃপা ভিক্ষা করল। ষোড়শী তাদের উদ্ধার করল। আর জীবানন্দকে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করল নবীন জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে। সেখানে তার সার্থকতা হবে মাতৃত্বের মধ্যে। জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা, নারীর চরম সাধনা এ-ভাবেই রূপায়িত হয় দরদী লেখক শরৎচন্দ্রের লেখনী মুখে।
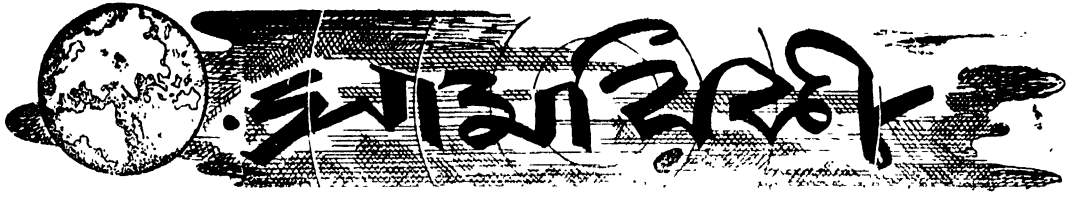
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি—

ভারত সরকার ১৯৬৩-৬৪ সালের বার্ষিক খসড়া হিসাবে বহু নূতন কর ধার্য করার ফলে এবং দেশের অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্তনে সর্বত্র নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের মধ্যে দারুণ অসুবিধা সৃষ্ট হইয়াছে এবং সে জন্য বিক্ষোভের শেষ নাই। চাউলের দাম ৩৫ টাকা মণ হইয়াছে, তৈল, মসলা প্রভৃতির দাম বাড়িয়াছে, বাজারে তরকারী দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য, মাছ ৪ টাকা হইতে ৬ টাকা সের। বাঙ্গালী রুটি খাইতে অভ্যস্ত নহে—সে বাধ্য হইয়া রুটী খাইতেছে। আলু অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সকলকে গম ও আলু খাইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ভেতো বাঙ্গালী ভাত না খাইয়া বাঁচে না সে জন্য সর্বদা সর্বত্র হাহুতাশ শুনিতে হয়। আমেরিকা হইতে গম আসিলে তবে লোক গম খাইবে, রেঙ্গুন হইতে চাল আনিয়া ভারতবাসীদের ভাত খাওয়াইতে হইতেছে—ইহাই ত দেশের অবস্থা! ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৬ বৎসর অতীত হইল—এতদিনেও শাসকবর্গের ভারতবর্ষকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। গত প্রায় এক বৎসর কাল না হয়, চীন-ভারত যুদ্ধের ফলে ভারতে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার পূর্বে ১৫ বৎসর কেন খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযুক্ত চেষ্টা করা হয় নাই, তাহা বুঝা যায় না। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হইতে চলিল, বহু সহস্র কোটি টাকা তাহার জন্য ব্যয় হইল—কিন্তু তাহার ফলে সাধারণ দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধান হইল না—কাজেই মানুষ আর ধৈর্যধারণ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে একটু চেষ্টা করিলেই এক জমিতে বৎসরে ৩ বার ফসল ফলানো যায়—কিন্তু তথাপি প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন হয় না। পশ্চিম বাংলায় এত অধিক আলু জন্মে যে উপযুক্ত ঠাণ্ডাঘরের অভাবে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ নষ্ট হইয়া যায়—মানুষের কাজে লাগে না। অবশ্য অত্যধিক লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিই খাদ্যাভাবের মূল কারণ—গত ১০।১২ বৎসর ধরিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু পরিবার-পরিকল্পনার কথা বলিয়া চীৎকার করিতেছেন—কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে সে প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করা যাইতেছে না। পরিকল্পনা আছে, টাকা আছে—কিন্তু কাজ করিবার সৎ-লোকের অভাব—কেন জানি না—কোন মানুষ তাহার কর্তব্য ভাল করিয়া সম্পাদন করিতে চাহে না। সকলে সর্বদা নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ব্যস্ত—ফলে সকলেই ফাঁকি পড়িতেছে। গত ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার দীঘা সমুদ্রতীর সহরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মিলনেও এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছিল। তথায় প্রদেশ কংগ্রেস নেতা শ্রী অতুল্য ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবাবুলাল শর্মা, শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী, শ্রীমহারাজা বসু প্রমুখ নেতারা শুধু মূল্য বৃদ্ধিতে জনগণের অসুবিধার কথা বলেন নাই—যে সকল মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর জন্য জিনিষপত্রের দাম অযথা বাড়িয়াছে, তাহাদের কঠোর শাস্তিদানের কথাও বলিয়াছেন। যাহা হউক, এখন সবে জ্যৈষ্ঠ মাস—পৌষ মাঘের পূর্বে নূতন ধান পাওয়া যাইবে না। এই ৮।৯ মাস কাল সরকার যদি নানা দেশ হইতে খাদ্যশস্য—বিশেষ করিয়া চাল আমদানী করিয়াও তাহার উপযুক্ত বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন—তবেই দেশবাসী আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু এ বিষয়ে শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। প্রতি দেশবাসীকেও নিজ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিতে হইবে। ইউরোপে যুদ্ধের সময় খাদ্যাভাব উপস্থিত হইলে প্রতি দেশবাসী তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে খাদ্য উৎপাদন করিয়াছিল। আমাদের দেশে

পতিত জমির অভাব নাই—অধিবাসীরা যত্ন ও চেষ্টা করিলে খাদ্যের একাংশ অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারেন। স্বর্গত 'মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সে জন্য সকলকে গৃহে হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু প্রভৃতি পালন করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি পশ্চিম বাংলায় অধিক পরিমাণে নারিকেল উৎপাদনের কথা সর্বদা সকলকে বলিতেন। আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, জামরুল, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতির চাষও বেশী করা দরকার—কিন্তু কেহ এসব কথা শোনে না—শুধু খাদ্যাভাবের জন্য সরকারকে গালি দিয়া কর্তব্য শেষ করে। প্রচুর তরকারী পাইলে দরিদ্র মানুষ তাহা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতির চাষও বাড়িতেছে না। ধনী ও শিক্ষিতের দল এই কার্যে অগ্রসর না হইলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য। আমরা সকল বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করি—দেশবাসী অবহিত হইলে সরকার তাহার কর্তব্য সম্পাদনে অবশ্যই আগাইয়া আসিবেন।

দীঘায় শ্রীজহরলাল নেহরু—

দীঘায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মিলনের উদ্বোধন করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ২৮শে এপ্রিল রবিবার সকালে দীঘায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও আসিয়াছিলেন। ঐ সম্মিলনে সভাপতি হইয়াছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী—সম্মিলনে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিজয়া নন্দ পট্টনায়ক, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রবিবার শ্রীনেহরু ৩৭ মিনিট বক্তৃতা করিয়া সম্মেলন উদ্বোধন করেন। তিনি বক্তৃতায় দেশের জরুরী অবস্থার কথা বলিয়া কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝাইয়া দেন। পরদিন ২৯শে এপ্রিল সোমবার সকালে শ্রীনেহরু দীঘা হইতে ২০ মাইল দূরে কাঁথিতে যাইয়া এক জনসভায় ২৫ মিনিট বক্তৃতা করেন। সেখানে তিনি দেশবাসীকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে আবেদন জানান। চীনের সহিত আবার যুদ্ধ হউক বা না হউক, আজ ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ যদিও আজ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য প্রভৃতি দিয়া ভারতকে সাহায্য করিতেছে, কিন্তু তথাপি আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার—সকল বিষয়ে ভারতকে এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে। খাদ্য উৎপাদন না করিলে যে টাকা দিয়া আমরা বিদেশ হইতে খাদ্য ক্রয় করিব, সেই টাকা দিয়া যন্ত্রপাতি ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারিব না। সে জন্য শ্রীনেহরু সকলকে সর্বাগ্রে খাদ্য উৎপাদন করিতে আবেদন জানান। কারখানার শ্রমিকরা যদি পূর্ণভাবে পরিশ্রম করিয়া প্রচুর উৎপাদনে সাহায্য না করে, তবে এখনও বহু দিন আমাদের বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানী করিতে হইবে—সে জন্য শ্রীনেহরু কৃষক ও শ্রমিকদের নিজ নিজ কর্তব্য অধিকতর নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে উপদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোক যদি কৃষক ও শ্রমিকদের কাজে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা না করে, তবে কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষে কর্তব্য পালন করা সম্ভব হইবে না। শ্রীনেহরু কাঁথি হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ অঞ্চলে শ্রীনেহরুর উপস্থিতি সকলের মধ্যে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে।

দীঘা সম্মিলনে প্রস্তাব—

দীঘায় ২৯শে এপ্রিল প্রদেশ কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মিলনে যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার মর্ম এইরূপ—(১) বিশ্বাস-ঘাতক চীনের হামলাকে প্রতিরোধ করার জন্য সমগ্র জাতিকে একযোগে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে (২) ভারতের অভ্যন্তরে চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের সায়েস্তা করিতে হইবে ও তাহাদের দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বাধা দিতে হইবে (৩) শ্রীনেহরুর জোট-নিরপেক্ষ রাজনীতিতে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি দীঘা সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন এবং জেলার নেতা রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি তাঁহাকে সকল কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। দীঘায় কয়েক শত কংগ্রেসকর্মী ও কয়েক হাজার দর্শক এই সম্মিলন উপলক্ষে ৩।৪ দিন বাস করিয়াছেন। এই সম্মিলনের দ্বারা দীঘাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা হইয়াছে।

দিল্লীতে আলোচনা—

মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব শ্রীডীন রাস্ক ও বৃটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রী শ্রীডানকান স্যাণ্ডস্ দিল্লীতে আসিয়া ১লা মে হইতে ৪ দিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্র নেতা ও সরকারী কর্মীদের সহিত উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কি করিয়া ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে সন্তুষ্ট করিয়া কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যায়—শ্রীস্যাণ্ডস্ সে জন্য চেষ্টা করিবেন। পশ্চিমী দেশ-সমূহ ও আমেরিকা যে ভারতকে যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিতেছে, সে ব্যাপারের সহিত কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কোন যোগাযোগ নাই। বৃটেন ও আমেরিকা উভয় দেশই ভারতের সহিত চীনের যুদ্ধে ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১৯৬৫ সালেরপর ও ইংরাজি চলিবে—

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে স্থির ছিল যে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরাজি ভাষা কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হিসাবে চালু থাকিবে। গত ২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে লোকসভায় যে নূতন ভাষা বিল গৃহীত হইল, তাহাতে বলা হইয়াছে—আরও কিছুকাল ঐ ব্যবস্থা চলিবে—অর্থাৎ ইংরাজি সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে। ১৯৭৫ সালে হিন্দী ভাষার অবস্থা সম্বন্ধে ৩০ জন সংসদ সদস্য লইয়া এক কমিটি গঠিত হইবে ও ঐ কমিটী ভবিষ্যতের সরকারী ভাষা সম্বন্ধে নির্দেশ দিবে। ইতিমধ্যে সকল রাষ্ট্রে নিজ নিজ মাতৃভাষায় সরকারী কাজ চালানো হইবে। ২৫শে বৈশাখ হইতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দপ্তরে বাংলা ভাষায় অধিকাংশ কাজ করা হইবে। যদিও সংবিধানে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দী এখনও রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই—সেজন্যই ইংরাজিকে বহাল রাখা হইল। আমাদের বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

পাকিস্তানী হামলা—

চীন সকল সভ্যতার নীতি পদদলিত করিয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। চীনের বন্ধু পাকিস্তান কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না। পাকিস্তান ভারতের সহিত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতেছে না। সে দিনের পর দিন শুধু পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের উপর নানাভাবে আক্রমণ করে না—সর্বদা সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়া, ভারতের জিনিষপত্র চুরি ডাকাতি করিয়া সীমান্তবাসী ভারত-বাসীদের উত্যক্ত ও বিরক্ত করে। সম্প্রতি ত্রিপুরা সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্যরা নানাভাবে ভারতীয় অধিবাসীদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। এ বিষয়ে ভারত পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখিলে কোন উত্তর আসে না। গত ১৬ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান একই নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ না করিলে ইহার প্রতীকারের অন্য কোন উপায় নাই।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

নদীয়া কৃষ্ণনগরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনের পর গত ৭ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে স্থানীয় কলেজে এক মাসিক সভা হয়। ঐ দিন সকাল সাড়ে ৬টায় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার হইতে তিন খানি রিজার্ভ বাসে প্রায় ১২০ জন সদস্য যাত্রা করিয়া বেলা ৯ টায় তারকেশ্বরে পৌঁছেন। তথায় তারকনাথের মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনের পর ১০টায় পুনরায় যাত্রা সুরু হয়। তারকেশ্বরে কর্মী শ্রীদিধাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্যামাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি অতিথিগণকে আদর আপ্যায়ন করেন। সকলে বেলা ১২টায় বিদ্যাসাগর সেতু (চাঁপাডাঙ্গা), বড় ছোট বড় নদীর পুল অতিক্রম করিয়া কামারপুকুর রামকৃষ্ণ সারদা কলেজে গমন করেন। তথায় প্রিন্সিপাল শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পিতা, কলেজের সম্পাদক শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানান ও কলেজ গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনে তৃপ্ত করেন। বেলা ২টা হইতে ৪টা সদস্যগণ বাস যোগে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পিতৃগৃহ জয়রামবাটী ও কামার-পুকুরে ঠাকুরের পিতৃগৃহ, মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া সাড়ে ৪টায় কলেজ হলে এক সভায় মিলিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান করেন। সম্মিলনের সভা-পতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভাপতি হন এবং অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, স্বামী গদাধরানন্দ, বিমলাকান্তবাবু, প্রিন্সিপাল বিনয় কৃষ্ণবাবু, শ্রীফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসৌরীন দে প্রভৃতি সভায় সময়োপযোগী ভাষণ দেন। শ্রীযুক্তা আশা-পূর্ণা দেবী, শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীসুরেন নিয়োগী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শতাধিক খ্যাতিমান সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে সভা সাফল্যমণ্ডিত হয়। সন্ধ্যা ৭টায় সভান্তে জলযোগাদির পর বাসে যাত্রা করিয়া করিয়া সকলে মধ্যরাত্রিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাহার পর গত ৫ই মে রবিবার হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে বিড়লা কোম্পানীর রেয়ন কারখানায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের আর একটি মাসিক অধিবেশন হয়। ঐ দিন বেলা ১টায় ট্রেণে শতাধিক সদস্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ট্রেণে বেলা ৩টায় ত্রিবেণীর কুন্তী হল্ট স্টেশনে গমন করেন। কারখানা ঐ স্টেশনের পাশে—২ ঘণ্টাকাল কারখানা পরিদর্শনের পর বেলা ৫টায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু, সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীঅজিত ঘোষ, কবি শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণ রত্ন, শ্রীশুদ্ধসত্ব বসু, শ্রীকৃষ্ণধন দে, সভাপতি প্রভৃতির ভাষণ এবং শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কয়েকখানি মধুর সঙ্গীত সকলকে ২ ঘণ্টা কাল মুগ্ধ করিয়াছিল। কারখানার ম্যানেজার শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী জয়শ্রী দেবীর নেতৃত্বে কারখানার কর্মীরা সকলকে নানাভাবে আদর করেন। উৎসবে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতির উপস্থিতি উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছিল। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন এই ভাবে দূরবর্তী স্থান সমূহে সাহিত্য সভার উদ্যোগ আয়োজন করিয়া নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিক গণের মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

দৌত্যব্যর্থ—

আরব যুক্তরাষ্ট্রের নেতা শ্রীআলি সবরী ভারতের সহিত চীনের আপোষের জন্য চীন কর্তৃপক্ষের সহিত কথা বলিতে পিকিং গিয়াছিলেন। তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে। চীন কর্তৃপক্ষ কলম্বো প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। দেশে ফিরিবার পরে ২৭শে এপ্রিল শ্রীসাবরী দিল্লীতে আসিয়া শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ২৮শে এপ্রিল শ্রীনেহরু দীঘায় বক্তৃতা করার সময় সে বিষয়ে নিজের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বন্ধু দেশসমূহ চীন-ভারত যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ভারতকে সাহায্য করিলে ভারত অবশ্যই সে সাহায্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি কোন সাহায্য না আসে, তাহা হইলে ভারত নিজের শক্তি দ্বারাই শত্রুর সহিত লড়াই করিবে। শ্রীসবরী এক বিরাট দেশের নেতা—তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

পথের নাম পরিবর্তন—

সম্প্রতি কলিকাতার তিনটি বড় রাজপথের নাম পরিবর্তন করা হবয়াছে—(১) কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের নাম করা হইয়াছে—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নামে বিধান সরণি (২) চিৎপুর রোডের (আপার ও লোয়ার উভয় মিলিয়া) নাম করা হইয়াছে—রবীন্দ্রসরণি (৩) গ্রে ষ্ট্রীটের নূতন নাম হইল শ্রীঅরবিন্দ সরণি। তিন ব্যক্তিই বর্তমান বাংলার স্রষ্টিকর্তা—তাঁহাদের নাম লোক সর্বদা স্মরণ করিলে তাঁহাদের আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

রুরকেলা কারখানার জন্য জার্মাণ ঋণ—

গত ২৫শে এপ্রিল পশ্চিম জার্মাণীর বন সহরে ভারত সরকার ও পশ্চিমজার্মাণ সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার ফলে রুরকেলা কারখানার জন্য পশ্চিম জার্মাণী ভারতকে ৪০ কোটি মার্ক ঋণ দান করিবে। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মাণীর প্রদত্ত ৬৬ কোটি ৮০ লক্ষ মার্ক ঋণ পাইয়া ভারতসরকার ঐ কারখানাটি বড় করি াছেন। ভারতে এখনও প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কোচবিহার তুফানগঞ্জে ভীষণ ঝড়—

গত ২৯শে এপ্রিল কলিকাতায় খবর আসিয়াছে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির ফলে ১০টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়াছে—৭ হাজার লোক নিরাশ্রয়, ২৫ জন নিহত ও ১৫৭ জন গুরুতর আহত হইয়াছে। খবর পাইয়াই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঐ স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন—ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলেন, কোচবিহারে যাহা দেখিলাম, ধ্বংসের এরূপ সর্বগ্রাসী মারাত্মক রূপ এর আগে আর দেখি নাই—ধুবড়ী অঞ্চলে ধ্বংসের প্রচণ্ডতা কল্পনাকেও হারাইয়া দিয়াছে। একটি মাত্র গ্রামে এক শত লোক মারা গিয়াছে।

বাঙ্গালী যুবকগণের উৎসাহ—

গত ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত ৫ মাসে ৫৫৮৮ জন বাঙ্গালী যুবক সাধারণ সৈনিক হিসাবে ভারতীয় সেনা বাহিনীতে যোগদান করিয়াছেন। গত ৪ঠা মে কর্তৃপক্ষের একজন এই তথ্য প্রকাশ করেন এবং বলেন—বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা শুভ সংবাদ। বাঙ্গালীও যে প্রয়োজন হইলে সকল দুঃখ বরণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতে পারে—ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণ হয়। সে জন্য শীঘ্রই শুধু বাঙ্গালী সৈনিক লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করা হইবে।

শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য—

মৈমনসিংহের মহারাজা ৺শশিকান্তের পুত্র খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীস্নেহাংশু-কান্ত আচার্য্যকে ২৩শে এপ্রিল রাত্রিতে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কয় মাস পূর্বে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কলেরা মহামারি—

গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে এবার শুধু কলিকাতা সহরে নহে—মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলায় কলেরা মহামারিরূপে দেখা দিয়াছিল। রাজ্য সরকারের ব্যবস্থায় বহু রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়া বাঁচিয়া গেলেও কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা এবার কম নহে। কলেরা রোগের প্রধান কারণ, উপযুক্ত শুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। সরকার কলিকাতার মত বড় সহরেও সে অভাব দূর করিতে পারেন নাই, মফঃস্বলের কথা ত বলিবার নহে।

আলুর অপচয়—

পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়—কিন্তু উপযুক্ত ঠাণ্ডাঘরের অভাবে প্রতি বৎসর ৭ কোটি টাকা মূল্যের আলু নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মফঃস্বলে বহু স্থানে কোল্ড ষ্টোরেজ বা ঠাণ্ডাঘর নির্মিত হইলেও সে সকল স্থানের কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও নীতির অভাব আলুচাষীদের এই ক্ষতি সাধন করিতেছে। সরকার আলু সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন, ইহাই দরিদ্র আলুচাষীদের আবেদন।

কেদারনাথ স্মৃতি উৎসব—

পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর বহু মনীষীর স্মৃতি বিজড়িত। বাংলার শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দক্ষিণেশ্বরের অধিবাসী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পূর্তি হওয়ায় দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের উদ্যোগে স্থানীয় অধিবাসীগণ গত ১২ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় মণ্ডল বাগানে সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া কেদারনাথের স্মৃতি উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল, স্থানীয় অধিবাসী সুলেখক শ্রীসুবোধকুমার রায় কর্তৃক এই উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত 'নন্দীশর্মা' নাটকের অভিনয়। বলা বাহুল্য কেদারবাবু প্রথম জীবনে নন্দীশর্মা ছদ্মনামে তাঁহার রচনা প্রকাশ করিতেন। তিনি যে সময়ে বাংলা সাহিত্যে নন্দী শর্মা নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের তৎকালীন ঘটনাবলী অবলম্বনে সুবোধকুমার নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। তাহাতে শুধু কেদারনাথের জীবন কথাই লেখা হয় নাই, তৎকালীন দক্ষিণেশ্বরের একটি পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। কবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার অধ্যাপক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সুলেখক ও সমাজসেবক বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মহানুভব কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত যদুনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কেদারনাথের প্রতিবেশী মনীষীদিগের চরিত্রও এই নাটকে উপভোগ্য বিষয় হইয়াছে। উৎসবের দিন সন্ধ্যায় এই নূতন নাটকের অভিনয় গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই মুগ্ধ করে। নাটকে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, এবং শেষ পর্যন্ত যে ট্র্যাজেডীর মধ্যে ইহা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাকে সত্যই সার্থক সৃষ্টি বলা যায়। সুসাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর সভাপতিত্বে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং স্থানীয় শ্রীফণীন্দ্রভূষণ মৈত্র, কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীনন্দগোপাল পাল ও শ্রীসুবোধকুমার রায় কেদার-নাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বক্তৃতা করেন এবং সভাপতি মনোজবাবু একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে 'কেদারনাথ স্মরণে' নামক একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া উৎসবে বিতরণ করা হয়। পুস্তিকাখানি কেদারনাথের জীবনের ও সাহিত্যের বহু তথ্যে পূর্ণ। ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকগণের যে ইহা বিশেষ উপকারে লাগিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেদারনাথের সাহিত্যের কথা বাংলার সর্বত্র আলোচিত হওয়া উচিত।

ভারতীয় চিন্তানায়ক বৈঠক—

আগামী ১লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য কলিকাতায় আসিবেন, তিনি সেদিন ভারতীয় চিন্তানায়কদের বৈঠকেরও উদ্বোধন করিবেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ কলিকাতায় চিন্তানায়ক বৈঠকের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের সপ্তম বার্ষিক সম্মিলন উপলক্ষে ঐ বৈঠক ৭ দিন ধরিয়া চলিবে ও বৈঠকের সঙ্গে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শূন্য ঘাট

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

স্মৃতির এ পথে এসে ব্যথা পাই, চোখে আসে জল,
নদীতে নেমেছে ঘাট, তাও ভাঙা,
সব যেন ফাঁকা ;
এ ঘাটে তোমারে দেখে একদিন হয়েছি চঞ্চল,
ঘুঘু ডাকে ক্লান্ত কণ্ঠে, শূন্য মনে মিছে বসে থাকা।
তুমি নাই, পথ আছে, নিরাশ্রয় দুর্গতির মাঝে,
স্বপ্নের কোরক ফুটে ঝরে গেছে, আশাহত মন,
তোমার সে মেটেঘর চিহ্নহীন, মূক হয়ে রাজে
ইতিহাস। রৌদ্র যেন রুদ্ররূপে জলে অনুক্ষণ।

বটের শীতল ছায়ে কেটে গেছে সারাটি দুপুর,
আমার কথার পুঁথি নিরালায় নিয়ে ছিলে তুমি।
পাতায় পাতায় বায়ু দোল দিয়ে গেছে বহু দূর,
সূর্য্যের রক্তিম আঁখি দেখেছিনু আমরা দুজনে,
অতীতের প্রতিধ্বনি কাণে আসে, মোর জন্মভূমি
এই গ্রামখানি আজো বেঁচে আছে কাকলী কূজনে।
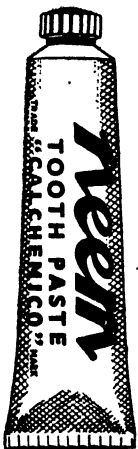
সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

১৩

উনবিংশ-শতকের প্রমোদ-প্রিয় লোকজনের মনে যাত্রাভিনয়ের পালা দেখবার সখ যে কতখানি প্রবল ছিল এবং সে যুগে যাত্রার আসরে মজার-মজার যে সব ঘটনা ঘটতো, পুরোনো গ্রন্থ-কেতাবে তারও অনেক বিচিত্র কাহিনী নজরে পড়ে। একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে, আপাততঃ সেকালের যাত্রাভিনয়ের আসরের এমনি একটি মজার কাহিনী নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। কাহিনীটিতে লেখকের কল্পনার তুলির রঙীণ-পরশ থাকলেও, এ রচনা থেকে সেকালের যাত্রার আসরের নিখুঁত পরিচয় মিলবে প্রচুর।

*　　*　　*

(অমৃতলাল বসু রচিত 'কৌতুক-যৌতুক' গ্রন্থ হইতে)

…পূজার তিন রাত্রে-ই যাত্রা হইত ; এক যায়গায় অধিক ভিড় হইবে বলিয়া মণ্ডপের (দুর্গোৎসবের) সম্মুখে অঙ্গনে এক দলের গাহনা চলিত আর বাহিরে নারিকেল-বাগানের পার্শ্বে চালা বাঁধিয়া আর এক দলের গাহনা বসিত। যাত্রা শুনিতে কত লোক যে জমায়েত হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না ; সদর হইতে বড় বড় মহাজনেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন, উকীল, মোক্তার ডেপুটী, মুন্সেফ এমন কি জজ, কালেক্টর, ডাক্তারসাহেব ও পুলিশ সাহেবরা-ও আসিয়া আমোদ করিতেন।…

…　　…　　…

…বোধ হয় বলিয়াছি যে নবমীর পূজার দিন-ই সর্ব্বাপেক্ষা ধুমধাম বেশী, সেই দিনকার বায়না খুব উঁচুদরের অধিকারীর-ই থাকিত, ঐ দিন-ই সদর হইতে ইংরাজ বাঙালী হাকিমেরা এবং বড় বড় উকীল মোক্তার সেরেস্তাদার, পেশ্‌কার, নাজীর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসরে উপস্থিত থাকিতেন। একবার নবমী পূজার রাত্রে কলিকাতার তৎকালীন কোন অধিকারীর দল নলদময়ন্তীর পালা গান করিবে। মণ্ডপের সম্মুখে উঠানে আসর হইয়াছে, সামিয়ানার নীচে সব ঝাড় ঝুলানো, চারিদিকে থামে থামে দেয়ালগিরি। আজ আর তেলের আলো নাই, সব মোমবাতির ব্যবস্থা ; দালানের সাম্‌নের রকে ও তিনদিকের বারান্দায় অভ্যাগত নিমন্ত্রিতগণ বসিয়াছেন, বাড়ীর ও পল্লীর ছেলেরা কেহ বা জরি-মখমলের পোষাক পরিয়া, কেহ বা কোমরে কোর্‌মাখানো কাপড় জড়াইয়া গায়ে ছিটের জামা আঁটিয়া গান আরম্ভমাত্র-ই আসরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সং আসিলে জাগিয়া উঠিবে। উঠানের একপাশে কয়েকখানি কেদারা পাতা তাহাতে জজ, কালেক্টার, পুলিশ সাহেব, ডাক্তার সাহেব

প্রভৃতি রাজপুরুষেরা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের ও পান আহারের বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং সকলেরই হাস্যবদন। যাত্রা খুব জমিয়া গিয়াছে, এক দল ছোক্‌রা রঙিণ পোষাক পরিয়া জরির তাজ মাথায় দিয়া হাত নাড়িয়া গান গাহিতেছে, দুই দিকে দুই জন মশালচি ছোকরাদের মুখের সাম্‌নে দুই দিকে মশাল ধরিয়া আছে; এখন যেমন থিয়েটারে অভিনয়কালে বড় বড় অভিনেতার মুখের উপর 'লাইম লাইট্‌' ৺অমৃতলাল বসু মহাশয়ের আমলে রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয়ের সময়, একালের রীতি-অনুযায়ী বৈদ্যুতিক-বাতির সাহায্যে প্রধান চরিত্রাভিনেতাদের উপর আলোক-সম্পাতের সুব্যবস্থা ছিল না…তাই তখনকার দিনে 'লাইম্‌-লাইট্‌, বা 'গ্যাসের বাতির' সহায়তায় থিয়েটারের অভিনেতাদের উপর আলোক-সম্পাত করাই ছিল রেওয়াজ) নিক্ষেপ করে, সেকালে সেইরূপ যাত্রার গায়কদিকের মুখের কাছে মশাল ধরা হইত। ছোকরারা গাহিতেছে:—

"হয়ে আমার-ও স্বপক্ষ যাও পক্ষরাজ বল গে' রাজায়।"

চারিদিক হইতে রুমালে বাঁধা সিকি, আধুলি, টাকা প্যালা পড়িতেছে, 'বাহবা বাহবা' 'বেশ বেশ' শব্দে অট্টালিকা মুখরিত, সাহেবরা-ও প্যালা দিতেছেন, কালেক্টার সাহেব-ও মাঝে মাঝে এক এক টাকা দিতেছেন; কিন্তু তাঁর মুখভাবে যেন কতকটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা যাইতেছে। প্রথমে আসিয়া-ই যাত্রা শুনিবার জন্য তিনি যেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া ছিলেন, এখন যেন ক্রমেই তাহা নিবিয়া যাইতেছে। সকল দর্শকের দৃষ্টি-ই কালেক্টার সাহেবের মুখের উপর স্থাপিত, তিনি খুশী হইলে কর্ম্মকর্ত্তার ক্রিয়া সার্থক, জেলাস্থ সকল লোক-ই তাঁহার খুশীতে খুশী; কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি না দেখিয়া কি বড় রায় মহাশয়, কি বাড়ীর বাবুরা, কি ডেপুটী, উকীল, মোক্তার ও অন্যান্য লোক, সকলে-ই যেন মনমরা হইয়া যাইতেছেন।

ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই, তিনি যখন জয়েণ্ট-রূপে কুষ্টিয়ার সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন সেখানে একবার বারওয়ারী পূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া নিমাই দাসের 'রাবণ-বধ' যাত্রা শুনিতে যান। সে যাত্রায় তিনি দশমুণ্ড রাবণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হন, মাথার উপর একখানি থালা রাখিয়া তাহার উপর একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ সমেত পিলসুজ বসাইয়া ঝোড়োর অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া খুব তারিফ করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা খুশী হন, হাসিয়া লুটাপুটী খান ও প্যালা বৃষ্টি করিতে থাকেন সেই দলের হনুমানের ল্যাজ ও লম্ফ-ঝম্প দেখিয়া। পাবনার পুরা কালেক্টার হইয়া তিনি প্রায় সাত আট মাস আসিয়াছেন এবং ক্লাবে শুনিয়াছিলেন যে রায়েদের বাড়ী পূজার সময় যাত্রা শুনিবার জন্য সাহেবদের প্রতি বৎসর নিমন্ত্রণ হয়, সেই অবধি তিনি হনুমান দেখিবার আশায় মনে মনে বড় আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং হনুকে বখ্‌সিস্‌ দিবার জন্য আজ অনেকগুলি টাকা পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু দেড় ঘণ্টার উপর গাহনা চলিতেছে, এখন-ও হনু আসিল না দেখিয়া তিনি বড়-ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। মেজবাবু আসিয়া চেয়ারের পাশে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন ও হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুর! হাউ যাত্রা, ইজ্‌ ইট প্লিজ্‌ ইওর লর্ডশিপ?"

সাহেব বলিলেন, "ওয়েল, ওয়েল, হোয়ার ইজ্‌ হনু?"

মেজবাবু কথার ভাবার্থটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময়ে একজন পোষাকপরা খানসামা একখানি বড় রূপার থালায় করিয়া গুটিকতক ফরাসী 'কারণ'-পূর্ণ কাঁচের গ্লাস আনিয়া সাহেবদের সম্মুখে ধরিল, সকলে-ই এক এক চুমুক পান করিলেন, কালেক্টার সাহেব যেন একটু বেশী করিয়া-ই গলায় ঢালিয়া দিলেন, তখন আবার গান শোনা, হাসি, গল্প চলিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে-ই কালেক্টার সাহেব জোর গলায় বলিলেন, "বন্ধ্‌ করো, বন্ধ্‌ করো!" মফঃস্বলে কালেক্টার সাহেবের হুকুমে প্রসূতির প্রসব বেদনা বন্ধ হয়, এ ত' যাত্রা; একটা ছোকরা ডান কাণে হাত দিয়া তান ধরিয়াছিল, "দময়ন্তী—ই—ই—ঈ—ঈ—ঈ—" সে তানে দীর্ঘ ঈ তুলিতে তুলিতে নিজে হ্রস্ব উ হইয়া বসিয়া পড়িল। গাওনা বন্ধ হইল, সকলে-ই স্তম্ভিত—শঙ্কিত! ভূধর-ডেপুটী তাড়াতাড়ি দালান হইতে নামিয়া সাহেবকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধ হ'য়েছে?" সাহেব বলিলেন, "হনু কাঁহা? হনু ল্যাও"

ডেপুটী বলিলেন, "এ নল-দময়ন্তীর পালা, ইহাতে হনু নাই।"

সাহেব বলিলেন, "বাবু, তোম কুচ্ নেই জান্তা। নলডাইমই হাম নেই মাংতা; হনু ল্যাও, হনু বেগার যাত্রা হোটা? হনু ল্যাও।"

ডেপুটীবাবু তখন রায় মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "মশাই, সাহেব ত বড় চ'টে গেছেন, হনুমান না হ'লে ওঁর কোন মতে-ই চল্‌বে না।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "উপায়? এমন জান্‌লে রাম-রাবণের পালা যারা গায় তাদের-ই আনাতুম্, এখন কি করা যায়?"

ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল প্রভৃতি পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিছু-ই স্থির হয় না। যাত্রা বন্ধ; সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় দোলগোবিন্দ মোক্তার পরামর্শ দিলেন যে, "এর আর ভাব্‌চেন কি, বলুন না অধিকারীকে ডেকে একটা যাকে হোক্ ল্যাজ ট্যাজ পরিয়ে মুখে একটা মুখোস দিয়ে আনুক, খানিকটা হুপ্ হাপ্ ক'রে লাফিয়ে টাপিয়ে চ'লে যাবে, সাহেব-ও খুসী হবে—সব দিক্ বজায়-ও থাকবে।"

অধিকারীকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "এত রাত্রে হনুমান পাই কোথা?" কর্ত্তা বলিলেন, "যাকে হোক্ একটাকে দাও না সাজিয়ে, আমি না হয় তাকে আলাদা কিছু বখশিস্ দেব, বুঝ্‌ছ না,—কালেক্টার সাহেবের হুকুম।"

অধিকারী বলিল, "ল্যাজ না হয় একটা দড়ী টড়ী দিয়ে বা কাপড় পাকিয়ে করে দিলুম, কিন্তু মুখোস পাই কোথা? আমাদের পালায় ত মুখোসের দরকার হয় না।"

মোক্তার দোলগোবিন্দ বলিলেন, "আরে টিকে টিকে, মুখে টিকের গুঁড়ো মাখিয়ে তার ওপর চূণ-সিঁদুরের গোটাকতক ফোঁটা দাও, দিব্যি হনুমান হবে।"

কি ক'রে, যে মুটেটা যাত্রাওয়ালাদের সাজের ঝাঁকা মাথায় করে এনেছিল, অধিকারী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে-ই হনুমান সাজিয়ে দিলে, এ বাড়ীতে যাত্রার দলের মধ্যে অনেকে-ই কিছু কিছু কারণ প্রসাদ মুখে দিয়াছিল মুটেটি-ও বঞ্চিত হয় নাই; সুতরাং সে নাচিতে বসিয়া আর ঘোমটা টানিল না; হুপ-হাপ করিয়া লম্ফে ঝম্পে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল ও মুখ খিঁচাইতে লাগিল; কলেক্টার সাহেব আহ্লাদে আটখানা, টাকার ওপর টাকা প্যালা দিতে লাগিলেন। হুজুর যখন খুসী হইয়া প্যালা দিতেছেন, তখন বাড়ীর কর্ত্তা ও বাবুদিগের ও সঙ্গে সঙ্গে প্যালা দিতে হইল, দোতালার চিকের ভিতর হইতে-ও উঠানে প্যালা পড়িতে লাগিল। সাহেব হাঁকিতে লাগিলেন, "আউর হনু, আউর হনু ল্যাও।" মোক্তার দোলগোবিন্দ বলিলেন, "অধিকারী, আর একটা হনুমান বের কর, সাহেব ব'ল্‌ছেন।" তার পর আর একজন হনুমান সাজিয়া আসিল। সাহেব হাঁকিতে লাগিলেন, "আউর হনু, আউর হনু ল্যাও।" ক্রমে দুটো, তিনটে, পাঁচটা; নল চাপ্‌কান্ খুলিয়া হনুমান সাজিল, দময়ন্তী শাড়ী ফেলিয়া ল্যাজ পরিল, নাচিয়েদের আর ঘুঙুর খুলিতে অবসর হইল না, মুখে কালি মাখিয়া লাফাইতে লাগিল, বেহালাওয়ালা বেহালা রাখিয়া, ঢুলী ঢোল রাখিয়া, জুড়ী ল্যাজ পরিয়া হনুমান হইল, সাহেবরা "ব্রাভো, ব্রাভো" করিতে লাগিল, আর চারিদিক্ হইতে প্যালা বৃষ্টি হইতে লাগিল, শেষে অধিকারী নিজে হনুমান সাজিয়া উঠানের এক কোণে স্থিত একটা পিয়ারা গাছ হইতে এমন এক লাফ মারিল যে একেবারে হুপ্ করিয়া পুলিস সাহেবের কোলে পড়িয়া গেল, কালেক্টার সাহেব তার হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। কোথায় বা নলের বনগমন, কোথায় বা দময়ন্তীর রোদন, কোথায় বা সেই গান—

"মহারাজা নল দময়ন্তী হারাল, রাজ্য-ভ্রষ্ট হল—

উঠানময় কেবল কালো মুখ, দড়ির ল্যাজ, আর হুপ হাপ!

সাহেবেরা স্যাম্পেনের উপর ব্রাণ্ডি চাপাইয়াছেন, হনুমানদলের লাফ দেখিয়া পূর্ব্বকথা "স্মরি" তাঁহারা-ও গ্যালপ্ আরম্ভ করিলেন; সাহেবদের নাচে আর আমাদের লাফে প্রভেদ বড় কম-ই, তাহার উপর দেশী বিলিতী কারণ আসরে রীতিমত চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় লম্ফ রোগ সকলকে-ই আক্রমণ করিল—উঠানে কেবল লাফ্। পঞ্চাশ পঞ্চান্নটা হনু লাফাইতেছে, হাতে হাট তুলিয়া সাহেবরা লাফাইতেছেন, শাম্‌লা মাথায় ডেপুটি লাফাইতেছে, ভুঁড়ি ফুলাইয়া সদরালা লাফাইতেছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া মুন্সেফ্ লাফাইতেছে, সেরেস্তাদার,

পেস্কার, নাজীর, মহাফেজ, পেয়াদা, আর্দ্দালী, বাড়ীর কর্ত্তা, বাবুরা, পা'ক, সর্দ্দার, খানসামা, সবই লাফাইতেছে আর ঢুলী ঢাকীরা বাজাইতে বাজাইতে উচ্চ লম্ফে নৃত্য করিতেছে। ছেলেগুলি আঁত্‌কে উঠিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল; লজ্জা অনেক মানা করিলেও স্ত্রীলোকের-ও ত' একটা সহ্যের সীমা আছে, কে সে মানা শোনে। চিকের কাঠির ফাঁক্ দিয়া বামাকণ্ঠের কলহাস্য প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হইল। এ বাড়ীতে প্রায় ৭০ বৎসর পূজা, প্রতি বৎসর যাত্রা-ও হইতেছে, কিন্তু এমন ডিমোক্র্যাটিক যাত্রা কখন-ও হয় নাই।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সাহেবরা আমোদ শেষ করিয়া বিদায় হইলেন! সেকহ্যাণ্ডের চোটে বড় রায় মহাশয়ের ডান কব্জীতে ব্যথা ধরিয়া গেল, যাইবার সময় কালেক্টার সাহেব বৃদ্ধকে বলিয়া গেলেন যে তিনি তাঁহাকে ইয়াদ রাখিবেন। তখন-ও বোতলে মাল ছিল, সুতরাং দেশী হাকিম ও উকীল মোক্তারদের মধ্যে অনেকে-ই ভোর পর্য্যন্ত রায়েদের কৃতার্থ করিলেন।

এখন-ও বোধ হয় পাবনায় দু'পাঁচ জন প্রাচীন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা ইংরাজ-বাঙালী-হৃদ্য-মিলনের এই আনন্দোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

* * * *

কেতাবের কাহিনী ছাড়াও, উনবিংশ-শতকের প্রাচীন সংবাদ পত্রে সেকালের যাত্রাভিনয়ের বহু বিচিত্র তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সব তথ্য-বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট হদিশ মেলে যে তখনকার আমলে যাত্রার আসরে বিভিন্ন পালার অভিনয়কালে আবালবৃদ্ধবনিতা রসিক-দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য শুধু যে সুললিত নৃত্য-গীত বাদ্য, কাব্য-রসাশ্রিত সংলাপ, আর অলৌকিক নাটকীয়-ঘটনাবলী পরিবেষণ করা হতো তাই নয়, বিভিন্ন দৃশ্যের মাঝে মাঝে কারণে অকারণে প্রায়ই নিতান্ত-অপ্রাসঙ্গিকভাবে আজব-অদ্ভুত এমন কি, উৎকট-রূপসজ্জাধারী নানা ধরণের সং, ভাঁড় প্রভৃতি কৌতুকাভিনেতাদের আবির্ভাবের অশ্লীল রঙ্গ-রসিকতা আর স্থূল হাস্যরসের অবতারণা করা ক্রমেই রীতিমত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনবিংশ-শতকের গোড়ার দিকে, যাত্রার দলগুলি অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল পেশাদারী-অভিনেতাদের রুজী-রোজগারের আগ্রহ-উৎসাহে⋯কিন্তু পরে, সেকালের শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী-লোকজনের মনে যাত্রাভিনয়ের প্রবল অনুরাগ দেখা দেবার ফলে, ক্রমশঃ দেশের নানা অঞ্চলে মোটা-মোটা টাকা চাঁদা তুলে তাঁরা ছোট-বড় বিভিন্ন ধরণের সৌখিন-যাত্রার দল সৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তাঁদের এই অভিনব কীর্ত্তি-কলাপেরও প্রচুর নিদর্শণ মেলে!

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১৬ই জুন, ১৮২১)

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।—ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দরবিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্ট হইয়াছে।

* * * * *

(সমাচার দর্পণ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৮২২)

নূতন যাত্রা॥—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে, কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্মবেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২সং আইসে—দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাসদাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্যরহস্য সম্বলিত অঙ্গভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর ন্যক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী

আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

*   *   *   *   *

সেকালের বাউল
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি

(সমাচার দর্পণ, ২৩শে মার্চ্চ ১৮২২)

নূতন যাত্রা ॥—নেপ্তেনন্ত (লেফ্‌টেন্যাণ্ট) উইলেম (উইলিয়াম) ফ্রেঙ্কলিন (ফ্র্যাঙ্কলিন) সাহেব কামরূপা নামে যে গ্রন্থ ইংরেজী ভাষাতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ মোকাম ভবানীপুরের শ্রীযুত জগন্মোহন বসুজ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া তাহা হইতে কামরূপ নামে যাত্রা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৪ চৈত্র শনিবারে ঐ ভবানীপুরের শ্রীশ্যামসুন্দর সরকারের বাটীতে ঐ যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।

*   *   *   *   *

(সমাচার দর্পণ, ৪ঠা মে, ১৮২২)

নূতন যাত্রা ॥ মহাভারত প্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতিসুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহর্ষপ্রভৃতি কবিরা স্বীয় ২ শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করাতে মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গের এক যাত্রা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আপনারদিগের মধ্যহইতে বিভবানুসারে কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাকা ইত্যাদি ক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে ঐ যাত্রা বহু কাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধন দ্বারা যাত্রার ইতিকর্ত্তব্যতা বেশভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

(সমাচার দর্পণ, ১৩ই জুলাই, ১৮২২)

নূতন যাত্রা ॥—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয়—এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্যনৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন—ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৬ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

*   *   *   *   *

(সমাচার দর্পণ, ৫ই মে, ১৮২৭)

রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা।—গত ২ বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগানবাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল এ যাত্রার সম্প্রদায় সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকোনিবাসি কতকগুলিন রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শ্রবণ জন্য সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ না হওয়াতে প্রচররূপে রাষ্ট্র হয় নাই তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ কিঞ্চিল্লিখনাবশ্যক হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি ..বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুস্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক হায় হায় ধ্বনি করিয়াছিলেন।

* * * * *

এমনিভাবে গ্রামে-শহরে, দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকজনের মনে যাত্রাভিনয়ের প্রতি আগ্রহ-অনুরাগ ছড়িয়ে পড়ার ফলে, সেকালে পেশাদারী ও সৌখিন যাত্রারদল গড়ে তোলা আর নানা রকমের পালাভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে ছোট বড় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ তীব্র রেশারেশি আর তুমুল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল·· ঊনবিংশ শতকের প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তারও বহু বিচিত্র-বিবরণ পাওয়া যায়। একালের কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য, আপাততঃ সেকালের এ সব চিত্তাকর্ষক-কাহিনীর দু'চারটি নমুনা সংকলন করে নেওয়া হলো।

(সমাচার দর্পণ, ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৩২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। শ্রীশ্রী ৺শিব-নগরীতে শ্রীশ্রী ৺শারদীয় পূজাকালীন তত্রস্থ সৌকিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শ্রীযুত তারিণীচরণ কবিরাজের বাটীতে সর্ব্বমনোরঞ্জনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবালবৃদ্ধ ললনা কুলবধূপ্রভৃতি তদ্দর্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্ব্বশর্ব্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাপন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে শ্রীযুত রামরতন দ্বিজবিচক্ষণ মহাশয়ের বাটীতে যাত্রা হওয়াতে দলাধিপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার বাবুর কোন বিশেষ গুণাগুণ প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে ঐ বাবুজী ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া দ্বিজপক্ষে চন্দ্রকান্ত যাত্রার উপলক্ষে যাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন। ৭ পৌষ বুধবার শ্রীযুত সুধাকরসম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ বাবুর ৫০০০ পাচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। সে সকলি অলীক কারণ অদ্যাবধি তদ্বিষয়ে পাচ পয়সাও খরচ হয় নাই অনুভব হয় যে মুদ্রা অভাবে যাত্রা শীঘ্র অযাত্রা হইবেক কেননা যে সকল নববাবুরা নব-অনুরাগে নির্ভর করিয়া স্ব২ অভিলাষ পূর্ণার্থে ঐ কাব্যে কাব্য করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন বাবুজীকে কাবু করিতে না পারিয়া আপন ২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন। বাবুজী এক পয়সার মা বাপ—কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এই-মাত্র।···কস্যচিৎ তীর্থযাত্রিণঃ।

* * * * *

(ক্রমশঃ)

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রণতি

জ্যোতির্ময়ী দেবী

হে হাসি অশ্রুর কবি তুমি বলেছিলে
হেসে নাও দুদিনই তো আছ এ নিখিলে!
দেখিলে দেখালে রঙ্গ কৌতুকে উদার!
অট্টহাসি ভণ্ড দেখে—অসি তীক্ষ্ণ ধার!
হে কবি অমর হয়ে আছে নন্দলাল।
রাষ্ট্র তারে দেয় কোল। রবে চিরকাল।
করিছে দেশের কাজ! প্রাণে বেঁচে! আহা।
থাকিলে কহিতে তুমি 'বাহবা রে বাহা!
হাসিতে মিশিল অশ্রু ধরার ইঙ্গিতে
ভরে হিয়া ভক্তি প্রেম দেশের সঙ্গীতে।
"ধাত্রী মাতা দেবী স্বর্গ" গাঁথি স্তুতিমালা
সাথে দিলে গোরা প্রেম পূর্ণ করি ডালা!

নারী বিচিত্রা

(৩)

বুদ্ধিতে নারী

স্থ-নন্দা
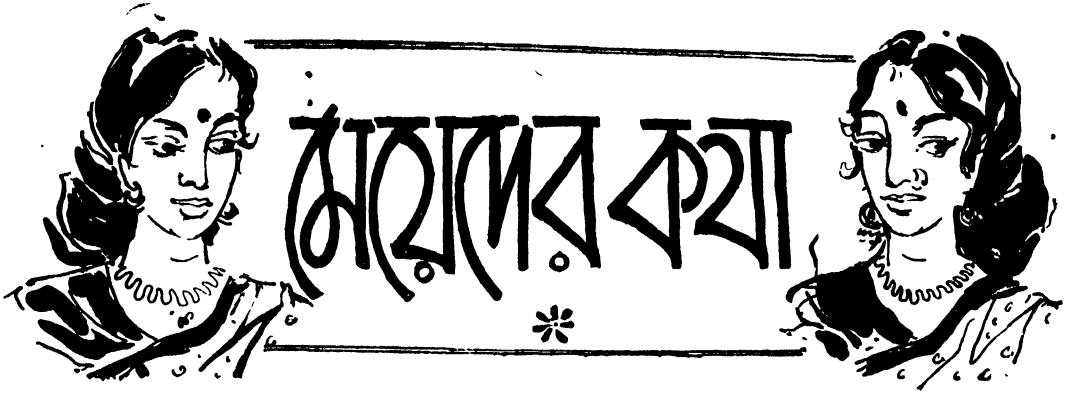
শাস্ত্রবাক্যে বুদ্ধি বলতে বোঝায় ধীগুণ। ধীগুণের অষ্টবিধ গুণ নির্দেশ করেছেন পৌরাণিক যুগের পণ্ডিতগণ, তা হচ্ছে শুশ্রূষা (জানিবার ইচ্ছা), শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ (তর্ক), আপোহ (বিতর্ক), অর্থজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। এই নিয়ে বুদ্ধি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নারীর বুদ্ধি কতখানি আছে তা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু সে বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে নারীর সাধারণ বুদ্ধিই বিচার্য।

নারী কার্য্যোদ্ধার করতে তার নৈসর্গিক কৌশল প্রয়োগ করে ব'লে—অনেকে মনে করেন যে নারীর প্রকৃত বুদ্ধি কম। এ কথা অতীব মিথ্যা! অবশ্য কোথায় নৈসর্গিক চতুরতার শেষ ও কোথায় স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। তাই যারা নারীকে বুদ্ধিহীনা বলে অবজ্ঞা করে তারাই আবার তার চাতুর্য্যকে বাহবা দেয়।

যে নারী সুন্দরী সে বিশেষ প্রয়াস না ক'রেও বসন-ভূষণে ও ব্যবহারে নিজেকে পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। এতে তার কোন চেষ্টা ক'রতে হয়না। এ তার সহজাত বুদ্ধি-প্রসূত কলা-কৌশল। কিন্তু যখনই সে এই নিশ্চেষ্ট বুদ্ধিকে সক্রিয় ক'রে তোলে, তখনই তাকে স্বতস্ফূর্ত কৌশলের সাথে স্বাভাবিক বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রয়োগ করতে হয়। এইখানেই তার চতুরতা ও পুরুষের মনোভাব উপলব্ধি ক'রবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এইখানে তার জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে সহজ প্রবৃত্তির যোগাযোগ ঘটে।

বুদ্ধিমান পুরুষ আত্মপ্রকাশী। সে তার বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রকাশ করে দেখাতে চায়; কিন্তু নারী কৌশলী, সে তার বুদ্ধি গোপন ক'রে রাখে, কারণ পুরুষের আত্মম্ভরিতাকে সে ক্ষুব্ধ ক'রতে চায় না,—সে তার উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য মনে মনে সে পুরুষের এই আত্মশ্লাঘাকে কৌতুকের চোখে দেখে। "A man has his will, but a woman has her way," বলেছেন অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স্‌। নারীর উদ্দেশ্য পুরুষকে তার পূর্বকল্পিত পথে কৌশলে চালিয়ে নেওয়া এবং সে জানে কি ক'রে তা হোতে পারে। নারী গৌরব চায় না, সে চায় ভক্ত। সে চায় তার উদ্দেশ্য সফলকাম ক'রতে, এবং পুরুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আত্মক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ক'রতে। সেই তার মুখ্য উদ্দেশ্য, আত্মম্ভরিতা নয়। তাই পুরুষ যখন নারীর বশ্যতা স্বীকার

করে, তখন সে নারীর রূপে আকৃষ্ট হোয়েই হোক, তার দুর্বলতায় দয়াপরবশ হয়েই হোক, অথবা তার অসংলগ্ন তর্কের জন্যই হোক, নারীর তাতে কিছুই এসে যায় না। তার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই হোলো। তাই পুরুষ যখন নারীর সূক্ষ্ম নির্দেশে চলে, সে ভাবে তার উদার পৌরুষত্ব-প্রণোদিত হয়েই সে কাজ ক'রছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাতে সে নারীর তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির আয়ত্তে। অবশ্য একথাও ঠিক যে অধিকাংশ পুরুষ নারীর বুদ্ধির চেয়ে তার ছলনার নিকট, অথবা তার উত্যক্ত বাক্যবাণের নিকট নতি স্বীকার করে। এ কথা অবশ্য সে স্বীকার ক'রতে চায় না, কারণ তাতে তার পৌরুষত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, তার সম্ভ্রমে লাগে। অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি নারী পুরুষকে তার ছলনা গোপন ক'রে এই বোঝাতে চায় যে—তার সূক্ষ্মবুদ্ধি, নারীসুলভ স্বতস্ফূর্ত মানসিক চিন্তার দ্বারাই সে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। ছলনা সে স্বীকার ক'রতে চায় না; কারণ এতেই সে পুরুষের অহমিকাকে আঘাত না ক'রে কার্য্যোদ্ধার ক'রতে পারে। পুরুষের আত্মশ্লাঘায় আঘাত দিলে তার জিদ্ চেপে যায়,—নারীর সে উদ্দেশ্য নয়। তাই সে পুরুষের মনোরঞ্জন ক'রতে সর্বদা প্রয়াস পায়।

নারী যখন পুরুষের মন অপহরণ করে তখন সে নারী হিসাবেই করে; কিন্তু পুরুষ নারীর যে গুণে মোহিত হয় তাহাই আবার তার বিরক্তি উৎপাদন করে। কেহ এক-জন পুনঃ পুনঃ বিবাহ ক'রে পত্নীবিয়োগে আবার বিবাহে উন্মুখ হয়ে বললে: "নারী পুরুষের মতই বুদ্ধিমতী, কিন্তু অনেকগুণ বেশি চতুর ও কপট। কিন্তু এ জানা সত্বেও আবার বিবাহ ক'রতে উদ্‌গ্রীব, কেন না সে মনে করে এই গুণই নারীকে আকর্ষণীয় করে। নারীর চাতুর্য্য ও কপটতা সে পছন্দ করে না, কিন্তু ইহাই আবার তাকে আকৃষ্ট করে। অনেক পুরুষই এই ভাবেই চিন্তা করে, যদিও তা তারা স্বীকার করে না।

নারীর মানসিক চিন্তাধারাকে অবজ্ঞা করা সৌজন্যের পরিপন্থী। "নারীর খেয়াল" ব'লে আমরা অনেক কথা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি। এ কতক সত্য হ'লেও সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ নারীর মানসিক চিন্তাধারা স্বভাবত ধীর, শান্ত ও হিসাবী এবং সে জানে কি প্রকারে সে তার নারীত্বের বিশেষ অধিকারের সুযোগ নিতে পারে। একই নারী যখন দুই বা ততোধিক পুরুষের প্রেমের পাত্রী, তখন সে তার স্বাভাবিক চতুরতা দিয়ে সকলের সাথেই বেশ মানিয়ে চলতে পারে। প্রত্যেক প্রেমিকই মনে করে যে, ভাগ্য তারই প্রতি সুপ্রসন্ন। পরিশেষে যখন সে কোন একজন পুরুষকে বেছে নেয়, কিংবা সকলকেই প্রত্যাখ্যান করে, তখন পুরুষের মনের দিকে সে বিন্দুমাত্র তাকায় না। তার মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ কিংবা লজ্জা হয় না। পুরুষ এখানে হতবাক্! অপ্রীতিকর অবস্থাকে ধীর শান্তভাবে এড়িয়ে যেতে নারীর চতুরতা সমধিক প্রকাশ পায় এই প্রকার নাটকীয় অভিনয় পুরুষের চেয়ে নারীর পক্ষে সহজ-সাধ্য। কিন্তু যত সহজেই হোক না কেন, এতে তার আশ্চর্য্যজনক নিপুণতা প্রকাশ পায়। "আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না" ব'লে একটা আশ্চর্য্য বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে নির্বিকার ভাবাপন্ন ক'রে আত্মদোষ স্খালন ক'রতে নারীই পারে। এতে তার অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পায়। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ অনেক সময় বেসামাল হয়ে পড়ে, কিন্তু নারী কখনও হতবুদ্ধি হয় না। যে কোন প্রতিকূল অবস্থাতে, যাকে বলে embarassing situation,—তার মন-চাঞ্চল্য কিংবা মনোবিকার হয় না, এবং পুরুষ যেখানে হতভম্ব হয়ে কি ক'রবে দিশে পায় না, নারী সেখানে অবলীলাক্রমে নির্বিকারে নিজের পথে চলে যায়, ভ্রূক্ষেপও করে না সেদিকে—যেন কিছুই হয় নাই—এই ভাব। অন্যের অনুভূতির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি না থাকায় অসংগত সুবিধা নিতে সে একটুও দ্বিধাবোধ করে না এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় লোকচক্ষে নিজের সম্মান বাঁচাতে ও নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তার সমস্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে। এ থেকে অবশ্য এ বোঝায় না যে—তার চতুরতা সব সময়ে ধর্ম্মাধর্ম বিবেচনাশূন্য ও বিবেকহীন।

নারীর একটা নিজস্ব বিধি আছে যাতে সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ একটা বিষয়ে সমস্ত মন নিবিষ্ট করতে পারে। সে যে কোন সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনতে পারে, এবং কেহ যদি তাকে কথার প্যাঁচে কোণঠেসা ক'রতে চায়, তার উত্তর সে এমন চটুলতার সাথে দিতে পারে যে তার উত্তর খুঁজে পাওয়া

দুষ্কর। এ বিষয়ে বার্ণাড্‌শ্‌র জীবনের একটি কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অতি প্রখর। কথায় তাঁকে কেহ পরাস্ত ক'রতে পারতো না। একদিন মাত্র তিনি জীবনে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন—সে তাঁর স্ত্রীর নিকট। কথায় কথায় বার্ণাড্‌শ্‌ বললেন: "নারীর থেকে পুরুষ অধিক বুদ্ধিমান্"। শুনে বার্ণাড্‌শ্‌-গৃহিণী বললেন: সে কথা ঠিক, তার প্রমাণ তুমি আমাকে বিবাহ করেছ, আর আমি তোমাকে বিবাহ করেছি"। শুনে বার্ণাড্‌শ্‌ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, এর উত্তর আর তাঁর মনে যোগায় নাই।

নারী তার নারীত্বের এবং নারী ব'লে সমাজে যে বিশেষ স্থান তার প্রাপ্য—তার সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিজস্ব দুষ্কর্মের ফলাফল অনেক সময় বেশ এড়িয়ে যায়, এবং সেটা যে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে এ ভাবে নয়, সে যেন নির্দোষী এই ভাব দেখিয়ে। এ অভিনয় খুব সহজ-সাধ্য নয় বিবেক থাকলে। এতে নারীর আশ্চর্য্যজনক দক্ষতা প্রকাশ পায়।

যেখানে তার সহানুভূতি বা আসক্তির উদ্রেক না হয় সেখানে সে নির্বাক, এবং সেখান থেকে বেশ নির্বিকারে সে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু যেখানে তার আসক্তি আসে সেখানে তার নারীসুলভ চতুরতা তার মনোবিকারের কাছে পরাজিত হয়। এখানে যদিও সে আত্মবিস্মৃত হয় তথাপি সে বুদ্ধিভ্রষ্টা হয় না। তাই সে পুরুষের নিকট আবেদন নিবেদন করে, এমন কি নিজেকে- হীনও করে তার মন পাবার জন্য। কিন্তু তার সহজাত কৌশল সে কখনো ত্যাগ করে না।

নারী তার নৈসর্গিক বুদ্ধি দিয়ে পুরুষের সাথে যে প্রকার ব্যবহার করে, তা সব সময়ই বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়। পুরুষকে আকৃষ্ট ক'রতে সে যে পন্থা অবলম্বন করে সব সময় তা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। তার চারিত্রিক দোষ-ত্রুটির জন্যই সে পুরুষের বিরাগভাজন হয়। নারী প্রেমাসক্ত হ'লে সে অকপটভাবে দয়িতকে সমস্তই দান ক'রতে প্রস্তুত হয়। সে তখন বুঝতে পারে না যে তার অদেয় কিছু থাকতে পারে, এর অন্যথা কিছু হতে পারে। তখন তার মনের অবস্থায় ও তার ভাবধারা প্রণোদিত হয়েই সে একথা ধ্রুব সত্য ব'লে মনে করেই এইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিন্তু পুরুষ এর শেষ মূল্য দেয়। সে ভাবে—এর আর অন্যথা হতে পারে না। তাই ভেবে সে আত্মতুষ্টি লাভ করে। কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করে এ অঙ্গীকার তার নিজের প্রতিজ্ঞার মতই মূল্যহীন, তখনি সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। নারী তার ব্যবহারের ভুলে নয়, সে তার আসক্তির যথার্থ গভীরতা ধারণা ক'রতে পারেনি বলেই তাদের এই ব্যর্থতা। অথবা এও হতে পারে, শেষ পর্যন্ত সমাজ-দ্রোহী কাজ তার সাহসে কুলায় নাই। সে নিজের মন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্যক উপলব্ধি ক'রতে পারে নি। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে বুদ্ধিভ্রষ্টা হয়। এইখানে তার স্বতস্ফূর্ত বুদ্ধি তার কোন উপকারে লাগে নি।

নারীর বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণ, যদিও তার পরিধি সঙ্কীর্ণ। সে এক পলকে যা দেখে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতি ছায়াচিত্রের মত তার মনে গেঁথে যায় এবং তার কার্য্যকরী বুদ্ধির দ্বারা পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে নেয় ও তার সম্ভাব্য এক নিমেষে বিচার করে নিতে পারে। এই সূক্ষ্ম অনুভূতিই তার বুদ্ধির প্রখরতা!

নারীর তিতিক্ষা অসাধারণ। তর্কে নারীর পরাজয় কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ ভাবলেই ঠকতেই হয়, কারণ নারী তার লক্ষ্যের প্রতি অবিচল স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এবং চোখের জলে ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে, অথবা নিস্তব্ধতার আবরণে সে মনের উদ্দেশ্য গোপন রাখে। তার বাহ্যিক নীরবতার পিছনে প্রখর চিন্তাধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যে পুরুষ ভাবে সে নারীর চিন্তাধারা ও মতামতকে তর্কে পরাস্ত ক'রে তাকে তার নিজস্ব মতাবলম্বী ক'রতে সক্ষম হয়েছে, সে মারাত্মক ভুল করে।

"A Woman Convinced against her will
Is of the same opinion still."

(an old proverb)

এ কথা সত্য, নারী একবার নিরাশ হলে সেই মুহূর্তেই অন্যভাবে আক্রমণ ক'রবার চিন্তা ক'রতে থাকে। "A man may not balk a woman bent on having her own ways."

(Lew Wallace)

নারীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি কখনও কখনও অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে এমনই নিবদ্ধ হয় যার ভবিষ্যৎ ও

ফলাফল মূল্যহীন। এই জন্য তার বুদ্ধির প্রখরতা অনেক সময় কার্য্যকরী হয় না; বরং তা অনিষ্ট সাধন করে। তাই শাস্ত্রে বলে "স্ত্রী পুংবচ্চ প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্।" যে গৃহে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, সে গৃহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। কারণ সে পূর্বাপর সব বিবেচনা করে না। ক্ষুদ্র, অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে সে চিন্তা করে, যার পরিপ্রক্ষিতে বিচার করলে ভ্রমাত্মক মীমাংসা হয়। "স্ত্রীবচঃ প্রত্যয়ো হন্তি বিচারং মহতামপি।" স্ত্রী বাক্যে বিশ্বাস ক'রলে মহতেরও বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। অবশ্য এ সব শাস্ত্রবিদ্‌রা ছিলেন পুরুষ ও তাঁরা যে সকলেই পক্ষপাতশূন্য ছিলেন তা বলা যায় না। সেকালে নারীর প্রতি একটা কুসংস্কার ছিল, যা সমাজের উপস্থিত পরিণতির ফলে দূরীভূত হয়েছে। এরাই ছিলেন তখন স্ত্রাস্বাধীনতার বিরুদ্ধে। তাঁরাই শাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন নারী সম্বন্ধে।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রাস্ত স্থবিরে কালে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা।"

"স্ত্রীলোককে বাল্যকালে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনকালে স্বামী রক্ষা করে, এবং বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করে। অতএব কোনকালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।"

স্বাধীনতা না থাকলে স্বাধীন চিন্তা কি ক'রে থাকবে! যাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল অন্দরমহলে, বাহিরে যাদের দৃষ্টিপাত ক'রবার অধিকার ছিল না তাদের কাছ থেকে চিন্তার প্রসারতা ও বুদ্ধির বিচক্ষণতা আশা করা যায় না। তাদের পঙ্গু করে রেখে তারা হাঁটতে পারে না—অভিযোগ করা যেমন অর্থহীন, নারীকে মূর্খ করে রেখে যদি বলা যায় তারা লিখতে পড়তে জানে না, তেমনি নারীকে তার বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রতে না দিয়ে যদি বলা যায় তার বুদ্ধি নাই, তা হ'লে সে উক্তির মূল্য কি হতে পারে তা বলার প্রয়োজন দেখি না। তখনকার সমাজ ও এখনকার সমাজে অনেক পার্থক্য। তাই এখন আর ওসব শাস্ত্রবাক্য প্রযোজ্য হতে পারে না। শিক্ষার প্রসারতার সাথে নারীর চিন্তা ও বুদ্ধিরও প্রসারতা বাড়ছে,—যা ছিল এতকাল কূপ-মণ্ডুকের মত। সমাজের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী-বুদ্ধির বিবেচনা ক'রতে হবে। সুযোগ না দিলে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। সেক্সপীয়র বলেছেন: "Bondage is hoarse, and may not speak aloud."

নারীর লক্ষ্য হচ্ছে পুরুষ, এবং অনেক সময় তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে সুকৌশলে চারিদিকে জাল বিস্তার করে, এবং সে মনোভাব সে পুরুষের নিকট গোপন রাখে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সব সময় শেষ পর্য্যন্ত সফল নাও হতে পারে। কারণ পুরুষ যদি একবার তাকে অবিশ্বাস করে তা হ'লে নারীর চাতুর্য্যের উপর তার আর কোন কৌতূহল থাকে না, এবং যে পুরুষের উপর তার এই চাতুরী তার বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলে। তখন নারীর বুদ্ধির আর কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু পশ্চাৎপদ হওয়া নারীর স্বভাব নয়, সে চাইবে সামনে এগিয়ে যেতে, তা সম্ভব না হ'লে স্থিতাবস্থা মেনে নেবে। পরাজয় সে স্বীকার ক'রবে না।

নারী যখন তার স্বাভাবিক গুণে পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার না ক'রে তাকে আঘাত করবার জন্যই বুদ্ধি প্রয়োগ করে, তখনই হয়তো উপস্থিত পরিস্থিতি প্রতিহত হয়ে তাকেই আঘাত করে। বিদ্রূপ ক'রতে নারী নিপুণ। তাই সে যখন হেয়জ্ঞানে পুরুষকে ব্যঙ্গোক্তি করে তখন তার ভৈরবী চরিত্র তখনকার মত পরিতৃপ্তি লাভ করে বটে, কিন্তু এতে পুরুষের যে সৌজন্য, তার সে "শিভল্‌রীর" উপর নারীর সমস্ত বল-ভরসা বিনষ্ট হয়ে যায়। পুরুষ নিজ দোষেই এ ভর্ৎসনা পেলেও নারীকে সে নূতন মূর্তিতে দেখতে পায়, আর তার পরিণামে নারীর প্রতি তার সমবেদনার স্থলে একটা বিদ্বেষ ও বৈরীভাব এসে যায়। কারণ অসংগত তিরস্কার ও বিদ্রূপোক্তি মানুষের মনকে নিঃশেষে যতখানি নীরস করে দেয় এমন আর কিছুই পারে না। তাই প্রচণ্ড বাদানুবাদের পর সম্পর্ক ও পরিস্থিতি আর কদাচিৎ পূর্বের মত ফিরে আসে। কোথায় একটু খট্‌কা, একটু তিক্ততা মনের মধ্যে থেকে যায়। বিশ্বাস ও শান্তিপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নারী অসংযত বিদ্রূপপ্রিয়, এবং সময় বিশেষে তার সমস্ত বুদ্ধি ও চতুরতা অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গোক্তিতে নিয়োজিত হয়ে কালফণীর মত মানুষকে দংশন করে। পুরুষের মন জয় ক'রতে যেখানে সামান্য কিছু প্রিয়বাক্যের প্রয়োজন হয়, সেখানে নারী পুরুষের প্রতি কোপাবিষ্ট হয়ে তার প্রতি অনর্গল বিদ্রূপাত্মক ভর্ৎসনা প্রয়োগ করে। হয়তো সে পুরুষকে ত্যাগ ক'রতে চায়, নতুবা এই বিদ্রূপাত্মক

তিরস্কার দিয়েই সে পুরুষকে শাসিয়ে রাখতে চায়। এতে তার চেতন মনের অজ্ঞাতেই সে তার স্বাভাবিক ধীর, সহিষ্ণু বুদ্ধি ও অপ্রতিরোধী স্বভাব ত্যাগ ক'রে ধ্বংসাত্মক আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এতে তার বুদ্ধির স্বরূপ প্রকাশ না পেয়ে তার বিকৃত ভাবই পরিস্ফুট হয়। "Women often fall back on their instincts, when they would do better to use their judgements." এইখানে তার নৈসর্গিক নিষ্ঠুরতা তার বিচার বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলে। নারীর সহজ প্রবৃত্তি তার জ্ঞান বুদ্ধি থেকে প্রবল। "Her instinct is stronger than her intelligence." নারী ভুলে যায় যে বিদ্রূপ ক'রে পুরুষকে সংশোধন করা যায় না, কিংবা তাকে বশীভূত করাও চলে না। এমন কি তার ক্ষতিও কিছু করা যায় না। সেক্সপীয়র বলেছেন "Where your good cannot advantage him, your slander never can endamage him." এতে নারীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু কারো উপকার হয় না—তার নিজের তো নয়ই। তবে এটা তার স্বভাবগত। "Sweet is revenge specially to women." (Byron)

নারী একবার ক্রোধান্বিতা হ'লে তার ভৈরবী মূর্তি প্রকাশ পায়—সে তখন ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। নারী-চরিত্রের এ একটা দিক বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা একদিকে যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা কল্পনা করেছিলেন, অপর দিকে সেই নারীকেই আবার ধ্বংসাত্মক কালী মূর্তিতে দেখিয়েছেন।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হিংসা, পরনিন্দা, ঘৃণা মানব-চরিত্রের তাৎপর্য। এতে তারা যা আনন্দ পায় তা আনন্দের অপভ্রংশ—চিত্ত-বিকার!

"Envy and calumny and hate and pain,
And that unrest which men miscall delight."
(Shelley)

এতে তাদের বুদ্ধির বিকাশ পায় না। এ তাদের ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ষড়রিপু নারী পুরুষ উভয়েরই আছে। তাদের প্রবলতায় জ্ঞান-বুদ্ধি অবলুপ্ত হয়। এর পরিণাম সময় বিশেষে হয় ভয়াবহ। দাঁতের কথায় ব'লতে গেলে—

"......Avarice, envy, pride
Three fatal sparks, have set the
hearts of all
On fire." (Dante)

কিন্তু এতে নারীর নিজস্ব দোষ কিছু নাই, এ মানব জাতির দোষ,—জন্মগত মানব জীবনের রহস্য! তবে দোষে গুণে এটাই বোধ হয় মানবীয়,—নতুবা সকলেই বুদ্ধ, চৈতন্যদেব হ'য়ে যেতো।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত সোপেনহাউয়ার (Schopenhawer) বলেছেন "নারী অতি মাত্রায় বুদ্ধিমতী, কিন্তু তার প্রতিভা নেই"। কারণ তাঁর মতে নারী চির-কালই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন,—যাকে তিনি বলেছেন—"subjective." বিশ্ববিখ্যাত জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত নীচে (Nietzsche) ও একই কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন নারীবিদ্বেষী। নারীর মধ্যে প্রতিভা নেই এ কথা কতটা সত্য বলা কঠিন, কারণ প্রতিভা সাধারণ বস্তু নয়,—এ খুবই দুর্লভ, এবং পুরুষের মধ্যেও এ অতি বিরল,—যদিও নারীদের চেয়ে বেশি। নারী চরিত্রে প্রতিভার উন্মেষ হতে পারে না, কারণ তার চিন্তা সর্বব্যাপী নয়, তার প্রসারতা নাই। তার চিন্তা সঙ্কুচিত ও অন্তর্মুখী—যা প্রতিভা বিকাশের প্রতিকূল! তার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য নাই, ভাবের সম্প্রসারণ নাই, দৃষ্টি সুদূর প্রসারী নয়। এ সবই প্রতিভা উন্মেষের পরিপন্থী!

নারীকে সন্তান পালন ক'রতে হয়, তাই তার মন সর্বতোভাবে সন্তানমুখী। সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তার আসা-ভরসা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ সবকিছু নিহিত। সেখানে তার মন বহুমুখী হওয়া স্বাভাবিক নয়। প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য। পুরুষের মন বহুমুখী! তার কার্য্য, তার চিন্তা, তার মানসিক পরিণতি যদিবা কতকটা প্রতিভা উন্মেষের অনুপন্থী, নারীর তা নয়। প্রকৃতি তাকে গঠন করেছে সেই ভাবে। তা হোলেও নারী-প্রতিভার উদাহরণ পৃথিবীতে একেবারে বিরল নয়। ক্ষণা, গার্গী, লীলাবতী আমাদের দেশের প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী। ম্যাডাম কুরী তাঁর প্রতিভায় বিশ্ব চমৎকৃত করেছেন। উদাহরণ আরো আছে; কিন্তু তবু এ মুষ্টিমেয়।

অবশ্য নারীর মধ্যে প্রতিভা নাই এ কথায়

আপত্তি নেই, কারণ সে বুদ্ধিকে গোপন ক'রে রাখাই শ্রেয় মনে করে।

নারীর অত্যধিক উৎকট বুদ্ধি পুরুষকে অস্বস্তিকর সন্দেহ ভাবাপন্ন করে। অথচ নারীর প্রকৃত যে চাতুর্য দিয়ে সে পুরুষের উপর আধিপত্য করে—সে তাকে বাক্যের ছলনায় প্রশস্তি ক'রে তার সন্তোষ সাধন করা। এখানেই তার প্রকৃষ্ট ও অব্যর্থ ব্যবহার।

নারীবুদ্ধি যদি প্রখর হয়, তার ইন্দ্রিয়শক্তি প্রখরতর। পুরুষের চিন্তাধারা সে সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা সম্যক উপলব্ধি ক'রতে পারে,—যা পারে না পুরুষ নারীচরিত্র বিশ্লেষণ ক'রতে। এ চেষ্টা সে করেও না।

প্রখর বুদ্ধিমতী নারীকে পুরুষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করে; কিন্তু এ জাতীয় নারীকে খুব কম পুরুষই স্ত্রীরূপে কামনা করে; এমন কি বিশেষ প্রয়োজন না হোলে তার সঙ্গও কামনা করে না। যে নারী বিনা তর্কে পুরুষের কথা মন দিয়ে শোনে ও অল্প কথায় সুখ-দুঃখে সমবেদনা অনুভব ক'রে শান্তি দিতে পারে, সেই নারীই পুরুষের মনোরঞ্জন করতে পারে, এবং তারই সাথে সে মনের মিল নিয়ে চলতে পারে। পুরুষ বুদ্ধিমতী নারীকে প্রশংসা করে বটে, কিন্তু যে নারী তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে চারিদিক বিকশিত করে সে নারীকে সে সন্দেহের চোখে দেখে। তার প্রতি পুরুষের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। এ ছাড়া যে নারী বিদ্রূপপ্রিয় তাকেও পুরুষ পরিহার করে। "Men are afraid of witty women especially those who delight in making cutting speeches (Holland) কিন্তু পুরুষের এই মনোভাব নারীর বুদ্ধিতে অজানিত নয়। জাগতিক রহস্যই এই। পুরুষ শক্তিমান্ ও নারী তারই উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীলতার সাথে থাকে কতকটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আর ভক্তি শ্রদ্ধার উৎস হচ্ছে শ্রেষ্ঠতা, উৎকৃষ্টতা। নারী-পুরুষের সম্বন্ধ এই। এর ব্যতিক্রম হতে পারে, তবে তা স্বাভাবিক নয়।

পূর্বেই বলেছি যে নারীর নৈসর্গিক বুদ্ধি ও তার জ্ঞান বুদ্ধির পার্থক্য সহজে বোধগম্য নয়। এক কথায় বলতে গেলে নারীর চতুরতা একটা নিবিড় সূক্ষ্ম অনমুভবনীয় বিশেষত্ব, আর তার স্বাভাবিক বা জ্ঞানবুদ্ধি প্রকৃত স্থূল সত্য। নিক্তির একদিকে যেমন তার সহজাত অনুভূতি দিয়ে দ্রব্যের এবং অবস্থার মূল্য নিরূপণ করবার ক্ষমতা, অন্যদিকে পার্থিব জীবনযাত্রায় তার অসাধারণ নৈপুণ্য সত্যই প্রীতিকর ও চমকপ্রদ। সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায় নারীত্ব যেমন তার বুদ্ধিকে বিকশিত করে, তেমনি তাকে আবার সঙ্কুচিতও করে। এই দুইয়ের যথাযোগ্য সামঞ্জস্য সব সময় সম্ভবপর নয়—আশা করাও যায় না।

যে নির্বোধ পুরুষ তার স্ত্রী তার প্রতি সমদরদী নয় ব'লে হৃদয়-বিদারক ও একই কালে হিংসাত্মক ভাষায় তার অন্তরের বেদনা ব্যক্ত করে ও অন্যত্র সান্ত্বনা খোঁজে, সে সত্য মিথ্যা জড়িত করেই বলে। কিন্তু স্ত্রী তার এই দুর্বলতাকে ঘৃণা করে। স্বামী যেমন স্ত্রীর মনোবেদনা সব সময় বুঝতে পারে না, স্ত্রীও সেইরূপ সব সময় স্বামীর সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, ও কল্যাণ-অকল্যাণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না। যেখানে তার নিজস্ব শান্তি এবং আনন্দের প্রশ্ন থাকে, সেখানে নারী পুরুষের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে; কিন্তু যখন সেই পুরুষই বালসুলভ কল্পনার বশে "রোমান্টিক" ভাবাপন্ন হয়ে অসন্তুষ্ট হয় তখন তা স্ত্রীর উপলব্ধির বাহিরে। তার চিন্তা দ্বিমুখী নয়, দেওয়া নেওয়া নয়,—সে একমুখী। কিন্তু যে নারী তার সহজ জ্ঞানের সাথে তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে, তার কল্যাণ দিয়ে সমস্তদিক আগলে ধরতে চেষ্টা করে সে নারীর পক্ষে পুরুষকে আয়ত্বে রাখা বিশেষ কঠিন নয়। পেতে চাইলে দিতে হয়, এবং দিলে পেতে ইচ্ছা হয়—এ চিরন্তন সত্য! এ সত্য উপলব্ধি করা যেমন পুরুষের পক্ষে, ততোধিক নারীর পক্ষেও কর্তব্য। অন্যথা, তাকে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলে অদৃষ্টের দোষ দেওয়া, অথবা পুরুষকে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না। নারী-মন একগুঁয়ে, তার বিরক্তি উৎপাদন করলে সে হয় uncompromising—সংসারে অনেক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এই থেকে।

দুশ্চরিত্রা নারীর কথা বিভিন্ন। "অতর্ক্যা কুটিনী কুটরাচনা হি বিধেরপি"। নষ্টচরিত্রা রমণীর কূটকৌশল স্বয়ং বিধাতারও অজ্ঞেয়। কোন দিক দিয়ে এরা আক্রমণ করে বোঝা কঠিন। "অধরেঽমৃতং হি যোষিতাং হৃদি হলাহল-মেব কেবলম।" এই উক্তির রমণীদিগের অধরে অমৃত; কিন্তু হৃদয়ে হলাহল বিষ থাকে। এ হোলো তাদের ব্যবসা,

তাদের এ না হ'লে চলে না। প্রগল্ভা, কুটিলা, লজ্জাহীনা এই তাদের আকর্ষণ :—

"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুল স্ত্রিয়ঃ॥"

দ্বিজগণ অসন্তোষশূন্য হ'লে বিনষ্ট হন, রাজারা সর্বদা সন্তোষপরায়ণ (আনন্দমত্ত) হ'লে বিনষ্ট হন, বারবণিতারা লজ্জাশীলা হ'লে তাদের আদর হয় না, এবং কুলস্ত্রী লজ্জাহীনা হ'লে নিন্দিতা হন।

আমরা এ জাতীয় রমণীর কথা বলতে চাই না, কারণ "কঃ প্রাজ্ঞো বাঞ্ছতি স্নেহং বেশ্যাসু সিকতাসু চ।" কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বেশ্যাতে ও বালুকাতে স্নেহ পেতে ইচ্ছা করে? পতিতা রমণীতে ও বালুকাতে স্নেহ রস কিছুমাত্র থাকে না। যদিবা তারা কিছুমাত্র অনুরাগের ভান করে সে "বিলাসিনী হি সর্বস্ব সন্ধ্যেব ক্ষণরাগিণী"। সন্ধ্যার রক্তরাগের মত তার অনুরাগ ক্ষণস্থায়ী। তারা বিষতুল্য! তাদের চাতুর্য্য প্রাণঘাতিনী।

পুরুষ এবং নারীর মন স্বভাবতঃ পরস্পরবিরোধী। তাদের একত্রিত জীবনযাত্রা শান্তি ও আনন্দময় করতে হ'লে তাদের পারস্পরিক সুখ-দুঃখ, চিন্তাধারা, মনোভাব নমনীয় বুদ্ধির দ্বারা চালিত ক'রতে হবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাদের সুবুদ্ধির দ্বারা পারস্পরিক বিরোধী মতের মধ্যে একটা ঐক্য,—একটা সেতু নির্মাণ না ক'রে পরস্পরকে আঘাত ক'রে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল মনোমালিন্য, বিদ্বেষ, কলহ, অশান্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা। তখন কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা মনোভাব সংযত ক'রে নীরস, নির্লিপ্ত, নিশ্চেষ্ট পারিবারিক জীবন যাপন করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না,—যা হ'তে পারতো সুখের, শান্তির, শৃঙ্খলার সংসার। এতে জীবনের উৎস শুকিয়ে যায়, কাজ ক'রবার ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যায়, উৎসাহ নিবে যায়। নিরানন্দ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা জীবন যাপনে পর্য্যবসিত হয়।

মানুষ যেমন তার নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে উঠতে পারে না, তেমনি নারী ও পুরুষ স্ব স্ব স্বভাবগত চারিত্রিক গঠনের বাহিরে কিছু চিন্তা ক'রতে পারে না। তাই অবস্থা বিশেষে তারা একে অন্যের ভাব ও চিন্তাধারা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারে না। যেটা বোধগম্য নয় সেটা মনে হয় অস্বাভাবিক। তাই নারী ও পুরুষ পরস্পরের নিকট হেঁয়ালী। তাই পুরুষ ভাবে রমণীর চাতুর্য্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা তার নারীত্ব, সে তার বাইরে যেতে পারে না। এ সত্য উপলব্ধি ক'রতে পারলে অবস্থা বিশেষে নিজেকে মানিয়ে চলতে স্ত্রী-পুরুষের কারো পক্ষে কঠিন হয় না।

নারীর প্রকৃত বুদ্ধি বুঝতে হোলে পুরুষের আপেক্ষিকে বিচার ক'রলে চলবে না। তার সাথে নর-নারী নিরপেক্ষ ভাবে কোন দুরূহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ক'রতে হয়,—যেখানে নারী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য গণ্য নহে। কিন্তু সে বিষয় হওয়া চাই নিগূঢ় অবিচ্ছন্ন ভাবের। যে বিষয়ের মধ্যে জন্মগত মনুষ্য স্বভাব প্রচ্ছন্নভাবেও লুক্কায়িত থাকে সেখানে উভয়ের বুদ্ধি নারী পুরুষের স্ব স্ব সংস্কারের বশবর্তী। এখানে মানুষে মানুষে নয়, নারীতে পুরুষে বিচার আসে। তাতে তাদের নৈসর্গিক বুদ্ধির প্রমাণ পেলেও তাদের জ্ঞানবুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পুরুষ যেখানে কথা বলে, নারী সেখানে নির্বাক থেকে, অথবা তার নিস্তব্ধতার মাঝে দুই একটি কথা ব'লে, কিংবা প্রকাশ ভঙ্গীতে তার মনোভাব ব্যক্ত ক'রতে পারে, এবং এরই মধ্যে সে আনন্দ ও বেদনা দুই-ই দিতে পারে। অতি বড় বুদ্ধিমান পুরুষও তার প্রতি এই সূক্ষ্ম চাতুর্য্যের শর নিক্ষেপ প্রণিধান ক'রতে পারে না। সময় বিশেষে এ সহনীয়ও নয়। কখনো কখনো নারী অবস্থা এত কলুষিত ক'রে তোলে যে, সে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এখানে তার নারীত্ব তার বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়। নারীত্বে আঘাত পেলে তার দিক-বিদিক জ্ঞান থাকে না। তাই তার নারীত্বের অপমানে উপেনকে আঘাত ক'রতে গিয়ে করুণাময়ী নারীত্বের কাছে তার ক্ষুরধার বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেললো। তার প্রায়শ্চিত্ত তাকে ক'রতে হয়েছিল। নারী যে কি চায়, তা সে নিজেই জানে না। তাই তার চিন্তা ও কার্য্য পরস্পরবিরোধী। প্রসিদ্ধ নারী কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (Elizabeth Barret Browning) নারীর মন নিয়েই নারীর সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন :—

"Most illogical,
Irrational nature of our womanhood,
That blushes one way, feels another way,
And prays, perhaps, another!"

নারীর বুদ্ধিও নির্ব্বুদ্ধিতা দুইই সমান। একজন বুদ্ধিহীনা নারীর নৈসর্গিক চতুরতা অনেক সময় বুদ্ধিমতী নারীর চেয়ে বেশী কার্য্যকরী। পুরুষকে আয়ত্তে রাখতে সমধিক শাস্তি রাখে তারাই যারা সুকৌশলে নারীত্বের মধ্যে তাদের বুদ্ধিকে লুকিয়ে রাখতে পারে।

"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য,"—এ কথা খাটে পুরুষের পক্ষে, নারীর পক্ষে নয়। আমাদের ঠাকুরমা বলতেন: অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি"। এটা নারীর পক্ষে খুবই প্রযোজ্য!

নারীপুরুষ সম্বন্ধ জটিল। পুরুষ যেখানে তার স্বাভাবিক শক্তি ও তার্কিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রণোদিত হয়, নারী সেখানে তার স্বতস্ফূর্ত বুদ্ধি ও নৈসর্গিক চতুরতা সম্যক প্রয়োগ করে। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে শান্তি, পরস্পর বিরোধিতায় অশান্তি। এই-ই পৃথিবীর ধারা! এ নিয়মের বাইরে কেহ যেতে পারে না,—সেটা হবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ,—তাই হবে সেটা অস্বাভাবিক। বিপরীত আকর্ষণ বিকর্ষণের উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। বিশ্বজগতের এই ধারা। Harmony out of disharmony—সৃষ্টির বিরাট মহিমা। Out of Chaos God created the universe—অনন্ত শূন্যের বিশৃঙ্খলা থেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি! নরনারীর পরস্পর-বিরোধী বিশৃঙ্খল মিলনের মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টির বীজ!

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

প্রাচীনকাল থেকেই দুনিয়ার সব দেশে সুসভ্য মানব-সমাজে টাকা-পয়সা, অলঙ্কার, সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম, রূপ-সজ্জার সামগ্রী, তাম্রকূট আর তাম্বুল সেবনের উপকরণ প্রভৃতি টুকিটাকি দরকারী-জিনিষপত্র রাখবার জন্য সচরাচর ছোট-বড় নানা রকম সৌখিন-সুন্দর ছাঁদের 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ, 'আঁশ'-জাতীয় (Fibre) তন্তু, গাছের বাকল, জন্তু-জানোয়ারের চামড়া, রেক্সিন, প্লাষ্টিক, রেয়ন, নাইলনের চাদর এবং সুতী, রেশমী আর পশমী কাপড় দিয়েই বিভিন্ন ছাঁদের এই সব বিচিত্র-সৌখীন 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' রচনা করা হয়। সুপ্রচলিত এই রীতি-অনুসারে, সুতী, রেশমী কিম্বা পশমী কাপড় দিয়ে অনায়াসে ঘরে বসে নিজের হাতে কারু-শিল্পের কাজকর্ম করে কি উপায়ে টুকিটাকি-জিনিষপত্র রাখবার উপযোগী এমনি বিচিত্র সৌখীন ছাঁদের 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' বানানো যেতে পারে, আপাততঃ তারই কিঞ্চিত হদিশ দিচ্ছি।
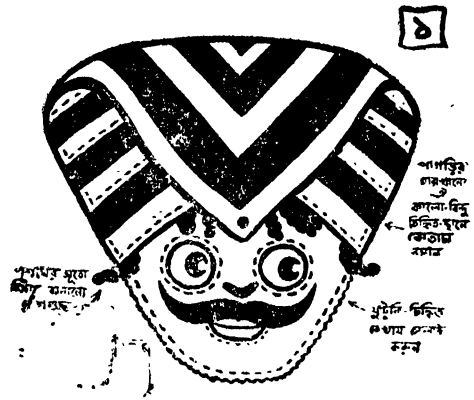
উপরের ১নং চিত্রে যে নমুনাটি (Pattern) দেখানো আছে, তেমনি-ছাঁদে টুকিটাকি-জিনিষপত্র রাখবার সৌখিন ব্যাগ বা 'বটুয়া-থলি রচনার জন্য—বেশ পুরু-মোটা, মজবুত ও থাপি-ধরণের সুতী, রেশমী কিম্বা পশমী কাপড় ব্যবহার করাই ভালো। সুতী-কাপড়ের মধ্যে—'খদ্দর', 'লিনেন', 'ক্যানভাস্' জাতীয় মোটা-কাপড়ই এ-কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে। রেশমী-কাপড়ের সাহায্যে এমনি-ধরণের 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' বানাতে হলে, 'গরদ', 'তসর', 'মুগা', 'ব্রোকেড্', 'ভেলভেট' প্রভৃতি পুরু-মোটা ছাঁদের উপকরণ বেছে নেওয়াই সমীচীন। পশমী-কাপড় দিয়ে এ সব সৌখিন-সুন্দর

সামগ্রী বানানোর জন্য—'ফেল্ট' (Felt) পুরু-মোটা 'ফ্ল্যানেল' (Flannel) জাতীয় মজবুত শীত-বস্ত্রই বিশেষ উপযোগী হবে। নিজস্ব রুচি-অনুযায়ী এ ধরণের কারু-শিল্প-সামগ্রী রচনার সময়, গোড়াতেই সংগ্রহ করতে হবে —ছোট-বড় প্রয়োজনমতো মাপের কয়েক টুকরো সুতী; রেশমী অথবা পশমী-কাপড়···এবং সেলাইয়ের জন্য চাই ছুঁচ, সুতো আর কাঁচি। এছাড়া আরো দরকার হবে—এক-হালি কালো-রঙের 'উল্' (Wool) বা পশমের-সুতো, 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' সঙ্গে মানানসই দেখায়, সুদৃশ্য-ছাঁদের এমন একটি রঙীণ-বোতাম···এ বোতামটি সেলাই করার উদ্দেশ্য—'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' মাথার শিয়রে ত্রিকোণাকৃতি-ঢাকাটিকে' (Trianguler-shaped Upper-Lid-Flap) মুখের উপরাংশের-কাপড়ের সঙ্গে পাকাপোক্তভাবে এঁটে রাখা, যাতে থলির ভিতরকার টুকিটাকি-জিনিষপত্র অসাবধানতার ফলে, আচম্‌কা বাইরে না গড়িয়ে পড়ে যায়। সুতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের টুকরোগুলি অবশ্য এ-ধরণের কারু-শিল্পের কাজ যিনি করবেন, তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দমতো রঙ-অনুসারেই বেছে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। তবে, সর্ব্বদাই নজর রাখা প্রয়োজন যে ছোট-বড় প্রত্যেকটি কাপড়ের টুকরোই যেন আগা-গোড়া পরস্পর-মানানসই রঙের হয়। কারণ, এ ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি ঘটলেই,শিল্প-সামগ্রীটি শেষ পর্য্যন্ত যে দেখতে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। যাই হোক,কথাটা আরো পরিষ্কারভাবে বোঝবার সুবিধার উদ্দেশ্যে, ধরে নেওয়া যাক্—উপরের ১নং চিত্রে দেখানো 'মাথায় ডোরা-কাটা চাদরের পাগড়ি-আঁটা ইয়া লম্বা গোঁফওয়ালা ঐ ভোজপুরী-পাহারাদারের, মুখের ছাঁদে 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' রচনার জন্য বেছে রাখা হয়েছে, ঈষৎ-পুরু-'ফেল্ট'-জাতীয় চারটি আলাদা আলাদা রঙের অর্থাৎ গাঢ়-লাল (Deep Red, Scarlet or Crimson), শাদা, ফিকে হলদে আর গাঢ়-সবুজ অথবা গোলাপী-আর-নীল, ডোরা-কাটা, পশমী কাপড়ের টুকরো। এই চারটি পশমী-কাপড়ের মধ্যে, গাঢ়-লাল রঙের বড়-টুকরোটি দিয়ে বানানো হবে—ভোজপুরী-পাহারাদারের মুখাবয়ব, শাদা-রঙের ছোট-টুকরোটি থেকে তৈরী হবে—পাহারাদারের একজোড়া গোলাকার চোখ, এবং রুমালের মতো চৌকোণা (Square) বড় রঙীণ ডোরাকাটা-টুকরোটি দিয়ে রচিত হবে—পাহারাদারের মাথার ঐ সৌখিন পাগড়ি। শাদা-রঙের ঐ গোলাকার চোখের কালো-তারা দুটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে—কালো-রঙের 'উল' বা পশমী-সুতোর সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে অথবা ঠিক অমনি ছাঁদে কালো-রঙের পশমী-কাপড় ছাঁটাই করে, ছোট-ছোট দুটি আঁখি-তারা বানিয়ে, শাদা-রঙের গোলাকার-চাক্‌তির প্রত্যেকটির উপরে যথাযথস্থানে সেলাই করে গেঁথে বসিয়ে। পাহারাদারের ভোজপুরী-গোঁফ-জোড়া রচনা করতে হবে—১নং চিত্রের নমুনা-অনুসারে কালো-রঙের পশমী-কাপড়ের টুকরো ছাঁটাই করে, গাঢ়-লাল রঙের ঐ মুখাবয়বের যথাস্থানে ছুঁচ-সুতোর সেলাই দিয়ে জোড়া লাগিয়ে। ইয়া-লম্বা ঐ ভোজপুরী-গোঁফের নীচে পাহারাদারের ঠোঁট দুটি বানাতে হবে—১নং চিত্রের নমুনার ছাঁদে গোলাপী-রঙের পশমী-কাপড়ের টুকরো ছাঁটাই করে যথাযথ-জায়গায় সেটিকে সেলাই দিয়ে জুড়ে বসিয়ে।

তবে বিভিন্ন-রঙের কাপড়ের টুকরোগুলিকে এমনি-ভাবে যথাযথস্থানে সেলাই করে জুড়ে বসানোর আগে, আরো কয়েকটি দরকারী-কাজ সেরে নিতে হবে। পছন্দ-মতো রঙের কাপড়ের টুকরোগুলি বেছে নেবার পর, প্রথমেই গাঢ়-লাল রঙের কাপড়ের টুকরোটিকে, নীচের 'ক'-চিহ্নিত ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ধরণে ছাঁটাই করে ফেললেই—ভোজপুরী-পাহারাদারের মুখাবয়বের সামনের ও পিছনের অংশ অর্থাৎ 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' দুইদিকের 'আবরণী-বস্ত্রের' (Cover-Cloth) সু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এবারে 'খ'-চিহ্নিত ছবির
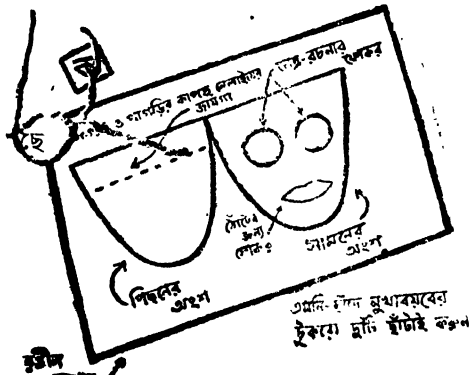
ভঙ্গীতে, শাদা-রঙের কাপড়ের টুকরো ছাঁটাই করে পরিপাটি-নিখুত ছাঁদে ভোজপুরী-পাহারাদারের গোলাকার চোখ-দুটি, এবং কালো-রঙের কাপড়ের টুকরো থেকে একজোড়া চোখের তারা, ইয়া-লম্বা গোঁফ আর নাকের সীমা-রেখাটি বানিয়ে ফেলবেন। এমনিভাবেই গোলাপী-রঙের কাপড়ের টুকরো ছাঁটাই করে বানাতে হবে—ভোজপুরী-পাহারাদারের ঠোঁট দুখানিকে। কাপড়ের টুকরোগুলিকে ছাঁটাই করার আগে, প্রত্যেকটির নক্সা যথাযথ আকারে ও মাপে বড় একটি কাগজের উপর নিখুঁতভাবে এঁকে নিয়ে সেই 'খশ্‌ড়া-চিত্রগুলিকে প্রয়োজনমতো কাপড়ের উপর আগাগোড়া 'ছকে' বা 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিতে হবে। তাহলে আর সেলাইয়ের কাজের সময় কোনো অসুবিধা ঘটবে না।

এইভাবে বিভিন্ন ছাঁদে ও মাপে রঙীণ-কাপড়ের টুকরোগুলিকে নির্দ্দিষ্ট-আকারে ছাঁটাই করে নেবার পর, সেগুলিকে যথাযথস্থানে সেলাই করবার পালা। সেলাইয়ের সময় প্রথমেই উপরের 'ক'-চিহ্নিত ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ভঙ্গীতে মুখাবয়বের দুটি অংশ—অর্থাৎ 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' 'আবরণী-বস্ত্রের' সামনের ও পিছনের দিক, একটিকে অপরটির উপর সমানভাবে বসিয়ে রেখে ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে সে দুটি অংশকে পাকাপোক্ত-ভাবে একত্রে জোড়া দিয়ে নেবেন। এবারে শাদা-রঙের গোলাকার চোখের-কাপড়ের টুকরো দুটির উপরে কালো-রঙের কাপড় ছেঁটে বানানো আঁখি-তারা দুটিকে সুষ্ঠুভাবে সেলাই দিয়ে টেঁকে, রচনা করবেন—ভোজপুরী-পাহারা-দারের সজাগ-নেত্রযুগল। তারপর গাঢ়-লাল রঙের কাপড়ে যথাস্থানে—চোখের ছাঁদে ও মাপেগোলাকার দুটি 'ফোকর' বা 'গর্ত্ত' (Round Hole) কেটে, সেই জায়গায় একের পর এক সেলাই করে বসিয়ে দিন—সদ্য রচিত ভোজপুরী-পাহারাদারের ঐ একজোড়া রাগ-নেত্র। এ কাজ সারা হলে, কালো-রঙের পশমী-সুতো দিয়ে পরিপাটি-ছাঁদে ভোজপুরী-পাহারাদারের মাথার কেশগুচ্ছ রচনা করে, সেগুলিকেও সেলাই করে এঁটে দেবেন উপরের ১নং চিত্রে দেখানো প্রত্যেকটি জায়গায়।
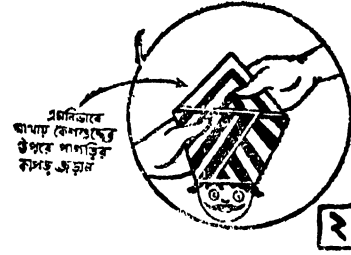
এবারে উপরের ২নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি-ভঙ্গীতে ভোজপুরী-পাহারাদারের ঐ ডোরাকাটা পাগড়ির-কাপড়ের চৌকোণা-টুকরোটিকে সুষ্ঠুভাবে 'ভাঁজ' (Fold) করে নিয়ে, সেটিকে সেলাই দিয়ে পাকাপাকি-ভাবে জুড়ে বসিয়ে দিন—কেশগুচ্ছ-সমেত মুখাবয়বের কাপড়ের সামনের ও পিছনের দিকের উপর-অংশের উভয়-কিনারা বরাবর জায়গায়। এমনিভাবে কেশগুচ্ছ-সমেত-মুখাবয়বের উপর-প্রান্তে পাগড়ির সীমারেখাটি আগা-গোড়া পরিপাটি-ধরণে সেলাই হয়ে যাবার পর, পাগড়ির কাপড়ের প্রলম্বিত-ত্রিকোণাকার প্রান্তটিকে মুখাবয়বের সুমুখ-দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি'র বোতাম-পরানোর 'ফোকর' (Button-hole) বা 'ঘর' রচনা করুন এবং যথাস্থানে সুদৃশ্য-সৌখিন ঐ রঙীণ-বোতামটিকে বসিয়ে সেলাই দিয়ে টেঁকে নিন। তাহলেই উপরের ১নং চিত্রের নমুনামতো টুকিটাকি-জিনিষপত্র রাখবার উপযোগী সুদৃশ্য-সৌখিন 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' রচনার কাজ শেষ হবে। এবারে এই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া থলিটি' সাদরে প্রিয়-জনদের হাতে তুলে দিন...এমন বিচিত্র-অভিনব সৌখিন-কারুশিল্প-সামগ্রী উপহার পেয়ে, তাঁরা যে প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'ক্রশ-ষ্টিচ' ও 'কার্পেট' সূচী-শিল্পের নতুন নক্সা-নমুনা

সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়

রঙ-বেরঙের 'রেশমী' (Silk) অথবা 'পশমী' (woolen) সুতো দিয়ে 'ক্রশ-ষ্টিচ' ও 'কার্পেট' সূচী-শিল্পের কাজ করে মনোরমভাবে গৃহ-সজ্জার উপযোগী সৌখিন ও

সুন্দর ছাঁদের নানারকম 'দেয়াল-চিত্র' (Decorative Wall-pictures), আসন, 'কুশান্-ঢাকা (Cushion-cover), টেবিল-ঢাকার মাদুর (Table-Mat), মহিলা-দের 'ভ্যানিটি-ব্যাগ' প্রভৃতি সুদৃশ্য কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন 'নক্সা-নমুনা' (Design বা Pattern) সহযোগে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এবারেও ঠিক তেমনি-ধরণের 'ক্রশ-ষ্টিচ্' অ'র 'কার্পেট' সূচীশিল্পের উপযোগী আরেকটি সহজ-সরল ওঅনায়াস-সাধ্য বিচিত্র-নতুন 'নক্সা-নমুনা' (Design বা pattern) প্রকাশিত হলো—নীচের ছবিটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট-পরিচয় মিলবে !
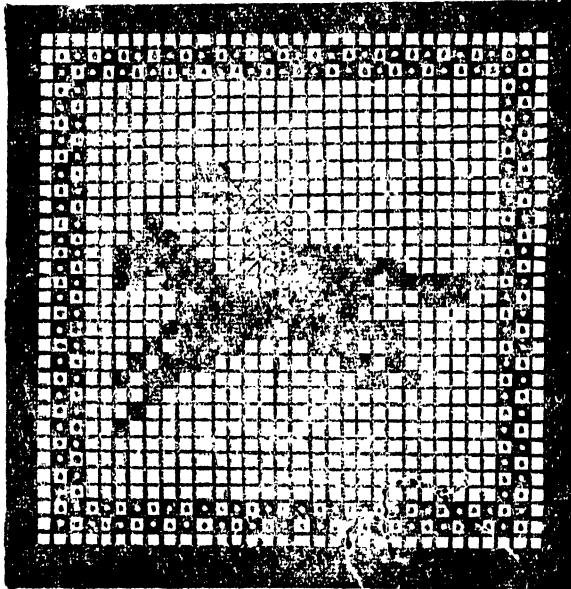
উপরের ছবিতে 'ছুটন্ত-ঘোড়ার পিঠে ঘোড়সওয়ারের' যে 'নক্সা-নমুনাটি' দেখানো হয়েছে, 'ক্রশ্-ষ্টিচ্'ও 'কার্পেট' সূচী-শিল্পের কাজ করে সেটিকে নিখুঁত ছাঁদে ফুটিয়ে তোলবার জন্য কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন। এ নক্সাটি রচনার জন্য দরকার—প্রয়োজনমতো ছোট, বড় বা মাঝারি আকারের 'কার্পেট-সেলাইয়ের কাপড়' (Carpet-Cloth) কিম্বা 'ক্রশ্-ষ্টিচ' সূচী-শিল্পের উপযোগী ঐ মাপেরই পুরু ও খাপি ধরণের 'লিনেন' (Linen), 'খদ্দর', 'দো-সূতী', 'চট' অথবা মিহি-ছাঁদের 'ক্যানভাস' (Canvas) জাতীয় কাপড়, 'কার্পেট' অথবা 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' সূচী-শিল্পের উপযোগী কয়েকটি সরু-মোটা মজবুত ছুঁচ, একখানি ভালো কাঁচি আর পছন্দমতো পাকা-রঙের কয়েক গোছা ভালো 'পশমী' (woolen-strands) বা 'রেশমী' (Silken-strands) সুতো। আলোচনা-প্রসঙ্গে ধরে নেওয়া যাক্, উপরের নক্সাটি রচিত হবে—১৩½″ইঞ্চি×২০″ ইঞ্চি সাইজের কাপড়ের এবং এই সূচী-শিল্পের 'নমুনাটি' ফুটিয়ে তোলা হবে নিম্নলিখিত রঙের 'পশমী' বা 'রেশমী' সুতোর সাহায্যে :—

(১) কালো-রঙের ঘরগুলি অর্থাৎ ঘোড়ার দেহাংশ ও ল্যাজের জন্য ব্যবহার করবেন—হালকা অথবা গাঢ়-বাদামী (Light or Deep Brown) কিম্বা লাল্‌চে-ধরণের বাদামী (Crimson) রঙের রেশম অথবা পশমের সুতো ;

(২) '×'-চিহ্নিত ঘরগুলি অর্থাৎ, ঘোড়-সওয়ারের জামার অংশ রচনার জন্য বেছে নেবেন—কমলা (Orange) অথবা লাল (Vermillion) রঙের 'রেশমী' বা 'পশমী' সুতো ;

(৩) '/'-চিহ্নিত ঘরগুলি অর্থাৎ, ঘোড়-সওয়ারের পাজামার অংশ রচনার জন্য ব্যবহার করবেন—গাঢ় কিম্বা ফিকে-হলদে (Deep or Light Yellow) রঙের 'পশম' বা 'রেশমের' সুতো।

(৪) '-'-চিহ্নিত ঘরগুলি অর্থাৎ, ঘোড়-সওয়ারের লম্বা বুট-জুতো আর ঘোড়ার পিঠের 'জিনের' অংশ রচিত করতে হবে—ফিকে-পাটালী (Light Fawn) অথবা কালো (Black) কিম্বা ফিকে-ছাই (Light Grey) রঙের 'রেশমী' বা পশমী' সুতো দিয়ে ;

(৫) '×'-চিহ্নিত ঘরগুলি অর্থাৎ, ঘোড়সওয়ারের মুখে ... রচনা করবেন—গোলাপী রঙের 'রেশমী' বা 'পশমী' সুতোর সাহায্যে। ঘোড়সওয়ারের নাক, মুখ, চোখ রচনার জন্য গাঢ় বাদামী রঙের 'রেশমী' বা 'পশমী' সুতো ব্যবহার করবেন।

(৬) কালো-রঙের মাঝে শাদা-বিন্দু চিহ্নিত ঘরগুলি অর্থাৎ, ঘোড়সওয়ারের মাথার টুপিটির জন্য ব্যবহার

করবেন—গাঢ়-নীল (Deep Blue) রঙের 'পশম' বা 'রেশমের' সুতো।

(৭) 'নক্সা-নমুনার' পশ্চাদ্‌পটের (Background of the Pattern-design) অর্থাৎ, ছুটন্ত-ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের পিছনে ঐ শাদা-ঘরগুলিকে আগাগোড়া ভরাট করে তোলবার জন্য বেছে নেবেন—কচি-ঘাসের মতো হালকা-সবুজ (Light Green) রঙের 'রেশমী' অথবা 'পশমী' সুতো।

(৮) এবারে 'পশ্চাদ্‌পটের' (Background) চারিদিকে 'শাদার মধ্যে কালো বিন্দু' এবং 'কালোর মধ্যে শাদা-বিন্দু' চিহ্নিত যে সব ঘরগুলি রয়েছে, সেগুলিকে ভরে তুলবেন—হাল্‌কা-বেগুনী (Mauve) আর গাঢ়-নীল (Dark Blue) রঙের 'রেশম' বা 'পশমের' সুতো ব্যবহার করে।

(৯) 'পশ্চাদ্‌পটের' চারিদিকে 'দো-রঙা' এই 'বর্ডার' (Border) বা 'পাড়' রচনার পালা শেষ হলে, পাড়ের কোলেই বরাবর যে শাদা-ঘরগুলি বাকী রয়েছে, সেগুলি আগাগোড়া ভরাট করে ফেলুন—গোলাপী রঙের 'পশমী' বা 'রেশমী' সুতোর সাহায্যে।

(১০) অতঃপর 'নক্সার' চারিদিকে যে চওড়া কালো-রঙের 'বর্ডার' বা 'পাড়' চিহ্নিত ঘরগুলি রয়েছে, সেগুলি ভরে তুলুন—গাঢ় বেগুনী (Violet) রঙের 'রেশম' কিম্বা 'পশমের' সুতোয়। তাহলেই বিভিন্ন-বর্ণের সমন্বয়ে অপরূপ-সুন্দর ছাঁদে ফুটে উঠবে উপরের 'নক্সা-নমুনায়' দেখানো 'ছুটন্ত-ঘোড়ার পিঠে ঐ ঘোড়-সওয়ারের সূচীশিল্প-প্রতিলিপিটি !

সুধীরা হালদার

এবারে পশ্চিম-ভারতের মহারাষ্ট্র-প্রদেশের অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় অভিনব-সুস্বাদু একটি নিরামিষ-খাবার রান্নার কথা বলছি। মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় এ খাবারের নাম দেওয়া হয়েছে—'চিরোটে'। এটি বেশ মুখরোচক নোন্তা-জাতীয় খাবার। বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে অথবা ছুটির দিনে আত্মীয়-বন্ধুদের প্রীতিভোজের আসরে বিচিত্র এই মহারাষ্ট্রীয়-খাবার পরিবেষণ করে সবাইকেই প্রচুর আনন্দ ও নতুনত্বের স্বাদ দেওয়া যেতে পারে।

চিরোটে ঃ

মহারাষ্ট্রীয়-প্রথায় 'চিরোটে' খাবার রান্নার জন্য উপকরণ দরকার—চায়ের কাপের তিন-কাপ ভালো ময়দা, বড়-চামচের দুই-চামচ চালের গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো অল্প একটু নুন, ঘি, এবং চার-পাঁচটি ছোট-এলাচ। তবে নোন্তা-স্বাদের বদলে, মিষ্টি-স্বাদের 'চিরোটে' রান্না করতে হলে, উপকরণ সংগ্রহের সময় নুনের জায়গায় চিনি ব্যবহার করবেন। উপরে যে ফর্দ্দ দেওয়া হলো, তাই দিয়ে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশখানা 'চিরোটে' বানানো যাবে—এই হলো মোটামুটি হিসাব।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হলে, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, পরিষ্কার একটি পাত্রে ময়দা আর চালের গুঁড়ো মিশিয়ে, তার সঙ্গে আন্দাজমতো ঘিয়ের 'ময়ান' দিয়ে, সব-টুকু একত্রে মেখে ফেলুন—লুচি রুটি-পরোটা বানানোর সময়, সচরাচর যেমনভাবে ময়দা বা আটা মেখে নিতে হয়, ঠিক তেমনি ধরণে। অতঃপর, ছোট-এলাচগুলি খোশা ছাড়িয়ে এলাচ-দানাগুলিকে মিহি-ছাঁদে গুঁড়িয়ে নিয়ে, সত্য-মাখা ঐ ময়দা আর চালের গুঁড়োর তালের (Lump) সঙ্গে মিশিয়ে, বাড়ীতে লুচি-রুটি-পরোটা বানাবার জন্য

যেমন পদ্ধতিতে কাজ করেন, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ হাতের তালুর চাপ দিয়ে ঠেশেঠুশে ডলে, সেটিকে আগাগোড়া বেশ নরম-নমনীয় করে তুলুন।

এমনিভাবে ময়দা আর চালের গুঁড়ো মেশানো তাল-টুকু মেখে নেবার পর, সেই তালটিকে আগাগোড়া ছোট-ছোট কয়েকটি 'টুকরো' বা 'লেচির' আকারে বিভক্ত করে, প্রত্যেকটি টুকরোকেই চাকি-বেলনীর সাহায্যে লুচি, রুটি বা পরোটার মতো পাৎলা-ছাঁদে ও চাক্তির আকারে বেলে নিন। তারপর সগু-বেলা ঐ পাৎলা-ছাঁদের ময়দা-চালের-গুঁড়ো মিশ্রিত একটি 'চাক্তি' নিয়ে, সেটির দু-পিঠেই সামান্য ঘি মাখিয়ে রাখুন। এবারে দু'পিঠে-ঘি-মাখানো ঐ প্রথম-চাক্তিটির উপর আরেকটি 'চাক্তি' বসিয়ে রেখে, সেটির গায়েও ঠিক আগের মতো পদ্ধতিতে ঘিয়ের প্রলেপ লাগিয়ে, তার সঙ্গে তৃতীয়, অর্থাৎ, পুনরায় অন্য একটি 'চাক্তি' জুড়ে দিন।

তারপর অঙ্গাঙ্গীভাবে একত্রে-আঁটা এই তিনটি 'চাক্তিকে' আড়াআড়ি-ধরণে, অর্থাৎ, পাশ-বালিশের মতো লম্বা-ছাঁদে গুটিয়ে (Roll) নিয়ে, ছুরি কিম্বা খুন্তির সাহায্যে সেটিকে আগাগোড়া ছোট-ছোট 'টুকরো' করে কেটে ফেলুন। এভাবে কাটবার সময় খেয়াল রাখবেন—টুকরোগুলি যেন আকারে নিতান্ত ক্ষুদে-ছাঁদের না হয়··· প্রত্যেকটি 'টুকরোই' অন্ততঃপক্ষে ২" ইঞ্চি লম্বা-আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনি প্রথায় বাকী 'চাক্তিগুলিকে 'টুকরো' করে কেটে নিয়ে, রান্নার কাজে হাত দিতে হবে।

মহারাষ্ট্রবাসীদের প্রিয়-খাদ্য 'চিরোটে' রান্নার প্রণালী, অনেকটা ঠিক লুচি বা পুরি বানানোর মতোই। 'চিরোটে' রান্নার সময়, গোড়াতেই উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি ঢেলে দিয়ে গরম করে নিন। আগুনের তাপে ঘিটুকু গলে গিয়ে আগা-গোড়া বেশ তরল ও ফুটন্ত-গরম হয়ে উঠলে, সেই ফুটন্ত-ঘিয়ে ময়দা আর চালের গুঁড়ো মেশানো ক্ষুদে-লম্বা ছাঁদে-কাটা টুকরোগুলির কয়েকটিকে ছেড়ে দিয়ে,খুন্তির সাহায্যে সেগুলির প্রত্যেকটিকে মৃদু-চাপ দিয়ে তপ্ত-তরল ঘিয়ের মধ্যে সামান্যক্ষণ বারবার সযত্নে ডুবিয়ে রেখে সুষ্ঠুভাবে ভেজে নিন। এমনিভাবে ভাজার ফলে, কিছুক্ষণ বাদে, এ সব টুকরোগুলি লুচি বা পুরির মতো ফেঁপে ফুলে উঠে ফিকে-বাদামী রঙের দেখতে হলেই খুন্তির সাহায্যে সযত্নে-সাবধানে সেগুলিকে উনানের-আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে নিয়ে অন্য একটি পাত্রে রেখে দেবেন। ঠিক এমনি প্রথাতেই টুকরোগুলিকে ভেজে নিবেন—তাহলেই রান্নার কাজ চুকবে। এবারে প্রিয়জনদের পাতে এই খাবারটি সযত্নে পরিবেষণ করুন···আপনাদের হাতের রান্না অভিনব-মুখরোচক মহারাষ্ট্র-দেশীয় 'চিরোটে' খাবারের স্বাদ পেয়ে তাঁরা যে বিশেষ খুশী হবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য !

পরের সংখ্যায় এমনি বিচিত্র-উপাদেয় আর কয়েকটি সুস্বাদু-ভারতীয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

কৈফিয়ৎ

আধুনিক-তরুণ ঃ—ইস্‌···মাই গড্‌!···তাই তো, 'এত রাত হয়েছে, খেয়ালই'নেই!···সেই সকালে কলেজের নাম করে বেরিয়েছো · তারপর থেকে এতক্ষণ অবধি ময়দান, মার্কেট, সিনেমা হোটেল ঘুরে বাড়ী ফেরা···বাড়ীতে বাবা মাকে কি কৈফিয়ৎ দেবে?···

আধুনিকা-তরুণী ঃ—কৈফিয়ৎ!···ননসেন্স্‌!···হোয়াই—বাবা-মা এ-যুগের মানুষ···তাঁরাও যে যাঁর বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে খুশীমতো ঘুরে বেড়ান—ক্লাবে, পার্টিতে সর্ব্বত্র!···কাজেই, কৈফিয়ৎ চাইবেন কি জন্য?···

মেষ লগ্ন

উপাধ্যায়

(দ্বাদশ ভাবে কেতুর অবস্থান হেতু ফলাফল ভৃগুসংহিতানুসারে)

কেতু মেষ লগ্নে থাক্‌লে জাতক আত্মকেন্দ্রিক, সঙ্গবিমুখও অসামাজিক প্রকৃতির হয়। শারীরিক যন্ত্রণা। সৌষ্ঠব গঠনের অভাব। শারীরিক সান্ত্বনা। খ্যাতি প্রতিপত্তি। রক্তপাতাদি, দন্তরোগ, অস্থিভঙ্গ প্রভৃতির আশঙ্কা। পারিবারিক ব্যাপারে অপবাদ। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অভাব।

কেতু বৃষ রাশিতে ধন ভাবে থাকলে প্রচুর ধনক্ষতি হয়। মাঝে মাঝে আসে অর্থের অভাব অনাটন। ধৈর্য্যের সঙ্গে ধনোপার্জ্জনে সচেষ্ট। পারিবারিক দুঃখদুর্দ্দশা। কুটুম্বের সহিত মনোমালিন্য ও বিরোধ। অসাফল্যের জন্য মনোকষ্ট। মস্তিষ্কের পীড়ার আশঙ্কা। অর্থাগমে ও সাফল্যে বাধা।

কেতু মিথুন রাশিতে সহজভাবে থাকলে ভ্রাতৃহানি এবং ভ্রাতৃবর্গের দুঃখ দুর্দ্দশা, উৎসাহের অভাব, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি, অস্ত্রাঘাত বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা, বৃথা গর্ব্ব, গুণ্ডামির দিকে ঝোঁক, সাধুতা ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব। সহজ জ্ঞানের অভাব, লেখাপড়ায় বাধা উপস্থিত হয়।

কেতু কর্কট রাশিতে বন্ধভাবে থাকলে মাতৃপক্ষের দুর্ব্বলতা, মাতার মৃত্যু বা মাতার সহিত বিচ্ছেদ, জমিজমাও গৃহসংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষতি। আমোদ প্রমোদও চিত্ত-প্রসন্নতাস অভাব। নানা দুঃখ কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়। ফাঁকি দিয়ে উপার্জ্জনের ইচ্ছা। সন্ন্যাসের বাধা আধ্যাত্মিক উন্নতি। পর গৃহ বাস অবশ্যম্ভাবী। জীবনে নানা দুর্ঘটনা।

কেতু সিংহরাশিতে পুত্রভাবে থাকলে সন্তানহানি ও সন্তান দুঃখী, লেখাপড়ায় ক্ষতি, জ্ঞানের অভাব, বুদ্ধির উৎকর্ষতার জন্য অদম্য প্রচেষ্টা, জীবনের শেষে বৈরাগ্য ঐকান্তিক চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা সাফল্য লাভ, প্রণয়ভঙ্গযোগ· আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ।

কেতু কন্যারাশিতে শত্রুভাবে থাকলে শত্রু দমনের শক্তিলাভ, প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য সচেষ্ট, মাতামহ পক্ষে দুর্ব্বলতা, দুঃসাহসিকতা, পাপপুণ্যকে অগ্রাহ্য করে আত্মসুখের জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন, রোগের দ্বারা পঙ্গুত্ব আসতে পারে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

কেতু তুলা রাশিতে জায়া ভাবে থাকলে বিবাহের এবং দাম্পত্য জীবনের পক্ষে অশুভ। বিবাহ হোলেও স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ভাব ও বিচ্ছেদ. ব্যবসায়ে অংশীদার থাকলে তার জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ ও আশাভঙ্গ, শত্রুর উৎপীড়নে দুঃখ কষ্ট ও দুর্ভাগ্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আধিক্য, নানা দুঃখকষ্ট বরণ করে অদম্য উৎসাহ ও পুরুষকারের দ্বারা পার্থিব সুখ ভোগ। প্রতারকের দ্বারা অর্থহানি।

কেতু বৃশ্চিকরাশিতে নিধন ভাবে থাকলে পৃষ্টবেদনা, শরীরে বায়ু প্রকোপ, যকৃৎ দোষ, মানসিক রোগে পীড়িত। কটুভাষিণী স্ত্রীর জন্য অশান্তি। হঠাৎ মৃত্যু। অপঘাতে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু। অষ্টমে কেতু আয়ু হ্রাস কারক।

কেতু ধনুরাশিতে ধর্ম্মভাবে থাকলে জীবনের সব ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত বাধা, বাল্যে পিতৃবিয়োগের আশঙ্কা, ভ্রমণের সময় বিপদ। ভাগ্যোদয়ে নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট, বিদেশী বা বিধর্ম্মীর সংশ্রবে বিদেশে ভাগ্যবৃদ্ধি। আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা।

কেতু মকর রাশিতে কর্ম্মভাবে থাকলে কর্ম্মভাব উত্তম হয় না। একাধিক স্থানে কর্ম্ম। কর্ম্মের ব্যাপারে উন্নতি হয়ে অকস্মাৎ অবনতি বা পদচ্যুতি হওয়া অসম্ভব নয়। জীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আশা কম।

কেতু কুম্ভরাশিতে আয়ভাবে থাকলে খুব কম লোকেরই সঙ্গে বন্ধুত্ব। স্ত্রীপুত্র এবং আত্মীয় কুটুম্বের ব্যাপারেও আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। কোন বিদেশী বা ম্লেচ্ছ মুরুব্বির সাহায্যে অর্থাগম ও পদবৃদ্ধি।

কেতু মীন রাশিতে ব্যয়ভাবে থাকলে ব্যয়বৃদ্ধি ও নানা অশান্তির কারণ ঘটে। বিশেষ কিছু সঞ্চয় হয় না। কোন দুর্ঘটনা বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্টভোগ ও পঙ্গুত্ব আসা ও অসম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষরাশি

ভরণীনক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। অশ্বিনী জাত গণের পক্ষে মধ্যম। ভরণী জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। এমাসে কিছু শারীরিক অসুস্থতা। উদর, ফুস্ ফুস চক্ষু ও হৃদয় এই কয়েকটি স্থানে রোগাধিকারের সম্ভাবনা। রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে এবং হাঁপানি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা আবশ্যক। স্বজন ও পুত্রবর্গের সঙ্গে কলহ। পরিবার বহির্ভূত আত্মীয়গণের সঙ্গে মনোমালিন্য। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। বন্ধু দ্বারা প্রতারণা। ব্যয়াধিক্য। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অনুকূল। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ, কর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে মোটামুটি ভালো যাবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। ব্যয়াধিক্য যোগ। অর্থপ্রাপ্তি ও চিত্তসুখ।

বৃষ রাশি

রোহিণী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। মৃগশিরা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। হজমের গোলমাল। উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি সম্ভব। ফুসফুস ও হৃদয় সামান্যরূপ আক্রান্ত হোতে পারে। রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক অবস্থা কিছুটা ভালো হোলেও পরিবারবহির্ভূত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য, তজ্জনিত অশান্তি। সন্তোষজনক আর্থিক সঙ্গতি। সামান্য আর্থিক ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক নয়। মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম, অপ্রত্যাশিত ভাবে শুভ সূচনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে সাফল্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন রাশি

আর্দ্রানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই যাবে, তবে বায়ুপিত্ত প্রকোপের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। পারিবারিক মনোমালিন্য প্রকাশ পেলেও পুনরায় প্রীতির লক্ষণ দেখা দেবে। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। নগদ টাকার টান ধরবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। চাকুরিক্ষেত্রে শত্রু বৃদ্ধি। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ এবং উন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ বিশেষতঃ সঙ্গীতকলাভিজ্ঞাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কর্কট রাশি

তিনটি নক্ষত্রজাত ব্যক্তির ফলই একরূপ। মাসটি মোটের উপর সকলের পক্ষে ভালো। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না। পিত্তপ্রকোপ, শ্লেষ্মাপ্রকোপ বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিলেও তা সাময়িক। সামান্যরূপ দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

কিছু পারিবারিক অশান্তি। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই সম্ভব। অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থাগম যোগ। ব্যয়াধিক্য। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি অনুকূল। চাকুরির পক্ষে বিশেষ শুভ। বহুদিনের বেকার ব্যক্তির ও এমাসে চাকুরি লাভ। অস্থায়ী চাকুরিজীবির স্থায়ীপদে অধিষ্ঠান। স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত শুভ, অনেকে সন্তানবতী হবে। নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠা। চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রীর পক্ষে মাসটি বিশেষ অনুকূল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ সাফল্য লাভ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির উত্তম, মঘাজাত ব্যক্তির মধ্যম এবং উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির নিকৃষ্ট ফল। শারীরিক অবনতি। পিত্তপ্রকোপ। শরীরে আঘাত প্রাপ্তি। দৈহিক শক্তির হ্রাস। সংসারের খরচপত্র নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ বিবাদ, পরিবার বর্হিভুত ব্যক্তিদের দ্বারা লাঞ্ছনা ভোগ। আর্থিক অনুকূল হলেও আয়ের ভাগ বেশী হবে না। অল্পবিস্তর ক্ষতি। শত্রুবৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীয় পক্ষে মন্দ নয়। চাকুরিজীবির পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাস্থ্যের অবনতি। অন্যান্য বিষয়ে উত্তম। মঞ্চ ও ছায়াভিনেত্রী, শিল্পকলাভিজ্ঞা প্রভৃতির পক্ষে অতীব উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

কন্যা রাশি

হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম এবং উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে অধম। অতিরিক্ত গরমের জন্য কষ্টভোগ, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, চক্ষু পীড়া ও পিত্তপ্রকোপের সম্ভাবনা। স্ত্রীর অসুস্থতা। পারিবারিক সামান্য কলহাদি। মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালোই। আর্থিক অবস্থা শুভ। অনাদায়ী অর্থপ্রাপ্তি। ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মোটের উপর মন্দ নয়। চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম। পদোন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সন্তোষজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ কোনদিকেই শুভ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

তুলা রাশি

স্বাতীজাতগণের পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে অধম। উদর ও গুহ্যপ্রদেশে পীড়া; জ্বর, আমাশয়, দাঁতের যন্ত্রণা। অতিরিক্ত গরম হেতু রক্তের চাপ বৃদ্ধি, সন্তানের পীড়া। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য ও পারিবারিক অশান্তি। আর্থিকক্ষেত্র বিশেষ শুভ এবং উন্নত অনুকূল পরিস্থিতি। অনাদায়ী অর্থ লাভ। ঋণ পরিশোধ। সামান্য ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মোটামুটি মন্দ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়, প্রতিকূল আবহাওয়া। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতিপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে দুঃসময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

তিনটী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের একইপ্রকার ফল। স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালো। শারীরিক দুর্ব্বলতাবোধ। আঘাত বা দুর্ঘটনার ভয়। পারিবারিক শান্তি। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ শুভ। গর্ভবতীর কন্যাসন্তান প্রসব। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে উত্তম। মূলাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে অধম। জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা, ফাইলেরিয়ার রোগীর সতর্কতা আবশ্যক। দুর্ঘটনার আশঙ্কা, পারিবারিক শান্তি, পরিবার-বহির্ভূত স্বজনবর্গের সঙ্গে মনোমালিন্য, আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক, অর্থ সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় সাফল্য। অপর পক্ষে অর্থের চাপ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে অনুকূল। চাকুরিজীবীর পক্ষে মিশ্রফল। কর্ম্মক্ষেত্রে খ্যাতি প্রতিপত্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ সন্তোষজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। অনেকে সন্তানবতী হবে, কন্যাসন্তানের সম্ভাবনা। চাকুরিজীবী, ছায়ামঞ্চাভিনেত্রী প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর রাশি

শ্রবণাজাতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম এবং উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি, উদরঘটিত পীড়া, রক্তস্রাব, দুর্ঘটনার ভয়, অস্ত্রের আঘাত প্রভৃতি। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও বন্ধুবর্গের সহিত কলহ, পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কলহ বিবাদের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হবে। আর্থিক ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়, নানা প্রকার সমস্যাসঙ্কুল হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক নয়। চাকুরিরক্ষেত্রে মিশ্রফলপ্রদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর ভাগ্যে কষ্টভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা, নানা প্রকার অশুভ ঘটনার সমাবেশ। শারীরিক ও মানসিক অবনতি, বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে বাধাপ্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাতগণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি হবেনা। উদরঘটিত পীড়া, চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক ঐক্য ও শান্তিসুখ, বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, গৃহে নবজাতক বা জাতিকার আর্বিভাব। আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষজনক, নানাভাবে অর্থাগম, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, আর্থিক সাফল্যের ব্যাপারে বন্ধুদের আনুকূল্য লাভ। ব্যয় সঙ্কোচ আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী অতীব উত্তম। পদোন্নতি, উত্তম মর্য্যাদালাভ এবং কর্ম্মে সুখ্যাতি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম ভাগ্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সন্তানলাভ প্রভৃতি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

তিনটি নক্ষত্রজাত ব্যক্তিরই এক প্রকার ফল। স্বাস্থ্যের কিছু অবনতি ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। সন্তানদের স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়া। সামান্য কলহাদি হোলেও পারিবারিক ক্ষেত্র শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। পরিবারবর্হিভূত স্বজনগণের সহিত মনোমালিন্য, আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষজনক নয়। চৌর্য্য ভয়, আর্থিক ক্ষতি প্রভৃতি সম্ভব। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ ও আশাপ্রদ, পদোন্নতিযোগ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়, বৃদ্ধি ও বিস্তারের যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ শুভ। উত্তম বিবাহ, সন্তান, লাভ, মানমর্য্যাদা বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ। সঙ্গীত শিল্পকলা ছায়া ও মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৃত্তিজীবী নারীর বিশেষ শুভ সময়! বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর উত্তম সাফল্য।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার পীড়া। পিতার অশান্তি, পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা ও বন্ধু দ্বারা ক্ষতি। নিজের ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, ধনাগম ও সুখ্যাতির আশা, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক অবস্থা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃষ লগ্ন—

দৈহিক অবস্থা শুভ, ধনলাভ যোগ, গৃহে পুত্র কন্যার বিবাহ উৎসব। কর্ম্মোন্নতি, ভ্রাতার রোগ ভোগ, প্রতারণা ভোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন লগ্ন—

সন্তানের বিদ্যায় উন্নতিলাভ, অর্থব্যয়, বেদনাজনিত পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, ঋণযোগ, স্বাস্থ্যের অবনতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

কর্কট লগ্ন—

বাত বেদনা, অম্লপিত্তজনিত পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, ধনাগম, সহোদরভাব শুভ, স্ত্রীর পীড়া, ভাগ্যোন্নতি ও পদোন্নতি, গৃহে পুণ্য উৎসব, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যলাভ।

সিংহ লগ্ন—

দেহভাব মধ্যম, বন্ধুভাব শুভ, সন্তানের দেহপীড়া, অর্থলাভ, ব্যয়বৃদ্ধি, যশোভাগ্য শুভ, নূতন গৃহ নির্ম্মাণ বা সংস্কার, চাকুরিরক্ষেত্র স্বাভাবিক, স্ত্রীলোকের পক্ষে মিশ্রফল, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ফল মধ্যবিধ।

সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

কন্যা লগ্ন—

দেহভাব শুভ, দাম্পত্য প্রণয়, ভাগ্যোন্নতি, বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতির অভাব, মাতার পীড়া, কর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, চাকুরিজীবী স্ত্রীলোকের কর্ম্মোন্নতি, সন্তানের পীড়া, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো নয়, স্নায়ুগত পীড়া, নানারকমে অর্থব্যয়, সন্তান-সন্ততির শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা, স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পুত্র-কন্যার বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ। শত্রু বৃদ্ধি, গৃহ নির্ম্মাণে বাধা, কর্ম্মস্থলে অশান্তি, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভাব, ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য, সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য ভালো যাবে, ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি, গুরুজন বিয়োগ, কর্ম্মে সাফল্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক শান্তির অভাব, কর্ম্মস্থল স্বাভাবিক, ভাগ্যলাভে বাধা, আর্থিক উদ্বেগ, ঋণযোগ, নূতনভাবে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে মিশ্র-ফল, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

মকর লগ্ন—

দেহপীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, শত্রুবৃদ্ধি, পারিবারিক অবস্থা ভালো, স্ত্রীর জীবন সংশয় পীড়া, দেশভ্রমণ, প্রীতি-ভঙ্গ, দাম্পত্যকলহ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা শুভ, ধনাগম, আংশিক অশান্তি, মোকর্দ্দমায় জয়, আর্থিক উন্নতি, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, সন্তানাদির পীড়া, মাতার রোগভোগ, সহোদর ভাবের ফল শুভ, গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

প্যাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ অগ্রগতি ॥

১৯৬২ সালের চিত্র নির্ম্মাণের খতিয়ান থেকে দেখা যায় যে ভারতীয় চিত্র সংখ্যার দিক থেকে এখন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। চিত্র জগতের লীলাভূমি হলিউড রয়েছে তৃতীয় স্থানে, আর প্রথম স্থানে রয়েছে জাপান। চতুর্থ স্থানে ফরাসী চিত্রকে রাখা যেতে পারে। গত বৎসরের খতিয়ানে দেখা যায় ভারত ছাড়া প্রায় সব কয়টি দেশেই চিত্র নির্ম্মাণে ভাঁটা পড়েছে। জাপান গত বৎসর ৩৭৫টি চিত্র নির্ম্মাণ করেছে, কিন্তু ১৯৬১ সালে নির্ম্মাণ করেছিল ৫৩৫টি। হলিউড্ ১৯৬১তে নির্ম্মাণ করেছিল ১৮৭টি চিত্র, কিন্তু গত বৎসর তৈরী করেছে মাত্র ১৩৮টি। ফ্রান্স ১৯৬১তে তৈরী করেছিল ১১৬টি চিত্র, আর গত বৎসর করেছে মাত্র ৮০টি। ভারত কিন্তু ১৯৬১ সালে যে সংখ্যক চিত্র নির্ম্মাণ করেছিল তার থেকে ১৯৬২তে আরও বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৬১তে ভারতে তৈরী হয়েছিল ২৯৭টি চিত্র, আর গত বৎসর ১৯৬২তে নির্ম্মিত হয়েছে ৩১২টি চিত্র; অর্থাৎ ১৫টি চিত্র বেশী তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে বোম্বাইতে নির্ম্মিত হয়েছে ১১৯টি, মাদ্রাজে ১৪৬টি এবং কলিকাতায় ৪৭টি। ১৯৬০ সালে কিন্তু ভারতে আরও বেশী সংখ্যক চিত্র নির্ম্মিত হয়েছিল ৩২০টি এবং জাপানে সেই বছর তৈরী হয়েছিল ৫৪৭টি চিত্র।

যাই হোক, এই খতিয়ান থেকে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে জাপান, হলিউড্, ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্ম্মানিও চিত্র নির্ম্মাণের সংখ্যার দিক থেকে পিছুতে আরম্ভ করলেও ভারত কিন্তু পেছাই নি—এটা একটা মস্ত বড় আশার কথা। তবে শুধু সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে গেলেই চলবে না, গুণের দিক থেকেও এগুতে হবে। সেদিক থেকে আমরা এখনও পেছিয়ে আছি। ভারতীয় চিত্র-

উত্তমকুমার প্রযোজিত ও অভিনীত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুক্তি প্রতিক্ষীত 'ভ্রান্তিবিলাস' চিত্রে উত্তমকুমার।

নির্ম্মাতারা চিত্রের সংখ্যা যেমন বাড়াচ্ছেন গুণ বাড়ানোর দিকেও যদি সেই রকম দৃষ্টি রাখেন তাহলে আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় চিত্র সর্ব্বদিক দিয়েই বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন করে নিতে পারবে।

হাইহিল ঃ

একজন রিটায়ার্ড পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাড়ীর পাশেই একটি মেস্‌বাড়ী। অন্যান্য মেম্বারের সহিত বিখ্যাত রেডিও-আর্টিষ্ট চন্দন মুখার্জীও ঐ মেসে বাস করে। চন্দনের একটি এ্যাল্‌সেসিয়ান্ কুকুর আছে, তার নাম গুণ্ডা। এই গুণ্ডা একদিন ঐ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মেয়ে মল্লিকার পায়ের একপাটি 'হাইহিল' জুতা মুখে করিয়া চন্দনের ঘরে লইয়া আসে। তাহার ঐ জুতার খোঁজ করিতে আসিয়া মল্লিকা চন্দনকে যাহা নয় তাহাই বলিয়া যায়। এই ঘটনা হইতেই কাহিনী ক্রমে নাটকীয় হইয়া ওঠে। কিন্তু মেসের আর একজন মেম্বর হাবুল অনেকদিন হইতেই 'হুইসেল' বাজাইয়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে মল্লিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহাকে বিবাহ করিবার আশাও মনে মনে পোষণ করিতেছিল। সেই উদ্দেশ্যে হাবুল তাহার এক মামাকে আনাইয়া তাহার দ্বারা বনচাঁড়ালের গাছ, শকুনের ডিম, বাবুই পাখীর বাসা, আর টিকটিকির লেজ দিয়া যোগবলে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও সংকর্ষণের দ্বারা নিজের সহিত মল্লিকার বিবাহটা প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যেই বোধহয় আনিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! কিন্তু পরিশেষে সবই ভণ্ডুল হইয়া গেল। চন্দনই মল্লিকাকে লাভ করিল। এই হল 'হাইহিল্' চিত্রের গল্পের সারাংশ।

রাজীব পিকচার্স-এর প্রথম নিবেদন। এই 'হাইহিল' চিত্রে হাস্যরস পরিবেশন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। তাই ইহাতে কাহিনী যথাযথভাবে দানা না বাঁধিলেও, অথবা ঘটনার পারম্পর্য সর্বদা যথাযথ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে নানাবিধ বাধা থাকিলেও, কেবলমাত্র হাস্যরস পরিবেশনার ক্ষেত্রে 'হাইহিল' অমলিন ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কিছু কিছু দৃশ্য এবং কলাকৌশলের বিষয়ে কয়েকটি ত্রুটি বাদ দিলে, অদ্যাবধি প্রদর্শিত বাংলা হাস্যরসের চিত্র সমূহের সহিত তুলনায় 'হাইহিল' চিত্রটি সত্যসত্যই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। চিত্রটি দেখিবার সময় সহজ ও নির্মল আনন্দ উপভোগ করা যায়। তাই চিত্রটির প্রযোজক ও পরিচালক যথাক্রমে শ্রীরামচন্দ্র শর্মা ও শ্রীদিলীপ মিত্র—উভয়ের এই প্রথম প্রচেষ্টাকে আমরা সার্থক বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁহাদের এই অবদান আমাদের মনে ভবিষ্যতে উন্নততর বাংলা হাস্যরস চিত্রের বিষয়ে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করিয়াছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত চিত্র প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এইরূপ মনে হইলেও হইতে পারে যে, হাস্যরসের ক্ষেত্রে কাহিনীর সুসংবদ্ধতা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তা ঠিক নহে। কারণ বহু বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ হাস্যরসের পশ্চাতে জীবন-সমালোচনার একটি মৌলিক গতানুগতিকতাবর্জনকারী এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলে। আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে সে সমস্ত বিচার-বিভ্রম ও ভ্রান্ত মতবাদ অখণ্ডনীয় সত্যের মত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে জীবনের যে সমস্ত বৈষম্য ও অসঙ্গতির সম্বন্ধে আমাদের মন অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়িয়াছে—প্রকৃত হাস্যরস জীবনের সেই সমস্ত ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিকে এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া আমাদের জীবনের বিচারধারাকে এবং শোভন-অশোভন নির্ধারণের মানদণ্ডকে আমূল পরিবর্তন করিয়া দেয়। তাই প্রকৃত হাস্যরস গভীরভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। Shakespeare এর ন্যায় নাট্যকারের প্রথম জীবনের নাটকেও এই প্রকৃত হাস্যরসের পরিচয় মিলে না। তাঁহার শেষ জীবনের নাটকে উপরোক্ত প্রকৃত হাস্যরসের পরিচয় মিলে। ইহা ব্যতীত এক কথায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, Wit এবং Humour-এর যে পার্থক্য তাহা অনুভব করিতে পারিলেই প্রকৃত হাস্যরসের উপরোক্ত

অগ্রদূত পরিচালিত মুক্তিপ্রাপ্ত 'উত্তরায়ণ' চিত্রে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

সংজ্ঞা অনুধাবন করা সহজ হইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে প্রকৃত হাস্যরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহানুভূতিপূর্ণ জীবন-সমালোচনার জন্য যে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনীরও প্রয়োজন আছে তাহাও অতি সহজবোধ্য হইয়া উঠিবে।

'হাইহিল' চিত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কণ্ঠ সঙ্গীতপ্রশংসাযোগ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু গীত-রচনা আশানুরূপ হয় নাই। বিধায়কবাবু অভিজ্ঞ চিত্রনাট্যকার। তাই তাঁহায় নিকট সংলাপ রচনার বিষয়ে আমরা এই চিত্রে যাহা পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক মুন্সীয়ানা আশা করিয়াছিলাম। চিত্র গ্রহণের কাজ পরিচ্ছন্ন বলা যায় বটে, কিন্তু কুশলতার পরিচয় খুব মিলে না। তবে বহির্দৃশ্যে দূরের দৃশ্য গ্রহণ ভাল হইয়াছে। কিন্তু ঘরের রাত্রিকালিন দৃশ্য সমূহে আলোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আরও যত্ন গ্রহণের আবশ্যক ছিল। দৃশ্যসজ্জা সাধারণ ও স্বাভাবিক। সম্পাদনার কাজ ভাল হইয়াছে। তবে আরও একটু যত্ন লইলে চিত্রের গতি বর্দ্ধিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

চিত্র পরিচালক দিলীপ মিত্র এই প্রথম প্রচেষ্টার মধ্যেই তাঁহার ভবিষ্যতের সফলতার বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু বাংলা চিত্রের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়া মল্লিকার স্বপ্ন-দৃশ্যে তাঁহার বোম্বাই-মার্কা রুচি বিসর্জন দেওয়াই উচিত ছিল।

অভিনয়াংশে : অনিল চ্যাটার্জী, সন্ধ্যা রায়, ৺ছবি বিশ্বাস, ৺তুলসী চক্রবর্তী, ৺নবদ্বীপ হালদার, ভানু ব্যানার্জী, জহর রায়, অনুপকুমার প্রভৃতি।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই যথাযথ অভিনয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কেহই বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে অতি অভিনয়ও হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সব কিছু মিলাইয়া চিত্রটি উপভোগ্য হইয়াছে।

—সর্বজিত

মহানগরের রাজপথে

শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

নেতাজী সুভাষ রোড। মহাবিপ্লবীর নামাঙ্কিত মহানগরের রাজপথ। আনমনে চলতে চলতে অদূরের উত্তেজিত জনতার কোলাহল কানে এল। ত্রস্তপদে এগিয়ে গেলাম। মোড়ের বৃদ্ধ পানওয়ালা বলে উঠল, 'ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে বাবুজী—খুব গোলমাল হচ্ছে।' কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সামনে দেখা গেল সেই ক্রুদ্ধ জনতা। 'নিউ ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ' এর সামনে একটি বোর্ড ঝুলছে—তাতে লেখা রয়েছে 'Payments Suspended', বন্ধ গেটের সামনে বিভিন্ন মানুষের চীৎকার। তারা গেট খুলে ভিতরে ঢুকতে চায়। বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের আর্তস্বর সমগ্র স্থানটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সর্ব্বস্ব হারিয়েছে তারা। ঐ বন্ধ দরজার ওপাশে তাদের সবকিছু যেন নির্মম হস্তে ছিনিয়ে রাখা হয়েছে। জীবনের সঞ্চিত অর্থ আজ অনিশ্চিতের পথে চলে গেছে। প্রতিহিংসা পরায়ণ যুবকের রোষাগ্নির পার্শ্বেই দেখলাম অশীতিপর বৃদ্ধের অশ্রুধারা। ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে কেউ বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করেছেন—আবার কারও বা অনূঢ়া কন্যার বিবাহ নির্ভর করছে ঐ আজন্ম সঞ্চিত অর্থের উপর। হঠাৎ জনতার মাঝে দেখা গেল বিরাট চাঞ্চল্য। ভিতর থেকে একজন বেড়িয়ে এলেন,—দূরে হাত নির্দেশ করে বলে উঠলেন, "ঐ আসছে—Accountant"—দৌড়ে ছুটে গেলেন তিনি। লক্ষ্য করলাম রাস্তার ওদিক থেকে ধীর পদক্ষেপে চিন্তা-ক্লিষ্ট মনে একজন এগিয়ে আসছেন। চোখে চশমা—হাতে অর্ধদগ্ধ বিড়ি।

উত্তেজিত ভদ্রলোক দৌড়ে যেয়ে তার জামা ধরে ঝাকানি দিয়ে বলে উঠলেন, "এখানে কি তামাসা দেখতে এসেছেন?" "আমি কি করব?"—শান্তভাবে জবাব এল। ব্যাঙ্কএর সামনের ক্রুদ্ধ জনতা এদিকে ফিরে তাকাল। তারা বলে উঠল, "দিন না দু'ঘা বসিয়ে।" Accountantএর অবস্থা তখন সঙ্গীন। পূর্ব্বের ভদ্রলোক আরও উত্তেজিত হয়ে তাকে প্রহার করতে সুরু করলেন। ক্রোধভরে বলে উঠলেন, "পথে যে বসালেন তার কি হবে?" চারিদিক থেকে কলরব উঠল। "মেরে ফেলল"—"মেরে ফেলল"। রাস্তার অপর পার্শ্ব থেকে একদল ছুটে এল। তারা প্রথমোক্ত ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল। এতদূর ধৃষ্টতা! প্রকাশ্য রাজপথে শিল্পীর অবমাননা! শারীরিক নির্য্যাতন! দলবদ্ধ হয়ে তারা উক্ত ভদ্রলোককে আক্রমণ করতে এলেন; তারপর পার্শ্ব থেকে চীৎকার উঠলো, "Lovely—Lovely," সেদিকে লক্ষ্য করে সে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটি লরীর উপর ক্যামেরার সামনে দাড়িয়ে চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। দুই হাত উর্দ্ধে তুলে সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ যেন পরিতৃপ্তির আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। নির্বাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যদ্রষ্টা সত্যজিৎ রায়! বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক! বহির্ভারতে যিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ চলছে। Accountant হিসেবে যে শিল্পী প্রহার খেলেন তিনি জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় উত্তেজিত আমানতকারিদের প্রহারের দৃশ্যটি এতই বাস্তবানুগ হয়েছিল যে দূরে দাঁড়িয়ে যাঁরা এসব দেখছিলেন তাঁরা নিজেদের সংযম হারিয়ে ফেলেন। তারা ভাবলেন সত্যি বুঝি অনিল চট্টোপাধ্যায়কে প্রহার করা হচ্ছে! তাই তাদের আক্রোশ উপছে পড়েছিলো ঐ প্রহারকারীর উপরে। পরিচালক আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে উঠেছেন। তার কল্পনার ছবি পরিপূর্ণ বাস্তবতার রূপ নিয়েছে। প্রথম প্রহারকারী ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নবাগত। অথচ সত্যজিৎ রায়ের যাদু স্পর্শে সেও যেন সজীব উঠে উঠেছে।

সে দিন ছিল রবিবার। সকাল ৭টা থেকেই নেতাজী সুভাষ রোডে লোক সমাগম সুরু হতে থাকে বিশেষ. একটি ব্যাঙ্ক এর সামনে সত্যজিৎ রায় সুটিং করবেন—এ সংবাদটি চারদিকে কি ভাবে যেন ছড়িয়ে পড়ে। বেলা ৮টা নাগাদ ইউনিট সহ সত্যজিৎ রায় এলেন।

—সুটিং আরম্ভ হ'ল—বেলাও বেড়ে চলল। সেদিনের রোদ ও গরম বুঝি সর্বংসহা ধরিত্রীকেও হার মানিয়ে

দিয়েছিল। উপস্থিত সকলেই অসহ্য রোদের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু নির্বিকার ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তাঁর যেন অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নেই—নিজে ক্যামেরা ধরে ধ্যানমগ্ন মহাতপস্বীর মত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছেন। বিভিন্ন সট গুলি সম্পর্কে মাঝে মাঝে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কয়েক শত অতিরিক্ত শিল্পী সেদিন কাজ করছিলেন,—পরিচালক কিন্তু প্রতিজনের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন—তিনি যেন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। কাজের মাঝে যারা ভুল করছেন তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গেই তাদের সংশোধন করে দিচ্ছিলেন। কখনও তাঁকে অধৈর্য হতে দেখলাম না,—এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

নরেন্দ্রনাথ মৈত্র রচিত 'অবতরণিকা' গল্প কেন্দ্র করে 'মহানগর' নির্মিত হচ্ছে। চিত্রটি প্রযোজনা করছেন বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম দিক্‌পাল আর, ডি, বনশাল। শ্রীবনশাল প্রযোজিত অন্যান্য চিত্রগুলি সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'মহানগর' তার সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা! পর্দার অন্তরালে থেকে আর, ডি, বির চিত্রগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে। কাহিনী নির্বাচন থেকে সুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রের মাঝেই বিমলবাবুর প্রত্যক্ষ স্পর্শ রয়েছে।

'মহানগর' চিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন গাঙ্গুলী, ভি, কি, রেডউড, শীলা পাল ও আরও অনেকে। চিত্রনাট্য ও সংগীতের দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক স্বয়ং। 'মহানগর'-এর চিত্র গ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

বৃটেনের রঙ্গমঞ্চের কথা

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম. এ. (লণ্ডন) পি. এইচ. ডি (লণ্ডন)

একটা জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি জানতে হলে তার রঙ্গমঞ্চকেও জানতে হবে। বৃটেনের একটি প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চ হ'ল Royal Court Theatre. বেশীর ভাগ রঙ্গমঞ্চ লণ্ডনের West Endএ ভিড় করলেও দুএকটি অন্য পল্লীতে আছে। এটা অবশ্য গতানুগতিক রীতির ব্যতিক্রম। Royal Court Theatreকে এই ব্যতিক্রম হিসেবেই নেওয়া যায়। কারণ চেলসি অঞ্চলে এই রঙ্গমঞ্চটির মাত্র ছয় বছর আগে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি এই রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হলেও বৃটিশ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এর প্রভাব কম নয়।

কেবল আনন্দ পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েই এই প্রতিষ্ঠান ক্ষান্ত হয় নি—এর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল—বিশেষ প্রতিভা আবিষ্কার করা ও তার বিকাশে সহায়তা করা। যেমন ধরা যাক John Osborne এর কথা। বিশিষ্ট নাট্যকার Osborne এর "Look Back in aner বা 'Entertainer'এর নাম কে না জানে?

রঙ্গমঞ্চ জগতে এমনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এই দুটি নাটক যে চিত্র জগতেও তারা সহজে স্থান করে নিয়েছে। আজ তাই এই দুইটি নাটকের চিত্রাভিনয়ও ব্যাপকভাবে ভাবুকমনকে দোলা দিয়েছে। এমনি আর একজন নাট্যকার হলেন Arnold Wesker—যাঁর নাটক এই রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকটির নাম হ'ল "Roots"—সমাজতন্ত্রী মনের বলিষ্ঠ প্রকাশ। নাট্যকার তরুণ, তাই তাঁর রচনায় আছে সজীবতা, আছে আগামী কালের উজ্জ্বল স্বপ্ন। অনেক মনীষীর লেখা নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে এইখানে—এটা কম গৌরবের কথা নয়। এর মধ্যে যাঁদের বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁরা হ'লেন Sartre, Beeret Jean Genet, Ionesco, Max Frisch, John Arden, Harold Printer, Simpson. এর মধ্যে আবার কারো কারো লেখা নাটক কোন রকম পটভূমিকা ও দৃশ্য ছাড়াও অভিনীত হ'য়েছে। অবশ্য অভিনয় করেছেন বিশেষ বিশেষ অভিনেতা। বৃটেনে যাঁরা নাটকের প্রকৃত সমঝদার তাঁরা Royal Court Theatre এ মঞ্চস্থ কোন নাটকই দেখতে ভোলেন না। কারণ সকলেই জানেন এই রঙ্গমঞ্চের আভিজাত্যের কথা।

এখন দেখা যাক কি ভাবে এই অভিজাত রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হল। আশ্চর্য্যের কথা যে কোন রাষ্ট্রীয় সাহায্য বা সাধারণ পৃষ্ঠপোষকতা না থাকা সত্বেও এই রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হয়েছে কেবল বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টায়। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির পেছনে একজনের আপ্রাণ চেষ্টা কাজ করেছে। তিনি হলেন George Devine—তাঁরই অফুরন্ত উৎসাহ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে তাঁর সহকর্মীরাও হাত বাড়িয়েছিলেন এই উদ্যমকে সার্থক করে তুলতে। আজ সেই প্রচেষ্টার ফল হল এই জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গতানুগতিক রুচি ও জীবনযাত্রর বাইরেও যে জগৎ যে অভিজ্ঞতা থাকতে পারে সেই নূতন যুগের বাণীকে রূপ দেবার দায়িত্ব নিলেন George Devine,

পুরোনো দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হবার জন্যে ডেভিন ১৯৫৬ সালে তাঁর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করলেন—তার ফলে Royal Court Theatre স্থাপিত হ'ল। এমনি অনেক অভিনয়শিল্পীদের অভিযান আগেও দুই একবার যে সুরু হয়নি তা নয়—তবে সার্থক-রূপ নেবার আগেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্য এর ক্রমোন্নতি ও জনপ্রিয়তা। এর কারণ কি? উত্তরে George Devine বলেছেন যে এটা একটা সৌভাগ্য বলতে হবে যে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক দল তরুণ উৎসাহী অভিনেতার পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েগেছেন—আর পেয়েছেন John Oborne এর মত শক্তিশালী নাট্যকারকে। তাঁর Look back in Anger নাটক নাট্যজগতে যে যুগান্তর এনেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর Royal Court Theatre এর পক্ষে এটা একটা শুভ সূচনা। তারপর আজ পর্য্যন্ত ২৯ জন ইংরেজ নাট্যকারের সৃষ্টিকে একে একে এই রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করা হয়েছে—আর তার অধিকাংশই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে—এমন কি সারা ইউরোপের রঙ্গমঞ্চেও তার অভিনন্দন ছড়িয়ে পড়েছে।

ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে অন্য যে সব নাট্যকারের সৃষ্টি বেশী সাড়া জাগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম করা যেতে পারে John Ardenকে তাঁর রচনা Sergeant Musgrave's Dance নাটক হিসাবে বিশেষ সমাদর পেয়েছে স্বীকার করতেই হবে। এর পর উল্লেখযোগ্য হল Arnold Weskerএর সামাজিক নাটক Roots এছাড়া আছেন N. F. Simpson Brecht, Samuel, Beeret Sartre Man Frisch ও এমনি আরও অনেকে। তাঁদের সৃষ্টি কেবল আনন্দ পরিবেশনের জন্যই নয়, একটা বুদ্ধির দীপ্তির ওর সঙ্গে অনুভূতির সমন্বয় ঘটানোই এই সব নাটকের উদ্দেশ্য। যেমন Jean Gentএর লেখা 'The Balcony' বা 'The Black' Lonescoর The Chairs বা 'The Lesson' দর্শক সমাজে একটা আলোড়ন এনেছে। আর সে আলোড়ন সম্ভব হয়েছে george Devine এর দূরদৃষ্টির জন্যে। তিনি বুঝেছিলেন যে নতুন যুগের দাবী মেটাতে হ'লে এমন নাটকের দরকার যা মানুষের চেতনালোকে দোলা দিতে পারবে—নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে পারবে।

george Devine এর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে সাফল্যের পথে পা বাড়াতে সাহায্য ক'রেছে। নাটকের একটা বিরাট সম্ভাবনাকে মূর্ত্ত করার জন্যে তাঁর নিষ্ঠার অভাব হয়নি। তাঁর মতে নাটকের মাধ্যমে অভিনয় পরিচালনা, রস-বোধ ও শিল্প নৈপুণ্য সব কিছুর প্রকাশ সম্ভব। আর তার সার্থক পরিণতি আনতে গেলে চাই নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালকদের পূর্ণ সহযোগিতা ও বিশেষ শিক্ষা। Devineএর স্বপ্ন যে Royaul Cowrt Theatre এই শিক্ষার দায়িত্ব নেবে—এর পরিচয় কেবল রঙ্গালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—হবে সংস্কৃতিজগতের অন্যতম কেন্দ্র। এই আদর্শকে রূপ দিতে হলে যে ইউরোপীয় নাটকের দ্বারস্থ হ'তে হবে তা বুঝেছিলেন। কারণ ইউরোপের রঙ্গজগতে যে ঐতিহ্য রয়েছে তার কাছ থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। তাই তিনি সেদিন হাত বাড়াতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে Samuel Beckett এর রচনা "Waiting for godot" এর কথা। বৃটিশ রঙ্গালয়ে এর প্রভাব কম নয় মানতেই হবে।

তাই Devine-এর নীতি হল প্রতিভার আবিষ্কার করা। ফলে আজ নাটক সৃষ্টির দিকে অনেকের উৎসাহ এসেছে—আর নাটকের দিকে আগ্রহ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ছাড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা নাটকে বিশেষ উৎসাহী তারাও আজ এই

কেন্দ্রের কর্ম্মী হিসেবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। শিক্ষা নবিশীর সুযোগ পেতে চায়। কেন? কারণ Royal Court ছাড়া আজ বৃটেনে এমন কোন কেন্দ্র নেই যেখানে উৎসাহী যুবসম্প্রদায় তাদের নাট্যামোদী মনকে ভরে তুলতে পারবে। তাইত এই কেন্দ্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের আশায় অনেকেই ভিড় করে।

কিশোর শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাবার জন্যে এক জন প্রকাশকও এগিয়ে এসেছেন বিশেষ নাটকের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প নিয়ে।

কিশোরমন সবখানেই সজীব—তাই ইউরোপের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই সব নাটক মঞ্চস্থ করার উৎসাহ দেখা দিয়েছে। যেমন বলা যায় Becktt এর 'Crapps Last Tape, এর কথা।

এখন দেখা যাক Royal court Theat বৃটেনের সাধারণ পেশাদারী রঙ্গজগতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার Arthur Miller এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে—আজকের নাট্যজগতে যে পরিবর্ত্তন এসেছে তার মূলে আছে Royal Court-এর প্রভাব। দশবছর আগে বৃটিশ রঙ্গজগৎ জীবনের মুক্তধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল—সেখানে যেন একটা সাবধানী দৃষ্টি, একটা সংকীর্ণ মন কাজ করত। কিন্তু আজ একটা পরিবর্ত্তনের ঢেউ এই সব প্রাচীনপন্থী গতানুগতিক রঙ্গালয়ের দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে। নাট্যামোদী মনে উঁচু ধরণের আনন্দ পরিবেশনের চেষ্টা সুরু হয়েছে। এই পরিবর্ত্তনের পালা সুরু হয়েছে মাত্র। Royal court Theatre দুটি ধারায় ভাব-বিপ্লব আনতে চাইছেন। এক ধরণের নাটক হল—সামাজিক নাটক। সোজাসুঁজি একটা আন্দোলন সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। এই গোষ্ঠীর নাট্যকারের অন্যতম হ'লেন John Orbonne ও Arnold Wesker. সমাজের যা জীর্ণ ও সংকীর্ণ তার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোই হ'ল এই শ্রেণীর নাটকের লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছবার অন্য পথও আছে। সেটা সম্ভব হয় জীবনের গভীর অনুভূতিলোকে ঝঙ্কার তোলার মাধ্যমে। মানব দরদী মনকে জীবনদর্শী করে তুলতে হ'লে রসের আবেদন চাই। আর সেই রস পরিবেশনের ভার নিয়েছেন Ionesco, Beeret, Painter ও Simpson এর মত শক্তিশালী জীবনধর্ম্মী নাট্যকার।

এই দুটি বিশিষ্ট ধারার মধ্যে কোন বিরোধ আছে কিনা প্রশ্ন জাগতে পারে। George Devine এর মতে এ দুটি ধারার মধ্যে সত্যিকারের কোন সংঘাত নেই—কারণ এ দুইএর সংগমেই জন্ম নেবে অনাগত ভবিষ্যৎ, নতুন অভিব্যক্তি।

আগেই বলা হয়েছে কে Royal Court Theatre কোন সরকারী বা সাধারণ পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। অবশ্য এতে সুবিধে অসুবিধে দুইই আছে। অসুবিধে যাই থাক না কেন সুবিধে হ'ল যে এই কেন্দ্রের কার্য্যধারায় বা নীতি অবলম্বনে কারও কোন হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। ফলে যে ব্রত নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পরীক্ষা মূলক ভাবে নিত্যনতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবার অবাধ স্বাধীনতাকে হারিয়ে ফেলতে চায় না এই সংস্কৃতি কেন্দ্র। আজ সবাই তাকিয়ে আছে এই রঙ্গালয়ের মঞ্চের দিকে। যে সব নাটক অদূর ভবিষ্যতে মঞ্চস্থ হবে তার মধ্যে থাকবে, Osborne এর Blood of Bombergs Beeret-এর Happy Days ও John Arden-এর The Work House Donkey প্রতিটি নাটকই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এমনি নতুন নতুন নাটকীয় সৃষ্টির উন্মাদনায় Royal Court Theatre-এর জয় যাত্রা অব্যাহত।*

* লণ্ডন বি, বি, সির (বিচিত্রার) সৌজন্যে।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আগা খাঁ হকি কাপ ঃ

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত আগা খাঁ হকি গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে নর্দার্ন রেলওয়ে (দিল্লী) ২-০ গোলে পাঞ্জাব পুলিশ দলকে পরাজিত করেছে। এইনিয়ে রেলদল দু'বার ফাইনালে জয়ী হ'ল। প্রথম জয়লাভ করে ১৯৫৯ সালে। পাঞ্জাব পুলিশ দল ইতিপূর্ব্বে দু'বার (১৯৫৫ ও ১৯৬০) আগা খাঁ কাপ পেয়েছে এবং ১৯৫১ সালের ফাইনালে তারা পরাজিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পাঞ্জাব পুলিশ দল এবছর বোম্বাই গোল্ড কাপ জয় করেছিল।

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৬৩ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় পাকিস্তানকে, সেমি ফাইনালে ৫-০ খেলায় মালয়কে এবং ফাইনালে ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে জোন ফাইনালে উঠেছে। পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ এবং জাপানের মধ্যে এই নিয়ে তিনবার খেলা হ'ল এবং ভারতবর্ষ প্রতিবারই জয়ী হ'ল। ভারতবর্ষ ১৯৫৬ সালে ৩—২ খেলায়, ১৯৬১ সালে ৪—১ খেলায় এবং ১৯৬৩ সালে ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করেছে।

ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষ খেলবে ইণ্টার জোন সেমিফাইনাল খেলায় বিজয়ী দেশের সঙ্গে। ইউ-রোপীয়ান এবং আমেরিকান জোন বিজয়ী দেশ ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল পর্য্যায়ে খেলবে। ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার পরই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। ভারতবর্ষ এই নিয়ে উপর্যুপরি দু'বার ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করলো। গত বছর (১৯৬২) ইণ্টার-জোন ফাই-নালে মেক্সিকো ৫—০খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল।

উবের কাপ ঃ

মহিলাদের বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় (দলগত অনুষ্ঠান) বিজয়ীদলের পুরস্কার এই উবের কাপ। এই কাপটি দান করেছেন ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় শ্রীমতী বেট্টি উবের। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯৫৭ সালে। প্রতি তৃতীয় বৎসরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৩ সালের উবের কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকা ৪—৩ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিনবার উবের কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৬৩ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় আমেরিকা এক সময়ে ৩—১ খেলায় অগ্রগামী ছিল। ইংল্যাণ্ড খেলা সমান ৩—৩ করাতে শেষ ডাবলস খেলাটি খুবই গুরুত্ব লাভ করে। প্রতিযোগিতার এই শেষ খেলাতে আমেরিকার পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন জুড়ি হাসম্যান

এবং কার্লিনি স্টার্কি। তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বোগার্স এবং প্রিটচার্ড জুটিকে পরাজিত করেন। ১৯৬৩ সালের উবের কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে শ্রীমতী জুডী হাসম্যান (কুমারী জীবনে জুডী ডেভলিন) তিনটি খেলায় অংশ গ্রহণ ক'রে তিনটিতেই জয়লাভ করেন। তাঁর সহযোগিতায় এবং নেতৃত্বে আমেরিকা উপর্য্যুপরি তিনবার (১৯৫৭, ১৯৬০ এবং ১৯৬৩) উবের কাপ জয়ের গৌরব লাভ করলো।

১৯৬৩ সালের প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ইংল্যাণ্ড ৫—২ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত ক'রে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠেছিল।

মেহরা ট্রফি ঃ

বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত নক্-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বি, এন, আর দল ১১৯ রানে শক্তিশালী মোহনবাগান দলকে (গত বছরের রানার্স-আপ) পরাজিত ক'রে মেহরা ট্রফি জয় করেছে।

প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ ঃ

বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলায় মোহনবাগান ক্লাব জয় লাভ করেছে। খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। শেষ পর্য্যন্ত টসের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

পেনাংয়ে অনুষ্ঠিত ৫ম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতি-যোগিতায় ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া যুগ্মভাবে টঙ্কু আবদুল রহমান কাপ জয় করেছে। ফাইনাল খেলায় ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া দু'টি করে গোল দেওয়াতে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। শেষ পর্য্যন্ত টসের সাহায্য নিতে হয়। টসে ব্রহ্মদেশ জয়লাভ ক'রে প্রথম ছয়মাস কাপটি রাখার অধিকার পায়।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় মোট বারটি দেশ যোগদান করে। প্রথমে লীগ প্রথায় খেলা হয়। ভারতবর্ষের খেলা পড়েছিল এ গ্রুপে। দুটি গ্রুপে বারটি দেশকে সমান-ভাবে ভাগ করা হয়।

এ গ্রুপ থেকে ব্রহ্মদেশ এবং বি গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া অপরাজিত অবস্থায় ফাইনালে উঠেছিল। দক্ষিণ কোরিয়া গত বারের রানার্স-আপ। গতবারের বিজয়ী দেশ তাইল্যাণ্ড এ গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল (৫টা খেলায় ৯ পয়েণ্ট)। ভারতবর্ষ পেয়েছিল চতুর্থ স্থান (৫টা খেলায় ৫ পয়েণ্ট)। ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল ঃ জয় ২, পরাজয় ২ এবং খেলা ড্র ১।

ভারতবর্ষ ১—০ গোলে কম্বোডিয়া এবং ২—০ গোলে ফিলিপাইনকে পরাজিত করেছিল। ভারতবর্ষ হার স্বীকার করেছিল ১—২ গোলে মালায় এবং ০—২ গোলে থাইল্যাণ্ডের কাছে। ভারতবর্ষ বনাম ব্রহ্মদেশের খেলাটি ১—১ গোলে ড্র হয়েছিল। ব্রহ্মদেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই খেলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ব্রহ্মদেশ এ গ্রুপে অপরাজেয় অবস্থায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল।

বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি ঃ

১৯৬৩ সালের বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনের ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশ ২—১ গোলে মাদ্রাজ একাদশ দলকে পরাজিত করে। প্রথম দু'দিনের ফাইনাল খেলায় কোন দলই গোল দিতে পারেনি। সেমি-ফাইনালে ১৯৬২ সালের রানার্স-আপ পাঞ্জাব পুলিশ ৩—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে। পাঞ্জাব পুলিশ ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালে গোল্ডকাপ পেয়েছিল। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ একাদশ দল ১—০ গোলে নদার্ণ রেলদলকে (দিল্লী) পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ঃ

ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরের খেলা গত ১লা মে থেকে আরম্ভ করেছে। ১৯৬৩ সালের এই ইংল্যাণ্ড সফরের তালিকায় আছে মোট ২৯টি প্রথম শ্রেণীর খেলা (পাঁচটি টেস্ট খেলা সমেত)। ইংল্যাণ্ড সফরকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলে আছেন এই ১৭ জন খেলোয়াড় ঃ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (অধিনায়ক), কনরাড হাণ্ট (সহ-অধিনায়ক), ওয়েসলি হল, রোহন কানহাই, গারফিল্ড সোবার্স, আলফ্রেড ভ্যালেনটাইন,

জোসেফ সোলমন, উলী রডরিগস, সিমর নার্স, ইস্টন ম্যাক্‌মরিস, ডেভিড এ্যালান, বেসিল বুচার, লান্স গিবস, চার্লস গ্রিফিথ, লেস্টার কিং, ডি এ এম কারু এবং ডেরিক মারে। এঁদের মধ্যে শেষের দু'জন এখনও কোন টেষ্ট ম্যাচ খেলেননি। ইংল্যাণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে টেষ্ট খেলার উদ্বোধন হয় ১৯২৮ সালের ২৩শে জুন, লর্ডস মাঠে। এই দুই দেশের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৪০টি টেষ্ট খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল: ইংল্যাণ্ডের জয় ১৫, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ১০ এবং খেলা ড্র ১৫। এই ৪০টি টেস্ট খেলায় টেষ্ট সিরিজ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০টি। টেস্ট সিরিজের ফলাফল: ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৫টি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৩টি এবং ২টো টেস্ট সিরিজ ড্র। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাবার' জয় ১৯২৮ সালে অর্থাৎ উভয় দেশের প্রথম টেস্ট সিরিজেই। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম 'রাবার' পেয়েছে ১৯৩৪-৩৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজে।

বেটন কাপ ঃ

১৯৬৩ সালের বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে গত বছরের রানার্স-আপ সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দল (বোম্বাই) ২—০ গোলে গত বছরের বাইটন কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে বেটন কাপ পেয়েছে। সেণ্ট্রাল রেল দলের পক্ষে এই নিয়ে উপযুপরি তিনবার বেটন কাপের ফাইনাল খেলা। ১৯৬০ সালের ফাইনালে তারা বেটন কাপ পায়। গত বছরের ফাইনালে রেল দল ০-১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে পরাজিত হয়।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ ঃ

১৯৬৩ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তিনবার খেতাব পেল। ইতিপূর্ব্বে তারা হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে (কাস্টমস দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে)। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে প্রধানতঃ গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান, রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল এবং বি-এন-আর দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। মোহনবাগান উপর্যুপরি ১৭টা খেলায় জয়লাভ ক'রে যখন ৩৪ পয়েণ্ট তুলেছিল তখন ইস্টবেঙ্গল দলের ছিল ১৮টা খেলায় ৩৪ (২টো খেলা ড্র, জয় ১৬) এবং বি-এন-আর দলের ১৮টা খেলায় ৩১ পয়েণ্ট। মোহনবাগান তাদের অষ্টাদশ খেলায় বি-এন-আর দলের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ১-২ গোলে পরাজিত হ'লে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের সমান ১৮টা খেলায় ৩৪ পয়েণ্ট দাঁড়ায়। মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গলের শেষ খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে জয়লাভ ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। মোহনবাগান হয়েছে রানার্স-আপ।

এ পর্যান্ত মোহনবাগান ক্লাব হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোট ৮ বার এবং এর মধ্যে উপযুপরি চারবার।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল ফলাফল:

পুরুষ বিভাগ: বিজয়ী সার্ভিসেস—৭২ : রানার্স-আপ মহীশূর—৬৮ পয়েণ্ট।

মহিলা বিভাগ: বিজয়ী মহীশূর—৪২ : রানার্স-আপ পশ্চিম বাংলা ৩৬ পয়েণ্ট।

বালক বিভাগ: বিজয়ী মহীশূর—৮১ : রানার্স-আপ মাদ্রাজ ৫৯ পয়েণ্ট।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসর পূর্ণ হইল এবং আগামী বর্ষারম্ভে আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষ একান্ন বৎসরে পদার্পণ করিবে। আষাঢ় সংখ্যা খ্যাতিমান লেখক-লেখিকাদের রচনায় সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হইয়া বিশেষ সংখ্যারূপে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহার প্রতি সংখ্যা ২৲ টাকা হিসাবে ধার্য হইল। এজেণ্টগণ, পূর্ব হইতেই যোগাযোগ করুন; বিজ্ঞাপনদাতাগণ, সত্বর হউন।

কর্মাধ্যক্ষ
ভারতবর্ষ

সাহিত্য সংবাদ

স্মৃতিচারণ (দ্বিতীয় খণ্ড) : শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীদিলীপকুমার রায় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র। এদেশে যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্রের খুবই অভাব। বড় চাকুরিয়ার পুত্র বড় চাকুরিয়া এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের জাতীয় অথবা সাহিত্যিক সাঙ্গীতিক সংস্কৃতিতে যাঁর বিশিষ্ট অবদান আছে তাঁর পুত্রেরা প্রায়ই বংশধর হ'লেও কুলতিলক হয় না।

দিলীপকুমার উচ্চ শ্রেণীর কবি, অসামান্য শ্রেণীর সুরকার ও সঙ্গীতকোবিদ, একজন শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক যিনি বহু বিষয়েই লিখেছেন। সর্বোপরি, তিনি ধর্মপথের একজন একনিষ্ঠ সাধক—সাধনভজনে অনেকদূর অগ্রসর। ভগবান্ তাঁকে অসামান্য কণ্ঠলাবণ্য দিয়েছেন, সেই সম্পদকে তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে। তিনি বহুভাষাবিদ্, যার ফলে তিনি আজ একজন আন্তর্জাতিক পুরুষ ব'লে গণ্য। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি ভারতের সঙ্গে অধিকাংশ সভ্যদেশের সংযোগ স্থাপন করেছেন।

সম্প্রতি তাঁর জীবনস্মৃতি "স্মৃতিচারণ" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গসাহিত্যে এই প্রায় হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থটী একটি অপূর্ব অবদান। দিলীপকুমার জীবনে যে সকল দেশী ও বিদেশী মনীষী কবি সঙ্গীতজ্ঞ দার্শনিক ও ধর্মাচার্যদের সাহচর্য লাভ করেছেন তাঁদের সহিত ভাবের আদান প্রদানের বিশদ বিবৃতি এই গ্রন্থ বর্তমান যুগের বিবিধ সংস্কৃতির মধ্যে সাম্য বৈষম্য বিচার, দ্বন্দ্ব ও তার সমন্বয়, সমস্যা ও তার সমাধানের কথা আছে। এক কথায় এ-বইটিকে বর্তমান যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বলা চলে। কিন্তু ইতিহাস ব'লে এ-অভিনব সৃষ্টিকে বিদায় দিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে, কারণ বইখানি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগ্রন্থ—বহু বিচার, সিদ্ধান্ত, মন্তব্য ও আলাপ-আলোচনা এতে সরস ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। তার উপরে লেখক নিজে কবি ব'লে তাঁর রচনা নানা স্থানে গদ্য কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলা যায়।

অপিচ এ-বইটি বহু চরিত্রের সমাবেশে একখানি উপন্যাসের ম'তই চিত্তাকর্ষী হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসের নাটক দিলীপকুমার নিজেই—কেন না তাঁর বৈচিত্র্যময় ঘটনাঘন জীবন প্রতিফলিত হয়েছে ছত্রে ছত্রে। কিন্তু এ-সূত্রে আর একটি কথা বলা চাই। সেটী এই যে এ-বইটি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষী হ'লেও এর বিষয়বস্তুতে উপন্যাসের কাল্পনিক উপাদান কিছু নেই। চরিত্রগুলি বিধাতা পুরুষেরই সৃষ্টি এবং অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজের বৈচিত্র্যময় মধুর শুচিশোভন চরিত্রটিকে অনুস্যূত করেছেন তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মতই। বহু জীবন্ত চরিত্রের সমাবেশে বাস্তব সত্য দিয়ে গড়া উপন্যাস যদি কেউ পড়তে চান তবে তিনি যেন "স্মৃতিচারণ" পাঠ করেন--এর আনন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে বহু বিচিত্র তথ্য তথা তত্ত্বেরও সাক্ষাৎ পাবেন। কারণ "স্মৃতিচারণ" কেবল দিলীপকুমারের জীবন চরিত্রই নয়, বহু জ্ঞানী গুণী মহাজনের জীবনীর সঙ্গে জড়িত। এক কথায় সাহিত্যের বহু শাখার মিলনে সমৃদ্ধ।

কত চরিত্রই যে এতে আছে: রোমাঁ রোলাঁ, বার্টরাণ্ড রাসেল, ওলগা বিককত, ভ্লাদিমির, মসিয়ে, এন্ড্রু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, বারীন্দ্রকুমার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কত নাম করব? আর প্রত্যেক চরিত্রই এত চিত্তাকর্ষক যে পড়তে পড়তে তাঁদের ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়তে হয়।

•

[প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। মূল্য—৬'৫৯নঃ পঃ]

শ্রীকালিদাস রায়

বাল্মীকি রামায়ণ (যুদ্ধকাণ্ড):

পদ্যানুবাদ—শ্রীআশালতা সেন।

রামায়ণের সহিত বাঙালীর পরিচয় সাধারণতঃ কৃত্তিবাসের রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া! কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনেকখানি রাম কথাকে অবলম্বন করিয়া বাঙালীর সমাজ-জীবনের কথা, বাঙালীর ঘরের কথা; এই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ 'আজ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙালীর মনকে অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের বর্ণিত রাম-কথা বাঙলা দেশে যত জনপ্রিয়তাই লাভ করুক না কেন, রামায়ণের মূলের ঐশ্বর্য ও মহিমা তাহাতে সর্বত্র অক্ষুন্ন থাকে নাই। আমরা ছেলেবেলা হইতে কুম্ভকর্ণকে যেমন করিয়া জানি কুম্ভকর্ণ ঠিক তাহাই নয়; বাল্মীকি রামায়ণে দেখিতে পাইব, তাহারও একটি স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল। বিভীষণকে আজ আমরা যেভাবে 'ঘরপোড়া বিভীষণ' বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি বাল্মীকির রামায়ণের সহিত আমাদের ভাল করিয়া পরিচয় থাকিলে বিভীষণকে আমরা ঠিক তেমন করিয়া ঘৃণা করিতে শিখিতাম না। অন্য চরিত্রের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কৃত্তিবাসের অঙ্কিত রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এবং বাল্মীকি-বর্ণিত রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সর্বাংশে এক নয়।

এই কারণে মূল-রামায়ণের সহিত আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। মূলকে যে আমাদের সংস্কৃততেই পড়িতে বা বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই: মূলানুগ অনুবাদের ভিতর দিয়াও ইহা সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকাংশে সম্ভব হইতে পারে। বাঙালীকে সেইভাবে মূল রামায়ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবারই চেষ্টা করিয়াছেন সুলেখিকা এবং আজীবন সমাজ-সেবিকা শ্রীযুক্তা আশালতা সেন তাঁহার বর্তমান গ্রন্থের ভিতর দিয়া। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ্রীযুক্তা সেন বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একটি পদ্যানুবাদ দিয়াছেন। লেখিকা ঠিক সমগ্র কাণ্ডটির অনুবাদ করেন নাই, বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল অংশগুলির পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। অংশগুলি লেখিকা এমন ভাবে নির্বাচন করিয়াছেন যে সবগুলি জুড়িয়া আখ্যানভাগটি একটি সমগ্রতা লাভ করে। গ্রন্থারম্ভে লেখিকা রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথম দুইটি অধ্যায়ের পদ্যানুবাদ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বাল্মীকি-রামায়ণের আরম্ভটি যে কিরূপ তাহাও যেমন জানিতে পারা যায়, তেমনই সমগ্র রামায়ণের বাল্মীকি-কৃত বিষয়-বিন্যাস কিরূপ তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায়।

লেখিকার অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই, ইহা যেমন অনেকখানি মূলানুগ তেমনই ইহা সাবলীলন। ভাষায় তিনি মূলের শব্দ-ব্যবহার ও অলঙ্কারাদি অনেকই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা বাঙলারূপের মাধুর্যও যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। অনুবাদের মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল স্থানের কিছু কিছু মূল উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। লেখিকার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়, এবং আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থখানির ছাপা বাঁধাই ও অঙ্গসজ্জা ভাল।

[প্রাপ্তিস্থান—প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী; ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ মূল্য—৩৫০ নঃ পঃ]

—শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২২।৫।৭৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত